দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রতিষ্ঠিত

ভারতবর্ষ

সচিত্র মাসিক পত্র

একত্রিংশ বর্ষ

দ্বিতীয় খণ্ড

পৌষ ১৩৫০—জ্যৈষ্ঠ ১৩৫১

সম্পাদক

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

প্রকাশক—

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ভারতবর্ষ

একত্রিংশ বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড ; পৌষ ১৩৫০—জ্যৈষ্ঠ ১৩৫১

লেখ-সূচী—বর্ণানুক্রমিক

চিত্রসূচী—মাসানুক্রমিক

পৌষ—১৩৫০

বহুবর্ণ চিত্র

সারনাথ মন্দিরগাত্রের চিত্র

মাঘ—১৩৫০

বহুবর্ণ চিত্র

কুসুম কলিকা

ফাল্গুন—১৩৫০

বহুবর্ণ চিত্র

চৈত্র—১৩৫০

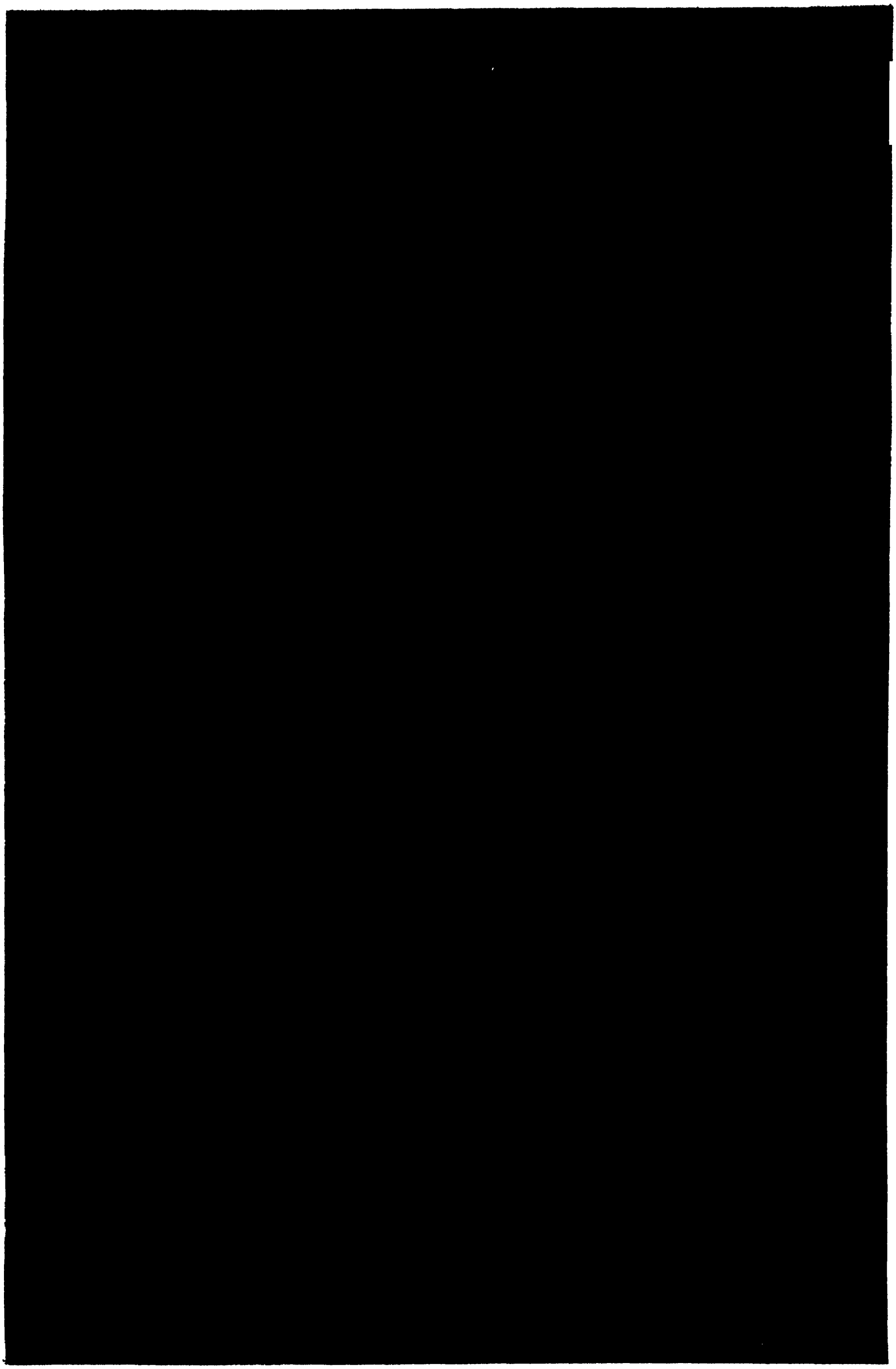
বহুবর্ণ চিত্র

বৈশাখ—১৩৫১

বহুবর্ণ চিত্র

জ্যৈষ্ঠ—১৩৫১





শিল্পী—শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বসু সারনাথ মন্দিরগাত্রের চিত্র ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্





ভারতবর্ষ



পৌষ—১৩৫

দ্বিতীয় খণ্ড	একত্রিংশ বর্ষ	প্রথম সংখ্যা

বৈষ্ণবচিত্রের উৎস ও তাহার পটভূমিকা

শ্রীজনরঞ্জন রায়

বৈষ্ণব চিত্র বলিতে আমরা কৃষ্ণলীলাই বুঝিব।

কোনোভাব মনের মধ্যে তার ছবি না আঁকিলে তুলি দিয়া তাহা প্রকাশ করা যায় না। চিত্রকর তার সংস্কার এবং আবেষ্টনীর দ্বারা প্রেরণা পায়।

সংস্কার আসে তার বাল্যযৌবনের স্মৃতি হইতে; তার পিতামাতার আচার ব্যবহার হইতে। তার জাতির রং, গড়ন, তার দেশের নদনদী, পশুপাখী, দুঃখ উৎসব আনন্দ হইতে।

সব দেশেই একটা বেড়া—বেষ্টনী তৈরী ক'রে তার সাহিত্য। যার প্রভাব সবচেয়ে বেশী। আমরা বৈষ্ণব চিত্রের কথাই বলিতে বসিয়াছি। এখানে বৈষ্ণবের ধর্ম্ম-সাহিত্যের প্রভাব প্রধান হইবেই হইবে।

ক্রমে অনেকগুলি কথা আসিয়া পড়িল। সময়, সাহিত্য, সমাজ, স্থান, ভাব—ইত্যাদি। বৈষ্ণব চিত্রের উৎস খুঁজিতে গিয়া এই সব জিনিষের তল্লাস করিতে হইবে। নতুবা কোন্ দেশ হইতে এই ফল্গুধারা বাহির হইল তাহার হদিস্ করা দুর্ঘট হইবে। উৎস এখন স্রোতস্বতী—সহস্র হস্ত বিস্তৃত। বহু ধারায় মিলিয়া প্রকাণ্ড। বহু পুষ্ট হইলেই তাহাকে বড় বলা যায় না। সে কথা আপাততঃ থাক। আমরা বলিতেছিলাম ফল্গুনদীর ন্যায় ইহারও দুইটি-শাখা চোখে পড়ে। তাই উভয় শাখায় গিয়াই আমাদের ডুব দিতে হইবে। নতুবা উৎসের সন্ধান মিলিবে না। কোনো শাখার স্রোতে ভাসিয়া গেলে চলিবে না। দুইটি ছাড়া অন্য প্রধান কোনো শাখার সন্ধানও জানিনা। পাহাড়ে নদীতে চোরাবালি আছে, তরঙ্গ আছে, টানও আছে। ধর্ম্মের টান্ খুব বেশি টান। বৈষ্ণব ভাব তরঙ্গে ভাসিলে চলিবে না। অবৈষ্ণব ভাবতরঙ্গও সেখানে আছে। শুধু হিন্দু কারুশিল্প-ই নয়, সেখানে মুঘল কারুশিল্পও আছে। তাই পায়ে জোর দিয়া দাঁড়াইতে হইবে।

মুখবন্ধ বড় করিবার দরকার নাই। যাহা দু'চার কথা না বলিলে নয় তাহাই বলিলাম। বৈষ্ণব চিত্রকলার পরিণত কৈশোর খ্রীঃ ত্রয়োদশ শতকে। কৈশোর-মাধুর্য্য মুগ্ধ করে খুবই। কিন্তু শৈশব ও পৌগণ্ডে তার মাধুর্য্য ছিল না—এমন হয় না। বাড়ার রীতিই তো এই—ক্রমে ক্রমে।

কিন্তু আমরা হিন্দু চিত্রকলার শৈশব জানি না। হয়তো চতুর্থ শতকে ইহার জন্ম হয় গুপ্ত সাম্রাজ্যে। গুপ্ত রাজগণ বৈষ্ণব ছিলেন তাঁদের রাজ্যসীমা কেরল হইতে কাঞ্চী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

আমরা কতকটা জানি ইহার পৌগণ্ড। যাহা খ্রীঃ অষ্টম ও নবম শতকে তার রূপটি দেখাইয়া লুকাইয়া পড়ে পাহাড় গুহায়। এলিফান্টা ইলোরা, সাইগিরি, অজন্তা প্রভৃতি গিরি কন্দরে।

তারা লুকাইয়াছিল বলিয়াই বাঁচিয়া আছে। না লুকাইলে বাঁচিত না। যারা লুকায় নাই তারা বাঁচে নাই। রাষ্ট্র যখন ত্রাহি ত্রাহি ডাক ওঠে, রূপ তখন মুখ ঢাকিতে বাধ্য হয়। শিব যখন রুদ্র নাচন নাচিতে ছিলেন, তখন তাঁর আলেখ্য আঁকা হইয়াছিল ইহা কেহ বলিবে না।

ভারত রাষ্ট্র-মঞ্চে তখন 'দিন্-দিন্' শব্দের ঝঞ্ঝনা। অর্দ্ধচন্দ্র আঁকা পতাকা পত পত শব্দে উড়িতেছে। আরবি টাট্টু দাবড়িয়া পাঠানের ঝটিকাবর্ত্তের মতো ঢুকিতেছে। তাদের হাতের ঘূর্ণায়মান তলোয়ারের এক এক চোটে কত কি উড়িয়া যাইতেছে। ঘোড়ার দাপটে ধুলি পটল আকাশ ছাইতেছে। সুতরাং সব কিছুই লণ্ডভণ্ড হইয়া যাইতেছে

ইতিহাস সব কথা বলে নাই। না বলিলেও আমরা বুঝিতে পারিতেছি। লুকানো ছিল যাহা তাহাই বাঁচিয়াছে। লুকানো যাহা নাই তাহা আর নাই।

সেই গাজনে কত কি গিয়াছে তার হিসাব নিকাশ করা অসম্ভব। কারণ কত কি ছিল তারও কোন ফিরিস্তি নাই। তবে অনুমান হয় চারুশিল্প ও কারুশিল্প প্রায় সবই গিয়াছে। তাহা যদি না যাইত তবে অজন্তার মতো বহু স্থানেই ফ্রেস্‌কো-চিত্র পাওয়া যাইত।

আরো একটা কথা বলা হয়। ছবির কাপড় নষ্ট হইয়া গিয়া থাকিবে। তাই পুরাতন নমুনা মেলে না। নিশ্চয় ভয়ে ভয়ে যেখানে সেখানে ছবিগুলির অন্ততঃ কিছুটা—লুকান হইয়াছিল। সেগুলিও পাওয়া যায় না কেন? ইহার উত্তর প্রাণ বাঁচানো তখন বড় দায়—ছবি বাঁচানো বড় নয়। সোঁতা, কীট, অযত্ন—এসব তো ছিলই। এইরূপে কে কোথায় কি ফেলিয়া গেল--তার ঠিকানাই ছিল না। তার ফলে ছবিগুলি প্রায় সবই গিয়াছে।

রাষ্ট্রের বুকে এই ঘূর্ণিবার্ত্তার সঙ্গে যে বান ডাকিল তাহাতে ঘর ভাঙ্গিল, দেউল ভাঙ্গিল; মানুষ মরিল, সভ্যতা মরিল। কিন্তু জোয়ারের তোড়ে একদিক যখন ভাঙ্গে, আর একদিক তখন গড়ে। তা ভালমন্দ যাহাই কেন গড়ুক না। নদী-মাতৃক দেশের লোক আমরা এটা খুবই দেখি। বান যখন থিতাইল অন্যদিকে পলি পড়িয়াছে। এইভাবেই ইণ্ডো-এরিয়ান শিল্প গড়িল। তাতে ভারতীয় আছে, পারসীক আছে।

রাজপুত চিত্রকলা যেখানে প্রভাব বিস্তার করিল সেখানে হিন্দু মুসলমান জাতি-বিচারের বেশী হাঙ্গামা ছিল না। অন্ততঃ বাঙলায় যে হাঙ্গামাটা দেখি তেমন কিছু নিশ্চয় ছিল না। এমন কি যে স্থানটা তাদের রাজপাট—সেই দিল্লী আগরায় এমন খুব বেশী লোক তো মুসলমান হয় নাই। তার কাছাকাছি মথুরা, বৃন্দাবন, জয়পুর, গোয়ালিয়র, মালব, এলাহাবাদ, দোয়াব, অযোধ্যা সে সব জায়গাতেও মুসলমানের খুব সংখ্যাধিক্য নাই। এমন কি নিজাম—যাহা দুই শত বৎসরের অধিক মুসলমান শাসনে আছে, সেখানে শতকরা দশ জন মাত্র মুসলমান। তার পূর্ব্বে গোলকুণ্ডা, বিজাপুর, আমেদপুর মুসলমান অধিকারে এ সব বহুকালই ছিল। তবু সেখানে মুসলমানের সংখ্যা তেমন কিছু নয়। কিন্তু বাঙলায় এত মুসলমান আধিক্য—এর কারণ বাঙলায় প্রাচীন সমাজপতিদের দূর-দৃষ্টির লজ্জাকর অভাব। কিন্তু সকল স্থানেই দেখি শিল্পে ও চিত্রে মুসলমান প্রভাব খুব বেশী। বাঙলা ছাড়া ঐ সব স্থানে কিন্তু একজন হিন্দু ও একজন মুসলমান ভদ্রলোককে দেখিলে মনে হইবে দুই ভাই। এতই মিল দু'জনের হাবভাব, পোষাক ও সভ্যতায়। বাঙলায় হিন্দু তার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে খুবই যত্নশীল—যাহার ফলে এখানে এতটা ছোঁওয়াছুঁয়ি—স্পর্শ দোষের এই বিরাট ব্যবধান গড়িয়া উঠিয়াছে—হিন্দু বাঙালীর নিজেদের মধ্যেও। বৌদ্ধ ও পাঠান—পর্য্যায়ক্রমে এই দুই শত্রুর হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে গিয়া এই ছোঁয়াচ আতঙ্ক বাঙলার হিন্দুকে এতটা পাইয়া বসিয়াছিল। এই দলভাঙ্গা পথভ্রষ্ট বৌদ্ধগণই শেষে দলে দলে মুসলমান হয়। ইহারাই নেড়া নেড়ী বলিয়া হিন্দু সমাজে উপেক্ষিত হইত। নেড়া নেড়ী অর্থে বৌদ্ধ সঙ্ঘারামের ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী। আউল, বাউল সম্প্রদায় প্রধানভাবে ইহাদের দ্বারাই গঠিত হয়। ইহারা এখন বৈষ্ণব। ইহাদের নিন্দা করিবার কোনো হেতু নাই। খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতকেও বাজারে কন্যা বিক্রয় প্রথা ছিল। সুতরাং পাঁচ সিকায় মেয়ে বিক্রয়ের যে কাহিনী আমরা শুনি, তাহাতে নবদ্বীপকে অস্পৃশ্য করিবার কারণ দেখি না। সমাজে এরূপ এক সময়ে হইয়াছিল। ইহা ইতিহাস। ইতিহাসকে ফেলিয়া দিলে চলিবে না।

"Strabo tells us that those who are unable from poverty to bestow their daughters in marriage, expose them for sale in market places in the flower of their age."— —Robertson's India, p, 55

তবে ইহা এখন নাই। কবি দাশরথী রায় ইহা নিয়া খুব একচোট ঠাট্টা করিয়া গিয়াছেন।

খৃষ্ট পূর্ব্ব তৃতীয় শতকে যে পুরুষ ও স্ত্রী-ধর্ম্মমহামাত্র ছিলেন তাঁরাই যেন গোঁসাঞী ঠাকুর ও মা গোঁসাঞী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।

পল্লীগ্রন্থ সকলে যে সকল মত উল্লিখিত আছে "সেই সকল কোথাও পরিবর্ত্তিত, কোথাও বিকৃত হইয়া, কোথাও বা উচ্চতর আদর্শে নীত হইয়া, বঙ্গীয় সহজিয়া ও বাউলদের মধ্যে এখনও প্রচারিত হইতেছে।"—ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের কল্যাণে আমরা এ সব কথা জানিতে পারিয়াছি।

কিন্তু আমরা সমাজতত্ত্ব আলোচনা করিতে বসি নাই। শুধু পাশের একটি চিত্র হিসাবে ইহা দেখিয়া যাইতেছি।

বাদশার নিগ্রহ এবং অনুগ্রহ দুইই পায় বাঙলার বৈষ্ণব সমাজ। খুন্তি—যাহা কীর্ত্তনের আগে আগে যাইত—তাহা বাদশার পাঞ্জার আকৃতি মাত্র। যেন কীর্ত্তনে যোগদানকারীদের দেখান হইত ফরমান্ আছে। ইহা যেন পাঞ্জাযুক্ত আদেশপত্র। ইহা দেখাইয়া বলা হইত যে, তোমরা কীর্ত্তনে নির্ভয়ে যোগ দাও। দুইটি অর্দ্ধচন্দ্র পাশাপাশি দিয়া একরকম খুন্তি বাহির হয়। খুন্তিরও আবার রকমফের হইয়াছে। শাখা অনুসারে রকমফের। যেমন তিলকে রকম ফের হইয়াছে। লতা গোস্বামীদের (মালদহ) নূপুরাঙ্কিত, নিতাইগৌর শাখার (নবদ্বীপ, খড়দহে) চম্পককলি এবং অদ্বৈত শাখার (শান্তিপুরে) বটপত্র আকারের তিলক লওয়া হইতেছে। এখন খুন্তিকে চক্র—বিষ্ণুর চক্র করিবার চেষ্টা হইতেছে। ইতিহাস এইরূপে বদলায় ব্যবহারিক জগতে। শেষে তার আসল রূপ কি ছিল বাহির করা অসম্ভব হয়। যেমন পূর্ণিমাতে সত্যপীরের সিন্নি সত্যনারায়ণের সিন্নিতে পরিণত হইয়াছে।

মুসলমানের সংখ্যা এত বাড়িলেও বাঙলার এখনকার চিত্র-শিল্পে রাজপুত প্রভাবই বেশী আছে। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন বলেন মগধের প্রধান চিত্রশালা এই বাঙলা দেশ। তাঁহার লেখাটি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"শুধু মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা নহে—প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানবের চিত্রাঙ্কন প্রচেষ্টা, যাহা সিঙ্গানপুরে প্রভৃতি স্থানে পাওয়া যাইতেছে, তাহার সঙ্গেও বাঙ্গালার কুটির-শিল্পের আশ্চর্য্য ঐক্য দৃষ্ট হয়। পাহাড়পুরে দেশীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য-শিল্পের যে সকল নিদর্শন আছে,—তাহাতে মনে হয় বাঙ্গালার কলালক্ষ্মী যেন অতল জলধিতল হইতে তাঁহার প্রথম নিষ্ক্রামণের পদচিহ্ন সেখানে রাখিয়া গিয়াছেন। অজন্তার চিত্রগুলি যে বাঙ্গালী চিত্রকরের করস্পর্শে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, তাহার কতকগুলি প্রমাণ গ্রন্থভাগে (৪১৬-৫২ পৃঃ) প্রদত্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ ভারতীয় জগৎ প্রসিদ্ধ শিল্প-কেন্দ্রগুলির আদর্শ এখন পর্য্যন্ত বাঙ্গলায় রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। বঙ্গ-পল্লীতে আর্য্যসভ্যতার শেষ রেণু-কণা আমরা যে পরিমাণে কুড়াইয়া পাইয়াছি, আর্য্যাবর্ত্তের অন্যত্র তাহা সুলভ নহে। এ দেশের কুটির-শিল্পে আমরা মহেঞ্জোদারো, অজন্তা, অমরাবতী প্রভৃতি শিল্পকেন্দ্রের তীর্থরেণু প্রচুররূপে পাইতেছি। পাষাণের গায়ে, কাঠে, বস্ত্রে, তূলট কাগজে, তিরুট ও তালপত্রের পুঁথির মলাটে, উপাধানের আচ্ছাদনে, কাঁথা-শিকা-আল্‌পনা-মেঠাই-দেয়ালচিত্রে, ঘটিতে, বাটিতে, পালঙ্কে, পানের ডিবেতে, দেব বিগ্রহে, কাঠের রথে, সিংহাসনে, মন্দিরের পোড়া ইটে, মাদুর ও পাটীতে, হস্তিদন্তের ও ধাতব তৈজসপত্রে, এমন কি বিছানা বাঁধিবার দড়ি, পুঁতির লাঠি, নারিকেলের মালায় রচিত নরমুণ্ড, অস্ত্রের বাঁট, খলে, আসন প্রভৃতি শত শত নিত্য-ব্যবহৃত দ্রব্যাদিতে চারুকলার যে সকল নিদর্শন পাইতেছি, তারা সুচিরাগত বৌদ্ধ শিল্পের ধারাটি উজ্জ্বল করিয়া দেখাইতেছে। গত একশত বৎসরের মধ্যে এই স্রোত মন্দীভূত হইয়া বিলুপ্ত হইবার আশঙ্কা জন্মাইতেছে।

বাঙ্গালার শিল্প কৃতিত্ব সম্বন্ধে আমরা পাঠকের দৃষ্টি এই পুস্তকের ২৩৫-৪৮, ৪০৬-৫২ পৃষ্ঠার প্রতি আকৃষ্ট করিতেছি, নানা কারণে আমরা অনুমান করিয়াছি, বাঙ্গলা দেশই মগধের প্রধান চিত্রশালা ছিল।"—ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন "বৃহৎ বঙ্গ" (১ম ভাগ, ভূমিকা), পৃষ্ঠা ৮/০

বাঙলায় এই যে ওরিয়েণ্টাল আর্টের রিনেস্‌ দেখা দিয়াছে—এই প্রাচ্য চিত্রকলার পুনরুজ্জীবনের সময় চীন জাপানের চিত্রধারাও গোপনে গোপনে বেশ মিশিয়া গিয়াছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা চলে, হিন্দুদিগের চারিটি স্থাপত্য-যুগের বিবরণ পাওয়া যায়। কোণারক মন্দির বাঙালী শিল্পের পরিপূর্ণ বিকাশের স্মরণ চিহ্ন। হণ্টার সাহেব ইহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন—"It concentrates in itself the accumulated beauties of the four architectural centuries of the Hindus......it forms the climax of Bengal art and wrung an unwilling tribute even from the Mohumedens"—Hunter's Orissa, p. 29.

ফর্গুসন সাহেব তাঁহার স্থাপত্যের ইতিহাসে লিখিয়াছেন হিন্দু স্থাপত্য সম্পূর্ণ একটি মৌলিক বস্তু (purely indigenous). কিন্তু আমরা স্থাপত্য আলোচনা করিব না। জয়নগর, মজিলপুর এবং উত্তর বঙ্গে যে সমস্ত বিষ্ণু ও শক্তি মূর্ত্তি বাহির হইয়াছে তাহা বাঙলার ভাস্কর্য্যের গৌরব।

হিন্দু চিত্রকলার রিনেস্‌ যুগ খ্রীঃ ত্রয়োদশ শতক হইতেই আরম্ভ হয়। অনেকের মতে ইহা নব জাগরণ নয়। ইহা একটি নূতন ধারা। একটি নূতন বেণী। আমরা ক্রমে সেই কল্পধারার ত্রিবেণীর সন্ধান পাইতেছি। একটি ইরাণী, একটি হিন্দু, একটি চৈন। এই মুক্তবেণী মিশিয়াছে যুক্তবেণী হইয়া ভারতের ত্রিবেণী সঙ্গমে।

আমরা কিন্তু খুঁজিতে বাহির হইয়াছি একটি মাত্র উৎস—বৈষ্ণব চিত্রের উৎস। আর সেই উৎসের বিহার ক্ষেত্রের—তাহার পটভূমিকার দৃশ্যও দেখিতে চাহিয়াছি। কিন্তু ত্রিবেণীর টানে কোথায় গিয়া পড়িলাম? এটা যে ত্রিবেণীর টান, আগে তাহা বুঝিতে পারি নাই! উৎসমুখে যাইতে উজাইতে হইবে অনেক দূর।

একটা কথা বলিয়া যাওয়া ভাল মনে করিতেছি। পটভূমিকায় কি অপূর্ব্বত্ব আছে যে তাহা দেখিবার জন্য আমরা এত ব্যাকুলতা দেখাইতেছি? ইহা হয়তো অনেকেই ভাবিতেছেন। আমরা ব্যাকুলতা দেখাইতেছি কেন জানেন? এই সব বৈষ্ণব চিত্র দেখিলে মনে হইবে, ইহা যেন এক একটি আনন্দোৎসবের মূর্ত্ত ছবি। বৈষ্ণবের ভক্তিশ্রদ্ধা প্রীতির স্রক চন্দন যেন প্রত্যেকটিতে মাখানো। ইহার পশ্চাতে নিশ্চয়ই কোনো সুষমার আকর আছে। অথবা ইহা কি পঙ্কজ? পঙ্ক হইতে শতদল জন্মায়। কিন্তু সকল দেবতারই পাদপীঠ এই শতদল। পঙ্ক হইতে জন্ম হইলেও শতদল শোভা পরম রমণীয়। বৈষ্ণব চিত্রকরগণ যে ভাবধারা নিয়া যাহা আঁকিয়াছেন তাহার পশ্চাতে যে প্রেরণা আছে, তাহাও জানা একান্ত আবশ্যক। নতুবা চিত্রবস্তুর সবটুকু রস উপলব্ধি করা যাইবে না। চিত্রবস্তুর মানে করা যাইবে না। চিত্রকরকে চেনাও যাইবে না।

একটা প্রসঙ্গ ভাল করিয়া বলা হয় নাই, তাহা সারিয়া যাই। বিশেষজ্ঞগণ এ বিষয়ে একমত যে ত্রয়োদশ শতকে হিন্দু চিত্রকলা মুসলমান চিত্রকলা দ্বারা প্রভাবিত। ইহা কি রাজপ্রীতি বা রাজভীতি? ইরাণী-ভাব হিন্দু চিত্রকরদের মুগ্ধ করিল কেন? গুলাব ও কবিগণের বিনোদোদ্যান রূপ সৌন্দর্য্যের আধার ইরাণের চিত্রকলার মধ্যে নিবার মতো লোভনীয় কিছুই কি ছিল না? রস অপর রসকে আকর্ষণ করে, রূপ চায় রূপকে। এখানে তাঁরা বুঝি সমধর্ম্মী হইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু কি কারণে এই মিশ্রণ হয় এসব কথা ভাল করিয়া কেহ বলেন নাই। ভগিনী নিবেদিতার মন্তব্য নিরপেক্ষ বলিয়া মনে হয়। সভ্যতার ক্রম-বিকাশের ধারা আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন—

"এশিয়া ভূখণ্ডে বিরাট এক সভ্যতার উদ্ভব হয়। যে ভূখণ্ডের প্রান্তসীমা মিশর, আরব, গ্রীস, ভারত ও চীন—সেই দেশই এই সভ্যতার কেন্দ্রভূমি। তন্মধ্যে মিশর ও আরব সভ্যতা ধ্বংস হইয়াছে। গ্রীস ও প্রধানতঃ ভারত এই সভ্যতার আকরভূমি হইয়া রহিয়াছে। এই ভারতেই—জগতের আর কোথাও নয়—সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারা আমরা অনুসন্ধান করিতে পারি। * * * দৃঢ় মেরুদণ্ড বিশিষ্ট জাতির ন্যায় ভারতবাসী অন্য দেশের নূতন আদর্শকে পরীক্ষা করিয়াছে। * * * সাধ্যমত অন্যকে দূরে রাখিয়া—গ্রহণ করিয়াছে ধীরে ধীরে। কত সব শক্তিশালী জাতি ব্রাহ্মণ্য সভ্যতার (চাকায়) একটা ফাঁকে জড়াইয়া গিয়া কেমন যেন স্থিরভাবে নিজেকে মিশাইয়া দিয়াছে (* * * settle down in the interstices of the Brahmanical civilization * * *) কিন্তু (ভারতে) মুসলমান আগমনের পর এই আদান-প্রদানের ইচ্ছা-অনিচ্ছা রুদ্ধ হইল—ভারতকে মুসলমান ধর্ম্ম ও ভাবধারা নিতেই হইল"।—

Myths of the Hindus & Buddhists—Sister Nivedita and Ananda Coomarswami, pp 1-2. যাহা সত্য তাহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতেই হইবে। গৌরবের হইলেও তাহা আছে, অগৌরবের হইলেও তাহা আছে। হিন্দুর জাতিধর্ম্মের ন্যায়, তার স্থাপত্য ও চিত্রকলায় মুসলমান সংসর্গ প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে। কিন্তু বাঙলার 'চিত্রপট' মুসলমান ধারা বহন করে না। এই সমস্ত চিত্রপট বাখারির ফ্রেমে ন্যাকড়ার উপর মাটী লেপিয়া জমি করা হইত। ক্রমে ইহা হইতে ছাপা পটচিত্র প্রবর্ত্তিত হয়।

ইহারই টানে টানে আর একটা প্রসঙ্গ আসে—মুঘল সভ্যতার প্রসঙ্গ। ভারতের বুক জুড়িয়া আছে তার কীর্ত্তিকাহিনী। তা বুক জুড়ানো যত হোক আর না-ই হোক। আমরা এখানে খুব সংক্ষেপে তার উপর দিয়া চোখ বুলাইয়া যাইব। ভারতের রাষ্ট্রপটের দিক্‌দর্শন করিতে তাহা খুব দরকার।

এই মুঘল সভ্যতার অভ্যুদয় হয় ইরাণী ও হিন্দু সভ্যতার মিলনে। খোদ জাহাঙ্গীরের রাজপ্রাসাদ এই হিন্দু স্থাপত্য ও ইরাণী স্থাপত্যের সমন্বয়। স্থাপত্যের যেমন একটি নিদর্শন দিলাম চিত্রেরও তেমনি একটি দিতেছি। তাহা বৃন্দাবনবাসী হরিদাসের ছবি। তানসেনের গুরু হরিদাসকে দেখিতে আকবর বৃন্দাবনে যান। তার আগে বৃন্দাবন সমভূম হয়—মামুদ গজনী ও মহম্মদ তোগলকের কৃপায়। আকবরের সময় বৃন্দাবন ফের কিছুটা গুছাইয়া উঠিয়াছিল। আকবর বৃন্দাবনে হরিদাসকে দেখেন। তার যে চিত্র আছে সেই চিত্রের কথাই বলিতেছি। আগরার যাদুঘরে এই চিত্রখানি আছে। চিত্রখানিতে ইরাণী ও হিন্দু চিত্রধারার সমাবেশ দেখা যায়। ইহা খ্রীঃ ষোড়শ শতকের শেষের দিকের ভারতীয় চিত্রকলার একটি নিদর্শন।

মোগলদের সময় হিন্দু মুসলমান মিলন ভালভাবেই হইতে থাকে। বহু যৌন সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তানসেন আকবরের জামাতা হন। মহাপ্রভুর সময় হুসেন সাহ বাঙলায় একটা মিলনের চেষ্টা করেন। তিনি আবার বাছিয়া বাছিয়া জামাতা করিতেন ব্রাহ্মণদের ছেলে নিয়া। কিন্তু যেখানেই এই যৌন সম্পর্ক হইয়াছে সেখানেই হিন্দু জাতি হারাইয়াছে। রামমোহন শৈব হিঁদুয়ানী মতে যবনী বিবাহ করিলেন। পাঁতিও দিলেন। তাঁর পৈতারও জাতি গেল না। কিন্তু তাঁরই সমাজে তাঁর বিধান টিকিল না। হিন্দু সমাজে তো নয়ই। তা' যতই তাহা শস্ত্র-শাসন হোক না। রামমোহনের এই জাত-বাঁচানোর রহস্যটা কি?—থাক সে কথা। আমাদের আলোচনার অনেক বাহিরে সে কথা। পর্ব্বত লঙ্ঘন করিতে হয় সেখানে যাইতে।

মোগলদের কোনো ভাস্কর্য্য নাই। এখানে ভাস্কর্য্য মানে প্রধানভাবে দেবমূর্ত্তি বলিতেছি। মুসলমানরা কখনো মূর্ত্তি পূজক ছিলেন না বা ন'ন। ইহাই তার কারণ। ভারতীয় ভাস্কর্য্য মুসলমান ভাবধারা বর্জ্জিত।

রাজপুতগণ রাজ্যচ্যুত হইয়া পঞ্চনদ ও হিমাচলের পশ্চিমে ছড়াইয়া পড়ে। একদিকে যোধপুর, উদয়পুর, উজ্জয়িনী ও মথুরা। অন্যদিকে বিকানীর হইতে গুর্জ্জর। ত্রয়োদশ শতকে এই সব স্থানে যে চিত্রকলা ফুটিয়া ওঠে তাকেই রাজপুত চিত্রকলা বলিতেছি। এই চিত্রকলার উপজীব্য বৈষ্ণবভাব।

তখন কোন্ সাহিত্য এই চিত্রবিদদের ভাব যোগায় তাহা দেখিবার বিষয়।

ত্রয়োদশ শতকে রামানুজ। মাধবাচার্য্য এবং জয়দেবও তখন আসরে নামিয়াছেন। চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশে রামানন্দ ও কবীরকে দেখিতে পাই। বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস, তুলসীদাসও সেখানে গাহিতেছেন। তারপর আসিলেন মহাভাবময় শ্রীচৈতন্যপ্রভু। দক্ষিণ ভারতে তখন জ্ঞানেশ্বর, নামদেব ও তুকারাম বীণাহস্তে বিচরণ করিতেছেন। সমাজ ও সাহিত্যে এই যে আনন্দ কল্লোল উঠিয়াছিল চিত্রকরের তুলিতে তাহাই রূপ নিয়াছিল। কবির ভাষায় তখন যে ছন্দ ওঠে, ভক্তের মনে যে ধ্যান-বিগ্রহ গঠিত হয়, চিত্রে তাহাই ধরা পড়ে।

প্রকৃতির সহজ শোভা এই চিত্রগুলির বিশেষত্ব। চিত্রকরগণ পাথরের দেশে যে আড়ম্বরহীন সৌন্দর্য্যের মধ্যে বাস করিতেন চিত্র-গুলিতে তাহাই আছে। সাধারণ গ্রাম, রাখাল, গোপবধূ তাহাদের মানবীয় ভাব দিয়া চিত্রিত হইয়াছে। ভাগবদ গীতার ধর্ম্ম ও মর্ম্ম এগুলিতে প্রকট হইয়াছে। রামায়ণ মহাভারতের চিত্রও সেখানে আছে। শিব-পার্ব্বতীর অনুপম চিত্র আছে। বহু উপকথার, জন্তুর, ঋতুর এবং রমণীয় দৃশ্যের ছবিও আছে। রাগ রাগিণীর ছবি রাজপুতরাই প্রথম আঁকেন। ভীষ্মের শরশয্যা, কাঙড়া চিত্রের গোধূলি প্রভৃতি উচ্চ শিল্পকলার নিদর্শন।

হাভেল সাহেবের চিত্রপরিচিতি হইতে এ সব সম্বন্ধে বহু কথাই আমরা জানিতে পারি।

কিন্তু এ সব চিত্রসম্ভার কতকটা নষ্ট হইয়া গিয়াছে রাজপুতদের গৃহ-বিবাদ কালে। বাকী যাহা কিছু কাঙড়ায় ছিল, চিত্র ও চিত্রকর সমেত ১৯০৫ সালের ভূকম্পনে তাহা নিশ্চিহ্নপ্রায় হইয়াছে। রাজপুত চিত্রমধ্যে কাঙড়া চিত্রের সমধিক গৌরব ছিল।

কাঙড়া বা নগরকোট হিমাচলের পাদদেশে একটি উপত্যকা। অপার্থিব সৌন্দর্য্যের আধার এই উপত্যকার মধ্যে বসিয়া রাজপুত চিত্রকরগণ তাঁহাদের তুলিকা সম্পাতে কলা মাধুর্য্যের যে সৃজনী প্রতিভা প্রকাশ করেন, কালের হস্ত তাহা প্রায় সবই ধ্বংস করিয়া দিয়াছে।

"বৃটিশ রাজত্বের প্রারম্ভ হইতেই চিত্রকলার অবনতি হইয়াছে"—এরূপ খেদ প্রকাশ করা হয়—(রাজপুত চিত্রকলা—শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়, নারায়ণ, ফাল্গুন, ১৩২৫)। কেন ও কিরূপে এই অবনতি হইয়াছে তাহা আমরা দেখিলাম। শুচিতা ও মৌলিকতা গেলে সব কিছুরই অপমৃত্যু হয়। বৈষ্ণব চিত্র ক্রম বিকাশের দীর্ঘ পথে হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া এখন অগৌরবের বোঝা মাথায় চাপাইয়া নত হইয়া পড়িয়াছে। তাহা যেন ফরাসী রামায়ণ চিত্রে পরিণত হইতেছে। সীতাদেবী ফল্গুধারাকে অভিসম্পাত করিয়া-ছিলেন—তুমি অন্তঃসলিলা হও। বৈষ্ণব চিত্রধারার ফল্গু উৎসকে আমাদেরও বলিতে ইচ্ছা হইতেছে—অন্তঃসলিলা হও!...তোমার এ গ্লানি সহ্য হয় না। অবসাদ, অসুস্থতা চিরদিন থাকিবে না। সমাজে ও অন্তরে বৈষ্ণব ভাব-বিশুদ্ধতার অভাব হইয়া থাকিবে। তাই চিত্রে এই মালিন্যের রেখা ফুটিয়া উঠিতেছে।

কবে সেই ভাব-বিশুদ্ধতা আবার ফিরিয়া আসিবে? কিন্তু এই ভাব-বিশুদ্ধতা বলিতে আমরা কি বুঝি তাহাও বলা প্রয়োজন। তাহা না বলিলে আমাদের বক্তব্য অসম্পূর্ণ থাকে। কোন্ ভাবধারা প্রকৃষ্ট?

একটু আগে হইতে বলি—

রাধাকৃষ্ণের প্রচার প্রাচীন হিন্দুজগতে ছিল না। পুরীর মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের বহু লীলা উৎসব হয়। সেখানে এ'খনও রাধাকৃষ্ণ নাই। আছেন কৃষ্ণ ও লক্ষ্মী। এখনও অনেক পুরাতন হিন্দু পরিবারে ও হিন্দু মন্দিরে আছেন লক্ষ্মী ও গোবিন্দ।

জয়দেবের অতুলনীয় গীতগোবিন্দ গানে রাধাকৃষ্ণের প্রথম প্রচার হয়। পুরাণে যাহাই থাক্, প্রচার হয় জয়দেব দ্বারা। আবার সেই রাধা-গোবিন্দের ভাবধারা ও লীলাধারা বহুল প্রচার হয় শ্রীচৈতন্যদেবের অনুপম ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়।

সুতরাং শ্রীচৈতন্যদেব যে ভাবে রাধাকৃষ্ণকে অনুভব করেন সেই ভাবই প্রকৃষ্ট ও পরিশুদ্ধ ভাব। রামানন্দ রায়ের মুখে শ্রীরাধার তত্ত্ব ও লীলা শ্রবণ কালে—

> "পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল
> অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল।
> না সো রমণ না হাম রমণী
> দুঁহু মন মনোভব পেষল জানি।"—

রাধাকৃষ্ণের যে ভাবচিত্র পরিস্ফুট হইয়াছে তাহাই বিশুদ্ধ ভাব। শ্রীচৈতন্যদেবের একান্ত প্রিয় রাধাকৃষ্ণের এই চিত্রে কোনো মনঃক্ষোভকর ধৃষ্ট চাঞ্চল্য নাই—কোনো ভাববিকার নাই।

ইহাতে আছে পূর্ণ আবেগ অথচ গভীর ধৈর্য্য। ইহাতে আছে প্রাণভরা বিশুদ্ধ অনাবিল প্রেম। যাহা পরস্পরের সম্পূর্ণ ঐক্যেই পর্য্যবসিত হয়—সার্থক হয়—পূর্ণ হয়। এই কারণে শ্রীমদ্ভাগবতে শুকদেব রাসলীলা অবসানে বলিয়াছেন—"যথার্ভকঃ স্ব প্রতিবিম্ব বিভ্রমঃ"। বালক যেমন নিজের প্রতিবিম্বের সঙ্গে—অভিন্নজ্ঞানে মনের আনন্দে খেলা করে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণও তেমনি গোপীগণের সঙ্গে অপরূপ রাসলীলা করিয়া-ছিলেন। বস্তু যে এক—একেতেই সব পর্য্যবসিত হইবে। সুগভীর ভাবস্রোতে পৃথক সত্ত্বা লোপ হইয়া যায়।

একজন সাধক সন্ন্যাসী বৈদান্তিক দৃষ্টি দিয়া এই মধুর ভাবটি সুন্দর-ভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"পাশ্চাত্য-শিক্ষাপ্রাপ্ত বর্ত্তমান যুগের নব্যসম্প্রদায়ের চক্ষে মধুর ভাব, পুংশরীর-ধারীদিগের পক্ষে অস্বাভাবিক ও বিসদৃশ বলিয়া প্রতীত হইলেও বেদান্তবাদীর নিকটে উহার সমুচিত মূল্য নির্দ্ধারণে বিলম্ব হয় না। তিনি দেখেন, ভাবসমূহই বহুকালাভ্যাসে মানব মনে দৃঢ় সংস্কাররূপে পরিণত হয় এবং জন্মজন্মাগত ঐরূপ সংস্কার সকলের জন্যই, মানব এক অদ্বয় বস্তুর স্থলে এই বিচিত্র জগৎ দেখিতে পাইয়া থাকে। * * * শ্রীভগবানে পতিভাবারোপ করিয়া 'আমি স্ত্রী' বলিয়া ভাবিতে ভাবিতে সাধক পুরুষ আপনার পুংত্ব ভুলিতে সক্ষম হইবার পরে, 'আমি স্ত্রী' এ ভাবকেও অতি সহজে নিক্ষেপ করিয়া ভাবাতীত অবস্থায় উপনীত হইতে পারিবেন, ইহা বলা বাহুল্য। * * * প্রশ্ন হইতে পারে, তবে কি রাধাভাব প্রাপ্ত হওয়াই সাধকের চরম লক্ষ্য? উত্তরে বলিতে হয়, বৈষ্ণব গোস্বামিগণ বর্ত্তমানে ইহা অস্বীকার পূর্ব্বক সখীভাবপ্রাপ্তিই সাধ্য এবং মহাভাবময়ী শ্রীরাধিকার ভাব লাভ সাধকের পক্ষে অসাধ্য বলিয়া প্রচার করিলেও, উহাই সাধকের চরম লক্ষ্য বলিয়া অনুমিত হয়। কারণ দেখা যায়, সখীদিগের ও শ্রীমতী ভাবের মধ্যে একটা গুণগত পার্থক্য বিদ্যমান নাই, কেবলমাত্র পরিমাণগত পার্থক্যই বর্ত্তমান। দেখা যায়, শ্রীমতীর ন্যায় সখীগণও সচ্চিদানন্দঘন শ্রীকৃষ্ণকে পতিভাবে ভজনা করিতেন এবং শ্রীরাধার সহিত সম্মিলনে শ্রীকৃষ্ণের অধিক আনন্দ দেখিয়া, তাঁহাকে সুখী করিবার জন্যই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন সম্পাদনে সর্ব্বদা

বস্থবতী। আবার দেখা যায়, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীব প্রভৃতি গোস্বামিপাদগণের প্রত্যেকে মধুরভাব পরিপুষ্টির জন্ত পৃথক পৃথক শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের সেবায় শ্রীবৃন্দাবনে জীবন অতিবাহিত করিলেও তৎসঙ্গে শ্রীরাধিকা মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেবা করিবার প্রয়াস পান নাই—আপনাদিগকে রাধাস্থানীয় ভাবিতেন বলিয়াই যে, তাঁহারা ঐরূপ করেন নাই, এ কথাই উহাতে অনুমিত হয়।"—(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ, স্বামী সারদানন্দ, পৃঃ ২৫২-২৫৪)।

বস্তু যে এক—একেতেই সব পর্য্যবসিত হইবে। সুগভীর ভাবস্রোতে পৃথকসত্ত্বা লোপ পাইয়া যায়—সকলেই ভগবানের সঙ্গে মিলিত হয়।

শ্রীচৈতন্যদেব এই মহাভাবে বিভোর হইয়া থাকিতেন। আপন দেহকেও তিনি রাধাতনু বলিয়া মনে করিতেন।

এই ভাবধারাই বৈষ্ণবের প্রাণবস্তু। বৈষ্ণবের অন্তরে ও সমাজে এই ভাববিশুদ্ধতা আবার আসুক। যতদিন তাহা না আসিবে ততদিন বৈষ্ণব-চিত্তে এই কলঙ্ক রেখা কিছুতেই কাটিবে না।

লীলাসঙ্গিনী

শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য

একটি ছোট দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা। যাত্রী মাত্র দুইজন অথবা একজনও বলা চলে—স্বামী-স্ত্রী। দুইটি ষ্টেশনের মধ্যবর্ত্তী পথটুকু বেশ নিশ্চিন্তভাবে অন্তরঙ্গতার সহিত কথাবার্ত্তা চলিতে থাকে, যেই কোন যায়গায় গাড়ী দাঁড়ায় কমল দরজার কাছে গিয়া হয়ত একটু দাঁড়ায়, নতুবা একটা সিগারেট ধরাইয়া প্লাটফর্মের উপরে পায়চারি করিয়া বেড়ায়।…এমনি করিয়াই এতক্ষণ কাটিতেছিল। মাঝে মাঝে হাল্কা রসিকতা, কখনও বা সাংসারিক সুখ শান্তি সম্ভাবনার কথা, আবার হয় ত কখনও তরুণ দম্পতীর আবেগ-চঞ্চল অন্তরের সহজ স্বাভাবিক অভিব্যক্তি ভাষায় ভাবে ফুটিয়া উঠিতেছে থাকিয়া থাকিয়া।

একসময়ে অনুকণা বলে, আচ্ছা, তোমাদের পুরুষ জাতটা অমন বেহায়া কেন বল তো। লোকগুলো কেবল আমায় দেখচে। ভারি বিশ্রী লাগে।

কমল হাসিয়া জবাব দেয়, দোষ ত ওদের নয়, ভগবানের—যিনি তোমায় গড়েছেন। আমার বিশ্বাস তোমার যদি উপায় থাকত তবে হয়ত তুমিও দিনরাত তোমাকে দেখ্‌তে। মধুকরের দোষ কি বলো…। তা ছাড়া, মেয়ে জাতকেই বা সভ্য বলি কি করে, ওরা যে তোমায় দেখ্‌চে সেটা কে তোমায় বল্‌লে? তুমিও ওদের দিকে চেয়ে আছো কিনা তার প্রমাণ পাচ্ছি না ত!

অনুকণা কৃত্রিম কোপের অবতারণা করিয়া অন্যদিকে মুখ ঘুরাইয়া লয়, তখন কমল তাহার গা ঘেঁষিয়া বসিয়া বলে, জানো কণা, তুমি রাগ করলে আমার হাসি পায়। শুধু হাসি নয়, খুব আনন্দ হয়। আমি অনেক সময় কামনা করি, তোমার রাগরক্তিম অধর…

অনুকণা আর গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিতে পারে না—হাসিয়া ফেলিয়া বলে—যাও তুমি বড্ড ইয়ে।

বিবাহের পর তাহারা এই প্রথম মুক্তির আস্বাদ লইতে বাহির হইয়াছে। অনুকণার শরীর তেমন ভালো নাই, তা ছাড়া কমলেরও মনে মনে কিছুদিন নিরবচ্ছিন্নভাবে বাহিরে কাটাইবার বাসনা রহিয়াছে। সংসারে তাহাদের এমন কেহ নাই যাহাকে লজ্জা করিয়া চলা দরকার, অথবা যাহাকে মানিয়া চলিতে হয়। কমলের সংসার তাহার অনুকণাকে লইয়া, আর যাহারা আছে তাহারা নিতান্ত আশ্রিত-পর্য্যায়ভুক্ত। কাজেই ভাবিবার কিছু নাই।

কমল ভাবিয়াছিল পশ্চিমের কোনো শহরে গিয়া থাকা যাইবে, কিন্তু অনুকণার অত্যন্ত ইচ্ছা কিছুদিন গ্রামে গিয়া বাস করিবার। ছেলেবেলা হইতে শহরে শহরেই তাহার দিনগুলি কাটিয়াছে, এক আধবার তাহার পল্লীগ্রামে যাইবার সৌভাগ্য ঘটিয়াছে কিন্তু তাহাতেই অনুকণার মন পল্লীগ্রামের প্রতি অনুরক্ত হইয়াছে বলিলে অন্যায় হইবেনা। কথায় কথায় সে বলে, বাবাঃ আর পারিনে—শহরের মধ্যে দম বন্ধ হয়ে হাঁপিয়ে উঠেচি—আর পারিনে।

প্রথম প্রথম কমল পল্লীগ্রামের অসুবিধার বিস্তারিত বিবরণ দাখিল করিয়া দেখিয়াছে কিন্তু কোনোই ফলোদয় হয় না। রুচি-স্মিতা আধুনিকা অনুকণার এই অভিনব অভিলাষ কমলকে রীতিমত ভাবাইয়া তুলিয়াছিল, কারণ তাহার বিশ্বাস যে অনুকণা যেখানেই যাক শহরের ষোল আনা সুবিধা না থাকিলে কিছুতেই থাকিতে পারিবে না। শুধু শুধু হয়রাণী কপালে লেখা আছে—অনেক ভাবিয়াও কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বন্ধু হরিপদকে লিখিয়া তাহাদেরই বাড়ীর কাছে এক আশ্রয় ঠিক করিয়া একদিন সে সত্যসত্যই রওয়ানা দিল।

* * * *

পথটা ভালোই লাগিতেছে। দুপাশে দিগন্তপ্রসারী প্রশান্ত শ্যামশোভা, ঘন সবুজের বিপুল বিচিত্র বৈভবের মেলা বসিয়াছে—দিগ্বলয়ে আকাশ আর মৃত্তিকার মিলন রেখায় পৌঁছিবার পথে মানুষের দৃষ্টি যেন পথহারা বিভ্রান্ত হইয়া যায় এমনই মায়াময় ইহার রূপ! মাঝে মাঝে এক ঝাঁক পাখী ওপাশ হইতে এপাশে উড়িয়া যাইতেছে, আবার কখনও বা আর একদল ওপাশের অন্তরাল হইতে এইদিকে ভাসিয়া আসিতেছে। কোথাও বা লতাগুল্ম বেষ্টিত তরুশাখা হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে রেল লাইনেরই পাশে দাঁড়াইয়া, অথবা রেলগাড়ীর দিকে বিস্ময়াবিষ্টের মতই নির্ব্বাক, নিস্পন্দ হইয়া চাহিয়া আছে!…অনুকণা কিছুই বুঝিতে পারে না এসবের। সে ওই বাহিরের আকাশের দিকে তাকাইয়া দেখিতেছে কখনও, কখনও বা অন্য কিছু—ইতস্ততঃ তাহার চঞ্চল দৃষ্টি ঘুরিয়া ফিরিতেছে।

কমলের মনেও যেন আনন্দের জোয়ার আসিয়াছে। একদিকে তাহার পাশে অনুকণা। আর ওই বাহিরের অপূর্ব্ব সুন্দর বনশোভা। নিত্যকার 'সংসারের মধ্যে গৃহকর্ত্রী' অনুকণা আজ যেন কোথায় হারাইয়া গিয়াছে, তাহার পরিবর্ত্তে দিশাহারা, স্বপ্নালসদৃষ্টি মেলিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে কোন বনহরিণী। সে পথ জানে না, আকুল আকুতিভরা অন্তরে কমলের সহায়তা প্রার্থনা করিতেছে—কথাটা ভাবিতে কমলের বেশ ভালো লাগে। আর অনুকণা পদে পদে আপনার অজ্ঞতার নবনব পরিচয় দিয়াই যেন আনন্দ পাইতেছে। কেমন একটা নূতন অচেনা আবেষ্টনীর মধ্যে তাহার বিস্ময়ের অবধি নাই। এখানে সবই অজানা অচেনা—কিন্তু এমন একজন তাহার পাশে আছে যে এই এতগুলি অজানা অচেনাকে ভালো করিয়াই জানে! অনুকণা আপনার বিস্ময়ের মধ্যেই ডুবিয়া আছে।

একটা ষ্টেশন ছাড়িয়া গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, কমল দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া বসিতেই অনুকণা বলিল, বারবার অত ওঠানামা ক'র না।

—আচ্ছা, যো হুকুম! কিন্তু ভাবো দেখি, ষ্টেশনে যদি গো-গাড়ী না থাকে।

—না থাকে, নাই থাক্‌বে, আমরা পায়দলে চ'লে যাবো। তোমার সঙ্গে লেকে চার পাঁচ পাক ঘুরতে পারি আর এটা পারবো না? তবে মালগুলোর জন্যেই যা ভাবনা। সুটকেশ দুটো না হয় দুজনে নেওয়া যাবে। আর একটা লোক দিয়ে বিছানা আর ট্রাঙ্কটা—।

—ব্যস্‌, ব্যস্‌। তা দু'মাইল পথ, আমি কিন্তু চার আনার এক পাই কমে যাবো না।

—এত সস্তা। মাত্র চার আনা? আচ্ছা, তবে তোমায় যদি মাস মাইনে ক'রে রাখা যায়, তা হলে তুমি কত মাইনে চাও! দশ টাকা—বারো টাকা, কত? শীগগির বলো।

—উঁহু অত কমে লারলাম—এই দু'গণ্ডা টাকা দেবা?

অনুকণা এবং কমল দু'জনেই একচোট হাসিয়া লয়। হঠাৎ হাসি থামাইয়া অনুকণা বলে, আচ্ছা ওগুলো হলদে হলদে কি ফুল গো!

—ও-ইগুলো? চেনো না বুঝি—আমাকে দু'বেলা যা হামেশাই দেখাও তুমি সেই সর্ষে ফুল।

অনুকণা মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতে থাকে—কি সুন্দর! হলুদ রঙের কি বাহার গো।

অনুকণা স্তব্ধ হইয়া যায়, কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকে তারপর বলে—আচ্ছা, আমাদের এইখানে যদি ছোট্ট একটা বাড়ী হ'ত?

—আমায় আর একটু শীর্ণ হ'য়ে মাথায় চুল রাখতে হ'ত।

—কেন, ম্যলেরিয়া বুঝি!

—না. ম্যলেরিয়ার জন্যে মানসিক ক'রে চুল রাখতাম।

—তোমার হেঁয়ালী ছাড়ো বাপু।

—এর নাম কাব্যি রোগ। এখানে বাস ক'রতে পারে কবিরা, যাদের দশটা পাঁচটা আপিস নেই, হাটবাজারের ভাবনা নেই তারা। শুধু ছিলিম কয়েক কাব্য সুধা সিঞ্চনে যাদের দিন কাটে তারা পারে ওখানে থাকতে।

কিন্তু মুখে যতই কমল অনুকণাকে ঠাট্টা করুক তাহার এই হরিদ্রাবর্ণের দীর্ঘ কোমল চিক্কণ মসৃণ সরিষার ক্ষেতগুলি বড় ভালো লাগিয়াছে। সে বাহিরের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে,—মাঝে মাঝে এক একটি ক্ষেতের দেখা মিলিতেছে ক্ষণেকের জন্য। বহুদিনের পুরাতন অভ্যাসবাঁধা মন যেন আজ এই হলুদরঙের মাঝে আসিয়া নবজীবন লাভ করিল। কমলের মনেও শেষ পর্য্যন্ত কাব্যের হলুদের 'ছোপ' লাগিয়া গেল!

এমনি করিয়া চলিতে চলিতে ঘণ্টা তিনেক কাটিয়া গিয়াছে—

এখনও প্রায় এতখানি সময় পড়িয়া রহিয়াছে। তা থাক্‌, তাহাতে আপত্তি নাই। কমলের মনে হয় এই পথ কি চিরদিনের জন্য স্থায়ী হয় না? এমনি করিয়া তাহারা চলিবে অন্তহীন পথের উদ্দেশে অনন্তকাল ধরিয়া—দেশ দেশান্তরে তাহাদের পদধ্বনি বাজিয়া উঠিবে ক্ষণেকের তরে কিন্তু থামিবেনা তাহারা—পথ চলিবে যুগ যুগান্তর ধরিয়া অবিশ্রাম। এমনি ধারা অসম্ভব কল্পনার অর্থহীন ছবি কমলের মনে ভাসিয়া বেড়ায়।

* * * *

পথের যাত্রী দুটি নূতন পরিবেশের মধ্যে বেশ আলাপ জমাইয়া অন্তরঙ্গ হইয়া বসিয়াছিল, তাহাদের নব-পরিচয়ের পসরা ইহারই মধ্যে বেশ আন্তরিক ভাববিলাসভারাবনত হইয়া উঠিয়াছিল। এমন সময় কোথা হইতে আকস্মিক দমকা বাতাসে তাহাদের ভাবের তরী টলমল করিয়া দুলিয়া উঠে। কোথায় আঘাত করিলে কাহার অন্তরে কি রকম ঘা লাগে কি সুর বাজে তাহা সব সময় জানা যায় না। আঘাতে তরঙ্গের লহর উঠিল কিনা তাহাও সব সময় বুঝিতে পারা যায় না।

অনুকণা এমনি জিজ্ঞাসা করিল,—আচ্ছা ওই ফুটফুটে সাদা বাড়ীটা তোমার কেমন লাগে। বেশ সুন্দর না?

কমল তাহার কথার জবাব না দিয়াই প্রশ্ন করিয়া বসে, আচ্ছা, কেমন লাগে ওই টুকটুকে লাল বাড়ীটা?

দুটি প্রশ্ন, অতি সাধারণ এবং স্বাভাবিক—ইহার মধ্যে এমন কিই-বা থাকিতে পারে যাহার জন্য কমল জবাব দিল না, অনুকণাও চুপ করিয়া রহিল।

কমলের মুখে কথা নাই, তাহার দৃষ্টি চলিয়া গিয়াছে সম্মুখের মাঠ ছাড়াইয়া ওই লাল বাড়ীর আঙ্গিনায়। সুমুখে লাল কাঁকরের সরু রাস্তা, তাহার পাশে পাশে চলিয়া গিয়াছে আম কাঁঠাল আর বকুল গাছের সারি, এ পাশের তৃণসবুজ মাঠে ধোপাদের তাল্কা মেঘের মত সাদা সাদা কাপড় শুকাইত দুপুর বেলায়। তারই পাশ দিয়া রেলের লাইন চলিয়া গিয়াছে আঁকিয়া বাঁকিয়া—সাপের গতির মতই মসৃণ অথচ বক্র গতি এই রেল পথের। কমলের স্মৃতিটা কিন্তু স্বচ্ছ, স্পষ্ট কোথাও ঝাপসা হইয়া যায় নাই। তাহার মনে আছে লাইনের ওপারে রহিয়াছে অজানা রাজ্য—কেবল দূর হইতে ইহার ভিতরের গহন অরণ্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, সে বননীল রেখা দেখিলে মনে হয় পৃথিবী কত সুন্দর! দৃষ্টির সামনে কে যেন মখমলের আস্তরণ বিছাইয়া দিয়াছে। কমলের তাহার যৌবন, তাহার কলেজ জীবন ছাড়াইয়া, তাহার আধুনিক পরিবেশ ছাড়াইয়া চলিয়া যায় দূরগত দিবসের দিকে সুরেনের পদরেণু অনুসরণ করিয়া। সেখানে রহিয়াছে লাল কাঁকরের সরু পথ, ছোট্ট কয়েকখানি ছবির মত ঝকঝকে বাংলো, আর রহিয়াছেন মা, বাবা—মধুর স্মৃতিসৌরভভরসরঞ্জিত মনোনভের দিকে

কমলেশের আকর্ষণ যেন অমোঘ হইয়া উঠিয়াছে। কমলেশ স্মৃতির সাগরে ডুবিয়া গেল। একবার কি ওই ওখানে ফিরিয়া যাওয়া যায় না!……

হঠাৎ অনুকণার হাতটা হাতে ঠেকিতেই কমলের সম্বিত ফিরিল। শূন্য দৃষ্টিতে অনুকণার পানে চাহিয়া সে আবার বাহিরের দিকে তাকায়। অনুকণাও যেন সাতসমুদ্র তেরো নদীর পারে সেই তেপান্তরের রাজপুরীতে চলিয়া গিয়াছে।

অনু ভাবিতেছে ওই শাদা বাড়ীটার কথা। পদ্মের মত দুগ্ধশুভ্র, ছবির মত সুন্দর বাড়ীটা। বাড়ীটার সর্ব্বাঙ্গে যেন মায়া মাখানো। ওর ছোট বাগানের গোলাপ, চামেলী, মালতী আর অপরাজিতা প্রত্যেকটি ফুলের সঙ্গেই অনুকণার বিশেষ পরিচয় আছে। তাহারা ফুটিবার আগে যেন অনুকণার অনুমতি লইয়া আসিত—সে প্রত্যহ গাছগুলির খবরাখবর করিত।…সে আর বঙ্কু—বঙ্কু এই শাদা বাড়ীর একমাত্র ছেলে। ছেলেটা বেশ। অনুকণা আজ দশ বৎসর পরেও বঙ্কুকে হারাইয়া ফেলে নাই। হঠাৎ তাহাকে দেখিতে পাইল, একেবারে চোখের সামনে। হাফ প্যাণ্ট পরা ফর্সা বঙ্কু, সব সময় তাহার মুখে কথা সরে না, অধিকাংশ সময়ই সে চুপ করিয়া অনুর সঙ্গে বেড়াইত। আবার যখন কথা বলিতে আরম্ভ করিত তখন তাহার মুখে যেন বাক্যস্রোত বহিয়া যাইত। অনুকণার বড় মামা বলিতেন, ওইটুকু ছেলে, কি ওর বুদ্ধি! অনুকণা অবশ্য বঙ্কুর বুদ্ধির তারিফ করিত কিন্তু বড় মামার কথা শুনিলে তাহার অত্যন্ত রাগ হইত! —ওইটুকু ছেলে কোথায়, বঙ্কু ত রীতিমত বড়। অনুকণার মনে আছে বঙ্কু ছিল মাপা সাড়ে চার আঙুল মাথায় উঁচু অনুকণার চেয়ে। এখনও কথাটা মনে আছে—আশ্চর্য্য! তাহাদের বৈকালিক ভ্রমণ, সান্ধ্য গল্পের আসর—সবই যেন মধুময়। মামার বাড়ীর পথেও যেন কি মাধুরী! লাল কাঁকরের সরু পায়ে চলা পথটা আর বঙ্কুদের পদ্মের মত শাদা বাড়ীর ঢেউখেলানো প্রাচীর, বকুল গাছের তলা আর শীতের দুপুরে মিঠে রোদ—এরা যেন হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে অনুকণাকে। আর সেই কিশোর বঙ্কু, শিখার মত উজ্জ্বল বঙ্কু দাঁড়াইয়া আছে তাহার জ্ঞানভাণ্ডারের মণিকোঠার দুয়ার খুলিয়া। প্রতি গ্রীষ্মাবকাশ আর বড়দিনের ছুটিতে অনুকণা মামার বাড়ী আসিত যখন সে স্কুলে পড়িত।…

তারপর অনেকদিন কাটিয়া গিয়াছে। মামারা বদ্‌লি হইয়াছেন, অনু স্কুল হইতে কলেজে উঠিয়াছে, বালিগঞ্জী সোসাইটিতে সুনাম অর্জন করিয়া অবশেষে সম্প্রতি এই শিবতুল্য ম্যাজিষ্ট্রেট স্বামী পাইয়াছে। সেই ছোটবেলার মিছে খেলাঘরের মধুর স্মৃতি ত তাহার মনে পড়িবার কথা নহে—কিন্তু তবু পড়িল। একবার সে স্বামীর পানে চাহিয়া দেখিল কিন্তু মনটা রহিয়া গেল সেই বহু যুগের ওপারে।…তাহাদের ঠাকুর পূজার আয়োজন, বৈকালে বেড়াইতে যাওয়া সেই রেল লাইনের পোলের ধারে। একদিন বঙ্কু করিল কি, হঠাৎ, কোন কথাবার্ত্তা নাই দুই টুক্‌রা পাথর কুড়াইয়া লইয়া বলিল, দেখ্‌বে অনু আগুন জ্বালাবো? এই ছাখো…।

অনু দেখিল বাস্তবিকই আগুন জ্বলিল, তাই দেখিয়া তাহার সে কি বিস্ময়! সেই আগুন জ্বালাইবার ছবিটা আজিও স্পষ্ট, উজ্জ্বল, জাগ্রত হইয়া উঠিল অনুকণার মানসপটে। অনুকণার সমস্ত অন্তরে যেন কি এক অব্যক্ত বেদনা মূর্ত্ত হইয়া উঠিল। না, না, অসম্ভব—বঙ্কুকে অনুকণা কোনোদিন চিনিতে ভুল করিবে না। বঙ্কুর সেই আয়ত নয়নের বিশেষ দৃষ্টি…তাহার মুখের আদল…মাথার কোঁকড়া চুল—কিছুই ত অনুকণার স্মৃতি হইতে এতটুকু ম্লান হইয়া যায় নাই। হাজার লোকের মধ্যে ছাড়িয়া দিলেও তাহাকে আজিও অনুকণা অতি সহজে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে। এমনি করিয়া অনুকণা আপনার ভাবরাজ্যে বিভোর হইয়া রহিল।…কিন্তু কথাগুলি ভাবিতে ভালো লাগিলেও এর চেয়ে আরও বেশি ভালো লাগে অনুকণার আর একটি কথা। তবে তার ধারা অন্য এবং রূপও অন্য।…অনুর সমস্ত অন্তর মাতৃত্বের জন্য আকুল।

* * * *

ওপাশে কমল বসিয়া আছে। ঘনায়মান সন্ধ্যার আরক্ত আকাশের দিকে অকারণে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া সে চলিয়া গিয়াছে কৈশোরের লীলাভূমিতে। ছোটবেলায় তাহার সঙ্গী ছিল না কেহ। তারপর বোধ হয় পৃথিবীর সঙ্গে অন্তরঙ্গতার সহিত সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য এক দুই করিয়া সঞ্চয় বাড়িয়া চলিল। তখন ত জানা ছিল না যে কোন্ তন্ত্রে আঘাত করিলে কি সুর বাজে। তের চৌদ্দ পনেরো ষোল—এই বয়সে জীবনের ভবিষ্যৎ কাল সাদা কাগজের মতই সুন্দর এবং সম্ভাবনাময় থাকে, তখন যথেষ্ট বোধশক্তির উদয়ও হয় না।…কিন্তু সে কথা থাক। এই ভাবিয়া সে বাহিরের অনন্ত মুক্তির সহিত আপনার মনের মিলন ঘটাইবার জন্য আকুলভাবে চাহিয়া রহিল। এমনি করিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া কখন যে সে আপনারই আবর্ত্তে আসিয়া পড়িয়াছে তাহা বুঝিতেও পারে নাই। সে যেন আপনার মনকে সম্ভব অসম্ভবের গণ্ডীর বাহিরে ছড়াইয়া দিয়া স্বপ্ন দেখিতেছে।

তাহার একাকীত্বময় জীবনের প্রথম জ্যোতিষ্ক বলিতে একজন আসিল, তাহার আগমন যেমন বিদ্যুতের মত আকস্মিক তেমনি দীপ্তিময় এবং ক্ষণস্থায়ী। কমলের আজিও প্রথম বিদ্যুৎ রেখার সেই ছবিটা মনের মধ্যে আঁকা রহিয়াছে। তার পর ত কত বিদ্যুৎ সে দেখিয়াছে, কত ঝড়বৃষ্টি জীবনের উপর দিয়া কাটিয়া গিয়াছে তবু সেই প্রথম দিনের সে ছবিটা অম্লান রহিয়া গেল! কালো রোগা ছিপ্‌ছিপে ধাঙ্গড়ের ছেলেটা যদিও কমলের অনেক উপকার করিত এবং তাহার অত্যন্ত অনুগত ছিল তবু তাহাকে ঠিক সঙ্গীর পর্য্যায়ে ফেলা যায় না।…লাল টুক্‌টুকে ডুরে শাড়ী-পরা ফুটফুটে একটি মেয়ে! কোথাও কোনো ভূমিকা নাই অথচ এমন একটা আশ্চর্য্য ঘটনা কেমন করিয়া ঘটিতে পারে? ধোপারা যেখানে কাপড় শুকাইতে দিয়াছে তাহারই উপর দিয়া কাপড় জামা মাড়াইয়া মেয়েটি আপন মনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কমল অবাক হইয়া গেল ইহাকে দেখিয়া। বেশ মেয়েটি। প্রথম যেদিন কমল মেয়েটিকে দেখিল, সেদিন সে কেবল দেখিলই, কোন প্রশ্ন করিল না তাহাকে—অথবা ভরসা করিল না। তাহার ধরণই ওই, সব কিছু লইয়া আপনার মনে চিন্তাই সে করে, সে যাহা ভাবে তাহা লইয়া আর কাহাকেও বিব্রত করে না। যাইহোক, সে আবিষ্কার করিল যে, চৌধুরী সাহেবের কুটুম্ব না কে আসিয়াছে, মেয়েটি তাহাদেরই।

পরদিন সকালে হঠাৎ কি একটা গোলমালে কমলের ঘুম

ভাঙ্গিয়া গেল। সে চোখ মুছিতে মুছিতে উঠিয়া মায়ের কাছে আসিতেই দেখিল তাহার মায়ের মত একজন মহিলা বসিয়া বসিয়া গল্প করিতেছেন। কমল লাজুক, সে অমনি নিজের পড়ার ঘরের দিকে পলায়নের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল। ওদিকে আবার মহিলাটি মাকে প্রশ্ন করিলেন, এই বুঝি আপনার ছেলে?

মা স্নেহমাখা সুরে বলিলেন, হ্যাঁ ভাই, নিয়ে দিয়ে ওই একটিই আপনাদের আশীর্ব্বাদে যদি বাঁচে তবেই ভাই। ও আমার নয় আপনাদেরই ছেলে।

তারপর কমল যা ভয় করিয়াছিল তাহাই হইল; মহিলাটি বলিলেন, এদিকে এসো তো বাবা।

মা বলিলেন, প্রণাম কর, মাসিমা হন।

তিনি বলিলেন, থাক, থাক, বেঁচে থাকো, মানুষ হও। দিদি কমলকে আমায় দিন না। তারপর তাহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, ছাখো তো বাবা হতভাগা মেয়েটা কোথায় গেল? ওরে অ অঙ্কু ইদিকে আয়, মেয়েটার ধিঙ্গীপনা দিন দিন বাড়ছে।

কমল প্রথমে বুঝিতে পারে নাই যে হতভাগা মেয়েটা কে কিন্তু এইখান হইতে যাইবার অনুমতি পাইয়া আশ্বস্ত হইয়া সে হতভাগা মেয়েটাকে খুঁজিবার জন্য তৎপরতার সহিত দৌড় দিল। অবশ্য অঙ্কুকে খুঁজিয়া বাহির করিতে তাহার বিন্দুমাত্র কষ্ট হয় নাই। তাহার পড়ার ঘরে গানের গুন্‌গুনানী শুনিয়া কমল প্রথমে সেইখানেই গেল এবং দেখিল গভীর অভিনিবেশ সহকারে কালকের সেই মেয়েটি তাহার বইয়ের ছবি দেখিতেছে। তাহাকে দেখিয়া মেয়েটি সঙ্কুচিতভাবে বইখানা বন্ধ করিয়া চুপ করিয়া গেল। কমল হাসিল। মেয়েটি বলিল, হাস্‌লে যে বড়?

কমলের কানে যেন কথাটা বাজিয়া উঠিতেছে, অঙ্কুর সেই অপ্রতিভ সুন্দর মুখের ক'টি কথা। কমল গম্ভীর হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তোমার নাম কি?

মেয়েটি উল্‌টাইয়া প্রশ্ন করিয়াছিল, তোমার নাম আগে বল না, আমার নাম আগে কেন বল্‌তে গেলাম।...তাহার কচি মুখের সেই ঝঙ্কার দিয়া ঘাড় দুলাইয়া কথা বলিবার ভঙ্গী যেন বহু দূরের আকাশে মিলাইয়া যাওয়া অতীতের পার হইতে হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে। তাহার ঝঙ্কারের সঙ্গীত বায়ুস্তরে সজীব হইয়া কমলেরই সম্মুখে ঘুরিয়া ফিরিতেছে। কমল যখন বলিয়াছিল, না বল্‌লে ব'য়েই গেল, তোমার নাম অঙ্কু আমি জানি।

তাহার উত্তরে মেয়েটি বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া সপ্রতিভ ভাবে জবাব দিয়াছিল, আহা, থাম মশাই, তোমার নাম আর কে না জানে, বঙ্কু তো তোমার নাম।

সেই হইতে সত্যসত্যই কমলের নাম বঙ্কু হইয়া গেল এবং অঙ্কুর সহিত তাহার খুব ভাব হইয়া গেল। তারপর কতদিন সকালে, দুপুরে, বিকালে, সন্ধ্যায় সেই ছোট্ট একটি মেয়ের সঙ্গে কমলের কাটিয়াছে তাহার হিসাব নাই। হয়ত বেশিদিন নয়—কিন্তু তবু তা অনেক দিনই হইবে—সব ক্ষেত্রে আঙ্কিক নিয়মের হিসাব খাটে না, গভীরের রাজ্য আলাদা। এমনি করিয়া তাহাদের অন্তরঙ্গতা যখন আকর্ষণের পর্য্যায়ে পা দিল সেই সময়েই দুজনের পথধারা বহিল দুই দিকে। শেষ যখন অঙ্কুকে সে দেখিয়াছে তখন অঙ্কুর কালো চুর্ণ কপাল ঘাড় ছাড়াইয়া পিঠের উপর আসিয়া পড়ে।

তারপর তাহার কলেজের জীবন, বিচিত্র অভিজ্ঞতাময় সজ্ঞান জীবন, সেখানে আসিয়া কৈশোরের স্বপ্ন যেন বাস্তব সত্যের স্পষ্টতার স্পর্শে ক্ষীয়মান হইয়া আস্তে আস্তে লুপ্ত হইয়া গেল। নানারকম বাস্তবিকতার মধ্যে হারাইয়া গেল সেই সাদা কাগজের মত শুভ্র, অলিখিত জীবনের সম্ভাবনা সম্ভারময় অজ্ঞাত অধ্যায়গুলি।

হঠাৎ কমলের মনে হইল অঙ্কু তাহার চোখ চাপিয়া ধরিয়াছে পিছন হইতে, সে অঙ্কুর হাত দুটি চাপিয়া ধরিয়াছে—আর অঙ্কু আর্ত্ত স্বরে বলিতেছে, আঃ, উঃ, মাগো, লাগ্‌ছে ছাড়ো বঙ্কু।...বহুদিন আগে আতর ফুরাইয়া গিয়াছে, অথচ নাকের কাছে সেই খালি শিশিটা ধরিলে যেমন একটা অতিপরিচিত মৃদু সৌরভ পাওয়া যায়—এ ঠিক তেমনি।...সত্যি কিন্তু সেদিন অঙ্কুর হাত দুটি লাল হইয়া উঠিয়াছিল। কমলের মনে হইল, এতদিনে হয়ত তাহার গাল দুটি ঠিক ওই হাতেরই মত রক্তিম হইয়া উঠিয়াছে। কে জানে। কোথায় সে অঙ্কু আর কোথায় সেই কমল, তাহার ঠিকানা নাই। বিশ্বের ঘূর্ণ্যমান চক্রের আবর্ত্তে পড়িয়া কে যে কোথায় চলিয়া যায় তাহা আবিষ্কার করা সম্ভব নহে। কিশোর কালের কাঁচা স্বপ্নাচ্ছন্ন মনের সঙ্গে যাহার পরিচয়, পরিণত বয়সের স্পষ্ট দিনে তাহাকে দেখিবার জন্য কমলের মন আজ স্মৃতির সিংহদ্বারে উপস্থিত হইয়াছে—মাঝে যে বিরাট কালের সমুদ্রের ব্যবধান আছে তাহাকে কি অতিক্রম করা যায় না! কমল ভাবপ্রবণ, কল্পনা-বিলাসী, কিন্তু সে মানব-জীবনের সহজ পরিণতিকে বুঝিতে পারে, সেটুকু বোধশক্তি আছে।

কমল যে বিবাহ করিয়া সুখী হইতে পারে নাই একথা মিথ্যা। অনুকণা সুন্দরী, কমল তাহাকে ভালোবাসে একথা যেমন সত্য, তেমনি আজ তাহার মনে হইতেছে যে অঙ্কুকে যদি সে পাইত তবে আর তাহার চাহিবার কিছুই ছিল না।

আকাশের অস্তপারে কখন যে রক্তাভ মেঘখানাকে কালো করিয়া সূর্য্য অস্ত গিয়াছে কমল লক্ষ্য করে নাই। কখন যে তৃণ-সবুজ দিগন্তপ্রসারী মাঠখানা পার হইয়া গেছে সে জানে না... তাহার সামনে যেন এখনও রহিয়াছে চৌধুরীদের ছোট্ট লাল বাড়ীটা। আচ্ছা অঙ্কু কোথায়! তাহার বাঁকা বাঁকা কথা বলা ঘাড় দুলাইয়া বিচিত্র ভঙ্গিতে, তাহার দৃপ্ত, সরল, সুন্দর নিজস্বতায় ভরা মুখচ্ছবি আজিও কোথাও কি বাঁচিয়া আছে! কমল যেন বিগত দিনের অন্ধকার-প্রায় পথের অলিতে গলিতে অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতেছে ট্রেণের অবিশ্রাম চাকার শব্দের চেয়েও দ্রুততর গতিতে।

কমলেশ ভাবে তাহাদের বিবাহের কথা, তাহাদের দাম্পত্য জীবনের কথা। তাহাতে রস, তাহাতে মাধুর্য্য আছে, সান্ত্বনা আছে, প্রীতি, প্রণয়, আকর্ষণ সবই ত রহিয়াছে—তবু, তবু কি যেন কোথায় নাই। কিসের অভাব তাহাদের? সেই দুটি অন্তরের অতি নিকট অন্তরঙ্গতা,...তবু তাহার মনে হয় যেন অঙ্কু হারাইয়া গিয়াছে জীবনের পশ্চাতে ফেলিয়া আসা স্মৃতির দলে, মনে হয় যুগ যুগান্ত ধরিয়া খুঁজিয়া ফিরিলেও আর তাহাকে ফিরিয়া পাওয়া যাইবে না।

অন্ধকারে বাতাসের দিকে মুখ ফিরাইয়া সে যেন ধীরে মনে মনে ডাকিল—অঙ্কু! তাহার মনে হয় আজ সে যে স্বপ্ন দেখিল এতক্ষণ ধরিয়া—তাহা হয়ত আরো মধুর আরো সুন্দর হইত—যদি অনুকণা আর কাহারও স্ত্রী হইত, তাহার না হইয়া।

অনুকণা তাহারই পাশে বসিয়া ছিল, সে জবাব দিল—ডাক্‌ছ আমায় !

কমলেশ বাহিরের দিকে চাহিয়াই জবাব দেয়—না। বাতাসে তাহার চুলগুলি এলোমেলোভাবে উড়িয়া কপালের উপর পড়িতেছে, দৃষ্টি যেন ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। একবার কমলের মনে হয় মুখ ফিরাইয়া অনুকণাকে দেখিয়া লইলে কেমন হয়। পরক্ষণে নিত্যদিনের অতি পরিচিত পত্নীর মূর্ত্তি তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়, সে চুপ করিয়া বাতাসের শব্দ শোনে।

অনুকণারও কথা কহিতে ভালো লাগিতেছে না। তাহার মনে হয় সঙ্গে যদি খোকা থাকিত, সেই খোকা যে তার বাপের মতই দেখিতে, যার ঈষৎ কুঞ্চিত চুলগুলিকে কিছুতেই বাগে আনা যায় না, যে খোকা সেই বন্ধুরই মত পাকাপাকা কথা বলিত—তাহা হইলে তাহাদের আজিকার যাত্রা সার্থক সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অনু আজ সমস্ত অন্তর দিয়া কামনা করে সেই খোকাকে, যে তাহার কোলে কোনোদিন আসিবে কি না ঠিক নাই। আচ্ছা খোকা যদি কমলের মত দেখিতে না হইয়া মায়ের মত দেখিতে হয়! কথা একবার মনে হইতেই অনু নিজের কাছেই কথাটা গোপন করিবার চেষ্টা করে—কথাটা নিজেরই মনঃপূত নহে। তাড়াতাড়ি কমলের হাত ধরিয়া টানে—শোনো, ওগো শুন্‌ছ !

—কি। বলিয়া কমল মুখ ফিরাইল।

—আচ্ছা তোমার বন্ধুর দেশের কাছে না কি কোন্ একটা জাগ্রতা দেবী আছেন !

—না ছিলেন না তবে তাঁর যতদূর মনে হচ্ছে আবির্ভাব হবে খুব শীগ্‌গির। কেন বলত ?

—তোমার সব তাতেই ঠাট্টা।

—বেশ বলো, আর ও অপরাধ হবে না। তোমার উচিত ছিল কোনো দার্শনিক অথবা অঙ্কের অধ্যাপকের সহধর্ম্মিণী হওয়া, তাহলে ঠাট্টার বালাই থাকৃত না।

—আচ্ছা তোমার বন্ধু ত ষ্টেশনে আসবেন।

—হুঁ, একেবারে পুত্র কলত্র ইত্যাদি সরেজমিনে হাজির হবে।

—ওঁর ত ছেলে মেয়ে পাঁচটি, তার দুটি বুঝি মেয়ে না !

অনুকণার বুকের ভিতর হইতে কি যেন একটা কঠিন ভারী বস্তু উপর দিকে ঠেলিয়া উঠিতে চাহে কণ্ঠ বাহিয়া।

কমল সংক্ষেপে জবাব দেয়—হুঁ। ওর ছোট মেয়ের নাম ক্ষান্ত তার আগেরটির নাম 'আর না'।

—আহা, তোমাদের যেমন কথার ছিরি। মানুষকে হেনস্থা করা কি করে যে আসে তোমাদের।

কমল পকেট হইতে একটি চুরুট বাহির করিয়া আপনমনে ধরায়।

অনুকণা মনে মনে ভাবে হরিপদর স্ত্রীকে ধরিয়া একটা ভালো-রকমের মাদুলীর ব্যবস্থা করিয়া লইতে হইবে।

এক সময়ে সে প্রশ্ন করে—আচ্ছা আমাদের বাসা থেকে তোমার বন্ধুর বাড়ী কতদূর হবে ? দেখা যায় ?

—কি করে বলব, আমি ত দেখিনি তবে হরিপদ লিখেছে খুব কাছেই।

বোধহয় অকারণেই বিরক্তিতে কমলের অন্তরাত্মা জলিয়া উঠে। কেন, কিসের জন্ত তাহার এই অসন্তোষ সে নিজেও বুঝিতে পারে না। কোন্ একটা ষ্টেশনে গাড়ী আসিয়া থামিতেই সে দরজা খুলিয়া নীচে নামে। অনুকণা মুখ বাড়াইয়া বলে—খাবারওলা যদি পাও তো কিছু মিষ্টি নাও না।

—কেন কলকাতা থেকে ত চার টাকার মিষ্টি—।

—আহা, তাতে বুঝি কুলোয়। পাঁচটার মুখে দিতে ভাগে একটি করেও পড়্‌বে না। তা ছাড়া নতুন জায়গায় যাচ্ছি রাত বিরেতে যদি খাবার ব্যবস্থা নাই হয়ে ওঠে তখন ?—নাও-না ফেলা ত যাবে না।

চুরুটটা ঠোঁটের ডগায় কমলেশ আরও চাপিয়া ধরে। একটু আগে যে সব মধুর দিবাস্বপ্ন সে দেখিয়াছে তাহার সহিত এই পৃথিবীর বাস্তবের সঙ্গে কি সামান্ত এতটুকুও সাদৃশ্য থাকিতে নাই ! চুরুটটা হঠাৎ কেমন করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল।

*　　　*　　　*

তারপর। যেদিন তাহারা আসিয়া এখানে পা দিল তাহার পরদিনই হরিপদর স্ত্রীকে দলে টানিয়া অনুকণা কাছেই কোন্ জাগ্রতা কালির স্থানের সন্ধান আদায় করিয়া যাইবার জন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিল। সেদিন দুপুরে কমল একখানা বই মুখে দিয়া শুইয়া ছিল অনুকণা ঘরে ঢুকিয়া সকলরবে বলিল,—দিদি ভয়ানক ধরেছেন একবার দেবিদুর্গাপুরের মন্দিরে যাবার জন্তে।

—তা বেশ যাও।

—না, তোমায়ও যে যেতে হয়।

কথাটা শুনিয়া কমলের খুব রাগ হইল। রাগ হইল বলিলে ভুল হইবে কারণ সে মনে মনে চটিয়াই ছিল, এখানে আসিবার পর হইতে তাহার আর প্রাধান্ত নাই, শুধু তাই নয় নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে অনুকণা তাহাকে কোনো কথা বলে না কমলেশ তাহা বেশ ভালো ভাবে লক্ষ্য করিতেছে ! তাই তাহার পুঞ্জীভূত উত্তাপ যেন এই সুযোগে একসঙ্গে বাহির হইয়া আসিতে চাহে। তবে কমলেশের বিশেষত্ব হইতেছে এই যে, সে রাগিলে বেশ আস্তে আস্তে কথা বলে সহজে কেহ ধরিতে পারে না যে সে রাগিয়াছে।

—আমায় আবার কেন। তোমাদের মেয়েদের ধর্ম্ম মেয়েদের কাছেই থাক্ না।

—বেশ, তাই হোক্ আমি তবে দিদিকে বলি গে আমার যাওয়া হবে না।

—অবিশ্যি আমি তোমায় যাবার জন্তে মাথার দিব্যি দিই নি, তুমি নিজেই বল্‌লে যাবে, বল্লাম যাও—ইচ্ছে না হয় যেও না।

—এরপর না গেলেই ভালো হয়। তবে দেবতার স্থানে যাবো বলে পারতে পক্ষে সোমত্ত থাকৃতে না যাওয়া পাপ, তাই আমার বলা। আচ্ছা গেলে কি তোমায় বাঘে খাবে ? না হয় গেলেই একবার।

—তা যেতে হয় ত পারতাম একবার না হয় দুবার।

—যাবে ? চলো। কিন্তু আজই যেতে হবে তাহ'লে।

—আজ না গেলেই নয়। কমল ঠিক রাগটা প্রকাশ করিতে পারে না।

—আজ তিথিটা দিদি বল্‌ছিলেন প্রশস্ত আছে তাই।

—বেশ।

অমাবস্যা তিথিতে ষোড়শোপচারে দেবীর পূজা দিয়া পুষ্প-নির্ম্মাল্য ও চরণামৃত সংগ্রহ করিয়া অনু বেশ প্রফুল্ল মনেই বাড়ী ফিরিল। তাহার মনে আজ একটা তৃপ্তির বিকাশ। কমল সারা পথটা প্রায় নীরবেই আসিয়াছে অনুকণা বোধহয় তাহা লক্ষ্য করিয়াও কিছু বলে নাই বা প্রশ্ন করে নাই—তাহার নিজেরই শান্তি ভঙ্গের আশঙ্কায়।

পরদিন শাস্ত্রানুমোদিত প্রথায় অষ্টধাতুর মাদুলী প্রস্তুত করিয়া তাহার মধ্যে দেবীর চরণের পুষ্পনির্ম্মাল্য দিয়া অনুকণা ধারণ করিল। কমল যেন নেপথ্য-অভিনেতার দলে, সে সবই দেখিল, ব্যস্ ওই পর্য্যন্ত—দেখিয়াই সে ক্ষান্ত। সে কোন মতামত প্রকাশ করে না, কে-ই বা তাহার মতামত চাহিয়াছে। সমস্ত দিনটা তাহার মেঘাচ্ছন্ন বর্ষনোন্মুখ আষাঢ়ের আকাশের মত গভীর বিষাদচ্ছায়ায় কাটিল।

সন্ধ্যাবেলায় অনুকণা আর নীরব থাকিতে পারিল না—তোমার কি শরীর অসুখ করছে গো ?

—না তো।

—তবে অমন মনমরা দেখাচ্ছে কেন, কি হয়েছে ?

—মন তো আর কারুর হাত ধরা নয়, কখনো মরে কখনো বাঁচে—যাদের আছে তারাই বোঝে।

—আচ্ছা, বল্‌বে না ?

—কি বল্‌ব! কমলের অভিমানাহত অন্তর যেন স্তব্ধ হইয়া অনুকণার দিকে চাহিয়া আছে। অনুকণা ভালো করিয়া তাহার মুখের পানে চাহিতে পারে না। সে যেন কতবড় একটা অবিচার করিয়া চলিয়াছে কমলের প্রতি—এই কি তাহার স্বামী বলিতে চাহে! কিন্তু কি তাহার অপরাধ, বাস্তবিকই সে কোনো অন্যায় করিয়াছে কিনা অনুকণা তলাইয়া ভাবিতে পারে না। তাহার যেন কেমন ভয় হয়। সে কোনোরকমে বলিয়া ফেলিল—আমার ওপর রাগ করেছো ?

তেমনি সহজ সরল ভাষায় উত্তর মিলিল—না।

* * *

এমনি করিয়া লুকোচুরির মধ্য দিয়া কয়েকদিন কাটিল। অনুকণা আজকাল তাহার দিদি, কালী মায়ের মাহাত্ম্য এবং দিদির ছেলেমেয়েদের লইয়া সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকে। আর কমল অগত্যা হরিপদ এবং তাহার প্রতিবেশীদের ডাকিয়া অথবা তাহাদের বাড়ী গিয়া দিন কাটায়। কিন্তু এমন করিয়া একই বাড়ীতে দুই জনে বাস করিয়া আড়আড় ছাড়ছাড় হইয়া আর কত দিন কাটান যায়!

কোথা হইতে দুর্নিবার একটা ভয় আসিয়া অনুকণাকে পাইয়া বসিয়াছে, সে কিছুতেই যেন কমলের কাছে যাইতে পারে না। কি এক অপরিজ্ঞাত ভয় তাহার সমস্ত সত্তাকে শক্তিহীন করিয়া ফেলিয়াছে—সে সাহস সঞ্চয় করিয়া স্বামীর কাছে যাইতেও ভরসা পায় না। তাহার মনে হয় কমল যেন আর কেহ হইয়া গিয়াছে, তাহার উপর অনুর কোন অধিকার নাই, বুঝি বা জোর করিতে যাইলে ফল খারাপ দাঁড়াইবে।

অবশ্য কমলের বেলায় সে প্রশ্ন ওঠা উচিত নহে—তাহার পুঞ্জীভূত অভিমান দিন দিন আরও দুর্লজ্ঘ্য হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু ব্যাপারটা কাহারও যেন ভালো লাগিতেছে না—বিশেষ করিয়া অনুকণার। কমলেশের এ কয়দিনে এগুলি এক রকম অভ্যাসে দাঁড়াইয়াছে। সে এসব লইয়া মাথা গরম না করিবারই যথাসাধ্য চেষ্টা করে।

সেদিন রাত্রে আহারাদির পর কমলেশ আপনার শয্যায় গড়াগড়ি দিতেছিল—ঠিক ঘুমায় নাই, বিছানাটা যেন গরম হইয়া উঠিতেছে তাই বার বার সে সরিয়া নড়িয়া শুইতেছে। সে ভাবিতেছিল, ছুটি এখনও দীর্ঘ দিন, কেমন করিয়া এইভাবে এখানে কাটানো যায়, কিন্তু অনুকণাকে একেলা রাখিয়া যাইতে চাহিলে গোল বাধিবে। আর তা যদি না হয় তবে কলিকাতায় ফিরিয়াও ত সেই বাড়ী আর সেই অনুকণা আর তাহার তাবিজ-কবচ!

—ঘুমুলে না কি। বলিয়া কোন ভূমিকা না করিয়াই অনুকণা আসিয়া তাহার পাশে বসিল।

—না।

—আচ্ছা, আজকাল তোমার কি হয়েছে গো। বলিতে বলিতে অনুকণা কমলের হাত দুটি জড়াইয়া ধরে, আমায় তুমিও যদি এমন করো তবে কার কাছে যাবো। অন্ধকারে অনুকণার অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠস্বর শুনিয়া কমল বিচলিত হয়।

—কি, কি-হ'ল!

—আমায় তুমি মারো বকো গালাগালি দাও, তোমার দুটি পায়ে পড়ি। অমন পাষাণের মত চুপ করে থেক না। আমার মনে হয় তুমি আমায় এড়িয়ে—

—অনু সে কথা থাক। তুমি শান্ত হও। মেয়ের জাত বড় উতলা হয়।

—ওগো হ্যাঁ, তাই ত তারা মেয়ের জাত।

—বলো, বলো তাই তারা মায়ের জাত, তারা দেবী—নইলে যে মানুষটা রোজ দুবেলা তার চোখের সামনে যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করছে, তাকে দেখেও দেখ্‌তে পায় না।

—ওগো চুপ করো।

বলিয়া অনুকণা স্বামীর হাত চাপিয়া ধরে। কিন্তু পরক্ষণেই আবার বলে—না-না বলো, শাস্তি নিতেই আজ এসেছি।

—শাস্তি দেবার আমি কেউ নই। যারা বর দিতে পারে তাদের কাছে শাস্তিও পাওয়া যায়—বর নাও, সাজা নাও তোমার মা কালীর কাছে। আমি কেউ নই।

অনুকণা স্বামীর বুকের উপর লুলটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে থাকে ফুলিয়া ফুলিয়া—ওগো আমায় ক্ষমা করো।

কমলেশ তাহার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে সান্ত্বনা দেয়—অনু ওঠো, ছি, ছেলেমানুষী করেনা আমি কি তোমার ওপর রাগ করে থাক্‌তে পারি? তুমি এর আগে এলেই ত পারো, আমি ত আর তোমায় বলি নি কিছুই।

এমনি ভাবে অনেকক্ষণ তাহাদের কাটিল, মেঘ কাটিয়া যেন আবার স্বাভাবিক অবস্থায় তাহারা ফিরিয়া আসিয়াছে।

অনুকণা বলে—ভগবান আমায় কেবল তোমাকেই দিয়েছেন। আমি শুধু বার বার ভুলে যাই সে কথা, তাই ত কষ্ট পাই। এই দেখ এই যে মাদুলী, কালীবাড়ী যাওয়া এর কি দরকার ছিল? জানিই ত যে ওসব ঝামেলা আমাদের ঘাড়ে চাপ্‌বে

না। কিন্তু অকারণ কতকগুলো খরচপত্তর, মন মানে না তাই করা। একটা অশান্তির সৃষ্টি।

কমল বলে—এই বা মন্দ কি, পরে যখন এসব দিনের কথা মনে পড়বে তখন কি ভালোই লাগ্‌বে। এ ভালো হ'ল, আগে তেতো খেয়ে তারপর ভালো ভালো তরকারী খাওয়ার মত আর কি।

—যাও। বলিয়া অনুকণা স্বামীর বুকের উপর হাত রাখিল।

কমল সন্ত্রস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—আরে, এটা আবার কি। দেখ দেখি আমায় জখম করবে নাকি? ও, বুঝেছি এটা তোমার সেই পুত্রেষ্টি। ওটা আবার কেন।

অনুকণা তাড়াতাড়ি বলে—দাঁড়াও ওকে বিদেয় দিই।

তারপর মাদুলীটা খুলিয়া হাতে করিয়া অনুকণা কাঁপিতে থাকে। কোথায় রাখিবে, কি করিবে সে মাদুলীটা? হাতে রাখা চলিবে না, গলায় ঝুলানো চলিবে না কি উপায়। তাহার মনে পড়িল দিদি বলিয়া দিয়াছেন, কোনো সময়ের জন্য মাদুলী কাছ ছাড়া করা চলিবে না। অনুকণা আর ভাবিতে পারে না তাড়াতাড়ি সুতোশুদ্ধ মাদুলীটা মুখে পুরিয়া দেয়। গিলিয়া ফেলাই ভালো।

খানিকক্ষণ দু'জনেই চুপ-চাপ। হঠাৎ কমল বলে—ওগো শুনছ।

—উঁ

—চল একটু বাইরে যাই।

আবার সেই উঁ—উঁ শব্দ। অনুকণার মুখ দিয়া কেমন একটা অস্বাভাবিক শব্দ বাহির হইতেছে।

তারপর আলো জ্বালিয়া ভালো করিয়া দেখিয়া কমল কিছুই বুঝিতে পারে না। সে চাকরকে ডাকিয়া তুলিয়া ডাক্তারের কাছে পাঠাইল।

* * *

ডাক্তার বলিলেন—Sudden shock তেমন ভয় নেই। এই ওষুধেই কাজ হবে।

জ্ঞান ফিরিতে ঝুঁকিয়া পড়িয়া কমল প্রথম প্রশ্ন করিল—এখন কেমন আছো অনু।

সে ঘাড় নাড়িয়া জবাব দেয়—ভালো।

কমল তাহার হাতটা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে বলে—অনু আমি তোমায় বল্‌ছি তুমি মাদুলী পর'। কোথায় সেটা বলো আমি নিজে এনে পরিয়ে দিচ্ছি।

অনুকণা ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া থাকে। কমলের মনে পড়ে ছেলেবেলার সেই অক্ষুর কথা, তাহার চোখে ত এই ভাষাই ছিল?

লণ্ডন-তীর্থে

শ্রীমতিলাল দাস

আয়ার হইতে ওয়েলস প্রদেশের মধ্য দিয়া লণ্ডনে ফিরি। দুঃখের বিষয় ওয়েলস প্রদেশের কোনও নগরে নামি নাই। রেলপথের বাতায়নের মধ্য দিয়াই এই সুন্দর দেশের সহিত পরিচয় ঘটিয়াছিল। গ্রেট বৃটেনের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে ওয়েলস অবস্থিত—১২টি জেলা লইয়া এই ক্ষুদ্র প্রদেশ গঠিত। ইংলণ্ডের রাজা প্রথম এডওয়ার্ডের প্রথম পুত্র বার্ণার ভন এই সহরে জন্মগ্রহণ করে—সেই হইতে ইংলণ্ডের যুবরাজকে ওয়েলস রাজকুমার নামে অভিহিত করা হয়। ওয়েলস প্রদেশেই কল্টিক জাতীয় বৃটনেরা পলাইয়া গিয়া বাস করে—সাধারণ ইংরাজ হইতে ইহাদের আচার ব্যবহার ও ভাষায় পার্থক্য আছে। ওয়েলসের লোকেরা খুব আলাপী ও নিরহঙ্কার। ওয়েষ্টমিনষ্টার গির্জ্জায় একজন ওয়েলস মহিলার সঙ্গে আমার আলাপ হয়। ওয়েলসের মেয়েরা চেক দেওয়া গাউন পরিতে ভালবাসে এবং কালো টুপি ও রঙীন গলাবন্ধ পরিতে পছন্দ করে। ওয়েলস ভাষা সংস্কৃতের মত বিভক্তি ও তদ্ধিতের সাহায্যে নিজের শব্দ-সম্ভার বাড়াইতে পারে। ওয়েলস জাতি এই ভাষা বাঁচাইয়া রাখিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করে, কিন্তু কালস্রোতে বোধ হয় ইহা লুপ্ত হইয়া যাইবে।

রাজনৈতিক বিবর্ত্তন ভাষায় পুষ্টি ও বৃদ্ধি সাধনে বিশেষ সহায়তা করে। আসামী ভাষা ও বাংলা ভাষা অনুরূপ—আসাম ও বাংলা একই প্রদেশ থাকিলে হয়ত কালে উভয় ভাষা মিলিয়া একই ভাষা হইয়া যাইত। কিন্তু প্রাদেশিকতার আবহাওয়া আসামীকে একটা স্বতন্ত্র ভাষা করিয়া গড়িয়া তুলিবে। আর্লণ্ডেও লুপ্তপ্রায় আয়ার ভাষা স্বাধীন আইরিশ তন্ত্রের কল্যাণে নবরূপ এবং নবজীবন পাইতেছে। ডাবলিন হইতে আড়াআড়ি পাড়ি দিয়া খুব সম্ভব বিডিপার্ক বন্দরে নামি। সেখান হইতে লণ্ডনের ইউষ্টন ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছি। ভূগর্ভস্থ ষ্টেসন হইতে লিফ্টে করিয়া উঠিয়া টিউব রেলে বেলসাইজ স্কোয়ার ষ্টেশনে আসিয়া বাসায় ফিরিলাম।

শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল কিন্তু স্বাবলম্বী সাজিবার অভিমান করিতে গিয়া নিজের ভারী সুটকেস বহিয়া বাসায় উপস্থিত হইলাম। দুঃখ ও কষ্টের মধ্যে মানুষ হইয়াছি তাই যখন সদুপায়ে পয়সা বাঁচাইতে পারি, তখন পয়সা ব্যয় করিতে কুণ্ঠা হয়। এই স্বভাব-কৃপণতা এবং স্বাবলম্বনের অভিমানের জন্য বিশেষ কষ্ট পাইলাম। বাসায় আসিয়া অনেক চিঠি পাইলাম—তিন সপ্তাহের জমা চিঠি—ইহাদের মধ্যে লেডি কার-মাইকেলেরও আমন্ত্রণ ছিল—তাঁহার চিঠি পাইয়া খুব আনন্দ লাভ করিলাম।

২৯শে সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার। সকালে উঠিয়া গ্রিণ্ডলের ব্যাঙ্কে চলিলাম—আইরিশ টাকা কড়ি বদল করিয়া লইলাম—চিঠিপত্রেরও সন্ধান করিলাম। আইরিশদের দেশে যাইবার পূর্ব্বে লেষ্টার স্কোয়ারে ছবি তুলিয়াছিলাম—আড়াই শিলিং দিয়া তিনখানি বেশ বড় বড় ছবি দিল—আমাদের দেশে ইহার জন্য আট দশ টাকা নিত। তা ছাড়া এই ছবির মুদ্রণ-পারিপাট্য চারুতা এবং স্নিগ্ধতা এই দেশে দুর্ল্লভ। ছবি নিয়া আমার এক বন্ধুর পুত্রের সন্ধানে চলিলাম। বন্ধু সিমলায় কাজ করেন—পুত্রকে ব্যারিষ্টার হইবার জন্য বিলাত পাঠাইয়াছেন। তাহার নাম পঙ্কজ। দেখিলাম সে একটা অপরিচ্ছন্ন ঘর ভাড়া লইয়াছে—যে অঞ্চলে আছে সে অঞ্চলও আমার ভাল লাগিল না। বিলাতে আসিয়া চুপচাপ করিয়া ঘরেই থাকে। যে সজাগ্রত ঔৎসুক্য মানুষকে বড় করে, যে নব পরিচয়ের বিস্ময় মানুষকে জিজ্ঞাসু করে—তাহার মধ্যে তাহার অভাব লক্ষ্য করিলাম। তাহাকে এই সব বিষয়ে কিছু উপদেশ

প্রদান করিলাম। কিন্তু মনে হইল সে উপদেশ বৃথাই গেল। কি করিবে এবং কি পড়িবে সে বিষয়েও তাহার স্থির ধারণা কিছু নাই। আমি তাহাকে এক বিষয়ে মনস্থির করিয়া লইতে বলিলাম। তাহাকে আমার সঙ্গে দেখা করিতে বলিয়া আসিয়াছিলাম, কিন্তু সে দেখা করে নাই। বোধ হয় সে উপদেষ্টাকে চায় নাই—সে চাহিয়াছিল বন্ধু। বন্ধু সাজিবার বিড়ম্বনা করিতে পারি নাই—তাই আমার সঙ্গে সে আর দেখা করিবার প্রয়োজন অনুভব করে নাই।

আমাদের দেশে বহু অভিভাবক অতিশয় কষ্ট করিয়া পুত্রদের বিলাত পাঠান। কিন্তু পাঠাইবার পূর্ব্বে তাঁহারা পুত্র কি করিবে এসব বিষয়ে বিশেষ অনুধাবন করেন না—ইহা বড়ই অন্যায়। অবশ্য অর্দ্ধ পৃথিবীর অধীশ্বর বৃটিশ জাতির সভ্যতার কেন্দ্র লণ্ডনে আসিলে সজীবতা, সক্রিয়তা এবং প্রাণের প্রাচুর্য্য লাভ করা সহজ। কিন্তু লাভ করিবার জন্য চাই গ্রহিষ্ণু মন। লইতে না জানিলে সুধাস্রোতও বিরূপ হইয়া যায়। আমার তরুণ বন্ধুগণ নিশ্চয়ই আমায় ক্ষমা করিবেন, কিন্তু আমার মনে হয়, আমাদের দেশের বহু যুবক লণ্ডনের প্রাণ-প্রাচুর্য্য আদৌ লাভ করেন না—তাহারা বিলাতী আদবকায়দার বাহিরকে অনুকরণ করিয়া সাহেব সাজিয়া চাল দিতে চাহেন, কিন্তু যে জীবনের প্লাবন ইহাদিগকে বড় ও মহান করিয়াছে—তাহা গ্রহণ করিতে তাহাদের আগ্রহ ও কৌতূহলের একান্ত অভাব। শ্রীমান্ পঙ্কজের বাসা হইতে বিদায় লইয়া পি, ই, এন্ ক্লাবের আন্তর্জাতিক ওয়েলস ডিনারের টিকিট সংগ্রহ করিবার জন্য চলিলাম।

পি, ই, এন একটা world-association. যাহারা লেখনী চালায় তাহারা সকলেই পেনের মেম্বার হইতে পারে। আবার ইহার প্রত্যেক অক্ষর দিয়া এক একজন বিশিষ্ট লেখককে বুঝায় পি অর্থে Poet এবং Playrights ই অর্থে Editor এবং Essayist এবং এন্ অর্থে Novelist. কবি, নাট্যকার, সম্পাদক, প্রবন্ধরচনাকারী এবং ঔপন্যাসিক প্রভৃতির এই সম্মেলন বিশ্বের সাহিত্যিক সমাজে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। H. G. Wells এই বৎসর এই সমিতির সভাপতি ছিলেন—তাঁহার সম্মানের জন্য এই বিরাট ভোজের আয়োজন। ইহাতে নানা দিক্ নানা দেশ হইতে মণীষী ও সাহিত্যিকগণের সমাগম হইবে—ইহাতে যোগ দিবার জন্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্ত্তী মহাশয় বিশেষ করিয়া বলিয়াছিলেন।

বন্ধুবর চক্রবর্ত্তীর চিঠিখানি তুলিতেছি। যেমন লিখেছেন তেমনই—

Urgent
Sept 21
Balliol College
Oxford

প্রিয়বরেষু

এই বিরাট সাহিত্যিক উৎসব হবে ১৩ই অক্টোবর—আমি P E Nএ আছি, তাই চারজনকে আমি Recommend করতে পারি, Guest টিকিট কিনবার জন্য। এখনও তিনদিন আমার হাতে আছে। আপনি যদি পত্রপাঠ আমাকে জানান আপনি পনেরো শিলিংএর একটা টিকিট কিনতে চান কিনা তাহলে বাধিত হব। তিন দিনের পর আর একটি টিকিটও পাওয়া যাবে না।

এই Banquetএ শুধু ইংরেজ সাহিত্যিক নয়, Continent থেকে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ লেখক, Artist এবং Critic নিমন্ত্রিত হয়ে আসবেন। একই সন্ধ্যায় বর্ত্তমান য়ুরোপের বিশ্ববিখ্যাত মনীষী অনেককে দেখতে পাবেন—তাঁদের সঙ্গে পরিচিত হতে পারবেন।

হয় বিলিতী Dinner suit নয় তো যে কোনো ভারতীয় পোষাক পরে ডিনারে আসতে পারবেন। আপনার উত্তরের অপেক্ষায় রহিলাম আমার waiting listএ আরো অনেক বন্ধু আছেন যাঁরা যেতে চান, কিন্তু আপনাকে আগে জানাতে চাই। প্রীতিনমস্কারান্তে

ভবদীয়

শ্রীঅমিয় চক্রবর্ত্তী

এই সাহিত্যিক উৎসবে যোগ দিবার আমার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল, কিন্তু অধ্যাপক চক্রবর্ত্তীর চিঠি যখন আসে তখন আমি ডাবলিনে কাজেই তাঁহার এই প্রীতির সুযোগ গ্রহণ করিতে পারি নাই।

তাই নিজেই শেষ চেষ্টা করিবার জন্য লণ্ডন পি. ই. এন আফিসে গেলাম আমি ভারতীয় পি. ই. এনের সভ্য—আমার নিজস্ব দাবী পেশ করিবার জন্য। সেক্রেটারী ছিলেন না অন্য একজন তরুণী বলিল যে আর কিছুতেই টিকিট পাওয়া যাইবে না কাজেই দুঃখিত হইয়া ফিরিতে হইল।

এই অবসরে এই বিশ্বজাগতিক সাহিত্যিক-গোষ্ঠির কথা কিছু বলিব। মানুষ তাহার মনস্বিতার জন্যই প্রগতির পথে আরোহণ করে। সাহিত্যিকেরাই জাতির চিন্তাধারা নিয়ন্ত্রিত করেন। এই সার্ব্বজনীন সাহিত্য-গোষ্ঠি দেশে দেশে ভেদ ও বৈষম্যের বেড়া ভাঙিয়া বিশ্বমৈত্রী এবং উদারতার বীজ বপন করিবে ইহাই ইহার শ্রেষ্ঠ অবদান। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন পি. ই. এন-এর একটা ভোজসভায় প্রসিদ্ধ অধ্যাপক গিলবার্ট মারে যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহা হইতে এই সংঘের আদর্শ ও প্রেরণার কথা আমরা বুঝিতে পারিব।

গিলবার্ট মারে বলেন :—"May I ask our Greek guests to remember what socrates says in calling for a panhellenic patriotism : "The name of Hellene is no longer a matter of race but of mind The people who have spared our education have more right to be called Greeks than those who share our blood" If that is so, may not you and I and other members of the P. E. N. Club put in a claim to share that name's glory ? The great common tradition, the common memory of splendid achievements and ideals, does more than mere racial decoret to unite the Greeks today with one another and with us, and to make us of the P. E. N Culb at least the poor relations of AEschyens and Plato."

এই সাহিত্যিক সঙ্ঘ বিশ্বের মনীষায় এই মহৎ আদর্শ সঞ্চার করিবার বিশেষ চেষ্টা করিতেছে। যাহারা মানুষের হীন পরিবেশে বিভ্রান্ত না হইয়া এই পৃথিবীতে স্বর্গ রচনা করিবার স্বপ্ন দেখে, সেই সমস্ত ভাব-বিলাসীদের এই মিলন নবযুগের সূচনা করিবে এই বিশ্বাস করি।

আজ চারদিকে রণ-তাণ্ডবের পৈশাচিক অট্টহাস্য—মানুষের মন সঙ্কুচিত ও বিষণ্ন না করিয়া পারে না। কিন্তু এই শূন্যতা, এই ক্লৈব্যই চরম কথা নয়। কিন্তু ধ্বংসের এই বিরাট যজ্ঞের মাঝ দিয়াই নবসৃষ্টির অভ্যুদয়, একথা কেবল সাহিত্যিকেরাই অনুভব করিতে পারেন এবং বলিতে পারেন। সাহিত্যিক স্রষ্টা—তাহার চিত্তের পরিধি অসীম। সেই অসীমতায় ক্ষণিকের এই মারণ-যজ্ঞ নিঃশেষ হইয়া যায়। বিশ্বের রথ চলিবে—সুখ দুঃখের চক্রনেমি পরিবর্ত্তিত হইবে—শুধু রহিবে সমস্ত সংঘাত, সমস্ত বিপদ এবং সমস্ত পরাজয়ের গ্লানির শেষে সৃষ্টির জ্যোতির্ম্ময় আনন্দ। স্রষ্টা বসন্তের মত প্রাচুর্য্যের অধিকারী—সমস্ত বাধার মাঝে সে আপন দক্ষিণ-পবনের গুঞ্জরণ পাঠাইয়া আনন্দোৎসব গড়িয়া তোলে। সাহিত্যিক চিরযাত্রী। আনন্দ-পথিক এই যাত্রীদের সম্মিলন ভাবী সংগঠনের দিনে কল্যাণকর বহু কাজ করিতে পারিবে ইহা সুনিশ্চিত।

ভারতবর্ষে মাদাম ওয়াদিয়া একটা P. E. N ক্লাব গড়িয়াছেন। বাংলায় ইহার শাখা ছিল। দুঃখের বিষয় ভারতীয় শাখা এবং বাংলা শাখার মধ্যে বিরোধ বাধিয়াছে। আশা করি এই বিরোধ শেষ হইবে।

ভারতবর্ষ নিজেই একটা বিরাট দেশ—ভারতবর্ষেই একটা সাহিত্যিক সঙ্ঘ গড়িয়া তোলা প্রয়োজন। ভারতের নানা ভাষায় যে সব লেখক রচনা করেন তাহাদের পরস্পর ভাব বিনিময় এবং আলাপ-পরিচয়ের সুযোগ হইলে দেশের ও জাতির বিশেষ উপকার হইবে। এ বিষয়ে ভারতীয় পি. ই. এনের অগ্রসর হওয়া বাঞ্ছনীয়।

লণ্ডন.আফিস হইতে বিফল মনোরথ হইয়া বাসায় ফিরিয়া শয়ন করিয়াই দিন শেষ করিলাম। দীর্ঘ ভ্রমণের ক্লান্তি ও অবসাদ পাইয়া বসিল। কালে বাসা পরিবর্ত্তন করিব—তাহার দুশ্চিন্তাও খানিক ছিল।

৩০শে সেপ্টেম্বর বুধবার। আর্য্য ভবনের নিকট ৪নং বেলসাইজ এভেনিউ একটা বোর্ডিং হাউস এখানে ভারতীয় ছাত্রেরই আড্ডা। আমার জিনিষপত্র লইয়া এখানে প্রবেশ করিলাম। আমাকে কে, সে, নম্বিবার নামক একজন মাদ্রাজী ডাক্তারের ঘরে বাসা ছিল। জিনিষপত্র রাখিয়া India office লাইব্রেরীতে বই ফিরাইতে গেলাম। বই ফেরত দিয়া কিছু নূতন বই আনিলাম। এখানে আহারের কিছু অসুবিধা হইতে-ছিল। আমি নিরামিশাসী, অবশ্য বিলাতী সংজ্ঞা অনুসারে। খাওয়ার বিশেষ ভাল ব্যবস্থা ছিল না। ল্যাডলেডি বলিল—আমি যদি থাকি সুব্যবস্থা করিবে। সে ভরসায় নির্ভর করিয়া থাকিতে পারিলাম না। Down side crescentএ এক রাশিয়ান পরিবারে একটা আসন খালি ছিল—সেখানে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া বাসায় ফিরিলাম।

নম্বিয়ার বেশ আলাপী। তাঁহার অবস্থা বোধ হয় সুবিধা নয়, অথচ কষ্ট করিয়া বিলাতে আসিয়াছেন। তাঁহার অধ্যয়ন স্পৃহা—নিজেকে বড় করিবার বাসনা আমার ভালই লাগিল। এই তপস্যার ভাবটি বাঙ্গালী ছাত্রদের মধ্যে দেখিবার সুযোগ হয় নাই। পাওয়ার ষ্ট্রীটে যাহাদের দেখিয়াছিলাম, তাহাদের চাপল্যই দেখিয়াছিলাম—সাধনায় সমাহিত দৃষ্টি চোখে পড়ে নাই। অবশ্য কেহ কেহ তাহাদের মধ্যে ভাল ছিল, কিন্তু সাধারণভাবে বাঙালী ছাত্রদের মধ্যে উচ্চাশা, তপস্যার অধ্যবসায়, সদাজাগ্রত ঔৎসুক্যের অভাবই লক্ষ্য করিয়াছি।

১লা অক্টোবর বৃহস্পতিবার। পরদিন সকালে উঠিয়া Down sde crescent বাসায় আসিলাম। বেলসাইজ এভিনিউর ল্যাডলেডি চমৎকার লোক বলিয়া মনে হইল। সে আপত্তি করিল না। ইচ্ছা করিলে স সপ্তাহের ভাড়া লইতে পারিত। সে তাহা লইল না। কলিকাতায় যে হাট কিনিয়াছিলাম—এভিনিউ বোর্ডিঙের ভৃত্য জিমকে দান করিলাম। সে খুসি হইয়া ধন্যবাদ জানাইল। Down side crescent ও Hampstead Heath Garden Suberb.

Hampstead Heath অনুর্ব্বর প্রান্তর—মাঝে মাঝে তরঙ্গ-দোলার মত উচ্চাবচ ভূমি, তৃণসমাকীর্ণ উপত্যকা, গুল্মসঙ্কুল বিস্তার লইয়া এই Heatte লণ্ডনের প্রিয় স্থান। ৮০৪ একর জমি সাধারণের বিচরণ ভূমি। ইহার চারিপাশে সহরতলী গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সহরতলী নগর পত্তনের চমৎকার দৃষ্টান্ত।

বাড়ীওয়ালী একজন রাশিয়ান বুড়ী—তাহার সঙ্গে তাহার একটী মেয়ে থাকিত। মেয়েটির কোনও ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে বিবাহ হইয়াছে। আমি যে কয়েকদিন ছিলাম, তাহার মধ্যে তাহার স্বামীকে কখনও আসিতে দেখি নাই। এই বাসাতে কমলাকর নামে একজন মারাঠী যুবক থাকিত। কমলাকর ও এই তরুণী রাত্রিদিন প্রণয়ী-যুগলের মত গুঞ্জন করিত। তাহাদের হাব ভাব দেখিয়া আমার খারাপ মনে হইত। বোধ হয় তরুণী এই যুবককে ফাঁদে ফেলিয়াছিল। বাসা পরিবর্ত্তন করিয়া অন্য কোথাও বাহির হইতে পারিলাম না। স্থানীয় odeon সিনেমা গৃহে ছবি দেখিতে চলিলাম।

দুইটি গল্প দেখাইল—প্রথমটার নাম where's Sally? একটি ধড়িবাজ লোক এক ভদ্রলোকের মেয়েকে বিবাহ করিল। এমন সময় তাহার পুরাতন সঙ্গী দাস তাহার দেখা পাইল। ইহারা মাতাল ও জুয়াচোর। ইহাতে যে ঘটনাচক্র গড়িয়া উঠিল, তাহার জাল হইতে সে কেবল মিথ্যা কথার চূড়ান্ত করিয়া পরিত্রাণ পাইল।

অন্য গল্পটিও লঘু, Magnetism শক্তি গ্রহণ করিয়া একটা লোক উদ্ভ্রান্ত হইল। তারপর ঘটনা-সংস্থানে সে এক বড়লোকের মেয়ের দৃষ্টিপথে পড়িল। এবং ভাগ্যচক্রে তাহাকে বিবাহ করিল।

দর্শকেরা বোধহয় এইসব লঘু চিত্র পরিবেশন করেন। দুইটি চিত্রই বিলাতী কোম্পানীর—আমেরিকার হলিউডের ছবির ঐশ্বর্য্যচ্ছটা ইহাতে নাই।

এখানের ঘরে বৈদ্যুতিক নলে গরম করিবার ব্যবস্থা নাই। গ্যাসের ব্যবস্থা আছে—তাহাই জ্বালাইয়া কিছু পড়াশুনা করিলাম। কমলাকর আসিল—সে আলাপী তাহার সঙ্গে নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইল।

২রা অক্টোবর শুক্রবার। কমলাকরের কথাই ভাবিতেছিলাম। তাহার ধীশক্তি, তাহার ভদ্রতা, তাহার আলাপ তাহাকে হয়ত জীবনে বড় হইবার সুযোগ দিতে পারিত। কিন্তু অধিকাংশ বিলাত-প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রের মত সে জীবনের আনন্দ-কৌতুককে বিসর্জ্জন দিতে পারে না। Gone with the wind নামক উপন্যাসের গ্রন্থকার মার্গারেট মিচেল চমৎকার কথা বলিয়াছেন—"The only difficulty was that by being just and truthful and tender and unselfish, one missed most of the joys of life and certainly many Bedwx. And life was too spert to miss such pleasant things—"

ভোগ-সর্ব্বস্ব চার্ব্বাক নীতি—সাধারণে এই আরামের পথকে শ্রেয় মনে করে, তাই ত চার্ব্বাক দর্শনের এক নাম লোকায়ত। অবশ্য ইহার অন্য একটা দিক আছে। মানুষ আনন্দ চায়। সৃষ্টির গভীর প্রেরণা আনন্দ হইতে জাত, তাই মানুষ আনন্দের জন্য ছুটাছুটি করে। আনন্দ পিপাসা তাই নিন্দনীয় নয়, কেবল মানুষ যাহা সত্যকার আনন্দ তাহা না জানিয়াই বিপথে গমন করে। আজ লণ্ডনের সহরতলী Worm wood Scrubs কায়দায় দেখিতে গেলাম।

লণ্ডনে প্রায় দশ বারটা কারাগার আছে। ইহাদের মধ্যে New-gate খুব প্রসিদ্ধ ছিল—এখানে বহু প্রাণ-দণ্ডের বীভৎস অনুষ্ঠান সংঘটিত হইয়াছে। এই কারাগার বোধহয় এখন আর নাই। ক্লার্কেন ওয়েলে কারাগার, ওয়াণ্ডসওয়ার্থ জেল হলওয়ে কারাগার বেশ নাম করা। The westminster House of connection, the Millbank Penitentiary, the Model Prison প্রভৃতি জেলগুলিতে আধুনিক মনোভাবজাত সংশোধনের ব্যবস্থা আছে। ক্রমশঃ



উপনিবেশ

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ইহার পরে ছয় মাসের মধ্যে গঞ্জালেস্ আর চর্ ইস্মাইলের খোঁজ খবর নিতে পারে নাই।

নদীতে জোয়ার-ভাঁটা চলিতে লাগিল অব্যাহত নিয়মে, বসন্তের স্পর্শে নদীর জল আরো বেশি করিয়া লবণাক্ত হইয়া আসিল। বিলে কল্মীর ফুল ফুটিল—শ্যাওলার মধ্যে বুনো-হাঁস চোখ বুজিয়া রোদ পোয়াইতে লাগিল, আর নদীর স্রোতে বহিয়া আনা প্রচুর পলি-মাটির সহায়তায় জীবন-কীটেরা নূতন উপনিবেশের বীজ রচনা করিয়া চলিল।

এম্নি একদিনে—এক বৈশাখী অপরাহ্নে উপনিবেশের উপর দিয়া কালো ঝড় ঘনাইয়া আসিল।

তাণ্ডব সুরু হইল নদীতে—ফেনার মুকুট তুলিয়া কালো কালো ঢেউ আসিয়া আছড়াইয়া পড়িল তীরের গায়ে। ধ্বংসাবশিষ্ট গীর্জাটার পাশে যেখানে রাশি রাশি গাছের শিকড় জলের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে, ওখানে ঝুর্ঝুর্ করিয়া মাটি জলে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে ফোঁটায় ফোঁটায় রক্তও চোঁয়াইতে লাগিল—জোহানের রক্ত।...

বর্মিদের বজরাটা ইহার মধ্যে কতদূরে চলিয়া গেছে কে বলিবে। ঝড়ের মুখে পাল তুলিয়া দিয়াছে তাহারা। তেঁতুলিয়ার মোহানা পার হইয়া, সমুদ্রের দোলায় দুলিতে দুলিতে তাহারা চলিয়াছে ইরাবতীর দেশে। সেখানে এখন পাহাড়ে পাহাড়ে ফুল ফুটিতেছে, প্যাগোডা হইতে ধূপের গন্ধ উঠিতেছে, শত শতাব্দীর নখর-চিহ্নকে অস্বীকার করিয়া বরাভয় বিতরণ করিতেছে ধ্যানমগ্ন শিলামূর্তি। ম্লান আলোয় চকিতের জন্য তাহাদের বজরায় লিসির ভয়ার্ত মুখখানা দেখা গেল, তারপরেই হয়তো তাহা দৃষ্টির বাহিরে চিরদিনের মতো গেল বিলীন হইয়া।...বর্মিটা হাসিতেছে। পর্তুগীজদের বীরত্বের আদর্শ হইতে যে শিক্ষা সে লাভ করিয়াছে—সে শিক্ষা এম্নি করিয়াই কাজে লাগাইল শেষ পর্যন্ত।

কিন্তু ঝড় চলিতেছে তেঁতুলিয়ায়। কালো অন্ধকার। ঈগলের মতো পাখা মেলিয়া বজরার দুর্দম গতি। দিক চক্রবালে দেখিতে দেখিতে মিলাইয়া গেল।

আর হরিদাস সাহার পান্সী নৌকা? এই প্রলয়-তুফানে তাহা নির্বিঘ্নেই পাড়ি জমাইতেছে কি? অথবা সৃষ্টি ছাড়া যাযাবরের সমস্ত যাত্রা আসিয়া শেষ হইয়া গেছে রাক্ষসী-নদীর মৃত্যু তাণ্ডবে? কেরামদ্দীর ভাবনা কোথাও যেন কূল পাইতেছিল না।

কিন্তু সব চাইতে কঠিন সমস্যা বোধ করিতেছিলেন কবিরাজ বলরাম মণ্ডল ভিষক্‌রত্ন।

মুক্তো উচ্ছ্বসিত ভাবে কাঁদিতেছে। খোলা জানালা দিয়া জলের ছাট তাহার সমস্ত মুখে ছড়াইতেছে, চুল বাহিয়া কপাল বাহিয়া বৃষ্টির জল গড়াইয়া পড়িতেছে আর তাহার সঙ্গে মিশিয়াছে চোখের জল। বৃষ্টিতে কাপড়টা ভিজিয়া দেহের সঙ্গে সংলগ্ন হইয়া গেছে—শরীরের রেখায় রেখায় নির্ভুলভাবে আসন্ন মাতৃত্ব।

বাইরে ঝড়ের বিরাম নাই। ঘরের মধ্যে ক্ষিপ্ত বাতাস ঢুকিয়া তাণ্ডব করিতেছে যেন—কিন্তু মুক্তোর তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই বিন্দুমাত্রও। আর বলরাম তাকাইয়া আছেন বজ্রাহতের মতো। ব্যাপারটা অসম্ভব কিছু নয়, এর চাইতে সঙ্গত এবং সম্ভব কিছুই নাই। তবু বলরাম কী বলিবেন ভাবিয়া পাইলেননা, কেবল মুক্তোর কাতর মুখটা তাঁহার দৃষ্টির সামনে জাগিতে লাগিল দুঃস্বপ্নের মতো।

বলরাম কহিলেন, কেঁদে কী হবে মুক্তো। ব্যবস্থা একটা তো করতেই হবে।

মুক্তোর চোখ জ্বলিয়া উঠিল, ব্যবস্থা! ব্যবস্থা আবার কী করবে! এই জন্যেই তুমি এত আদর করে আমাকে এখানে নিয়ে এসেছিলে, আমার সর্বনাশ করবার জন্যে?

—সর্বনাশ! তাই তো।

বলরাম ঘাড় এবং মাথা চুলকাইতে লাগিলেন। সর্বনাশ—তা বটে। বংশরক্ষা করাটা দেহধর্মের প্রধান কর্তব্য; বংশধরের মুখ দেখিয়া আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া ওঠে মানুষের মন। কিন্তু সেই বংশধর যে সময়বিশেষে কী ভয়ানক শত্রু হইতে পারে সেটা অনুভব করিয়া বলরাম অত্যন্ত স্নায়বিক উত্তেজনা বোধ করিতে লাগিলেন।

চর্ ইস্মাইলের এই নির্জন সমাজহীন দেশ—এখানে অনেক কিছুই সম্ভব হইতে পারে, কাজেই মোটের উপর একটা দুঃসাধ্য ব্যাপার কিছু নয়। কিন্তু—

মুক্তো আবার বিলাপ করিয়া কহিল, আমার তখনই সন্দেহ হয়েছিল আমার সর্বনাশ করাই তোমার মতলব। তবুও বিশ্বাস করেছিলুম, ভেবেছিলুম—

বলরাম চটিয়া গেলেন—পৌরুষটা বেশ সজাগ হইয়া উঠিতেছে এতক্ষণে। সব দোষ বুঝি তাঁহারই ঘাড়ে গিয়া পড়িল শেষ পর্যন্ত। এই সর্বনাশের জন্য মুক্তোর যেন কোনো দায়িত্বই নাই। গঙ্গাজলে ধৌত বিশুদ্ধ একটি তুলসীপত্র আর কি! তবু যদি সব কথা বলরাম না জানিতেন। দেশে থাকিতে সে যে কতগুলি ছেলের মাথা খাইবার উপক্রম করিয়াছিল সেটা তো আর জানিতে বাকী নাই কাহারও। ইহাকেই বলে কলিকাল!

বলরাম চটিয়া গেলেন—শুধু মুক্তোর উপরে নয়, সমস্ত পৃথিবীর উপরেই। কাহারো ভালো করিতে নাই জগতে, ভালোবাসিতে নাই কাহাকেও। এতদিন বেশ তো কাটিতেছিল, দয়া-পরবশ হইয়া মুক্তোকে আশ্রয় দিয়াই না এই বিভ্রাট ঘটিল। কী অন্যায় তিনি করিয়াছেন। শুধু আশ্রয় দিয়াছেন বলিলে কম বলা হয়,—মাথায় তুলিয়া রাখিয়াছেন বলিলেও যথেষ্ট বলা হয়না। কাপড় চোপড়, ভালো খাবার দাবার, এমনকি, দুচারখানা গয়না পর্য্যন্ত। বলরাম তো আর দেবতা নন যে কেবল দিয়াই চলিবেন, তাহার পরিবর্তে এতটুকু দাবী তাঁহার থাকিবেনা! মুক্তোর এমন রূপ-যৌবনও বৃথাই তো নষ্ট হইতেছিল।

ঝড় চলিতেছে সমানে। একটা অশ্রান্ত সোঁ সোঁ শব্দ আর ঘনাইয়া আসা তরল অন্ধকারে অতি তীব্র গতিশীলতা। হুড়মুড় করিয়া একটা নারিকেল গাছ ভাঙিয়া পড়িল বুঝি। তেঁতুলিয়ার জলে যে মাতন চলিতেছে, এখান হইতেও, তাহা যেন অনুভব করা যায়।

কিন্তু এই অবাঞ্ছিত আগন্তুক। মুক্তোর গর্ভে যে শিশু আসিতেছে তাহাকে লইয়া কী করা যাইতে পারে? বলরাম ভাবিতে লাগিলেন। মনের সামনে অনেকগুলি শিকড় বাকড়ের নাম খেলিয়া গেল, বলরামের কবিরাজী প্রতিভা জাগিয়া উঠিতেছে। এখন এই একটা মাত্র পথ খোলা আছে—কিছু হয়তো এতেই হইবে।

ঘরের মধ্যে অন্ধকার ঘনাইতেছে। ঝড়টা এইবারে থামিবে বোধ হয়—মুক্তো এখন একটা আলো জ্বালিয়া দিয়া গেলে পারিত। কিন্তু আজ আর আলো জ্বালিবার উৎসাহ নাই তাহার।

দরজায় জোর ধাক্কা পড়িল কয়েকটা।

বলরাম উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিতেই রাধানাথ প্রবেশ করিল। ভিজিয়া ভূত হইয়া আসিয়াছে। ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া দাঁড়াইতেই ছোটখাট একটা নদী বহিয়া গেল যেন।

বলরাম বিস্মিত হইয়া কহিলেন, কোত্থেকে এলি?

রাধানাথ কহিল, কোত্থেকে আবার আসব! দিদিমণি পাঠিয়েছিলেন,—পথে আসতে আসতেই ঝড়ে ধরে নিলে। একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়েছিলুম—হুড়মুড় ক'রে একটা মস্ত ডাল আমার গা ঘেঁষে পড়ল বাবু। আর দু হাত এদিকে পড়লেই রাধানাথের আর পাত্তা মিলত না।

—পাত্তা না মিললেই ভালো হত। কুঁড়ের বাদশা কোথাকার।

—আজ্ঞে আপনি তো বলছেন ভালো হত, কিন্তু রাধানাথের রাধা যে বিধবা হত, সে খেয়াল নেই বুঝি?

উত্তর-দায়ক ভৃত্যের রসিকতার দুশ্চেষ্টা দেখিয়া আরও ক্ষেপিয়া গেলেন বলরাম। কহিলেন, যা, যা, ফ্যাক্ ফ্যাক্ করিস্‌নি। কিন্তু দিদিমণি কোথায় পাঠিয়েছিল তোকে?

রাধানাথের স্বরেও এবার অসন্তোষ প্রকাশ পাইল, তুমি যে সদরের উকিলের মতো জেরা সুরু করলে বাবু, ভিজে কাপড়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে জবাব দেব শুনি? ওষুধ আনতে পাঠিয়েছিল।

—ওষুধ! কী ওষুধ?

—এই দেখ না,—রাধানাথ কোঁচড়টা খুলিয়া দেখাইয়া দিল। আধো অন্ধকারের মধ্যে দেখা গেল, একরাশ সবুজ উজ্জ্বল ফল বৃষ্টিতে ভিজিয়া তাহার কাপড়ের মধ্যে চিকচিক করিতেছে।

—কী ফলরে এগুলো? বলিয়া একটা ফল হাতে তুলিয়া লইতেই ভয়ে ও বিস্ময়ে বলরাম কথা কহিতে পারিলেন না। করবী ফুলের একরাশ গোটা। এগুলি ওষুধই বটে—ভবরোগের ওষুধ। কয়েকটা বাটিয়া খাইলেই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে নশ্বর দেহযন্ত্রণাটা বেশিক্ষণ ভোগ করিতে হয়না। বিসূচিকার লক্ষণ প্রকাশ পায়, কিছুটা রক্ত বমি হইয়া তারপরেই—ব্যাস্। মুক্তোর মতলব তাহা হইলে—

কথাটা ভাবিতে গিয়াও বলরামের মস্তিষ্কের সমস্ত কোষগুলি একসঙ্গে যেন ঝন্ ঝন্ শব্দ করিয়া বাজিয়া উঠিল। আত্মহত্যার মতলব আঁটিতেছিল মুক্তো! ব্যাপারটা কি এতদূর পর্যন্তই গড়াইয়াছে যে আত্মহত্যা না করিয়া তাহার হাত হইতে আর নিষ্কৃতি নাই!. কিন্তু পুলিশে একবার খবর পাইলে ফাঁসির দড়ি তাঁহারই গলায় আঁটিয়া বসিবে যে!

ব্যাপারটার সূচনামাত্র অনুধাবন করিয়াই রোষে বলরাম বিদীর্ণ হইয়া পড়িলেন।

—আমাকে ফাঁসিতে চড়াবি তোরা! হতভাগা উজবুক কোথাকার!

যাইবার জন্য পা বাড়াইয়াছিল রাধানাথ, কিন্তু বলরামের এই আকস্মিক বিস্ফোরণে থমকিয়া দাঁড়াইল।

—কী হয়েছে?

—কী হয়েছে? কী হয়নি তাই শুনি? উঃ, কী ভয়ানক লোক সব! তলে তলে এই সব কাণ্ড চলেছে!

—বকবক্ ক'রে মরো গে তুমি, আমি চললুম—রাধানাথ সত্যিসত্যিই চলিয়া গেল।

অন্ধকারের মধ্যে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন বলরাম। ব্যাপারটা অপ্রত্যাশিত রূপ লইতেছে। সন্তান আসিতেছে—আসুক না। যদি কোনোমতেই ঠেকানো না যায় তাহা হইলে গলা টিপিয়া মারিয়া তেঁতুলিয়ার জলে ফেলিয়া দিলেই চলিবে। এতো ফরিদপুর নয় যে চৌকিদার হইতে আরম্ভ করিয়া একেবারে বড়লাট পর্য্যন্ত ইংরেজের আইন সঙ্গীন্ খাড়া করিয়া আছে!

কিন্তু মুক্তো? জীবন সম্বন্ধে কেন সে এত তিক্ত হইয়া উঠিতেছে, কেন এমন আকস্মিকভাবে সে নিজেকে শেষ করিয়া দিতে চায়? দেশে গাঁয়েও তো এমন কত ঘটনা হয় বলরাম কি তাহা জানেন না? ডাক্তার কবিরাজের পিছনে কয়েকটা টাকা খরচ করিলেই তো যথেষ্ট। দিনকয়েক কানাঘুষা, সামান্য কিছু আলোচনা,—তাহার পরেই আর কোনো কলরব নাই। যেমন চলিতেছিল—তেমনি ভাবেই কাটিয়া চলে যথানিয়মে।

অন্ধকারে দাঁড়াইয়া মুক্তোর বৃষ্টিসিক্ত করুণ মুখখানির কথা ভাবিয়া বলরাম এই মুহূর্তে কেন যেন অত্যন্ত বেদনা বোধ করিতে লাগিলেন। হাজার হউক, মুক্তো তাঁহার আশ্রিত, একেবারে অতটা না করিলেও চলিত। কিন্তু সেই সমস্ত মুহূর্ত—রক্ত-তরঙ্গিত স্নায়ুতে সেই মূঢ় বিহ্বলতা। কতদিন যে বলরামের কাটিয়াছে শুষ্ক নিঃসঙ্গতায়, নারীসঙ্গহীন তীব্র একাকিত্বে। বলরাম ভীরু, বলরাম কাপুরুষ।

সেই ভীরু যখন তাহার চাইতেও ভীরুকে হাতের মুঠার মধ্যে পাইয়াছে, তখন তাহার মধ্যে অত্যাচারী পশুশক্তিটা দেখা দিয়াছে দ্বিগুণ রূপ লইয়া। যে দুর্বল চিরদিন সকলের কাছে লাঞ্ছনা স্বীকার করিয়াই আসিয়াছে, সে যখন তাহার চাইতে দুর্বলকে আয়ত্তের মধ্যে পায়, তখন ক্ষুধার্ত বাঘের মতো হইয়া ওঠে তাহার মূর্তি। সকলের কাছ হইতে যাহা সে পাইয়াছে, সে বস্তু একজনকেই সম্পূর্ণভাবে বর্ষণ করিয়া মানসিক ক্লীবত্বের ঋণমুক্ত হইতে চায় সে।

ঝড় থামিয়া গেছে সম্পূর্ণভাবে। শুধু শুকনো পাতার উপর থাকিয়া থাকিয়া ঝর্ ঝর্ শব্দে এক এক পশলা জল ঝরিয়া পড়িতেছে মাত্র। তেঁতুলিয়ার গর্জন আর শোনা যায় না। শুধু ঘরের মধ্যে মুক্তো এখনো নিতান্ত অকারণে ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছে। আর কাঁচ ভাঙা দেওয়াল ঘড়িটা ক্রমাগত টক্ টক্ করিতেছে—যেন অত্যন্ত জোরে, অত্যন্ত অস্বাভাবিক ভাবেই।

(ক্রমশঃ)

ফাউস্ট

কাজী আবদুল ওদুদ

দ্বিতীয় দৃশ্য

শহরের ফটকের সামনে

শহর থেকে দলে দলে বেরিয়ে আসছে নরনারী ঈস্টারের দিনে। ইতস্তত: ছুটেছে তারা, লক্ষ্য তাদের স্ফূর্তি—মদ খাওয়া হল্লা নাচগান। সুসজ্জিত বেশে বেরিয়েছে তরুণী ঝি-রা, তাদের সঙ্গে নাচতে চাচ্ছে কলেজের ছোকরারা; কলেজের ছোকরাদের টিটকারি দিচ্ছে মধ্যবিত্ত নাগরিক-কন্যারা তাদের এমন বিশ্রী রুচির জন্যে। ভিক্ষুক গান গেয়ে গেয়ে চাচ্ছে ভিক্ষা; সৈন্যরা গেয়ে চলেছে—

উচ্চচূড় দুর্গ যত
প্রাচীর উঁচু যার,
উন্নাসিক কন্যা সব
শোভার বাহার,
দুইই মোরা চাই—
লড়ি মোরা দুঃসাহসে
বেতন খাসা পাই।
... ...

ফাউস্ট বেরিয়েছে ভাগনারকে সঙ্গে নিয়ে। জনসাধারণকে এমন আনন্দরত দেখে সে বলছে—

বসন্তের প্রসন্ন দৃষ্টিতে
বরফের কবল থেকে মুক্ত হয়েছে ঝরণা ও নদী;
আশার রঙ লেগেছে উপত্যকায়,
বৃদ্ধ শীত এখন মুকুটহীন,
আশ্রয় নিয়েছে দুর্গম পর্বতে;
...সূর্য্য ফোটাবে ধরণীতে তার প্রিয় রঙ,
লাল নীল হরিৎ ফুল দেখা দেয়নি এখনো,
সেই অভাব পূরণ করছে সে নরনারীর রঙ বেরঙের
পোষাকে।

তারা দাঁড়িয়েছিল এক উঁচু জায়গায়। ভাগনারের দৃষ্টি জনগণের দিকে আকৃষ্ট করে ফাউস্ট বল্লে—

অন্ধকার ফটকের ভিতর দিয়ে
বেরিয়ে আসছে সুসজ্জিত জনগণ;
আনন্দে বেরিয়ে আসছে সূর্য্যালোকে—
প্রভুর অভ্যুত্থানের উৎসব তাদের আজ!
অনুভব করছে তারা নিজেদেরও অভ্যুত্থান—
তাদের নীচু আঁধার বাস-অযোগ্য গৃহ থেকে;
শ্রমের বন্ধন থেকে, দুশ্চিন্তা ও বিরক্তি থেকে;
বদ্ধ ভবন থেকে
শহরের সংকীর্ণ গলিঘুঁজি থেকে;
গির্জার গম্ভীর নৈশ উপাসনা থেকে
সবাই এখন উপস্থিত প্রসন্ন সূর্য্যালোকে।
দেখো দেখো কেমন ছুটেছে এরা
মাঠ ও বাগানের ভিতর দিয়ে দূরে দূরান্তে,
নদীর প্রশস্ত মন্থর বুকে
ভাসছে অগণিত সুদৃশ্য খেয়াতরী,
ডুবু ডুবু বোঝাই নিয়ে
ছাড়লো শেষ নৌকা।
দূরের পাহাড়ী পথ বেয়েও
নামছে রঙ বেরঙের পোষাক।
ঐ শোনো গ্রামের আনন্দ কোলাহল—
এই-ই জনগণের স্বর্গ!
এখানে আনন্দনিরত ছোট বড় সবাই;
এখানেই অনুভব করি আমি মানুষ—এখানেই বটে।

ভাগনার বল্লে—

গুরুদেব, আপনার সঙ্গে পায়চারি করা সৌভাগ্য,
তা থেকে পাই সম্মান উপকার দুইই।
কিন্তু একা হলে আমি এখানে আসতাম না,
কেননা স্থূল সব কিছুতে আমার বিতৃষ্ণা।
এই সব বেহালা বাজনা, চীৎকার, লাফালাফি
—ইতর লোকদের এই হল্লা—আমি ঘৃণা করি;
এদের চেঁচামেচি শুনে মনে হয় এদের পেয়েছে শয়তানে;
এই সব এদের আমোদ, এদের গান!

এর' পর কৃষকদের নাচ ও গান। উদ্দাম ভঙ্গিতে চল্লো তাদের প্রায় নির্দোষ স্ফূর্তি। নাচের শেষে একজন বৃদ্ধ কৃষক ফাউসটের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করে' বল্লে, তাঁর মতো পণ্ডিত যে তাদের উৎসবে পদার্পণ করেছেন এ তাঁর মহানুভবতার পরিচায়ক। সে ফাউসটকে নিবেদন করলে তাদের সব চাইতে ভাল পাত্রে টাট্‌কা-ঢালা মদ, বল্লে—এই পাত্রে যত ফোঁটা মদ আছে তত দিনের আয়ু তাঁর লাভ হোক। ফাউসট ধন্যবাদ জানিয়ে ও এদের স্বাস্থ্য কামনা করে পাত্র গ্রহণ করলে। কৃষক ফাউসটের পিতার গুণগান করলে, কত রোগীকে তিনি রোগমুক্ত করেছিলেন সে কথা বল্লে; সেবার মড়ক লাগ্‌লে যুবক ফাউসটও লোকদের কেমন আপ্রাণ সেবা করেছিলেন সে কথাও সে স্মরণ করলে, বল্লে, সেদিনে তিনি হয়েছিলেন যেন মঙ্গলদাতা ঈশ্বর। সবাই গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তার স্বাস্থ্য কামনা করলে। ফাউস্ট বল্লে—

মাথার উপরে যিনি আছেন তাঁকে নতি জানাও,
তিনিই সাহায্য করতে শেখান, সাহায্য পাঠান।

এদের পরিত্যাগ করে' কিছুদূর অগ্রসর হলে ভাগনার বল্লে—

মহাপুরুষ, আপনার মনে কি গভীর ভাবই না জেগেছে
জনগণের এই অকৃত্রিম সম্মান লাভ করে'!
কত ভাগ্যবান্ তিনি যাঁর প্রতিভা
যোগ্য করেছে তাঁকে এমন সম্মানের!
পিতা পুত্রের সসম্মান দৃষ্টি আকর্ষণ করে আপনার দিকে,
সবাই কৌতূহলী হয় আপনার সম্বন্ধে,
ঘিরে দাঁড়ায় আপনার চারদিকে,
বেহালা থেমে যায়, নাচ আরম্ভ হয় দেরীতে,
আপনি এগোলেন তারা দাঁড়ালো সারি দিয়ে,
সবাই টুপি তুলে অভিবাদন করলে আপনাকে
আর একটু হলেই তেমন সম্মান দেখানো হতো
যেমন সম্মান ভক্তরা নতজানু হয়ে দেখায়

পবিত্র "দেহ ও শোণিত সেবন" অনুষ্ঠানের
শোভাযাত্রার প্রতি।

আর একটু উপরে উঠে এক পাথরের উপরে তারা বসলে। ফাউসট বল্লে—

চিন্তায় তন্ময় হয়ে এখানে একা একা কাটিয়েছি বহু দিন—
অর্থহীন উপবাসে ও প্রার্থনায় তখন আমার জীবন
হয়েছিল ক্লিষ্ট।
তখন ছিলাম আশায় সমৃদ্ধ ও প্রত্যয়ে বলীয়ান,
সজল নয়নে দীর্ঘশ্বাসে কত আকুল প্রার্থনা জানিয়েছি
স্বর্গের দেবতার সমীপে
সেই দূরপ্রসারী মড়ক নিবারণের জন্যে!
জনগণের প্রশংসা এখন মনে হয় বিদ্রূপ;
যদি দেখতে পেতে আমার মন তবে বুঝতে
এই প্রশংসার কত অযোগ্য জ্ঞান করি
পিতা পুত্র উভয়কেই!
আমার সম্মানিত পিতার মস্তিষ্ক ছিল খেয়ালে ভরপুর,
সাধনায় ছিল না তাঁর ত্রুটি—কিন্তু নিজের ভঙ্গিতে।

তার পিতা ছিলেন সেইদিনের আল্‌কেমি-বিশারদ। বিচিত্রভাবে নানা বিরুদ্ধধর্মী দ্রব্যের মিশ্রণে তিনি তাঁর সহকারীদের নিয়ে কিরূপে ওষুধ তৈরী করতেন সে সব বর্ণনা করে ফাউসট বলছে—

ওষুধ হতো প্রস্তুত—রোগীর সমস্ত যন্ত্রণার
অবসান হতো অচিরে।
"কে কে ভাল হলো"—সে প্রশ্ন করতো না কেউ।
এমনি ভাবে ভয়ানক সব ওষুধ তৈরি করে'
এই উপত্যকা আর পাহাড়ের অঞ্চলে
আমরা হয়েছিলাম মারীর চেয়ে ভয়াবহ।
আমার দেওয়া বিষে মরেছে হাজার হাজার লোক,
আর আজ আমাকে শুনতে হচ্ছে যারা বেঁচে আছে
তাদের মুখ থেকে
সেই নির্লজ্জ ঘাতকদের প্রশংসা!

ভাগনার বল্লে—

কেন দুঃখ পাচ্ছেন এই চিন্তায়?
নিপুণ ভাবে অবিচলিত অধ্যবসায়ে
পূর্বপুরুষ থেকে পাওয়া শিক্ষাকে কাজে খাটানো ভিন্ন
মানুষ আর কি করতে পারে?
… … … … …

ফাউসট বল্লে—

সুখী সে যার অন্তরে আজো জাগে
ভুলের সমুদ্র থেকে ডাঙায় ওঠ্‌বার আশা!

কিন্তু এ প্রসঙ্গ ত্যাগ করে' সে তাকালো অস্তগামী সূর্য্যের মহিমার পানে—বাড়ী ঘর, গাছপালা, পাহাড়ের চূড়া, সব কেমন রঞ্জিত হয়ে উঠেছে সেই দৃশ্যের দিকে। তার মনে কামনা জাগ্‌লো যদি আকাশে উড়বার পাখা তার থাকতো তাহলে এই অপূর্ব দৃশ্য তার জন্য হতো। সে বল্লে—

হায় যে পাখা মনকে ওড়ায় আকাশে
তার এমন শক্তি নেই যে দেহকে টেনে তুলবে।
তবু প্রতি আত্মায় কামনা জাগে
সুদূরের জন্যে—
যখন নিঃসীম আকাশ থেকে
ভেসে আসে চাতকের তান,
যখন পর্বত চূড়া ও দেওদারের মাথার উপরে
পাখা মেলে ভাসে ঈগল,
প্রান্তর হ্রদ ও দ্বীপের উপর দিয়ে
উড়ে চলে সারস-বলাকা দূর দূরান্তের তীরে।

ভাগনার বল্লে—

আমার মনেও কখনো কখনো অদ্ভুত খেয়াল জাগে,
কিন্তু এমন খেয়াল জাগে নি কোনো দিন।
বন ও মাঠের দিকে তাকিয়ে শীগগিরই আসে ক্লান্তি,
পাখীর মতো পাখাতেও নেই আমার প্রয়োজন;
তা না হলে আনন্দে কেমন করে' সঞ্চরণ করতে পারি
পুঁথির পাতায় পাতায়, এক বই থেকে অন্য বইতে!
শীতের রাত্রি তখন হয় কত মধুর, তীব্র পুলক
সঞ্চারিত হয় প্রতি অঙ্গে! আর
যখন চোখের সামনে খুলে ধরি কোনো প্রাচীন তুলট
তখন যেন স্বর্গ নেমে আসে ভূতলে!

ফাউসট বল্লে—

কিছু পরিচয় পেয়েছে মনের একটি খেয়ালের,
অন্যটির কথা জানতে চেয়ো না কখনো!
হায়, আমার মধ্যে রয়েছে দুইটি মন,
একটি কেবলই বিরুদ্ধাচরণ করে অন্যটির।
একটি নিগূঢ় আসক্তিতে
জড়িয়ে ধরেছে জগৎ সংসারকে,
অপরটি ধূলি কুয়াসার স্তর সবলে ভেদ করে'
মাথা তুলতে চায় নির্মল আকাশে।

ফাউসট প্রার্থনা করলে নিকটে যদি আদেশপালনরত দেবযোনি থাকে তবে তারা তাকে নিয়ে যাক নূতনতর পূর্ণতর ক্ষেত্রে।—

যদি থাকতো আমার এমন মায়া-আবরণ
যার সাহায্যে যেতে পারতাম যেখানে খুশী,
তবে জগতের কোনো সম্পদের পরিবর্তে
—রাজার পোষাকের পরিবর্তেও—করতাম না তা বদল।

ভাগনার বল্লে, এমন ভাবে দেবযোনিদের ডাকা ভাল নয়, তাদের দ্বারা মানুষের নানা ব্যাধি নানা অনর্থ ঘটে। অন্ধকার হয়ে আসছিলো দেখে সে গৃহে ফিরতে চাইলে। এমন সময়ে ফাউসটের চোখ পড়লো দূরের একটি কালো কুকুরের উপরে—সেটি তাদের দিকেই আসছিল। ফাউসটের সন্দেহ হলো এটি কুকুর নয়, কিন্তু ভাগনার বল্লে এটি কুকুর ভিন্ন আর কিছুই নয়, শিক্ষা দিলে অনেক কিছু শিখতে পারবে।

তৃতীয় দৃশ্য

ফাউস্টের পাঠাগার

কুকুর সঙ্গে নিয়ে ফাউস্ট প্রবেশ করলে।
রাত্রির বাণী-ভরা স্তব্ধতা ফাউস্ট অনুভব করছে, তার মনে জাগছে—
এমন সময়ে উৎকৃষ্টতর আত্মা জাগ্রত হয়
আলোকের দেশে:
…কামনার নাগপাশ হয় শিথিল;
অন্তরে নতুন করে' জাগে মানবপ্রেম,
নতুন করে' জাগে ভগবৎ-প্রেম।

……আশা নতুন করে' হয় মঞ্জুরিত,
বিচার বুদ্ধি নতুন করে' হয় সবাক্ ;
সাধ যায় জীবন প্রবাহে ভাসতে,
জীবনের উৎস-মুখ খুঁজে পেতে।

কুকুর মাঝে মাঝে ঘেউ ঘেউ করে' উঠছে তাতে ফাউস্ট বিরক্ত হচ্ছে, তাকে বলছে থামতে—এই চীৎকারে আহত হচ্ছে তার নবলব্ধ শান্তি।

কিন্তু সে দুঃখিত হয়ে অনুভব করলে তার সেই শান্তি অন্তর্হিত হয়ে গেছে। সে ভাবলে অপৌরুষেয় বাণীর সহায়তায় সে ফিরে পাবে সেই শান্তি। এজন্যে খুলে নিলে নিউ টেস্টামেণ্ট আর তা থেকে অনুবাদ সুরু করলে তার মাতৃভাষা জার্মানে।

প্রথম লাইনটি নিয়েই সে মুশকিলে পড়লো। "আদিতে ছিল শব্দ" —কিন্তু "শব্দে"র কি এত মর্য্যাদা! সে ভাবলে 'শব্দে'র পরিবর্ত্তে বরং লেখা উচিত "চিন্তা"। কিন্তু আবার সে ভাবলে—চিন্তার কি সৃষ্টি করবার ক্ষমতা আছে? তখন সে ভাবলে, লেখা যাক "আদিতে ছিল শক্তি।" পরক্ষণেই তার মনে হোলো হয়ত মূলের অর্থ প্রকাশ পেল না। সে নির্মলতর উপলব্ধির জন্য প্রার্থনা করলে আর খুশী হয়ে লিখলে—"আদিতে ছিল কর্ম।"

কুকুর আবার চীৎকার করে' উঠলো। ফাউস্ট অপ্রসন্ন হয়ে বল্লে… দরজা খোলা আছে বেরিয়ে যাও…। কিন্তু সবিস্ময়ে সে দেখলে কুকুর সিন্ধু ঘোটকের মতো প্রকাণ্ড হয়ে উঠেছে—দেখতে কি ভীষণ! সে বুঝলে এ কোনো অপদেবতা। সে নানা মন্ত্র পাঠ করতে লাগলো। কুকুর ফুলতে ফুলতে হাতীর মতো প্রকাণ্ড হলো, শেষে হলো ধোঁয়ার কুণ্ডলী—তা থেকে বেরিয়ে পড়লো এক ভ্রাম্যমান বিদ্যার্থী; ফাউস্টকে সে বল্লে—

এত গোল কেন? প্রভুর কি হুকুম?
এইই মেফিস্টোফিলিস।

ফাউস্ট তার নাম জিজ্ঞাসা করলে। সে বল্লে—

এ খুব নগণ্য ব্যাপার
…তার কাছে "শব্দে"র প্রতি যার এত বিতৃষ্ণা :
যে সমস্ত বাহ্য চাকচিক্য পরিহার করে
দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছে অস্তিত্বের গভীরতার প্রতি।

ফাউস্ট তবু তার নাম জানতে চাইলে সে কোন্ শ্রেণীর অপদেবতা তা জানবার জন্যে। মেফিস্টো বল্লে—

সে সেই দুর্বোধ্য শক্তির অংশ
যার অভিপ্রায় সব সময়ে মন্দ, কিন্তু করে
সব সময়ে ভাল।

ফাউস্ট বল্লে—

এ হেঁয়ালির অর্থ?

মেফিসটো বল্লে—

আমি হচ্ছি সেই শক্তি যার কাজ অস্বীকার
করে' চলা!
আর খুব সঙ্গত ভাবেই ; কেন না শূন্য থেকে
সবের উদ্ভব, সেই শূন্যেই মিলিয়ে দেওয়া চাই সব ;
বেশী ভাল হতো যদি সৃষ্টি আদৌ না হতো।
তোমরা যার নাম দিয়েছ পাপ—
ধ্বংস—অর্থাৎ যা কিছু মন্দের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট—
আমার অধিবাস সে সবে।

ফাউস্ট বল্লে—

বলছ তুমি অংশ, কিন্তু দেখাচ্ছে ত তোমাকে পূর্ণাঙ্গ?

মেফিস্টো বল্লে—

যা সত্য তাই তোমাকে বলছি না বাড়িয়ে।
মানুষ—নির্বুদ্ধিতার "ক্ষুদ্র বিশ্ব"—চায় কিন্তু
নিজেকে পূর্ণাঙ্গ বলেই জানতে।
আমি অংশের অংশ, কিন্তু সেই অংশই
আদিতে ছিল সব,
—আদিম রাত্রি—যা থেকে জন্মলাভ করেছিল
আলোক—
সেই উদ্ধত আলোক আজ দাবি করছে সব জায়গা,
অধিকারচ্যুত করতে চাচ্ছে তার মাতা রাত্রিকে।
কিন্তু জিৎতে পারছে না যত চেষ্টাই করুক,
যুক্ত রয়েছে সে জড় দেহের সঙ্গেই :
নির্গত হচ্ছে জড় দেহ থেকে, জড় দেহকেই করছে সুন্দর,
জড় দেহই রোধ করছে তার গতি ;
তাই আমার বিশ্বাস, আর বেশী দেরী নেই,
জড়ের ধ্বংসের সঙ্গে ঘটবে তারও বিলোপ।'

ফাউস্ট বল্লে—

তোমার মহৎ উদ্দেশ্য অনুধাবন করতে পারছি!
পুরো ধ্বংস ত সম্ভবপর হবে না তোমার দ্বারা,
তাই আরম্ভ করেছ অল্প দিয়ে।

মেফিসটো দুঃখিত হয়ে স্বীকার করলে এই ধ্বংসের কাজে এ পর্য্যন্ত সে তেমন কৃতকার্য্য হয়নি, বিশ্ব সংসারের বেঁচে থাকবার শক্তি অদ্ভুত—

ভূমিকম্প ঝড় বন্যা আগ্নেয়গিরির উচ্ছ্বাস—
এ সবের পর আবার শান্তি নেমে আসে সমুদ্র
ও ধরণীর পরে!
আর সেই জাহান্নামী জীবজন্তু আর মানুষের পাল!
কি হবে আর তাদের সঙ্গে খেলা করে!
কতজনকেই না দিলাম সাবাড়!
কিন্তু আবার গজিয়ে ওঠে রক্তবীজের ঝাড়।

ফাউস্ট বল্লে—

চিরন্তনী সৃজনী শক্তির বিরুদ্ধে
নিষ্ঠুর ঘৃণায়
তুমি উত্তোলিত করেছ শয়তানী মুষ্টি,
বৃথা তোমার আস্ফালন!
বিপর্য্যয়ের অদ্ভুত সন্তান,
খুঁজে নাও বরং অন্য কোনো ব্যবসায়।

মেফিস্টো বল্লে—সে কথা পরে হবে, আপাততঃ সে চাচ্ছে বিদায়। সে বন্দী হয়েছে বুঝে ফাউস্ট তাকে ছাড়তে চাইলে না। কিন্তু মেফিস্টোর চেলারা বাইরে থেকে এক দীর্ঘ মন্ত্র আবৃত্তি করে' ফাউস্টকে ঘুম পাড়িয়ে দিলে, সেই অবসরে মেফিস্টো পালিয়ে গেল। এই মন্ত্র এক দীর্ঘ ছেলে-ভুলোনো ছড়া, এর দ্রুত ছন্দ-প্রবাহে ভেসে চলেছে ফল ফুল জল মেঘ ও আলোকিত আকাশের বিচিত্র দৃশ্য, সৌন্দর্য্য ও লালিত্যের বিচিত্র ইঙ্গিত—সেই সৌন্দর্য্য ও লালিত্য-প্রবাহে নিমজ্জিত হয়ে ফাউস্ট যেন পাবে তার দেহ মনের স্বস্তি। অনুবাদক বেয়ার্ড টেইলর বলেছেন, ছয় বৎসর ধরে' চেষ্টা করেও এর আশানুরূপ অনুবাদ তিনি দিতে পারেন নি, কেন না প্রধানতঃ বাক্‌ভঙ্গি ও ছন্দ-লালিত্য অবলম্বন করে' ফুটেছে এর সৌন্দর্য্যের মায়া।

বিহঙ্গ

(নাটিকা)

সমরেশচন্দ্র রুদ্র এম-এ

ইজিপ্টের একটা ফ্রণ্ট। দিকচিহ্নহীন মরুভূমির মত জায়গা। ব্রিটিশ পক্ষের সৈন্যদের এখানে ওখানে দেখা যাচ্ছে। বেলা অপরাহ্ন হলেও রোদের তেজ প্রচণ্ড। যুদ্ধের অন্য কোন লক্ষণ নেই, কেবল দূরবিক্ষিপ্ত গোলার শব্দ মাঝে মাঝে তীব্র হুইসিলের মত আসছে। একটা বড় ঢিবির পাশে দুটী বাঙ্গালী সৈন্য বসে গল্প করছে। এত অন্যমনস্কভাবে তারা গল্প করছে যে পেছনে যে আর একটি বাঙ্গালী সৈন্য ও তার সঙ্গে আর একটি বাঙ্গালী মহিলা এসে দাঁড়িয়েছে, তা তারা টের পায়নি।

কেশব। অমরবাবু!

অমর মুখ ফিরিয়ে দুজনকে দেখে যে ভাবে বিস্ময়ে আনন্দে চমকিত হয়ে উঠল, তা বোধহয় আর্মিষ্টিস্ ঘোষিত হয়েছে শুনেও ততটা হতে পারত না।

অমর। (খানিকটা বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে থেকে মহিলাটির প্রতি) সংজ্ঞা! তুমি!

সংজ্ঞা। হাঁ।

অমর। কেশববাবু!

কেশব। (হাসিমুখে) হাঁ, আমরা। দৃষ্টির ভুল নয়, সত্যি।

অমর। সত্যি! (অপর সৈন্যটির প্রতি) জীমূত, আমার স্ত্রী। আর ইনি আমার স্ত্রীর বড় ভাই কেশববাবু। সংজ্ঞা, আমার বন্ধু জীমূতবাবু, যাঁর কথা তোমাকে চিঠিতে কতবার লিখেছি। (সকলের নমস্কার)

কেশব। খুব আশ্চর্য হয়ে গেছেন, না?

অমর। আশ্চর্য? হাঁ, এ যে বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু এখানে আপনারা এলেন কি করে?

কেশব। দেখছেন না আমার ইউনিফর্ম? আপনাদের রেজিমেণ্ট এখানে চলে আসার পর আমি নাম লেখাই।

অমর। ও, একেবারে এত দূরে ঠেলে দিলে! উঃ, বাংলাদেশ কত দূর! কিন্তু সংজ্ঞা, তুমি কি বলে—

কেশব। ও কিছুতেই শুনবে না। আমার সঙ্গে জোর করে এল। এখানকার আর্মি সার্ভিসে ভর্তি করে দাও, নার্সের কাজ করবে।

অমর। আশ্চর্যের কথা। বাঙালী মেয়ে এমন সাহস করতে পারে! শুধু বাঙালী নয়, ভারতের অন্য কোনও মেয়ে যে যুদ্ধের কাজে ভারতের বাইরে গেছে, তা তো শুনিনি। জীমূত, তুমি শুনেছ?

জীমূত। কই, না তো।

কেশব। তাহলে কি হয়, সংজ্ঞা তো সাহস করে এসেছে। এখন আপনাদের অফিসারকে বলে একটা ব্যবস্থা করে দিন।

অমর। ব্যবস্থা করা কি সোজা কথা! সব সাদা চামড়া যে জায়গায়, সেখানে কালোর ঠাঁই হয় কি করে?

কেশব। চেষ্টা করে দেখুন, সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে এল, অমনি ফিরে যাবে? আসুন জীমূতবাবু, আমরা খানিকটা ঘুরে আসি।

জীমূত। চলুন। (জীমূত ও কেশব এগিয়ে চলল)

অমর। সংজ্ঞা!

সংজ্ঞা। কি?

সমর। ধন্য তোমার সাহস!

সংজ্ঞা। তোমাদেরই বুঝি সাহস থাকতে পারে, আর আমাদের পারে না?

অমর। তা বটে। এখুনি সেল পড়তে সুরু করলেই বুঝতে পারা যাবে সব. তখন পালাবার পথ পাবে না।

সংজ্ঞা। পালাবার পথই যদি খুঁজব, তাহলে এতখানি পথ এলুম কি জন্যে?

অমর। সেটা পথ, আর এটা ফ্রণ্ট, তা খেয়াল আছে তো?

সংজ্ঞা। তা আছে।

অমর। কিন্তু তোমাকে একটু রোগা রোগা দেখাচ্ছে কেন বল তো, অসুখ-বিসুখ করেছিল কিছু?

সংজ্ঞা। (অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে) না।

অমর। তবে কি? (চিবুক ধরে নিজের দিকে মুখ ফিরিয়ে) বল, কেন এত রোগা হয়ে গেছ।

সংজ্ঞা। সব কি ভুলে গেছ নাকি?

অমর। কি বল তো, আমার তো কিছু মনে পড়ছে না।

সংজ্ঞা। মনে আর কি করে পড়বে! মনে পড়বে বলেই তো ছুটে এলুম। কতদিন দেখিনি তোমায়।

অমর। তা সত্যি। উঃ, কতদিন হল বলতো, একবছর, না?

সংজ্ঞা। একবছর এখনও হয়নি। আজ ন মাস পাঁচদিন হল।

অমর। এত পরিষ্কার করে হিসেব রেখেছ মধুময়ী। মধুময়ী! কতদিন তোমায় আদর করে ডাকতে পাইনি। তোমার কাছে যাবার জন্যে আমার মনটা কত ছট্‌ফট্ করে জান? কিন্তু ছুটী পাওয়া মুস্কিল। যুদ্ধ মিটলেই ছুটে গিয়ে তোমার পাশে হাজির হব।

কামানের গর্জন থেকে থেকে শোনা যাচ্ছে

সংজ্ঞা। কবে যুদ্ধ মিটবে?

অমর। রণদেবতাই জানেন। ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাও, অচিরে যেন যুদ্ধের শেষ হয় এবং সেই সঙ্গে যুদ্ধের সমস্ত কারণের শেষ হয়, যাতে পৃথিবীতে আমরা সকলে স্থায়ী শান্তিতে বাস করতে পারি। জান, জীমূত আর আমি কি বলে রোজ প্রার্থনা করি?

সংজ্ঞা। আচ্ছা, জীমূতবাবুর কোনখানে বাড়ী?

অমর। কোনখানে আবার বাড়ী! বাংলা দেশে। এত সহস্র সহস্র মাইল দূরে এসে আমাদের সোনার-বাংলা মাকে ভাগ ভাগ করে দেখছ? তোমরা কাছে থাক, তাই বুঝতে পার না, এই দূরপ্রবাসী ছেলেদের কাছে মা আমাদের কি। হিন্দু নয়, মুসলমান নয়, খৃষ্টান নয়, আমরা সব নবকিশলয়-শ্যামা স্নেহময়ী বাংলা মায়ের সন্তান। কিন্তু দেখ, তুমি তো বললে না, কেন এত রোগা হয়ে গেছ।

সংজ্ঞা। আন্দাজ কর না কি।

অমর। আন্দাজ করব? (হঠাৎ চাপা হাসিমুখে) আন্দাজ করব? কি পুরস্কার দেবে বল।

সংজ্ঞা। বলই না দেখি আগে, তারপর তো।

অমর। তারপর তো? আচ্ছা। (যেন কিছু ভাবছে এইভাবে কিছুক্ষণ উপরের দিকে তাকিয়ে থেকে) কোন নতুন আত্মীয়ের শুভাগমন হয়েছে।

সংজ্ঞা হাসতে লাগল

ঠিক হয়েছে? দাও এবার পুরস্কার।

সংজ্ঞা। কিন্তু বলতে তো পারলে না, ছেলে না মেয়ে।

অমর। ছেলে না মেয়ে? (যেন সামান্য চিন্তা করে) ছেলে।

সংজ্ঞা। হল না, হল না।

অমর। হল না? বেশ, বলছি এবার। মেয়ে।

সংজ্ঞা। ঠিক। কঠিন প্রশ্নের কঠিন উত্তর দিয়েছো। ফুল মার্ক।

অমর। কতদিনের হল? আমার কাছে একটু খবর পর্যন্ত দাওনি?

সংজ্ঞা। এই দেড়মাস হল। তোমাকে খবর দেওয়া হয়নি এইজন্যে যে আমরা ভাবছিলুম, তুমি আসবে, আসবে। গিয়ে একেবারে আশ্চর্য হয়ে যেতে, বেশ মজা হত।

অমর। সংজ্ঞা!

সংজ্ঞা। কি?

অমর। ভাবছি, এতদিন কি করে ছেড়ে ছিলুম তোমায়। আচ্ছা দেখ, আমার চিঠি পাবার জন্যে তুমি একটু চঞ্চল হতে, না?

সংজ্ঞা। (বাঁকা হাসিমুখে) হুঁ, বেশী হতুম না, সামান্য একটু হতুম।

অমর। কিন্তু আমি তোমার চিঠির জন্যে কত ব্যাকুল হয়ে থাকতুম জান? সমস্ত মনটা যেন ভিখারীর মত রাস্তার ধারে চিঠির জন্যে ভিক্ষা-পাত্র হাতে নিয়ে আকুল নয়নে চেয়ে থাকত। সংজ্ঞা, বাংলা দেশ থেকে একখানিও চিঠি যদি এসে হাজির হয়, তাহলে আমাদের ভেতর কি হল্লোড় পড়ে যায়, তা তুমি আন্দাজ করতে পারবে না। সবাই চীৎকার করে উঠে, ওরে ভাই, একবার হাতে দে, তোর ধন, পরে তুই বুকে করে রাখিস, এখন একবার দেশের মাটীর গন্ধ পেতে দে, বাংলা মায়ের একটু স্পর্শ পেতে দে। হাঁ, তারপর বল, আমার মেয়ের কি নাম রেখেছ।

সংজ্ঞা। আমার মেয়ের বলছ যে? তোমার মেয়ে নাকি?

অমর। বাব্বা, তোমার তো সাহস কম নয় দেখছি, মেয়ের বাবাকে উড়িয়ে দিতে চাও!

সংজ্ঞা। কি সুন্দর হয়েছে দেখবে একবার। মা নাম দিয়েছেন কস্তুরী।

অমর। কস্তুরী? তাহলে বাড়ী ঢুকতে না ঢুকতেই আমি মেয়ের গায়ের সৌগন্ধ পাব বল।

সংজ্ঞা। আচ্ছা এই যে দিনরাত এত গোলাগুলির শব্দ, তাতে তোমাদের কষ্ট হয় না?

অমর। কষ্ট? হাঁ, প্রথম প্রথম কিছু হত, তারপর সয়ে গেল। সংজ্ঞা, যুদ্ধক্ষেত্রে যারা থাকে, তাদের কাছে গোলাগুলির শব্দও তেমন কিছু নয়, মৃত্যুও তেমন কিছু নয়, তাদের কাছে ভয়ের একমাত্র জিনিস হচ্ছে, মরণোন্মুখের অসহায় কাতরানি।

হঠাৎ প্রতিপক্ষের এক ঝাঁক এরোপ্লেনের শব্দ আসতে লাগল, তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মিত্রপক্ষের বিমানবিধ্বংসী কামান শব্দমুখর হয়ে উঠল

(ব্যস্ত হয়ে) জার্মান প্লেন আসছে সংজ্ঞা।

সংজ্ঞা। জার্মান প্লেন?

অমর। হাঁ। ছুটে এস তাড়াতাড়ি, ওই ঢিবির পাশে গিয়ে শুয়ে পড়তে হবে।

সংজ্ঞা। শুয়ে পড়তে হবে?

অমর। হাঁ, নাহলে দেখতে পাবে। চলে এস তাড়াতাড়ি। (সংজ্ঞার হাত ধরে ছুটতে ছুটতে চলল। এরোপ্লেনের শব্দ ও সেল পড়ার শব্দ তীব্রভাবে আসছে। অমর ও সংজ্ঞা ঢিবির পাশে গিয়ে শুয়ে পড়ল।) উপুড় হয়ে শোও। ভয় করছে সংজ্ঞা?

সংজ্ঞা। ভয় কি, তুমি আছ।

অমর। এই তো চাই। এমন দৃঢ়তা না থাক্‌লে কি আর আমরা বড় জাত হয়ে দাঁড়াতে পারব।

মাথার উপরের আকাশে তখন দুপক্ষের এরোপ্লেনের যুদ্ধ সুরু হয়েছে। গোলাগুলির বিস্ফোরণে চতুর্দ্দিক প্রায় অন্ধকার

আমাদের ফুলশয্যার রাত্রি মনে পড়ে সংজ্ঞা? আজ আমাদের নতুন করে ফুলশয্যা।

কিছুদূরে একটা সেল পড়ে সুতীব্র শব্দ করে উঠল

সংজ্ঞা। তুমি আমার হাতে হাত দাও।

অমর। কেন? ভয় হচ্ছে?

সংজ্ঞা। ভয় নয়, ভাবনা। মরবার সময় তোমার অঙ্গ স্পর্শ করে যেন শেষ নিঃশ্বাস ফেলতে পারি।

এক হাত বাড়িয়ে দিতে অমর এক হাত দিয়ে ধরলে

অমর। সেজন্যে ভাবনা নেই, মরলে তুমি একা মরবে না, যুগলে মরব। এত কাছাকাছি রয়েছি, সেলের সে ভব্যতা জ্ঞান আছে, দুজনকেই নিমন্ত্রণ করবে।

হঠাৎ অতি দুরন্ত শব্দে একটা বিস্ফোরণ হল। সংজ্ঞা ভীষণভাবে চমকে চেয়ে দেখে, কোথায় ইজিপ্ট, আর কোথায় সে! শিশু কন্যাটিকে পাশে নিয়ে পিত্রালয়ের একটি কক্ষে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল দুপুরবেলা; ঘুম ভেঙ্গে চেয়ে দেখে, মেয়েটি কাঁদছে। মেয়েটিকে থামাবার চেষ্টা না করে সংজ্ঞা আবার চোখ বুজল ফ্রণ্টে পৌঁছুবার জন্যে। মনের মত শরীর কি উড়তে পারে না?

ধ্বনিয়া উঠিছে আকাশে বাতাশে ক্ষুধিতের ক্রন্দন

শ্রীগোপালচন্দ্র সাধু

'কবি-চোখে' নয় দেখিয়াছি যাহা অতি বাস্তব রূপে
তাদের বেদনা কাহিনী শোনায় মানুষেরে চুপে চুপে!
বিলাসমত্ত মহানগরীর পথ বেয়ে চলা কালে—
দেখি এক নারী গ্রীষ্ম দুপুরে চলেছে আপনা ভুলে।
সংগে তাহার তিনটি পুত্র, শিশু-সন্তান কোলে—
সাজি ভোলানাথ, উলংগ হোয়ে, মায়ের সংগে চলে।
জননী তাদের মলিন জীর্ণ সাত হাত চীর পরে,
কোন মতে নিজ লজ্জা ঢাকিয়া ভিখ্ মাগে দ্বারে দ্বারে।
যে দেশে নারীর হেন অপমান দুচোখে দেখিতে হয়—
'সভ্য' বলিয়া তখনও জানাই আমাদের পরিচয়!
কাঁদে কোন পিতা সন্তানে হেরি,—ক্ষুধিত ক্লিষ্ট মুখ,
'দাও ভগবান দুমুঠি অন্ন, ভরুক তাদের বুক।'

পাগলের মত ছুটা-ছুটি করে নগরের অলিগলি,
যারে দেখে তারে বলে—'ভিখ্ দাও, ক্ষুধার যাতনা ভুলি।'
মন্দির হেরি থমকি দাঁড়াল শুভ্রাবসনা নারী;
ডাকে ভগবানে ডেকে নাও পদে, আর না সহিতে পারি!
বড়ই বেদনা, বড় হাহাকার, গৃহে মোরা উপবাসী—
শেষ করে দাও আমাদের প্রাণ, কেড়ে নাও দুঃখ রাজি।
'ডাষ্টবিন'গুলো ময়লা গিলিয়া সেজেছে নরকপুরী—
ভিখারী তাহার লোল চাহনীতে সেথানে করিছে চুরি!
দিকে দিকে আজ শুনি ক্ষুধিতের বুককাটা ক্রন্দন—
নিঃস্ব, রিক্ত, ব্যথা-বেদনার নাগপাশ বন্ধন!
তুমি কি দেখেছ অভিশাপ বিষে বাতাস হোয়েছে ভারী?
এস ভগবান, বাঁচাও ক্ষুধিত পৃথিবীর নরনারী!

ক্রুক্‌স সাহেবের অধ্যাত্ম ও প্রেততত্ত্ব বিষয়ে গবেষণা

শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র (এটর্ণী)

[সার উইলিয়ম ক্রুক্স্ এফ, আর, এস্ (জন্ম ১৮৩২—মৃত্যু ১৯১১) একজন জগৎবিখ্যাত অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন বড় বৈজ্ঞানিক ছিলেন। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার সুবিধার জন্য যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকরণেও তাঁহার বিশেষ কৃতিত্ব ছিল। তিনি একাধারে বড় রসায়নশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা ও জ্যোতিষশাস্ত্রবিদ্ ছিলেন। থেলিয়াম্ নামক ধাতু তিনি আবিষ্কার করেন। তিনি কত শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ছিলেন তাহা নিম্নলিখিত বিবরণ হইতে পাঠক পাঠিকারা বুঝিতে পারিবেন। হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের জগদ্বিখ্যাত রেডিওলজির অধ্যাপক লেনার্ড সাহেব জার্মান ভাষায় (তাহা ইংরাজীতে অনুবাদিত হইয়াছে) খৃঃ পূঃ ছয় শতাব্দী হইতে বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দীর আরম্ভ পর্য্যন্ত যত বিজ্ঞান শাস্ত্রের আবিষ্কর্ত্তা ও উন্নতিকারক পাশ্চাত্য পণ্ডিত জন্মিয়াছেন তাহাদের সকলের গবেষণা পাঠ করিয়া মাত্র ৬৭ জনকে সর্ব্বোচ্চ বিবেচনা করিয়া তাহাদিগের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত ও কৃতিত্বের কথা লিখিয়াছেন—তাহারা কিরূপ শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ছিলেন তাহার ভিতর কতকগুলির নাম দেখিলেই বুঝা যায়। যথা—ইউক্লিড, আর্কিমিডিশ, কপার্নিকাস্, গ্যালিলিও, ওয়াট, কাভেণ্ডিশ্, গ্যালভানি, কেপ্‌লার, নিউটন, ফ্যারাডে হেম্মহোল্টস্, টমশম্, কেলভিন, ডারউয়িন, ম্যাক্সওয়েল, হার্ট্‌স্—তাহাদেরই ভিতর ক্রুক্‌স্ সাহেবকে স্থান দিয়াছেন ও তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গবেষণা সকলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ কিরূপে পরবর্ত্তী বৈজ্ঞানিকদিগের নূতন নূতন আবিষ্কারের পথ প্রদর্শক হইয়াছে তাহাও লিখিয়াছেন। তাহার প্রদর্শিত পথে পরে এক্স্ রে (x-ray) আবিষ্কার হইয়াছে, পরমাণুর (atom) ভিতরের অনেক তথ্য আবিষ্কারও হইয়াছে।

জড় প্রকৃতির অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়া তিনি যেমন কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন ও নূতন আবিষ্কারের পথ পরিষ্কার করিয়াছেন আধ্যাত্মিক শক্তি সম্বন্ধেও বৈজ্ঞানিকদিগের ভিতর তিনিই প্রথমে আমাদিগের অন্তর্নিহিত যে অনেক প্রকার আধ্যাত্মিক আশ্চর্য্য শক্তি আছে তাহা বৈজ্ঞানিক সতর্কতার সহিত পরীক্ষা করিয়া ইংলণ্ডের রয়াল সোসাইটিতে এক প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠান এবং যেরূপ সতর্ক পরীক্ষা করিয়াছিলেন তাহার বিবরণও দেন। কিন্তু এই শক্তির প্রকাশ এত আশ্চর্য্যজনক ও তৎকালে প্রাকৃতিক শক্তি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদিগের যে বদ্ধমূল ধারণা ছিল তাহার বিরুদ্ধ বলিয়া তখনকার অনেক বড় বড় বৈজ্ঞানিকরা (স্যার উইলিয়ম ওয়ালেস্ ব্যতীত) তাঁহাকে অবিশ্বাস করেন ও তাঁহার প্রবন্ধ অগ্রাহ্য করেন। অনেকে বলিতে লাগিল যে তিনি প্রতারিত হইয়াছেন—তাঁহার নির্ভুল পরীক্ষার অনেক কল্পিত ভুল ও দোষ আছে—তাঁহাকে অপদস্থ করিবার চেষ্টারও ত্রুটি হয় নাই। কিন্তু তিনি তাহাতে দমিবার পাত্র নন্—তাঁহার পরীক্ষার যে কোন ভুল নাই তাহা দেখাইয়াও পরে তিনি আরও যে সকল অত্যাশ্চর্য্য আধ্যাত্মিক শক্তির প্রকাশ দেখিয়াছিলেন ও প্রেতাত্মার অস্তিত্ব সাপেক্ষ যে সকল অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিতে দেখিয়াছিলেন তাহা ১৮৭৪ সালে প্রকাশ করেন। সেই পুস্তক এখন দুষ্প্রাপ্য। তাঁহার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার সবিশেষ বিবরণ ও অন্য বৈজ্ঞানিকদিগের সহিত ঐ সম্বন্ধে যে সকল পত্রাদি লিখিত হইয়াছিল তাহা বাদ দিয়া এই অনুবাদ প্রকাশ করিতেছি।

এই পুস্তক প্রকাশের ফলে ও তাহার সনির্ব্বন্ধ প্ররোচনায় অনেকেই ঐ সকল তত্ত্ব অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন ও সকলেই—অনেক পরবর্ত্তী জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণ ঐ সকল তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সকলেই ক্রুক্‌স্ সাহেবের পরীক্ষার যথার্থতা স্বীকার করিয়াছেন—পাশ্চাত্য সকল দেশেই বহু অধ্যাত্ম ও প্রেততত্ত্ব অনুসন্ধান সমিতি হইয়াছে—সেই অনুসন্ধানের ফল নিয়মিত প্রকাশ হইয়াছে—বহু সহস্র পুস্তক বাহির হইয়াছে—আরও আমাদের অন্তর্নিহিত অনেক নূতন প্রকার শক্তি আছে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। ইংরাজী শিক্ষিত অনেকেই পরকাল আছে ও আমাদিগের অন্তর্নিহিত অনেক অসাধারণ শক্তি আছে তাহা বিশ্বাস করা প্রাচীনপন্থিদিগের কুসংস্কার প্রসূত বলিয়া মনে করেন—তাহারা এখন যে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দির প্রায় শেষ পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদিগের অধিকাংশ জড়বাদী ছিলেন—অর্থাৎ কোন বিশেষ প্রকার জড় সমাবেশে জীবনের ও চিৎশক্তির আবির্ভাব হইয়াছে তাহাই সত্য বলিয়া মনে করেন; কিন্তু সেই মতবাদ এখন অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদিগের দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়াছে তাহাও হয় তো জানেন না। কিন্তু সেই ভুল বিশ্বাসবশে তাহারা হিন্দুর কৃষ্টি, হিন্দুর সামাজিক নিয়মাদি ও জীবনযাপন প্রণালী যাহা আমাদিগের অন্তর্নিহিত সম্যক উদ্বোধিত আধ্যাত্মিক শক্তিলব্ধ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত—তাহা উপেক্ষা করায় আমাদিগের জীবনে সর্ব্বত্রই ঘোর বিরোধ, বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি হইয়াছে—আমাদিগের দুর্গতি বাড়িতেছে। তজ্জন্য ক্রুক্স সাহেব আধ্যাত্মিক শক্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিরূপ প্রমাণ পাইয়াছিলেন ও তাহা কিরূপ আশ্চর্য্যজনক ও কত ভিন্ন প্রকারের তাহার অনুবাদ প্রকাশ করিলাম। পাঠকবর্গ দেখিবেন যে তাঁহার এই সকল গবেষণা কিরূপ পাতঞ্জলের যোগশাস্ত্রে লিখিত যোগবিভূতির সত্যতা সমর্থন করিতেছে।]

ক্রুক্‌স্ সাহেবের প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণা

যে অজানা দেশ সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত নানারূপ বিকৃত জনশ্রুতি মাত্র শ্রুত হইয়াছে, এরূপ কোন সুদূর অপরিজ্ঞাত দেশের প্রকৃত তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে হইলে পর্য্যটক যেরূপভাবে অগ্রসর হইতে থাকে তেমনি আমি বিগত চারি বৎসর ধরিয়া এ পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিকদিগের প্রায় সম্পূর্ণ অজানা একটি প্রাকৃতিক জ্ঞানের ক্ষেত্রের তত্ত্ব নির্ণয়ের চেষ্টায় নিযুক্ত আছি। অজানা দেশের সমস্ত প্রাকৃতিক ঘটনা, যাহা সেখানকার লোকেরা ক্রুদ্ধ দেবতার ক্রীড়া বলিয়া মনে করে—পর্য্যটক যেমন তারই মধ্যে প্রাকৃতিক নিয়ম ও প্রাকৃতিক শক্তির বিকাশ দেখিতে পায়—তেমনি সে সব বিষয় জনসাধারণ অলৌকিক বা একান্ত স্বেচ্ছাচারী, অপ্রাকৃতিক, অস্থূল শরীরী প্রাণীদের কার্য্য মাত্র মনে করে, সেগুলি আমি প্রাকৃতিক শক্তির দ্বারা ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছি। পর্য্যটনের সুবিধার জন্য পর্য্যটক যেমন বিভিন্ন জাতির সর্দ্দার ও ভিষকদিগের সহৃদয়তা ও সাহায্যের উপর নির্ভর করে, তেমনই আমি যে শক্তি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে অগ্রসর হইয়াছি সেই শক্তি যাহাদের অধিক আছে তাহাদের সাহায্য পাইয়াছি। এমন কি তাঁহাদের মধ্যে অনেকের সহিত গভীর সৌহার্দ্দ্য জন্মিয়াছে ও তাঁহাদের অকৃত্রিম আতিথ্যও উপভোগ করিয়াছি। পর্য্যটক যেমন সুবিধামত—মাঝে মাঝে তাহার ভ্রমণ কাহিনী অতি সংক্ষিপ্তভাবে গৃহে লিখিয়া পাঠায়—এবং ঐ সব কাহিনী নিতান্ত বিচ্ছিন্ন ভাবে লেখার জন্যও—কিরূপ অবস্থায় সেই সকল ঘটনা ঘটে তাহার বর্ণনা না থাকায়, প্রায়ই অবিশ্বাস-যোগ্য বা হাস্যাস্পদ বলিয়া মনে হয়—তেমনি আমি পূর্ব্বে দুইবার দুইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা প্রকাশ করি; কিন্তু জনসাধারণের কাছে পূর্ব্বোক্ত প্রকার কোন ভূমিকা ও অন্য জানা তথ্যের সহিত তাহা কেমন খাপ খায়—না দেওয়ায় উহা বিশ্বাসযোগ্য হয় নাই। শুধু তাহাই নহে, জনসাধারণ এইরূপ কোন বিষয় বিশ্বাস

করিতে প্রস্তুত না থাকায়, অনেক গালিগালাজও খাইতে হইয়াছে। অবশেষে পর্য্যটক যেমন ভ্রমণান্তে ফিরিয়া আসিয়া তার পর্য্যটনের বিক্ষিপ্ত কাহিনী বাছিয়া গুছিয়া একত্র করিয়া ধারাবাহিকরূপে জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করে, আমি তেমনি আমার অনুসন্ধানান্তে উহার বিশদ কাহিনী সর্ব্বসাধারণের কাছে প্রকাশ করিতেছি। আমি যে সমস্ত ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতেছি তাহা এত অসাধারণ ও আমাদের বৈজ্ঞানিক ধারণার বিরুদ্ধ—বিশেষতঃ যখন তাহা এতাবৎ কাল সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত অপরিবর্ত্তনশীল মধ্যাকর্ষণ শক্তির নিয়মের বিরুদ্ধ, তজ্জন্য যদিও আমার বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে তাহা অসম্ভব বলিয়া বিশ্বাস করিবার প্রতিকূল—তথাপি তাহা আমার পূর্ব্ব সংস্কারের বিরুদ্ধ বলিয়া আমার চক্ষু ও স্পর্শেন্দ্রিয়ের সাক্ষ্য—যাহা অন্য সকল উপস্থিত ব্যক্তির চক্ষুও স্পর্শেন্দ্রিয়ের সাক্ষ্য দ্বারায় সমর্থিত—তাহা মিথ্যা নয়। *

কিন্তু একটি ঘরে যত লোক আছে—যাহারা সকলেই বুদ্ধিমান ও অন্য সকল বিষয়ে প্রকৃতিস্থ বলিয়া স্বীকৃত তাহারা যদি কতকগুলি আশ্চর্য্য ঘটনার প্রত্যেক খুঁটিনাটির পর্য্যন্ত সত্যতা একমত হইয়া স্বীকার করে, তাহা হইলে তাহারা সকলেই তৎকালে একটা সাময়িক পাগলাম বা ভ্রান্তির দ্বারায় অভিভূত হইয়া ঐরূপ একমত হইয়া তাহা বলিতেছে বলাই, আমার মতে, ঐ সমস্ত বিস্ময়কর ঘটনা অপেক্ষা অসঙ্গত।

বিষয়টি প্রথমে যাহা মনে হয় তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক বড় ও জটিল। চারি বৎসর পূর্ব্বে ভাবিয়াছিলাম যে, যে সমস্ত বিস্ময়কর ঘটনা সম্বন্ধে নানারূপ কথা শুনিতে পাই, তাহা বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণের পরীক্ষায় টিকে কিনা দেখিবার জন্য অবসর সময়ের দুই একটি মাস দিলেই যথেষ্ট হইবে। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই মনে হইল, ইহার মধ্যে 'কিছু আছে'—নিরপেক্ষ অনুসন্ধানকারী ব্যক্তিই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন।

আমি যখন প্রাকৃতিক নিয়মান্বেষী তখন এই সমস্ত ঘটনা যে সিদ্ধান্তেই লইয়া যাউক না কেন, আমি আরও অধিক অনুসন্ধান হইতে নিবৃত্ত হইতে পারি নাই। এইভাবে কয়েক মাস কয়েক বৎসরে দাঁড়াইল এবং যদি আমার ইচ্ছামত সময় দিতে পারিতাম তবে আরও দীর্ঘকাল আমি এই সকল তত্ত্ব অনুসন্ধানে দিতাম। কিন্তু অন্যান্য বৈজ্ঞানিক ও সাংসারিক বিষয়ে আমার মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক হওয়ায়, এবিষয়ে আমার অনুসন্ধান সম্বন্ধে যেরূপ সময় দেওয়া আবশ্যক তাহা দিতে পারিলাম না। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে কিছুকাল পরে এ বিষয়ে অন্য বৈজ্ঞানিকেরা অনুসন্ধান করিবেন। বিশেষ, আমার আর পূর্ব্বের মত সুযোগ সুবিধা নাই, এখন মিষ্টার ডি, ডি, হোম্‌এর স্বাস্থ্য ভাল নাই। মিস্ কেট ফক্স (এক্ষণে মিসেস্ জেন্‌কেন্) পারিবারিক ও মাতৃত্বের কর্ত্তব্যের জন্য ব্যাপৃত হইয়াছেন; এজন্য আমার অনুসন্ধান সম্প্রতি বন্ধ রাখিতে বাধ্য হইলাম। *

যে সম্বন্ধে আমি পরীক্ষা করিতেছিলাম, সে বিষয়ে যাঁহারা যথেষ্ট ক্ষমতাশালী ব্যক্তি তাঁহাদের কাছে অবারিত দ্বারের অনুগ্রহ সাধারণতঃ বৈজ্ঞানিকেরা আশা করিতে পারে না। প্রেততত্ত্ব বা আধ্যাত্মিক তত্ত্ব অনুবর্ত্তীদিগের মধ্যে অনেকেই উহা ধর্ম্মবিশ্বাসের অন্তর্গত মনে করেন। অনেক ক্ষেত্রেই পরিবারস্থ তরুণবয়স্কা মিডিয়াম্ (medium—অর্থাৎ যাহারা অলৌকিক শক্তির আধার—যাহাদের ভিতর হইতে মধ্যে মধ্যে অলৌকিক শক্তির আবির্ভাব হয়) দিগকে অপরের সহিত মিশিতে দেয় না—তাহাদের নিকট যাইতে পাওয়া কঠিন এইরূপ অলৌকিক ঘটনার দ্বারা তাহাদের মতবাদ বিশেষভাবে সমর্থিত হইতেছে, তাহারা মনে করেন এবং তাহারা এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান করা অপবিত্র বলিয়া মনে করেন। ব্যক্তিগত অনুগ্রহহিসাবে আমি একাধিকবার সেই সব সম্মিলনীতে সেখানে প্রেতাত্মাবাদীদিগের বৈঠক বা সিয়ান্স (seance) অনুষ্ঠান হয়, সেখানে প্রবেশের অনুমতি পাইয়াছি। দেখিয়াছি ঐ অনুষ্ঠানগুলি যেন তাহাদের কাছে কোন ধর্ম্মানুষ্ঠান বিশেষ। তবে একজন বাহিরের লোকের পক্ষে দুই একবার এই অনুগ্রহ পাওয়াই—এই সম্বন্ধে বিশদভাবে অনুসন্ধানের পক্ষে যথেষ্ট নহে। কৌতূহল নিবৃত্তি করা এক—আর রীতিমত তত্ত্বানুসন্ধান করা অন্য জিনিষ। আমি সর্ব্বদাই এ সম্বন্ধে সত্য নির্দ্ধারণ করিতে সচেষ্ট রহিয়াছি। দুই চারিবার এ বিষয়ে আমার নির্দ্দেশ ও নিয়মমত বিশেষভাবে পরীক্ষা করিতে আমাকে অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। তবে একবার দুইবার মাত্র, যাহার ভিতর এইরূপ অলৌকিক শক্তির প্রকাশ হয়—যাহাকে তাহারা তাহাদিগের মতবাদ বা ধর্ম্মবিশ্বাসের পূজারিণী মনে করে—তাহাকে তাহার পবিত্র মন্দির হইতে আমার নিজের গৃহে, আমার নিজের বন্ধুবান্ধবের মধ্যে লইয়া যাইতে অনুমতি পাইয়াছি—সেখানে প্রতারিত হইবার সম্ভাবনা-বর্জ্জিত পরীক্ষা করিবার বিশেষ সুযোগ হইয়াছে এবং যে সব ঘটনা আমি অন্যত্র—যেখানে পরীক্ষা করিবার সুযোগ অপেক্ষাকৃত অল্প—প্রত্যক্ষ করিয়াছি সেগুলিও তখন বিশেষভাবে পরীক্ষা করিবার সুযোগ পাইয়াছি। আমার পর্য্যবেক্ষণের ফলাফল পরে আমার পুস্তকে প্রকাশ করিব।

ক্রমশঃ

---

* এই সমস্ত ঘটনার কথা আমার একজন প্রবীণ বৈজ্ঞানিক বন্ধুর কাছে লিখিয়া পাঠাই। তদুত্তরে তিনি আমাকে একখানি পত্র লিখিয়া যে সমস্ত মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাহা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। বৈজ্ঞানিক জগতে তিনি এমন উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত যে তাঁহার মন্তব্যের মূল্য খুব বেশী। তিনি লিখিয়াছেন; "আপনার পত্রের কোন যুক্তিপূর্ণ উত্তর খুঁজিয়া পাই না। এ একটা অপূর্ব্ব ব্যাপার যে, যতই কেন আমি আধ্যাত্মিক ও প্রেততত্ত্ব বিষয়ে বিশ্বাস করিতে চাহিনা, এবং আপনার সত্যনিষ্ঠা ও বৈজ্ঞানিক পর্য্যবেক্ষণ শক্তির প্রতি আমার গভীর আস্থা সত্ত্বেও, একান্ত পরিতাপের সহিত ভাবি যে বিশ্বাস করিতে যেন আরও প্রমাণ আবশ্যক। ইহা সত্যই একান্ত দুঃখের বিষয়। দুঃখের বিষয় এজন্য বলি, কারণ মানুষ কোন জিনিষই যুক্তির দ্বারা মানিতে চায় না। যখন পুনঃ পুনঃ প্রত্যক্ষ করিবার ফলে উহা বিশ্বাস করা একটা মানসিক অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়ায়, তখনই আর সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ জন্মে না। আশ্চর্য্যের বিষয় যে বৈজ্ঞানিকদের মনোবৃত্তি এই বিষয়ে আরও বদ্ধমূল। এই কারণে যাহারা এইরূপ আশ্চর্য্য ঘটনা যুক্তিযুক্ত প্রমাণেও বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নয় তাহাদিগকেও অসাধু মনে করা উচিত নয়। পুরাতন বদ্ধমূল ধারণার সুদৃঢ় প্রাচীর পুনঃ পুনঃ প্রবল আঘাতের দ্বারা চূর্ণ করিতে হইবে।"

* ইহারা দুইজন বিশেষ শক্তিশালী মিডিয়াম, তাহাদিগকে লইয়াই ক্রুক্‌স সাহেব এই বিষয়ে গবেষণা করেন।



"ধূপ ছায়া"

(নাটিকা)

শ্রীশৈলেশনাথ বিশী

(নাটকের অভিনয় সময় ২৪ ঘণ্টার কাহিনী সূর্য্যাস্ত হইতে পরদিন অপরাহ্ণ)

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সময়—৬ষ্ঠ শতাব্দী। স্থান—উজ্জয়িনী

দৃশ্য—শিপ্রাতট, পাষাণ নির্ম্মিত বিস্তৃত ঘাট। ঘাটের বহু ঊর্দ্ধ হইতে অসংখ্য সোপান ধাপে ধাপে নামিয়া শিপ্রার গর্ভে প্রবেশ করিয়াছে। (কাশীর ঘাটের মত) শিপ্রার জল সেই পাষাণতটে আছড়াইয়া পড়িতেছে।

কাল—বর্ষার সন্ধ্যা—শ্রাবণ মাস—আকাশে ঘন মেঘ পুঞ্জীভূত—ঠাণ্ডা হাওয়া দিতেছে। শীঘ্রই বৃষ্টি হইবে। ঘাট নির্জ্জন,—তবে একেবারে জনশূন্য নহে। ঘাটের সর্ব্ব নিম্ন সোপান প্রান্তে একটী পুরুষ দক্ষিণ করতলে কপোল বিন্যস্ত করিয়া বসিয়া আছেন, পুরুষ মধ্য-বয়সী যৌবনের মধ্যাহ্ন—বয়স অনুমান ৩০।৩২ বৎসর। তাঁহার দেহের রং তপ্তকাঞ্চন বর্ণ, মুণ্ডিত মস্তকে গোষ্পদের মত অর্দ্ধেক মাথা জুড়িয়া শিখা—কপালে শ্বেত চন্দনের ত্রিপুণ্ডক, বামস্কন্ধ ও দক্ষিণ বাহুর নীচে দিয়া শুভ্র যজ্ঞোপবীত দেখা যাইতেছে। দেহের অর্দ্ধেক সবুজ রং এর জরিপাড় উত্তরীয়ে ঢাকা। পরিধানে হরিদ্রা রংয়ের জরিপাড়—বারাণসীর ক্ষৌমবস্ত্র। (জরির হলুদে রংয়ের চেলী) পুরুষ গভীর চিন্তামগ্ন। ছিন্নভিন্ন মেঘের আড়ালে সপ্তমীর ক্ষীণ চাঁদের আবছায়া আলো-আঁধারে সব বিচিত্র দেখাইতেছে। দূরের লোক চেনা যায় না। কাছের লোক চেনা যায়।

ঘটনা আরম্ভ :—কয়েকটী যুবতী এই সময় সোপান বাহিয়া জলের ধারে নামিয়া আসিল। পুরুষকে কেহ লক্ষ্য করিল না। তাহাদের পরিধানে রং বেরংয়ের ঘাগ্‌রা, বক্ষে রঙ্গিণ কুচবন্ধ (কাঁচুলী) ও গায়ে ওড়না। প্রত্যেকের বস্ত্রের প্রত্যেকটী রং বিভিন্ন। তাহাদের দেখিয়া মনে হয় যেন রংয়ের ঝর্‌ণা বহিয়া চলিয়াছে। সংখ্যায় অনুমান ৫।৭ জনের বেশী নহে। যুবতীগণ সকলেই উদ্ভিন্ন-যৌবনা ও সুন্দরী।

পুরুষটী সচকিতে তাহাদের দিকে কটাক্ষে চাহিয়া পুনরায় চিন্তামগ্ন হইলেন। তাহাদের কথা দূরাগত সঙ্গীতের মত শোনা যাইতেছিল।

১মা। কি লা, আজ খুব হাসি খুসি দেখছি যে? কাল তোর বর দেশে ফিরেছে না?

সকলে কলহাস্যে হাসিয়া উঠিল ও সমস্বরে দ্বিতীয়াকে প্রশ্ন করিল। কি হয়েছে ভাই? কি ভাই বল না?

২য়া। তোরা আইবুড়ো মেয়ে। তোদের কিছু বলবোনা। আমাদের সাথে মিশিস্ কেন?

১মা। ওদের শীগ্‌গীরই বর আসবে। বলনা ভাই, বলনা?

২য়া। (পরিহাসের সহিত যুবতীদের প্রতি) যদি আমাদের সাথে মিশতেই চাস—তবে মধু, মোম, কুমকুম ও ইঙ্গুদি তেল মিশিয়ে ঠোঁটে মাখিস্। সেই সঙ্গে কেয়ার রেণুও দিতে পারিস—কিন্তু খুব সামান্য। দেখিস তবেই মধু-মাছি এসে উড়ে পড়বে।

১মা। জানিস ভাই, মৃদুলার কি দুঃখ! তার স্বামী আজও ফিরলনা। তোরা কেউ বলতে পারিস—যবদ্বীপ কত দূরে?

২য়া। সিংহল পার হ'য়ে ছয় মাসের পথ। মৃদুলার জন্যে বড় দুঃখ হয়, সে আমাদের সাথে আর মেশেনা।

১মা। ওলো ভাখ্, মেঘগুলো আজ পূব দিকে যাচ্ছে।

২য়া। এ মেঘ আজ অলকায় যাবেনা।

পুরুষটী কান খাড়া করিয়া শেষের কথাটী শুনিতে চেষ্টা করিলেন—কিন্তু ইহার বেশী আর শোনা গেলনা।

যুবতীরা ঘাটে ওড়না ও কুচবন্ধ রাখিয়া গাত্র মার্জ্জনা করিয়া তীরে উপরের সিঁড়িতে উঠিল ও ওড়না কুচবন্ধ গায়ে দিল।

ইহাদের মধ্যে একটীকে লক্ষ্য করিয়া পুরুষটী বলিলেন—"নবমল্লিকে, এদিকে শুনে যাও।"

সকলে চমকিত হইয়া মুখ ফিরাইল এবং ত্রাস্ত ও সলজ্জভাবে নিজ নিজ বসন সংযত করিল।

নবমল্লিকা নিম্নকণ্ঠে পুরুষের নাম উচ্চারণ করিল "ভট্ট কালিদাস—কবি।"

সকলের চোখে উত্তেজনার ইঙ্গিত খেলিয়া গেল এবং সকলে সংযত ও সশ্রদ্ধভাবে পুরুষের সমীপবর্ত্তী হইল।

নবমল্লিকা যুক্তকরে প্রণাম করিয়া বলিল—"আর্য্য, আমাদের প্রণাম গ্রহণ করুন।"

ভট্ট স্মিতমুখে আশীর্ব্বাদ করিলেন, "তোমরা আয়ুষ্মতী হও! তোমরা এতক্ষণ কি কথা বলছিলে?"

সকলে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাউয়ি করিল। যে কথা হইতেছিল তাহা পুরুষকে কী প্রকারে বলা যায়? বিশেষতঃ ভট্টের কাছে তো নয়ই। নবমল্লিকা ইহাদের মধ্যে সুচতুরা—সে স্মিতহাস্যে কহিল—"কবি, আজ মেঘ পূর্ব্বদিকে যাচ্ছে। অলকায় যাবেনা, আমরা এর জন্য আক্ষেপ করছিলাম।"

ভট্ট কহিলেন—"সেজন্য আক্ষেপ কেন?"

নবমল্লিকা কহিল—"যক্ষপত্নী বিরহ বেদনায় কালক্ষেপ করবে, যক্ষের সংবাদ পাবেনা।"

কবি প্রসন্নহাস্যে তাহাদের মনের ভাব বুঝিয়াছেন—এরূপভাবে বলিলেন—"তোমরা দেখছি—কাব্যশাস্ত্রে সুচতুরা, বুঝলাম মেঘদূত পড়েছ, আমার একটী প্রশ্নের উত্তর দিতে পার?"

সকলে করজোড়ে কহিল—"আজ্ঞা করুন।"

ভট্ট শির সঞ্চালন করিয়া কহিলেন—"সে বড় কঠিন প্রশ্ন, তোমরা পারবেনা।"

নবমল্লিকা অনুনয়ের স্বরে বলিল "আর্য্য, প্রশ্ন করুন—আমরা চেষ্টা করব।"

ভট্ট সকলের চক্ষে কৌতুহল লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "তোমরা বলতে পার, কাব্যে নায়ক নায়িকার বিবাহ হয়ে গেলে কবির আর কিছু বক্তব্য থাকে কিনা?"

যুবতীগণ বিস্ময়ে নির্ব্বাক রহিল। তাহারা বুঝিতে পারিলনা, কবি তাহাদের মত অপরিণত বুদ্ধি যুবতীদের নিকট কাব্য শাস্ত্রের এই কঠিন প্রশ্ন কেন করিলেন।

নবমল্লিকা স্তব্ধতা ভাঙিয়া উত্তর করিল "আর্য্য, নায়ক নায়িকার মিলন ঘটলেই তো কাব্য শেষ হল। তার পর কবির আর কি বক্তব্য থাকতে পারে?"

কবি কহিলেন—"আমি বিবাহের কথা বলছি; মিলনের কথা বলিনি।"

নবমল্লিকা কহিল—"উভয়েই এক নয় কি?"

* এই নাটকের আখ্যানভাগ শ্রীযুক্ত শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "অষ্টম সর্গ" হইতে লওয়া হইয়াছে। পরে পরিবর্দ্ধিত করিয়া নাটকাকারে রূপান্তরিত করা হইয়াছে।

ভট্ট হাসিয়া কহিলেন "ঐ তো প্রশ্ন।"

সকলে নির্ব্বাক রহিল। ভট্ট ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

অবশেষে তরলিকা কথা কহিল, সে ইহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা চতুরা, এতক্ষণ কথা কহে নাই। এবার মুখ টিপিয়া কবিকে কহিল "ভট্ট, এ প্রশ্ন ভট্টিনীর নিকট কখনও করেছেন কি ?"

ভট্ট চমকিয়া মুখ তুলিলেন। দেখিলেন—তরলিকার ওষ্ঠ-প্রান্তে চাপাহাসি খেলিতেছে। তিনি ঈষৎ বিব্রতভাবে কহিলেন "না তাকে জিজ্ঞাসা করিনি। আজ গৃহে ফিরেই জিজ্ঞাসা করব। কিন্তু তোমরা আর বিলম্ব কর না—রাত্রি হয়েছে—তোমরা গৃহে যাও,"

তরলিকা বিজয়িনীর গর্ব্বে নত মস্তকে কবিকে নমস্কার করিল ও বলিল "আর্য্য ! আমাদের আশীর্ব্বাদ করুন।"

সকলে যুক্তহস্তে দণ্ডায়মান রহিল। কবি কহিলেন—"আমি তোমাদের কি আশীর্ব্বাদ করব। আমি শঙ্করের দাস, আর শঙ্করারি কামদেব তোমাদের সহায়। ভাল, আশীর্ব্বাদ করছি—"মা ভূ দেবং ক্ষনমপিচতে স্বামীনা বিপ্রযোগঃ।" সকলে যুক্তকরে নমস্কার করিয়া বিদায় লইল।

আজ কয়দিন কবির চিন্তার শেষ নাই। কুমারসম্ভব কাব্য শেষ হইয়াছে। হরগৌরীর মিলন হইয়াছে। মদন পুনরায় জাগ্রত হইয়াছে। কবির আর কি বলিবার আছে। তবুও কবির মনের সংশয় যাইতেছে না। মনে হইতেছে যেন সব কথা বলা হয় নাই। আরো কিছু যেন বলিবার আছে। ইহার মীমাংসা করিতে না পারিয়া কবি দুশ্চিন্তায় কালাতিপাত করিতেছেন।

কবি সন্ধ্যা-বন্দনায় প্রবৃত্ত হইবেন ভাবিতেছেন, এমন সময় কবি দেখিলেন ঘাটের শেষ ধাপে আলুলায়িত-বেণী নিরাভরণা, রুক্ষ কেশ একটী সুন্দরী রমণী জলে পা ডুবাইয়া শিপ্রা যেখানে মোড় ঘুরিয়াছে—দূরে চক্রবালের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া আছে। অন্ধকারে দেখা যায় না, তবে মনে হয় রমণী কাঁদিতেছে—কবি ইহাকে বাল্যকাল হইতেই চিনিতেন। ইহাকে লক্ষ্য করিয়া তিনি ডাকিলেন—"মৃদুলা"। তন্দ্রাহতের ন্যায় যুবতী ফিরিয়া চাহিল। ওড়নাতে দেহ আবৃত করিয়া সলজ্জ সঙ্কোচে ভট্টের সম্মুখীন হইল।

ভট্ট জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি ভৈরব নাবিকের বধূ" ?

মৃদুলা হেঁট মুখে কি বলিল বুঝা গেল না। কেবল তাহার ওষ্ঠ কাঁপিতে লাগিল।

ভট্ট পুনরায় বলিলেন "তোমার স্বামী শ্রেষ্ঠী অগ্নিদত্তকে নিয়ে গত বৎসর যবদ্বীপে গিয়েছে। আজও ফেরেনি ?"

মৃদুলা নিজ অঞ্চলে চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া মৃদু মাথা নাড়িল।

ভট্ট আশ্বাস দিয়া কহিলেন—"তুমি ভেবো না—ভৈরব কুশলেই আছে।"

মৃদুলা উদ্গত অশ্রু চাপিয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে কহিল "দেব, আজ আপনি অভাগিনীর প্রাণ দিলেন। মহাকাল আপনাকে জয়যুক্ত করুন। আজই কি সংবাদ এসেছে ?"

ভট্ট কহিলেন "হাঁ, আজই রাজসভায় সংবাদ এসেছে"। ভৈরব নিরাপদে তরীসহ সমুদ্র সঙ্গমে ফিরেছে। ২।১ দিনের মধ্যে গৃহে ফিরবে। ভৈরব এলে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও। আজই তুমি মহাকাল মন্দিরে পূজা দিও।"

মৃদুলা "যে আজ্ঞে" বলিয়া কবিকে পুনঃ পুনঃ নতমস্তকে যুক্তকরে সকৃতজ্ঞ অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিল।

এদিকে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে—রাত্রি হইয়াছে—আর বসিয়া থাকা সমীচীন নহে বলিয়া কবি উঠিলেন ও সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া তীরে উঠিলেন।

দ্বিতীয় দৃশ্য

পথ ও মন্দিরচত্বর

ঘাটের অদূরেই মহাকালের গগনভেদী মন্দির। ঘাট হইতে তাহার চূড়া দেখা যায়। আরতির সময় সমাগত।—পথ পিচ্ছিল—অসংখ্য নরনারী পথে চলিতেছে এখনও বনদেবীর হস্তে দীপবর্ত্তিকা জ্বালা হয় নাই। *

গৃহস্থের ঘরে প্রদীপ জ্বলিয়াছে। তাহার আলোতে পথ স্বল্পালোকিত। পথের পার্শ্বে নানাবিধ বিপণি। পথ অত্যন্ত সরু পাথর বাঁধান (কাশীর গলির মত) তবে পথের পাশ দিয়া মোড়ে মোড়ে অসংখ্য শাখা প্রশাখা বাহির হইয়াছে। অধিকাংশ নাগরিক কবিকে নমস্কার করিয়া পথ ছাড়িয়া দিতেছে। গৃহস্থের ঘর হইতে সন্ধ্যার ধূপধুনার গন্ধ ও রাস্তার নবমল্লিকা ও মালতী পুষ্পের গন্ধে আমোদিত। ফুল বিক্রেতাগণ উক্ত পুষ্পের মালা সাজাইয়া মন্দিরের দিকে চলিতেছে—নাগরিকদের প্রত্যেকের গলায় ফুলের মালা ও গায়ে স্বর্ণালঙ্কার। কবি এইরূপ জনতা ঠেলিয়া মন্দিরের চত্বরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন ও যুক্তকরে পথ হইতেই দেবতাকে প্রণাম করিলেন। মন্দিরে প্রবেশ করিলেন না।

মন্দির চত্বরে ঢাক, ঢোল, ডমরু ও রামশিঙা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের তুমুল কোলাহল ও মন্দির মধ্যে সুর-তাল-লয় সহকারে "শিব মহিম্ন স্তোত্র" পাঠ হইতেছে। অসংখ্য প্রদীপের আলোতে মন্দির ও মন্দির চত্বর আলোকিত ও নীলাগুরু ধূমে আচ্ছন্ন ও সহস্র প্রদীপের আলোতে মন্দির ও পথ আলোকিত। মন্দির ভিতরে সমস্বরে স্তোত্র পাঠ ও বাহিরে বাদ্যযন্ত্রের তুমুল শব্দ। নরনারী "হর হর ব্যোম্ ব্যোম্" রবে বিরাট কোলাহল সৃষ্টি করিতেছে। চারিদিকে অগুরুধূমের কুহেলিকায় মায়াজাল সৃজন করিয়াছে। আলো আঁধারের বিচিত্র সমাবেশের মধ্যে সুগন্ধ বহ বাতাসে নরনারীর গতিবিধি এক কথায় আলো, রং ও শব্দের বিচিত্র সমাবেশ।

কবি আরতি শেষ পর্য্যন্ত বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিলেন এবং আরতি শেষে নতমস্তকে দেবতাকে প্রণাম করিয়া ঐ পথেই অগ্রসর হইলেন।

সামনের মোড় ফিরিতেই কবি দেখিলেন—সামনে প্রশস্ত তোরণ, বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে ঘেরা এক বিরাট অট্টালিকা। সহসা কবির মুখ উৎফুল্ল হইল। তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে আজ নগরমুখ্যা গণিকা সুলেখার গৃহে সম্পানক † উৎসব। কবি জানিতেন যদি কেহ উজ্জয়িনীর মধ্যে তাহার প্রশ্নের সমাধান করিতে পারে তবে এই সুলেখা। কেবল উজ্জয়িনী নহে সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তের মধ্যে এইরূপ চতুষষ্ঠীকলায় পারংগতা শিক্ষিতা ও রসবোধ-সম্পন্না নারী আর একটীও নাই। স্বয়ং আর্য্যাবর্ত্তের অধীশ্বর শকারি-বিক্রমাদিত্য পর্য্যন্ত তাহাকে মানিয়া চলেন। আজ কবির সুলেখার গৃহে সম্পানকের নিমন্ত্রণ। তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। স্বয়ং মহারাজ বিক্রমাদিত্য আজ নবরত্নসমভিব্যাহারে সুলেখার গৃহে অতিথি। একথা তাঁহার একেবারেই মনে ছিল না। ইহা ভাবিয়া নিতান্ত লজ্জাবোধ করিলেন।

প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। দীপালোকে উদ্ভাসিত। তোরণে অসংখ্য দোলা, পালকী, রথ আসিতেছে—যাইতেছে—তোরণ সম্মুখে সুবেশা, সুরূপা ও সুন্দরী কিঙ্করীগণ পুষ্পমালা ও চন্দন লইয়া অভ্যাগতদের অভ্যর্থনা করিতেছে। কবি তোরণে প্রবেশ করামাত্র তোরণ বালিকা কিঙ্করীগণ কবিকে ঘিরিয়া ফেলিল ও সকলে সমস্বরে কলকণ্ঠে যুক্তকরে তাঁহাকে সম্ভাষণ করিল—"আসুন কবীন্দ্র—স্বাগত। আসুন পণ্ডিতবর। আর্য্য

---

* পথে আলো দিবার জন্য পাথরের নগ্ন নারী মূর্ত্তি। রাত্রে তাহাদের হাতে মশাল জ্বালিয়া পথ আলোকিত করা হইত।

† সম্পানক :—সুরাপান উৎসব

সুলেখা—সাগ্রহে আপনার প্রতীক্ষা করছেন। আপনার অনুপস্থিতিতে নবরত্ন মালিকা আজ মধ্য-মণিহীন। স্বাগত! শুভাগত!"

কবি মর্ম্মর সোপানে পদার্পণ করা মাত্র একটী কিঙ্করী ছুটিয়া আসিয়া কবির পাদপ্রক্ষালন করিয়া দিল, অন্য একটী যুবতী শুভ্র শুভ্র কার্পাস বস্ত্রে কবির পা মুছাইয়া দিল।

আর একজন কবির ভ্রূমধ্যে শ্বেত চন্দন ও কুমকুমের তিলক পরাইয়া দিল। অন্য একটী যুবতী কবির গলায় সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও স্থূল যূথীর মালা পরাইয়া দিল। কবি উচ্চহাস্যে তাহাকে বলিলেন—"সুলোচনে! তুমি এ কি করলে? আমার গলায় মালা পরালে?"

সুলোচনা কুটিল হাসিয়া উত্তর দিল "কবিবর! আমরা আজ প্রত্যেকে আর্য্যা সুলেখার প্রতিনিধি। এ মাল্য তিনিই আজ আপনাকে পরিয়েছেন।"

মুখের মত জবাব পাইয়া হাসিতে হাসিতে কবি প্রাসাদ অভিমুখে চলিলেন। উজ্জয়িনীতে কথাটা কাণাঘুষা ছড়াইয়া উঠিয়াছে যে চতুষষ্ঠি কলায় পারদর্শিনী অসামান্যা সুন্দরী সুলেখা কবির প্রতি অনুরক্তা। কথাটী লোকমুখে কবি গৃহিণী ভট্টিনীর কানেও গিয়াছে। তিনি সুলেখার গৃহে কবির যাতায়াত মোটেই পছন্দ করেন না এবং এইজন্য কবিকে ভট্টিনীর নিকটে লাঞ্ছনাও কম ভোগ করিতে হয় না।

উদ্যানের মধ্য দিয়া শ্বেত প্রস্তরে বাঁধান পথ। পথের দুই ধারে ধ্যানমগ্ন মহাদেবের শ্বেতমর্ম্মর নির্ম্মিত মূর্ত্তি। মূর্ত্তির জটাজাল বহিয়া সুগন্ধি বারি সুরধনী হইয়া উৎসের মলয় বহিয়া যাইতেছে। এই পথ দিয়া কবি প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন।

তৃতীয় দৃশ্য

প্রাসাদ—নৃত্যশাখা সজ্জিত কক্ষ। কক্ষের ছাদ বহু বর্ণে চিত্রিত। মর্ম্মরনির্ম্মিত স্তম্ভের সারি। ছাদ হইতে অসংখ্য সুগন্ধি তৈলের দীপ রৌপ্যের শিকল দিয়া ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। উজ্জ্বল আলোতে কক্ষ উদ্ভাসিত। কক্ষের মধ্যে বিস্তীর্ণ ফরাস—তাহাতে বহুমূল্য কার্পেট পাতা। এই কক্ষে উজ্জয়িনীর তরুণ নাগরিকদের সভা। নাগরিকগণ বিচিত্র বেশে আসিয়াছে। সাদা ধুতি খুব কম লোকেই পরিধান করিয়াছেন। প্রত্যেকের হাতে বলয় ও গলায় ফুলের মালা—গায়ে রঙ্গিণ উত্তরীয়। প্রত্যেকেই পান খাইতেছে। কাহারও গায়ে জামা নাই। এই সভার মধ্যস্থলে সুরূপা তরুণী নর্ত্তকী সুর-তাল-লয় সহযোগে বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে নাচিতেছে। বাদ্যযন্ত্র, বীণ্‌, পাখোয়াজ ও সারঙ্গী। নর্ত্তকীর পরিধানে বিচিত্র ঘাগরা ও কুচবন্ধ। মস্তকে দীর্ঘ বেণী ও ফুলের মালা জড়ান। নর্ত্তকীর ওড়না নাই। নর্ত্তকীর সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কার কোমরে নীবিবন্ধ। হস্তে কেয়ূর মণিবন্ধে বহুমূল্য বলয়—কণ্ঠে রত্ন-হার ও ফুলের মালা—নর্ত্তকী নাচিতেছে—দর্শকগণ ভাবাতুর মন্ত্রমুগ্ধের মত এই নৃত্যশীলা তরুণীর চটুল চরণক্ষেপ নির্নিমেষে দেখিতেছে। একটী শব্দ পর্য্যন্ত নাই। কিঙ্করীগণ চর্ম্মপূর্ণ চষক হইতে সুরা ঢালিয়া স্ফটিক পানপাত্রে চারিদিকে পরিবেশন করিতেছে। দর্শকগণ পাত্র নিঃশব্দে শেষ করিয়া পরিচারিকার হস্তে দিতেছে।

কবি কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া নৃত্য দেখিলেন, পরে দ্বিতীয় কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

দ্বিতীয় কক্ষ—কথা-কাহিনীর আসর—কক্ষের সাজসজ্জা প্রথম কক্ষের মতই। বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কক্ষের মধ্যস্থলে মর্ম্মরের বেদী। বক্তা স্বয়ং * বেতাল ভট্ট। তিনি শঙ্খখচিত পদ্মাসনের বেদীতে বসিয়া কাহিনী বলিতেছেন। শ্রোতাগণ মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনিতেছে। পরিচারিকাগণ চিত্রার্পিতের ন্যায় পানপাত্র হস্তে দাঁড়াইয়া আছে। সুরা পরিবেশন করিতে ভুলিয়া গিয়াছে।

বেতাল ভট্ট কহিতেছেন—"পিশাচ অট্ট অট্ট হাস্য করল। বল্লে মহারাজ, এই শ্মশানভূমির উপর আপনার কোন আধিপত্য নেই। এ আমার রাজ্য। ঐ যে নর-মেদ-শোণিতলিপ্ত মহাশূল প্রোথিত দেখছেন এই আমার রাজদণ্ড।"

কবি হাস্য গোপন করিয়া একবার চারিদিকে চাহিলেন। শ্রোতাদের মধ্যে সুলেখাকে দেখিতে পাইলেন না। কবি বিমর্ষ মুখে অন্য কক্ষে প্রবেশ করিলেন। ক্রমশঃ

* বেতাল ভট্ট—৬ষ্ঠ শতকে বেতাল পঞ্চবিংশতি কথাসরিৎসাগর লিখিয়া সংস্কৃতে ছোট গল্পের প্রচলন করেন। তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় লেখক ছিলেন। এ পর্য্যন্ত সংস্কৃতে ছোট গল্পের লেখক হিসাবে তাঁহার সমকক্ষ কেহ নাই। তাঁহার লেখা বহু ভাষায় অনুদিত হইয়াছে। বেতাল ভট্ট জগতে ছোট গল্পের প্রথম প্রবর্ত্তক—এক কথায় **father of short story writers.**

দান প্রতিদান

শ্রীযামিনীমোহন কর

কলেজ থেকে পূজোর বন্ধের সময় দু' মাসের মাইনে পাওয়া গেছে বোনাস্‌ হিসাবে। মনটা একটু প্রফুল্ল ছিল। স্ত্রীর শরীরটা কিছুদিন থেকে খারাপ যাচ্ছিল। ডাক্তার একটা টনিক খেতে বলেছিলেন, কিন্তু পয়সার অভাবে কেনা হচ্ছিল না। কলেজ থেকে বাড়ী ফেরবার পথে ধর্ম্মতলায় এক ওষুধের দোকানে ঢুকলুম। বার হচ্ছি এমন সময় একজন ভদ্রলোক বিনীত স্বরে বললেন "মশাই শুনছেন?" থমকে দাঁড়ালুম। কি ব্যাপার! ট্রামে ভদ্রলোকের পকেট মেরেছে। স্ত্রী মরণাপন্না, যদি পাঁচটা টাকা ধার দিই। জানি ধার দিলে বন্ধুরাই কখনও ফেরত দেয় না, এতো অপরিচিত। কিন্তু মনটা বোনাস্‌ পাওয়াতে একটু ভাল ছিল। তার ওপর স্ত্রীর অসুখ। দয়া হ'ল। যাক না পাঁচ টাকা। এমনি তো কত দিকে কত বেরিয়ে যায়। দিলুম। ভদ্রলোক অজস্র ধন্যবাদ দিয়ে বললেন—"স্যার আপনার ঠিকানাটা দয়া করে দিন। কাল সকালে টাকা দিয়ে আসব।" কথাটা অবিশ্বাস্য। ভাঁওতা। তবু ঠিকানা দিলুম।

পরদিন সকালে খেতে বসেছি। স্ত্রীর সঙ্গে টাকা পাঁচটা দেওয়ার কথা হচ্ছে। তিনি বোঝাচ্ছেন লোকটা আমায় ঠকিয়ে মিথ্যে কথা বলে পাঁচটা টাকা নিয়েছে। আমি একটা আস্ত বেকুব। এমন সময় চাকর এসে বল্লে—"একজন ভদ্রলোক বললেন কাল পাঁচটা টাকা ধার নিয়েছিলেন। শোধ দিতে এসেছেন।" ভৃত্যকে বললুম—"যা, তাঁকে বৈঠকখানায় বসা।"

ভৃত্য চলে গেল। গর্ব্বভরে স্ত্রীকে বললুম—"দেখলে!" তিনি দমে গিয়ে বললেন—"তাই ত দেখছি!"

তাড়াতাড়ি আহার শেষ করে নীচে নেমে গেলুম। বৈঠকখানায় কেউ নেই। টেবিলের ওপর একটা পার্কার পেন ও রূপোর পেপার ওয়েট ছিল। সে দুটীও অদৃশ্য। এই প্রতিদান। অবশ্য স্ত্রীকে কিছু বলিনি। সাহসে কুলোয় নি।

সঙ্গীতে



রচনা ও সুর—মিঞা তানসেন　　　　　　শিক্ষক—মহম্মদ দবীর খাঁ (বীণ্‌কার)

স্বরলিপি—শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী এম-এল-সি

ধ্রুপদ

ললিতা-পূর্ব্বী—চৌতাল

আশা লাগি মোহে প্রভু
ময়ুর মুকুট বংশীবালে তুমরে মিলন কি।
জ্ঞান ধ্যান অত মত গত সব শুধ বিসরাই
রাহা তথত হুঁ তুমরে আবনকি॥

ঢুঁড়ত ফিরত বৃন্দাবনমে কেহু না পায়ো
শ্যামসুন্দর কি ঝলকি।
আজহুঁ খুব খুব সমঝ লেও মনমে
তানসেন ইন সব কে মনকি॥

মন্তব্য—অধিকাংশ লোকের এই ধারণা যে, আমাদের মার্গসঙ্গীতে সুর ভিন্ন কথার দিকে বা কাব্যের ভাবের দিকে মোটেই লক্ষ্য ছিল না। কিন্তু এই ধারণা যে ভ্রমাত্মক তাহা স্বামী হরিদাস, মিঞা তানসেন, বিলাস খাঁ ও শাহ্‌ সদারঙ্গ প্রভৃতি সঙ্গীতনায়কগণের রচিত গীতি সকল পাঠ করিলে উপলব্ধি হয়। পরবর্ত্তী যুগে অশিক্ষিত নানা ওস্তাদ গীতপদ সকল বিকৃত করিয়াছেন অথবা তুচ্ছ পদযুক্ত গান রচনা করিয়াছেন ইহা সত্য, কিন্তু হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের গৌরবময় যুগে গীতপদ ও গীতস্বর উভয়েরই মর্য্যাদা ছিল। ধ্রুপদ সঙ্গীত অধিকাংশই ভগবদ্ভজনমূলক ভক্তিরসাত্মক গান।—স্বরলিপিকার

স্থায়ী

```
   +          ০          ২          ০          ৩              ৪
II                                             ধর্মা  -পর্মা | -গমা  -গা I
                                               আ০     ০০       ০০    শা

+            ০             ২             ০            ৩              ৪
ঋন্‌া  -ঋা | -র্মা  -গা | -ঋা  -সা | সা   -মা | র্মমা  -র্মা | -গা  -া I
লা০    ০     ০     গি     ০     ০     মো   ০     হে     ০       ০    ০

+            ০             ২             ০            ৩              ৪
গা  ঁ-ঋা | গর্মা  -পা | পর্মা  দা | পর্মা  -দা | র্মা  -গা | গা  গা I
প্র   ০     ভু০    ০     ম০    য়ূ   র০    ০      মু    ০     কু   ট
```

\+ ০ ২ ০ ৩ ৪
গমা -ঋা | -গমা গা | -া ঋন্‌া | -ঋা -ঋা | -গঋা -গা | -ঋা -গা I
বং ০ ০ ০ শী ০ ৰা০ ০ ০ ০ ০ লে ০ ০

\+ ০ ২ ০ ৩ ৪
পা -া | -দঋা -দা | -না দা | পা -ঋপা} | -ধঋা -া | -গমা -া I
তু ০ ০ ০ ০ ০ ম রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

\+ ০ ২ ০ ৩ ৪
ঋগা -ঋা | -ঋা -গা | ঋা -সন্‌া | ঋা -সা | "ধঋা -পঋা | -গমা -গা" II
মি০ ০ ০ ল ন ০ ০ কি ০ আ০ ০ ০ ০ ০ শা

অন্তরা

\+ ০ ২ ০ ৩ ৪
II ধা -ঋা | ধা র্সনা | -র্সা র্সনা | ঋর্া র্সনা | -র্সা দনা | -ঋা না I
জ্ঞা ০ ন ধ্যা০ ০ ন ০ অ ত ০ ০ ম০ ০ ত

\+ ০ ২ ০ ৩ ৪
দা -পা | -ঋপা পদা | -ঋা -গা | -মা মা | ঋমা -গঋা | -মা গা I
গ ত ০ ০ স০ ০ ০ ০ ব শু০ ০ ০ ০ ধ

\+ ০ ২ ০ ৩ ৪
ঋা ধা | নর্সা -না | ঋগা -ঋা | -র্সনা -র্সা | ঋর্না -ঋর্া | ঋর্া -র্গঋর্া I
বি স রা০ ০ ই ০ ০ ০ ০ ০ রা ০ ০ ০ ০ ০

\+ ০ ২ ০ ৩ ৪
র্গা -ঋর্া | -র্সা -া | নঋর্া না | ধঋা -ধা | -না ঋর্না | -দা -পা I
হা ০ ০ ০ ত ০ থ ত ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

\+ ০ ২ ০ ৩ ৪
পা -ঋপা | দঋা -পঋা | -গমা -ঋা | -গমা -গা | গরা -ঋা | গা -া I
হুঁ ০ ০ তু০ ০ ০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ ম ০ ০ রে ০

\+ ০ ২ ০ ৩ ৪
গঋা -গা | ঋা সা | -সা -ন্‌া | ঋা -সা | "ধঋা -পঋা | -গমা -গা" II
আ০ ০ ব ন ০ ০ কি ০ আ০ ০ ০ ০ ০ শা

সঞ্চারী বা ভোগ

\+ ০ ২ ০ ৩ ৪
II ন্‌সা -মা | -া মা | -া মা | মা ঋমা | -গা -ঋা | -মা গা I
টুঁ০ ০ ০ ড় ০ ত ফি র০ ০ ০ ০ ত

\+ ০ ২ ০ ৩ ৪
ঋগা -ঋা | ঋগা -ঋা | গঋা ঋা | সা -ন্‌সা | ধন্‌া -ঋা | -ঋগা -ঋা I
বৃ০ ০ ন্দা ০ ব ০ ন মে ০ ০ কে ০ ০ ০

\+ ০ ২ ০ ৩ ৪
-ন্দা -না | -দা পা | ধঋা -পঋা | -গা -মা | ঋগা -ঋা | -মা -গা I
০ ০ ০ হুঁ না০ ০ ০ ০ ০ পা০ ০ ০ য়ো

\+ ০ ২ ০ ৩ ৪
ন্‌া -ঋা | হ্মগহ্মা গা | ঋসা সা | পা -দহ্মা | -দা -না | দা পা I
শ্রা ০ ম০০ সু ন্দ০ র কি ০০ ০ ০ ঝ ল

\+ ০ ২ ০ ৩ ৪
দহ্মা -গমা | -হ্মা -গা | -ঋহ্মা -গা | -ঋা -সা | "ধহ্মা -পহ্মা | গমা -গা" II
কি০ ০০ ০ ০ ০০ ০ ০ ০ আ০ ০০ শা০ ০

আভোগ

\+ ০ ২ ০ ৩ ৪
II হ্মা -ধা | হ্মা গা | -া হ্মা | ধা -হ্মা | র্সা -না | -ঋর্া র্সা I
আ ০ জ হুঁ ০ খু ব ০ খু ০ ০ ব

\+ ০ ২ ০ ৩ ৪
না ঋর্া | হ্মর্গা -হ্মর্া | র্গা -ঋর্া | র্সা -নর্সা | র্সা -র্সনা | -ঋর্া র্সা I
স ম ঝ০ ০ লে ০ ও ০০ আ প০ ০ নে

\+ ০ ২ ০ ৩ ৪
নঋর্া না | দা -পহ্মা | -পা -া | ধহ্মা -পহ্মা | -গা -মা মা -া I
ম০ ন মে ০০ ০ ০ তা ০০ ০ ০ ন ০

\+ ০ ২ ০ ৩ ৪
হ্মমা -হ্মমা | -গা -ঋমা | গা -া | গহ্মা গা | ন্‌া ঋা | গহ্মা -ধা I
সে০

\+ ০ ২ ০ ৩ ৪
হ্মা -গা | ঋা -সা | -া -ন্‌া | ঋা -সা | "ধহ্মা -পহ্মা | -গমা -গা" IIII
ম ০ ন ০ ০ ০ কি ০ আ০ ০০ ০০ শা

অপরাধ-বিজ্ঞান

শ্রীআনন ঘোষাল

[প্রবন্ধটী লেখা হয়েছে দুর্ব্বলচিত্ত মানসিক রোগগ্রস্থ মেয়েদের সম্বন্ধে। সুস্থমনা মেয়েদের কোনও কথা আলোচিত হয় নি। এজন্য কেহ যেন আমাকে ভুল না বুঝেন। ভুল ত্রুটী সংশোধন করে দিলে কৃতজ্ঞ থাকব।]

নারীঘটিত অপরাধগুলি সংঘটিত হয়, শুধু পুরুষের অপরাধ প্রবৃত্তির জন্য নয়। নারীর দৌর্ব্বল্য, মূর্খতা ও সামাজিক অবস্থা ও ব্যবস্থা এজন্য দায়ী। নারীঘটিত যে সকল অপরাধ বলপূর্ব্বক সমাধিত হয়, সেগুলি সম্বন্ধে আলোচনার কোনও উদ্দেশ্য এ প্রবন্ধে নাই। সেগুলির জন্য দায়ী পুরুষের অপরাধ-স্পৃহা, কথিত নারীর ও তার পুরুষ-আত্মীয়দের দৌর্ব্বল্য ও অসাবধানতা, কতক পরিমাণে রাষ্ট্রও বটে। কিন্তু এ সকল ছাড়াও কতকগুলি অপরাধ আছে, যেগুলিকে আমরা যৌথ অপরাধ বা contributing offence বলি অর্থাৎ নারী ও পুরুষের অপরাধ প্রায় সমান। সমান কিন্তু আইন এজন্য কখনও নারীকে শাস্তি দেয় না। শাস্তি দেয় কেবলমাত্র পুরুষকে। এর কারণ নারীর মন স্বভাবতঃই দুর্ব্বল। কিন্তু পুরুষের মন তা নয়, (অন্ততঃ তা হওয়া উচিত নয়)। এজন্য আইনজ্ঞরা নারীকে বিপথে চালিত করবার জন্য কেবলমাত্র পুরুষকেই দায়ী করে। মেয়ে বিশেষ যদি কোনও পুরুষকে প্রলুব্ধও করে, তবুও সেই পুরুষের বলা উচিৎ—"ছিঃ বোন, এগুলো ভাল কথা নয়। তোমার মন এত দুর্ব্বল? এরকম ছেলেমানুষি করতে আছে। যাও বাড়ী যাও, মা ভাববে।" ছেলেটীর আরও বলা উচিত—ভাগ্যক্রমে তুমি আমার কাছে এসেছ। যদি কোনও বদ ছেলের কাছে যেতে ত কি সর্ব্বনাশ ঘটত বল ত। এ রকম ভুল যেন আর না হয়।* এ ছাড়া পুরুষ যদি তার সহিত ভিন্নরূপ আচরণ

* আমার মতে তার আরও একটু এগিয়ে যাওয়া উচিত। তার উচিত তাকে বিয়ে করা (সম্ভব হলে), নয়ত একটা ভাল পাত্র তার জন্যে জোগাড় করে দেওয়া।

করে ত তাকে শাস্তি পেতে হবে, অবশ্য যদি অদৃষ্ট বিরূপ হয়। আইনানুসারে নাবালিকা যে কোনও বালিকা এবং সাবালিকা বিবাহিতার সহিত উক্ত বালিকা বা বিবাহিতার সম্মতি ক্রমেও যদি কেহ কোনও অপরাধমূলক কাজ করে ত সে আইন অনুযায়ী দণ্ডিত হবে। কিন্তু এজন্য সেই বালিকার বা বিবাহিতার কোনও শাস্তি হবে না। সর্ব্বদেশেই জাতির মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করে নারীর উপর। তাই নারীকে রক্ষা করার প্রচেষ্টা সর্ব্বদেশেই আছে। কারণ নারী নিজেই অনেক সময় নিজের শত্রু হয়ে দাঁড়ায়, অবশ্য নিজের অজ্ঞাতসারে। এতে ক্ষতি যদি কারও হয় ত—তা হয় নারীর। পুরুষের ক্ষতি ক্ষতির মধ্যেই নয়। কিন্তু কেবলমাত্র আইন দ্বারা নারীকে রক্ষা করা যায় না। দেশ বিদেশের সামাজিক ব্যবস্থা ও অবস্থার ত্রুটিরও সংশোধনের প্রয়োজন হয়। নারীর উপর প্রধানতঃ দুই প্রকারের অপরাধ সংঘটিত হয়। প্রথম প্রকার অপরাধ হয় নারীর সহযোগে, দ্বিতীয় প্রকার অপরাধ সংঘটিত হয় নারীর অনিচ্ছায়। যে ক্ষেত্রে নারীর সহযোগিতা অর্জ্জন করা হয়, সে ক্ষেত্রেও তা করা হয় নারীর কয়েকটা দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে। এইরূপ দুর্ব্বলতার প্রকৃত কারণ কি, কি ভাবেই বা তা আসে এবং তার সুযোগ নিয়ে কি ভাবে বিজ্ঞ দুর্ব্বৃত্তরা মেয়েদের ঠকায়, প্রথমে সেই সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক্। মেয়েদের মন সম্বন্ধে যুগে যুগে মণীষীরা আলোচনা করেছেন; শেষে নাচার হয়ে "দেবা ন জানন্তি" বলে নিশ্চেষ্ট হয়েছেন। সত্যই নারীর মন দুর্জ্জেয়। তার কারণ মেয়েরা নিজেরা কি চায় তা তারা নিজেরাই জানে না। এজন্যে মেয়েদের বিশ্বাস করাও কঠিন হয়ে পড়ে। নিম্নের বিবৃতিটুকু প্রণিধানযোগ্য।

"আমি —নং বাটীর পাশে একটা মেসে থাকতাম। ধীরে ধীরে পাশের বাড়ীর একটী মেয়ের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব গড়ে উঠে। মেয়েটীর বয়স তখন উনিশ। এই বিষয়ে তার পনের বৎসর বয়স্কা ভগিনীটি আমাদের বিশেষ সাহায্য করত। সে একাধারে পত্রবাহক, উপদেষ্টা ও পাহারার কাজ করত। তারই কথায় তার বাপের কাছে গিয়ে আমি বিয়ের প্রস্তাব করি ও প্রত্যাখ্যাতও হই। এর পর আমি নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়ি। কনিষ্ঠা ভগিনীটি (ভাবী শ্যালিকা) তখন গোপনে আমার সঙ্গে দেখা করে ও আমাকে উত্তেজিত করে। সে আমাকে বলে—"জামাইবাবু! আপনি পুরুষ নন। যান, দিদিকে নিয়ে যান, বিয়ে করুন।" তার দিদিকে সে বলে—"দিদি, তুই কি সতী নস্? যা জামাইবাবুর সঙ্গে।" আমার এক বন্ধু ও তার পত্নীর (বন্ধুনী) সহিত পরামর্শ করে তাদের বাড়ীতেই বিয়ের বন্দোবস্ত করি। রাত্রি তখন দশ ঘটিকা। ট্যাক্সি করে নাপিত ও পুরোহিতকে সঙ্গে নিয়ে (টোপরও ছিল) মেয়েটির বাড়ীর কাছে যাই। প্রিয় শ্যালিকাটি (ভাবী) তার জ্যেষ্ঠা ভগিনীটিকে নিজে হাতে বেনারসী পরায়, সাজায়, কপালে চন্দনের ফোঁটা দেয়। শুধু তাই নয়, সঙ্গে করে ট্যাক্সি পর্য্যন্ত পৌঁছেও দেয়। তার পর ছুটে গিয়ে তার মা'কে গিয়ে সেই খবর দেয়—"মা, দিদি পালিয়ে যাচ্ছে।" তার মা হৈ হাল্লা করে ছুটে আসে। বহুলোকে ট্যাক্সি ঘেরোয়া করে। আমি পুনরায় প্রত্যাখ্যাত হই। প্রিয়তমাকে তার মা চুল ধরে টেনে নিয়ে যায়, আমারই সামনে দিয়ে।" [৮ই আগষ্ট ১৯৩৪, সময় রাত্রি দশ ঘটিকা]

এক্ষেত্রে কনিষ্ঠা কন্যাটি নিজেই জানত না যে সে'ও তার অজ্ঞাতসারেই তারই দিদির বরকে ভালবেসেছে। দিদিকে সাহায্য করার সময় একটা স্বাভাবিক যৌন আকাঙ্ক্ষা তারও মনের মধ্যে দানা বাঁধছিল, অতি সংগোপনে ও ধীরে ধীরে। তার অন্তরের ভালবাসা সময়ে সময়ে বাইরে এসেও উঁকি দিয়েছে। কিন্তু তখনই সে তার সেই ভাবকে দাবিয়ে দিয়েছে। অনেকের বিশ্বাস প্রেম একবার এলে তা স্থায়ী ভাবেই আসে। কিন্তু সেটা ভুল। স্ত্রীজাতির বহু পতির প্রতি স্বাভাবিক (poligametic tendency) আকাঙ্ক্ষা—তার কারণ সম্বন্ধে পূর্ব্বে (আষাঢ় সংখ্যার ভারতবর্ষ দেখুন) আমি আলোচনা করেছি। প্রেম বা একনিষ্ঠা সভ্যতার অন্যতম দান। বংশানুক্রমে চিন্তা ও সংস্কৃতি দ্বারা মানবমানবী একনিষ্ঠায় অভ্যস্ত হয়েছে। এর মধ্যে যে শুধু নিছক প্রেম থাকে, যৌন স্পৃহা থাকে না, তা নয়। যৌন স্পৃহা মেয়েদের পুরুষের দিকে ঠেলে দেয়। প্রেম ঠেলে দেয় তাকে একটা বিশেষ পুরুষের দিকে, যাকে কিনা তার ভাল লাগে। Sugar-coated কুইনাইনের সঙ্গে এর তুলনা করা চলে। ভিতরে থাকে যৌন-স্পৃহা, উপরে থাকে প্রেম। প্রেমবিবর্জ্জিত যৌন-স্পৃহা পশুসুলভ প্রবৃত্তি, সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে মানবী তা ত্যাগ করেছে। প্রেম একনিষ্ঠার একটা কবি-সুলভ অভিব্যক্তি মাত্র, অনেকটা মনের বিকারও বটে। প্রেম যদি হঠাৎ আসে ত হঠাৎই আবার তা চলে যেতে পারে। হঠাৎ আসার প্রেমের মধ্যে একটা বিশেষত্ব আছে। এক্ষেত্রে নারীবিশেষ কোনও পুরুষকে ভালবাসে না। সে ভালবাসে তার কতকগুলি গুণ বা qualitiesকে। মেয়েটী হয়ত এমন একটী ছেলে চাইছিল, যে দেখতে গৌরবর্ণ, লম্বা ছয় ফুট সাত ইঞ্চি, এম-এ পাশ, তার গাড়ী আছে বাড়ী আছে, বেতন চার পাঁচশ টাকা। এই গুণগুলি যা সে কল্পনায় দিনের পর দিন ভেবে এসেছে, হঠাৎ যদি তার অধিকাংশই কোন ছেলের মধ্যে দেখে ত তখনই সে তাকে ভালবেসে ফেলবে। এক্ষেত্রে সে ছেলেটাকে ভালবাসেনি, ভালবেসেছে তার গুণগুলিকে। এইরূপ গুণ আরও বেশী সংখ্যায় যদি সে আর একটী ছেলের মধ্যে পায়, ত সে তাকেও ভালবাসতে পারে, এমন কি তার পূর্ব্ব প্রেমাস্পদকে বিদায় দিয়েও। প্রেম যদি ধীরে ধীরে আসে, সেটাকে তাড়াতে হলে ধীরে ধীরে তাড়াতে হয়। এক্ষেত্রে কন্যা-বিশেষ ভালবাসে মানুষটাকে, তার গুণগুলিকে নয়। অপেক্ষাকৃত ভাল ছেলের কথা বলে তাকে ভুলান যায় না। তবে স্থায়ী কিছুই নয়, সময়ে সবই সেরে যায়, মনোবিজ্ঞান প্রণালীতে চিকিৎসার দ্বারাও এই সব রোগ বা বিকার হতে মেয়েরা সেরে উঠে। এ সম্বন্ধে পরে আমি আলোচনা করব; একমাত্র বিবাহ বা ঐ রকম একটা কিছুর বন্ধনই মাত্র প্রেমকে স্থায়ী করতে সক্ষম। আইনের ভয় সকলেই করে, তা সামাজিক বা রাজার, যে কোন আইনই হোক। আমার মতে চিন্তা, কর্ত্তব্য, অভ্যাস ও অনন্যোপায়তা প্রেমিক প্রেমিকাকে একনিষ্ঠ থাকতে সাহায্য করে। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে কথিত বিবাহটী যদি স্বাভাবিক হত, ত কনিষ্ঠাটী ধীরে ধীরে যুক্তি তর্ক সহনশীল ও সহজ সঙ্গ দ্বারা তার সেই অর্জ্জিত অজ্ঞাত প্রেম ধীরে ধীরে অপসারিত করত;

ভগিনীপতিটী তার নির্ব্বাপিতপ্রায় কামনায় পুনরায় ইন্ধন না দিলে, সে সহজেই সহজ হয়ে উঠত। কিন্তু এই বিশেষ ক্ষেত্রে তার সেই সুযোগ ও সময়ের অভাব ঘটেছিল। মনে মনে সে বুঝেছিল, ভবিষ্যতে তার বোন-ভগিনীপতির সাক্ষাৎ আর নাও মিলতে পারে। তাই শেষ পর্য্যন্ত সে ঠিক থাকতে পারে নি। এক কথায় কনিষ্ঠাটী নিজেই জানত না সে নিজে কি চায়। যে প্রেম ধীরে ধীরে গড়ে উঠে সেই প্রেমকে একদিনে অপসরণ করার চেষ্টায় মাত্র কুফলই ফলে। এরূপ চেষ্টা মেয়েটীর নিজেরও করা উচিত নয়, তার অবিভাবকদেরও নয়। এতে মন দেহ দুইই ভেঙ্গে পড়ে। এরূপ ক্ষেত্রে ভালবাসার যৌন রূপকে বদলে প্রেমরূপে আনার চেষ্টা করা উচিত কিংবা কৌশলে এক পক্ষকে দূরে সরিয়ে দিয়ে সময়ের হাতেই চিকিৎসার ভার দেওয়া উচিত।

প্রেম রোগ হিষ্ট্রিয়া রোগের মতই, কারুর সারে একদিনে, কারও পনের দিনে, কারও সারে ছয় মাসে কিন্তু তা সারেই। উপরোক্ত কাহিনীটী থেকে মেয়েদের আর একটী বিশেষ ধর্ম্ম পরিলক্ষিত হবে। সেটী হচ্ছে মেয়েদের হিংসা-ধর্ম্ম। আমার বিশ্বাস মেয়েরা যখন মরে এবং চিতা থেকে যখন তার ছাই উড়ে, তখন সেই ছাইয়ের সঙ্গেও উড়ে হিংসা। সতীন ত দূরে থাকুক, মরা মানুষকেও তারা সইতে পারে না, নিজের বোনকেও নয়। কথিত লোকটী যদি উভয় ভগ্নীর সহিত উভয়ের অজ্ঞাতসারে প্রেমাভিনয় করত বা অপরাধমূলক কার্য্য করত, তা হলে উভয় ভগ্নীই তাদের নিজেদের প্রভূত ক্ষতি সাধন করেও তার সেই অপকার্য্যে সহযোগিতা করত। উপরোক্ত কারণেই এইরূপ সম্ভব হয়। এই গুলিই মেয়েদের আইনজ্ঞদের মতে দুর্ব্বলতা। এই সব দুর্ব্বলতার জন্যই মেয়েদের আইনের আওতায় না ফেলে, তাদের রক্ষার বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

এইরূপ দুর্ব্বলতার একটী বিশেষ নিদর্শন নিম্নে দেওয়া হল; এই বিশেষ ক্ষেত্রে মেয়েটী মানুষকে ভালবাসেনি। সে ভালবেসেছিল কতকগুলি গুণাগুণকে। তার সেই প্রেম এসেছিল হঠাৎ, তাই হঠাৎই তার সেই প্রেম অপসারিত হয়। নিম্নের বিবৃতিটুকু পড়ে দেখুন। এই প্রেম ছিল হিষ্ট্রিয়া রোগ প্রসূত।

"কোনও এক বড় ঘরের শিক্ষিতা মেয়ে একজন বাঙ্গালী এ্যাংলোর সঙ্গে পলায়নের সময় ধরা পড়ে। কিছুতেই মেয়েটীকে নিবৃত্ত করা যায় না। রাত্রি ৮ ঘটিকায় মেয়েটীকে আমার কাছে হাজির করা হয়। বাপ, মা, আত্মীয়েরাও মেয়েটীর সঙ্গে ছিলেন। কোনও রূপ যুক্তি তর্কে মেয়েটীর মন নরম হয় না। শেষে আমাকেই প্রত্যক্ষভাবে নামতে হল। মেয়েটীর রোগ আমি বুঝে নিয়েছিলাম। আমি যে তারই পক্ষে এইরূপ একটা ভাব দেখলাম, তারপর মেয়েটীকে কাছে ডেকে বললাম—ভয় কি খুকি, আমি নিজে তোমাদের মিলন ঘটাব। কিন্তু বাবাকে যেন বলে দিও না। তবে এক সর্ত্তে। উপবাস করলে চলবে না। খাবার আনাচ্ছি, খেতে হবে। মেয়েটী আরও কাছে সরে, অনুযোগের স্বরে বলল—খাব, কিন্তু আপনি তাকে এনে দেবেন ত? কাল কিন্তু তাকে আমি দেখব। কোথায় রেখেছেন ওঁকে?

বুঝিয়ে সুঝিয়ে মেয়েটীকে খাওয়াতে আরম্ভ করলাম। ভুলিয়ে ভুলিয়ে বেশ কিছু বেশীই খাওয়ালাম। তারপর তাকে পাশের ঘরে বাপ মার কাছে বসিয়ে দিয়ে এলাম। রাত্রি দেড় ঘটিকায় পুনরায় মেয়েটীকে কাছে ডাকি। এ-কথা সে-কথার পর বললাম—দেখ খুকি, ভেবে দেখলাম আমি, বৃহত্তর স্বার্থের জন্য ক্ষুদ্রতর স্বার্থ বলি দেওয়া উচিত। যুদ্ধের সময় সীমান্তে যারা প্রাণ দেয়, তারা কি ভালবাসে না—তাদের প্রিয়তমা, স্ত্রী পুত্র বাপ মা, ভাই বোন, বন্ধু স্বজন সকলকেই তারা পিছনে ছেড়ে আসে, ভেবে দেখ তোমার সমাজের, তোমার বংশগৌরবের সবার উপর তোমার কর্ত্তব্যের কথা। কর্ত্তব্য লোকের মাত্র একটা থাকে না। প্রিয়তমা স্ত্রীর উপর যেমন একটা কর্ত্তব্য থাকে বাপ মা, পাড়াপড়শী ও দেশ এবং জাতির উপরও মানুষের কর্ত্তব্য আছে। একটা কর্ত্তব্য অতিমাত্রায় করতে গিয়ে আর একটা কর্ত্তব্যের অবহেলা করা মনুষ্যত্বের পরিচয় নয়। মানুষ কতদিনই বা বাঁচে, কিন্তু কর্ত্তব্য চিরকাল থেকে যায়, কালই তুমি, আমি বা তোমার "সে", মরে যেতে পারি। আজ যেটা তুমি সত্যি মনে করছ কাল সেটী তোমার মিথ্যা মনে হবে। তোমার অনুতাপ আসবে, কিন্তু ফেরবার উপায় থাকবে না। মনে রেখ, একদিন হয় ত ছোকরাটী তোমায় ফেলে পালাবে; কিন্তু বাপ মা খবর পেলে তোমায় বুকে তুলে নিলেও নিতে পারে। কিন্তু সে অবস্থায়ও তুমি শান্তি পাবে কি? ছেলেটীকে কতটুকুই বা তুমি জান। হয় ত শেষ পর্য্যন্ত তোমাকে ঠকাবে। আমি এমন অনেক ঘটনা জানি; বলি শোন। এ ছেলেটীকেও জানি, তারও অনেক কীর্ত্তিকলাপ বলব। তোমার মত ভাল মেয়ের কোনও ক্ষতি হয়, তা আমি চাই না।

দেখলাম আমার বক্তৃতা মেয়েটীকে বেশ একটু উতলা করে দিয়েছে। তার কারণও ছিল। ইচ্ছে করেই আমি মেয়েটীকে রাত্রি দেড়টায় কাছে ডাকি। অনেকেই জানেন, দিনে কেউ ভূত বিশ্বাস করে না, কিন্তু রাত্রে করে। তার কারণ রাত্রে মন (nervous) দুর্ব্বল থাকে। এই দুর্ব্বলতার আমি সুযোগ নিই। মেয়েটীকে পেটভরে খাওয়ানর মধ্যেও একটা উদ্দেশ্য ছিল। খুব বেশী খেলে, মস্তিষ্ক থেকে কিছুটা রক্ত উদরে নেমে আসে উদরকে (bowels) সুপরিচালিত করবার জন্যে। রক্তের অভাবে, মস্তিষ্কের শক্তিও কমে যায়। Brainও অনেকটা Suggestive হয়ে উঠে অর্থাৎ উহা একটা ভাল Receiver এ পরিণত হয়। এরূপ অবস্থায় মেয়েটী তার মনের গোপনতম কথাও বলে ফেলতে বাধ্য। আমি ধীরে ধীরে তার মনের প্রত্যেকটী জোট খুলে দিই এবং সে আসল সত্য উপলব্ধি করে। নরম সোফায় শোয়ানরও একটা কারণ ছিল। নরম সোফায় শুলে, স্নায়ুগুলি Relax হয়ে পড়ে এবং তখন সে আর তর্ক করতে পারে না। রাত্রে মরার গল্প খুব ফলপ্রদ হয়। তাই তাকে মরার কথাও শুনাই।

আশু ফল ফলেছে বুঝে, আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম —আচ্ছা খুকি, মানুষ কি ভালবাসে। খানিকটা কাঁচা মাংস, হাড়গোড়, জামাকাপড়কে—না মানুষের কৃষ্টি সংস্কৃতি ও গুণাগুণকে। যে গুণাগুণ বা যে লাবণ্য তোমাকে মুগ্ধ করেছে, সেগুলি যদি আর একটী ছেলেতে পাও ত তাতে তোমার আপত্তি কি?

এইরূপ আরও কিছুক্ষণ কথোপকথনের পর দেখলাম, মেয়েটীর কঠিন মন কাদার মত হয়েছে। তাড়াতাড়ি পাশের ঘর থেকে

তার শিশু ভ্রাতাটীকে এনে তার কোলেতে বসিয়ে জিজ্ঞেস করলাম —কে বল ত ? চিনতে পার একে।

মেয়েটী কেঁদে উঠে ভাইটাকে বুকে জড়িয়ে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে আমি তার মা ও অন্য বোনেদের কাছে এনে দিলাম। মেয়েটী মা'র পায়ে আছড়ে পড়ে কেঁদে উঠল—আমায় ক্ষমা কর মা। আমি অন্যায় করেছিলাম, আর কখন অবাধ্য হব না।

এত সহজে গোলযোগ মিটবে তা কেউ আশা করেনি। মেয়েটীর অবিভাবক খুসী হয়ে বললেন—আপনি বেশ বোঝাতে পারেন ত স্যার। সন্ধ্যার দিকে একবার করে যদি আসেন আমাদের বাড়ীতে ত কৃতজ্ঞ থাকব। কিছুক্ষণ করে মেয়েটাকে বুঝিয়ে আসবেন।

দেখলাম অভিভাবকটী একবার যে ভুল করেছেন, সেই ভুলই পুনরায় করতে চান। তাঁর মেয়ের মন এখনও তিনি বুঝতে পারেন নি। আমি তাঁকে আড়ালে ডেকে মেয়েটীকে তাড়াতাড়ি পাত্রস্থ করবার সুপরামর্শ দিয়ে বললাম—দেখি যদি সময় পাই, চেষ্টা করব যাবার।

যাবার আগে মেয়েটী আমার কাছে এসে আমার হাতখানা চেপে ধ'রে অনুযোগ করল—সত্যি যাবেন কিন্তু। রোজ যাবেন। আমি কথা দিচ্ছি, খুব ভালভাবে থাকব।

এ সম্বন্ধে আরও একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্। আমার কোনও এক বন্ধু বিয়ের পর জানতে পারেন, তাঁর স্ত্রী অপর একটী ছেলেকে ভালবাসে। বন্ধুটী আরও আবিষ্কার করেন তাঁর স্ত্রী সদা-সর্ব্বদাই উক্ত ছেলেটীর কথা ভাবে। এ সম্বন্ধে বন্ধুবর আমার পরামর্শ চান। আমি তখন তাকে এইরূপ পরামর্শ দিই। আমি তাঁকে বলি—দেখ এখন সে তোমার স্ত্রী। তাকে রক্ষা করার ভার এখন তোমার। এখন দুইটী মাত্র উপায় আছে। একটী উপায় হচ্ছে মেয়েটীকে ভুলিয়ে রাখা এবং কথিত ছেলেটী যাতে কখনও তার নজরে না আসে সে সম্বন্ধে লক্ষ্য রাখা। এই উপায়ে তার মনের এই বিকার সারা সময়সাপেক্ষ এবং এতে তার স্বাস্থ্যের হানিও হতে পারে। তবে সেরে সে উঠবেই। দ্বিতীয় উপায় হচ্ছে, ছেলেটীকে ভাইয়ের মত কাছে ডেকে আনা। ছেলেটী যদি কু-মতলবী না হয় ত এইটেই হবে সমীচীন। সুফলও ফলবে অল্প সময়ে। স্বামীর এই উদারতায় স্ত্রী মুগ্ধ হবে। পাশাপাশি তুলনার সুযোগ পেয়ে স্বামীর দিকেই সে বেশী ঝুঁকবে এবং কথিত ছেলেটীকে সে ভাইয়ের মত ভালবাসবে। মনে রেখ, ভালবাসা বোনের উপর, স্ত্রীর বা বান্ধবী যার উপরই হোক, আসলে জিনিসটা একই। বিষয়বস্তু একই, তফাৎ যা কিছু তা degree বা গুরুত্বের। Degree কম হলেই স্ত্রীর ভালবাসায় বোনের ভালবাসা হয়ে উঠে। এই ভালবাসার রূপান্তর ঘটান খুবই সহজ। তুমি এই দিক দিয়েই অগ্রসর হও। আমি তাকে আরও বলি—দেখ ভাই, তোমার বাটীর বাগানে যদি গোলাপ ফুটে, তা দেখবার অধিকার সবারই আছে। পথিক পথে চলতে চলতে তা দেখবেই। তোমার সঙ্গে যদি তার ঘনিষ্ঠতা থাকে ত সে বাগানে ঢুকে ফুলের কাছেও আসতে পারে, তবে সে যদি সে ফুলটা তুলতে চায় তাহলে অবশ্য নিশ্চয়ই তুমি আপত্তি করবে। তখন তুমি অবশ্যই বলবে—Look here, don't encroach on my right. মনে রাখবে কৃপণের ঘরেই চুরি হয় বেশী। নর্দ্দামায় ফুটা বুঁজিয়ে ও জানালার খড়খড়িতে পুডিং লাগিয়ে বিবাহিতা স্ত্রীকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখে তারাই—যাদের নিজের উপর বিশ্বাস নেই।

চিকিৎসা প্রণালী নির্ব্বাচন খুব সাবধানে করা উচিত। ভুল হলে সর্ব্বনাশ হতে পারে। কোনও একটী ছেলে একটী মেয়েকে জীবন-সঙ্গিনীরূপে না পেয়ে আত্মহত্যার প্রয়াস পায়। সে একটী উচ্চস্থান থেকে লাফায়, কিন্তু মরে না। তার পা ও হাত ফ্রাক্‌চার্ড হয়। বহু দিন চিকিৎসার পর সে আরোগ্য লাভ করে, কিন্তু চলবার ক্ষমতা তার থাকে না। বাটীর চাকর ঠেলা গাড়ী করে বিকালে তাকে বেড়িয়ে আনত। ইতিমধ্যে মেয়েটীর অন্যত্র বিবাহ হয় এবং সে এ সব ব্যাপার জানতেও পারে না। লোকেরা ঠাট্টা করে কথিত ছেলেটীকে অষ্টাবক্র মুনি বলত। একদিন প্রসঙ্গক্রমে মেয়েটীর স্বামী সেই মুনিবরের কথা স্ত্রীকে জানায়। সব কথা শুনে মেয়েটী উৎসাহিত হয়ে বলে উঠে—তাই না'কি। চল না একদিন বাঁদরটাকে দেখে আসি। এই-খানে পতিদেবতা একটা মস্ত ভুল করেছিল। সে বুঝতে পারেনি তার স্ত্রীর আসল মনের কথা। এইরূপ ভুলের ফল কত বিষময় হয় তা নিম্নের বিবৃতি পাঠ করলে বুঝা যায়।

"বিয়ের অনেক পরে আমি জানতে পারি আমার স্ত্রী কোনও একটী ছেলেকে ভালবাসত। আমি এও শুনি আমার সঙ্গে তার অমতেই তাকে বিয়ে দেওয়া হ'য়েছে। অথচ আমার প্রতি তার ব্যবহারের কোনও ত্রুটী পাই না। একদিন কথায় কথায় কথিত ছেলেটী সম্বন্ধে তাকে জিজ্ঞেস করি। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বলে—স্বার্থপর পুরুষ। নিশ্চিন্ত থাক। দেহের দিকে কোনও অঘটন ঘটে নি। তবে মনের দিক থেকে ঘটেছিল। নিশ্চিন্ত হয়ে আমি তার মনের দিকে নজর রাখি। জিজ্ঞাসা করলে স্ত্রী বলতেন—মন তার ঠিক আছে। পুরাণ কথা তিনি ভুলে গেছেন। কিন্তু আমি তা বিশ্বাস করিনা এবং বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করি। শেষে মিথ্যে করে তাকে জানাই, ছেলেটী মারা গেছে। কয়েকদিন মনমরাভাবে থেকে আমার স্ত্রী পুনরায় সহজ হয়ে উঠে এবং আমিও নিশ্চিন্ত হই। একদিন সিনেমায় সেই ছেলেটীর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। আমার স্ত্রী বুঝতে পারেন আমি মিথ্যে বলেছি। পরদিন সকালে দেখি আমার স্ত্রী আত্মহত্যা করেছেন।"

ক্রমশঃ



পুনরুজ্জীবন

শ্রীসনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সিনেমা দেখিয়া অতি প্রফুল্লচিত্তেই মোহিত বাড়ী ফিরিল। শীতকালের সন্ধ্যা ছয়টা; সূর্য্যের শেষ রক্ত রশ্মি ম্লান হইয়া উপায়হীনের মত মিলাইয়া যাইতেছে, পথে কত গাড়ী, লোক— সব কিছু মিলিয়া এক বিচিত্র স্বপ্নলোক। তাহার মনের স্বপ্নজাল অতি লঘু কুয়াসার মত পৃথিবীর বুকে মিলিয়া গিয়াছে। এ স্বপ্ন, এই আনন্দ-বেদনা সে এইমাত্র ছায়াছবি হইতে সংগ্রহ করিয়া ফিরিয়া আসিতেছে। কোথায় কোন দূর দেশের একটি তরুণের বাল্যস্বপ্ন আজ অকস্মাৎ নিমেষে তাহারই আপন হইয়া উঠিল, তাহার বাল্যের সব স্মৃতি উথলিয়া তুলিল; সে তাহাই রোমন্থন করিয়া চলিয়াছে, আর স্বপ্নের মায়াজাল রচনা করিতেছে।

কি সূক্ষ্ম কলাকৌশল, কি অভিনব অভিনয়চাতুর্য্য! উপলব্ধির আবেগে তাহার পা যেন মাটিতে পড়ে না! সর্ব্ব দেহ লঘু হইয়া যেন সেই অপরূপ আনন্দ-বেদনাময় স্বপ্নলোকে অভিযান করিয়াছে। কিন্তু বাড়ীতে আসিয়াই সে স্বপ্নের জাল চকিতে ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। একখানা খামের পত্র তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে। সে ছিঁড়িয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। লিখিয়াছে তাহারই গ্রামের এক বন্ধু—নাম শীতল। পত্রের বিষয়—শীতলেরই পিতা। পত্রখানা পড়িয়া সে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিল।

শীতলের বাবা লালমোহনবাবুকে সকলেই বলে পাগল। লোকে তাঁহাকে ঠিক বোঝে না, তবু তাঁহাকে বড় ভালবাসে এবং শ্রদ্ধা করে। অন্য পাঁচজনের চেয়ে মোহিত তাঁহাকে শ্রদ্ধা করে এবং ভালবাসে অনেক বেশী। কারণ সে তাঁহাকে খানিকটা বোঝে। আত্মভোলা শান্ত হাস্যমুখ মানুষটি পরের উপকার করিতে গিয়া পরের বোঝা ঘাড়ে করিতে গিয়া নিজের যথাসর্ব্বস্ব খোয়াইয়াছেন। কিন্তু তাহার জন্য তাঁহার দুঃখও নাই, অহঙ্কারও নাই। পরের বোঝা যখনই তিনি আপনার ঘাড়ে চাপাইয়াছেন তখন বুঝিয়া সুঝিয়াই চাপাইয়াছেন, তাই পরের দায়ে যখন আপনার ক্ষতি হইয়াছে তখন সে ক্ষতিতে বিচলিত হন নাই। এই করিয়াই তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব গিয়াছে। লোকে সে কথা বোঝে না। কেহ ঠাট্টা করে, কেহ সহানুভূতির সঙ্গে বলে বাতিকগ্রস্ত। কেহ একেবারে পাগল বলিয়া উড়াইয়া দেয়। তিনি সবই জানেন; দুঃখিতও হন না লোকের অজ্ঞতায়, কিম্বা তাহাদের অদূরদৃষ্টির জন্য তাঁহার ওষ্ঠ কৃপাহাস্যেও বিস্ফারিত হয় না। এই করিয়াই তো তিনি সারা জীবনটা কাটাইলেন! কিন্তু বৃদ্ধ আজ হঠাৎ আবার একি করিয়া বসিলেন! তাঁহার বয়স পঞ্চাশের ওপারে গড়াইয়া গিয়াছে, এই বয়সে আবার এ কি পাগলামী তাঁহার মাথায় চাপিল! পাগলামী নয়ত কি! বেশ পরের উপকার করিয়া যথাসর্ব্বস্ব জলাঞ্জলি দিয়াছেন সেও বেশ কথা! কিন্তু শেষকালে এ আত্মাহুতি দিবার কি প্রয়োজন ছিল? প্রবল প্রতাপ জমিদার নন্দনের অন্যায়ের প্রতিবাদ করিয়া আমরণ অনশনের কি প্রয়োজন ছিল? এ পাগলামী নয়ত কি? হয়ত ঠিকই হইতেছে। তাঁহার জীবন যে ভঙ্গীতে আত্মপ্রকাশ করিয়া বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে তাহার সমাপ্তির পরিণত ভঙ্গীই হয়ত এ ছাড়া কিছুই হইতে পারিত না।

কিন্তু বৃদ্ধ এ কি করিয়া বসিলেন! গ্রামের জমিদার, নিতান্ত সাধারণ ছোটখাট জমিদার নয়; ধনী শক্তিমান, প্রতিপত্তিশালী। তাহার উপর ইস্কুল-হাসপাতাল দিয়া সাধারণের উপর এবং সরকারকে তুষ্ট করিয়া যে উভয়বিধ প্রতিপত্তি তাঁহারা অর্জ্জন করিয়াছেন তাহাতে তাঁহাদের সহিত দ্বন্দ্বে পারিয়া উঠা সোজা কথা নয়। জমিদারের ছেলে আপনার জমিদারীতে আসিয়া খাজনা আদায় করিতে গিয়া যদি একটা প্রজাকে শাসনই করিয়াছে তাহাতে অন্যায়টা কি হইল! জমিদার তো প্রজাশাসন করিবে··· সে তো তাহারই কাজ! গ্রামের কোন্ চাষী প্রজা খাজনা দেয় নাই, উপরন্তু আবার ভূস্বামীর সহিত উদ্ধত বাদানুবাদ করিয়াছে। শক্তিমান শক্তিহীনের দম্ভ সহিবে কেন? প্রহার দিয়া আপনার শক্তির গুরুত্ব বুঝাইয়া দিয়াছে। আরও কয়েকজন অক্ষম এই পন্থার প্রতিবাদ করিতে গিয়া একই পন্থায় প্রহৃত হইয়া বুঝিয়াছে এবং স্বীকার করিয়াছে যে তাহাদের আস্ফালন ও দম্ভ অন্যায় হইয়াছে। প্রতিপক্ষ তাহাদের হইতে অনেক বেশী শক্তিশালী, আর সম্বন্ধটা যুধ্যমান দুইটা পক্ষের সম্বন্ধ নয়; যে সম্বন্ধ উভয়পক্ষে বর্ত্তমান তাহা পিতাপুত্রের সম্বন্ধ। প্রয়োজন হইলে উদ্ধত পুত্রকে পিতা শাসন করিতে পারেন এবং তাহাই করা উচিত। উদ্ধত সন্তান সম্প্রদায় একথা স্বীকার করিল, কিন্তু মানিলেন না ঐ বোকা, সংসারজ্ঞানহীন লালমোহন। পরের বোঝা বহন করাই যাঁহার স্বভাব এবং তাহাতেই যিনি আপনার সর্ব্বস্ব খোয়াইয়াছেন, তিনি এবারও একান্ত উপযাচকের মতই পরের বোঝা ঘাড়ে লইয়া চরম ক্ষতি স্বীকার করিতে অগ্রসর হইয়া আসিলেন। যাহারা অপমানিত হইয়া অপমানকে শুধু হজম নয়, একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে, তাহাদেরই অপমানের শোধ লইতে তাহাদের অপমানকে আপনার বলিয়া নিজের ঘাড়ে লইয়া তিনি আপনার চরম সর্ব্বনাশকে ডাকিতে কুণ্ঠা না করিয়া মরিতে বসিয়াছেন। যদি প্রহারকর্ত্তা জমিদারতনয় অপমানিত দীন প্রজাবর্গের নিকট আপনার অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা না করেন তবে তিনি আমরণ অনশন করিবেন।

ইহাই লালমোহনের ছেলে শীতলের পত্রের মর্ম্মার্থ। পত্র পড়িয়াই মোহিতের স্বপ্নজাল ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল; সে একান্ত বিরক্ত হইয়া উঠিল। পাগলামী নয়ত কি! কোথায় কে কাহার উপর অত্যাচার করিল, তাহারই প্রতিকার করিতে না খাইয়া শুকাইয়া মরিতে হইবে? কি অদ্ভুত কথা! এমন কেহ কখনও শুনিয়াছে! মোহিত শুধু বিরক্ত হইয়া উঠিল না; সমস্ত ব্যাপারটা তাহার কাছে হাস্যকর মনে হইল। সে আর হাসি সামলাইতে পারিল না। পৃথিবীতে ডন্ কুইক্সটের মত কতক-গুলা লোক অতি তুচ্ছ কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিয়া ভাবে—পৃথিবীর

মহা উপকার করিতেছি, কী মহান কারণের জন্ম কী মহোত্তম আত্মত্যাগ করিতেছি! আর এই লোকগুলার এ মোহ, এ পাগলামী মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত যায় না। তাহা ছাড়া ইহার পশ্চাতে অতি বিচিত্র গূঢ় প্রশংসা-লিপ্সা কাজ করে। মরিয়াও কি সুখ, লোক বাহবা দিবে! এই প্রশংসার কামনায় মানুষ মরিতেও রাজী। এ পাগলামী ছাড়া আর কী!

তবু শীতলকে একখানা পত্র লিখিতে হইবে। শীতলকে সে ভালবাসে। শীতলের সঙ্গে সে একসঙ্গে পড়িয়াছে। তাহার উপর লালমোহনকে সে শ্রদ্ধা করে এবং ভালবাসে। লালমোহনের শান্ত, বলিষ্ঠ চরিত্র তাহাকে আকর্ষণ করে। কিন্তু তাঁহার ঐ পরোপকার-প্রবৃত্তি ইদানীং যেন মাত্রা ছাড়াইয়া যাইতেছে। তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিতে হইবে শীতলের পত্রের মধ্য দিয়া। শীতলও যেন একটু বিরক্ত হইয়াছে পিতার অদ্ভুত আচরণে। পিতাকে সে বড় ভালবাসে, ভক্তি করে—শুধু পিতা বলিয়া নয়; লালমোহনের আদর্শ-প্রীতি ও জীবন মানুষ হিসাবেও শীতলের উপর যথেষ্ট আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। পিতার প্রতিটি কর্ম্মকে সে হিসাব করিয়া দেখে এবং প্রীত হয়। কিন্তু এ যেন বড় বাড়াবাড়ি হইতেছে, তাই শীতলও উদ্বিগ্ন, উৎকণ্ঠিত এবং বিরক্ত হইয়াছে—এটা পত্র হইতে মোহিত বুঝিতে পারিল। সমস্ত ব্যাপারটা তাহার কাছে অত্যন্ত হাস্যকর মনে হইতেছে। কিন্তু সে ভাব গোপন করিয়া, সে যে অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছে এবং লালমোহনের অত্যন্ত অন্যায় হইতেছে এই কথাটাই ঘুরাইয়া ফিরাইয়া লিখিতে হইবে।

সে পত্রখানা লিখিয়া শেষ করিল। নিতান্ত সামাজিক পত্র একখানি। ক্ষুধা পাইয়াছে, সে মায়ের কাছে গিয়া ছোট ছেলের মত ব্যবহার করিয়া, মাকে প্রীত ও ব্যতিব্যস্ত করিয়া আহার সমাধা করিল। তারপর একখানা ইংরাজী নভেল খুলিয়া মানব চরিত্রের অতি গূঢ় রহস্যলোকে ডুবিয়া গেল। কি বিচিত্র মানব জীবন!

অনেক রাত্রে বইখানা শেষ করিয়া পরম আরামে আহার করিয়া সে নিশ্চিন্ত হইয়া পড়িল ও কিছুক্ষণের মধ্যে গাঢ় ঘুমে অচেতন হইয়া গেল।

পরদিন প্রাতঃকাল।

সে উঠিয়া চা খাইয়া আবার পড়িতে বসিল। নূতন উপন্যাস একখানা। প্রফুল্লমনে বইয়ের পাতা উল্টাইতে গিয়া চোখে পড়িল শীতলের লেখা পত্রখানা। প্রফুল্ল মন নিমেষে বিরক্তিতে ভরিয়া উঠিল। গত দিনের মতই বিরক্তির সঙ্গে সঙ্গে একটা অবরুদ্ধ হাসির স্রোত তাহার গলা পর্য্যন্ত ঠেলিয়া উঠিল—অকারণেই। গত সন্ধ্যার মতই এই প্রাতঃকালে তাহার অন্তরে যে একটি অপরূপ সুষমার পূর্ণাঙ্গ মূর্ত্তি গড়িয়া উঠিতেছিল, লালমোহনের কথা মনে পড়িতেই কুয়াসায় মিলাইয়া গেল।

মোহিতের বয়স আর কত, চব্বিশ। সে এযুগের আদর্শে আপনাকে গড়িয়া তুলিয়াছে। নিতান্ত অবাস্তব আদর্শে সে বিশ্বাস করে না। অপমানের শোধ অপমান করিয়াই লইতে হয়। অপমানের শোধ নিজে অপমানিত হইতে হইতে মৃত্যুকে ডাকিয়া আনিয়া হয় না—তাহা সে পরিষ্কার বোঝে। লালমোহন আমরণ অনশন করিয়া সম্মান আদায় করিয়া অপমানের শোধ লইবেন এ কেমন কথা। আর অধিকার কাড়িয়া লইতে হয়। দাও বলিলে কেহ কোন দিন দেয় নাই বা দিবে না। এখানে কেবল প্রয়োজন শক্তির। তাই লালমোহনের পন্থা শুধু অবাস্তব নয়, হাস্যকর। সে হাসি থামাইবে কেমন করিয়া?

উত্তর সে ডাকে দিয়া আসিল। তারপর প্রতিকূল আঘাতে তাহার সযত্নরচিত যে স্বপ্নলোক ভাঙিয়া গিয়াছিল তাহাই পুনরায় রচনা করিতে আরম্ভ করিল। অকস্মাৎ তাহার স্বপ্নলোকের কেন্দ্রবাসিনী অনসূয়াকে মনে পড়িল। অনসূয়াদের বাড়ী কয়দিনই যাওয়া হয় নাই। অনসূয়া হয়তো অভিমান করিয়া আছে। বড় মধুর তাহার অভিমান! সে অভিমান ভাঙাইয়াও মোহিত বড় আনন্দ পায়। তাই সে মাঝে মাঝে ইচ্ছা করিয়াই অনসূয়াকে অভিমান করিবার সুযোগ দেয়। সে যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। লালমোহনের কর্ম্মে যে বিরক্তি তাহার মনে গত রাত্রি হইতে সঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল অনসূয়ার চিন্তায় তাহা কাটিয়া গেল। তবু আর একবার লালমোহনের হাস্যকর কাজের কথা ভাবিয়া বিরক্ত হইল।

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অপরাহ্ণ আসিল। আবার রৌদ্রের সাদা রং বাসি চাঁপার মত হলুদ বর্ণ হইয়া আসিয়া মেঘের কোলে স্বপ্ন ছড়াইয়া দিয়াছে, বাতাস দিনান্তের বিকীরিত তাপে ও শীতলতায় ভারী হইয়া উঠিয়াছে। অনসূয়া হয়ত গা ধুইয়া, ধোওয়া কাপড় পরিয়া, কপালে টিপ পরিয়া তাহারই অপেক্ষা করিতেছে। সে চঞ্চল হইয়া উঠিল। আর বিলম্ব নয়।

অনসূয়ার কথাই তাহার মনে বার বার ঘুরিতে লাগিল। অনসূয়ার সহিত তাহার আলাপ দীর্ঘদিনের নয়। তবু শান্ত কিশোরীটি তাহার সারা মন আজ জুড়িয়া বসিয়াছে এবং তাহার মনের কেন্দ্রে বসিয়া সকল প্রকারের স্বপ্ন সৃষ্টি করিতে অনুপ্রেরণা জোগাইতেছে। আরও সুখের কথা-উভয়েরই পিতৃপক্ষ এ বিষয়ে অনুকূল। বিবাহও আসন্ন। আজ সারা অপরাহ্ণ আপনার সর্ব্বমহিমা লইয়া যেন তাহাকে আশ্বাস দিতেছে—এ মিলন সুখের হইবে। অনসূয়ার প্রতি প্রীতিতে, সহানুভূতিতে, স্নেহে তাহার সর্ব্ব অন্তর অভিষিক্ত হইয়া উঠিল।

অনসূয়া সত্যই তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ছাদের আলিসায় ভর দিয়া রাস্তার অবিশ্রাম জনস্রোতের মধ্যে বিশেষ একটি মানুষ আসিতেছে কিনা—তাহাই সে দেখিতেছিল। মোহিত তাহাদের বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়াই ছাদের দিকে অভ্যাসমত তাকাইল এবং দেখিতে পাইল তাহার স্বপ্নলোক-বাসিনী কিশোরীর কোমল অনুসন্ধিৎসু মুখখানি তাহাকে দেখিয়াই একবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়া পরক্ষণেই অদৃশ্য হইল। অনসূয়া অভিমান করিয়া আছে—সে অভিমান ভাঙাইতে হইবে।

সূর্য্য অস্ত গিয়াছে। চা জল খাবার খাইয়া প্রায়ান্ধকার ক্রমঘনায়মান অন্ধকারের মধ্যে ছাদে সে অনসূয়ার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। অনসূয়া তাহারই দিকে চাহিয়া আছে। তাহার দেহ অন্ধকারে প্রায় অদৃশ্য। কেবল তাহার বড় বড় চোখের উপর সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলো আসিয়া পড়িয়াছে। আকাশে বড় বড়

কয়টা তারা উঠিয়াছে। এক ঝলক শীতল বাতাস তাহাদিগকে ছুঁইয়া বহিয়া গেল।

মোহিত বলিল—আচ্ছা অনু, বলত এখন কি বাতাস বইছে, ল্যাণ্ড-ব্রীজ না সী-ব্রীজ?

অনু শুধু বলিল—জানিনা।

অনেক সাধ্যসাধনার পর অনুর অভিমান ভাঙিল। মোহিত আবার প্রশ্ন করিল—বলত অনু, starএ আর planetএ তফাৎ বোঝা যায় কি করে?

অনু হাসিয়া বলিল—তুমি কি আমার মাষ্টারী করতে এসেছ? বাবা কি তোমাকে আমার মাষ্টারী করতে বহাল করতে চান না কি? তা যদি হয়, তা হলে আমি আমার দিনের ব্যবস্থা নিজেই করব বাপু। ও কথা যাক—শোন। পরশু আমার বাবা তোমার বাবার কাছে যাবেন—বিয়ের কথা পাকাপাকি করে ফেলতে —আজ বলছিলেন।

যে স্বপ্ন সে অবিরাম রচনা করিতে চাহিতেছিল ফিরিবার পথে তাহাই যেন কায়া ধরিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিল। তারার অস্পষ্ট আলোকে আলোকিত আকাশ হইতে অন্ধকারের পাথায় ভর করিয়া স্বপ্ন সুখ শান্তি পৃথিবীতে নিঃশব্দে নামিয়া আসিতেছে। এক অবিচ্ছিন্ন শান্তির মধ্যে সমস্ত পৃথিবী আবর্ত্তিত হইয়া চলিয়াছে।

গত কাল সন্ধ্যায় যে চিন্তা তাহাকে পীড়িত ও বিরক্ত করিতেছিল সে কোথায় উবিয়া গিয়াছে। যাহার কথা মনে করিয়া মোহিত বিরক্ত হইতেছিল তাহার কথা তাহার হয়ত আর মনেই নাই। লালমোহন বলিয়া কি কেহ কোন দিন ছিল?

পরদিন বেশ কাটিল।

তাহার পরদিন সে সমস্ত দিনটাকে একটা গানের সুরের মত রচনা করিবার কামনা লইয়া অতি প্রত্যূষে বিছানা ছাড়িয়া উঠিল। আজ অনুর পিতা তাহার পিতার নিকট আসিবেন তাহাদের বিবাহের কথাবার্ত্তা পাকা করিতে। তাহার জীবনের শ্রেষ্ঠতম অধ্যায়ের আজ ভূমিকা রচিত হইবে। সে একমনে প্রার্থনা করিল—তাহার আজিকার দিনটি গানের সুরের মত হউক। সে চা খাইয়া নিয়মমত প্রসন্ন মনে আপনার কর্ম্মে মনোনিবেশ করিয়াছে এমন সময় তাহার পরিকল্পিত দিনের বুকে উল্কাপিণ্ডের মত শীতলের চিঠি আসিয়া পড়িয়া তাহার সুর বাঁধা বীণার তারে আগুন ধরাইয়া দিল।

শীতল লিখিয়াছে—লালমোহনকে তাঁহার কর্ম্ম হইতে প্রতিনিবৃত্ত করা অসম্ভব। তিনি অনশন আরম্ভ করিয়াছেন এবং বেশ প্রফুল্লভাবেই কয়দিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। কিন্তু আজ দুই দিন তিনি বড় দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন। অনেকে তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কেহই পারে নাই। তিনি শান্ত হাসিমুখে সকলের অনুরোধই উপেক্ষা করিয়াছেন।

মোহিত চঞ্চল হইয়া উঠিল। শুধু চঞ্চল নয়, রাগে সে প্রায় আগুন হইয়া উঠিল। রাগ শুধু লালমোহনের উপর নয়, শীতলের উপরও। কোথায় দূরে কোন পল্লীকুটিরে এক বৃদ্ধ কতকগুলা অশিক্ষিত, ভীরু, আত্মসম্মানজ্ঞানহীন মানুষের জন্য অকারণে মরিতে বসিয়াছে—তাহাতে তাহার ক্ষতি বৃদ্ধি কি? তাহাকে জানাইয়া লাভ কি? সে কি করিতে পারে? আর তাহার করিবারই বা কি আছে? আর সে করিতেই বা যাইবে কেন? তাহার আপনার ব্যক্তিগত জীবনের সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, শান্তি, সুন্দর ভবিষ্যৎ নষ্ট করিবার অধিকার শীতলেরও নাই, লালমোহনেরও নাই। প্রভাতের শান্ত সৌন্দর্য্য তাহার চোখের সম্মুখ হইতে সরিয়া গিয়া যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল। তাহার কি? তাহার কি!! সে বার বার সেই বৃদ্ধের মৃত্যুকামনা করিল। মরুক—সে মরুক। তাহার পাগলামীর, ভণ্ডামীর তাহা হইলে অবসান ঘটিবে।

পরক্ষণেই সে শিহরিয়া উঠিল। ছি-ছি-ছি, সে এ কি করিতেছে! সে মৃত্যুকামনা করিতেছে! সে একজনকে মরিবার অভিশাপ দিতেছে! আর দিতেছে কাহাকে? একজন শান্ত সহিষ্ণু বৃদ্ধ—যে চিরটা কাল পরের বোঝা আপনার ঘাড়ে লইয়া বহিয়া চলিয়াছে, আর আজ তাহাদেরই জন্য মরিতে বসিয়াছে, তাহাকে সে মরিবার অভিশাপ দিতেছে! সে শিহরিয়া উঠিয়া বার বার বৃদ্ধ লালমোহনের দীর্ঘজীবন কামনা করিল। লালমোহন এ সঙ্কট হইতে সগৌরবে উত্তীর্ণ হউন, তিনি শতায়ু-সহস্রায়ু হউন। বেদনায়, করুণায়, মমতায় তাহার সারা মন ভরিয়া উঠিল। তাহার মনে লালমোহনের অতি সাধারণ মুখখানি ভাসিয়া উঠিল। দন্তহীন, দীর্ঘনাসাসমন্বিত একখানি মুখ। সে জীর্ণ ওষ্ঠ দুইটী কখনও ব্যথার কাহিনীতে স্পন্দিত ও কখনও অপমান-অত্যাচারের কথায় স্ফুরিত হইতে সে দেখিয়াছে। কিন্তু তাঁহার চক্ষে সব সময়েই বৃদ্ধ এক শান্ত নির্লিপ্ত প্রসন্ন দৃষ্টি রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন।

আজ হয়ত সেই শীর্ণ ব্যথিত মুখ অনশনে আরও ক্লিষ্ট, আরও শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। হয়ত চক্ষের ও ওষ্ঠের সেই হাস্য নিতান্ত জৈব কষ্টে এবং মানুষের নিগ্রহের দুঃখে ম্লান হইয়া মিলাইয়া যাইতে বসিয়াছে। তাহার হৃদপিণ্ডটা দুঃখে একবার যেন ছিঁড়িয়া বাহির হইয়া আসিতে চাহিল। তাহার চক্ষুর সম্মুখ হইতে প্রভাতের প্রসন্ন আলোক যেন মিলাইয়া গিয়া গোধূলির অস্পষ্ট অন্ধকারে তাহার চারিদিক ছাইয়া গেল।

তাহার সম্বিৎ ফিরিলে তাহার মনে হইল—এ কি করিতেছে সে? কে কোথায় নিতান্ত কাল্পনিক কারণে মরিতে বসিয়াছে, আর সে তাহারই উপর আপনার মনের রং মিশাইয়া সে চিন্তাকে আরও ব্যথাতুর করিয়া তুলিতেছে! এ তো নিতান্তই ভাব-প্রবণতা। এ চিন্তা জলাঞ্জলি দিতেই হইবে। নয়তো তাহার ঘাড়ে ভূতের মত চাপিয়া বসিবে। লালমোহন বাঁচুন বা মরুন —তাহাতে তাহার কিছুই আসে যায় না। শীতলের পত্রের উত্তর আর দেওয়া হইবে না। তাহার উত্যক্ত হইবার কোন কারণই তো নাই।

গাড়ী বারান্দায় মোটরের শব্দ উঠিল। সে একবার আপনার সমস্ত শরীরে ঝাঁকি দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। অনসূয়ার বাবা আসিয়াছেন—তাহাদের স্বাচ্ছন্দ্য-সুন্দর ভাবী জীবনের ভূমিকা রচনা করিতে। অনসূয়া—তাহার অনু! অনুকে লইয়া একান্তে নব জীবন রচনা করিয়া সে সুখী হইবে। সে বই টানিয়া লইয়া পড়িতে বসিল।

কিছুক্ষণ পরে অনুর বাবা হাসিমুখে তাহার বাবার ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহার পিছন পিছন তাহার বাবাও বাহির হইয়া আগাইয়া দিতে আসিলেন—তাঁহার ঠোঁটেও মিষ্ট হাস্যরেখা। মোহিত বুঝিল সকল সমস্যার সমাধান হইয়াছে। সমস্ত প্রভাত আবার আপনার রূপে, রসে, গন্ধে তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

এ অবস্থায় আর পড়া চলে না। একবার বাগানে ঘুরিয়া আসিতে হইবে। সে বইখানা বন্ধ করিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গেই দৃষ্টি পড়িল শীতলের চিঠিখানার দিকে। লালমোহনের অনশন-সংবাদ-সমন্বিত পত্র। আবার তাহার সারা বুকটা জ্বলিয়া উঠিল। লালমোহন মরিতে বসিয়াছেন তো সে কি করিবে! রাগে অধীর হইয়া সে পত্রখানা তুলিয়া লইয়া কুচিকুচি করিয়া ছিঁড়িয়া সারা ঘরময় ছড়াইয়া দিল। তারপর দ্রুতপদে বাগানের দিকে বাহির হইয়া গেল।

বাগানে সে অনেকক্ষণ ঘুরিয়া বেড়াইল। তাহার সযত্ন-রচিত স্বপ্নসৌধ ভাঙিয়া পড়িতেছে, তাহার শান্তি যাইতে বসিয়াছে। সে কি করিবে? এ তাহার কি হইল! একান্ত অসহায়ভাবে শূন্যদৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিতে লাগিল। তাহার দৃষ্টি পড়িল বাগানের বেড়ার কাঁটাগাছগুলার উপর। আলোক-লতার অজস্রতায় কয়দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বেড়ার গাছগুলা ঢাকা ছিল। মালী সেগুলা ছিঁড়িয়া জঞ্জাল বলিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল। সে তো এই কয়দিন আগের কথা। অসহায়, বলহীন পরভৃতের যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তাহা দিয়াই আবার কাঁটাগাছগুলাকে জড়াইয়া ধরিতে চাহিতেছে, কয়েকটা ইতিমধ্যে ধরিয়াছে। জীবনের প্রতি কি গভীর মমতা! আর লালমোহন সেই জীবনকে নষ্ট করিতেছেন হাসিমুখে। এ কি বোকামী, পাগলামী—না অন্য কিছু?

এই যে অনসূয়ার বাবা যে সুখের ও আনন্দের সূচনা করিয়া দিয়া গেলেন তাহাতে তাহার কত প্রসন্নতা আসিবার কথা, কত স্বপ্ন দেখার কথা তাহার। কিন্তু কেন সে আনন্দে সে ভাসিয়া যাইতে পারিতেছে না! কেন আজ জীবনের এই মাহেন্দ্রক্ষণে তাহার ভাবী বধূ অনসূয়ার কোমল মুখখানি মনে না পড়িয়া বার বার বৃদ্ধ লালমোহনের দন্তহীন শীর্ণ মুখখানি মনে পড়িতেছে! এ কি দুর্গ্রহ!

অনসূয়াকে সে ভালবাসে, গভীরভাবে ভালবাসে। কিন্তু বহুদূরবর্ত্তী কোন পল্লীর প্রান্তে জীর্ণ কুটীরবাসী বৃদ্ধের সহিত তাহার কি সম্বন্ধ আছে যাহাতে আজ অনসূয়াকে মনে না পড়িয়া শুধু তাঁহাকেই মনে পড়িতেছে, আর অনসূয়ার প্রেমে পূর্ণ হৃদয়ের পাত্র ছাপাইয়া ঐ বৃদ্ধের জন্য মমতা ও করুণা উচ্ছ্বসিত হইয়া ঝরিয়া পড়িতেছে।

আবার মমতা মুছিয়া ফেলিয়া সে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। শীতলকে সে পত্রের উত্তর দিবে না, অথচ সে পত্র লিখিয়া কেবল তাহাকে উত্যক্ত করিতেছে। কী অন্যায়! তাহাকে বিশেষ করিয়া লিখিবার কি প্রয়োজন ছিল!

সুখের বহু বিচিত্র উপকরণ উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও সে একটা গভীর বিষাদের মধ্যেই সমস্ত দিনটা কাটাইল। আজ কত কল্পনা করিবার তাহার ছিল, কত স্বপ্ন রচনার কথা আজ তাহার। কিন্তু সব সত্ত্বেও সারাদিন তাহার অতি গভীর বেদনা ও অবহেলায় কাটিল। যেন একখানা আকারহীন কৃষ্ণ ছায়াযবনিকা তাহার জীবন ও তাহার মধ্যে আসিয়া ব্যবধানের সৃষ্টি করিয়া তাহার মনের উপর ঘন কালো ছায়া বিস্তার করিয়াছে। সে অন্ধকার যেন অন্তহীন এবং অবিরাম।

রাত্রেও ভাল ঘুম হইল না। সারা রাত্রি অকারণেই বার বার তন্দ্রা আসিল এবং ভাঙিয়া গেল।

সকালে উঠিয়াই সে ঠিক করিয়া ফেলিল—এ রোগের প্রতিকার একমাত্র আছে অনসূয়ার কাছে। অনসূয়ার কাছেই আজ সারাদিন সে কাটাইয়া আসিবে।

ঠিক ফল মিলিল। অনসূয়ার সঙ্গে দিনের অধিকাংশ ক্ষণটা কাটাইয়া তাহার মনের সমস্ত বিষাদ জড়তা কাটিয়া গেল। সে স্পষ্ট বুঝিয়াছে জীবনে তাহাকে সুখের সন্ধান অনু দিতে পারিবে। সে তাহার কল্যাণস্পর্শে তাহার সকল দুঃখ, অবসাদ ঘুচাইয়া দিবে। অনুকে লইয়া সে সুখী হইবে। আবার আকাশ জুড়িয়া স্বপ্ন নামিয়া আসিতেছে। তাহার সুখে যেন বিশ্বসংসার সুখী হইয়া উঠিবে।

কয়টা দিন বেশ কাটিল। লালমোহনের কথা সে এক রকম প্রায় ভুলিয়া গিয়াছে, ইচ্ছা করিয়াই ভুলিয়া গিয়াছে। যাহা পীড়াদায়ক, যাহাতে জীবনের সকল সুখ সকল শান্তি নষ্ট হইয়া যায়, তাহা মনে পুষিয়া রাখিয়া লাভ কি! জীবনেরই তাহাতে ক্ষতি হয়। মোহিত জীবনকে আন্তরিকভাবে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে। তাহাকে তাই ভুলিতেই হইবে। তবু মাঝে মাঝে মনের কোন অতল অন্ধকার দেশ হইতে লালমোহনের দন্তহীন মুখ ভাসিয়া উঠে, তাহার মন ক্ষণিকের জন্য অকারণ অনুশোচনায়, মমতায়, রাগে এক সঙ্গে রঞ্জিত হইয়া উদ্বেল হইয়া উঠে। সে অস্থির হইয়া পড়ে। কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্যই। যেন কোথায় একটা কাঁটা কবে ফুটিয়াছে ভুলিয়া গিয়াছি; তবু মাঝে মাঝে এক একবার সেটা নড়িয়া চড়িয়া ব্যথা দিয়া জানাইয়া দিয়া যায়—আমি আছি।

তাহা সত্ত্বেও কয়দিন বেশ কাটিল। বেশ কাটিবে না? বাহিরে অজস্র সুখ তাহার জন্য আজকাল অহরহ সঞ্চিত হইতেছে যে! কন্যা আশীর্ব্বাদ হইয়া গিয়াছে। দুই এক দিনেই বিবাহের দিন স্থির হইয়া যাইবে।

অকস্মাৎ সমস্ত শান্তি ভঙ্গ করিয়া আবার শীতল তাহাকে পত্রাঘাত করিল। লালমোহনের অবস্থা বড় খারাপের দিকে গিয়াছে। জমিদারনন্দন তাঁহার সহিত গোপনে দেখা করিয়া তাঁহাকে অনশন হইতে নিবৃত্ত হইতে পরামর্শ দিয়াছিলেন এবং ভবিষ্যতে প্রজাদের সহিত ভাল ব্যবহার করিবেন এমন প্রতিশ্রুতিও নাকি দিয়াছিলেন। তবে তিনি প্রকাশ্যে প্রজাদের কাছে ক্ষমাভিক্ষা এবং অপরাধ স্বীকার করিতে স্বীকৃত হন নাই। তাই লালমোহনও অনশন ভঙ্গ করেন নাই। তিনি হয়ত আর বাঁচিবেন না। তাঁহার ওজন অনেক কমিয়া গিয়াছে, আহার আর প্রায় করিতেই পারেন না। চোখের দৃষ্টিও প্রায় নষ্ট হইয়াছে। তিনি মৃত না হইলেও প্রায় মৃতকল্প। যদি অনশন ত্যাগ না করেন কবে কয়দিনের মধ্যেই অতি সাংঘাতিক পরিণাম তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে।

পত্রখানা পাইয়া মোহিতের সমস্ত আনন্দ তিক্ত হইয়া গেল। নিজের উপর অতি গভীর ক্ষোভে ও বেদনায় সে অধীর হইয়া উঠিল। এখানে সে তরুণ বয়সে প্রতি মুহূর্ত্তে আপনার সুখের স্বপ্ন দেখিতেছে, আর পল্লীতে একটি বৃদ্ধ পরের বোঝা ঘাড়ে লইয়া মরিতে বসিয়াছে। কি তাহার আদর্শ বোধ। কি তাহার নিষ্ঠা! নিজের উপর ধিক্কারে তাহার সারা মন ছি-ছি করিয়া উঠিল। সে এ কি করিতেছে! কিন্তু সে কি করিবে? তাহার হাত পা যে বাঁধা। অনু যে তাহাকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। সে কি করিবে!!

সারাদিন তাহার মনে হইল—শীতল যেন ঐ পত্রগুলা তাহাকে এমনিই লেখে নাই। উহার মধ্যে লালমোহনের আদেশে শীতল তাহাকে বার বার আহ্বান করিয়া ইঙ্গিতটা উহ্য রাখিয়াছে। এই কথাটাই তাহাকে বার বার সমস্তদিন পীড়া দিল। লালমোহন যদি মরিয়া যান, আর সে যদি তাঁহার শূন্যস্থান পূরণ করিতে যায় তবে তাহাকেও তো লালমোহনের মত তিলে তিলে মৃত্যুকে বরণ করিতে হইবে! ধীরে ধীরে চোখের দৃষ্টি তাহার কমিয়া আসিবে, শরীর লঘু লইয়া সমস্ত পেশী, স্নায়ু, শিরা, উপশিরা ক্ষুধায় শুকাইয়া চীৎকার করিবে—ক্রমে মৃত্যু আসিয়া এই স্পন্দমান জীবনের উপর স্থিরভাবে যবনিকা টানিয়া দিবে। সর্ব্বাঙ্গ তাহার শিহরিয়া উঠিল। তাহার শরীরের সমস্ত শিরা উপশিরা পেশী স্নায়ু যেন কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার নিকট প্রার্থনা করিল—না, না, ইহা করিও না গো, আমাদের মারিও না। আমাদের সুখে স্বচ্ছন্দে স্বাভাবিকভাবে থাকিতে দাও। সে মরিয়া যাইবে? এত সুখ, এত স্বপ্ন, তাহার ভাবী জীবন, তাহার বাবা-মা, তাহার অনসূয়া, অনুকে ছাড়িয়া সে কোথায় যাইবে? মরিতে সে পারিবে না! লালমোহন আপনার আদর্শ লইয়া, মানব-প্রেম লইয়া স্বর্গে যান! সে পারিবে না! ভগবান তাহাকে ক্ষমা করুন! তাহার জীবনদেবতা নিশ্চয়ই তাঁহাকে মার্জ্জনা করিবেন!

সে স্থির করিয়াছে এ বিষয় লইয়া সে আর ভাবিবে না। কিন্তু চিন্তা যে ছাড়ে না, ঐ একই চিন্তা তাহাকে অহরহ আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। সে কি করিবে? সে ছুটিল অনসূয়ার কাছে। উদ্ধারের উপায় অনসূয়া জানে।

সে প্রায় ছুটিতে ছুটিতেই অনসূয়ার কাছে হাজির হইল। অনু কি কাজ করিতেছিল, কাজ ফেলিয়া হাসি মুখেই তাহাকে অভ্যর্থনা জানাইতে উঠিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু মোহিতের পাণ্ডুর ক্লিষ্ট মুখ দেখিয়াই তাহার হাসি মিলাইয়া গেল। সে কাছে আসিয়া উদ্বিগ্ন মুখে তাহার হাতে হাত রাখিয়া বলিল—'কি হয়েছে তোমার?'

আস্তে আস্তে সে যতটা পারিল খুলিয়া অনসূয়াকে বলিল। অনুকে না বলিলে সে বাঁচিবে কি করিয়া! সব শুনিয়া অনু একবার খুব হাসিল। তারপর গম্ভীরভাবে তাহাকে বলিল—কি পাগল তুমি! এই নিয়ে তুমি ভেবে মরছ? ভেবে কি হবে? তুমি যাঁর কথা বললে তিনি মহৎ মানুষ! তাঁরা আদর্শের জন্তে মানুষের জন্তে চরম আত্মত্যাগ করতে পারেন। কিন্তু আমরা সাধারণ মানুষ, আমরা তা পারি না। তার অধিকারও আমাদের নাই। তা ছাড়া তুমি তো এখন একা নও। তোমার বাবা মা আছেন। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিল—তা ছাড়া আমি আছি।

অনুর গম্ভীর অভিজ্ঞের মত কথায় মোহিত আশ্চর্য্য হইল, তাহার হাসিও আসিল। কি সহজ স্বাভাবিক বুদ্ধি অনুর! যে কথাগুলা সে নিজেও ভাবিয়াছিল কিন্তু জোর পায় নাই, অনুর মুখের সেই কথাতেই সে কত জোর পাইল। সারাদিন সে নিশ্চিন্ত আরামে আহার করিল, ঘুমাইল, তাস খেলিল, অনুর সহিত গল্প করিয়া কাটাইল। অপরাহ্ণে ফিরিবার সময় পূর্ব্বাহ্ণের কথার জের টানিয়া অনু কোমলকণ্ঠে তাহাকে বলিল—ও নিয়ে তুমি মন খারাপ করো না। ও সব কথা তুমি ভেব না, বুঝলে। তারপর হাসিয়া যোগ দিল—তার বদলে আমার কথা ভেব, কেমন? অনসূয়া আর দাঁড়াইল না, চলিয়া গেল। যাইবার সময় তাহার হাতের গোলাপ কুঁড়িটি তাহার হাতে যেন তাহাকে না জানাইয়া গুঁজিয়া দিয়া গেল।

গোলাপ কুঁড়িটিকে নানা ভঙ্গিতে স্পর্শ করিতে করিতে সে বাড়ী ফিরিল। সে বার বার মনে মনে কামনা করিল যে আজ যেন তাহার স্বপ্নে সর্ব্ব সুষমায় মণ্ডিত হইয়া অনু তাহাকে দেখা দেয়।

রাত্রি দ্বিপ্রহর। ভীষণ দুঃস্বপ্ন দেখিয়া তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। স্বপ্নে সে যাহাকে দেখিল সে তো অনসূয়া নয়! লালমোহনের মুখ অতি দীর্ঘ সময় ধরিয়া তাহাকে স্বপ্নে দেখা দিল। সে দেখিল, স্পষ্ট প্রত্যক্ষ দেখিল, লালমোহন মরিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মুখের প্রতিটি পেশী নিস্পন্দ, প্রাণ-লেশহীন এবং স্থির। শীর্ণ মুখ অনাহারের যন্ত্রণায় আরও দীর্ঘ ও শীর্ণ হইয়াছে, মুখের রং হইয়া গিয়াছে কালো। নিষ্পলক স্থির চোখ দুইটাতে কাচের চোখের মত স্থির অর্থহীন দৃষ্টি। শুধু দন্তহীন সঙ্কুচিত মুখ বিবর হইতে অবিরাম অর্থহীন রব বিকট শব্দে বাহির হইয়া সেই দেহহীন মৃত মুণ্ডের চারিদিকে কুলাল-চক্রের মত প্রচণ্ড ঘূর্ণনে শত শত, লক্ষ লক্ষ, ক্রমে কোটি কোটি শব্দচক্রের অন্তহীন তীক্ষ্ণ বৃত্ত রচনা করিতেছে। আর যেন তাহাকে ডাকিতেছে—আয়, আয়, আয়!

ভয়ে তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। শীতের রাত্রে সে ঘামিয়া উঠিয়াছে। ঘুম ভাঙিতেই সেই অর্দ্ধ তন্দ্রা-জাগরণের মধ্যে সে বুঝিতে পারিল ষ্টীমারের বাঁশী গম্ভীর শব্দে বাজিতেছে। বলিষ্ঠ তরুণ অন্ধকার ঘরের মধ্যে একাকী ছোট শিশুর মতই ভীত হইয়া উঠিল।

সমস্ত দিনটা তাহার এক অতি গভীর এবং অনিশ্চিত শঙ্কার মধ্যে কাটিল। ক্লান্তিতে সমস্ত দেহ যেন ভাঙিয়া পড়িতে চাহিতেছে। ভাল করিয়া আহার সে করিতে পারে নাই। তবু শুইতে কি বিশ্রাম করিতে ভয় করে, যদি নিদ্রার মধ্যে আবার সেই মুখ দেখা দেয়।

অতি মন্থর তালে দিন গড়াইয়া অপরাহ্ণে পৌছিল। সমস্ত পশ্চিম আকাশ রাঙা মেঘে ভরা। কই আজ তো আকাশ হইতে স্বপ্ন নামিয়া আসিতেছে না। তাহার স্বপ্নসৌধ ভাঙিয়া গিয়াছে। পশ্চিমের রাঙা মেঘ হইতে যেন আজ ক্ষণে ক্ষণে রক্ত ক্ষরিত হইয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। কয়দিনই লালমোহনের সংবাদ সে পায় নাই। সেই কথাই সে ভাবিতেছিল, এমন সময় চাকর

আসিয়া চিঠি দিয়া গেল। শীতলের চিঠি। চিঠিখানা খুলিতে তাহার হাত কাঁপিতে লাগিল। মনে ভয়, পাছে পত্রখানায় লালমোহনের মৃত্যু সংবাদ থাকে। সে মনে মনে একান্ত করিয়া প্রার্থনা করিল যেন লালমোহন শতায়ু হন, যেন এ পত্রে তাঁহার মৃত্যু সংবাদের পরিবর্ত্তে আরোগ্য সংবাদ থাকে। সে কিছুক্ষণ পত্রখানা খুলিতে পারিল না। তারপর মনের সমস্ত জোর একত্রিত করিয়া পত্রখানা খুলিয়া ফেলিয়া এক নিঃশ্বাসে পড়িয়া শেষ করিল।

লালমোহন দেহত্যাগ করিয়াছেন। সে কিছুক্ষণ স্থাণুর মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া একটা পরম স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিল। সে তাহার কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ফেলিয়াছে। সে যাইবে—লালমোহনের শূন্যস্থান পূর্ণ করিতে সে যাইবে। কালই যাইবে।

সহসা তাহার শরীরের সমস্ত পেশী যেন কিসের স্পর্শে দৃঢ়ীভূত হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইল তাহার মাথা যেন গিয়া স্পর্শ করিয়াছে রক্ত-আলোক-উদ্ভাসিত মেঘলোকে। উর্দ্ধোত্থিত দুই বাহুতে যেন চন্দ্র-সূর্য্যকে ছিঁড়িয়া আনিবার শক্তি। তাহার পদ-যুগলের চাপে পৃথিবী যেন থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে।

কিন্তু সে এক মুহূর্ত্ত। পরক্ষণেই সমস্ত দেহ শিথিল হইয়া উঠিল, সে পরলোকগত বৃদ্ধের জন্য রুদ্ধ আবেগে ভাঙিয়া পড়িল। যে বিপুলবিস্তার কৃষ্ণ ছায়া তাহাকে এ কয়দিন আচ্ছন্ন রাখিয়াছিল, সে যেন এক ফুৎকারে উড়িয়া গিয়া জীবন যেন আবার তাহার সত্য স্বরূপ তাহার কাছে উদ্ঘাটিত করিল। তাহার চব্বিশ বছরের জীবনখানি তাহার কাছে একবার অর্থহীন মনে হইল। পরক্ষণেই মনে হইল—না, ঠিকই হইয়াছে। সে এতদিন যে খেলা করিয়াছে তাহা না হইলে সে এখানে আসিত কি করিয়া। সে সসম্ভ্রমে আপনার সমস্ত জীবনকে পরম শ্রদ্ধায় প্রণতি নিবেদন করিল।

গোধূলির রক্ত আলোকের সঙ্গে শেষ স্বপ্নসৌধ ভাঙিয়া মিলাইয়া গেল। সন্ধ্যা নামিয়া আসিল, তাহারই সঙ্গে শেষ তারালোকবিন্দুখচিত আকাশ হইতে অন্ধকারের কালো পাখায় ভর করিয়া নামিয়া আসিল পুঞ্জ পুঞ্জ নবতর স্বপ্ন।

দুর্ভিক্ষপীড়িত বাংলার আগামী বৎসর

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ

বাংলা সরকারের চিত্তরঞ্জন এভিনিউস্থ স্থায়ী শিল্পপ্রদর্শনীতে ১৯৩৯ সালের ৬ই ডিসেম্বর এক বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তৎকালীন অর্থসচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয় এদেশে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে আনন্দপ্রকাশ করিয়াছিলেন এবং আশা করিয়াছিলেন যে ইহাতে কৃষকদের দুঃখ ঘুচিবে। তখন যুদ্ধের প্রথম অবস্থা এবং যুদ্ধ চলিতেছিল সাতসমুদ্র তের নদী পারে। জাপান তখনও যুদ্ধে নামে নাই, আমেরিকা তখনও ভবিষ্যত বীরত্বের কোন লক্ষণই দেখায় নাই। যুদ্ধের নামে সেদিন ভারতবর্ষ স্বাবলম্বী হইবার স্বপ্ন দেখিয়াছিল, তাহার একান্ত আশা ছিল—যেসব শিল্প ভারতে স্থাপিত হয় নাই তাহা এইবার স্থাপিত হইবে এবং যেগুলি ছোট আকারে আছে তাহাদিগকে বাড়াইয়া তোলা হইবে। সেদিন খাদ্যাদির মূল্যবৃদ্ধিতে কৃষকের লাভ হইবার সম্ভাবনা ছিল, কারণ তখনও পর্য্যন্ত মূল্য সাধারণের আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যায় নাই। জীবনমান তখন সর্ব্বসাকুল্যে মাত্র শতকরা কুড়ি পঁচিশ ভাগ বাড়িয়াছিল, অথচ যুদ্ধব্যবস্থার নানা প্রয়োজনীয় অর্ডারে দেশে মুদ্রার যোগান রেখা লক্ষণীয় ভাবেই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। যদিও জার্ম্মানী আমাদের আমদানী বাণিজ্যে তৃতীয় এবং রপ্তানী বাণিজ্যে চতুর্থ স্থান অধিকার করিত এবং তাহার যুদ্ধ ঘোষণার ফলে রসায়নিক, ওষুধপত্র, চামড়া পাকা করিবার দ্রব্যাদি, যন্ত্রাদি, ইস্পাত ও নানাপ্রকার ধাতুর আমদানী এদেশে বন্ধ হইয়া গেল তবু আমরা আশা করিয়াছিলাম জাপান, আমেরিকা প্রভৃতি দেশ হইতে উপরোক্ত জিনিষগুলি আনাইয়া আমরা কাজ চালাইয়া দিব এবং সরকারের চেতনা ও উদ্বিগ্নতার সুযোগে যতদূর সম্ভব নিজেদের অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তৈয়ারীর ব্যবস্থা এদেশেই করিয়া লইব। ভারত সরকার চিরদিনই আমাদের স্বার্থ সম্বন্ধে একটু দেরী করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করেন এবং এক্ষেত্রেও সেই নীতির কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটিল না। নিজেদের বাণিজ্যের ভবিষ্যত কি হইবে ইহা ঠিক করিতে করিতে প্রভুদের পুরো দুটি বৎসর কাটিয়া গেল এবং ১৯৪১ সালের শেষ দিকে সমস্ত পৃথিবীকে চমকিত করিয়া জাপান ও আমেরিকা যুদ্ধে ঝাপাইয়া পড়িল। এতদিন যাঁহারা আজ নয় কাল করিয়া আয়োজনে অযথা বিলম্ব করিতেছিলেন, জাপান যুদ্ধ ঘোষণা করিবার পরই তাহাদের টনক নড়িল। কিন্তু সময় থাকিতে অবহিত না হওয়ার ফলে অবস্থা আয়ত্তে আনা আমাদের শাসকসম্প্রদায়ের পক্ষে তখন আর সম্ভব হইল না।

তাহার পরই দেশে হাহাকার উঠিল। অতি অল্পদিনের মধ্যে জাপান সুদূর প্রাচ্যে দেশের পর দেশ জয় করিয়া লইয়াছে এবং পিছাইয়া আসিবার সুচিন্তিত পরিকল্পনায় সম্মিলিত পক্ষ নিজস্ব একটি ইতিহাসও সৃষ্টি করিয়াছেন। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া বাংলাদেশে ধান্য উৎপাদন কম হইতেছিল, একে তো ভারতবর্ষে সাধারণ উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ অন্যান্য দেশের তুলনায় খুবই নগণ্য, পৃথিবীর গড়পড়তা একর পিছু ধান্য উৎপাদন যখন ১৪৪০ পাউণ্ড, ভারতবর্ষ তখন মাত্র ৯৮৮ পাউণ্ড উৎপন্ন করিয়া থাকে ; তাহার উপর আবার কৃষিপ্রধান দরিদ্র দেশ হওয়াতে আয়ের স্বল্পতার জন্য এখানকার অধিকাংশ লোকের জীবনযাত্রার মান খুবই অনুন্নত। নিজেদের ভাল শস্য বিক্রয় করিয়া বিদেশী সস্তার চাউল প্রভৃতি খাইয়া আমাদের কৃষকেরা কায়ক্লেশে এতদিন বাঁচিয়াছিল। তাই একদিকে আমাদের খাদ্য যতই কম উৎপন্ন হইতেছিল, অন্যদিকে ততই বর্ম্মা ও অষ্ট্রেলিয়া হইতে চাউল ও গম আমদানী বাড়িতেছিল। সেদিন সুস্থ অবস্থায় এই আমদানী বৃদ্ধিতে আমরা ভয় পাইবার কোন কারণ দেখি নাই। তারপর জাপানের যুদ্ধঘোষণায় বর্ম্মা হাত ছাড়া হইলেও সমুদ্রপথ বিপদসঙ্কুল হইয়া উঠিলে ১৯৪২ সালে খাদ্য শস্যের আমদানী প্রায় বন্ধ হইয়া যায়। যুদ্ধের সময় সৈন্য ও যুদ্ধের কাজে সাহায্যকারীদের প্রয়োজন স্বীকার করিয়া এবং বন্দীদের প্রতি কর্ত্তব্য স্মরণ রাখিয়া অতিরিক্ত পরিমাণে খাদ্যশস্যের মজুতদারী ও অপচয়ের

ব্যবস্থা হয় এবং যে পরিমাণ শস্য মধ্যপ্রাচ্য প্রভৃতি স্থানে পাঠান হয় তাহাও উপেক্ষণীয় নহে। সেই সময় জনসাধারণ সামান্য সঞ্চয় ভাঙ্গাইয়া কোনমতে গ্রাসাচ্ছাদনের আয়োজন করিয়াছিল বলিয়া স্বাভাবিক দরিদ্র এই দেশে অবস্থার শোচনীয়তা ততখানি হৃদয়ঙ্গম করা যায় নাই।

একে উৎপাদন কম ও আমদানী নাই, তাহার উপর সরকার জিনিষপত্র আটকাইবার যে অহেতুক ব্যস্ততা প্রকাশ করিলেন, তাহারই ফলে যোগান এবং চাহিদার মধ্যে প্রচুর অসামঞ্জস্য ঘটিয়া গেল। বিশ্ব-ভ্রমণকারী অন্যতম মার্কিন সিনেটার রালফ্ ক্রষ্টার যাহা বলিয়াছেন তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য। ব্রহ্ম হইতে যে শতকরা দশভাগ চাউল আসিত, উপযুক্ত বণ্টন ব্যবস্থা হইলে তাহার অভাব এমন করিয়া দেশবাসী বুঝিতে পারিত না। দেশের অধিকাংশ লোক বাধ্য হইয়া উপবাসে কাল কাটাইয়াছে, শতকরা দশভাগ খাদ্য কম থাকিলে অগণিত মানুষকে কুকুর বিড়ালের মত মরিতে দিবার কোন সঙ্গত যুক্তি থাকিতে পারে না। আসল কথা সরকারের অতিরিক্ত চাহিদায় ব্যবসায়ী মহলে ও সাধারণ ক্রেতাদের মধ্যে দারুণ উদ্বেগের সৃষ্টি হয়। সরকারী অতি ব্যস্ততার দরুণ আমাদের প্রায় সকলেই ধরিয়া লইয়াছিলাম যে দেশে এবার খাদ্য কম পড়িবেই, সুতরাং বণিকেরা ও অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল পরিবারবর্গ যতদূর সম্ভব জিনিষ ঘরে মজুদ রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং ব্যবসাদারেরা সুযোগ অপেক্ষা করিয়া রহিল কালা বাজারের। পরে যখন সত্য সত্যই জিনিষ দুষ্প্রাপ্য হইল, ব্যবসায়ীরা বাজারে যাহা গোপনে গোপনে ছাড়িতে লাগিলেন তাহা তেমনি দুর্মূল্য হইয়া উঠিল। এই অবস্থায় দেশবাসীর সাধারণ ক্রয়ক্ষমতা বর্দ্ধিত মূল্যকে স্পর্শ করিতে পারিল না, ফলে দরিদ্রদের সম্বল হইল ভিক্ষা এবং ভিক্ষা না জুটিলে অনাহারে মৃত্যু। ১৯৪৩ সালের মে মাস হইতে জিনিষের অভাব এবং অগ্নিমূল্যতার দরুণ বাংলাদেশে মন্বন্তর দেখা দিয়াছে। দলে দলে লোক অন্নের অভাবে মৃত্যুবরণ করিয়াছে, কিন্তু সরকারী অব্যবস্থা সমানে চলিয়াছিল বলিয়া অবস্থা আয়ত্তে আনা যায় নাই। মালগাড়ী যুদ্ধের কাজে লাগিয়া অযুদ্ধের যোগানের বেলায় সংখ্যায় মুষ্টিমেয় হইয়া পড়িয়াছিল, দামোদরের বাঁধ ভাঙ্গায় একটি বিরাট রেলপথ অকর্ম্মণ্য হইয়া গেল। তা ছাড়া বড় বড় বণিকের ঘরে এবং সরকারীর গুদামে যে খাদ্যবস্তুর পর্ব্বত পচিয়া গেল তাহার হিসাব দেওয়া অসম্ভব। মানুষের প্রাণ বাঁচানোর চেয়ে বড় কর্ত্তব্য মানুষের আর নাই; কিন্তু গত ছয়মাস ধরিয়া লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু উপেক্ষা করিয়াও যে মজুতশালায় খাবার জমিয়াছিল তাহা এখনকার নূতন-ছাড়িয়া-দেওয়া শস্য দেখিলেই অনুমান করা যায়। এখন যে চাউল বাজারে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে তাহার কিছু অংশ খারাপ হইয়া গেলেও তাহাতে আমন চালও ঢের আছে এবং সেগুলি অবশ্যই গত বৎসরের উৎপাদন। এই জমান চাউল যদি সময়ে বাহির করিয়া দেওয়া হইত, তাহা হইলে নিঃসংশয়ে বহু লোকের জীবন রক্ষা পাইত। তা ছাড়া সরকারের বিরুদ্ধে পাঞ্জাবের মন্ত্রী সর্দ্দার বলদেব সিং যে অভিযোগ করিয়াছিলেন তাহাও যে কোন সহানুভূতি-সম্পন্ন ব্যক্তিকে ব্যথাতুর করিয়া তুলিবে। পাঞ্জাবের গম কিনিয়া বাংলায় বিক্রয় করার ভিতর যে মণকরা পাঁচ টাকা লাভের ব্যবস্থা ছিল তাহা গরীবের পক্ষে মারণাস্ত্র স্বরূপ হইয়াছে। যদিও সরকারপক্ষ যুক্তি দেখাইয়াছেন যে লাভের টাকা অন্যদিক হইতে আর্ত্তত্রাণে নিয়োজিত করা হইয়াছে তথাপি বার টাকা মণ দরে যাহারা আটা কিনিতে পারিত তাহারা সত্তেরো টাকা দিতে নাও পারিতে পারে—এই সহজ কথাটা কি করিয়া যে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি এড়াইয়া গেল তাহাই আশ্চর্য্য। দরিদ্র শ্রমসহিষ্ণু জনসাধারণের ক্রয় শক্তির বাহিরে ইচ্ছা করিয়া অন্ন মূল্য টানিয়া লইয়া যাওয়ার ফলে নিত্য ব্যবহার্য্য প্রত্যেক দ্রব্যের দামই যে আপেক্ষিকভাবে বর্দ্ধিত রহিয়া যাইবে ইহা তো সাধারণ বুদ্ধির কথা। যাহাদের অনেক আছে তাহারা সত্তেরো কেন সাতাশ টাকায়ও আটা কিনিতে পারে; কিন্তু তাহাদের সুবিধা হওয়ার জন্য দেশের একান্ত প্রয়োজনীয় দরিদ্র শ্রেণীকে যে জোর করিয়া মরণের পথে ঠেলিয়া দেওয়া হইল, ইহা সত্যই খুব দুঃখের বিষয়।

ইউরোপের যুদ্ধক্ষেত্রে এখন সম্মিলিত পক্ষের অনেকটা সুবিধা হইয়াছে, সুতরাং জাপানকে আক্রমণ করিয়া বর্ম্মা সিঙ্গাপুর প্রভৃতি পুনরুদ্ধারের তোড়জোড় করা কিছুই অস্বাভাবিক নহে। এখন আমাদের এই বাংলাদেশকেই প্রাচ্য যুদ্ধের পট ভূমিকা বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। আমাদের এখানে আগেই লোক সংখ্যা ছিল ৬ কোটি ১৪ লক্ষ তাহার উপর বর্ম্মা হইতে যাহারা আসিয়াছে এবং যুদ্ধ করিতে যে বিদেশীর দল এখানে রহিয়া গিয়াছে তাহাদের সংখ্যা শুধু বিপুল নয় তাহাদিগকে অতিথি হিসাবে সৎকার করাও একটা ভয়ানক ব্যাপার। এই বৎসর এত দুঃখের ভিতর দিয়া আমাদের যে কয়জন কায়ক্লেশে বাঁচিয়া আছি আগামী বৎসর বেশ সুখে না থাকিলে দুর্ব্বল আমাদের পক্ষে জীবন রক্ষা কিছুতেই সম্ভব হইবে না। এখন শরীরের অবস্থা এমন হইয়াছে যে সামান্য একটু অসুখ হইলেই রোগ মারাত্মক হইয়া দাঁড়ায় এবং চিকিৎসা রীতিমত ব্যয়সাধ্য হওয়ায় ডাক্তার ডাকা আমাদের অবস্থায় কুলায় না। তাছাড়া ঔষধপত্রও অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাজারে পাওয়া যায় না। অনেকদিন ভেজাল জিনিষ হজম করিয়া ও একেবারে না খাইয়া আজ বাংলার বহুলোক মৃত দেশ-বাসীদের অনুগামী হইতে চলিয়াছে। এ বৎসর যে ঝড় বহিয়া গেল তাহার পরোক্ষ মাশুল আগামী বৎসর অবশ্যই দিতে হইবে এবং আগামী বৎসর যদি ঝড় নাও হয়, বাত্যাবিক্ষুব্ধ জীর্ণ ঘরবাড়ি সংস্কার না করিলে মানুষ সেগুলির ভিতর বাস করিতে পারিবে না। অর্থাৎ ভাঙ্গা শরীরে যদি আর কিছু কষ্ট সহিতে হয় তাহা হইলে আমাদের মত যে ভাগ্যবানের দল তেরশ পঞ্চাশ সালকে ফাঁকি দিয়া আসিল, ঘাটের কাছে ভরাডুবির কলঙ্ক হইতে তাহারা কিছুতেই মুক্তি পাইবে না।

এবার বাংলায় ভাল ফসল হইয়াছে, আশা করা যায় দুমুঠো ভাতের জন্য নিরুপায়ের মৃত্যুশোভাযাত্রা আর দেখিতে হইবে না। তবে শস্য যতই হউক, বহিরাগত জনমণ্ডলীর সহিত সমস্ত বাংলাদেশের পক্ষে তাহা কিছুতেই পর্য্যাপ্ত নহে। অবশ্য আমরা এ কথা ধরিয়া লইতে পারি যে গত দুই বৎসর যাবৎ নিজেদের শেষ পুঁজিটুকুও খরচ করিয়া যাহারা অতি কষ্টে আজও মরণকে ঠেকাইয়া রাখিয়াছে তাহাদের পক্ষে এবার অপচয়ের কথা দূরে থাক স্বাভাবিক বাজারেও (যাহা এবৎসর মোটেই আশা করা যায় না) প্রয়োজনের সম্পূর্ণ পরিমাণ সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য হইবে। এই ব্যয়সঙ্কোচের অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে ফসলের ঘাটতিটুকু পূর্ণ হওয়া খুব অস্বাভাবিক নহে।

এখন ব্যাপারটা নির্ভর করিতেছে পুরোপুরিভাবে গভর্ণমেন্টের উপর। যদি পৃথিবীর যে কোন স্থানে ফ্রন্ট খুলিবার আংশিক খাদ্য-দায়িত্ব তাঁহারা বাংলাদেশের ঘাড়ে না চাপান এবং ব্রহ্ম অভিযান বা ভারতরক্ষার নামে যে সাদা কালা অসংখ্য সৈন্য আমদানী করিয়াছেন তাহাদের ব্যক্তিগুলিকে বাহির হইতে আনিবার মত, খাদ্যও যদি বাহির হইতে আনিবার ব্যবস্থা করেন—তাহা হইলে হয় তো আমাদের দুঃখের লাঘব হইতে পারে। বন্দীনিবাসের খাদ্য সরবরাহের দায়িত্ব হইতে এই দারুণ দুঃসময়ে বাংলাদেশকে মুক্তি দেওয়া অবশ্যই উচিত। যদি এই সকল প্রয়োজনের অজুহাত না থাকে তাহা হইলে সরকার পক্ষ হইতে মাল কিনিবার জন্য তাড়াহুড়ার কোন অর্থ হয় না এবং বাজারে মাল পাওয়া গেলে ক্ষুধাতুর বিরাট বাঙ্গালাদেশের আংশিক রেশনিং পরিকল্পনা স্থগিত রাখার পক্ষেও যথেষ্ট যুক্তি আছে। গভর্ণমেন্ট যদি ক্রয় না করেন, বণিক এবং অর্থশালী ব্যক্তিগণ বাজারের আমদানীর প্রাচুর্য্য দেখিয়া ভবিষ্যতে একদিন মাল পাওয়া যাইবে না বলিয়া অহেতুক আতঙ্কগ্রস্ত হইবেন না এবং ফলে যোগান ও

চাহিদার সামঞ্জস্য রক্ষা হওয়াতে আমাদের ক্রয়শক্তির মধ্যেই দ্রব্যমূল্য থাকিয়া যাইবে। এবার দুর্ভিক্ষের বিচিত্র অভিজ্ঞতার পরে সামান্য স্বাচ্ছল্যের যে সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহা নষ্ট করিয়া দেওয়া সরকারের পক্ষে অত্যন্ত অনুচিত হইবে। সরকার বাজারের মাল না কিনিয়া উপস্থিত যদি অবস্থা লক্ষ্য করিয়া চলেন এবং সরবরাহের নিয়মিত ব্যবস্থা যদি বজায় রাখিতে পারেন, এ বৎসর অপেক্ষা আগামী বৎসর অবশ্যই আমাদের পক্ষে সুখের হইবে। বেসরকারী কাজে মালগাড়ীর যোগান কিছু পরিমাণে বাড়াইয়া সরকারের উচিত যখনই পাওয়া যাইবে—উদ্বৃত্ত অন্যান্য প্রদেশ ও বিদেশ হইতে খাদ্যাদি বাংলা দেশে আনিয়া বাজারে ছাড়িয়া দেওয়া। জাপানের সহিত ভাল করিয়া যুদ্ধে যদি নামিতেই হয় এবং বর্ম্মা প্রভৃতি দেশ পুনরুদ্ধার করার যদি সত্যই ইচ্ছা থাকে,—বাংলার অধিবাসীদের সম্প্রীতি, সাহায্য এবং সহানুভূতি হারানো রাজনীতিজ্ঞের কাজ হইবে না। বাংলাকে বাঁচিতে দিলে অথবা বাঁচিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলে আজ বাঙ্গালী কৃতার্থ হইয়া যাইবে। মৃত্যুর গ্রন্থি হইতে জীবনকে ছিনাইয়া আনা যদি সম্ভব হয়, জীবনদাতাকে দেশবাসী সহজে ভুলিয়া যাইবে না। এই জন্যই সামান্য উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়া লর্ড ওয়াভেল ও স্যার রাদারফোর্ড জনপ্রিয় হইয়াছেন। অন্য সকল কথার উর্দ্ধে আজ আমাদের জীবনে স্থান পাইয়াছে অন্নসমস্যার কথা। যুদ্ধের পরে ধ্বংসস্তূপের উপর নূতন পৃথিবী গঠনের জন্য বিরাট বিরাট পরিকল্পনা হইতেছে, যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের জন্য অনেক মণীষীই মাথা ঘামাইতেছেন কিন্তু সম্প্রতি বাংলার যে সর্ব্বনাশ হইয়া গেল তাহার ক্ষতিপূরণ করিবার ভার লইবে কে? ইহার পর যাহারা বাঁচিয়া থাকিবে নিঃসম্বল সেই অসহায় মানবশিশুদের ঘর বাঁধিয়া জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা শুধু ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার নহে, ইহার জন্য অগাধ সহানুভূতি ও বেদনাবোধেরও প্রয়োজন। চিরকাল জাতির দুঃখঝঞ্ঝা যাহাদের মাথার উপর দিয়া গিয়াছে, যাহারা বন্যা মহামারী ও অসংখ্য ছোটবড় বিপদের দিনে দেশবাসীকে বাঁচাইবার শুভ সংকল্পে নিজেদের নিঃস্ব ও রিক্ত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, সেই দেশপ্রেমিক সুসন্তানেরা আজ অধিকাংশই কারাগারে অবরুদ্ধ রহিয়াছেন। ইহাদের মুক্তি দিলে, অন্ততঃ সাময়িকভাবে এই দুর্ভিক্ষপীড়িত বাংলাকে রক্ষার জন্য বাহিরে আসিতে দিলে, ইহাদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, পরিচালনা, সংগঠনের শক্তি ও অক্লান্ত পরিশ্রমে বাংলার চেহারা ফিরিয়া যাইতে পারে। যাহারা মরিবার মরিয়াছে, কিন্তু যাহারা আজও মৃত্যুর দুয়ারে বসিয়া জীবনের অসীম মায়ায় ঈশ্বরের করুণা ভিক্ষা করিতেছে তাহাদের বাঁচিবার অধিকার স্বীকার করা কি মনুষ্যত্বের পরিচায়ক নহে। আমরা আশার সহিত লক্ষ্য করিয়াছি গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ব্রিটিশ সরকারের ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় নীতি অনেকখানি পালটাইয়া গিয়াছে। এখন সব জিনিষই একটু একটু করিয়া বাজারে ছাড়া হইতেছে। অসামরিক দেশবাসীকে দীর্ঘকাল প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ব্যবহারের সুবিধা হইতে বঞ্চিত করিবার পর তাহাদের একাংশের মৃত্যুমূল্যে আমরা আমাদের শাসকবর্গের নিকট হইতে এই সুব্যবহারটুকু কিনিতে সক্ষম হইয়াছি। তাছাড়া ঋণ ও ইজারা বিলের চুক্তি অনুসারে আমেরিকা হইতে প্রচুর জিনিষপত্র আমদানী হইতেছে, এই আমদানী ব্যাপকভাবে চলিলে আমাদের অভাব অনেকটা মিটিয়া যাইবে। কারখানা প্রতিষ্ঠা করিয়া বা গাছ পুঁতিয়া ফলভোগ করিবার যুক্তির অবশ্যই দাম আছে এবং এই সময় শিল্পের প্রসার করা খুবই উচিত। কিন্তু এখন উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধার পাইতে গেলে অপেক্ষা করা তো চলিবে না, বেসামরিক অধিবাসী হিসাবে আজ শুধু আমরা আমদানী করা বা এদেশে উৎপন্ন দ্রব্যাদির একটা ন্যায্য ভাগ পাইবার বাসনা করি। যুদ্ধের জন্য দুর্ভিক্ষ হইয়াছে, দুর্ভিক্ষ দূর করিতে যুদ্ধজয়ের চেষ্টার মতই খরচ করা উচিত। মানুষের মনের বল রক্ষা না করিলে মানুষ অন্যায় করিয়া বাঁচিবার চেষ্টা করিবে, অথচ সেইরূপ জীবন হয় তো সেই দুষ্কৃতকারীও চাহে না। যাহাদের হাতে ক্ষমতা আছে এ বিষয়ে তাহারা অবহিত হউন।

জাপানীদের দ্বারা যদি কোন বিপর্য্যয় না ঘটে তাহা হইলে ১৯৪৪ সালে সরকারী সাহায্যে আমরা, যাহারা বাঁচিয়া আছি, চেষ্টা করিলে আমাদের দেশকে আবার মানুষের রূপ দিতে পারিব। মনের ক্লৈব্য ও জড়তা এবং অভাবের অনুশোচনা লক্ষ লক্ষ দেশবাসীকে শুধু ঘরছাড়াই করে নাই, সমাজ, কৃষ্টি ও জাতীয়তাবোধও ভুলাইয়া দিয়াছে। মৃত্যু ছাড়াও অনিবার্য্য সামাজিক বিপ্লবের যে বন্যা আসিতেছে আগামী বৎসর তাহার মুখোমুখী দাঁড়াইয়া খুব দক্ষহস্তে হাল না ধরিলে আমাদের নিজের বলিতে আর কিছুই থাকিবে না। একেতো অভাবে জমি বিক্রয় করিয়া কৃষকশ্রেণী ভবিষ্যতের পথ অর্দ্ধেক নিজের হাতে রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে, তাহার উপর বাঁচিবার নিশ্চিত রাস্তা যদি তাহাদের কেহ দেখাইয়া না দেয় মৃত্যু ও জীবনের নিষ্ফল সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টায় বাংলার পল্লীগ্রামের শ্মশানত্বই তাহারা সৃষ্টি করিবে। এখনও পর্য্যন্ত গ্রামই আমাদের দেশের ইতিহাস অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে, কবন্ধ সহরে জীবনযাত্রার মূল্যও যেমন কম, অতীত বলিয়া গর্ব্ব করিবার মত তাহার তেমনি কিছুই নাই। ক্যাম্প‌্‌জীবনের অনিশ্চয়তার কবল হইতে ফিরিয়া যাহারা অনেকখানি বদলাইয়া যাইবে তাহারা যদি জমিহারানো বিত্তহীন লক্ষ লক্ষ গ্রামবাসী কৃষককে প্রভাবিত করিয়া পথে টানিয়া আনে, সামাজিক জীবনে এক চরম বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া যাইবে। এই দুর্য্যোগ হইতে দেশকে রক্ষা করিবার জন্যও সরকারের উচিত চিন্তাশীল মণীষীদের কারাগারের বাহিরে আসিবার অধিকার দেওয়া।

অবশ্য আমরা দুঃখ সহিতে সহিতে এমনি হইয়া উঠিয়াছি যে একটুখানি আলো দেখিলেই আনন্দে আত্মহারা হইয়া যাই। আবার হয়তো পুরাতন শাসন ব্যবস্থার পুনরভিনয় হইবে, আবার হয়তো এত চাউল জন্মান সত্ত্বেও একমুঠো অন্নের জন্য দিনরাত ভিক্ষার ঝুলি লইয়া আবাল-বৃদ্ধ বনিতা পথে পথে ভিড় বাড়াইবে, হয়তো আবার মৃতদেহের স্তূপ জমিয়া যাইবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় মহানগরীর পাথরবাঁধানো রাজপথে। তবু শাসকসম্প্রদায়ের যেটুকু মতিগতির পরিবর্ত্তন আমরা লক্ষ্য করিতেছি, তাহা যদি স্থায়ী ও সত্য হয় তাহা হইলেই আমাদের একান্ত আশা সম্পূর্ণ না হউক, কিছু পরিমাণে ফলবতী হইতে পারে।

এলো যেন মৃত্যুর উৎসব

শ্রীপ্রফুল্লরঞ্জন সেনগুপ্ত এম্-এ

পৃথ্বীর প্রাঙ্গণ মাঝে ওঠে আজ আর্ত্ত কলরব—
প্রাত্যহিক জীবনেতে এলো যেন মৃত্যুর উৎসব !
দিগন্তে আঁধার নামে, শতাব্দীর সূর্য্য ডুবে যায়,
যুগ সন্ধ্যা এলো বুঝি ? সভ্যতা জানায় বিদায়।

বর্ব্বর উৎসব রত লোভাতুর মানুষের মন —
জিঘাংসা দস্যুর সম ঘুরিতেছে আজি অনুখন :
নিষ্পাপ কতোনা প্রাণ—অনাহারে হ'লো কতো শেষ—
সোনার ফসল কোথা ? কোথা তারা হ'লো নিরুদ্দেশ ?

জীবন সাহারা প্রায়, চারিদিকে ওঠে হাহাকার,—
তোমার ন্যায়ের দণ্ডে, হে ঈশ্বর, নাই প্রতিকার ?
পৃথিবী কঙ্কাল হ'লো সঞ্জীবিয়া তোলো আজ তারে,—
বিষাক্ত প্রাণের বীজ ধ্বংস ক'রে গভীর আঁধারে।

বাঁধন দড়ি ও ছাঁদন দড়ি

শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়

মানব সভ্যতার 'বাঁধন দড়ি' ভগবদ্ বিশ্বাস, আর 'ছাঁদন দড়ি' শুভবিবাহ। বন্ধনকে ছন্দে নিয়ন্ত্রিত করতে না পারলে, সভ্যতার রজ্জু বা দড়িদড়া ছিন্নভিন্ন হ'য়ে যাবে—ইহাই সভ্য জগতের আতঙ্ক।

শুভবিবাহের মূলে রয়েছে যৌন লিপ্‌সা বা আত্মবিস্তারের আকাঙ্ক্ষা। "একোহং বহু স্যাম।" একা আমি, বহু হবো। Preservation of self and propagation of species—জীবজগতের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। পশুপক্ষী কীট পতঙ্গ থেকে মানুষ নিজেকে পৃথক করলো—বাঁধন দড়ি ও ছাঁদন দড়ি সাহায্যে একটা সীমারেখা টেনে। তারপর ধীরে ধীরে গড়ে উঠ্‌লো সভ্যতার নানাবিধ আস্‌বাব, বহু সামাজিক রীতি ও নীতি, দেখা-সাক্ষাৎ হলেই 'নমস্কার' ও 'Good bye' পর্য্যন্ত। অগ্নিগর্ভ পৃথিবীর বাইরের পুষ্পিত শ্যামশোভার মত—মানুষের পশুবৃত্তিও চাপা রইলো রং-বে-রংয়ের বাহ্য পোষাক ও পরিচ্ছদের অন্তরালে। তাই যুগে যুগে সভ্যতার মুখোস্ খুলে পড়ছে—বাঁধন দড়ি ও ছাঁদন দড়ি শতধা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে।

সভ্যতার চাহিদা অনুসারে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র ক্রম-বিবর্ত্তনের অপরিহার্য্য ফল। পরিবার ও সমাজকে রক্ষা করবার জন্তে—রাষ্ট্রশক্তি হ'লো অপ্রতিদ্বন্দ্বী। রাজা হলেন সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের প্রতিনিধি। তাঁর আদেশ নির্ব্বিচারে মান্য করা বা তাঁর অঙ্গুলি সঙ্কেতে পরিচালিত হওয়াই—সভ্যতার চরমোৎকর্ষ।

বর্ত্তমান যুগে রাষ্ট্রশক্তির রূপ ও সংজ্ঞা যতই পরিবর্ত্তিত হোক্ মূলবস্তুর কোনও পরিবর্ত্তন হয় নি। হিটলার, তোজো, ষ্টালিন, চার্চ্চিল ও রুজভেল্টকে যে নামেই অভিহিত করা হোক্—মূলে কিন্তু যথাক্রমে দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, ভীম, অর্জ্জুন ও যুধিষ্ঠিরকেই আমরা দেখতে পাচ্ছি। আজ পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ নরবলি হচ্ছে, তাদেরই অঙ্গুলি নির্দ্দেশে। তাঁদের সবার পকেটেই একটা সভ্যতার মাপকাঠি আছে, তাঁরা কেউই অসভ্য আদিম যুগের মানুষ নন। এইসব রাষ্ট্র-দিকপাল বা সভ্যতার 'মনুমেণ্টরা' কেন পারছেন না একটা সাময়িক মীমাংসার মুসাবিদা করতে, বা স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতে? আসল কথা হচ্ছে, বাইরের রূপ-সজ্জা নিয়ে আমরা যতই বড়াই করি, ভিতরের অসভ্যতা আমাদের পশুকেও হার মানায়।

আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা, আজও যাঁরা গাছে গাছে 'হুপ্‌হাপ্' ক'রে বেড়াচ্ছেন তাঁদের সম্বোধন ক'রে বলতে ইচ্ছে হয়—"ঠাকুরদাদারা! তোমরা বেশ আছো। রেশান-কণ্ট্রোলের ঠেলায় প'ড়ে ফুট্‌পাতে এসে কাটা পাঁঠার মত দাপিয়ে মরছো না।" একটা সুসভ্য 'বম্বার প্লেন' আর একটী অসভ্য 'চিল' যখন পাশাপাশি ওড়ে, তখন বোধহয় আমাদের বাঁধন দড়ি ও ছাঁদন দড়ির আবিষ্কর্ত্তারা অন্তরীক্ষ থেকে হেসে ওঠেন—তাঁদের প্রবর্ত্তিত মানব সভ্যতার বর্ত্তমান স্বরূপ দেখে।

সভ্যতার বহিরাবরণ সব দেশে সমান শক্ত ও মজবুত নয়। যেখানকার সভ্যতা যত অল্পদিনের, সেখানকার চামড়াও তত বেশী পাত্‌লা। এই হিসাবে ভারতের প্রাচীন সভ্যতাকে 'গণ্ডারী' আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। বল্মীকস্তূপের মধ্যে দেহ-রক্ষা ক'রে শুধু 'রাম'নাম জপ করা ছাড়া, এ যুগের ভারতীয় সভ্যতার অন্য কোন রূপ কল্পনা করা যায় না।

রাস্তার দু'ধারে ময়রার দোকান। কত রসনা-পরিতৃপ্তিকর খাবার সাজানো রয়েছে। ফুটপাতে একটা লোক, সেইদিকে চেয়ে চেয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে মরে গেল। অন্য দেশের লোক হ'লে, নিশ্চয়ই একটা রসোগোল্লা কেড়ে নেবার জন্যে হাত বাড়াত। মহাত্মা গান্ধী বলেন—"Before the hungry, even God dare not appear, except in the shape of bread." কিন্তু বাংলার ভগবদ্ প্রতিনিধি পুলিশ তো অনায়াসেই পারছে ফুটপাতে দাঁড়ানো ক্ষুধার্ত্তদের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করতে? জগতের শ্রেষ্ঠ-সুসভ্য জাতি বাঙালী—তা' প্রমাণিত হয়েছে।

হিন্দিতে একটা প্রবাদ আছে—

"পিয়াস্ না মানে ধুপী-ঘাট,
নিদ্ না মানে মোরতা খাট্,
ভুখ্ না মানে ঝুটা ভাত,
প্রীত না মানে ছোটা জাত।"

ইহা অসভ্যতার কথা, সন্দেহ নাই। সুন্দরবনের কোনো ব্যাঘ্র শিশু অনাহারে মরেছে—এ সংবাদ কোন রিপোর্টারই সংগ্রহ করতে পারেন না। কিন্তু কল্‌কাতায় কি দেখ্‌তে পাচ্ছি? যা দেখতে পাচ্ছি, তা' থেকে একথা খুব নিঃসঙ্কোচে বলা যায়, বাংলার 'গণ্ডারী সভ্যতা' জগতকে বিস্ময়াবিষ্ট করেছে। বাংলা আজ জগৎ-সভায় অতি উচ্চ প্রশংসা লাভের যোগ্য। এমন চঞ্চলতাহীন, 'ইষ্টনাম' জপ করতে করতে অনাহার-মৃত্যুর গৌরব জগতের আর কোনো জাতিই দাবী করতে পারে না। অতএব বাঁধন দড়ির জয় জয়কার—এই বাংলা দেশে।

তারপর ছাঁদন দড়ির কথা। শুভ বিবাহের মর্য্যাদা রক্ষা, বাংলার মত আর কেউ করতে পারেনি। পেটে যাঁরা অন্ন জুটাতে পারেন না, তাঁরাও এখানে যথারীতি বিবাহিত হন্—বহু সন্তানের মা-বাপ হন। অন্য দেশের মত বাংলায় কোনো অবৈধ সন্তানের বালাই নেই, কারণ সভ্যতার আলোকে তাদের প্রকাশ নিষিদ্ধ। ভুল ক'রে তারা যদি কোনো অন্ধকার ঘরে ঢুকে বসে, অন্ধকার থাকতে-থাকতেই বিদায় নিতে বাধ্য হয়। আজ বাংলা দেশ থেকে—ঝাঁকে ঝাঁকে যে সব শিশু সন্তানকে দেশ দেশান্তরে পাঠান হচ্ছে—বাঙালী আজ সগর্ব্বে একথা নিশ্চয়ই বলতে পারে—'তারা 'অরফ্যান' বটে, কিন্তু অন্য দেশের মত 'ব্যাষ্টার্ড' নয়। নিয়মমত শালগ্রামশীলা সাক্ষ্য রেখে এদের মা-বাপের শুভবিবাহ হয়েছিল। অতএব ছাঁদন দড়িরও জয় জয়কার এই বাংলা দেশে। পৃথিবীতে বাঙালীরাই সর্ব্বাপেক্ষা সুসভ্য জাতি এবং বাংলার বাঁধন দড়ি ও ছাঁদন দড়ি যে সর্ব্বাপেক্ষা টিকসই—তা' সর্ব্ব প্রকারেই প্রমাণিত হয়েছে।

জঙ্গম

বনফুল

১৯

দিবা দ্বিপ্রহর।

খোলা মাঠে হু হু করিয়া একটা হাওয়া বহিতেছে। কাছে দূরে গরু চরিতেছে। মাঠের প্রান্তে যে কুল-গাছটা আছে তাহা লক্ষ্য করিয়া কয়েকটা রাখাল বালক ক্রমাগত ঢিল ছুঁড়িয়া চলিয়াছে। আরও দূরে চাষের জমি। কোথাও সরিষা, কোথাও গম, কোথাও যব, কোথাও মটর, কোথাও ছোলা—হলুদ-সবুজ-নীলের মহোৎসব পড়িয়া গিয়াছে যেন। যমুনিয়ার কিন্তু এসব দিকে লক্ষ্য নাই, সে আপনমনে কাঠ ও গোবর কুড়াইতেছে। প্রতিদিন দ্বিপ্রহরে ইহাই তাহার কাজ। মাঠে মাঠে ঘুরিয়া সে শুকনো ডাল পালা ও গোবর সংগ্রহ করে। প্রকৃতির এই ঐশ্বর্য্যের মাঝখানে তাহাকে কিন্তু মোটেই মানায় নাই—পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের মাঝে খানিকটা সচল আবর্জ্জনা যেন। মাথায় রুক্ষ তৈলহীন চুল, পরিধানে জীর্ণ মলিন বসন, রোগে খাদ্যাভাবে শীর্ণ শ্রীহীন বিগত-যৌবন দেহ। বলিষ্ঠ মুশাইকে ভুলাইবার মতো তাহার কিছুই নাই। অথচ কতই বা তাহার বয়স—ত্রিশের বেশী নয়—কিন্তু ইহারই মধ্যে বুড়ি হইয়া গিয়াছে। মুশাইকে ভুলাইবার মতো কিছু না থাকিলেও মুশাইকে ভুলাইবার আগ্রহ তাহার কম নয়। বস্তুত উহাই তাহার জীবনের একমাত্র আগ্রহ। তাহার সহিত ঝগড়া করিয়া, তাহার জন্য পূজা করিয়া, তাহার পছন্দ-মতো রান্না করিয়া, রাত্রে কোমরে তেল মালিশ করিয়া, সকালে চা-প্রস্তুত করিয়া, তাহার কাপড়-জামা-পাগড়ি ক্ষার দিয়া পরিষ্কার করিয়া নানা উপায়ে সে মুশাইকে আগলাইয়া রাখিয়াছে। মুশাই যদি তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া যায় তাহার গতি কি হইবে। কাহাকে লইয়া থাকিবে সে। নিজের পেটের ছেলে জোয়ান বউ লইয়া শহরে চলিয়া গেল, তাহার দিকে একবার ফিরিয়া তাকাইল না পর্য্যন্ত। কলে 'নোকৃরি' করিতেছে! যমুনিয়া অমন 'নোকৃরি'র মুখে প্রত্যহ হাজারবার ঝাড়ু মারে। 'নোকরি' নয়—আসল কথা 'জরু'। জোয়ান 'জরু' লইয়া মজা করিয়া আলাদা থাকিতে চায়। তাহার কথা একবার ভাবিল না পর্য্যন্ত—'জরু' লইয়া উন্মত্ত হইয়া চলিয়া গেল। কম বয়সী ছুঁড়ি দেখিলে পুরুষ-গুলার হিতাহিত-জ্ঞান লোপ পায় যেন। 'পুতহু'র যৌবনের কথা ভাবিতে গিয়া সহসা তাহার নিজের যৌবনের কথা মনে পড়িল। তাহাকেও কি কম নাকাল হইতে হইয়াছিল! জমিদারের গোমস্তা কুঞ্জবাবু, পীরু গাড়োয়ান, জমিরুদ্দিন সিপাহী,—কত লোকই যে তাহার পিছনে লাগিয়াছিল! থানার 'নাক-কাট্টা' চৌকিদারটা তো তাহাকে ধরিয়া একদিন জঙ্গলের মধ্যে টানিয়াই লইয়া গিয়াছিল। বিগত যৌবনের বিস্মৃতপ্রায় নানা কাহিনী মনের মধ্যে ভিড় করিয়া আসিল…কয়দিনই বা ছিল সে যৌবন…চকিতে আসিল এবং চলিয়া গেল। মুশাইয়ের সহিত কবে কোন বাল্যকালে বিবাহ হইয়াছিল, ভাল করিয়া মনেও পড়ে না। মনে পড়ে যখন সে যৌবনে প্রথম পদার্পণ করিল সেই দিনগুলি। মুশাই তখন তাহাকে লইয়া বিভোর হইয়া থাকিত… পাগল হইয়া গিয়াছিল যেন…কাহারও দিকে তাকাইলে ক্ষেপিয়া যাইত, কোন বেচালের খবর কানে গেলে মারিয়া 'ধুনিয়া' দিত। গুণ্ডাটা চিরকালই একরকম, কথায় কথায় কেবল মারপিট। কিছুদিন পরে বিষুণের জন্ম হইল, দেখিতে দেখিতে তাহার যৌবন চলিয়া গেল। শুধু যৌবন কেন, কতদিনই কাটিল তাহার পর। মুশাই তাড়ি ধরিল, মদ ধরিল, কত ছুঁড়ির পিছনে ঘুরিল, এক সাহেবের কাছে কিছুদিন নোকরি করিল, তাহা ছাড়িয়া আবার কিছুদিন মজুরি খাটিল। এক দারোগাবাবুর বিষদৃষ্টিতে পড়িয়া দুই মাস জেল পর্য্যন্ত খাটিয়া আসিল। এখন শঙ্করবাবুর কাছে বাহাল হইয়াছে। সে নিশ্চিন্ত হইয়াছে। শঙ্করবাবুর কাছেই ও জব্দ থাকে। তবু মুসহরণীটাকে লইয়া সেদিন পর্য্যন্ত কি কাণ্ড! পাপটা বিদায় হইয়াছে বাঁচা গিয়াছে। মুশাই তাহার, আর কাহারও নয়। আর কাহাকেও কাছে ঘেঁসিতে দিবে না সে। মুশাইয়ের জন্যই যমুনিয়া জ্বালানি সংগ্রহ করিয়া ফিরিতেছে। শীতকাল। ঘর একটু গরম না করিলে মুশাই ঘুমাইতে পারে না। এইগুলি দিয়া ঘরে 'বোরশি' উঠানে 'ঘুর' জ্বালাইতে হইবে। ঘুরের পাশে বসিয়া মুশাই গল্প করিতে ভালবাসে। বারবার বিড়ি খাওয়াও আছে—কত 'শালাই' কিনিবে সে!

নির্জ্জন মাঠে নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে জীর্ণবসনা শীর্ণকান্তি যমুনিয়া শুকনো ডালপালা কুড়াইয়া ফিরিতে লাগিল।

২০

রাত্রি দ্বিপ্রহর।

সমস্ত গ্রাম ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কৃষ্ণ পক্ষ। চতুর্দ্দিকে সূচীভেদ্য অন্ধকার, অবিশ্রান্ত ঝিল্লী-ধ্বনি। "হুঁম্ হুঁ"—প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের অন্ধকার ভেদ করিয়া শব্দ হইল—দূরের আর এক বৃক্ষ হইতে প্রত্যুত্তর আসিল 'হুঁম্ হুঁ'। 'হুঁম্ হুঁ—হুঁম্—হুঁ'। নির্জ্জন নিশীথে নিশাচর পক্ষী-মিথুন গম্ভীর কণ্ঠে আলাপ করিতেছে। শীতের বাতাস প্রকাণ্ড তেঁতুল গাছের শাখা প্রশাখা দুলাইয়া, বাঁশবনে শিহরণ জাগাইয়া, মাঠের শুষ্ক পাতা উড়াইয়া একটানা বহিয়া চলিয়াছে। ঝিল্লীধ্বনির সহিত হিল্লোলিত বৃক্ষ-পল্লবের মর্ম্মরধ্বনি মিশিয়া একটা নিরবচ্ছিন্ন সঙ্গীত মধ্যরাত্রির স্তব্ধতার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া অপরূপ ছন্দে রনিয়া রনিয়া উঠিতেছে। সহসা পাশের ঝোপে একটা শৃগাল ডাকিয়া উঠিল। তীক্ষ্ণ তীব্র একটিমাত্র ডাক। তাহার পর সব চুপচাপ। অন্ধকারের নিবিড়তা ঘনতর হইয়া উঠিল, সমস্ত শব্দ মুহূর্ত্তের জন্য যেন থামিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে আর একটা তীক্ষ্ণ শব্দে অন্ধকার বিদীর্ণ হইল—কে যেন শিস্ দিতেছে। ঝোপটা নড়িয়া উঠিল, ঝোপের ভিতর হইতে গুঁড়ি মারিয়া বাহির হইয়া আসিল শৃগাল নয়, মানুষ। কারু। যে দিকে শিস বাজিয়াছিল সেই দিকে সে দ্রুতপদে আগাইয়া গেল। শ্যাওড়া গাছের অন্ধকারে কম্বল গায়ে

দিয়া ফরিদ দাঁড়াইয়া আছে। দুইজনে নিঃশব্দ গতিতে অন্ধকারে মিশাইয়া গেল। চুরি করিতে চলিয়াছে।

মানুষের সাড়া পাইয়া নিশাচর পক্ষী-দম্পতি উড়িয়া গেল। কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার রাত্রি আবার নিবিড় হইয়া উঠিল।

ঢং—ঢং—ঢং—ঢং—ঢং—

মহিষের গলায় ঘণ্টা বাজিতেছে। মাঠের পথ ধরিয়া গুলাব সিংহের শতাধিক মহিষ ধীর মন্থর গতিতে চলিয়াছে। চলিয়াছে লক্ষ্মীবাগের উদ্দেশ্যে। মণি বাঁড়ুয্যের জমিতে এবার নাকি চমৎকার ফসল হইয়াছে—আজ রাত্রের মধ্যেই সমস্ত ক্ষেত চরাইয়া দিতে হইবে ইহাই গুলাব সিংহের হুকুম। চারিজন বলিষ্ঠ পশ্চিমা গোয়ালা প্রকাণ্ড লাঠি কাঁধে করিয়া মহিষ-বাহিনীর পিছনে পিছন চলিয়াছে।

হুঁম হুঁ—হুঁম্ হুঁ—

দূর আম্রকাননে নিশাচর পক্ষী-দম্পতি পুনরায় আলাপ সুরু করিল।

২১

"নিকল্—নিকল্—নিকল্ হমরা ঘর সে—"

ফুলশরিয়ার চোখে আগুন, ঠোঁট কাঁপিতেছে। পদাহত কুকুরের মতো হরিয়া বাহির হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে ফুলশরিয়া তাহার কাপড়ের পুঁটুলি এবং বিছানাটাও বাহিরে ফেলিয়া দিয়া ঘরের ঝাঁপ বন্ধ করিয়া দিল। তাহার পর লণ্ঠনের আলোটা আর একটু উস্‌কাইয়া দিয়া বঁটিটা টানিয়া পেঁয়াজ কুটিতে বসিল। "একেবারে মাথায় চড়িয়া বসিয়াছে যেন। ঘা কবে সারিয়া গিয়াছে অথচ নড়িবার নাম নাই। এক পয়সা রোজকার করিবে না, জোয়ান 'মরদ' বসিয়া বসিয়া আমার অন্ন ধ্বংস করিবে রোজ রোজ। আমি কত জোগাই। ঘায়ের চিকিৎসা করিতে গিয়া তো যাহা কিছু সঞ্চিত ছিল সব গিয়াছে, কিছু 'জেবর' পর্য্যন্ত বন্ধক পড়িয়াছে। ও কি আর সে টাকা শোধ দিবে। 'মুরদা' আবার 'আস্‌নাই' করিতে চায়, একবার 'আসনাই' করিতে গিয়া তো মরিতে বসিয়াছিল, লজ্জাও করে না 'বেহুদ্দা'টার। আমার কাছে আর কোন 'মরদ' আসিতে দিবে না—কাল তো রাজীববাবুর ব্যাটাকে অপমানই করিয়া বসিল—ইস্, 'সাধি' করা 'জরু' বানাইয়া তুলিতে চান আমাকে—'সাধি' করা জরু তো ঘরে আছে একজন—সেইখানেই যা না—এখানে মরিতে পড়িয়া আছিস কেন—এক কড়ার সামর্থ্য নাই 'আসনাই' জমাইতে চান —এই জাতীয় স্বগতোক্তি করিতে করিতে ফুলশরিয়া পেঁয়াজ কুটিতে লাগিল। পেঁয়াজের তরকারিটা বানাইয়া এক বোতল 'শরাব' আনিতে হইবে। আজও গদাইবাবুর আসিবার কথা আছে। রাজীবলোচনের পুত্র গদাইবাবুর মুখটা মনে পড়িতে তাহার হাসি পাইল। কি বেহায়া আত্মসম্মানহীন এ লোকটাও। কাল হরিয়ার নিকট অপমানিত হইয়াও আজ আবার আসিবে খবর পাঠাইয়াছে। আজ আসিবার অন্য একটা কারণ আছে অবশ্য। ফরিদ কারু নিশ্চয়ই খবর দিয়াছে যে গহনাগুলা ফুলশরিয়ার জিম্মায় তাহারা রাখিয়া গিয়াছে। সেইগুলি হস্তগত করিবার জন্যই গদাইবাবু আজ বিশেষ করিয়া আসিতেছেন। উৎপলবাবুর ঘরে সিঁধ দিয়া উহারা আর কি কি পাইল কে জানে। মাইজির দামী শাড়িগুলা নিশ্চয়ই নেকি মাড়োয়ারির ঘরে গিয়াছে। জেবরগুলা রাজীববাবুর ঘরে গিয়া ঢুকিবে। চোরাই গহনা আত্মসাৎ করিবার জন্য রাজীববাবু একজন স্যাকরাকেই নিজের বৈঠকখানার বাহিরের ঘরটাতে আশ্রয় দিয়াছেন, লোককে অবশ্য বলেন ভাড়া দিয়াছেন। চোরাই গহনা গালানোই ওই স্যাকরাটার একমাত্র কাজ। ভাড়া না আর কিছু! ফুলশরিয়ার অজানা কিছু নাই। 'চোট্টা' সব! শুধু 'চোট্টা' নয় ভীতুও। চোরের হাত হইতে সোজাসুজি গহনা লইবারও হিম্মৎ নাই হুজুরদের, পাছে ধরা পড়েন। ফুলশরিয়া গহনাগুলি কয়েকদিন লুকাইয়া রাখিবে, তাহার পর চুপি চুপি গদাইবাবু আসিয়া একদিন লইয়া যাইবেন। বিশেষ করিয়া এইজন্যই আরও হরিয়াকে তাড়াইয়া দিতে হইল। সেদিন শেষ রাত্রে গহনার পুঁটুলি লইয়া কারু আসিয়া যখন ডাক দিল তখন কি মুশকিলেই না সে পড়িয়াছিল। পুঁটুলিটা সারারাত বাড়ির পিছনে ছাইগাদায় লুকাইয়া রাখিতে হইল। হরিয়াকে এসব কথা বলা যায় না। বিশ্বাস করিবার মতো লোক সে নয়। কারুকেও ফিরাইয়া দিতে পারে না। নিজের স্বার্থের জন্যই পারে না। এসব ব্যাপারে তাহার বেশ মোটা রকম পাওনা আছে। দুই দফা 'পাওনা'— একবার কারুরা দিবে—আর একবার গদাইবাবু। নানা রকম 'দুধ ধান্দা' করিয়া তাহাকে রোজকার করিতে হইবে তো। না করিলে তাহার চলিবে কেমন করিয়া। সহসা ফরিদ এবং কারুর জন্য তাহার দুঃখ হইল। চুরির সমস্ত ঝুঁকিটা তাহাদের। ধরা পড়িলে তাহাদেরই জেল হইবে। অথচ কয়টা টাকাই বা বেচারারা পাইবে। রাজীবলোচন এবং নেকিরাম দয়া করিয়া যাহা দিবে তাহাই। কারুর ভীত চকিত মুখখানা তাহার মনে পড়িল। সহসা সে ঠিক করিয়া ফেলিল, কারু এবং ফরিদের নিকট হইতে সে এবার আর কমিশন লইবে না।

"চনাচুর গরম পেয়ারে ম্যয় লায়া হুঁজি চনাচুর গরম—"

চানাচুরওলা রামু আসিতেছে। রোজই প্রায় আসে। ফুলশরিয়া ঘাড়টা একটু উঁচু করিয়া দেখিল তাকে বিড়ির বাণ্ডিলটা আছে কিনা। এদিকে আসিলে রামুর ফুলশরিয়ার আঙনায় একবার ঢোকা চাই। পুরাতন আলাপ। ফুলশরিয়ার প্রথম প্রণয় রামুর সহিতই। প্রণয়ের নেশা অবশ্য রামুর বহুদিন পূর্ব্বে ছুটিয়া গিয়াছে—এখন তাহার ঘরে একপাল ছেলেমেয়ে এবং মারমুখী খাণ্ডার বউ। তবু রামু এখনও আসে। আসে, একটু বসে, বিড়ি খায়, দুই একটা অশ্লীল রসিকতা করে, তাহার পর চলিয়া যায়। মাঝে মাঝে দুই এক দোনা চানাচুর উপহার দেয়, দাম দিতে গেলে লয় না। বলে—"ই তোরা সুদ ছে"—বলে, আর অপ্রতিভ হাসি হাসে একটা।

চানাচুরের ব্যবসা করিবার জন্য ফুলশরিয়াই তাহাকে কুড়িটা টাকা দিয়াছিল কিছুকাল পূর্ব্বে। সে ভাল করিয়াই জানে যে রামু ও টাকা কখনও শোধ দিবে না। রামু কিন্তু রোজই বলে যে পরের মাসেই সে সব শোধ করিয়া দিবে। বহু 'পরের মাস' আসিল এবং চলিয়া গেল, টাকা আজও শোধ হয় নাই। ফুলশরিয়া মনে মনে হাসে। যদিও সে জানে যে ও টাকা আর ফিরিয়া পাওয়া যাইবে না তবু সে মুখ ফুটিয়া কখনও বলে না যে টাকাটা তোমায় দান করিলাম। রামু বড় আত্মসম্মানী লোক, তাহার দান সে লইবে না। তাছাড়া সে মুখ ফুটিয়া বলিতেই বা যাইবে কেন, লোকটাকে হাতে রাখাই তো ভালো। ফুলশরিয়া পেঁয়াজ কুটিতে কুটিতে রামুর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। রামু চলিয়া গেলে গদাইবাবু আসিবেন, তাহার পর জমাদার সাহেব। হঠাৎ ফুলশরিয়া ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। জমাদার সাহেবের কি ভীষণ গালপাট্টা, বাহিরে কি তর্জ্জন গর্জ্জন—হঠাৎ মনে হয় দুর্দ্ধর্ষ সিংহ একটা যেন, অথচ—। ফুল শরিয়া আবার হাসিল। (ক্রমশঃ)

মৃগয়া অভিযান

শ্রীপ্রতুলচন্দ্র ঘোষ

শীতের এক অপরাহ্নে যাত্রারম্ভ ; তারিখ মনে নেই, তবে দিনটি প্রখরালোকে উত্তপ্ত এবং যাত্রার পক্ষে বিশেষ শুভ ছিল। দীর্ঘ, বঙ্কিম পথ মোটারে পার হ'তে হবে। পাটনা থেকে বক্তিয়ারপুর ; বক্তিয়ারপুর হ'তে নওয়াদার বুড়ি ছুঁয়ে বিহার সরীফের কোল ঘেঁষে হাজারীবাগ রেঞ্জের এক জঙ্গলে আমাদের অভিযানের লক্ষ্যস্থল। শিকারের পক্ষে স্থান অতীব আশাপ্রদ—ঘন বিস্তৃত অরণ্য, শস্যক্ষেত্র, পাহাড়ী ঝর্ণা ; এর সমস্ত পথ দুস্তর হলেও অগম্য নহে। এমন কি, উপত্যকার কিয়দংশে মোটর বিহারেও শিকারের সন্ধান করা যেতে পারে। অর্থাৎ "গেম্" কিছু-না-কিছু পাওয়া যাবেই। এমন আবহাওয়ায় আমরা—মানে শিকারীর সঙ্গীরা, অতিশয় উৎফুল্ল হয়ে সঙ্গ নিলেম। দাদু আমাদের পাকা শিকারী। তার হাতের তাগ্ এমন অব্যর্থ যে না দেখ্লে বিশ্বাস হয় না। আমি আর বিজয়দা' সহকারী এবং দর্শক। দরকার হলে কার্ত্তুজ, বুলেট, জলের ব্যাগ প্রভৃতি এগিয়ে দেবো। শিকার পেলে ছুটে গিয়ে কুড়িয়েও নিয়ে আসতে পারি। তা ছাড়া, অ্যাড্ভেঞ্চারের মোহ তো শরীরের প্রতি রোমকূপে ভরপুর ছিলো।

মোটারের ব্যাক্সীটে আমরা তিনজন ঘন ও ঘনিষ্ঠ হয়ে অগ্রসর হতে লাগলেম। একশ' মাইলের উপর মোটরে যেতে হবে। পাটনা থেকে বক্তিয়ারপুরের রাস্তা অত্যন্ত বন্ধুর এবং ক্লেশদায়ক। কোন মতে হোঁচট্ খেতে খেতে এটা পার হতে পারলেই মঙ্গল, তবে ধূলিময় রাস্তা পাওয়া যাবে। দিনের শেষে প্রায় দেড় হাজার ফুট এক পাহাড়ের পাদদেশে আমরা গিয়ে পৌঁছুলেম। দেশটির নাম একতারা। একতারা গয়া জেলার একটি ক্ষুদ্র পল্লী বিশেষ। এর একপার্শ্বে কোদার্ম্মা, অন্যদিকে রজৌলী। মাথার উপরে হাজারীবাগ রেঞ্জের বিস্তৃত পাহাড়। পাহাড়গুলি দেখ্তে কুশ্রী নহে, তবে হিংস্র বন্যজন্তুতে এর প্রতিটি গুহা, প্রত্যেক অরণ্য বিপদসঙ্কুল হয়ে আছে। শাল মহুয়ার পত্রমর্ম্মরে, অতি নিকটে যে ঝর্ণাটি অনুচ্ছ্বল অন্তর্লীন বেদনায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হয়ে চলেছে তার দিকে তাকিয়ে শিকারী মনও বিস্ময়ে অভিভূত হয়। দাদু'র রুচিকে তারিফ না করে পারা গেল না। দাদু' নিজে শিকারী হলেও কবি-মনা। একতারার বাংলোতে থাক্তেও দেখেছি রাত্রির অন্ধকারে তিনি একাকী নিবিষ্ট মনে দূরের পাহাড়টার দিকে তাকিয়ে আছেন। বহুবার লক্ষ্য করেছি—ঝর্ণার উৎসমুখ দেখাবার আগ্রহ তাঁর শিকার-অন্বেষণ থেকে কিছুমাত্র কম নয়। বলা বাহুল্য, আমাদের অস্থায়ী আস্তানা ঐ একতারা'র ইন্স্পেক্শন্ বাংলোতেই স্থির ছিলো। অতঃপর এখান থেকেই আমাদের ইতস্ততঃ ছুটোছুটি করে বন্য জানোয়ারের পেছু নিতে হ'বে এবং এখান থেকেই "পথে পথে শ্বাপদের অভ্যর্থনা, পদে পদে মৃত্যু দিবে হানা।"

দ্রুত হস্তমুখ প্রক্ষালনান্তে চা' খেয়ে নিলেম, এখনই বাহির হ'তে হবে। স্থানীয় দু'একজন পথপ্রদর্শক এবং জনৈক প্রসিদ্ধ শিকারীকে সঙ্গে নিয়ে দাদু 'নাইট-স্যুটিং'এ যাবেন স্থির কর্লে'ন। নাইট-স্যুটিং নাকি ভয়ানক থ্রীলিঙ্। স্পট্ লাইট্ ফেলে ফেলে নিঃশব্দ গতিতে মোটর নিয়ে অগ্রসর হবার পর কোন এক পাহাড়ী নদীর ধারে, কিংবা শাকের ক্ষেতে থমকে দাঁড়িয়ে শিকারের আশায় উন্মুখ হয়ে থাক্তে হবে। তখন হতভাগ্য কোন বন্যজন্তু যদি ক্ষুৎ কিংবা পিপাসায় কাতর হয়ে সেই নদীর ধারে বা ক্ষেতে নাগালের ভেতরে আসে এবং সেই পরম শুভক্ষণটি অবহেলায় পার না হয়ে যায়, তবে অব্যর্থ লক্ষ্যে তাকে স্মরণীয় করে রাখা হয়। ইহাই নাইট্-স্যুটিঙের আসল রোম্যান্স।

—'নাইট্ স্যুটিঙই যদি না হলো তবে বৃথা এই শিকারের অভিযান ; হিংস্র বন্যজন্তু যদি দেখ্তে চাও, রাত্রির রহস্যময় মুহূর্ত্তগুলি বিচিত্র এক অনুভূতিতে, বিস্ময়কর এক উত্তেজনায় তোমাকে স্থির হয়ে বসে থাকতে হবে। কতো রকমফের জানোয়ারের চিৎকার, খস্খস্ সর্সর্ শব্দে তুমি রোমাঞ্চিত হয়ে উঠবে! মজা তো সেইখানেই—দাদু বল্লেন এবং সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করে উঠলেন,

"—হিংস্র ব্যাঘ্র অটবীর—
আপন প্রচণ্ড বলে প্রকাণ্ড শরীর
বহিতেছে অবহেলে ;—দেহ দীপ্তোজ্জ্বল
অরণ্য মেঘের তলে প্রচ্ছন্ন-অনল
বজ্রের মতন—রুদ্র মেঘমন্দ্র স্বরে
পড়ে আসি' অতর্কিত শিকারের 'পরে
বিদ্যুতের বেগে——"

—আমরা তো ইতিমধ্যেই যথেষ্ট রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছি ; চলুন না, কোথায় যাবেন?

কিন্তু সেই জনৈক প্রসিদ্ধ শিকারীর বাড়ীতে গিয়ে শোনা গেল, নাইট্-স্যুটিঙ্ এখন বন্ধ রাখ্তে হ'বে।

—কেন বন্ধ রাখ্তে হ'বে?

—ইম্প্রসিবল্!

—হোয়াই?—আমরা সমস্বরে বলে উঠলেম।

ঠিক বন্ধ রাখতেই যে হবে তা নয় ; তবে, রাখলে ভাল হয়। কারণ, একজন রাজকর্ম্মচারীর নির্দেশ এবং অপর এক বিশিষ্ট 'রুলিং চীফে'র অনুরোধ। তাঁরা উভয়েই নাকি দু' একদিনের ভেতরে ঐ স্থানে নিশীথ অভিযানে বাহির হ'বেন। তারা বলে পাঠিয়েছেন, বন্যজন্তু জানোয়ার পালন করে রাখো ; বাঘের সামনে বেঁধে দাও মহিষ, নয়ত ছাগল। ভালুককে যথেচ্ছা বেড়াতে দাও মহুয়া বনের মাঝে, হরিণ বন্য বরাহদের নষ্ট কর্ত্তে দাও শাক্শব্জীর ক্ষেত। মোটের উপর, 'গেম্' যেন হাতছাড়া না হয়। সুতরাং, উপস্থিত নাইট্ স্যুটিঙ্ স্থগিত রাখা শ্রেয়ঃ।

প্রসিদ্ধ শিকারীটি দাদুর অন্তরঙ্গ বন্ধু। ভদ্রলোক কানে শোনেন না ; কিন্তু তার চোখের জ্যোতি আশ্চর্য্যরকম তীক্ষ্ণ, হাতের নিশানা নাকি অদ্ভুত ভাবে সুস্থির।

দাদু বল্লেন—আমরা যদি মাচা বেঁধে রাত্রে শিকার মারি, যদি দিনের বেলা এই বনে 'বীট্' করি, আপনার আপত্তি নেই ত?

—না না, আপত্তি কেন থাক্বে! আমি এখুনি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি'। ভদ্রলোক শশব্যস্ত হয়ে তার সঙ্গীদের ডেকে পাঠালেন।

কোন্ গাছের উপর মাচা হবে, কোন্ নদীর ধারে দাদুকে মোটর নিয়ে অপেক্ষা কর্ত্তে হ'বে—ইত্যাদি সমস্তই ঠিক হয়ে গেল।

পথপ্রদর্শকদের উঠিয়ে নেওয়া গেল। পথপ্রদর্শক মানে রাত্রিচরদের আস্তানার খবর যে রাখে। শীতের রাত্রি দেখ্তে দেখ্তে গভীর নীথর হয়ে উঠ্ল। দাদু উপযুক্ত নৈশাচ্ছাদানে ভূষিত হয়ে নিলেন। হাতে রাইফেল, কোমরে সারিবদ্ধ বুলেট। টর্চ্চ, জলের ব্যাগ, সিগ্রেটের টিন্ সব হাতের কাছে রইল। বিজয়দারও সাহেবী পোষাক, ফ্লানেলের ট্রাউজার, কোট, চেষ্টারফিল্ড, এবং লাঠি। আমার এক হাতে টর্চ্চ, অন্য হাতে একখানি শাণিত কৃপাণ।

বন্দুক যখন চালাতে জানি না, তখন হাতে একখানা অস্ত্র থাকা ভাল। কী জানি—ভয়ে কথাটা আর শেষ কর্ত্তে পারলেম না।

'হ্যাঁ, এখন চলো সবাই'—তীব্রগতিতে মোটরে ছুটে চল্‌লো। কিছুদূর এসে আমরা বিভক্ত হয়ে পড়লাম। এখন বিভিন্ন স্থানে শীকারের প্রত্যাশায় সমস্ত রাত্রি অচল অপলক ভাবে অপেক্ষা কর্ত্তে হ'বে। দাদু চল্লেন নদীর ধারে; আমরা—আমি, বিজয়দা আর প্রসিদ্ধ শীকারী'র কনিষ্ঠ ভ্রাতাটি—চল্লেম গভীর বনের দিকে। সেখানেই আমাদের নির্দ্দিষ্ট মাচা বাঁধা আছে। উক্ত মঞ্চটি এক বিশাল শাল্মলীতরুর একটি স্থূল শাখার পত্রান্তরালে রচিত হয়েছিল। অরণ্যের মধ্য দিয়ে এক মাইল পথ হেঁটে পার হয়ে এলাম। পথে যেতে যেতে বহু শ্বাপদের পদচিহ্ন দেখা গেল।

—'এই দেখুন হায়না'র পা'।

—'আর, ইয়া শেরুকা'।

—'আজ জরুর কুছ্ মিল্ যায়েঙ্গা'।

নবীন শিকারীটি আমাদের উৎসাহ দিয়ে আগে আগে বন্দুক বাগিয়ে চল্লেন। অতি মৃদুস্বরে তাকে একবার প্রতিবাদ জানালেম—'আপনার ওই বন্দুক দিয়ে কী শের্ কিংবা ভাল্ (ভল্লুক) মারা সম্ভব হবে?'

—'ওঃ হো জারেগা। মেরে পাছ্ ব্যাচেল্ টোটা হ্যায়'।

—তাহলে আর ভাবনা কি। চলুন্ বিজয়দা।

নবীন শিকারীটি আমাদের আদবকায়দা শিখিয়ে দিতে লাগ্‌লেন। আমরা যেন কাশি, হাঁচি, উঃ, আঃ শব্দ কখনো ভুলেও না করি। তাহলে কিন্তু শীকার পাওয়া যাবে না। হরিণের কান ভয়ানক তীক্ষ্ণ। সব সময়ে সজাগ থাক্‌তে হবে। নিঃশব্দে, শুধু শ্বাসপ্রশ্বাস ফেলে একটা রাত একটু কষ্ট ক'রে কাটিয়ে দিন্ বাবুজী—'তারপর. তগ্‌দীর আচ্ছা রহে তো দেখ্ লেঙ্গে'। টর্চ্চ ফেলে ফেলে অরণ্যপথে চল্লাম্। 'কোথায় রে সে নীড়, কোথা সে আশ্রয়শাখা'! মাচার নীচে এসে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লাম। 'এ কী রূপে দিলে দরশন্!' ওই বিশাল শাল্মলীতরুর ঋজু, মসৃণ দেহ অধিরোহণ করে আশ্রয়শাখায় স্থান গ্রহণ আমার দ্বারা সম্ভব হবে না। প্রায় দশ পনেরো ফিট উচ্চে আমাদের নিমিত্ত নৈশ শয্যা রচিত হয়েছিল। নবীন শিকারী তর্‌তর্ করে উঠে গেলেন। তারপর বিজয়দা'র **attempt** সুরু হলো। সে যে কী ভয়ানক **attempt.** হে ভগবান, তোমার পতাকা যাহারে দেও…!' ফ্লানেলের ট্রাউজার কোট—সোয়েটার—মোজা নিয়ে বৃক্ষারোহণ যে কী দুঃসাধ্য কার্য্য, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্য কেউ অনুমানও করতে পার্ব্বেন না। নাঃ, কিছুতেই হাস্য সংবরণ করা গেল না। কিন্তু 'হাসতে মোদের মানা'; বিজয়দা একপা' ওঠেন তো সরাৎ করে তিন হাত নীচের দিকে ঝুলে পড়েন। তাছাড়া ঝোলাও কী সহজ ব্যাপার, বিশাল গুঁড়ির সেই বিস্তৃত পরিধি! চার হাতেও তাকে কায়দা করা সম্ভব নয়।

—'আর একটু, এই আমি হাত বাড়িয়ে দিলেম, ধরুন এই হাত!'

কিন্তু হাত ফস্‌কে গেল। বিজয়দা একেবারে সেই বাতাহত কদলী বৃক্ষবৎ—

আমি হো-হো করে হেসে উঠলাম।

—'দেল্লাগী মৎ করিয়ে! আইয়ে বাবুজী ইধারসে।'—নবীন শিকারীর সহায়তায় বিজয়দা'কে এবার টেনে তোলা গেল। শীতের রাত্রেও আমরা গলদ্‌ঘর্ম্ম হয়ে উঠেছি। শয্যার দিকে তাকিয়ে শিউরিয়ে উঠলেম। তিন হস্ত পরিমিত এক দড়ির খাটিয়ায় আমাদের তিনজনকে সারারাত নিষ্ঠার সহিত অপেক্ষা করতে হবে। পাশ ফেরা দূরে থাকুক্ ভালভাবে বস্‌বার স্থানও নেই। ভারী পোষাকে সুস্থির হয়ে বসা সহজসাধ্য নহে। প্রতি মুহূর্ত্তান্তে ইচ্ছা হয় একটু ওদিকে ফিরে বসি। —হাত-পা একটু আরাম করে ছড়িয়ে দিই। নড়াচড়া করতে গেলেই গাছের ডালটা দুলে ওঠে…বৃক্ষপত্র টুপ্-টাপ্ করে নিস্তব্ধ রাতে গভীর শব্দে ভূপতিত হয়। অতএব নট্ নড়নচড়ন্!

পত্রান্তরাল থেকে একবার চারিদিকে তাকিয়ে নিলেম। হাল্‌কা পাত্‌লা জ্যোৎস্নায় সমস্ত জায়গাটা মোহাবিষ্ট হয়ে আছে। শিকারের পক্ষে এই জ্যোৎস্নাপ্লুত রজনী মোটেই আশাপ্রদ নয়। নিশ্চুপ অবস্থায় নির্জ্জন স্থানে বসে রাত্রির এই শুভ্রা, ধ্যানস্তিমিত রূপ আমাদের যথেষ্ট আনন্দ দিয়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু শিকারীদ্বয় এই অন্তরায়ে অনেকবার খুঁৎখুঁৎ করেছিলেন। সামনে স্বল্প বিস্তৃত চষা জমি; কাদায় জলে জনমানব শূন্য স্থানে তাহা অব্যবহার্য্য হয়ে পড়ে আছে। ক্ষেতের এক পার্শ্বে একটা ছোট নালা, অন্য ধারে আর একটা বড়ো খাল। আমাদের পেছনে রয়েছে ঘনারণ্য সমাবৃত একটা নাতি-বৃহৎ পাহাড়। তারই তলদেশে যখন বসে আছি তখন এমন আশা করা মোটেই অসঙ্গত নয়' আমাদের নবীন শিকারীটি গাছে উঠেও এই শেষবারের মতন বল্লেন, যে, এখানেই শেষরাত্রে বা মধ্যরাত্রে তৃষ্ণা নিবারণার্থে বন্যজন্তুদের সমাগম হবে। আমরাও নিঃসংশয়ে ইহা বিশ্বাস করলেম এবং 'উৎকণ্ঠায় তাহাদের লাগি প্রতীক্ষা' করতে লাগলেম। রাত্রি ধীরে ধীরে গভীর হতে লাগলো। শীতে, স্থানের অপরিসরতায় আমরা ক্রমেই অস্বস্তি বোধ করছি। কন্‌কনে ঠাণ্ডায় হাত-পা আড়ষ্ট হয়ে আসছে; মশক দংশনে শরীরের উন্মুক্ত স্থানগুলো ক্ষতবিক্ষত। হঠাৎ একটা তীব্র চিঁ-চিঁ শব্দে সমস্ত অরণ্য-পাহাড় বিদীর্ণ হয়ে গেল। আমরা দুজনেই ঠোঁটে আঙুল চেপে স্থির হয়ে রইলেম। নবীন শিকারী বন্দুকের মুখ ঘুরিয়ে তাগ ঠিক করে নিলেন। এ নিশ্চয়ই শম্বার্ (বন-হরিণ)। বিশাল তার শৃঙ্গ, মসৃণ ডোরাকাটা ধূসর তার গাত্রচর্ম্ম, চোখে তার সুদূরের দৃষ্টি, অতিদ্রুত তার গতিবেগ…' আমাদের কল্পনাতে পরিষ্কার-ভাবে সে উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌লো। আর গুলীবিদ্ধ সেই দেহাংশ খণ্ডিত করে কী সুস্বাদু এবং রসাল ভোজ্যবস্তুই যে তৈরী হ'বে…! আনন্দে উত্তেজনায় বিজয়দা'কে প্রায় ঠেলা দিতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু হায়, সেই বনের হরিণ আমাদের মনেই শেষাবধি রয়ে গেল।

নবীন শিকারী দীর্ঘ একটি নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করে বল্লেন,—নাঃ, ভাগ্ গিয়া!

আমরা লজ্জিত হয়ে পড়লেম। আমাদেরই অপরাধে বোধহয় শিকার হাতছাড়া হয়ে গেল। আবার উৎকণ্ঠায়, আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগ্‌লেম, ক্লান্তিতে ঘুমে বৃক্ষ থেকে আচম্‌কা যাতে পড়ে না যাই একজন অপরের শরীর দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে আছি।

—নাঃ, আর পারা যাচ্ছে না, এবার চলুন বিজয়দা! কোথাও আগুনের ধারে না যেতে পার্লে শীতে একেবারে মরেই যাব।

—আরো কিছুক্ষণ বসলে হ'তো না।

—থাক্‌গে!

আসবার সময় অরণ্যের মাঝে বেদেনীদের এক আড্ডা দেখে এসেছিলেম। উপস্থিত সেখানে গিয়ে হাত-পা একবার না সেঁকতে পারলেই নয়। আবার সেই বিজন বনপথ বেয়ে ফিরে চল্লেম, রাত্রি প্রায় অন্তিম মুহূর্ত্তে উপস্থিত। হিমেল হাওয়ায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো অবশ হয়ে আসছে। আড্ডার নিকটে যেতেই কুকুরক'টা চিৎকার করে উঠ্‌লো। আগুন তাদের জ্বালানোই থাকে। বিনা বাক্যব্যয়ে একেবারে আগুনের ভেতরে হাত দু'টো প্রসারিত করে দিলেম। বেদেনীরা শশব্যস্তে বেরিয়ে এলো। এমন সময়ে তারা মানুষের আগমন প্রত্যাশা করে না। হাতে তাদের অস্ত্র ধরাই ছিল। বোঝা গেল, প্রয়োজনের সময় মেয়েরাও পেছ্‌পাও হবে না। আমাদের একজন পাহাড়ী সঙ্গী ব্যাপারটা তাদের বুঝিয়ে দিল। এবার বাহির হলো পুরুষ-অভিভাবকরা। সঙ্গে এলো কম্বল, চাটাই এবং কিছু শুক্‌নো খড়। সেই ধূলি-দুর্গন্ধ বিজড়িত কম্বলে আরামের সঙ্গে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লেম। দাদু'র কোন খোঁজ পাচ্ছি না। তখন পর্য্যন্ত বন্দুকের কোন আওয়াজ কানে আসে নি। দাদু'র প্লেস্ ছিলো তখন নদীর কিনারায়, হয়ত তিনি কিছু

নিয়ে আসতে পার্বেন। এই রঙীণ আশায় অবশিষ্ট রাতটুকু ওখানেই কাটানো স্থির করলেম।

শ্রান্ত অবসন্ন শরীর দেখতে দেখতে নিস্তেজ হয়ে এলো।

—'উঠুন্ না মশাই, এরই মধ্যে নাক্ ডাকাতে আরম্ভ করলেন'—

ধড়মড় করে উঠে বসলেম।—'নাক আমার ডাকে না বিজয়দা, তা আপনি যতোই বলুন।'

—চলুন, একবার নদীর ধারটা ঘুরে আসি। দাদু'র তো কোন আওয়াজই পাচ্ছি না। এদিকে তো ফর্সা হয়ে এলো।

—তার জন্য আর আপনাকে ভাবতে হ'বে না। হাতে যখন রাইফেল্ আছে, তখন আবার ভয়টা কিসের? বরং আমরা নিরস্ত্র হয়ে বেরুলেই তিনি চিন্তিত হয়ে উঠবেন।

—চলুন না মশাই, প্রাতঃকৃত্যাদিটাও তো সমাপন কর্ত্তে হবে।

—ওঃ, চলুন তাহ'লে।

মাঝপথেই দাদুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তার নিস্তেজ মুখমণ্ডল দেখেই বোঝা গেল তিনিও কিছু পান নাই।

—তোমরা সেই ডাক্ শুনতে পেয়েছিলে? দাদু বল্লেন,—'শেষ রাত্রে এসেছিল, কিন্তু আমার নাগালের বাইরেই রয়ে গেল।' শার্দ্দূল স্যুটিং দাদু'র চিরদিনের সখ। গেম্ হাতছাড়া হয়ে যাওয়াতে তার অনুতাপের অন্ত রহিল না।

একতারার ডাকবাংলোতে যখন ফিরে এলাম, বেলা তখন প্রায় সাতটা। ঠাণ্ডা ঝিরঝিরে হাওয়ায় ক্লান্ত দেহ-মন বিবশ হয়ে পড়েছিলো। পথে আসতে আসতে দাদু' ঠিক করে ফেল্লেন, দিনের বেলায় পাহাড়ের মাথায় ঘন অরণ্যে 'বীট্' করা হবে, বেদেনীরা বীটার্সদের কাজে অতীব সুদক্ষ। তাদের অল্প কিছু পারিশ্রমিক এবং খাদ্য উপযোগী শিকারের কিয়দংশ মাংস দিলেই খুসী হয়ে হৈ-হৈ কর্বে। আমাদের নবীন শিকারীটি তার অগ্রজকে খবর দিতে ছুটলেন। সেই প্রসিদ্ধ শিকারী এবার আমাদের সঙ্গী হ'বেন। দিনের বেলায় 'বীট্' ভয়ানক 'ইন্টারেস্টিং'। বীট্ মানে—একদিক থেকে বন্যজন্তু-জানোয়ারদের তাড়া করে নিয়ে অপরদিকে চালনা করা; সেই অপরদিকের বিভিন্ন ঘাঁটিতে বিভিন্ন শিকারীরা সমান দূরবর্ত্তী স্থানে বন্দুক রাইফেল বাগিয়ে থাক্বেন। শিকার পাল্লার মধ্যে পড়লেই সকলে একসঙ্গে বা প্রথম যিনি দেখবেন তিনিই তার উপর বুলেট্ ছুঁড়ে ঘায়েল করবেন। আক্রমণের মোটামুটি প্ল্যান এই। তবে, অর্দ্ধচক্রাকারে কৃত এবম্বিধ ব্যূহ অনেক সময়ে বিপদজ্জনক হয়ে পড়ে। অনেক সময়ে দেখা গেছে এক ঘাঁটির গুলী অপর ঘাঁটির উপর অতর্কিতে পড়ে শিকারী এবং শিকার-বিলাসীদের প্রাণসংশয় করে ফেলেছে। সুতরাং অর্দ্ধচক্র এবং পরিধির ঘাঁটি অত্যন্ত সাবধানে নির্দ্দিষ্ট এবং সংরক্ষিত হওয়া প্রয়োজন।

ডাকবাংলো থেকে অতি দ্রুত প্রাতঃরাশ শেষ করে নেওয়া গেল। গরম-গরম খিচুড়ী তৈরীই ছিল। তার সঙ্গে সংযুক্ত হ'লো অর্দ্ধদগ্ধ তিতির মাংস। বন্দুকটা তুলে দাদু'ই সেটা সামনের গাছ থেকে সংগ্রহ করে দিলেন।

এবারকার পরিচ্ছদ অপেক্ষাকৃত হাল্কা করে নিতে হলো, গরম-কোট ছেড়ে হিল্ষ্টীক্ সঙ্গে নিলেম। জলের ব্যাগ ভর্ত্তি করে নেওয়া গেল। আবার মোটরে উঠে অগ্রসর হ'তে লাগলেম, ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে কণ্টকাকীর্ণ অপ্রশস্ত পথ—কোনমতে ঘুরতে ঘুরতে জঙ্গলের পাদদেশে এক মন্দিরের চত্বরে উপস্থিত হওয়া গেল। এখানকার আবহাওয়া অতীব গাম্ভীর্য্যপূর্ণ। একধারে সর্সর্ ঝর্ঝর্ শব্দে প্রবাহিত হচ্ছে একটা বেগবতী প্রস্রবণ। অন্যদিকে মুসাফিরখানায় সদ্য পরিত্যক্ত হাঁড়ি-কল্সী এবং রান্নার অন্যান্য উচ্ছিস্টাংশ মন্দিরের উপর কৌতুহল আরোও বাড়িয়ে দিল। এই নির্জ্জন ঘনারণ্যে মন্দির শুধু কৌতুহল এবং ধর্ম্মপ্রবণতাই বৃদ্ধি করায় না। ভক্তি পাইয়ে দেয়। এমন জায়গায় ডাকাতি, রাহাজানি, ব্যভিচারই সম্ভব হতে পারে। অন্ত প্রেরণা পরে আসে এবং ক'জনের আসে তাহাও সন্দেহসাপেক্ষ। আমাদের শরীর ছম্ছম্ কর্ত্তে লাগলো। মন্দিরটির নাম শুনলেম 'মহাদেওজীর স্থান'। এখানেই সকলের সম্মিলিত হবার কথা আছে। এখান থেকেই আমরা অতি সন্তর্পণে পাহাড়ের মাথায় উঠতে লাগলেম। কাঁটা লতাগুল্মে প্রতি পাদক্ষেপ জড়িয়ে যাচ্ছে। তা'ছাড়া, চড়াই ভেঙ্গে পাহাড়ের শীর্ষদেশে ওঠা বিশ্রী পরিশ্রমজনিত এক ক্লেদাক্ত ব্যাপার। বেদেনীরা পাহাড়ের গভীর তলদেশে চলে গেছে। সেখান থেকে তারা তাড়া করে নিয়ে আসবে বন্যশিকার। হরিণ, গওার, শের, ভাল্ বা গিনি ফাউলও ছুটে আসতে পারে। তার পূর্ব্বেই আমাদের নির্দ্দিষ্ট ব্যূহে প্রবেশ করা দরকার। এখানকার শিকারীদের পথঘাট সব জানা। তারা অতি দ্রুত অল্প শ্রমে উপরে উঠে গেলেন, আমরা তখনও অনেক নীচে। পলাশ-মহুয়ার গন্ধে সমস্ত বনানী রঙীণ মদমত্তে উৎফুল্ল হয়ে আছে। প্রতিপদে হোঁচট খাচ্ছি, তবুও তুলে রাখছি শুক্নো হরিতকী, মুখ দিয়ে শুষছি করবী ফুলের মধু। তৃষ্ণা নিবারণের সহজ এবং স্থায়ী উপায় ইহাই এবার স্থির করা গেল। কারণ, জলের ব্যাগ ইতিমধ্যেই অনেকখানি নিঃশেষিত। উপরে পানীয় জল পাওয়া যাবে না, চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি না থাক্লে শিকারী হওয়া যায় না। অব্যর্থ গুলীভেদের মতনই ইহা এক নিমিষে ঠিক করে নিতে হয়। আমরা তখন প্রায় এক হাজার ফুট উপরে উঠে গেছি। নীচে থেকে বেদেনীদের অস্ফুট কোলাহল অতি মৃদুভাবে কখনো কখনো ভেসে আসছে। আরোও দু'শ ফুট আন্দাজ উঠে আক্রমণ-ব্যূহের সন্ধান পাওয়া গেল। অর্দ্ধচন্দ্রাকৃত ব্যাসের সমান দূরবর্ত্তী তিনটি স্থানে তিনজন শিকারী আস্তানা নিলেন। আমি আর প্রসিদ্ধ শিকারী এক ঘাঁটিতে রইলেম,—দাদু রইলেন একজন পাহাড়ী গাইড নিয়ে। বিজয়দা আছেন কেন্দ্রাবস্থিত ঝোপে জুনিয়ার শিকারীর সঙ্গে। সকলের বন্দুকের নল নিম্নাভিমুখী গভীর খাদের দিকে। ঐ দিক থেকেই ভয়ার্ত্ত পশু প্রাণ বাঁচাতে তাড়া খেয়ে উপরে ছুটে আসবে। নীচের কোলাহল ক্রমেই স্পষ্টতর হয়ে আসছে। এবার আমাদের দৃষ্টিশক্তি অসিফলকের মতন তীক্ষ্ণ এবং চকিত হয়ে উঠল। যে কোনদিক থেকে যে কোন 'গেম' যে কোন সময়ে উর্দ্ধশ্বাসে ত্বরিত ছুটে বেরিয়ে আসতে পারে। যিনি আগে দেখতে পাবেন, 'স্যুট' করে তিনিই সমস্ত দিনের প্রশংসা ও জয়-তিলক অর্জ্জন করে নেবেন; কিন্তু লক্ষ্যভেদ যদি অব্যর্থ না হয়, একবার বুলেটের গুরুগম্ভীর ধ্বনির পর জন্তুর গতি ভিন্ন পথে ধাবিত হবে; হয়ত বা থমকে কোথাও তারা আত্মগোপন করে থাক্বে। শিকারীর গুলীর আওয়াজ তাদের অতি পরিচিত। প্রাণান্তকারীদের আকস্মিক আক্রমণ ও আর্ত্তনাদ বন্যজীবরাও ভোলে না। আমরা কান খাড়া করে আছি। আমার ঘাঁটির প্রসিদ্ধ শিকারী কানে একেবারেই শোনেন না। সুতরাং, আমি অধিকতর সচেতন হয়ে রইলেম। বীটার্সরা প্রায় সম-উচ্চে উঠে এলো। এমন সময়ে,······খট্ খট্ খটাখট্······। বিদ্যুৎগতিতে একদল গওার (বন্য হরিণ) ছুটে বেরিয়ে এলো। গত রাত্রির কল্পনায় হরিণ দিবালোকে পরিস্ফুট হয়ে পড়লো। আরো সুন্দর, সজীব হয়ে প্রাণভয়ে ছুটতে লাগলো। ওধার থেকে কে যেন সব চাইতে আগে রাইফেল ছুঁড়লেন, কি হ'লো কিছুই বোঝা গেল না। শীকার পড়লো কিনা তাহাও উপর থেকে আন্দাজ কর্ত্তে পারলেম না। কিন্তু, মৃগযূথ ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়লো। আমাদের সামনের পাহাড়টার উপর ছুটলো দুটো হরিণ শাবক; বাকিগুলো নীচের দিকে গতি ফেরালো। উত্তেজনায় আমি শিকারীপ্রবরকে ঠেলা দিয়ে বল্লেম,—"ফায়ার্"। তিনি রাইফেলটা উঠিয়ে নিলেন। এক মুহূর্ত্ত কী যেন ভেবে আবার ওটা নামিয়ে রাখলেন। ফের বল্লাম,—'দেখিয়ে ভাগ রহা হ্যায়।' 'চালাইয়ে গোলী।'

'যানে দি জিয়ে। মাদী'কা পর্ হাম্ নেহি গোলী ছোড়্তা।'

অর্থাৎ শাবক দু'টোর মাথায় শিং ছিল না এবং তার মতে উহারা হরিণ নয়, হরিণী। আমি নিরাশ হ'য়ে চুপ করে রইলেম। শিকারে এসে শ্রেণীভেদ, জাতিভেদ আমার দু'চোখের বিষ। অনেক বড়ো শিকারীরা, শোনা গেছে, নাকি বিশেষ অবস্থায় বিশেষ 'গেম্' শিকার করেন্ না—একমাত্র নরখাদক ব্যাঘ্র ছাড়া। নিরীহ জীবদের উপরে তাদের অযাচিত করুণা প্রায়ই শিকার-বিলাসীদের নিকট বিসদৃশ ঠেকে। দু'দিনের অফুরন্ত উত্তেজনা এতখানি শ্রম স্বীকারের পর হাওয়ায় মিশে গেল।

দাদু বেরিয়ে এলেন। রাইফেল তিনিই শুধু ছুড়েছিলেন। শিকার জখম হয়েছে। হেড্-বীটার্সকে ডেকে তিনি চতুর্দ্দিকে পাঠিয়ে দিলেন। সবাই খুঁজতে খুঁজতে নীচে নেবে চলো। প্রায় পাঁচ শ' ফুট্ নীচে একটা ক্ষীণ ঝর্ণাধারার পার্শ্বে বোধ হয় মৃত্যুর পূর্ব্বে শেষবারের মতন জলপান করার পর বৃহৎ একটি শম্বার ভূমিশয্যা নিয়ে পড়েছিল। তার দক্ষিণ পদের কিছু উপরে (জানুর নিম্নভাগে) গুলীর চিহ্ন দেখা গেল। মসৃণ, মোলায়েম মৃতদেহটির উপর একবার হাত বুলিয়ে নিলেম। বিরাট শৃঙ্গের একধার ভগ্ন...সেই সুদূরের দৃষ্টি যে-চোখে ছিল, সেই মৃগাক্ষী দু'টি তরল নীলাভ হয়ে এসেছে। অসহনীয় যন্ত্রণায় গুলীবিদ্ধ পা' পাথরের উপর বারংবার ঘর্ষণ করার আভাষ পেলাম, "ডেথ্ ইজ্ ডেথ্"! 'হাণ্টেড্' শীকার নিয়ে আধ্যাত্মিক আলোচনার সময় এখানে নহে। দাদু দু'জন বেদিনী'কে মৃতদেহের জিম্মায় রেখে সামনের পাহাড়টায় আর একটা বীট্ দেবার আয়োজন কর্লেন। সেখানেও অনুরূপ আবেষ্টনীতে মারা হলো একটা 'লেপার্ড'। অত্যন্ত ছোট, কিন্তু হিংস্রতায় যে দুর্ব্বল নহে, তার প্রমাণ পাওয়া গেল জন্তুটির গোঁফ, নখ ও দংষ্ট্রাতে। তার ছালটা ছাড়িয়ে নিয়ে যথাশীঘ্র নীচে নেমে এলাম। বীটার্সদের প্রাপ্য মাংস দেওয়া গেল। এ ছাড়া, অনেক লোভী, দরিদ্র মাংসভুক্রা ইতিমধ্যে জুটেছিল, তাদেরও কিছু কিছু বিতরণ করা গেল। বাকিটা ব্যাগ-দড়ির সাহায্যে মোটরের পেছনে আমরা ঝুলিয়ে নিলেম। শীতের মধ্যাহ্ন এবার সায়াহ্নে এসে ঠেকেছে। পুনরায় কোট-কম্বল চাপিয়ে গাড়ীতে পা' তুলে দিয়ে শরীরে উত্তাপ বৃদ্ধি করে নিলেম। দাদু বীটার্সদের এবার পাওনা মিটিয়ে দিলেন। একটা সিগ্রেট্ ধরিয়ে তিনি গাড়ীতে উঠে বল্লেন,—'তেওয়ারী, জোরসে হাঁকাও।'

চারটে আলো জ্বালিয়ে মোটার তীব্রগতিতে পাটনার দিকে ফিরে চল্ল।

ভাব—অলঙ্কার

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন ঘোষ

যাহা কোন বস্তুর শোভা বৃদ্ধি করে, তাহাকে বলে অলঙ্কার। ইহার নামান্তর আভরণ, ভূষণ।

মানবের প্রকৃত অলঙ্কার কি? দেহের অলঙ্কার হার বলয় সাজ পোষাক ইত্যাদি। গৃহের অলঙ্কার খাট, পালঙ্ক, আয়না আলমারী, আসবাবপত্র ইত্যাদি। কাব্যের অলঙ্কার উপমা, অনুপ্রাস প্রভৃতি।

'অলঙ্কার' অর্থ কি? ধাতুগত অর্থ অলম্+কৃ+ঘঞ—'অলং' অর্থাৎ যথেষ্ট, চূড়ান্ত, আর না, 'ঢের হয়েছে'—এইরূপ বুদ্ধি, প্রতীতি বা অভিমান করায় যাহা। শাস্ত্রীয় একটি কথা আছে 'অলং'—বুদ্ধি অর্থাৎ, যে বস্তু লাভে অন্য বস্তুর প্রতি কামনা বা লোভ থাকে না—চরম পরিতৃপ্তি লাভ হয়। যেমন গীতায় আছে—

"যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ"।

অহং+কার=অহঙ্কার; তিরস্ (অন্তর্ধান)+কার= তিরস্কারঃ, যাহা অপরকে দূরে সরাইয়া দেয়। এই অর্থেই দরজার পরদাকে বলে 'তিরস্করণী; ধিক+কার=ধিক্কারঃ, অর্থাৎ ধিক্ ধিক্ বলিয়া অবজ্ঞা প্রকাশ।

অলঙ্কার=অলম্+কার। ইহা এমন বস্তু যাহা 'অলং'—বুদ্ধি অর্থাৎ মানবের চরম ও পরম তৃপ্তি, শোভা, শ্রী ও তুষ্টি বিধান করে।

মানব একাধারে দেহ এবং চিৎ। দেহ ত আছেই, চিৎ বা আত্মাও আছে। এইজন্য, শাস্ত্রে মানবকে বলা হইয়াছে 'চিজ্জড়-সমন্বয়'। দেহের শোভা স্বর্ণ রৌপ্য হীরা মুক্তা প্রভৃতি। তেমনই আত্মার অলঙ্কার 'ভাব' বা ভগবদানুগত্য।

এই অলঙ্কারের বিপরীত বা প্রধান পরিপন্থী হইল 'অহঙ্কার' অর্থাৎ, দেহ এবং তদনুবন্ধী গেহ প্রভৃতিতে অভিমান—যাহাকে বলে দেহাত্মবুদ্ধি।

অলঙ্কার আর অহঙ্কার এই উভয়ের সম্বন্ধ দিবা-নিশা তুল্য। একের সন্নিধানে বা প্রাধান্যে অপরটি নিষ্প্রভ ও শক্তিহীন। যেমন আছে সাধন সঙ্কেত:—"যাঁহা রাম তাঁহা নাহি কাম। যাঁহা কাম তাঁহা নাহি রাম।"

এ বিষয়ে ভক্ত সাধকের মনোরম অনুভূতি এইরূপ:—"ছাড়লে পরে অহঙ্কার পাবি শ্যাম—কলঙ্ক অলঙ্কার"। "যদি সাধ মনে পরাতে ভূষণে, অঙ্গে লিখ শ্যাম নাম, হরিদাসীর আন্ ভূষণে কাজ কি আছে"।

ভাবের টিকা অনুরাগ-তিলক যে পরেছে কৃষ্ণকলঙ্ক যাহাতে লেগেছে তাহার একমাত্র লোভনীয় সজ্জা 'ভাব-অলঙ্কার'। যথা শ্রীরাধার অনুভূতি:—

"আমার নয়ন-ভূষণ শ্যাম দরশন
শ্রবণ-ভূষণ বাঁশীর গানে।
করের ভূষণ তাঁর চরণ-সেবন
বদন-ভূষণ কৃষ্ণ নামে।
কণ্ঠের-ভূষণ শ্যাম-মণি-হার
নাসা-ভূষা অঙ্গ-গন্ধ।
প্রতি অঙ্গে আমার পিরীতি ভূষণ
কহয়ে দাস গোবিন্দ।"

'কৃষ্ণভক্ত' এই খ্যাতি, চিহ্ন বা কলঙ্কই মানবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খ্যাতি ও গৌরব—ইহা শ্রীচৈতন্যদেবের ঘোষণা।

মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধারও ঐ একই কথা—

কানু পরিবাদ, মনে ছিল সাধ
সকল করিল বিধি
(চণ্ডীদাস)

কৃষ্ণ-ভাবময়ী সাধনার পরম কাম্যও ঐরূপ :—

"তোমার অনুরাগের তিলক পরে
আমি হব কৃষ্ণ-কলি।
ওহে বৃন্দাবনের বন্ধু আমার
তুমি হৈয়ো আমার কৃষ্ণ-অলি।"

যে 'গীতাঞ্জলি' বিশ্ববাসীকে মুগ্ধ করিয়াছে তাহাতে রবীন্দ্রনাথের যে মূল সুর বাজিয়াছে তাহাও ঐ একই রূপ। যথা :—

"আমায় নিয়ে মেলেছে এই মেলা
আমার হিয়ায় চলছে রসের খেলা।
হে মোর দেবতা ভরিয়া এ দেহ প্রাণ
আমার মধ্যে কী অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান। ইত্যাদি"

ভক্ত ভগবানের এই যে টানাটানি ও ছুটাছুটি শ্রীমদ্ভাগবত ইহাকে ভক্তি প্রেম—সাধনার চরম আদর্শরূপে প্রকটিত করিয়াছেন। ভক্ত ভগবানের এইরূপ পারস্পরিক আকর্ষণ একটি 'অপরিকল্পিতপূর্ব্ব' চমৎকারকারী দিব্য বস্তু।

ইহারই নাম শ্রীচৈতন্যদেবের নিজের আচরণ দিয়া জগতে প্রকটিত "অনর্পিতচরী" সাধনা।

এই যে ভক্ত ভগবানের পারস্পরিক প্রেম টানাটানি, ইহা জড়-বৈজ্ঞানিকের প্রচারিত মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বকে হার মানাইয়াছে, বহুদূরে, বহু নিম্নে ফেলিয়াছে। পুরুষোত্তম বা Personal God-এর এই যে রসের খেলা, এক কথায় ইহার নাম 'লীলা'—যাহা পৃথিবীর কোনও জাতির ধারণা বা অনুভূতিতে আসে নাই। ইহার ইংরাজী প্রতিশব্দ নাই। ইংরাজীর বিশেষজ্ঞ শ্রীঅরবিন্দও ইহার ইংরাজি প্রতিশব্দ দিতে পারেন নাই। 'লীলা' বুঝাইতে তিনি লিখিয়াছেন Lila.

বেদের 'মধু'-ব্রহ্ম (মধুবাতাঋতায়তে, মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ, মধুব্য পার্থিবং রজঃ ইত্যাদি মন্ত্র), 'রস'-ব্রহ্ম (রসোবৈসঃ) আর ভাগবত-প্রতিপাদ্য প্রেমের ঠাকুর মাধুর্য্যময়, লীলারসময় Personal God শ্রীহরি একই তত্ত্ব—যাহার নাম "বাস্তবং বস্তু" (ভাগবত)।

মানবাত্মার চরম কৃতার্থতা ও পরম শোভন অলঙ্কার লীলা-রসময় ভাব। ইহাই ভাগবতোক্ত "বুভূষা" (ভবিতুং ইচ্ছা) 'ভূ' ধাতু অর্থ হওয়া। কি হওয়া? যাহা মানবের হওয়া উচিত, তাহা হওয়াই মানবের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার ও গৌরব।

ভাগবতের 'বভূষা' শ্রীঅরবিন্দের হাতে ইংরাজী নাম পেয়েছে 'To become.'

শ্রীঅরবিন্দের প্রকাশভঙ্গী এইরূপ :—

"To me the ultimate value of a man is to be measured not by what he says, nor what he does, but by what he becomes."

'ভূ' ধাতু অর্থে এই যে খেলা 'ভাব' 'বুভূষা' ইহাই হইল মানবের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার, গৌরব ও গরব। এই ভাবের পরিণতি হইল, 'কান্তা প্রেম', শ্রীরায় রামানন্দ কর্ত্তৃক বিঘোষিত ও শ্রীচৈতন্যদেব কর্ত্তৃক সমর্থিত ও প্রচারিত 'তত্ত্ব "রাধা-প্রেম সাধ্য শিরোমণি"। ভাবের সেরা বা পরিণত ও পরিপুষ্ট অবস্থা 'মহাভাব'। মহাভাব-স্বরূপিণী, আরাধনা-তত্ত্বের চরম বিকাশ প্রাপ্ত প্রস্ফুটিত মূর্ত্তি (Principle of devotion perfected and personified, so to say) হইলেন শ্রীরাধা। বিশ্বসংসারে ঈশ্বর আরাধনাকারী ব্যক্তিমাত্রই, কি পুরুষ, কি স্ত্রী—যে দেশের, যে সমাজের, যে জাতির, যে গোত্রের, যে বর্ণের, যে বয়সের, যে স্তরেরই হউন না কেন, সকলেই শ্রীরাধার 'গণ' বা তাঁহার 'অনুগা' মণ্ডলীভুক্ত।

এই যে 'ভাব', 'বুভূষা', ভূ ধাতু তত্ত্ব, ইহারই নাম গীতার "ব্রহ্ম ভূয়ায় কল্পতে," 'সদ্ভাব ভাবিত' হওয়া অর্থাৎ সারূপ্যলাভ। ইহাই রবীন্দ্রনাথেরও কাম্য সাধনা।

জীবনের চরম পরিপূর্ণতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন :—

"সারা জনম তোমার লাগি
প্রতিদিন যে আছি জাগি
ওহে চিরজীবনের সাধনা
আমার প্রিয়তম তুমি নাথ
ওগো সুন্দর বল্লভ কান্ত
মিলন হবে তোমার সাথে
একটি শুভ দৃষ্টি পাতে
জীবন বধূ হবে তোমার নিত্য অনুগতা
বরণমালা গাঁথা আছে
আমার চিত্ত মাঝে
কবে নীরব হাস্য মুখে
আসবে বরের সাজে
বিজন রাতে পতির সাথে মিলবে পতিব্রতা।
ওগো আমার এই জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা"

ভাব-অলঙ্কার-চূড়ামণি ইহাই।

এই যে কান্তা প্রেম, ইহা এক অপূর্ব্ব সাধন-তত্ত্ব। ইহা ব্রজ-বধূগণ-কর্ত্তৃক প্রচারিত এক পরম রম্যা উপাসনা—"রম্যা-কাচিদুপাসনা যা ব্রজবধূবর্গেণ কল্পিতা"।

এই রম্যা আরাধনা-তত্ত্বকে শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণনা করিয়াছেন পতিব্রতা সতীসাধ্বী স্ত্রীর পতির প্রতি অব্যভিচারিণী নিষ্ঠার দৃষ্টান্ত দ্বারা।

আমেরিকা দেশেও মণীষী ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ সুর তুলেছেন এইরূপ :—

"If you want to attain your highest spiritual perfection, you have got to become a woman"

বিশুদ্ধ 'কান্তা'-ভাব সাধনায় শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার স্বামীর আদর ও গরব। অন্য অলঙ্কার বা পুরস্কার মনে ধরে না। যথা শ্রীরাধার আকুতি :—

"তোঁহার গরবে গরবিনী হাম
রূপসী তোঁহার রূপে।
হেন মনে করি ও দুটি চরণ
সদা লৈয়া রাখি বুকে।

অঙ্গের আছয়ে অনেক জনা
আমার কেবল তুঁহি।
পরাণ হইতে শত শত গুণে
প্রিয়তম করে মানি।
নয়ন অঞ্জন অঙ্গের ভূষণ
তুঁহি সে কালিয়াচান্দা।
জ্ঞানদাস কয় তোঁহারি পিরীতি
অন্তরে অন্তরে বান্ধা।"

আরাধনা তত্ত্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্র ও আদর্শ মূর্ত্তি হইলেন শ্রীরাধা। রাধা ভগবানের একান্ত বল্লভা। রাধার প্রেমের নাম 'সমর্থা' রতি অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে পরিপূর্ণরূপে শ্রীভগবানের 'বাঞ্ছাপূর্ত্তি' ও 'আহ্লাদ' প্রদান (হরিতোষণ) কার্য্যের সর্ব্বাপেক্ষা দক্ষা যিনি তিনিই 'রাধা'। রসস্বরূপ সচ্চিদানন্দঘন শ্রীভগবানের আনন্দশক্তি বা হ্লাদিনী মূর্ত্তি শ্রীরাধা। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে আছে :—

'কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে নামে আহ্লাদিনী'
'কৃষ্ণ-বাঞ্ছা পূর্ত্তি রূপ করে আরাধনে
অতএব রাধিকা নাম পুরাণে বাখানে'।

কৃষ্ণ আহ্লাদিনী আনন্দদায়িনী যিনি তিনিই হ্লাদা—রাধা (রলয়োভেদঃ)। রাধাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা কৃষ্ণ-বাঞ্ছা-পূর্ত্তিকারিকা, তাই তাঁহার নাম 'সমর্থা'। চরিতামৃত বলেন :—

'কৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা রাধিকাতেই রহে।'

যতদিন ভগবান থাকিবেন, ভক্ত থাকিবে, আরাধনাতত্ত্ব থাকিবে, যতদিন ভক্ত ভগবানে "যুগল সম্মিলন" (রবীন্দ্রনাথের ভাষা) সত্য থাকিবে, ততদিন রাধা ও তাঁহার গণ (আরাধক মণ্ডলী) থাকিবে, ততদিন এই 'ভাব'—অলঙ্কার সত্য ও কাম্য থাকিবে।

মানব জন্মকে ভাগবত বলেছেন সকল জন্মের শ্রেষ্ঠ জন্ম "অখিল জন্ম শোভনং নৃজন্ম" (ভাঃ ৫।১৩।২১)। সকল জন্মের শোভা বা অলঙ্কার স্বরূপ মানব জন্ম। আবার, মানবের শোভা, অলঙ্কার, মূল্য মর্য্যাদা হইল 'ভাব'। যাহার পরাকাষ্ঠা বা চরম আদর্শ হইলেন—মহাভাবস্বরূপিনী শ্রীরাধা।

এই ভাব-অলঙ্কার গড়নের গোড়া পত্তন 'শরণাগতি' বা 'নিবেদিতাত্মা' ভাব অর্থাৎ সর্ব্বকার্য্যে সর্ব্ব বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে ভগবানের প্রতি একান্ত আনুগত্য। ইহাকে বলে 'তদীয়তা' এবং ভাগবত মতে "তদীয়" ভাবই—জীবনের পরম পুরুষার্থ "ভগবদীয়ত্বেনৈব পরিসমাপ্ত সর্ব্বার্থঃ" (ভাঃ ৫।৬।১৭)

এই 'ভাব' অলঙ্কারের আমদানী হয়, নব-বিবাহিত জীবনে। ঘরে ঘরে বিবাহ উৎসবে যথাশক্তি বসন ভূষণাদি প্রদত্ত হইয়া থাকে। কিন্তু ভাব-অলঙ্কারের প্রতি তেমন দৃষ্টি থাকে না। ভাব-অলঙ্কার পরিলে, ভাব-অঞ্জন চোখে লাগিলে, জীবনের রঙ্ বদ্‌লাইয়া যায়। সুর অন্যরূপে বাজে—জীবনের সমস্ত অনুভূতি সমস্ত আস্বাদন এক নূতন রসে রসিত হয়। সে দেখে "কৃষ্ণময় জগৎ," "নারায়ণময়ং জগৎ," "বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি"। তখন হয় তার কৃষ্ণময়ী ভাব—যেমন আছে চরিতামৃতে—"কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যার ভিতরে বাহিরে। যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণস্ফুরে"। তখন তার আন্ ভূষণে কাজ কি আছে—"প্রতি অঙ্গে পিরীতি ভূষণ, কহয়ে দাস গোবিন্দ"।

চিঠি

শ্রীমঞ্জুশ্রী সোম বি-এ

কানে যাচ্ছিল না রেবার কোনো কথা—রান্নাঘরে যে সমস্ত আলোচনা চল্‌ছিল মা'তে আর জেঠাইমা'তে। দুধটা জ্বাল দিয়েই চিঠিখানা পড়বার সে সময় পাবে মনে হচ্ছে। লেটার-বক্স থেকে খামখানা নিয়ে সেই যে সেমিজে পুরেছে, ঘামে ত' সারা হ'য়ে গেল!

ও' বেলার তরকারী কুট্‌ছে বৌদি, তাকে না আবার এঁচোড় কুট্‌তে ডাকে! এখন তো মোচা নিয়ে ও' ব্যস্ত আছে।

বাটিগুলোতে এক এক করে দুধটা ঢেলে রেখে কড়াটা বার করে দিয়ে ও' সরে পড়তে যাচ্ছে, এমন সময় মা বললেন, 'লংকাটা একটু বেটে দে, মা।'

তারপর মাছটাও কুটে দিতে হ'ল।

জেঠাইমা বল্‌লেন, 'আজ কারুর চিঠি এলো না? ডাক এসেছে?'

লীলা বল্‌লে, এসেছে, দিদির একখানা চিঠি ছিল।

'—কে লিখেছে রে?' মা'র প্রশ্ন।

রেবা কথা কয়না; মাছ ক'খানা করতে হবে, ভাব্‌তে থাকে। বউদি সামলায়। বলে, ওর বন্ধু।

'আর বন্ধু দরকার নেই। এই দুঃসময়ে আর চিঠি লেখে না—লোকে বলে খেতে পাচ্ছে না!'

...সারা বাড়ীটায় একটা গোপন জায়গা নেই চিঠি পড়বার। এ' ঘরে বাবা, ও' ঘরে দাদা। ছাদে গেলেও লীলা গিয়ে পড়তে পারে। কলতলায় গিয়ে পড়া যেত, কিন্তু সর্দি হয়েছে আজ; ও' স্নান করবে না, জেঠাইমার নিষেধ।

কি করে রেবা...পড়ার টেবিলে গিয়ে চেয়ারখানা টেনে বসে... সুকৌশলে চিঠিখানা বের করে শাড়ির আঁচলে ঢাকে...বুকের ভিতরটা কেমন ধক্ ক'রে ওঠে...নীল খাম...রেবার চোখের তারায়ও ঝিলিক্ দিয়ে নেচে ওঠে আনন্দের নীলদ্যুতি...। ও'দিকে দাদা পড়ছে কি একটা বই...সন্তর্পণে রেবা খামখানার মুখ খুল্‌তে যাবে, বাবা ডাকেন, 'রেবা, একবার আয় ত' মা!'

ও'র দীপ্তি-উজ্জল মুখে নেমে আসে অভিমানের ছায়া এদিক-ওদিক চেয়ে আবার খামখানা সেমিজে পুরে ফেলে।

'ধুতিখানার ফাট্ ধরেছে, দেখেছিস্? এ বেলা রিপু করে ফেল মা, নইলে...।

সূচ সুতো নিয়ে এসে বাবার ধুতিখানা সেলাই করে রেবা

উঠ্‌ল…এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়ার মিঠে আমেজ ওর মনে বুলিয়ে দিলো স্নিগ্ধ সুতৃপ্তি…এখন বুঝি চিঠিখানা ও' পড়তে পারবে। দাদা বেরিয়ে গেছে, ও' ঘর শূন্য…খুশি হ'য়ে উঠে রেবা…কিন্তু ঘড়ি জানিয়ে দেয়, এবার জনা ও খুকুলুকে স্নান করিয়ে দিতে হবে…থম্‌কে দাঁড়ায় রেবা। বাঁ-হাত দিয়ে অনুভব করে' ও'র বহু-ঈপ্সিত প্রত্যাশিত প্রবাসী প্রিয়'র মনের লিখনখানি…ঐ সাদা মেঘ ভেসে যাওয়া দূর আকাশে ও'র চোখের তারা আপনাকে হারায়…

…লীলাটা যেন কি। কোথা থেকে দৌড়ে এসে গলা জড়িয়ে ধ'রে মিষ্টি সুরে বলে, 'বল্‌না দিদি, কার চিঠি।' যদিও কিছু প্রকাশ করে না, তবু রেবা ও অলোকের মধুর-মিতালির কথা লীলা জানে মনে মনে…ও'দের দু'জনের দেখাশোনা, আলাপ ও আদানপ্রদানের এমন কতগুলো বিশেষ সময় ও সংকেত আছে, যা শুধু বৌদি-ই জানে…কিন্তু তুখোড়, চটপটে মেয়ে লীলা… একান্ত মৌনভাবে অতি মনোযোগের সংগে অত্যন্ত ঔৎসুক্য নিয়ে এই কিশোরীটিও যে সমস্ত কিছু লক্ষ্য করছে, তা' জানে না রেবা, বৌদি বা অলোক!

…রেবার সমস্ত মন তখন দারুণ দুঃখ ও ক্ষোভে জমজমাট্‌… ও'র চোখের কোণে বেদনার ছলছলে আভা…বল্‌লে বলে' সব কিছুই যে তোর জান্‌তে হবে, তা'র কোন মানে নেই…' বাড়ির সবাই যেন আজ জোট পাকিয়ে গোপন অভিসন্ধি ক'রে রেবার পিছনে লেগেছে…ও'র চোখ ছাপিয়ে জল আসে, নাকের ডগা লাল হ'য়ে ওঠে…

ঠোঁট উল্‌টিয়ে লীলা বলে, 'হুঁ, বুঝেছি—'

রেবা তখন সশব্দে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসে নীচে…ও'র কানের দুলে নাচন চলে…হাতের কাঁচের চুড়ি বাজে রিনিক্‌-ঝিনিক্‌…বৌদি বলে ফিস্‌ফিসিয়ে, 'রাজপুত্তুরের খবর কি গো?'

রেবার ঠোঁট দুটোয় শুধু তরংগ খেলে যায় বার কয়েক…সব কথা তা'র হারিয়ে গেছে…চোখ তুলেও সে তাকাতে পারছে না…

খাওয়া-দাওয়ার পাট উঠ্‌তে বেলা দেড়টা বাজ্‌লো…ছাদে উঠে এলো রেবা…এবার কি সে পরিপূর্ণ—একেলা পড়তে পারবে চিঠিখানি—।…বাবা, দাদা অফিসে…মা শুয়েছেন… জেঠাইমা নাকে চশমা এঁটে রামায়ণ পড়্‌ছেন…বৌদি একটা টেবিল্‌ ক্লথে ফুলের কাজ করছে…লীলা গেছে সেলিমার বাড়ি বেড়াতে…হ্যাঁ, এখন তা'র মিলেছে নিজেকে একান্ত একেলা করে পাবার পরিপূর্ণ অবকাশ…এই তো অতল স্বপ্ন-সায়রে গাহন করবার বিরাট প্রশান্তি এল ও'র জীবনে…আকাশে আজ এক খণ্ড লঘু মেঘের লুকোচুরি খেলাও চলছে না…যতদূর দেখা যায় নীলিম আকাশ তট…দূর, উর্দ্ধ গগনে উড়ে যায় বলাকার অর্দ্ধ চন্দ্রাকার ঝাঁক…দু' একটি শংখচিল, তাদের ডানা-ঝাপ্‌টের সংগে সংগে ঝরে পড়ে' অজস্র স্বর্গ-রেণু…কোথায় কোন্‌ দেশে তারা যায়, কে জানে। নিরুদ্দেশের ডানায় ভর করে—রেবার মনও ছুটে যায় জানা-অজানার মর্ত্তে, স্বর্গে…ঐ আকাশের মুক্তপর্ণা বিহংগম-বিহংগমীর মতই এখন তার অবাধ উন্মুক্তি…নিজেকে একা পাওয়ার মাঝেই সে পায় এক অভিনব আত্মপরিচয়…তাইতে-ই সে বিমুগ্ধ, বাণীহারা…কতো বর্ণের বিচিত্র ডোরে ওর স্বপ্নের জাল বোনা…ও'র কল্পনার খেলাঘরে কতো রঙীন ছবির আসা-যাওয়া…

খেয়াল হয় রেবার হাতে তা'র নীল খাম। তা'র হাতের কাঁকন বাজে ছল্‌ছলাৎ…টং টাং…বুকের মাঝে বাজে কোন্‌ সোহাগ মধুর ছন্দ।

খস্‌…খস্‌…খস্‌…

নীল খামখানার ভিতর থেকে চিঠিটা বার করে। চিঠির পাতা খুলতেই একরাশ সৌরভ রেবাকে জানালো প্রথমতম কাব্যিক অভিনন্দন…পাতার বুক থেকে যুঁই রজনীগন্ধার পাঁপড়ি পড়ল ঝরে—ওর বুক বেয়ে কোলের ওপর…কি মিষ্টি, কি পরম অনুরাগ-সিক্ত।…সুনীল কাগজের বুকে লেখা চিঠি…জোছনা রাতে নেয়ে ওঠা একরাশ রজনীগন্ধার মতই স্নিগ্ধ-আবেশ-মধুর …সৌন্দর্যে ও সৌগন্ধে প্রাণে আনে বিবশ-স্বপন।

অলোক কবি…অলোক শিল্পী…তাই তা'র নিত্য নূতন মনের খেয়াল পাঠায় এই ভালো-লাগা কিশোরীর কাছে।…লিপিকার ওপর এঁকেছে ওর খুসির খেয়ালে দু'টি কাঁকন ও একটি অঙ্গুরীয় রেবার ঠোঁটের পাঁপড়িতে সলজ্জ-হাসির ঝিলিক্‌ খেয়ে যায়…বুকের রক্তে নামে ছন্দের বন্যা।

'বঁধুয়া—'

এই নামেই অলোক ওকে ডাকে…কতোদিন রেবা এরি জন্যে অভিমান করেছে…তবু অলোক নাম বদ্‌লাতে নারাজ…এ' নাকি ওর মনের খুসি—বড়ো ভালো লাগে, বড়ো মিঠে লাগে, আর বড়ো আপন লাগে।

রেবার সরম-মুকুলিত মুখে কিংশুক রক্তিম দীপ্তাভা বুকের নীড়ে চল্‌ছে কার মৃদু-মধুর গুণ-গুণানি…চোখের তারায় আলো-ছায়ার ঝিকিমিকি…কপোলের মাঝে ক্ষণে ক্ষণে অপরূপ বর্ণ-সুষমার পরিবর্ত্তন চলে…আঙুলগুলো কাঁপে, যেন কোন্‌ দুরন্ত বাতাসের উদ্বেল-চঞ্চলতায়…চূর্ণ কুন্তলের ফাঁকে ফাঁকে বিন্দু বিন্দু ঘর্মে, কানের দুলে, গলার হারে চঞ্চলতা…

…একেবারে শেষ-আখরটি ওর মনে নেশা ধরিয়ে দেয়… তন্দ্রাহতের মত রেবা শুধু বলে শতবার শত সুরে, মন-সখা… মন-সখা…মন-সখা……

নিকটেতে দিও ঠাঁই

মহারাণী শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

এ মর জগতে কেন এনেছি'লে
ওগো মোর প্রিয় বিভু,
তৃষাতুরা মোর জীবন করেছ
বারি নাহি দিলে কভু। ওগো মোর প্রিয় বিভু॥

করমেরে সাথী করিয়া চলেছি।
তব কৃপা নাহি পাই,
তবু ডাকি প্রিয় দূরে নাহি যেও
নিকটেতে দিও ঠাঁই॥

শতাব্দীর শিল্প—গগাঁ

শ্রীঅজিত মুখোপাধ্যায় এম-এ (লণ্ডন), এফ্-আর-এ-আই (লণ্ডন)

পৃথিবীর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড অভিযোগ নিয়েই গগাঁর জন্ম হয়। তাঁর শিরায় ছিল তাজা রক্ত, তাই আধুনিক কৃত্রিম সভ্যতার বিরুদ্ধে গগাঁর তরুণ মন বিদ্রোহ করে বসল। গগাঁ ছিলেন কর্ম্মী এবং সাধারণের চেয়ে অনেক বেশী বুদ্ধিমান। জীবনধারণের পক্ষে যথেষ্ট উপার্জ্জন করা সত্ত্বেও তিনি আর্থিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য উপেক্ষা করে শিল্প সৃষ্টিই জীবনের একমাত্র কাম্য বলে মেনে নিলেন। জীবন যুদ্ধে পরাজয়ের ভয়ে যারা মদ খেতে সুরু করে দেয়, সেইসব কাপুরুষদের মত দেশ ছেড়ে তিনি প্রশান্ত মহাসাগরের আদিম দ্বীপপুঞ্জে পালিয়ে যান নি। কিন্তু তিনি একদিকে যেমন ছিলেন যোদ্ধা তেমনি ছিলেন ভীতু। দৈহিক শক্তি ছিল তাঁর প্রচুর, কিন্তু নৈতিক চরিত্রে তিনি খুব দুর্ব্বলতার পরিচয় দিতেন। কিন্তু এসব স্তুতিবাক্যের প্রলোভন এড়িয়ে যাবার মত তীক্ষ্ণবুদ্ধি গগাঁর ছিল। গগাঁ জানতেন যে তাঁর আঁকা ছবিগুলি শুরু পিসারোর ছবির অনুকরণ মাত্র। কিন্তু গগাঁ এও জানতেন যে তাঁর নিজের ভিতরে আছে সত্যিকারের শিল্প প্রতিভা। তাই "ইম্প্রেশানিজম" আর তাঁর ভাল লাগল না। গগাঁ শিল্পে একটা বড় আদর্শ খুঁজতে লাগলেন। জীবনের বাস্তবতা থেকে দূরে থাকবার জন্যই গগাঁ শিল্প গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু এখন দেখা গেল তাঁর জীবনই শিল্পের সঙ্গে এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে যে এর থেকে গগাঁর পালানর পথ আর নেই। ১৮৮৩ সনের জানুয়ারী মাসে তাই গগাঁ বলে উঠলেন, "শিল্পই আমার ধর্ম্ম, আজ থেকে প্রত্যেকদিন শিল্প সৃষ্টি করাই হবে আমার একমাত্র উদ্দেশ্য।"



প্রেতাত্মার নিরীক্ষণ

যখনই তাঁর জীবন দুর্ব্বহ হয়ে উঠেছে, তখনই আত্মীয় স্বজন পরিবারবর্গ উপেক্ষা করে চলে যেতে মোটেই ইতস্ততঃ করেন নি।

শিল্প জগতে যখন তাঁর প্রথম প্রবেশ তখন ছিল "ইম্প্রেশানিজম্"এর যুগ। শিল্প ইতিহাসে অনভিজ্ঞ গগাঁ ঝোঁকের মাথায় "ইম্প্রেশানিষ্টদের" দলে ভর্ত্তি হলেন। প্রথম প্রথম তিনি "ইম্প্রেশানিষ্টদের" বর্ণবিন্যাস খুব প্রশংসা করতেন এবং প্রাচীনের গতানুগতিক পন্থার বিরুদ্ধে যে তারা দাঁড়িয়েছে সেই সাহসিকতা গগাঁর খুব ভাল লাগত। ১৮৮০ সনে প্রথম তাঁর আঁকা ছবি "ইম্প্রেশানিষ্টদের" প্রদর্শনীতে দেখানর ব্যবস্থা হয়। জনসাধারণের কাছ থেকে কিছু প্রশংসাও তিনি অর্জ্জন করেন এবং বিশেষভাবে সমালোচক হারম্যান তাঁর আঁকা "মগ্ন" ছবিখানির খুব উচ্চ প্রশংসা করেন। যদিও এই সম্মানে গগাঁ খুব খুসী হয়েছিলেন কথাটি শুনে তাঁর স্ত্রী দস্তুরমত ভয় পেয়ে যান।

কিন্তু প্রতিজ্ঞামত দৈনিক ছবি আঁকা গগাঁর হয়ে উঠল না। সভ্যতা থেকে দূরে নিজেকে ঠেলে নিয়ে চললেন। অনেক লোকসান দিয়ে নিজের আঁকা ছবিগুলি বিক্রী করে প্যারী ছেড়ে চলে এলেন একটি নির্জ্জন পল্লীতে। প্রায় ৮ মাস পল্লীজীবন কাটিয়ে কোপেনহেগেন প্রভৃতি ঘুরে গগাঁ একেবারে নিঃস্ব অবস্থায় পুনরায় ফিরে এলেন প্যারীতে। দুঃখ কষ্ট তাঁর অপরিচিত ছিল না; বেদে-জীবনে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন। তাই দারিদ্র্য সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে আবার গগাঁ শিল্পসৃষ্টির দিকে মনোযোগী হয়ে উঠলেন।

ব্রিটেনিতে গগাঁকে ডেকে পাঠান হল। তাঁর জীবনের স্বপ্ন বাস্তব রূপে পরিণত করার পক্ষে ব্রিটেনি একটি আদর্শ স্থান। উপরন্তু

এখানে তিনি বিখ্যাত শিল্পী ভ্যান্ গগ্ প্রভৃতির সংস্পর্শে আসবার সুযোগ পান। এইভাবে বহুদিন ঘুরে ফিরে দুঃখকষ্টের মধ্যে দিয়ে চলতে চলতে গগাঁ মাঝে মাঝে গর্জ্জে উঠে বলতেন—"শিল্প শিল্পের জন্যেই। না হবার কোন কারণ নেই। শিল্প সৃষ্টি বেঁচে থাকার জন্যে; নিশ্চিত পেটের জন্যে ত' বটেই।"

ব্রিটেনিতে থাকা কালীন শেষ কয়েকবছর গগাঁ ডেগাস্, ভ্যান্ গগ্, সিজান প্রভৃতি শিল্পীদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হন। এই সময় তিনি "যীশু" ও "জ্যাকব এঞ্জেলের লড়াই" নামে দুখানি ছবি আঁকেন। এই ছবি দু'খানিতেই তাঁর নিজস্ব প্রতিভা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। কিন্তু গগাঁর মনে ধর্ম্মের ভণ্ডামী ছিল না, তাই তিনি ছবি দু'খানির বিষয়-বস্তুতে ধর্ম্মভাব জাগাতে মোটেই চেষ্টা করেন নি। যীশু সম্বন্ধে গতানুগতিক ধারণা তিনি সম্পূর্ণ-ভাবে অগ্রাহ্য করে ছবিখানিতে এক নূতন ভাব ফুটিয়ে তোলেন।

এই সময় ব্রিটেনিতে গগাঁ এক ছত্রাধিপতি। কিন্তু তাঁর রাজত্ব ছিল অল্পপরিসর। অন্যদিকে প্যারীও কোনদিন তাঁকে অনুপ্রেরণা দিতে পারি নি। তাই স্বভাবতঃ সুদূর প্রাচ্যের রঙিণ সূর্য্য, সেই শব্দহীন গহন অরণ্যানী, দিগন্ত বিস্তৃত সমুদ্র তাঁকে আকৃষ্ট করল। এই সময় তাহিতি সম্বন্ধে একখানি ছোট বই গগাঁর জীবন-পথ সুনির্দ্দিষ্ট করে দেয়। তিনি তাঁর এই ভ্রমণ বৃত্তান্ত "নোয়া নোয়া" পুস্তকে খুব আন্তরিকতার সঙ্গে লিখে গেছেন।



মাহানা-নো-আতুয়া



তাহিতি সুন্দরী

তাহিতির একটি সুন্দর পল্লীতে গগাঁর জীবন সুরু হল। খালি পা, নগ্ন বুক, দেশী খাবার খেয়ে তাদের আচার ব্যবহারের সঙ্গে মিশে গগাঁ যেন এখানে এক নূতন প্রাণের স্পন্দন পেলেন। দিনের পর দিন তিনি কুঁড়ে ঘরের সামনে বসে বসে শুনতেন নিশীথ রাতের বাজনার শব্দ, দেখতেন প্রণয়ের অভিসার, লণ্ঠন জ্বালিয়ে প্রেতাত্মার বিতাড়ন। এই সময়েই গগাঁর দুর্দ্ধর্ষ জীবন যেন তাহিতির আবহাওয়ায় শান্ত ও স্নিগ্ধ হয়ে উঠল।

কিন্তু তবুও তার জীবনে কিসের যেন আজ অভাব। ভালবাসার সঙ্গী তাঁর চাই—বান্ধবীকে খুঁজতে তিনি বেরিয়ে পড়লেন। বেশীদূর তাঁকে যেতে হল না। চারিদিকেই তাহিতি সুন্দরীদের আনাগোনা। তের বছরের মেয়ে তেহুরার দেহে প্রথম যৌবনের জৌলুস গগাঁকে মুগ্ধ করল।

গগাঁ তেহুরাকে জিজ্ঞেস করলেন—"তুমি কি আমাকে ভালবাস?"

তেহুরা এর উত্তর দিল না। চলে এল গগাঁর ঘরে মাত্র আট দিন থাকবে বলে। তাহিতিদের নিয়ম মেয়ে যদি আট দিনের মধ্যে কোন পুরুষের বাড়ী থেকে ঘরে ফিরে আসে তবে বুঝতে হবে মেয়ে সেই পুরুষের ভালবাসা চায় না। কিন্তু তেহুরা আর

গগাঁর ঘর থেকে ফিরে এল না। গগাঁ তাহিতি সুন্দরীকে বিয়ে করলেন।

তেহুরাকে ঘিরেই চলল গ গাঁ র শিল্প সৃষ্টি। দিনের পর দিন এক নূতন উদ্যমে ছবি এঁকে যেতে লাগলেন এবং এই সময়কার ছবিগুলিই গ গাঁ কে শিল্প জগতে অ ম র করে রেখে গেছে। গগাঁর ভয়ানক ইচ্ছে ছবিগুলি প্যারিতে প্রদর্শিত হয়। এক ব ন্ধু র সাহায্যে ১৮৯৩ সনের আগষ্ট মাসে তাহিতি ছেড়ে গগাঁ তাঁর আঁকা ছবিগুলি নিয়ে প্যারিসে এসে পৌঁছুলেন।

ছ বি গু লি র বিরাট প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হল। সুখ্যাতি এবং অ খ্যা তি দুইই পেলেন প্রচুর। ছবিগুলির বিক্রী থেকে বেশ কিছু অর্থও যে না পেলেন তাও নয়, কিন্তু যে জ গ ত থেকে গগাঁ নিজেকে দূরে রাখতে সব সময় চেষ্টা করেছিলেন সেই প্যারীর নৈশ-জীবন তাঁকে একদিন কঠিন রোগে আবদ্ধ করল।

উচ্ছৃঙ্খলতার বিরুদ্ধে দাঁড়ানর মত শক্তি গগাঁর আর নেই। প্যারীতে যা কিছু বিষয় সম্পত্তি ছিল সব বিক্রী করে প্রা চ্যে র দিকে আবার তাঁর মন ছুটল। ১৮৯৫ সনের ফেব্রুয়ারী মাস গগাঁর চলে যাবার সময়। তাঁর বিশেষ বন্ধু ষ্ট্রীনবার্গকে গগাঁ অনুরোধ করলেন তাঁর প্রদর্শনীর ক্যাটালগের একটি ভূমিকা লিখে দিতে।

ষ্ট্রীনবার্গ কটূক্তি করে লিখ্‌লেন, "তুমি গগাঁ পৃথিবীতে এক নূতন জি নি ষ দিয়েছ সত্য, কিন্তু প্রাচ্যের এই প্রখরতায় আমাদের কোন উৎসাহ নেই। তোমার কল্পনারাজ্যে যে ই ভ্‌ কে দাঁড় করিয়েছ তোমার ছবির অনুপ্রেরণার জন্তে, সেই মানসসুন্দরী আমাদের আদর্শ নয়। তুমি একজন



তাহিতির মেয়ে



চিন্তিতা

বন্য মানুষ যে সভ্যতাকে ঘৃণা করে এবং যা গতানুগতিক তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করে না। এমন কি তোমার কাছে আকাশ লাল, যদিও আমাদের মত অন্য রকম।"

উত্তরে গগাঁ বললেন, "Your civilization is your disease, my barbarism my restoration to health. The Eve of your civilized conception makes us all misogynists. The old Eve who shocked you in my studio will perhaps seem less odious to you some day. I have perhaps been unable to do more than suggest my world, which seems unreal to you...only the Eve I have painted can stand naked before us. Yours would always be shameless in this natural state, and if beautiful, the source of pain and of evil."

গগাঁ তাহিতিতে ফিরে এলেন বটে কিন্তু তেহুরার সন্ধান আর পাওয়া গেল না। ভগ্নহৃদয়, উৎসাহহীন, দারিদ্র্যের কষাঘাতে গগাঁ আরসেনিক বিষ খেয়ে জীবনের শেষ তিনখানি ছবি আঁকলেন, (১) "What are we ?", (২) "Whence do we come ?", (৩) "Whither are we going ?"

কিন্তু গগাঁর ভাগ্যে ছিল আরও কিছু কষ্ট, তাই তাঁকে বাঁচতে হল। জীবন ধারণের জন্তে সরকারী দপ্তরে অতি সামান্য মাহিনায় এক চাকুরী গ্রহণ করলেন। বিদ্রোহী মন বিতৃষ্ণায় ভরে উঠল। বুর্জোয়া সমাজের বিরুদ্ধে, সরকারী সয়তানীর বিরুদ্ধে গগাঁ প্রচার সুরু করে দেওয়ায় আদালতে তাঁর বিচার সুরু হল। আদালতের দণ্ডের অপেক্ষায় তাঁকে আর থাকতে হয় নি।

গগাঁ চিরদিনের জন্তে তাঁর সমস্ত অভিযোগ নিয়েই ধরণীর বুক থেকে বিদায় নিলেন।

রেডিওর লেখা

শ্রীসোমা

রেডিওর জন্যে কিছু লিখতে হবে। কি লিখব? এমন কিছু লিখব যাতে খানিকটা থাকবে শিক্ষা, (থাকবে আসলে সবটাই কিন্তু প্রচ্ছন্ন) খানিকটা থাকবে আনন্দ, খানিকটা থাকবে বিভিন্ন আদর্শবাদের কিছু কিছু, আর থাকবে বৈচিত্র্য! অর্থাৎ পাঁচটা জিনিষ এমনভাবে মেশাতে হবে যাতে, পাঁচটার কোনটাও বেশী হবে না, অথচ যার যেটা পছন্দ সে সমস্ত অনুষ্ঠানটির মধ্যে, সেটারই প্রাধান্য অনুভব করবে। ভুললে চলবে না যে সন্ধ্যাবেলায় বাড়ীতে বাড়ীতে রেডিও সেটে অনুষ্ঠানটি যখন হবে তখন হাজার রকমের লোক হাজার মনোভাব নিয়ে বিভিন্ন পরিবেষ্টনীর মধ্যে অনুষ্ঠান শুনবে। যদি ভাল না লাগে তাহ'লে একটা সুইচ ঘোরালেই সব শেষ। তিন মাসের শ্রম, পরিচালকের শ্রম, শিল্পীদের শ্রম, সব পণ্ডশ্রম! কাজেই এমন কিছু জিনিষ এমন ভাবে লিখতে হবে, যা সব রকম লোকের সব রকম আবহাওয়াতে 'ভাল' লাগবে।

এমন কি লিখব?

যাই লিখি না কেন, আরম্ভতেই যদি আদর্শবাদ প্রচার করি, অফিস্-ফেরতা বড়বাবু বিরক্ত হয়ে বলবেন—"বন্ধ কর, বক্তিমে ভাল লাগে না! কাঁটা ঘুরে যাবে, দরকার নেই!

তাহ'লে? হাল্কা কিছু দিয়ে আরম্ভ করলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃদ্ধ অধ্যাপক মাথা নেড়ে বললেন "ছ্যাবলামী আর কত শুনব?"—দরকার নেই।

সাম্প্রদায়িক মতবাদ দিলে চলবে না, রাজনীতিতে মেয়েদের আপত্তি, প্রেমের গল্প এক ঘেয়ে (সিনেমার সৌজন্যে!) প'নেরো মিনিটে নাটক জমবে না, তার বেশী সময় হলে কেউ একমনে বসে শুনতে পারবে না! আধুনিক গান দিয়ে আরম্ভ করলে বুড়োরা চটবে, কালোয়াতী দিলে যুবক যুবতীরা গালাগাল দেবে, হরিনাম করলে সমূহ বিপদ, কীর্ত্তন দিলে বন্ধু বান্ধবরা ঠাট্টা করবে, সবেতেই বিপত্তি, তাহ'লে? আচ্ছা ছাত্র-জীবন সম্বন্ধে কিছু লেখা যাক! আশা করা যায় সকলেরই ভাল লাগবে! ছাত্র জীবন মানে, চলতি ভাষায় যাকে বলে কলেজের জীবন। বেশীর ভাগ শ্রোতাদেরই ভাল লাগবে। কেন ভাল লাগবে? যারা ছোট তাদের ভাল লাগবে—কারণ, ভবিষ্যতে তাদের জীবনের খানিকটা আভাষ তারা পাবে, ছাত্র ছাত্রীদের ভাল লাগবে নিজের বাস্তব জীবনকে নাটকীয় ভাবে দেখতে পাবে বলে, আর যারা তিরিশ পেরিয়ে গেছে তাদের ভাল লাগবে কারণ অতীতে তাদের ছাত্রাবস্থার যে স্মৃতি তার মধ্যে অনেকখানি মাধুর্য্য আছে! তাছাড়া হয়ত এই অনুষ্ঠানের মধ্যে বিগত দিনের একটা অস্পষ্ট ইঙ্গিত নূতন করে পাবে বলে! আধুনিকাদের ভাল লাগা স্বাভাবিক, মাদের ভাল লাগবে কারণ কলেজের জীবন সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা অত্যন্ত অস্পষ্ট···কাজেই ছাত্র জীবন সম্বন্ধে কিছু লিখব!

কি লিখব? লেখার পেছনে কি উদ্দেশ্য থাকবে? কেমন ভাবে উদ্দেশ্য ব্যক্ত করব? শেষে কি বলব? কি বলে শেষ করব?—যাই বলি না কেন, আর যাই উদ্দেশ্য থাক না কেন, গোড়াতেই তার আভাষ দেব না; কারণ, আমার যা বক্তব্য সেটা বলবার আগে, শ্রোতাদের নিজেদের একটা নিজস্ব মত গড়ে তোলবার জন্যে উপযুক্ত সময় দেব, সুবিধা দেব এবং সুযোগ দেব; তা যদি না দি তাহ'লে তাদের অহমিকায় আঘাত লাগবে, তারা অভিমানিত হবেন, এমন কি অপমানিতও বোধ করতে পারেন! আর যাই করি না কেন, শ্রোতাদের বিদ্যা-বুদ্ধির অমর্য্যাদা কিছুতেই করতে পারব না! ভুললে চলবে না, যে বেতার মারফৎ কিছু বলাও যা—যে কোন ভদ্র গৃহস্থ পরিবারের মধ্যে বাধাপ্রাপ্ত না হয়ে কথা বলা প্রায় একই জিনিষ! কাজেই ভদ্রপরিবারে যখন প্রবেশ লাভ করব তখন ভদ্রলোকের মতন ব্যবহার করব, এমন কিছু বলব না—যা মা মেয়ে ছেলে ও পিতা একসঙ্গে ব'সে শুনতে পারবে না বা এমন ভাবে কিছু বলব না, যাতে তাঁদের মনে হবে সন্ধ্যাবেলাটা তাদের বাজে নষ্ট করলাম। তাঁদের কাছে আমার গল্প এমন ভাবে বলব যাতে তাঁদের ভাল লাগবে, মনে গভীর রেখাপাত করবে, তাঁরা বলবেন, "বেশ লাগল, আর একদিন আসবেন!"

অর্থাৎ হাসিমুখে প্রথম আরম্ভ করব, গুছিয়ে ঘটনার সমাবেশ করব, ক্রমে ক্রমে আমার বক্তব্যের উপক্রমণিকা সাজিয়ে তুলব; এমন ভাবে সাজাব যাতে সাজানোর সঙ্গে সঙ্গেই ওঁদের মনেও ওঁদের নিজেদের মতামতটি গড়ে ওঠে; শেষ করে, ভাববার এক মিনিট সময় দেব এবং তারপর বলব—আচ্ছা এই জিনিষটা এই রকম হলেই বোধ হয় ভাল হয় না!—বলেই হাসি মুখে বিদায় চাইব, উত্তরের অপেক্ষায় দাঁড়াব না, কারণ সেটা তাঁদের নিজস্ব জিনিষ। আমার কাজ হবে তাঁদের একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হবার পথে এগিয়ে দেওয়া!

আচ্ছা, এবার আরম্ভ করা যাক। প্রথমেই অনুষ্ঠানের নামকরণ, কি নাম দেওয়া যায়? এমন একটা নাম দিতে হবে যাতে সহজেই চোখে পড়তে পারে! আচ্ছা "আপনার কি মত?" নামটা কেমন? ভাল' নয়? ভাল' করে ভেবে দেখুন ত! একটা খুব সাধারণ কথা ভুলে যাবেন না যেন, যখনই কোন লোককে কোন কিছু সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করবার অনুরোধ করেন, তখন যাঁকে অনুরোধ করছেন তাঁর মনের প্রতিক্রিয়া কি হয়? তাঁর অহমিকাকে আপনি সন্তুষ্ট করলেন, তাঁর বিদ্যা, তাঁর বুদ্ধি তাঁর বিচার শক্তিকে আপনি প্রাধান্য দিলেন, ফলে তাঁকে আপনি আনন্দ দিলেন আর দিলেন অপরিসীম আত্মতৃপ্তি! কাজেই স্বীকার করলেন "আপনার কি মত" নামটা মুখ মানান সই! বেশ তাহ'লে আরম্ভ করা যাক—

"আপনার কি মত?"

(১) ছাত্র জীবন!

অনুষ্ঠানটি সাধারণ জীবনযাত্রার একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠছে, নাটক নয়, নক্সাও নয়, তাহ'লে কি? অনুষ্ঠানটি

যখন আমাদের জীবনযাত্রার একটি বিশিষ্ট ঘটনাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠছে তখন এই ধরণের অনুষ্ঠানের নাম দেওয়া যেতে পারে feature বা জীবন্তিকা! মোটামুটি জেনে রাখা ভাল —জীবন্তিকা হল এমন ধরণের অনুষ্ঠান, যে অনুষ্ঠানে অলীক কিছু নেই, সমস্তটাই বাস্তব! উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দি। ধরুন "ছাতা"। ছাতা কি করে প্রথম এল, কোথা থেকে এল, কোথায় প্রথম ছাতার ব্যবহার হয়, কোথায় ছাতা তৈরী হয়, কি কি উপকরণ দিয়ে ছাতা তৈরী হয়, ভারতবর্ষে বছরে কত ছাতা ব্যবহৃত হয়, ছাতার কারখানায় শ্রমিকদের মজুরী কত, ইত্যাদি তথ্যে পুর্ণ অনুষ্ঠান হ'লে, সেই অনুষ্ঠানটিকে বলব জীবন্তিকা, কিন্তু ছাতাকে উপলক্ষ করে যখনই একটা গল্প ফাঁদব—এই ধরুন "মণিকাঞ্চনের" মতন, তখনই সেটা হ'য়ে গেল, নাটক অথবা প্রহসন, অথবা নক্সা, জীবন্তিকা আর রইল না!

তাহ'লে আমাদের অনুষ্ঠানটি হ'ল একটা জীবন্তিকা, আচ্ছা এবার তাহ'লে অনুষ্ঠানটি পুরো লেখা যাক, ভুল ত্রুটি যা থাকবে পরে শোধরাণো যাবে। (লিখবার সময় একটা কথা কিছুতেই ভুললে চলবে না—যাদের জন্যে লেখা, তারা শুধু কানে শুনছে। চোখেও দেখছে না, বইতেও পড়ছে না—)

আপনার কি মত?

(১) ছাত্র জীবন

জীবন্তিকা—

ঘোষক: ছাত্র জীবনের এক দিক……

ক্রমেই অস্পষ্ট ভেসে উঠল, একজন সুমিষ্ট কণ্ঠে গান
গাইছে, আর সেই সঙ্গে অস্পষ্ট মোটর চলার শব্দ

সুবীর। (গান থামিয়ে) বুঝলি প্রমথেশ, ছবিখানা সুন্দর, আজ ক্লাস পালিয়ে বক্সের টিকিট কেনা সার্থক হ'য়েছে! আমি ত ভাবতেও পারিনি বিমলা এমন সুন্দর অভিনয় করবে! charming! Isn't she?

প্রমথেশ। অদ্ভুত! হ্যাঁরে সুবীর, বিনয় প্রক্সী দিয়েছে ত', না এবছরও per centage short বলে আটকে দেবে—আর পারি না ভাই, প্রত্যেক বছর পড়ে থাকতে লজ্জা করে!

সুবীর: রাখ বাপু তোর কলেজের কথা, সন্ধ্যেটা নষ্ট করে দিস্ না! আমার ত' ইচ্ছে করছে বইখানা আজই আর একবার দেখতে! গানগুলো কি wonderful বল ত'—মাই—রি!

প্রমথেশ: আর এক মাস বাদে পরীক্ষা খেয়াল আছে?

সুবীর: দোহাই তোর প্রীতিদেবীর, এমন সন্ধ্যেটা! আর ঐ হতচ্ছাড়া জিনিষটার কথা মনে করিয়ে দিয়ে নষ্ট করে দিস্ না!

প্রমথেশ: (হাসতে হাসতে) I'm sorry, আচ্ছা ক্ষতি-পূরণ করছি। ড্রাইভার, এসপ্লানেড, Carloতে!

সুবীর: The idea.

গর্জন করে গাড়ী বেরিয়ে গেল

ভেসে উঠল জনতা, ট্রাম বাস চলাচলের শব্দ—হকার
দু চার জন…এই সব শব্দ

সুবীর:* Charming! Look at the board! Eat, drink and be merry!—খাও দাও সুখে থাক, চমৎকার! —চল ঢুকে পড়া যাক! কলেজের আর সবাইকে নিশ্চয় এখানে পাব!

পথের গোলমাল মিলিয়ে গেল, ভেসে উঠল রেষ্টুরেণ্টের
গোলমাল, আবহ সঙ্গীত বাজছে নৃত্যের সুরে

প্রমথেশ: (চিৎকার করে) হ্যালো রাজীব!…

রাজীব: এসো প্রমথেশ, এসো! কোথা থেকে তুই মাণিকজোড়ে!

সুবীর: সোজা স্বর্গ থেকে নেমে আসছি!

রাজীব: কোথায় গিয়েছিলি বল না?

সুবীর: Guess it? হ্যালো প্রণব, তুইও এখানে, আরে সমর যে?—সমস্ত ক্লাসটাই যে দেখছি এখানে, প্রফেসাররা ত' আজ কাঁদছে দেখছি!

রাজীব: কোথায় গিয়েছিলি বল না?

সুবীর: কুহেলিকা দেখতে। মাইরি কি বলব, বিমলা কি অদ্ভুত অভিনয় করেছে! She is an angel.

রাজীব: দেখিস বিমলার কথা বলতে বলতে যে বিমনা হ'য়ে পড়লি!

সুবীর: Jokes apart, যা অভিনয় করেছে কি বলব! Boy! দুটো চপ, আর দু কাপ চা!—Boy!—

সমর: প্রণব, চল আজ সাড়ে নটায় আমরা দেখে আসি!

প্রণব: টিকিট পেলে ত', একে বসন্তকাল, তায় শনিবার, আজকাল আর কপোত কপোতী যথা সুখে উচ্চ নীড়ে নয়, বন্ধু-বান্ধবী যথা সুখে সিনেমা গৃহে!

সমর: I say pronab, don't be vulgar!

প্রণব: That's the spile of life.

সুবীর: এই প্রণব, চল আমরা সকলে মিলে আজ রাত নটায় আর একবার দেখে আসি।

প্রণব। টিকিট!

সুবীর: Don't worry! বাবার টাকা আছে, আমার দিল্ আছে, আর houseএ box আছে—শুভ ত্র্যহস্পর্শ—

প্রমথেশ: Long live Subir! (চিৎকার করে) বয়! —ছটা ডিনার! orchestraকে এই নম্বরটা বাজাতে বল! সুবীর বিমলার সেই প্রথম গানখানা কি যেন—

সুবীর: "আমার প্রথম প্রেমের কমল কলি মঞ্জুরিল"

সকলে: wonderful সুর ত'!

সুবীর: তারপর শোন—অলি গুঞ্জরিল, অলি গুঞ্জরিল…

সকলে: আরে মাপস্! আয় আয়!…

মানস: আরে বাবা: নরক যে গুলজার করে রেখেছ! ব্যাপার কি?

সুবীর: "কুহেলিকা" দেখতে যাচ্ছি নটায়—যাবি!

মানস: না ভাই, আজ আর নয়! আজ বাড়ীতে একেবারে যা তা হ'য়ে গেছে!

সকলে: কেন কি হল?

মানস: আরে আজ হিলম্যানটা নিয়ে আউটিংএ গিয়েছিলাম, কনক আর বোনদের নিয়ে, রাস্তায় চাকা গেল খারাপ হ'য়ে, বাড়ী ফিরতে হল দেরী, ফলে পিতৃদেবের মধুর বাক্যব্যয়!

সকলে : তাই নাকি ?

সুবীর : তুই ত আচ্ছা বোকা! টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরির ছেলে হ'য়ে old manকে বোকা বোঝাতে পারলি না ?

মানস : কাঁহাতক আর বোকা বোঝান' যায়! চার বছর পর পর বি-এ ফেল করে, যা রিসন্‌স্‌ দিয়েছি তা তো আজও মনে আছে! তাছাড়া আমার old man একটু অন্ত ধরণের!

সুবীর : ওসব বাজে কথা রাখ! বল, সিনেমা যাবি ?

মানস : না ভাই, চার বার ফেল করেছি, এবার পাশ করতেই হবে!

সুবীর : ও বাবা! মড়ার মুখে যে হরিনাম! যাক্‌ বাবা, পাশ-টাস্‌ কর, আমাদের ত' আর ও বালাই নেই! যতদিন বড়লোক বাবা বেঁচে আছে আর বাবার হোটেলের দরজা খোলা আছে ততদিন জীবনের একটি মটো! Eat, Drink and Be merry! কলেজে নাম না থাকলে aristrocratic Societyতে চলা ফেরা করায় অসুবিধে তাই নামটা রাখা, আর বাবার চোখে ধূলো দেবার জন্যে একশো টাকা দিয়ে প্রফেসার রেখেছি—just for a show!

সকলে : Bravo, Bravo!

ঘড়িতে নটা বাজল···

সুবীর : Hurry up every one, নটা বাজল, আর নয়—সিনেমায় দেরী হ'য়ে যাবে! মানসকে ছেড়ে দে, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাক, আমাদের lifeএর philosophy হল—

প্রণব : Eat !!!

সুবীর : Drink !!!

প্রমথেশ : And—

সকলে : Be merry !!!!···

orchestra জোরে বেজে উঠল—সমস্ত গোলমাল ছাপিয়ে···ক্রমেই তা মিলিয়ে গেল

ঘোষক : আর এক দিক্‌।······

খুব ক্ষীণ স্বরে বেহালা বাজবে···চারিদিকে অখণ্ড নীরবতা···ঘড়ির টিক্‌ টিক্‌ শব্দ, তার পর দুটো বাজবার সঙ্কেত···

অরুণ : রাত দুটো! Physics হল, Mathematics প্রায় সেরে এনেছি, এখন Chemistryটা পড়তে পারলেই সব চেয়ে ভাল' হবে···

ছেলেটি জল খেল
দরজা খোলার শব্দ—কে যেন দরজা খুলে ঘরে এল

মা : অরুণ, এবার শুতে যা বাবা, অনেক রাত হল!

অরুণ : এই যে যাই মা! আর একটু বাকি আছে, আর আধ ঘণ্টা হলেই হ'য়ে যায়—একটু দাঁড়াও।

মা : না বাবা, অনেক রাত হ'ল। আজ ছমাস এই রাত জেগে জেগে পড়ে শরীরের কি অবস্থা যে হয়েছে—তা যদি একটু বুঝতিস্‌! আমার মায়ের প্রাণ, সহ্য হয় না!—রাত দুটো বেজে গেছে!

অরুণ : মাগো আর মাত্র ছ পাতা—তাহ'লেই কালকে বইটা ফেরৎ দিতে পারব!—নিজে পরের কাছ থেকে ধার করে বই এনেছি, কথা দিয়েছি কাল ফেরৎ দেব, যদি কথা না রাখতে পারি তাহ'লে ভবিষ্যতে আর কোনদিনও হয়ত' সে বই দেবে না!

মা : কিন্তু আমি যে আর পারি না সহ্য করতে! দিনের পর দিন এমনি করে পড়লে, শরীরের যে আর কিছু থাকবে না!

অরুণ : (হাসতে হাসতে) আচ্ছা আচ্ছা তুমি যাও—আমি এক্ষুণি শুতে যাচ্ছি!

মা : দেখিস্‌, দেরী করিস্‌নি যেন!

দরজা বন্ধ হবার শব্দ

বেহালা ক্রমেই জোর হ'তে লাগল—একটানা, করুণ তার সুর, বিপদমাখা···ঘড়ির টিক্‌ টিক্‌ শব্দ···তিনটে বাজল···সুর যেন ভোরের বেলার দিকে ঝুঁকে পড়ল···চারটে বাজল···

বেহালাতে ভৈরবীর সুর—ঝরে পড়ল···

ঘোষক : ঘণ্টার পর ঘণ্টা অরুণ প'ড়ে চলে। মুহূর্তের পর মুহূর্তের সশব্দ চরণধ্বনি ঘড়ির বুকের ওপর—বিরাম-বিহীন বিশ্রাম-বিহীন সময়ের ছুটে চলা।···অরুণ পড়ে চলে সমতালে। ঘুমের আবেশে চোখ ওর ঢুলে পড়ে—কিন্তু ওর বিদ্রোহী মন পরাজিত হয় না। বইখানা ওকে যেমন করেই হ'ক শেষ করতে হবে।···

পূবের আকাশে রং ধরে···

মা : এখনও শুতে গেলি না অরুণ? তুই কি চাস্‌ আমি তোর পায়ে মাথা খুঁড়ে মরি? পরীক্ষার মাত্র সাতদিন বাকি, যদি অসুখ করে!

অরুণ : তাহ'লে Scholarship পাবার আশা ক্ষীণ হবে, আমার পড়া বন্ধ হবে তোমাদের আহার বন্ধ হবে!—তাই জন্যেই ত' আমার এই প্রাণপণ পরিশ্রম—তাই অবিরত এই সংগ্রাম!

মা : তাই বলে সারারাত তুই পড়ে কাটাবি ?

অরুণ : দিনের বেলায় সময় কোথায় বল'? সকাল থেকে রাত পর্য্যন্ত টিউশানী আর বোনের বিয়ের জন্যে বরকর্তাদের পায়ে ধরা। পড়ার কথা কাউকে বললেই বলে "গরীবের আবার ঘোড়া রোগ কেন?—গরীব হওয়া কি কম বিপদ মা! বন্ধুবান্ধবরা ঘৃণা করে টাকা নেই বলে, কাফেতে বসে সিনেমার গল্প করতে পারিনা বলে! টিউশানী করি বলে, ছাত্রের পিতারা ভাবেন আমি কৃপার পাত্র তিনমাস অন্তর মাইনে দেন! অনেক অধ্যাপক আবার ভাল' করে পড়ান না, কারণ প্রণব সুবীরের মতন একশো টাকা মাইনে দিয়ে তাঁদের মাষ্টার রাখতে পারি না বলে! সবাই এক জোট হয়ে বুঝিয়ে দেয় সংসার আমাদের অচল, বাড়ীতে বিধবা মা, অবিবাহিত বোন!—আর—

মা : আর কিছু আমি শুনতে চাই না, তুই শুয়ে পড় ভোর হ'য়ে এল'!

অরুণ : আমাদের ক্লাসের অর্দ্ধেক ছেলে কি করে জান'? আড্ডা মারে, সিনেমায় যায়, হোটেলে টাকা ওড়ায়, বছর বছর ঘুঁষ দেয় পারসেণ্টেজ রাখবার জন্যে, পরীক্ষায় ফেল করে, আবার

কলেজে ফিরে আসে! ওরা ভাবে টাকাটা বুঝি খোলাম কুচি —আর আমার মতন যারা তারা—

ঘোষক: তারা খেতে পায় না, তারা পরতে পায় না, পড়বার ইচ্ছা থাকলেও পড়বার সুযোগ তারা পায় না! হেলায় তারা মানুষ, সংসারের বোঝা তাদের কাঁধে, পৃথিবীর চিন্তা তাদের মনে। কেউ তাদের চেনে না, কেউ তাদের মানে না—হেতু? যেহেতু ছাত্র জীবনের মাদকতা তাদের কর্তব্যের ভাগে শূন্য বসাতে পারেনি—তাই! যেহেতু উচ্ছৃঙ্খলতা তাদের বিপথে টেনে নিয়ে যেতে পারেনি!

সবচেয়ে বড় কারণ হল, তারা গরীব, তারা অনাদৃত!…

সঙ্গীত যেন প্রতিধ্বনি করল—ভৈরবী, ভৈরবী…

মা: দুঃখ করে কি করবি বল, এই ত' দুনিয়ার রীতি! গরীব তারা চিরদিনই গরীব—চিরদিনই তারা অনাদৃত…

অরুণ: কিন্তু কেন তা হ'বে? মানুষ কি সব অবস্থায় সমান নয়? মানুষ কি গরীব বলে চিরদিন বঞ্চিত থাকবে? মানুষ কি মানুষকে কোনদিনও সমান ভাবে ভাবতে শিখবে না?

মা: হ্যাঁ, শিখবে বৈ কি! শিখবে সেদিন, যেদিন নূতন আলোক লগনে মানুষ জাগবে…

পথের বৈরাগীর ভৈরবী সুরের গান তখন বুঝি অস্পষ্ট শোনা গেল…

"জাগো আলোক লগনে
হে পুরবাসী
কেন রচিছ স্বপনে,
ক্ষণেকের তরে ভুবনে আসি
হে পুরবাসী"…

আচ্ছা এবার বিচার করে দেখা যাক! প্রথম দিক্‌টা প্রবীণদের ভাল লাগবে না, কিন্তু আশা করা যায় তাঁরা শুনতে অরাজী হবেন না—কারণ প্রথমেই বলে দেওয়া হয়েছে এটা হল "এক দিক"। প'নেরো মিনিটে যদি দুদিকও দেখান' হয়, তাহ'লেও নিশ্চয় প্রথম দিকটা সাত মিনিটের বেশী লাগবে না। এ সময়টা নিশ্চিন্ত মনে তাঁরা শুনবেন। শোনবার আরও একটা কারণ আছে। এই ধরণের ছাত্র জীবন তাঁদের সময় নিশ্চয় ছিল' না, তাঁরা বলবেন, এর চেয়ে ভাল' ছিল। হয়ত' সত্যিই ছিল! এই যে মনোভাব, আমাদের সময় "ছাত্র জীবন" এত কদর্য্য ছিল' না—এটা একটা পরম আত্মতৃপ্তি এবং এই আত্মতৃপ্তির জন্যেই তাঁরা শেষ পর্য্যন্ত শুনবেন, পার্থক্যটা কতখানি তাই দেখাবার জন্যে! দ্বিতীয় দিকটা তাঁদের ভালই লাগবে, ভাল লাগবে না তাদের যারা আমাদের প্রণব সুবীরের মতন, কিন্তু তাঁরাও শুনবেন কারণ তাঁদের একটা কৌতূহল হবে "শেষে কি বলবে?"

তাহ'লে শুনবে সবাই।

আচ্ছা, বোঝবার পক্ষে অসুবিধা বিশেষ না হবারই কথা, কারণ প্রথম অংশে বিশেষ চরিত্র সুবীর ও মানস। সুবীরকে দিয়ে প্রথম কথা বলানো হয়েছে এবং তার নামটা যে সুবীর প্রমথেশের প্রথম কথাতেই তা বলা হ'য়েছে। তারপর থেকে সুবীরই বেশীর ভাগ কথা বলেছে কিন্তু ছোট ছোট কয়েকটা কথা কয়েকজনে বলেছে, তার সঙ্গে আছে হোটেলের গোলমাল, কাজেই ছাত্রদের ভীড় যে বেশ আছে তা বোঝবার পক্ষে অসুবিধা নেই! কথায় কথায় নটা বাজবার সময় সঙ্কেত দিয়ে সময়টা সহজেই কাটানো গেছে। এই ধরণের ছেলেদের বিরুদ্ধে মতবাদ সৃষ্টি করবার জন্যে, একটা শো' শেষ থেকে তৃতীয় শো' আরম্ভ পর্য্যন্ত সমস্ত সময়টা হোটেলে বসে কাটানোর ব্যবস্থা, ইংরেজি বুলি ও বাবাকে বোকা বানানোর প্রসঙ্গ যথেষ্ট! আমাদের কাজ, বলা বাহুল্য, এইটেই যদি উদ্দেশ্য হয়, এইখানেই অর্দ্ধেক, সুসম্পন্ন হ'য়েছে!

এই পর্বকে শেষ করবার জন্যে প্রয়োজন ছিল শেষকালে চিৎকার জোরে অর্কেষ্ট্রা এবং অযথা একটা গোলমাল, প্রবীণদের বিরক্তি যাতে ধূমায়িত হয়!

এই অযথা গোলমালের আরও একটা কারণ আছে। পরবর্ত্তী অর্দ্ধরাত্রির কথোপকথন ও তার সামঞ্জস্য রেখে, নিস্তব্ধ নীরব রাত্রের উপযোগী সঙ্গীত দুটোই ধীর স্থির। এই ধীর স্থির জিনিষটি খুলবে ভাল, খুব খানিকটা গোলমালের রেশ টেনে যদি আরম্ভ করা যায়! এটা একটা সাধারণ মনস্তত্ত্ব!

এখন দ্বিতীয় পর্বটি যাতে সকলের সহানুভূতি পায় তার ব্যবস্থা করতে হয়েছে, এটাও আমাদের একটা মস্ত বড় উদ্দেশ্য। তাই জন্যে রাত দুটো থেকে অল্প সময়ের মধ্যে সহজ অথচ নিশ্চিন্ত ভাবে ভোর পর্য্যন্ত সময়ের ব্যবধান দেখান' হ'য়েছে!

চারটের পর ঘোষক যদি খানিকটা সময় নিয়ে কথাগুলো বলে, তাহ'লেই ভোর হবার সমস্ত লক্ষণগুলো সহজ ভাবেই সঙ্গীতের মধ্যে দেখানো চলবে।

তার পর শেষ করবার সময় ভৈরবীতে বৈরাগীর গান, সময়টা যে ভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে তাতে শ্রোতারা সহজেই ভোরের আবহাওয়ায় পৌঁছে গেছেন, কাজেই বৈরাগীর কণ্ঠে ভৈরবীতে গান ভাল' লাগবে এ আশা করা যেতে পারে! গানের মানে দু ভাবেই ধরা যায়! গান হিসেবে যতখানি মূল্য, শেষ অংশে মার কথার সঙ্গে যথেষ্ট সামঞ্জস্যও আছে এবং মধুরেণ সমাপয়েৎ করাও হয়েছে! সব চেয়ে বড় কথা হ'ল, সাম্যবাদের যুগে এ ধরণের অনুষ্ঠান ভাল' লাগবে এ আশা করা অন্যায় নয়!

তাহ'লে দেখা যাচ্ছে "আপনার কি মত?" এই পর্য্যায়ে অনুষ্ঠান হয়ত' খুব খারাপ নাও হতে পারে!—শুধু ছাত্র-জীবন কেন, এই পর্য্যায়ে ত' আরো অনেক অনুষ্ঠান হ'তে পারে, ভেবে দেখতে দোষ কি?



বাহির বিশ্ব

মিহির

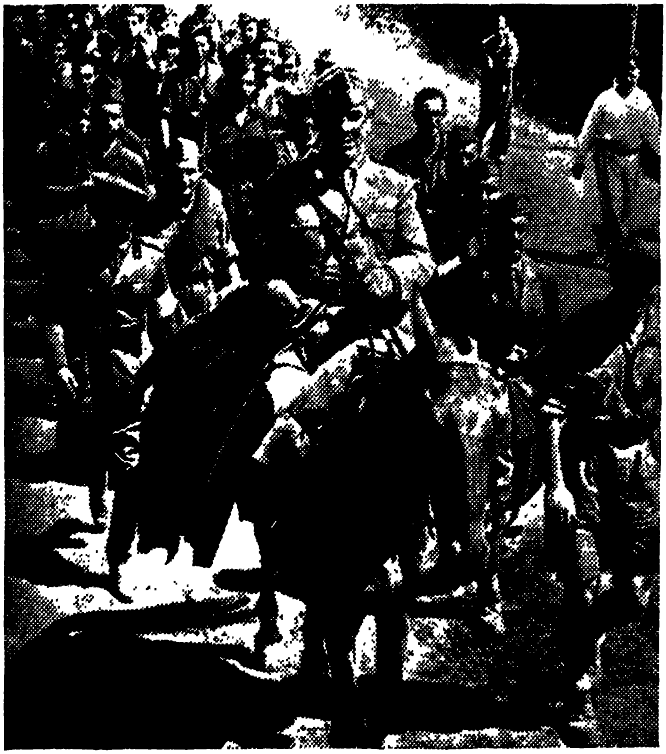
গত মাসে জার্ম্মানীর প্রবল প্রতিরোধ-শক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে; রুশ রণাঙ্গনে ও ইটালীতে নাৎসী সেনার প্রতিরোধ ও প্রতি-আক্রমণ সমানভাবে চলিয়াছিল। পূর্ব্ব ইউরোপে সে তাহার কতকগুলি হৃত স্থান পুনরুদ্ধার করিতেও সমর্থ হইয়াছে। ঈজিয়ান্ সাগরের দ্বীপগুলিতে সে এই সময় সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রশান্ত মহাসাগরে আমেরিকান্ সেনা একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটী অধিকার করিয়াছে; কর্ণেল নক্সের ভাষায় ইহা জাপানের গৃহপ্রাঙ্গণের পথে সম্মিলিত পক্ষের একটি দীর্ঘ পদক্ষেপ।

রুশ রণক্ষেত্র

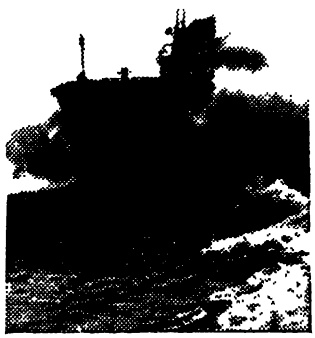
নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে লালফৌজ ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভ অধিকার করে এবং পেরিকপ্ যোজক অতিক্রম করিয়া পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়; ফলে অবশিষ্ট রুশ রাজ্যের সহিত ক্রিমিয়া সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন-সংযোগ হইয়া পড়ে। ইহার পর হইতে দক্ষিণ অঞ্চলে রুশ সেনার সাফল্যের গতি মন্থর। কিয়েভের পর ঝিটোমীর ও করষ্টেন্ অধিকার করিয়া তাহারা বিপুল নাৎসী বাহিনীকে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছিল; কিন্তু নাৎসীদের প্রবল পাল্টা আক্রমণে লালফৌজ ঐ দুইটি স্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে, বিপন্ন নাৎসী সেনাদলও আপাততঃ রক্ষা পাইয়াছে। সম্প্রতি চারকেসীর নিকট এক দল নূতন রুশ সেনা নীপার নদী অতিক্রম করিয়াছে। ইহার ফলে নীপার বাঁকের নাৎসী বাহিনীর বিপদ আরও বৃদ্ধি পাইলেও তাহারা এখনও সম্পূর্ণরূপে পরিবেষ্টিত হয় নাই। অবরুদ্ধ ক্রিমিয়াতে জার্ম্মানদিগকে আঘাত করিবার জন্য লালফৌজ পূর্ব্ব দিকে কার্চ্চ প্রণালীতে অবতরণ করিয়াছে। তাহারা কার্চ্চ নগরের উপকণ্ঠেও পৌঁছিয়াছিল; কিন্তু জার্ম্মান সেনার প্রবল প্রতিরোধের ফলে কার্চ্চনগর এখনও তাহারা অধিকার করিতে পারে নাই।

দক্ষিণ অঞ্চলে নাৎসী সেনার প্রতিরোধের প্রাবল্য এই ভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় রুশ সেনাপতিগণ তাহাদের রণকৌশল সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়াছেন বলিয়া মনে হইতেছে। দক্ষিণ অঞ্চলে তাঁহাদের মনোযোগ হ্রাস পায় নাই; তবে তাঁহারা এই সময় মধ্য রণক্ষেত্রে অধিক মনোযোগ প্রদান করিয়া ঐ অঞ্চলের শত্রু সৈন্যকে তাঁহাদের ইউক্রেণ প্রদেশের সহযোদ্ধাদিগের সহিত বিচ্ছিন্ন সংযোগ করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। ইতিমধ্যে রুশ সেনা গোমেল্ অধিকারের পর পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইয়া লেনিন্‌গ্রাড-ওডেসা রেলপথ বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। এখন হোয়াইট্ রুশিয়া প্রদেশে রুশ সেনার প্রবল অভিযান চলিতেছে।

পূর্ব্ব য়ুরোপে রুশ সেনার গ্রীষ্মের ও শরতের অভিযান শেষ হইল, এখন তথায় শীতকালীন যুদ্ধের পালা। রুশ সেনা গ্রীষ্মে ও শরতে এই প্রথম আক্রমণাত্মক অভিযান চালাইল। এই অভিযানে তাহারা বিস্ময়কর সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছে। গত বৎসর শীতকালে লালফৌজের যে পাল্টা আক্রমণ আরম্ভ হয়, তাহার সহিত যোগ রাখিয়াই তাহাদের গ্রীষ্মকালীন অভিযান চলে। এই অভিযানে তাহারা কেবল মধ্য রণাঙ্গণেই ৮শত মাইল হৃত অঞ্চল পুনরুদ্ধার করিয়াছে; দক্ষিণ রণাঙ্গনে তাহারা ষ্ট্যালিনগ্রাড্ হইতে খার্স্‌ন্ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে। তবে রুশ সৈন্যের এই সাফল্য সত্ত্বেও একটি কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই;



জনৈক বিশিষ্ট ইটালিয়ান সামরিক কর্ম্মচারী ইটালিয়ান সৈন্যগণের অগ্রভাগে অশ্বপৃষ্ঠে গমন করিতেছেন। ইটালিয়ানগণের সহিত সন্ধির পর ইহারা মিত্রপক্ষের হইয়া যুদ্ধ করিতেছে



একটী আমেরিকান যুদ্ধ জাহাজ

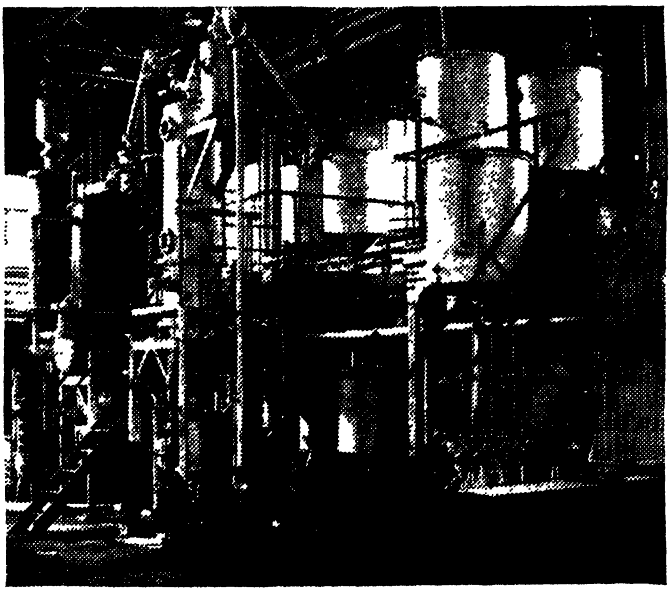
কোন স্থানেই জার্ম্মান বাহিনী সম্পূর্ণরূপে পরিবেষ্টিত হইয়া নিশ্চিহ্ন হয় নাই, প্রত্যেক ক্ষেত্রে পরিবেষ্টিত হইবার নিশ্চিত সম্ভাবনা ঘটিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহারা পশ্চাদপসরণ করিতে পারিয়াছে।

গ্রীষ্ম ও শরৎকালীন সাফল্যে রুশ সেনার সরবরাহ-সূত্র দীর্ঘ



ইটালীতে মিত্রপক্ষের এণ্টিফ্যাসিষ্ট আন্দোলন

হইয়াছে। জার্ম্মান সৈন্যরা প্রত্যাবর্ত্তনের সময় তাহাদের পরিত্যক্ত অঞ্চল শ্মশান করিয়া যাইতেছে। এই সকল স্থানের পুনর্গঠন সময়সাপেক্ষ।



পেট্রোল হইতে যুদ্ধের উপকরণ প্রস্তুতের আর এক দৃশ্য

তাহার পর জার্ম্মানীর আক্রমণ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে রুশিয়ার বিভিন্ন শ্রমশিল্পপ্রতিষ্ঠান যতদূর সম্ভব উরল অঞ্চলে স্থানান্তরিত হইয়াছে। এই অঞ্চল হইতে বর্ত্তমান রণক্ষেত্রে সমরোপকরণ সরবরাহ করিতে হইলে পলায়নরত নাৎসী বাহিনী কর্ত্তৃক চূর্ণীকৃত দেশগুলি অতিক্রম করিতে হইবে।

এইরূপ অবস্থায় এই বৎসর শীতকালে রুশ সেনার আক্রমণের প্রাবল্য হ্রাস পাইবে বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধে গণ-রাষ্ট্র রুশিয়ায় বহু অসাধ্য সাধিত হইতেছে। গত বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে মিঃ উইল্‌কী রুশিয়ার অবস্থা সম্বন্ধে বলেন—তথায় ৫০ লক্ষ রুশ ধ্বংস হইয়াছে, ৬ কোটী জার্ম্মানী দাসত্ব স্বীকারে বাধ্য হইয়াছে; রুশিয়ায় আহার্য্য নাই, বস্ত্র নাই, ঔষধপত্র নাই। সেই রুশিয়া যে গত শীতকালে ষ্ট্যালিনগ্রাডে অমিত বিক্রমের পরিচয় দিতে পারিবে এবং শীতকালীন অভিযানের সহিত যোগ রাখিয়াই গ্রীষ্ম ও শরৎকালে তাহার বিস্ময়কর আক্রমণ চলিবে, ইহা কেহ কল্পনাও করিতে পারে নাই। কাজেই, রুশ সেনার পশ্চিমাভিমুখে অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে যদি পুনরধিকৃত অঞ্চলের মধ্য দিয়া সরবরাহ-সূত্র স্থাপিত হয়, তাহাতে অধিক বিস্ময়ের কারণ থাকিবে না। শীতকালে রুশ সেনার আক্রমণের প্রাবল্য হ্রাস না পাইয়া যদি বর্দ্ধিত হয়, তাহা হইলে উহা "বিস্ময়ের দেশ" সোভিয়েট রুশিয়ায় স্বাভাবিক ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবে।

ইটালীতে সঙ্ঘর্ষ

ইটালীর ক্ষুদ্র রণক্ষেত্রে সম্মিলিত পক্ষ অত্যন্ত ধীরে সামান্য সামান্য সাফল্য অর্জ্জন করিতেছেন। নূতন নূতন স্থানে সৈন্য অবতরণ করাইয়া প্রবলভাবে শত্রুকে আঘাতের কোন চেষ্টা এখনও দেখা যায় নাই। নভেম্বর মাসে আবহাওয়ার অবস্থা মন্দ হওয়ায় বহুদিন ইটালীর রণক্ষেত্রে একরূপ নিষ্ক্রিয়তা চলিয়াছিল। তাহার পর, নভেম্বর মাসের শেষে জেনারল মণ্টগোমারীর ৮ম বাহিনী আড্রিয়াতিকের উপকূলে সাঙ্গরো নদী অতিক্রম করিয়াছে। জার্ম্মানরা তাহাদিগকে বাধা দানে সচেষ্ট হইয়াছিল; কিন্তু ৮ম বাহিনীর গতিরোধে তাহারা সমর্থ হয় নাই। সম্প্রতি জেনারল মণ্টগোমারী দাবী করিয়াছেন যে, তাঁহার সৈন্যগণ সাঙ্গরো নদীর উত্তর তীরে জার্ম্মাণ ব্যূহ ভেদ করিয়াছে; রোম অভিমুখে তাহাদের অগ্রগতির পথ এখন একরূপ উন্মুক্ত। পশ্চিম উপকূলে জেনারল মার্ক ক্লাকের নেতৃত্বাধীন ৫ম মার্কিণীবাহিনী একরূপ নিশ্চল; সম্প্রতি তাহারা ভনাফ্রোর নিকট সামান্য সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছে।

ইটালীতে যুদ্ধের অবস্থা দেখিয়া মনে হয়, সম্মিলিত পক্ষ হয়ত এখানে সামান্য তৎপরতায় নিযুক্ত থাকিয়া সমস্ত শীতকাল অতিবাহিত করিবেন। শীত উত্তীর্ণ হইবার পর অন্যত্র শত্রুকে প্রবলভাবে আঘাত করিবার পরিকল্পনা হয়ত তাঁহারা রচনা করিয়াছেন। সেই আঘাতের সময় ইটালীর রণক্ষেত্রেও আক্রমণের প্রাবল্য বৃদ্ধি করা হইবে।

ঈজিয়ান্ সাগরে

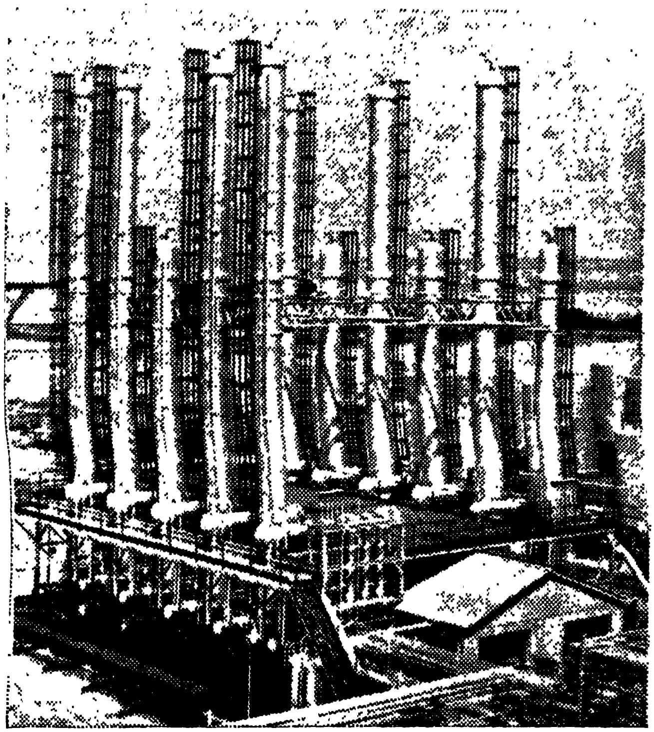
সম্প্রতি ঈজিয়ান সাগরে সম্মিলিত পক্ষের গুরুত্বপূর্ণ পরাজয় ঘটিয়াছে। ইটালীয় গবর্ণমেণ্টের আত্মসমর্পণের সময় সম্মিলিত পক্ষ ইটালীর

অধিকৃত দ্বীপগুলি ব্যবহারের যে অধিকার পান, ঈজিয়ান্ সাগরে তাহা প্রয়োগ করিতে পারেন নাই। এই অঞ্চলের রোডস্ ও কস্ দ্বীপে জার্ম্মানী দ্রুত প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহার পর, সম্মিলিত পক্ষ লেরস্ ও অন্য দুই একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ অধিকার করেন। দোদেকেনীজ দ্বীপপুঞ্জের উত্তরে স্যামসেও সম্মিলিত পক্ষ অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন। নভেম্বর মাসের মধ্যভাগে জার্ম্মানী ঈজিয়ান্ সাগরের এই সকল দ্বীপ হইতে সম্মিলিত পক্ষকে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত করিয়াছে।

এই সকল দ্বীপের সামরিক গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক। ইহারা দার্দানেলিজের প্রবেশ দ্বারে অবস্থিত। গ্রীসে ও ক্রীটে আক্রমণ চালাইবার পক্ষে ইহারা গুরুত্বপূর্ণ পটভূমি। পক্ষান্তরে, শত্রুর পক্ষে ভূমধ্য সাগরের পূর্ব্ব তীরে আঘাতের জন্য এই সকল দ্বীপ গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটীরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। ঈজিয়ান্ সাগরের দ্বীপগুলি হইতে বিতাড়িত হইয়া সম্মিলিত পক্ষ বল্‌কানে আক্রমণ পরিচালনের উত্তম ঘাঁটীতে বঞ্চিত হইয়াছেন; ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্ব তীর সম্বন্ধে অধিকতর সতর্কতা অবলম্বনেরও প্রয়োজন হইয়াছে।



পেট্রোল হইতে যুদ্ধের উপকরণ প্রস্তুত হইতেছে



পেট্রোল হইতে যুদ্ধের উপকরণ প্রস্তুতের অপর একটি দৃশ্য

লেবাননে স্বাধীনতা-আন্দোলন

ভূমধ্য সাগরের পূর্ব্ব তীরবর্ত্তী ক্ষুদ্র লেবানন্ রাজ্য নভেম্বর মাসে আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে অত্যন্ত চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়াছিল। লেবানন্ অতি ক্ষুদ্র রাজ্য; ইহার লোকসংখ্যা মাত্র ৯ লক্ষ, ইহা বস্তুতঃ সীরিয়ার একটি অংশ। তবুও গত মহাযুদ্ধের পর লেবাননকে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র বলিয়া স্বীকার করা হয়। সম্ভবতঃ, এই রাজ্যের অধিবাসীর দুই-তৃতীয়াংশ খৃষ্টান্ বলিয়া ইহাকে সীরিয়া রাজ্যের "আলষ্টারে" পরিণত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। ইতিহাস পাঠকরা অবগত আছেন—ক্যাথলিক আয়র্লণ্ডের আলষ্টার প্রদেশে প্রোটেষ্ট্যাণ্ট জমিদার বসাইয়া আইরিস্ জাতীয় আন্দোলনে স্থায়ী কণ্টক সৃষ্টি করিয়া রাখা হইয়াছে।

গত মহাযুদ্ধের পর ফ্রান্স জাতি-সঙ্ঘের নিকট হইতে লেবানন্ ও সীরিয়ার ম্যাণ্ডেটারী অধিকার লাভ করে। এই অধিকারের অর্থ "নাবালক" লেবানীজ ও সীরিয়ান্‌রা যতদিন "সাবালক" না হইবে, ততদিন ফ্রান্সে ঐ দুইটি রাজ্যে অভিভাবকত্ব করিবে। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত লেবানীজ ও সীরিয়ানদের জাতীয় দাবী উপেক্ষা করিয়া ফ্রান্স তথায় প্রতিষ্ঠিত ছিল। ঐ সময় ফ্রান্সের পক্ষ হইতে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে, তিন বৎসর পরে সীরিয়া ও লেবাননকে স্বাধীন করিয়া দেওয়া হইবে। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সময় পর্য্যন্ত এই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা হয় নাই।

তাহার পর ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স পরাজিত হইবার পর ম্যাণ্ডেটারী রাজ্যের কর্ত্তৃত্বভার ভিসি সরকারের উপর বর্ত্তায়। ইহাতে এইরূপ আশঙ্কার সৃষ্টি হয় যে, এই সকল রাজ্য হয়ত জার্ম্মানীর প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইবে। বিশেষতঃ ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের প্রথমে জার্ম্মানী বলকান্ মথিত করিয়া পশ্চিম এশিয়ার নিকটবর্ত্তী হয়; ওদিকে ইরাকে রসিদ্ আলির নেতৃত্বে বিদ্রোহ দেখা দেয়। এই সময় লণ্ডনস্থিত ফ্রি ফ্রেঞ্চ কমিটীর প্রতি অনুরক্ত কিছু ফরাসী সৈন্য এবং বৃটিশ সৈন্য সীরিয়া ও লেবানন্ অধিকার করে। এই দুইটি রাজ্যকে তখন ম্যাণ্ডেটারী শাসন অবসানের এবং পরিপূর্ণ স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।

এই প্রতিশ্রুতি অনুসারে লেবাননে আইন পরিষদ গঠিত হয়। ঐ পরিষদে গত নভেম্বর মাসের প্রথমে শাসনতন্ত্র সংস্কারের ও পরিপূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হয়। লেবাননস্থিত ফরাসী ডেলিগেট্ জেনারল

ঐ প্রস্তাব নাকচ করেন। ইহাতে সমগ্র লেবাননে দারুণ বিক্ষোভ দেখা দেয়, খৃষ্টান, মুসলমান সকলেই এই বিক্ষোভে যোগ দেয়। ভেনিগেট্ জেনারল কঠোর হস্তে এই আন্দোলন দমন করিতে প্রয়াসী হন; প্রেসিডেণ্ট, আইন পরিষদের সদস্য সকলকেই গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু কিছুতেই আন্দোলন দমিত হয় না—উহা উত্তরোত্তর প্রসারিত হইতে থাকে। তাহার পর, আলজিয়ারস্থিত ফ্রেঞ্চ লিবারেশন্ কমিটী জেনারল কাক্রকে লেবাননে প্রেরণ করিয়া ফরাসী ভেনিগেট্ জেনারলের কার্য্যগুলি বাতিল করাইয়াছেন। ফলে. তখন লেবাননে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; আইন সভা এবং প্রেসিডেণ্ট সকলেই এখন কাজ করিতেছেন। তবে, লেবানীজরা তখনও পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করিতেছে।

লেবাননের সাম্প্রতিক আন্দোলনে প্রমাণিত হইয়াছে যে, স্বাধীনতার দাবী সম্পর্কে তথায় খৃষ্টান ও মুসলমান সকলেই ঐক্যবদ্ধ। ভারতের সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা এই দৃষ্টান্ত হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারেন। তাহার পর, লেবাননের এই আন্দোলনের প্রতি মিশর এবং অন্যান্য সন্নিহিত রাষ্ট্রগুলির যেরূপ আগ্রহ প্রকাশ পায়, তাহাতে বুঝা গিয়াছে যে, ভবিষ্যতে মধ্য-প্রাচীর আরব রাষ্ট্রগুলির প্রতি ইউরোপের ধুরন্ধররা আর যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারিবে না।

গিলবার্ট দ্বীপপুঞ্জে আমেরিকান্ সৈন্য

সম্প্রতি প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যস্থলে গিলবার্ট দ্বীপপুঞ্জ আমেরিকান্ সৈন্য কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে। এই সাফল্যের গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক। মধ্য প্রশান্ত মহাসাগরে ক্যারোলিন্ প্রভৃতি ম্যাণ্ডেটেড্ দ্বীপপুঞ্জ জাপানের একটি প্রধান ঘাঁটী। এই ঘাঁটীকে সে বর্ত্তমান যুদ্ধে লিপ্ত হইবার বহু পূর্ব্ব হইতেই শক্তিশালী করে। গিলবার্ট দ্বীপপুঞ্জে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আমেরিকান্ সেনাপতিরা জাপানের এই শক্তিশালী ঘাঁটীতে প্রত্যক্ষ আঘাতের সুবিধা লাভ করিয়াছেন। নিউগিনি ও সলোমন্‌সে এবং অলিউসিয়ান্ দ্বীপপুঞ্জে সম্মিলিত পক্ষের সাফল্য অপেক্ষা তাহাদের গিলবার্ট দ্বীপপুঞ্জ অধিকারের গুরুত্ব অধিক; ইহাকে তাহাদের প্রকৃত আক্রমণাত্মক তৎপরতা বলা যায়। ইতিপূর্ব্বে তাহাদের সমর-প্রচেষ্টা প্রধানতঃ প্রতিরোধাত্মক উদ্দেশ্যেই পরিচালিত হইয়াছিল।

কায়রো-সম্মিলন

নভেম্বর মাসের শেষভাগে কায়রোয় প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট, মিঃ চার্চ্চিল ও মার্শাল চিয়াং-কাই-সেক্ প্রাচ্য অঞ্চলের প্রধানতঃ সামরিক ও গৌণতঃ রাজনৈতিক বিচারের আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। পাঁচ দিন ব্যাপী আলোচনার পর তাঁহারা সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

সামরিক সমস্যা সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত স্বভাবতঃ গোপন। সাধারণভাবে বলা হইয়াছে যে, জাপানের বিরুদ্ধে জলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষে প্রবল আক্রমণ চালান হইবে। কায়রো সিদ্ধান্তের পরও এই বৎসর শীতকালে ব্রহ্মদেশ আক্রমণ করিয়া ব্রহ্ম-চীন উন্মুক্ত করিবার চেষ্টা হইবে বলিয়া মনে হয় না। বিশেষতঃ কায়রো সম্মিলনীর পরই ঘোষিত হইয়াছে যে, জার্ম্মানীর পরাজয়ের পর প্রাচ্য অঞ্চলে মনোযোগ প্রদান করা হইবে। কাজেই, সমগ্রভাবে জাপানের বিরুদ্ধে শক্তি সমাবেশই যে কেবল স্থগিত থাকিবে তাহাই নয়, ব্রহ্ম-অভিযানও এই বৎসর স্থগিত থাকিল, কারণ ব্রহ্মের যুদ্ধ জাপানের বিরুদ্ধে সর্ব্বাত্মক সমর-প্রচেষ্টার অন্যতম প্রধান অঙ্গ।

কায়রোয় তিনটি শক্তির পক্ষ হইতে ঘোষিত হইয়াছে যে, ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের পর জাপান যত স্থান অধিকার করিয়াছে, তাহা হইতে সে বিতাড়িত হইবে। মাঞ্চুরিয়া ও ফরমোসাসহ সমগ্র চীনারাজ্য চীনকে প্রত্যর্পণ করা হইবে; কোরিয়া স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হইবে অর্থাৎ জাপানকে তাহার অধিকৃত সকল রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিয়া ক্ষুদ্র দ্বীপ-রাষ্ট্রে পরিণত করা হইবে। বৃটেন্ ও আমেরিকার পক্ষ হইতে যুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এই ঘোষণার গুরুত্ব সুদূরপ্রসারী। সম্প্রতি জাপান চীনকে স্বতন্ত্র সন্ধি করিবার জন্য প্রলুব্ধ করিতেছে; সে মাঞ্চুরিয়া ও ফরমোসা ব্যতীত চীনের সমস্ত অধিকৃত অঞ্চল ত্যাগ করিয়া যাইতে সম্মত হইয়াছে। এই সময় সম্মিলিত পক্ষের উল্লিখিত ঘোষণায় চীনাদিগের মনে গভীর রেখা পাত হইবে বলিয়া মনে হয়; ইহা জাপানের কৌশলী প্রচার কার্য্য ব্যর্থ করিয়া দিবে। ৩।১২।৪৩

নাহি ভয়

শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত

সার দিয়ে আর চক্ষের জল ফেলে
কত না যত্নে নরম করিলে মাটী,
কি ফসল তুমি তার কাছ থেকে পেলে
মেকির বাজারে মিলিল কি কিছু খাঁটী?
দুঃখের দিনে যত দুর্ব্বহ বোঝা;
ইচ্ছায় আর চাপিল অনিচ্ছাতে
বহিয়া সে সব তবুও চলিলে সোজা
আশা নিরাশায় ব্যথা আর বেদনাতে।
অনেকদিন ত কাটালে এমনি কোরে,
এবার বন্ধু, পিছনে ফিরিয়া চাও—
সব ঋণশোধ হবে না'ক আঁখি লোরে
শেষটুকু যদি পার এই বেলা দাও।
মৃত্যুপথের পথিক বন্ধু! শোন
গলা ছেড়ে গাহ যুদ্ধের জয়গান;
কেন বৃথা আর মিথ্যার জাল বোন?
দধীচির সম দিতে হবে তব প্রাণ।
মরণ-মঞ্চে দাঁড়াইয়া গাহ জয়—
জীবন-যুদ্ধে-জিয়ান মৃত্যু, নাহি ভয়, নাহি ভয়।

তুমি হলে আকাশের তারা

শ্রীনৃপেন্দ্রগোপাল মিত্র

অন্তহীন আকিঞ্চনে হলে বিজয়িনী
অকস্মাৎ ঘন-উদ্বেলনে, সংগাহারা
হৃদয়ের পট-ভূমিকায়, তুমি মোর
জয়লক্ষ্মী; আমি তব দীনভক্ত শুধু।
কিন্তু কাল? কাল তুমি সেই পুরাতন—
বক্ষের অতল তলে, স্মৃতির প্রাসাদে,
অযুত অতিথি সাথে, লভিয়াছ স্থান—
সংখ্যাতীত প্রকোষ্ঠের একেতে কোথায়
চিহ্নিত হইয়া গেছে তব প্রিয় নাম।
তুমি কি হারায়ে গেলে? তব চিহ্ন কিবা
নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল, অন্তরে আমার?
নহে নহে-তুমি হ'লে আকাশের তারা,
অসংখ্য স্তিমিতদ্যুতি নক্ষত্রের মাঝে,
তোমারো রহিল পরিচয়। আজ তুমি
তোমাতে কেবল, আচ্ছন্ন করিয়া আছ
স্মৃতির আকাশ—কাল তুমি সে তোমরা—
নিজস্ব বৈচিত্র্য ল'য়ে রয়েছ ফুটিয়া,
অপার রহস্যময় মনের গহনে—।

তিব্বতের বৌদ্ধ সংস্কৃতি

অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার এম-এ, পি-আর-এস, পি-এইচ্-ডি

মধ্য-এশিয়ার জনপদসমূহের মধ্যে তিব্বত সর্ব্বশেষে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করে। সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্বে এই দেশে বুদ্ধপন্থীর অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, আধুনিক তিব্বতের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী দেশসমূহে অর্থাৎ চৈনিক তুর্কীস্থান, চীনদেশ এবং উত্তর ভারতীয় জনপদসমূহে ইহার বহুকাল পূর্ব্বেই বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তৃত হইয়াছিল। বৌদ্ধ সংস্পর্শ হইতে তিব্বত কিরূপে এত দীর্ঘকাল আপনার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিল, তাহার কারণ নিশ্চিত জানা যায় না; তবে এই দেশের প্রাকৃতিক এবং তৎকালীন রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থাই এজন্য দায়ী বলিয়া মনে হয়। সে যুগে তিব্বতের রাষ্ট্রীয় বিস্তার আরম্ভ হয় নাই। দেশটী কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। এমন কি পরবর্ত্তী সাম্রাজ্যের যুগেও জনসাধারণের মধ্যে পূর্ব্বকালের 'অষ্টাদশ-জনপদে'র স্মৃতি উজ্জ্বল ছিল দেখা যায়। আবার প্রাচীন তিব্বতের চারিপার্শ্বে বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র জাতি বাস করিত। এই দেশে প্রবেশের পথও সুগম ছিল না। তিব্বতের এই প্রাচীন যুগের ইতিহাস তমসাচ্ছন্ন।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ এবং সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে নম-রি-স্রোঙ্-সন্ (আনুমানিক ৫৭০-৬২০ খৃঃ) নামক একজন শক্তিমান্ নায়ক মধ্য তিব্বতের অসভ্য বা অর্দ্ধসভ্য জাতিগুলিকে পরাজিত করিয়া এক পরাক্রান্ত রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র সুপ্রসিদ্ধ স্রোঙ্-সন্-গম্-পো (আঃ ৬২০-৫০ খৃঃ) রাজসিংহাসন লাভ করেন। তাঁহাকে তীব্বতীয় সভ্যতার জনক বলা যাইতে পারে। তিনি বাহুবলে সমগ্র তিব্বতে একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন এবং পশ্চিম দিকে লদক ও জঙ্-জঙ্ জনপদ, পূর্ব্বে তঙ্-সিয়ঙ্ জাতির দেশ ও উত্তরদিকে পরাক্রান্ত তু-যুক্-লুন্ রাজ্যে রাষ্ট্রীয় প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হন। এই সময়ে সুসভ্য নেপাল রাজ্যের প্রকৃত শাসক ছিলেন ঠাকুরীবংশীয় অংশুবর্ম্মা। তিব্বতসম্রাট্ তদীয় কন্যার পাণি প্রার্থনা করিয়া নেপালে দূত প্রেরণ করিলেন। কথিত আছে নেপালকুমারী বর্ব্বর তিব্বতীয়কে বিবাহ করিতে বড় সহজে সম্মতি দেন নাই। যাহা হউক বিবাহের পর পতিগৃহে যাইবার সময় রাজকুমারী অক্ষোভ্য বুদ্ধের একটী সুন্দর মূর্ত্তি সঙ্গে লইয়া যান। আজিও র-মো চে নামক লাসার প্রাচীনতম বৌদ্ধবিহারে এই মূর্ত্তিটী দেখিতে পাওয়া যায়। এই ঘটনার কিছুকাল পরে ৬৩৯ খৃষ্টাব্দে তিব্বতসম্রাট্ অপর একজন কৌলীন্যসম্পন্না বিদেশীয়া মহিলাকে বিবাহ করেন। ইনি চীনের সম্রাটপরিবারের দুহিতা মুন্-শেঙ্ (চীন ভাষায় "ওয়েন্ চেঙ্") কোঙ্-চো। পশ্চিম চীনের থাঙ্-বংশীয় সম্রাট্ থাইত্-সুঙ্কে তিব্বতরাজের বাহুবলে বাধ্য হইয়া এই বিবাহে স্বীকৃত হইতে হইয়াছিল। তিব্বতীয়গণের মতে প্রধান তিব্বতরাজদূতের অপূর্ব্ব কূটনৈতিক চাতুর্য্যের ফলেই এই বিবাহ সম্ভব হয়। যাহা হউক, চীনা রাজকুমারীও পতিগৃহে আগমনের সময় সপত্নীর ন্যায় একটী চন্দনকাষ্ঠনির্ম্মিত বুদ্ধমূর্ত্তি সঙ্গে আনিয়াছিলেন। শোনাযায় এই মূর্ত্তি ভারত হইতে মধ্য-এশিয়ায় এবং তথা হইতে চীনে নীত হইয়াছিল। মহিষীদ্বয়ের প্রভাবে পড়িয়া স্রোঙ্-সন্-গম্-পো বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। মধ্য-এশিয়ায় বিজয়াভিযান চালাইবার সময়েও তিনি বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের সংস্পর্শে আসিয়া বুদ্ধের শান্তিময় মুক্তিমার্গের বিষয় অবগত হইয়াছিলেন। কথিত আছে, তাঁহার চেষ্টায় লাসা নগরীতে দুইটী বৌদ্ধবিহার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে র-মো-চে নামক বিহারটী অদ্যাপি বর্ত্তমান-আছে, কিন্তু ফুল্-নঙ্ সংজ্ঞক অপর বিহারটী কিছুকাল পরে চীনাগণ কর্ত্তৃক ধ্বংস হইয়াছিল। তিব্বতীয়গণ এই শ্রদ্ধার্হ নরপতিকে বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর, তদীয় নেপালী মহিষীকে সবুজ তারাদেবী এবং চীনা মহিষীকে শ্বেত তারাদেবী জ্ঞানে পূজা করিয়া থাকে।

কিন্তু স্রোঙ্-সন্-গম্-পোর রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম্মবিস্তার অপেক্ষা সভ্যতা-বিস্তারের দিকেই অধিক মনোযোগ দেওয়া হইয়াছিল। তিনি এক দণ্ডবিধিশাস্ত্র সঙ্কলিত করেন বলিয়া কথিত আছে। তদীয় চীনা মহিষীর আগ্রহে বর্দ্ধিষ্ণু গৃহস্থগণ স্বদেশীয় বস্ত্রের পরিবর্ত্তে চীনাংশুক পরিধানে অভ্যস্ত হইল। দেশে বহু-সংখ্যক বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। আবার অনেক তিব্বতীয় বালককে বিদ্যাশিক্ষার জন্য চীনদেশেও প্রেরণ করা হইল। তিব্বতের কোন বর্ণমালা ছিল না। ৬৩৯ খৃষ্টাব্দে অনুর পুত্র থোঙ্-মি-সম্ভোত নামক একজন প্রাজ্ঞ ব্যক্তিকে বর্ণমালার সন্ধানে কাশ্মীর দেশে প্রেরণ করা হয়। তিনি কয়েক বৎসর ভারতবর্ষে বাস করিয়া লিপিদত্ত বা লিপিকর নামক জনৈক ব্রাহ্মণের নিকট বিদ্যাভ্যাস করেন। সম্ভবতঃ 'লিপিকর' এই ব্রাহ্মণের নাম নহে, তাঁহার ব্যবসায়-জ্ঞাপক পদবী মাত্র। যাহা হউক, অতঃপর থোঙ্-মি-সম্ভোত কতকগুলি বৌদ্ধগ্রন্থ এবং স্বদেশের জন্য উদ্ভাবিত বর্ণমালা সঙ্গে লইয়া তিব্বতে ফিরিয়া যান। তিব্বতীয় লিপি ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দীতে উত্তর ভারতে প্রচলিত ক্রমবিবর্ত্তিত ব্রাহ্মী লিপি হইতে উদ্ভূত। এই বর্ণমালা তিব্বতীয় সভ্যতায় ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান। সেই সময়ে চীনা মহিষীর প্ররোচনায় যে চীনের বর্ণমালা তিব্বতে প্রচলিত হয় নাই, ইহাতে পরিণামে ঐ দেশের মঙ্গল হইয়াছে। কারণ চীনা বর্ণমালার অনেকগুলি ব্যবহারিক অসুবিধা আছে।

এইরূপে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে তিব্বতে যে বৌদ্ধমতের প্রচলন হইল, তাহার কিছু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। কারণ, আমাদের দেশের সাধারণ পাঠকের কেবলমাত্র গৌতমবুদ্ধের মতবাদ সম্বন্ধে সামান্য একটু ধারণা আছে; পরবর্ত্তীকালে বৌদ্ধ-ধর্ম্মে বিবর্ত্তনমূলক যে সম্প্রদায়গত মতভেদের সৃষ্টি হইয়াছিল, সে বিষয়ে তাঁহারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। লামাধর্ম্ম অর্থাৎ তিব্বতীয় বৌদ্ধ-ধর্ম্ম মূলতঃ সপ্তম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত উত্তর ভারতে প্রচলিত বৌদ্ধধর্ম্মের তিব্বতীয় রূপ। কিন্তু এই ধর্ম্ম গৌতমবুদ্ধের প্রচারিত ধর্ম্মের সহিত মতামতের দিক হইতে অভিন্ন নহে।

খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে পূর্ব্ব-ভারতে গৌতমবুদ্ধের (আঃ ৫৬৩-

৪৮৩ খৃঃ পূঃ) আবির্ভাব হইয়াছিল! তিনি পূজা, যাগযজ্ঞ, কঠোর তপশ্চর্য্যা, জন্মগত জাতিভেদ প্রভৃতিতে আস্থাহীন ছিলেন। তাঁহার মতে, মানবের স্বকৃত কর্ম্মই তাহার ভবিষ্যৎ গঠিত করে; নির্দ্দিষ্ট উপায়ে সদনুষ্ঠান দ্বারা সে ক্রমশঃ উন্নত হইয়া পরিণামে নির্ব্বাণ লাভ করিতে পারে, সেজন্য বেদে বা আত্মায় বিশ্বাস কিংবা ঈশ্বর বা দেবদেবীর উপাসনা আবশ্যক নহে। বুদ্ধের জীবনকালে তাঁহার ধর্ম্মমত পূর্ব্ব-ভারতের নানা স্থানে প্রচারিত হইয়াছিল; কিন্তু সর্ব্বত্র সুপ্রচলিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে মৌর্য্যবংশীয় সম্রাট্ অশোকের বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণের ফলে যেন এই ধর্ম্মের ক্ষীণ স্রোত প্রবল বারিধারা লাভ করিয়া কূলপ্লাবিনী স্রোতস্বিনীতে পরিণত হইল। অশোক বৌদ্ধ উপাসক হইয়া সংবোধি (বুদ্ধগয়া), লুম্বিনী গ্রাম, কণকমুনি স্তূপ প্রভৃতি বৌদ্ধতীর্থ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং ঐ সকল তীর্থে পূজাদি সম্পাদন করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। বোধ হয় ইতিপূর্ব্বেই কর্ম্ম ও জ্ঞানবাদমূলক বৌদ্ধধর্ম্মে ধীরে ধীরে ভক্তিরও স্থান হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। অশোক স্বয়ং ভগবান্ বুদ্ধের প্রতি তাঁহার 'গৌরব' এবং 'প্রসাদে'র কথা উল্লেখ করিয়া গর্ব্ব অনুভব করিয়াছেন। যাহা হউক, অশোক বৌদ্ধসঙ্ঘের দলাদলি দূর করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু পরিণামে এই চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। কারণ শীঘ্রই বৌদ্ধ সম্প্রদায় দুইভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে এবং প্রাচীন পান্থগণ স্থবিরবাদী ও সংস্কারপন্থী দল মহাসাঙ্ঘিক নামে খ্যাত হয়। মহাসাঙ্ঘিক সম্প্রদায়ের মতে বৌদ্ধভিক্ষুর আয়াসলভ্য চরম অবস্থা অর্হত্ব নহে; উপযুক্ত সাধনাবলে তাঁহারা বুদ্ধত্বও লাভ করিতে পারেন। এই নবমত অনেকের চিত্ত বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিল। মৌর্য্য যুগে জাতক এবং অবদান সাহিত্যের জনপ্রিয়তার ফলেও সম্ভবতঃ এই ধর্ম্ম ক্রমশঃ লোকপ্রিয়তা অর্জ্জন করিতেছিল। কেহ কেহ মনে করেন যে মৌর্য্য সম্রাট্ অশোকের পূর্ব্বেই মহাসাঙ্ঘিক সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হইয়াছিল; কিন্তু এই সিদ্ধান্ত নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয় নাই। যাহা হউক, মহাসাঙ্ঘিক মতবাদের মধ্যে পরবর্ত্তী মহাযান সম্প্রদায়ের আবির্ভাবের সূচনা লক্ষ্য করা যায়। কারণ মানুষের বুদ্ধত্ব লাভের প্রয়াস হইতেই অচিরে বোধিসত্ত্বসংজ্ঞক বুদ্ধত্বকামী এক শ্রেণীর দেবতা ও তাঁহাদের পূজাবিধির কল্পনা হইয়াছিল।

মৌর্য্যগণের অবনতির পর উত্তর-পশ্চিম ভারতে, গ্রীক, শক, পহ্লব, কুষাণ প্রভৃতি নানা বৈদেশিক জাতির অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়ে বিদেশ হইতে বিভিন্ন জাতীয় নানা লোক ভারতে প্রবেশ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মে আকৃষ্ট হয়। অনেকে মনে করেন, এই সকল বিদেশী জাতির মনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে দৃঢ় সংস্কার থাকার ফলেই বৌদ্ধদিগের মধ্যে এই সময় মহাযান সম্প্রদায় নামক এক নবীন দলের আবির্ভাব হয়। এই সম্প্রদায়ের মতে ভগবান্ বুদ্ধ প্রার্থীর আবেদনে কর্ণপাত করিতে এবং তাহাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে সমর্থ। এইবার বুদ্ধ প্রকৃত-পক্ষে ঈশ্বরের আসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। মহাযান মতাবলম্বিগণ প্রাচীনপন্থী বৌদ্ধদিগকে হীনযান আখ্যা দেন। বহু-কাল পূর্ব্বে ভারতবর্ষেই এই ভক্তিবাদের সূত্রপাত হইয়াছিল, উপরে তাহার ইঙ্গিত করা হইয়াছে। কিন্তু কথিত আছে, কুষাণ বংশীয় সম্রাট্ কণিষ্ক মহাযানমতের প্রথম পৃষ্ঠপোষক এবং তদীয় সভাসদ নাগার্জ্জুন এই মতবাদের স্রষ্টা। এই কাহিনী সত্য হইতে পারে; কিন্তু লক্ষ্য করিতে হইবে যে এই নাগার্জ্জুন বিদেশীয় ছিলেন না; তিনি বর্ত্তমান মধ্যপ্রদেশের অধিবাসী ছিলেন। কুষাণবংশে কণিষ্ক নামধেয় দুইজন সম্রাটের অস্তিত্ব অবগত হওয়া যায়। প্রথম কণিষ্ক ৭৮-১০২ খৃষ্টাব্দে এবং দ্বিতীয় কণিষ্ক ১১৯ খৃষ্টাব্দের নিকটবর্ত্তী সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। নাগার্জ্জুনের পৃষ্ঠপোষক কণিষ্ক সম্ভবতঃ এই দ্বিতীয় কণিষ্ক। যাহা হউক, মহাযান মতের জনপ্রিয়তার ফলে অসংখ্য বুদ্ধ, বুদ্ধত্বপ্রয়াসী বোধিসত্ত্ব এবং অন্যান্য দেবদেবী কল্পিত হয় এবং বুদ্ধকর্ত্তৃক নিন্দিত পূজাবিধির আড়ম্বরে ও বিড়ম্বনায় বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের ন্যায় ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে। কিন্তু জনসাধারণের নিকট এই ধর্ম্ম অসামান্য সমাদর লাভ করিল। আজিও কেবল চট্টগ্রাম, সিংহল, ব্রহ্মদেশ এবং শ্যামদেশে হীনযানপন্থী বৌদ্ধ দেখা যায়; কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বৌদ্ধগণ মহাযান মতাবলম্বী। নেপাল, সিকিম, ভূটান, লদক, চীন, আনাম, কোরিয়া, জাপান, তিব্বত, মোঙ্গোলিয়া প্রভৃতি জনপদ মহাযানপন্থী।

কালক্রমে মহাযানের ভক্তিমূলক আধ্যাত্মিকতার সহিত হিন্দু দর্শনের প্রভাবে কিছু কিছু অতীন্দ্রিয়তাবাদের সংমিশ্রণ ঘটিল। ইহার ফলে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে আচার্য্য বসুবন্ধুর যোগাচার মত প্রবল হইয়া উঠে। যোগের মূল কথা পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার অর্থাৎ ভগবানের সহিত জীবের সম্মিলন। সুতরাং আদি মহাযান মতের সহিত উহার যোগাচার শাখার মতগত একটা মৌলিক পার্থক্য দেখা যায়। শীঘ্রই এই নবীন ধর্ম্মে অনেক ভৌতিক প্রক্রিয়া ও তন্ত্র-মন্ত্রের স্থান হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দীতে মহাযান এবং যোগাচারপন্থী বৌদ্ধগণ তান্ত্রিক মতাবলম্বী শৈব ও শাক্তগণের দ্বারা প্রভাবিত হন। তান্ত্রিকগণ শিবের স্ত্রীশক্তিরূপে জগন্মাতার বিভিন্ন মূর্ত্তির সাধনা করিতেন। ফলে বৌদ্ধগণও তাঁহাদের বোধিসত্ত্ব, দেবতা, উপ-দেবতা প্রভৃতির নানাপ্রকার অদ্ভুত আকার ও ক্ষমতা বিশিষ্ট স্ত্রীশক্তিসমূহ কল্পনা করিয়া তাঁহাদের পূজার ব্যবস্থা করিলেন। এই সকল শক্তিকে লোকের ক্ষতি সাধনে এবং ভক্তগণকে অতি-মানুষী শক্তি প্রদানে সমর্থ জ্ঞানে পূজা করা হইত। মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মের এই ক্রম-বিবর্ত্তিত রূপের নাম মন্ত্রযান। সপ্তম শতাব্দীতে এই মন্ত্রযান বৌদ্ধধর্ম্মই প্রথমে তিব্বতে প্রবেশ করিয়াছিল।

মন্ত্রযান মতের ক্রমিক বিবর্ত্তন ফলে কালক্রমে কালচক্রযান সংজ্ঞক নবীন বৌদ্ধ মতের উদ্ভব হয়। কালচক্রবাদীরা তান্ত্রিক হিন্দুদেবী কালীর সহিত ধ্যানীবুদ্ধ কিংবা আদিবুদ্ধের মিলন কল্পনা করিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এবং বহু দেবদেবীর সৃষ্টি এই মিলনের উপর আরোপ করিতেন। তাঁহাদের কল্পিত হেরুক, কালচক্র, অচল, বজ্রভৈরব প্রমুখ দেবগণ অনন্ত শক্তির অধিকারী, কিন্তু ঘোরতর নৃশংস। তন্ত্র-মন্ত্র ও পূজাদি দ্বারা তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা সন্তুষ্ট রাখিতে হইত। দশম শতাব্দীতে এই কালচক্র মত তিব্বতে সমাদর লাভ করিয়াছিল।

মন্ত্রযান এবং কালচক্রযানের সংমিশ্রণের ফলে শীঘ্রই এক নূতন মতের উদ্ভব হয়; ইহার নাম বজ্রযান। বজ্রাচার্য্য বা

সিদ্ধগণ পূর্ব্বোক্ত দেবতাদিগের সহিত ডাক ও ডাকিনীসমূহের পূজা করিতেন। তাঁহারা কৃচ্ছ্রসাধন ও তান্ত্রিক বামাচারে অভ্যস্ত ছিলেন। তাঁহাদের মতে সাধনা দ্বারা সাধক সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন এবং সিদ্ধ হইলে অলৌকিক শক্তির অধিকারী হওয়া যায়। এই বজ্রযান মতও তিব্বতে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। তিব্বতের লামা বা বৌদ্ধাচার্য্যগণকে সিদ্ধিলাভের জন্য অতিশয় উৎসাহী ও ব্যগ্র দেখা যায়। অবশ্য তাঁহারা স্বীকার করেন যে অর্হত্ব হইতে এই সিদ্ধির স্থান অনেক নিম্নে। লামা ধর্ম্মে অর্থাৎ তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্ম্মে মন্ত্রযান, কালচক্রযান এবং বজ্রযানের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে; কিন্তু বজ্রযানের প্রাধান্য সর্ব্বাধিক। অবশ্য ভারতীয় ধর্ম্মকে তিব্বতীয়গণ অনেকটা নিজস্ব করিয়া লইয়াছে। তিব্বতীয় দার্শনিকগণ বৌদ্ধ দর্শনের রসাস্বাদনে বঞ্চিত নহেন; কিন্তু লামাধর্ম্মে তিব্বতের নিজস্ব অনেক পৌরাণিক কাহিনী, প্রাচীন মতবাদ এবং জাতীয় কুসংস্কারমূলক ভূতপ্রেত পূজাদিও স্থান পাইয়াছে! এক কথায়, ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম্ম তিব্বতের প্রাচীন ধর্ম্মকে উচ্ছেদ করিতে গিয়া উহার কোন কোন অংশকে নিজ অঙ্গের ভূষণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। কিন্তু এই প্রসঙ্গে প্রাচীন তিব্বতীয় ধর্ম্মেরও কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়া রাখা প্রয়োজন।

তিব্বতের প্রাচীন ধর্ম্মের নাম বোন্-পো। এই ধর্ম্মাবলম্বিগণের মতে, বোন্ সংজ্ঞক দেবতা বা উপদেবতাগণ স্বর্গ-মর্ত্ত শাসন করেন। ভূমি, পর্ব্বত, নদী, হ্রদ এবং প্রাকৃতিক অবস্থা সমস্তই বোন্দিগের শাসনাধীন। এই বোন্দিগকে প্রাচীন ভারতের যক্ষ এবং ব্রহ্মদেশের নাত্ সংজ্ঞক উপদেবতার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। বোনেরা সহজেই কুপিত হন এবং ঝঞ্ঝাবাত, মহামারী, বন্যা প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া মনুষ্যগণকে পীড়িত করিয়া থাকেন। তাঁহারা বিদেশীয় কোন ব্যক্তি, বস্তু বা ভাব সহ্য করিতে পারেন না; উহা দেখিলেই ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহারা দেশের নানা দুর্দ্দশা ঘটাইয়া থাকেন। এই বোন্গণকে তিব্বতদেশীয় সমাজের রক্ষণশীল দলের মনোভাবের প্রতীক বলা যাইতে পারে। তিব্বতের ইতিহাসে মাঝে মাঝে দেখা যায়, অমাত্যেরা ধর্ম্মসংস্কারকামী নরপতির উৎসাহ সংযত করিবার জন্য পরামর্শ দিতেছেন! প্রকৃতপক্ষে ইহাতে যেন রক্ষণশীল বোন্দেবতাদিগেরই মনোভাব ধ্বনিত হইয়াছে।

এইবার আমরা তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তারের ইতিহাস আলোচনা করিব। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে স্রোঙ্-সন্-গম্-পো নানা উপায়ে স্বদেশকে একটী সুসভ্য জনপদে পরিণত করিতে চেষ্টা করেন। চীন ও ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধাচার্য্য আনাইয়া তিনি তিব্বতীয়গণের শিক্ষাদীক্ষা ও আচারব্যবহার সংস্কার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। অবশ্য ইহাতে তিব্বতের জাতীয় ভাবধারার গতি সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ হয় নাই; কারণ বিদেশীয় ধর্ম্ম, দর্শন, সাহিত্য ও শিল্পকলাকে তিব্বতীয়েরা নিজস্ব আকার দান করিয়াছিল। যাহা হউক, এই নরপতির সময়ে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্মের সূত্রপাত মাত্র হইয়াছিল; দেশে ইহা সুপ্রচারিত হয় নাই। সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে তিব্বতীয় ইতিহাসের প্রধান কথা তিব্বতের রাষ্ট্রীয় বিস্তার। অবশ্য এই যুগে কয়েকটী বৌদ্ধবিহার নির্ম্মিত হয়; কর্ম্মশতক, সুবর্ণপ্রভাসসূত্র প্রভৃতি গ্রন্থ এবং আয়ুর্ব্বেদ ও জ্যোতিষ বিষয়ক কয়েকখানি পুস্তকও এই সময়ে অনুবাদিত হইয়াছিল। স্রোঙ্-সন্-গম্-পোর মৃত্যুর পর তাঁহার পৌত্র মঙ্-স্রোঙ্-মঙ্-সন্ (৬৫০-৭৯ খৃঃ) সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার পরাক্রান্ত সৈন্যদল সুবিখ্যাত গর্-বংশীয় সেনাপতিগণের নেতৃত্বে দক্ষিণে নেপাল রাজ্য পদানত করে, উত্তরের তু-য়ুক্-হুন রাষ্ট্র ধ্বংস করে এবং বিজয়গর্ব্বে তুর্কীস্থানে অগ্রসর হইতে থাকে। তাঁহার পর তদীয় পুত্র দু-স্রোঙ্-মঙ্-পো-জে (৬৭৯-৭০৪ খৃঃ) এবং পৌত্র মেস্-অগ্-সোম্‌স্ (৭০৪-৫৫ খৃঃ) ক্রমান্বয়ে তিব্বতের রাজসিংহাসন লাভ করেন। অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে তিব্বতীয়গণ পশ্চিমে বাল্‌তীস্থান পর্য্যন্ত অধিকার করে এবং পামীর অঞ্চলের কুড়িটী জনপদের সহিত রাষ্ট্রীয় সম্পর্কে আবদ্ধ হয়। ৭৪৭ খৃষ্টাব্দের চীনা সমরাভিযান দীর্ঘকাল তাহাদের অগ্রগতি রোধ করিতে পারে নাই। অষ্টম শতাব্দীর শেষার্দ্ধে তিব্বতীয়েরা খোতান অধিকার করে এবং তুর্কীস্থানে চীনা ও উইগুর্-তুর্কীদিগের আধিপত্য প্রায় বিলুপ্ত করিয়া দেয়। কিন্তু কান্-সু জনপদের পশ্চিম ও দক্ষিণ অঞ্চলের অধিকার লইয়া চীনা এবং তিব্বতীয়গণের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। মেস্-অগ্-সোম্‌সের পুত্র খ্রি-স্রোঙ্-দে-সনের সময়ে (৭৫৫-৯৭) ৭৬৩ খৃষ্টাব্দে চীনবাহিনী পরাজিত করিয়া তিব্বতীয়গণ চীনের রাজধানী চঙ্গন বা সি-ঙান্-ফুতে প্রবেশ করে। অতঃপর ৮২২ খৃষ্টাব্দে তিব্বত ও চীনের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়। এই সন্ধি তিব্বতের রাষ্ট্রীয় গৌরবের সর্ব্বোচ্চ সীমা। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে পূর্ব্বোক্ত অঞ্চলসমূহে তিব্বতীয় অধিকার ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছিল।

খ্রি-স্রোঙ্-দে-সনের রাজত্বকালে একদিকে তিব্বত যেমন একটা মহাশক্তিতে পরিণত হয়, অপর দিকে তেমনই সমগ্র দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল প্লাবন উপস্থিত হয়। তাঁহার মাতা চীনদেশীয়া বৌদ্ধরমণী ছিলেন। তাঁহার পিতার সময়ে খোতান প্রভৃতি পশ্চিমাঞ্চলের দেশসমূহ হইতে অনেক বৌদ্ধভিক্ষু তিব্বতে পলাইয়া আসেন। চীনকুমারী মহিষী কিম্-শেঙ (চীনাভাষায় "চিন্-চেঙ্") কোঙ্-চোর পরামর্শে তাঁহাদিগকে মহাসমাদরে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু ৭৪০-৪১ খৃষ্টাব্দে রাজমহিষী এবং আরও বহু ব্যক্তি মহামারীতে প্রাণ হারান। ইহার ফলে পশ্চিমদেশীয় ও অন্যান্য বৌদ্ধভিক্ষুদিগের বিরুদ্ধে কুসংস্কারমূলক জনমত প্রবল হওয়ায় তাঁহাদিগকে বিতাড়িত করা হয়। কথিত আছে, এই সময়ে তিব্বত দেশে ভৌতিক উপদ্রব অত্যন্ত প্রবল হইয়াছিল; এই উৎপাত দমনের জন্য নেপালবাসী বৌদ্ধাচার্য্য শান্তিরক্ষিত বা শান্তরক্ষিতকে তিব্বতে নিমন্ত্রণ করিয়া লওয়া হয়। খ্রি-স্রোঙ্-দে-সন্ আচার্য্য শান্তরক্ষিতের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার বৃদ্ধি এবং ভৌতিক উপদ্রব দমনের জন্য তাঁহার সাহায্যপ্রার্থী হন। কিন্তু শান্তরক্ষিত এই উৎপাত দমনে অসমর্থ হওয়ায় তাঁহারই পরামর্শে আনুমানিক ৭৮০ খৃষ্টাব্দে উড্ডানদেশের অধিবাসী মহাচার্য্য পদ্মসম্ভবকে তিব্বতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনা হয়। মধ্যএশিয়া এবং বজ্রাসন (বুদ্ধগয়া), বাঙ্গালা, কামরূপ প্রভৃতি পূর্ব্বভারতের নানা জনপদ পরিভ্রমণ করিয়া পদ্মসম্ভব নালন্দাবিহারে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি শ্মশানবিহারী যোগাচারপন্থী ছিলেন এবং তান্ত্রিক শক্তি ও চাতুর্য্যের জন্য সুবিখ্যাত হইয়াছিলেন।

এই শক্তির বলেই তিনি জহোর দেশের রাজকুমারী মন্দারবকে বিবাহ করিতে সমর্থ হন। কেহ কেহ মনে করেন, জহোর হিন্দুস্থানের নাম; কাহারও মতে ইহা পাঞ্জাবের অন্তর্গত মণ্ডী; আবার কাহারও মতে ইহা বাংলার অন্তর্গত সাভার বা যশোহর। বাংলার পালবংশীয় সম্রাট্ ধর্ম্মপালকে কোন কোন তিব্বতীয় ঐতিহাসিক গ্রন্থে সহোর বা জহোরের রাজা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে; সুতরাং মনে হয়, এই রাষ্ট্র বাংলা দেশের অন্তর্গত হওয়া অসম্ভব নহে। যাহা হউক, পদ্মসম্ভব তাঁহার বজ্র নামক অস্ত্র (সম্ভবতঃ মায়া দণ্ডবিশেষ) এবং মহাযান শাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত মন্ত্রাদির সাহায্যে তিব্বতীয়গণের পূজিত প্রধান ভৌতিক শক্তিগুলিকে পরাজিত করিলেন। শোনা যায় উহাদের মধ্যে যেগুলি বৌদ্ধমত সমর্থন করিতে স্বীকার করিল, কেবল তাহারাই অব্যাহতি পাইয়াছিল। কুসংস্কারাচ্ছন্ন তিব্বতবাসিগণ পদ্মসম্ভবের তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ প্রত্যক্ষ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের অনুরাগী হইয়া উঠিল। তাঁহার অলৌকিক শক্তি তিব্বতীয়দিগের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তাঁহার চেষ্টায় ৭৮৭ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত সম্-যস্ বিহার প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনিই প্রথম তিব্বতীয়গণকে বৌদ্ধভিক্ষুর জীবন-বরণের অধিকার দান করেন। তাঁহার যত্নে ক্রিয়া, যোগ, অনুযোগ প্রভৃতি বিষয়ক তান্ত্রিক সাহিত্যের বহুসংখ্যক গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। অনেক শাস্ত্রগ্রন্থ সংগৃহীত হয় এবং দণ্ডবিধিশাস্ত্র সংস্কৃত হয়। পদ্মসম্ভব ঞিঙ্-ম (অর্থাৎ প্রাচীন) সংজ্ঞক তিব্বতীয় বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। সম্-যস্ বিহারটী মগধের ওদন্তপুরী বিহারের অনুকরণে নির্ম্মিত হইয়াছিল। শান্তরক্ষিত ইহার অধ্যক্ষ হন। ব্য-ক্রি-জিগ্স্ তিব্বতীয়গণের মধ্যে প্রথম ভিক্ষু; কিন্তু পল্-বঙ্স্‌কে প্রথম লামা বলা হইয়া থাকে। সাতজন শ্রমণের মধ্যে বৈরোচন শাস্ত্রবেত্তায় প্রধান ছিলেন। আজিও শান্তরক্ষিত তিব্বতে বোধিসত্ত্বরূপে এবং পদ্মসম্ভব বুদ্ধের সমকক্ষরূপে পূজিত হন। পদ্মসম্ভব তিব্বতীয়গণের নিকট লো-পোন্ অর্থাৎ গুরু, অথবা গুরু রিন্-পো-চে অর্থাৎ অমূল্যগুরু নামে পরিচিত। তাঁহার তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপে পারদর্শী কুড়িজন শিষ্য ছিল। তিনি প্রায় তের বৎসর তিব্বতে অবস্থান করিয়া আনুমানিক ৭৯৫ খৃষ্টাব্দে নেপালে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

এইরূপে যে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্ম তিব্বতে প্রতিষ্ঠালাভ করিল, পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে তিব্বতীয় বোন্ ধর্ম্মের সহিত ইহার খানিকটা সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল। সেইজন্য পণ্ডিতগণ লামাধর্ম্ম বা তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্ম্মকে a priestly mixture of Saivite mysticism magic and Indo-Tibetan demonolatry overlaid by a thin varnish of Mahayana Buddhismরূপে বর্ণনা করিয়া থাকেন। এই ধর্ম্ম তিব্বতে অত্যধিক জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছিল। খ্রি-স্রোঙ-দে-সন্ বিহারাদি নির্ম্মাণ করিলেন এবং ভারতীয় পণ্ডিতগণের সাহায্যে বৌদ্ধশাস্ত্র গ্রন্থাবলী তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদের ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু বোন্-পো পুরোহিতগণ এই নবধর্ম্মের বিরোধিতা করিতে লাগিলেন। হোয়া-শাঙের নেতৃত্বে তিব্বতস্থিত চীনা বৌদ্ধেরাও ইহার বিরোধী হইলেন; তাঁহারা পূর্ব্বপ্রচলিত বৌদ্ধমতের সমর্থন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে রাজার আমন্ত্রণে মগধবাসী আচার্য্য কমলশীল তিব্বতে উপস্থিত হন। তাঁহার চেষ্টায় তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। এখনও তিব্বতে আচার্য্য কমলশীল কর্ত্তৃক চীনা মহাযানপন্থী হোয়া-শাঙ্ মহাদেবের পরাজয় কাহিনী ধর্ম্মাভিনয়ে প্রদর্শিত হইয়া থাকে। ইহার পর কিছুকাল তিব্বতে তান্ত্রিক বৌদ্ধমতের প্রভাব অব্যাহত ছিল। কারণ খ্রি-স্রোঙ-দে-সনের পুত্র ও উত্তরাধিকারী মু-নে-সন্-পো (৭৯৭-৮০৪ খৃঃ) এবং সদ্-ন-লেগ্স্-এর (৮০৪-১৭ খৃঃ) সময়ে উহার প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ণ হইবার কোন কারণ উপস্থিত হয় নাই।

তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসকে চারি যুগে বিভক্ত করা যায়। প্রথমতঃ, সপ্তম শতাব্দীতে স্রোঙ-সন্-গম্-পোর রাজত্বকাল হইতে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে খ্রি-স্রোঙ-দে-সনের রাজত্বের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবেশের যুগ। দ্বিতীয়তঃ, অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে নবম শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তারের যুগ। তৃতীয়তঃ দশম হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত ধর্ম্মসংস্কারের যুগ। চতুর্থতঃ, সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে দলৈলামা বা পুরোহিতরাজ প্রতিষ্ঠার সময় হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত আধুনিক যুগ। এই চারি যুগের মধ্যে প্রথম দুইটী যুগকে একত্র করিয়া আদিযুগ, তৃতীয়টীকে মধ্যযুগ এবং চতুর্থটীকে বর্ত্তমান যুগ আখ্যা দিয়াও যুগ বিভাগ করা যাইতে পারে।

নবম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে সদ্-ন-লেগ্স্-এর পুত্র সম্রাট্ রল্-প-চনের রাজত্বকালে (৮১৭-৩৬ খৃঃ) তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্ম্ম এক প্রবল প্রেরণা লাভ করে। এই নরপতি অতিশয় বুদ্ধ ও ভিক্ষুভক্ত ছিলেন। তিনি বহুসংখ্যক বৌদ্ধ বিহার নির্ম্মাণ করেন এবং উহাদের কতকগুলিকে শুল্করাদি আদায়ের ক্ষমতাসহ অনেক সরকারী জমি দান করেন। তাঁহার সময়ে অনেক রাজকীয় অধিকার ভিক্ষুদিগের হস্তগত হইয়া যায়। তিনি বহুসংখ্যক ভারতীয় ও তিব্বতীয় পণ্ডিতের সাহায্যে নাগার্জ্জুন, বসুবন্ধু-প্রমুখ বৌদ্ধ দার্শনিকগণের গ্রন্থাবলী তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করাইয়াছিলেন। এই সকল পণ্ডিতের মধ্যে জিনমিত্র, শীলেন্দ্র-বোধি, সুরেন্দ্রবোধি, প্রজ্ঞাবর্ম্মা, দানশীল, বোধিমিত্র, পল্-সেগ্স্, যে-সে-দে, ছোস্-ক্যি-গ্যল্-সন্ প্রভৃতির নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি অত্যাসক্তির জন্য রল্-প-চন্ তাঁহার বৌদ্ধবিদ্বেষী কনিষ্ঠ ভ্রাতা লঙ্-দর্-মর প্ররোচনায় নিহত হন। এইবার তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্মের এক দারুণ দুর্দ্দিন উপস্থিত হইল। কারণ লঙ্-দর্-ম (৮৩৬-৪২ খৃঃ) সিংহাসনারোহণ করিয়া তিব্বত দেশ হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের মূলচ্ছেদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বিহার-মন্দিরাদি বিধ্বস্ত হইল; বৌদ্ধগ্রন্থালয়সমূহ ভস্মীভূত হইল; বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগকে গৃহস্থের—এমন কি কোন কোন ভিক্ষুকে কসাইএর জীবন যাপন করিতে বাধ্য করা হইল। সুখের বিষয়, এই অত্যাচার দীর্ঘকালস্থায়ী হয় নাই। সিংহাসন লাভের তিন বৎসর পরেই পল্-দোর্জে নামক একজন লামা বা ভিক্ষু কর্ত্তৃক অত্যাচারী লঙ্-দর্-ম নিহত হন। তাঁহার পক্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের মূলোৎপাটন করা পূর্ণরূপে সম্ভব হয় নাই। কথিত আছে, মৃত্যুকালে তিনি অনুশোচনা করিয়াছিলেন, "আহা, আমি যদি তিন বৎসর আগে মরিতাম, তবে ভাল হইত; কারণ, তাহা হইলে আর এত পাপের কাজ আমাদ্বারা অনুষ্ঠিত হইত না। আবার যদি তিন বৎসর বেশী বাঁচিয়া যাইতাম, তাহা হইলেও ভাল হইত; কারণ এই সময়ের মধ্যে আমি দেশ হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের মূলোচ্ছেদ করিয়া যাইতে পারিতাম।" আশ্চর্য্যের বিষয়, এই নরপতির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তিব্বতে একচ্ছত্র রাষ্ট্রশাসনের অবসান হয় এবং দেশে কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রশক্তির উদ্ভব হয়। ইহার কারণ এই যে আরব এবং চীনের সহিত দীর্ঘকাল যুদ্ধবিগ্রহের ফলে তিব্বতের ক্ষাত্রশক্তি সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়াছিল। (ক্রমশঃ)

সাময়িকী

সরকারের কর্ত্তব্য কি?—

বাঙ্গালার দুর্দ্দশা মোচনে সরকারের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া কলিকাতাস্থ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন বাঙ্গালার গভর্ণরের নিকট নিম্নলিখিত বিষয় জানাইয়াছেন—(১) বর্ত্তমানে গভর্ণমেণ্ট বা বড় কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কোনও খাদ্যশস্য বিশেষতঃ আমন ধান্য ক্রয় করিবেন না। সৈন্যদল ও বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি (যাহাদের অধীনে বহু শ্রমিক কাজ করে) তাহাদের হাতে যদি উদ্বৃত্ত চাউল থাকে তবে তাহা যথাসম্ভব বাজারে বিক্রয় করিয়া দিবার নির্দ্দেশ দিতে হইবে। (২) অবিলম্বে বাঙ্গালা হইতে ধান ও অন্যান্য খাদ্যশস্য চালান দেওয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করিতে হইবে। অন্যান্য স্থান হইতে বাঙ্গালায় খাদ্যশস্য আমদানীর সুব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে। ভারত গভর্ণমেণ্টকে কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চলের অসামরিক জনগণের খাদ্য সরবরাহের ভার লইতে হইবে। (৩) ধান কড়ারী ঋণ বা ধান দাদনের দেনা শোধ করা বন্ধ রাখিবার নির্দ্দেশ দিতে হইবে। (৪) কেবলমাত্র অনুমোদিত ব্যবসায়ীদেরই ধান চাউলের ব্যবসা করিতে দেওয়া হইবে। (৫) উদ্বৃত্ত এলাকা হইতে ঘাটতি এলাকায় ধান চাউল সরবরাহের বন্দোবস্ত করিয়া দিতে হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা—

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার ডাক্তার রাধাকৃষ্ণ গত ২৭শে নভেম্বর কাশীতে এক সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ম্ম-শিক্ষার অভাবের কথা বিশেষভাবে বিবৃত করিয়াছেন। কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে সে ব্যবস্থার প্রয়োজন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। শুধু কাশীতে নহে, ভারতের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে যাহাতে ধর্ম্ম-শিক্ষা একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে, সেজন্য যদি সার রাধাকৃষ্ণণের মত লোক চেষ্টা করেন, তবে হয় ত শীঘ্র সুফল ফলিতে পারে।

পরলোকে সুরাজমোহিনী দেবী—

ভারতবর্ষ পত্রিকার প্রবর্ত্তক ও গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্নী সুরাজমোহিনী দেবী ৮১ বৎসর বয়সে গত ৮ই অগ্রহায়ণ স্বর্গলাভ করিয়াছেন। স্নেহধন্য আমরা তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাইতেছি।



সুরাজমোহিনী দেবী

তথ্য সংগ্রহ ব্যবস্থা—

নারায়ণগঞ্জ হইতে ঢাকা জেলা ন্যাশানাল চেম্বার অফ কমার্সের সেক্রেটারী বর্ত্তমান অন্ন সঙ্কট সম্পর্কিত আবশ্যক তথ্যাদি সংগ্রহ করার জন্য একটি ফরম তৈয়ারী করিয়া ঢাকা জেলার প্রতি গ্রামে ও জনপদের অধিবাসীদের তাহা পূরণ

করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। লোক সংখ্যা পূর্ব্বে কি ছিল, মৃত্যু সংখ্যা, মৃত্যুর কারণ, বর্ত্তমান লোকসংখ্যা, বৃত্তি, কৃষির অবস্থা, রিলিফ কার্য্য প্রভৃতি বিষয়ে তথ্যাদি সংগ্রহ ও সঙ্কলন কার্য্য সংশ্লিষ্ট জেলাবাসীরা সাহায্য করিবেন, আশা করা যায়। ঢাকায় যে ব্যবস্থা হইয়াছে, এই ব্যবস্থা সকল জেলায় প্রবর্ত্তিত হইলে ইহার পর যাঁহারা ইতিহাস রচনা করিবেন, ঐ সকল তথ্য তাঁহাদের উপকারে লাগিবে।

দুর্ভিক্ষের পরবর্ত্তী সমস্যা—

রাষ্ট্রীয় পরিষদে খাদ্য বিতর্ক সভায় খাদ্য সচিব সার জওলা-প্রসাদ শ্রীবাস্তব দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলের পুনর্গঠন ব্যবস্থা সম্পর্কে বলিয়াছেন—"আমরা প্রয়োজন হইলে এই সমস্ত লোককে (দুর্ভিক্ষ পীড়িতকে) গরু বাছুর, তৈজসপত্র, বস্ত্র ও জীবিকা-নির্ব্বাহের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি কিনিবার জন্য ঋণ ও অর্থসাহায্য করিব। দুর্ভিক্ষকালে যাহারা জমিজমা বিক্রয় করিয়াছে তাহারা পুনরায় সামর্থ্যানুযায়ী দীর্ঘকালের কিস্তিবন্দীতে যাহাতে মূল্য দিয়া জমিগুলি ফিরিয়া পাইতে পারে, তাহার জন্য আইন প্রণয়নের প্রয়োজনও হইতে পারে।" ইহা তাঁহার ব্যক্তিগত অভিমত। তবে আমরা আশাকরি, অবিলম্বে ইহা তিনি কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের নীতিতে পরিণত করিতেও সমর্থ হইবেন।

নানাস্থানের অবস্থা—

চট্টগ্রাম—চট্টগ্রাম মিউনিসিপালিটীর ভূতপূর্ব্ব চেয়ারম্যান মিঃ নুর আমেদ এম-এল-সি এখন চট্টগ্রামেই আছেন। তিনি জানাইয়াছেন—চট্টগ্রামের অবস্থার বিশেষ উন্নতি হয় নাই। শীত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অবস্থা খারাপ হইতেছে এবং কলেরা, ম্যালেরিয়া, আমাশয়, শোথ প্রভৃতি রোগের প্রাদুর্ভাব চলিতেছে। কেবল বাঁশ-খালি থানার এলাকাতেই ৫ হাজার লোক কলেরায় মারা গিয়াছে।

পাবনা—পাবনা জেলার সর্ব্বত্র ভীষণ কলেরা দেখা দিয়াছে। বালকুচি থানার তামাই গ্রামে এক হাজার লোক কলেরায় মারা গিয়াছে। কামারখন্দ থানার চৌবাড়ী গ্রামে ১২৫ জন লোক কলেরায় মারা গিয়াছে।

বিক্রমপুর—ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জ মহকুমার মধ্যে বিক্রম-পুর অবস্থিত। তথায় ৯ লক্ষ লোকের বাস। তন্মধ্যে প্রায় এক লক্ষ লোক খাদ্যাভাবে অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে। ৬৮টি ইউনিয়নে মোট ৩৪ হাজার লোক না খাইয়া মারা গিয়াছে। সংক্রামক ব্যাধি দেখা দিয়াছে। শীতে আরও অধিক লোক মারা যাইবে।

নেপাল মহারাজের মহানুভবতা—

নেপালের মহারাজা বাহাদুর তাঁহার দেশের উদ্বৃত্ত ধান ও চাল বাঙ্গালার দুর্গত ব্যক্তিদিগের সাহায্যকল্পে প্রেরণের প্রস্তাব করিয়া বাঙ্গালীমাত্রেরই ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। যাহাতে সেই ধান ও চাল ব্যবসায়ীদের হাতে পড়িয়া অধিক মূল্যে বিক্রীত না হয়, মহারাজা সে বিষয়েও অবহিত আছেন।

পণ্ডিত মণ্ডলীর জন্য দরদ—

দানবীর শ্রীযুত যুগলকিশোর বিরলা তাঁহার পিতা রাজা বলদেবদাস বিরলার নামে বাঙ্গালার টোলের অধ্যাপক ও ধর্ম্মপ্রাণ পণ্ডিতদিগকে ৫০ হাজার টাকা দান করিবেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রীযুত সতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের নিকট আবেদন করিলে ঐ সাহায্যের অর্থ পাওয়া যাইবে। বিরলা ভ্রাতৃগণের দান বাঙ্গালা দেশে সর্ব্বজনবিদিত।

পরলোকে দুর্গাপ্রসাদ খৈতান—

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী দুর্গাপ্রসাদ খৈতান গত ১৯শে নভেম্বর মাত্র ৫১ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। ১৫ বৎসর কলিকাতা হাইকোর্টের সলিসিটারের কাজ করিয়া তিনি ব্যবসায়ে যোগদান করেন ও ব্যবসাক্ষেত্রে অসাধারণ সাফল্যলাভ করেন। তিনি কয়েক বৎসর কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার ছিলেন। শ্রীযুত দেবীপ্রসাদ খৈতান ইঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা।

ভারতের দুর্ভিক্ষে পার্ল বাক—

মিসেস পার্ল বাক বর্ত্তমানে আমেরিকায় নিউইয়র্কে বাস করেন। তিনি তথায় ভারতের দুভিক্ষে সাহায্য কল্পে এক জরুরী কমিটী গঠন করিয়া যাহাতে সত্বর ভারতে খাদ্য প্রেরিত হয়, সেজন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। যুদ্ধে আহতদের জন্য তথায় যে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা হইতে ভারতকে ৫০।৬০ লক্ষ ডলার দিবার জন্যও তিনি অনুরোধ জানাইয়াছেন। মিসেস বাক সাহিত্যিক ও নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন। তাঁহার চেষ্টা হয়ত কতকাংশে সফল হইবে।

ভারতের প্রচারক দল—

২৬শে নভেম্বর লণ্ডন হইতে খবর আসিয়াছে যে ভারত গভর্ণমেণ্ট বৃটীশ জনসাধারণের নিকট ভারতের যুদ্ধ প্রচেষ্টা বিবৃত করিবার জন্য যে ৪জন বেসরকারী প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে ৩জন—সার শ্রীনিবাস শর্ম্মা, মিঃ আর, আর, ভোলে ও মিঃ এম-গিয়াসুদ্দীন লণ্ডনে পৌছিয়াছেন। চতুর্থ ব্যক্তি মিঃ এইচ-জি-মিশ্র অসুস্থ হইয়া পথে কায়রোতে অবস্থান করিতেছেন। এই প্রচারকগণ কে—কি বিষয়ে ইঁহারা প্রচার করিবেন—এ সকল বিষয় ভারতবাসীদের অজ্ঞাত।

কয়লা সমস্যা—

নভেম্বর মাসের শেষভাগে কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় মেয়র সৈয়দ বদরুদ্দোজা জানাইয়াছেন—নভেম্বর মাসে পলতায় পাম্পিং ষ্টেশনের জন্য নির্দ্দিষ্ট ১৭৫ গাড়ী কয়লার মধ্যে মাত্র ১ গাড়ী ও টালার পাম্পিং ষ্টেশনের জন্য নির্দ্দিষ্ট ৯১ গাড়ীর মধ্যে মাত্র ১২ গাড়ী কয়লা এ পর্য্যন্ত আসিয়া পৌছিয়াছে। যুদ্ধের জন্য মালগাড়ীর এরূপ অভাব হইয়াছে—ইহার ফলে কলিকাতায় জল সরবরাহ বন্ধের উপক্রম হইয়াছে।

ভারতীয় দুস্থ শিশুরক্ষা প্রচার সমিতি

জাতির ভবিষ্যৎ যে সব শিশুরা অযত্নে, অনাদরে মরিয়া যাইতেছে তাহাদের রক্ষাকল্পে এই সমিতি গঠিত হইয়াছে। প্রচার সমিতির উদ্দেশ্য জনসাধারণের মনে শিশুদের প্রতি মমতা ও সহানুভূতি উদ্রেক করা—যাহার ফলে দেশের মধ্যে শিশুদের উপযুক্তভাবে খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের জন্য চিরস্থায়ী বাসগৃহ নির্ম্মিত হয়। এই উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যেই যাঁহারা অর্থ, দ্রব্য এবং নানা

ভাবে এই সমিতিকে সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—রায় বাহাদুর শ্রীকিষেণ, মিঃ বি, এ, মলিক, শ্রীমতী প্রতিমা সরকার, শ্রীমান গোপাল গাঙ্গুলী এবং শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, শ্রীমতিলাল রায় প্রভৃতি প্রচার সমিতিকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছেন। সমিতির শীতকালীন প্রচার কার্য্য ইতিমধ্যেই সুরু হইয়াছে। আমরা এই মহৎ উদ্দেশ্যের সাফল্য কামনা করি।

হাওড়া আর্ত্ত সেবাশ্রম—

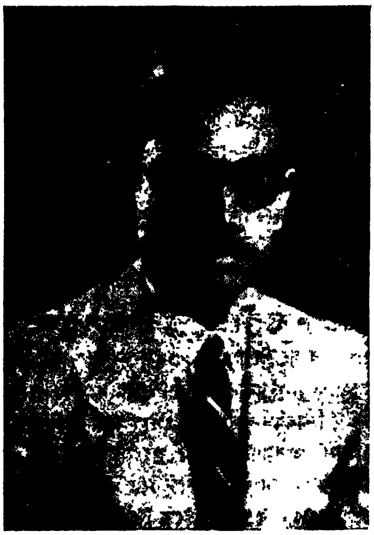
হাওড়া রিলিফ সোসাইটীর কর্ম্মীরা স্থানীয় শান্তি সমাজের পরিচালনাধীনে হাওড়া ১৫৬ সার্কুলার রোডে আর্ত্ত সেবাশ্রম নামে একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তথায় সকালে ও বিকালে সমাগত রোগীদিগের চিকিৎসা করা হয় ও ৩০জন রোগীকে স্থায়ীভাবে রাখার ব্যবস্থা হয়। গত ১৯শে অগ্রহায়ণ ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পৌরহিত্যে উহার উদ্বোধন উৎসব হইয়া গিয়াছে।

মালদহে মহামারী—

মালদহ জেলা বোর্ডের স্বাস্থ্য বিভাগ জানাইয়াছেন যে, গত ১৪ই আগষ্ট হইতে ৩০শে অক্টোবর পর্য্যন্ত জেলার ১৫টি থানায় মোট ২৮৫৫জন লোক কলেরা রোগে মারা গিয়াছে। মালদহ জেলায় ম্যালেরিয়াও প্রবলভাবেই দেখা দিয়াছে।

শ্রীযুত তপেন্দ্রমোহন সেন—

মুর্শিদাবাদ বহরমপুরের উকীল স্বর্গত রায় বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথ সেনের পৌত্র ও রায় বাহাদুর শ্রীযুত রমণীমোহন সেন মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান তপেন্দ্রমোহন সেন বিশেষ অনুমতি লইয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ের



শ্রীতপেন্দ্রমোহন সেন

পূর্ব্বে ফাইনাল এটর্ণী পরীক্ষা পাশ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার কর্ম্মজীবনে সাফল্য কামনা করি।

পরলোকে ডাঃ জিতেন্দ্রনাথ—

সুপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার জিতেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় গত ৩০শে নভেম্বর মধুপুরে ৬৭ বৎসর বয়সে পরলোক-



৺জিতেন্দ্রনাথ মজুমদার

গমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা ব্যথিত হইলাম। তিনি প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং ডাক্তার বিহারীলাল ভাদুড়ীর দৌহিত্র। ১৮৭৬ সালে ৪ঠা জুলাই তাঁহার জন্ম হয়। প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষালাভের পর তিনি আমেরিকায় চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করিতে যান এবং ফিরিবার পথে লণ্ডন ও ভিয়েনা ঘুরিয়া আসেন। ১৯১১ সালে তিনি পুনরায় লণ্ডনে হোমিওপ্যাথিক কংগ্রেসে যোগদান করিতে গিয়াছিলেন। ভারতে হোমিওপ্যাথি প্রচারে তাঁহার অসাধারণ উৎসাহ ছিল। তিনি পিতার নামে হোমিওপ্যাথিক হাসপাতাল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁহার চেষ্টায় হোমিওপ্যাথি সরকারী অনুমোদন লাভ করে। তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং ভাটপাড়ার পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহার চিকিৎসা নৈপুণ্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে 'ভিষগ্-ভারতী' উপাধি দান করেন। নদীয়া জেলার চাপরা গ্রামের প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি ব্রাহ্মণোচিত বহুগুণের অধিকারী ছিলেন।

অন্ধদের জন্য শিক্ষা কেন্দ্র—

শ্রীযুত এস-সি-রায় নামক একজন অন্ধ ছাত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করিয়া 'রাসবিহারী ঘোষ বৃত্তি' লাভ করিয়া পাশ্চাত্য দেশসমূহে অন্ধদিগকে শিক্ষাদান প্রথা শিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন। তিনি ফিরিয়া আসিয়া বর্ত্তমানে ৩৯।এ হরিশ মুখার্জ্জি রোডে একটি বাড়ীতে 'লাইট হাউস্ ফর দি ব্লাইণ্ড' নামক প্রতিষ্ঠান খুলিয়া অন্ধদিগকে শিক্ষাদান করিতেছেন। মিঃ রায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও অধ্যাপকের কাজ করেন। লর্ড

অরুণকুমার সিংহকে সভাপতি এবং অধ্যাপক রায় ও ডাক্তার টি-আমেদকে সম্পাদক করিয়া উক্ত অন্ধশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক সমিতি গঠিত হইয়াছে। অন্ধদিগকে সাধারণ শিক্ষা ছাড়া শিল্প, সঙ্গীত প্রভৃতিও শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। অন্ধদের শিক্ষাদানের জন্য যত অধিক সংস্থা দেশে স্থাপিত হয়, ততই দেশের পক্ষে মঙ্গলের বিষয়। অধ্যাপক রায়ের এই উদ্যোগ সর্ব্বথা প্রশংসার যোগ্য।

প্রতি সপ্তাহে লক্ষ লোকের মৃত্যু—

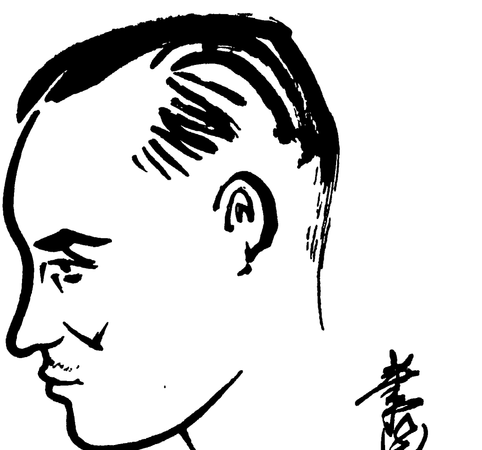
বাঙ্গালা পরিভ্রমণের পর দিল্লীতে ফিরিয়া গিয়া পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু তথায় এক সভায় বলিয়াছেন যে বাঙ্গালা দেশে প্রতি সপ্তাহে এক লক্ষ লোক মারা যাইতেছে। তিনি ভারত সচিব মিঃ আমেরীকে বাঙ্গালা দেশে আসিয়া ২।৩ দিন থাকিয়া দেশের অবস্থা দেখিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন।

পরলোকে হরিপদ কুমার—

গণেশ অপেরা পার্টির মালিক হরিপদ কুমার গত ৪ঠা অগ্রহায়ণ বর্দ্ধমান জেলার দেরিয়াটোন গ্রামে ৫৫ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে যাত্রার দলগুলির বিশেষ ক্ষতি হইল।

শিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন—

খ্যাতনামা চীনা-শিল্পী ও চিত্রকর ইয়ে-চিন-উ সম্প্রতি চুংকিংস্থ জাপানী কবল হইতে নিজেকে উদ্ধার করিয়া কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। কলিকাতাস্থ রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটীতে



শ্রীশৈলজ মুখোপাধ্যায় চিত্র—ইয়ে-চিন-উ

তাঁহার চিত্রেরও একটি প্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে। তাহার পর তিনি গত ১লা ডিসেম্বর কলিকাতা ১নং চৌরঙ্গী টেরাসে শিল্পী শৈলজ মুখোপাধ্যায়ের এক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিয়াছিলেন। তথায় ভারতের লুপ্ত পটশিল্প ও কাশ্মীর দেওয়াল চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছিল।

আরিয়াদহ অনাথ ভাণ্ডার—

কলিকাতা ১০০ ক্লাইব ষ্ট্রীটের গুজরাটী সেবা সমিতি আরিয়াদহ (২৪পরগণা) অনাথ ভাণ্ডারের কার্য্যে প্রীত হইয়া ভাণ্ডারকে এক হাজার টাকা দান করিয়াছেন এবং উক্ত সমিতির সহ-সভাপতি মোহিনী মিলের শ্রীযুত মোহনলাল এন সাহা ভাণ্ডারে ৩০১ টাকা দান করিয়াছেন। বেঙ্গল রিলিফ কমিটী সুলভে ও বিনামূল্যে বিতরণের জন্য ভাণ্ডারে ১৬০ মণ চাউল ও ডাল এবং দুগ্ধ বিতরণের জন্য ১০০ টাকা নগদ দান করিয়াছেন।

প্রজ্ঞাভারতী—

বাঙ্গালার যুবক যুবতীবৃন্দের পরস্পরের মধ্যে জ্ঞানের আদান প্রদান ও প্রচারের উদ্দেশ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর কালিদাস নাগকে সভাপতি ও শ্রীযুত সমর বসুকে সম্পাদক করিয়া ৭২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে 'প্রজ্ঞাভারতী' নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও গত ৫ই ডিসেম্বর তাহার উদ্বোধন উৎসব হইয়া গিয়াছে। ডক্টর নাগের মত গবেষক পণ্ডিতের নেতৃত্বে যদি একদল যুবক নানা বিষয়ে গবেষণায় ব্রতী হন, তাহা হইলে তাঁহাদের কার্য্যের দ্বারা দেশ উপকৃত হইবে।

বাঙ্গালায় আগাছা—

বাঙ্গালা দেশে ৪ হাজার ২শত ৬৯ বর্গ মাইল পরিমিত জমী আগাছায় আবৃত। প্রতি বৎসর ঐ আগাছা অঞ্চলগুলি হইতে কম পক্ষেও ৫০ লক্ষ ৫০ হাজার টন শুষ্ক কচুরীপানা পাওয়া যাইতে পারে। কচুরীপানায় প্রচুর পরিমাণ নাইট্রোজেন ও পোটাসিয়াম ক্লোরাইড এবং যথেষ্ট ফসফেট রহিয়াছে। কচুরীপানার ছাই চাষাবাদের পক্ষে চমৎকার সার।

চট্টগ্রামে মৃত্যুর হিসাব—

গত জুন মাসের প্রথম সপ্তাহ হইতে অক্টোবরের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত চট্টগ্রাম মিউনিসিপাল এলাকায় মোট ২৬৫৯জন লোক মারা গিয়াছে। গত বৎসর ঐ সময়ে মাত্র ৩৬৫জন লোক মারা গিয়াছিল। কক্সবাজার মহকুমার কুতুবদিয়া দ্বীপে মোট ৪২ হাজার লোকের বাস; গত অক্টোবরের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত তথায় কয় মাসে মোট ১০ হাজার লোক মারা গিয়াছে।

পরলোকে রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ—

দীর্ঘকাল রোগভোগের পর খ্যাতনামা শিক্ষাব্রতী রিপণ কলেজের প্রিন্সিপাল রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ মহাশয় প্রায় ৫৫ বৎসর বয়সে গত ৬ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় পরলোকগমন করিয়াছেন। ছাত্র জীবনেই তিনি অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দেন ও জাতীয় শিক্ষা পরিষদে যোগদান করিয়া কিছুকাল তথায় শিক্ষকতা করেন —পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে তিনি রিপণ কলেজে আসেন এবং ক্রমে তাহার ভাইস প্রিন্সিপাল ও প্রিন্সিপাল হন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও অধ্যাপনা করিতেন। তিনি নিজে পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার অধ্যাপনা তাঁহাকে বিশেষ জনপ্রিয় করিয়াছিল। তাঁহার মত শিক্ষাব্রতীর এদেশে ক্রমেই অভাব হইতেছে।

পরলোকে ডাক্তার সুরেশচন্দ্র—

২৪পরগণা গোবরডাঙ্গা নিবাসী ডাক্তার সুরেশচন্দ্র মিত্র গত ১০ই অগ্রহায়ণ পরিণত বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি



৺সুরেশচন্দ্র মিত্র

সরকারী চাকরী ত্যাগ করিয়া আজীবন গ্রামে থাকিয়া দেশের ও দশের সেবা করিয়া গিয়াছেন। তিনি স্থানীয় মিউনিসিপালিটীর ভাইস চেয়ারম্যান, যমুনা নদী সংস্কারের প্রধান উদ্যোক্তা, হাই স্কুলের সেক্রেটারী প্রভৃতির কার্য্যে বহু বৎসর নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার বহু রচনা ভারতবর্ষ, অর্চনা, ব্রহ্মবিদ্যা, স্বাস্থ্য-সমাচার প্রভৃতি পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। গোবরডাঙ্গা মিউনিসিপালিটীর ভূতপূর্ব্ব চেয়ারম্যান, বিষাণ সম্পাদক শ্রীযুত প্রবোধচন্দ্র মিত্র তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র।

মফঃস্বলে ধানের দাম—

বেঙ্গল রিলিফ কমিটীর সেক্রেটারী শ্রীযুত ভগীরথ কানোরিয়া সম্প্রতি ২৪পরগণা জেলার ডায়মণ্ডহারবার মহকুমা ও মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমা ঘুরিয়া আসিয়া জানাইয়াছেন যে ঐ সকল স্থানে কৃষকগণ ৫ টাকা ৬ টাকা মণ দরে ধান বিক্রয় করিতেছে। তাহাদের অভাবের তাড়না এত অধিক যে তাহাদের পক্ষে অধিক দামের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকা সম্ভব নহে বলিয়াই তাহারা যে কোন দামে ধান বিক্রয় করিতে বাধ্য হইতেছে। গভর্ণমেণ্ট যদি ঐ সকল ধান উপযুক্ত মূল্য দিয়া কিনিবার ব্যবস্থা করেন, তবেই চাষীরা রক্ষা পাইবে, নচেৎ আবার তাহাদিগকে শীঘ্রই দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে হইবে।

ম্যালেরিয়া ও কুইনাইন—

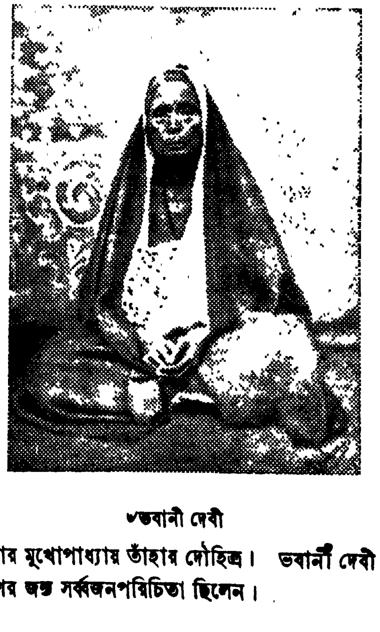
এবার বাংলা দেশে ম্যালেরিয়া যেরূপ ভীষণভাবে দেখা দিয়াছে, ম্যালেরিয়ার সেরূপ ভীষণতা পূর্ব্বে বহুদিন দেখা যায় নাই। খাদ্যাভাবে শীর্ণ লোকের পক্ষে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হওয়া যে স্বাভাবিক, তাহা কাহারও অজ্ঞাত নহে। গত জানুয়ারী হইতে সেপ্টেম্বর এই ৯ মাসে শুধু ফরিদপুর জেলায় ম্যালেরিয়ায় ৩০ হাজার লোক মারা গিয়াছে। গভর্ণমেণ্ট সেজন্য নভেম্বর মাসের শেষ ১৫ দিনে ঢাকা, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, বগুড়া, পাবনা, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, রাজসাহী, নোয়াখালি, ত্রিপুরা, ২৪পরগণা, হুগলী ও জলপাইগুড়ী কয়টি জেলায় ২৪ হাজার পাউণ্ড কুইনাইন পাঠাইয়াছেন। আগামী ৩ মাসে আরও ৩০ হাজার পাউণ্ড কুইনাইন প্রদান করা হইবে। ব্যবসায়ীদের হাতে পড়িয়া কুইনাইনের দর অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে—যাহাতে লোক সুলভে কুইনাইন পায়, গভর্ণমেণ্ট সে জন্যও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিতেছেন।

একতাই সর্ব্বাধিক প্রয়োজন—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার প্রসিদ্ধ জননায়ক ডাক্তার শ্রীযুত বিধানচন্দ্র রায় গত ২৭শে নভেম্বর এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেসন উৎসবে বক্তৃতা করিতে যাইয়া ভারতের জনসাধারণের মধ্যে ঐক্যের প্রয়োজনের কথা বিশেষ ভাবে বলিয়া আসিয়াছেন। তিনি বলেন "পুরাকাল হইতে প্রয়াগ সহর সকলের একটি মিলন ক্ষেত্ররূপে ব্যবহৃত হইয়াছে; সেইজন্য এই প্রয়াগ হইতেই সর্ব্বভারতীয় মিলনের বাণী প্রচারিত হওয়া প্রয়োজন। আজ সকল ভারতবাসীকে সকল প্রকার বিভেদ ভুলিয়া নিজ কর্ত্তব্য পালনে ঐক্যবদ্ধ হইয়া কাজ করিতে হইবে।" ডাক্তার রায়ের এই বাণী ভারতের গৃহে গৃহে প্রতিধ্বনিত হউক, ইহাই আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি।

পরলোকে ভবানী দেবী—

হুগলীর সরকারী উকীল স্বর্গত শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্নী ভবানী দেবী গত ১২ই কার্ত্তিক পরিণত বয়সে পরলোক-গমন করিয়াছেন। বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের রাজস্ব বিভাগের সেক্রেটারী শ্রীযুত সত্যেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় আই-সি-এস তাঁহার পুত্র এবং কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি ডক্টর



৺ভবানী দেবী

বিজনকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁহার দৌহিত্র। ভবানী দেবী তাঁহার নানা গুণের জন্য সর্ব্বজনপরিচিতা ছিলেন।

মজুতদার ও মুনাফাখোর—

"পঞ্চাশের মন্বন্তর" সংঘটনের যে সকল কারণ দেওয়া হইয়াছে, তাহার জন্য মজুতদার ও মুনাফাখোর অনেকাংশে দায়ী বলিয়া মিঃ আমেরি হইতে অপরাপর রাজকর্ম্মচারীরা বলিয়া থাকেন। যাঁহারা এবারকার দুর্ভিক্ষের সংবাদ রাখেন তাঁহারা সকলেই একথা মানিয়া লইবেন। যাঁহারা প্রভূত মাল মজুত করিয়া পরে অধিক মুল্যে মাল ক্রয় করা হইতে আত্মরক্ষা করিতে গিয়া আকস্মিকরূপে বাজারে দ্রব্যাদির মূল্য চড়াইয়া দেন বা মাল বেশী মাত্রায় ধরিয়া অত্যধিক চড়া মূল্যে বিক্রয় কবিয়া লাভবান্ হইতে গিয়া লোকের জীবননাশের কারণ হন, সাধারণতঃ তাঁহারা সমাজের শত্রুরূপে পরিগণিত হইয়া থাকেন। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রকাশ, রেল কোম্পানী তাহাদের বিপুল সংখ্যক কর্ম্মচারিদিগের জন্য এককালীন ৪২ দিনের মাল মজুত করিয়াছিলেন, তাহা ছাড়া বড় বড় সকল কারবারই বহু পরিমাণ মাল জমাইয়াছিলেন। ইহার উপর বাঙ্গালা সরকার পঞ্চনদের গম বিক্রয় করিয়া ৩৬ লক্ষ এবং গমজাত দ্রব্যাদি হইতে সাড়ে ৬ লক্ষ টাকা এবং কেন্দ্রীয় সরকার এইভাবে এক কোটী টাকা লাভ করিয়াছেন। এই দুই সরকার একই সময় লাভের লোভ ত্যাগ করিলে আন্দাজ আড়াই হইতে তিন টাকা মণ পিছু আটা ময়দার দাম কম পড়িত; প্রতি সের আটা ময়দা পাঁচ পয়সা আরও সস্তা হইলে আরও অধিক লোক কিনিয়া খাইয়া জীবন ধারণ করিতে পারিত। দারুণ আকালের সময় যে কাজের জন্য সাধারণ লোককে অপরাধী করা প্রয়োজন, সেইরূপ কাজে সরকারী বা আধা সরকারী প্রতিষ্ঠান লিপ্ত হইলে সাধারণ দুর্ব্বৃত্তদিগকে শাসনে রাখা কষ্টকর।

অধিক খাদ্য শস্য উৎপাদন—

গত ২৭শে নভেম্বর শনিবার কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রচার বিভাগের উদ্যোগে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে অধিক খাদ্য শস্য উৎপাদন বিষয়ে এক প্রদর্শনী খোলা হইয়াছে। কুচবিহারের মহারাজা উক্ত প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিয়াছেন। সহরের অধিবাসীদিগকে খাদ্য শস্য ও শাকসব্জী চাষের প্রয়োজনের কথা প্রদর্শনীতে বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছে। বর্ত্তমান বৎসরে লোককে খাদ্য সম্বন্ধে যে দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হইয়াছে, ভবিষ্যতে যাহাতে আর তাহা করিতে না হয়, এই প্রদর্শনী সেই শিক্ষা দিবার জন্যই খোলা হইয়াছে। শ্রীযুত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী ইহার ব্যবস্থা করিয়া সকলের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

কলিকাতায় খাদ্য সরবরাহ—

ভারত গভর্ণমেণ্ট ১৯৪৪ সালে বৃহত্তর কলিকাতার অধিবাসীদিগকে খাওয়াইবার জন্য মোট ৬ লক্ষ ৪৬ হাজার টন খাদ্য বাহির হইতে কলিকাতায় প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রথম তিন মাসে ২লক্ষ টন খাদ্য শস্য বাঙ্গালায় প্রেরিত হইবে। বাঙ্গালা দেশে প্রতি বৎসর গড়ে ৮০লক্ষ টন খাদ্য শস্য উৎপন্ন হয়। আগামী বৎসর বাঙ্গালায় এক কোটি টন খাদ্য শস্য উৎপন্ন হইবে বলিয়া আশা করা যায়। যদি উৎপাদন বৃদ্ধি পায় ও ভারত গভর্ণমেণ্ট ব্যবস্থা মত খাদ্য সরবরাহ করেন তাহা হইলে ১৯৪৪এর শেষে বাঙ্গালায় খাদ্য শস্যের মূল্য পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে।

দুর্ভিক্ষের শিক্ষা—

পঞ্চাশের মন্বন্তর কলিকাতাবাসীর চক্ষুর সম্মুখ হইতে অন্তর্হিত হইলেও পল্লী অঞ্চলে সম্পূর্ণরূপে বিরাজ করিতেছে। লোকে কিছু কিছু আহার্য্য হয়ত পাইতেছে, কিন্তু কলেরা, জ্বর, আমাশয় প্রভৃতি রোগ সপ্তাহে অন্ততঃ একলক্ষ লোকের জীবন নাশ করিতেছে। এ অবস্থা আরও কতদিন চলিবে নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। আশঙ্কা হয়, পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ "একান্ন সালের" সহিত যুক্ত হইয়া যাইবে। এখনও পর্য্যন্ত তাহা নিবারণের বিশেষ কোনও লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই। চাউল ছিল না, তাহার সমস্যা লইয়াই গভর্ণমেণ্ট বিব্রত ছিল; এখন যাহা হউক চাউল হইয়াছে, তাহার কি ব্যবস্থা হয় তাহা লইয়া এখন গভর্ণমেণ্ট প্রচারকার্য্যে ব্যস্ত। কিন্তু প্রকৃত অভাব কেবল চাউলের নয়, আরও সকল ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি অগ্নিমূল্যে বিক্রীত হওয়ায় লোক দ্রুত নিঃস্ব হইয়া পড়িতেছে, চাউল পাওয়া গেলেও চড়া দামে কিনিয়া খাইবার শক্তি থাকে না। ইহার কারণ অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। শ্রদ্ধেয় রমেশ দত্ত মহাশয় দুর্ভিক্ষের কতকগুলি কারণ দিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে জমির অতিরিক্ত রাজস্ব অন্যতম কারণ বলিয়া গিয়াছেন: সম্প্রতি প্রকাশিত শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রকাশিত "১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষ "(The Famine of 1770)" হইতে "ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের" পটভূমিকায় এই রাজস্ব আদায় ও অন্যান্য অর্থ-নৈতিক অব্যবস্থা কি ভাবে নিহিত ছিল, তাহা জানিবার সুযোগ হইয়াছে। এই জাতীয় পুস্তকাদি পাঠের বিশেষ প্রয়োজন আছে। বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ লইয়া যে সকল প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতে দেখা যায়, যদি গভর্ণমেণ্ট পূর্ব্ব পূর্ব্ব দুর্ভিক্ষের ভুলগুলি দূর করিতে চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে এই মহামারী সংঘটিত হইত না। বাঙ্গালায় চাউল হইয়াছে বলিয়া আশ্বস্ত বা নিশ্চিন্ত হইবার কারণ নাই, পারিপার্শ্বিক অবস্থার যে-সকল সমন্বয় বর্ত্তমান, তাহাতে আগামী বৎসরের জন্যও যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ আছে।

শ্রীযুত জয়াকরের উপদেশ—

সমগ্র জাতির প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া যাহাতে প্রত্যেকটি পুরুষ, নারী ও শিশুকে তাহার পরিপূর্ণ বিকাশ ও উন্নততর জীবনযাপনে সাহায্য করা যায়, সেই উদ্দেশ্যেই ভারতের জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনা রচনা করিতে হইবে—পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেসন উৎসবে গত ২৬শে নভেম্বর সুবিখ্যাত জননেতা ও আইনজীবী শ্রীযুত মুকুন্দরাম জয়াকর উপরোক্ত কথাগুলি বলিয়াছেন। মহাযুদ্ধের পর যদি জাতির হাতে আত্মনিয়ন্ত্রণের ভার আসে, তখনই এই সকল কথা বিবেচনার সুযোগ হইবে। নচেৎ এই উপদেশ প্রদান—অরণ্যে রোদন মাত্র।

শিক্ষকবৃন্দের আবেদন—

জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির দরুণ সরকারী ও বেসরকারী সকল প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মচারীদেরই মাগ্‌গী ভাতা ও নির্দ্দিষ্ট মূল্যে খাদ্য প্রদানের ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু শিক্ষকগণকে সেরূপ কিছু

দিবার কোন ব্যবস্থাই এ পর্য্যন্ত হয় নাই। সেজন্য বাঙ্গালার দুর্গত শিক্ষকগণের পক্ষ হইতে গভর্ণরের নিকট এক আবেদন করা হইয়াছে। শিক্ষকগণের এই দাবী পূর্ণ করিবার শক্তি গভর্ণমেণ্ট ছাড়া আর কাহারও নাই। কাজেই গভর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে অবহিত থাকা পূর্ব্ব হইতেই কর্ত্তব্য ছিল। যাহা হউক, আমাদের বিশ্বাস বিলম্বে হইলেও এখন গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে ব্যবস্থায় মনোযোগী হইবেন।

ছাত্রের সাফল্য—

শ্রীযুত অরুণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গত এম্-এ পরীক্ষায় ইতিহাসে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার



শ্রীঅরুণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

করিয়াছেন। তিনি আই-এ এবং বি-এ পরীক্ষায়ও প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি বিক্রমপুর নিবাসী শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্র এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও সিটি কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রীযুত অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ, পি-আর-এস্ মহাশয়ের ভ্রাতা।

হিন্দু মিশনের অনাথাশ্রম—

হিন্দু মিশন মেদিনীপুর জেলার কাঁথিতে ৩ হইতে ৬ বৎসর বয়স্ক ৫০টি শিশু রাখিবার জন্য একটি অনাথাশ্রম খুলিয়াছেন। তাঁহারা কাঁথি মহকুমার সাতমাইলের নিকটস্থ বাসুদেবপুর গ্রামে আর একটি আশ্রমে গর্ভবতী স্ত্রীলোক ও শিশুদিগকে রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টি—

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট, মিঃ চার্চ্চিল ও মার্শাল ষ্টালিন তেহারাণে মিলিত হইয়া জার্ম্মাণ সমরশক্তি ধ্বংস ও শীঘ্র জয়লাভ করিবার জন্য দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির পরিকল্পনা স্থির করিয়াছেন। তাঁহারা প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে আক্রমণের মাত্রা বৃদ্ধি করা হইবে। পূর্ব্ব ও দক্ষিণ হইতে নূতন আক্রমণের সঙ্গে দ্বিতীয় রণক্ষেত্র সৃষ্টি হইবে। ২৭শে নভেম্বর হইতে ৫ই নভেম্বর পর্য্যন্ত তেহারাণে ত্রিশক্তি বৈঠক চলিয়াছিল। শেষে সকলে মিলিয়া উপরোক্ত ঘোষণার সঙ্গে জানাইয়াছেন—আমাদিগের জাতিগুলি যুদ্ধ ও শান্তির সময় একযোগে কাজ করিবে।

আসামেও ভীষণ দুরবস্থা—

বাঙ্গালার ন্যায় আসামও দুর্ভিক্ষ পীড়িত হইয়াছে এবং শ্রীহট্ট জেলাতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুর্গতি উপস্থিত হইয়াছে। ঐ জেলায় বানিয়াচঙ্গ গ্রামে মৃত্যুসংখ্যা ৭ হাজারেরও অধিক। ম্যালেরিয়াও ভীষণভাবে দেখা দিয়াছে। বাঙ্গালা হইতে সাহায্য পাঠাইবার জন্য মৌলবী এ-কে-ফজলল হক, কিরণশঙ্কর রায়, হুমাউন কবীর ও সুন্দরীমোহন দাস এক আবেদন প্রচার করিয়াছেন।

মর্ম্মর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা—

গত ৬ই ডিসেম্বর সকালে কলিকাতা নিমতলা শ্মশান ঘাটে স্বর্গত দেশনায়ক সার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি আবক্ষ মর্ম্মর মূর্ত্তির আবরণ উন্মোচন করা হইয়াছে। বিকালে তাঁহার স্মৃতি সভাও হইয়াছিল। সভায় বিচারপতি চারুচন্দ্র বিশ্বাস, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সনৎকুমার রায়-চৌধুরী, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, নরেন্দ্রকুমার বসু প্রভৃতি বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

শিল্পীর কৃতিত্ব—

প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী শ্রীমান পান্না সেন ১৯৪৩-৪৩ সালের নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মিলনের সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় বাউল ও পুরাতন



শ্রীপান্না সেন

বাংলা গানে প্রথম, ভজন, রবীন্দ্র সঙ্গীত ও গজলে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া বহু পদক লাভ করিয়াছেন।

অধ্যাপকের গবেষণা—

বর্ত্তমানে নানা জাতির বহু নির্ব্বাসিত অধ্যাপক নিউ ইয়র্ক সহরে থাকিয়া গবেষণা কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। আমীর আব্বাস ফারোখী নামক প্রসিদ্ধ অধ্যাপক বর্ত্তমানে তথায় থাকিয়া নিজ গবেষণাবলী লিপিবদ্ধ করিতেছেন।



অধ্যাপক আব্বাস ফারোখী

প্রাচ্য বাণী-মন্দির—

প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী ডক্টর রমা চৌধুরী সম্প্রতি "প্রাচ্য বাণীমন্দির" নামক একটী নূতন গবেষণাগার স্থাপিত করিয়াছেন। ডক্টর বিমলাচরণ লাহা এ গবেষণালয়ের কার্যকরী সভার সভাপতি। এ গবেষণাগার স্থাপনের সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য সংস্কৃত সাহিত্যের বহুল প্রচার। সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে গবেষণা বিষয়ে ছাত্রদের সর্ববিধ সুযোগ প্রদান এবং শিক্ষা দান এ গবেষণালয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য। প্রাচ্য বাণীমন্দিরে প্রতি মাসে অন্ততঃ একটী আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হইবে এবং প্রথিতযশা মণীষিবৃন্দ ভারতীয় সংস্কৃতিমূলক কোনও বিষয়ে বক্তৃতা বা প্রবন্ধ পাঠ করিবেন। ভারতীয় সংস্কৃতি বিষয়ে অনুরক্ত ব্যক্তিমাত্রেই এ গবেষণালয়ের সভ্য হইতে পারিবেন। এ গবেষণাগারের গ্রন্থাবলী ইংরাজী, সংস্কৃত ও বাংলা—এ তিন সিরিজে প্রকাশিত হইবে। বাংলায় সর্বসাধারণের সুখপাঠ্য সংস্কৃতবিষয়ক গ্রন্থও প্রকাশিত হইবে। এ গবেষণালয়ের প্রথম আলোচনা সভায় মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথ তর্কবেদান্ততীর্থ মহাশয় সভাপতি এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতবিভাগের প্রধানাধ্যাপক ডক্টর সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় বক্তা ছিলেন।

ভারতে তাঁতের কাপড়—

স্বাভাবিক সময়ে ভারতবর্ষে ২ শত কোটি গজ কাপড় তাঁতে প্রস্তুত হইত। এই উৎপাদন ভারতের প্রয়োজনের তিন ভাগের এক ভাগ। মোট প্রয়োজন ৬ শত কোটি গজ বলিয়া ধরা হইয়াছে।

বাঙ্গালায় চিনির চাহিদা—

চিনি শিল্পে বাঙ্গালার অবস্থা আদৌ সন্তোষজনক নহে। বাঙ্গালা দেশে বৎসরে যে পরিমাণ চিনির কাটতি হয় তাহার শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ মাত্র বাঙ্গালা দেশে তৈয়ারী হয়। বাঙ্গালায় বৎসরে প্রায় ১ লক্ষ ৫০ হাজার টন চিনি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বাঙ্গালার চিনির কলগুলিতে মাত্র ৫০ হাজার টন চিনি প্রস্তুত হয়।

তাঁতশিল্পীদের সাহায্য দান—

কলিকাতার সূতা ব্যবসায়ী সমিতি তাঁতীদের সাহায্যের জন্য কয়েকটি জেলায় ৩ গাঁট সূতা বিতরণ করিয়াছেন। তাহা ছাড়া তাঁতীদিগকে নগদ ৮৭৫০ টাকা ও ২০০০ টাকা মূল্যের বস্ত্র দান করা হইয়াছে।

চীনের কয়েকটী প্রদেশে দুর্ভিক্ষ—

চীনের হোনান, কোয়াটাঙ, চেকিয়াঙ, শাণ্টাঙ ও হেই প্রদেশে ভীষণ আকারে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। কোন কোন এলাকায় ক্ষুধার তাড়নায় চীনারা জাপ অধিকৃত অঞ্চলে চলিয়া গিয়া দাসত্বের বিনিময়ে অন্নসংগ্রহ করিতেছে।

বেলডাঙ্গায় ভীষণ ম্যালেরিয়া—

মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গা থানায় গত অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে প্রায় ২ হাজার লোক ম্যালেরিয়ায় ও ৪শত লোক কলেরায় মারা গিয়াছে। শুধু আন্দুলবেরিয়া ইউনিয়নে এক হাজার লোক বিভিন্ন প্রকার জ্বরে আক্রান্ত হইয়াছিল।

ডায়মণ্ডহারবারে সাহায্য দান—

২৪পরগণা জেলার ডায়মণ্ডহারবার মহকুমায় গভর্ণমেণ্ট দুস্থদিগকে সাহায্য দানের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের কাজ দিতেছেন; দক্ষিণস্থ কয়েকটি গ্রামে লবণ প্রস্তুত করাইয়া সেই লবণ ক্রয় করা হইতেছে। খাদ্য ও অন্যান্য উপকরণ দিয়া ধান ভানা, সূতা কাটা, কাপড় বুনা, ঝুড়ি তৈয়ারী, দড়ি প্রস্তুত, মাদুর বোনা প্রভৃতি কাজ করান হইতেছে।

আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ স্মৃতি রক্ষা—

আচার্য্য সার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের স্মৃতি রক্ষা করিবার জন্য সম্প্রতি কলিকাতায় একটি কমিটী গঠিত হইয়াছে—সার প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত প্রভৃতি তাঁহার একখানি জীবনী লিখিবার ও তাঁহার স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করিতে মনোযোগী হইয়াছেন।

মুন্সীগঞ্জের দুরবস্থা—

২রা ডিসেম্বর পর্য্যন্ত মুন্সীগঞ্জ মহকুমায় বিভিন্ন রোগে ও অনাহারে ৫০ হাজারেরও অধিক লোক মারা গিয়াছে। তথায় এক লক্ষ লোক ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়াছে। নানাস্থানে কলেরা ও বসন্ত রোগ ব্যাপকভাবে দেখা দিয়াছে।

পরীক্ষার্থীদিগকে সুবিধা দান—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ স্থির করিয়াছেন যে ১৯৪৪ সালের আই-এ ও আই-এস-সি পরীক্ষার কোন বিজ্ঞানের প্র্যাকটিকাল পরীক্ষা গৃহীত হইবে না। এ ব্যবস্থায় বহু পরীক্ষার্থী উপকৃত হইবে বটে, কিন্তু পরীক্ষার দিনগুলি পিছাইয়া দিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট যে আবেদন করা হইয়াছিল, তাহার ফল এখনও প্রকাশিত হয় নাই।

পথ্যাপথ্য বিচার

শ্রীজীবনময় রায়

মাছ, মাংস যাঁরা খান—

-মাছ মাংস যাঁরা খান না তাঁদের কথা ভাদ্রের ভারতবর্ষে বলেছি। এবার মাছ মাংস যাঁরা খান তাঁদের পথ্যের কথা বলি। এ কথা আগের বারেই বলেছি যে মাছ বা মাংস হজম না হ'লে দুধ খাওয়ান উচিত নয়। তাতে আমাদের অজানতে একটু একটু ক'রে বদ-হজমের রোগ এসে পড়ে। প্রথম প্রথম তা ধরা পড়ে না; কেননা আমাদের ভিতরে যে ক্ষমতা আছে তা আমাদের শরীরের সব রকম শত্রুর সঙ্গে সব সময় লড়াই ক'রে চলেছে। সিংহী যেমন শত্রুর হাত থেকে নিজের ছানাদের বাঁচাবার জন্যে নিজের সমস্ত শক্তি সমস্ত তেজ দিয়ে শেষ পর্য্যন্ত লড়াই করে, শত্রুর শক্তি যদি তেমন বেশী হয় তখন মরে তবু ছানাদের বাঁচাবার জন্যে লড়াই করতে করতে মরে, তেমনি আমাদের শরীরের ভিতর এমন একটা শক্তি আছে যে, সমস্ত রোগ কিম্বা আমাদের শরীরের উপর সব রকম অত্যাচারের সঙ্গে সে লড়াই করছে। তার নাম দেওয়া যাক শক্তি-মা। রোগ যদি তেমন তেমন বেশী হয়, কিম্বা আমরা শরীরের উপর না-জেনে, কিম্বা ইচ্ছে ক'রে যদি এমন অত্যাচার করি যা থেকে আমাদের রক্ষা করা সেই শক্তি-মাএর ক্ষমতায় কুলায় না; তবু সে মরবার আগে পর্য্যন্ত সিংহ বিক্রমে লড়াই করতে করতে মরে। আমাদের শরীরের অজানা জায়গায় যখন এই লড়াই চল্‌তে থাকে তখন আমরা অনেক সময় জান্‌তেও পারি না যে শরীরে শত্রু ঢুকেছে—তারা একটু আধটু জান্‌লা দরজা ভাঙ্গচুর করছে! কেননা এই শক্তি-মার যে সব ওস্তাদ মিস্ত্রী আছে তারা চট্‌পট্‌ এই শক্তি-মার হুকুমে মালমসলা তৈরী ক'রে সেই সব ভাঙ্গা-চোরা মেরামত ক'রে ফেলে। তাই আমরা যখন নিজের শরীরের উপর ছোটখাট অত্যাচার করি তখন অনেকদিন পর্য্যন্ত আমরা জান্‌তেই পারি না যে নিজেদের কি ক্ষতি করছি—কেননা ঐ সব মিস্ত্রী নিজেরাই তাড়াতাড়ি সেই মেরামত ক'রে দেয়। কিন্তু তাদেরও ত নিজের নিজের বাঁধা কাজ আছে? সেই কাজের উপর এই সব মেরামতি কাজের জন্যে তাদের উপরি খাটুনী হয়। তাতে তারা একটু একটু করে হয়রাণ হ'য়ে অকেজো হ'য়ে পড়ে। তখুনি অসুখ আমাদের উপর জোর করে। আর আমাদের শরীর ভাঙ্গতে থাকে। কত লোকের যে বদহজম, অম্বল, গলা বুক জ্বালা, পেটে বাতাস, দাস্ত অপরিষ্কার এই রকম কত জিনিষ জোয়ান বয়স যেতে না যেতে সুরু হয় তা ত' গুণে শেষ করা যায় না। তার মানেই তাঁরা সকলে অপথ্য করেছেন অনেক দিন ধরে; মানে খাওয়া-দাওয়া চলা ফেরায় যে নিয়ম মানা উচিত ছিল, তা মানেন নি। যাই হোক এই সব জন্যেই, যাকে শাস্ত্রে, মানে কবিরাজী শাস্ত্রে, বলে বিরুদ্ধ-ভোজন (কি না, যে জিনিষের সঙ্গে যা খাওয়া চলে না এমন খাওয়া) তা করলে অসুখ এক সময় হবেই। তাই মাছ মাংস কিম্বা দুধ এদের মধ্যে একটা হজম না হ'লে আর একটা খাওয়া চলে না। এইখানে বিরুদ্ধ ভোজনের মোটামুটি একটা ফর্দ দিয়ে দিচ্ছি। সেই মত খাওয়া দাওয়া করলে রোগজ্বালা কম হবে, আর রুগীরও কোনো কষ্ট হবে না। কেন না তাতে হজমটা হবে ভালই; আর সব সময় মনে রাখতে হবে যে হজমটা ঠিক থাকলেই আমাদের শরীরের মিস্ত্রীরাও পেটভরে খেতে পায়—আর রোগের সঙ্গে লড়াই ক'রে মেরামতের কাজটা ভালভাবেই চালাতে পারে। আর তখন আমাদের সেই শক্তি-মা সব অসুখ সারিয়ে তোলবার সময় পান। এখন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রমতে যে যে জিনিষের সঙ্গে যে যে জিনিষ খাওয়া চলে না তার মধ্যে কিছু কিছু বল্‌ছি। কেন চলে না, তার কথা বিশেষ কিছু বলবার দরকার নেই; কেননা আমি ত এখানে ডাক্তারি বা কবিরাজি শাস্ত্র শেখাচ্ছি না, আমি যে রকম পথ্য আমাদের উপকারী আর যে রকম উপকারী নয় সেইগুলো জানিয়ে দিতে চাই। অল্প একটু কারণও জানাতে চেষ্টা করব।

	পথ্য	বিরুদ্ধ	কেন?
১।	মাছ কিংবা মাংস	দুধ	দুধ আর মাংস দুইই মধুর রস কিন্তু ঠাণ্ডা, আর মাংস গরম তাদের সঙ্গে মিশালে বিরুদ্ধ হয়।
২।	মূলা, রসুন, তুলসী, সজনে টজনে এই সব পাতা শাক	দুধ	অনেক কাল পরখ ক'রে দেখা গেছে যে এই রকম খেলে পরে চর্ম্ম রোগ এমন কি কুষ্ঠ পর্য্যন্ত হইতে পারে।
৩।	সব রকমের টক্ জিনিষ আর বিশেষ ক'রে কুমড়া,টক লেবু, গোড়া লেবু, মাদার, করমচা, কেওড়া, চালতা, কৎবেল, তেঁতুল, আমলকী, ডালিম, কুড়তি কলাই, মাষকলাই, মোচা, কালো জাম, নারকেল	দুধ	একটু একটু ক'রে বদ-হজম রোগ হয়—যাকে বলে ডিসপেপসিয়া।
৪।	পায়স	ঠাণ্ডা জল	কফ বাড়ে
৫।	পুঁই শাক	তিল বাটা	আমাশা হয়
৬।	গরম গরম খেয়ে বা পান ক'রে	ঠাণ্ডাজল খেলে	হজমের ব্যাঘাত হ'তে হ'তে ক্রমে
৭।	মাছ	দুধ, মধু, ঘি	ডিসপেপসিয়ার
৮।	মধু	বৃষ্টির জল মাছ	
৯।	দই	গরম জিনিষ,	
১০।	ঘোল	বেল কলা	
১১।	ঘি	১০ দিন কাঁসার বাসনে থাকলে	বিষাক্ত হয়
১২।	ভাত, তরকারী, পাচন	জুড়োবার পর আর একবার গরম করলে	

১৩। দই দুধ ঘোল একসঙ্গে খেলে
১৪। অনেক রকম মাংস কলা
১৫। মাংস, মাছ, মূলো, পদ্মের ডাঁটা, মধু, গুড়, দুধ আর মাষকলাই এদের একটার সঙ্গে আর একটা খেলে ক্রমে লোকে কালা, অন্ধ, বোবা, কাঁপন রোগী।
১৬। মধু গরম ক'রে বা গরম জিনিষের সঙ্গে খেলে কিম্বা পরিশ্রমে যার শরীর গরম আর ক্লান্ত সে মধু পান করলে বিষের কাজ করে।

এই রকম আরো আছে। কিন্তু মোটামুটি এই কটা মনে রাখলেই আমাদের কাজ চলে যাবে। তারপর রুগীর অবস্থা বুঝে ডাক্তার কবিরাজ যেমন বলবেন তা শুনতে হবে। একটা কথা মনে রাখতে হবে—

অতি ভোজন আর গুরুপাক জিনিষ—

আমরা যাকে বলি, রুগীর কাছে তা এমনিতেই বিরুদ্ধ। অতি ভোজন মানে পেট ঠেসে খাওয়া। এই কথাটি মনে রেখে প্রথম থেকেই সাবধান হ'য়ে রুগীর খাবারের যোগাড় করতে হবে। রুগীর শরীরের উপর দিয়ে পথ্য নিয়ে পরখ করা খুব বিপদের। রুগীর পথ্য খুব সাবধানে চালালে বেশীর ভাগ রোগেই প্রায় বিনা চিকিৎসায় সেরে যেতে পারে।

তাই বলছিলাম যে মাছ মাংস, যা হজম করা মোটের উপর একটু শক্ত, সেই পথ্য দিতে হ'লে খুব সাবধান হ'য়ে না দিলে কখন কখন খুব বিপদ হ'তে পারে। মাছ মাংস রুগীকে কতখানি দেওয়া চলবে তা খুব একটু থেকে একটু একটু ক'রে সইয়ে সইয়ে বাড়িয়ে দেখতে হয়।

ডিম, মাছ আর মাংস—

এই তিনটির কথা নিয়ে এখন বলব।

ডিম—

ডিম জিনিষটা গ্রামে যতটা ভাল পাওয়া যায় সহরে তত ভাল পাওয়া যায় না। সহরে বেশীর ভাগই চালানী ডিম। ডিম জিনিষটা চারদিনের বেশী পুরনো হ'লে তাকে আর তাজা ডিম বলা চলে না। আর তাজা ডিমই হ'ল সব রোগীর সব চেয়ে ভাল পথ্যের মধ্যে একটি। ডিম তাজা পাওয়া গেলে (১) সেই ডিম সকালে ৪।৫ ফোঁটা আদার রস দিয়ে কাঁচাই খাওয়া ভাল। এ ডিম সহজে হজম হয়, আর খুব পোষ্টাই। ডিম যদি তেমন তাজা না পাওয়া যায় তবে কাঁচা খাওয়া ভাল নয়। তাজা না পাওয়া গেলেও ডিম খুব ভাল থাকা চাই। একটু খারাপ হ'লেও তাতে পেট বেশ খারাপ হ'তে পারে। তাই (২) ভাল ডিম নিয়ে ফুটন্ত জল একটা পেয়ালার মধ্যে ঢেলে তাতে ডিম রেখে চাপা দিতে হবে। ডিমটা ডুবে যাওয়ার মত জল দেওয়া দরকার তারপর দু'মিনিট রেখে তুলে নিলে যতটুকু সেদ্ধ হবে সেইটেই হজমের পক্ষে ভাল। এই ডিম একটু সৈন্ধব নুন আর গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে খেতে হয়। এখানে এইটুকু বলে রাখি যে হজমের পক্ষে সন্ধব নুনই সবচেয়ে ভাল। আর গোলমরিচের গুঁড়ো যেন ন্যাকড়ায় না ছেঁকে ব্যবহার না করা হয়। এ সব খুব ছোট ছোট কথা, তবু ছোট কথাগুলোকেই আমরা গ্রাহ্য করি কম, আর তার ফল সব সময় খুব সুবিধের হয় না, ছোটও হয় না। অনেক সময় তাড়াতাড়ি ক'রে যে কোনো, হয়ত লঙ্কা বাটা—শিলে খানিকটা গোলমরিচ গুঁড়ো ক'রে তার ছিবড়ে শুদ্ধুই এনে রুগীকে দি। তারপর যখন তার পেটে অনেকক্ষণ পরে জ্বালাপোড়া কামড়ানো এই সব নানা রকম যাতনা সুরু হয় তখন আমরা ভেবে পাই না কেন এমন হ'ল। হয়ত এই একটু অসাবধান হওয়ার জন্যে তার পেটটা খারাপ হয়, রাতে যাতনায় ঘুম হয় না, জ্বর বেড়ে যায়—এই সব কত কি হ'তে পারে তার ঠিক নেই। যাই হোক্ মোট কথা সেবা করতে গেলে খুব ছোট ছোট জিনিষের দিকেও নজর রাখতে হয়। ডিম আরও অনেক রকম ক'রে খাওয়া চলে। (৩) একটা তাওয়া বা কড়াইয়ের উপর খানিকটা জল দিয়ে ফুটে উঠলে তার মধ্যে ডিমটা ভেঙ্গে ছেড়ে দিয়ে নামালে, অল্প একটু জমে যাবে। একে বলে জল পোচ। (৪) তা ছাড়া ঘিএর মধ্যে ঐ রকম ক'রে পোচ করা যায়। সাবধান হ'তে হবে যেন কড়া ভাজা না হ'য়ে যায়। ভাজা যত কম হবে, হজম তত শীগগির হবে। আর ঘিটাও ভাল গাওয়া-ঘি হওয়া চাই। তবে রুগীর অসুখ যদি বেশী না থাকে আর হজম মোটামুটি ভাল থাকে তা হ'লে ভাল খাঁটি ভয়সা ঘিও চলতে পারে। (৫) তাজা ডিম পেলে ডিমটাকে খুব করে ফেটিয়ে (ফেনা ক'রে নিলেই ভাল) তার সঙ্গে এক ছটাক দুধ, আর এক চামচ চিনি মিশিয়ে খাওয়া যায়। দুধটা সামান্য গরম হ'লেই ভাল হয়। মুরগীর ডিম, রুগীর রুচি আর হজমের দিকে নজর রেখে সকালে ২।৩টে পর্য্যন্ত ডিম ঐ সব রকম ক'রে দেওয়া যায়।

অনেকে ডিম ভাজা করে দেন। তা খুব খারাপ, হজম হ'তে চায় না। ডিম সিদ্ধ ক'রে খেলেও হজম হ'তে দেরী হয়। সেদ্ধ আর ভাজা ডিমে খুব বদ-হজম হয়, পেটে বাতাস হয়, এমন কি পেটের অসুখও হয়। আর ক্ষয় রুগীর পেটটা ভাল না রাখতে পারলে তার শরীর নিজেকে মেরামত করবার মালমসলা কোথায় পাবে? তা ছাড়া ক্ষয় রুগীর পেট একবার খারাপ হ'লে তা সারিয়ে তোলা খুব শক্ত। আর পেট খারাপ থাকলে ক্ষয় রুগীকে বাঁচানো যায় না। তাই বলছি, ডিম, মাছ, মাংস এসব খুব সাবধানে খাওয়াতে হয়।

অথচ ডিম যেমন উপকারী, (আর উপরে লেখা যে পাঁচ রকম ক'রে খেতে বলা হ'য়েছে তাতে হজমও সহজে হয়) এমন খুব কম পথ্যই আছে। তাই বাড়ীতে মুরগী পুষে কিম্বা জানা বাড়ী থেকে রোজ তাজা ডিম এনে রুগীকে দিতে পারলে খুব ভাল হয়। কেউ কেউ ফেটানো দুধ ও ডিমে একটু ব্রাণ্ডি দিয়ে থাকেন। খুব দরকার না হ'লে ব্রাণ্ডি দেওয়া আমি ভাল মনে করি না।

ডিমের মধ্যে যে দুধের ছানার মতন জিনিষ আর চর্ব্বি আছে, তা আমাদের শরীরের মেরামতি কাজে খুব দরকার। তাই বলছি যে ক্ষয়-রুগীকে সকাল বেলা একটা দুটো ডিম সহজে-হজম হয় এমন ক'রে রোজ দেওয়া ভাল।

মাছ—

মাছ কোনো কোনো দেশের খুব আদরের খাবার; বাঙালীরা বেশীর ভাগ লোকই ত মাছ ভাত খেতে ভালবাসে।

জাপনীরা মাছ খুব খায়। তাই মাছের কথা একটু ভাল ক'রে জানা দরকার।

মাছ জিনিষটা অমনিতে ত বেশ পোষ্টাই। কেননা মাছেও ঐ ছানা জাতের জিনিষ আর চর্ব্বি খুব আছে। কিন্তু পোষ্টাই হ'লে কি হবে—মাছ হজম করা ডিমের চেয়ে শক্ত; আর অনেক মাছ আছে যা মাংসের চেয়েও হজম করা শক্ত। মাছ বেশীর ভাগই গুরুপাক। তা ছাড়া মাছে কফ আর পিত্তি বাড়ায়। সব মাছই কিছু কিছু কফ বাড়ায়। কিন্তু যদি হজম করতে পারে তা হ'লে মাছ বেশ জোর আনে শরীরে, আর মাথা খুব পরিষ্কার রাখে।

মাছের মধ্যে বড় পাকা মাছ খারাপ, আর ছোট মাছ (নরম, কচি) বেশ হালকা, পেটের পক্ষে ভাল। ছোট মাছ সহজেই হজম হয় আর বেশ রুচি বাড়ায়। তাই যখন যে যে মাছকে "ভাল পথ্য তাই রুগীকে খেতে দিতে পারা যায়"—একথা বলা হবে সেই সেই মাছের খুব ছোট বাচ্চার কথাই বুঝতে হবে। যেমন রুই মাছের এক পোয়া মত, কাৎলার পাঁচ ছটাক, মৃগেলের পোয়াটেক মত, এই রকম ছোট ছোট মাছই পথ্য এই বুঝতে হবে।

যদিও কবিরাজী শাস্ত্রে রুই মাছকেই সবচেয়ে ভাল মাছ ব'লে ব'লেছে, তবু রুগীকে রুই মাছের চেয়ে অন্য অনেক মাছ দিয়েই বেশী ভাল হয় আর অপকার কম হয় দেখা গেছে। আর একবার মনে করিয়ে দি—মাছ বলতে যে যে মাছের নাম করা যাচ্ছে সেই সেই মাছের ছোটগুলো বুঝতে হবে। এখন সবচেয়ে ভাল মাছ থেকে পরে পরে অল্প ভাল মাছগুলোর নাম করছি।

মাগুর—(খুব ছোট নয় বড়ও নয়) পেট ভাল না থাকলে মানে পায়খানা যদি একটু পাৎলার দিকে থাকে তাহ'লে এ মাছ একটু পেটটা ধরাবার দিকে নিয়ে যায়। এতে রক্ত খুব তাড়াতাড়ি হয়—তাই কমজোর রক্ত কমে গেছে—এমন রুগীর খুব উপকার হয়। মাছ খাওয়াতে চাইলে এই মাছই দেওয়া উচিত। ন্যাকড়া ছাঁকা হলুদ ও ধনেবাটার জল আদাবাটা পাঁচফোড়ন দিয়ে রাঁধতে হবে। এইখানে আবার বলে নি (যদিও গত ভাদ্রের ভারতবর্ষে একথা খুব পরিষ্কার ক'রেই বলেছি) যে বাটা মসলা সাবধানে ন্যাকড়ায় ছেঁকে তার জল দিয়ে সব রান্না রাঁধতে হবে। কোনো কারণেই মশলার খিঁচ যেন পেটে না যায়।

শিঙি—শিঙি মাছেরও প্রায় মাগুর মাছের মত গুণ। তবে এতে একটু কফ বাড়ায়। শিঙি মাছও ঐ রকম ক'রে রাঁধে। পেটের-অসুখওয়ালা রুগী যদি বেশী রোগা হয়, আর তার যদি কফ না থাকে তবে শিঙি মাছ খাইয়ে তাকে মোটা করা যায়। তা ছাড়া শিঙি আর মাগুর দুই মাছেই খুব রুচি বাড়ায়। এরও মাঝারির মানে—ছোটও নয় বড়ও নয় সেই মাছই পথ্য। পেটের অসুখ বেশী থাকলে মাছ বাদ দেওয়াই ভাল। তবু রুগী যদি এই মাছ খেতে চায় তবে গাঁদাল পাতা বেটে ঐ মাছের ঝোল দিলে উপকার হয়।

ডানকুনি—খুব ছোট ছোট মাছ। একটু তেত। খুব হাল্‌কা, আর প্রায় দোষ বলতে এর কিছু নেই। কবিরাজী কথায় বলে ত্রিদোষনাশক।

কই—ছোট ছোট কই বেছে নিতে হয়। যার মাংস খুব নরম—মানে ছিবড়ে হয় নি। কই বেশ বল করে, আর কফ নষ্ট করে। রান্না মাগুরের মত।

ছোট রুই, কাৎলা—এক পোয়ার বেশী ওজনের পোনা মাছ পথ্য নয়। মশলা—হলুদ, ধনে, পাঁচফোড়ন। রুই মাছ শেওলা খায়, আর ঘুমোয় না সেই জন্যে খুব খিদে বাড়ায়। ফিঁকে ক'রে রাঁধলে মানে খুব তেল মশলা দিয়ে না রাঁধলে বেশ তাড়াতাড়ি হজম হয়, আর সেই জন্যে শরীরের শক্তি বাড়ায়। যে সব রুগীর পেট কিছু খারাপ নয়, তাদের পক্ষে ছোট পোনা মাছের ঝোল বেশ ভাল পথ্য।

মৃগেল—এর গুণ রুইয়ের চেয়ে কম। রুই না পেলে কাৎলা, আর কাৎলা না পেলে মৃগেল মাছ খাওয়া চলে।

টেঙ্গরা—মাঝারি রকমের বেছে নিতে হয়। রান্না—মাগুর, কই, রুই, এর মত কিম্বা সুধু হলুদ আর কালোজিরে ফোড়ন দিয়ে বেশ পথ্য হয়। টেঙ্গরা মাছে কফ আর পিত্ত কম পড়ে। একটু আদাবাটা দিয়ে রাঁধলে খুব সহজে হজম হয়।

বেলে, চ্যাং—পেটের অসুখে ভাল। পিত্ত নষ্ট করে। এর মধ্যে চ্যাং মাছটাই বেশী উপকারী।

বাটা—হজম করা শক্ত। কিন্তু পেট ভাল থাকলে বায়ু আর পিত্ত নষ্ট করে।

ইলিষ, চিংড়ী, চিতল, শোল, আড় মাছ অপথ্য। তাই আর তাদের কথা বেশী কিছু বল্লাম না।

এ ছাড়াও পাবদা, মৌরলা, বাচা, বাঁশপাতা এই কয়েকটি মাছও বেশ ভাল, আর খাওয়া চলতে পারে। তবে এসব মাছের দোষ এই যে—এসব মাছ জ্যান্ত কিম্বা খুব টাট্‌কা পাওয়া যায় না। আর বাজারের চালানি মরা মাছ রুগীকে খাওয়ানোতে খুব বিপদ আছে।

মনে রাখতে হবে যে মাছের সঙ্গে ঘি বিরুদ্ধ, তাই মাছকে তেল দিয়ে সাঁৎলে রাঁধতে হয়—ঘি ছোঁয়াতেও নেই। মাছ ভাজা বেশী কড়া জিনিষ তাই হজম করা শক্ত। রুগীর পথ্য রাঁধবার সময় সাবধান থাকতে হবে যেন মাছ সাঁৎলাতে গিয়ে ভাজা না হ'য়ে যায়।

মাছ পোড়া—নুন, তেল, হলুদ মাখিয়ে পাতায় জড়িয়ে মাছ পুড়িয়ে খাওয়া খুব পোষ্টাই তবে এটা হজম করা একটু শক্ত।

ছোট পুঁটী মাছ—তেত, কফ আর বাত নষ্ট করে. মুখ আর গলার রোগে ভাল, বেশ রুচি আনে আর হাল্‌কা—মানে সহজে হজম হয়।

খল্‌সে—বাত, পিত্ত, কফ শূল আর আম এই সবেই অল্প স্বল্প ভাল। খুব বেশী ভাল নয় কিন্তু খারাপ নয়।

কুয়োর মাছ—রুগীর পক্ষে খারাপ। নদীর মাছ—যে রুগীর রক্ত পড়ে তার পক্ষে খারাপ। দীঘির মাছ গুরুপাক, মানে হজম হ'তে দেরী হয়। খালের বা ছোট নদীর মাছ বেশ ভাল। ঝরণার মাছ খুব ভাল।

কচ্ছপ—কচ্ছপের মাংস ক্ষয় রুগীর খুব ভাল পথ্য, কবিরাজীতে বলে ত্রিদোষনাশক। এতে বল, বুদ্ধি, মনে রাখবার ক্ষমতা, চোখের তেজ বাড়ায় আর রক্ত ঠাণ্ডা করে, শোথে, যক্ষ্মায় আর আমরক্তে ভাল পথ্য। জ্বর সামান্য থাকলে দেওয়া চলে।

কাঁকড়া—পায়খানা যে সব রুগীর খুব কড়া তাদের পক্ষে

কাঁকড়া মন্দ নয়। তবে কাঁকড়া ভাতে কি পাতুড়ী ক'রে খেতে হয়। তেল নুন দিয়ে মেখে। তবে কচ্ছপ আর কাঁকড়া বাছাই করা একটু শক্ত, তাই ওগুলো না খেতে দেওয়াই ভাল। জ্বরে অপথ্য।

সব সময়ে এটুকু মনে রাখতে হবে যে জ্বর যখন থাকবে না কিম্বা খুব সামান্য থাকবে তখনই মাছ ভাত দেওয়ার সময়। জ্বর বাড়লে মাছ ভাত দিলে হজম করতে কষ্ট হয়। মোটামুটি বেলা ১০টার মধ্যে ভাত খাওয়া শেষ করা উচিত। জ্বর বেশী উঠলে কোনো সময়ই মাছ দেওয়া ঠিক নয়।

মাংস—এবারে মাংসের কথা বলি। মাংস খেলে মাংস বাড়ে এমনি একটা কথা আমাদের দেশে চলিত আছে। সে কথা সত্য। ক্ষয়রুগী—কিম্বা কোনো রোগ ভুগে উঠেছে এমন রুগী, কিম্বা খুব রোগা হ'য়ে পড়েছে যে তাকে মাংস খাওয়াতে হয়। তবে সব সময়ই একটা কথা মনে রাখতে হবে যে কেবল জিনিষটা ভাল ব'লেই তা খাওয়ানো চলবে না। আমরা খাই কেন? শরীর গড়বে ব'লে। তাই এমন জিনিষ এমন ভাবে খাওয়া দরকার যাতে আমাদের শরীর তা খুসী হ'য়ে নেয়। শরীর মানে সুধু জিভ খুসী হ'য়ে নিলেই হবে না, পেট থেকে সুরু ক'রে শরীরের সমস্ত ভাগ যেন খেয়ে মেজাজ খারাপ না করে। তাই সকলের জন্যে একরকম জিনিষ পথ্য নয়। একজন লোক যা খেয়ে ভাল থাকে, আর একজন তাই খেয়েই হয়ত অসুখ বাধায়। আবার একজন যত খেতে পারে, আর একজনের তা খেলে হয়ত অসুখ করবে। এই জন্যে নানা রকম রুগীর ক্ষমতা, অভ্যাস, আর রুচি বুঝে বুঝে এক একটা জিনিষ দেওয়ার কথা ভাবতে হবে। এখন মাংসের গুণ বলি:—

মাংসং বাতহরং সর্ব্বং বৃংহণং বলপুষ্টিকৃৎ।
প্রীণনং গুরু হৃদ্যঞ্চ মধুরং রসপাকয়োঃ॥

এর মানে মাংস বায়ু নষ্ট করে, পোষ্টাই, গায়ে জোর আনে, মধুর রস আর গুরুপাক মানে হজম করতে দেরী লাগে। তবে অবশ্য খুব কচি মাংস হ'লে একটুও গুরুপাক হয় না; বরং মাছের চেয়ে শিগ্‌গিরই হজম হয়। তাই ক্ষয় রুগীর অল্প জ্বর থাকলে মাছের চেয়ে মাংস ঢের ভাল। কিন্তু রান্নাটা যেন গুরুপাক ক'রে না করা হয়।

মাংস রান্নার কয়েকটি রকম এখানে লিখে দিচ্ছি, রুগীকে খাওয়াতে হ'লে যে গুলো চলবে।

খুব কচি (পাঁটা, খাসী, ভেড়া, মুরগী, পায়রা, চড়ুই, বটের, ঘুঘু, তিতির, হস্তেল, ঘুঘু, হরিণ, খরগোস)—এই সবের মাংস ক্ষয় রুগীর ভাল পথ্য। এর পর লিখে দেব—সবচেয়ে ভাল থেকে একটু একটু পরপর কম ভাল কোন কোনটা। এখন কি কি রকম ক'রে মাংস রাঁধলে রুগীর ক্ষতি হবে না তাই বলি।

(১) মাংস আর হাড় থেঁতো থেঁতো ক'রে একটা বোতোলে একটু আদা বাটা, আর অল্প একটু সন্ধব নুন দিয়ে (অল্প চিনিও দেওয়া যায়) বোতোলের মুখটা এঁটে বন্ধ করতে হয়। তারপর ঠাণ্ডা জলে একটা হাঁড়ির মধ্যে সেই বোতলটা ছেড়ে জ্বাল দিতে দিতে জলটা ফুটে উঠবে। এমনি ফুটন্ত জলে ঐ বোতলে ভরা মাংস সিদ্ধ হবে ১ ঘণ্টা ৪০ মিনিট—মানে ১০০ মিনিট। তারপর বেশ শক্ত ন্যাকড়ার মধ্যে দিয়ে ছেঁকে রসটুকু বার ক'রে নিতে হয়। তারপর ফোটানো অথচ ঠাণ্ডা জল ঢেলে মাংসগুলো অল্প নেড়ে চেড়ে আবার ছেঁকে ছিবড়েগুলো ফেলে দিতে হয়। ঐ রসটুকু তখনই টাট্‌কা টাট্‌কা খাওয়ালে খুব শীগগির হজম হয়, আর ভারি পোষ্টাই জিনিষ। কেউ কেউ একটু কাগজী লেবুর রস দিয়েও খেতে ভাল বাসেন। তাতে কোনো ক্ষতি নেই। বরং যার যাতে রুচি, সে জিনিষ যদি অন্য আর একটার সঙ্গে মিশে রুগীর ক্ষতি না করে, তবে তা দেখাই উচিত। ক্ষতি করলে তা নিশ্চয়ই দেওয়া উচিত নয়। যেমন কেউ যদি বলেন ওতে একটা কাঁচা লঙ্কা ফেলে রাঁধ, তবে তা কখনই করা উচিত নয়। কিম্বা কেউ যদি ঐ রসটুকু খেয়ে বলেন "একটু দুধ দাও, মুখটা বড় আঁশটে হ'য়ে গেছে" তবে তা দেওয়া উচিত নয়। কেননা, দুধটা যদিও রুগীর পথ্য, আর ঐ মাংস-রসও তাই কিন্তু ঐ দুইয়ের যোগে বিরুদ্ধ হয়। তাই রুগীর রুচি আর রুগীর অপথ্য দুটো কথাই সব সময় যাচাই করে পথ্য দিতে হবে। এ রান্নায় জল দিতে হয় না।

(২) কাঁচা মাংস হাড় থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে, তাই থেঁতো ক'রে রস বা'র ক'রে নিতে হয় আর তখুনি খাইয়ে দিতে হয়। এতেও এক ফোঁটা লেবুর রস দিয়ে খেলে মন্দ লাগে না। তবে এই মাংস খুব সুস্থ জন্তুর (মানে যে জানোয়ার বেশ জোরালো যার অসুখ নেই তাজা দেখতে) হওয়া চাই; নইলে রুগীর ক্ষতি হ'তে পারে। এই মাংসরসেও জল দিতে হয় না। পরিমাণ একবারে আধ ছটাক রস।

(৩) বেশ ভাল ঘি একটু, মেটে হাঁড়িতে দিয়ে, ঘি হ'লে তাতে তেজপাতা, আস্ত গরম মশলা, আস্ত পিঁয়াজ, ছেঁচা আদা ছেড়ে দিতে হয়। তারপর মাংস আর মেটুলী দিয়ে অল্পক্ষণ সাঁৎলে দরকার মত নুন আর একটুখানি চিনি সিকি চামচ বার্লি আর দরকার মত জল দিয়ে বেশ ক'রে চাপা দিতে হয়। এত জল দেওয়া দরকার যে দেড় ঘণ্টা সেদ্ধ হ'লেও মাংস যেন ধরে না যায়। জল আগে থাকতে ফুটিয়ে রাখলে ভাল হয়, আর সেই গরম জল মাংসে ঢালতে হয়। অসুখ একটু বেশী থাকলে ঐ ঝোল শক্ত নাকড়ায় বড় চামচ কিম্বা হাতার পিছন দিয়ে রগড়ে রগড়ে ছেঁকে নিতে হয়। অসুখের কম বেশী দেখে এক আধটুকরো মাংস বা বেশী টুকরো মাংস দেওয়া হবে তা ঠিক করতে হয়। একটু একটু ক'রে সইয়ে নেওয়াই ভাল। আস্তে আস্তে ঐ সমস্ত মাংস আর ঝোলও হয়ত রুগীকে দেওয়া চলবে। কিন্তু তা আস্তে আস্তে দিতে হবে, খুব সাবধানে। মাংস আর মেটুলী ১ ছটাক, পিঁয়াজ একটা, বার্লি সিকি চামচ, তেজপাতা ২টো, গরমমশলা (ছোট এলাচ ১টি, লবঙ্গ চার পাঁচটা, দারচিনি ক'ড়ে আঙুলের মত এক টুকরো) জল মাংসের চব্বিশ গুণ। নরম আঁচে রান্না হবে। মাংস বাড়ালে, মশলা আর পিঁয়াজ ও জল সেই হিসাবে বাড়াতে হবে।

(৪) মাংস আধ পোয়া—জল বারো গুণ—মশলা ন্যাকড়া ছাঁকা হলুদ, ধনে জিরে গোলমরিচ বাটা (দরকার মত)। ভাল ঘি—পিয়াজ কুচি—আদাবাটা গরমমশলা। মেটে হাঁড়িতে ঘি দিয়ে তার মধ্যে পিঁয়াজ কুচি ছেড়ে একটু নাড়া-চাড়া করে নিতে হবে (পিঁয়াজ যেন ভাজা না হয়), তার পর মাংস মেটুলী আর কাঁচা পেঁপের টুকরো দিয়ে একটু সাঁৎলে নিতে হয়। কাঁচা পেঁপে বেশ বড় ২।৩ টুকরো, বেশী দিলেও ক্ষতি নেই। ইচ্ছা হ'লে ২।৩

টুকরো আলুও দেওয়া যায়। এইবার আদাবাটা দিয়ে একটু নেড়ে-চেড়ে মশলা গোলা ফুটোনো জল ঢেলে, আর আধ চামচ চিনি দিয়ে সরা চাপা দিতে হবে। বেশ ঘণ্টা দেড়েক পরে একটা ছোট এলাচ, একটুকরো দারচিনি, আর চার পাঁচটা লবঙ্গ দিয়ে নামাতে হবে। মাংস যেমন যেমন বাড়াবে (অবশ্য খুব সাবধানে হজমের দিকে লক্ষ্য রেখে) মশলা, পিয়াজ, আলু পেঁপেও সেই মত বাড়াতে হবে।

(৫) আধ পোয়া আস্ত মাংস কিম্বা ঐ পরিমাণ ছোট পাখীর পা (হজম ভাল থাকলে মাংস বেশী নেওয়া যায়)—একটু নুন চিনি আর আদাবাটা দিয়ে আধ সের জলে সরা চাপা দিয়ে সিদ্ধ করতে হয়। ইচ্ছা হ'লে সঙ্গে দু টুকরো কাঁচা পেঁপে, দুটো খোসা ছাড়ানো আস্ত আলু দেওয়া চলে। খুব নরম আঁচে মাংস আর তরকারী সিদ্ধ হ'য়ে গেলে কড়াইয়ে একটু গাওয়া ঘি চড়িয়ে আস্ত গরমমশলা (২ টো ছোট এলাচ, দু টুকরো দারচিনি—লবঙ্গ দিতে হয় না) দিয়ে ঝোলটুকু বাদে মাংস আর তরকারী ছেড়ে একটুক্ষণ ভাজতে হয়। আলু অল্প বাদামী হ'লে সবটাই ভাজা হ'ল বুঝতে হবে। তখন মাংস সিদ্ধর যে ঝোলটুকু বাকী ছিল, তাই দিয়ে নেড়ে-চেড়ে নামাতে হবে।

(৬) চার নম্বরের মত ক'রে মাংস রাঁধবার মাঝামাঝি সময় একমুঠো পুরণো (অর্দ্ধ থেকে এক ছটাক) আতপ চাল, আর পাকা চাল কুমড়ো ২।৩ টুকরো, কিসমিস ১০।১২টা, আলু, আস্ত পিঁয়াজ, ফুলকপি, কড়াইশুঁটি, ইচ্ছামত এই সব জিনিষ দিয়ে বা এর মধ্যে যে যে জিনিষ পছন্দ বা পাওয়া যায় তাই দিয়ে রাঁধতে পারা যায়। সব জিনিষ ঠিকমত সিদ্ধ হ'য়ে যাওয়া চাই! নামাবার পর ভাল মাখন চা চামচের দু' চামচ দিয়ে নামাতে হয়! নুন মিষ্টি খুব কম ক'রে দেওয়াই ভাল। ফেন গালা হবে না।

(৭) মাংস আর মেটুলীতে মিলিয়ে আধ পোয়া। গরমমশলা, পেঁপে, কিসমিস ৬ নম্বরের মত। ছোট পিয়াজ কুচি চা চামচের ঢিবি ক'রে এক চামচ মত, আদাবাটা অল্প খানিকটা, চিনি চা চামচের এক চামচ, আর সম্ভব নুন অল্প। মাংস ছোট ছোট টুকরো ক'রে কেটে সেদ্ধ ক'রে জল শুকিয়ে নিয়ে রেখে দিতে হয়। তার পর শুকনো হাঁড়িতে ঘি, পিঁয়াজকুচি, ১ ছটাক পুরাণো আতপ চাল, কিসমিস, আদাবাটা আর আস্ত গরমমশলা একটার পর একটা দিতে দিতে নাড়তে হবে, চাল খুব অল্প ভাজা হলেই মাংস, জল আর নুন দিয়ে চাপা দিতে হবে। জলটুকু টেনে যাবার আগে একবার চিনি দিয়ে নেড়ে-চেড়ে দিয়ে আবার ঢাকা দিতে হয়। তার পর জল সবটা টেনে নিলে নামাতে হয়। কেউ কেউ ঘিয়ের মধ্যে একটা দুটো আস্ত তেজপাতা দেন। তেজপাতা ভাল জিনিস, দেওয়া মন্দ নয়। পাঁচ ছটাক জল এই ভাত করতে দরকার হবে। তা ছাড়া মাংস সেদ্ধ ক'রে নিতে যতটুকু জল লাগে তা ত লাগবেই।

অনেকগুলো মাংসের নাম আমি ক'রেছি যা ক্ষয় রোগে ভাল। এর মধ্যে কয়েকটা আছে, আর এ ছাড়াও কয়েকটা আছে যা ওষুধের মত কাজ করে। যেমন "ক্রব্যাদমাংসং" মানে মাংস খায় এমন জানোয়ারের মাংস ক্ষয় রুগীর শরীর গড়বার কাজে ভারি ভাল জিনিষ। আর "জাঙ্গলজ্য রসাশ্চ" মানে বনের জন্তুর মাংসরস। কিন্তু গ্রাম দেশে যদিও বা এ সব মাংস কিছু কিছু পাওয়া যায়, সহরে ত একেবারেই তা পাওয়া যায় না। অবশ্য একটু চেষ্টা করলে বনমুরগী বা বুনো শুয়োর এ সব হয়ত পাওয়া যায় কিন্তু নেকড়ে বাঘ মেরে খাওয়ার দিন নিশ্চয় আর নেই। যাই হোক সে জন্যে ভেবে ত লাভ নেই। যা হাতের কাছে পাওয়া যায় তাতেই বেশ কাজ চলে যাবে।

মাংসের মধ্যে ক্ষয়রুগীর পক্ষে কচি পাঁঠার মাংসই সব চেয়ে ভাল, আর সহজে পাওয়া যায়।

ছাগ মাংসং লঘুস্নিগ্ধং স্বাদপাকং ত্রিদোষঘ্নুৎ।
নাতিশীতমদাহিত্বাৎ স্বাদ পীনসনাশনং।
পরং বলকরং রুচং বৃংহণং বীর্য্যবর্দ্ধনং।

এর মানে কবিরাজী শাস্ত্রে ছাগলের মাংসকে খুব উপকারী মাংস ব'লে ব'লেছে। বলেছে এ মাংস হালকা সহজে হজম হয়, স্নিগ্ধ, হজমের সময় মিষ্টরস, অম্বল হয় না, খুব ঠাণ্ডা বা গরম নয়, খুব জোর হয়, বায়ু, পিত্ত, কফ, তিনটেরই উপকার করে, খুব পোষ্টাই এই রকমের অনেক গুণের জিনিষ এই পাঁঠার মাংস। তাই কচি পাঁঠার মাংস টাটকা পেলে ক্ষয়রুগীকে তা ছাড়া অন্য মাংস দেওয়া উচিত না। কিন্তু যার বাচ্চা হ'য়ে গেছে এমন ছাগলীর মাংস বেশ অপকারী। নইলে শাস্ত্র মতে চারপাওয়ালা মেয়ে জন্তুর মাংসই ভাল। কিন্তু পাখীর বেলায় পুরুষই ভাল। অবিশ্যি ছোট পাখী বা জন্তুর পুরুষ মেয়ের মাংসে বেশী কিছুই তফাৎ নেই।

কচি ভেড়ার মাংস পিত্ত আর কফ বাড়ায়। তবে খাসী ভেড়ার মাংস কতকটা ভাল।

ছোট হরিণের মাংস—একটু পেচ্ছাপ বাহ্যে কম করায়। কিন্তু আর সব দিকে মন্দ না। কচি খরগোসের মাংস (বনের যদি হয়) তবে খুব ভাল—প্রায় সবদিক দিয়ে। জ্বর, পেটের অসুখ, আমাশা, রক্ত খারাপ, কাশ শ্বাস, বায়ু, পিত্তি, কফ সব তাতেই ভাল। ছোট বুনো খরগোস রুগীকে দেওয়া মন্দ নয়।

এখন পাখীর মাংসের কথা বলি। আগেই বলেছি যে পাখীর মধ্যে পুরুষ পাখী বেছে নিলেই ভাল হয়। বনমুরগী—পাখীর মধ্যে যক্ষা রুগীর বনমুরগীই সবচেয়ে ভাল। তবে বেশী সর্দ্দি কাশী থাকলে ভাল নয়। ছোট পালা মুরগী—ছাগলের মাংসের পরেই এর কথা মনে করতে হবে।

কুক্কুটো বৃংহনো স্নিগ্ধো বীর্যোষ্ণোঽনিলহৃৎ গুরু।

মানে, পোষ্টাই, স্নিগ্ধ আর সবই ভাল তবে হজম করতে একটু দেরী হয়। কিন্তু ছানা মুরগীতে তা হয় না, খুব তাড়াতাড়ি হজম হয়। অবিশ্যি যেমন ক'রে রাঁধতে বলা হ'য়েছে তেমনি ক'রে রাঁধতে হবে —নইলে মশলাপাতি দিয়ে রাঁধলে নিশ্চয়ই খুব খারাপ করবে।

একথা খুব ভালো ক'রে মনে রাখতে হ'বে যে—যে রুগীর সর্দ্দি কাশি খুব বেশী মানে কফ যার খুব বেশী কিংবা যার জ্বর খুব বেশী বেশী উঠছে—যেমন ১০২ ডিগ্রী—তাকে কখনই মাংস দেওয়া উচিত নয়। তার নিরামিষ, দুধ, ঘি, গোলমরিচ, শুঁঠ, পিপুল, আদা এই সবই দেওয়া উচিত। আর খুব পুরোনো তেঁতুলের সরবৎ—অন্ততঃ পাঁচ বছরের পুরোনো।

যক্ষা রুগীকে বেগুন, করেলা, তেল, বেল, সরষে এই সব নিশ্চয়ই দেওয়া উচিত নয়।

এর পরের বার মোটামুটি ঘুম, বিশ্রাম, পেচ্ছাব বাহ্যির নিয়ম, পরিশ্রম আর মোটামুটি ওঠা বসা চলা ফেরায় কেমন করে ক্ষয়রুগী ভাল থাকতে পারে তাই বলে ক্ষয় রোগের পথ্যের কথা শেষ করব। আর ক্ষয় রোগের মধ্যে ডায়েবেটিসের পথ্যের কথা বলবার চেষ্টা করব।

খেলা ধূলা



শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়



৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

বোম্বাই পেণ্টাঙ্গুলার ক্রিকেট ঃ

হিন্দু ঃ ৫৮১ (৫ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড)

অবশিষ্ট দল ঃ ১৩৩ ও ৩৮৭

বোম্বাই পেণ্টাঙ্গুলার ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে হিন্দুদল ১ ইনিংস ও ৬১ রানে অবশিষ্ট দলকে পরাজিত করে ফাইনাল বিজয়ী হয়েছে।

হিন্দুদল টসে জয়লাভ ক'রে ব্যাটিং আরম্ভ করে। প্রথম দিনের খেলার শেষে ২ উইকেটে ৩১৯ রান উঠে। এইচ অধিকারী এবং ভি এস মার্চ্চেণ্ট যথাক্রমে ১২৩ এবং ১১২ রান ক'রে নট আউট থাকেন। সোহনী ৫৭ রান করেন। দ্বিতীয় দিনের খেলায় অধিকারী যখন ১৮৬ রান ক'রে আউট হ'লেন তখন দলের ৪৫৯ রান উঠেছে। অধিকারী ১৭ রানের মাথায় আউট হবার একবার সুযোগ দিলেও তিনি বরাবরই চমৎকার খেলেছিলেন। উইকেটের চারদিকে বল পিটিয়ে তিনি ব্যাটিংয়ে ক্রীড়াচাতুর্য্যের পরিচয় দেন। তাঁর 'স্কোয়ার কাট ষ্ট্রোক' সত্যই সুন্দর। তাঁর রান সংখ্যায় ১৪টা বাউণ্ডারী ছিল। রঙ্গনেকার মার্চ্চেণ্টের জুটী হ'লেন। মার্চ্চেণ্ট তাঁর দু'শত রান পূর্ণ করলেন ৩৩৭ মিনিট খেলে। রঙ্গনেকার নিজস্ব ২২ রান ক'রে যখন আউট হ'লেন তখন মার্চ্চেণ্টের ২০৫ রান উঠেছে। মোট রান হয়েছে ৫০৩। এর পর সি এস নাইডু এসে জুটলেন, কিন্তু মাত্র ১৮ রান ক'রে বিদায় নিলেন। কিষেণচাদের জুটীতে মার্চ্চেণ্ট নিজস্ব ২৪০ রান যখন পূর্ণ করলেন তখন দলের মোট রান উঠেছে ৫৪৯। হিন্দুদলের ৫ উইকেটে ৫৮১ রান উঠলে মার্চ্চেণ্ট ইনিংস ডিক্লেয়ার্ড করলেন। মার্চ্চেণ্ট ২৫০ রান এবং কিষেণচাদ ১৫ রান করে নট আউট রইলেন। ২৫০ রান তুলতে মার্চ্চেণ্টের ৪১৫ মিনিট নেয়। তাঁর রানে ৩১টা বাউণ্ডারী ছিল।

অবশিষ্ট দলের প্রথম ইনিংস আরম্ভ হ'ল দ্বিতীয় দিনের ৪-৩০ মিনিটে। দলের ২৯ রান যখন উঠেছে তখন দু'টো উইকেট পড়ে গেছে। নির্দ্দিষ্ট সময়ে ট্যাম্প তুলে নেওয়া হ'লে দেখা গেল ২ উইকেটে অবশিষ্ট দলের ৮১ রান উঠেছে। ডায়াস ৩৭ রান এবং হাজারী ৩২ রান করে নট্ আউট রইলেন।

তৃতীয় দিনে অবশিষ্ট দলের বাকি ৮ উইকেটে মাত্র ৫২ রান উঠলো। মোট ১৩৩ রানে তাদের প্রথম ইনিংস শেষ হ'ল। হাজারী এবং হাজারীর জুটীতে অবশিষ্ট দলের মোট ১০৩ রান উঠে। বিজয় হাজারী দলের সর্ব্বোচ্চ ৫৯ রান করেন। অবশিষ্ট দলের এই বিপর্য্যয়ের কারণ হিন্দুদলের মারাত্মক বোলিং। সি এস নাইডু ৪৬ রানে ৪টা উইকেট পান। সারভাতে ৬ ওভার বল ক'রে ৬ রান দিয়ে ১টা মেডেন এবং ৩টি উইকেট পান।

অবশিষ্ট দল ৪৪৮ রান পিছনে থেকে 'ফলো-অন' করতে বাধ্য হ'ল। দ্বিতীয় ইনিংসের সূচনাও ভাল হ'ল না। বিজয় হাজারীর সঙ্গে বিক্রম হাজারী যখন যোগ দিলেন তখন রান উঠেছে মাত্র ৬০। আর এদিকে পাঁচজন আউট হয়েছেন। এই দুই ভাই কিন্তু খেলার মোড় ঘুরিয়ে দিলেন।

তৃতীয় দিনের খেলার শেষে অবশিষ্ট দলের ১৮৯ রান দাঁড়াল। বিজয় হাজারী এবং বিক্রম যথাক্রমে ১২৫ রান এবং ১৪ রান ক'রে নট্ আউট রইলেন। বিজয় ৬ রানের মাথায় একবার আউট হবার সুযোগ দিয়েছিলেন। বিক্রম খুব দৃঢ়তার সঙ্গে উইকেট রক্ষা ক'রে খেলেছিলেন। তাঁর মাত্র ১০ রান উঠে ২ ঘণ্টা সময়ে।

চতুর্থ দিনের খেলার মধ্যাহ্ন ভোজের পূর্ব্বেই শতাধিক রান তুলে বিজয় হাজারী পেণ্টাঙ্গুলার ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় আর একটি রেকর্ড স্থাপন করলেন। মার্চ্চেণ্টের ২৫০ রানের রেকর্ড ভাঙ্গতে তখন তাঁর আর মাত্র ৫ রান দরকার। লাঞ্চের পর সে রেকর্ড ভঙ্গ হ'ল। লাঞ্চের সময় পর্য্যন্ত হাজারী ভ্রাতৃদ্বয় খেলছেন শুনে দর্শকসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ২০,০০০ হাজারে দাঁড়াল। হাজারী ভ্রাতৃদ্বয় ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটীতে ৩২৯ মিনিট খেলে ৩০০ রান তুলে আর এক নতুন রেকর্ড স্থাপন করলেন। বিক্রম নাইডুর বলে মার্চ্চেণ্টের হাতে ধরা দিলেন। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে বিজয় হাজারীকে রান তুলতে যে ভাবে সহায়তা করেছিলেন তার দৃষ্টান্ত সত্যই উল্লেখযোগ্য। ৩৩২ মিনিট খেলে তিনি ২১ রান তুলেছিলেন।

বিক্রমে হাজারীর বিদায় নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দলের ভাঙ্গন আবার দেখা গেল। ভালেরাও কোন রান না করেই বিদায় নিলেন, রান তখন উঠেছে ৭ উইকেটে ৩৬২। শেষের তিন উইকেট হারতে হল মাত্র ১০ রানে। বিজয় হাজারী ৪০৫ মিনিট খেলে ৩০১ রান তুলেন। তাঁর রান সংখ্যায় ৩১টা বাউণ্ডারী এবং একটা ওভার-বাউণ্ডারী ছিল। হাজারীর ৩০৯ রান উঠার পর ৩৮৭ রানে অবশিষ্ট দলের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয়ে গেল। হিন্দুদল এক ইনিংস ৬১ রানে বিজয়ী হ'ল।

পেণ্টাঙ্গুলার প্রতিযোগিতায় কয়েকটি রেকর্ড ঃ

সর্ব্বোচ্চ রান সংখ্যা ঃ

৫৯১ (৭ উইকেট ডিক্লেয়ার্ড)—১৯৩৯ সালে ইউরোপীয়ানদের বিরুদ্ধে হিন্দুদল এই রান করেন।

সর্ব্বাপেক্ষা কম রান সংখ্যা ঃ

৬৪ (১৯৩৭ সালে মুসলীম দলের বিরুদ্ধে ইউরোপীয় দল এই রান করেন)।

সর্ব্বোচ্চ ব্যক্তিগত রান সংখ্যা ঃ

৩০৯ রান (ভি এস হাজারী, অবশিষ্ট দল) হিন্দুদলের বিরুদ্ধে ১৯৪৩ সালে।

রেকর্ড পার্টনারসীপ ঃ

৩৪৫ (তৃতীয় উইকেট)—এইচ অধিকারী এবং ভি এস মার্চ্চেণ্ট (হিন্দুদল)—অবশিষ্ট দলের বিরুদ্ধে। ৩০০ (পঞ্চম উইকেট) —ভি এস হাজারী ও বিক্রম হাজারী (অবশিষ্ট দল)—হিন্দু দলের বিরুদ্ধে ১৯৪৩ সালে।

ডবল সেঞ্চুরী ঃ

৩০৯—বিজয় হাজারী (অবশিষ্ট দল), হিন্দুদলের বিরুদ্ধে ১৯৪৩ সালে।

২৫০ নট্ আউট—ভি এস মার্চ্চেণ্ট (হিন্দুদল), অবশিষ্ট দলের বিরুদ্ধে ১৯৪৩ সালে।

২৪৮—বিজয় হাজারী (অবশিষ্ট দল), মুসলীম দলের বিরুদ্ধে ১৯৪৩ সালে।

২৪৩—ভি এম মার্চ্চেণ্ট (হিন্দুদল), মুসলীমদলের বিরুদ্ধে ১৯৪১ সালে।

২৪১—লালা অমরনাথ (হিন্দুদল), অবশিষ্ট দলের বিরুদ্ধে ১৯৩৮ সালে।

২২১ নট্ আউট—ভি এম মার্চ্চেণ্ট (হিন্দুদল), পার্শীদলের বিরুদ্ধে ১৯৪১ সালে।

২০০ এ এল হোসী (ইউরোপীয়ান), হিন্দুদলের বিরুদ্ধে ১৯২৪ সালে।

পূর্ব্ববর্ত্তী বিজয়ী এবং বিজিত দল ঃ

	বিজয়ী	বিজেতা
১৯৩৭	মুসলীম দল	অবশিষ্ট দল
১৯৩৮	মুসলীম দল	হিন্দু দল
১৯৩৯	হিন্দু দল	মুসলীম দল
১৯৪০	মুসলীম দল	অবশিষ্ট দল
১৯৪১	হিন্দু দল	পার্সি দল
১৯৪২	প্রতিযোগিতা বন্ধ থাকে।	

হিন্দু দল—৫১৫ (৭ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড)

ইউরোপীয়ান—১৪০ ও ১৬৬

বোম্বাই পেণ্টাঙ্গুলার ক্রিকেট প্রতিযোগিতার একদিকের সেমি-ফাইনালে হিন্দুদল এক ইনিংস এবং ২০৯ রানে ইউরোপীয় দলকে পরাজিত করে।

সোহনী এবং মানকড়ের জুটীতে হিন্দু দলের প্রথম ইনিংস আরম্ভ হয়। সূচনা খুব ভাল হ'ল না। মাত্র ৬ রান ক'রে সোহনী আউট হলেন। মাত্র ৬ রানে হিন্দু দলের একটা ভাল উইকেট পড়ে গেল। এর পর মানকড় ও অধিকারীর জুটীতে দলের ৯২ রান উঠলে অধিকারী নিজস্ব ৫৯ রান করে লেগার্ডের বলে মার্শেলের কাছে ধরা পড়লেন। মার্চ্চেণ্ট যোগদান করলেন মানকড়ের সঙ্গে। ২১০ মিনিটের খেলায় দলের ২০০ রান উঠলো। মানকড় ৭৮ রানের মাথায় হ্যারিসের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে সে বারের মত বেঁচে গেলেন। এদিকে কিন্তু মার্চ্চেণ্ট ৬২ রানে ষ্টারগিসের হাতে ধরা পড়লে তাদের জুটী ভেঙ্গে গেল। উভয়ের জুটীতে ১৩৫ মিনিটে ১২০ রান উঠেছিল। দলের রান তখন ২১২। কিষেণচাঁদ যোগদান করলেন এবং সে দিনের খেলার শেষ পর্য্যন্ত ৭৯ রান ক'রে নটআউট রইলেন। কিন্তু মানকড় ২৪৬ মিনিট খেলে ৯১ রান ক'রে আউট হলেন, তার মধ্যে ৭টা ছিল বাউণ্ডারী।

প্রথম দিনের খেলার শেষে হিন্দু দলের ৫ উইকেটে ৩৭০ রান উঠলো। কিষেণচাঁদ ৭৯ রান এবং রামপ্রকাশ ৪৮ রান ক'রে নট আউট রইলেন। ইউরোপীয় দলের মেজর এ এল লেগার্ড (অক্সফোর্ড ব্লু) ৪০ ওভার বলে ৬৯ রান দিয়ে ২২টা মেডেন এবং ৩টে উইকেট পেলেন।

দ্বিতীয় দিনের খেলায় কিষণচাঁদ ১১১ রান করে অবসর নিলেন। দলের রান তখন ৪৩৩। কিষণচাঁদ ১৯৫ মিনিট খেলেছিলেন এবং আউট হবার কোন সুযোগ দেননি। মোট ১৩টা বাউণ্ডারী করেন। পেণ্টাঙ্গুলার ক্রিকেট খেলায় কিষেণচাঁদ এবারই প্রথম 'সেঞ্চুরী' করলেন। কিষেণচাঁদ এবং রামপ্রকাশের ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটীতে ১৮২ রান উঠেছিল। কিষেণচাঁদ অবসর নিলে তাঁর স্থলে সি এস নাইডু রামপ্রকাশের জুটী হ'লেন এবং ৩২ রান করে আউট হলেন। দলের রান তখন ৪৯২। নাইডু একটা ছয়ের মার দিয়ে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ৭ উইকেটে ৫১৫ রান উঠলে ইনিংস ডিক্লেয়ার্ড হ'ল। রামপ্রকাশ ১১৬ রান ক'রে এবং এস ব্যানার্জ্জি ৭ রান ক'রে নট আউট রইলেন।

মধ্যাহ্ন ভোজের পর ইউরোপীয় দল তাদের প্রথম ইনিংস আরম্ভ করে এবং চা পানের এক ঘণ্টার মধ্যেই ১৪০ রানে ইউরোপীয় দলের প্রথম ইনিংস শেষ হয়ে যায়। ডিকসন দলের সর্ব্বোচ্চ ৩৯ রান করেন। এস ব্যানার্জী ১০ ওভার বলে ২টী মেডেন এবং ১৯ রান দিয়ে ৪টী উইকেট পেলেন।

৩৭৫ রান পিছনে থেকে ইউরোপীয় দলকে 'ফলো অন' করতে হয়। দ্বিতীয় ইনিংসের কোন উইকেট না হারিয়ে তারা ১৩ রান করলে। সে দিনের মত খেলা বন্ধ হ'য়ে যায়।

তৃতীয় দিনে ইউরোপীয় দলের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হ'ল ১৬৬ রানে। স্কিনার দলের সর্ব্বোচ্চ ৪০ রান করলেন। সোহনী, ব্যানার্জি, নাইডু প্রত্যেকে ৩টে ক'রে উইকেট পেলেন। ইউরোপীয় দল এক ইনিংস ও ২০৯ রানে শোচনীয় ভাবে হিন্দু দলের কাছে পরাজিত হ'ল।

মুসলীম দল—৪৩০ (৯ উইকেট ডিক্লেয়ার্ড)
পার্শি দল—১৮৭ ও ২১৩ (৬ উইকেট)

পেণ্টাঙ্গুলার ক্রিকেট প্রতিযোগিতার প্রথম রাউণ্ডের খেলায় মুসলীম দল প্রথম ইনিংসের খেলায় অগ্রগামী থাকায় বিজয়ী বলে ঘোষিত হয়।

পার্শি দল প্রথম ব্যাটিং করে এবং চা পানের কিছু পরই তাদের ১৮৭ রানে প্রথম ইনিংস শেষ হয়। জে বি খোট দলের সর্ব্বোচ্চ ৬৪ রান করেন। মোবেদ ৩২ রান করে নটআউট থাকেন।

মুসলীম দলের প্রথম ইনিংস আরম্ভ হয় এবং দিনের শেষে ১ উইকেটে ৭৫ রান উঠে।

দ্বিতীয় দিনে মুসলীম দলের ৭ উইকেটে ৩২৬ রান উঠলে সে দিনের মত খেলা শেষ হয়। নজর মহম্মদের ৬১ রান, আনওয়ার হোসেনের ৫৯ রান, কে সি ইব্রাহিমের ৫৬, এম মার্চ্চেণ্টের ৫৫ রান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তৃতীয় দিনে ৪৩০ রানে মুসলীম দলের প্রথম ইনিংস ডিক্লেয়ার্ড করা হল। আমীর ইলাহীর ৬৯ রানই দলের সর্ব্বোচ্চ ছিল। খোট ৯৫ রানে তিনটি উইকেট পেলেন।

২৪৩ রান পিছনে পড়ে পার্শি দলের দ্বিতীয় ইনিংস আরম্ভ হ'ল। খেলার নির্দ্দিষ্ট সময় অতিক্রম করলে দেখা গেল ৬ উইকেটে পার্শি দল ২১৩ রান করেছে। আর মোদী নটআউট ৭২ রান এবং কুপার ৫১ রান করেন।

মুসলীম দল—৩৫৩ ও ১৬৩ (৩ উইকেট)
অবশিষ্ট দল—৩৯৫

পেণ্টাঙ্গুলার ক্রিকেট প্রতিযোগিতার অপর দিকের সেমি-ফাইনালে মুসলীম দলের সঙ্গে অবশিষ্ট দলের খেলা হয়। অবশিষ্ট দল প্রথম ইনিংসের রানে অগ্রগামী থাকায় বিজয়ী হয়েছিল।

মুসলীম দল টসে জয়লাভ ক'রে ব্যাটিং আরম্ভ করে এবং দিনের শেষে ৮ উইকেটে ৩০৬ রান করে। নজর মহম্মদ ১৪১ রান ক'রে নটআউট থাকেন। ২৬ এবং ৩২ রানের মাথায় উইকেটের পিছনে তিনি দু'বার ধরা দেবার সুযোগ দিলেও তাঁর খেলা সূচনা থেকেই ভাল হয়েছিল। অবশিষ্ট দলের ফিল্ডিং ভাল না হওয়ার ফলেই মুসলীম দল অতিরিক্ত রান তুলতে সক্ষম হয়। দ্বিতীয় দিনে মুসলীম দলের ৩৫৩ রানে প্রথম ইনিংস শেষ হ'ল। নজর মহম্মদ ১৫৪ রান করলেন ৩৪২ মিনিটে। গুল মহম্মদের ৪২ রানও উল্লেখযোগ্য।

দ্বিতীয় দিনে অবশিষ্ট দলের প্রথম ইনিংস আরম্ভ হ'ল ১২-৪০ মিঃ। আরম্ভ মোটেই ভাল হ'ল না। মধ্যাহ্ন ভোজের সময় ৩ উইকেটে মাত্র ৩০ রান উঠেছে। দিনের শেষে অবশিষ্ট দলের ৪ উইকেটে ২২৫ রান দাঁড়াল। ভি এস হাজারী ১১৯ রান ক'রে নটআউট রইলেন।

তৃতীয় দিনের খেলায় ২৫০০ হাজার দর্শকের সামনে হাজারী নিজস্ব ২৪৮ রান ক'রে আমীর ইলাহীর বলেই তাঁর কাছে ধরা পড়লেন। দলের রান উঠেছে ৩৯৪।

হাজারীর এই ব্যক্তিগত রান সংখ্যায় পেণ্টাঙ্গুলার ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় ভি এম মার্চ্চেণ্ট প্রতিষ্ঠিত পূর্ব্ববর্ত্তী ২৪৩ রানের রেকর্ড (১৯৪১ সালে মুসলীম দলের বিরুদ্ধে) অতিক্রম করে। হাজারী সর্ব্বসমেত ৪৪৫ মিনিট খেলেছিলেন; তাঁর রান সংখ্যায় ২১টা 'বাউণ্ডারী' ছিল। অবশিষ্ট দলের ৩৯৪ রানে আর মাত্র এক রান যোগ হবার পর ইনিংস শেষ হয়ে যায়। এই রান উঠতে ৫০০ মিনিট সময় নেয়। আরোলকার ৬৬ রান করেন। আমির ইলাহী ১৬০ রানে ৮টা উইকেট পান।

মুসলীম দল আর মাত্র দু'ঘণ্টা হাতে নিয়ে দ্বিতীয় ইনিংস আরম্ভ করলো। তিন উইকেটে ১৬৩ রান উঠলে খেলা শেষ হয়ে গেল।

কে সি ইব্রাহিম ৭১ রান করে নট আউট থাকেন। গুল মহম্মদের ৩৬ এবং ইনায়েৎ খাঁর ৩৪ রান উল্লেখ করা যায়। অবশিষ্ট দলের এই বিজয় সম্ভব হয়েছিল হাজারীর ব্যক্তিগত কৃতিত্বের জন্য। তাঁর দৃঢ়তাপূর্ণ ক্রীড়াচাতুর্য্য দর্শকদেরও মুগ্ধ করেছিল।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রণীত নাটক "ধাত্রীপান্না"—১৷৷০
শ্রীনিকুঞ্জ পত্রী প্রণীত উপন্যাস "হে বান্ধবী মোর"—২৲
শ্রীশশধর দত্ত প্রণীত উপন্যাস "মোহনের প্রথম অভিযান"—২৲
সরলা নন্দী ও প্রফুল্লনলিনী নন্দী প্রণীত "প্রেমাবতার যীশুখৃষ্ট"—৮০
শ্রীবীণাপাণি দেবী সাহিত্য সরস্বতী প্রণীত রন্ধন-শিক্ষা "মেয়েদের পিকনিক"—২৲
শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ প্রণীত "সমাজ ও সাহিত্য"—৩৲
শ্রীহরিপদ দে প্রণীত "মুক্তির ডাক"—১৷০

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ

২০৩৷১৷১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা ; ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত



শিল্পী—শ্রীযুক্তা ইন্দুরাণী সিংহ কুসুম কলিকা ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্



মাঘ—১৩৫০

দ্বিতীয় খণ্ড | একত্রিংশ বর্ষ | দ্বিতীয় সংখ্যা

ব্রহ্মজ্ঞান ও তাহার সাধন

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্‌-এ

উপনিষদের যে সকল অংশে ব্রহ্মজ্ঞানের বর্ণনা আছে সে সকল অংশ এত চিত্তাকর্ষক যে—সকল দেশের সকল যুগের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ উচ্ছ্বসিত ভাষায় সে সকলগুলির প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান কি উপায়ে লাভ করা যায়—উপনিষদের যে সকল অংশে তাহা নির্দেশ করা হইয়াছে, সে সকল অংশের প্রতি অনেকে যথেষ্ট মনোযোগ প্রদান করেন নাই, অথবা সে সকল অংশ তাঁহারা লক্ষ্য করিলেও তাঁহাদের মনঃপূত হয় নাই বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। উপনিষদে যদিও ইহা স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে বেদবিহিত কর্ম অনুষ্ঠান করিতে হইবে এবং বেদবিহিত আচার পালন করা প্রয়োজন, তথাপি কেহ কেহ বেদবিহিত কর্ম এবং আচারের নিন্দা করেন, যদিও তাঁহারা উপনিষদুক্ত ব্রহ্মজ্ঞানের প্রশংসা করিয়া থাকেন।

ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন হয়—ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি দেখেন সম্মুখে ও পশ্চাতে, দক্ষিণে ও বামে, উর্দ্ধে ও অধে—সর্বত্রই ব্রহ্ম।

ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাৎ ব্রহ্ম পশ্চাৎ
ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ।
অধশ্চোর্দ্ধং চ প্রসৃতং
ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠং॥
মুণ্ডকোপনিষৎ ২।২।১১

"অমৃতস্বরূপ ব্রহ্ম সম্মুখভাগে, ব্রহ্ম পশ্চাৎভাগে, ব্রহ্ম দক্ষিণে, ব্রহ্ম উত্তরে, ব্রহ্মই অধ এবং উর্দ্ধে প্রসারিত হইয়াছেন, এই বিশ্ব ব্রহ্মই, এই জগৎ বরণীয়তম ব্রহ্মই"।

যাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে, বিশ্বজগতের সকল বস্তুর মধ্যেই তিনি তাঁহার আত্মাকে দর্শন করেন। কারণ তাহার আত্মা ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যায় এবং ব্রহ্ম জগতের যাবতীয় বস্তুর মধ্যেই অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন।

সংপ্রাপ্যৈনমৃষয়ো জ্ঞানতৃপ্তাঃ
কৃতাত্মানো বীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ।
তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরা
যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি
মুণ্ডকোপনিষদ্ ৩।২।৫

"এনম্" এই ব্রহ্মকে "সংপ্রাপ্য" সম্যকরূপে প্রাপ্ত হইলে তাঁহাকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিতে পারিলে, "ঋষয়ঃ" ঋষিসকল "জ্ঞান তৃপ্তাঃ" ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া পরিতৃপ্ত হন; যাঁহারা ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন, ব্রহ্ম কি বস্তু তাহা জানিতে পারেন, যে ব্রহ্ম অনন্ত অসীম আনন্দের সমুদ্র, তাঁহার মধ্যেই যাবতীয় জীব অবস্থান করিতেছে, তাঁহার মধ্যে থাকিয়াও তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না, মনে করিতেছে যে দুঃখ পাইতেছে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে কিছু দুঃখই নাই, "কৃতাত্মনো" আত্মা কি বস্তু তাহা তাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছেন, বুঝিয়াছেন যে আত্মা দেহ নয়, ইন্দ্রিয় নয়, মন বা বুদ্ধিও নয়, তাহাদের অপেক্ষা সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ, "বীতরাগাঃ" তাহাদের সকল কামনা দূরীভূত হয়, আমরা সেই আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হই না বলিয়াই বাহ্য জগতের নানাবিধ বস্তু—শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ—আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকি,

ঋষিগণ সেই আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে জানিতে পারেন, তাঁহাদের কোনও আকাংক্ষা থাকে না ; "প্রশান্তাঃ" আমাদের কামনাসকলই আমাদের হৃদয়কে চঞ্চল করে, সুতরাং যাঁহাদের কোনও কামনা নাই তাঁহাদের হৃদয় তরঙ্গহীন সমুদ্রের ন্যায় প্রশান্তভাবে অবস্থান করে, "তে" ঋষিগণ "সর্ব্বগং" জগতের সর্ব্বত্র অবস্থিত, সকল বস্তুর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট ব্রহ্মকে "সর্ব্বতঃ প্রাপ্য" সকল রকমে অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে প্রাপ্ত হইয়া "ধীরাঃ" নিত্য ও অনিত্য বস্তুর বিবেক (পার্থক্য) উপলব্ধি করিয়া, "যুক্তাত্মানঃ ব্রহ্মের সহিত তাঁহাদের আত্মাকে সর্বদা সংযুক্ত রাখিয়া "সর্বম্এব আবিশন্তি" সকল বস্তুর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েন, সকল জানিতে পারেন, সকল অনুভব করিতে পারেন।

"ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মএব ভবতি" যিনি ব্রহ্মকে জানিতে পারেন, তিনি ব্রহ্মই হইয়া যান। "আনন্দাৎ হি এব খলু ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রযন্তি অভিসংবিশন্তি" এই সকল প্রাণী আনন্দ হইতেই উৎপন্ন হয়, আনন্দের দ্বারাই জীবিত থাকে, প্রয়াণকালে আনন্দেই প্রবিষ্ট হয়। "রসো বৈ সঃ" সেই ব্রহ্ম আনন্দ স্বরূপ। "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন" ব্রহ্মের আনন্দস্বরূপকে জানিতে পারিলে কদাচ ভীত হয় না। "সোঽকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয়" সেই ব্রহ্ম কামনা করিলেন—"আমি বহু হইব—আমি বহুরূপে জন্মগ্রহণ করিব"। "য আত্মা অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকোঽবিজিঘিৎসঃ অপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ" যে ব্রহ্ম আত্মস্বরূপ, যিনি নিষ্পাপ, যাঁহার জরা নাই, মৃত্যু নাই, ক্ষুধা নাই, পিপাসা নাই, যাঁহার কামনা সত্য, যাঁহার সংকল্প সত্য। "ঐতদাত্ম্যং ইদং সর্বং তৎ সত্যং স আত্মা তৎ ত্বম্ অসি শ্বেতকেতো" ব্রহ্ম এই বিশ্বজগতের আত্মস্বরূপ, তিনিই সত্য, হে শ্বেতকেতো, তুমিই সেই ব্রহ্ম। "উত তমাদেশম্ অপ্রাক্ষ্যঃ যেন অশ্রুতং শ্রুতং ভবতি অমতং মতং অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতং" তুমি কি সেই বিষয়ে উপদেশ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে—যাহা জানিলে যাবতীয় অশ্রুত তত্ত্ব শ্রুত হয়, অচিন্তিত বস্তু চিন্তিত হয়, অবিজ্ঞাত বস্তু বিজ্ঞাত হয়। এই সকল জ্ঞানগর্ভ বাক্য শুনিলে সকলেরই চিত্ত শ্রদ্ধাভরে আনত হয়। এই সকল কথা শুনিয়া সোপেনহয়ার (Schopenhauer) বলিয়াছেন "almost superhuman conceptions" "whose originators can hardly be regarded as mere men" অর্থাৎ এই সকল ধারণাকে অলৌকিক বলা যায়, যাঁহারা এইরূপ ধারণা করিতে পারিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে মানব বলা যায় না। (শাস্ত্র বলেন, বেদ অপৌরুষেয়, সোপেনহয়ার সেই কথাই সমর্থন করিয়াছেন।) ডয়সন (Deussen) বলিয়াছেন "There are philosophical conceptions unequalled in India or perhaps anywhere else in the world" উপনিষদে যে সকল দার্শনিক তত্ত্ব আছে সমগ্র পৃথিবীতে বোধ হয় ততদূর উচ্চ ধারণা কোথাও দেখা যায় না। উইণ্টারনীজ বলিয়াছেন "those highest questions which were at last treated so admirably in the Upanishads" অর্থাৎ সেই সকল শ্রেষ্ঠ প্রশ্ন—যেগুলি উপনিষদে এত সুন্দরভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপায় সম্বন্ধে উপনিষদ একস্থানে বলিয়াছেন যে ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞ, দান এবং তপস্যা অনাসক্তভাবে সম্পাদন করিয়া ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা করে। ("তমেব ব্রাহ্মণাঃ বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা অনাশকেন" বৃহদারণ্যক উপনিষদ ৪।৪।২২)। উপনিষদের এই বাক্য প্রতিধ্বনি করিয়া শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন, "যজ্ঞ, দান এবং তপস্যা ত্যাগ করা উচিত নহে, এই সকল কর্ম সম্পাদন করা উচিত, এই সকল কর্ম চিত্ত শুদ্ধ করে ; আসক্তি এবং ফলাকাংক্ষা ত্যাগ করিয়া এই সকল কর্ম অনুষ্ঠান করা উচিত ইহা আমার নিশ্চিত এবং উত্তম মত।"

যজ্ঞ দানং তপঃ কর্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেবতৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাং॥ ১৮।৫

এতান্যপি তু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতম্ উত্তমম্॥ ১৮।৬

উপনিষদ বলিলেন 'অনাশকেন'। ভগবান তাহার ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন 'সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ'। এরূপ মনে হইতে পারে যে দান ও তপস্যা নিশ্চয় ভাল কাজ। কিন্তু নানাবিধ দেবতার স্তবস্তুতি পাঠ করিয়া অগ্নিতে আহুতি দিলে অথবা পশুবধ করিলে তাহাতে কি ভাল হইতে পারে ; বিশেষতঃ উপনিষদ এক পরব্রহ্মের কথা বলিয়াছেন, নানাবিধ দেবতার কল্পনা কি আর্য্য জাতির প্রথম জ্ঞানোন্মেষের সময়ের ভ্রান্ত ধারণা নহে? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে উপনিষদে এক সর্বশক্তিমান পরব্রহ্মের কথা আছে ইহা সত্য ; কিন্তু বৈদিক দেবতাদের কথাও উপনিষদে বহু স্থানে বলা হইয়াছে ; এই সকল দেবতা পরব্রহ্ম কর্ত্তৃক সৃষ্ট এবং তাঁহার প্রদত্ত শক্তির সাহায্যে জগৎ পালন করেন। ঈশোপনিষদের শেষ শ্লোকে অগ্নি দেবতার নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। কেনোপনিষদে বলা হইয়াছে যে ইন্দ্র, বায়ু এবং অগ্নি অন্য দেবতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; কঠোপনিষদে যম দেবতা নচিকেতাকে যজ্ঞের দ্বারা অগ্নির উপাসনা শিক্ষা দিতেছেন, মুণ্ডকোপনিষদে বলা হইয়াছে যে পরব্রহ্ম হইতে দেবতাগণের উৎপত্তি হইয়াছে, ফলতঃ বিভিন্ন উপনিষদের নানা স্থলে দেবগণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। উপনিষদ বলিয়াছেন—বেদবিহিত যজ্ঞ করিয়া স্বর্গলাভ করা যায় সত্য, কিন্তু স্বর্গে চিরকাল থাকা যায় না ; সুতরাং কেহ যদি মোক্ষকে জীবনের উদ্দেশ্য করেন তাহা হইলে তাঁহাকে স্বর্গলাভের আকাংক্ষা বর্জন করিতে হইবে। তাই বলিয়া উপনিষদ বৈদিক যজ্ঞ করিতে নিষেধ করেন নাই, যজ্ঞ অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তৈত্তিরীয় উপনিষদ বলিয়াছেন যে দেবকার্য্য (যজ্ঞ) এবং পিতৃকার্য্য (শ্রাদ্ধ ও তর্পণ) কখনও অবহেলা করিবে না। "দেবপিতৃ কার্য্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যং" তৈত্তিরীয় উপনিষদ ১।১১।২। ফলের আশা করিয়া যজ্ঞ করিলে স্বর্গলাভ হয়, কিন্তু নিষ্কামভাবে যজ্ঞ করিলে চিত্ত শুদ্ধ হয়। ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য চিত্ত শুদ্ধ করা একান্ত প্রয়োজন। এই জন্য উপনিষদ এবং গীতায় নিষ্কামভাবে যজ্ঞ করিতে বলা হইয়াছে। যজ্ঞ করিতে হইলে দীর্ঘকাল ধরিয়া দেহ ও মনকে সংযত করিয়া রাখা প্রয়োজন হয়। উপবাস, বিশুদ্ধভাবে মন্ত্রোচ্চারণ, মন্ত্রের অর্থ চিন্তা, দেবতার ধ্যান, নিরন্তর এই সকল অভ্যাস করিলে ইন্দ্রিয় সংযম স্বাভাবিক হইয়া যায়। চিত্তের মলিনতার প্রধান কারণ ইন্দ্রিয়ের অসংযম। যজ্ঞ সাধন দ্বারা ইন্দ্রিয় সংযম অভ্যাস করিলে চিত্ত নির্মল হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই সকল সূক্ষ্ম তত্ত্ব বুঝিবার চেষ্টা করেন নাই! তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে উপনিষদ যখন এক পরব্রহ্মের কথা বলিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই উপনিষদের মতে বৈদিক দেবতাগণের কল্পনা মিথ্যা এবং যজ্ঞ সকল বুজরুকি মাত্র। Dr. Winternitz লিখিয়াছেন—"While the Brahmanas were pursuing their barren sacrficial science, other circles were engaged upon those highest questions which were at last treated so admirably in the Upanishads," অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণ যখন নিষ্ফল যজ্ঞের অনুষ্ঠানে রত ছিলেন তখন অন্য দলের লোক উচ্চ দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা করিতেছিলেন—যে তত্ত্ব সকল অবশেষে উপনিষদে উৎকৃষ্ট ভাবে আলোচনা করা হইয়াছিল। আমরা কিন্তু বৃহদারণ্যক উপনিষদে দেখিতে পাই যে জনক রাজার যজ্ঞ সভাতেই ব্রাহ্মণগণ দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছিলেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে দেখিতে পাই রাজার যজ্ঞ সভায় উষস্তি ঋষি দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা করিয়া যজ্ঞ সম্পাদন করেন। Macdonald লিখিয়াছেন "Though the upanishads generally form a part of the Vedas, they really represent a new religion which is in virtual opposition to the ritual or practical

side." অর্থাৎ যদিও উপনিষদগুলি বেদেরই অংশ তথাপি তাহারা একটি নূতন ধর্ম শিক্ষা দেয় যাহা অনুষ্ঠানমূলক যজ্ঞাদির বিরোধী। আমরা পূর্বে দেখাইয়াছি যে যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান ব্রহ্মজ্ঞানের বিরোধী নহে, ব্রহ্মজ্ঞানের উপযোগী। অন্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও এইভাবে লিখিয়াছেন। Garbe লিখিয়াছেন—"The Brahmin priest is proficient only at excogitating sacrifice after sacrifice…senseless ritualistic hocus pocus. All at once lofty thoughts appear on the scene xx A passionate desire to solve the riddle of the universe and its relation to the ownself holds the mind captive." অর্থাৎ পুরোহিতগণ কেবল অর্থহীন যজ্ঞ করিতে পারিতেন, হঠাৎ সে স্থলে উচ্চ দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা আরম্ভ হইল। Hertel লিখিয়াছেন—"The kshattriyas unable to believe in the vedic Gods substituted instead the idea of nature powers and propounded a philosophy which was essentially a monism," অর্থাৎ ক্ষত্রিয়গণ বৈদিক দেবতাতে বিশ্বাস করিতে না পারিয়া একেশ্বরবাদ প্রচার করেন। উপনিষদের কোনও কোনও স্থলে দেখা যায় যে ক্ষত্রিয় রাজাগণ দার্শনিক তত্ত্ব শিক্ষা দিতেছেন। কিন্তু আরও অধিক স্থলে দেখা যায় যে ব্রাহ্মণগণই শিক্ষা দিতেছেন। তাহা লক্ষ্য না করিয়া Hertel সাহেবকে লিখিতেছেন যে ব্রাহ্মণগণ বৈদিক দেবতা লইয়া ব্যস্ত ছিলেন, ক্ষত্রিয়গণ তাহা পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করেন। তিনি যে কল্পনা করিয়াছেন ব্রহ্মজ্ঞান ও দেবতাতত্ত্বের মধ্যে বিরোধ আছে তাহাও যথার্থ নহে। Dr. Ernest Hume লিখিয়াছেন—"The whole religious doctrine of different Gods and of the necessity of sacrificing to the Gods is seen to be a stupendous fraud by the man who has acquired metaphysical knowledge of the monistic unity of the self and of the world in Brahman or Atman." অর্থাৎ যাঁহাদের ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে তাঁহারা দেখিয়াছেন যে বহু দেবতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করা একটি জুয়াচুরি মাত্র। আমরা পূর্বে উপনিষদ হইতে বাক্য উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে উপনিষদ দেবতার পূজা করিতে বলিয়াছেন, যজ্ঞ করিতে বলিয়াছেন, তথাপি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ দেবতত্ত্বের প্রতি এবং যজ্ঞের প্রতি বিদ্বেষ হেতু কেবল কল্পনার উপর নির্ভর করিয়া এই সকল কথা বলিয়াছেন। (ক্রমশঃ)

দিবা-স্বপ্ন

শ্রীজয়ন্তকুমার চৌধুরী

চিৎপুর আর হ্যারিসন্-রোড যেখানে মিশেছে এসে
তারি ডান-ধার ঘেঁসে
লম্বাটে বাড়ী—মেসবাড়ী চারতোলা ;—
বহুদিন ধরে এখানেই আছি, ঘরখানা ভালো, পুবে ও দখিনে খোলা।
সাম্‌নের ফালি বারান্দাটায় মাটির টবেতে পোঁতা—
হাট থেকে কেনা চীনে-চামেলীর লতা।
খোলা জানালায় তাহারি গন্ধ ঢোকে ;
ঝিমোনো-দুপুরে ঝিম্ লেগে যায়,
অলস-শয়নে ঘুম নেমে আসে চোখে।
সারা দুপুরের গাঢ়-ঘুম থেকে উঠি পাঁচটার পরে ;
গুমোট লেগেছে ঘরে ;
ঘোর-লাগা চোখে চায়ের পেয়ালা হাতে—
ভারী ভালো লাগে ঠাণ্ডা-হাওয়ায় চুপ্-চাপ্ ক'রে বসিতে বারান্দাতে।
দেখি বসে বসে কত কি যে চলে, চলেছে লোকের-মেলা—
উদাস বিকালবেলা।
কত শাড়ী আর কত ধুতি-পাঞ্জাবী,
কত রকমের কত লোক চলে ;—
দেখি চেয়ে আর কত কি যে মনে ভাবি।
প্রবীণ উকিল আন্‌মনা চলে ট্রামের-লাইন ধ'রে—
ঘাড়টাকে কাৎ ক'রে।
বাঁকা-শিরদাঁড়া সাম্‌নে গিয়েছে ঝুঁকি' ;
কালো-শাম্‌লার স্থানে-অস্থানে খয়েরীর আভা মাঝে মাঝে দেয় উঁকি।
সে কবে কখন্ এই প্রবীণের নবীন-মনের কোনে,
কবে সে সঙ্গোপনে—
গুটি বেঁধেছিল 'রাসবিহারী'-র কীট ;—
সে গুটির কাঁচা-সোনালী সুতোর আগা-পাশ্-তলা বাঁধা পড়ে গেছে গিঁট।
পথে যেতে তাই আজিও হয়ত ভাবিছে আইন-জীবী
পুরাণো সে-কথা সবি।
হঠাৎ কখন্ চোখের সুমুখ দিয়ে
ফুলের-ময়ূরে-লুকোনো মোটারে বর চলে যায় বধূটিকে পাশে নিয়ে।
বুড়ো-রাস্তাটা জোয়ানের মত হেসে ওঠে উল্লাসে ;—
নয়নের পথে আসে—
চকিতের তরে দুটি ভাসা ভাসা মুখ ;
কান্নার-জলে-ভারী-হয়ে-ওঠা চোখ দুটি, আর দুটি চোখ উৎসুক।
ছেলেটির চোখে এখনো ভাসিছে আবুহোসেনের নেশা,
গত রজনীর বাসরের স্মৃতি-মেশা।
চারিদিকে হাসি, উৎসব রাশি, ফুলের গন্ধ তাজা ;
কোন্ সে হারুণ-অল্-রসিদের খেয়ালেতে গড়া একটি রাতের রাজা।
ও-ধারে একটি কলেজের ছেলে চলিতেছে পথ বেয়ে,—
সঙ্গে একটি মেয়ে,—
পাত্‌লা-গড়ন, বোকা-বোকা মুখ, চোখ দুটি ভাসা-ভাসা ;—
বুকেতে বেঁধেছে বাসা—
ভবিষ্যতের রঙীন্ স্বপ্ন কত,
সাত-রঙে-গড়া ইন্দ্রধনুর মত।
প্রণয়ের ধারা বন্ধন হারা চলিতেছে সোজা পথে ;—
সহসা আপনা হ'তে—
অভিভাবকের উপল-খণ্ডে প্রতিহত হয়ে বেঁকে,
বালীগঞ্জের লেকে
হয়তো বা এসে লভিবে চরম-গতি ;
তরুণ-মনের সুখ-স্বপনের প্যাথেটিক্ পরিণতি।
শত জীবনের শত ধারা চলে সুমুখের পথ বেয়ে ;—
আছি শুধু ব'সে চেয়ে।
মনের পথেও গোপনে গোপনে কারা করে আনা-গোনা।
বাহিরের সুরে বোনা—
ভিতরের এই তারের যন্ত্রখানি,—
হাসি-কান্নার সরু-মোটা তারে তোলে কত কি যে ধ্বনি।

প্রতীক

শ্রীমতী প্রতিমা গঙ্গোপাধ্যায়

১

বিবাহের বিশ বৎসর পরে অমিতা পিত্রালয়ে যাইতেছে পূজার সময়।

অন্য সময়ে সে মধ্যে মধ্যে পিত্রালয়ে গিয়াছে, কিন্তু বিবাহের পর পূজার সময় এই প্রথম তাহার পিত্রালয়ে যাওয়া।

প্রায় প্রতি বৎসরই পূজায় পিতামাতাকে দেখিবার আবেদন সে বহুবার জানাইয়াছে ও প্রত্যেকবারই তাহা নামঞ্জুর হইয়াছে নানা ওজর আপত্তি তুলিয়া।

বেশী কর্তৃত্বের আধিক্যবশত: শশুরালয়ের কর্তৃপক্ষ ভুলিয়া যাইতেন যে বধূরও সম্পূর্ণ স্বাধীন একটি মনোবৃত্তি আছে ও ইচ্ছা অনিচ্ছা আছে, যাহা সহস্র নিষেধ ও শাসনের নাগপাশে বাঁধা থাকিলেও অনমনীয় থাকে এবং যত বাধা পায় ততই তাহা আত্মপ্রকাশ করিতে চায়।

বিবাহের পর প্রথম প্রথম পূজার কয়দিন সারাদিন ঘুরিয়া ফিরিয়া ভাইবোনগুলির মুখ ও সে আপনি কি করিত না করিত, কিরূপ আনন্দকোলাহলে তাহার পিতৃ-গৃহ মুখরিত হইত তাহারই তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনাগুলিও মনে পড়িয়া তাহার মন কেমন করিত ও মন উদাস হইয়া যাইত।

বিজয়ার দিন রাত্রে যখন প্রণাম সারিয়া আশীষ্ লইয়া কর্ম্মশেষে শয্যায় যাইত, গভীর রাত্রির স্তব্ধতায় ধীরে ধীরে মনে পড়িত পিতামাতার স্নেহপূর্ণ মুখ। কতদিন তোমাদের প্রণাম করি নাই, মনে করিতেই ধারা বাহিয়া ঝরিয়া পড়িত অশ্রু!

এসব অবশ্য বহুদিন পূর্ব্বেকার কথা।

তাই বোধহয় তাহার স্বাধীনতালাভের প্রথম বৎসরেই অমিতা চলিল পিত্রালয়ের পথে, তাহার ক্ষুদ্র বালিকার বঞ্চিত হৃদয়খানি সঙ্গে লইয়া।

পিত্রালয়ে পিতামাতাও পূজার সময় কন্যার আগমনে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন। বহুদিন পরে তাঁহাদের আদরিণী জ্যেষ্ঠা কন্যা শারদীয়া পূজায় তাঁহাদের নিকট আসিতেছে। তাঁহাদের মনের আকাঙ্ক্ষা তাঁহাদের দীন মনের তলেই বরাবর লুক্কায়িত থাকিত, ধনী বৈবাহিক মহলে তাহা তাঁহারা কোনদিন প্রকাশ করিতে পারেন নাই সাহস করিয়া। কেবল পূজার কয়দিন মন তাঁহাদের উদাস করিয়া তুলিত—প্রথমা কন্যার সহাস্য মুখখানির বিরহে, মনে হইত আহা! কতদিন আসে নাই। বহুদিন পরে তাঁহাদের অমি পূজার সময় গৃহে আসিতেছে।

স্বভাব-গম্ভীর পিতাও তাঁহার গাম্ভীর্য্য ভুলিয়া বার বার অন্দরে আসিয়া কেবলি প্রশ্ন করিতেছিলেন "হ্যাঁগা কোন তারিখে ওরা আসছে গা?" এবং বহুবার শ্রুত তারিখটি পুনরায় শুনিয়া অপ্রতিভ হইয়া বলিতেছিলেন "ও হ্যাঁ হ্যাঁ, খালি ভুলে যাচ্ছি।"

মাতা ফরমাস দিয়া কন্যার জন্য নানা দ্রব্যের আয়োজনে ব্যাপৃত আছেন, মুখে তাঁহার প্রসন্নহাসি মনের স্বাভাবিক হাসি ফুটিয়াছে।

ছোট ভগ্নীটি ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবলি মাকে প্রশ্ন করিতেছে "হ্যাঁমা তুমি যে বলেছিলে দিদি দুর্গার মত আসছে—দোরে আমের পল্লবপূর্ণ ঘট বসাবে তা করছ না কেন? কবে বসাবে?"

আনন্দের আবেগে কোন অসতর্ক মুহূর্ত্তে বলিয়া ফেলা উচ্ছ্বাসটুকু কন্যা সরল মনে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। মা অপ্রতিভহাসি হাসিয়া বলিতে ছিলেন "হাঁরে দেবো বইকি।"

২

শুইয়া অমিতা ভাবিতেছিল যে আগ্রহ আকাঙ্ক্ষা লইয়া অমিতা পিত্রালয়ে তাহার শূন্যস্থানটি পূর্ণ করিতে আসিয়াছিল আজ আসিয়া দেখিতেছে যে সেই স্থানটিই আর নাই। বিশ বৎসরের ব্যবধানে সেই স্থানটি তাহার হারাইয়া গিয়াছে।

নতুবা এমন হইতেছে কেন? আজ তাহার পিত্রালয়ে পূজা। কালীপূজা। পূর্ব্বে যেমন আয়োজন দেখিত, তেমনি আয়োজন হইয়াছে কিন্তু তাহার মনে সে উৎসাহ কই?

আসিয়া পর্য্যন্ত তাহার একটি কথা ক্রমাগত মনে হইতেছে—যে আনন্দ পাইতে আসিয়াছিল—যে ভাবে পাইবে ভাবিয়াছিল, তাহা পাইতেছে না। পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনীগণের সহিত স্নেহে শ্রদ্ধায় আনন্দে ভালবাসায় যে দিনগুলি কাটিতেছে সে আনন্দ তো সে পূর্ব্বেও পাইয়াছে—আজও দেখিতেছে সেই আনন্দই তাহার প্রধান আনন্দ। কিন্তু সে উৎসবের আনন্দ কই? যে কথা স্মরণ করিয়া কতদিন সে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছে, মনে মনে ভাবিয়াছে একটিবার যাইতে পারিলেই তাহার পুরাণো দিনগুলি ফিরিয়া পাইবে হায় তাহা কই?

শৈশবকালে সঙ্গিণীগণের সহিত সেই স্বল্পমূল্যের পূজার নূতন সাড়ীখানি পরিয়া কপালে খয়েরের টিপ দিয়া পায়ে আলতা রাঙ্গাইয়া কত আনন্দেই না পূজাস্থলে ছুটিত। ঢাকের বাজনা সুরু হইলে আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব সহিত না, ছুটিয়া চলিয়া যাইত যেন কণামাত্র উৎসবের আনন্দ ফাঁকি পড়িয়া না যায়। পূজা হইতে আরতি পর্য্যন্ত দেখিয়া তবে তৃপ্তি হইত। তখন মনে হইত এতবড় প্রতিমা, এমন জাঁকজমক বুঝি আর কোনও দেশে নাই। কতদিন মনে মনে সে এই সকল কথাই ভাবিত।

বক্সিদের সেই পূজা-বাড়ী সেই সাবেকী চালের পূজার আয়োজন সবই তেমনি আছে। কিন্তু সেই পূজা-বাড়ীতে গিয়া দেখিয়া তাহার মনে হইতেছিল—এত সামান্য আয়োজন? এমনি টিমটিম করিয়া পূজা?

মেজবৌদি তাহার মুখ দেখিয়া কি ভাবিয়া ছিলেন কে জানে, তবে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলেন "তোদের ওখানে পূজোয় বুঝি খুব ধুম হয়?"

অন্যমনস্কে অমিতা উত্তর দিয়াছিল "হাঁ।"

তিনি বলিয়াছিলেন "তাতো হবেই, বিদেশের লোকে বেশী ধুম করে। তা সেইজন্যে এখানে তোর মন লাগছে না।"

অমিতা অপ্রতিভ হইয়া গিয়াছিল।

কিন্তু সত্যই কি তাই ? তাহাতো নহে। ওখানে যত ব্যয়-বহুল উৎসব হউক না কেন, তাহার প্রাণ তো তখন কাঁদিত এখানকার জন্যই ?

মনে পড়ে ছোট বেলার কথা, দুর্গা পূজার শেষে কি ব্যগ্র-ব্যাকুল প্রতীক্ষা করিয়া থাকিত কালী পূজার জন্য। কবে কালী পূজা আসিবে ; মনে হইত দিন যেন ফুরাইতে চাহিতেছে না। কারণ তাহাদের বাটীতে কালী পূজা। তাহার পর অবশেষে সেই আকাঙ্ক্ষিত দিনটি আসিলে সে কি আনন্দ। আজ বহুদিন পরে কালী পূজায় সে উপস্থিত রহিয়াছে, কিন্তু মনে তাহার সে স্ফূর্ত্তি কই ? সব যেন নিষ্প্রভ বোধ হইতেছে।

পূজাস্থল দেখিয়া আসিয়াছে। একটি গ্যাস জ্বলিতেছে। উঠানের কোনে ঢাক পিটিতেছে এবং তাহার সহিত তাল দিয়া একটি ছোট ছেলে কাঁসী বাজাইতেছে। আলো আঁধারে ঘেরা মন্দির প্রাঙ্গণ। বারান্দায় উপবাসী বিধবার দল পূজা দর্শন আকাঙ্ক্ষায় বসিয়া গল্প জুড়িয়াছে।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বাজী লইয়া ঘুরিতেছে। তাহার মনে হইতেছে ইহাতে প্রাণ নাই, সেই প্রাণভরা উৎসবের কোলাহল তো নাই ?

মাকে সে প্রশ্ন করিয়াছিল "হাঁ মা,আগের চেয়ে এখন আয়োজন কম হয়, না ?"

মা বিস্মিত হইয়া বলিয়াছিলেন "না তো ? আগের চেয়ে এখন লোক খাওয়ানো বেশীই হয়, তুই ভুলে গেছিস্।"

মনের মধ্যে কেমন যেন তাহার অস্বস্তি বোধ হইতেছিল, কেমন যেন খাপ খাইতেছে না, তাহার মন যেন নিঃঝুম হইয়া আছে, পূর্ণ আনন্দ আসিতেছে না, কি যেন চলিয়া গিয়াছে তাহা আসিতেছে না।

সেই অস্বস্তিভরা মন লইয়া আর ঘুরিতে ভাল লাগিতেছিল না—তাই নির্জ্জনে আপনার ঘরখানিতে আসিয়া অমিতা শুইয়া আছে।

মাথার নিকটে মৃদুভাবে রেডিয়োতে গান চলিতেছে।

৩

অমিতা তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়াছিল, উচ্চ কোলাহলে তাহার তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। কে চেঁচায় ? কান পাতিয়া শুনিতেই বুঝিতে পারিল নীচেকার অঙ্গনে ছেলের দল কোলাহল করিতেছে।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে অনেকক্ষণ। লজ্জায় অমিতা চোখ মুছিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। মা এতক্ষণ কি করিতেছেন কে জানে ?

ছেলে মেয়ে—তাহারাই বা কোথায় ঘুরিতেছে !

নীচে যাইবার পূর্ব্বে অমিতা পশ্চিমের বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইল। নীচেকার প্রশস্ত অঙ্গনে ততক্ষণে ছেলেমেয়ের দল ভীড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

সম্মুখের উচ্চ প্রাচীরে সারি সারি দীপমালা জ্বলিতেছে।

তাহার ভ্রাতা স্বহস্ত-প্রস্তুত তুবড়ী জ্বালাইতেছে, তাহা ফুল কাটিয়া দোতলার সমান উচ্চ হইতেছে আর সমাগত বালক-বালিকা আনন্দে চীৎকার করিয়া প্রশংসা করিতেছে।

তাহাতেই এত কোলাহল !

তাহার ছোট ভগিনী ও কন্যাটি হাত ধরাধরি করিয়া ঘুরিতেছে।

প্রদীপ ও রংমশালের আলোয় তাহাদের আনন্দ-উদ্ভাসিত মুখমণ্ডল অতি সুন্দর বোধ হইতেছে।

আনন্দপূর্ণ সরল মুখছবি, প্রাণের সজীবতা, উৎসবের আনন্দ-ভঙ্গী, তাহাদের বচনে—তাহাদের চঞ্চল গতিতে।

তাহার ছোট ভগিনীটি ছুটিয়া ভ্রাতার নিকট গেল "ন'-দা আমায় একটা তুবড়ী দাওনা বলির সময় জ্বালাবো।"

আর একটি মেয়ে ছুটিয়া আসিল "আমাকেও একটা তুবড়ী ন'দা।"

কে একজন বলিল "এবারকার তুবড়ী তোমার সবচেয়ে ভাল হয়েছে চুনেদা।"

নিবিষ্টচিত্তে তুবড়ীতে আগুন দিতে দিতে তাহার ভাইটি সাফল্যের হাসি হাসিয়া বলিল "তা হবেই তো, এবার যে বড়দি এসেছেন, বড়দির মেয়েছেলেরা এসেছে—তাদের জন্যই তো করেছি, তাই খুব মন দিয়ে মেপে মশলা দিয়েছি।"

'ওই যে ওই বড়দির ছেলেমেয়ে' চুনী হস্ত সঙ্কেতে অমিতার পুত্রকন্যাকে দেখাইয়া দিল।

অমিতা দেখিল তাহার পুত্রকন্যা আনন্দে কোলাহল-রত বালকবালিকাগণের সহিত মিলিয়া খেলিতেছে—হাতে তাহাদের রংমশাল, জ্বলন্ত ফুলঝুরী ক্ষণে ক্ষণে উচ্চহাসির রোলে চারিদিক ভরিয়া দিতেছে।

চাহিয়া চাহিয়া সহসা অমিতার মনে হইল—ওই তো তাহার প্রতিচ্ছবি।

কি সে ভাবিতেছিল ? হঠাৎ তাহার মনে হইল—

যে শূন্যতা সে এতক্ষণ বোধ করিতেছিল তাহা তো স্বাভাবিক। তাহার ওই আনন্দের দিন ফুরাইয়া গিয়াছে, ধীরে ধীরে তাহার অজ্ঞাতে তাহার দিন চলিয়া গিয়াছে, আর তাহা ফিরিবেনা ! এ আনন্দ উপভোগ করিবার ক্ষমতা তাহার লুপ্ত হইয়াছে।

তাহা বলিয়া আনন্দ ফুরাইয়াছে কি ? আনন্দ যে অফুরন্ত, আনন্দ অন্তরে। তাহার শিশুকাল ফুরাইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহারই শিশুপ্রতীকগণ ঠিক তাহারই মত করিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া নিঃশেষে আনন্দ গ্রহণ করিতেছে। তাই তো অমিতা সকাল হইতে ইহাদের দেখিতে পায় নাই, পূজা স্থলেই ইহারা আছে। উৎসবেই তাহারা মগ্ন। সে দূরে সরিয়া গিয়াছে। তাহার সেই শূন্যস্থান পূর্ণ করিয়াছে অন্যে। যে শূন্যতা সে বোধ করিতেছে, তাহা তাহার অন্তরে, কিন্তু জগতে তাহার স্থান শূন্য নাই। তুমি, আমি, সে, এমনি করিয়াই জীবনপ্রবাহের স্রোত অক্ষুণ্ণবেগে চলিয়াছে। ইহাই জীবনধারা।

অমিতার ভারাক্রান্ত মন নিমেষে লঘু হইয়া গেল।

সত্যই তো ! সত্যই তো ! বিগত যৌবন, সে প্রৌঢ়ত্বের দ্বারে দাঁড়াইয়া শৈশবের অনাবিল আনন্দ চাহিতেছিল কেমন করিয়া ?

তাহার দুঃখ নাই। তাহারই পুত্রকন্যা, ভ্রাতা, ভগিনীগণ যে তাহারই, শৈশবের আনন্দ তাহারই প্রতীক।

আজিকার পূজা, আজিকার উৎসব তাহাদের জন্য। তাহাদের আনন্দ উৎসব সে শুধু দেখিবে।

তিব্বতের বৌদ্ধসংস্কৃতি

অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সরকার এম্‌-এ, পি-আর-এস্‌, পি-এইচ-ডি

(২)

আনুমানিক ৮১০ খৃষ্টাব্দে খলিফাগণের সহিত এবং ৮২২ খৃষ্টাব্দে চীনের সহিত তিব্বতের সন্ধি হয়। সঙ্ঘর্ষের পরিণামে এই তিন রাষ্ট্রেরই সামরিক শক্তি ধ্বংস হইয়াছিল। আবার এই দুইটী সন্ধি-স্থাপনের ফলে এবং তিব্বতরাজ রল্‌-প-চন কর্ত্তৃক বৌদ্ধপ্রীতিমূলক শান্তিনীতি অনুসরণের জন্য তিব্বতীয় জাতি দীর্ঘকাল সামরিক বিদ্যাচর্চ্চার অবসর পায় নাই। যাহা হউক, উহার পর যে দীর্ঘকালব্যাপী রাষ্ট্রীয় দুর্য্যোগ তিব্বত অন্ধকার করিয়া রাখিয়াছিল, সেই দুর্দ্দিনে বৌদ্ধ ভিক্ষুসমাজের নৈতিক অধোগতি হইলেও, তাঁহারা ধীরে ধীরে কিছু কিছু রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হইয়া উঠিতেছিলেন।

একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে যে-শেস্‌-ওদ্‌ নামক একজন নরপতি তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্ম্মের মালিন্য দূর করিতে প্রয়াসী হন, তিনি পশ্চিম তিব্বতের গু-গে এবং পু-রঙ্‌স্‌ নামক স্থানে অবস্থান করিতেন। এই সময়ে এশিয়ার নানা দেশ হইতে বৌদ্ধাচার্য্যগণ তিব্বতে উপস্থিত হন। যে-শেস্‌-ওদ্‌ মগধের বিক্রমশীল বিহারের অধ্যক্ষ আচার্য্য অতিশ বা অতীশকে তিব্বতে আনয়নের চেষ্টা করেন। বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসে অতিশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান নামে বিখ্যাত। অতিশকে তিব্বতীয় গ্রন্থাবলীতে পূর্ব্বভারতস্থিত বাংলা দেশের অন্তর্গত বিক্রমণিপুর বা বিক্রমপুরের রাজবংশের কুমার বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। তিনি কালচক্রযান মতাবলম্বী ছিলেন। যে-শেস্‌-ওদের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্রের রাজত্বকালে আনুমানিক ১০৩৮ খৃষ্টাব্দে অতিশ তিব্বতে উপনীত হন এবং তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্ম্মে নূতন প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি কাল-বিভাগ গণনার সংস্কার করেন এবং লামাধর্ম্মকে তিব্বতীয় কুসংস্কার হইতে বিমুক্ত করিতে প্রবৃত্ত হন। ইহার ফলে সংস্কারপন্থী কয়েকটী নূতন সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয় এবং কতিপয় প্রাচীন সম্প্রদায় সংস্কৃত হইয়া শক্তিশালী হয়। এই সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে কহ্‌-দম্‌-প, শাক্য-প এবং কর্‌-গ্যু-প বিশেষ বিখ্যাত। অতিশ প্রায় তের বৎসর তিব্বতে অবস্থান করিয়া অনুমান ১০৫৩ খৃষ্টাব্দে ৭৩ বৎসর বয়ঃক্রমকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার অসংখ্য গ্রন্থের মধ্যে বোধিপথপ্রদীপ সুবিখ্যাত। তাঁহাকে কহ্‌-দম্‌-প সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বলা হইয়া থাকে। কিছুকাল পরে পূর্ব্বোক্ত সম্প্রদায়সমূহ শক্তিশালী হইয়া দেশের অভ্যন্তরে নানা স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের অধিকার হস্তগত করে এবং যাজকতন্ত্র শাসনের সূত্রপাত হইতে থাকে। ইহার ফলে তিব্বতে চীন ও মোঙ্গোলদিগের উপদ্রব বর্দ্ধিত হয়। দ্বাদশশতাব্দীতে কর্‌-ম-প, দি-কুঙ্‌-প, ত-লিঙ্‌-প প্রভৃতি কয়েকটি উপসম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছিল।

একাদশ শতাব্দীতে বজ্রযানমতাবলম্বী ভারতীয় সিদ্ধাচার্য্যগণও তিব্বতে সমাদর লাভ করিয়াছিলেন। বজ্রাচার্য্যগণের মধ্যে নরো-পর নাম সুবিখ্যাত। মর্‌-প নামক অপর একজন সিদ্ধাচার্য্য তিব্বতীয় কবি ও সাধক মি-ল-রস্‌-পর (১০৩৮-১১২২ খৃঃ) গুরু ছিলেন। মর্‌-প কিছুকাল তিব্বতে অবস্থানের পর ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তিনি বিক্রমশীল বিহারে আচার্য্য অতিশের সমসাময়িক ছিলেন।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্ম্ম এক নূতন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। এই সময়ে চীনের মোঙ্গোলজাতীয় য়ুয়ান্‌ বংশীয় সম্রাট্‌ কুবলাই খান্‌ তিব্বত অধিকার করিয়া তাঁহার মোঙ্গোল দলবলসহ লামাধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ১২৬১ খৃষ্টাব্দে তিনি শাক্য বিহারের অধ্যক্ষকে চীনে নিমন্ত্রণ করেন এবং তাঁহার নিকট লামাধর্ম্মে দীক্ষিত হন। এই ধর্ম্মে অনুরাগী হইয়া কুবলাই খান্‌ পেকিনে এবং মোঙ্গোলিয়ার নানা স্থানে বৌদ্ধবিহার নির্ম্মাণ করিলেন। অতঃপর তিনি শাক্যমঠের প্রধানাচার্য্যকে লামা-ধর্ম্মাবলম্বিগণের সর্ব্বপ্রধান গুরু এবং নিজের অধীনে তিব্বত দেশের প্রধান শাসকরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই শাক্য আচার্য্যই লামাধর্ম্মের মহাগ্রন্থ কহ্‌-গ্যুর্‌ সংগ্রহগ্রন্থখানিকে অন্যান্য পণ্ডিত-গণের সাহায্যে মোঙ্গোল ভাষায় অনুবাদ করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি তিব্বতীয় লিপিতে মোঙ্গোল ভাষা লিখিবারও ব্যবস্থা করিয়া-ছিলেন; কিন্তু সে ব্যবস্থা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। যাহা হউক, এ সময় হইতে প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীকাল শাক্য বিহারের অধ্যক্ষগণ তিব্বতের ধর্ম্ম ও রাষ্ট্রগুরু ছিলেন। এই সময়ে অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী বৌদ্ধ সম্প্রদায়গুলিকে নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল। কথিত আছে, ১৩২০ খৃষ্টাব্দে শাক্য সম্প্রদায় দিকুঙ্‌স্থিত কর্‌-গ্যু-প সম্প্রদায়ের বিহারটী ভস্মীভূত করিয়া দেয়। কিন্তু শীঘ্রই শাক্য সম্প্রদায়ের রাষ্ট্রীয় প্রভাবের অবসান ঘটিল। ১২৬৮ খৃষ্টাব্দে য়ুয়ান্‌ বংশ উচ্ছেদ করিয়া মিঙ্‌ বংশীয় সম্রাট্‌গণ চীনের আধিপত্য লাভ করেন। তাঁহারা বৌদ্ধ হইলেও লামাধর্ম্মকে প্রীতির চক্ষে দেখিতেন না। শাক্যমঠের প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ণ করিবার জন্য তাঁহারা কহ্‌-দম্‌-প ও কর্‌-গ্যু-প সম্প্রদায়ের অপর দুইটী বিহারের অধ্যক্ষকে শাক্য মঠাধ্যক্ষের সমান অধিকার ও মর্য্যাদা দান করিলেন। এমন কি, তাঁহারা সম্প্রদায়সমূহের পারস্পরিক বিবাদেও প্রশ্রয় দিতে লাগিলেন। এই সময়ে লামাধর্ম্ম ক্রমশঃ নৈতিক অধোগতির নিম্নস্তরে পৌঁছিতেছিল।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে সোঙ্‌-খ-প (জন্ম আঃ ১৩৫৫ খৃঃ) নামক এক ব্যক্তি লামাধর্ম্মের সংস্কারে প্রবৃত্ত হন। তিনি তিব্বতের বিভিন্ন মঠের নানা ধর্ম্মগুরুর নিকট ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ভিক্ষু-দিগের ব্রহ্মচর্য্যমূলক কঠোর জীবন যাপনের ব্যবস্থা করা এবং লামাধর্ম্ম হইতে তন্ত্রমন্ত্রের প্রভাব হ্রাস করা সোঙ্‌-খ-পর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহার সংস্কার প্রচেষ্টার ফলে গে-লুগ্‌-প সংজ্ঞক একটী নবীন সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। তিনি লাসার নিকটবর্ত্তী গহ্‌-দন্‌ বিহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। শীঘ্রই সেরা, দেপুঙ্‌ এবং তশিলুনপো নামক স্থানে তিনটী নূতন বিহার প্রতিষ্ঠিত হইল এবং গে-লুগ্‌-প সম্প্রদায়ের প্রতিপত্তি বাড়িতে লাগিল।

কিছুকাল পরে তিব্বতের পুরোহিত-রাজের পদ ও পদবী এই সম্প্রদায়ের করতলগত হইল। আজিও গে-লুগ্-প সম্প্রদায়ের লামাগণ দলৈ লামার পদ লাভ করিয়া থাকেন।

এই সময়ে অবতার পারম্পর্য্যবাদের সূত্রপাত হয়। ইহা তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য। ইহার মূল কথা এই —যে কোন দেবতা একবার কোন সম্প্রদায়মধ্যে মনুষ্য মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইলে সেই সম্প্রদায়ে ক্রমাগত তাঁহার আবির্ভাব হইতে থাকে অর্থাৎ কোন দেবতা যদি কোন মঠাধ্যক্ষের রূপে আবির্ভূত হন, তবে সেই মঠের পরবর্ত্তী সমুদয় অধ্যক্ষকেই উক্ত দেবতার অবতার বলিয়া বুঝিতে হইবে।

১৬৪০ খৃষ্টাব্দে গে-লুগ্-প সম্প্রদায়ের পঞ্চম মহালামা ঙগ্-ওয়াঙ্-লো-জঙ্ মধ্য তিব্বতের শাসনাধিকার হস্তগত করেন। তিনি একজন পদস্থ তীব্বতীয় রাজকর্ম্মচারীর সন্তান ছিলেন এবং তশিলুন্-পো মঠের অধ্যক্ষ ছোস্-কি-গ্যল্-সনের তত্ত্বাবধানে দেপুঙ্ বিহারে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিব্বত দেশটী খন্-দো বা পূর্ব্বদেশ, বু বা মধ্যদেশ এবং সঙ্ বা পশ্চিম দেশ—এই তিনটী স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। তিনটী রাষ্ট্রই ফগ্-মো-দ্রু বংশীয় নরপতিগণের শাসনাধীন ছিল। মধ্য তিব্বতে গেলুগ্-প সম্প্রদায়ের প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছিল; কিন্তু অপর দুইটী রাষ্ট্রে তাহার মর্য্যাদা অবিসংবাদী হয় নাই। ১৬৩০ খৃষ্টাব্দে পশ্চিম তিব্বতপতির অভিভাবক মধ্য তিব্বত জয় করেন। তিনি শাক্য সম্প্রদায়ের অনুগামী ছিলেন। ফলে তাঁহার শাসন সময়ে গেলুগ্-প সম্প্রদায়ের প্রতিপত্তি নানারূপে ক্ষুণ্ণ হয়। ঙগ্-ওয়ান্ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহার গুরুর সহযোগিতায় স্বীয় সম্প্রদায়ের দুর্গতির বিষয় উল্লেখ করিয়া মোঙ্গোল নায়ক গুশি-খানের নিকট এক আবেদন উপস্থাপিত করেন; কারণ এই মোঙ্গোল নেতা গে-লুগ্-প সম্প্রদায়ের অনুগামী ছিলেন। গুশি খান্ অবিলম্বে তিব্বত অধিকার করিয়া মহালামা ঙগ্-ওয়াঙের উপর তিব্বতের শাসন-ভার অর্পণ করিলেন। ইহার ফলে রাষ্ট্রনায়ক এবং ধর্মগুরু হিসাবে মহালামার প্রাধান্য দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল। অর্দ্ধসভ্য কুসংস্কারান্ধ মোঙ্গোল জাতির নিকট এই তন্ত্রসিদ্ধ আচার্য্যের অনুগ্রহ ও আশীর্ব্বাদের মূল্য অল্প ছিল না। গুশিখান্ কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ ঙগ্-ওয়াঙ্কে দলৈ উপাধিতে ভূষিত করিলেন। মোঙ্গোল ভাষায় দলৈ শব্দটীর অর্থ মহাসমুদ্র অর্থাৎ মহাসমুদ্রের ন্যায় প্রশান্ত বা জ্ঞানগম্ভীর। এই উপাধির জন্য তিব্বতের ধর্ম্ম-গুরু এবং রাষ্ট্রনায়ককে বিদেশীয় পণ্ডিতেরা দলৈ লামা আখ্যায় অভিহিত করিয়া থাকেন। কিন্তু স্বদেশে তিনি রিন্-পো-ছে অর্থাৎ প্রভুত্বের মহামণি নামে পরিচিত। যাহা হউক, গুশি খানের সময় হইতে তশিলুন্-পো মঠের অধ্যক্ষেরা এই গৌরবান্বিত উপাধিতে ভূষিত হইয়া আসিতেছেন এবং লাসা ও তশিলুন্-পো মঠের অধ্যক্ষদ্বয় যথাক্রমে অবলোকিতেশ্বর ও অমিতাভের অবতার রূপে পূজিত হইতেছেন।

ঙগ্-ওয়াঙ্ অচিরেই তিব্বতে সুদৃঢ় রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিলেন। তিনি আপন সম্প্রদায়ের শক্তি বর্দ্ধিত করিলেন এবং বিবিধ উপায়ে অন্যান্য সম্প্রদায়ের ক্ষতিসাধন ও উহাদের মঠসমূহ আত্মসাৎ করিতে লাগিলেন। লাসার নিকটে তিনি পো-ত-ল সংজ্ঞক মহাবিহার নির্ম্মাণ করাইলেন। তাঁহার চেষ্টায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতৃগণ তাঁহাকে এবং তাঁহার উত্তরাধিকারিগণকে দেবাংশসম্ভূত এবং একই দেবতার পারম্পর্য্যক্রমাগত অবতার রূপে স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। আনুমানিক ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে ঙগ্-ওয়াঙ্ মৃত্যুমুখে পতিত হন; কিন্তু রাজনৈতিক কারণে তদীয় অমাত্য দে-স্রিদ্ এই মৃত্যুর কথা গোপন রাখিয়া সুদীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর কাল তাঁহারই নামে রাজ্য শাসন করিতে থাকেন।

পরবর্ত্তী দলৈ লামা সঙ্-য়ঙ্-গ্যা-সে অনিয়ন্ত্রিতচরিত্র ছিলেন; তাঁহাকে কোনক্রমেই এই সম্মানিত পদের উপযুক্ত বলিয়া স্বীকার করিতে ইচ্ছা হয় না। তাঁহার রচিত প্রেমগীতিসমূহ আজ পর্য্যন্ত তিব্বতে গীত হইয়া থাকে। কথিত আছে, ১৭০৫ খৃষ্টাব্দে চীন সরকারের প্ররোচনায় সঙ্-য়ঙ্ নিহত হন। এই সময় হইতে চীনের শাসনকর্ত্তৃপক্ষের নির্দ্দেশানুযায়ী তিব্বতের রাষ্ট্রীয় শাসন এবং পররাষ্ট্রীয় সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত হইতে থাকে। দলৈ লামার নিয়োগ ব্যাপারেও চীন কর্ত্তৃপক্ষ হস্তক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহাতে গেলুগ্-প সম্প্রদায়ের মর্য্যাদা বিশেষ ক্ষুণ্ণ হয় নাই; কারণ এই সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের মধ্য হইতে দলৈলামা নিয়োগের ব্যবস্থা অব্যাহত ছিল। দুঃখের বিষয়, নৈতিক ও আচারগত অবনতির ফলে শীঘ্রই এই শক্তিমান্ ও মর্য্যাদাশীল সম্প্রদায়টীর বৈশিষ্ট্য হ্রাস পাইতে থাকে। আজকাল কেবলমাত্র কিঞ্চিৎ কঠোর ব্রহ্মচর্য্য বিধি এবং নিজস্ব বেশভূষা ও চিহ্ন দ্বারা গেলুগ্-প সম্প্রদায়ের স্বাতন্ত্র্য বুঝিতে পারা যায়।

তিব্বতের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে যাজকতান্ত্রিক শাসন বলা হয়। মধ্য ও উত্তর এশিয়ার কোন কোন অঞ্চলে এইরূপ শাসন ব্যবস্থার অস্তিত্ব অবগত হওয়া যায়।

এইবার তিব্বতীয় সাহিত্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া আমরা প্রবন্ধের উপসংহার করিব। ভারতীয় গ্রন্থাবলী তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়া তিব্বতে দুইটী বিরাট সংগ্রহে সঙ্কলিত হইয়াছিল। এই দুইখানি সংগ্রহ গ্রন্থের নাম কন্-গ্যু র্ অর্থাৎ অনুবাদিত বাণী (বুদ্ধবাণী) এবং তন্-গ্যু র্ অর্থাৎ অনুবাদিত ধর্ম্ম (বৌদ্ধাচার্য্যগণের নির্দ্ধারিত মার্গ)। এই দুই মহাগ্রন্থকে তিব্বতের শ্রুতি এবং স্মৃতি বলা যাইতে পারে। কথিত আছে, বু-তোন্ (জন্ম ১২৮৮ খৃঃ) নামক প্রসিদ্ধ তিব্বতীয় পণ্ডিত এই দুইখানি গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থদ্বয়কে সুবিখ্যাত চৈনিক ত্রিপিটকের সহিত তুলনা করা যায়। কিন্তু চীন এবং তিব্বত উভয়ত্রই দেখা যায়, অনুবাদিত আরও কতকগুলি গ্রন্থ ছিল; কিন্তু সেগুলি সঙ্কলনকর্ত্তার দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিছুকাল পূর্ব্বে তিব্বতীয় ভাষায় একখানি সংক্ষিপ্ত রামায়ণ কাহিনী আবিষ্কৃত হইয়াছে; কিন্তু উহা সংগ্রহে গৃহীত হয় নাই। যাহা হউক, তিব্বতীয় অনুবাদ সঙ্কলনে ভারতীয় গ্রন্থ ব্যতীত চীনা এবং মধ্য এশিয়ার ভাষাসমূহে রচিত পুস্তকের অনুবাদও দেখিতে পাওয়া যায়। আবার ইহাতে যে সকল ভারতীয় গ্রন্থানুবাদ সংগৃহীত হইয়াছে উহার সকলগুলি বৌদ্ধ-শাস্ত্র নহে; ভারতীয় জ্ঞানবিজ্ঞান বিষয়ক অপর কতকগুলি গ্রন্থও ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। উদাহরণ-স্বরূপ নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে—পাণিনি, চন্দ্র, কলাপ, সারস্বত প্রভৃতি ব্যাকরণ; অমরের নামলিঙ্গানুশাসন প্রভৃতি কোষগ্রন্থ; কালিদাসপ্রণীত মেঘদূত প্রভৃতি কাব্য;

দণ্ডীর কাব্যাদর্শ প্রভৃতি অলঙ্কারবিষয়ক পুস্তক ; ছন্দোরত্নাকর, বৃত্তমালা প্রমুখ ছন্দোগ্রন্থ ; বাগ্‌ভটকৃত অষ্টাঙ্গহৃদয় এবং অন্যান্য আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রীয় পুস্তক ; প্রতিমালক্ষণাদি মূর্ত্তিশিল্প সম্পর্কিত গ্রন্থ ; চাণক্য নীতি প্রমুখ নীতিশাস্ত্র ইত্যাদি, ইত্যাদি। এই সংগ্রহে দুইখানি অনমুবাদিত সংস্কৃত গ্রন্থও স্থান পাইয়াছে—নাগার্জ্জুন কৃত ঈশ্বরনিরাকরণ এবং কালিদাসকৃত সরস্বতী-স্তোত্র। এই কালিদাস মেঘদূত রচয়িতার সহিত অভিন্ন কিনা, তাহা বলা যায় না। তিব্বতীয় অনুবাদের বৈশিষ্ট্য এই যে ইহা অত্যন্ত মূলানুগত। অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ ভারতবর্ষ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে ; কিন্তু তিব্বতীয় অনুবাদ হইতে পণ্ডিতগণ উহার কয়েকখানির সংস্কৃত মূল উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

তিব্বতের নিজস্ব সাহিত্যও বিপুল। সঙ্ঘ, সম্প্রদায় বা মঠ-বিশেষের ইতিহাস এবং দলৈলামা ও অন্যান্য লামার জীবন বৃত্তান্ত সম্পর্কে বহু তিব্বতীয় গ্রন্থ আছে। পদ্মসম্ভব, অতিশ প্রমুখ বৌদ্ধাচার্য্যের পদ্য বা গদ্যময় জীবনচরিত তিব্বতে অত্যন্ত জনপ্রিয়। অনুবাদিত ও মৌলিক বহুসংখ্যক আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থের একটী বিরাট সংগ্রহ আছে। উহার নাম বৈদূর্য্য-ঙোন্-পো (নীল মাণিক্য)। অনুরূপ একটী বিপুল জ্যোতিষ গ্রন্থ সংগ্রহের নাম বৈদূর্য্য-কর্-পো (শ্বেত মাণিক্য)। অনেকগুলি আখ্যায়িকা গ্রন্থ আছে ; মধ্য এশিয়া হইতে প্রাপ্ত সে-সব্ কাহিনী তিব্বতে লোকপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে। উপকথা এবং কাব্যও তিব্বতীয় সাহিত্যে অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। আবার শ্রৌত ও গৃহ্যসূত্রের ন্যায় আচার-বিষয়ক এবং প্রবাদ ও মহাজনবাণী বিষয়ক পুস্তকও অসংখ্য রহিয়াছে। অবশ্য তিব্বতীয় সাহিত্যের অনেক গ্রন্থের মূলেই ভারতীয় প্রভাব বিদ্যমান; কিন্তু কোন কোন স্থলে চীন-দেশীয় সাহিত্যেরও প্রভাব লক্ষিত হয়।

চায়না ও আয়না

শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়

১

মেয়েটির নাম 'চায়না'।

বাঙালী মেয়ের এমন নাম কেন হলো ?

অনুসন্ধানে জান্‌লাম—নামটি তার নিরর্থক নয়। বিভিন্ন অর্থ-সঙ্গতি নিয়েই চায়নার নামকরণ সার্থক হয়ে আছে।

চায়নার মা পুত্রবতী ছিলেন না। চার মেয়ের পর 'চায়না'কে তিনি মোটেই চান্‌নি। চায়নার বাবা আবিষ্কার করেছিলেন—'মুখখানা তার নাকি ঠিক চীনামেয়েদের মত।' চায়নার দাদামশাই ছিলেন হোমিওপ্যাথ। দেড় মাস বয়সে সে নাকি ভুগেছিল খুব কঠিন 'মাসিপিশি' রোগে। দাদামশাই তাকে আরোগ্য করেছিলেন—'এক ফোঁটা চায়না দিয়ে।' সে কারণে—তিনি তাকে ডাকেন 'চায়না দিদি', আর চায়না তাঁকে ডাকে 'হোমিও দাদু'।

বারো বছর বয়সে চায়না সঠিক বুঝ্‌লো—সত্যিই এ জগতে কেউ তাকে চায় না। মা-বাবা দু'জনেই গেলেন স্বর্গে। দিদিরা ঠিক স্বর্গে না-গেলেও প্রায় তার কাছাকাছি কোথাও গেলেন, তাঁদের শ্বশুর বাড়িতে।

মা মরার পর চায়না তার হোমিওদাদুর কোলে ব'সে কাঁদে। তিনি নিজের কোঠরগত চোখদু'টি মোছেন আর বলেন—"ছিঃ, কাঁদতে নেই।"

"তুমি কাঁদো কেন দাদু ?"

"কই কাঁদি ? বারে, আমি তো হাসি। এই দেখ্‌না হাস্‌ছি"……

হাসির সঙ্গে জড়িয়ে যায় কান্নার করুণ সুর। বুড়োর কোলে কচি মেয়েটির মতো, সে হাসিও যেন ম্লান হ'য়ে কান্নার কোলে মিশে থাকে।

২

চায়না পা দিয়েছে ষোলোতে।

হোমিওদাদু বলেন—"চায়না ! এখন তোকে একটা রাঙা বরের সঙ্গে বিয়ে দি'……"

চায়নার চোখ ছল্‌ছলিয়ে ওঠে, হোমিওদাদুর গলাটা জড়িয়ে ধ'রে বলে—"কেন দাদু ! তুমিও কি আমাকে চাও না ?" হোমিওদাদুর দম্ আটকে আসে, হাত দু'খানা ছুঁড়ে ফেলে—চোখমুখ চেপে পালিয়ে যান্। কথাটা ঠিক বলা হয় না। চায়না হাসে।

বিয়েকে চায়না বড় ভয় করে। কারণ, সে জানে—বাঙালী মেয়েদের ওটা প্রায় স্বর্গে যাওয়ার সামিল। দিদিরা সেই-যে গেছে, আর তো আসেনি ? মার যাওয়ার সঙ্গে, তাদের যাওয়ার তফাৎ কি ? হোমিওদাদু এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন না।

চায়না বলে—"দোহাই দাদু ! আমি বিয়ে চাই না।"

চায়নার চিবুকটা ধ'রে আদর ক'রে হোমিওদাদু বলেন—"বিয়ে যে তোকে চায় দিদিমণি ?"

চায়নার চোখমুখ অন্ধকার হ'য়ে ওঠে—হোমিওদাদুর কোলে মুখ লুকিয়ে চোখ মোছে। মুখ তুলে চোখ রাঙিয়ে জিজ্ঞাসা করে—"বিয়ে যে আমাকে চায়, তা' তুমি কি করে জান্‌লে দাদু ?"

"ওই দেখ্, একটা রঙিন প্রজাপতি তোর কপাল ছুঁয়ে পালিয়ে গেল—তোর সারা গায়ে ছড়িয়ে দিয়ে গেল—বিয়ের ছাপ্ !"

চায়না বেগে ছুটে যায়। প্রজাপতিটাকে ধ'রে এনে শাস্তি দিতে চায়, কিন্তু তার দু'ডানায় রংবেরঙের কারুকার্য্য দেখে চমকে ওঠে—বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করে—"প্রজাপতির ডানা-দুটোকে এভাবে চিত্রিত করেছে কে দাদু ?"

"তোর সারা দেহটাকে বিয়ের রঙে রাঙিয়ে দিচ্ছে যে"······

চায়না হোমিওদাদুর মুখ চেপে ধরে। চিৎকার ক'রে ব'লে ওঠে—"না, না, না। বিয়ে আমি চাই না। প্রজাপতিটাকে আমি টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ছিঁড়ে ফেল্‌বো।"

হোমিওদাদু হাত চেপে ধরেন "ছিঃ"······

৩

ছেলেটি এলোপ্যাথ। চায়না তাকে চায় না জেনেও সে তাকে বিয়ে করেছে—হোমিওদাদুর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে। কিন্তু বিয়ের পরেই চায়না অসুস্থ। মাথায় তার অসহ্য যন্ত্রণা। দিনরাত হোমিও-দাদুর জীর্ণ-শীর্ণ ঠাণ্ডা হাতখানা কপালে চেপে ধ'রে শয্যায় শুয়ে থাকে।

চায়না একদিন হঠাৎ কেঁদে ওঠে—"দাদু! কেন তুমি আমাকে চাও না? কি অপরাধ করেছি আমি? সবার মত তুমিও কি শেষে"······আর বল্‌তে পারে না।

হোমিওদাদু ডুকরে কেঁদে ওঠেন। চায়নাকে বুকে চেপে ধ'রে বলেন···"ওরে চায়না। আমি তোকে চাই বলেই তো বিয়ে দিইছি—তোকে সুখী করতে চেয়েছি—এ কথাটা তুই কেন বুঝ্‌বি না?"

চায়না বলে—"ওই যে আমাকে স্বর্গে পাঠাবার জন্যে উনি আস্‌ছেন—ওকে বাধা দাও, বলে দাও, আমি স্বর্গে যাব না।" শ্বশুর বাড়িকে সে স্বর্গ বলেই জানে।

এলোপ্যাথ একটা হাইপোডারমিক সিরিঞ্জে দশগ্রেন কুইনাইন নিয়ে চায়নার পাশে এসে দাঁড়ায়, চায়না ভয়ে শিউরে ওঠে। চিৎকার করে কেঁদে বলে, "রক্ষা করো দাদু! রক্ষা করো আমাকে, ওঁর হাত থেকে।"

হোমিওদাদু এলোপ্যাথকে বাধা দিয়ে বলেন—"থাক্‌, আর ইন্‌জেকসান ক'রো না।"

এলোপ্যাথ বিস্মিত হ'য়ে বলে—"কি বল্‌ছেন আপনি? 'ম্যালিগ্‌ন্যান্ট ম্যালেরিয়া' যে!"

হোমিওদাদু দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ ক'রে বলেন—"যা' ভাল বোঝ করো। তুমিই এখন মালিক!"

কুইনাইন ইন্‌জেক্‌সানের ফলে সে যাত্রা চায়না বেঁচে গেল বটে, কিন্তু তার মুখে আর হাসি ফুট্‌লো না। সে যেন শুকিয়ে যাওয়া ফুলটির মতো বোঁটার বাঁধন থেকে আল্‌গা হয়ে ঝরে পড়তে লাগ্‌লো।

* * * *

চায়না চলে গেল, রেখে গেল একটি ছোট্টো মেয়ে হোমিও-দাদুর কোলে। তিনি তার নাম রেখেছেন—'আয়না'। নিষ্প্রভ কোটরগত চোখদুটি 'আয়না'র উপর রেখে, তিনি দেখেন 'চায়না'কে। হ্যাঁ, ঠিক! সেই নাক, সেই চোখ, সেই মুখ, সেই হাসি। কে বলে চায়না নেই?

হঠাৎ একদিন কাঁপ্‌তে কাঁপতে—এলোপ্যাথের নাকে একটা ঘুষি মেরে হোমিওদাদু চিৎকার ক'রে ওঠেন—"চায়না বেঁচে আছে, তবু তুমি কেন আর একটা বিয়ে করলে—ব্রুট্‌!"

এলোপ্যাথ এ কেন'র জবাব দিতে না-পেরে একান্ত অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে থাকে।

সায়েশ্বর

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

সত্যই ছিল অনেক গুণ যে তার,
দুষ্ট সে ছিল, যত পারো দোষ দিয়ো,
শত্রুও বহু—ছিল দুনিয়ার বা'র
তবু ভালবাসি সে ছিল আমার প্রিয়।

২

কেন ভালবাসি? বুঝিতে পারিনে নিজে
দেখিলেই তারে ভুলিতাম সব দোষ,
সে নাহিক আর, আঁখি মোর উঠে ভিজে,
কতই বকেছি—দেখিনি তাহার রোষ।

৩

দুষ্ট সে ছিল—সে ছিল দুষ্ট ঘোড়া,
লাফাতো, ছুটিত, সে যে ছিল তেজী, তাজা,
চাঁটু ছুড়িয়াছে—তখন মেরেছি কোড়া
কিন্তু সে ছিল সকল ঘোড়ার রাজা।

৪

ধরণ-ধারণে সে ছিল যে বাজপাখী
অনেক পাখীর করিত বিড়ম্বনা
কষ্ট হত'না ফিরাতে তাহারে ডাকি
নিকটে আসিত—একেবারে পোষমানা।

৫

হৃদয়ে তাহার কত ছিল দয়া মায়া,
কেহ বলে ঠেঁটা, কেহ বলে তারে ঠক,
সকলি সত্য—কিন্তু তবুও আহা—
স্নেহের ভিখারী—সে ছিল মর্য্যাদক।

৬

গেছে সে চলিয়া—চোখ ভরা মোর জল,
তার কথা কই, ব্যথায় কবিতা লিখি,
পদ্মের সাথে লয়ে কাঁটা পানিফল
সে ছিল আমার গোটা "মজলিস্‌ দীঘি"

লণ্ডন তীর্থে

শ্রীমতিলাল দাস

(২)

Wormwood scrubs লণ্ডনের প্রান্তদেশে অবস্থিত বৃহৎ কারাগার। বাসে করিয়া গিয়াছিলাম। এখানকার chief officer আমাকে সাদর অভ্যর্থনা করিয়া সমস্ত জিনিষ দেখাইলেন। কয়েদীদের মধ্যে দেখিলাম কয়েকজন ভারতীয়ও আছে। ইহাতে লজ্জা অনুভব করিলাম। জেলার বলিল, "এখানে অনেকে আসে, যাদের একদম আসা উচিত নয়।"

—"নিশ্চয়ই তারা সঙ্গদোষে খারাপ হয়।"

জেলার উত্তর দিল—"তা হয় বই কি।"

বলিলাম—"আপনি তা হলে শাস্তির চেয়ে সংশোধন ভাল—এই মত অনুসরণ করেন।"

—"সম্পূর্ণভাবে করি না—কেহ কেহ Born criminal—এদের কিছুতেই ভাল মানুষ করা যাবে না—"

আমি বলিলাম—"একথা বোধ হয় ঠিক নয়, মানুষ যতই পঙ্কে পড়ুক সে তার অন্তরের দেবত্ব কখনও ভুলতে পারে না—"

জেলার মাথা নাড়িল। সে এই মতে সায় দিতে পারে না। সে বলিল—"আমাদের অভিজ্ঞতা অন্যরূপ—এমন মানুষ আছে, যাদের দুষ্প্রবৃত্তি এত গভীর যে কোনও সদাচরণেই তারা সাড়া দেয় না—তাদের চাতুর্য্য—তাদের কুভাব কিছুতেই শেষ হয় না।"

জেলারের অভিজ্ঞতা, তাহার বাস্তব জ্ঞান লইয়া তর্ক করিয়া লাভ নাই। কিন্তু আমরা আধ্যাত্মিক; আমরা বিশ্বাস করি প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই ভগবান্ আছেন। অমঙ্গল, অকল্যাণ, পাপ কেবল বাহিরের বস্তু। ভিতরে যে সদাজাগ্রত শিব আছেন, কিছুতেই তিনি পঙ্কলিপ্ত হন না। মানুষ পতনের যে স্তরেই পড়ুক না কেন, তাহার দিব্য শক্তি সুযোগ পাইলেই প্রদীপ্ত হইবে।

শ্রীঅরবিন্দ তাহার Divine Life নামক গ্রন্থে মানুষের পরিণতির কথায় ইহাই লিখিয়াছেন :—

"The liberation of the individual soul is therefore the keynote of the definitive divine action; it is the primary divine necessity and the pivot on which all also turns. It is the point of Light at which the intended complete self-manifestation in the many begins to emerge. But the liberated soul extends its perception of unity horizontally as well as vertically. Its unity with the transcendent one is incomplete without its unity with the cosmic many. And that lateral unity translates itself by a multiplication, a reproduction of its own liberated state at other points in the multiplicity. The divine soul reproduces itself in similior liberated souls as an animal reproduces itself in similar bodies"

মানুষের মুক্তির জন্যই বিধাতার এই লীলা চক্র চলিতেছে; কোনও মানুষই হেয় নহে, তুচ্ছ নহে। যে মুক্ত ও শুদ্ধ হয়, সে কেবল আপন মুক্তি ও শুদ্ধি লইয়া ব্যাপৃত থাকিতে পারে না। সকলের মুক্তির জন্যই তাহার সাধনা। অপরাধ ও অপরাধী সম্বন্ধে আমাদের মনোভাব বদলাইবার দিন আসিয়াছে। অপরাধ সমাজে ঘটে, তাহার জন্য সমাজ-ব্যবস্থাই বহু স্থলে দায়ী। ক্ষুধার্ত্ত যদি আহার না পায়, তাহা হইলে সে চুরি করিবে। যে রাষ্ট্র, যে সমাজ, মানুষের গ্রাসাচ্ছাদনের সুব্যবস্থা করিয়াছে, সেখানে চৌর্য্য লোপ পায়। মানুষের পরিবেশ তাহার স্বভাব ও চরিত্রকে নিয়ন্ত্রিত করে।

আমাদের পরাধীন দেশে মানুষ সত্যবদ্ধ হইতে পারে না, কারণ সত্য বলিবার বহু বিপদ সে সহসা গ্রহণ করিতে পারে না। য়ুরোপীয় মহিলার মত নির্ভয়ে আমাদের মেয়েরা চলাফেরা করিতে পারেন না, তাহার অন্যতম কারণ বৃটিশ মহিলা জানেন তাহার পিছনে বৃটিশ রাষ্ট্রের সমগ্র শক্তি রহিয়াছে—আর আমাদের দেশে প্রত্যহই নারী ধর্ষিত ও লাঞ্ছিত হইতেছে, রাষ্ট্র নির্ব্বিকার চিত্তে তাহা সহ্য করিতেছে।

পৃথিবীর ধন-বৈষম্যই কলহ, বিবাদ, অন্যায় ও অত্যাচারের মূল। কেহ ধনের প্রাচুর্য্যে কেমন করিয়া ব্যয় করিবে জানে না। আবার কেহ সারা দিনরাত্রি পরিশ্রম করিয়াও ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে পারিতেছে না। এই ধন-বৈষম্য দূর করিয়া ধন-সাম্য স্থাপন করিতে পারিলে পৃথিবীতে নব যুগের আবির্ভাব হইবে, অনেক চিন্তাবীর এই কল্পনা করেন। রাশিয়াতে এই সাম্যবাদের পরীক্ষা চলিতেছে। ধনতন্ত্র পৃথিবীতে দুঃখ, দারিদ্র্য, অশিক্ষা, অত্যাচার রাখিয়াছে, সাম্যবাদ মানুষের সেই মনোভাব দূর করিতে পারে। রাশিয়ার পরীক্ষা বোধহয় অনেকাংশে সাফল্য লাভ করিয়াছে।

ভাবী যে যুগ সে যুগ সমাজ-ব্যবস্থায়, শিক্ষায় ও সভ্যতায় সর্ব্ব মানুষের এই সমানাধিকারের নীতি আরও বহুলভাবে প্রচার করিবে ইহা নিঃসন্দেহ এবং মনে হয়, এই সাম্যবাদের পথেই পৃথিবীতে সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রগতি হইবে।

কারাগার দেখিয়া বাসে করিয়া পশ্চিম লণ্ডনের নানা স্থান বেড়াইয়া Lord Chancellor অফিসে গেলাম। এখানে লণ্ডনের বিভিন্ন আদালতের কার্য্য ভালভাবে দেখিবার জন্য চিঠি পত্রাদি লইয়া ফিরিলাম।

বাসায় ফিরিলে কমলাক্ষ বলিল "আপনি ক্যাম্ব্রিজে গিয়েছেন?"

বলিলাম—"না, অক্সফোর্ডে মাত্র একদিন গিয়েছি—"

"ক্যাম্ব্রিজে একটা বক্তৃতা দিন না কেন?"

উত্তর দিলাম—"আমার দিক থেকে ত আপত্তি নেই—কিন্তু ওখানে পরিচিত কেউ নেই—"

কমলাক্ষ বলিল—"আচ্ছা আমি আমার অধ্যাপককে লিখছি—"

কমলাক্ষকে বেশ ভাল লাগিতেছিল। সে আলাপ করিতে জানে।

৩রা অক্টোবর শনিবার। লেডি কারমাইকেল আজ সকালে দেখা করিতে বলিয়াছিলেন, প্রাতরাশ সারিয়া তাঁহার ওখানে গেলাম। লেডি কারমাইকেল ১৩নং পোর্টম্যান ষ্ট্রীটে থাকেন, তাঁহার সেক্রেটারী এলিসন বোলাণ্ডস লিখিয়াছিলেন :—

"Dear sir,

Lady Carmichael desires me to say that she would be so pleased if you could call and see her on Saturday morning at 12 O'clock. She hopes this time will be convenient to you and regrets that this week and the next are so fully booked up that she cannot easily arrange an appointment at a more convenient time."

সাধারণতঃ ওদেশে লোকে চায়ের নিমন্ত্রণ করেন; বেশী পরিচিত হইলে লাঞ্চের নিমন্ত্রণ করেন। ১২টার সময় দেখা করার আহ্বান সাধারণ নহে বলিয়া

চিঠিতে কৈফিয়ৎ দেওয়া হইয়াছে। পোর্টম্যান ষ্ট্রীটে পৌঁছিলে সুদর্শনা সেক্রেটারী আসিয়া আলাপ করিলেন। তারপর লেডি কারমাইকেলের বসিবার ঘরে নিয়া গেলেন। সুন্দর সুদৃশ্য ড্রয়িংরুম—নানা দেশের কারু-শিল্পখচিত। লেডি কারমাইকেল ভারতবর্ষে বহু বৎসর কাটাইয়াছেন। এখানে যে রাজকীয় আবহাওয়ার মধ্যে বাস করিয়াছেন, তাহার ছাপ তাহার আলাপে অনুভূত হয়; কিন্তু উহা বাদ দিলে তাহার অমায়িক উদারতা হৃদয়কে মুগ্ধ করে।

বিলাতে প্রত্যেক মানুষের একটা 'হবি' থাকে। এই খেয়াল না থাকিলে তাহাদের জীবন ব্যর্থ হইয়া যায়। আমাদের সংসারে আমরা পুত্রকলত্র লইয়া বাস করি, বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা পুত্র ও কন্যার সন্তান ও সন্ততিদের লইয়া কাল কাটান, কিন্তু উহাদের দেশে বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা একক, পুত্র কন্যার সংসার তাহাদের জড়ায় না। তাহাদের বাঁচিবার জন্য খেয়াল চাই।

লেডি কারমাইকেল অনেকগুলি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত আছেন। তিনি Bengal Home Industry, World Sisterhood এবং ভিক্টোরিয়া লীগ প্রভৃতিতে আছেন। আমি লেখক ও বক্তা শুনিয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং আমার এক বক্তৃতার ব্যবস্থা করিবেন বলিলেন। বিলাতে থাকিতে আর নিমন্ত্রণ পাই নাই। বোধহয় সেক্রেটারী না থাকায় এই কথা লিখিয়া না রাখায় তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন। লেডি কারমাইকেল বাংলার অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। বলিলেন বাংলার প্রতি তাঁহার প্রীতি অক্ষুণ্ণ আছে। বাংলার কুটীর-শিল্প প্রসারের জন্য তাঁহার আয়োজনকে আমি প্রশংসা করিলাম।

যন্ত্র মানুষের জীবনের চারুতা ও কমনীয়তা বিসর্জন দিয়া রুক্ষতাকে বরণ করে। সৃষ্টির মাঝে স্রষ্টা যে দিব্য আনন্দ লাভ করে, প্রত্যেক শিল্পীই সেই অমৃত রস পান করে, কিন্তু সেই শিল্প যখন মানুষের সৃষ্টিকে ছাড়াইয়া যন্ত্র দানবের কবলিত হয় তখন আমাদের বস্তু অনেক বাড়ে, কিন্তু আমাদের মনুষ্যত্ব একেবারে হারায়। যন্ত্রাগারে মানুষও যন্ত্র হইয়া দাঁড়ায়—সেখানে সে আর শিল্পীর অবিমিশ্র আনন্দ লাভ করে না।

লেডি কারমাইকেলের নিকট বিদায় লইয়া হরিহরদাদার সন্ধানে চলিলাম। তিনি লাঞ্চ খাওয়াইলেন। আমাদের আলাপের বিবরণ শুনিলেন। শ্রীযুক্ত চক্রবর্ত্তী নরওয়ের বিখ্যাত ঔপন্যাসিক জোহান বয়ারকে একটা চা-উৎসবে সম্বর্দ্ধিত করিতেছিলেন- সেখানে নিমন্ত্রণ ছিল। হরিহরদাদা গন্তব্যস্থানে আমাকে পৌঁছাইয়া দিয়া বিদায় লইলেন। শ্রীযুক্ত চক্রবর্ত্তীর নিমন্ত্রণ লিপিটি তুলিতেছি:—

4 Gordon Place W. C. 1
30th Sept.

প্রিয়বরেষু,

পেন্সিল দিয়ে লিখছি, কিছু মনে করবেন না। আগামী শনিবার বিকেল চারটের সময় আমি বিখ্যাত নরোয়েজিয়ান লেখক Johan Boyerকে একটা Party দিচ্ছি। আপনি এসে আমাদের সঙ্গে চায়ে যোগ দিলে সুখী হব। Wine and Book Restaurant, 45 Great Russel Street (opporssite British Museum)—তার সব উপরের তলায় আমরা মিলিত হব। P. E. N Banquetএ আর টিকিট পাওয়া অসম্ভব—তারাতো আপনাকে জানিয়েছে। আপনি থাকলে বেশ হ'ত, কিন্তু ডাবলিনে ছিলেন, চিঠি এর আগে তো পৌঁছত না। Dublinএ নিশ্চয়ই Yeates, James Stephens, Sean o' Casey প্রভৃতির সঙ্গে আপনার কথাবার্ত্তা হয়েচে। আমি গিয়েছিলাম কয়েক বছর আগে, আপনি সম্প্রতি কী দেখলেন শুনতে উৎসুক আছি।

অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যে চিঠি পাঠাচ্চি—ত্রুটি মার্জ্জনা করবেন।

ভবদীয়—শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

ছোট সিঁড়ি বাহিয়া উপরের তলায় গেলাম। তখন কর্ম্মকর্ত্তাদেরও সকলে আসে নাই। একে একে অনেকে আসিল। সর্ব্বশেষে আসিলেন জোহান বোয়ার—দীর্ঘ সমুন্নত দেহ—জ্যোতির্ম্ময় দীপ্ত চোখে প্রতিভার জ্যোতি বিকশিত, মুখে হাস্যমধুর প্রসন্নতা। বিশ্বজোড়া যে কীর্ত্তি অর্জন করিয়াছেন, তাহার জন্য লেশমাত্র গর্ব্ব নাই। শিশুর মত স্নিগ্ধ সরলতা, যুবকের মত কৌতুকপ্রিয়তা এবং আচরণে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সৌজন্য তাহাকে আমার খুব ভাল লাগিয়াছিল। পরে নরওয়ে যখন যাই, তখন নরোয়েজিয়ানদের খুব ভাল লাগিয়াছিল। নরওয়ে বহু শতাব্দী যুদ্ধ বিগ্রহ করে নাই। যে দর্প, যে গর্ব্ব মানুষকে অন্ধ করে, তাহাই মানুষকে সংকীর্ণ করে। নরোয়েবাসীর এই স্বাভাবিক মধুরতা জোহান বোয়ারে শতগুণ অধিক অভিব্যক্ত ছিল। জোহান বোয়ারের The great Hunger, The power of lie, God and Woman, Folk of the Sea, The Pilgrimage প্রভৃতি পুস্তকে একটী নূতন সুর, একটী নূতন ব্যঞ্জনা আছে। নরওয়ে দেশের সুকঠিন জীবনযাত্রার দৃঢ় ও ভীষণ ছবি এই সমস্ত লেখায় প্রতিফলিত।

আমাদের সঙ্গে দুইটি জার্ম্মাণ তরুণী ছিল। সুন্দরী, চঞ্চলা, হাস্যময়ী। তাহাদের উচ্ছল হাসি ও কৌতুক আমাদের আসরকে উৎফুল্ল করিয়া তুলিতেছিল।

মিঃ বোয়ার তাহাদের দিকে প্রীতিপূর্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—"আজ বুঝি তোমরা Engaged হয়েছ?"

লাস্যময়ী তরুণীরা অপ্রতিভ হইয়া রসিক লেখকের দিকে বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। কি বলিবে ভাবিয়া পায় না। রসিক তবু রসধারা বর্ষণ করেন—তা না হলে এত হাসছ কেন? প্রগলভারা এইবার শ্লেষ বুঝিল—চারিদিকে তুমুল হাস্য জাগিল। তরুণীরা কিন্তু দমিল না, তাহারা দৃপ্তভঙ্গীতে কহিল—"We are happy because of an engagement with a great man আপনার মত মহৎ লোকের সঙ্গ পেয়েছি তাই আমরা ধন্য। তরুণীদের তীক্ষ্ণধী তাহাদিগের মুখ রক্ষা করিল। আমি বলিলাম—"কিন্তু মহৎ লোকটী যে অতি বৃদ্ধ"—আমার ব্যঙ্গ সকলের ভাল লাগিল। আনন্দের ছটা আসর জমাইয়া তুলিল।

চক্রবর্ত্তী মিষ্ট মধুর কণ্ঠে বলিলেন "একটা বাংলা গান শুনবেন?"

সরস কণ্ঠে অতিথি উত্তর দিলেন "হাঁ, যদি বাঙলাদেশের সুন্দরীর কণ্ঠে গীত হয়—"

শ্রীযুক্তা আশালতা ভট্টাচার্য্য রবীন্দ্রনাথের একটী গান গাহিলেন। শ্রীযুক্তা শ্যামাঙ্গিনী—য়ুরোপীয়ের চোখে সুন্দরী বলিয়া বোধ হয় জয়মাল্য পাইবেন না, কিন্তু তাহার শাড়ীতে তাহাকে চমৎকার দেখাইতেছিল। তাহার গলাটি দরাজ অথচ মিষ্ট। মিঃ বোয়ার এবং অন্যান্য শ্রোতৃবৃন্দ খুব খুসি হইল।

খাবার আসিল। খাইতে খাইতে মিঃ বাকের সঙ্গে আলাপ হইল। ইনি একজন ডাচ। বাকে দম্পতী শান্তিনিকেতনে অনেক দিন বাস করিয়া গিয়াছেন। তিনি বাংলা জানেন। রবীন্দ্রনাথের গানকে তিনি অনুবাদ করিয়াছেন এবং তাহাতে বিলাতী সুর দিয়াছেন। তিনি বাংলা গান গাহিলেন—"গ্রামছাড়া ঐ রাঙা মাটীর পথ আমার মন ভুলায় রে।" বিদেশীর কণ্ঠে এই বাংলা গান আমাদের অলৌকিক আনন্দ দিল। বাকে সুরজ্ঞ—সঙ্গীতে তাহার অসামান্য দখল।

শ্রোতৃবৃন্দ পুনরায় গাহিতে অনুরোধ করিল। তিনি তখন গাহিলেন—"সকাল বেলার আলোয় বাজে—"।

মিঃ বাকে বলিলেন—দেশে দেশে মানুষের মনে রয়েছে অদ্ভুত ঐক্য—বাংলায় একটা লোকসঙ্গীত গাইব—আর তার সঙ্গে গাইব একটা বার্গাণ্ডির গান—দুটির মধ্যে রয়েছে অসামান্য সাদৃশ্য—

দুইটি গাহিলেন। আমাদের কাছে খুব ভাল লাগিল। শ্রীযুক্ত

চক্রবর্ত্তী অতিথিকে অভ্যর্থনা জানাইয়া কিছু বলিলেন—"হে মান্য অতিথি, তোমায় আমরা পেয়েছি, তাই আমরা ধন্য; বাংলার কবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তোমার রয়েছে সৌখ্য—সেকথা আমরা শ্রদ্ধায় স্মরণ করি। তোমার লেখায় আছে দুটি সুর—একটী সংগ্রামের, বিশ্বব্যাপী সংঘর্ষের, আর একটী সত্যের সুর, সৌন্দর্য্যের সুর। কিন্তু আসলে বৈষম্য জাগেনি—উনি এই দুধারার সামঞ্জস্য করেছেন—তিনি ইহাদের পিছনে যে সুসঙ্গতি আছে তা দেখেছেন, বাংলাদেশে তোমার প্রভাব অসামান্য—বাংলার পক্ষ থেকে তোমায় আমরা প্রীতি অভিনন্দন জানাই—"।

গিরিজা মুখোপাধ্যায় নামক একজন যুবক কিছু বলিলেন। তিনি বলিলেন, "একজন সাংবাদিক নরোয়েবাসীর নিকট শুনছিলাম—যে নরোয়েতে বোয়ারের প্রতিভা classic হয়ে গেছে--সে পায় সম্মান ও শ্রদ্ধা—কিন্তু তাঁর কাছে তারা এখন জীবনের খাদ্য পায় না—একথা সত্য কিনা জানিনা—তবে আমরা বাঙালীরা তাঁর লেখায় পাই আনন্দ ও কাব্যরস— তার প্রভাব আমরা ভুলতে পারি না—তাকে আমরা সংবর্দ্ধনা করি।"

তারপর বোয়ারকে জহরলালের—India and the world. রাধাকৃষ্ণের Hindu view of life এবং একজন বিলাতী গ্রন্থকারের Condition in India নামক পুস্তক তিনখানি উপহার দেওয়া হইল।

মিঃ বোয়ার উত্তর দিবার জন্য উঠিলেন। তাহার বলিবার ভঙ্গী চমৎকার—স্বচ্ছন্দ সরল ভাষায় ধন্যবাদ জানাইলেন। তিনি বলিলেন—"বিদেশী ভাষায় বলা কিছু কষ্টকর। যারা ভাল ইংরেজী জানে না, তারা মনের মতন করে ভাব প্রকাশ করতে পারে না—এই অভিনন্দনের জন্য ধন্যবাদ।" গিরিজা মুখোপাধ্যায় যে অশোভন কথা বলিয়াছিলেন তাহার একটী চমৎকার প্রত্যুত্তর দিলেন—"যৌবনের বাণী সব বাণী নয়, যুবকেরা যা পায় তাতেই মেতে ওঠে—তারা অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করে না। বয়স ও অভিজ্ঞতা অনেক কথা বলতে পারে—সে কথা যদি ভুলে যাই তাহলে আমরা অবিচার করব। আমি ঔপন্যাসিক। ঔপন্যাসিকের কাজ কিছু রসময় লেখা—রসের প্রকাশের সঙ্গে হয়ত কোনও সত্য ফুটে ওঠে—কিন্তু সত্যপ্রকাশ তার কাজ নয়।" বোয়ার চমৎকার বলেন। তাহার ইংরেজী অনভিজ্ঞতার কৈফিয়ৎ, সাহিত্যিক বিনয়, কবির সহিত তাহার হৃদ্যতার কথা বলিলেন, "তোমাদের কবির সঙ্গে আমার কয়েকদিন কেটেছে তার স্মৃতি-সৌরভ বলবার নয়।" ধর্ম্ম সম্বন্ধে তার সঙ্গে আমার অনেক আলোচনা হয়েছিল—ইচ্ছা আছে একদিন তা প্রবন্ধাকারে লিখব। বাংলায় নরওয়ে মিশনারি পাঠাব কি না সেই প্রসঙ্গে কবি উত্তর দিয়েছিলেন—"বাংলা দেশে আমাদের অনেক ফুল আছে--আমরা মিশনারি চাই না" এই কথায় কবি তার আনন্দ ধর্ম্মকে চমৎকার ভাবে প্রকাশ করেছিলেন—আমরা নরোয়েতে যে কেবল নরকের ভয়ে মরি—আমাদের ধর্ম্মবোধ ভয় ও বিভীষিকায় কবির কাছে সৌন্দর্য্য ও আনন্দের বাণী শুনে খুব খুসি হয়েছিলাম।

পরিশেষে ধন্যবাদ জানাইয়া বলিলেন—"আজ আমার জীবনের একটী পরম সৌভাগ্যের দিন—এই ভ্রমণের সুখময় স্মৃতি হবে আজ—কারণ আমি আজ বাংলার চমৎকারিণী এবং হৃদয়মোহিনী মহিলাদের পরিচয় লাভ করেছি—"

তার পর সকলে তাহাদের অটোগ্রাফ লইয়া আসিল। তিনি সকলের খাতায় হাস্যমুখে আপনার নাম লিখিলেন।

বিদায়ের পূর্ব্বে আমি তাঁহাকে প্রশ্ন করিলাম "আপনার লেখার মর্ম্মবাণী কি?" তিনি তাহার অর্থপূর্ণ দৃষ্টি আমার দিকে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "আমার কোনও বাণী নেই—এই জীবন সুন্দর এবং মহান্—চির-প্রকাশমান ছবির পট—আমি শুধু বিস্ময়ে দেখি আর ভালবাসি—"

শ্রদ্ধা জানাইয়া বিদায় লইলাম। এই চমৎকার সন্ধ্যাটির স্মৃতি বার বার মনে জাগে। এখানে শ্রীযুক্ত সোমনাথ মৈত্র, জ্যোৎস্না চট্টোপাধ্যায়, বিপিনকৃষ্ণ সিংহ প্রভৃতির সঙ্গে আলাপ হইয়াছিল।

Gower streetএ ফিরিয়া ষ্টুডেন্টস্ ইউনিয়নের সভ্য হইয়া ডিনার খাইয়া বাসায় ফিরিলাম। (ক্রমশঃ)

উপনিবেশ

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

৪

উৎসব শেষ হইয়া গেল।

আকাশের প্রান্তে প্রান্তে যাহারা কালো কালো মৃদঙ্গে ঘা মারিয়া নদীর উপর নাচিতে সুরু করিয়াছিল, তাহাদের আর খুঁজিয়া পাইবার জো নাই। কোঁকড়ানো চুলের মতো নদীর জল এখনো ফুলিয়া উঠিতেছে—দিকে দিগন্তে ফস্‌ফরাসের উজ্জ্বল দীপ্তি-কণিকা ফুটিয়া পড়িতেছে, ফাটিয়া পড়িতেছে এখনও। কিন্তু তাহাকে দেখিয়া এখন আর ভয় করেনা। ওপার হইতে চাঁদ উঠিয়া আসিতেছে: নদীর মুখের উপর হইতে কে একখানা কালো ঘোম্‌টা সরাইয়া নিল যেন। জলের হাসি দেখিলে এখন কাহার মনে হইবে যে একটু আগেই পাতাল হইতে একশোটা রাহু পৃথিবীর সমস্ত আলো গিলিয়া খাইবার জন্য ইহার তলা হইতে ঠেলিয়া উঠিয়াছিল!

উৎসব শেষ হইয়া গেল—যাহারা উৎসবে যোগ দিয়াছিল, ঝোড়ো হাওয়ায় পাখা মেলিয়া উড়িয়া গেছে তাহারা। শুধু চাঁদ নয়, মেঘের আঁড়াল সরিয়া ধোঁয়াটে তারাগুলি ক্রমেই স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে—। সপ্তর্ষি নামিতেছে একেবারে জলের কোল পর্য্যন্ত। কেবল উৎসবের সাক্ষী হইয়া আছে ভূলুণ্ঠিত কতকগুলি সুপারী গাছ—আর নাচের সময় কাহার হাত হইতে একটা সোনার বালা যে খঁসিয়া পড়িয়াছিল তাহারি উত্তাপে দীর্ণ দগ্ধ একটা তালগাছ হইতে এখনো উৎকট গন্ধকের গন্ধ উঠিয়া আকাশ বাতাসকে ছাইয়া ফেলিতেছে—মুমূর্ষুর খানিক বিষাক্ত নিশ্বাসের মতো।

ঝড় থামিতেই ডি-সিল্‌ভার মনে হইল, গোরুগুলির একবার খোঁজ লইলে ভালো হয়। ঝড় সুরু হইবার আগে তাহাদের সবগুলি ফিরিয়া আসে নাই, গাছ চাপা পড়িয়া দু একটা মরিয়াছে কিনা কে বলিবে। বিশেষত শাদা-কালোয় মিশানো যে বড় গোরুটা দু বেলায় পাঁচ সের করিয়া দুধ দেয় তিন চার দিনের মধ্যেই বাছা হইবে সেটার। এই দুর্বৎসরে সেটা খোয়া গেলে বিলক্ষণ ক্ষতি হইয়া যাইবে।

একটা লণ্ঠন লইয়া ডি-সিল্‌ভা বাহির হইয়া পড়িল। বৈশাখ আসিতে অবশ্য দু মাস দেরী, তবু ইহাকে চয়ের প্রথম কাল বৈশাখী বলা যাইতে পারে। জোরটা নেহাৎ কম হয় নাই। নদীতে কতগুলি নৌকা যে মারা পড়িয়াছে কে জানে। দু একটা মড়া আসিয়া চরে ঠেকিলে হয়তো সেটা সঠিকভাবে জানিতে পারা

যাইবে। গাছ অনেকগুলি পড়িয়াছে। জোহানের চালা হইতে তিন চারখানা টিন আসিয়া উড়িয়া নামিয়াছে রাস্তায়।

চাঁদ উঠিয়াছে বটে, কিন্তু নানা গাছের ছায়ায় খানিকটা ঘন অন্ধকার। পায়ের তলায় জল ছপ্ ছপ্ করিয়া উঠিতেছে, ওপাশ দিয়া ওটা কি চলিয়া গেল? বাপ্‌রে—প্রকাণ্ড একটা খ'য়ে জাতি! চার হাতের কম লম্বা হইবেনা! ডি-সিল্‌ভা লাফাইয়া তিন পা সরিয়া গেল। কিন্তু লিসির মতোই সাপটাও ডি-সিল্‌ভাকে নগণ্য বোধ করিল কিনা কে জানে—অন্তত লক্ষ্য করিল না।

ঝড়ের পরে চর-ইস্‌মাইল ঘুমাইয়া আছে শিশুর মতো শান্ত হইয়া। কোথাও কোনো কলরব নাই। সব যেন রহস্যময় ভাবে নীরব। অন্ধকার গ্রামের পথে ডি-সিল্‌ভার ভয় করিতে লাগিল। এখানে ওখানে জমাট-বাঁধা জোনাকির পুঞ্জ—আলোগুলা যেন ভূতের চোখের মতো দেখিতে। নূতন বৃষ্টির জল পড়িয়া ভিজা ঝরা পাতা আর কাদার গন্ধ উঠিতেছে।

ডি-সিল্‌ভা চীৎকার করিয়া ডাকিল, জোহান, জোহান!

পাত্তা মিলিল না।

—এই সন্ধ্যে বেলায় ঘুমিয়ে পড়লে নাকি? জোহান!

তবুও সাড়া আসিলনা।

ওপাশেই ডি-সুজার বাড়ী। এও যেন একটা ঘুমন্তপুরী হইয়া আছে। কোনোখানে একটা সাড়াশব্দ পাইবার যদি জো থাকে। অবশ্য, ডি-সিল্‌ভা প্রাণ গেলেও ডি-সুজার সঙ্গে যাচিয়া আর আলাপ করিতে রাজী নয়—বিশেষত সেদিনের সেই ব্যাপারের পর। সে ভুঁড়ো, সে অকর্মা—এসব অপবাদ এবং অপমান ডি-সিল্‌ভা মরিয়া গেলেও ভুলিবেনা কোনোদিন। বরং যেমন করিয়া হোক ইহার শোধ লইবে। মেরীর নাম করিয়া সে শপথ করিয়াছে, চালাকি নয়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এমন সময়—এই রকম অন্ধকারের মধ্যে ডি-সুজার এক আধটা কাশির আওয়াজ শুনিতে পাইলেও খুশি হইত মনটা।

তিন চারটা গাছ পড়িয়াছে ডি-সুজার। দরজাটা হাঁ করিয়া খোলা। বাড়িতে মানুষ নাই নাকি? ডি-সিল্‌ভার আরো খারাপ লাগিতেছে। পথ চলিতে চলিতে ডি-সিল্‌ভা নিজের মনে গুন্ গুন্ করিয়া বাইবেল্ আওড়াইতে লাগিল। কিন্তু অস্থির চঞ্চল মন—ঈশ্বর আর শয়তানের মধ্যে বারে বারে গণ্ডগোল বাধিয়া যাইতেছে। ঈশ্বরের কৃপা চাহিতে গিয়া সে বারেবারেই চাহিতেছে শয়তানের কৃপা।

দুত্তোর শয়তান। একেবারে মাথা খারাপ হইয়া গেল নাকি তাহার? চুলোয় যাক গোরু—এমন রাত্রিতে সেটাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা না করিলেই হইত। তা ছাড়া যে সাপ সে দেখিয়াছে, ওই রকম আর একটা ফণা তুলিয়া আসিয়া দাঁড়াইলেই তো—

ডি-সিল্‌ভা ফিরিয়া যাইবার প্রেরণা বোধ করিতে লাগিল। কিন্তু জঙ্গলের আড়ালটা সরিয়া গেছে—এতক্ষণে মাথার উপর তারা ভরা আকাশ আর চাঁদ ঝল্‌মল্ করিয়া উঠিয়াছে। আর ওদিকে পোষ্ট অফিসের জানালায় একটা বড় আলো জ্বলিতেছে, তবে আর ভয়টা কিসের!

ভাঙা গির্জার ওদিকটা একবার খুঁজিয়া আসিতেই হইবে। ভয়টা অবশ্য ওদিকেই—এক সময়ে ওখানে গোরস্থান ছিল। লোকে বলে, জায়গাটা জিন-পরীর আস্তানা। তবে গোরস্থান বলিতে বিশেষ কিছু আর অবশিষ্ট নাই। ডি-সিল্‌ভার চোখের সামনেই তো প্রতিবছর একটু একটু করিয়া ভাঙিতে ভাঙিতে তাহা প্রায় নিশ্চিহ্ন হইয়া গেছে। তবুও—

সাহসে ভর করিয়া ডি-সিল্‌ভা আগাইয়া চলিল।

গাছের ছায়ায় শাদা মতো কি পড়িয়া আছে ওটা? তাহার গোরুটাই নয় তো? বসিয়া বসিয়া জাবর কাটিতেছে বোধহয়। সমস্ত গ্রামটা খুঁজিয়া খুঁজিয়া সে হয়রাণ, আর এদিকে—

কিন্তু কয়েক পা আগাইতেই ভয়ে ডি-সিল্‌ভার মাথার চুলগুলি খাড়া হইয়া গেল। গলা হইতে একটা চীৎকার বাহির হইয়া আসিতে না আসিতেই থামিয়া গেল অর্ধপথে। হাত হইতে লণ্ঠনটা মাটিতে পড়িয়া বার কয়েক দপ্ দপ্ করিল, তারপরেই নিবিয়া গেল সেটা। যা দেখিয়াছে তা যেন এখনো বিশ্বাস হইতেছে না।

জোহানের রক্তাক্ত কবন্ধ দেহটা চোখে পড়িয়াছিল ডি-সিল্‌ভার।

বর্মী মেয়েই শেষ পর্যন্ত দরজা খুলিয়া দিল। বলিল, বড় বেশী অন্ধকার, তাই না?

কথা কহিবার প্রেরণা ছিলনা। তবু মণিমোহন জবাব দিল, তা হোক, টর্চ আছে আমার সঙ্গে।

বর্মী মেয়ে তাহার টুকটুকে ঠোঁট দুটিতে মিষ্টি একটুখানি হাসি ফুটাইয়া তুলিল।

—আর কোনদিন এদিকে আসবেনা বোধহয়।

—না।

—আমার উপর রাগ করেছ তুমি।

—কারো উপর কোনো রাগ নেই আমার—মণিমোহন আর কথা বাড়াইতে চাহিলনা। বড় বড় পা ফেলিয়া সে চলিতে লাগিল। সমস্ত শরীর মনে অসহ্য গ্লানি আর বিরক্তি। স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে সে। এই ঝড়ের সন্ধ্যা তাহার জীবনে থাকিবে একটা দুঃস্বপ্ন হইয়া।

দূর হইতে বর্মী মেয়ের গলা ভাসিয়া আসিল, আবার এসো।

মণিমোহন জবাব দিল না।

ঝরা পাতা, কাদা আর অন্ধকার। টর্চের আলোয় পথটা জ্বলিয়া উঠিতেছে তরল কাদায়। রবারের জুতা বারে বারে পিছলাইয়া পড়িতে চায়। কিন্তু মণিমোহনের মনটা নিজের মধ্যেই তলাইয়া গিয়াছিল।

ক্ষুধা কত তীব্র হইতে পারে মানুষের, আর কেমন অসংকোচেই সেটা যে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে। দ্বিধা নাই, সংশয় নাই, ভাবনা নাই। কী হইতে পারে এবং কী হইতে যে পারেনা, তাহা লইয়া বিচলিত হওয়া অসম্ভব এবং অবান্তর। রূপকে যদি আগুন বলা যায় তাহা হইলে সে রূপের দাহিকা-শক্তি সম্বন্ধে আর এতটুকুও সংশয় নাই মণিমোহনের মনে।

কিন্তু একথা কি কখনো ভাবিতে পারিত রাণী? বর্ধমানের সেই গ্রাম। আমের জামের ছায়ায় ঝিমাইয়া আসা সন্ধ্যা। এখন ফাল্গুন মাস—অজস্র মুকুল ধরিয়াছে চারিদিকে,

মহুয়ার গন্ধের মতো অত্যুগ্র একটা মাদক-সৌরভে মাঠ-ঘাট-বন ছাইয়া গেছে। তুলসী-মঞ্চের তলায় ছোট একটা মাটির প্রদীপে শিখাটা কাঁপিতেছে মৃদু মৃদু। দূরের ষ্টেশনে সন্ধ্যার লোকাল আসিয়া থামিল কলিকাতা হইতে—মৃদু হুইশিল্ বাজাইয়া আবার চলিয়া গেল। রাণী উৎকর্ণ হইয়া কান পাতিয়া আছে। এখনই বাহিরে কাহার জুতার শব্দ শোনা যাইবে বোধহয়।

মৃদু জীবন—শান্ত আর মন্থর। একশো বছর আগে যাহা ছিল তাহাই। গ্রামের তলা দিয়া যে নদী বহিয়া গেছে, এক বর্ষাকাল ছাড়া সব সময়েই হাঁটু অবধি কাপড় তুলিয়া সে নদী পার হইয়া যাওয়া চলে। দুই পাবে ভাঁটফুল ফুটিয়াছে, কখনো কখনো তাহার দু-চারটি কেউ বা নদীর জলে ভাসাইয়া দেয়। সে নদীতে প্রদীপ ভাসিয়া চলে, ভাসিয়া যায় কাগজ আর মোচার খোলার নৌকা। শুক্নার সময় শ্যাওলার মধ্যে হাতড়াইয়া চিংড়ি মাছ ধরে গ্রামের বাগ্দীরা।

আর এখানে? যেটুকু মাটি তাহা তো নদীব করুণাতেই নিজেকে সঁপিয়া দিয়া বসিয়া আছে। নূতন চর জাগিতেছে প্রত্যহ—নূতন মানুষ আসিয়া দেখা দিতেছে নূতন পেশী আর নূতন হিংস্রতা লইয়া। মাটিকে বিশ্বাস নাই—চোরা বালি হাঁ করিয়া আছে। ফাল্গুনে আমের মুকুলের গন্ধ নাই—আছে আকাশের কোণে কোণে ঝড়ের মুখবন্ধ। আর এই জগতের প্রেম? রাণীর মতো তাহা উৎকণ্ঠ এবং উৎকর্ণ হইয়া প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকে না, কাড়িয়া লয়—ছিনাইয়া লয়।

এখানকার যোগ্য নয় মণিমোহন। এই হিংসা আর পশুত্বকে দেখিয়া তাহার বিস্ময় জাগে, কিন্তু শ্রদ্ধা আসেনা। আদিম অমার্জিত যাহা—তাহার মধ্যে বিশালত্ব আছে, কিন্তু রূপ নাই। তাহা আগুন লাগাইতে পারে, আলো জ্বালাইতে পারেনা।

নির্ঘাৎ ম্লেচ্ছ লোক প্রাপ্তি।

সমস্ত মনটা বিশ্রীভাবে বিস্বাদ আর কুৎসিৎ লাগিতেছে। ওই বর্ম্মী মেয়েটাকে ভাবিতে গিয়াই তাহার সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিতেছে। নিজেকেই কি সে আর বিশ্বাস করে? পাত্র যখন কানায় কানায় ফেনাইয়া উঠিতেছে, তখন সে কতক্ষণ ধরিয়া নিজেকে রাখিতে পারিবে শান্ত এবং সংযত করিয়া?

যা থাকে কপালে, এখানকার চাকরী সে ছাড়িয়াই দিবে। তারপর কলিকাতা। ট্রাম বাস মোটরের কলিকাতা! পরিচিত মুখ, চেনা রেস্তোরাঁ। লেকে পার্কে আর সিনেমায় সেই সব মেয়ের মুখ: যাহারা মোহ জাগাইয়া দেয়, কল্পনাকে প্রসারিত করে। আগুন নয়, খোলা জানালার ফাঁকে বিদ্যুতের আলোর মতো। রাত্রির চৌরঙ্গী—মেট্রো সিনেমা। ফ্লাওয়ার মার্কেট। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান্ মেয়ের গা হইতে পাউডারের গন্ধ।

চট্কা ভাঙিয়া গেল। কোথায় কলিকাতা! উপনিবেশের নারিকেল বীথিতে বাতাসের মর্মর। নদী হইতে ঠাণ্ডা বাতাস শীত করিতেছে। শিয়াল ডাকিতেছে দূরে। বৃষ্টি ভেজা বন হইতে উড়িয়া আসা একদল পোকা টর্চের আশ্চর্য আলোটার রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করিতেছি। সামনেই তাহার বোট।

টর্চের আলো দেখিয়া গোপীনাথ একটা লণ্ঠন লইয়া অত্যন্ত দ্রুত গতিতে নামিয়া আসিল। বলিল, আমরা ভেবে ভেবে হয়রাণ। এই ঝড়ের মাঝখানে কোথায় ছিলেন বাবু?

মণিমোহন সংক্ষেপে কহিল, গাঁয়ের মধ্যে।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া গোপীনাথ বলিল—আমরা তো ভেবে কূল পাইনা। সবাই মিলে আপনাকে খুঁজতে বেরোচ্ছিলুম। কি ভয়ানক ঝড়—দেখেছেন! একটু হলেই বোট্টাকে উড়িয়ে নিত আর কি!

রবারের জুতাটা কাদায় ভরিয়া গেছে। নদীর জলে জুতা শুদ্ধু পা দুইটা ধুইয়া মণিমোহন বোটে উঠিয়া আসিল।

গোপীনাথ বলিল, তা হলেও ছাড়িনি। মুরগী দুটো বানিয়েছি বেশ ক'রে। টাকা না দিক, বুড়ো মজঃফর মিঞা মাঝে মাঝে এ রকম দু-চারটে মুরগী খাওয়ালে মন্দ হয়না নেহাৎ।

ক্লান্তভাবে মণিমোহন বিছানাটাব উপর গড়াইয়া পড়িল। বলিল, বেশ তো, ভালো ক'রে খেয়ে নাও। আমি আর রাত্রে কিছু খাবনা।

—খাবেন না? গোপীনাথের কণ্ঠস্বর বিস্মিত এবং আহত শুনাইল, এত ভালো ক'রে রান্না করলুম বাবু, আপনি না খেলে—

—আমি খেয়ে এসেছি।

—খেয়ে এসেছেন! এই গাঁয়ের মধ্যে!

—হুঁ।

গোপীনাথ আরো বিস্মিত হইয়া গেল: এই সব মুসলমানেরা! এরা আবার আপনাকে কি খেতে দিলে বাবু?

—সে অনেক কথা। মণিমোহন গম্ভীর হইয়া রহিল।

অতএব গোপীনাথ চুপ করিয়া গেল, কিন্তু তাহার বিস্ময়ের অন্ত রহিল না। এই গ্রামে এমন কোন লোক আছে যে আদর আপ্যায়ন করিয়া সবকারীবাবুকে খাইতে দিবে। সন্ধ্যার সময় এক এক কাঁসি পান্তো ভাত গিলিয়াই তো ইহারা নিশ্চিন্তে রাত কাটাইয়া দেয়। আরো এই ঝড়—

সে যাই হোক, অত ভাবিয়া গোপীনাথের দরকার নাই। বারো টাকা মাহিনার কর্মচারী সে। ভদ্রলোকের ছেলে বলিয়া মণিমোহন তাহাকে কিছুটা সম্মান দেখায়, কাগজপত্র লেখায় মাঝে মাঝে। কিন্তু আসলে সে তো মনিমোহনের আর্দালী ছাড়া আর কিছুই নয়। উপর-ওয়ালা মনিবের চাল-চলন লইয়া সে দুশ্চিন্তা প্রকাশ করিতে যাইবে কি জন্য?

তবু একটা জিনিস বড় খচ খচ করিতেছে। হাজার হোক, হিন্দুর ছেলে। মুরগী খাওয়াটা না হয় সমর্থন করা যাইতে পারে—পেটে গঙ্গাজল আছে, ওটা শুদ্ধ হইয়া যাইবেই। কিন্তু মুসলমানের রান্না! সাতবার প্রায়শ্চিত্ত করিলেও ও পাপ হইতে আর নিষ্কৃতি নাই। (ক্রমশঃ)



প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে বৌদ্ধ কবির দান

আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ

জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি ভিন্ন কোন জাতি উন্নতি-সোপানে আরোহণ করিতে পারে না—ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত কথা। কিন্তু আমাদের বাঙ্গালী বৌদ্ধ-ভ্রাতৃগণ প্রাচীনকালে কি মোহবশে এ সত্য অবহেলা করিয়া জীবনযাপন করিয়াছিলেন, বুঝা যায় না। বাঙ্গালা তাঁহাদের মাতৃভাষা ও জাতীয় ভাষা। তথাপি বাঙ্গালার সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাঁহাদের কার্য্যকারিতা অতি সামান্য—এমন কি কিছুই নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মাতৃভাষার প্রতি তাঁহাদের এই অবহেলা সত্যই সাহিত্যানুরাগীর প্রাণে পীড়া দান করিয়া থাকে।

বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীগণ এদেশের আদিম অধিবাসী। প্রাচীনকালে এদেশ বহু বৌদ্ধের আবাসস্থল ছিল। সমগ্র বঙ্গের মধ্যে চট্টগ্রামে এখনও সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক বৌদ্ধের বাস। তাঁহারা চট্টগ্রামে "মগ" নামে খ্যাত। তাঁহাদের সাধারণ উপাধি "বড়ুয়া"। অনেকের "মুচ্ছুদ্দি" ও "চৌধুরী" উপাধিও দেখা যায়। ধর্ম্মে, ভাষায় ও কৃষ্টিতে স্বতন্ত্র হইলেও তাঁহারা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া বহুকাল পূর্ব্বে পুরাদমে বাঙ্গালী বনিয়া গিয়াছেন, আচার ব্যবহারে তাঁহারা পূর্ব্বে অনেকটা মুসলমানের অনুরূপ ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধধর্ম্ম-সংস্কারক ও প্রচারক—পায়মিতা আসিয়া তাঁহাদের সমাজে একটা নূতন চেতনার সঞ্চার করিয়া যান। তদবধি তাঁহারা অনেকটা আত্ম-চেতনা-প্রবুদ্ধ হইয়াছেন সত্য কিন্তু আচার ব্যবহারে ও হাবভাবে একেবারে হিন্দুর কুক্ষীগত বলিলেও কিছুমাত্র অসত্য বলা হয় না। (আমার শৈশবকালে মগদিগকে মুসলমানের বাড়ীতে আহার-বিহার করিতে দেখিয়াছি—এখন তাহারা তাহা করে না।) পোষাকে পরিচ্ছদে অধুনা তাঁহারা পুরা-দস্তুর "হিন্দুবাবু" সাজিয়াছেন। এমন কি নামটিতে পর্য্যন্ত তাঁহারা আপনাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেন নাই। নিজেদের পালি ভাষায় রচিত ধর্ম্মগ্রন্থাদি অধিগম্য না থাকায় হিন্দুর ধর্ম্মগ্রন্থাদি (যেমন রামায়ণ—মহাভারত) পাঠ করিয়াই তাঁহারা দিন যাপন করিয়াছেন। তাঁহাদের ধর্ম্মভাষা পালি, কিন্তু ইহা তাঁহাদের অতি কম লোকেরই জ্ঞান গোচর ছিল। তজ্জন্য বাঙ্গালা ভাষাকেই তাঁহারা চিরদিন মাতৃভাষারূপে বরণ করিয়া নিয়াছেন। মুসলমানেরা যেমন বাঙ্গালাকে মাতৃভাষার বেদীতে বসাইয়া তাহারই ভিতর দিয়া আপনাদের ধর্ম্ম ও সভ্যতা প্রচারিত করিয়াছেন, মগেরা মোটেই তেমন কিছু করেন নাই। এজন্য তাঁহাদের ধর্ম্ম ও সভ্যতার কথা তাঁহাদের ধর্ম্ম-যাজকের মুখে শুনা ভিন্ন কোন উপায় ছিল না এবং এই কারণেই পাশাপাশি বাস করিলেও তাঁহাদের ধর্ম্ম ও সভ্যতার বিষয় অত্যল্প হিন্দু-মুসলমানই পরিজ্ঞাত আছেন। বাঙ্গালা ভাষা-ভাষী হইয়াও মাতৃভাষার সেবায় বিমুখ ছিলেন বলিয়া প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে তাঁহাদের হস্তচিহ্ন নাই বলিলেও চলে। সারা জীবন চেষ্টা করিয়াও বৌদ্ধধর্ম্ম ও সাহিত্য সম্বন্ধে একমাত্র পুঁথি ভিন্ন আমি আর কোন প্রাচীন পুঁথিপত্র আবিষ্কার করিতে পারি নাই। সত্য বটে, পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের রাজা ধরম বখ্শের মহিষী কালিন্দী রাণী "খাদুত্তোয়াং" নামক একখানি পালি গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করাইয়াছিলেন কিন্তু তাহাও কোন বৌদ্ধ কবির রচনা নহে। উক্ত রাণীর আদেশে নীলকমল দাস নামক জনৈক হিন্দুই "বৌদ্ধ-রঞ্জিকা" নাম দিয়া উহার অনুবাদ করিয়াছিলেন।

উপরে যে একমাত্র পুঁথির উল্লেখ করিয়াছি, তাহার নাম "মঘা-ধর্ম্ম-ইতিহাস"। এই গ্রন্থই সারা প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে একমাত্র বৌদ্ধ রচিত গ্রন্থ। তাহাও আবার আদ্যন্ত খণ্ডিত—কেবল ১ম ও ৮ম পত্র মাত্র বিদ্যমান। দুইটি পত্রই কিছু কিছু ছিন্ন। ২৪×৮ অঙ্গুলি পরিমিত দোভাঁজ করা কাগজ। পুঁথির আকারে একপিঠে লেখা। হাতের লেখা বিশ্রী। পুথির বয়স শতেক বৎসরের উর্দ্ধে হইবে না। "হরিচান্দ" নামক কবি ইহার রচয়িতা। ইঁহার কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। তবে ইনি মগজাতীয় ও চট্টগ্রামের লোক ছিলেন এরূপ অনুমান করিলে কিছু অসঙ্গত হইবে মনে হয় না।

প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে বৌদ্ধ কবির রচনার নিদর্শন স্বরূপ দুইটি পত্রই এখানে অবিকল প্রকাশিত করিলাম:—

"নম গণেসায় নম। নম স্বরসক্তি দেবি নম।
অত্ত মঘা ধর্ম্ম ইতিহাস লিক্ষতে।
প্রথমে প্রণাম * প্রভু নারায়ণ।
জাহার কারণে হইল এই তিনভুবন॥
সত্ত রজ তম তিন গুণের প্রচার।
এই তিন গুণে জান * সংসার॥
তম গুণে করে ব্রহ্মা সর্ন্চার (সঞ্চার)।
নর আদি পশু পক্ষি সকল সংসার॥
সত্ত গুণে * * নাম ধরয়ে আপন।
দয়া ধর্ম্ম সুখ দুঃখ সংসার পালন॥
রজ গুণে সদাসিব খিরদা সাগর।
প্রলয় * * তেনি করিব সংঘার (সংহার)॥
এই তিন গুণ প্রভু ধরে তিন জন।
নমস্কার করি এই তিনের চরণ॥
মাতা পিতা দুইজন বন্দম একমনে।
সংসার দেখিল আমি জাহার কারণে॥
শ্রীগুরুর চরণে মোর কটি নমস্কার।
জাহার কৃপাতে দেখি সকল সংসার॥
বাপে দিল জন্ম মায়ে ধরিল উদরে।
পশুবুদ্ধি অনাচার হইল সংসারে॥
অবহেলে গুরুদেবে দিল চক্ষুদান।
পশুবুদ্ধি ছারিয়া হইল দিব্ব গ্যান॥
হেন গুরুর চরণে আনন্দ জার মন।
সেই জনে ছারি জাবে ভবের বন্ধন॥
কর জোরে কায়মনে করি পরিহার।
ভকত্তি করিআ বন্দম জল অবতার॥
বাঙ্গালা ভাসেতে সবে বলে *। (১ম পত্র)।

* * *

তবে পুনি চলি জাবে বৈকণ্ঠ (বৈকুণ্ঠ) নগরি।
উছরা না করি জদি জেবা করে দান।
দস গুণে এক গুণ কহে ভগবান॥
দান করিআ জদি উছরা করিব।
এক গুণ কৈল্লে দান সোল গুণ পাইব॥
চিমিডিং (?) উছরার কথা কৈল এই মত।
মঘা কথা হীন সক্তি কইতে পারি কত॥
হরি চাঁদে কহে হরির চরণ ভাবিআ।
লোকে বুজীবারে কহে পয়ার রচিয়া॥

* * *

যথা সংমুজার কথা অন্নিত লহরি।
কাহার সকতি ইহাঁ বর্ন্নিবারে পারি॥
জাহার স্রবনে জান পাপেতে মোছন।
আনাইংদা সোত্তেরে (?) পূর্ব্বে কহিছে নারায়ণ॥
তবে সে আনাইংদা পুনি জোর করি হাত।
কথ ২ দান য়াছে কহত আমাত॥
তবে নাগর চাঁদে কহে জোর করি পাণি।
আনন্দে জীঙ্গাসা করে ধর্ম্মের কাহিনি॥
তবে সে গদমা কুরা কহে আনাইংদারে।
(বুজিতে সে) সব কথা সকল সংসারে॥
ছারাইক দান জেবা করে যুনথার (তার) কথা।
এই লোকে সুখ * * হরি জথা॥
দস কল্প দেব পুরে থাকিব সে জন।
নানামত কতুকে থাকিব দেবসন॥
* আমরা (?) পুরেত ভুগ করি।
পুনর্জ্জম্ম হবে আসি এই মৈত্তপুরি॥
ছারইক দানের কথা নাই কবু অন্ত।
কুলবন্তের ঘরে জর্ম্ম হইব অনন্ত॥
তিন জর্ম্ম হইবেক চক্রপতি রাজা।
সকল পিতিবির (পৃথিবীর) লোকে করিবেন পুজা॥
তবে আর দান জদি করয়ে ভুবনে।
দানেতে করিব ধর্ম্ম কহে নারায়ণে॥
দানেতে অনেক যুক (সুখ) না জায়ে কহন।
না বুজী লোক সবে পাপে দিবে মন॥
দানবন্ত জেই জন নাই জমের ভএ (ভয়)।
হরসিত চিত্ত রহে দেবের আলএ (আলয়)॥
ছত্র দান করে জেবা সেই সাহু (সাধু) জন।
বিস্তারিআ কহি যুন তাহার কথন॥
কনক রাজত ছত্র জে দিবে গোসাঞিরে।
দস কল্প থাকিবে সে অমরা নগরে॥
পাইংজাং চামাণিরে ছত্র জে করিব দান।
অষ্টদস কল্প হবে দেবপুরে স্থান॥
দেবের আলএ নানা মত করি সুখ।
অনেক বিস্তার ছত্র দানের কতুক॥
এহার ধর্ম্মের কথা জানিবা অনন্ত।
নর লোকে জর্ম্ম হবে হইআ কুলবন্ত॥
হিন কুলে জর্ম্ম সে না হবে কোন কালে।
ধর্ম্মসিল খেলাবন্ত হইবে রাজকুলে॥
তা যুনি আনাইংদা পুন হেতু জিঙ্গাসিল।
কহ প্রভু এই বর (বড়) অত্‌ভুত যুনিল॥
আপনে কহিলে আমি যুনিল অথন।
কুরারে করিলে দান হএ দসগুণ॥
সেই কুরা তাপে চাঙ্গা সর্ব্বলোকে জানি।
তাহাতে অধিক ধর্ম্ম কহিলে আপনি॥

(৮ম পত্র)

খণ্ডিত পুথির সাহায্যে আর বেশী কথা বলা যায় না। পাঠকগণ দেখিবেন, বৌদ্ধ কবির রচনা হইলেও তাঁহার ভাষা বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল।

আমার দেশের বৌদ্ধ-ভ্রাতৃগণ এখন শিক্ষা-দীক্ষায় অনেকটা অগ্রসর হইয়াছেন এবং অনেক কৃতবিদ্য ও উচ্চপদস্থ লোক তাঁহাদের সমাজে আছেন। ডাক্তার বেণীমাধব বড়ুয়া, গজেন্দ্রলাল বড়ুয়া প্রভৃতি কয়েকজন সাহিত্যিকও তাঁহাদের মধ্যে রহিয়াছেন। আধুনিক কালে তাঁহারা "বৌদ্ধ-বন্ধু," "বৌদ্ধ-পত্রিকা," "সম্বোধি" প্রভৃতি মাসিক পত্র পরিচালনায় ব্যাপৃত হইয়া আপনাদের ধর্ম্ম, সভ্যতা ও কৃষ্টির কথা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাষার সেবা করিতেছিলেন। এখন তাঁহারা হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকায় মাতৃভাষা তাঁহাদের সেবা হইতে বঞ্চিতা হইয়াছেন। ইহাতে যুগপৎ তাঁহাদের ও বাঙ্গালা সাহিত্যের—উভয়েরই ক্ষতি সাধিত হইতেছে। কথাগুলি একবার আমার বৌদ্ধ-ভ্রাতৃগণ চিন্তা করিয়া দেখিবেন কি?

অপরাধ বিজ্ঞান

শ্রীআনন ঘোষাল

সহজাত বুদ্ধিপ্রণোদিত প্রেমই হচ্ছে সত্যকার প্রেম। এই প্রেমকে Commercial প্রেমও বলা যায়। Irrational বা অবুঝ প্রেম অনর্থেরই কারণ হয়। হিষ্ট্রিয়া আদি মনোবিকার Cultural contract বা কৃষ্টিগত অসমতা, সাময়িক উন্মাদনা, বা Temporary insanity প্রভৃতি এই সব অনর্থের মূল। অধিকাংশ অবুঝ প্রেমই হিষ্ট্রিয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। নিম্নের বিবৃতিটুক পড়লে বিষয়টা বুঝা যাবে।

"আমি একজন ধনীর সন্তান। শুধু তাই নয়, কোলকাতার একজন নামজাদা লোক। একটী মাত্র কন্যা আমার। ধনীর দুলালী, অতি সন্তর্পণে তাকে মানুষ করেছি। মোটর ভিন্ন সে রাস্তায় বেরোয়নি। সে যে ওপারের পেট্রলের দোকানের সামান্য কর্ম্মচারীটাকে ভালবাসবে তা কল্পনারও বাইরে। ভিন্ জাতের ছেলে, শিক্ষা দীক্ষা কিছুই নেই। টিনের-বাড়ীতে থাকে। হঠাৎ তার একটা প্রেমলিপি আমার হাতে আসে। আমি সকল সমাচার অবগত হই। রাত্রে সেদিন ঘুম হয় না। দেড়টা পর্য্যন্ত ওত পেতে বসে থাকি। হঠাৎ দেখি, মেয়ে আমার বাপের বিপুল ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করে, এক বস্ত্রে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। তখনি তাকে আটকে ফেলি। মেয়ের আমার সে কি আছড়ানি। কি ভীষণ তার কাতরাণি। থেকে থেকে আছড়ে পড়ে, আর অজ্ঞান হয়। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে আর বলে—ওগো পায়ে পড়ি, তোমরা আমায় মুক্তি দাও। আমি তোমাদের কেউ নই। চোখ দিয়ে আমার জল পড়ে। এতদিন ধরে যাকে বুকে করে মানুষ করেছি, সে কিনা বলে, আমি তোমাদের কেউ নই। দূর থেকে দেখা ও কথা কওয়া ছাড়া, অন্য কোনও ঘনিষ্ঠতা তাদের হয় নি। ক্ষণিকের এই আলাপ, তার শক্তি এত বেশী। সাত আট দিন একভাবে কেটে যায়। রাত্র জেগে পাহারা দিই, শেষে নাচার হয়ে আমার এক বন্ধুকে ডেকে আনি। বন্ধুটী আমার একজন অভিজ্ঞ পুলিশ অফিসার। অভয় দিয়ে তিনি জানালেন—ভাববার কিছু নেই। এ নিছক হিষ্ট্রিয়া রোগ, Typical suppressed type of Hystria—হিষ্ট্রিয়া হলেই যে সব সময় হাত পা ছুঁড়ে তা নয়। এক এক জনের এক একটা লোক বা জিনিসের উপর ঝোঁক আসে, বাংলায় যাকে বলে "বাই"। এর ঝোঁক পড়েছে এই ছেলেটার উপর। পুরা ৩১ দিন নেবে, তারপর ধীরে ধীরে সেরে যাবে। এর মধ্যে দেখব, ছোকরাটা বাটীর ত্রিসীমানায় না আসে। পুলিশ বন্ধুটী আরও বল্লেন, ছোকরাটাকে

তিনি কালই শায়েস্তা করবেন, শেষ কথাটা ঘুমন্ত অবস্থায়ই মেয়ের কানে গেল। ছুটে এসে বন্ধুর পা জড়িয়ে সে বলে উঠল—'ওকে কিছু বলবেন না, সব দোষ আমার।' মেয়ের আমার 'তদ্‌গত তদ্‌ভাব তদ্‌চিত্ত' অবস্থা। লজ্জায় ক্ষোভে ও অপমানে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলাম। পুলিশ বন্ধুটী পরামর্শ দিলেন—কোনও রকম অত্যাচার করবেন না, সবাই যেন মিষ্টি কথা বলে, একেবারেই ও প্রকৃতস্থ নয়। রোগ হঠাৎ উগ্র হয়ে উঠেছে। ৬১ দিন পর্য্যন্ত আয়ত্তের বাইরে থাকবে, অনেক সময় ছয় মাসও নেয়। ৬১ দিন পর্য্যন্ত সাবধানে অপেক্ষা করুন, রাত্রে ভাত দেবেন না। Diet changeএর প্রয়োজন, সকালে লেবুর রস দেবেন, ঘুমের ওষুধও দরকার।"

পুলিশ বন্ধুটী খুকির বাক্স তল্লাস করে কতকগুলি বই বার করেন। ধনীর দুলালীরা গরীব ছেলেকে বিয়ে করে গাছতলায় এসেও কেমন সুখে থাকে, গল্পে তা বর্ণিত ছিল, কথিত ছেলেটীই এই বইগুলি খুকিকে পাঠায়। বন্ধুবর এই বইগুলি সরিয়ে নিয়ে সেই স্থলে বিশেষ কয়েকটী পুস্তক রেখে যান। পুস্তকগুলিতে গরীবের ঘরের অনেক দুর্দ্দশার বর্ণনা ছিল। ৬১ দিন পর দেখলাম মেয়ে আমার ধীরে ধীরে সেরে উঠছে। পুরাণ কথার উল্লেখে সে এখন লজ্জিত হয়। বাড়ীর কাছে ছোকরাটাকে দেখলে সে নালিশ জানায়। সে এখন সৎপাত্রে পাত্রস্থ। সুখেই সে ঘরকন্না করছে।

এই ৬১ দিনের মধ্যে যদি কথিত ছোকরাটী মেয়েটীকে হরণ করতে সক্ষম হত, তাহলে সে নিশ্চয়ই তাকে নষ্ট করত। ৬১ দিন মেয়েটীও তার অনুগত থাকত। কিন্তু ৬১ দিন পরেই মেয়েটীর মোহ কেটে যেত। বাধ্য হয়ে তখন সে ছেলেটীর কাছেই থেকে যেত, কিংবা যেত না। কিন্তু একটা অভাবনীয় অনুশোচনায় সে আজীবন দগ্ধ হত। ৬১ দিনের পূর্ব্বেই তাকে উদ্ধার করলে, তার আচরণ থাকত পূর্ব্বের মতই। কিন্তু ৬১ দিন পরে সেই একই মেয়ে তার অপহারকের বিরুদ্ধে বিবৃতি দেবে। সে তখন বুঝতে পারে, তার দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে অপহারক তার কি সর্ব্বনাশ করেছে। তার তখন প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি জেগে উঠে। এইরূপ প্রতিহিংসা তদন্তের বিশেষ সহায়ক হয় এবং সহজেই অপরাধীকে জেলে পাঠান যায়। এইজন্য ৬১ দিন পর্য্যন্ত Rescue Homeএ রাখার পর মেয়েদের কোর্টে পাঠান উচিত। Cultural Contrast বা কৃষ্টিগত অসমতাও একটী বিশেষ Factor বা দিক। দূর থেকে মেয়েরা অনেক কিছুই ফানুস গড়ে। কিন্তু কাছে যখন দেখে, অপহারকের সঙ্গে তার একটা বিরাট কৃষ্টিগত প্রভেদ, তখন সঙ্গে সঙ্গেই অপহারকের উপর সে বিরূপ হয়। অনুশোচনায় সে মূহুর্মূহু দগ্ধ হতে থাকে। কৃষ্টিসম্পন্ন মেয়েরা গরীব মূর্খের সঙ্গে স্বইচ্ছায় বেরিয়ে এলেও, উদ্ধার হওয়ার পর এই কারণেই অপহারককে মিথ্যার জাল বুনেও জেলে দিতে কুণ্ঠিত হয় না। ধনীর সহিত নির্ধনের চলে, কিন্তু মূর্খের সহিত শিক্ষিতের চলে না। প্রায়ই দেখা যায় একইরূপ কৃষ্টি-সম্পন্ন ছেলে মেয়ে মিলিত হলে, পরস্পর থেকে পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করা শক্ত হয়, জাতি ধর্ম্ম বা সংস্কার কোন কিছুই এইরূপ মিলনে বাধা দানে অক্ষম হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে মেয়েটী অপহারকের বিরুদ্ধাচরণ করতে অরাজী থাকে। Temporary Insanity অপর আর একটী Factor হিষ্ট্রিয়া রোগ ধীরে ধীরে জন্মায়। কিন্তু উন্মাদনা হঠাৎ ও এক মুহূর্ত্তেই এসে পড়ে, কিন্তু বেরিয়ে আসার পরেই প্রায়শঃ তারা প্রকৃতস্থ হয়, অনেক সময় চেঁচিয়েও উঠে। কেহ বা অপহারকের পায়ে পড়ে তাকে ফিরিয়ে দেবার জন্য অনুরোধ জানায়। ঝোঁকের মাথায় বেরিয়ে এসে তারা দেখে তাদের ফেরার পথ বন্ধ হয়ে গেছে। অথচ অপহারককেও সে বরদাস্ত করতে পারে না। তাকে তখন বাধ্য হয়ে ঘৃণিত জীবন যাপন করতে হয়। সুবিধামত একনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করে। সুযোগ পেলে সে বিবাহও করে; এই ধরণের একটী মেয়েকে উদ্ধার করে তাকে জিজ্ঞেস করা হয়—"আপনি এরকম করলেন কেন?" উত্তরে সে বলে—"মতিচ্ছন্ন হয়েছিল।" এই সব বিশেষ ক্ষেত্রে মেয়ের মন কিছুকাল যাবৎ প্রেমোন্মুখ থাকে। কিন্তু সে প্রেমের পাত্র ঠিক করতে পারে না। এই ধরণের মেয়েদের কল্পনাশক্তির অভাব ঘটে, কারও কারও কল্পনা ভুল পথে পরিচালিত হয়। মনকে জোর করে সংযত করতে গিয়ে অনেকে মনের বিকার ঘটায়। হঠাৎ তার মনে হয় যেন সে এই লোকটাকেই চাইছে। চোখে চোখে তাকান বা পুনঃ পুনঃ ভাবনার ফলে এইরূপ বিকার জন্মায়। অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে, অজ্ঞাত অপহারকের ইঙ্গিতেও সে বেরিয়ে পড়ে। এইরূপ উগ্র প্রেরণা হঠাৎ আসে ও ক্ষণস্থায়ী হয়। ঠিক সেই দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে অপহারক হাজির হলে মেয়েটীকে বার করা সহজ হয়। আত্মীয় স্বজন ছাড়া এমন কোনও ব্যক্তি সে দেখে না, যার উপর সে প্রেম ন্যস্ত করতে পারে। এজন্য প্রথম অনাত্মীয় যে ব্যক্তি তার সম্মুখে আসে তাকেই সে বরণ করে নেয়। রাস্তার ভিখারী হলেও তার আপত্তি থাকে না। এই কারণেই অনেক গৃহস্থের মেয়ে পানওয়ালার সঙ্গেও চলে এসেছে।

প্রায়ই দেখা যায়, যেখানে প্রেমের পাত্র একাধিক থাকে, সেখানে মেয়েরা তুলনামূলকভাবে বিচার করার সুযোগ পায় এবং উক্তরূপ বিচারার্থ যে সময়টুকু পায়, সেই সময়টুকুতে তারা আত্মস্থ ও প্রকৃতিস্থ হয়। এইজন্য আধুনিক পরিবারের শিক্ষিতা মেয়েরা, যারা পর্দ্দা প্রথা মানে না, তারা অবাঞ্ছনীয় ব্যক্তির সহিত প্রস্থানও করে না। তারা এমন এক ব্যক্তিকে পাকড়াও করে, যার কিনা মোটর আছে, বেতন চারিশতের কম নয়, যা কিছু গোলমাল বাধে তা জাতি কুল বা ধর্ম্ম নিয়ে। একাধিক ব্যক্তির সহিত সংলাপে অপর একটী সুবিধা আছে। তারা পরস্পর পরস্পরকে সংযত রাখে, যতক্ষণ না মেয়েটী বিশেষ একজনকে বেছে নেয়।

প্রেম যখন আসে তা হঠাৎই আসুক বা ধীরে ধীরেই আসুক, তা দুর্জ্জয়রূপেই আসে, আমাদের দেশে যে ভাবে ও যেরূপ সন্তর্পণে মেয়েদের মানুষ করা হয়, তাতে প্রেম কি তা তারা কিছুটা বিয়ের আগে বুঝলেও প্রেমের প্রকৃত সন্ধান পায় বিয়ের পরে। অজ্ঞ নিরক্ষর মেয়েরা যারা ভাবপ্রবণ নয়, যাদের কল্পনাশক্তি নাই, তারা এইরূপ বিবাহেই সন্তুষ্ট থাকে। বিয়ের পরই গভীরভাবে তারা স্বামীকে ভালবেসে ফেলে। বিয়ের পরদিনই স্বামীর হয়ে ভাইবোনের সঙ্গে এমন কি পিতামাতার সঙ্গেও কলহ করতেও তাদের বাধে না। সহজ স্বার্থ ও যৌন স্পৃহা তাদের জীবনের সহায়ক হয়। কিন্তু সাবধানে ও সন্তর্পণে মানুষ হলেও আজিকার পর্দ্দাশীল মেয়েরাও প্রেমের উপন্যাস পাঠ ও প্রেম-অভিনয়াদি দর্শনে বঞ্চিত নয়। শিক্ষার সঙ্গে তাদের কল্পনা শক্তিও প্রখর হয়ে উঠে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মনও প্রেমোন্মুখ হয়। আধুনিক পরিবারের মেয়েদের ন্যায় মেলামেশার সুযোগ তাদের নেই। ফলে কল্পনায় তাদের ভাবী স্বামীর রূপ ও গুণ সম্বন্ধে একটা ধারণা করে নেয়। বাপ মার দেখে-দেওয়া স্বামীর সঙ্গে তারা কল্পনার স্বামীর সহিত যদি একেবারে বিপরীত মিল হয় ত সর্ব্বনাশ! প্রকৃতিস্থ ও সহজ হতে তাদের তখন বহু সময় লাগে। অবশ্য সময়ে সবই ঠিক হয়ে যায়। কিন্তু যতদিন তা না হয় ততদিন নানাভাবে তাকে ভুলিয়ে রাখা উচিত। এর মধ্যে যদি তার কল্পনায়-আঁকা ছেলের মত কোনও একটী ছেলের সহিত তার অবাধ মেলামেশার সুযোগ ঘটে এবং সর্ব্বোপরি সেই কথিত ছেলেটী যদি দুষ্টপ্রকৃতির হয় ত মেয়েটীর আর রক্ষা নেই। মেয়েদের এই বিশেষ ভাবটীকেও আমি একপ্রকার দুর্ব্বলতা বলব এবং এইরূপ দুর্ব্বলতার সুযোগ যে সব ছেলেরা নেয়, তাদের শাস্তি পাওয়া উচিত। এইজন্য বিয়ে দেওয়ার আগে অভিভাবকদের মেয়ের চিন্তাধারা ও ইচ্ছার সহিত পরিচিত হওয়া উচিত, তবে মনে রাখা উচিত, সকল মেয়ের চিত্ত-দুর্ব্বল নয়। তা হলে বর্ত্তমান সমাজ বহুদিনেই ভেঙ্গে যেত। সুযোগের অভাব, মনের সবলতা বা কর্ত্তব্যজ্ঞান মেয়েদের এ বিষয়ে সাহায্য করে। অনেক ক্ষেত্রে একনিষ্ঠতার সঙ্গে সারা জীবন বাস করলেও স্বামী স্ত্রীর জীবনে প্রকৃত মিল হয় নি এমনও দেখা গেছে।

উপরোক্ত কারণই এইরূপ গরমিলের জন্য দায়ী ; জেনে রাখা উচিত পাত্রস্থ করবার পূর্ব্বে মেয়ের মন সম্বন্ধে পূর্ব্বাহ্নেই জ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন। অনেক মেয়েই মনের ভাব ভাষায় ব্যক্ত করতে অক্ষম। এই কারণে কৌশলে তার মন জানা দরকার। নিম্নোক্তরূপে মেয়েদের আসল মনের সন্ধান পাওয়া যায়। নিম্নের প্রশ্নোত্তরগুলি প্রণিধানযোগ্য।

প্রঃ—আচ্ছা খুকি, তুমি নিশ্চয় ছবি ভালবাস, কেমন ? সেদিন একটা প্রদর্শনীতে চমৎকার তিনটে ছবি দেখলাম, তিনটাই কিনে নিয়েছি। ভারি চমৎকার ছবি তিনটে।

উঃ—নিশ্চয় ভালবাসি, আপনি বাসেন না। কে না ভালবাসে। তিনটে ছবিই কিনেছেন। বড্ড পয়সা নষ্ট করেন আপনি। আমি কিন্তু একটা নেব।

আ—বেশ ত নিও না। কোন্‌টা নেবে, প্রথম ছবিটা হচ্ছে একটা পল্লীচিত্র। এতে আঁকা আছে ছোট একতলা একটা বাড়ী। চারিধারে তার সব্জী বাগান, দূরে একটা পুকুরও দেখা যায়। মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বাড়ী আর কি ?

সে—দরকার নেই। পাড়াগাঁ আমার ভাল লাগে না। মশা, অন্ধকার, কুঠির ত দূরের কথা, পাড়াগাঁর রাজবাড়ীতেও আমার ভয়। মেজদির এক পাড়াগাঁর জমীদার বাড়ীতে বিয়ে হয়েছে। জমীদার স্বামী হলে কি হয়, বড্‌ড বদ্‌রাগী। গেঁইয়াগুলো আমার দু চক্ষের বিষ।

আ—অপর ছবিটা হচ্ছে একটা প্রাসাদের, সহরের বুকের উপর প্রাসাদ। চারিদিকে ফুলের বাগান, গেটের দু পাশে মালির ঘর। সামনে দু' সারি মোটর-গ্যারাজ। বাড়ীটা তোমার ভারী ভাল লাগবে। ইচ্ছে হবে সেখানে গিয়ে থাকতে, নেবে ছবিটা ?

সে—থাক। বড়লোকের বাড়ী। বড়লোকগুলোকে দু চক্ষে দেখতে পারি না। তারা সব দাম্ভিক হয়। কেউ কেউ মাতালও হয়। মাতালকে বড় ভয় করি আমি। বড়লোক মূর্খ হলে ত কথাই নেই। গরীব মানুষ আমরা প্রাসাদের দরকার নেই। ও ছবি আমি নেব না।

আ—তাই নাকি তবে তুমি তৃতীয় ছবিটা নিও। সহরতলীর গলির মোড়ের ছোট্ট বাড়ী। বারণ্ডাটায় গ্যাসের আলো পড়েছে। বাড়ীর মালিক খুব বড়লোক নয়, গরীবও নয়, তা ছবিটা দেখলেই বুঝা যায়, আর পাওয়া যায় মালিকের এসথেটিক্ সেন্সের পরিচয়। ছবিটার একটা ফটো-কপি পকেটেই আছে, দেখ দিকি।

সে—বেশ বাড়ীটা ত! আমার যদি টাকা থাকত ত এই রকম একটা বাড়ী কিনতাম, ভারি চমৎকার কিন্তু। Originalটা আমায় দেবেন ত ? ঠিক দেবেন।

মেয়েরা ভালবাসে শুধু আসল মানুষকে নয়, কল্পনার মানুষকেও তারা ভালবাসে। আসল মানুষের সঙ্গে কল্পনার মানুষের মিল না থাকলেই মুস্কিল।

উপরি-উক্ত দুর্ব্বলতাগুলি ছাড়া আর এক প্রকার দুর্ব্বলতা মেয়েদের মধ্যে দেখতে পাই, সেটা হচ্ছে বয়সের দুর্ব্বলতা। মেয়েদের চৌদ্দ হতে একুশ পর্য্যন্ত বয়সের একটা বিশেষত্ব আছে। এই বয়সকালের মধ্যে যে ব্যক্তি তাদের মনে প্রথম দাগ কাটবে (First Impression) সেই জিতবে। সে যদি অতি বড় কদাকার, অশীতি বয়স্কের বৃদ্ধও হয় তবু সেই জিতবে! তার সঙ্গে ফ্রি কম্‌পিটিশনে তরুণ ধনী সুশ্রী যুবকরাও তখন হার মানবে। এর বহু নিদর্শন আমার কাছে সংগৃহীত আছে। আমি এমন একটী সুন্দরী ষোড়শীকে জানি, যে একজন পঞ্চাশবয়স্ক প্রৌঢ়ের জন্য পাগল হয়ে উঠে এবং আমার বিশেষ বিরক্তির কারণ হয়, এজন্য সে আমাকে যে কৈফিয়ৎ দেয় তা থেকে কিছুটা নিয়ে উদ্ধৃত করলাম।

"আমি সুখে থাকি বা না থাকি তা আমি বুঝব। প্রকৃত সুখ মানুষের মনের মধ্যে থাকে, বাইরে নয়। বুড়কে বিয়ে করছি কেন জানতে চান। আমার বিশ্বাস তিনি অনেকের চেয়ে ভাল ও নিয়মিত জীবন যাপন করে এসেছেন, আপনাদের মত যে কোনও যুবকের চেয়েও তার দেহ ও মন অধিকতর সুস্থ ও সবল। আমার বিশ্বাস আপনাদের যে কোনও যুবকের চেয়েও তিনি বেশী দিন বাঁচবেন। গৌরী কি শিবকে বিয়ে করেছিল তার বয়স দেখে, না জটা দেখে ; গৌরী শিবকে বিয়ে করেছিলেন, তিনি মহাযোগী মহাত্যাগী বলে। আর এও জেনে রাখবেন তিনি আপনাদের মত যে কোনও যুবকদের চেয়েও আমাকে বেশী ভালবাসেন এবং বরাবর বাসবেনও, পাতায় পাতায় বা ফুলে ফুলে ঘুরে বেড়াবেন না, বুঝলেন !"

অনেক অভিভাবক আছেন যাঁরা ছেলে ছোকরা সম্বন্ধে সাবধান থাকেন। কিন্তু বুড়াদের সম্বন্ধে সাবধান থাকেন না, এটা তাঁদের মস্ত বড় একটা ভুল। চৌদ্দ হতে একুশ (পঁচিশও) বৎসর বয়সের মেয়েদের ভালবাসার মধ্যে যেমন একটা প্রাণ বা Sincerity থাকে, অনুরূপ বা তদূর্দ্ধ বয়স্কের সৎ চরিত্রের যুবকদের মধ্যেও প্রায় তদনুরূপ Sincerity বা প্রাণ দেখা যায়। উভয় পক্ষই বিবাহের জন্য ব্যস্ত হয়, কিন্তু চল্লিশের উপর বয়স্কের এমন অনেক দুর্ব্বৃত্ত আছে, যারা বয়সের দোহাই দিয়ে তরুণ মেয়েদের সাহচর্য্য লাভ করে এবং তাদের মনে প্রথম দাগ কাটাবার সুযোগ পায় ; এই বয়স্কের লোকেরা প্রায়ই বিবাহিত হয়, ফলে মেয়েটীকে বিবাহ করাও সম্ভব হয় না। এরা অভিভাবকদের ভুলিয়ে রাখতে পারে সহজে। তুলনামূলকভাবে বিচার করে দেখা গেছে যে চল্লিশের উপর বয়স্ক লোকদের মধ্যে বজ্জাতি থাকে বেশী। ভাবপ্রবণতার অভাবই এর একমাত্র কারণ। তবে কোনও কোনও ক্ষেত্রে যে এর অন্যথা হয় না তা নয়, যৌবন চলে যাবার পূর্ব্বাহ্নে অনেকে বেপরোয়া হয়ে উঠে। ইহা একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। মন তাদের অপেক্ষা করতে চায় না। এই ধরণের দুর্ব্বৃত্তরা আনাগোনা করে পর্দ্দানশীন পরিবারের মধ্যেই বেশী, যে পরিবারের মেয়েরা সাধারণতঃ তরুণ বয়স্কদের সাহচর্য্য পায় না। এরা অবিভাবকদের এই কুসংস্কারেরও সুযোগ নেয়। আমি এমন একজন দুর্ব্বৃত্তকে জানতাম। তার চুলেও পাক ধরেছিল, শুনেছিলাম চুলগুলা সে ইচ্ছে করেই পাকিয়েছিল। তার এক বন্ধু তাকে একটা বিশেষ তৈল মাখতে উপদেশ দেন, যাতে কিনা তার চুল পাকা বন্ধ হতে পারে। উত্তরে সে বলে—"ক্ষেপেছ, এতে সুবিধে কত। খুকিরা ভয় পেয়ে পালায় না। ডাকলে কাছে আসে। এমন কি আদর করলেও কিছু বলে না।" এক কথায় পাকা চুল তার কাছে ছিল একটা ধাপ্পা। এ বিষয়ে অভিভাবকদের আমি সাবধান করে দিতে চাই।

আমাদের দেশের অভিভাবকদেরও এমনি অনেক দুর্ব্বলতা আছে, যার সুযোগ দুর্ব্বৃত্তরা প্রায়ই নিয়ে থাকে। আমি এ সম্বন্ধে অনেক কথা একজন দুর্ব্বৃত্তের কাছে শুনেছিলাম। তার বিবৃতির কিছুটা নিয়ে দেওয়া হল।

"পান বা সিগারেট আমি খাই, তবে সব যায়গায় খাই না। তার কারণও আছে। শুনবেন, বলি শুনুন। ধরুন অমুক বাটীর কর্ত্তার সঙ্গে আপনি দেখা করতে গেছেন। কর্ত্তা বললেন—Do you Smoke? যদি বলেন হাঁ, ত কর্ত্তা হেঁকে বলবেন—আরে চাকরটা গেল কোথায়। ও ভিখু, সিগারেট কেস্‌টা নিয়ে আয়। কিন্তু যদি বলেন খাই না, তা হলে কি হবে জানেন! কর্ত্তা তখন বলে উঠবেন—"very good, খুব ভাল ছেলে ত বাবা তুমি।" তারপর হেঁকে উঠবেন—'ওরে রমা, চা নিয়ে আয় ত।' এইভাবে বাড়ীর গিন্নীর প্রশ্নের উত্তরে যদি বলেন—"হাঁ পান খাই," তাহলে গিন্নী ঝিকে ডেকে বলবেন—ওরে ঝি, পানের ডিবেটা আন। কিন্তু যদি বলেন, না খাই না, তাহলে এক গাল হেসে, সস্নেহে গিন্নী বলবেন—'পানও খাও না, বাবা আমার শিবের মত দেখছি।' সকল সন্দেহ তাঁর মন থেকে মুছে যাবে। তিনি তখন তাঁর মেয়েকে ডেকে বলবেন—"ওরে পুঁটি, মশলা নিয়ে আয় ত।" -এর পরে পুঁটি এলে এও বলতে পারেন—"যা দাদাকে প্রণাম কর।" অনেকে আসন দেবার আগে ধপ করে মাটিতে বসে পড়ে ভালমানুষও সাজে। (ক্রমশঃ)

কালীঘাটের গেঞ্জি

শ্রীসন্তোষকুমার দে বি-এ

প্রবেশিকা পরীক্ষার মুখে যে ছাত্রীটি হাতে আসিয়া পড়িল তাহাকে শিক্ষা দিতে যাইয়া অনেকটা শিক্ষা পাইয়া আসিয়াছি। ইহাতে আমার দুঃখ নাই, বরং মেয়েদের উপর শ্রদ্ধা বহুল পরিমাণে বাড়িয়াছে।

নাম তার নমিতা নন্দী; নামের মধ্যে যে মানুষের কোনও সত্যিকার সান্নিধ্য থাকে সে কথা তাহাকে না দেখিলে বিশ্বাস করিতাম না। প্রথমাবধি লক্ষ্য করিলাম—এত শান্ত, এত সরল সুন্দর মেয়ে আমি আর দেখি নাই। তাহার নির্বিকার মুখশ্রীর অটল সৌম্যরূপ যেন বিস্ময়াবিষ্ট করিয়া তুলে। মনে হয়, কামনার উন্মাদ হস্ত সেখানে নিস্তেজ হইয়া মধুময় কল্পনার আশ্রয় নেয়।

নমিতা পড়িতেই চাহিত, অথচ আমি ঠিক সকল সময় পড়াইতে চাহিতাম না। হয়ত সে কথা সে বুঝিত, জানিতে পারিত—কত সামান্য উপলক্ষ নিয়া আমি কত বাজে বকি, আর কত প্রয়োজনীয় বিষয়গুলিও অলক্ষ্যে এড়াইয়া যাই। সে বুঝিত, হয়ত কখন বিরক্তও হইত, কিন্তু বলিতনা কিছুই।

পড়াশুনার শেষে দু-একদিন আমি তার ডেস্‌ক হইতে "ক্ষণিকা"খানি তুলিয়া নিতাম, এলোমেলোভাবে পড়িতে পড়িতে দু-একটিতে কখন্ মন নিবিষ্ট হইয়া পড়িত, খেয়াল থাকিত না। শ্যামল কুঞ্জবনতলে সঞ্চারমান গোপবালার গোপন অভিসার-যাত্রার মত দূর অতীতের পরম রহস্যময় মায়ার আবেষ্টনী সৃষ্টি হইত। শ্রাবণ মেঘের ছায়ায় কালিন্দীর কালো জল আরও কালো হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া যাহারা গাগরী ভরণে আসিয়াছিল তাহাদের অন্তর শিহরিয়া উঠিল। চঞ্চল হস্তে কিঙ্কিনী ধ্বনিত হইল। খেয়াতরীখানি দুলিয়া উঠিয়াছে—আর কুঞ্জবন আলো করিয়া ময়ূর কলাপ বিস্তার করিয়াছে।

এই চিত্রের মোহময় স্নিগ্ধ সরস রূপের লহরীর মধ্যে অলক্ষ্যে কখন কলিকাতার প্রখর আলোকিত রাজপথ তলাইয়া যাইত, পড়িবার ঘরখানির অস্তিত্ব লোপ পাইত। সেখানেও যেন বর্ষা ঘনাইয়া আসিয়াছে, তরী বুঝি দুলিতেছে, ঐ বুঝি শ্যামবন-বীথি মথিত করিয়া বর্ষার বাতাস ছুটিয়া আসিতেছে।

চাহিয়া দেখিতাম, জানালার নীল পর্দাটি উড়িতেছে, নমিতার মাথার চুল উড়িয়া মুখে পড়িতেছে, আর সে অপলক দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে।

এই একটি মুহূর্তে সে যেন তাহার নিস্পৃহ অভিমান ছাড়িয়া আপন স্বরূপে দেখা দিত। আমার মনে হইত, গোপিনীরা কি ইহার অপেক্ষাও সুন্দর ছিল, নমিতা কি দ্বাপরে গোপবালা হইয়া কালিন্দীকূলে বর্ষার আবাহন করে নাই?

নিঃসন্দেহে বুঝিলাম—ভালো বাসিয়াছি। তাহাকে আমি কেন, যে কোন পুরুষ, যাহার প্রাণ আছে, চক্ষু আছে, অন্তর আছে—সে কখনই এই মমতাময় দৃশ্যটির মধ্যে তাহাকে দেখিয়া ভালো না বাসিয়া পারিত না। তাহার আটপৌরে শাড়ীর মধ্যে অগোছাল নিখুঁত সৌন্দর্য এমন ঘরোয়াভাবে ধরা পড়িত, যেন তাহা মাজিয়া ঘসিয়া সাজাইয়া দেখিবার বাসনাও জাগিত না।

যাহার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয় না তাহাকে ভালোবাসিবার একটি সহজ ও সুলভ পরিস্থিতি জুটিয়া গিয়াছে। এই সৌরভময় মুহূর্তে প্রতিটি ক্ষণ মোহময় আকর্ষণে উচ্চকিত করিয়া রাখে। কত নগণ্য এই ব্যক্তি—কিন্তু তাহারই মধ্যে অযুত সম্ভাবনার আশ্বাস ঝংকার তুলিয়া ফিরিতে থাকে। জানি না কি বিশ্বাসে আমি যেন বিকশিত হইয়া উঠিতেছিলাম।

প্রাণের স্বভাবধর্মই এইরূপ আত্মানুভূতির রোমাঞ্চকর পরিব্যাপ্তি কিনা জানিনা, কিন্তু নমিতার দিক হইতে 'স্পষ্টত' কিছুই বুঝিতে পারি না। মনে হয় পরীক্ষার তাড়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশ পথ না ডিঙ্গাইয়া সে আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইতে পারিতেছে না, আমার নাগালও তাহার কাছে পৌঁছে না। ভাবিলাম পরীক্ষা শেষ হইলে এই ক্ষণিকার পাতায় পাতায় যে অবিনশ্বর রসধারা বিচিত্রলহরী তুলিয়া বহিয়া চলিয়াছে উহারই কূলে তাহাকে নিয়া দাঁড়াইব; সেই ক্ষণিকার ভাবতরঙ্গিণী তীরে আমাদের ক্ষণিক মিলন চিরদিনের ঔজ্জ্বল্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে।

কিন্তু হইয়া উঠিল না, কিছুই হইল না।

নমিতাকে কথাটা যেদিন পাড়ি পাড়ি করিতেছি সেদিন পরীক্ষার ভারমুক্ত নমিতাও যেন অনেকটা উন্মুখ হইয়া আছে মনে হইল। কথাটা ঘুরাইয়া বলিলেও সে সোজা করিয়া ধরিয়া বলিল, মাষ্টারের পক্ষে ছাত্রীকে ভালোবাসা খুবই সোজা, কি বলেন?

নমিতার নিম্ন কণ্ঠস্বরে এত বড় স্পষ্ট উক্তি প্রত্যাশা করি নাই, এ যেন কে বলবান হস্তে বৃষের শৃঙ্গদ্বয় দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়াছে। এক মুহূর্তে আমার ভিতরটা যেন রী রী করিয়া উঠিল। বলিলাম, কথাটা তুমি কি ভাবে গ্রহণ করো, নমিতা? কিন্তু তুমি কি জানো না, স্নেহ ভালোবাসা সহজ জিনিষ। সহজ অর্থ যা সঙ্গে সঙ্গে জন্মে। কাউকে দেখবার সঙ্গে সঙ্গে যদি ভালো লাগে, ভালো বাসে—সেটা কি অহেতুক, সহজ বলেই সত্য নয়?

মাথা নীচু করিয়া নমিতা বসিয়াছিল—সেই ভাবেই সে একটু হাসিল, বলিল—সহজ বলেই সেটা সুলভ। দুর্লভ করে যাকে না পেলেন, অনায়াসে পাওয়ার গ্লানি তাকে গ্রাস করে ফেলে।

তর্ক করিয়া কাহারও উপর ভক্তি আনা সম্ভব নয়, তর্ক করিয়া কাহাকে ভালোবাসাও যায় না, ভালোবাসানোও যায় না—এটুকু বুঝিতাম, তাই বৃথা তর্ক না করিয়া উঠিয়া আসিলাম। সেদিন সন্ধান নিয়া জানিতে পারিলাম—কেন এবং কিসের বলে নমিতা গম্ভীর স্বরে কথাগুলি আমাকে শুনাইয়া দিয়াছে। যে বন্ধু ছাত্রীটির সন্ধান দিয়াছিল, সে-ই জানাইয়া দিল, নমিতা অন্যত্র আসক্ত এবং সে জন্যই সে প্রাণ পণ করিয়াছে। প্রতিটি দিন সে

তাই মূল্য দিয়া ক্রয় করিয়া আপনাকে প্রিয়তমের উপযুক্ত করিয়া তুলিতেছে।

মহৎ প্রেমের প্রেরণা লইয়া ফিরিয়া ছিলাম। নমিতার কাছে আর মুখ দেখাইবার উপায় ছিল না। সে আমাকে কতদূর নীচ-মনা বলিয়া মনে করিয়াছে।

পৃথিবীর বর্ণ বদলাইয়া গেল; বুঝিলাম সংসারে অর্থ সামর্থ্যই মূল বস্তু। নারীর প্রেম স্নেহ ভালবাসা প্রভৃতিও সেই অর্থের বেদীমূলে নিত্য উৎসর্গিত হয়। নতুবা দরিদ্র বলিয়া, বেকার বলিয়া আমার কি প্রাণ নাই, না সে প্রাণে সত্যকার স্নেহ মমতা থাকিতে পারে না। না, শুধু নমিতার জন্য নয়, বিশ্ব সংসারের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আমার মনের মধ্যে আক্রোশে ফুঁসিতে লাগিল।

কিছুদিন পরে কলিকাতার একটা অজ্ঞাত গলির মধ্য দিয়া একদিন বাহির হইতেছি, রসা রোডে ট্রাম ধরিব। গলিটা একটা মোড় ঘুরিয়া সোজা যাইয়া রসারোডে পড়িয়াছে ভাবিয়া সেই দিকে হাঁটিলাম। বর্ষা আসিতেছে—সুতরাং ব্যস্ত।

মোড়টার কাছেই একটি জানালায় অকস্মাৎ একটু নজর পড়িয়া মনে মনে হাসিলাম—সেই একই দৃশ্য, একই কাহিনী রচিত হইতেছে। একটি টেবিলের পাশে একজন যুবক বসিয়া কি পড়িতেছে, আর নিকটে দাঁড়াইয়া—তাহার ছাত্রীই হইবে, ছাত্রী না হইয়া যায় না।

একটু দূর চলিয়া আসিয়া মনে হইল, ছাত্রীটিকে যেন চিনি, যেন নমিতা। ফিরিতে হইল। নমিতা থাকিত শ্যামবাজারে, এটা যে রসা রোড্। কে টানিয়া আনিল জানি না, স্বাভাবিক গতিতে সাধারণ পথিকের মত ফিরিলাম ও ধীরে ধীরে জানালা অতিক্রম করিলাম। এবার আর সন্দেহ রহিল না, নমিতা-ই, তবে সিন্দুরের আভায় তাহার গৌর মুখশ্রী যেন শতগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

আবার ফিরিয়া বড় রাস্তার উদ্দেশ্যেই চলিলাম। নমিতার তবে বিবাহ হইয়াছে। কবে হইল, কাহার সহিত হইল কে জানে? জানিয়া আমার লাভই বা কি?

অকস্মাৎ চাপিয়া জল আসিল। আমি জোরে চলিয়া যে বারান্দাটির তলায় আশ্রয় নিলাম তাহারই নিকটে গলির মোড় ঘেসিয়া জানালাটি, দাঁড়াইয়া দেখা গেল, চেয়ারের যুবকটি একখানি বই-এর উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, বর্ষার ক্ষীণ আলোকে তাহার পুরুকাচের চশমাতেও বোধহয় সে দেখিতে পাইতেছে না। আর তাহার চেয়ার ঘেঁসিয়া নমিতা ঝুঁকিয়া পড়িতেছে। তাহার অবিন্যস্ত কেশপাশ পিঠের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

শুনিলাম যুবকটি পড়িতেছে—

ওরে শাওন মেঘের ছায়া নামে
কালো তমাল মূলে,
ওরে এপার ওপার আঁধার হল
কালিন্দীর কূলে।
ঘাটে গোপাঙ্গনা ডরে
কাঁপে খেয়াতরীর পরে,
হের কুঞ্জবনে নাচে ময়ূর
কলাপখানি খুলে॥

সেই কবিতা, যাহা একদা আমাকে অযুক্ত স্বপ্ন দেখাইয়াছিল, যে কালিন্দীর কূলে আমি নমিতাকে স্বরূপে চিনিবার অপার গৌরবে উল্লসিত হইয়া উঠিতাম।

শ্রাবণের বর্ষা সজোরে তর্জন করিয়া ছুটিয়া আসিল, যেন কাহার উপর প্রচণ্ড প্রতিশোধের জিঘাংসার রূপ সে জলধারার প্রমত্ত তাণ্ডবে প্রকট করিয়া তুলিতে লাগিল। নিরুপায় হইয়া দাঁড়াইয়া আছি, পথের ছিটকানো কাদাজলে কাপড়ের কৌলীন্য নষ্ট হইতেছে। একটু ঝুঁকিয়া পড়িলে রসারোডে ছুটিয়া-চলা ট্রাম বাস দেখা যায়, কিন্তু এতটা পথ দৌড়িয়া গেলেও ভিজিয়া যাইতে হইবে। সঙ্গে সদ্য-আদায়-করা একখানি সার্টিফিকেট ছিল, সেটির উপর মায়া জীবনের অপেক্ষাও অধিক—কারণ ঐ সার্টিফিকেট হয়ত আমার উদরান্নের সংস্থান করিয়া দিবে। অতএব নিরুপায় হইয়া দাঁড়াইয়া আছি।

বাহিরে বর্ষার প্রমত্ত মূর্তির উচ্ছ্বল আলাপের ফাঁকে ফাঁকে ঘরের মধ্যে বর্ষার কাব্য জমিয়া উঠিয়াছে, তাহার খণ্ড অংশ শুনা যায়—

আজিকে দুয়ার রুদ্ধ ভবনে ভবনে,
জনহীন পথ কাঁদিছে ক্ষুব্ধ পবনে।

এ পথে সত্যই লোক চলিতেছে না, রাজপথেই শুধু ট্রাম-বাসগুলি যন্ত্রযুগের জয় ঘোষণা করিতেছে। একটি গানের কলি আমার মনে পড়িল—

"এমন দিনে তারে বলা যায়,
এমন ঘন ঘোর বরিষায়।"

কিন্তু না, দুর্বলতা আর পোষণ করিনা। এখন ঘনঘোর বরিষায় চিন্তা করি, রেন-কোটের বিজ্‌নেস্‌টা এবার জোর চলিবে, কিন্তু মূলধন কৈ, নতুবা কি আর চাকুরি চাকুরি করিয়া ঘুরি?

বিমনা হইয়া পড়িয়াছিলাম, মনটা যখন নিজের কানে আসিল তখন শুনিলাম—

"—ওরে আজ তোরা যাস্‌নে ঘরের বাহিরে।"

নমিতা বাধা দিয়া বলিল, সত্যিই এমন দিনে কি ঘরের বাইরে যেতে দিতে আছে মানুষকে। তুমি তো তবু বড়বাজারে ছুটেছিলে, জোর করে ধরে না রাখলে এমন বর্ষাটা মাটি হত।

নমিতার স্বামী উত্তর করিলেন—সত্যি কি ঘরের বাইরে না বেরুলে চলে। দেখ না, ঐ বারান্দায় এক ভদ্রলোক কতক্ষণ থেকে দাঁড়িয়ে।

কথাগুলি যে আমি শুনিতে পাইতেছি তাহা নিশ্চয় উহারা অনুমান করেন নাই। বারান্দায় আমিই আছি, আর একটি গরু ভিজিতে ভিজিতে কিছুক্ষণ আগে আসিয়া উঠিয়াছে। আমাদের উভয়ের মধ্যে নিশ্চয় আমাকেই একটু ভদ্রলোকের মত দেখায়; অন্তত জামাকাপড়টা সদ্য ধোপ ভাঙ্গা, সার্টিফিকেট আদায় করিতে আসিয়াছিলাম, সুতরাং স্মার্ট সাজিতে হইয়াছে। এবার আমাকে উদ্দেশ করিয়া উহারা কথা বলিতে সুরু করিয়াছে দেখিয়া এ বারান্দায় আর দাঁড়ান সঙ্গত মনে হইল না। ট্রামের উদ্দেশ্যেই বর্ষা মাথায় করিয়া পথে নামিলাম। পিছনে দরজা খুলিবার শব্দ যেন শুনিয়াছিলাম, কিন্তু ফিরিয়া তাকাইতে ভরসা

হইল না। আমার ভরসা না হইলেও যিনি দরজা খুলিয়াছেন তিনি পরিষ্কার কণ্ঠে ডাকিলেন—সন্তোষবাবু!

নিজের নাম ধরিয়া আহূত হইলে নিজের অজ্ঞাতেও অন্তত একবার সকলেই ফিরিয়া তাকায়। আমিও তাকাইতেই দৃষ্টি বিনিময় হইয়া গেল। নমিতা নিজে আসিয়াছে, বারান্দায় নামিয়া ডাকিতেছে—এই জোর বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে ভিজছেন কি, উঠে আসুন, উঠে আসুন।

উঠিতে হইল, কথাটা অবহেলা করিলে যেন অপমান করা হয় মনে হইল। নমিতা বলিল, এখানে আসুন, ভিতরে আসুন—বলিয়া সে আমায় পথ দেখাইয়া ভিতরে নিয়া গেল।

ভিতরটা বাহির অপেক্ষা অন্ধকার, বর্ষার জন্যও বটে, ঘরের ছাদটা নীচু বলিয়াও বটে। নমিতা আলো জ্বালাইয়া আমাকে বসিতে দিল। পাশেই তাহার স্বামীকেও দেখিলাম। নমিতা আমাকে দেখাইয়া তাহার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল—ওঁর কথা বলছিলে, ওখানে দাঁড়িয়ে ভিজছিলেন? এঁর নাম সন্তোষবাবু, খুব ভালো কবিতা লেখেন, আর রিসাইট করেন।

নমিতার স্বামী বলিলেন—শুনে আনন্দিত হলুম, নমস্কার।

তাহার প্রীতিস্নিগ্ধ কণ্ঠে আমিও প্রীত হইলাম, বলিলাম, আপনি নিশ্চয় আমাকে দেখেন নি আগে, নমিতা দেবীর প্রবেশিকা পরীক্ষার সময় আমি তার গৃহশিক্ষক ছিলাম, কিন্তু আমার যে পরিচয় তিনি দিলেন সেটা নেহাৎ বাগাড়ম্বর।

নমিতার স্বামী বলিলেন—এইমাত্র রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়া হচ্ছিল, তাই আপনাকে দেখে আপনার কাছে যেটা আপনার অপ্রধান গুণ সেটাই নমিতার কাছে প্রধান হয়ে উঠেছে।

এ কথার আমি কোনও জবাব দিলাম না। নমিতা ভিতরে গিয়াছিল, আমি একবার চারিদিক নিরীক্ষণ করিয়া নিলাম। কি দেখিলাম তাহার সবটা বুঝিলাম না বলিয়া নমিতার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলাম—এগুলি কি?

ঘরের কোণে এক গাদা সাদা কাপড়ের মত পদার্থ স্তূপীকৃত হইয়া আছে। তিনি উত্তরে বলিলেন—কালীঘাটের গেঞ্জির নাম শুনেছেন বোধহয়, এও কালীঘাটের একটি গেঞ্জির কারখানা। আপনার ছাত্রীটি তার পরিচালিকা এবং আমাকে—এর ম্যানেজার থেকে বাজার সরকার, দালাল, মুটে—যাই বলুন সবই খাটবে। এই দেখুন না এইমাত্র বড়বাজারে যাব বলে বের হচ্ছি, আর বর্ষাটা চেপে এসে গেল।

নমিতা চায়ের বন্দোবস্তে গিয়াছে ভাবিলাম—ফিরিয়া আসিল রেকাবিতে মিষ্টি নিয়া, জলের গ্লাসটাও সে নিজেই আনিয়াছে; টেবিলে রেকাবিটা নামাইয়া বলিল—আপনি চা খান নাকি? আমাদের আবার ওসব বালাই নেই। বলেন তো না হয় রাস্তা থেকে আনিয়ে দিই।

চা খাওয়া আমার অভ্যাস নাই। তবে কিনা নানা জনের দুয়ারে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়, একজন আগাইয়া দিলেই তো ঠেলিয়া রাখা যায় না, মনে ভাবিবে কি?

নমিতা হাসিমুখে বলিল—আপনি আমাদের এখানে আর কখনও আসেন নি; আমাদের এ সামান্য আতিথ্য গ্রহণে কুণ্ঠিত হবেন না।

বলিলাম, কুণ্ঠা কিসের। আমি কি জানতাম যে বাসাটা এখানে? তাহাকে আপনি বলিব, কি তুমি বলিব ভাবিয়া পাইলাম না।

মিষ্টি ক'টি গলাধঃকরণ করিয়া গ্লাসের জলটুকু তৃপ্তির সহিত পান করিলাম। সকালে উঠিয়াই ছুটিয়াছি, পাছে 'রায় সাহেব' বাহির হইয়া যান, তবে আর আজও সার্টিফিকেটটা পাওয়া যাইবে না। সার্টিফিকেট মিলিয়াছে, কিন্তু সকাল অবধি একটু কুটা দাঁতে না কাটায় উদরের অন্ত্র গুলির মধ্যে দাহের সৃষ্টি হইয়াছিল। নমিতার দেওয়া মিষ্টি ও জল সেই দাহ নিবাইয়া দিল।

তুমি ও আপনির দ্বন্দ্বে নমিতাকে ছাড়িয়া তাহার স্বামীকেই জিজ্ঞাসা করিলাম, কত দিন এ কারখানা করেছেন?—

বছর দুই হ'ল, কেমন নমিতা? ধরুন এপ্রিল টু মার্চ এক বছর আর—

বাধা দিয়া নমিতা বলিল—খুব তো হিসেবী লোক, এই তো সতের মাস চলছে।

আমিও তো তাই বলছি, এপ্রিল টু মার্চ!

তাহার কথায় বাধা দিয়া নমিতা আমাকে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল—দেখবেন?

একটি সুইচ বোর্ডের কাছে যাইয়া সে চার পাঁচটি সুইচ জ্বালিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে পাশাপাশি চারটি ঘর ও বারান্দা আলোকিত হইয়া উঠিল। আমি ও নমিতার স্বামী ঘুরিয়া ঘুরিয়া এটা সেটা দেখিলাম, নমিতা পরম আনন্দের সঙ্গে সকল জিনিষ দেখাইল। তারপর বলিল, ওঁর বরাবর ইচ্ছে ছিল এম-এ দিয়ে প্রফেসর হবেন। কিন্তু প্রফেসর হয়ে কি হ'ত বলুন তো? বড় জোর নিজে একটু সুখে সম্মানে থাকতেন, কিন্তু ভালোবেসে ছেলেদের যে শিক্ষা দিতেন তাতে তারা অকেজো হয়ে বেকারের সংখ্যাই বাড়তো না কি? এখানে তবু ওঁর দু'টি প্রিয় ছাত্র অন্ন-সংস্থান করতে পারছে। সেটা কি আনন্দের কথা নয়?

আমি বলিলাম—জ্ঞান চর্চা এক পৃথক জগতের কথা।

নমিতা বিনীতভাবেই বলিল—কিন্তু শুধু জ্ঞানের আলোচনায় একটা জাতির কিছুতেই চলে না, তার সমাজ বাঁচিয়ে রাখতে হলে বিবিধ রকম কাজ করা চাই, কাজ করলেই উপার্জন হয়, যাতে উদরের অন্ন, পরণের বস্ত্রের ব্যবস্থা হয়।

দেখিলাম নমিতা কথা কহিতে শিখিয়াছে। মনে শান্তি পাইলে মানুষ পৃথক জীবে পরিবর্তিত হইয়া যায়। মনে হইল—যে অবস্থায় তাহাকে আমি পূর্বে দেখিয়াছি সে যেন তাহার মৌন তপস্যার যুগ। এই বুদ্ধি-প্রতিভায় দেদীপ্যমান বাক্‌পটু মহিয়সী মূর্তি সেই তপস্বিনীর অন্তরালে যে প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে তাহা বুঝিতে পারি নাই, আজ না দেখিলে বুঝিতাম না।

ঘুরিয়া ঘুরিয়া সারা কারখানা সে দেখাইয়া দিল। নীচে মাল প্রস্তুত হয়, উপরে অফিস, তাহাদের থাকিবার ঘর, ছাদে রান্নাঘর। সংসারটা তাহাদের পক্ষে যেন কত সহজ হইয়া উঠিয়াছে।

নমিতার স্বামীকে আমার ভালো লাগিল। সুরসিক ও মার্জিতরুচি ভদ্রলোক। ইহাকেই পাইবার জন্য নমিতার কঠোর তপস্যা করিতে হইয়াছে। তাহার এই সংসার ও স্বামীর এই কর্মধারা নমিতা নিজে গড়িয়া তুলিয়াছে। ইহার মধ্যে কোথাও আড়ম্বর চোখে পড়িল না, অথচ সমস্ত পরিমণ্ডলটিতে একটি সূক্ষ্ম স্বাতন্ত্র্য সহজেই ফুটিয়া উঠিয়াছে যাহা সচরাচর কারখানা গৃহস্থালীতে মিলে না।

বাহিরে বর্ষা অনেকক্ষণ ধরিয়া গিয়াছে। আমি উঠিবার কথা বলিলে নমিতার স্বামী একটি গেঞ্জি আমায় উপহার দিলেন। গেঞ্জিটি নিয়া আসিয়াছি—আসল কালীঘাটের গেঞ্জি।

ধূপ ছায়া

(নাটিকা)

শ্রীশৈলেশনাথ বিশী

তৃতীয় দৃশ্য

কক্ষান্তর

এই কক্ষটা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। তাহার সাজসজ্জাও তদনুরূপ। শ্বেত পাথরের সারি সারি স্তম্ভ। স্তম্ভের উপর চতুষ্কোণ ছাদ। ছাদ নানাবিধ ফুল পাতায় চিত্রিত। কক্ষের দেওয়াল মহাভারত ও রামায়ণ চরিত্রে চিত্রিত। ছাদ হইতে অসংখ্য প্রদীপ সোনার শিকলে ঝুলিতেছে, মাঝে মাঝে স্বর্ণ দণ্ডের উপর বর্ত্তিকায় সুগন্ধি ধূপ জ্বলিতেছে—তাহার সুগন্ধে কক্ষ আমোদিত। মর্ম্মর স্তম্ভের গায়ে পুষ্পমালা জড়ান। ছাদ হইতে অসংখ্য পুষ্পমালা পুষ্পস্তবক মুখে করিয়া ঝুলিতেছে। চারিদিকে আলো, রং ও গন্ধের সমাবেশ।

কক্ষের মধ্যে ১৫।২০জন লোক আছে। কক্ষটী এত বৃহৎ যে প্রথম প্রবেশ করিয়াই লোক আছে কিনা বুঝা যায় না। যাঁহারা আছেন তাঁহারা নিঃশব্দে বসিয়া আছেন। ৮।১০জন সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী যুবতী ময়ূরপঙ্খ নির্ম্মিত দীর্ঘ ব্যজনীতে (লম্বা পাখা) ব্যজনরতা ও উহার মধ্যে কয়েকজন স্ফটিকের পানপাত্র লইয়া নিঃশব্দে সুরা পরিবেশন করিতেছে। কক্ষের মধ্যস্থলে স্বয়ং মহারাজ বিক্রমাদিত্য বররুচির সহিত অক্ষ ক্রীড়ায় রত। বহুমূল্য আস্তরণ-শোভিত তাকিয়ায় উভয়ে আরাম করিয়া বসিয়াছেন—পার্শ্বে ঐরূপ উপাধান সজ্জিত, সম্মুখে পিক্‌দানী, পার্শ্বে ব্যজনরতা পরিচারিকা—তাম্বূলকরঙ্ক হস্তে কিঙ্করী ও সুরাপাত্র হস্তে পরিচারিকা।

মহারাজ স্ফটিক পাত্র হইতে নিঃশব্দে একপাত্র সুরা পান করিলেন—তাম্বুল-করঙ্ক-বাহিকা সম্মুখে পান ধরিল—মহারাজ একটী পান মুখে পুরিলেন। অন্য একটী পরিচারিকা সম্মুখে পিকদানী ধরিল—মহারাজ পানের পিক্ ফেলিয়া মুখ তুলিয়া বলিলেন—"কেও—কালিদাস! এসো বসো। বররুচি আজ আমার বলয় জিতিয়া লইয়া এইবার অঙ্গদ বাজী"—বররুচি মৃদু হাস্য করিলেন। এই বলিয়া মহারাজ "কচেবার" বলিয়া পাশার ছড়ি ফেলিলেন। পাশার ছড়ি গজদন্তে নির্ম্মিত। তাহার মধ্যে নীলকান্ত ও রক্তবর্ণের পান্নার চক্ষু খচিত। উজ্জ্বল আলোতে পাশার ছড়ি ঝলমল করিয়া উঠিল। মহারাজের পরিধানে বারাণসীর বহুমূল্য স্বর্ণখচিত শ্বেত বর্ণের চেলী, গায়ে ঐরূপ লাল বর্ণের উত্তরীয়। মাথায় মুকুট (বাংলার বিবাহের টোপর আকৃতি), গলায় ফুলের মালা! অক্ষক্রীড়া চলিতে লাগিল।

কবি কিছুক্ষণ রাজার অক্ষক্রীড়া দেখিলেন। পরে নিঃশব্দে উঠিয়া বাঞ্ছিতার সন্ধানে চলিলেন। ঘরের অন্য পার্শ্বে গিয়া দেখিলেন—যেন নীল সরোবরে এক রাজহংসী সাঁতার দিতেছে। বহুমূল্য নীল রংয়ের চীনাংশুকের উপর রৌপ্যের সুতায় শ্বেত পদ্ম আঁকা—নাতি উচ্চ আসন, তাহার উপর তুষার-শুভ্র চীনাংশুকের বসনে সজ্জিতা—অলঙ্কার-বাহুল্য-বর্জ্জিতা পুষ্পমাল্যশোভিতা অসামান্যা সুন্দরী তন্বী এক রমণী বাম-করতলে কপোল রাখিয়া তাঁহার পায়ের নীচে উপবিষ্ট একজন পুরুষের কথা শুনিতেছেন। পুরুষের কথার কর্কশ স্বর কবির কানে আসিল। কবি উভয়ের সম্মুখীন হইলেন। কবিকে দেখিয়া তন্বী যুক্তকরে নমস্কার করিয়া কহিলেন—"আসুন কবি—স্বাগত! এত বিলম্ব করলেন কেন? আসুন—আসন পরিগ্রহ করুন!" কবি সুলেখার পার্শ্বে নীচে উপবেশন করিলেন। রমণী স্বহস্তে স্ফটিক পাত্রে তাঁহাকে সুরা দিল। কবি পানান্তে পাত্র পরিচারিকার হস্তে ফিরাইয়া দিলেন। রমণী নিজ তাম্বূলকরঙ্ক হইতে কবিকে নিজ হাতে পান দিলেন। কবি তাম্বূল গ্রহণ করিলেন।

কবি দেখিলেন রমণীর সামনে এক পুরুষ উপবিষ্ট। পুরুষের মুখ শূকরের মত। গাত্রচর্ম্ম কর্কশ লোমে আবৃত। মস্তকের কেশ খাড়া হইয়া আছে। সূচীবৎ হস্তে বিদ্ধ হয়।

ইনি বরাহ বা মিহির ভট্ট। ৬ষ্ঠ শতকের প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ।

কবি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"আরে বরাহ যে, না না মিহির ভট্ট, কেমন আছ? জ্যোতিষের দুর্ব্বোধ্য আলোচনা এইখানে চালাচ্ছ? না, তুমি কি কথিত জ্যোতিষের আলোচনা আরম্ভ করেছ? সুলেখার হাত দেখছ? তা হলে আমার হাতখানিও একবার দেখ।" বলিয়া নিজ হাত বাড়াইয়া দিলেন। বরাহ ওরফে মিহির ভট্ট কবিকে উপেক্ষা করিয়া বলিতে লাগিলেন "একি সোজা কথা! এই যাবনিক বলাৎকার! একবার ভেবে দেখ অশ্বিন্যাদি বিন্দু তিন অংশ সরে গিয়েছে। আমাদের অপৌরুষেয় শাস্ত্রের উপর সোজা জুলুম চলছে। যদি এ চলে তবে আমাদের শাস্ত্র মিথ্যা হবে। লোকে যবনের দাস হবে। গ্রহতারা মণ্ডিত ব্যোম নিরন্তর ঘূর্ণমান হয়েও অচল পৃথিবীর কোন গতি নেই। তা অচল। আকাশচক্র রথচক্র নয়।" কবি হাসিয়া বলিলেন "তা ঠিক নয় বরাহ। আকাশচক্র সত্যই রথচক্র। মহাকালের ঘর্ঘরহীন রথচক্র।"

বরাহ হুঙ্কার দিয়া বলিলেন "এ অর্ব্বাচীনের কথা। তুমি জ্যোতিষ কী জান? তুমি 'ঋতু সংহার' লিখেছ—সুরতাল করে আর একখানি বধ সংহার লেখ। তোমাদের কাব্য শাস্ত্রের স্থান এর মধ্যে নেই। এর তোমরা কী বুঝবে?

কবি বলিলেন—"কেন বুঝিব না? সপ্তবিংশতি নক্ষত্র, দ্বাদশ রাশি, নবগ্রহ লইয়াই তো তোমাদের শাস্ত্র।"

বরাহ কবিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া বলিতে লাগিলেন "যাবনিক মত চললে শাস্ত্র লোপ পাবে ক্রিয়া-কলাপ যাগযজ্ঞ বন্ধ হবে, এই যাবনিক মত নিয়ে আর্য্য ভট্ট (১) এক সিদ্ধান্ত পর্য্যন্ত লিখছে। এই সমস্ত গর্ভ-দাসেরা জানে না—কি কুকার্য্য তারা করেছে।"

কবি অন্যদিকে চাহিয়া দেখিলেন—তাঁহাকে হস্ত সঙ্কেতে গৃহের অন্য কোণ হইতে কে একজন ডাকিতেছে—কবি উঠিয়া সেইদিকে গেলেন।

গৃহের অন্য পার্শ্বে বিস্তীর্ণ গালিচায় বসিয়া জনৈক অশীতিপর বৃদ্ধ। বৃদ্ধের দুই পার্শ্বে দুইজন পরিচারিকা। একজন ব্যজন করিতেছে। অন্যজন সুরা পরিবেশন করিতেছে।

বৃদ্ধের সাজগোজ নব্য যুবার ন্যায়। সাদা চুল দেখা যাইবে বলিয়া এমন করিয়া উষ্ণীষ বাঁধিয়াছেন যে শুভ্র চুলের গুচ্ছ দেখা যাইতেছে না। চক্ষুতে কজ্জল—মুখ দন্তহীন—কিন্তু রঙ্গিন বস্ত্র পরিধান করিয়াছেন এবং লোল চর্ম্ম দেখা যাইবে বলিয়া দীর্ঘ পুরাহাত আংরাখা ব্যবহার করিয়াছেন। তাহার হস্তে বলয়—বাহুতে কেয়ূর, কর্ণে কুণ্ডল, গলায় মালা। বার্দ্ধক্যের সমস্ত চিহ্ন তিনি দেহ হইতে মুছিয়া ফেলিতে চাহেন।

কবিকে দেখিয়া তিনি উঠিতে চেষ্টা করিলেন—অতিরিক্ত আসব পানে তিনি উঠিতে চেষ্টা করিয়াও পারিলেন না। উপাধানে বসিয়া

(১) সমসাময়িক বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ। ইনি সূর্য্য-সিদ্ধান্তের রচয়িতা। ইনিই সর্ব্বপ্রথম ভারতবর্ষে সূর্য্য ও পৃথিবীর আহ্নিক বার্ষিক গতি স্বীকার করেন।

পড়িলেন ও পরিচারিকার হাত হইতে সুরা লইয়া তাহা পান করিলেন। কবিকে দেখিয়া হাঁউ মাঁউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

কবি নীরবে হাস্য গোপন করিয়া কহিলেন—"বটু! তোমার দুঃখ কিসের?"

অমরসিংহ (২) কহিলেন "এসো সখা কালিদাস—আমি তোমার জন্যই অপেক্ষা করছি। আমি আজ সকলের প্রথমে এসেছি যে সুলেখার সঙ্গে আজ বোঝাপড়া করব। আমি তাকে বহু মদন উপহার দিয়েছি। আমি তার প্রেমে পাগল। সে কিনা আমাকে 'তাত' বলে!"—

কবি। তোমার প্রেম নিবেদন উপযুক্ত পাত্রে হয়নি। বটু, সুলেখা বর্ষীয়সী, তুমি বালক মাত্র।

পরিচারিকাদ্বয় মুখ ফিরাইয়া হাসিতে লাগিল। অমরসিংহ—(সোৎসাহে) কালিদাস, তুমি আমার প্রাণাধিক বয়স্য। তুমি আমাকে বাঁচাও। আমি একবার আত্মদান করেছি—আর তো ফিরিয়ে নিতে পারি না।

কবি। সে ঠিক কথা। আমাকে কী করতে হবে।

অমরসিংহ। আর কিছু না, তুমি কেবল বরাহটাকে সুলেখার কাছ হতে দূর করে দাও। বরাহ একটা বৃষ।

কবি কহিলেন—বরাহ আবার বটু হইল কবে?

অমরসিংহ বলিলেন—সে একটা আস্ত বলীবর্দ্দ।

কবি কহিলেন—তোমার অভিধান আওড়াতে গেলে দেরী হবে। বাকীটা আমি শেষ করে দিই।—বলিয়া বৃদ্ধের পৃষ্ঠে হাত দিয়া বলিলেন—"উক্ষ্য ভদ্রো বলিবর্দ্দ ঋষভঃ, বৃষভোঃ বৃষঃ" কেমন এই তো?

বৃদ্ধ (পরম উৎসাহে)—কালিদাস, তুমি আমার প্রাণাধিক বয়স্য।

কালিদাস। আচ্ছা, আমি বরাহটাকে সুলেখার নিকট হতে তাড়িয়ে দিচ্ছি। আর কিছু করতে হবে না তো?

অমর সিংহ। আর কিছু না—আমি আজ সকলের আগে এসেছি। বরাহ সেই সময় হতেই সুলেখাকে জুড়ে বসে আছে।

কালিদাস। আচ্ছা আমি যা বলব, তুমি তাতেই রাজী তো?

অমরসিংহ। বরাহ যাতে গররাজী আমি তাতেই রাজী, সেজন্য আমি বাজী ধরতে প্রস্তুত।

কালিদাস। বাজী ধরতে হবে না। এই যথেষ্ট হবে।

কবি পুনরায় বরাহ ও সুলেখার নিকটে গেলেন। গিয়া বরাহকে বলিলেন—মিহির গুপ্ত, এদিকে কত বিপদ। আমি অমরসিংহের কাছ হতে আসছি। অমরসিংহ আর্য্যভট্টের সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে শীঘ্রই তার অমরকোষে "আহ্নিকগতি" বলে একটি শব্দ যোজনা করবে। আপামর সাধারণ এই আহ্নিকগতির কথা জানবে। বরাহ রুদ্ধ হুঙ্কার ছাড়িয়া বলিলেন—"অমরসিংহ একটা সৌণ্ড নখদন্তহীন বৃদ্ধ ভল্লুক!" এবং স্থির থাকিতে না পারিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন এবং অমরসিংহের উদ্দেশ্যে গালি দিতে দিতে স্থান ত্যাগ করিলেন।

সুলেখা। কবি, যদি অসহায়া নারীকে সবলের হাত হতে রক্ষা করলে কিছু পুণ্য থাকে, তবে আজ তা তোমার প্রাপ্য।—বলিয়া হাস্য করিলেন। কবি মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

সুলেখা—কবি, আজ তোমাকে চিন্তান্বিত দেখছি কেন? খবর সব ভাল তো?

কবি। সুলেখা, আমি আজ কদিন হতেই খুব চিন্তিত। কোন মীমাংসা করতে পারছি না। সেই জন্যই তোমার কাছে আসা।

সুলেখা। কবিকে হাত ধরিয়া নিজের পার্শ্বে বসাইয়া—বল কবি, তোমার চিন্তার কারণ কি?

কবি। সুলেখা, আমার "কুমারসম্ভব" কাব্য শেষ হয়েছে। অনেক কষ্টের পর গৌরী নিজ মনোমত পতিলাভ করেছেন—মানে পুনর্জ্জীবিত হয়েছে, কিন্তু তবুও আমার মন মানছে না। মনে হয়, আরো কিছু বলবার আছে।

সুলেখা। কাব্যে নায়ক নায়িকার মিলনের পর কবির আর কি বক্তব্য থাকতে পারে? সেটা কি অলঙ্কারশাস্ত্র-সম্মত হবে? তাছাড়া সেটাতে রসভঙ্গ হবে না কি!

কবি। আমি নিজে কিছু মীমাংসা করতে পারছি না, বুঝতে পারছি, নায়ক নায়িকার মিলনের পর কবির আর কিছু করবার থাকে না, তবুও মন প্রবোধ মানছে না। কী একটা অসম্পূর্ণ ত্রুটী-বিচ্যুতি থেকে গেল মনে হচ্ছে।

সুলেখা—বুঝেছি কবি, তুমি দেব-দম্পতির ঘর কন্নার ছবি আঁকতে চাও?

কবি—তোমার মত রসবোদ্ধা চতুষষ্টী কলায় পারদর্শী বিদুষী সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে নাই। তুমি ছাড়া একথা আর কে বুঝবে?

সুলেখা। (জোড় হস্তে) কবি, তুমি আমাকে বহু মান দাও। আমি সামান্যা নারী, আর তোমার যশগানে সপ্তসিন্ধু আজ মুখরিত। তুমি কী যে বল তার ঠিক নাই। হাঁ ভাল কথা, ভট্টিনী কেমন আছেন?

কবি। তিনি গৃহেই আছেন এবং ভালই আছেন।

সুলেখা। হায় কবি! আমার কাছে কিছু গোপন করনা। একমাত্র ভট্টিনীই তোমায় চিনলেন না। নিজের গৃহে যে সুখ পাও নাই, আজ কল্পনায় ভরে দিয়ে তুমি দেব দম্পতির সেই গৃহ-সুখের কথা তোমার অমর কাব্যে দিতে চাও—এই তো?

কবি। তুমি ঠিক ধরেছ সুলেখা।

সুলেখা। কাব্য ও অলঙ্কারশাস্ত্র রসাতলে যাক।

কবি। হৃদয় দিয়ে যা অনুভব করবে—তাই কাব্য হবে। তোমার হৃদয় যা চাইছে—তুমি অবশ্যই তা করতে পার।

কবি। তোমার কথা শুনেও মীমাংসায় আসতে পারছি না—মনে হচ্ছে কাব্য আর বাড়ালে—নিছক ব্যক্তিগত জীবনের ছাপ পড়বে।

সুলেখা। কবি আজ গৃহে গিয়ে রাত্রেই এ প্রশ্নের জবাব পাবে। নিজেই তার সমাধান করতে পারবে।

দুইজনে বাক্যালাপে এমন তন্ময় হয়েছিল যে রাত্রি কত তা বুঝতে পারেন নি, এমন সময় যামঘোষ দীর্ঘ বেণু বাদন করে রজনীর তৃতীয় যাম ঘোষণা করল।

উভয়ে ত্রাস্তে উঠিলেন ও দেখিলেন—উৎসবের দীপালোক ম্লান হইয়া গিয়াছে।

কবি। সুলেখা! তবে এখন গৃহে গমন করি।

সুলেখা। এসো কবি—তুমি জয়যুক্ত হও—আমিও দেখি মহারাজ কি করছেন। উভয়ে বিপরীত দিকে প্রস্থান করিলেন

চতুর্থ দৃশ্য

উজ্জয়িনীর রাজপথ। বনদেবীর হস্তে দীপবর্ত্তিকা অর্দ্ধদগ্ধ হইয়া জ্বলিতেছে। পথ জনহীন। কেবল ২।১টী প্রতিহার ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। পথিপার্শ্বে শায়িত কুকুর প্রতিহারের পদশব্দে জাগরিত হইয়া ২।১ বার ডাকিতেছে। তৃতীয় প্রহর রাত্রি।

কবি এইপথে গৃহে চলিয়াছেন। পথের দুইদিকের গৃহের বাতায়ন রুদ্ধ। পথ নিঝুম নিস্তব্ধ।

কবি কিছুদুর গিয়া একটী গৃহের সম্মুখে দাঁড়াইলেন এবং গৃহদ্বারে মৃদু করাঘাত করিতে লাগিলেন।

---

(২) অমরকোষের রচয়িতা। এ পর্য্যন্ত সংস্কৃত সাহিত্যে এরূপ সর্ব্বজনপ্রিয় অভিধান কেহ প্রণয়ন করেন নাই, সংস্কৃত সাহিত্যে অমরকোষের স্থান অদ্বিতীয়। ইনি রাজার জ্ঞাতি। উপাধি রাজা।

কিছুক্ষণ পরে একটা যুবতী প্রদীপ হস্তে আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল ও প্রদীপ হস্তে পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল।

যুবতী। আজ এত রাত হোল কেন?

কবি নীরব রহিলেন।

যুবতী। নীরব রহিলে কেন? কোথায় এত রাত্রি পর্য্যন্ত ছিলে? বলতে ভয় পাচ্ছ?

কবি। ভয় কেন পাব? আমি "সামপানকে" গিয়েছিলাম।

কবি গৃহিণী। নিশ্চয়ই সেই কুলটা সুলেখার গৃহে!

কবি। তুমি কী বলছ? সুলেখা বিদূষী চতুঃষষ্টীকলা—

কবি গৃহিণী। (মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া) রাখ তোমার পারংগতা, সে কুলটা, বেশ্যা ও গণিকা। আমি তোমাকে কত বার সেখানে যেতে নিষেধ করেছি? তুমি গণিকালয় হতে আসছ—অদ্য এ গৃহে তোমার স্থান নেই।—বলিয়া সশব্দে কবির সম্মুখে গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন।

কবি কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন—পরে একটু ঘুরিয়া গৃহসংলগ্ন কাঠের সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিলেন এবং পৈতা হইতে চাবি বাহির করিয়া তালা খুলিয়া ঘরে ঢুকিলেন। চকমকি দ্বারা প্রদীপ জ্বালিলেন।

অস্পষ্ট আলোকে চারিদিকে রাশি রাশি তালপত্রে লেখা পুঁথির স্তূপ দেখা যাইতেছে। মেঝেতে ইতস্ততঃ কত পুঁথি পড়িয়া আছে। গৃহের মধ্যস্থলে কাষ্ঠাসনে লিখিবার বেদীপীঠ। গৃহের দেয়ালে হর-গৌরীর নানা ভাবের ছবি আঁকা। কবি পুঁথির স্তূপ হইতে একখানি পুঁথি বাহির করিয়া মস্তকে স্পর্শ করিলেন। সেইখানি কবির নূতন কাব্য "কুমার-সম্ভব"।

কবি নিজ মনেই বলিলেন—"হে দেব, আমি তোমাদের মিলনের কাব্য লিখেছি। সুলেখা ঠিক বলেছে। তোমাদের ঘর কন্নার সুখের ছবি আমার মনে যা উদয় হয়েছিল তা মিলে গেছে। কবির কাজ এইখানেই শেষ। হে দেব আমার অপরাধ নিও না।" বলিয়া পুনরায় পুঁথিখানি মস্তকে ঠেকাইয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিলেন। তখন পূর্ব্বদিকে উষার অরুণ আলোক দেখা দিয়াছে। কবি বস্ত্র লইয়া স্নানার্থে চলিলেন।

পঞ্চম দৃশ্য

উজ্জয়িনীর—রাজসভা

বিস্তীর্ণ হল। লাল পাথরের শতস্তম্ভের উপর বিস্তীর্ণ চতুষ্কোণ ছাদ। মধ্যস্থলে রাজ সিংহাসন। সিংহাসনের সামনে কৃত্রিম জলযন্ত্র। তাহা হইতে উৎসের ন্যায় সুগন্ধি বারি নিক্ষিপ্ত হইতেছে। ফোয়ারা ঘিরিয়া নবরত্নের বসিবার আসন। রাজার দক্ষিণ পার্শ্বে রাজ-অমাত্য, সচিব ও মন্ত্রীদের বসিবার সোপান শ্রেণী। বামপার্শ্বে তদ্রূপ অর্দ্ধ গোলাকারে সজ্জিতসোপানাবলী। বামপার্শ্বে নাগরিকদের বসিবার স্থান। রাজ সভায় অবারিত দ্বার। সকলেরই প্রবেশের অধিকার আছে। রাজার মস্তকে ছত্রধারিণী স্বর্ণখচিত শ্বেত ছত্র ধারণ করিয়া আছে। অন্য একজন যুবতী শ্বেত চামরে রাজাকে ব্যজন করিতেছে। সিংহাসনের পাদপীঠে দু'টী যুবতী বসিয়া আছে। একটীর হস্তে তাম্বুলকরঙ্ক। অন্যটির হস্তে সুরাপাত্র। রাজার সম্মুখে স্বর্ণধূপাধারে কালাগুরুচন্দনে সুগন্ধ ধূপ জ্বলিতেছে। রাজার পিছনে অর্দ্ধ গোলাকারে দাঁড়াইয়া একশত রাজ-দেহরক্ষী। তাহাদের হস্তে বল্লম, কোমরে তরবারি ও পৃষ্ঠে ঢালী। রাজসভা পুরবাসী, সচিব, অমাত্য, মন্ত্রীবর্গ ও রক্ষিগণে পূর্ণ হইয়াছে। মৃদুগুঞ্জন ধ্বনি হইতেছে।

চারণগণ আসিয়া রাজার বন্দনা গান গাহিলেন। রাজা উত্তর ভারত হইতে শকদের তাড়াইয়া দিয়াছেন বলিয়া আর্য্যাবর্ত্তের জনগণ তাঁহাকে 'শকারি' উপাধি দিয়াছেন। প্রধান মন্ত্রী শুভ্রকেশ শুভ্রবসন ও মাথায় উষ্ণীষ, কপালে চন্দন তিলক—জাতিতে ব্রাহ্মণ—সকলেরই গরদের কাপড় পরা। (কেবল সাধারণ নাগরিকগণ কার্পাসবস্ত্র পরিধান করিত)। তিনি নিজ আসন হইতে উঠিয়া রাজসমীপে নিবেদন করিলেন—"মহারাজ শকারি বিক্রমাদিত্য জয় যুক্ত হউন! মহাচীন ও রোমকের যবন সম্রাট দূত প্রেরণ করেছেন—"

রাজা। মন্ত্রী! দূত কী বার্ত্তা নিয়ে এসেছে?

মন্ত্রী। মহাচীনে আর্য্যাবর্ত্তের মহারাজ-এর দূত আছে—যবন সম্রাট রোমক নগরীতে রাজদূত বিনিময় করতে চান।

সন্ধিবিগ্রহিক অগ্রসর হইয়া রাজাকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন—যবন রাজের এ অতি উত্তম প্রস্তাব। মন্ত্রীমহাশয়, দূতের নিকট কোন রাজলিপি আছে?

মন্ত্রী। রাজদূতদ্বয় বহির্দ্বারে অপেক্ষা করছে। রাজাদেশ হলেই সভায় প্রবেশ করবে।

রাজা। দূতকে রাজসভায় আনয়ন করা হউক!

প্রতিহারের সহিত দূতদ্বয় রাজসভায় প্রবেশ করিলেন। রাজাকে অভিবাদন করিয়া রাজহস্তে লিপি দিলেন।

রাজা লিপি মন্ত্রীকে দিলেন—মন্ত্রী পড়িলেন—যবনরাজ রোমক সম্রাট লিখিয়াছেন—"দুই রাজ্যে বাণিজ্য আদান প্রদান বেশ চলিতেছে। গত বৎসর আর্য্যাবর্ত্ত হইতে উজ্জয়িনীর নাবিকগণ প্রায় এক কোটী মুদ্রার বারাণসীর ক্ষৌমবস্ত্র রোমক নগরে বিক্রয় করিয়াছিলেন। তাহাতে রোমকবাসী সাধারণ লোক দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছিল। সম্রাট এবার ঐ দ্রব্যের বাণিজ্য বন্ধ করিয়া দিতে চাহিয়াছেন। তাহার পরিবর্ত্তে গন্ধদ্রব্য ও কার্পাস বস্ত্র চাহিয়াছেন।"

রাজা। এ অতি উত্তম প্রস্তাব। তবে বণিক গোষ্ঠীকে এ কথা জানান দরকার।

মন্ত্রী। বণিক গোষ্ঠীর প্রধান দেবভূতি শ্রেষ্ঠী এইখানেই উপস্থিত আছেন।

দেবভূতি অগ্রসর হইয়া অভিবাদন করিয়া বলিলেন—"মহারাজ, রোমক নগরের জনগণ চীনাংশুক ও বারাণসীর ক্ষৌমবাসের জন্য বাতুলের ন্যায় আগ্রহ প্রকাশ করে। এইবার শ্রেষ্ঠী অগ্নিদত্ত মহাচীন হতে ২ কোটী মুদ্রার উপর চীনাংশুক এনেছেন।"

রাজা। এই চীনাংশুক বাহিলক (পারস্য), গান্ধার (কাবুল) ও কীরাত প্রভৃতি দেশে বিক্রয় করবে।

দেবভূতি। মহারাজ, উক্ত দেশসমূহ রোমক নগরীর মত সমৃদ্ধিশালী নয়। সেখানে কার্পাস বস্ত্র, সৈন্ধব লবণ, শর্করা, মধু ও গন্ধদ্রব্য প্রভৃতি বিক্রয় হয় এবং প্রতি বৎসর উজ্জয়িনীর অন্যান্য শ্রেষ্ঠীগণ প্রায় সহস্র শকট ও স্বার্থবাহে ঐ সব দেশে বাণিজ্য করেন। রোম নগরে জলপথে সুদক্ষ নাবিকের অধীনে শ্রেষ্ঠীগণের পণ্যতরী প্রতি বৎসর বাণিজ্য করে।

রাজা। এ বৎসর রাজাদেশে রোমক নগরে চীনাংশুক বিক্রয় বন্ধ। যে সমস্ত চীনাংশুক বিক্রয় হবে না, তা এই রাজভাণ্ডার হতে কিনে নেওয়া হবে।

দেবভূতি। মহারাজের জয় হোক।

রাজা। দূত আর কী সংবাদ এনেছ?

মন্ত্রী। মহাচীনের সম্রাট লিখেছেন—গত বৎসর কবি কালিদাসের গ্রন্থ, অমর সিংহের অভিধান ও বেতাল ভট্টের গল্পের যে অনুলিপি গিয়েছিল তা চীন ভাষায় অনূদিত হয়ে পঠন পাঠন হচ্ছে। এবার চম্পা (ইন্দোচীন) ও যবদ্বীপ হতে উক্ত কবি ও লেখকগণের গ্রন্থের একশত অনুলিপি চেয়ে পাঠিয়েছে, তার সঙ্গে মিহির ভট্টের গ্রন্থের নামও করেছেন।

রাজা। ঐ সব গ্রন্থের অনুলিপি শীঘ্র পাঠিয়ে দেওয়া হোক।

মন্ত্রী। দুইশত লেখক প্রত্যহ ঐ সব গ্রন্থের অনুলিপি কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন।

এমন সময় অমরসিংহ উঠিয়া প্রস্তাব করিলেন—শুনেছি রোমক নগরে রোমকসিদ্ধান্ত নামে নতুন মত গড়িয়া উঠিয়াছে। তাতে পৃথিবীকে গতিশীল বলেছে। অতএব রোমক সম্রাটের কাছে উক্ত গ্রন্থের একখণ্ড অনুলিপির জন্য লেখা হক। উহা না আসা পর্য্যন্ত আমার অভিধান সম্পূর্ণ হচ্ছে না।

বরাহ ওরফে মিহির গুপ্ত বলিলেন—মহারাজ, এ অর্ব্বাচীনের কথা। যাবনিক শাস্ত্রের সঙ্গে আমাদের শাস্ত্রের কি সম্বন্ধ? যত মতবাদই হক না কেন, আমাদের মতবাদ বদলান যাবেনা।

অমরসিংহ। যুক্তি তর্কে যা সর্ব্ববাদীসম্মত হবে তাই মেনে নিতে হবে।

রাজা। (মিহির ভট্টের প্রতি) এতে আপনার আপত্তি কি? আপনার মতবাদ বদলাবার কথা হচ্ছে না—অন্য দেশ জ্যোতিষশাস্ত্রের আলোচনায় কতদূর অগ্রসর হয়েছে তা আমাদের জানা দরকার।

মিহির ভট্ট। কোন দরকার নেই মহারাজ! আমাদের শাস্ত্র স্বয়ংসিদ্ধ।

অমরসিংহ কালিদাসের পা টিপিয়া নিম্নস্বরে বলিলেন—বলনা বটু! আমার কথাগুলি গুছিয়ে বলো। ব্যাটা বরাহের দম্ভ ভগ্ন করতে হবে।

কালিদাস। (উঠিয়া) মহারাজ, রাজা অমরসিংহ বলতে চান—যদি সত্যই পৃথিবীর আহ্নিকগতি থাকে, তবে তাঁর অভিধানে সে শব্দ যোজনা না করলে তাঁর অভিধান অসম্পূর্ণ থেকে যায়। যাবনিক সিদ্ধান্ত মূল না দেখলে তাদের সিদ্ধান্ত বোঝা যাচ্ছে না।

রাজা। আর্য্যভট্টও নাকি যবন সিদ্ধান্তের অনুসরণ করে পৃথিবীর আহ্নিকগতি সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়েছেন।

মিহির। আর্য্যভট্ট একটী কুলাঙ্গার! শাস্ত্র মানে না।

রাজা। যাই হক, সমস্ত পণ্ডিতের মত জানা দরকার। আপনি সব মত জেনে যদি বিরুদ্ধ মত খণ্ডন করতে পারেন তবেই আপনার মত সকলে মেনে নেবে।

অমরসিংহ। (সোৎসাহে) সাধু প্রস্তাব।

রাজা আজ্ঞা করিলেন—যবন সম্রাটকে যাবনিক সিদ্ধান্ত সহ একজন যবন জ্যোতির্বিদকে উজ্জয়িনীতে পাঠাইবার জন্য অনুরোধ কব্রিতে।

মন্ত্রী। (যুক্ত করে) যে আজ্ঞা!

রাজা। এখন আপনারা স্থির হইয়া উপবেশন করুন। আজ কবি কালিদাসের নতুন মহাকাব্য "কুমার-সম্ভব" পাঠ হবে।

চতুর্দ্দিকে মৃদুগুঞ্জন আরম্ভ হল। কবি পুঁথি খুলে পাঠ আরম্ভ করলেন:

> অস্ত্যুত্তরস্যাংদিশি দেবতাত্মা
> হিমালয়োনামো নগাধিরাজঃ
> পূর্ব্বাপরৌ তোয়নিধিঃ বগাহ্য
> স্থিতঃ পৃথিব্যাং ইব মানদণ্ডঃ॥

কালিদাস প্রথমেই দেবতাত্মা হিমালয়ের বর্ণনা আরম্ভ করিলেন—তুষারমৌলি হিমালয় ধ্যানগম্ভীর, তার কত সৌন্দর্য্য কবি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, ছত্রে ছত্রে—সে কী সৌন্দর্য্যের বর্ণনা, শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনিতেছেন—মর্ত্তলোকে এত সৌন্দর্য্য সম্ভব নহে, যেন দেবলোক মূর্ত্ত হইয়া শ্রোতাদের সামনে আসিয়াছে—কবি বলিতে লাগিলেন—হিমালয় হিমের আধার—তুষার শীতল বটে, কিন্তু একটি দোষে কী হয়? যেমন চন্দ্রের কলঙ্ক তার শোভাই বাড়ায়। সূর্য্যোদয়ের সময় লোহিতরাগ তুষারশৃঙ্গে প্রতিফলিত হইয়া চারিদিকে গৈরিক প্রস্রবণ ছুটাইয়া দেয়—অপ্সরীরা সন্ধ্যা সমাগত মনে করিয়া নিজেদের সাজগোজ করিতে থাকে, এম্নি চিত্তবিভ্রম তাহাদের রোজই হয়। সিংহেরা হাতী মারে; কিন্তু সিংহেরা কোথায় কোন গহন গহ্বরে থাকে তাহা জানা যায় না—তবে সিংহদের নখরে হাতীর মাথার মুক্তা লাগিয়া থাকে—শীকারীরা সেই মুক্তা অনুসরণ করিয়া সিংহের বিবরে গিয়া সিংহ শীকার করে।

সেখানে বিদ্যাধর দম্পতিরা গুহায় রাত্রে বিশ্রাম করে—তাই বলিয়া তাহাদের আলোর অভাব হয় না; হিমালয়ে এক রকম গাছ আছে তাহা হইতে রাত্রে আলো বাহির হয়—তাতেই তাহাদের গুহা আলোকিত হয়। কবি পড়িতে লাগিলেন—হাতীর পাল দেবদারু গাছে তাদের গা ঘষিয়া গাত্রকণ্ডুয়ন নিবারণ করে, দেবদারু গাছ হতে হাতী গা ঘষায় একরকম আঠা বাহির হয়—তাহার গন্ধে হিমালয় সর্ব্বদাই সুরভিত হইয়া থাকে।

কবি হিমালয়ের শোভা বর্ণনার পর বর্ণনা করিতেছেন, শ্রোতারা মর্ত্ত্য ছাড়িয়া যেন কোন দেবলোকে বিচরণ করিতেছেন, কবি হিমালয়ের শোভা শেষ করিয়া হিমালয়রাজের কথা বলিতে লাগিলেন যে—তাহাদের রাজাকে চামরী গাভীর পাল তাহাদের পুচ্ছের চামর দিয়া সর্ব্বদাই বীজন করিতেছে; হিমালয় অফুরন্ত মণিমাণিক্য মুকুতার ভাণ্ডার—এ হেন সর্ব্ব-ঐশ্বর্য্যময় রাজার ঘরে গৌরী জন্ম নিলেন। গত জন্মে সতী দক্ষের যজ্ঞে পতিনিন্দা শুনিয়া প্রাণ ত্যাগ করেন, পুনরায় শিবের সহিত মিলিত হইবার জন্য হিমালয়ের ঘরে হিমালয়-রাজকন্যা হইয়া জন্মিয়াছেন।

যেদিন গৌরীর জন্ম হইল—সেদিন চারিদিকে প্রসন্ন-নির্ম্মল-সুগন্ধ বায়ু বহিতেছে, চারিদিকে শঙ্খধ্বনি হইতেছে, দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করিতেছেন, এমন সময় গৌরী ভূমিষ্ঠ হইলেন। তিনি চন্দ্রকলার মত প্রতিদিন বাড়িতে লাগিলেন—তাঁহার শরীরে রূপ যেন আর' ধরে না—কবি বলিতে লাগিলেন সে রূপের আমি কী বর্ণনা করিব, তাঁহার হাসি বর্ণনা করিবার আমার ক্ষমতা নাই এতই নয়নমনমুগ্ধকর; সেই হাসির যদি কিছু তুলনা হয়—তবে তোমরা নতুন কচি লালপাতার উপর কুন্দ ফুলের কথা মনে করিবে—কিম্বা প্রবালের হারের উপর মুক্তার গাঁথনীর কথা ভাবিবে।

তাঁহার ভ্রূ—কবি বলিতে লাগিলেন—দেখিয়া স্বয়ং মন্মথ তাঁহার ধনুক ভাঙিয়া ফেলিয়াছেন, আর গৌরীর চোখের চাহনী—সে কথা আর কী বলিব? তাঁহার চাহনি দেখিয়া হরিণেরা লজ্জায় মুখ লুকায়—আর গৌরীর অঙ্গে যৌবনের এম্নি বিকাশ হইয়াছে যে—তাঁহার স্তনযুগলের কথা না বলিলেও চলে; তবে নেহাৎই যদি তোমরা শুনতে চাও তবে মনে করিবে সেই স্তনযুগল এত উন্নত ও গাঢ় সন্নিবিষ্ট যে তাহার মধ্যে মৃণাল সূত্রেরও ব্যবধান নাই। কবি বলিতেছেন তাঁহার উরুর কথা আর কি বলিব? কদলী গাছের সহিত কিছু তুলনা হইতে পারে—কিন্তু তাই বা বলি কি করিয়া? কদলী গাছের স্পর্শ হিমশীতল—উহার সহিত তাহার তুলনাই হয় না। গৌরীর পা দুখানি—তার কথা আর কি বলিব? গৌরী যখন হাঁটিয়া যান, মনে হয় তাঁহার চলবার পথে স্থলপদ্ম ফুটে উঠছে, আর তাহার মুখের শোভা—তার তুলনাই হয় না—গৌরীর মুখ দেখিয়া স্বয়ং নিশানাথ চন্দ্র মাসের ১৫ দিন অতি ক্ষীণ শোভা ধারণ করেন।

এই উদ্ভিন্ন-যৌবনা গৌরীর বিবাহের বয়স হইয়াছে দেখিয়া গিরিরাজ যোগ্য পাত্রের জন্য অতিশয় চিন্তিত হইলেন।—এমন সময় নারদ ঘুরিতে ঘুরিতে রাজবাড়িতে আসিলেন, গিরিরাজ নারদকে গৌরীর জন্য উপযুক্ত পাত্র দেখিতে অনুরোধ করিলেন। নারদ ত্রিভুবন খুঁজিয়া গৌরীর উপযুক্ত পাত্র পাইলেন না—শেষে রাজাকে বলিলেন—মহেশই গৌরীর একমাত্র যোগ্য পাত্র, তবে তিনি তাঁহার প্রিয়া সতীর বিয়োগে ধ্যানমগ্ন—গৌরীর এই ধ্যান ভঙ্গ করিয়া শিবকে পতি লাভ করিতে হইবে।

মহেশ্বর হিমালয়ের অত্যুচ্চ গৌরীশৃঙ্গে ধ্যানমগ্ন—তুষারশুভ্র হিমের কোলে জ্বলন্ত রজত গিরি বলিয়া মনে হইতেছে—শুভ্রতায় চোখ ঝলসিয়া যায়। নন্দী কিছুদূরে সোনার বেত্রদণ্ড হাতে লইয়া চারিদিক শাসন

করিতেছেন—জনপ্রাণী সব চুপ কর—মহেশ্বর ধ্যানমগ্ন—তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হয় এমন কাজ করিও না।

এই ভাবে কত দিন বর্ষে পরিণত হইল—মহাদেবের আর ধ্যানভঙ্গ হয় না। গৌরী প্রত্যহ নিয়মিত শুচিস্নাতা হইয়া—সখীগণকে লইয়া মহেশ্বরের পূজা করিয়া যান। মহাদেব কোন দিন চাহিয়াও দেখেন না। দিন এইভাবে যায়—হঠাৎ একদিন চারিদিকে সাড়া পড়িয়া গেল—কোকিল মুহুর্মুহু ডাকিতে লাগিল, উতলা বাতাস গৌরীর সত্তস্নাত কেশগুচ্ছ লইয়া খেলা করিতে লাগিল—চারিদিকে ফুল ফুটিল, বর্ণে গন্ধে চারিদিক আমোদিত হইল—হরিণ নিজ শৃঙ্গ দ্বারা হরিণীর দেহ কুণ্ডয়ন করিতে লাগিল, সময় বুঝিয়া মন্মথ তাঁহার বাজ নিক্ষেপ করিলেন—ধ্যানমগ্ন মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গ হইল। তাঁহার কোপদৃষ্টিতে মদন ভস্ম হইয়া গেল। তিনি বিরক্তিভরে গৌরীর দিকে চাহিয়া সে স্থান ত্যাগ করিলেন। গৌরী মহাদেবের এই প্রত্যাখ্যানে মরমে মরিয়া গেলেন। বাড়ী গিয়া তাঁহার সব আভরণ সজ্জা খুলিয়া ফেলিলেন, নিজ দেহ গৈরিক বস্ত্রে আবৃত করিলেন ও মহাদেবকে পাইবার জন্ম উৎকট তপস্যা করিতে লাগিলেন।—গৌরীর সে রূপলাবণ্য কোথায় গেল? কবি পড়িতে লাগিলেন—তিনি কৃশ-পাংশু হইয়াছেন, তাঁহার মস্তকে জটাভার—ক্ষীণতন্বী দেহ যেন জ্বলন্ত হোমশিখার মত দেখায়। গৌরীর দুঃখে সমবেদনায় শ্রোতাদের দুই চোখে ধারা বহিতে লাগিল—নিষ্পন্দ হইয়া তাঁহারা শুনিতে লাগিলেন। কবি পড়িয়া চলিয়াছেন—গৌরীর কুটীরে একদিন এক ব্রহ্মচারী অতিথি হইলেন। গৌরী তাঁহাকে সমাদর করিলেন, কিন্তু অতিথি শিবনিন্দা করিতে লাগিলেন। নবীন অতিথি বলিলেন—সেই হৃদয়হীন নিষ্ঠুর শিবের জন্য তুমি তপস্যা করিতেছ—সে কি তোমার মত সুন্দরীর মর্য্যাদা বুঝিবে?—গৌরী তাঁহাকে স্থান ত্যাগ করিতে বলিলেন ও পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, এমন সময় নবীন অতিথি গৌরীর হাত ধরিয়া বলিলেন, গৌরী চাহিয়া দেখ আমি কে?—গৌরী মুখ ফিরিয়া চাহিতেই—

রাজা ও সভাসদগণ নিষ্পন্দ হইয়া শুনিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিক হইতে রাশি রাশি স্বর্ণালঙ্কার, হীরা, মুক্তা ও পুষ্পমালা কবির উপর বর্ষিত হইতে লাগিল।

পাঠ শেষের কিছু পূর্ব্বে সুলেখা আভরণ ও পুষ্পমালা হাতে লইয়া "কবি! কবি!" বলিয়া অর্দ্ধপথে অগ্রসর হইয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেলেন। মূর্চ্ছিতা সুলেখাকে পরিচারিকাগণ উঠাইয়া লইয়া গেল। অমরসিংহ তাহার সমস্ত অলঙ্কার ও পুষ্পমালা কবিকে দিয়াও তৃপ্ত হইলেন না। শেষে নিজের উত্তরীয় দিয়া কবির মাথায় উষ্ণীষ বাঁধিয়া দিলেন।

নবীন অতিথিকে গৌরী চিনিলেন না। গৌরীর অবস্থা তখন শোচনীয়, তিনি যাইতেও পারিতেছেন না, আর লজ্জায় থাকিতেও পারিতেছেন না; এমন সময় দুই বলিষ্ঠ বাহুর আলিঙ্গনে তিনি বদ্ধ হইলেন; তাঁহার ক্ষীণ দুর্ব্বল তনুলতা আনন্দের আবেগ সহ্য করিতে পারিল না, তিনি শিব অঙ্গে ঢলিয়া পড়িলেন—হর-গৌরীর মিলন হইল। শ্রোতাগণ মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনিতেছেন—সভায় একটী সূচিপতনের শব্দও শোনা যায়—এমন সময় কালিদাসের পাঠ শেষ হইল। কুমারসম্ভব মহাকাব্য সপ্তম সর্গে কবি শেষ করিয়াছেন। শ্রোতাগণ এই রূঢ় আঘাতে সচেতন হইয়া জানিতে পারিলেন যে তাঁহারা এইবার মর্ত্তলোকে আসিয়াছেন—চারিদিকে ধন্য ধন্য রব উঠিল—স্বয়ং সম্রাট বিক্রমাদিত্য উঠিয়া কবিকে গাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিলেন ও নিজ কণ্ঠের বহুমূল্য রত্নহার কবির গলায় পরাইয়া দিলেন—শ্রোতাগণ নিজ নিজ দেহ হইতে হার মঙ্গল-বালা যাহার যাহা ছিল—কবির চারিদিকে বর্ষণ করিতে লাগিলেন—সুলেখা জনতা ভেদ করিয়া নিজের সমস্ত অলঙ্কার ও পুষ্পমালা লইয়া কবিকে দিতে আসিয়া—কবি—কেবল এই কথা বলিয়াই অর্দ্ধপথে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন—চারিদিকে কবির জয়ধ্বনি হইতে লাগিল।

যবনিকা

মায়া

শ্রীমতী নমিতা দত্ত

প্রভাতের ধূসর আলো ধরার বুকে ছড়িয়ে পড়েছে। শীতের আমেজ তখনও কাটেনি!

টুকটুকে লাল লেপের তলা থেকে ছোট্ট হাত দুখানি বাড়িয়ে দিয়ে গোলাপের মত আরক্তিম মুখখানি হাসিতে উদ্ভাসিত করে' প্রতিদিনের মতন সদ্য ঘুম ভাঙ্গা চোখে বাবলী ডাকলে—"মা! মা মণি! মা!"

মা তার পাশে নেই! সে তা' জানে না। বাবা তার নিদ্রালস কণ্ঠে ব্যাকুলভাবে তাকে দু'হাতের মধ্যে জড়িয়ে ধরে কাছে টেনে নিয়ে বল্লেন—"ভোর হবার আগেই বুঝি দুষ্টুমী সুরু হ'ল? এখনও সকাল হয়নি! ঘুমো!"

আব্দারের ভঙ্গীতে বাবলী বল্ল—"মা কোথায় বাবা?"

"পাশের ঘরে ঘুমুচ্ছেন! তুমিও ঘুমোও!" বলে প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাবার জন্যই বোধকরি আবার পাশ ফিরে শুলেন। বাবলীর কাছে এ যেন এক নতুন অভিজ্ঞতা। মা হঠাৎ এ ঘর ছেড়ে ও ঘরেই বা ঘুমুতে গেলেন কেন? অনেক ভেবেও সে কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারল না। প্রতিদিনের মত কাল সন্ধ্যা বেলাতেও সে তার মায়ের হাত ধরে এই ঘরে এসেছে। ঠাকুর দুধ দিয়ে গিয়েছিল, মা নিজ হাতে সেই দুধও খাইয়ে দিয়েছেন! পাশে শুয়ে গুন্ গুন্ করে গান গেয়ে ছড়া বলে বাবলীকে ঘুম পাড়ালেন। তার অস্পষ্ট রেশটুকু এখনও যেন কানের কাছে বাজছে!

"বাব্লী···বাব্লী···বাবুল"···প্রতিদিনের মত ভোরের বেলায় ঘুমের মাঝে ও যেন তার মায়ের ডাক শুনেই ঘুম থেকে উঠেছে বলে মনে হয়! কিন্তু তা' ত নয়। বাবা তার বল্লেন, মা পাশের ঘরে ঘুমুচ্ছেন! এ যেন এক গভীর সমস্যা। সমাধান করা বাবুলের ক্ষমতার বাইরে! শেষ অবধি অসহায় অবস্থায় পড়ে গভীর বিরক্তি ভরে লেপখানি গায়ের ওপর টেনে নিয়ে বাবার বুকের কাছটীতে সরে গেল। নিজের অজ্ঞাতে বোধ করি সে ঘুমিয়ে পড়ল।···হঠাৎ পিসিমার ডাকে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। মাথার কাছে দাঁড়িয়ে তিনি বাবলীর কোঁকড়ান চুলে ভরা মাথাটী নাড়া দিয়ে ডাকছেন—"বাবলী! এই বাবুল ওঠ!"

বাবা কখন উঠে গেছেন সে টের পায়নি। সোনালী রোদে সারা ঘর ভরে গিয়েছে! নিশ্চয় তিনি এতক্ষণ চা খাওয়া শেষ

করে খবরের কাগজটী নিয়ে বৈঠকখানায় গিয়ে বসেছেন। ছোট্ট দুটী হাতে ঘুমে-ভরা শ্রান্ত চোখ দুটী সে মার্জ্জনা করতে করতে উঠে বসে। ফুলো-ফুলো নরম দুটী গালে আঙুল চেপে পিসিমা বল্লেন—"বোকা মেয়ে! পড়ে পড়ে ঘুম হচ্ছে!···কে এসেছে জানিস?"

বড় বড় চোখ দুটো তার বিস্ময়ে ভরে উঠ্‌ল। বল্ল শুধু—"কে পিসিমা?"

তাকে কোলে তুলে নিয়ে বাইরে যেতে যেতে পিসিমা বল্লেন—"চলনা দেখে আসি! মার খোকা হয়েছে। ভাইটীকে কোলে নিবি ত?"

'ভাই হবে' এ কথাটী সে ঠাকুরমা ও পিসিমার মুখে আগে শুনেছে বটে। এবং তাকে যে কোলে নিয়ে আদরও করতে হবে, তাও সে জেনেছে! কিন্তু ঘুম ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গেই আজ সকালে উঠে নূতন অতিথিটীর আগমন সংবাদ বাবলীর মোটেই পছন্দ হলনা। উপরন্তু এটুকুও তার বুঝতে দেরী হলনা যে মা তাহলে তার ভাইটীকে নিয়েই পাশের ঘরে শুয়েছেন। তাই বাবলী তাকে খুঁজে পায়নি। প্রবল আপত্তির সঙ্গে মাথা নেড়ে সে বল্ল—"যাঃ!"

পিসিমা হেসে বল্লেন—"হ্যাঁরে···চল দেখবি!"

দালানের সবগুলি ঘর পার হয়ে কোন ঘেসে সিঁড়ির গায়ে যে ঘরটী বাবলী এ অবধি তালাবদ্ধ অবস্থায় দেখে আসছে, সেই ঘরটীতে দেখল যে তার মা চৌকীর ওপর শুয়ে আছেন। পাশে কাঁথা জড়ান ছোট—অতি ছোট একটী প্রাণী রয়েছে! বাবলীর সাড়া পেয়ে মা হাসিমুখে পাশ ফিরে শুলেন। কৌতুকে তার চোখের তারা দুটী উজ্জ্বল হয়ে হাসছে। গভীর বিস্ময়ে আগ্রহ-ভরে পিসিমার কোল থেকে জোর করেই প্রায় নেমে পড়ে বাবলী ঘরে ঢুকতে যায়! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মা, পিসিমা একসঙ্গে হাঁ হাঁ করে ওঠেন! পিসিমা তাকে ধরে ফেলে বলেন, "এখন বুঝি মার কাছে যেতে আছে! দেখছ ত ভাইটী পাশে শুয়ে আছে! ও ভারী নোংরা।···তাই মাকে এখন ছুঁতে নেই, বুঝলে?"

বাবলীর ম্রিয়মান মুখের দিকে তাকিয়ে মার মুখখানিও ম্লান হয়ে উঠল। তাই তিনি বলেন—"তুমি পিসিমার সঙ্গে যাও··· দুধ খেয়ে এসো! লক্ষ্মী বাবা আমার।" কিন্তু বাবলীর যাবার কোন লক্ষণই প্রকাশ পায়না। দুটী আঙুল মুখে পুরে দৃঢ়পায়ে মাথা হেঁট করে সে দরজার গোড়ায় গোঁ ভরে দাঁড়িয়ে থাকে।

মায়ের অসহায় মুখের দিকে তাকিয়ে পিসিমা মৃদু হেসে বল্লেন—"লক্ষ্মী ছেলে···চলো। আমি তোমার মুখ ধুইয়ে দুধ খাইয়ে দোব! মার কাছে যায়না···মা দুষ্টু!"···এতক্ষণে বাচ্চাটার ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ায় ছোট হাত দুখানির সরু সরু আঙুলগুলি মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায় ওপর দিকে তুলে পাখীর ছানার মত অস্ফুট চীৎকার করে উঠল। নবাগতের কান্নায় ব্যস্ত হয়ে মা তার দিকে পাশ ফিরে শুয়ে বুকে চেপে ধরলেন। পিসিমা বল্লেন—"ঝিটা বুঝি পড়ে পড়ে ঘুম দিচ্ছে!···ঝি···ও ঝি! ওকে একটু কোলে নাওনা বাছা!"

ঘরের অপর প্রান্তে মেঝেয় কাপড় পেতে ঝি নির্ব্বিবাদে ঘুমাচ্ছে। পিসিমার ডাকে তার ঘুমের কোন ব্যাঘাত হ'ল বলে ত মনে হ'ল না। তাছাড়া, তার উঠবারও প্রয়োজন হ'ল না! কারণ মায়ের হাতের স্পর্শে বাচ্চাটী মুহূর্ত্তের মধ্যে চুপ করে গভীর তৃপ্তিভরে আবার চোখ বুঁজল। পিসিমার সঙ্গে যেতে যেতে বাবলী আবার পেছিয়ে দাঁড়াল। ঐ অতটুকু প্রাণীটির প্রতি মায়ের এই ব্যগ্রতা, এতখানি আগ্রহ তার কণামাত্র ভাল লাগল না। পিসিমা আবার বল্লেন—"এসো! অনেক বেলা হয়ে গেছে। দুধ খাবে চল!"

মা এইবার মৃদু তিরস্কার করে বল্লেন—"যাওনা খুকু! তুমি বড় অসভ্য হয়েছ। দুষ্টুমী করে না··যাও!"

কেমন নির্লিপ্ত উদাসীন ভাব! ঐ বাচ্চাটীকে পেয়ে, পিসিমার কথা ছেড়ে দিয়ে, মাও যেন তার কি রকম হয়েছেন! মা কি তার জানেন না—যে মায়ের দুখানি তার খুব ভাল লাগা হাতে···যেখানে শাঁখার তলায় লাল রেশমী চুড়ীর কোলে সোনার চুড়ীর রিণিঝিণি শব্দে কান পেতে শোনার অভ্যাসে সে দুধ খেতে অভ্যস্ত—আজ তার ব্যতিক্রমে কি করে সে ও মুখে দুধের বাটী তুলে ধরবে! সে যেন এক মহাসমস্যায় পড়ল।··· মায়ের তিরস্কারে বাবলীর চোখ দুটো জলে ভরে এল! ম্লান বিষণ্ণ মুখে সে পিসিমার হাত ধরে চল্ল।

* * * * *

খেতে বসে বাবলীর বাবা তার পাশটীতে বাবলীর জন্য নির্দ্দিষ্ট আসনখানি শূন্য দেখে ডাকছেন—"বাব্‌লী! বাবুল!"··· পশ্চিমের বারান্দার কোণে ধূমট আকাশে দিকে তাকিয়ে বাবলী তখন গভীর চিন্তায় মগ্ন! সঙ্ঘবদ্ধ গোটাকয়েক চিল চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে নেমে এসে ওধারের তাল গাছটার মাথায় বসে বিকট সুরে চীৎকার জুড়ে দিয়েছে। বুড়ো অশ্বত্থ গাছটার পাতার ওপর রোদ পড়ে থেকে থেকে ঝিক্‌মিকিয়ে ওঠে। বাবলীর চির অশান্ত মন এসব ছাড়িয়ে আজ দূর দূরান্তে পক্ষীরাজের গতিতে ছুটে চলেছে। তার মনে হয়···ঐ পাখীগুলোর মত দুটী ডানা মাত্র যদি কোথা থেকে কেউ তাকে এনে দেয়, অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য এদের চোখের অন্তরালে পাড়ি মেরে···প্রথমে মাকে তার ফাঁকি দেবে! বেশী কিছু নয়, শুধু একটু ভয় দেখান···একটু জব্দ করা! মা তার চিরদিনের সেই বাবলীকে ওই পাখীগুলোর মত পাখা মেলে উড়্‌তে দেখে ব্যস্ত হয়ে ডাকবেন—"বাব্‌লী! ওরে বাবুল শোন্···শোন্!"

ও কিন্তু সে ডাকে একটুখানিও ফিরে না চেয়ে সোজা···দূরে···আরও দূরে চলে যাবে। থাকুন ওরা ঐ বাচ্ছাটাকে নিয়ে! বাবলীও অনেক শাস্তি দিতে জানে। শেষকালে মা যখন রাত্রের অন্ধকারে বিছানায় শুয়ে বালিসে মুখ গুঁজে কাঁদতে থাকবেন·· যেমন তাঁকে সেবারে বাবলীর অসুখের সময় কাঁদতে দেখেছিল···তখন না হয় ভেবে চিন্তে আবার সে ফিরে আসতে পারে। থাক্‌না এরা···কাঁদুক্ পড়ে পড়ে! কিন্তু নিজের অনুপস্থিতিতে মায়ের চোখের জল কল্পনা করে বাবলীর শুভ্র নিটোল গাল বেয়ে মুক্তা ধারা নেমে এল।··· তাহলেও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বাবলী প্রবলভাবে মাথা নেড়ে নিজের মনে বারবার বলতে লাগল—'যাবোনা! মার কোলে আর আমি যাবো না···থাকুন তিনি বাচ্ছাটাকে নিয়ে'···

পিসিমা পিছন থেকে এসে গাল দুটী তার টিপে দিয়ে সস্নেহে বল্লেন, "পাগলের মত একা একা এখানে কি বকা হচ্ছে?…বাবা যে তোমায় খেতে ডাকছেন।"…তারপর বাবলীর মুখের দিকে তাকিয়ে ব্যস্তভাবে তাকে কোলে তুলে নিয়ে বলেন—"কাঁদছ কেন মণি?…কে বকেছে তোমায় বল ত? দিই স্বর্পণখা রাক্ষসীর মত কুচ্‌ করে তার নাকটা কেটে!"

পিসিমার কথায় উছল-হাসির ধারা বাবলীর দুই ঠোঁটের কোলে নেমে আসে। সলজ্জভাবে সে পিসিমার কাঁধে মুখ লুকায়!

২

একে একে দিন যায়।…

মা খোকাকে নিয়ে এসে ঘরে ঢোকেন! ঠাকুরমার ত সারাদিনে ও রাতে জপের মালা ও খোকার পরিচর্য্যা করা ছাড়া যেন আর কিছুই কাজ নেই। বাবলীর মার শরীর অত্যন্ত খারাপ। ডাক্তার রোজ এসে তাকে দেখে যান! কোনরূপ পরিশ্রম করা তার একেবারেই বারণ। মায়ের রক্তশূন্য পাংশু মুখের দিকে তাকিয়ে বাবলী ভাবে··'মা যেন কি রকম হয়ে গেছেন…আগের মত হাসতেও যেন তিনি ভুলে গেছেন'। বাবলীর যাবতীয় কাজ পিসিমাই সব করেন! বাবলীর এতটুকু আব্দার বা অত্যাচার আগের মত আর কই মা ত সমর্থন করেন না!। রান্না তাকে করতে হয় না, ঠাকুর করে। কুটনা কুটতে হয় না, ঠাকুমা সারেন! ঘর দুয়ার পরিস্কার করে নি…কাজের মধ্যে শুধু ত বাবলীকে জামা পরাণ ও দুধ খাওয়ান। তাও ত পিসিমা করেন। শুধু পাশে শুয়ে একটুখানি গল্প করা, সেটুকুও কি তার দ্বারা হ'তে পারে না? অবশ্য মা কিছু বলেন না বাবলীকে বা বকেন না!…কিন্তু তার আগেই বাবা কিংবা ঠাকুমা বাবলীকে ধমক দিয়ে সরিয়ে দেন…বলেন—"বিরক্ত কোরো না খুকী! মার শরীর খারাপ…শুধু শুধু বকিও না ওকে!"··

সকলকার বারণ সত্ত্বেও মা বাচ্ছাটাকে নিয়ে মাঝে মাঝে বিছানায় উঠে বসেন। কিন্তু বেশীক্ষণ বসতে না পেরে আবার শুয়ে পড়েন বিছানাতে!…বাবলীর ভারী ইচ্ছা করে মায়ের বুকের একান্ত কাছটীতে গিয়ে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকে…দুটো কথা বলে তাঁকে অন্যমনস্ক করে দিয়ে যন্ত্রণার কিছু লাঘব করে। কিন্তু মার কাছে গেলেই মা বলেন, তুমি থাম—বকিও না বাবুল… যাও খেলা করগে!"

দুপুরের রৌদ্রে ছাদের ওপর পা মেলে বসে ঠাকুমা খোকাকে নিয়ে আদর করেন। সেই ছোট্ট চোখ বোঁজা বাচ্ছাটা…যে কণামাত্র বাইরের আলোয় চোখ মেলে তাকাতে পারত না দুদিন আগেও, এই কটী দিনে সে অনেকখানি দুষ্টু হয়ে উঠেছে। পুট্-পুটিয়ে মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারিদিকে সে তাকাতে থাকে! পিসিমা উচ্ছ্বসিতভাবে বলেন—"ওমা…কি দুষ্টু গো! আবার হাসছে দেখ! এই…এই…" বলে জিভে টাক্ টাক্ শব্দ করে বাচ্ছাটার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করেন। ঠাকুরমা হাসেন এবং তার সেই নড়বড়ে তুলতুলে শরীর নাচিয়ে নাচিয়ে আদর করে বলেন—"চাঁদ আমার ধন! শুক্তি সেঁচা মুক্ত রে!"·· দূরে পাঁচিলের আড়ালে দাঁড়িয়ে বাবলী অভিমানে ফুলতে থাকে। আজ যেন ওঁরা তার অস্তিত্বটুকু ভুলে গেছেন! দিনের দিন যে ছড়া-কাহিনী শুনিয়ে ঠাকুরমা ওকে আদর করেছেন, সেইগুলিই কিনা আজ নির্ব্বিবাদে ঐ বাচ্ছাটাকে প্রয়োগ করতে এতটুকুও দ্বিধাবোধ করেন নি!

সন্ধ্যাবেলা অফিস ফেরৎ বাবলীর বাবা এসে ডাকেন—"বাবলী!"…হাতে তার কলের একটী এঞ্জিন! আগের একটী দিনের মত বাবলীর প্রতি তার ব্যবহারে কিছুমাত্র ব্যতিক্রম দেখা যায় না।…কিন্তু গত দুদিন থেকে বাড়ীতে ডাক্তার ও লোকজন অনবরত যাতায়াত করেছেন! বাবাও যেন একটু বেশী রকমের গম্ভীর হয়ে গেছেন। পিসিমা তাকে আগলে আগলে বেড়ান। বলেন—"মার ঘরে এখন যেও না বাবলী…মায়ের তোমার অসুখ কিনা, চেঁচামিচি করলে বাবা তোমার বকবেন!"

যত গোলমাল বাচ্ছাটাকে উপলক্ষ করে মাকে নিয়েই! মার জন্যই তার বাবা হেসে কথা ক'ন না। ঠাকুমাও ঐ ঘর ছেড়ে বাইরে বড় একটা আসেন না! শুধু পিসিমাই যা মাঝে মাঝে আড়ালে আড়ালে আগের মত ছুটোপাটি করে' তার সঙ্গে খেলা করেন। বাবলী তার মাকে শাস্তি দেবার জন্য মনে মনে সঙ্কল্প করল! কিন্তু কি উপায়ে দেওয়া যায়? হ্যাঁ…এক উপায় আছে! সন্ধ্যার দিকে লছমী যখন কাজ সেরে বাড়ী যাবে, সেই সুযোগে সন্ধ্যার অন্ধকারে তার পেছন পেছন বাড়ীর বাইরে গিয়ে অন্য পথে ছুট দেবে। এমনি সহস্র ভাবনায় সারা মন তার উদ্বেলিত হয়ে ওঠে।…

কিন্তু একদিন সন্ধ্যায় ঘুমিয়ে সকালে উঠে বাবলী দেখল, পাশে তার পিসিমা শুয়ে নেই। অনেকখানি বেলা হয়েছে! রৌদ্রে সারা দিক ভরে গেলেও অন্যদিনের মত বাড়ীতে কর্ম্ম-ব্যস্ততার চিহ্নটুকুও নেই। সব যেন স্তব্ধ! দরজার সামনে হিন্দুস্থানী ঝিটা আঁচল বিছিয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। সে তাহলে কাল রাত্রে বাড়ী যায় নি! নিঃশব্দে খাট থেকে নেমে ঝি-কে না জানিয়েই পাশের ঘরে, যে ঘরে তার মা শুতেন সেখানে এসে দাঁড়াল। শয্যা শূন্য…মা কোথা গেলেন তার? বাবাকেও সে দেখতে পেল না! জানালার ধারে ঠাকুরমা খুব গম্ভীর হয়ে বসে আছেন। জ্ঞানতঃ বাবলীর জীবনে ঠাকুরমাকে এত গম্ভীর কোন দিনই দেখেনি! চোখ দুটো তার খুব কান্নার পরে যেমন খুব ফুলো ফুলো দেখায়, তেমনি যেন। খাটের পায়ার কাছে মাটীতে পিসিমা সেই ছোট্ট বাচ্ছাটাকে নিয়ে বসে আছেন। দরজার বাইরে বাবলীর পায়ের শব্দে মুখ তুলে তাকিয়ে আবার মুখ নামিয়ে নিলেন। কিন্তু অজস্র অশ্রুধারায় তার ক্রোড়ে শায়িত ছোট প্রাণীটির দেহ তিক্ত হতে লাগল।…অস্বাভাবিক স্তব্ধতায় বাবলীর মন কৌতুহল ও বিস্ময়ে ভরে গেল! পায়ে পায়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে পিসিমার মুখটী তুলে ধরবার ব্যর্থ চেষ্টা করে বারবার সে শুধু প্রশ্ন করতে লাগল—"কাঁদছ কেন পিসিমা? আমার মা কোথায় গেল?"…চোখের জল ছাড়া তার প্রশ্নের কোন উত্তরই বাবলী পেলে না!…তখন সে ঠাকুরমার কাছে ছুটে গিয়ে তার কোলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে একই প্রশ্ন করল—"আমার মা কোথায়?…বাবা কোথায় গেল?"…কোন উত্তর না দিয়ে শুধু তিনি দুহাতে বাবলীকে জড়িয়ে ধরে অস্ফুটস্বরে কেঁদে উঠলেন। কারো কাছে কোন উত্তরই সে পেল না! উপরন্তু

জীবনে বাবলী যাঁদের কখনও কাঁদতে দেখেনি, তাঁদের এই ভাবান্তরে সে বিরক্তও হল কম নয়। নিশ্চয়ই তারা জানেন যে তার মা কোথায় গেছেন! তাছাড়া জেনে শুনেই যে তারা বাবলীকে বলছেন না, তাতে তার কোন সন্দেহ নেই। এই রকম কতবার ত তার মা কত জায়গায় গিয়েছেন, কই তখন ত এঁরা এভাবে কাঁদেন নি! বাবলীর শিশু মন বিষণ্ণ হতে বিষণ্ণতর হয়ে উঠল। ঠাকুরমার বাহুমুক্ত হয়ে মুহূর্ত্তমাত্র সে মায়ের শূন্য শয্যার পানে তাকিয়ে বাবলী ছুট্‌ল লছমীর ঘুম ভাঙ্গাতে! সে নিশ্চয়ই জানে তার মা কোথায়।···

লছমী আগেই উঠে বসেছে। বাবলীকে দেখে ব্যস্ত হয়ে সে জিজ্ঞাসা করল যে এই সকালে উঠে তাকে না ডেকে সে কোথায় গিয়েছিল? সে ত বাবলীর ওঠ্‌বার জন্যই দরজা আগলে শুয়েছিল। এতগুলি প্রশ্নের মাঝে তার চোখও যে অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে, বাবলীর অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে সেটুকু এড়াল না। সে ব্যাকুলভাবে তার কোলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে রুদ্ধস্বরে বল্ল—"আমার মা কোথায় লছমী? বলনা তোমরা সকলে মিলে কাঁদছ কেন?"··· লছমীর কাছ থেকেও কোন জবাব সে পেল না! সদ্যমাতৃহারা শিশুটীকে বুকে জড়িয়ে ধরে লছমীর চোখেও অজস্র ধারা নেমে এল। কি যে ছাই করে এরা! উত্তেজিতভাবে দুহাত দিয়ে লছমীকে ধাক্কা দিয়ে বাবলী বল্ল—"আঃ! বল না লছমী আমার মা কোথায় গেল?"···

অবাধ্য অশ্রু রোধ না করতে পেরে লছমী শুধু একটা আঙ্গুল নির্দ্দেশ করে আকাশের দিকে দেখিয়ে দিল। এতক্ষণে যেন বাবলীর কাছে ব্যাপারটা পরিষ্কার হ'ল। ওঃ!···মা তাহ'লে তার মত তাকে জব্দ কর্ব্বার কল্পনা করেই একটুখানি শুধু চোখের আড়াল হয়েছেন। ভারী চালাক ত তিনি! কিন্তু ভয় পাবার মেয়ে বাবলী নয়! তবু সে ব্যাকুলভাবে রোরুদ্যমানা লছমীর চিবুকে হাত দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"মা আবার আসবেন ত লছমী? একটুখানি বেড়াতে গেছেন···না?"

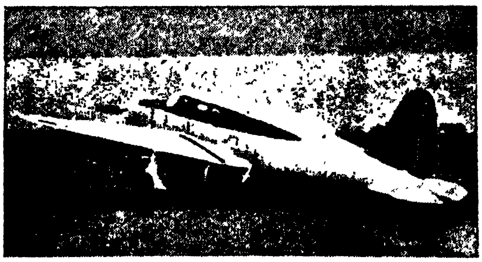
অতি পাষাণও নিষ্ঠুর সত্য প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত হয়! কি আর বলবে লছমী এর উত্তরে? শুধু সে ঘাড় নেড়ে জানাল, হ্যাঁ···মা তার আবার ফিরে আসবেন। বাবলী শুধু ভাবতে লাগল কি করে তার মা বাবলীর মনের কথা জানতে পেরে আগে হতেই লুকিয়ে রইলেন! কোথায় সে লুকিয়ে তার মাকে কাঁদাবে···তা নয় তিনি নিজে লুকিয়ে সকলকে এভাবে কাঁদাতে লাগলেন!

প্লাষ্টিকের যুগে

শ্রীগৌরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি-এস্‌-সি

বর্ত্তমানকালে 'প্লাষ্টিক্'-এর উন্নতি ও প্রসার যত শীঘ্র এবং যতখানি সম্ভব হয়েছে এর আগে আর কখনো তা হয়নি। বস্তুতঃ 'প্লাষ্টিক্'-এর জন্ম এবং তার প্রগতির ইতিহাস বিজ্ঞানের অন্যান্য অনেক কিছু উৎপাদনের তুলনায় নিতান্ত সাম্প্রতিক বলা চলে। জৈব (organic) যৌগিক পদার্থ থেকে এর অভ্যুত্থান—এর বৈচিত্র্যের কথা এবং শিল্প-বাণিজ্যে ও মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনেএর ক্রমবর্দ্ধমান নিত্য ব্যবহারের কাহিনী —এই তো মাত্র সেদিনের। আলেকজাণ্ডার পার্কস্ (Alexander Parkes) নামক একজন ইংরাজ রসায়নবিদের আপ্রাণ চেষ্টায় ও আগ্রহে এর জন্মকথা আবিষ্কৃত ও প্রচারিত হোলো। তাঁর পরীক্ষা চরম উৎকর্ষতা লাভ করে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে। তিনিই প্রথম 'প্লাষ্টিক্'-এর নমুনা তৈরী ক'রে দেখালেন—সাধারণ সৌখীন জিনিষ তৈরী করার কাজে 'প্লাষ্টিক্'-এর বিপুল সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের ইঙ্গিত তিনিই প্রথম লোক-লোচনের গোচরে আনলেন। সাধারণ তুলার ওপর নাইট্রিক্ আর সালফিউরিক্ এসিডের কার্য্যকারিতার ফলে উৎপন্ন হয় সেলুলোজ নাইট্রেট্। পরে যখন ব্রিটেন্, আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্ম্মাণী প্রভৃতি দেশের শিল্পপতিরা এর সম্ভাবনার কথা নিয়ে মাথা ঘামাতে সুরু করলেন, তখন থেকে এর নাম রাখা হোলো সেলুলয়েড্। পিঙ্‌পঙ্‌ বল থেকে কৃত্রিম রবার অবধি যাবতীয় সুন্দর স্বচ্ছ সৌষ্ঠবময় সৌখীন জিনিষই আধুনিক বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক গবেষণার ফল, আর এদেরই সংক্ষিপ্ত নাম রাখা হয়েছে "প্লাষ্টিক্"। চেহারায় আর ধর্ম্মে এরা স্বতন্ত্র হ'লেও রসায়নবিদের মতে এরা এক অর্থাৎ একই বংশীয়। দুই জাতীয় উপকরণ থেকে আর দুইটী স্বতন্ত্র প্রক্রিয়া থেকে এরা তৈরী।

সেলুলোজ-এর যৌগ (compound) থেকে যে প্লাষ্টিক তৈরী হয় সেটা পেতে হ'লে মূল উপকরণকে রীতিমত নরম ক'রে নিয়ে চাপ প্রয়োগের ফলে একে নির্দ্দিষ্ট আকার দেওয়া হয়। এই চাপ প্রয়োগের ব্যাপারে কখনো বা প্রবল প্রচুর উত্তাপের দরকার হয়, আবার কখনো হয়ও না। সেলুলয়েডও এই দলে। নির্দ্দিষ্ট আকার দেওয়ার পরও এই দলের 'প্লাষ্টিকে'র আকারের রূপান্তর ঘটানো ভারী সহজ। সামান্য তাপ প্রয়োগের ফলেই এরা নরম হ'য়ে যায়, তখন আবার একই প্রক্রিয়ায় যা-খুসী আকার দেওয়া চলে। এদের এই একটা মস্ত গুণ। অন্য ধরণের 'প্লাষ্টিক্' হোলো এর বিপরীত দলের। অবশ্য এদের বেলাতেও চাপ ও তাপ প্রয়োগের সাহায্যেই ছাঁচে ঢালাই করা হয়, কিন্তু এদের আকারের রূপান্তর ঘটানো যায় না। আরো তাপ

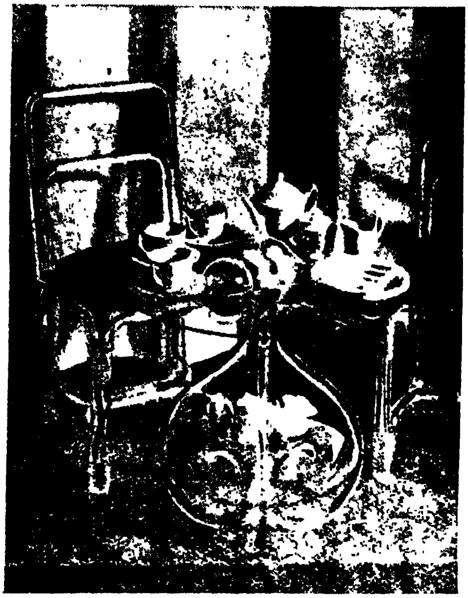


মার্কিন উড়োজাহাজ

প্রয়োগের ফলে এরা আর নরম হয় না, বরং ক্রমশঃ কঠিন থেকে কঠিনতর হ'য়ে ওঠে।

সেলুলয়েড্ ছাড়া সেলুলোজ্—প্লাষ্টিক্ আরো অনেক আছে। সেলুলোজ নাইট্রেট্ বা সেলুলোজ এ্যাসিটেট্—এগুলি হোলো মিশ্রিত যৌগিক পদার্থ। কিন্তু খাঁটী অকৃত্রিম সেলুলোজও এভাবে ব্যবহৃত হয়। কাঠের কোমল অংশ (অর্থাৎ শাঁস) কিংবা কাগজ, কষ্টিক সোডা আর

কার্ব্বন বাইসালফাইডের যুগ্ম কার্য্যকারিতার গুণে এক রকমের চটচটে আঠাযুক্ত পদার্থে রূপান্তরিত হয়, তার রাসায়নিক নাম ভিস্‌কোজ (Viscose); এ আসলে সেলুলোজ ছাড়া আর কিছুই নয়। চকোলেটের বাক্স বা সিগারেটের প্যাকিং কাগজ আর মেয়েদের কৃত্রিম



লুসাইট-নামক স্বচ্ছ পরিষ্কার মজবুত প্লাষ্টিকের তৈরী টেবিল, চেয়ার প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় ঘর সাজানোর আসবাবপত্র

মোজা এ সবই একই জিনিষ থেকে তৈরী হয়—তার নাম সেলোফেন্‌, ভিস্‌কোজ্‌-থেকে-পাওয়া-রেয়নেরই এ হোলো জাতভাই।

পুরোনো ধরণের প্লাষ্টিক্‌-উপাদানের মধ্যে সবচেয়ে ভালো হোলো কেসীন্‌ (Casein) অর্থাৎ পনির, দুধের শ্রেষ্ঠতম সার ভাগ। সস্তা, সুলভ অথচ চিত্তাকর্ষক ব'লেই এই স্নেহজাতীয় প্লাষ্টিকের প্রচার, প্রসার ও প্রচলন সৌখীন শিল্পদ্রব্যে অফুরন্ত। এর রূপের পূর্ণতা যেমন চোখ ধাঁধায়, তেমনি মন মাতায়। মাখন-তোলা দুধ থেকেই সাদা কেসীন্‌ পাওয়া যায়। এই দুধের সঙ্গে রেনেট (Rennet) ব'লে একরকম বসা-ঘন পদার্থ মিশিয়ে যে অধঃক্ষেপ (Precipitate) পাওয়া যায়, তারই নাম কেসীন্‌। এই নমনীয় পদার্থটা বেশ ক'রে ধুয়ে শুকিয়ে নেওয়া হয়। তারপরে রঙ্‌ করার জন্যে রঞ্জক (pigment) আর সামান্য একটু জল মিশিয়ে—একে পেষণের উপযোগী করা হয়। বৈদ্যুতিক শিল্পের প্রসারের প্রাথমিক অবস্থায় নিত্য প্রয়োজনীয় অন্তরিত (insulated) অংশগুলির জন্যে নির্ভর করতে হোতো পোর্সিলেন, মাইকা আর ইবনাইটের ওপর। সহজেই নমনীয় এবং ছাঁচে ঢালাই করা যায় এমনতরো জিনিষের সাহায্যে সুইচ্‌, প্লাগ, সকেট্‌ এবং অন্যান্য যাবতীয় অপরিহার্য্যরূপে ব্যবহৃত দ্রব্যাদি প্রস্তুত করার সম্ভাবনার কথা অনতিবিলম্বেই শিল্প ব্যবসায়ীদের কাছে ধরা পড়লো। তারপরই এলো বাইটুমেন-প্লাষ্টিক্‌ (bitumen plastic)-এর যুগ। গলিত বাইটুমেনের সঙ্গে এ্যাস্‌বেস্‌টস্‌ আর সিলিকা (এটা সাধারণত: ধুলা বালির আকারেই মেশানো হয়) মিশিয়ে এই ধরণের প্লাষ্টিক্‌ প্রস্তুত হয়।

অবশিষ্ট সকল ধরণের প্লাষ্টিক্‌ পাওয়া যায় রজন (resins) থেকে। খুব সাধারণ ও পরিচিত রাসায়নিক দ্রব্য (যেমন কয়লা পেট্রল) থেকে সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার সাহায্যে রসায়নবিদ্‌গণ এই জাতীয় প্লাষ্টিক্‌ উদ্ধার করেছেন। এক্রাইলিক রজন (acrylic resin)এর নাম এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৩৫ সালে সর্ব্বপ্রথম এই প্লাষ্টিক্‌ বাজারে বেরোয় এবং এর বিস্ময়কর কয়েকটী ধর্ম্মের জন্য তৎকালে প্লাষ্টিকের যুগে যুগান্তর এনেছিলো।

কাচের চেয়েও এটা পরিষ্কার, চকচকে আর আলোকরশ্মি বহনের ক্ষমতা এর অপরিসীম। সাধারণ কাচের পরিবর্ত্তে এই জাতীয় রজন-উৎপন্ন প্লাষ্টিকের সম্ভাবনাপূর্ণ ব্যবহারের প্রচলন হ'তে হয়ত আর বেশী দেরী নেই।

আর এক জাতীয় প্লাষ্টিক্‌ যা' কেবলমাত্র একবারই ব্যবহৃত হ'তে পারে সেটা মেলে ফরমালডিহাইড্‌ (formaldehyde) রজন থেকে, এর ডাক নাম হোলো ব্যাকেলাইট্‌—সেই-নামেই বর্ত্তমান কালে এটা খুব চেনাশোনা ও পরিচিত। আমাদের ঘরোয়া বহু জিনিষপত্তরই আজকাল বিশেষভাবে এই রকমের প্লাষ্টিক্‌ থেকেই তৈরী হচ্ছে।

আসল কথা, সত্যিকারের 'প্লাষ্টিকের' যুগ সবেমাত্র সুরু হয়েছে। তার কথা ও কাহিনী নিয়ে বিজ্ঞানীরা আজ বিশেষভাবে মশগুল। নিত্য নতুন আবিষ্কার ও উদ্ভাবন এবং তারই যথাশীঘ্র প্রয়োগের সাহায্যে প্লাষ্টিকের যুগকে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর ক'রে তোলার ব্রতে তাঁরা এখন একান্তভাবে ব্যাপৃত।

আর কেন !

শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

আর কেন বাঁধো মিছে বেহালার তার ?
ছিঁড়ে ফেল ! বেঁধে নেবে একতারা ?
তারি বলো কিবা দরকার !
ঘরে যারা ছিল তারা—পথে নেমে এসেছে :
কূলে যারা ছিল তারা—অকূলেতে ভেসেছে।
ঘরে নাই দীপ আজ, পথে নাই পাথেয় ,
দরিয়ায় নাই খেয়া, খরস্রোত অজেয় !
তবু কেন সুরবাঁধা বেহালায় সেতারে ;
তারের যে সুর ছিল ঠাঁই নিল বেতারে।
মরণের বাঁশী বাজে মানুষের শিয়রে,
বারুদের বিষ লেগে বনবীথি শিহরে।
ধমনীতে উল্লাস ধনী আর বণিকের,
কেউ করে জয়গান মজ্‌দুর শ্রমিকের।
কাজ নেই সে সবেতে এসো আজ দুজনে
পাশাপাশি বসি গিয়ে বটতলে বিজনে।
এ পারেতে ছায়া নামে—
পারে আঁধিয়ার ;
চেয়ে থাকি মুখোমুখি,
মরণের সুখে সুখী ;
প্রলয়ের মহালয়ে হোক একাকার।
ভেঙে ফেল একতারা ;
ছিঁড়ে ফেল তার।

ফাউস্ট

কাজী আবদুল ওদুদ

চতুর্থ দৃশ্য

ফাউস্টের পাঠাগারে মেফিস্টো উপস্থিত হলো এক ফিটফাট ভদ্র যুবকের বেশে। ফাউস্টকে সে বল্লে—তেম্নি সুসজ্জিত হয়ে এই গর্ত থেকে বেরিয়ে জগৎ দেখতে।

ফাউসট বল্লে—

বেশবিন্যাস যাই করি না কেন
জগতের দিকে তাকিয়ে পাব কেবল দুঃখ।
বিলাস-ব্যসনে যে সুখ পাব সে বয়স আমার নেই,
আর বুড়োও এত হইনি যে কামনা পেয়েছে লোপ।
জগৎ থেকে কি পাব?
সে ত কেবল বলছে—
ছাড়ো ছাড়ো ছাড়ো!
… … …
সংসার ত পূরণ করে না তার একটি আশ্বাসও!
… … …
আমার অন্তরে আছেন যে ঈশ্বর
তাঁর কাজ হচ্ছে সেই অন্তরকে কেবল মথিত করা,
আর বিশ্ব-ভুবনে বিরাজ করছেন যে ঈশ্বর
তাঁর সাধ্য নেই প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করা।
আয়ুর এই দুর্বহ ভারে পিষ্ট হয়ে
মৃত্যুকে মানি বরণীয়, জীবন অভিশপ্ত।

মেফিসটো বল্লে—

…তবু মৃত্যু পুরোপুরি কাম্য নয় কারো।

ফাউসট বল্লে—

অহো, ভাগ্যবান সে-ই জয়ের মুহূর্তে
যার ললাটে শোভা পায় শোণিতসিক্ত মাল্য।
হায়, যদি সেই মহীয়ান্ দেবযোনির সামনে
সেই পরম উদ্দীপনার মুহূর্তে নিঃশেষিত হতো আমার আয়ু!

মেফিসটো টীপ্পনী করলে—

কিন্তু সেই শুব্ধ রাত্রিকালে
নীল পানীয় পান করতে চান নি কোনো মহাশয়।

ফাউসট বল্লে—

দেখছি আড়ি পাতায় তোমার আনন্দ!

মেফিসটো বল্লে—

সবজান্তা নই আমি, তবে জানি অনেক কিছুই।

ফাউসট বল্লে—

সেদিন পরিচিত সুরের মায়া
আকর্ষণ করেছিল আমাকে চিন্তার দিশাহারা
ঘূর্ণিপাক থেকে,
শৈশব থেকে লালিত প্রত্যয়
প্রতারিত হয়েছিল মোহন প্রতিধ্বনির দ্বারা।
কিন্তু এখন ধ্বংস কামনা করি সব কিছুর—
অন্তরাত্মাকে যা জড়ায় মায়ায়,
উজ্জ্বল মধুর ছলনায়
রাখে তাকে বন্দী করে' দুঃখের কারাগারে।
প্রথমে ধ্বংস হোক উচ্চাকাঙ্ক্ষা
যা দিয়ে মন নিজেকে রাখে ভুলিয়ে!
ধ্বংস হোক যত মোহিনী মূর্ত্তি
যারা প্রভাবিত করে সূক্ষ্ম চেতনা।
ধ্বংস হোক মিথ্যা ভাবী স্বপ্ন—
নামের খ্যাতির গৌরবের!
ধ্বংস হোক সহায় সম্পত্তি—
স্ত্রী সন্ততি দাস কৃষি!
ধ্বংস হোক ধন
যা আনে অশান্ত কর্মের নেশা,
আয়োজন করে সুখের পুষ্পশয্যা!
ধ্বংস হোক দ্রাক্ষার দেবভোগ্য সুধা—
প্রণয়ের পরম প্রসাদ!
ধ্বংস হোক আশা, ধ্বংস হোক বিশ্বাস!
আর বিধ্বস্ত হোক ধৈর্য্য!

তখন অন্তরীক্ষে দেবযোনিরা ব্যথিত হয়ে বলে উঠ্‌লো—

হায়! হায়!
ধ্বংস করলে,
সুন্দর জগৎ,
প্রবল আঘাতে:
ছিন্ন ভিন্ন হলো! বিধ্বস্ত হলো!
আসুরিক বিক্রমে!
যত সব বিক্ষিপ্ত অংশ
নিয়ে যাই শূন্যে,
শোক করি
নষ্ট সৌন্দর্য্যের জন্যে!
ধরণীর পুত্রদের
ওগো বরেণ্য,
সুন্দরতর করে'
আরবার কর সৃষ্টি,
সৃষ্টি কর ভেঙে ফেলা জগৎ তোমার অন্তরে!
নব জীবন
যাত্রা সুরু করুক
নির্মলতর দৃষ্টি নিয়ে,
নব নব আনন্দ সঙ্গীত
উঠুক কণ্ঠে কণ্ঠে
তার অভিনন্দনে!

মেফিসটো বল্লে, এই মানসিক অস্বস্তি থেকে সে ফাউসটকে উদ্ধার করবে, তাকে নিয়ে যাবে মানুষের সমাজে—জনতায় নয়—তাতে ঘুচবে তার মনের গ্লানি; ফাউস্ট যদি রাজি হয় তবে সে হবে তার সঙ্গী—ভৃত্য। ফাউসট জিজ্ঞাসা করলে—কি সর্ত্তে? মেফিসটো বল্লে—সে কথা পরে ভেবে দেখলেই চলবে। ফাউসট বল্লে—

না না—শয়তান আত্মপরায়ণ,
তার স্বভাব নয়
"নিষ্কাম ভাবে" কারো জন্য কিছু করা।

পরিষ্কার করে' বলো তোমার সর্ত্ত !
নইলে এমন ভৃত্য থেকে বিপদের সম্ভাবনা যথেষ্ট।

মেফিসটো বল্লে—

"এখানে" আমি অক্লান্ত সেবক, চলবো
তোমার রশি গলায় পরে,'
চলবো তোমার ইঙ্গিত মাত্রে,
কিন্তু "সেখানে" যখন আমরা মিলিত হব
তখন তুমি করবে আমি যা করলাম।

ফাউসট বল্লে, এই "সেখানে"র চিন্তায় সে বিব্রত নয়। তার আনন্দের উৎস এই পৃথিবী, এই প্রতিদিনের সূর্য্য, এসব ছেড়ে যখন সে চলে যাবে তখন ঘটুক যা খুশী, তখন ভাববার দরকার হবে না সে স্বর্গে যাবে না নরকে যাবে।

এই চুক্তি নিষ্পন্ন করবার জন্য মেফিসটো তাকে আহ্বান করে বল্লে—

তোমাকে দেব এমন জিনিষ যা কেউ কখনো দেখেনি।

ফাউসট অবজ্ঞা প্রকাশ করে' বল্লে—

কৃপার পাত্র শয়তান, তুমি দিতে পার আমি যা চাই তাই !
মানুষের আত্মার পরম প্রয়াস
কবে বুঝতে পেরেছে তোমার মতো জীব ?
তোমার দেওয়া ভোজ্য তৃপ্তি দেয় না কখনো ;—
তুমি দিতে পার টক্‌টকে সোনা,
পারার মতো চঞ্চল, গলে যায় আঙুলের ফাঁক দিয়ে,—
দিতে পার এমন তন্বী আমার বক্ষলগ্ন থেকে
যে চটুল আঁখি হানে অপরের প্রতি—
দিতে পার সম্মানের দিব্য আস্বাদ
যা মিলায় উল্কার মতো।
আনো সেই ফল যা তুলবার আগেই যায় পচে,
আর সেই গাছ, যাতে প্রতিদিন জন্মে নতুন নতুন পাতা !

মেফিসটো বল্লে—

এতে আমার ভয় পাবার কিছু নেই ;
এমন জিনিষ আমার আছে, দেখাতেও পারি নিঃসন্দেহ।
কিন্তু বন্ধু, এমন দিন হয় ত আসবে
যখন আমরা খুঁজবো শান্তি, কামনা করবো নিবিড় সুখ।

ফাউসট বল্লে—

যদি কখনো আরামে সুখশয্যায় নিজেকে দিই এলিয়ে,
সেই ক্ষণেই যেন হয় আমার জীবনের অবসান !
... ...
এই আমার পণ।

মেফিসটো বল্লে—

ঠিক ত !

ফাউসট বল্লে—

নিঃসন্দেহ !
যেদিন চলমান মুহূর্ত্তকে আমি বলবো,
"আর একটুকু থাকো—এত সুন্দর তুমি !"
সেদিন বেঁধো আমাকে অচ্ছেদ্য বন্ধনে,
ঘোষণা করো আমার চরম ধ্বংস সেই দিন !
... ...

তাদের চুক্তি নিষ্পন্ন হলো রক্তের অক্ষরে, কেন না, মেফিসটোর মতে রক্ত দিয়ে যা লেখা হয় তার মর্য্যাদা কিছু ভিন্ন রকমের।

যে জীবন ফাউসট এখন যাপন করতে চাচ্ছে সে সম্বন্ধে সে মেফিসটোকে বল্লে—

... ...
বৃথা আমি হয়েছিলাম উচ্চাভিলাষী,
আমি বরং সমকক্ষ তোমাদের :
সেই মহীয়ান দেবযোনি থেকে পেয়েছি অবজ্ঞা,
প্রকৃতির রহস্যের দ্বার রুদ্ধ আমার সামনে ;
ছিন্ন হয়েছে অবশেষে চিন্তার সূত্র—
জ্ঞান আনে অবর্ণনীয় বিরক্তি।
সন্ধান করা যাক এখন ভোগ-সমুদ্রের তলকূল,
তাতে যদি প্রশমিত হয় কামনার জ্বালা !
মায়ার দুর্ভেদ্য গুণ্ঠনে আবৃত হয়ে
আসুক নব নব বিস্ময়, চকিত মোহিত করতে !
যোগ দিই কালের উদ্দাম নৃত্যে,
ঘটনার প্রবাহে !
আনন্দ ও দুঃখ,
দুর্ভাবনা ও সাফল্য,
আবর্ত্তিত হয়ে চলুক যেমন খুশী ;
মানুষের পরিচয় অশ্রান্ত উদ্দীপনায় !

মেফিসটো বল্লে, তার আপত্তি নেই কিছুতে, তবে সুখ-সেবনের পথে যে তারা অগ্রসর হচ্ছে সে ক্ষেত্রে ফাউসটের জন্য চাই অসঙ্কোচ—দ্বিধা করলে চলবে না।

ফাউসট বল্লে—

শুনেছ ত সুখ লক্ষ্য নয় আমার ;
আমি চাই উদ্দাম আবর্ত্তন, ভোগের তীক্ষ্ণতম যাতনা,
প্রেম-বিহ্বল ঘৃণা, উল্লসিত বিতৃষ্ণা।
আমার অন্তরে জ্ঞানের পিপাসা হয়েছে নিবৃত্ত,
কোনো ব্যথা থেকেই হবে না তা প্রতিহত,
মানুষের জন্য সৃষ্ট হয়েছে যত সুখ-দুখ
সব পরীক্ষিত হবে আমার অন্তরতম সত্তায় ;
ক্ষুদ্র ও মহৎ সবের রূপ জাগবে আমার আত্মায়,
সঞ্চিত হবে তাতে তাদের আনন্দ ও বেদনা ;
এমনিভাবে আমার নিজের সত্তা বিস্তৃত করবো তাদের সত্তায়,
আর শেষে সবার সঙ্গে লাভ করবো মানব-ভাগ্যের ব্যর্থতা।

মেফিসটো বুঝিয়ে বলে—

বিশ্বাস কর আমার কথা, হাজার হাজার বছর ধরে'
এই কঠিন মাংসের টুক্‌রো চিবিয়ে চলেছি আমি—
দোল্‌নায় দোলা থেকে আরম্ভ করে খাট্‌লিতে চাপা পর্য্যন্ত
কোনো মানুষ হজম করতে পারে নি এই পুরোনো খামিরা !
জেনে রাখো—এই সমগ্র
সৃষ্ট হয়েছে ঈশ্বর বলে' যিনি আছেন তাঁর খুশীর জন্যে !
তিনি বিরাজ করেন একা অনন্ত মহিমায়,
আমাদের তিনি নিক্ষেপ করেছেন দূরে অন্ধকারে,
আর তোমাদের জন্য নির্দ্ধারিত করেছেন দিন ও রাত্রি।

ফাউসট বল্লে—

কিন্তু আমি চাচ্ছি এই !

মেফিসটো তার অভ্যস্ত বক্র ভঙ্গিতে ইঙ্গিত করলে ফাউসটের আকাঙ্ক্ষার অসমীচীনতার দিকে, প্রকারান্তরে বুঝিয়ে দিলে ফাউসটের খেয়াল যেদিকে গেছে তা অসার কবি-কল্পনা ভিন্ন আর কিছু নয়—

ভাল কথা।
কিন্তু ভয়ের কথা হচ্ছে এই—
শিল্প দীর্ঘায়ত, আর সময় সংকীর্ণ।
সে জন্যে তোমার একটি কথা শোনা দরকার :
কোনো কবির সঙ্গে কর ভাব—
ছুটুক তার কল্পনা,
তারপর শোভা পাও তার তৈরি মুকুট পরে'
ঝলমল করছে যাতে বিচিত্র গুণাবলী—
সিংহের বিক্রম,
বন্য হরিণের ক্ষিপ্রতা,
ইতালীয়ের উষ্ণ শোণিত,
উত্তরাঞ্চলের দৃঢ়তা !
তার কাছ থেকে বুঝে নাও কেমন করে'
এক সূত্রে বাঁধা যায় মহত্ব আর হীনতা,
যৌবনের উদ্দামতার কালে
কেমন করে' প্রেম করতে হয় ঘৃণা করতে হয়
নিয়ম শৃঙ্খলার সঙ্গে !
এমন একজনের দেখা পাওয়া আমার বড় সাধ ;
এঁর নাম আমি দিতাম শ্রীল শ্রীযুক্ত ছোট ব্রহ্মাণ্ড।

ফাউসট্ অধীর হয়ে বল্লে—

কি মূল্য আমার, যদি সমস্ত মানবতার মুকুট
ধারণ করতে না পারি আপন মাথায় !

মেফিসটো বল্লে—

কেন, মোটের উপর তুমি যা তুমি তাই।
মাথা ফুলিয়ে ফঁাপিয়ে তুলতে পার যত খুশী কোঁকড়ানো
পরচুলা লাগিয়ে,
পায়ে লাগাতে পার আধহাতউঁচু-গোড়ালির জুতো—
কিন্তু আসলে রয়ে যাচ্ছ তুমি যা তাই।

ফাউসট্ দুঃখিত হয়ে দেখলে অনন্তের সমীপবর্তী হবার সাধনায় সে কেবলই হয়েছে ব্যর্থ। মেফিসটো তখন বল্লে—

মশায়ের চোখে ব্যাপারগুলো এইবার পড়েছে
যেমন পড়ে আর দশজনের চোখে।
চলতে হবে আমাদের বুদ্ধি খরচ করে
জীবনের আনন্দ-নাগালের বাইরে চলে যাবার পূর্বেই।
কি বিড়ম্বনা ! হাত পা ত আছেই,
আর আছে মাথা আর প্রাণশক্তি—
কিন্তু তাই বলে' যাতে নতুন করে' পেলাম তৃপ্তি
তা কি পুরোপুরি নয় আমার ?
যদি আমার আস্তাবলে থাকে ছয়টি ঘোড়া
তাদের শক্তি কি নয় আমারও শক্তি ?
—ছুটে চলি তখন পূর্ণতম মানুষের মহিমায়
যেন পদক্ষেপ করে' চলেছি চব্বিশ পায়ে !
ছাড়ো—বৃথা তত্ত্বচিন্তা ছাড়ো—
সংসারে ঝাঁপিয়ে পড় আনন্দে !
বলছি তোমাকে—তোমার তত্ত্বসন্ধানী উজবুকটি
আসলে এক ভূতে-পাওয়া জন্তু,
ছুটে বেড়াচ্ছে সে মাঠে মাঠে,
অথচ তার চারপাশে রয়েছে সরস সবুজ ঘাস।

এখানে ছাত্রদের নিয়ে অসার আলোচনায় তিক্তবিরক্ত না হয়ে সে তাকে বল্লে বাইরে বেরিয়ে পড়তে। অদূরে একটি ছাত্রের পদধ্বনি শোনা গেল। ফাউসট বল্লে—এর সঙ্গে দেখা করবার মতো মনের অবস্থা তার নয়। এই বলে' সে কক্ষ ত্যাগ করলে। তার ঢোলা পোষাক পরে' মেফিসটো বসলো ফাউসট হয়ে।

মেফিসটো ও ছাত্রের কথোপকথন বিখ্যাত, এতে প্রকাশ পেয়েছে বিভিন্ন ধরণের জ্ঞানচর্চার ত্রুটির প্রতি গ্যেটের কটাক্ষ। বেয়ার্ড টেলর বলেন, এটি লেখা হয়েছিল মের্ক-এর সঙ্গে গ্যেটের অন্তরঙ্গতার কালে—নিজের কলেজ-জীবনের স্মৃতি তখন গ্যেটের মনে অম্লান।—এর কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত হচ্ছে :—

তর্কবিজ্ঞান সম্বন্ধে :—

প্রকৃত পক্ষে চিন্তার সূক্ষ্ম বুনানি হচ্ছে
তাঁতির কাপড় বুনানির মতো ;
এক তাঁতে চলেছে হাজার সুতো,
মাকু চলেছে দ্রুত,
অদৃশ্যভাবে সুতার সঙ্গে সুতো হচ্ছে গাঁথা,
বেরিয়ে আসছে বিচিত্র বসন।
তার পর আসছেন নৈয়ায়িক,
প্রমাণ করছেন তিনি, সম্ভবপর নয় এ ভিন্ন আর কিছু হওয়া ;
প্রথম প্রস্থান এই—আর দ্বিতীয় প্রস্থান এই,
তৃতীয় আর চতুর্থ হবে—তা থেকে যা সিদ্ধান্ত হয় তাই ;
যদি না থাকতো প্রথম ও দ্বিতীয়,
ঘটতো না তবে তৃতীয় আর চতুর্থ।
সব দেশের পণ্ডিতরাই এতে মহা বিশ্বাসী,
কিন্তু তাদের মধ্যে জন্মে না একজনও তাঁতি।

দর্শন সম্বন্ধে :—

মনে রেখো, খুব গভীরভাবে বোঝা চাই সেই সব কথা
যা বুঝে ওঠা কুলোয় না মানুষের মাথায় !
তা মাথায় ঢুকুক আর না-ই ঢুকুক্
সে সব সম্বন্ধে পাবে কিন্তু এক একটি গালভারি শব্দ।

আইন সম্বন্ধে :—

সমস্ত আচার-ব্যবহার ও আইন
সংক্রামিত হয়ে চলেছে, গোপনে, মানবজাতির চিরন্তন
ব্যাধির মতো—
এক পুরুষ থেকে অন্য পুরুষে,
এক দেশ থেকে অন্য দেশে।
নেই যুক্তির বালাই, দান হয় অপকর্ম ;
দুর্ভাগ্য তোমার যদি জন্মেছ নাতি হয়ে !
যে আইন ও অধিকার জন্মেছে আমাদের সঙ্গে
বিধিবদ্ধ না হয়ে
হায়, তা বুঝবার জন্য নেই কারো মাথাব্যথা।

ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে :—

এই বিদ্যায় দেখ্‌বে
ভুল পথ এড়িয়ে চলা কত শক্ত ;
এর মধ্যে লুকিয়ে আছে অনেক বিষ,
কোন্‌টি বিষ আর কোন্‌টি ওষুধ তা বাছাই করা কঠিন।
সব চাইতে ভাল হচ্ছে এ বিদ্যায় একজনের কথা শোনা,
সোজাসুজি গুরুর বাক্য জ্ঞান করবে সত্য।
সমস্ত মনোযোগ নিবদ্ধ করবে শব্দের উপরে !
তাহলে সব চাইতে নিরাপদ দরজা দিয়ে

ঢুকতে পারবে ধ্রুবের মন্দিরে।
... ...
বুদ্ধি আর যেখানে থৈ পায় না
সেখানে এসে হাজির হয় শব্দ।
শব্দ নিয়ে লড়াই করা যায় কত চমৎকারভাবে ;
শব্দের সাহায্যে সহজে দাঁড় করানো যায় মতবাদ,
শব্দের উপরে বিশ্বাস স্থাপন করা যায় আরামে ;
শব্দ থেকে কেউ খসিয়ে নিতে পারে না কণামাত্রও।

চিকিৎসা-বিজ্ঞান সম্পর্কে :—

বৃথা ঘুরছ বিজ্ঞানের মহলে মহলে,
প্রত্যেকে ততটুকু শেখে যতটুকু তার পক্ষে সম্ভব।

জীবন সম্বন্ধে :—

পাণ্ডুর হয়ে গেছে সমস্ত তত্ত্ব,
সবুজ আছে শুধু জীবন-বৃক্ষ।

ছাত্রটি তার খাতায় পরম ভক্তিভরে ফাউসট-রূপী মেফিসটোর এক লাইন লেখা নিয়ে চলে গেল। পুনরায় এলো ফাউসট, বল্লে—এখন যেতে হবে কোথায় ?

মেফিসটো বল্লে—

যেখানে তোমার খুশী,
প্রথমে আমরা দেখব ক্ষুদ্র জগৎ, তার পর বৃহৎ জগৎ।

এখানে ক্ষুদ্র জগৎ বলতে বোঝা হয়েছে ব্যক্তিগত আশা আকাঙ্ক্ষার জীবন, আর বৃহৎ জগৎ বলতে বোঝা হয়েছে বৃহত্তর সংসার-জীবন, অর্থাৎ রাজ্যশাসন যুদ্ধ ঐতিহ্য ইত্যাদি। প্রথম জগতের পরিচয় সাধারণতঃ ফাউসট প্রথম খণ্ডে, আর দ্বিতীয় জগতের পরিচয় ফাউসট দ্বিতীয় খণ্ডে।

মেফিসটোর কথায় ফাউসট বলে—

আমার মুখে রয়েছে লম্বা দাড়ি,
তা নিয়ে সম্ভবপর হবে না স্বচ্ছন্দভাবে চলাফেরা করা।
... ...

মেফিসটো বল্লে—

তোমার এ সব ভয় শীগ্‌গিরই যাবে ঘুচে ;
আত্মবিশ্বাসী হও, তাহলে বুঝবে বাঁচবার রহস্য।

মেফিসটোর মায়া-চাদরে বসে তারা শূন্য দিয়ে উড়ে চল্‌লো।

ঢাকার 'জ্যোৎস্নার জাল'

শ্রীরমেশচন্দ্র রায়

ঢাকার ভুবনবিখ্যাত মসলিনের বিবরণ আমরা কেতাবে পাই ; ইহা যে কি বস্তু তাহা চক্ষে দেখি নাই—মসলিন আর প্রস্তুত হয় না ; ইহার চাহিদা আর নাই।

হয়ত বা মসলিন তৈরী করিবার সন্ধান জানে এমন লোকও আজ বাংলায় কিংবা ঢাকায় খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। মসলিন পরিবার



তুলা আঁচড়াইবার যন্ত্র (মাছের কাঁটা)

রুচি ও সৌখিনতাও দেশে আর আছে কি না সন্দেহ। সৌখিনতা ফিরাইয়া আনিতে পারিলেও সেই সখ মিটাইবার শিল্পীকে খুঁজিয়া বাহির করা অসম্ভব। এই অতি সূক্ষ্ম ও মূল্যবান বস্ত্র রাজা-রাজড়া ও আমীর-ওমরাহগণের অন্দরমহলে রাণী ও বেগমগণেরই অঙ্গের শোভা বর্দ্ধন করিত। বিদেশেও ধনীদের জন্য এই কাপড় প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হইত। এখন সেকাল গিয়াছে।

এই পৃথিবী-বিখ্যাত মসলিনের একটা মানসচিত্র বিদেশী লেখকগণের বিবরণ হইতে পাই। একজন ইংরাজ লেখক লিখিয়াছেন যে মসলিন প্রস্তুত করিবার জন্য যে সূতা কাটা হইত তাহা যে কত সূক্ষ্ম তাহার ধারণা করা কঠিন। এক পাউণ্ড তুলা হইতে প্রায় ২৫০ মাইল দীর্ঘ সূতা প্রস্তুত করা হইত। বিখ্যাত পর্য্যটক টেভার্নিয়ে (Tevernier) লিখিয়াছিলেন্ যে মসলিনের সূতা এত সূক্ষ্ম যে তাহা হাতে লইলে বুঝা যায় না যে হাতে কোন কিছু রহিয়াছে। ১৭শ শতকের একজন ইংরাজ লেখক মসলিনকে অবজ্ঞার সহিত "পণ্যের ছায়া" (Shadow of commodity) আখ্যা দিয়াছিলেন। কিন্তু তখনকার মার্জ্জিতরুচি ইংরেজগণ ইহার একটি কবিত্বপূর্ণ নাম দিয়াছিলেন—"Web of woven air" অর্থাৎ বাতাসের সূতায় তৈরী বাতাসের জাল।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের "Illustrated London News" নামক বিখ্যাত পত্রিকার এক সংখ্যায় এই "বাতাসের জাল" বুনিবার প্রক্রিয়া বিলাতের তাঁতিদের বুঝাইবার জন্য এক সচিত্র বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। ৮৫ বৎসর পূর্ব্বে একজন বস্ত্র ব্যবসায়ী ইংরেজ বণিক তুলা নির্ব্বাচন হইতে আরম্ভ করিয়া বস্ত্র-বয়ন পর্য্যন্ত সমস্ত প্রক্রিয়াটির সূক্ষ্মতম অংশের এমন বিশদ বিবরণ দিতে পারিয়াছেন যে তাঁহার অনুসন্ধিৎসা ও পর্য্যবেক্ষণ শক্তির কথা ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। তাঁহার প্রবন্ধের মর্ম্ম বুঝাইয়া দিবার জন্য তিনি যে ১২টি চিত্র সংযোজিত করিয়া দিয়াছিলেন তাহা এই প্রবন্ধের সহিত প্রকাশিত হইল। ৮৫ বৎসর পূর্ব্বে ঢাকায় কি পদ্ধতিতে সূতা কাটা ও বস্ত্রবয়ন হইত তাহার একটা উজ্জ্বল ছবি এই চিত্রগুলিতে



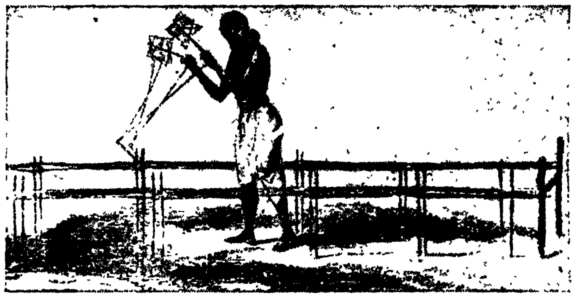
টাকুতে সূতা কাটা

পাই। শুধু তাহাই নহে, তখনকার দিনের ঢাকার সাধারণ লোকের কাপড় পরিবার ও কেশ-প্রসাধন ইত্যাদিরও একটা আভাস আমরা পাই।

এমন অতি সাধারণ মোটা যন্ত্রপাতি দ্বারা কেমন করিয়া এত সূক্ষ্ম "বাতাসের জাল" বুনিতে পারা যাইত, তাহা ভাবিবার বিষয়। উক্ত ইংরেজ লেখক লিখিয়াছেন 'The general idea as to this wonderful manufacture is, that it is produced at random and with the rudest tools—that the Indian is guided by a kind of instinct in its make, and is but a rough and careless-fingured worker. We are told of the weaver cleaning his cotton with a piece of fish bone, using as a spindle—a hollow reed hanging up his loom by a riverside between two trees digging a hole in the ground for his legs, and there weaving forth those moon-cloud webs that queens of old were proud to wear." অর্থাৎ অনেকে মনে করেন এই আশ্চর্য্যজনক বস্তুটি প্রস্তুত করিতে ভারতীয় তাঁতিরা যদৃচ্ছাক্রমে কার্য্যটি করিয়া যায়, তাহাতে না আছে কোন নিয়ম, না আছে কোন পদ্ধতি। তাহাদের যন্ত্রপাতি অত্যন্ত সাদাসিধে সেকেলে রকমের এবং তাহাদের আঙ্গুল চলে অতি অসতর্কতার সহিত। তাহারা আপন স্বভাববশেই এমন চমৎকার বস্ত্র বুনিয়া যায়। আমরা শুনিয়াছি তাহারা মাছের কাঁটা দিয়া তুলা পরিষ্কার করে, একটা নল দিয়া টাকুর কাজ সারিয়া লয়, নদীর ধারে দুইটা গাছের মাঝখানে তাঁত খাটাইয়া, পা-দুটি মাটীর গর্ত্তে রাখিয়া এমন "জ্যোৎস্নায় জাল" বুনিয়া ফেলে যে তাহা রাণীদের মন কাড়িয়া লয়।



ধনুক



টানা দেওয়া



লাটাই-এ সূতা জড়ান

৮৫ বৎসর পূর্ব্বে ইংরেজ লেখকটি অতঃপর যাহা লিখিয়াছেন তাহার উল্লেখযোগ্য অংশের সারমর্ম্ম নিম্নে দেওয়া গেল :—

"উক্ত বিবরণটি আংশিক সত্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য নহে। হিন্দু তাঁতিরা যদৃচ্ছাক্রমে কাপড় বুনে না। যেমন সর্ব্ববিষয়ে তেমনি এই কার্য্যেও তাহারা প্রত্যেকটি প্রক্রিয়ার সূক্ষ্মতম অংশে পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ মনোযোগ প্রদান করে এবং বস্তুটি প্রস্তুত করিবার সময় যে-যে অবস্থায় ইহার উৎকর্ষ সাধিত হয় সেই সেই অবস্থার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে। যুগ যুগান্তর হইতে আগত পদ্ধতিতে ধীরে ধীরে কাজ করিয়া তাহাদের এমন একটা কাণ্ড জ্ঞান জন্মিয়াছে যে তাহা অব্যর্থ। কেননা, সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম পণ্যের তালিকার মধ্যে মসলিনের উল্লেখ পাওয়া যায়; ঋক্‌বেদেও তাঁতে কাপড় বুনার কথা উক্ত আছে; গ্রীক্ পণ্ডিত হেরোডোটাস্‌ও ভারতবর্ষের কথা বলিতে গিয়া বলিয়াছেন, 'ঐ দেশের বনজ বৃক্ষের ফলে এক রকম পশম জন্মে—যাহা ভেড়ার লোম হইতেও সুন্দর ও উৎকৃষ্ট এবং ভারতবাসীরা তাহা হইতে কাপড় প্রস্তুত করে।'

"হিন্দু তাঁতিরা যে তুলা হইতে সূক্ষ্মতম মসলিন প্রস্তুত করে, সেই তুলা খুব ভাল নহে। ম্যান্‌চেস্টারের অভিজ্ঞ তাঁতিরা বলেন যে ভারতবর্ষের তুলার আঁস মোটা ও খাটো; ইহা দ্বারা মিহি কাপড় প্রস্তুত হইতে পারে না; মিহি কাপড় বুনিতে হইলে মার্কিন তুলার প্রয়োজন হয়। কিন্তু মার্কিন তুলার চাষ ও সংগ্রহ করিতে যে যত্ন লওয়া হয়, ভারতবাসীরা ভারতবর্ষের মোটা আঁসের তুলার চাষ করিতে ও সংগ্রহ করিতে তেমন যত্ন লয় না। তবু এই অযত্নসৃষ্ট ও অযত্ন সংগৃহীত তুলা হইতেই হিন্দু তাঁতিরা সূক্ষ্মতম সূতা কাটিতে পারে। তাহারা জানে যে ঢাকার পূর্ব্বাঞ্চলে যে তুলা জন্মে সেই তুলা যে সময়ে গাছ হইতে লওয়া হয়, সেই সময়েই তাহার ব্যবহার করিতে হয়। নতুবা তাহা পরিষ্কার করিবার সময় ফাঁপিয়া উঠিবে না। এই ফাঁপিয়া-ওঠা-না-ওঠা দ্বারা তুলা ভাল কি মন্দ নিরূপিত হইত এবং কলে সূতা কাটার পক্ষে লম্বা-আঁসের তুলা যেমন উপযোগী, অঙ্গুলিদ্বারা সূতা কাটার পক্ষে ছোট আঁসের তুলা তেমনি উপযোগী।

"পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে তুলা যত্নের সহিত সংগৃহীত না হওয়ায় পাতা বা বোঁটার ছিন্ন অংশ থাকিয়া যায়। ইহা প্রথমে অঙ্গুলি দ্বারা ছাড়ান হয়। পরে বীচি ছাড়াইবার জন্য আঁচড়াইয়া লওয়া হয়। এই কাজের জন্য ঢাকার তাঁতিরা বোয়াল মাছের চোয়ালের কাঁটা ব্যবহার করে (১ম চিত্র)। এই মাছ বাংলা দেশে প্রচুর পাওয়া যায় এবং ইহার চোয়ালের কাঁটায় খুব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম দাঁত আছে। তাহা চিরুণীর মত কাজ করে এবং তুলার মধ্যে মোটা আঁস কিম্বা ধুলাবালি যাহা থাকে তাহা আঁচড়াইয়া সহজে বাহির করিয়া ফেলে।"

তারপর, মসলিনের জন্য মিহি সূতা প্রস্তুত করিতে কি করিয়া তুলা বুনিতে হয় তাহার বিবরণ দিতে গিয়া লেখক লিখিয়াছেন "একটা ছোট, নরম ও সরু ধনু ব্যবহার করা হয়। একটা বাঁশের সরু ছিলেতে চামড়ার

সূক্ষ্ম তন্তু কিম্বা রেশমের বা কলাগাছের সূতায় প্রস্তুত সরু জ্যা লাগাইয়া ধনু তৈয়ার করা হয়। (২নং চিত্র)

সূতা কাটার বিষয় বলিতে গিয়া লেখক লিখিয়াছেন, "মিহি সূতা কাটার কাজ সম্পূর্ণরূপে স্ত্রীলোকেরাই করিয়া থাকে। তাহাদের বয়স



লাটাই-এ সূতা জড়ানর অপর পদ্ধতি

সচরাচর ৩০এর বেশী নহে। তাহাদের অঙ্গের কমনীয়তা এবং অঙ্গুলির সূক্ষ্ম স্পর্শানুভূতির জন্যই তাহারা এমন অননুকরণীয় কৌশল প্রদর্শন করিতে পারে—it is to their delicate organisation and exquisite sensibility of touch that is due to the inimitable specimens of their skill." (৩য় চিত্র)। বলা বাহুল্য যে একটা অতি সাধারণ টাকুতেই এমন মিহি সূতা কাটা যাইতে পারিত। 'বাংলার তাপ সাধারণতঃ ৮২ ডিগ্রি। সুতরাং বায়ুতে যথোপযুক্ত সিক্ততা রক্ষার জন্য জলের উপর মাঝে মাঝে সূতা কাটা হয়।'

৮৫ বৎসর পূর্ব্বের লেখক, তারপর তাঁতে বস্ত্রবয়নের ক্রমিক প্রক্রিয়াগুলির বিশদ বর্ণনা দিয়া প্রবন্ধ শেষ করিয়াছেন। এই বর্ণনায় অনেক পারিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, সুতরাং ইহা সাধারণ পাঠকের চিত্তাকর্ষক হইবে না। এই প্রক্রিয়াগুলিও এই প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত চিত্রগুলি ইহাতেই পরিস্ফুট হইবে; কেননা তাহা অনেকেরই দেখা ও জানা আছে; বর্ত্তমান কালেও চিত্রে প্রদর্শিত পদ্ধতিতেই পল্লীগ্রামে কাপড় প্রস্তুত করা হইয়া থাকে।

৮৫ বৎসর পূর্ব্বেও ঢাকায় মসলিন তৈয়ারী হইত, ইহা উক্ত ইংরেজ

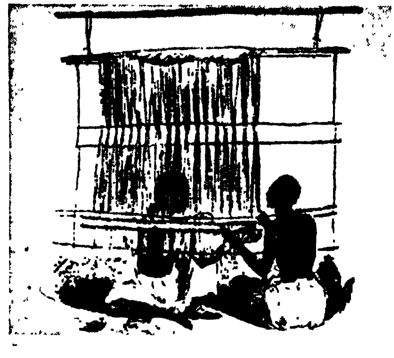


সূতা পাকান

লেখকের প্রবন্ধ হইতে বুঝিতে পারি। ইহার পরেও হয়ত মসলিন তৈয়ার হইয়াছে; কিন্তু এখন আর হয় না। ঢাকাই জামদানি ও অন্যান্য নানারকমের মিহি সূতার শাড়ী আজকাল প্রস্তুত হয়; কিন্তু এই সকল শাড়ী বুনিতে যে সূতা লাগে তাহা মিলের তৈরী সূতা। মিলের সূতা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বিলাত হইতে আসিত; বর্ত্তমানে বিলাতী, জাপানী ও দেশীয় মিলের সূতা ব্যবহৃত হয়।

যখন দেশে খদ্দরের ঢেউ চলিতেছিল, তখন হাতের কাটা মোটা সূতার খদ্দরের নানাপ্রকার শাড়ী ঢাকায় প্রস্তুত হইয়াছিল। তখন খদ্দরের জামদানি শাড়ী প্রস্তুত হইত; কিন্তু তাহাও কৃত্রিম খদ্দর বলিয়া লোকে বলিত: অর্থাৎ মিলের মোটা সূতাকে জলে চোবাইয়া রাখিয়া পরে ইহাকে পেটাইয়া আরও ফুলাইয়া লওয়া হইত; তাহাতে সূতা দেখিতে হাতে কাটা মোটা সূতারই মত হয়। নিছক প্রবঞ্চনা বৈ কি!

অদৃষ্টের কি পরিহাস! যে-স্থানে এক সময়ে মেয়েরা সামান্য একটা টাকু দিয়াই সাত কি আট ছটাক মোটা ও খাটো আঁসের দেশী তুলাতে ২৫০ মাইল লম্বা সূতা প্রস্তুত করিতে পারিত, সেস্থানে খদ্দর প্রস্তুত করার মত মোটা সূতা পর্য্যন্ত, এমন কি মিশরের কিম্বা আমেরিকার লম্বা আঁসের তুলাতেও আজকাল প্রস্তুত হয় না। মনে পড়ে ১৯৩০ সালের "আইন-ভঙ্গ" আন্দোলনের সময় ঘরে ঘরে চরকার সহিত টাকুও চলিয়াছিল। ট্রামে, বাসে, রেলে, রাস্তাঘাটে, সর্ব্বত্র টাকু, টাকু, আর টাকু!!! ছেলে, মেয়ে, যুবক-বৃদ্ধ সকলের হাতেই একটা টাকু ও দু-এক গাছি তুলা!!! আর দোকানে দোকানে বাংলার বাহির হইতে আমদানী পেঁজা তুলার সুদীর্ঘ লতানো গোছাগুলি ক্রেতৃগণকে আহ্বান করিত! "কি তুলা হে?" "আজ্ঞে, ওয়ার্দ্ধা কটন।" এই তো ছিল

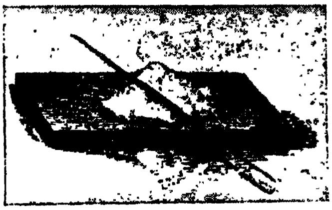


"নলি" ভরা

ক্রেতা-বিক্রেতার বুলি। তারপর? "আরে একেবারে পচা যে!" এই বলিয়া সেই প্রসিদ্ধ "ওয়ার্দ্ধা কটন" সকলে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। পরে দেশের লোকের চৈতন্যোদয় হইল যে বাংলার ত্রিপুরা পাহাড়ের টাট্‌কা তুলাতেই উত্তম খদ্দরের সূতা তৈয়ার হইতে পারে। চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরার পাহাড়ের তুলাতেই এক সময়ে মসলিন প্রস্তুত হইত। এখন এই তুলায় মোটা খদ্দর প্রস্তুত করিতেও আটকায়। ইহাও অদৃষ্টের পরিহাস। শুনিতে পাই বর্ত্তমানে বাংলার খদ্দরে "ওয়ার্দ্ধা কটন" ব্যবহৃত হয়।

এই সঙ্গে আর একটা কথা মনে পড়ে। যখন হাতের কাটা মোটা সূতায় প্রস্তুত সুন্দর সুন্দর শাড়ী বাংলার ভদ্র মহিলারা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তখন একদল অর্থনীতিবিদ ধুয়া উঠাইয়াছিলেন যে ঢাকা, করাসডাঙ্গা ও শান্তিপুরের তাঁতিকুলের অন্ন গেল, মিহি সূতার বস্ত্রশিল্প উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে, তাহাদের উদ্ধারকল্পে মিলের সূতায়, এমন কি বিলাতী সূতায় প্রস্তুত তাঁতের কাপড় চালাইতে হইবে। এইরূপ উপদেশে খদ্দরশিল্পের প্রভূত ক্ষতিই হইয়াছে। এই অর্থনীতিবিদগণের প্রধান যুক্তি ছিল এই যে, হাতের তাঁতে চরকা বা

টাকুর সূতা টিকে না—তাহাতে টানার কাজ চলে না। এই যুক্তির উত্তরে ত' লক্ষ লক্ষ টাকার খদ্দর বাজারে চলিতেছে। মসলিন প্রস্তুত করার জন্ত হাতের কাটা সূতাতেই টানা দেওয়া হইত। ফরাসডাঙ্গা, শান্তিপুর ও আধুনিক ঢাকাও চেষ্টা করিলেই চরকা বা টাকুর সূতায় মিহি কাপড় প্রস্তুত করিতে পারে।



তুলা পাঁইজ করার যন্ত্র

আসল কথা হইল এই, বংশানুক্রমে যে সকল তাঁতী তাঁত চালাইতেছে, তাহারা যদি দেশীয় তুলা হইতে চরকা বা টাকুতে কাটা সূতায় কাপড় বুনিতে আরম্ভ করে, তবে দেশের কাটুনিরাও ক্রমে ক্রমে মিহি হইতে আরও মিহি সূতা কাটার কৌশল ও শক্তি অর্জ্জন করিবে। গত কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে জানা যায় যে পূর্ব্বের চেয়ে দৃঢ়তর ও সূক্ষ্মতর সূতা দেশের কাটুনিরা কাটিতে সমর্থ হইতেছে। দক্ষিণাপথে বিশেষতঃ বেজওয়াদায় খুব মিহি সূতার খদ্দর প্রস্তুত হয় এবং সেই বস্ত্র বেশী মূল্যেই বিক্রীত হয়। বাংলায় এ বিষয়ে কিছুটা অগ্রগতির সূচনা দেখা যাইতেছে।

কিন্তু ঢাকার মসলিন-শিল্পের পুনরুদ্ধার হইবে কি না সন্দেহ। সেদিন কি আবার আসিবে?

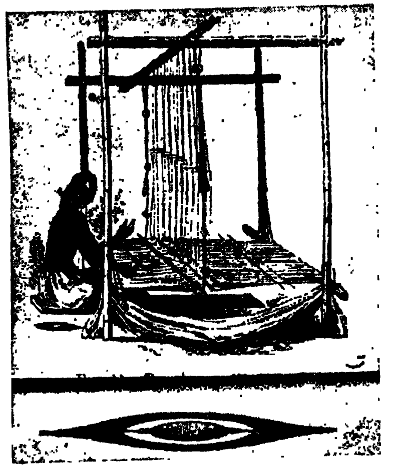
সেদিন আবার আসিতে পারে, যদি ঘরে ঘরে ঘরকন্নার অন্যান্য কাজের মতই আবার সূতাকাটা আরম্ভ হয়। ইহাতে অর্থের দিক দিয়া লাভ হউক বা না হউক, শুধু শিল্পের দিক দিয়া বিবেচনা করিয়া চরকা চালাইয়া গেলেও, অন্ততঃ নৈতিক দিক দিয়া তো কতকটা লাভ আছে। আমাদের গৃহলক্ষ্মীরা যদি রুটিন্ করিয়া দৈনন্দিন ঘরকন্নার কাজ করেন, তবে মধ্যাহ্নে না ঘুমাইয়া অন্ততঃ দুই ঘণ্টাকাল প্রত্যহ সূতা কাটিতে পারেন।

মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন, "It (handspinning) will save our women from forced violation of their purity. It will, as it must, do away with begging as a means of livelihood. It will remove our enforced idleness. It will steady the mind. And I verily believe that when millions take it as a sacrament, it will turn our faces Godward. This is the moral aspect of spinning." অর্থাৎ "হাতে সূতা কাটিলে আমাদের মেয়েদের পবিত্রতা রক্ষিত হইবে। ইহাতে জীবিকার জন্য ভিক্ষাবৃত্তি বন্ধ হইবে। বিনাকাজে বসিয়া থাকিতে হইবে না। ইহা মনের একাগ্রতা আনয়ন করিবে এবং আমার নিশ্চিত বিশ্বাস এই যে লক্ষ লক্ষ লোক যদি ইহাকে একটি মহাব্রতরূপে গ্রহণ করে, তবে ইহা আমাদিগকে ঈশ্বরাভিমুখী করিয়া দিবে। ইহাই চরকায় সূতা কাটার নৈতিক দিক।"



টানা দেওয়া

এই নৈতিক দিকটা আমার প্রবন্ধের মূল বক্তব্যের পক্ষে অবান্তর হইলেও, ইহার উল্লেখ করিলাম এই জন্য যে—কোন বড় কাজ সম্পন্ন করিতে হইলে তাহা নৈতিক ভিত্তির উপর না দাঁড়াইলে সুসম্পন্ন হয় না। চরকার সাহায্যে যদি বাংলার সূক্ষ্মবস্ত্রশিল্পের তথা ঢাকাই মসলিন-শিল্পের পুনরুদ্ধার করিতে হয়, তবে মিহি সূতা কাটার কৌশলটি আয়ত্ত করিতে হইবে। তাহা করিতে হইলে নিত্য অভ্যাসের প্রয়োজন। সেই অভ্যাস করিতে হইলে সূতাকাটা ধর্ম্মজ্ঞানেই করিতে হইবে এবং মহাত্মাজীর



তাঁতে বুনা ও (নীচে) মাকু

এই উপদেশটি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতে হইবে। ঠাকুর ঘরের পূজার মত, চরকায় সূতা কাটাকে নিত্যকর্ম্মে পরিণত করিতে হইবে।



গীতাঞ্জলির মূলকথা

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

যে বাধা বিশ্বজীবনের বিপুলতা থেকে আমাকে বিচ্ছিন্ন ক'রে রেখেছে তাকে অতিক্রম করা সহজ নয়। এই বাধা হচ্ছে 'আমি'র বাধা। আমি 'আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া ঘুরে মরি পলে পলে।' আমার চেতনা বিশ্বের সর্ব্বত্র আলোর মত ছড়িয়ে পড়তে পারছে না, কারণ তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে আমার সর্ব্বগ্রাসী 'আমি'। আমার আসক্তি আমার চোখে ঠুলি পরিয়ে রেখেছে—কাঞ্চনে আসক্তি, নারীদেহে আসক্তি, খ্যাতিতে আসক্তি, পুত্র-কন্যা-পরিবারে আসক্তি। এই আসক্তির ঠুলি আমার চোখের সামনে সব সময়ের জন্য ঝুলছে ব'লে আমি বিশ্বকে আত্মীয়রূপে আমার মধ্যে গ্রহণ করতে পারছিনে, তার বিচিত্র রূপকে আমার চোখ দেখেও দেখছে না, তার বিচিত্র সঙ্গীতও আমার কান শুনেও শুনছে না, আমার চেতনায় এই বিপুল শ্যামল ধরা মিথ্যা হয়ে আছে। বিশ্বের সঙ্গে আমার আত্মার সম্পর্ক এত শিথিল ব'লেই আমি আনন্দ পাচ্ছিনে। আনন্দের জন্যই মানুষ তৈরী হয়েছে—man is meant for happiness. আনন্দকেই আমি খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছি—তারই জন্য আমি ক্রমাগত উপকরণের পর উপকরণ জমিয়ে তুলছি, অনবরত বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে ছুটাছুটি করছি। Forgetful of his true self he becomes a self-seeker among shadows. ছায়া দিয়ে কখনো প্রাণের শূন্যতা পূর্ণ হয়? উপকরণের পর উপকরণই শুধু জমে উঠছে, কিন্তু হৃদয়ের হাহাকার কিছুতেই ঘুচছে না। যক্ষপুরীর রাজার মতো আমাদের দীনহীন মন কেবলই কাঁদছে: 'আমি তপ্ত, আমি রিক্ত, আমি ক্লান্ত।' আসলে দুঃখের কারণ জীবনের উপকরণরাশির দৈন্যের মধ্যে ততখানি নয়, যতখানি জীবনের তাৎপর্য্যকে বুঝতে না পারার মধ্যে, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়: The abiding cause of all misery is not so much in the lack of life's furniture as in the obscurity of life's significance, চতুরঙ্গের শচীশের ভাষায়: 'আমরা বদ্ধ, সেইজন্য আমাদের আনন্দ মুক্তিতে। এ কথাটা বুঝি না বলিয়াই আমাদের যত দুঃখ।' ঠিক এই ভাবেরই কথা রয়েছে Religion of Manএ: As in the world of art, so in the spiritual world, our soul waits for its freedom from the ego to reach that disinterested joy which is the source and goal of creation. আনন্দ থেকে এই সৃষ্টি, আনন্দের পানেই এই সৃষ্টির গতি। সেই আনন্দে পৌঁছানোর জন্যই আমাদের আত্মা মুক্তিকে চাইছে—'আমি' থেকে মুক্তি। The crossing of the limit produces joy. 'আমি'র গণ্ডীকে অতিক্রম করতে পারলেই আমার আনন্দ। তখন আমি যুক্ত হচ্ছি প্রেমে সকলের সঙ্গে, তখন আমার ও জগতের মধ্যে আর কোন আড়াল নেই। আমাদের প্রতিদিনের উপাসনার এবং ধ্যানের মন্ত্র হচ্ছে যা-কিছু আমাকে বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে তাকে জয় করবার জন্য। এই জন্যই যুগে যুগে কবিরা এসে মানুষের কানে ঘোষণা করেছেন:

Whoever you are, come forth! or man or woman come forth!

You must not stay sleeping and dallying there in the house, though you built it or though it has been built for you.

Out of the dark confinement! Out from behind the screen! (Leaves of Grass—Whitman)

তুমি যে-কেউ হওনা কেন, বেরিও এসো! তুমি নারীই হও অথবা পুরুষ হও, চলে এসো!

ঘরের মধ্যে ঘুমিয়ে থাকতে পারবে না তুমি! ঘর তুমি নিজেই তৈরী ক রে থাকো, অথবা তোমার জন্য কেউ তৈরী ক'রে থাকুক—ওর মধ্যে তোমার থাকা চলবে না।

বন্দীশালার অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসো! পর্দ্দার অন্তরাল থেকে বেরিয়ে এসো!

মুক্ত পথের বুকে যেখানে জীবন সহস্রধারায় ছুটে চলেছে দিকে দিকে, যেখানে প্রাণের মহোৎসব, মানুষের শোভাযাত্রা—সেখানেই তো আনন্দ! সেখানে 'আমি'র মধ্যে বন্দী হয়ে আছি বৃহৎ জগতের আহ্বানকে উপেক্ষা ক'রে, সেখানে সমস্ত আমোদ-প্রমোদ, নৃত্য-গীত, আহার-বিহার, অশনভূষণ এবং বেশ-ভূষার মধ্যে একটা গোপন আত্মগ্লানি ও নৈরাশ্য আমার জীবনকে কুরে কুরে খাচ্ছে। এই আত্মগ্লানি এবং নৈরাশ্যকে বাহিরের হাসির ছটা দিয়ে অন্যের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা যেতে পারে, স্বামী স্ত্রীর কাছে অথবা স্ত্রী স্বামীর কাছে একে ব্যক্ত করতে না পারে—তবুও এর অস্তিত্ব অত্যন্ত সত্য। খ্যাতনামা আমেরিকান ঔপন্যাসিক সিনক্লেয়ার লুইস্ ব্যাবিট (Babbit) উপন্যাসে ব্যাবিটের মনের যে চেহারা এঁকেছেন তার মধ্যে আমরা আবিষ্কার করি—সভ্য মানবের ক্লান্ত চিত্তের এই করুণ নিঃসঙ্গতাকে। ঘরে সুন্দরী স্ত্রী, রেডিয়ো, পুত্রকন্যা, সভ্যতার রুচিসঙ্গত নানারকমের আসবাব, কিন্তু সমস্ত উপকরণরাশির মধ্যে ব্যাবিটের নিঃসঙ্গ হৃদয়ে একটা করুণ হাহাকার। বিশ্বজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন রিক্তচিত্তের এই বেদনাকে হুইটম্যান বলেছেন: A secret silent loathing and despair.

শূন্য হৃদয়ের এই হাহাকারকে ঘুচাতে পারে শুধু জীবনের প্রাচুর্য্য। সবাইকে আত্মীয়রূপে জীবনে স্বীকার ক'রে নিতে হবে, বৃহৎ জীবনের পানে ইন্দ্রিয়ের এবং অনুভূতির সমস্ত বাতায়ন খোলা রাখতে হবে—নইলে আনন্দ কিছুতেই পাবো না। ভূমার মধ্যেই আমাদের সুখ, অল্পে আমাদের আনন্দ নেই। যে অনন্তকে আমরা আমাদের মধ্যে বহন ক'রে চলেছি—তাকে আমরা অস্বীকার করতে পারি বারম্বার। কিন্তু একথা

যদি মনে করি, আকাশ-জল-বাতাস-আলোকে অস্বীকার ক'রে, চারিদিকের অসংখ্য মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে কৃপণের মতো বেঁচে সুখ পাবো তবে ঠকতে হবে পদে পদে, কারণ আমার মধ্যে অনন্তের জন্য যে ক্ষুধা আছে সেই ক্ষুধা আমাকে অন্নের মধ্যে কখনো সুস্থির হ'য়ে থাকতে দেবে না।

আমার চিত্তগগন থেকে
তোমায় কেউ যে রাখবে ঢেকে,
কোন মতেই সইবে না সে
বারে বারেই জেনেছি!

গীতাঞ্জলিতে যে কান্না কবির কণ্ঠ থেকে বারে বারে বেরিয়ে এসেছে সে হচ্ছে সকলের সঙ্গে প্রেমে যুক্ত হবার জন্য মানব-হৃদয়ের গভীরতম কান্না। ধনে জনে আমরা যতই জড়িয়ে থাকি নে কেন—এই কান্নার বিরাম নেই।

যেথায় তোমার লুট্ হতেছে ভুবনে
সেইখানে মোর চিত্ত যাবে কেমনে।
সোনার ঘটে সূর্য্য তারা
নিচ্ছে তুলে আলোর ধারা,
অনন্ত প্রাণ ছড়িয়ে পড়ে গগনে।
সেখানে মোর চিত্ত যাবে কেমনে।

অথবা

এই মোর সাধ যেন এ জীবন মাঝে
তব আনন্দ মহাসঙ্গীতে বাজে।
তোমার আকাশ, উদার আলোকধারা,
দ্বার ছোটো দেখে ফেরে না যেন গো তা'রা,
ছয় ঋতু যেন সহজ নৃত্যে আসে
অন্তরে মোর নিত্য নূতন সাজে।

অন্তরের মধ্যে সমস্ত প্রকৃতিকে সাদরে গ্রহণ করবার যে সাধ—তারই অভিব্যক্তি গীতাঞ্জলির কবিতার পর কবিতায়। অঙ্গে এবং মনে এমন কোনো আবরণ যেন না থাকে যাতে জগতের সঙ্গে আত্মার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হবার পথে বাধা আস্তে পারে।

বাতাস জল আকাশ আলো
সবারে কবে বাসিব ভালো,
হৃদয় সভা জুড়িয়া তা'রা
বসিবে নানা সাজে।

একই কান্না!

আছি রাত্রি দিবস ধ'রে
দুয়ার আমার বন্ধ ক'রে,
আসতে যে চায় সন্দেহে তায়
তাড়াই বারে বারে।
তাই তো কারো হয় না আসা
আমার একা ঘরে।
আনন্দময় ভুবন তোমার
বাইরে খেলা করে।

এই যে আনন্দময় বৃহৎ ভুবন তার অরণ্য-গিরি-পুষ্প-তারকা-সমুদ্র-প্রান্তর নিয়ে লেখা রয়েছে—তাদের অন্তরে গ্রহণ করতে পারছি নে—এ বিচ্ছেদের ব্যথা গীতাঞ্জলির বহু কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে।

এমনি ক'রে চলতে পথে
ভবের কূলে
দুইধারে যা ফুল ফুটে সব
নিস্ রে তুলে।
সেগুলি তোর চেতনাতে
গেঁথে তুলিস্ দিবস রাতে,
প্রতি দিনটী যতন ক'রে
ভাগ্য মানি
নে রে, ও মন, নে রে আপন
প্রাণে টানি।

জীবনের পথে চলেছি। দিনের পর দিন আসছে কত রং নিয়ে, কত গন্ধ নিয়ে, কত সুধা নিয়ে। রাত্রির পর রাত্রি আসছে আকাশে অসংখ্য তারার প্রদীপ জ্বেলে। এদের কাউকে যেন অস্বীকার না করি। চেতনার আলো যেন সকলের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে। প্রতিটী দিনকে যেন সাদরে প্রাণের মধ্যে বরণ ক'রে নিতে পারি, দুয়ার বন্ধ দেখে কেউ যেন ফিরে না যায়!

নয়ন দুটি মেলিলে কবে
পরাণ হবে খুসি,
যে পথ দিয়া চলিয়া যাবো
সবারে যাবো তুষি।

I think whatever I shall meet on the road
I shall like and whoever beholds me shall
like me,
I think whoever I see, must be happy.

রবীন্দ্রনাথের বাংলা কবিতা এবং হুইট্ম্যানের ইংরেজী কবিতা একই সুরে বাঁধা। সকলকে যে খুসি করতে পারছিনে—তার কারণ নিজেকে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারছিনে। নিজেকে 'আমির' কারাগারে বেঁধে রেখেছি—আমার চেতনার আলোয় যেটুকু স্থান আলোকিত হয়ে আছে তা নিতান্তই অল্প। তার বাইরে যারা আছে তারা অন্ধকারে রয়েছে। তাদের উপরে আমার চেতনার আলো পড়ছেনা। তাই তাদের সম্বন্ধে আমি উদাসীন। তাই তারা থেকেও আমার কাছে না থাকারই সামিল। তাদের ও আমার মধ্যে যে দরজা রয়েছে তার কপাট বন্ধ। তাদের স্বীকার করছিনে ব'লেই আমাকে দেখে তাদের মন খুসীতে ভরে উঠ্ছেনা। তারা আমার কাছে বেতনভুক ভৃত্য, নয়তো একজন প্রতিবেশী মাত্র—তার বেশী কিছু নয়। তাদের মধ্যে যা পবিত্র, যা সুন্দর, যা মহৎ তার কোনো অস্তিত্ব নেই আমার কাছে। এক কথায় প্রেমে তাদের সঙ্গে আমি যুক্ত নই, আর এই জন্যই আমি চারিদিকের মানুষগুলির মনে আনন্দের তরঙ্গ তুলতে পারছিনে। আমার নিজের প্রাণও খুসী হ'তে পারছেনা।

গীতাঞ্জলিতে একদিকে যেমন প্রকৃতিকে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করবার জন্য ব্যাকুলতা, আর একদিকে তেমনি বৃহৎ মানব-সমষ্টিকেও প্রেমের মধ্যে স্বীকার ক'রে নেবার জন্য প্রার্থনা।

আমার একলা ঘরের আড়াল ভেঙে
বিশাল ভবে
প্রাণের রথে বাহির হ'তে
পারবো কবে ?
প্রবল প্রেমে সবার মাঝে
ফিরবো ধেয়ে সকল কাজে,
হাটের পথে তোমার সাথে
মিলন হবে,
প্রাণের রথে বাহির হ'তে
পারবো কবে ?

ভগবান তো উদাসীন স্রষ্টা নন, নীরো যেমন দূর থেকে জ্বলন্ত রোমকে দেখ্‌ছিলো—তিনি তো তেমন ক'রে দূরে দাঁড়িয়ে নির্ব্বিকার চিত্তে তাঁর সৃষ্টিকে দেখ্‌ছেন না। তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে তিনি যে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছেন। বৃহৎ জগৎ থেকে বিমুখ হ'য়ে কেবল দেবালয়ের কোণে নিজের মনে তাঁকে যদি ধরতে যাই—তিনি তো ধরা দেবেন না।

মুক্তি ? ওরে মুক্তি কোথায় পাবি ?
মুক্তি কোথায় আছে ?
আপনি প্রভু সৃষ্টি বাঁধন প'রে
বাঁধা সবার কাছে।

বিশাল সংসারে যেখানে দিকে দিকে সহস্র ধারায় কর্ম্মের স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে, চাষী যেখানে মাটি ভেঙে চাষ করছে, মজুর যেখানে পাথর ভেঙে পথ গড়ছে, যেখানে দিবানিশি উঠেছে বিশ্বজনের কলরব, সেইখানে তিনি রয়েছেন।

তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে
করছে চাষা চাষ—
পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ,
খাটছে বারো মাস।

অতএব বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে ঘরের কোণে ব'সে থাকার কোনো মানে হয় না। তিনি যে অভ্রভেদী রথে রাজপথে চলেছেন সকলের মাঝখান দিয়ে। তাঁর হাতে জীবনের জয়শঙ্খ।

উড়িয়ে ধ্বজা অভ্রভেদী রথে
ঐ যে তিনি ঐ যে বাহির পথে।
আয়রে ছুটে টান্‌তে হবে রসি,
ঘরের কোণে রইলি কোথায় বসি ?
ভিড়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে গিয়ে
ঠাঁই ক'রে তুই নে রে কোনো মতে।

এখানে ফুলের ডালি আর ধ্যান ধারণাকে দূরে রেখে ভিড়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়্‌বার আহ্বান কবির কণ্ঠ থেকে উৎসারিত হয়েছে।

মানুষের ভিড়কে যদি অস্বীকার করি, কর্ম্মের আহ্বানে যদি সাড়া না দিই, উন্মুক্ত অম্বরতলে, ধূসরপ্রসর রাজপথে, জনতার মাঝখানে যদি ভগবানকে পাবার চেষ্টা না করি—তাঁকে কোথাও পাবোনা—কতবার কত সুরেই না কবি এই কথা তাঁর কর্ম্মবিমুখ ভাববিলাসী জাতির কর্ণে বজ্রগর্জ্জনে ঘোষণা করলেন! 'শুনবো বাণী বিশ্বজনের কলরবে', 'নিয়ত মোর চেতনা পরে রাখো আলোয় ভরা উদার ত্রিভুবন', 'বিশ্বজনের পায়ের তলে ধূলিময় সে ভূমি সেইতো স্বর্গ ভূমি', 'যখন আমি পাবো তোমায় নিখিল মাঝে সেইখনে হৃদয়ে পাবো হৃদয়রাজে', 'সবার যেথায় আপন তুমি, হে প্রিয়, সেথায় আপন আমারো'—এই সমস্ত লাইনের মধ্যে একটী কামনাই বারে বারে ব্যক্ত হয়েছে—আর সেই কামনা হচ্ছে—প্রেমে সমস্ত মানুষের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করবার কামনা। বসন্ত এসেছে দিকে দিকে জীবনের বার্ত্তা কণ্ঠে নিয়ে। তাকে যেন স্বীকার করি, জীবনকে যেন অবগুণ্ঠিত ক'রে না রাখি, চেতনাকে যেন দিকে দিকে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারি।

আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে
তব অবগুণ্ঠিত কুণ্ঠিত জীবনে
কোরোনা বিড়ম্বিত তারে।
আজি খুলিও হৃদয় দল খুলিয়ো,
আজি ভুলিও আপন পর ভুলিয়ো,
এই সঙ্গীত মুখরিত গগনে
তব গন্ধ তরঙ্গিয়া তুলিও।

মানুষের হাট থেকে দূরে, একান্তে কেবল নিজের মনের ধ্যানের মধ্যে অন্তরের বিজন ছায়ায় ভগবানকে দেখা—সে দেখা যে স্বপ্ন দেখা! জীবনের কুরুক্ষেত্রে সহস্র সহস্র মানুষের মাঝে ভগবানের হাতে যেখানে কর্ম্মের শঙ্খনিনাদ—সেইখানে তাঁকে দেখবার জন্য কবির হৃদয় বারে বারে প্রার্থনা জানিয়েছে।

ভেবেছিলাম বিজন ছায়ায়
নাই যেখানে আনাগোনা
সন্ধ্যাবেলায় তোমায় আমায়
সেথায় হবে জানাশোনা।
অন্ধকারে একা একা
সে দেখা যে স্বপ্ন দেখা,
ডাকো তোমার হাটের মাঝে
চলছে যেথায় বেচাকেনা।

মানুষের মধ্যেই তো ভগবান। যেখানে মানুষকে আমরা ঘৃণায় অস্পৃশ্য ক'রে রাখি সেখানে ভগবানকেই আমরা ঘৃণা করি।

মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে
ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে।

যেখানে অহঙ্কারে স্ফীত হ'য়ে আমরা দীন হীন অস্পৃশ্য যারা তাদের কাছ থেকে দূরে স'রে থাকি—সেখানে আমাদের প্রণাম কখনো ভগবানের কাছে পৌঁছায় না; কারণ—

যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হ'তে দীন
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে
সবার পিছে, সবার নীচে,
সবহারাদের মাঝে।

সকলের সঙ্গে যে মিলতে পারছেন না—বিশ্বশালার ভাঙা-গড়ায় যেখানে কর্ম্মের কোলাহল সেখানে যে তাঁর ডাক পড়ছেনা

এই দুঃখ কবিকে বারে বারে পীড়িত ক'রে তুলেছে। তাই ব্যাকুল কণ্ঠ থেকে প্রার্থনা উঠেছে :

ভালো মন্দ ওঠা পড়ায়
বিশ্বশালার ভাঙা গড়ায়
তোমার পাশে দাঁড়িয়ে যেন
তোমার সাথে হয় গো চেনা।

মিলনের পথে বাধাটা কোথায়? বাধা হচ্ছে 'আমির' মধ্যে। আমার চেতনায় তো 'আলোকে-ভরা উদার ত্রিভুবন' নেই! সেখানে আছে আমার কাঙাল 'আমি'—তার ছোট ছোট আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। আমি আমার বাসনা নিয়ে সংসারের সঙ্গে কারবার করতে যাচ্ছি—তাই প্রকৃতির মধ্যে, মানুষের মধ্যে যে সুষমা যে মহিমা রয়েছে তাকে দেখতে পাচ্ছি না। মানুষ অথবা প্রকৃতিতো আমার প্রয়োজন মেটাবার উপায় মাত্র নয়। তার নিজের একটা সত্ত্বা আছে এবং সেই সত্ত্বার মূল্য আছে, মর্য্যাদা আছে। লোভে অভিভূত হয়ে সংসারের দিকে যখন চাই—তখন মানুষের মধ্যে প্রকৃতির মধ্যে কোনো সৌন্দর্য্য দেখতে পাইনে—তাই তার সঙ্গে প্রেমে আমি যুক্ত হ'তে পারিনে।

বাসনা মোর যারেই পরশ করে সে
আলোটি তার নিবিয়ে ফেলে নিমেষে।

তাই 'আমি'কে জীবন থেকে ঠেলে ফেলবার জন্য কবির অন্তরে কি ব্যাকুলতা!

আর আমায় আমি নিজের শিরে বইবো না।
আর নিজের দ্বারে কাঙাল হ'য়ে রইবো না।
এই বোঝা তোমার পায়ে ফেলে
বেরিয়ে পড়বো অবহেলে,
কোনো খবর রাখবো না ওর
কোনো কথাই কইবো না।
আমায় আমি নিজের শিরে বইবো না।

বারে বারে কবির কাতর কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এসেছে :

একা আমি অহঙ্কারের উচ্চ অচলে,
পাষাণ আসন ধূলায় লুটাও ভাঙো সবলে।
নামাও নামাও আমায় তোমার চরণতলে।

অহঙ্কার যতক্ষণ মনের মধ্যে উগ্র হ'য়ে আছে ততক্ষণ ভগবানকে স্বীকার করতে পাচ্ছি নে, 'আমি'টাই প্রবল হ'য়ে জীবনকে অধিকার করে আছে, ভগবানের কাছে যাবার যে পথ তাকে নির্লজ্জ ঔদ্ধত্যে অবরোধ ক'রে আছে।

ধরণী সে কাঁপিয়ে চলে বিষম চঞ্চলতা।
সকল কথার মধ্যে সে চায় কইতে আপন কথা।
সে যে আমার আমি প্রভু
লজ্জা তাহার নাই যে কভু,
তা'রে নিয়ে কোন্ লাজে বা
যাবো তোমার দ্বারে।

নিজের ঘরে এই 'আমি'র দীপশিখাকে যখন নিবিয়ে ফেলছি তখনই শুধু সমস্ত সংসার আমার চেতনায়-সৌন্দর্য্য এবং মহিমায় জীবন্ত হ'য়ে উঠ্‌ছে—ঘরের আলো যখন নিব্‌লো, রাতের তারাগুলি তখন দৃষ্টিতে ধরা পড়লো!

আলো যখন আপন ঘরে
নিবিয়ে ফেলি আলস ভরে,
লক্ষ তারা জ্বালায় তোমার
নিশীথিনী।

এই আমার 'আমি' আর কাউকে পাত্তা দিচ্ছে না, আর কাউকে স্বীকার করছে না।

সবার সজ্জা হরণ ক'রে
আপনাকে সে সাজাতে চায়।
সকল সুরকে ছাপিয়ে দিয়ে—
আপনাকে সে বাজাতে চায়।

অথচ নিজেকে এই গৌরব দেওয়ার কোন মানে হয় না। যা দেবতার প্রাপ্য তার উপরে আমার কোনো অধিকার নেই। জীবনের অনন্ত অভিযান চলেছে মৃত্যুর শক্তিপুঞ্জের বিরুদ্ধে। আলো জয় করতে করতে চলেছে অন্ধকারকে। ভগবান জীবন, ভগবান আলো। মানুষের কণ্ঠে যেখানে জীবনের জয়গান সেখানে সেই কণ্ঠস্বরের মধ্যে বিধাতারই কণ্ঠধ্বনি। মানুষের হাত যেখানে অন্ধকারকে আঘাত করছে, সেখানে সেই হাত বিধাতারই হাত। অসংখ্য কণ্ঠকে এবং অসংখ্য বাহুকে আশ্রয় ক'রে দেশে দেশে বিধাতার অভিযান চলেছে মহাকালের বুকে। লড়াই করতে করতে মৃত্যুহীন প্রাণ জয়ের শিখর হ'তে জয়ের শিখরে চলেছে। জীবনের মহানদী বিধাতার রক্তে লাল। লড়ায়ের বিরাম নেই। মৃত্যুর মধ্যে একজন মানুষের কণ্ঠ যখন নীরব হ'য়ে যাচ্ছে, তখন অন্যত্র নূতন কণ্ঠে জীবনের জয়ডঙ্কা গম্ভীর নির্ঘোষে বেজে উঠ্‌ছে। লড়াই করতে করতে একজনের হাত যখন ভেঙে যাচ্ছে—নূতন বাহুকে অবলম্বন ক'রে তখনও লড়াই চলছে। দুর্জ্জয় তাঁর সৈন্যবাহিনী। তার কখনও পরাজয় নেই। মুস্কিল হচ্ছে এই আমিটাকে নিয়ে। অহঙ্কারের জন্য নিজেকে জীবনের বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখ্‌ছি। বুঝতে পারৃছিনে—আমার কণ্ঠস্বর আমার নয়, আমার দেবতার। আমার বাহু দেবতার সহস্র বাহুর একটী মাত্র। আমি তাঁর জগৎ-জোড়া সৈন্যবাহিনীর একজন। নিজের ব'লে আমার 'আমি' যা দাবী করছে—সে গৌরব আমার নয়, আমার বিধাতার। আমি একা নই, আমি আমার নই। আমি বিধাতার। আমাকে নিঃশেষে তাঁর কাছে আত্ম-সমর্পণ করতে হবে। গীতাঞ্জলির কবিতাগুলির মধ্যে এই আত্ম-সমর্পণের সুর বারম্বার বেজে উঠেছে। গীতাঞ্জলির গান সুরু হয়েছে এই আত্ম-সমর্পণের প্রার্থনা দিয়ে।

আমার মাথা নত ক'রে দাও হে তোমার
চরণ ধূলার তলে।
সকল অহঙ্কার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে।

অহঙ্কার এসে বারে বারে যা বিধাতার প্রাপ্য সেই পূজার বলি মলিন হাতে হরণ করছে—যে গৌরব বিধাতার তার উপরে নিজে দাবী বসাচ্ছে—আর কবির শুভবুদ্ধি সেই অহমিকার বিরুদ্ধে ক্রমাগত সংগ্রাম ক'রে চলেছে। নিজের সঙ্গে নিজের এই যে লড়াই—এই লড়ায়ের বাজনায় গীতাঞ্জলির আদ্যন্ত ভরপুর।

ছাড়িতে পারিনি অহঙ্কারে,
ঘুরে মরি শিরে বহিয়া তা'রে,

ছাড়িতে পারিলে বাঁচি যে হায়
তুমি জানো, মন তোমারে চায়।

অথবা

কেন আমায় মান দিয়ে আর দূরে রাখো,
চির জনম এমন ক'রে ভুলিয়ো নাকো,
অসম্মানে আনো টেনে পায়ে তব।
তোমার চরণ ধূলায় ধূলায় ধূসর হব।

অহঙ্কার থেকে মুক্ত হ'য়ে ঈশ্বরের চরণে নিজেকে নিঃশেষে সঁপে দেবার সুর এইসব কবিতার মধ্যে ঝঙ্কৃত হ'য়ে উঠেছে।

ডাক্‌রে আবার মাঝিরে ডাক্,
বোঝা তোমার যাক্ ভেসে যাক্
জীবনখানি উজাড় ক'রে
সঁপে দে তা'র চরণমূলে।

এখানে আত্মনিবেদনেরই প্রার্থনা।

আমি চেয়ে আছি তোমাদের সবাপানে।
স্থান দাও মোরে সকলের মাঝখানে।
নীচে সব নীচে এ ধূলির ধরণীতে
যেথা আসনের মূল্য না হয় দিতে,
যেথা রেখা দিয়ে ভাগ করা নেই কিছু,
যেথা ভেদ নাই মানে আর অপমানে,
স্থান দাও মোরে সকলের মাঝখানে।

সমস্ত অহমিকাকে সরিয়ে ফেলে যেখানে বাহিরের কোনো আবরণ নেই, যেখানে আপনার উলঙ্গ-পরিচয়—সেইখানে সকলের সঙ্গে সমভূমিতে দাঁড়াবার জন্য কি কাতর অনুনয়!

অহঙ্কারের মিথ্যা হ'তে বাঁচাও দয়া ক'রে
রাখো আমায় যেথা আমার স্থান!
আর সকলের দৃষ্টি হ'তে সরিয়ে নিয়ে মোরে
কর তোমার নত নয়ন দান।

অহঙ্কার থেকে মুক্ত হবার জন্য একই মিনতি!

তোমার কাছে খাটে না মোর
কবির গরব করা,
মহাকবি, তোমার পায়ে
দিতে চাই যে ধরা।

কবির গর্ব্বকে মহাকবির পায়ে নিঃশেষ ক'রে দেবার জন্য একটা ব্যাকুল কামনার অভিব্যক্তি এখানে।

ম'রে গিয়ে বাঁচবো আমি তবে
আমার মাঝে তোমার লীলা হবে।
সব বাসনা যাবে আমার থেমে
মিলে গিয়ে তোমারি এক প্রেমে,
দুঃখ সুখের বিচিত্র জীবনে
তুমি ছাড়া আর কিছু না রবে।

অথবা

আমার আমি ধুয়ে মুছে
তোমার মধ্যে যাবে ঘুচে,
সত্য, তোমায় সত্য হবো
বাঁচ্‌বো তবে,
তোমার মধ্যে মরণ আমার মরবে কবে॥

আমি যতক্ষণ একান্ত সত্য—ততক্ষণ আমার মধ্য দিয়ে আমার ভগবানের প্রকাশ অসম্ভব। বাঁশির ভিতরটা শূন্য না হলে সে বাজবে না। আমার ভিতরটা যতক্ষণ অহমিকায় ভরাট হয়ে আছে—ততক্ষণ আমার জীবন-বাঁশি তাঁর হাতে বাজতেই পারে না। 'আমি'র মৃত্যু না হোলে আমার বাঁচাটা কখনো সত্য হবে না। তাই ভগবানের মধ্যে আমিকে নিঃশ্চিহ্ন ক'রে দেবার কামনা।

নামটা যেদিন ঘুচাবে নাথ,
বাঁচ্‌বো সেদিন মুক্ত হ'য়ে—
আপন-গড়া স্বপন হ'তে
তোমার মধ্যে জনম ল'য়ে।
ঢেকে তোমার হাতের লেখা
কাটি' নিজের নামের রেখা,
কতোদিন আর কাট্‌বে জীবন
এমন ভীষণ আপদ ব'য়ে।

অহমিকার দুর্ব্বহ ভারে ভারাক্রান্ত জীবনকে ভগবানের পায়ে নিঃশেষে নিবেদন ক'রে মুক্তির পরমানন্দকে আস্বাদন করবার জন্য কি ব্যাকুলতা!

গীতাঞ্জলিতে গীতারই প্রতিধ্বনি। এর মূল সুর আত্মসমর্পণের সুর, ভগবানের সঙ্গে এবং বৃহৎ জগতের সঙ্গে প্রেমে যুক্ত হবার সুর। সেই যোগের পথে প্রধান বাধা আমার 'আমি'। তাই জীবন থেকে 'আমি'কে নির্ব্বাসিত দেখবার জন্য গীতাঞ্জলির পাতায় পাতায় এই কান্না। অহমিকা আমাকে জগত থেকে এবং জগদীশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে রেখেছে, আর এই বিচ্ছেদের মধ্যে আমার আত্মার মৃত্যু! সেইজন্য বাঁচার জন্য 'আমি'র মৃত্যুর এতখানি প্রয়োজন।

গীতাঞ্জলির তাৎপর্য্য সামান্য কয়েকটা কথায় বলতে গেলে এই দাঁড়ায়: এই জগদ্বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থখানির মূল কথাটা হচ্ছে যোগ—পরমেশ্বরের সঙ্গে যোগ এবং সেইজন্য বিশ্বের সঙ্গে যোগ।

এমনি ক'রে মুখোমুখি
সাম্‌নে তোমার থাকা—
কেবলমাত্র তোমাতে প্রাণ
পূর্ণ ক'রে রাখা—

গীতাঞ্জলির ভক্ত কবির এই হচ্ছে গভীরতম প্রার্থনা। কিন্তু জগদীশ্বর তো জগতকে বাদ দিয়ে নেই। সীমা না হ'লে অসীমের কোনো মানে থাকে না।

সীমার মাঝে অসীম তুমি
বাজাও আপন সুর।

অরূপ যিনি তিনি রূপের মধ্যে অনবরতই ধরা দিচ্ছেন।

সেইজন্য জগদীশ্বরকে যে মুহূর্ত্তে পাচ্ছি জগতকেও সেই মুহূর্ত্তে পাচ্ছি।

যদি বাঁধি তোমার হাতে
পড়বো বাঁধা সবার সাথে,
যেখানে যে আছে, কেহই
রবে না বাকি।

আর এই যোগ তখনই সম্পূর্ণ হবে যখন 'আমি'র মৃত্যু ঘটবে। সেইজন্যই অহঙ্কারের বিরুদ্ধে গীতাঞ্জলিতে বারম্বার অভিযান।

পাণ্ড্যরাজ্য

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র পাল

প্রাচীন কালে ভারতের দাক্ষিণাত্য জনপদে দ্রাবিড়গণ বসতি স্থাপন করে। তৎপরে আর্য্যগণ ক্রমশঃ ঐ জনপদ আপনাদের অধিকারে আনিয়া যে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত করিয়াছিলেন তন্মধ্যে 'পাণ্ড্যরাজ্যের' নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কথিত আছে—পাণ্ড্য নামে কোন পরাক্রমশালী নৃপতির নামানুসারে রাজ্যটি পাণ্ড্যরাজ্য নামে অভিহিত হইয়াছিল।

রঘুর দিগ্বিজয়ে বর্ণিত আছে :—

"দিশি মন্দায়তে তেজো দক্ষিণস্যাং রবেরপি।
তস্যামেব রঘোঃ পাণ্ড্যাঃ প্রতাপং ন বিষেহিরে॥"

—রঘু ৪।৪৯

বিদর্ভের রাজা ভোজ তাঁহার কনিষ্ঠ ভগ্নী ইন্দুমতীর স্বয়ম্বর সভার আয়োজন করিয়াছিলেন। ইন্দুমতীর বিবাহ বর্ণনায় লিখিত আছে :—

"অনেন পাণিঁ বিধিবদ্ গৃহীতে
মহাকুলীনেন মহীতে গুর্ব্বী।
রত্নানুবিদ্ধার্ণবমেখলায়া
দিশঃ সপত্নী ভব দক্ষিণস্যাঃ॥"—রঘু ৬।৬৩

এতদ্ভিন্ন আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গের অন্যতম বীর সন্তান বিজয়সিংহ তাম্রপর্ণী (লঙ্কাদ্বীপ) অধিকারের পর তথাকার রাজপদে অভিষিক্ত হইতে সচেষ্ট হইলেন। তৎকালীন প্রথানুসারে মহিষী না থাকিলে অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হইতে পারে না। এই নিমিত্ত তিনি সত্বর এক সুলক্ষণা রাজকুমারীর সন্ধানার্থ সভাসদগণকে আদেশ করিলেন। ভারতের দক্ষিণাংশে পাণ্ড্যরাজ্যের রাজকুমারীর সন্ধান পাওয়া গেল। তখন তিনি পাণ্ড্যরাজের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া সমুদয় জ্ঞাপন করিলেন। পাণ্ড্যরাজ এই শুভ বিবাহে সম্মত হইয়া সাত শত সখীসহ কন্যাকে তাম্রপর্ণী প্রেরণ করিলেন। যথাকালে রাজকন্যা তাম্রপর্ণীতে উপনীত হইলে পরিণয় ও অভিষেক ক্রিয়া সুসম্পন্ন হইল।

প্রাচীন পাণ্ড্যরাজ্য বাণিজ্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। এই রাজ্যের অন্তর্গত 'মাদুরা' দ্রাবিড়-সভ্যতা ও তামিল সাহিত্যের কেন্দ্রস্থল ছিল। বর্ত্তমান মাদুরা, রামনাদ ও তিন্নেবেল্লী জেলাত্রয় লইয়া পাণ্ড্যরাজ্য বিস্তৃত ছিল বলিয়া অনুমিত হয় (১)।

প্রাচীন পাণ্ড্যরাজ্যের অন্তর্গত যে সকল প্রত্নদ্রব্য আজিও ভারতীয় ইতিহাসকে সমুজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে তৎসমুদয় সবিস্তারে বর্ণিত হইল।

রামেশ্বর—রামেশ্বর ভারতের প্রাচীন তীর্থগুলির মধ্যে অন্যতম। রামায়ণ পাঠে অবগত হওয়া যায়—এই রামেশ্বর হইতে লঙ্কাদ্বীপে গমনার্থে শ্রীরামচন্দ্র একটি সেতু নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তজ্জন্য রামেশ্বরের অপর এক নাম 'সেতুবন্ধ রামেশ্বর'। শ্রীরামচন্দ্র এই স্থানে যে শিবলিঙ্গটিকে পূজা করিয়াছিলেন তাহা 'রামেশ্বর' নামে অভিহিত হইয়াছে। রামেশ্বরের মন্দিরটি একটি দর্শনীয় বস্তু। ইহা সমতল ক্ষেত্র হইতে প্রায় ১০০০ ফিট উচ্চ।

এই মন্দির সম্বন্ধে Fergusson লিখিয়াছেন :—If it were proposed to select one temple which should exibit all the beauties of the Dravidian style in their greatest perfection and at the same time exemplify all its characteristic defects of design the choice would almost inevitably fall on that at Rameswaram in the island of Paban."

মাদুরা—মাদুরা ভারতের এক প্রাচীন নগর। খৃষ্টীয় ১৪শ অব্দের প্রারম্ভকাল পর্য্যন্ত ইহা পাণ্ড্যরাজ্যের অন্তর্গত ও হিন্দুরাজগণের অধীনে ছিল। মাদুরাবক্ষে সেই প্রাচীন হিন্দুযুগের নিদর্শনস্বরূপ 'মিনাক্ষী মন্দির' দণ্ডায়মান রহিয়াছে। সমগ্র মন্দিরটি প্রস্তরনির্ম্মিত এবং ইহার প্রত্যেক প্রস্তরফলক সুন্দর কারুকার্য্যবিশিষ্ট। এতদ্ভিন্ন মন্দির গাত্রে কতিপয় প্রাচীন শিলালিপিও পরিদৃষ্ট হয়; তৎসমুদয় ভারতীয় ইতিহাসের অমূল্য সম্পদ।

মিনাক্ষী মন্দিরের সমতুল্য আর একটি মন্দির দৃষ্ট হয়, ইহার নাম 'সুন্দরেশ্বর'—মন্দিরটি ধূসরবর্ণের প্রস্তরে নির্ম্মিত। দূর হইতে সূর্য্য ও চন্দ্রালোকে এই মন্দিরটি অতীব মনোরম দেখায়।

এতদ্ভিন্ন যাত্রিগণের সুবিধার জন্য একটি বিশাল মণ্ডপ রহিয়াছে। ষোড়শ শতাব্দীর শাসনকর্ত্তা তিরুমল্ল নায়েক এই মণ্ডপটি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তজ্জন্য তাঁহার নামানুসারে মণ্ডপটির নাম 'তিরুমল্ল-চৌলত্রি'।

শুচীন্দ্রম—প্রাচীন পাণ্ড্যরাজ্যের দক্ষিণাংশে কুমারিকা অন্তরীপ হইতে প্রায় ছয় মাইল দূরে 'গোপুরম' ও 'শুচীন্দ্রম' নামে দুইটি প্রাচীন মন্দির বিদ্যমান রহিয়াছে। মন্দিরদ্বয়ের মধ্যে শুচীন্দ্রম বিশেষ কাহিনী বিজড়িত। মিথিলার প্রখ্যাত মহর্ষি গৌতমের অনুপস্থিতিতে তৎপত্নীর নিকট দেবরাজ ইন্দ্র ছদ্মবেশে যাইয়া সতীত্ব নষ্ট করেন। সহসা মহর্ষি গৃহে আগমন করিবামাত্র ইন্দ্রকে ছদ্মবেশে দেখিয়া সমুদয় বুঝিতে পারিলেন এবং তাঁহাকে অভিশাপ দিলেন। ফলে ইন্দ্র কুষ্ঠব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হইয়া যন্ত্রণায় অধীর হইয়া পড়িলেন এবং এই স্থানে আসিয়া মুক্তিলাভের আশায় শিবের ধ্যান করিতে লাগিলেন। তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়া শিব ইন্দ্রকে শাপমুক্ত বা শুচি করিলেন। এই নিমিত্ত তদবধি এই স্থানটি "শুচীন্দ্রম" নামে অভিহিত হইয়াছে। অধুনাও সাধারণের বিশ্বাস যে—উক্ত স্থানে প্রতিষ্ঠিত এই শিবমন্দিরে প্রত্যহ গভীর রাত্রে ইন্দ্র আসিয়া শিবের যথারীতি পূজা করিয়া থাকেন। যাহা হউক, মন্দির পাণ্ড্যরাজ্যের প্রাচীন স্থপতিবিদ্যার একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শনস্বরূপ।

কিছুদিন পূর্ব্বে পাণ্ড্যরাজ্যের বা দক্ষিণাপথের প্রাচীন কীর্ত্তিগুলি সংরক্ষণকল্পে Director of Public Information, Government of India অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন :—

"The rich heritage which southern India possesses in its large number of temples remarkable alike for

---

(১) পাণ্ড্যরাজ্যের অবস্থান সম্বন্ধে কতিপয় মতামত প্রদত্ত হইল। "Kalidas calls the capital of Pandya-desha the serpent-town, which is probably the same as Negapattan, 160 miles south of Madras"—V. S. Apte's Dictionary.

"The Pandya country corresponded to the Madura, Ramnad, Tinnevelly districts and perhaps the southern portion of Travancore State and had its Capital at Kolkai and Madura"— —Dr. H. C. Rai Chowdhury

"Trichinopaly (Uraiyur, Sanskrit উরগপুর, Argaru of periplus)"—Cunningham's Ancient Geography of India, Notes by Prof. S. N. Mazumdar, P. 741.

their size and the wealth of Sculptural and epigraphical material is wellknown to the students of Indian architecture, art and history. Few people, however, realize the real value of these precious monuments and the great harm done to the cause of history by the indifference and neglect to which they are subjected at the hands of the larger publice and som, times by those who are charged with the duty of looking after them. The Archaeological depaitment has already taken steps to collect, study and publish as many of the inscriptions as possible, but thousands of inscriptions yet remain to be copied and deciphered."

*   *   *   *

The Hindu Religious Endowments Boards, which is functioning in the Madras Presidency, can with advantage take up the matter and impress on those concerned to look upon it as their sacred duty to preserve every stone of the old structures intact and thereby induce posterity to respect the pious foundations of our own generation."

বস্তুত: পাণ্ড্যরাজ্যের পূর্ব্বোক্ত প্রত্নসম্পদসমূহ সরকারী প্রত্নতত্ত্ববিভাগ কর্ত্তৃক সংরক্ষিত হইলে ভারতের প্রাচীন ঐতিহাসিক গৌরব চিরতরে অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

শতাব্দীর শিল্প—এপ্‌ষ্টাইন

শ্রীঅজিত মুখোপাধ্যায়, এম-এ (লণ্ডন) এফ-আর-এ-আই (লণ্ডন)

বাঁচ এবং বাঁচতে দাও। নিজের সৃষ্টি ভিন্ন ভাস্কর্য্যে অন্ত কোন শিল্পীর দান নেই এই মনোবৃত্তির প্রশ্রয় এপ্‌ষ্টাইন কোনদিনই হতে দেন নি। কিন্তু তাঁর নিজের কাজে ছিল অগাধ শ্রদ্ধা এবং ভাস্কর্য্যে যে মহান আদর্শের প্রেরণা এপ্‌ষ্টাইন পেয়েছিলেন তা থেকে কোনদিনই তিনি বিচ্যুত হন নি। হাজার রকম বাধা বিপদের মধ্যেও তিনি এই শিল্পাদর্শ বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছেন এবং অন্তান্ত শিল্পীদের বাঁচবার পথ এপ ষ্টাইন কখনই দুর্গম করে তোলেন নি।

জীবনে ক'জন মানুষ ক'দিন নগ্ন হতে পেরেছে বিশেষভাবে শীতপ্রধান দেশে যখন পোষাক পরিচ্ছদের আবরণে সর্ব্বদা দেহ ঢেকে রাখতে হয়। তাই যখন এপ ষ্টাইনের তৈরী নগ্ন মূর্ত্তিটি



(Adam) এ্যাডাম



সৃষ্টি

ষ্ট্রাণ্ডের তলবর্ত্তী রেলষ্টেশনে বসান হল তখন ইংলণ্ডের জনসাধারণ শিল্পীর বিরুদ্ধে তুমুল প্রতিবাদ জানাল এই বলে যে মূর্ত্তিটি অশ্লীলতার চরম নিদর্শন। কিন্তু সমস্ত যুক্তি তর্কের বিরুদ্ধে এই মধ্যবিত্ত মনোবৃত্তির আন্দোলন সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য ক'রে এপ্‌ষ্টাইন নিজের সাধনা নিয়ে ব্যস্ত রইলেন। কেননা এপ্‌ষ্টাইন শুধু



পল রব্‌সন্

ভাস্কর এবং কারিগরই ছিলেন না—তিনি বিদ্রোহী শিল্পী। ভাস্কর্য্যে গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে দাঁড়ানই তাঁর ধর্ম্ম বলে বিশ্বাস করতেন।

সমস্ত সমাজের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শিল্পে তাঁর এই নবতম দান শক্তিমান পুরুষের লক্ষণ সূচনা করে। এপ্‌ষ্টাইনের বিশেষত্ব সেইখানে—যেখানে তিনি সমস্ত বাধাবিঘ্নের মধ্যেও শান্ত অথচ দৃঢ় চিত্তে নিজের কাজ করে যেতেন। আধুনিক শিল্পীদের বিশেষভাবে ভাস্করদের মধ্যে তিনি যে একজন সাহসী এবং শ্রেষ্ঠ শিল্পী তা অবিসম্বাদিত।

'ব্রিটিশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশান' গৃহে এপ্‌ষ্টাইনের নির্ম্মিত মূর্ত্তি নিয়ে লণ্ডনে এমন একটা হৈ চৈ সুরু হয় যে রোঁদার পর অন্য কোন ভাস্করের শিল্পকাজে আর এতটা আলোচনা হয় নি। কিন্তু এপ্‌ষ্টাইন নিন্দুক এবং শত্রুকে প্রতিহত করার চেষ্টা কখনই করেন নি। বরঞ্চ যুক্তি তর্ক দিয়ে তাঁর শিল্পের ভাষা জনসাধারণকে বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর বলা এবং লেখা থেকে স্পষ্ট



বোঝা যায় যে এপ্‌ষ্টাইন একজন উঁচুদরের সমালোচকও ছিলেন। প্রাচীন কিংবা আধুনিক বিভিন্ন শিল্প সম্বন্ধে তিনি যে মত পোষণ করেন তা শুধু ঝরঝরে নয় অত্যন্ত গভীর। আমেরিকার শিল্পীদের প্রতি এপ্‌ষ্টাইন যে উপদেশ দিয়েছিলেন তা উল্লেখযোগ্য: "The greatest mistake that Americans can make in the future is to look to Europe for direct inspiration···Art must take firm root in some definite country." এই উক্তিটি সর্ব্বদেশের সর্ব্ব শিল্পীদের জন্যে প্রযোজ্য হতে পারে এবং এইখানেই এপ্‌ষ্টাইনের দূরদর্শিতা ও চিন্তার গভীরতা স্পষ্ট বোঝা যায়।

যদিও এপ্‌ষ্টাইন জাতিতে ছিলেন ইহুদি এবং নানাদেশ ঘুরে

বেড়িয়েছিলেন কিন্তু ইংলণ্ডকেই তিনি মাতৃভূমি করায় তাঁর শিল্পও ইংলণ্ডের আবহাওয়ায় ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে। অবশ্য ইহুদি জাতির ওপর অবিচার ও উৎপীড়নের ছায়া তাঁর ভাস্কর্য্যে প্রতিফলিত দেখা যায় এবং এপ্‌ষ্টাইনকে যে আদিম শিল্প অনুপ্রাণিত করেছিল তার মূলে রয়েছে এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে অস্ফুট বেদনা; কেননা এপ্‌ষ্টাইন প্রায়ই বলতেন, "আদিম শিল্পের প্রকাশভঙ্গী বীরত্বমূলক এবং সরলতার পরিচায়ক।"

এপ্‌ষ্টাইন নিজেও ছিলেন একজন বলিষ্ঠ পুরুষ এবং তাই বিভিন্ন রকমের বহুমূর্ত্তির আকার দিতে তিনি সমর্থ হয়েছেন। তিনি সাধারণতঃ মূর্ত্তিগুলির গঠন বৈচিত্র্যে বিশেষ কোন গুরুত্ব দেন না। যেমন তাঁর মুণ্ডহীন ভিনাস মূর্ত্তিটি সঙ্গমরত মোরগ মুরগীর ওপর দাঁড়িয়ে আছে—কিংবা 'রক্ ড্রিল' মূর্ত্তি যা মানুষ ও যন্ত্রকে চিহ্নিত করে।

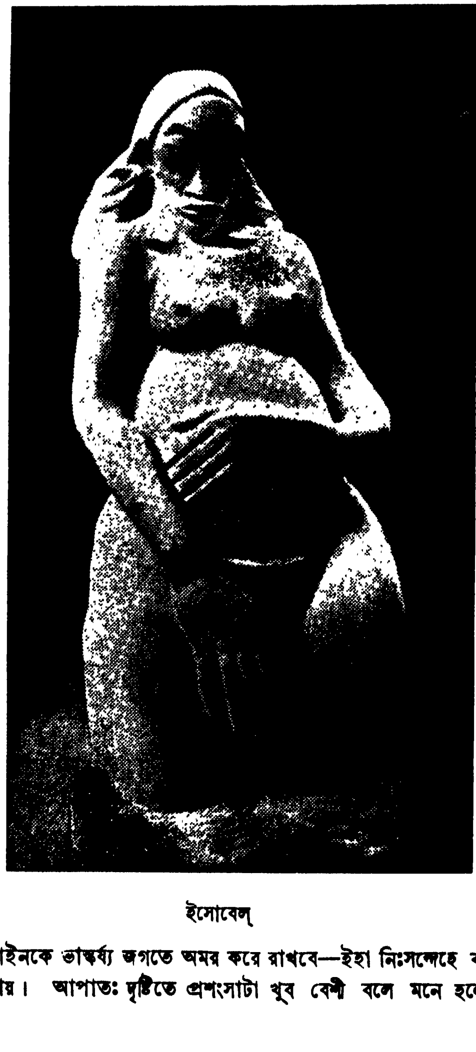
কিন্তু শিল্পীর অনেক খোদিত ফলক-মূর্ত্তিতে ভাস্কর্য্যের যে চরম গঠনভঙ্গী প্রকাশ করার চেষ্টায় সত্যিকারের সৃষ্টি থেকে নিজেকে বঞ্চিত করেছেন। মিশর কিংবা অসিরীয় শিল্পের আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়ার যুগ আর এটা নয়। প্রাচীন শিল্প যত উঁচু-দরের হোক না কেন, বর্ত্তমান যুগের শিল্পীর পক্ষে তা নকল করে শিল্পে কোন নূতন দান করা একেবারে অসম্ভব।

আধুনিক যুগের অধিকাংশ ভাস্কর্য্য বর্ত্তমান জীবনযাত্রাকে ভয় পায়; তাই মূর্ত্তিগুলির প্রকাশভঙ্গীও ভিন্ন যুগের বলে মনে হয়। কিন্তু যে সব শিল্পী শক্তিশালী তাদের কারবার চলে দৈনন্দিন জীবন নিয়ে—তাদের সৃষ্টির প্রত্যেকটি ভঙ্গীতে ফুটে ওঠে আধুনিক নরনারীর বৈচিত্র্য। এপ্‌ষ্টাইনও এই ধরণের একজন শিল্পী যিনি বর্ত্তমান জীবনকে মোটেই ভয় পাননি এবং এই হিসেবে শিল্পজগতে তাঁর ভাস্কর্য্য এক অনবদ্য দান—যদিও ফলক মূর্ত্তিগুলি প্রাচীন প্রভাবের দ্বারা দুষ্ট।

এপ্‌ষ্টাইনের তৈরী প্রতিকৃতিগুলির ভাব ও ভঙ্গিমা এপ্-



অস্কার ওয়াইল্ড্‌এর কবর



ইসোবেল্

আদর্শ তিনি খুঁজতেন তার আভাষ দেখতে পাওয়া যায়। এখানে এপ্‌ষ্টাইন প্রাচীন সভ্যতার শিল্পাদর্শের অনুকরণে মূর্ত্তিগুলির

ষ্টাইনকে ভাস্কর্য্য জগতে অমর করে রাখবে—ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। আপাতঃ দৃষ্টিতে প্রশংসাটা খুব বেশী বলে মনে হলেও

এমন কোন কারণ নেই যার জন্তে তিনি তাঁর এই প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হতে পারেন। বর্ত্তমান যুগ, লেখক, ঐতিহাসিক কিংবা বৈজ্ঞানিকদের প্রশংসা করতে মোটেই কার্পণ্য করে না, কিন্তু আধুনিক শিল্পীদের সম্বন্ধে আলোচনা উঠলেই জনসাধারণ বুঝতে চায় না যে প্রাচীনের আচার্য্যেরা মরে গেছে এবং চিরদিনের জন্তেই গেছে। অবশ্য এটা সত্য যে অতীতে বড় বড় ভাস্কর জন্মে গেছেন কিন্তু তাঁদের শিল্পের দাম বিংশ শতাব্দীতে খুবই কম। কিন্তু আজ যখন আমরা একজন উঁচুদরের ভাস্কর শিল্পীকে পেয়েছি—তখন তাঁর নবতম দানের জন্তে তাঁকে সমস্ত সম্মান দিতে যেন পিছিয়ে না পড়ি।

তার বিরুদ্ধে লোকে বলতে পারে—'ইম্প্রেশানিষ্টদে'র কৌশল দিয়ে এপ্‌ষ্টাইন জনসাধারণকে প্রতারণা করেছেন। কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিত 'চালাকি দিয়ে কোন মহৎ কাজ হয় না।' পৃথিবীতে মাটি পড়ে রয়েছে, অসংখ্য কারিগর ফটোমাফিক্ মূর্ত্তি রচনা করছেন—কিন্তু এপ্‌ষ্টাইন কেবলমাত্র একজনই।

মডেলের ওপর জোর আলোর রশ্মি ফেলে এপ্‌ষ্টাইন প্রথমে এলোমেলোভাবে কাজ করে যান, তারপর ধীরে ধীরে মডেলকে ব্রোঞ্জে রূপান্তরিত করে থাকেন। কিন্তু তাঁর এই পদ্ধতিতে কোন ঢিলা কাজ নেই, আলোছায়ায় তারতম্যের বৈষম্য এমন তীক্ষ্ণ হয়ে



একটি শিশু

ওঠে যে অঙ্গবিশেষে তিনি যে রূপ দিতে সক্ষম হন তাতে ফুটে ওঠে ব্যক্তিত্ব ও আত্মার স্পন্দন।

এপ্‌ষ্টাইন একশতের উপর ব্রোঞ্জের প্রতিকৃতি মূর্ত্তি তৈরী করেছেন। অবশ্য এর মধ্যে ভালমন্দ দুইই আছে কিন্তু মূর্ত্তিগুলি কোনটাই মৃত নয়—একেবারে জীবন্ত। ব্রোঞ্জকে অদ্ভুতভাবে এই রক্ত মাংসের রূপ দেওয়ায় এপ্‌ষ্টাইন যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তা অভূতপূর্ব্ব। কি ভাবে যে তিনি এ করতে সক্ষম হলেন তা আমরা জানি না। হয়ত' বলা যেতে পারে তাঁর প্রতিভা, কিন্তু উত্তরটা খুবই অস্পষ্ট রয়ে গেল।

এপ্‌ষ্টাইন যে দক্ষতার সহিত তাঁর শিল্পকে স্বায়ত্বাধীন করেছেন, যে বিদ্যা ও পদ্ধতি দিয়ে মূর্ত্তিগুলি প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে

এইখানেই এপ্‌ষ্টাইনের নিজস্ব প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি সেই ধরণের শিল্পী যিনি গভীর সুখদুঃখের অনুভূতি দিয়ে মানুষকে পর্য্যবেক্ষণ করতে মোটেই ভয় পান নি এবং যে বিরুদ্ধ শক্তি বর্ত্তমান যুগের স্রষ্টাদের খর্ব্ব করতে সর্ব্বদা উদ্যত সেই শক্তির বিরুদ্ধে বীরোচিতভাবে দাঁড়িয়ে ভাস্কর্য্যে যে দান এপ্‌ষ্টাইন রেখে গেলেন তা ভবিষ্যৎএর শিল্পীদের কাছে প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।



এভারেষ্ট পর্ব্বতের কথা

(রূপক)

এস, ওয়াজেদ আলি বি-এ (কেণ্টাব), বার-এট-ল

নভ মণ্ডল ভেদ করে, মস্তক সগর্ব্বে পৃথিবী থেকে তিরিশ হাজার ফিট উঁচুতে তুলে, দৃষ্টি সুদূর নীহারিকায় নিবদ্ধ করে, হিমালয়ের সুউচ্চ গিরিমালাকে অতি সহজে অতিক্রম করে এভারেষ্ট পর্ব্বত একাই দাঁড়িয়েছিল। শরীর তার অলঙ্কার এবং আড়ম্বর বৰ্জ্জিত শুভ্র তুষারে আবৃত। অপরের সংস্পর্শ থেকে নিজেকে একান্ত দূরে রাখবার জন্যই যেন সে শীতল বরফের দুর্ভেদ্য বর্ম্মে নিজেকে আবৃত করেছিল।

বায়ুমণ্ডলের ঝড়-ঝঞ্ঝা সহসা প্রচণ্ডবেগে প্রলয়ঙ্কর হুঙ্কারে তার শরীর এবং মস্তকের উপর দিয়ে বইতে শুরু করলে। বিরাট আকারের মেঘগুলি দৈত্য নিক্ষিপ্ত ডাইনামাইটের মতই বিদ্যুৎ কড়্ কড়্ শব্দে মেঘের জঠর থেকে লাফিয়ে উঠতে লাগলো।

সত্যই যেন দৈত্যবাহিনী আজ এভারেষ্ট পর্ব্বতের মস্তককে নত করবার জন্যে—আর তার গৌরবকে ধূলিস্মাৎ করবার জন্যে, তাদের সমস্ত শক্তি নিয়ে যুদ্ধে মেতে গিয়েছিল। আকাশ, বাতাস, চরাচর, বিশ্ব প্রকৃতি স্তব্ধ বিস্ময়ে এই অলৌকিক সংগ্রাম দেখছিল, আর রুদ্ধশ্বাসে ফলাফলের জন্য প্রতীক্ষা করছিল!

পরিশ্রান্ত দৈত্যবাহিনী বিফল-মনোরথ হয়ে শেষে কিন্তু নিরস্ত হল। ঝড়ের বেগ প্রশমিত হল। মেঘমুক্ত সূর্য্যের অমল আলোকে পৃথিবী জল্ জল্ করে উঠলো। এভারেষ্ট পর্ব্বতের অলঙ্কারবর্জ্জিত শুভ্র দেহের অবর্ণনীয় সৌন্দর্য্য-মহিমা পুনরায় বিশ্ববাসীর বিস্ময়োৎপাদন করতে লাগলো। মস্তক তার পূর্ব্বের মতই গর্ব্বোন্নত, পূর্ব্বের মতই সগৌরবে একাই সে বিরাজমান!

এভারেষ্টের পদতলে বিস্তৃত অন্তহীন প্রান্তর, তাতে অসংখ্য নাতিদীর্ঘ পাহাড়, পর্ব্বত। তাদের দেহ বৃক্ষে এবং লতাগুল্মের দ্বারা আবৃত। সেই সব গাছ-গাছড়া ঘেঁষা-ঘেঁষিভাবে এক সঙ্গে বাস করতো; আর তাতেই তারা আনন্দ পেত। সময় তারা কাটাতো পরস্পরের সঙ্গে গল্প-গুজব করে; পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ পোকা-মাকড়দের সঙ্গে প্রেমের খেলা খেলে, আর সোহাগের ঝগড়া করে। তাদের জীবন ছিল সংক্ষিপ্ত, আর সেটা তারা সুখেই কাটাতো। ভবিষ্যতের চিন্তা তারা বড় একটা করতো না। বর্ত্তমানের হাসি-কান্না, সুখ, দুঃখ নিয়েই তারা ব্যস্ত থাকতো। তারা ভাবতো, কি সুন্দর এই পৃথিবী, কি সুখের এই জীবন, কি মধুর এই আমোদ-প্রমোদ!

চিরতুষারাবৃত, উন্নতশীর্ষ, অচল, অটল এভারেষ্ট পর্ব্বতের বিরাট দেহের দিকে সবিস্ময়ে সসম্মানে সভয়ে তারা এক একবার চাইতো, আর পরস্পরের সঙ্গে বলাবলি করতো—কি নিঃসঙ্গ ওর জীবন, কি দারুণ নির্জ্জনতায় ওকে সময় কাটাতে হয়। ওর সঙ্গে কথা বলবার কেউ নেই, খেলার কোন সঙ্গী ওর নেই, সুখ-দুঃখের অংশ নেবার কেউ পৃথিবীতে ওর নেই। অমন নিঃসঙ্গ হয়ে কি কেউ থাকতে পারে। আমাদের দিন কেমন হাসি খেলায়, গল্প-গুজবে, মিলন-বিরহে কেটে যাচ্ছে। সময়ের গতির কথা আমাদের মনেই হয়না। একেই ত বলে জীবন! নিশ্চয় পর্ব্বত বেচারা আমাদের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে, আমাদের ব্যস্ত সমস্ত জীবনের উপর ঈর্ষা করছে। আমাদের সঙ্গে মিশতে যদি অনুরোধ করি, আনন্দে প্রাণ তাহলে ওর ভরে যাবে। অন্তরীক্ষের নির্জনতা ছেড়ে আমাদের সঙ্গে খেলা-ধূলা, গল্প-গুজব, হাসি-ঠাট্টা করতে পারলে নিজেকেও ধন্য মনে করবে! ওর নির্জ্জনতা দেখে সত্যই মায়া হয়। এস ওকে নিমন্ত্রণ করতে একজন দূত পাঠান যাক্।

বিচক্ষণ মিষ্টভাষী এক তোতাকে দূত মনোনীত করে গাছেরা এভারেষ্ট পর্ব্বতের কাছে পাঠালে। উড়তে উড়তে আধমরা হয়ে সে বেচারা শেষে পর্ব্বতের চূড়ার কাছে গিয়ে পৌছুলো। রোজকার নিয়মমত নির্নিমেষ দৃষ্টিতে এভারেষ্ট পর্ব্বত সুদূর নিহারিকার দিকে চেয়েছিলো। কি প্রশ্নের উত্তরের আশা সেখান থেকে যে তিনি করছিলেন তা তিনিই জানেন; আর কি যে আপন মনে তিনি ভাবছিলেন তাও তিনিই জানেন। একান্ত সম্ভ্রমের সঙ্গে ভূমিতে মাথা ঠেকিয়ে কুর্নিস করে তোতা গিরি-রাজকে তার দৌত্যের বিষয় অবহিত করলে, আর বললে সামান্য একটু নম্রতা স্বীকার করে যদি আমাদের সঙ্গে আপনি মেলামেশা করেন তাহলে জীবনটা আপনার কাছে এত নির্জ্জন আর নিরানন্দ বলে মনে হবে না। হেসে-খেলে গল্প-গুজব করে আনন্দে আপনি কাল কাটাতে পারবেন। পাখীরা গান গেয়ে আপনার চিত্ত-বিনোদন করবে, তরুণী বনবালারা বিলোল কটাক্ষ হেনে আপনার প্রাণে প্রেমের সঞ্চার করবে। ঋতুরাজের আবির্ভাবে দেহ আপনার পত্রে পুষ্পে রঙ্গীণ হয়ে উঠবে। বিষাদের শুভ্র আবরণ আর আপনার দেহে দেখতে পাওয়া যাবে না।

তোতার কথা শুনে গিরিরাজ ক্ষণেকের তরে তাঁর সমুদ্রের মত গভীর চক্ষু দুটীকে আকাশ থেকে নামিয়ে বক্তার সন্ধান করলেন। অনেক চেষ্টার পর তোতাকে দেখতে পেলেন। সে বেচারা সভয়ে গম্ভীর মুখে একান্ত মিনতির সঙ্গে তার বক্তব্য বলে যাচ্ছিল। আর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে এক একবার গিরিরাজের মুখের দিকে চাইছিল। বিষাদ এবং করুণার দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে গিরিরাজ বললেন, "হে সুকণ্ঠ তোতা! আমার মঙ্গলের চিন্তায় এতটা আয়াস স্বীকার করে, আর নিজেকে এতটা বিপন্ন করে তুমি যে এখানে এসেছ, তার জন্য আমার অভিবাদন গ্রহণ কর। তোমার বন্ধুরা আমার আনন্দ বিধানের জন্য এতদূর সচেষ্ট জেনে আমি বড়ই সুখী হলুম। তোমাদের এই সহানুভূতি সত্যই প্রশংসার যোগ্য!

তবে আমায় তোমরা একটু ভুল বুঝেছ। আর তাই আমার কথা ভেবে তোমাদের অন্তর বিমর্ষ হয়েছে! সেই জন্যই বোধ হয় সমতল ভূমিতে নেমে তোমাদের সঙ্গে হাসি খেলায় মশগুল্ হতে আমায় তোমরা অনুরোধ করছ।

চিরকাল যে আমি এখানেই আছি তা নয়! আমিও একদিন তোমাদের মতই সমতল ভূমিতেই ছিলুম, কিন্তু প্রাণের দুর্ব্বার প্রয়োজন শেষে এই ঊর্দ্ধে নিয়ে এসেছে!

আমার বর্ত্তমান জীবন বিষাদময় বটে, কেন না আমি একান্ত নিসঙ্গ, একান্ত একা। যাদের সঙ্গে এখন আমার কথাবার্ত্তা হয়, যাদের সঙ্গে ভাবের বিনিময় চলে, তারা থাকে উর্দ্ধে—ঐ নভোমণ্ডলে! আর যাদের সঙ্গে আমার বাল্যের সম্বন্ধ, তারা থাকে পরস্পরকে আঁকড়ে দূরে ঐ সমতলভূমিতে; তাদের সঙ্গে আমার রক্তের সম্পর্ক আছে বটে কিন্তু অন্তরের সম্বন্ধ নেই। উদ্দেশ্যহীন গল্প-গুজবে আর নিরর্থক হাসি-খেলাতেই তারা সময় কাটিয়ে দেয়; এর চেয়ে গুরুতর কোন বিষয়ের কথা তারা ভাবে না; ভাবতে ইচ্ছাও করে না; আর ভাববার অবসর তাদের নেই। সুদূর আকাশের ঐ যে জ্যোতিষ্কমণ্ডলী, আর তাদেরও উর্দ্ধে অবস্থিত ঐ যে নীহারিকা যেখানে নিত্য নূতন বিশ্বের সৃষ্টি হচ্ছে, এ সবের বিষয় তাদের জ্ঞান নিতান্তই সীমাবদ্ধ অকিঞ্চিৎকর, আর সেই সীমাবদ্ধ জ্ঞান বাড়াতে কিম্বা মস্তক উন্নত করে অসীম ঐ নভোমণ্ডলকে পর্য্যবেক্ষণ করতে, তার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে তারা কোন চেষ্টাই করে না। ক্ষণিকের তুচ্ছ হাসি খেলা, ক্ষণিকের আমোদ-প্রমোদ, ক্ষণিকের মিলন-বিরহ —এই নিয়েই তারা ব্যস্ত, আর এতেই তারা সন্তুষ্ট। সেইজন্যই তাদের জীবন এত সীমাবদ্ধ, এত সংকীর্ণ, এত সংক্ষিপ্ত! ক্ষণিকের তরে তারা আসে, ক্ষণিকের তরে আমোদ-প্রমোদে মত্ত হয়, তারপর বিস্মৃতির অতলস্পর্শ গহ্বরে তলিয়ে যায়। তাদের অস্তিত্বের কোন চিহ্নও পৃথিবীতে থাকে না। যুগ যুগ পূর্ব্বে, সুদূর এক অতীতে, পৃথিবীর শৈশব সময়ে আমিও ওদের মধ্যে থাকতুম। ওদের মধ্যে কেন, আমার স্থান ছিল ওদেরও নীচে। ওরা সব হাসি-ঠাট্টা, খেলা-ধূলা নিয়ে মশগুল্ থাকতো; আর আমি চুপটী করে বসে বসে কেবল ভাবতুম। আমায় কেউ গ্রাহ্যই করতো না।

আমার অন্তরে ছিল এক অগ্নিকুণ্ড। দিনরাত সেটী জ্বলতো, আর আকাশে উঠবার চেষ্টা করতো। তার জ্বালায় সর্ব্বদাই আমি অস্থির থাকতুম। যখন তখন আমার দেহে ভীষণ কম্পন এসে উপস্থিত হত! আমার সেই অগ্নিকুণ্ডের হুঙ্কারে বিশ্ববাসী চমকে উঠতো—ভাবতো আমি একা থাকতে ভালবাসি বলে আমার দেহে একটী দৈত্য কিম্বা শয়তান এসে প্রবেশ করেছে। আমার থেকে একটু দূরেই তারা থাকতো। হঠাৎ এক প্রলয় কাণ্ডের সৃষ্টি হল! আমি আমার বর্ত্তমান কলেবর প্রাপ্ত হলুম। আমার প্রতিবেশীরা নিম্নে সুদূর ঐ সমতল ভূমিতেই পড়ে রইল।

অন্তরের আগুন আমার কিন্তু এখনও নিভেনি। আরও উর্দ্ধে উঠবার জন্য অবিরাম চেষ্টা করে যাচ্ছে। আমার বাইরের স্থৈর্য্য আর ধৈর্য্য দেখে ভুল বুঝ না। আমার অন্তরের অগ্নিশিখা ধক্ ধক্ করে অনবরত জ্বলছে; আর আমার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করছে। তারই তাড়নায় অনুক্ষণ আকাশের দিকে আমি চেয়ে থাকি; গ্রহ তারকার গতিবিধি লক্ষ্য করি, আর নীহারিকার গুহ্য রহস্যের সন্ধান করি।

অন্তরের চিরজ্বলন্ত আগুনই এতদূর আমায় তুলে এনেছে, আর সেই আগুনই আরও উর্দ্ধে আমায় নিয়ে যাবে। সে আগুনের জন্ম যে ঐ নক্ষত্রলোকে! আর সেখানে ফেরবার জন্য সে যে অক্লান্ত সাধনায় মশগুল্!

সমতলভূমিতে ফিরে গাছ-গাছড়া কীট-পতঙ্গ প্রভৃতির সঙ্গে মিশতে আমায় অনুরোধ করা বৃথা। অন্তরের আগুন কখনই আমায় তা করতে দেবে না। একা এই নিঃসঙ্গ অবস্থায় সুদূর নীহারিকার দিকে চেয়েই আমায় দিন কাটাতে হবে; কেন না, যারা আমার অন্তরের সঙ্গী, আমার অন্তরের আগুনের সঙ্গী, তারা তো এই পৃথিবীতে থাকে না; সুদূর ঐ নভোমণ্ডলেই যে তাদের স্থান।

ঈশ্বরের এমনই বিধান, আমার অন্তরের এই উর্দ্ধমুখী গতি বিশ্বের জন্য তোমাদের সকলের জন্য অশেষ কল্যাণের কারণ হয়েছে। আমার বুকে ভর করে লতাগুল্ম, গাছগাছড়া দেখ কত উপরে উঠেছে। তুষার এবং মেঘের দৈত্যের সঙ্গে অবিরাম আমি যুদ্ধ করছি। গলিয়ে তাদের জলে পরিণত করছি। সেই জল থেকে বিশ্ববাসী জীবনের রস সংগ্রহ করছে। আমার শরীরের স্বেদ থেকে যে নির্ঝর ঝরছে, নদী বইছে, তাই থেকে পৃথিবী ফলে ফুলে শোভিত হচ্ছে, তাই থেকে সে তার রূপ রস গন্ধ সংগ্রহ করছে। নিজে জ্বলছি, কিন্তু তোমাদের শীতল রাখছি। নিজে নির্জ্জনে জীবন কাটাচ্ছি, কিন্তু তোমাদের জীবনকে আনন্দময়, ক্রীড়াময় করে তুলেছি।

এতেই আমি সন্তুষ্ট। একা বসে অন্তহীন সাধনায় জীবন কাটাব এই আমার সঙ্কল্প; এই আমার ভাগ্যলিপি! অন্য কোন প্রকারের জীবন আমার পক্ষে সম্ভবও নয়, আর বাঞ্ছনীয়ও নয়। তোমাদের সদুদ্দেশ্যের জন্য আমার অন্তরের ধন্যবাদ গ্রহণ কর। তোমাদের মঙ্গলের জন্য সর্ব্বান্তকরণে স্রষ্টার কাছে আমি প্রার্থনা করব। এখন তোমার সঙ্গীদের কাছে ফিরে যাও, আর আমার কথা তাদের শুনিয়ে দিও।"

পর্ব্বতের ভাব-বিভোর চক্ষু দু'টি আবার আকাশের দিকে ফিরে গেল। বিস্ময়াভিভূত তোতা ভক্তির সঙ্গে কুর্ণিস করে সমতল ভূমিতে ফিরে এল।

উৎসর্গ

শ্রীদিব্যেন্দু দাশগুপ্ত

আর কেহ শোনাবে না নিত্য নব গীতি—
কবি নাই—আছে তাঁর স্মৃতি।
সেই স্মৃতি মুছিবেনা জানি
মরণের যবনিকা টানি'—
মৃত্যু তারে পারিবেনা করিতে নিঃশেষ।
তার রেশ—
ক্ষণে ক্ষণে চিত্তে দেবে দোল,
সংসারের নানা কলরোল—
চকিতে তোমায় যবে করিবে উন্মনা।
জানি আমি—আমিও রবনা
চিরকাল—তাই,
চিত্তে তব পাই যেন ঠাঁই,
কবির স্মৃতির সাথে, মোর স্মৃতিখানি,
দিনু আজ আনি'।
ক্ষুদ্র মোর এ গীতিকা—হাত পাতি নিয়ো—
ভুল যদি হয়ে থাকে—আমারে ক্ষমিয়ো।

বিদ্যাপতির পদাবলী

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন

বর্ত্তমান বাঙ্গালা এবং বাঙ্গালী জাতিকে সম্পূর্ণরূপে জানিতে ও চিনিতে হইলে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের মধ্যে তাহার পরিচয় পত্রের মূলানুসন্ধান করিতে হইবে। ষোড়শ শতকের বাঙ্গালা কোন্ মন্ত্রে কোন্ পথে আপনার ভৌগলিক গণ্ডী সম্প্রসারিত করিয়াছিল, ষোড়শ শতকের বাঙ্গালী পঞ্চদশ শতাব্দীর সাধনা ও সঙ্গীতের মধ্য দিয়া রূপে রসে গীতি-গন্ধে কেমন করিয়া আপনাকে প্রায় পরিপূর্ণ শতদলে বিকশিত করিয়া তুলিয়াছিল, সে রহস্যের মর্ম্ম আজিও অনুদ্‌ঘাটিত রহিয়া গিয়াছে।

তুর্কী বিজয়ের পর হইতেই বাঙ্গালায় প্রায় শান্তি ছিল না। শমস্‌উদ্দীন ইলিয়াস শাহ বাঙ্গালাকে একছত্রা করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহাকে ও তাঁহার পুত্রকে দিল্লীর আক্রমণ সহ্য করিতে হইয়াছিল। এমনি অশান্তির মধ্যেই সমগ্র উত্তরাপথকে উচ্চকিত করিয়া চণ্ডীচরণ-পরায়ণ মহারাজা দনুজমর্দ্দনদেব নূতন মন্ত্রে দেশমাতৃকার অর্চ্চনা করিলেন। যদিও বোধনেই তাহার নিরঞ্জন ঘটিয়া গেল, তথাপি গৌড়ের নব-নির্ম্মিত রাজসরণীতে তাঁহার গৌরবদীপ্ত উদার পদাঙ্ক পরবর্ত্তী দুই একজন গৌড়েশ্বরকে প্রলুব্ধ করিয়া তুলিল। তাঁহারা মহাপ্রাণ দনুজমর্দ্দনরাজা-গণেশ ও তৎপুত্র যদু বা জলাল্-উদ্দীনকে শ্রদ্ধান্বিত সম্ভ্রমে একান্ত অকপটে অত্যন্ত হৃদ্যতার সঙ্গেই আপন আপন নিজস্ব ভঙ্গিতে অনুসরণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ফলে দেশ নূতনভাবে গড়িয়া উঠিল। বাঙ্গালী একটা জাতিতে রূপান্তরিত হইল। বাঙ্গালায় যুগান্তর ঘটিল। রাজা গণেশের বিস্তৃত পরিচয় ও সুবিস্তৃত কীর্ত্তি কথা আজিও বাঙ্গালায় আলোচিত হয় নাই। বন্ধুবর ডাঃ শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ই সর্ব্বপ্রথম ইহাঁর সত্য পরিচয় প্রকাশ করিয়াছেন। এই সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকের নিকট অনুরোধ—তিনি এই বিষয়ে অধিকতর অবহিত হউন।

একথা ঐতিহাসিক সত্যরূপে স-প্রমাণিত হইয়াছে যে বাঙ্গালা ভাষায় রামায়ণ-রচয়িতা মহাকবি-কৃত্তিবাস-পণ্ডিত মহারাজা দনুজমর্দ্দনের সভাতেই সম্মানিত হইয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে অন্য কোন কবি গৌড়েশ্বরের সভায় রাজসম্মান লাভ করেন নাই এবং বাঙ্গালা ভাষা বঙ্গেশ্বরের দরবারে স্থানপ্রাপ্ত হয় নাই। ইহাই সমধিক সম্ভব যে মহাকবি চণ্ডীদাস, পণ্ডিত কৃত্তিবাসের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বা সম-সাময়িক(?) ছিলেন। হয়তো চণ্ডীদাসের অমৃত-পদাবলী রাজা গণেশ বা তৎপুত্র যদুর সময়েই রচিত হইয়াছিল। এই দুই মহাকবি বাঙ্গালায় জাতি গঠনে সহায়তা করিয়াছেন। অতীত হিন্দু সংস্কৃতির নূতন গড়ন দিয়া তাঁহাদের কবি-কৃতি বাঙ্গালীকে নবভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। গৌড়াবনীবাসব জলালুদ্দীন পিতৃ-নিয়োজিত ব্যবস্থাপক সুপ্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত মহিন্তা গ্রামীণ বৃহস্পতিকে সম্বর্দ্ধনা দানে দেশের পণ্ডিতমণ্ডলীকে সংস্কৃত শাস্ত্রাদির চর্চ্চায় বিশেষরূপ উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালী প্রজা দুইবার রাজা নির্ব্বাচিত করিয়াছিল। অন্ততঃ দুই বারের কথাই ঐতিহাসিক সত্যরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। এই নির্ব্বাচিত নায়কের প্রথমজন হিন্দু, দ্বিতীয়জন মুসলমান। একজনের নাম নরপতি গোপাল দেব, অপরজনের নাম সুলতান হুসেন শাহ। গোপাল দেবের নির্ব্বাচনে বিশেষ বিরোধ ঘটে নাই, কিন্তু হুসেন শাহকে গৌড়ের তখ্‌তে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে প্রায় অর্দ্ধ-লক্ষাধিক প্রজা প্রাণবলি দিয়াছিল। হুসেন শাহের মত প্রজারঞ্জক নরপতি সর্ব্বদেশে সর্ব্বসময়ে জন্মগ্রহণ করেন না। রাজা গণেশের প্রায় সত্তর বৎসর পরে ইনি বঙ্গ-সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার মধ্যে ন্যূনাধিক পঞ্চাশৎ বৎসরের ইতিহাস হাবসী বিদ্রোহের ইতিহাস। সুলতান হুসেন শাহ নির্ম্মম হস্তে এই বিদ্রোহের মূলোচ্ছেদ করেন। তাঁহার সময়ে দেশে শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, প্রজাদের সুখ সমৃদ্ধি বর্দ্ধিত হয় এবং বাঙ্গালায় কাব্য-সাহিত্যে নবযুগের অভ্যুদয় ঘটে। হুসেন শাহ এবং তৎপুত্র নসরৎ শাহ বাঙ্গালী যোদ্ধা, রাজনীতিক, অর্থনীতিবিদ, বার্ত্তাজীবী, মন্ত্রকুশলী, সমাজ-সংস্থাপক, কাব্যরসিক প্রভৃতি বহু গুণী-জ্ঞানী ব্যক্তিকে সম্মানিত করিয়া দেশকে নবভাবে উজ্জীবিত করেন। ইহার কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে রাজনীতিকে সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিয়া যে তিনজন সন্ন্যাসী বাঙ্গালায় এক নূতন আন্দোলনের সূত্রপাত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম শ্রীপাদ্ লক্ষ্মীপতি পুরী, মাধবেন্দ্র পুরী ও ঈশ্বর পুরী। ঈশ্বর পুরীর নিশ্চিত পরিচয়—তিনি বাঙ্গালী ছিলেন। আমার অনুমান, অপর দুইজনেরও বাঙ্গালী পরিচয়ে বিশ্বাসের হেতু আছে। বাঙ্গালার পূর্ব্বোক্ত আবেষ্টনের পটভূমিকায় রাজনীতিকে অন্তরালে রাখিয়া তাহারই সমান্তরালে এই সন্ন্যাসী-প্রবর্ত্তিত আন্দোলনের যিনি নেতৃত্ব গ্রহণ করেন, তিনিও একজন বাঙ্গালী সন্ন্যাসী; তাঁহার নাম শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-চন্দ্র। তিনি বাঙ্গালার প্রেমাবতার, বাঙ্গালীর কাঙ্গালের ঠাকুর শ্রীমন্ মহাপ্রভু। তাঁহারই প্রভাবে বাঙ্গালী এক নূতন জাতিরূপে অভ্যুদিত হয়। তাঁহারই প্রভাবে বাঙ্গালায় মনুষ্যত্ব সমাদৃত হয়, বাঙ্গালী পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, দরিদ্র, ব্রাহ্মণ, চণ্ডালের বিভেদ ভুলিয়া ভারিত্র পুজায় অভ্যস্ত হয়। সমাজের সর্ব্বস্তরে প্রকৃত মর্য্যাদা-বোধের সঙ্গে নব বাঙ্গালীত্বের—এক অভিনব জাতীয়তা-বোধের উদ্বোধন হয়। শ্রীমন্ মহাপ্রভু প্রচারিত এই নবধর্ম্মের—বাঙ্গালীর প্রাণধর্ম্মের সূত্রগ্রন্থ ছিল—"চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক গীতি, কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ"—চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির পদাবলী, রায় রামানন্দের জগন্নাথ-বল্লভ-নাটক, বিল্বমঙ্গলের শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত এবং কবি জয়দেবের শ্রীগীতগোবিন্দ মহাকাব্য।

অতএব একথা সত্য যে "বিদ্যাপতির পদাবলী" আলোচনার আবশ্যকতা ও উপযোগিতা রহিয়াছে। মাত্র ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের জন্যই নহে, বাঙ্গালার সমাজ সংস্থিতি ও সংস্কৃতির ইতিহাসের দিক্ দিয়াও "বিদ্যাপতির পদাবলী" আলোচনা অবশ্য কর্ত্তব্য। দুঃখের বিষয় আজ পর্য্যন্ত তাহা হয় নাই। যাঁহারা এ পথে অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে সৌখীন ব্যক্তির সংখ্যাই সর্ব্বাধিক। এ দলে নামী লোক আছেন, তাঁহাদের কিন্তু নামের লোভই মুখ্য। ইহাঁদের অধিকাংশের ধারণা বিদ্যাপতির কবিতা সাধারণ নায়ক নায়িকার প্রেমের কবিতা—রাধাকৃষ্ণ তাহার রূপক মাত্র। যাঁহারা এতদপেক্ষা উচ্চকথা বলেন, তাঁহারা কৃপা-পূর্ব্বক ইহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করেন। এই উভয় সম্প্রদায়ই ভুলিয়া যান যে, যে উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগ কবি-চিত্তকে উদ্বেলিত করে, রসকে ভাবে মিলাইয়া প্রকাশ মুখর করে, বাঙ্‌ময় করে, সাকার এবং সাবয়ব করে, যে রসভাবের তরঙ্গাভিঘাত কোথাও বা প্রকাশ্যে কোথাও জনান্তিকে জনচিত্তে সংক্রামিত হইয়া বিপুল বিশাল গণশক্তিকে উদ্বোধিত করে, দুর্ব্বার ভাবাবেগের কূলপ্লাবী বন্যায় শতাব্দী-সঞ্চিত জঞ্জাল-স্তূপকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেয়, কবি কণ্ঠোদ্গীত সে সঙ্গীতকে মন্ত্র বলাই সঙ্গত। চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির পদাবলীকে এইরূপ বিশেষ দৃষ্টি-ভঙ্গী লইয়াই দেখিতে হইবে। কিন্তু জাতীয় জীবনে এই সমস্ত পদাবলীর প্রভাব ও শ্রীমন্ মহাপ্রভুর দিব্যাবদানের স্থান নির্ণয়ে আজিও আমরা নিশ্চেষ্ট রহিয়াছি। জাতির আত্মনির্দ্ধারণ ও আত্মনিয়ন্ত্রণে ব্রতী বাঙ্গালীকে এইদিকে দৃষ্টি ফিরাইতে হইবে। কিঞ্চিদূন সহস্রাব্দ পূর্ব্বে

বাঙ্গালী যাঁহাকে স্মরণ করিয়া জাতি গঠনে অগ্রসর হইয়াছিল, যাঁহার উদ্দেশে উচ্চারণ করিয়াছিল—

সোঽীহ গোপীশত কেলীকারঃ কৃষ্ণো মহাভারত সূত্রধারঃ।
অর্থঃ পুমানংশ কৃতাবতারঃ প্রাদুর্ব্বভূবোদ্ধৃত ভূমিভারঃ॥

এই যুগ সন্ধিক্ষণে রুধিরপ্রদিগ্ধ-ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড়াইয়া সমাহিত চিত্তে তাঁহাকেই—সেই ভূভারহারীকেই স্মরণ করিতে হইবে এবং প্রার্থনা করিতে হইবে, লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধ সংহারাবতার মহাকাল নহেন, রাধামুখাজে ন্যস্তদৃষ্টি শ্রীকৃষ্ণ আমাদের মঙ্গল করুন।

বিদ্যাপতির পদাবলী আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। যে প্রসঙ্গে কথাটা উঠিয়াছে, এইবার তাহারই অবতারণা করিতেছি। বঙ্গ-সাহিত্যের অকৃত্রিম বন্ধু স্বর্গগত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের ব্যয়ে বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ হইতে স্বর্গগত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের সম্পাদনায় "বিদ্যাপতি ঠাকুরের পদাবলী" প্রথম প্রকাশিত হয়—বাঙ্গালা সন তেরশত ষোল সালে। এই কার্য্যে গুপ্ত মহাশয় যেমন অসাধারণ পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তেমনই অজস্র ভুলও করিয়াছিলেন। কি কারণে জানি না, অনেক বাঙ্গালী কবির পদ তিনি মিথিলার ভাষায় রূপান্তরিত করিয়া বিদ্যাপতির নামে চালাইয়া দিয়াছিলেন। যাহা হউক সে সংস্করণখানি ফুরাইয়া গিয়াছিল, বাজারে আর পাওয়া যাইত না। স্বর্গগত সারদাচরণের সুযোগ্য পুত্র বিদ্যোৎসাহী শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র এম-এ বি-এল মহাশয় গত সন ১৩৪৮ সালে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন। বইখানির নাম দিয়াছেন "বিদ্যাপতি"। এই মহতী প্রচেষ্টার জন্য বাঙ্গালার সাহিত্য-রসিকগণ তাঁহাকে কৃতজ্ঞ অন্তরের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। আমি তাঁহাকে দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ জানাইতেছি। অধুনা স্বর্গগত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই গ্রন্থ সম্পাদন করিতেছিলেন। তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িলে রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর এম-এ, এই গ্রন্থের সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন। প্রথম হইতে তিনশত দশ সংখ্যক পদের ব্যাখ্যা বিদ্যাভূষণ মহাশয় করিয়া গিয়াছেন, বাকী পদের ব্যাখ্যা এবং শব্দসূচী রায় বাহাদুর করিয়াছেন। বিদ্যাভূষণের "নিবেদন" অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। কিন্তু রায় বাহাদুর একটী ষোল-পৃষ্ঠা-ব্যাপী "মুখবন্ধ" লিখিয়া দিয়াছেন। এই সংস্করণে নগেন গুপ্ত মহাশয়ের ভূমিকাটী সংক্ষেপ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমাদের মতে মুখবন্ধটি কমাইয়া গুপ্ত মহাশয়ের লিখিত প্রথম সংস্করণের ভূমিকাও অবিকল আদ্যোপান্ত ছাপাইয়া দেওয়া প্রয়োজন ছিল এবং সেইটিই শোভন ও সঙ্গত হইত।

বিদ্যাভূষণ মহাশয় নিবেদনে লিখিয়াছেন—"বিদ্যাপতির পদাবলী সম্পাদনের অন্তরায় অনেক। একজন বাঙ্গালী বিদ্যাপতি জুটিয়াছেন বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত অনেক পদ আবার তাঁহারই রচিত। তার পর রায়শেখর, শেখর, কবিশেখর নাম দিয়া অনেক পদ রচিত হইয়াছে। বিদ্যাপতির উপনাম কবিশেখর মনে করিয়া কেহ কেহ সেইগুলিকে বিদ্যাপতির স্কন্ধে চাপাইয়া দেন। ভূপতি সিংহ, চম্পতি, হরিবল্লভ, রতিপতি প্রভৃতির রচিত পদও আবার বিদ্যাপতির পদের সঙ্গে মিশাইয়া গিয়া থাকিবে। আজকাল কেহ কেহ সেইগুলি বাহির করিতেছেন। একবার মনে হইয়াছিল এই সমস্ত গোলমেলে পদগুলি বাদ দিয়া যাই। আবার ভাবিলাম বিদ্যাপতির রচিত পদও তো অপরের নামে চালানও বিচিত্র নয়। * * * * এখনও তেমন উপকরণ সংগৃহীত হয় নাই, যাহার বলে বিদ্যাপতির পদ বাছাই করা যাইতে পারে। কাজেই যতদুর সম্ভব পদ আমি বাদ দিই নাই। যেগুলি নিশ্চিত বিদ্যাপতির নয় সেইগুলিই বাদ দিয়াছি। অনেকগুলি পদকে কেহ কেহ বিদ্যাপতির নয় বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। আমি সেই সেই পদগুলির একটি তালিকা নিম্নে করিয়া দিলাম। পাঠকবর্গ ইচ্ছা করিলে সেগুলিকে বাদ দিয়া পড়িতে পারেন।"

বিদ্যাভূষণ মহাশয় আজ স্বর্গে। সুতরাং তাঁহার "নিবেদন" সম্বন্ধে কয়েকটী কথা সাবধানে সংক্ষেপে নিবেদন করিতেছি। বিদ্যাভূষণ মহাশয় গৌরবে বহুবচন প্রয়োগে যে "কেহ কেহ" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার প্রথম অংশের লক্ষ্য নগেন গুপ্ত মহাশয়। কারণ বিদ্যাপতির উপনাম কবিশেখর মনে করিয়া অপর কেহই কবিশেখর বা শেখর ভণিতার পদ বিদ্যাপতির স্কন্ধে চাপান নাই। একমাত্র নগেনবাবুই ঐ কাজ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় "কেহ কেহ" শব্দে স্বর্গগত সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়কে এবং আমাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। "অপ্রকাশিত পদরত্নাবলীর" ভূমিকায়, "পদকল্পতরুর" ভূমিকায় ও আরো অপরাপর প্রবন্ধে রায় মহাশয় বিদ্যাপতির পদের বিচার করেন এবং বাঙ্গালী কবিশেখর প্রভৃতির পদ চিহ্নিত করিয়া দেন। অতঃপর আমি "কবিরঞ্জন বিদ্যাপতির" পরিচয় প্রকাশ করি এবং কয়েকটী প্রবন্ধে চম্পতি প্রভৃতির পদ যে বিদ্যাপতির নামে বিদ্যাপতির পদাবলীতে গৃহীত হইয়াছে তাহা দেখাইয়া দেই। কিন্তু এ সম্বন্ধে আরো একটা কথা আছে। নগেনবাবুর সংগৃহীত পদগুলির কয়েকটী মাত্র বাদ দিয়া বিদ্যাভূষণ মহাশয় বাকী সমস্ত পদই ছাপাইয়া ফেলিয়াছিলেন। "বিদ্যাপতির নহে অথচ বিদ্যাপতি রচিত বলিয়া শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রচারিত পদ" এই শীর্ষক দিয়া তিনি শেখর বা কবিশেখর ভণিতার আঠাশটী পদ বাদ দিয়াছিলেন। তাই নিবেদনে লিখিয়াছেন—"যেগুলি নিশ্চিত বিদ্যাপতির নয়, সেইগুলিই বাদ দিয়াছি।" ব্যাপারটা কিন্তু অন্যরূপ ঘটিয়াছিল। গত ১৩৩৬ সালের ভারতবর্ষ পত্রের ভাদ্র সংখ্যায় আমার "বাঙ্গালী বিদ্যাপতি" শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের ২য় সংখ্যা "সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায়" "শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-রসকল্প-বল্লী" শীর্ষক একটা প্রবন্ধ প্রকাশ করি। ১৩৪২ সালের আশ্বিন সংখ্যা 'বঙ্গশ্রী' পত্রে আমার "কবিরঞ্জন" এই নামে একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই কয়টী প্রবন্ধে এবং প্রসঙ্গত অপর কয়েকটী লেখায় আমি "কবিরঞ্জন বিদ্যাপতি" সম্বন্ধে সুবিস্তৃত আলোচনা করি এবং প্রমাণিত করি, এই নামে শ্রীখণ্ডে সত্যই একজন পদকর্ত্তা ছিলেন, আর তাহার পদগুলি বিদ্যাপতির নামে চলিতেছে। কারণ ইতিপূর্ব্বে ইঁহার পরিচয় বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাসে অজ্ঞাত ছিল। বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রবন্ধগুলি দেখিয়াছিলেন, নিবেদনে তাহার ইঙ্গিত আছে। তথাপি কেন জানিনা নগেনবাবুর সংগৃহীত প্রায় সমস্ত পদ তিনি ছাপাইয়া ফেলেন। বইখানি যখন ছাপা হইয়া গিয়াছে, অথচ বাজারে বাহির করিতে পারিতেছেন না, এমনই অবস্থায় একদিন তাঁহার তেলিপাড়া লেনের বাসায় আমায় লইয়া গিয়া বিদ্যাপতির ছাপানো "ফাইলটী" আমার হাতে দেন এবং অপরাপর পদকর্ত্তার পদগুলি চিহ্নিত করিয়া দিতে অনুরোধ করেন। হয় তো তাঁহার অবসরাভাবেই তিনি এইরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান বিদ্যাপতির পদাবলীতে তিনি "অনেকগুলি পদকে কেহ কেহ বিদ্যাপতির নয় বলিয়া মনে করিয়া থাকেন" এইরূপ লিখিয়া যে তালিকাটী দিয়াছেন, আমি স্বীকার করিতেছি সে তালিকার দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমার। আমি সে সময় প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথবসুর "বিশ্বকোষ" প্রকাশালয়ে কার্য্য করিতাম। সুতরাং পদ নির্ব্বাচনে অধিক সময় দিতে পারি নাই। তথাপি যে সমস্ত পদ বিদ্যাপতির নহে বলিয়া চিহ্নিত করিয়া দিয়াছি সে সমস্ত পদ যে প্রকৃতই বিদ্যাপতির রচিত নয়, আমি তাহা সপ্রমাণ করিতে প্রস্তুত আছি। তালিকাটীর কথা বোধ হয় শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র মহাশয় জানেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয় তালিকার সংগ্রহে আমার নামোল্লেখ করিতে বিস্মৃত না হইলে আজ আমাকে এতটা কৈফিয়ৎ দিতে হইত না।

এইবার রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথের মুখবন্ধের কথা। আমি যখন আনন্দবাজারে বিদ্যাপতি-পদাবলীর সমালোচনা পড়িলাম, তখন ভাবিয়া আনন্দিত হইয়াছিলাম যে রায়বাহাদুরের মত সুপণ্ডিত বৈষ্ণব-

সাহিত্যাভিজ্ঞ, কৃতবিদ্য কীর্ত্তনরসিক, নিশ্চয়ই তাঁহার মুখবন্ধে বিদ্যাপতি সম্বন্ধে একটা সুচিন্তিত অভিমত দিয়া পদাবলীর সুনিপুণ বিচারে বিরুদ্ধ-সমালোচকের মুখ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। তাই পত্রের পর পত্র লিখিয়া শ্রীযুক্ত শরৎকুমারের নিকট হইতে বইখানি আনাইয়াছিলাম। যত্ন-সহকারে আদ্যোপান্ত অধ্যয়নেরও ত্রুটী করি নাই। কিন্তু দুঃখের সহিত নিবেদন করিতেছি, আশাভঙ্গে নিতান্তই ক্ষুব্ধ হইয়াছি। শরৎকুমার অর্থব্যয়ের ত্রুটী করেন নাই, বর্ত্তমানে ইহার বিক্রয়-লব্ধ অর্থে আর্থিক ক্ষতি কতটা পূরণ হইবে জানিনা, তবে ইহার মুখবন্ধে সাহিত্যের দিক্ দিয়া যে ক্ষতি হইয়াছে, সে ক্ষতি যে সহজে মিটিবে না ইহা একরূপ সুনিশ্চিত। সুদীর্ঘ বত্রিশ বৎসর পরে যে বইখানির দ্বিতীয়-সংস্করণ বাহির হইল, কতদিনে তাহার তৃতীয় সংস্করণ বাহির হইবে, আবার সে সময় রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথের মত পদাবলী-বিশেষজ্ঞ কীর্ত্তনরসিককে মুখবন্ধ লিখিবার জন্য পাওয়া যাইবে কিনা শ্রীভগবানই তাহা জানেন। যদিও রায় বাহাদুর নিজে সুপণ্ডিত, মৈথিল-ভাষাভিজ্ঞ কৃতী অধ্যাপক-বন্ধু এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অত্যুচ্চ ডিগ্রীধারী গবেষক সুকৃতী ছাত্রের সংখ্যাও তাহার অসংখ্য, আর এই সম্পাদনায় সকলে মিলিয়া পরিশ্রমও করিয়াছেন অসাধারণ, তথাপি এমন মারাত্মক ত্রুটিগুলির জন্য সত্যই আমি বিস্মিত, ব্যথিত এবং ক্ষুব্ধ না হইয়া পারিলাম না।

রায়বাহাদুর মুখবন্ধে শ্রীবৃন্দাবন হইতে সংগৃহীত বলিয়া কয়েকটি বিদ্যাপতি ভণিতার পদ তুলিয়া দিয়াছেন। পদগুলি বিদ্যাপতির নহে। আমি ১৩৪২ সালে ভাদ্র-সংখ্যা ভারতবর্ষে "বিদ্যাপতি বধ" প্রবন্ধে বিদ্যাপতিকে "শূলে" দেওয়ার কথা লিখিয়াছিলাম। রায় বাহাদুরের চারি সংখ্যক পদে "শূল কি মাঝ যবহুঁ পড়ল হাম" শূলের উল্লেখ আছে। এই শ্রেণীর পদেই সমস্যা অত্যধিক জটিলতর হইয়া উঠিয়াছে। জঞ্জাল বাড়াইয়া কোন লাভ নাই। বলা বাহুল্য পদগুলি শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে আনাইবার কোন প্রয়োজন ছিল না। এই সমস্ত পদ বাঙ্গালায় বহু বৈষ্ণব এবং সহজিয়া আউল বাউলের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়। পদের পুঁথিও নানাস্থানেই আছে। এই ছয়টি পদ এবং অপর কয়েকটি বিদ্যাপতি ভণিতার পদ বিদ্যাপতির শূলদণ্ডে-মৃত্যুকালীন্ রচনা, সহজিয়াগণ এইরূপই প্রচার করিয়া থাকেন। রায় বাহাদুরের সংগৃহীত পদের পাঠের সঙ্গে আমার পুঁথির পাঠের অনেক গরমিল আছে। ১ পদে, শুন ইহ জগজন স্থানে শুন বরযুবতী। ২ পদে, ত্রাহি ত্রাহি নটরাজ স্থলে ত্রাহি তরাহ ব্রজরাজ ইত্যাদি। উদাহরণ স্বরূপ ৪ সংখ্যক পদটি উদ্ধৃত করিলাম। এই পদে রায় বাহাদুর কৃত পাঠের কোন অর্থ বোধহয় না। পাঠকগণ মিলাইয়া দেখিবেন। আমার পুঁথিরও দুই একটি পদের পাঠ অর্থহীন।

রায় বাহাদুর ধৃত পাঠ—(মুখবন্ধ ২)

হরি হরি জনমে জনমে করি আশ।
কুমতি কঠিন জন বিপদে পড়ল যব তবহি কহল তুয়া দাস॥
সম্পদ সময়ে অশী ঘণী (?) না রাখত তাহে দেয়ল বাড়।
আচানক আই সমরে যব ভেটল দুষমনে দেওল বার॥
সম্পদ বেরি তুহারি অনুশীলন কবহু না করলহি (কাম ?)
শূলকি মাঝ যবহু পড়ল হাম তবহু জপল তুয়া নাম॥
কাতর হোই শিব শিব কহই জীবন ছটফটি জান।
অবহু রসনা বোলত ঘন ঘন কবি বিদ্যাপতি ভাণ॥

(জিজ্ঞাসা চিহ্ন রায় বাহাদুরের ব্যবহৃত)

আমার পুঁথির পাঠ—

মাধব জনমে জনমে করি আশ।
কুমতি কঠিন জন বিপদে পড়ল যব
তবহি কহল তুয়া দাস॥
সম্পদ সময়ে বচনে না বোললুঁ
তুয়া গুণ মঙ্গল দাতা।
তোহারি সুমাধুরি মন নাহি লুবধল
দুষমণ দেওল বাধা॥
তোহারি নাম গুণ অনুশীলন
সম্পদে না করলু হাম।
বিপদ সময়ে তব দাস হোয়লুঁ
তবহুঁ না পূরল কাম॥
গত অনুশোচন পুন পুন রোদন
বেদন বারিদ শ্যাম।
বিদ্যাপতি কহ বিপদে পড়ল যব
তবহু জপল তুয়া নাম॥

রায় বাহাদুর ব্রজবুলি এবং মৈথিলী ভাষা লইয়া মুখবন্ধে যেরূপ ভাসা ভাসা আলোচনা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার পাণ্ডিত্যের অনুরূপ হয় নাই। ব্রজবুলি একজনের সৃষ্ট ভাষা নহে। বিদ্যাপতির অনুকরণ করিতে গিয়া হিন্দী, মৈথিলী, বাঙ্গালা মিলাইয়া যশোরাজখান আদি কবিগণ প্রায় আপন অজ্ঞাতসারেই এই ভাষার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে ডাঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—বিশেষ করিয়া ডাঃ শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন বিস্তৃততর আলোচনা করিয়াছেন, ইঁহাদের মতের বিচার না করিয়া অবান্তর আলোচনার কোন অর্থ হয় না। ব্রজবুলির আলোচনা করিতে গিয়া রায় বাহাদুর এমন দুই একটি কথা বলিয়াছেন, যাহা প্রমাণসহ নহে। যেমন যশোরাজখানের পদ সম্বন্ধে বলিয়াছেন এই পদটি সমগ্রভাবে পাওয়া যায় না। (মুখবন্ধ ৫ পৃঃ) পদটি সম্পূর্ণই পাওয়া যায়। পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরীতে সঙ্করাভিসারিকার উদাহরণে পদটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত আছে। কীর্ত্তন-গীত-রত্নাবলী গ্রন্থেও পদটি পাওয়া যায়। আমি সম্পূর্ণ পদ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

এক পয়োধর চন্দন লেপিত আরে সহজই গোর।
হিম ধরাধর কনক ভূধর কোরে মিলল জোর॥
মাধব, তুয়া দরশন কাজে।
আধপদচারি করত সুন্দরী বাহির দেহলী মাঝে॥
ডাহিন লোচন কাজরে রঞ্জিত ধবল রহল বাম।
নীল ধবল কমল যুগলে চাঁদ পূজল কাম॥
শ্রীযুত হুসন জগত ভূষণ সেহ এহ রস জান।
পঞ্চ গৌড়েশ্বর ভোগপুরন্দর ভণে যশোরাজ খান॥

আমার বিশ্বাস—যশোরাজ খানের পদাবলীর বা কৃষ্ণমঙ্গলের কোন গ্রন্থ ছিল। এই পদ তাহারই অন্তর্গত। ইহার পূর্ব্বে মালাধর বসু গোবিন্দ-বিজয় লিপিয়াছিলেন। তাঁহার উপাধি ছিল গুণরাজ খান। সম-সময়ে চতুর্ভুজ হরিচরিত নাম দিয়া এক সংস্কৃত কাব্য লিখিয়াছিলেন। তাহারও বহু পূর্ব্বে কৃত্তিবাসের রামমঙ্গল ও চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তন লেখা হইয়া গিয়াছে। সুতরাং যশোরাজ যে একটী মাত্র পদ লিখিয়াছিলেন, ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। যশোরাজ শ্রীখণ্ডের অধিবাসী, জাতিতে বৈদ্য। রায় বাহাদুর লিখিয়াছেন 'পহিলহি রাগ' পদটী "কবি কর্ণপূরের চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকে সমগ্র ভাবে পাওয়া যায়"। বলা বাহুল্য কবিকর্ণপুর চৈতন্যচন্দ্রোদয়ে এই পদটী উদ্ধার করেন নাই। তিনি এই ধরণের একটী সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়া বা তুলিয়া দিয়াছেন। অতএব পদটী চৈতন্য-চন্দ্রোদয়ে সমগ্রভাবেই কি, আর আংশিক ভাবেই কি—মোটেই পাওয়া যায় না। পদটী কবি-কর্ণপূরের চৈতন্য-চরিত-মহাকাব্যে আছে। মুখবন্ধে এইরূপ আপ্ত-বাক্যের সংখ্যা মোটের উপর মন্দ হইবে না।

রায় বাহাদুর লিখিয়াছেন (মুখবন্ধ ৮ পৃঃ) "ইতিমধ্যে ছোট

বিদ্যাপতি বলিয়া শ্রীখণ্ডবাসী এক বিদ্যাপতির অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে (ভারতবর্ষ—১৩৩৬ সাল); এই ব্যক্তি কবিরঞ্জন ও বিদ্যাপতির ভণিতা দিয়া পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। মৈথিল কবি বিদ্যাপতিরও কবিরঞ্জন উপাধি ছিল জানা যায়। কাজেই সমস্যা আরো জটিল হইয়া পড়িল। বিদ্যাপতি ভণিতার যে বাঙ্গালা পদগুলি প্রচলিত আছে, তাহা এই বিদ্যাপতির হইতেও পারে। কিন্তু 'ছোট বিদ্যাপতি বলি যাহার খেয়াতি' তিনি বিদ্যাপতির অন্তরালে নিজের অস্তিত্ব একেবারে লোপ করিয়া দিলেন কেন, এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নহে। একটা লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে 'শ্রীরঘুনন্দনের ভক্ত' এই ছোট বিদ্যাপতি 'বিদ্যাপতি' ভণিতায় কোন গৌর সম্বন্ধীয় পদাবলী লিখেন নাই। বিদ্যাপতি, ছোট বিদ্যাপতি, রঞ্জন বা কবিরঞ্জন ভণিতায় গৌরাঙ্গ সম্বন্ধীয় পদ পাওয়া গেলে এ বিষয়ের কিছু সুমীমাংসা হইতে পারে। আপাততঃ ইহাই ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে বিদ্যাপতির যশোলুব্ধ বাঙ্গালী কবি নিজের পদে বিদ্যাপতির নাম চালাইয়া দিয়াছেন। চণ্ডীদাসের সম্পর্কেও এইরূপ বিভ্রাট ঘটিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন লেখক চণ্ডীদাস নাম দিয়া পদ রচনা করিয়া চণ্ডীদাস সমস্যাটীকে অসম্ভব রকম জটিল করিয়া তুলিয়াছেন"।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই সমস্ত বিখ্যাতনামা পণ্ডিত ব্যক্তি মাঝে মাঝে এমন সব কথা বলিয়া বসেন, যাহার ফলে আমাদের মত নগণ্য-ব্যক্তির নাভিশ্বাস উপস্থিত হয়। ইহাঁদের ছাত্রমহলে, গুণমুগ্ধ বন্ধু, ভক্ত ও পাঠকবর্গের মধ্যে এই সমস্ত কথা সহজেই ছড়াইয়া পড়ে, প্রামাণ্য গণ্য হয়। অবশেষে এই জঞ্জালস্তূপ পরিষ্কার করিতে প্রয়োজনাতিরিক্ত ইন্ধনের অপব্যয়ে সময়ে সময়ে আমরা নিতান্তই বিপন্ন হইয়া পড়ি। ১৩৩৬ সালের ভারতবর্ষের (ভাদ্র সংখ্যা) প্রবন্ধটী আমারই লেখা। রায় বাহাদুর এই প্রবন্ধটী ধৈর্য্য ধরিয়া আদ্যোপান্ত নিজে পাঠ করিলে অন্ততঃ আজিকার এই বিপদের হস্ত হইতে আমি নিস্তার লাভ করিতাম। উক্ত প্রবন্ধে রায় বাহাদুরের প্রশ্নের সমস্ত উত্তর দেওয়া আছে। পুনরায় সংক্ষেপে নিবেদন করিতেছি। মিথিলার বিদ্যাপতির যে কবিরঞ্জন উপাধি ছিল, তাহার কোন প্রমাণ নাই। নেপাল বা মিথিলার কোন পুঁথিতেই তাহার সমর্থন পাওয়া যায় না। স্বর্গগত নগেন গুপ্ত মহাশয় "চণ্ডীদাস কবিরঞ্জনে মিলন" চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি মিলনের এই ছত্রটী হইতে মিথিলার বিদ্যাপতিকে কবিরঞ্জন উপাধি দান করিয়াছিলেন। অথচ এই ভূমিকায় মিলন কাল্পনিক বলিয়া গিয়াছেন। রঘুনন্দন ভক্ত এই বিদ্যাপতির কবিরঞ্জন ও বিদ্যাপতি ভণিতার শ্রীগৌরাঙ্গ সম্বন্ধীয় পদ আছে। সেই পদ দুইটী ১৩৩৬ সালের ভারতবর্ষের প্রবন্ধে আমি ছাপাইয়া দিয়াছি। একটী পদ রামগোপাল দাস শাখা নির্ণয়ে নিজেই চিহ্নিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

শ্রীখণ্ডের সুকবি রামগোপাল দাস "বাণ অঙ্গ শর ব্রহ্ম নরপতি শাকে" রসকল্পবল্লী রচনা করেন। সে আজ কম-বেশী প্রায় তিনশত বৎসরের কথা। এই গোপালদাসের রচিত নরহরি ও রঘুনন্দনের "শাখা নির্ণয়" সন ১৩১৬ সালে শ্রীখণ্ড হইতে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তিকার ১৬ পৃষ্ঠায় ছাপা আছে—

"কবিরঞ্জন বৈদ্য আছিল খণ্ডবাসি।
যাহার কবিতা গীত ত্রিভুবন ভাসি॥
তার হয় শ্রীরঘুনন্দনে ভক্তি বড়।
প্রভুর বর্ণনা পদ করিলেন দঢ়॥

পদং যথা—শ্যাম গৌরবরণ এক দেহ ইত্যাদি

গীতেষু বিদ্যাপতি বদ্ বিলাসঃ।
শ্লোকেষু সাক্ষাৎ কবি কালিদাসঃ॥
রূপেষু নির্জ্জিৎ সিত পঞ্চবাণঃ।
শ্রীরঞ্জনঃ সর্ব্ব কলা নিধানং॥

ছোট বিদ্যাপতি বলি যাহার খেয়াতি।
যাহার কবিতা গানে ঘুচায় দুর্গতি॥"

"শ্যাম গৌরবরণ এক দেহ" পদটী যে কবিরঞ্জন রচিত, এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। আমি পদকল্পতরু হইতে পদটী তুলিয়া দিতেছি। কোন কোন পুঁথিতে পদটি কবিশেখর বা রায়শেখর ভণিতায় আছে। কিন্তু অধিকাংশ পুঁথিতে কবিরঞ্জন ভণিতায় পাওয়া যায় এবং এক্ষেত্রে তিনশত বৎসরের রামগোপাল দাসের প্রমাণ বলবত্তর। পদকল্পতরু পরিষৎ সং এই পদের সংখ্যা ২১৮৯। বটতলার ছাপা পুঁথিতে সংখ্যা ২১৪২। পদরসসারে এই পদের সংখ্যা ২২৯৭।

"শ্যাম গৌরবরণ এক দেহ।
পামর জন ইথে করয়ে সন্দেহ॥
সৌরভে আগোর মুরতি রস সার।
পাকল ভেল জম্বু ফল সহকার॥
গোপ জনম পুন দ্বিজ অবতার।
নিগমে না জানয়ে নিগূঢ় বিহার॥
প্রকট করিল হরিনাম বাখান।
নারি পুরুখ মুখে না শুনিয়ে আন॥
ত্রিপুরা চরণ কমল মধু পান।
সরস সঙ্গীত কবিরঞ্জন গান॥"

কোন কোন পুঁথিতে ইহার ভণিতা এইরূপ—"শ্রীরঘুনন্দন চরণ করি সার। কহে কবিরঞ্জন (কোন কোন পুঁথিতে কহে কবিশেখর) গতি নাহি আর॥" লক্ষ্য করিবার বিষয় কাঁচা আমের রংএর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের দেহ বর্ণের এবং পাকা আমের রংএর সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গের দেহ বর্ণের তুলনা করা হইয়াছে। সেই সঙ্গে কবি যেন শ্রীকৃষ্ণাপেক্ষা শ্রীগৌরাঙ্গে করুণা ও মাধুর্য্যের প্রৌঢ়িমার ইঙ্গিত করিয়াছেন। আমরা বিদ্যাপতি ভণিতার শ্রীগৌরাঙ্গের উল্লেখযুক্ত একটি পদ উদ্ধৃত করিতেছি। এই পদটি ভারতবর্ষের প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্যামরু শোকে সিন্ধু নিরমাওল তথি পর আনল ডারি।
সব গুণে হারল যো কছু রহি গেল হৃদি কম্পিত বরনারি॥
সখি হে অব নাহি মিলব কান।
গোপতি নন্দন সো কাহে মারব আপহি তেজব পরাণ॥
গিরি তনয়াধব কতহিঁ নাম লব জপি জপি জীবন শেষ।
নিজ বসন লাগে আগি সব রজনী দশমী দশা পরবেশ॥
অমরাবতি পতি ঘরণী গুণ দ্বয় যদি মধু হোয়ত মাই।
বিদ্যাপতি কহ ভাবি মরব কাহে না মিলল নিঠুর মাধাই॥

গোপতি নন্দন+গোপরাজ নন্দের পুত্র। গিরি তনয়াধব+গিরিজাপতি স্মরারি শঙ্কর। অমরাবতি পতি+ইন্দ্র—তাহার ঘরণী শচী। দ্বিতীয় গুণ রজোগুণ—রজ। শচীরজ+শ্রীগৌরাঙ্গ। শচীদুলাল যদি আমার হয়, তবে নিঠুর মাধবকে না পাওয়া গেলেও কেন ভাবিয়া মরিব! ১৩৩৬ সালের প্রবন্ধ প্রকাশের পর আমরা কবিরঞ্জন ভণিতায় অপর একটি শ্রীগৌরাঙ্গ বিষয়ক অতি সুন্দর পদ পাইয়াছি। পদটি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

মহানস ব্রজভূমি মাহ।

কয়লহি ভাব রসে	স্বাদু সুধাধিক	যোগিনি পাক নিরবাহ॥
অগম যোগস্থল	কো পরবেশব	রোয়ে অমর নরবৃন্দ।
ভোখ পিয়াসে	কোন্ বিলাওব	দুলহ অমিয় মকরন্দ॥
জগভরি জয় জয়	নদীয়া মহাকাশে	উয়ল গউরবর ইন্দু।
দূরে গেও উচনীচ	ভাসল ত্রিভুবন	উথলল কৌমুদী সিন্ধু॥

অভেদ সুর নর শ্বপচ দ্বিজবর সুচির অনর্পিত প্রেমা।
অঞ্চলে পাওল গোলক বৈভব রঙ্ক নিশঙ্কিত হেমা ॥
পাই পরমান্ন দীন অধম জন ধনি ধনি কলি যুগ বন্দে।
কবিরঞ্জন ভণ ঐছে নিবেদন রঘুনন্দন পদ দ্বন্দে ॥

পদটির অর্থ সম্ভবত এইরূপ—ব্রজভূমি রন্ধনশালা মধ্যে যোগিনী (যোগমায়া, [মাতরঞ্চ মহানসে :—রন্ধনশালার জননীরই অধিকার] ব্রজ অধিদেবী পৌর্ণমাসি) ভাব রসে অমৃত অধিক স্বাদু পাক নির্ব্বাহ করিলেন। সেই অগম্য যোগস্থলে কে প্রবেশ করিবে। ক্ষুধা তৃষ্ণায় অমর নর কাঁদিতেছে। দুর্লভ অমৃত মকরন্দ কে বিলাইবে। (এমনই একদিন অকস্মাৎ) জগত ভরিয়া জয়ধ্বনি উঠিল। নদীয়া মহাকাশে শ্রেষ্ঠ গৌরাঙ্গ ইন্দু উদিত হইলেন। কৌমুদী সিন্ধু উথলিল, ত্রিভুবন ভাসিল, উচ্চনীচ দূরে গেল। ব্রাহ্মণ চণ্ডাল দেবতা মানুষের ভেদ দূর হইল। গোলকবৈভব সুচির অনর্পিত প্রেম-রূপ হেম অঞ্চলে পাইয়া চির দরিদ্রও নিঃশঙ্ক হইল। অথবা গোলকের বৈভব অনর্পিত প্রেমরূপ-হেম চির দরিদ্রও নির্ভয়ে অঞ্চলে বাঁধিয়া লইল। দীন অধমেও পরমান্ন প্রাপ্ত হইয়া ধন্য ধন্য কলিযুগকে বন্দনা করে। কবিরঞ্জন বলিতেছেন—রঘুনন্দন পদযুগলে আমারও ঐ নিবেদন।

শ্রীখণ্ডের কয়েকজন সুকবি বৈদ্যপ্রধানের পরিচয় দিতে গিয়া রামগোপাল দাস রসকল্পবল্লীতে লিখিয়াছেন—"শ্রীকবিরঞ্জন দামোদর মহাকবি। যশোরাজখান আদি সবে রাজসেবী ॥" দামোদর গোবিন্দ-কবিরাজের মাতামহ। দামোদর এবং যশোরাজখান হুসেন সাহের আশ্রিত ছিলেন। কবিরঞ্জন হুসেন শাহের পুত্র নসরৎ শাহের অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন। একটি পদের ভণিতা এইরূপ—"সে যে নাসিরা শাহ জানে, যারে হানিল মদন বাণে, চিরঞ্জীব রহু পঞ্চ গৌড়েশ্বর শ্রীকবিরঞ্জন ভানে।" কিম্বা কবি বিদ্যাপতি ভানে। অপর একটি পদ—

নমুঙা বদনি ধনি বচন কহসি হসি।
অমিয়া বরিখে জনু শরদ পুনিম শশি ॥
অপরূপ রূপ রমণী মণি।
যাইতে পেখল গজরাজ গমনি ধনি ॥
সিংহ জিনি মাঝা খিনি তনু অতি কমলিনী।
কুচ সিরি ফল ভরে ভাঙ্গি পড়ব জানি ॥
কাজরে রঞ্জিত বণি ধয়ল নয়ন বর।
ভমর মিলল জনু বিমল কমল পর ॥
কবিরঞ্জন ভণে অশেষ অনুমানি।
রাএ নসরৎ শাহ ভুলল কমলা বাণী ॥

ভণিতার পাঠান্তর, (১) কবিরঞ্জন ভণে অপরূপ রূপ দেখি। রায় নসরৎ শাহ ভুললি কমলমুখী ॥ (২) কবিরঞ্জন ভানি অশেষ অনুমানি। নসিরা শাহ মধুপ ভুলল কমলা বাণী।

নাসীর উদ্দীন নসরৎ শাহ ১৫১৯ হইতে ১৫৩৩ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীগৌরাঙ্গদেব অন্তর্হিত হন। এই সময় মধ্যেই রঘুনন্দন প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং কবিরঞ্জন এই সময়েই বর্ত্তমান ছিলেন এবং তিনি শ্রীমন্ মহাপ্রভুর দর্শন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা চলে। খ্রীঃ ষোড়শ শতকের ১ম হইতে মধ্যভাগ পর্য্যন্ত দামোদর, যশোরাজ, কবিরঞ্জন প্রভৃতির সময় ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। কবিরঞ্জনের সমস্ত পদ এবং রায়শেখর প্রভৃতির বহু পদ মিথিলার বিদ্যাপতির নামে চলিয়া গিয়াছে। আজি চারিশত বৎসর পরে তাহার আলোচনা চলিতেছে।

মিথিলার বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত বয়ঃসন্ধির পদগুলি অত্যন্ত সাবধানে গ্রহণ করিতে হইবে। রামগোপাল দাস বলিয়া গিয়াছেন—

'রঘুনন্দনের শাখা নয়নানন্দ কবিরাজ।
যার শাখা উপশাখায় ভরিল ভবমাঝ ॥
বয়ঃসন্ধি রসে হয় যাহার বর্ণন।
ভাগ্যবান যেই সেই করয়ে স্মরণ ॥"

বয়ঃসন্ধির পদগুলি বিদ্যাপতির পদ সন্নিবেশে অত্যন্ত অসংলগ্ন মনে হয়। শ্রীখণ্ডের নয়নানন্দের সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান আবশ্যক। আশা করি রায় বাহাদুর অতঃপর—"আপাতত ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে বিদ্যাপতির যশোলুব্ধ বাঙ্গালী কবি নিজের পদে বিদ্যাপতির নাম চালাইয়া দিয়াছেন" তাঁহার এই অসম্বদ্ধ উক্তি প্রত্যাহার করিবেন। যশোলুব্ধ কাহারা, সাধারণে তাহার বিচার না করিলেও একদিন অন্যত্র তাহার বিচার হইবে। বৈষ্ণব কবিগণের সম্বন্ধে আপাততও ঐরূপ ধরিয়া লওয়া অপরাধ, বৈষ্ণব রায় বাহাদুরকে সে কথা স্মরণ করিতে অনুরোধ করিতেছি। এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝিতে কষ্ট হইতেছে না—"চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির" সমস্যা কাহারা অসম্ভব জটিল করিয়া তুলিতেছেন!

(মুখবন্ধ ১১) রায় বাহাদুর লিখিয়াছেন—"দশাবতারের স্তোত্র গান করিয়া যে জয়দেব কৃষ্ণের ভগবত্তা বিষয়ে বলিয়াছেন 'দশাকৃতি কৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নম'। তিনিই আবার আশীর্ব্বাদ শ্লোকে বলিতেছেন—'রাধায়াঃ স্তন কোরকোপরি মিলন্নেত্রো হরিঃ পাতু বঃ' এ রহস্য আমরা বর্ত্তমান যুগে বুঝিতে পারি না"। ইহা বিনয় না হইলে আশঙ্কার কথা। কারণ এ রহস্য কথঞ্চিৎ না বুঝিলে বৈষ্ণব পদাবলী আলোচনা চলিবে না। এই স্বীকারোক্তি সত্য হইলে তাঁহাকে আমার সম্পাদিত "কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ" পাঠ করিতে অনুরোধ করি। ঐ গ্রন্থের ভূমিকায় আমি যথাসাধ্য উক্ত রহস্যেরই আলোচনা করিয়াছি এবং প্রায় ঐ ভাষাতেই করিয়াছি।

রায় বাহাদুর বিদ্যাপতির "বারমাস্যার" উল্লেখ করিয়াছেন। চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির সময়ে "বারমাস্যা" বর্ণনার রীতি ছিল না। তবে যদি মিথিলায় ঐরূপ পদ পাওয়া গিয়া থাকে এবং সে পদ সত্যই বিদ্যাপতির রচিত হয়, তাহা হইলে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে মিথিলার বিদ্যাপতিই বারমাস্যা পদরচনার পথপ্রদর্শক। পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত বিদ্যাপতি, গোবিন্দ কবিরাজ ও গোবিন্দ চক্রবর্তীর মিলিত রচনায় সম্পূর্ণ বলিয়া কথিত বারমাস্যার পদের প্রথম চারিটী পদ বিদ্যাপতির রচিত এইরূপ প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে। বৈষ্ণব দাস নাকি এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন। আমাদের কিন্তু ঐ পদ সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ আছে। ঐ পদে মিথিলার কবির রচনার কোন লক্ষণই নাই। উহা কোন বাঙ্গালী কবির—সম্ভবতঃ কবিরঞ্জনের হইতে পারে। ছোট বিদ্যাপতির জনশ্রুতি মিথিলার বিদ্যাপতির সঙ্গে মিশিয়া যাওয়ায় হয় তো বৈষ্ণব দাস ঐরূপ লিখিয়া থাকিবেন। পদের শেষে গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী নিজের ভণিতা দিয়াছেন। লক্ষ্য করিবার বিষয়—মাঝের দুইটী পদের রচয়িতা বলিয়া গোবিন্দ দাসের নামও উল্লেখ করিয়াছেন—"রোই ঝর ঝর নিঝর লোচন বিষম অবদৌ মাস। কতিহুঁ অন্তর ততহি রহলিহ হমারি গোবিন্দ দাস"। কিন্তু প্রথম চারিটী পদের জন্য লিখিয়াছেন—"মোর হেরি সখী কোই। চৌঠ মাস বহু রোই" ॥ রচয়িতার পরিচয় জানা থাকিলে তিনি নিশ্চয়ই এখানে কবির নাম উল্লেখ করিতেন।

কবি বড়ু চণ্ডীদাস আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন—রাধাবিরহ-খণ্ডে এই চাতুর্ম্মাস্যেরই বর্ণনা করিয়াছেন। ভূপতি সিংহ বা সিংহ ভূপতি "মোর বন বন সোর শুনত বাঢ়ত মনমথ পীড়" এই পদে আশ্বিন পর্য্যন্ত "চতুরমাসকি বোল" বর্ণনা করিয়াছেন। বিদ্যাপতির বারমাস্যার—"পুনমতি সুতলি পিয়তম কোর। বিধিবস দৈব বাম ভেল মোর" ॥ এই দুই পংক্তির মিল লক্ষ্যণীয়। কৃষ্ণকীর্ত্তনের রসভাব প্রগাঢ় বহু পদের সঙ্গে বিদ্যাপতির কতকগুলি পদের বিশেষ সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিদ্যাপতির পদাবলী আলোচনায় আবশ্যকতা ও

উপযোগিতা আছে। এতদিনে আলোচনার উপযোগী উপকরণও প্রচুর আবিষ্কৃত হইয়াছে। সুতরাং মৈথিল ভাষাভিজ্ঞ কোন রসবোধ-সম্পন্ন বাঙ্গালী সাহিত্যসেবী যদি এই পথে অগ্রসর হন, তবে তাঁহার দ্বারা এই কাজ সম্ভব হইতে পারে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় শেখর, চম্পতি প্রভৃতি বাঙ্গালী কবির পদগুলি নগেন্দ্র গুপ্তের মত আলোচ্য পদাবলীতেও মৈথিলে রূপান্তরিত করা হইয়াছে, কিম্বা করিবার জন্য যত্ন লওয়া হইয়াছে। সম্পাদক হয় তো নগেন্দ্রবাবুর সংগৃহীত পদগুলিই ছাপাইয়া দিয়াছেন। মিথিলাতেও প্রণালীবদ্ধভাবে এই কার্য্য চলিতেছে। কৃষ্ণকীর্ত্তন ছাপানো আছে। চণ্ডীদাস পদাবলীর ১ম খণ্ড ছাপানো আছে। দীন-চণ্ডীদাসের পদের প্রায় সম্পূর্ণ পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। এই সময় একটু চেষ্টা করিলেই চণ্ডীদাস-সমস্যার সমাধান হইতে পারে। তেমনই নগেনবাবুর পুরানো সংস্করণ ও বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত এই দ্বিতীয় সংস্করণ লইয়াই এখন বিদ্যাপতি সম্বন্ধীয় গোলযোগও মিটিতে পারে। তবে এই কার্য্যে কিঞ্চিৎ পরিশ্রম করিতে হইবে। ভাষাতত্ত্ব ও তাহার ব্যাকরণ জানিতে হইবে। পদাবলী পড়িতে হইবে। কবিতা বুঝিতে হইবে। ভানু দত্ত প্রভৃতি মৈথিল আলঙ্কারিকগণের সন্ধান লইতে হইবে। এইরূপে নিরপেক্ষ অন্তঃকরণ ও সংস্কার-মুক্ত মন লইয়া কোন সহৃদয় সাহিত্য সাধক যদি এই পথে অনুকূল অনুশীলনে অগ্রসর হন, তাহা হইলেই "বিদ্যাপতির পদাবলীর" সুমীমাংসা ও বিদ্যাপতি সমস্যার সমাধান হইতে পারে। বাঙ্গালার যুবকদের মধ্যে কি এমন একজনকেও পাওয়া যাইবে না ? (১)

(১) রসকল্পবল্লী গ্রন্থে কবিরঞ্জনের পদ বা পদাংশ

(১) নব দর্শনে নবীন নারী
(২) গুরুয়া গরজে ঘন গগনে না গণে মন
(৩) দৃঢ় বিশোয়াসে পন্থ নেহারি
(৪) কি কহব মাধব পিরীতি তোহার
(৫) চরণ নখ রমণীরঞ্জন ছান্দ
(৬) উধসল কুন্তল ভারা

পদকল্পতরুতে—

(১) আর কবে হবে মোর শুভক্ষণ দিন
(২) কি কহব রে সখি আজুক বিচার
(৩) কি পুছসি রে সখি কানুক নেহ
(৪) পুরুখ রতন হেরি মন ভেল ভোর
(৫) উদপল কুন্তল ভারা
(৬) কি কব রাইএর গুণের কথা
(৭) আর সখি কবে হাম সো ব্রজে যায়ব

রসমঞ্জরীতে

(১) দৃঢ় বিশোয়াসে তুয়া পন্থ নেহারি
(২) পন্থ পিছোর নিশি কাজর কাঁতি
(৩) চরণ নখ রমণীরঞ্জন ছান্দ

অপ্রকাশিত পদরত্নাবলীতে

১) সখি হে তোহে কহু আজুক ভাখি
(২) এ ধনি এক নিবেদন তোয়
(৩) হার উর মরকত মুকুরক জ্যোতি

ত্রিপুরা আগরতলায় ত্রিপুরারাজের গ্রন্থাগারে রক্ষিত নরহরি চক্রবর্ত্তীর গীতচন্দ্রোদয় গ্রন্থে কবিরঞ্জনের কয়েকটা পদ আছে। অনুসন্ধান করিলে আরো নূতন পদ আবিষ্কৃত হইতে পারে। বিদ্যাপতির পদাবলীতে সহস্রাধিক পদ বিদ্যাপতির নামে গৃহীত হইয়াছে। অনেক পদে ভণিতা নাই, সেগুলি কোন প্রমাণে বিদ্যাপতির নামে গৃহীত হইয়াছে জানি না। মোটের উপর ভালরূপ আলোচনা করিলে বর্ত্তমান পদাবলী হইতে অন্ততঃ পাঁচশত পদ বাদ যাইবে। আমি যে তালিকা দিয়াছি তাহারই সংখ্যা তিনশতের কম হইবে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৬৪ সংখ্যক পুঁথিতে "আজু গোধুলি পেখলি বালা" এই পদটীতে—"সাহু হুসেন্ জানে যারে হানল মদন বাণে চিরঞ্জীবি রহু পঞ্চ গৌড়েশ্বর কবি বিদ্যাপতি ভাণে"॥ এই পাঠ আছে। অন্যত্র "যব গোধুলি সময় বেলি" উপরোক্ত পদের এইরূপ আরম্ভ ধরিয়া ভণিতার পাঠ পাইয়াছি—

"সে যে নসিরা শাহজানে
যারে হানল মদন বাণে
চিরঞ্জীব রহু পঞ্চ গৌড়েশ্বর
শ্রীকবিরঞ্জন ভাণে"।

ঢাকার ২৩৫৩ সং পুঁথিতে "গগনে গরজে ঘন" পদটী সম্পূর্ণ পাওয়া গিয়াছে। বারমাস্যা সম্বন্ধে লক্ষ্যণীয়—জ্ঞানদাসও আষাঢ় হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত চাতুর্ম্মাস্যের বর্ণনা করিয়াছেন।

সমালোচনার উত্তর

রায় বাহাদুর অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন 'বিদ্যাপতি' সম্বন্ধে যে সমালোচনা করিয়াছেন, ভারতবর্ষের সম্পাদক মহাশয় তদ্বিষয়ে আমার বক্তব্য প্রকাশের সুযোগ দান করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিলেন। আমার প্রথম বক্তব্য এই যে বিদ্যাপতির দ্বিতীয় সংস্করণ সম্বন্ধে এতাবৎ যে সকল সমালোচনা বাহির হইয়াছে তাহার সবগুলিই অনুকূল। সুতরাং বর্ত্তমান প্রতিকূল সমালোচনায় ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, এখনও এ সম্বন্ধে কাজ করিবার অবকাশ যথেষ্টই আছে। বাঙ্গালীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি রূপেই নহেন, কবিগুরু হিসাবেও বটে, 'বিদ্যাপতি' সম্বন্ধে যতই আলোচনা হয় ততই আমাদের জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? কেহ কেহ বিদ্যাপতির কবিতা শুধু গীত রূপেই আস্বাদন করিতে চাহেন, কেহ কেহ উহাকে প্রেমের বিলাস-নিকুঞ্জ রূপে দেখিয়াছেন, বৈষ্ণবেরা অর্থাৎ ভজনানন্দী যুগলোপাসকেরা ইহাকে বিশেষ প্রেরণালব্ধ স্তোত্র হিসাবে গণ্য করেন। বর্ত্তমানকালে শেষোক্ত সম্প্রদায়ের সংখ্যা অত্যন্ত বিরল। স্তোত্র মন্ত্রের যুগ পার হইয়া গিয়াছে, এখনকার আলোচনায় পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকার দৃষ্টিভঙ্গীর সমন্বয় হইলেই বোধ হয় শোভন হয়। শ্রীযুক্ত সাহিত্যরত্ন মহাশয়ের বিদ্যাপতি সম্বন্ধে আবেগময় অনুরাগ দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। তিনি বিদ্যাপতির কবিতাকে "মন্ত্র" রূপে গ্রহণ করায় অনেক সংশয়ান্দোলিত চিত্তে উৎসাহ জাগিবে।

বিদ্যাপতির পদাবলীর দ্বিতীয় সংস্করণ-প্রণয়নে আমার যে দায়িত্বের কথা হরেকৃষ্ণবাবু উল্লেখ করিয়াছেন, তদতিরিক্ত বক্তব্য মাত্র এই যে বন্ধুবর অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় মারাত্মক রূপে অসুস্থ হইয়া পড়িলে তাঁহার এই অসম্পূর্ণ কার্য সম্পূর্ণ করিবার গুরুভার গ্রহণ করিবার জন্য শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র অন্য কাহারও শরণাপন্ন হইয়াছিলেন কিনা জানি না। যোগ্যতর ব্যক্তি অনেক ছিলেন সন্দেহ নাই। কিন্তু একদিন সন্ধ্যায় প্রবল ঝটিকাবর্ত্তের মধ্যে যখন শরৎবাবু আমার ভবনে আসিয়া আমার সহায়তা প্রার্থনা করিলেন, তখন আমি অন্তিমশয্যায় শায়িত বন্ধুর কথা চিন্তা করিয়াই এ কার্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং নিঃস্বার্থ-ভাবে আমার যথাসাধ্য পরিশ্রম করিতে যে ত্রুটি করি নাই, তাহার সাক্ষ্য বন্ধুবর শরৎবাবুই দিতে পারিবেন।

এক্ষণে বর্ত্তমান সমালোচনার কথায় আসা যাউক। হরেকৃষ্ণবাবুর বক্তব্য মোটামুটি এই কয়েকটি :

(১) আমার 'মুখবন্ধ' তাঁহার মনঃপূত হয় নাই।

(২) ঐ মুখবন্ধে কয়েকটি মারাত্মক ভুল আছে যথা :

(ক) যশোরাজ খানের পদ সমগ্রভাবে পাওয়া যায় না আমার এই উক্তি ভুল।

(খ) কবিকর্ণপুরের চৈতন্যচন্দ্রোদয়ে রামানন্দ রায়ের পদ আছে বলিয়া আমি ভুল করিয়াছি।

(৩) কবিরঞ্জন বিদ্যাপতি সম্বন্ধে আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা প্রমাণসহ নহে।

(৪) বিদ্যাপতির যে সকল পদ আমি ভূমিকায় নবাবিষ্কৃত বলিয়া দাবী করিয়াছি, তাহা বহু পরিচিত এবং অনেক স্থলেই শুনিতে পাওয়া যায়।

এতদ্‌ব্যতীত 'ব্রজবুলির' উৎপত্তি, বারোমাস্যার পদ এবং বয়ঃসন্ধির পদ সম্বন্ধে হরেকৃষ্ণবাবু অনেক পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণা করিয়াছেন, যাহার সহিত আমার সম্বন্ধ অতি অল্প, বিদ্যাপতির সম্বন্ধও যে বেশী আছে তাহা মনে হয় না। মূল প্রতিবাদগুলি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতেছি। এখানে একটি কথা বলিয়া রাখা অন্যায় নহে ; বিদ্যাপতির কাব্যের ন্যায় কঠিন বিষয়ের আলোচনায় ভুল-ভ্রান্তি হওয়া স্বাভাবিক। বিদ্যাপতির ভাষা সম্বন্ধে, মত সম্বন্ধে, কাল সম্বন্ধে বহু সমস্যা এখনও সমাধানের প্রতীক্ষা করিতেছে। ইহার কোনটি সম্বন্ধে শেষ কথা বলিতে যাইবার ধৃষ্টতা আমার নাই।

(১) আমার মুখবন্ধ পড়িয়া হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় 'বিস্মিত ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ' হইয়াছেন। তাঁহার অনমুকূলতার অবশ্যই কারণ আছে। কিন্তু সাধারণ ভাবে উক্ত মন্তব্যের প্রতিবাদ অনাবশ্যক, যেহেতু তিনি তাঁহার বিস্ময়, ব্যথা ও ক্ষোভের কারণ অন্যত্র প্রদর্শন করিয়াছেন। সেই কারণগুলি যদি যুক্তিযুক্ত না হয়, তাহা হইলে তাঁহার সাধারণ উক্তি অসার হইয়া পড়ে। তবে তিনি একটি কথা বলিয়াছেন যাহার প্রত্যুত্তর এখানে দেওয়া আবশ্যক মনে করি। নগেন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের ভূমিকা সঙ্ক্ষেপে দিয়াছি বলিয়া তিনি ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। বিদ্যাপতির প্রথম সংস্করণে সম্পাদক যাহা বলিয়াছিলেন তাহার কতক (যেমন বিদ্যাপতির পাঠ-সমস্যা) এখন সকলেই মানিয়া লইয়াছেন। সুতরাং সে সময়ে তিনি যে প্রমাণের উপর প্রমাণ আহরণ করিয়া তাঁহার মন্তব্য দৃঢ়ীভূত করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহার প্রয়োজনীয়তা অনেক কমিয়া গিয়াছে। কতকাংশ বর্ত্তমান জ্ঞানের অবস্থায় সন্দেহাত্মক হইয়া পড়িয়াছে, সেই জন্যই এবং বাহুল্য-বর্জনের অভিপ্রায়ে কিছু কিছু বাদ দিয়াছি। তথাপি বর্ত্তমান সংস্করণে নগেন্দ্রবাবুর ভূমিকা ২৭ পৃষ্ঠা ব্যাপিয়া রহিয়াছে। অমূল্যবাবুর সম্পাদিত প্রথম খণ্ডে নগেন্দ্রনাথের ভূমিকা-মুদ্রণের কোনও সংকল্প ছিল বলিয়া জানা যায় না। আমিই উহা দিয়াছি, যদিও কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত আকারে। আমার 'মুখবন্ধ' না দিলে হইত, হরেকৃষ্ণবাবুর এই উক্তির শুধু জবাব হিসাবে সমালোচকের নিজেরই একটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়া তাঁহারই অনুমোদিত যুক্তি বোধ হয় প্রয়োগ করা যাইতে পারে। তিনি লিখিয়াছেন 'বিদ্যাপতির পদাবলী আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নহে।' ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, সেই আলোচনা শুনিতেই আমাদের কৌতূহল আছে। অনাবশ্যক, সুদীর্ঘ, আড়ম্বরপূর্ণ ছিদ্রান্বেষণের আত্মনিয়োজিত চেষ্টা সুদূরে নির্বাসিত করিয়া বিদ্যাপতির আলোচনা করিলেই বোধ হয় তিনি ভাল করিতেন।

(২) তথাকথিত মারাত্মক ভুল :

(ক) 'এক পয়োধর চন্দনে লেপিত' যশোরাজ খানের এই পদটি সমগ্র পাওয়া যায় না, এই কথা আমি বলিয়াছি। পদটির দ্বারা আমি যে বিষয় প্রমাণ করিতে চাহিয়াছি, সমগ্রতার অভাবে বা সদ্‌ভাবে তাহার কোনই বাধা হইতেছে না। বরং ঐ পদটি সমগ্র বলিয়া ধরিলে আমার যুক্তি অধিকতর সমর্থন লাভ করে। পদটি পদকল্পতরু বা পদামৃতসমুদ্রে নাই। কীর্ত্তনগীতরত্নাবলী বটতলার পুস্তক, পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরীর উপর নির্ভর করিয়া কোনও কথা বলিতে সাহস হয় না। ইহা লইয়া যে বাগ্‌বিতণ্ডা হইয়াছে, তাহা হইতে সতীশচন্দ্র রায়ের মত প্রবীণ পণ্ডিতও নিষ্কৃতি পান নাই। যশোরাজ খানের ঐ পদটি আমি অসম্পূর্ণ বলিয়াই মনে করি। বংশীবদনের ভ্রমাভিসার পদ 'রাই সাজে বাঁশী বাজে' দেখিলেই আমার সংশয়ের কারণ অনুমিত হইবে। তবে হরেকৃষ্ণবাবু যে পদটি তুলিয়া দিয়াছেন, আমি যে তাহার সহিত অপরিচিত নহি, তাহা আমাদের সম্পাদিত শ্রীপদামৃতমাধুরী গ্রন্থের ৫৮৪ পৃষ্ঠা দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন।

(খ) কবিকর্ণপুরের চৈতন্য-চন্দ্রোদয়ে রায় রামানন্দের প্রসিদ্ধ পদ 'পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল' আছে লিখিয়াছি। 'চৈতন্য চরিতামৃত' মহাকাব্য লেখা উচিত ছিল। স্বীকার করি। কিন্তু আমার কৈফিয়ৎ এই যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর চৈতন্যচরিতামৃত ও কবি কর্ণপুরের মহাকাব্য মধ্যে এই যে পদটি দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাতেও হয়ত সমস্ত সংশয় ঘুচে না। কবিরাজ গোস্বামীর গ্রন্থে এই পদটি দৃষ্টে কেহ হয়ত কবি কর্ণপুরের সংস্কৃত মহাকাব্যে পদটি ঢুকাইয়া দিয়াছেন এরূপ আপত্তি উঠিলেও উঠিতে পারে। কিন্তু যখন ঐ পদেরই হুবহু সংস্কৃত অনুবাদ চৈতন্য চন্দ্রোদয়ে দেখিতে পাই, তখন আর সংশয়ের অবকাশ থাকে না। রামানন্দ রায়ের পদ (কবিরাজ গোস্বামী ও কবিকর্ণপুর)—

না সো রমণ ন হাম রমণী।
দুহুঁ মন মনোভব পেশল জনি ॥

চৈতন্য চন্দ্রোদয়ে যথা :

সখি ন স রমণো নাহং রমণীতি ভিদাবয়োরাস্তে।
প্রেমরসেনোভয়মন ইব মদনো নিষ্পিপেষ বলাৎ ॥

অথবা :

অহং কান্তা কান্তস্ত্বমিতি ন তদানীং মতিরভূৎ
মনোবৃত্তির্লুপ্তা ত্বমহমিতি নো ধীরপি হতা।
ভবান্ ভর্ত্তা ভার্য্যাহমিতি যদিদানীং ব্যবসিতি
স্তথাপি প্রাণানাং স্থিতিরিতি বিচিত্রং কিমপরম্ ॥

চৈতন্যচন্দ্রোদয় (বহরমপুর) পৃঃ ৪২৯

কারণ যাহাই হউক, 'চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে'ই 'পহিলহি রাগ' ইত্যাদি ব্রজবুলি পদটি আছে।

(৩) 'কবিরঞ্জন' বিদ্যাপতি সম্বন্ধেই সমালোচকের 'ব্যথা' অধিক। তিনি যে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় সমস্ত সমস্যার সমাধান করিয়া দিয়াছেন বলিয়া দাবী করিতেছেন, ইহা যদি মানিয়া লইতে পারিতাম, তাহা হইলে আমার উক্তির সার্থকতা থাকিত না। আমি তাঁহার মতবাদকে উপেক্ষা করিয়াছি, অতএব তিনি আমার প্রতি বিরূপ হইবেন, ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু আমার স্বাধীন মত ব্যক্ত করিতে ক্ষতি কি ? সুধীজন দুই পক্ষ অপক্ষপাতে বিচার করিয়া যে মত সমীচীন মনে করেন, তাহাই গ্রহণ করিবেন। আমি একটি বিরুদ্ধ মত স্থাপন করিয়া এই গুরুতর সমস্যার প্রতি পণ্ডিতমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি এই মাত্র। আমি বলিতে বাধ্য হইতেছি যে হরেকৃষ্ণ বাবুর এ সমালোচনার পরেও আমি বিশেষ বিচার বিতর্ক করিয়াও তাঁহার সমাধান গ্রহণ করিতে সক্ষম হইলাম না। প্রধান বাধা কবির নাম লইয়া। কবির দুইটি নাম পাইতেছি (হরেকৃষ্ণবাবুর প্রসাদে) —একটি 'কবিরঞ্জন,' অপরটি 'বিদ্যাপতি'। একজনের রঞ্জন নাম হইতে বাধা নাই, কিন্তু 'কবিরঞ্জন' এই ভণিতায় যদি তিনি সর্বত্র বিরাজমান থাকেন, তবে 'বিদ্যাসাগর,' 'সাহিত্যরত্ন' প্রভৃতির ন্যায় ইহাকে উপাধিবোধক বলিয়া যে সংশয় হয়, তাহার নিরসনকল্পে হরেকৃষ্ণবাবুর যুক্তি যথেষ্ট মনে হয় না। আরও গোল বাধাইয়াছে, তাঁহার 'বিদ্যাপতি' উপাধিটি। 'কবিরঞ্জন' ও

'বিদ্যাপতি' এই উভয় নামের অন্তরালে পড়ায় কবি আমাদের সংশয় আরও ঘোরালো করিয়া তুলিতেছেন।

হরেকৃষ্ণ বাবু বলিতেছেন, বিদ্যাপতির কবিরঞ্জন নাম নাই। কিন্তু আমরা তাঁহার এই আপ্তবাক্য মানিয়া লইতে পারিতেছি না। তিনি এই অজুহাতের বলে কবিরঞ্জন ভণিতার সবগুলি পদ যে শ্রীখণ্ডের কবির বলিয়া দাবী করিতেছেন তাহা নহে; বিদ্যাপতিরও অনেক পদ এই 'ছোট' বিদ্যাপতির বলিয়া-টানিতেছেন। বাংলা পদগুলি কোনও বাঙ্গালী বিদ্যাপতির হইবে এবং তিনিই হয়ত শ্রীখণ্ডের 'সর্বকলানিধান' কবি। কিন্তু কবিরঞ্জনের ভণিতায় যে উৎকৃষ্ট ব্রজবুলির পদ পাওয়া যায়, তাহা যে শ্রীখণ্ডের কবি উপাধিক এক রঞ্জন-নামা ব্যক্তির রচনা তাহা বিশেষ প্রমাণসাপেক্ষ। প্রমাণের অভাব মিটিতে পারে যদি শ্রীরঘুনন্দন শাখান্তর্গত বা ভক্তচূড়ামণি রঘুনন্দনের শিষ্য কবির রচিত কোনও গৌরচন্দ্রিকার পদ পাওয়া যাইত —এই কথাই আমি মুখবন্ধে বলিয়াছি। তাহার সমালোচনায় হরেকৃষ্ণ-বাবু দুইটি পদের উল্লেখ করিয়াছেন—একটি পদকল্পতরুর এবং অপরটি তাঁহার নিজস্ব আবিষ্কার। হরেকৃষ্ণবাবু বহু পদাবলীর আবিষ্কার অথবা উদ্ধার সাধন করিয়াছেন। এ বিষয়ে তাঁহার নিকট বৈষ্ণব সাহিত্য অবশ্যই কৃতজ্ঞ থাকিবে। কিন্তু আমরা যদি তাঁহার আবিষ্কারের উপর সব সময়ে আস্থা স্থাপন করিয়া না উঠিতে পারি, তবে তাহাতে এমন কি অপরাধ হইতে পারে? নিপুণ সমালোচক সতীশচন্দ্র রায়ও তাঁহার আবিষ্কার সব সময়ে মানিয়া লইতে পারেন নাই। হরেকৃষ্ণবাবু এই নবতম আবিষ্কারও স্বাধীন প্রমাণাভাবে আমরা গ্রহণ করিতে পারিলাম না, এজন্য দুঃখিত। কারণ বহু বৈষ্ণব পদ দেখিবার সুযোগ আমাদের হইয়াছে; তদ্ভিন্ন গৌরপদতরঙ্গিণীতে দেড় হাজারের উপর গৌরাঙ্গ সম্বন্ধীয় পদ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে কবিরঞ্জনের 'চমৎকার' পদ একটিও খুঁজিয়া পাই নাই।

তাঁহার উদ্ধৃত অপর পদটি পদকল্পতরুতে আছে বটে। সেখানে ভণিতা 'কবিশেখর'; বটতলার পুস্তকেও ভণিতা কবিশেখর। আমার নিকট একখানি অখণ্ডিত পদকল্পতরুর পুথি আছে তাহাতেও কবিশেখরই ভণিতা। পদকল্পতরুর ২১৮৯ সংখ্যক পদের পাঠান্তরে আছে:

ত্রিপুরাচরণ কমল মধু পান।
সরস সঙ্গীত কবিরঞ্জন গান॥
পদরসসার পুঁথির পাঠ।

মূলে পাঠ আছে:

শ্রীরঘুনন্দন চরণ করি সার।
কহ কবিশেখর গতি নাহি আর॥

পদরসসার শতাধিক বর্ষ পূর্বের একখানি পুঁথি, তাহাও আবার অপহৃত হইয়াছে। ইহার অন্য পুথি পাওয়া যায় না। পদকল্পতরুর সুপ্রসিদ্ধ সম্পাদক সতীশচন্দ্র রায় নাকি তাহার একখানি নকল করিয়া রাখিয়া-ছিলেন; তাহা দেখিবার সুযোগ আমাদের হয় নাই। পদরসসারের সঙ্কলয়িতা নিমানন্দ দাস অনেক বিষয়ে পদকল্পতরুর ছায়া অনুসরণ করিয়াছেন, এই গানটি সম্বন্ধে ভিন্ন পাঠ-যোজনার কি হেতু, তাহা অনুমান করা সহজ নহে। তবে তাঁহার এই ভণিতা হইতে যদি রঘুনন্দন-শিষ্য কবিরঞ্জনের নাম পাওয়া যাইত, তাহা হইলেও কথা ছিল না। কিন্তু ত্রিপুরা-চরণাশ্রিত এই কবিরঞ্জনকে রঘুনন্দনের উপর কোন যুক্তিবলে চাপানো যায়, তাহা আমার ধারণায় আসে না। কাজেই ইহার পরে যদি 'নাভিশ্বাস' উপস্থিত হয়, তবে সে আমার মত সেই দুর্ভাগাদেরই হইবার কথা—যাহারা 'ছোট বিদ্যাপতি' খ্যাতি বিশিষ্ট কবিরঞ্জনের সন্ধান ত্রিপুরাচরণ-কমলেও পান না। ফল কথা, শ্রীখণ্ডের কবিরঞ্জন নামধেয় কোনও বৈষ্ণব কবিকে দাঁড় করাইতে হইলে হরেকৃষ্ণ-বাবুকে আরও প্রমাণপঞ্জী বাহির করিতে হইবে। গোপাল দাসের রচিত শাখা নির্ণয়েই হউক, আর দুই একটি বাংলা পদের ভণিতায় হউক, কবিরঞ্জন নামটি উপাধিদ্যোতক বলিয়া মনে না করিবার সন্তোষজনক কারণ খুঁজিয়া পাই না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, রামপ্রসাদের উপাধি ছিল কবিরঞ্জন। বিদ্যাপতির ঐ উপাধি ছিল বলিয়া প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে। কবিরঞ্জন বিদ্যাপতির উপাধি ছিল না, ইহা ছোট বিদ্যাপতির আবিষ্কর্তার পক্ষে বলা যত সহজ, আমাদের পক্ষে তত সহজ নহে। আমরা বিদ্যাপতির 'কবিরঞ্জন' উপাধি প্রমাণ প্রয়োগের দ্বারা পাইতেছি। এখন তাহা ফুৎকারে উড়াইয়া দেওয়া কি যায়? আমরা হরেকৃষ্ণবাবুর কথায় সতীশ রায় মহাশয়ের মতটি উড়াইয়া দিতে অক্ষম। "আমরা পদকল্পতরুর 'কবিরঞ্জন' ভনিতার পদগুলি...দৃঢ়তা সহকারেই বলিতে ইচ্ছা করি যে,...১১০৪ ও ১৭৬০ সংখ্যক পদদ্বয় ছাড়া বাকি পদগুলি কবিরঞ্জন উপাধিধারী মৈথিল কবি বিদ্যাপতির রচিত বলিয়াই প্রতীত হয়।" পদকল্পতরু ভূমিকা ১৬৫ পৃঃ।

আসল কথা এই হরেকৃষ্ণবাবু যখনই শ্রীখণ্ডে এক বিদ্যাপতির সন্ধান পাইয়াছেন, তখনই তিনি বিদ্যাপতির পদগুলি এই বাঙ্গালী বিদ্যাপতির বলিয়া দাবী করিতে লাগিয়া গিয়াছেন। আজকাল এই একপ্রকার নূতন উপদ্রব দেখা দিয়াছে। চণ্ডীদাসের শ্রেষ্ঠ পদগুলি এক দীন চণ্ডীদাসের বলিয়া প্রমাণ করিতে হইবে, বিদ্যাপতির ঘরে সিঁধ দিয়া তাঁহার যতগুলি সম্ভব পদ আনিয়া শ্রীখণ্ডে এক অজ্ঞাতনামা কবির রিক্ত ভাণ্ডারে ঢুকাইতে হইবে—এই প্রকার গবেষণাই আজকাল আদৃত হইতেছে। যাহারা ইহা মানে না, তাহাদের সম্বন্ধে গবেষকদিগের অসহিষ্ণুতা অনেক সময়ে মাত্রা ছাড়াইয়া যায়। পাঠক লক্ষ্য করিবেন হরেকৃষ্ণবাবু তাঁহার এই সমালোচনায় বিদ্যাপতির অপূর্ব কাব্যসম্পদ্-মণ্ডিত বয়ঃসন্ধির পদগুলি কোনও এক নয়নানন্দের বলিয়া গাহিয়া রাখিয়াছেন; সুতরাং আবার এক নয়নানন্দ বিদ্যাপতি আমাদের ঘাড়ে চাপিল বলিয়া বোধ হইতেছে। এক কবিরঞ্জন বিদ্যাপতি লইয়া যে গণ্ডগোলের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাই কি যথেষ্ট নহে?

"কবিরঞ্জনের সমস্ত পদ এবং রায়শেখর প্রভৃতির বহুপদ মিথিলার কবি বিদ্যাপতির নামে চলিয়া গিয়াছে—হরেকৃষ্ণবাবুর এই উক্তি অন্ততঃ কবিরঞ্জন সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে না। কবিরঞ্জনের 'নসিরা শাহ' যে হুসেন শাহের পুত্র হইতেই হইবে, এমন কথা বলা চলে কি?

(৪) আমি বিদ্যাপতির চৌদ্দ পদে'র একখানা পুঁথি বৃন্দাবন হইতে সংগ্রহ করিয়া তাহার কয়েকটি পদ ভূমিকায় ছাপিয়া দিয়াছি। এ পদগুলি যদি বঙ্গদেশে পাইয়া হরেকৃষ্ণবাবু ছাপিয়া থাকেন, ভালই। আমার এই স্বাধীন সংগ্রহ হইতে তিনি অধিকতর সমর্থন লাভ করিলেন। বৃন্দাবন হইতে পদ পাওয়া গিয়াছে, ইহাতে কি পদগুলি অশুদ্ধ হইল? তিনি ভাল পাঠ পাইয়াছেন, আমি পাই নাই। তাহাতেই বা এত অসহিষ্ণুতার কারণ কি? যাঁহারা এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিবেন, তাঁহারা মিলাইয়া পড়িবার সুযোগ পাইবেন এবং হরেকৃষ্ণবাবুর মৌলিকতার সমুচিত সম্মান দান করিবেন। তবে এই পদগুলি সর্বত্র শুনিতে পাওয়া যায় বলিয়া তিনি যে দাবী করিতেছেন, তাহা নিতান্তই ভিত্তিহীন। অপর কোনও পদ সংগ্রহেও আমি দেখি নাই।

জয়দেবের বর্ণিত কৃষ্ণের ভগবত্তা ও শৃঙ্গাররসের নায়কত্ব একসঙ্গে বুঝিতে আধুনিক রুচিতে হয়ত বাধে, এই কথা আমি বলিয়াছি; তাহাতে হরেকৃষ্ণবাবু আমাকে তৎকৃত জয়দেব পড়িতে উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু বর্তমান রুচির দিক্ দিয়া কোনও রসের বিচার তাঁহার সুলিখিত গ্রন্থখানিতে আছে বলিয়া আমি জানি না। বৈষ্ণব ও ভক্তদিগের যে নূতন তত্ত্ব অর্থাৎ আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে প্রাকৃত প্রেমের রাসায়নিক মিশ্রণ, ইহা হরেকৃষ্ণবাবুর সম্পাদিত জয়দেব কেন—বহু সংস্কৃত ও বাংলা গ্রন্থে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কিন্তু ঠিক এই বিষয় লইয়াই বর্তমান শিক্ষিত

সম্প্রদায়ের মধ্যে যথেষ্ট সন্দেহ, দ্বিধা ও বিরোধিতা লক্ষিত হয়, ইহা কাহারও অবিদিত নাই। আমি সেই বাধার কথা বলিয়াছি।

সুদীর্ঘ সমালোচনার উত্তর দীর্ঘতর করিয়া তোলায় লাভ নাই। আমি যাহা বলিয়াছি, তাহাতেই আমার বক্তব্য মোটামুটিভাবে বলা হইয়াছে আশা করি। হরেকৃষ্ণবাবু বিজ্ঞ, রসজ্ঞ ও নিপুণ সাহিত্যিক। এই সকল কারণে আমিই তাঁহাকে ১৯২৭ সালে সাহিত্য-পরিষদে চণ্ডীদাস সম্পাদন-কার্যে আহ্বান করিয়াছিলাম। কিন্তু সে চণ্ডীদাস যে কি অপূর্ব বস্তু হইয়াছে, তাহা সকলেই জানেন। এই সুদীর্ঘ দশ বৎসরেও তাহার একটি ভূমিকা লিখিবার সুযোগ সম্পাদকের হইল না। 'বিদ্যাপতি' সম্বন্ধে নিপুণভাবে আলোচনা করিবার যদি তাঁহার ইচ্ছা থাকে, তবে আমি অন্ততঃ সর্বান্তঃকরণে তাঁহার সমর্থন করিব।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, উপস্থিত ক্ষেত্রে বিদ্যাপতির সম্পাদক আমরা তিনজন। নগেন্দ্র গুপ্ত, অমূল্য বিদ্যাভূষণ এবং আমি—নগেন্দ্রবাবু ও অমূল্যবাবু উভয়েই ভুল করিয়া গিয়াছেন (হরেকৃষ্ণবাবুর মতে); সুতরাং I am in good company. তবে একটি কথা না বলিয়া পারিতেছি না—বিদ্যাপতির যে অংশ অমূল্যবাবুর সম্পাদিত, তাহাতে বিদ্যাপতির নয় এরূপ পদগুলির একটি তালিকা অমূল্যবাবুর 'নিবেদনে' দেওয়া আছে। হরেকৃষ্ণবাবু বলিতেছেন যে, 'সেই তালিকার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার।' ইহাতে আমি মনে করি অমূল্যবাবুর প্রতি ঘোর অবিচার করা হইয়াছে। পরলোকগত বন্ধু যখন হরেকৃষ্ণবাবুর এই তথাকথিত ঋণের কথা স্বীকার করিয়া যান নাই, বা সেরূপ কোনও ইঙ্গিত করেন নাই, তখন তাঁহার দেহাবসানে এই কথাগুলি না বলিলে কি শোভন হইত না? বৈষ্ণব সাহিত্য সম্বন্ধে গবেষণার জন্য হরেকৃষ্ণবাবু বহু পূর্বে যশের স্বর্ণপদক পাইয়াছেন, তাহাতে আর মীনা করিবার আবশ্যকতা কি?

চরমারি

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ

নৌকো গুণটেনে যাবে। আগের দু'খানা নৌকোর যাত্রীরা এগিয়ে গেছে। আমরা তিনজন পিছিয়ে পোড়লুম। পাড় ভেঙেছে খুব! খাড়াই পাড় বেয়ে উঠে চোখে পোড়লো, গ্রাম ক্ষেত। দেখলুম, আমাদের দল অনেকদূর এগিয়ে গেছে। তবুও যখন গ্রামে ঢুকে পড়ার লোভ এড়াতে পারা গেল না, বুঝলুম, আমরা নেহাৎ চাষাড়ে পেটুক। শর্ষে ফুলে ক্ষেত ভ'রে উঠেছে। শাকের পাতায় মাঠ কেঁপে উঠেছে। লাঙলের ঠ্যালায় মাটি জেগে উঠেছে। তাই আমরা দেখতে পেলুম।

লম্বা একটা পথ। তার দু'পাশে বিচুলির দেওয়াল আর খড়ের চাল। কুঁড়ে ঘর সারি সারি, এঁকে বেঁকে গেছে। অল্প জায়গা। তার মধ্যেই সব সেরে নিতে হোয়েছে। ছোট্টো একটুকরো উঠান। তাতে শুখোচ্ছে ডাল-কড়াই ধান-চাল। দুটো ছাগলের ছানা উঠানের একপাশে সামনাসামনি মাথা নীচু করে আছে অকারণ। চাষী বোধহয় বোঝালে, দেখচেন তো বাবুরা, অবস্থাখানা। এ সনটা আর নেয় নি। দয়া। ফিরে সনের বর্ষায় আর থাকতে হোচ্ছে না। কোথায় যাই যে! ভাঙোন বাঁচিয়ে পেছোতে পেছোতে, কোথায় এলুম দেখুন তো। এর পর, আর তো জায়গা নেই। এদিকে গ্রাম যে অনেকদিনকার।

জানি, আমরা ভদ্দোরলোক। গরীবের গ্রামে ঢুকলে তারা একটু অবাক হোয়ে চাইবে। আর আমরা মনে মনে খুসী হবো। এরা কিন্তু নিরুৎসাহ। তাই বুঝলুম, কেনো! যে-মাঠ এবারে চোষে সোনা পেয়েছে, ফিরে বারে তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই তৈরি মাঠ মাটি ঘর দোর শুধু একটা সনের জন্যে। তারপর পালাও—পালাও—পালাও। যাদের অনেকদিনকার গ্রাম গেলো জলে, সেই গরীব চাষাভুষোর দল, ঘর বাঁধে নতুন চরে। দু-তিনটে সন একটু গুছিয়ে নিতে না নিতে, গ্রাম-খাওয়া নদীর তোড় ফিরে যায় চরের দিকে। তাড়া লাগাবে। নোটিশ দেবে মাটিতে চিড় খাইয়ে। নতুন চর পড়লো মারা।

কতকাল আগে, ওম্‌নি করে চর মেরে নিয়ে, গ্রাম পত্তনি হয়েছিলো চরমারির। পদ্মা তখন, এখান থেকে কতদূরে ছিলো হয়তো। আজ আবার কতকাল পরে চরমারির গায়ে এসে ধাক্কা লাগিয়েছে। সরো সরো সরো। গ্রামের লোকের মনে সাড়া লেগেছে। তারা প্রস্তুত হয়ে মনে মনে বলে, চলো চলো।

গ্রামবাসীদের মুখ শুখিয়ে আছে। কালের তাড়া তাদের পেছনে লেগে রোয়েছেই। তাদের স্থিতি নেই, শান্তি নেই, গড়বার উদ্যম নেই, ধৈর্য্যের অধিকার নেই। কেবল যাহোক কোরে বেঁচে যাচ্ছে ওরা। এমন করে তাড়া খাওয়া হাঁসের পাল হয়ে মানুষের বাঁচতে সাধ থাকে কখনো! পদ্মাটা কি! যেনো দয়ামায়া-হীন বজ্জাৎ মেয়ে। কেবলই তার খেলা। সবই তার চল-চঞ্চলা। এখান থেকে নিয়ে ওখানে রাখছে। পুরানোকে ভেঙে লুকিয়ে ফেলছে। নতুনকে আবার ঠেলে দাঁড় কোরিয়ে দিচ্চে। সেখানে পলিপড়া মাটির ওপোর, প্রথমে লাগছে ক্ষুদে ক্ষুদে শ্যাওলা। তারপর ঘাস। তারপর চারা ঝাউ। বন হোয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। মাটি হোলো শক্ত। গ্রাম-হারা চাষারা এসে জঙ্গল কেটে সাফ করলে। শরষে দিলে ছড়িয়ে। গোরুবাছুর চরাতে লাগলো। গোয়াল-ঘর বাঁধলে। তারপরে ছোটো ছোটো মরাই মতন! ডাল-কড়াই থাকবে। ক্ষেতখামার চৌকি দেবার জন্যে, চাষার থাকবার দরকার। এলো তার ছেলেপুলে বৌ। সবই। গ্রাম প্রতিষ্ঠা হোলো নতুন কোরে। আবার হঠাৎ একদিন, এই চরেই বড়ো দেখে একটা চিড় খেলো। কোনসময়ে একদিন অতোবড়ো মাটি ভুস্ কোরে তোলিয়ে গেলো।

আমরা তিনজনে। আগের দলের পাত্তা নেই। নৌকা চলেচে গুণটেনে। সেই নিশানার আশায় আমরা বোসলুম। একেবারে নদীর কিনারায়। চাষাক্ষেতের বড়ো বড়ো চাঙার ওপোর, মুখোমুখি। পাড়টা এখন ভেঙেছে! নীচের দিকে ঝুঁকলে মনে হয়, পাহাড়ে উঠে খাদের দিকে চাইছি। পাড়ের পেটের মধ্যে সাদা বালি। হাওয়া নেই, ঠ্যালা নেই, তবু আপনি আপনি ঝোরছেই। খুব একটু একটু। মামা বোললে। কিন্তু সে কথাটুকুর পুনরাবৃত্তি না কোরলে, চরমারির নক্সা শেষ হোতে পারছেনা। তোমার পাওয়াধন তোমারই রইল মামা। আমি শুধু একটিবার বোলবো।—পদ্মার জল চলে। পদ্মার টান আছে। পদ্মাকূলের মাটিরও টান আছে। সেও চলে। তারও জোয়ার ভাঁটা আছে। এক জায়গায় জোয়ার হোয়ে গিয়ে জমে। আবার একদিন সেখান থেকে পালিয়ে আসার ভাঁটা ফোলে। শুধু জল চলতে ঢের ঢের দেখা যায়। কিন্তু এমন চলন। কারণটা ওই। দুয়ের মিল আছে। জলস্থল মিলে-মিশে গোড়ছে।—তাইতো পদ্মা দেখে অবাক লাগে রে!

বাহির বিশ্ব

মিহির

কলিকাতায় বোমা বর্ষণ

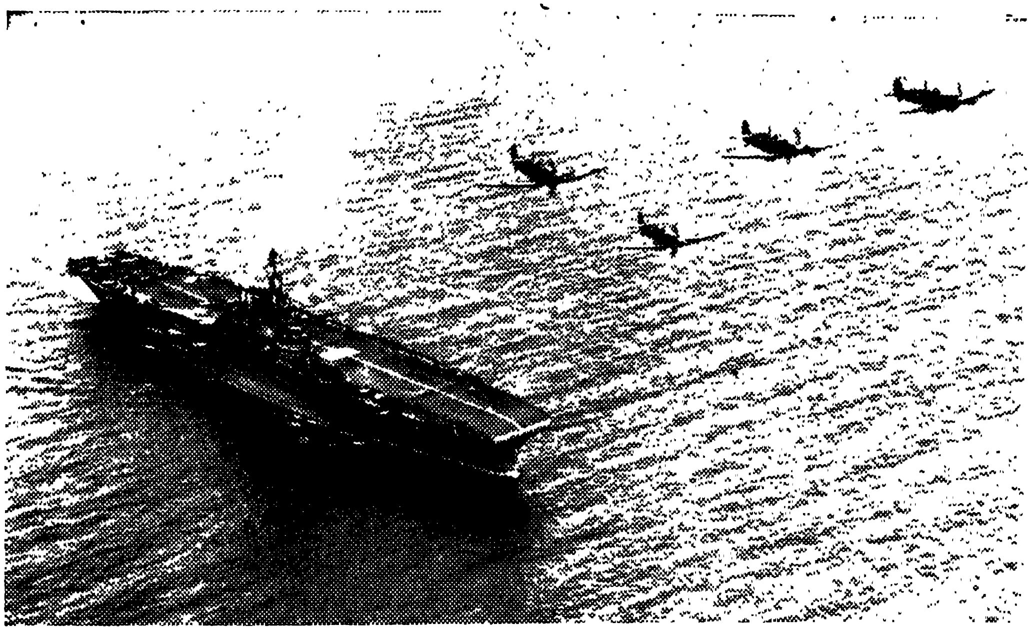
সুদীর্ঘ এগার মাস পরে গত ৫ই ডিসেম্বর কলিকাতায় প্রকাশ্য দিবালোকে প্রবল বোমা বর্ষিত হইয়াছে। গত শীতকালে কলিকাতা অঞ্চলে বোমা বর্ষণ অপেক্ষা এইবারের বোমা বর্ষণের প্রাধান্য যেমন অধিক, ক্ষতির পরিমাণও তেমনি অনেক বেশী।

নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে শত্রুর বিমানঘাঁটী থাকিলে বিমান আক্রমণ সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরাপত্তা সৃষ্টি কখনই সম্ভব হয় না। কাজেই বাঙ্গালা ও আসামের পূর্ব্ব সীমান্তে যতদিন জাপান প্রতিষ্ঠিত থাকিবে এবং বঙ্গোপসাগরে তাহার বিমানবাহী জাহাজ অবাধে প্রবেশ করিবে, ততদিন কলিকাতা এবং পূর্ব্ব ভারতের অন্যান্য স্থানে বিমান আক্রমণের আশঙ্কা কাটিবে না। তবে বর্ত্তমানে সম্মিলিত পক্ষ এই অঞ্চলে যেরূপ প্রতিরোধের আয়োজন করিয়াছেন, তাহাতে আক্রমণকালে শত্রুকে বিশেষ ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে। অবশ্য ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় বোমা বর্ষণের সময় শত্রু যে পরিমাণ ক্ষতি সাধনে সমর্থ হইয়াছে, সে অনুপাতে তাহার নিজের ক্ষতি অধিক হয় নাই।

শত্রুর অধিকৃত অঞ্চলে আকিয়াবই কলিকাতা হইতে নিকটতম বিমানঘাঁটী, এই ঘাঁটীর দূরত্ব ৩ শত মাইলের অনধিক। এখান হইতে কলিকাতায় প্রবল আক্রমণ পরিচালন সহজসাধ্য নয়। তবে শত্রুর বিমানবাহী জাহাজ বঙ্গোপসাগরে আসিয়া তথা হইতে অনায়াসে উপকূলবর্ত্তী নগরগুলিতে আক্রমণ চালাইতে পারে। ডিসেম্বর মাসে আক্রমণকালে বিমানগুলি আকিয়াব হইতে আসিয়াছিল, না বিমানবাহী জাহাজ হইতে আসিয়াছিল, তাহা নিশ্চিত অনুমান করা দুষ্কর।

এখন জাপান প্রতিরোধমূলক রণনীতি গ্রহণ করিয়াছে; নূতন নূতন অঞ্চলে আক্রমণ চালাইয়া অধিকার বিস্তারের বাসনা তাহার আর নাই। সে আশা করে—প্রাচ্য অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তৃতি সম্পর্কে ভবিষ্যতে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে রাজনৈতিক অনৈক্য সৃষ্ট হইবে। সেই অনৈক্যের সুযোগে সে তাহার বর্ত্তমান অধিকৃত অঞ্চলের অন্ততঃ একটা বিশাল অংশে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে সমর্থ হইবে। ইউরোপে জাপানের মিত্রশক্তির অবস্থা এখন নৈরাশ্যজনক; জাপানের পক্ষে একাকী বৃটেন ও আমেরিকার মিলিত সামরিক শক্তি চূর্ণ করিবার আশা পোষণ করা স্বাভাবিক নয়। এই জন্যই সে এখন দীর্ঘকাল প্রতিরোধমূলক যুদ্ধ চালাইয়া সম্মিলিত পক্ষের শিবিরের রাজনৈতিক অনৈক্যের দ্বারা উপকৃত হইতে চাহিতেছে।

জাপানের এই রণনীতির কথা স্মরণ রাখিলে নিশ্চিত মনে হইবে—কলিকাতায় অথবা পূর্ব্ব ভারতের অন্যান্য স্থানে জাপানের বিমান-আক্রমণ তাহার ভারত অভিযানের ইঙ্গিত নয়; সম্মিলিত পক্ষ এখন পূর্ব্ব ভারত হইতে ব্রহ্মদেশ আক্রমণের যে আয়োজন করিতেছেন, সেই আয়োজনে বিঘ্ন সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই জাপানের এই বিমান-তৎপরতা। বস্তুতঃ প্রতিরোধমূলক উদ্দেশ্যে পূর্ব্ব ভারতের সামরিক লক্ষ্যবস্তুগুলিতে জাপানের বোমা বর্ষণ স্বাভাবিক। এতদ্ব্যতীত সম্মিলিত পক্ষের আক্রমণ-ঘাঁটীতে অর্থাৎ ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্যও জাপান তৎপর হইতে পারে। এই উদ্দেশ্যে বিমান-আক্রমণ ব্যতীত, বিমান হইতে বিভিন্ন স্থানে সৈন্য অবতরণ করাইয়া এবং জলযানের সাহায্যে উপকূলবর্ত্তী অঞ্চলে সৈন্য প্রবেশ করাইয়া সে ভারতের বেসামরিক অধিবাসীকে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির বিরুদ্ধে প্ররোচিত করিতে প্রয়াসী হইতে পারে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে এবং রাষ্ট্রীয়



সমুদ্রবক্ষে ব্রিটীশের অতিকায় এয়ার ক্র্যাফ্‌ট্‌ কেরিয়ার

পরিষদে সরকার পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে যে, জাপান যুদ্ধের বন্দীদিগকে আনুগত্য ত্যাগে বাধ্য করাইয়া একটি ভারতীয় বাহিনী গঠন করিয়াছে। সঙ্গতভাবে মনে করা যাইতে পারে, ভারতের অভ্যন্তরে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য জাপান এই সকল ভারতীয় সৈন্য ব্যবহার করিবে।

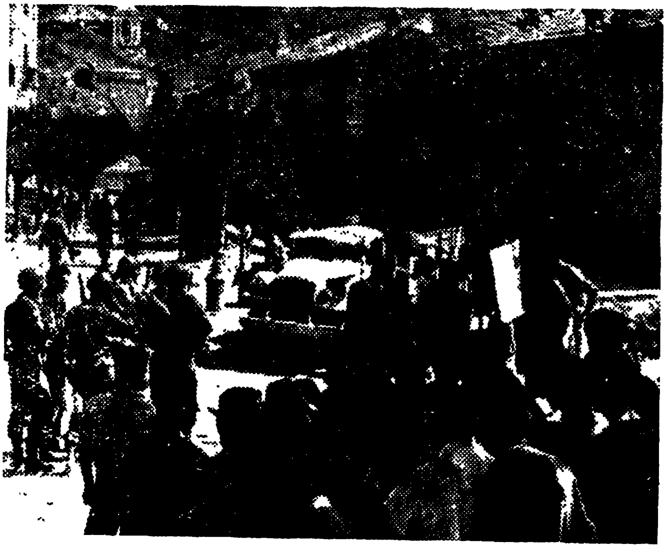
রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা

দুঃখের বিষয়—এই আশঙ্কা নিবারণের জন্য প্রয়োজনানুরূপ রাজনৈতিক ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় নাই। জাপান আশা করে—তাহার অনুগ্রহপুষ্ট ভারতীয় সৈন্যরা স্বাধীনতা লাভের স্বপ্ন দেখাইয়া ভারতবাসীকে ইঙ্গ-মাকিন শক্তির বিরুদ্ধে সহজেই উত্তেজিত করিতে পারিবে। বিশেষতঃ ভারতীয় কেন্দ্রীয় পরিষদে স্বরাষ্ট্র সদস্য প্রকাশ করিয়াছেন—জাপানের ভারতীয় বাহিনী গঠনে সুভাষচন্দ্র সহযোগিতা করিয়াছেন বলিয়া মনে হইতেছে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের একজন প্রাক্তন সভাপতির সহযোগে এবং ভারতীয় সৈন্যের দ্বারা জাপান যদি প্রচারকার্য্য চালাইতে পারে, তাহা হইলে উহার ফল অত্যন্ত আশঙ্কাজনক হইয়া উঠা সম্ভব। এই আশঙ্কা নিবারণের জন্য অচিরে ভারতের রাজনৈতিক অচল অবস্থার সমাধান হওয়া প্রয়োজন। প্রত্যেক ভারতবাসীর মনে এই ধারণা বদ্ধমূল করা আবশ্যক যে, জাপান পরাভূত হইলেই তাহারা স্বাধীনতা লাভ করিবে—পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদ তাহাদিগকে আর শৃঙ্খলিত করিয়া রাখিবে না। দুঃখের বিষয়—ভারতের শাসকশক্তি সামরিক প্রয়োজনে এই রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় দিতে পারেন নাই।

এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য—শত্রুর প্রচারকার্য্য ব্যর্থ করিবার উদ্দেশ্যে যেমন, তেমনি ব্রহ্মদেশে সাফল্যজনকভাবে যুদ্ধ পরিচালনের জন্যও ভারতের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করা উচিত। ব্রহ্মবাসীর সম্মুখে এই দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করা আবশ্যক যে, সম্মিলিত পক্ষ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন নাই। বর্ত্তমানে একদিকে ভারতে রাজনৈতিক অচল অবস্থা, অন্যদিকে ব্রহ্মবাসীকে স্বাধীনতা প্রদানের সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতির অভাব! ইহাতে শত্রুকে কৌশলী প্রচারকার্য্য পরিচালনের সুযোগ দেওয়া হইতেছে। জাপান এই সুযোগে বর্ম্মীদিগকে বুঝাইতে পারে যে, সম্মিলিত পক্ষের বিজয়ে তাহারা প্রাগ্‌যুদ্ধকালীন পরাধীনতা লাভ করিবে। এই অপপ্রচারের দ্বারা জাপান যদি বর্ম্মীদিগকে সত্যই বিভ্রান্ত করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে সম্মিলিত পক্ষের সেনাবাহিনীর ব্রহ্মে যুদ্ধ পরিচালন অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হইবে। ব্রহ্মদেশের পার্ব্বত্য অঞ্চলে বর্ম্মী জনসাধারণ যদি অভিযাত্রী বাহিনীর বিরোধিতা করে, তাহা হইলে তাহাদের অগ্রগতি বিশেষভাবেই বিঘ্নিত হইবে।

দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগর

সম্প্রতি সম্মিলিত পক্ষের সেনাবাহিনী নিউ বৃটেনে আরাউ অধিকার করিয়াছে। নিউ বৃটেনে রবাউলে জাপানের বিশালতম ঘাঁটী অবস্থিত। আরাউ হইতে এই রবাউল ঘাঁটীতে বিমান আক্রমণ পরিচালন সহজসাধ্য হইবে। ইহা ব্যতীত, গ্লষ্টার অন্তরীপের পথে জাপানের যে সরবরাহ-ব্যবস্থা, তাহাতে বিঘ্ন সৃষ্টি করাও অনায়াসাধ্য হইবে। সম্প্রতি মার্কিনী সেনা গ্লষ্টার অন্তরীপের বিমানঘাঁটী অধিকার করিয়াছে।



একটী ইটালীয় শহর পুনরুদ্ধার করিয়া মিত্রপক্ষের সৈন্যগণ উৎসব করিতেছে

তেহরাণ সম্মিলন

নভেম্বর মাসের শেষভাগে কায়রোয় মার্শাল চিয়াং-কাই-সেকের সহিত আলোচনা শেষ করিয়া প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ও মিঃ চার্চিল ইরাণের রাজধানী তেহরাণে গমন করেন। ডিসেম্বর মাসের প্রথমে মার্শাল ষ্টালিনের সহিত তাঁহাদের সুদীর্ঘ আলোচনা হয়। এই আলোচনার পর প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, তিন জন রাষ্ট্রনায়ক পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম দিক হইতে জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে তুমুল সংগ্রাম পরিচালনের সিদ্ধান্ত স্থির করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত, ইউরোপের ফ্যাসিষ্টমুক্ত অঞ্চলে গণ-প্রতিনিধিদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিবারও সিদ্ধান্ত হইয়াছে।

গত অক্টোবর মাসে মস্কোতে পররাষ্ট্র সচিবদের যে সম্মিলন হয়, তেহরাণ-সম্মিলন তাহারই পরিপূরক। তেহরাণ সিদ্ধান্তকে দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—সামরিক এবং রাজনৈতিক। সামরিক দিক হইতে জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা তেহরাণে রচিত হইয়াছে; ইতিমধ্যে সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজও আরম্ভ হইয়াছে। রাশিয়া বরাবরই জার্ম্মানীর সমরিক শক্তির পরিপূর্ণ ধ্বংস চাহিতেছে, বৃটেন ও আমেরিকার প্রতিক্রিয়াপন্থীদের চক্রান্তে মধ্যপথে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি যাহাতে জার্ম্মানীর সহিত আপোষ না করে, তাহার ব্যবস্থা করাই রুশিয়ার উদ্দেশ্য। তেহরাণে এই সম্পর্কে রুশিয়ার অনুকূল ব্যবস্থা হইয়াছে।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে রুশিয়া ইউরোপে প্রাগ্‌যুদ্ধকালীন ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্ত্তন নিবারণ করিতে চাহে। জার্ম্মান-অধিকৃত রাজ্যগুলির যে সব কালজীর্ণ গভর্ণমেণ্ট বৃটেনে জিয়াইয়া রাখা হইয়াছে, তাহাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা নিবারণ রুশিয়ার উদ্দেশ্য; এই সকল রাজ্যের ভবিষ্যৎ ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীরা যাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে না পারে, তাহার ব্যবস্থাও সে চাহে। এতদ্ব্যতীত, সে জার্ম্মানীর ও ইটালীর জনসাধারণকে বর্ত্তমান যুদ্ধের জন্য দায়ী করে না; সে কেবল ঐ সব দেশকে ফ্যাসিষ্ট দলের প্রভাবমুক্ত করিতে চাহে। তেহরাণ সম্মিলনীতে এই

রাজনৈতিক বিষয়ে রুশিয়ার জয় হইয়াছে। তেহারণ সিদ্ধান্তে ফ্যাসিষ্ট অধিকৃত রাজ্যগুলির এবং জার্ম্মানীর অধিবাসীকে গণতান্ত্রিক বিশ্ব-পরিবারে যোগ দিতে আহ্বান জানান হইয়াছে। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ঘোষণা করিয়াছেন যে, তাঁহারা জার্ম্মান জাতির বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করিবেন না। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—যুদ্ধের পর জার্ম্মান জাতির প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য লর্ড ভ্যান্‌সিটার্টের নেতৃত্বে বৃটেনে আন্দোলন চলিতেছে। এই আন্দোলনের নাম ভ্যান্‌সিটার্টিজম্।

প্রতিরোধরত যুগোস্লেভিয়া

তেহরাণ-সিদ্ধান্তের রাজনৈতিক অংশ বাস্তবক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইয়াছে যুগোস্লেভিয়ায়।

১৯৪১ খৃষ্টাব্দে বসন্তকালে যুগোস্লেভিয়া যখন জার্ম্মানী কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়, তখন তথাকার প্রতিরোধ কেন্দ্রগুলি উত্তমরূপে নিশ্চিহ্ন হয় নাই। জার্ম্মানী তখন রুশ অভিযানের জন্য দ্রুত প্রস্তুত হইতেছিল। এই জন্য সে যুগোস্লেভিয়ার প্রতি প্রয়োজনানুরূপ মনোযোগ প্রদান করিতে পারে নাই। সেই সময় হইতে যুগোস্লেভিয়ার পার্ব্বত্য অঞ্চলে গরিলা বাহিনীর প্রতিরোধ চলিয়া আসিতেছে। এই প্রতিরোধ সম্বন্ধে যুগোস্লেভিয়ার প্রবাসী গভর্ণমেন্টের সমর-সচিব জেনারেল মিহাইলোভিচের নাম বরাবর শুনা যাইতেছিল। বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ এই মিহাই-লোভিচ্‌কেই সাহায্য করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু এই ব্যক্তি ফ্যাসিষ্ট শক্তিকে প্রতিরোধ অপেক্ষা কম্যুনিষ্টদিগের সহিত যুদ্ধেই অধিক শক্তি ব্যয় করিতে থাকেন। ইহাতে তাঁহার সমর্থকের সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস পায়; পক্ষান্তরে কম্যুনিষ্ট নেতা টিটোর (জোসিফ্ ব্রোজ) সমর্থকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। রুশিয়া বহু পূর্ব্বেই জেনারল মিহাইলোভিচের কার্য্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়াছিল। এই জন্য এইরূপ আশঙ্কা ঘটে যে, মিহাইলোভিচের প্রসঙ্গ লইয়া ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির সহিত রুশিয়ার মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইবে, কারণ মিহাইলোভিচ্ বৃটিশের আশ্রিত যুগোস্লাভ্ গভর্ণমেন্টের সমর সচিব।

কিন্তু মার্শাল টিটো অসীম সংগঠন-ক্ষমতা ও সামরিক দক্ষতার পরিচয় প্রদান করিয়া এই সমস্যার সমাধান করিয়াছেন। বর্ত্তমানে যুগোস্লোভিয়ায় তাঁহার যে প্রতিপত্তি স্থাপিত হইয়াছে, ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি তাহা নির্ব্বিবাদে মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছেন। বর্ত্তমানে ২ লক্ষ সৈন্য টিটোর নেতৃত্বাধীনে যুদ্ধ করিতেছে। ইহাদের মধ্যে যুগোস্লেভিয়ার তিনটি প্রধান সম্প্রদায়—ক্রেট্, স্লোভেন্ ও সার্ব আছে; অবশ্য সার্ব্বদিগের সংখ্যা কিছু কম। পক্ষান্তরে, কয়েক সহস্র সার্ব কেবল মিহাইলোভিচকে সমর্থন করে। টিটোর সেনাদল এখন ডাল্‌মেসিয়ার উপকূল হইতে পূর্ব্ব বোস্‌নিয়া পর্য্যন্ত এবং আড্রিয়াটিক সাগরের দ্বীপগুলিতে যুদ্ধ করিতেছে। সম্প্রতি টিটোর নেতৃত্বে যুগোস্লোভিয়ায় একটি অস্থায়ী গভর্ণমেন্ট স্থাপিত হইয়াছে। বৃটেনের এবং রুশিয়ার পক্ষ হইতে টিটোর প্রধান কেন্দ্রে সামরিক মিশন প্রেরিত হইয়াছে। রুশিয়া পূর্ব্ব হইতেই টিটোকে সাহায্য করিতেছিল; বর্ত্তমানে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিও টিটোকে সাহায্য করিতেছেন। টিটো-সরকার সম্প্রতি যুগোস্লোভিয়ার প্রবাসী সরকারকে অস্বীকার করিয়াছেন এবং যুগোস্লেভিয়া সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইবার পূর্ব্বেই রাজা পিটারকে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

যুগোস্লেভিয়া রাজ্যটি বলকান অঞ্চলের ঠিক কেন্দ্র স্থানে অবস্থিত। তথায় প্রকৃত গণ-প্রতিনিধিত্বের প্রতিষ্ঠায় সমগ্র বলকান্ অঞ্চলে সুদুর-প্রসারী রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইবে বলিয়া মনে হয়। ইহা ব্যতীত যুগোস্লেভিয়ার ব্যাপারে ইহা সুনির্দ্দিষ্টভাবে প্রমাণিত হইল যে, যুদ্ধোত্তর ইউরোপে প্রকৃত গণপ্রতিনিধিদিগের প্রতিষ্ঠা নিবারণ করা সহজ হইবে না।

তুরস্কের নিরপেক্ষতা

তেহরাণ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ও মিঃ চার্চ্চিল্ তুরস্কের প্রেসিডেন্ট ইনেউনু এবং অন্যান্য তুর্কি রাজনীতিকদের সহিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইহাতে গবেষণা আরম্ভ হয় যে, তুরস্কের যুদ্ধে যোগদান আসন্ন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তুরস্কের পক্ষে এখন যুদ্ধে যোগ দান স্বাভাবিক নয়। এখনও ঈজিয়ান সাগরের দ্বীপগুলিতে—তুরস্কের পশ্চিম উপকূলের অতি সন্নিকটে জার্ম্মানী প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; বুলগেরিয়ায়ও জার্ম্মানী প্রতিষ্ঠিত, কৃষ্ণসাগরের উত্তর উপকূলের কিয়দ্দূর এখনও তাহার অধিকারভুক্ত। এইরূপ অবস্থায় তুরস্ক যদি এখন সম্মিলিত পক্ষের সহিত সামরিক সহযোগিতায় প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে জার্ম্মানী তাহাকে প্রবলভাবে আঘাত করিতে পারিবে। তুরস্ক এখন এইরূপ বিপদ বরণ করিবে না। তবে সম্মিলিত পক্ষের বলকান্ অভিযানের সময় এবং রুশ সেনা ইউক্রেনে আরও কিছুদূর অগ্রসর হইলে তুরস্ক নিষ্ক্রিয়ভাবে—অর্থাৎ কতকগুলি ঘাঁটী ব্যবহারের সুবিধা দিয়া সম্মিলিত পক্ষকে সাহায্য করিতে পারে। কায়রোয় হয়ত এই সকল বিষয়েরই আলোচনা হইয়াছে। যুদ্ধের অবস্থা এখন সম্মিলিত পক্ষের



শত্রুপক্ষের বোমার আঘাতে বিধ্বস্ত একটী ইটালিয়ান নগরীর ধ্বংসস্তূপ
—ক্রেনের সাহায্যে পরিষ্কার করা হইতেছে

অনুকূল হওয়ায় তুরস্কের পক্ষে এখন তাহাদের সহিত ঘনিষ্ঠতর সহযোগিতা স্বাভাবিক।

রুশ রণাঙ্গন

ডিসেম্বর মাসের শেষভাগে রুশ রণাঙ্গনের অবস্থা পুনরায় রুশিয়ার অনুকূলে পরিবর্তিত হইয়াছে। গত গ্রীষ্ম ও শরৎকালে সোভিয়েট বাহিনী অত্যন্ত দ্রুত পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়। ইহাতে তাহাদের সরবরাহ-সূত্র দীর্ঘ হইয়া পড়ে; পক্ষান্তরে জার্ম্মানীর সরবরাহ-সূত্রের দৈর্ঘ্য হ্রাস পায়। এই সময় বরফ পড়িতে আরম্ভ করায় রুশিয়ার পথঘাট দুর্গম হইয়া উঠে। এই সুযোগে জার্ম্মান সেনা কিয়েভ অঞ্চলে এবং নীপার বাঁকে প্রবল প্রতি-আক্রমণ আরম্ভ করে, এই প্রতি-আক্রমণের ফলে তাহারা কয়েকটি স্থান পুনরধিকার করিয়াছিল। সম্প্রতি জেনারেল ভটুটিনের প্রচণ্ড আঘাতে তাহারা কিয়েভ্ অঞ্চলে পুনরায় পশ্চাদপসরণে বাধ্য হইয়াছে। গুরুত্বপূর্ণ রেল ষ্টেশন কোরোষ্টেন্ পুনরায় রুশ সেনার অধিকারভুক্ত হইয়াছে; ঝিটোমীরের পতন ও আসন্ন। নীপার বাঁকের মধ্যেও জার্ম্মানদিগের প্রতি-আক্রমণ ব্যর্থ হইতে আরম্ভ করিয়াছে। হোয়াইট্ রুশিয়ায় ভাইটেবস্ক জার্ম্মানীর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটী; ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ রেল-সংযোগও বটে। এই ভাইটেবস্কের উদ্দেশে রুশিয়ার প্রচণ্ড আঘাত পতিত হইতেছে; ভাইটেবস্ক-পোলটস্ক রেলপথ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় জার্ম্মানদিগের সরবরাহ-সূত্র এখন দ্বিখণ্ডিত। কাজেই ভাইটেবস্কের পতনে আর বিলম্ব নাই বলিয়াই মনে হয়। বস্তুতঃ এখন সোভিয়েট বাহিনীর শীতকালীন আক্রমণ পূর্ণ বিক্রমে আরম্ভ হইয়াছে। আশা করা যায়, এই শীতকালেই রুশ রাজ্য সম্পূর্ণরূপে জার্ম্মানমুক্ত হইবে।

ইটালীর যুদ্ধ

ইটালিতে যুদ্ধের গতি এখনও মন্থর। আদ্রিয়াতিকের উপকূলে রুশবাহিনীর অর্টোনা অধিকারই সম্মিলিত পক্ষের উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক সাফল্য। পশ্চিম অঞ্চলে ৫ম বাহিনী সম্প্রতি কোনরূপ উল্লেখযোগ্য সাফল্যলাভে সমর্থ হয় নাই।

দ্বিতীয় রণাঙ্গনের আয়োজন

তেহরাণ সম্মিলনের পর ইউরোপে জার্ম্মানীকে বিভিন্ন দিক হইতে আক্রমণ করিবার জন্য আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে। এই সম্পর্কে সেনাপতিপদে নানারূপ পরিবর্তন সাধিত হইতেছে। যতদূর মনে হয়, আগামী বসন্তকালে ইউরোপে এই অভিযান চালিত হইবে। এই সময় সম্ভবতঃ ইটালীর রণাঙ্গনের সহিত যুগোশ্লাভ রণাঙ্গনের সমন্বয় সাধন করিয়া দক্ষিণ দিকে জার্ম্মানীকে প্রবলভাবে আঘাত করিবার চেষ্টা হইবে। আদ্রিয়াতিক সাগরে সম্মিলিত পক্ষের প্রভুত্ব স্থাপিত হওয়ায় এই সাগরের দুই উপকূলের দুইটি রণাঙ্গনের সমন্বয় সাধনের বিশেষ সুবিধাও হইয়াছে। এই সময় টিরানিয়ান্ সাগরের কর্সিকা ও সার্দ্দিনিয়াকে পাদভূমিরূপে ব্যবহার করিয়া ফ্রান্সেও অভিযান পরিচালনের চেষ্টা হইতে পারে। আর বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ হইতে যে অভিযানের আয়োজন, উহা হয়ত উত্তর ইউরোপের উদ্দেশেই চালিত হইবে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—সুদীর্ঘ দুই বৎসর রুশিয়া দ্বিতীয় রণাঙ্গনের জন্য চীৎকার করিয়াছে। কিন্তু এতদিন এই দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টি করিয়া রুশিয়ার প্রতি জার্ম্মানীর চাপ হ্রাস করা হয় নাই। বর্ত্তমানে রুশিয়া যখন একাকী জার্ম্মানীকে প্রচণ্ড আঘাত হানিতেছে, সেই সময় দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির জন্য যেন প্রকৃত আগ্রহ দেখা যাইতেছে। ইহাতে মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে যে, ইউরোপে রুশিয়ার একচ্ছত্র প্রভুত্ব বিস্তৃতি নিবারণের জন্যই এই আন্তরিকতা। সম্মিলিত পক্ষ এতদিন দ্বিতীয় রণাঙ্গন সম্পর্কে সামরিক অসুবিধার কথা বলিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু বহু সমর-বিশেষজ্ঞ এই অসুবিধার কথা স্বীকার করেন নাই। কাজেই মনে করা যাইতে পারে—রুশিয়া এবং জার্ম্মানী উভয়কে দুর্ব্বল করিবার উদ্দেশ্যেই সম্মিলিত পক্ষ এতদিন নিষ্ক্রিয়তা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

এখন দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির সময়েও সম্মিলিত পক্ষ বিচ্ছিন্নভাবে পশ্চিম ইউরোপে আক্রমণ আরম্ভ করিয়া রুশ সৈন্যের একাকী পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইবার সুবিধা সৃষ্টি হয়ত করিবেন না। রুশ সৈন্য যে সকল অঞ্চলে একাকী অগ্রসর হইবে, সেখানে রুশিয়ার আদর্শ বিস্তার-লাভের বিশেষ সম্ভাবনা আছে। ইহা রুশিয়ার প্রতীচ্য মিত্রদিগের পক্ষে আনন্দের কথা নয়। এই জন্য মনে হয়, বল্কান্ অঞ্চলে রুশ সৈন্যের সহিত ইঙ্গ-মার্কিন সৈন্যের মিলন ঘটাইয়া তাহাদিগকে পশ্চিম দিকে প্রেরণের পরিকল্পনা হয়ত রচিত হইয়াছে। হয়ত ইংলণ্ড হইতে নরওয়ে ও ফিন্ল্যাণ্ড আক্রমণ আরম্ভ করিয়া সোভিয়েট বাহিনীর সহিত মিলিত হইবার প্রয়াস হইবে। তাহার পর সম্মিলিত তিনটি সেনাবাহিনী দক্ষিণ ও উত্তর দিক হইতে ইউরোপের অবশিষ্ট অংশে অগ্রসর হইতে সচেষ্ট হইবে। ৩১।১২।৪৩

সমপণ

শ্রীআশুতোষ সান্যাল এম্-এ কাব্যরঞ্জন

এ জীবনে প্রভু, করিয়াছি সার, তোমার গীতার মন্ত্র,
অলখ্ যন্ত্রি, বাজাও আমারে—আমি যে তোমার যন্ত্র!
সকল ধরম তেয়াগি' শরণ—
লইনু কেবল ও দুটি চরণ;
হৃদয়ে করিনু তোমারে বরণ,—
জানিনা পুরাণ-তন্ত্র!
বড় অবসাদ-ভরা এ চিত্ত—শোনাও তোমার শঙ্খ,
বড় বেদনায় জ্বলিছে জীবন—পাতি' দেহ তব অঙ্ক!
তুমি যদি থাকো জুড়ি' সব ঠাঁই
তবে কি জগতে দুখজ্বালা নাই?
দাতা ও গ্রহীতা তুমি একাধারে?—
কহ—কর নিঃশঙ্ক।

করমেই আছে মোর অধিকার—ফলাফল তব হস্তে,
আজিও হয়নি বীতরাগ হিয়া—বাসনা হয়নি বশ যে!
মোর মোহকূপে ডুবে যাই আমি,
সে তো তব দোষ নহে—নহে স্বামী!
তবু মূঢ়সম যোঝি দিবারাতি
শুধু তব অপযশ হে!
কে কাহারে হেথা দিতে পারে সুখ—কে কাহারে দেয় দুখ গো!
তুমি যে অখিলে বিরাজো শ্রীহরি, ভরি' সবাকার বুক গো!
ভুবন জুড়িয়া বিথারিছ মায়া—
বুঝেছি;—এবার দেহ পদছায়া!
এ আঁধারে ছাড়ি' জ্যোতির পুলিনে
যেতে প্রাণ উৎসুক গো।

জঙ্গম

বনফুল

২২

নিপুদা ডায়েরি লিখিতেছিল—

"যাহাদের গৃহের কোন বন্ধন নাই, যাহারা ব্যক্তিগত কোন সম্পত্তি স্বীকার করে না, সতীত্বের যূপকাষ্ঠে স্ত্রীপুরুষের স্বাভাবিক প্রজনন-প্রবৃত্তিকে যাহারা বলিদান দিবার পক্ষপাতী নয়, কর্ম্ম ছাড়া যাহাদের অন্য কোন ধর্ম্ম নাই, এমন কি ভগবানকে পর্য্যন্ত যাহারা মানে না আমি সেই দলের। আমি নির্ভীক। কোন কিছুর খাতিরে আমি সত্য-পথ-ভ্রষ্ট হইব না। শঙ্কর আমাকে চাকরি করিয়া দিয়াছে এই অজুহাতে শঙ্করকে বাঁচাইবার জন্য অথবা উৎপলকে তুষ্ট করিবার জন্য আমি আমার জীবনের নীতি বিসর্জ্জন দিব না, দিতে পারিব না। আমি বিদ্রোহী। বিদ্রোহের আগুন জ্বালানোই আমার কাজ। প্রতি শ্রমিকের, প্রতি কৃষকের প্রাণে প্রাণে যে ভাব জাগাইতে হইবে তাহা যদি শঙ্কর-উৎপলের স্বার্থের পরিপন্থী হয় তাহা হইলে আমি নিরুপায়। কৃতজ্ঞতা? কিসের কৃতজ্ঞতা! আমার কাজের পরিবর্ত্তে উহারা আমাকে বেতন দেয়। অমনি দেয় না। যাহা দেয় তাহাও যথেষ্ট নয়। আমার মতো একজন কর্ম্মী রুষ-দেশে ইহার অপেক্ষা ঢের বেশী সুখে স্বচ্ছন্দে থাকে। আমিই বা থাকিব না কেন? অতিশয় স্থূল দৈহিক ক্ষুধা মিটাইবার সঙ্গতি পর্য্যন্ত আমার নাই। প্রায়ই ধার করিতে হয়। ভজহরি হয়তো আজই তাগাদা করিতে আসিবে। কেন আমি ধার করিব? শঙ্কর উৎপল 'ব্ল্যাক এণ্ড হোয়াইট' সিগারেট খাইবে—আমিই বা কেন বিঁড়ি ফুঁকিয়া মরিব? শঙ্কর-উৎপল শাল-দোশালা উড়াইবে, আমিই বা দারুণ শীতে একটা শস্তা র‍্যাপার জড়াইয়া কাঁপিয়া মরিব কেন? আমি কি মানুষ নই? আমি কি উঁহাদের অপেক্ষা কম বিদ্বান, কম বুদ্ধিমান? আমার ক্ষুধা কি উহাদের ক্ষুধা অপেক্ষা কম প্রবল? সমগ্র দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা যদি বিলাসিতার অনুকূল না হয় সকলে মিলিয়া সমানভাবে দুঃখ ভোগ করিব, সকলে মিলিয়া ব্ল্যাক্-ব্রেড আহার করিতে আপত্তি নাই, কিন্তু একজন পোলাও খাইবে আর একজন পান্তা ভাত—এ অবিচার সহ্য করা শক্ত। এ অসাম্য দূর করিতেই হইবে। আমারই যখন এই অবস্থা, তখন দরিদ্র শ্রমিক এবং কৃষকদের অবস্থা যে কি তাহা ভাবিতেও ভয় হয়। দারিদ্র্যের চাপে তাহাদের সমস্ত মন অসাড় হইয়া গিয়াছে, দুঃখকে দুঃখ বলিয়া অনুভব করিতেও পারে না। প্রতি শ্রমিককে প্রতি কৃষককে বুঝাইয়া বলিতে হইবে—যাহারা তোমাদের পেশীর শক্তি অন্যায়ভাবে অপহরণ করিয়া ক্রমাগত নিজেদের শক্তি বাড়াইয়া চলিয়াছে, যাহাদের লোভের অন্ত নাই, তোমাদের বুকের রক্ত শোষণ করিয়া জোঁকের মতো স্ফীতকায় হইতে যাহারা বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না, তাহাদের ওই গগনস্পর্শী প্রাসাদটাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ধূলিসাৎ করো। ওই পুঁজিতন্ত্রী ধনীরাই তোমাদের শত্রু। তোমাদের ন্যায্য প্রাপ্য জোর করিয়া কাড়িয়া লও—"

দ্বারপ্রান্তে শব্দ হইল। ভজহরি আসিল বোধ হয়। ঘাড় ফিরাইয়া নিপু দেখিল—ভজহরি নয় ছুলকি। একটু বিব্রত বোধ করিল। মেয়েটাকে আজই টাকা দিবার কথা। ছুলকি কিছু না বলিয়া দ্বারপ্রান্তে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার এই স্তব্ধতা অস্বস্তিকর। নিপু যতটুকু দেখিয়াছে তাহাতে অদ্যাবধি কোন উচ্ছৃলতা সে ছুলকির মধ্যে লক্ষ্য করে নাই। নির্ঝরের চাপল্য কিম্বা অগ্নির প্রদাহ, মান, অভিমান, সোহাগ, আবদার অর্থাৎ ইহার অন্তরের কোন পরিচয় আজ পর্য্যন্ত নিপু পায় নাই। ছুলকি শুধুই যেন দেহ, কেবল মাংস খানিকটা—আর কিছু নয়। কিন্তু অপরূপ সে দেহের গঠন। ক্ষীণ-কটি কুচভরনমিতাঙ্গী নিবিড়-নিতম্বিনী ছুলকি যেন জীবন্ত অজন্তা-চিত্র। কোন শিল্পীর কল্পনা যেন মূর্ত্ত হইয়াছে। কিন্তু এ মূর্ত্তির মধ্যে প্রাণ নাই—থাকিলেও নিপু তাহার কোন স্পর্শ পায় নাই। নিপুর কাছে ছুলকি পাথরের মতোই স্থির কঠিন নীরব। নিপু বিহ্বল হইয়া চাহিয়া রহিল। ছুলকি লাল ফুটকি দেওয়া হলুদ রঙের একটা শাড়ি পরিয়া আসিয়াছে। অবগুণ্ঠন নাই। চোখের দৃষ্টিতে শঙ্কা নাই, লজ্জা নাই, আগ্রহ নাই, প্রেম নাই—এমন কি দীপ্তিও নাই। স্থির অপলক দৃষ্টি যেন অনুচ্ছ্বসিত নীরব ভাষায় বলিতেছে—আমার পাওনাটা দিয়া দাও —আমি চলিয়া যাই।

ছুলকি জাতে মুসহর; এ অঞ্চলে মাঝে মাঝে মধু বিক্রয় করিতে আসে। মাথায় মধুর হাঁড়ি লইয়া—"মধু উ উ উ—মধু লিবে গো" বলিয়া রাস্তায় রাস্তায় ফেরি করিয়া বেড়ায়। সঙ্গে একজন পুরুষও থাকে। ঝাঁকড়া-চুল-ওয়ালা ভীষণ দর্শন লোকটা—তাহারও শরীর যেন পাথরে-কোঁদা—কোমরে সর্ব্বদা একটা ছোরা-গোঁজা—চক্ষুর দৃষ্টি সামান্য উত্তেজনাতেই হিংস্র হইয়া ওঠে। স্বামী বলিতে সভ্য সমাজে যে সম্পর্ক বুঝায়, এ ব্যক্তির সহিত ছুলকিব ঠিক সে সম্পর্ক আছে কি না তাহা জানা কঠিন; কিন্তু সে যে ছুলকির মালিক সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই। ছুলকি তাহার পদানত। এই আত্মসমর্পণের মূলে কি আছে—ছোরা, না প্রেম, না সামাজিক বন্ধন—তাহাও কেহ জানে না। এইটুকু শুধু সকলে জানে যে সে ছুলকির মালিক। ছুলকির এই সব নৈশ-অভিযান সে-ই নিয়ন্ত্রিত করে, উপার্জ্জনের সমস্ত টাকা সে-ই লয়। কিছুকাল আগে মুশাই এই ছুলকির কবলে পড়িয়াছিল। অর্থাভাবেই হোক বা যমুনিয়ার ছট্ পরবের জোরেই হোক, মুশাই এখন ছুলকিকে ছাড়িয়াছে। ছুলকি এখন নিপুর। ফুলশরিয়া কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া নিপু কিছুদিন ক্রোধে ক্ষোভে দিশেহারা হইয়া উঠিয়াছিল। বিস্ময়ও তাহার কম হয় নাই যখন সে আবিষ্কার করিল যে ওই ঘেয়ো-লোকটা তাহার স্বামী নয়! সামান্য পণ্যরমণী হইয়াও ওই লোকটাকে সে আঁকড়াইয়া রহিয়াছে! কেন? যে বস্তুতান্ত্রিক মানদণ্ড দিয়া সে জীবনের সমস্ত রহস্য নিরুপণ করিতে অভ্যস্ত, তাহা দিয়া সে ফুলশরিয়ার চরিত্র বিশ্লেষণ করিতে পারিল না। কাব্যের মুখস্থ বুলি আওড়াইয়া অবশেষে সে মনকে স্তোক দিল—প্রেমের

বিচিত্র নিয়ম বোধহয়! ইহা লইয়া বেশীদিন সে মাথাও ঘামাইল না. ডুলকিকে পাইয়া ফুলশরিয়াকে ভুলিয়া গেল। সে 'বায়োলজিক্যালি' বাঁচিতে চায়—ডুলকি, ফুলশরিয়া যে কেহ একটা জুটিলেই হইল। এখন কিন্তু ডুলকিকে দেখিয়া সে একটু বিব্রত বোধ করিল। হাতে মাত্র পাঁচটি টাকা আছে। পাঁচ টাকাই উহাকে দিয়া দিলে হাত যে একেবারে খালি হইয়া যাইবে। কিন্তু ডুলকির অপলক নীরব দৃষ্টিকে উপেক্ষা করা শক্ত। একটু ইতস্তত করিয়া নিপু অবশেষে পাঁচ টাকার নোটটা বাহির করিল এবং সেটা টেবিলে রাখিয়া একমুখ হাসিয়া বলিল—"বৈঠো—"

ডুলকি বসিল না।

পাঁচ টাকার নোটটার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া স্থিরকণ্ঠে বলিল, "পাঁচ টাকায় হোবে না বাবু, পচাশ টাকা লাগবে—"

মুসহরদের নিজের ভাষা একরূপ অদ্ভুত হিন্দি। কিন্তু 'বাঙালী' বাবুদের সহিত ইহারা বাঁকা বাংলায় কথা বলে।

নিপু আকাশ হইতে পড়িল। বলে কি! পঞ্চাশ টাকা দিতে হইবে!

"কাহে?"

ডুলকি নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। ক্ষণপরেই যাহা ঘটিল তাহা অপ্রত্যাশিত। নিপু চমকাইয়া উঠিল। হঠাৎ পিছনের অন্ধকার হইতে বাহির হইয়া আসিল ডুলকির মালিক এবং খাঁউ খাঁউ করিয়া নিজস্ব ভাষায় যাহা বলিল তাহার সারমর্ম এই:—আপনিই তো হুজুর সেদিন হাটে বক্তৃতা করিয়াছিলেন যে মজুরদের বেতন দশগুণ হওয়া উচিত, বাবু ভেইয়ারা তাহাদের ঠকাইয়া তাহাদের ন্যায্য মজুরি চুরি করিয়া নিজেরা বাবুয়ানি করে। কথাটা আমার বড় ভাল লাগিয়াছিল। আশা করিয়াছিলাম যে আপনি অন্তত মজুরদের প্রতি সুবিচার করিবেন। আপনিও আর সকলের মতো কম মজুরি দিতে চাহিতেছেন—এ তো বড় তাজ্জব কি বাত!

শাণিত দন্ত বিকশিত করিয়া লোকটা হাসিল। নিপু যে কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। লোকটার চোখের দিকে চাহিয়া থাকিতেও পারিল না—অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল। এই মূর্খটাকে সে কি করিয়া বুঝাইবে যে সকলে যদি সমাজ-তন্ত্রী না হয়—সে একা কি করিয়া হইবে, অর্থ-নৈতিক আইন অনুসারে তাহা যে কিছুতে হওয়া যায় না। তাহার মনে হইল অর্থনীতির মূল সূত্রগুলি সহজ ভাষায় ইহাদের মধ্যে প্রচার করা উচিত—তাহা না হইলে বক্তৃতার সহিত আচরণের সঙ্গতি রক্ষা করা যায় না। আমি নিজেও যে কত অসহায় তাহা ইহাদিগকে বুঝাইতে না পারিলে···

"চল্—"

নিপু চকিতে চোখ ফিরাইয়া দেখিল—লোকটা ডুলকির হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে—মুখ ভ্রূকুটি-কুটিল—চোখ দুইটা দপ দপ করিয়া জ্বলিতেছে। কয়টা টাকার জন্য মেয়েটা নাগালের বাহিরে চলিয়া যাইবে না কি।

"আরে, ঠহরো ঠহরো—যাও মৎ"

উভয়ে ফিরিয়া দাঁড়াইল। যদিও এতদিন ধরিয়া সে সাম্যবাদের মন্ত্র জপ করিয়াছে, কার্য্যকালে কিন্তু তাহার সুপ্ত বুর্জোয়া মনোবৃত্তি মাথা চাড়া দিয়া উঠিল—টাকা দিয়া এই ছোটলোক-গুলাকে কিনিয়া রাখিবার লোভ সে সম্বরণ করিতে পারিল না। তাহাকে অপমান করিয়া চলিয়া যাইবে! আস্পর্দ্ধা তো কম নয়! ঘোড়দৌড়ের মাঠে জুয়াড়ির যে রকম অযৌক্তিক রোখ চাপিয়া যায় বৈজ্ঞানিক নিপুরও ঠিক তাহাই হইল। সে অশুদ্ধ হিন্দিতে বলিয়া বসিল যে সে পঞ্চাশ টাকাই দিবে—আজ হাতে অত টাকা নাই, ডুলকি কাল আসিয়া যেন টাকা লইয়া যায়।

"বহুত খুব"

দুইজনেই অন্ধকারে মিলাইয়া গেল।

নিপু খোলা দ্বারটার দিকে চাহিয়া অবাক হইয়া বসিয়া রহিল। আরও অবাক হইয়া যাইত যদি দেখিতে পাইত—অন্ধকারে কেমন দুইজনে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো গলা ধরাধরি করিয়া চলিয়াছে। দেহের শুচিতা ইহাদের কাছে তত বড় নয়, মনের শুচিতা যতটা। প্রাণধারণ করিবার জন্য যেমন মধু-বিক্রয় করিতে হয়, তেমনি দরকার পড়িলে দেহ-বিক্রয়ও করিতে হয়। নারী-মাংস-লোলুপ কুত্তার অভাব নাই পৃথিবীতে। তাহাদের লোভের খোরাক জোগাইয়া অর্থ-উপার্জ্জন করিতে হয় বই কি মাঝে মাঝে। অর্থ-টা যে অতিশয় প্রয়োজনীয় জিনিস, না থাকিলে চলে না এবং মধু-বিক্রয় করিয়া সব সময়ে তাহা প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহও করা যায় না। উপরি রোজকার করিতে দোষ কি! ইহাদের নীতি কমিউনিষ্টিক নয়, একেবারে মহাভারতীয়। মন যদি একনিষ্ঠ থাকে—দেহ লইয়া ইহারা মাথা ঘামায় না। সমুদ্রাভিমুখিনী স্রোতস্বতীর বুকে সাময়িক খড়কুটা জঞ্জালের মতো এসব নিতান্তই সাময়িক ব্যাপার—আসে এবং ভাসিয়া যায়।······কেকার ধ্বনির ন্যায় একটা তীক্ষ্ণ শব্দ অন্ধকারকে আকুল করিয়া তুলিল। নিপুর মনে হইল আকাশে বোধহয় হাঁস উড়িয়া যাইতেছে। এ অঞ্চলের খালে-বিলে এ সময় হাঁস আসে। এ কিন্তু হাঁস নয়, ডুলকি। স্বামীর কি একটা রসিকতায় কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিয়াছে। নিপু বুঝিতে পারিল না, কারণ নিপুর কাছে ডুলকি কখনও হাসে নাই।······উন্মুক্ত দ্বারপথে চাহিয়া নিপু চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার অন্তরের মধ্যে অতৃপ্ত লালসা, দারিদ্র্যজনিত ক্ষোভ, আদর্শনিষ্ঠা, আদর্শচ্যুতি, আহত আত্ম-অভিমান, ব্যর্থ-আক্রোশ, সমস্ত যেন একটা তিক্ত বীভৎস রসের ফেনিল আবর্ত্তে টগবগ করিয়া ফুটিতে লাগিল। তাহার ইচ্ছা করিতে লাগিল যে সমাজবিধান তাহাকে এমন ক্ষুধিত অসমর্থ অসহায় করিয়া রাখিয়াছে তাহার বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহার টুঁটি কামড়াইয়া ধরিতে—ভীম যেমন করিয়া দুঃশাসনের রক্তপান করিয়াছিল।

"দেবতা বাড়ি আছেন নাকি"

তড়িৎ-স্পৃষ্ট হইয়া নিপু যেন সম্বিৎ ফিরিয়া পাইল। মুকুন্দ পোদ্দারের কণ্ঠস্বর!

এবার ভজহরিকে না পাঠাইয়া স্বয়ং আসিবার মানে? ভজহরিই তো প্রতিমাসে সুদ লইয়া যায়। দ্বারপ্রান্তে মুকুন্দ পোদ্দার আবির্ভূত হইলেন।

"এই যে দেবতা আছেন দেখছি—"

চৌকাঠের উপর দাঁড়াইয়া পোদ্দার মহাশয় পা ঠুকিয়া ঠুকিয়া চটিজুতা হইতে ধূলি অপসারণ করিলেন, তাহার পর ঘরে ঢুকিয়া

তৈলপক্ক বেঁটে বাঁশের লাঠিটি কোণে সন্তর্পণে রাখিয়া চৌকিতে আসিয়া উপবেশন করিলেন এবং নিপুর দিকে চাহিয়া হাসিলেন। দন্ত-লগ্ন স্বর্ণ-খণ্ডগুলি বাতির আলোকে চকমক করিয়া উঠিল।

"আপনি নিজেই এলেন যে আজ"

"কেন, দেব-দর্শনে দোষ কি আছে"

তাহার পর একটু হাসিয়া বলিলেন, "ভজহরির শরীরটা খারাপ। বাবু লোক সে, একটু ঠাণ্ডা লাগলেই কাবু হয়ে পড়ে। ঠাণ্ডার দিনে আমি কিন্তু হাঁটলেই ভাল থাকি—তাই ভাবলুম বেড়িয়েই আসি একটু—"

ক্ষণকাল থামিয়া মুকুন্দ পুনরায় বলিলেন, "আঃ—সে দিন হাটের বক্তৃতাটা আপনার চমৎকার হয়েছিল—অমন হক্ কথা বহুকাল শোনা যায় নি"

তাঁহার চোখের দৃষ্টিতে অগ্নির আভা ফুটিয়া উঠিল—মুখে হাসি।

নিপু হাসিয়া বলিল, "আপনারও ভাল লেগেছিল? আমার বক্তৃতা শুনে ওরা যদি জাগে, তাহলে তো আপনাদেরই বিপদ সব চেয়ে বেশী—"

"তাহলেও হক্ কথা হক্ কথাই। তাছাড়া আমরা আর ক'দিন। আর সব চেয়ে বড় কথা কি জানেন দেবতা—এই—"

মুকুন্দ পোদ্দার ললাটের মধ্যস্থলে তর্জ্জনী স্থাপন করিয়া হাসিলেন।

"এটি যতক্ষণ আমার স্বপক্ষে আছে ততক্ষণ দেবতা—কোন বক্তৃতাকেই আমি কেয়ার করি না। এমন কি আপনার প্যাম্‌ফেলেট—না কি বললেন সেদিন—তা-ও ছাপিয়ে দিতে আমি রাজি আছি"

"রাজি আছেন?"

"আপত্তি কি"

নিপু যেন অকূলে কূল পাইল। কলিকাতায় যে কমিউনিষ্টিক দলের সহিত সে এখন নামে-মাত্র সংশ্লিষ্ট আছে এবং যে দলের হরেন তালুকদার তাহার চাকরি-করা লইয়া খুব একটা ব্যঙ্গাত্মক পত্র লিখিয়াছে, হাজার কয়েক গরম প্যাম্‌ফ্লেট ছাপাইয়া যদি সেই দলে ছড়াইয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে তাহার শুধু যে মুখ রক্ষা হইবে তাহাই নয়, নীরব কর্ম্মী হিসাবে হয়তো দলের মধ্যে একটা জয়-জয়কারও পড়িয়া যাইতে পারে। ইহা নিতান্ত তুচ্ছ করিবার মতো জিনিস নয়। এমন কি প্যাম্‌ফ্লেটের ভাষায় সে যে আগুন ছুটাইবে তাহা যদি পুলিশ বিভাগের রোষ উৎপাদন করিয়া তাহাকে কারাবরণ করিতে বাধ্য করে তাহা হইলে তো কথাই নাই—তাহার প্রতিপত্তির অন্ত থাকিবে না। উত্তেজনাপূর্ণ কোন একটা কিছু করিতে না পারিলে তৃপ্তি নাই। এই অখ্যাত পল্লীগ্রামে একটা ক্যাপিটালিষ্ট জমিদারের অধীনে হাড়ি ডোমদের মধ্যে বাস করিয়া সহস্র বিরুদ্ধতার মধ্যে কাজ করা কি সম্ভব? কেহ তাহার একটা কথা বোঝে না। ইহাদের মধ্যে কোন উত্তেজনা নাই, কোন উৎসাহ নাই, কেহ একটা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পর্য্যন্ত করে না। উত্তেজনার সন্ধানেই সেদিন সে হাটে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিয়াছিল, উত্তেজনার সন্ধানেই লক্ষ্মীবাগে মণির বিরুদ্ধে চাষীদের ক্ষেপাইতেছে। কিন্তু ইহাতেও তৃপ্তি নাই। সমস্ত দেশকে মাতাইবে—ইহাই তাহার স্বপ্ন। এই ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে পড়িয়া থাকিলে তাহার স্বপ্ন সফল হইবে কি? মুকুন্দ পোদ্দারের কথায় তাহার অন্তরের সুপ্ত বহ্নি যেন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। মুখে কিন্তু বিশেষ আগ্রহ সে প্রকাশ করিল না—সে বিষয়ে সে খুব চালাক—অত্যন্ত নিরীহ ভাবেই বলিল—"বেশ তো, দিন না। তাহলে তো একটা ভাল কাজ হয়—"

"ভাল কাজ করতে কোন কালে পেছ-পা নই আমি। শঙ্কর-বাবু ইস্কুল করতে চাইলেন, দিলাম করে'—এখন সে ইস্কুলে ছাত্তোর জুট্‌ছে না, তাতো আর আমার দোষ নয়—"

"ছাত্র জুটছে না নাকি"

"জুটবে কি করে'। যা এক মাষ্টার পাঠিয়েছেন শঙ্করবাবু—লোকটার নাক সর্ব্বদা কুঁচকেই আছে—এটা নেই, ওটা নেই, সেটা নেই, নিত্যি একটা না একটা বায়নাক্কা লেগেই আছে। তাছাড়া বলে কি শুনবেন? বলে ছোটলোকের ছেলেদের গায়ে বড্ড গন্ধ, কাছে বসা যায় না! ফিনফিনে পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে এসেন্সওলা রুমাল নাকের কাছে ধরে' পড়ান। এ রকম হতচ্ছেদ্দা করলে ছাত্তোর ওর কাছে ঘেঁসবে কেন—অ্যাঁ কি বলেন আপনি—ছোটলোক হলেও ওরা মানুষ তো। এখন প্রতিটি ছাত্তোরকে যদি সাবান মাখাতে পারি তাহলে হয়তো ওঁর মনঃপুত হয়—কিন্তু অত পয়সা আমার নেই মশাই—অমন করে' লেখাপড়া শিখিয়েও কাজ নেই—আর লেখাপড়া শিখে হবে তো কচু—ইস্কুল করার চেয়ে এদেশে অন্নছত্র খোলা ভাল—ছোটখাটো একটা খুলেওছি—গুটি দশেক লোককে খেতে দি, তার বেশী আর পারি না—"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া মুকুন্দ পোদ্দার পুনরায় বলিলেন—"ইস্কুল ফিস্কুল চলবে না—"

স্কুল সম্বন্ধে নিপুর নিকট হইতে কোন মন্তব্য না শুনিয়া পোদ্দার মহাশয় ও বিষয়ে আর আলোচনা করা সঙ্গত মনে করিলেন না। কি জানি শঙ্করকে গিয়া যদি লাগায়! উৎপলের দক্ষিণ হস্ত শঙ্করকে চটাইবার সাহস তাঁহার নাই। স্কুল সম্বন্ধে এতক্ষণ তিনি যাহা বলিতেছিলেন তাহা অবশ্য খানিকটা সত্য। কিন্তু স্কুল না চলিবার আসল কারণ শিক্ষকের ফিনফিনে পাঞ্জাবি অথবা তাঁহার সদ্গন্ধ-প্রিয়তা নয়। আসল কারণ তিনি নিজেই। ভজহরির মারফত তিনিই পাকে-প্রকারে চেষ্টা করিয়াছেন ছাত্র যাহাতে না জোটে। ভজহরি গ্রামের চাষীদের গোপনে 'টিপিয়া' দিয়াছে যে স্কুলে যেন তাহারা ছেলে না পাঠায়, পাঠাইলে পোদ্দারজি চটিয়া যাইবেন। ছাত্র না জুটিবার ইহাই যথেষ্ট কারণ এবং আসল কারণ।

"প্যাম্‌ফ্লেট্ লিখি তাহলে?"

"লিখুন। পাঁচ জনের যদি উপকার হয়, দেব না হয় ছাপিয়ে। কিন্তু একটি সর্ত্তে—"

"কি বলুন"

"একটি নয়, দুটি সর্ত্ত আছে। প্রথম আমার নাম কারুর কাছে প্রকাশ করতে পারবেন না। দ্বিতীয় সর্ত্তটি একটু ইয়ে গোছের—বুঝিয়ে বলি তাহলে শুনুন। আচ্ছা, ছোটলোকদের মধ্যে আন্দোলন চালাতে পারবেন আপনি? মানে ষ্ট্রাইক, ধর্ম্মঘট এই সব?"

"তা চেষ্টা করলে পারি বোধ হয়"

"বহুত আচ্ছা। একটি কাজ করতে হবে আপনাকে। শুনেছেন

বোধহয় হৃদয়বল্লভ উৎপলের কাছ থেকে জমিদারিটা ফিরে কিনে নেবার চেষ্টা করছে—রাজীব দিচ্ছে টাকা। এর মানেটা বুঝছেন ?"

নিপু কিছুই শোনে নাই। মনে মনে আশ্চর্য্য হইল। বাহিরে কিন্তু এমন ভাব করিল যেন সে সব জানে।

"বুঝছেন কিছু ?"

"না"

"এর মানে ওই চশম্‌-খোর কঞ্জুস রাজীবই শেষ পর্য্যন্ত জমিদার হবে। আর তা হ'লে দুর্গতির অন্ত থাকবে না ভদ্দরলোকদের। উৎপল জমিদারি বিক্রি করুক, হৃদয়বল্লভ তা কিনুক—এ ওয়াজিব ব্যাপার—আমার কোন আপত্তি নেই ; কিন্তু রাজীবকে মাথা গলাতে দেব না আমি তার মধ্যে। হৃদয়বল্লভ যদি চায়, আমিই টাকা দিতে পারি—"

বিহ্বল নিপু বলিল, "আমাকে কি করতে হবে"

"কিছু নয়, হৃদয়বল্লভকে এই কথাটি শুধু জানিয়ে দিতে হবে যে রাজীবের টাকা নিয়ে আপনি যদি জমিদারি কেনেন তাহলে আপনি শান্তিতে থাকতে পারবেন না। আমরা ধর্ম্মঘট করব, প্রজারা যাতে খাজনা না দেয় তার চেষ্টা করব, গান্ধির দলকে ডেকে আনিয়ে ছারখার করে দেব সব। জমিদারি আপনি কিনুন, কিন্তু রাজীবের টাকা দিয়ে নয়। আমি টাকা দিতে রাজি আছি —নিতে হলে আমার টাকাই নিক"

"মানে, আপনি নিজেই জমিদার হতে চান ?"

মুকুন্দ পোদ্দার হাসিলেন—তাঁহার দাঁতের সোনা আবার চকমক করিয়া উঠিল।

"আমি জমিদার হলে দেখবেন কি করি। নিজের মুখে আগে থাকতে বলতে চাই না কিছু, দেখবেন। প্রজার ভাল কি করে' করতে হয় তা দেখিয়ে দেব আমি—"

নিপু সহসা অনুভব করিল এই ধনী মহাজনটিকে খুশি রাখিতে পারিলে ভবিষ্যতে তাহার অনেক সুবিধা হইতে পারে। আজ শঙ্কর যেমন উৎপলের সহায়তায় প্রতাপান্বিত হইয়াছে, সে-ও একদিন জমিদার মুকুন্দ পোদ্দারের সহায়তায় বহুলোকের উপর কর্তৃত্ব করিতে পারিবে। নিজের আদর্শ প্রচার করিবার সুবিধাই হইবে তাহাতে। তাহার এতদিনকার মহাজন-বিদ্বেষ সহসা যেন কুয়াশার মতো মিলাইয়া গেল। এই পুঁজিবাদি লোকটার স্বার্থরক্ষা করিতে তাহার আর দ্বিধা হইল না। বলিল—"আচ্ছা চেষ্টা করে দেখব—"

উভয়েই কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল। ক্ষণকাল পরেই কিন্তু মুকুন্দ পোদ্দারের আসল কথাটি মনে পড়িয়া গেল।

"আজ কিছু দেবেন না কি"

"হাতে এ মাসে একদম কিচ্ছু নেই। আরও গোটাপঞ্চাশেক টাকার জরুরি দরকার। কি যে করব ভাবছি। দেবেন আপনি ?"

"দিতে পারি অবশ্য—যদি—"

একটু ইতস্তত করিয়া মুকুন্দ বলিলেন—"আচ্ছা থাক, আপনার সঙ্গে আর ব্যবসাদারি না-ই করলাম, বন্ধকী দিতে হবে না আপনাকে—এমনিই দেব। কাল সকালে গিয়ে নিয়ে আসবেন। আপনার সোনার হাত-ঘড়িটাও ফেরত দিয়ে দেব। আপনার সঙ্গে বন্ধকী কারবার আর না-ই করলাম—অ্যাঁ কি বলেন—"

সহাস্যদৃষ্টিতে মুকুন্দ নিপুর দিকে চাহিলেন।

নিপু শুধু একটু মুচকি হাসিল।

"রাত হল, এবার ওঠা যাক—"

ঘরের কোন হইতে লাঠিটি লইয়া মুকুন্দ চৌকাঠের উপর সেটি অভ্যাসমতো বার দুই ঠুকিলেন।

"শীতকালের একটি সুখ কি জানেন, সাপ খোপের ভয় থাকে না। ওই জিনিসটিকে বড় ডরাই দেবতা—"

নিপু আবার মুচকি হাসিল।

মুকুন্দ পোদ্দার চলিয়া গেলেন। মুকুন্দ পোদ্দার চলিয়া গেলে নিপু আরও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার মুখের হাসি মিলাইয়া গেল, মনে হইল সে যেন নিঃস্ব হইয়া গিয়াছে। এতদিন যে বিত্ত সে সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিতেছিল আজ যেন তাহা ডাকাতে লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গেল। না—না—না—সে মুকুন্দ রাজীব শঙ্কর উৎপল কাহাকেও সাহায্য করিবে না—শত বিরুদ্ধ শক্তির বিরুদ্ধে একক সে সগর্ব্বে বিদ্রোহ-পতাকা তুলিয়া যুদ্ধ করিবে—ক্যাপিটালিজ্‌মের সহিত কোন সর্ত্তেই রফা করা চলিবে না। মুকুন্দ পোদ্দারকে এখনই সে কথাটা বলিয়া দেওয়া ভাল। সে উঠিয়া বাহিরে গেল।

"পোদ্দার মশাই—"

কোন উত্তর আসিল না। পোদ্দার মশাই অনেকদূর চলিয়া গিয়াছিলেন। একটা পেচক কর্কশকণ্ঠে চীৎকার করিতে করিতে উড়িয়া গেল।

ক্রমশঃ

দুঃখ নহে চিরজয়ী

শ্রীহেমলতা ঠাকুর

পৃথিবী ছাড়িয়া যাওয়া শেষ হওয়া নয়,
নুতন জগতে প্রাণ পাইবে নিশ্চয়
মৃত্যু পীড়িতেরা। ভয়ে হয়োনা কাতর—
জন্মান্তের যত পাপ ছিল অগোচর
মূর্ত্ত হয়ে আজ তারা করে ছুটাছুটি
রাজপথে গৃহদ্বারে করে লুটোপুটি
বিশীর্ণ কঙ্কাল মূর্ত্তি। পৃথিবীর পাপ
বহন করিছে তারা, দারুণ সন্তাপ
হানিতেছে পৃথিবীর দগ্ধ পিষ্ট বুকে
অনশনে-অর্দ্ধাশনে, প্লাবনের মুখে।
দুঃখ নহে চির জয়ী, চির তমোময়,
দিনান্তে নিশান্তে তার হতে হবে ক্ষয় ;
জানিল যে, ভাবিল যে, দৈন্যে দিল ফাঁকি
কে জানে তাহার ভাগ্যে কি রয়েছে বাকি।
দুঃখ দিয়া দুঃখ যার করি দিল শেষ
জ্যোতির্ম্ময় লোকে তার নিশ্চিত প্রবেশ।

সাময়িকী

বাঙ্গালার নূতন গভর্ণর—

মধ্যপ্রাচীর বর্ত্তমান রাষ্ট্রসচিব মিঃ রিচার্ড গার্ডিনার ক্যাসি বাঙ্গালার নূতন গভর্ণর নিযুক্ত হইয়াছেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে (মেলবোর্ণে) জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি ১৯৩১ সালে অষ্ট্রেলিয়ান পার্লামেন্টের সদস্য নির্ব্বাচিত হন। ১৯১৪-১৮ সালে তিনি যুদ্ধে কাজ করেন। ১৯৪২ সালের মার্চ্চ মাসে তাঁহাকে মধ্যপ্রাচীর রাষ্ট্র-সচিব নিযুক্ত করা হইয়াছিল। এই প্রথম বৃটিশ সমর মন্ত্রিসভার সদস্যকে গভর্ণর পদে নিযুক্ত করা হইল। তাঁহার দ্বারা দুর্দ্দশাগ্রস্থ বাঙ্গালার যদি কোন উপকার হয়, তবেই দেশবাসী চিরদিন তাঁহার নাম শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিবে।

ডাক্তার সুশীলকুমার দে—

ডাক্তার সুশীলকুমার দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক। সম্প্রতি তাঁহাকে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে। অধ্যাপনা ছাড়াও তাঁহাকে এই কাজ করিতে হইবে। ডাক্তার দে'র এই সম্মান প্রাপ্তিতে সকলেই আনন্দিত হইবেন।

শ্রীযুক্ত কানোরিয়ার বর্ণনা—

বেঙ্গল রিলিফ কমিটীর সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত ভগীরথ কানোরিয়া সিরাজগঞ্জ, চট্টগ্রাম, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে এক সপ্তাহ ভ্রমণের পর কলিকাতায় ফিরিয়া এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া জানাইয়াছেন—বাঙ্গালার সমস্যা আজ শুধু খাদ্যের নহে, কাপড়, আসবাবপত্র, গরু, জ্বালানি কাঠ, শাক-সব্জি, ঔষধপত্র, স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি সকল জিনিষেরই অভাব। দুর্ভিক্ষে শুধু মানুষ মারা যাইতেছে না, দেশের শিক্ষা ও কৃষ্টি নষ্ট হইয়া যাইতেছে। লোক ছেলেমেয়েদের স্কুলের বেতন জোগাইতে পারে না, সে জন্য মফঃস্বলের স্কুলগুলির ছাত্রসংখ্যা খুব কমিয়া যাইতেছে। পুষ্করিণীগুলির পঙ্কোদ্ধার করা বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়াছে। এই কার্য্যে লোককে মজুরী দেওয়া চলিবে, সঙ্গে সঙ্গে পানীয় জলের অভাব দূর করা হইবে। লোক বাসন পত্র, এমন কি ঘরের টিনের চালা পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া অন্নের সংস্থান করিতেছে—একজন মহকুমা হাকিমের সহিত কথা হইল—তিনি বলিলেন, তাঁহার মহকুমার ৮ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে সওয়া ৬ লক্ষ অধিবাসী অনাহারে বা অর্দ্ধাহারে মৃতপ্রায় হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত শৈলপতি চট্টোপাধ্যায়—

কলিকাতা কর্পোরেশনের চিফ একজিকিউটিভ অফিসার শ্রীযুক্ত শৈলপতি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কার্য্যকাল গত ২৪শে ডিসেম্বর শেষ হওয়ায় কর্পোরেশন কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে আরও ৫ বৎসরের জন্য ঐ পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট তাঁহার নিয়োগ মাত্র ৩ বৎসর কালের জন্য মঞ্জুর করিয়াছেন। কর্পোরেশনের বিশেষ অনুরোধ সত্ত্বেও গভর্ণমেণ্ট ৩ বৎসরের অধিককালের জন্য তাঁহার নিয়োগ অনুমোদনে সম্মত হন নাই। এই ব্যাপার লইয়া কর্পোরেশন কর্ত্তৃপক্ষের সহিত গভর্ণমেণ্টের মত ভেদে এক শাসনতান্ত্রিক সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। ইহার শেষ কোথায় কে জানে?

জগত্তারিণী স্বর্ণপদক—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ স্থির করিয়াছেন যে বঙ্গ-সাহিত্যে দানের জন্য শ্রীমতী নিরুপমা দেবীকে এবার বিশ্ব-বিদ্যালয়ের জগত্তারিণী পদক প্রদান করা হইবে। বঙ্গ-সাহিত্যের পাঠকবর্গের নিকট তাঁহার লিখিত দিদি, অন্নপূর্ণার মন্দির, দেবত্র, যুগান্তরের কথা, অনুকর্ষ প্রভৃতি গ্রন্থ সুপরিচিত। তাঁহার এই সম্মান প্রাপ্তিতে আমরা তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধাভিবাদন জ্ঞাপন করিতেছি।

আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় প্রথম—

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিশ্বপতি চৌধুরী মহাশয়ের পুত্র ও ভারতবর্ষের লেখক শ্রীমান জয়ন্তকুমার চৌধুরী এবার নিখিল বঙ্গ



শ্রীজয়ন্তকুমার চৌধুরী

ইণ্টার-কলিজিয়েট আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। আমরা তাঁহার জীবনে সাফল্য কামনা করি।

মফঃস্বলে ধান্য ক্রয়—

বাঙ্গালার বেসরকারী সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী মিঃ এইচ-এস সুরাওয়ার্দ্দী ৪ঠা জানুয়ারী এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া জানাইয়াছেন যে—বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট মফঃস্বলে ধান্য ক্রয় করিতেছেন বটে,

কিন্তু যেখানে মূল্য কম শুধু সেখানেই সামান্য পরিমাণ ধান কেনা হইতেছে ও তাহার ফলে কোথাও ধানের দাম বৃদ্ধি পায় নাই।

জমি বিক্রয় ও তাহার সমস্যা—

বর্ত্তমান খাদ্য সঙ্কটে অনেক দরিদ্র কৃষককে তাহাদের জমি বিক্রয় করিয়া সেই অর্থে খাদ্য কিনিয়া জীবন ধারণ করিতে হইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের কথা চিন্তা করিয়া এক অর্ডিনান্স দ্বারা ব্যবস্থা করিয়াছেন—১৯৪৩ সালের মধ্যে কোন প্রজা যদি ২৫০ বা তাহার কম টাকায় কোন জমি বিক্রয় বা অন্য উপায়ে হস্তান্তর করিয়া থাকে তবে খাদ্যাভাবে তাহা করিয়াছে এই যুক্তি দেখাইয়া বিক্রীত জমি ফিরিয়া পাইবার জন্য কালেক্টারের নিকট আবেদন করিতে হইবে। ক্রীত জমির উপসত্ব হইতে ক্রেতা যে টাকা লাভ করিয়াছে তাহা বাদ দিয়া যে টাকা বাকী থাকিবে তাহা ও তাহার উপর শতকরা ৩৵০ হারে সুদ দিয়া অবশিষ্ট বিক্রয় মূল্য ক্রেতাকে ফেরত দিতে হইবে। ঐ সব হইয়া গেলে ১লা বৈশাখ বিক্রেতা নিজের জমি ফিরিয়া পাইবে। বিক্রেতা ইচ্ছা করিলে বিক্রয় দলিলকে ১০ বৎসর বা তদনুরূপ সময়ের খাইখালাসী দলিলে রূপান্তরিত করিতে পারিবে। জমি ফিরাইয়া পাইবার জন্য আবেদন ২ বৎসরের মধ্যে করা চলিবে। ১৯৪৩ সালে বিক্রীত জমি সম্বন্ধে এই অর্ডিনান্স শুধু প্রযুক্ত হইবে। ইহার ফল যদি ভাল হয় ও দরিদ্র কৃষক যদি ইহা দ্বারা কোন সুবিধা লাভ করে, তবেই মঙ্গলের কথা।

গমের বীজ সংগ্রহ—

বাঙ্গালা সরকার বিহার হইতে অর্দ্ধমূল্যে ৫০ হাজার মণ গমের বীজ সংগ্রহ করিয়াছেন। বাঙ্গালা দেশে গমের চাষ বাড়াইবার জন্য এই বীজ সংগ্রহ করিয়া সর্ব্বত্র সরবরাহ করা হইতেছে।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস—

গত ৩রা জানুয়ারী হইতে দিল্লীতে আচার্য্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সভাপতিত্বে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। পণ্ডিত জহরলাল নেহরুকে এই কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত করা হইয়াছিল—কিন্তু তিনি এখন কারাগারে! বসু মহাশয় পদার্থ বিজ্ঞানের বিস্ময়কর উন্নতি ও ভবিষ্যৎ জগতের উপর তাহার প্রভাব সম্পর্কে এক পাণ্ডিত্যপূর্ণ অভিভাষণ পাঠ করিয়াছেন। আমরা আজ এই দেখিয়া আশ্বাম্বিত হইতেছি যে, ভারতের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণ কেবল গবেষণাগারে ধ্যানমগ্ন ঋষির মত নব নব সত্য উপলব্ধির আনন্দরসে ডুবিয়া নাই, এই শতরোগ মহামারীর দেশ, ক্ষুধিত ও নিরন্ন দেশের জনগণের জন্য বিজ্ঞানের সম্পদকে সর্ব্বজনলভ্য করিবার প্রয়াস করিতেছেন।

প্রবাসী বালিকার কৃতিত্ব—

সাহারাণপুর নিবাসী ডাক্তার হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা কুমারী গৌরীরাণী বন্দ্যোপাধ্যায় এবার এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসবে 'ডি-ফিল্' উপাধি লাভ করিয়াছেন। তিনি কলিকাতার ডক্টর কালিদাস নাগ ও এলাহাবাদের ডক্টর প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য—দুইজন খ্যাতনামা অধ্যাপকের অধীনে সংস্কৃত সাহিত্যে গবেষণা করিয়াছিলেন।

সম্মান প্রাপ্তি—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এ বৎসর অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা ডি-এস-সি, এফ-আর-এসকে 'সার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী পদক' এবং অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ, ডি-লিট্‌কে 'সরোজিনী বসু পদক' দান করিয়াছেন। উভয়েরই অধ্যাপনা ও পাণ্ডিত্যের খ্যাতি সর্ব্বজনবিদিত।

নূতন ফেলো নির্ব্বাচন—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্টার্ড গ্র্যাজুয়েটগণ কর্ত্তৃক সম্প্রতি অধ্যক্ষ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী), অধ্যাপক শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র (পোষ্ট্‌ গ্রাজুয়েট কাউন্সিলের সেক্রেটারী) ও ডাক্তার সুবোধ মিত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ডাক্তার মিত্র নূতন নির্ব্বাচিত হইলেন, অপর দুইজন পূর্ব্বে ফেলো ছিলেন।

যোগেশচন্দ্র সম্বর্দ্ধনা—

বহুভাষাবিদ্‌ পণ্ডিত অধ্যাপক রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগশচন্দ্র রায় মহাশয়ের নাম সর্ব্বজনবিদিত। বর্ত্তমানে তাঁহার বয়স ৮৫ বৎসর হইয়াছে। এই উপলক্ষে বাঁকুড়ায় তাঁহার সম্বর্দ্ধনার আয়োজন করা হইয়াছে। তাঁহার মত জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তির সম্বর্দ্ধনায় বাঙ্গালা দেশবাসী সকলের যোগদান করা উচিত। আমরা এই উপলক্ষে যোগেশচন্দ্রকে আমাদের শ্রদ্ধাভিবাদন জানাইতেছি এবং প্রার্থনা করি তিনি সুদীর্ঘ কর্ম্মময় জীবন লাভ করুন।

শ্রীযুক্ত আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়—

'ইন্সিওরেন্স হেরাল্ড' পত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সম্প্রতি ভারত গভর্ণমেণ্টের ইন্সিওরেন্স এড্‌ভাইসারি কমিটির সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি তরুণ ব্যবসায়ী—তাঁহার দ্বারা দেশের বহু মঙ্গলজনক কার্য্য আশা করা যায়।

বিদেশী ছাত্রগণের কর্ত্তব্যপালন—

আয়র্লণ্ডের গভর্ণমেণ্ট ভারতের দুর্ভিক্ষ পীড়িতদিগের জন্য এক লক্ষ পাউণ্ড সাহায্য প্রেরণ করায় লণ্ডন প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রগণ গত ২৪শে ডিসেম্বর এক সভায় আয়র্লণ্ডের লণ্ডনস্থ হাই-কমিশনারকে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন ও তাঁহার মারফত আয়র্লণ্ডবাসীদিগকে ভারতবাসীদিগের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়াছেন। প্রবাসী ভারতীয়গণের এই কার্য্য সর্ব্বথা প্রশংসনীয়।

হিন্দু মহাসভার নূতন কর্ম্মকর্ত্তা—

২৯শে ডিসেম্বর অমৃতসরে নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার নিম্নলিখিতরূপ নূতন কার্য্যনির্ব্বাহক দল নির্ব্বাচিত হইয়াছেন—সভাপতি—শ্রীযুক্ত সাভারকর, কার্য্যকরী সভাপতি—ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সহ-সভাপতি—ডাক্তার মুঞ্জে, মিঃ বোপৎকার, নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ভাই পরমানন্দ, ডাক্তার বরদারাজলু নাইডু ও বিক্রমল বেগরাজ। সাধারণ সম্পাদক—মঃ বি খাপার্দ্দে, আশুতোষ লাহিড়ী ও মিঃ কেশবচন্দ্র। সম্পাদক

—মিঃ দেশপাণ্ডে ও মিঃ গণপতি। কোষাধ্যক্ষ—মিঃ নারায়ণ দত্ত। একজন মহিলা সমেত ১৮ জন সদস্যকে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য করা হইয়াছে। জব্বলপুরে মহাসভার পরবর্ত্তী অধিবেশন হইবে স্থির হইয়াছে।

দুর্ভিক্ষের অবসান (?)—

সরকারী বক্তৃতা ও প্রচারে বলা হইতেছে যে বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষের অবসান হইয়াছে; রোগ ও বস্ত্রাদির অভাব এখন প্রধান চিন্তার কারণ। যাঁহারা সাধারণের খবর লইয়া থাকেন, বা কম বেশী ভুক্তভোগী, তাঁহারা কখনই ইহা স্বীকার করিবেন না। যখন বাজারে চাউলের দর ১৮॥০ হইতে ২০৲ মণ, তখন দেশে দুর্ভিক্ষের অবসান ঘটিয়াছে বলিয়া মানিয়া লইতে মন সরে না। যখন চাউল ২৸০ হইতে ৪।০ প্রতি মণ বিক্রীত হইত, যেখানে সস্তায় চাউল পাইবার জন্য লোকে বর্ম্মামুলুকের চাউলের জন্য আশা করিয়া বসিয়া থাকিত, সেখানে চাউল ২০৲ টাকা মণে দুর্ভিক্ষ নাই বলা আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র। এ কথা আরও সুস্পষ্ট কারণ অন্যান্য সকল ভোজ্য, পরিধেয়, আবাস, চিকিৎসা, শিক্ষা-সম্পর্কিত অর্থাৎ জীবনধারণের সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যই অগ্নি-মূল্য। এই মনোভাবের আরও একটা আশঙ্কাজনক দিক আছে; ইহাতে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষের শিথিলতা আসিতে পারে। গত বৎসর (১৯৪৩) এই সময় চাউল ১০৲ মণ বিক্রীত হইতে-ছিল; এখন তাহা ২০৲। সরকারী ইস্তাহার, আদেশ, অনুজ্ঞা, পরামর্শ সবই বৃথা বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে বসিয়াছে। আবার লরী বোঝাই চাউলের ছবি পত্রিকায় প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে; গত বৎসর বিজ্ঞাপন, চলচ্চিত্র ও তাহার ব্যাখ্যা দ্বারা বিতরিত চাউল লোকের জীবন রক্ষায় সমর্থ হয় নাই। প্রদেশে প্রদেশে, কেন্দ্রে ও প্রদেশে বিরোধ গতবাবেও ছিল, আবার আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বড় সহরে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্য বিতরণ, দ্রব্যাদির মূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং যথাপ্রয়োজনে সাধারণের মধ্যে বণ্টনের কোনও ব্যবস্থা কার্য্যকরী হয় নাই। উপরন্তু কেন্দ্রে ও প্রদেশে খাদ্য ব্যবস্থা সম্বন্ধে লোক নিয়োগের অন্ত নাই। এ সকলের ব্যয়ভার চাপিয়া যাইতেছে। "সন্ন্যাসীর" সংখ্যা "অনেক" হইয়া পড়িতেছে; সুতরাং "গাজন" কেবল "নষ্ট" হইবে না, এবারে একেবারে "দক্ষযজ্ঞ" ঘটিবে বলিয়া আশঙ্কা জাগিতেছে। বাঙ্গালায় সাধারণ লোক জীবিত থাকিতে দুর্ভিক্ষের অবসান ঘটিবে বলিয়া মনে হয় না। আমরা কর্ত্তৃপক্ষকে এই বিষয় অবহিত হইতে অনুরোধ করিতেছি।

নিয়ন্ত্রণ-বিধিভঙ্গের জের—

ইংলণ্ডে বে-আইনী কাজ করিলে অনেক সময় পদমর্য্যাদা ও ধনের আড়ম্বর অপরাধীকে রক্ষা করিতে পারে না। লেডী এ্যাষ্টর (Vicountess Astor) লণ্ডন টাইমস্ পত্রিকার স্বত্বাধিকারী লর্ড এ্যাষ্টরের স্বনামধন্যা পত্নী। ইনি স্বয়ং পার্লামেণ্টের সভ্যা। সম্প্রতি নিয়ন্ত্রিত দ্রব্যাদি আমেরিকা হইতে গোপনে আনাইবার চেষ্টা করার অপরাধে অভিযুক্ত হন। বিচারালয়ে মহিলা দোষ স্বীকার করেন এবং বিধিনিষেধ সম্বন্ধে নিজের অজ্ঞতার আশ্রয় লন। বিচারপতি মিঃ হেরাল্ড ম্যাক্‌কেনা কেবলমাত্র দশ পাউণ্ড (প্রায় ১৩৫৲) জরিমানা করিয়া সন্তুষ্ট হন নাই; দণ্ডাদেশের উপসংহারে বলেন, "পার্লামেণ্টের পুরাতন এবং প্রতিপত্তিশালিনী একজন সভ্যার পক্ষে বিধিনিষেধের প্রতি সম্পূর্ণ অজ্ঞানতা অত্যন্ত বিস্ময়কর; তাঁহার অজ্ঞতায় গভীরতা এবং অনবধানতার পরিমাণ সত্য সত্যই চাঞ্চল্যকর।" বোধ হয় বিচারকেরা নির্ভয়ে নিজ নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে পারেন বলিয়া সেখানে আইনের প্রতি লোকের ভয়-বিমিশ্রিত শ্রদ্ধা খুব বেশী।

হেমলতা দেবী সম্বর্দ্ধনা—

'বঙ্গলক্ষ্মী' সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবীর বয়স সম্প্রতি ৭০ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় দেশবাসী সাহিত্যিকগণের পক্ষ হইতে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনার আয়োজন করা হইয়াছে। শুধু বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবা দ্বারা নহে, বাঙ্গালার মহিলা সমাজের নানা কল্যাণসাধন করিয়া তিনি সকলের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছেন। এই উপলক্ষে আমরা তাঁহাকে আমাদের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিতেছি।



শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী (ঠাকুর)

পাইকারী জরিমানা—

মিঃ আমেরি পার্লামেণ্টে প্রশ্নের উত্তরে জানাইয়াছেন যে ৩১শে আগষ্ট (১৯৪৩ পর্য্যন্ত) ১,৫৫৬ স্থানে পাইকারী জরিমানা ধার্য্য হইয়াছে; ইহার মোট পরিমাণ ৯০ লক্ষ টাকা, তন্মধ্যে ৭৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা আদায় হইয়াছে। সম্ভবতঃ সেপ্টেম্বর হইতে এই তিন মাসে বাকী বকেয়া সব উসুল হইয়া থাকিবে। অপরাধী ধরিতে না পারিয়া পাইকারী জরিমানা সম্বন্ধে আমাদের আপত্তি আছে; তাহার উপর এই দুর্ভিক্ষের বৎসরে ১ কোটী টাকা আদায় করায় লোকের কষ্ট বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। আদায় কিছুদিন স্থগিত রাখিলে ভাল ছিল। এই সকল কারণে ক্রমে শাসনব্যবস্থা অপ্রিয় হইয়া উঠিতেছে।

বাণিজ্য পণ্যের মূল্য—

নয়া দিল্লীর সংবাদে প্রকাশ—ভারতে প্রস্তুত বাইসাইকেলের দাম ১০০৲ টাকা ও বিদেশী সাইকেলের ১৫০৲ টাকা দাম স্থির হইয়াছে। বিদেশ হইতে ভারতে ৫০ লক্ষ ক্ষুরের ব্লেড আসিতেছে। তাহা ছাড়া গভর্ণমেণ্ট এক প্রকার পিতলের চাদর প্রস্তুত করাইয়াছেন, তাহা দ্বারা একজন গৃহস্থের উপযোগী বাসন প্রস্তুত করিতে মাত্র ১০৲ টাকা খরচ হইবে।

দীর্ঘজীবন—

২৩শে অগ্রহায়ণ তারিখের বর্দ্ধমানের সংবাদে প্রকাশ, মুন্সী বেলায়েৎ হোসেন ১৩৬ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ১৮০৭ সালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বাঁকুড়ার দেওয়ানী

আদালতে চাকুরী করিয়া প্রায় ৭০ বৎসর পূর্ব্বে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। এরূপ দীর্ঘজীবন লাভের মূলনীতিগুলি জানার বিশেষ প্রয়োজন আছে। যাঁহারা মুন্সী সাহেবের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার সহিত পরিচিত, তাঁহাদের নিকট হইতে উহার একটী বিস্তৃত বিবরণী পাইলে জনসাধারণের কল্যাণে লাগিতে পারে।

বঙ্গ-মঙ্গল ভবন—

কলিকাতা কাশীপুর সিঁথি গ্রামে ৩নং আটা পাড়া লেনে শ্রীযুক্ত সন্ন্যাসীচরণ চন্দ্র মহাশয় গত ১লা অক্টোবর হইতে একটি সুবৃহৎ বাড়ী ভাড়া করিয়া অনাথ বালক বালিকাগণকে লইয়া বঙ্গ-মঙ্গল ভবন নামে একটি অনাথাশ্রম পরিচালনা করিতেছেন, বর্ত্তমানে তথায় প্রায় ৪০টি শিশু প্রতিপালিত হইতেছে; হাসপাতাল হইতে এই সকল শিশু সংগ্রহ করা হইয়া থাকে। চন্দ্র মহাশয় ও তাঁহার পত্নী নিজ পুত্রকন্যা জ্ঞানে তাহাদের সেবাশুশ্রূষা করিয়া থাকেন। ঐ গৃহে কয়েক শত অনাথের স্থান হইতে পারে। চন্দ্র মহাশয় এখন পর্য্যন্ত নিজের ও বন্ধুবান্ধবগণের অর্থেই সকল ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেছেন। তিনি নীরবে যে কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন, তাহা সর্ব্বথা প্রশংসনীয় এবং সকলের সাহায্য দানের যোগ্য। স্থানীয় শ্রীযুক্ত কুঞ্জকিশোর দাস ও শ্রীযুক্ত গোবর্দ্ধন দাস এ বিষয়ে চন্দ্র মহাশয়কে সাহায্য করিতেছেন।

দরিদ্র বান্ধব ভাণ্ডার—

উত্তর কলিকাতার দরিদ্র বান্ধব ভাণ্ডার বিশ বৎসর যাবৎ দুস্থ ও অভাবগ্রস্থ ব্যক্তিগণের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। এইখানে বহু গরীব গৃহস্থ চাউল ও বস্ত্রাদি সাহায্য পাইয়া থাকেন। ইঁহাদের বিভিন্ন দাতব্য চিকিৎসালয়ে বৎসরে প্রায় দেড় লক্ষ রোগী চিকিৎসিত হয়। এতদ্ব্যতীত কিরণশশী সেবায়তনে (যক্ষা চিকিৎসাগার) বিনামূল্যে যক্ষা রোগীর চিকিৎসা করা হয়; পূর্ব্বোক্ত কার্য্য ব্যতীত ইঁহারা বর্ত্তমানে প্রত্যহ প্রায় দুই হাজার দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত নরনারীকে খাওয়াইতেছেন ও মাসাধিক কালের জন্য বিপন্ন শিশু ও রমণীর আশ্রয় ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া বিভিন্ন কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে ভাণ্ডারের লঙ্গর-খানায় গভর্ণমেণ্টের আদেশানুযায়ী কেবলমাত্র কলিকাতাবাসী বুভুক্ষু নরনারীকে অন্ন বিতরণ করা হয়। ইঁহারা এখনও তিন শতাধিক শিশুকে ইণ্ডিয়ান রেড ক্রশ সোসাইটীর সৌজন্যে প্রত্যহ দু'বেলা একপোয়া হিসাবে দুগ্ধ বিতরণ করিতেছেন। গত এক মাসে ইঁহারা একশত পঞ্চাশটী ফ্রক্ ও জামা, চারিশত চাদর ও কম্বল এবং আড়াই শত গেঞ্জি বিতরণ করিয়াছেন। সম্প্রতি ভাণ্ডার বাংলার চব্বিশপরগণা জিলার কয়েক স্থানে ম্যালেরিয়াগ্রস্থ নরনারীর সেবার জন্য স্বেচ্ছাসেবক পাঠাইয়া ঔষধ, পথ্য ও কম্বলাদি বিতরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ—

গত ২৫শে ডিসেম্বর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণের শতবার্ষিক উৎসব কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ঐ দিন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও অন্যান্য যে ২০জন ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই সমাজ, সাহিত্য ও রাজনীতিক ক্ষেত্রে এক নূতন প্রাণবন্যার প্রবাহ আনিয়াছিলেন। ঐ ২০জনের মধ্যে অক্ষয়কুমার দত্ত, কাশীশ্বর মিত্র, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি ব্যক্তিগণের জীবনী সঙ্কলন করিয়া প্রচার হওয়া উচিত। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবন অসাধারণ ছিল। তাঁহার কথা এই উপলক্ষে প্রচারের ব্যবস্থা করা হইলে তদ্দ্বারা দেশ উপকৃত হইবে।

বিরলা ব্রাদার্সের নূতন প্রচেষ্টা—

মেসার্স বিরলা ব্রাদার্স এদেশে মোটর গাড়ী ও লরী প্রস্তুত করিবার জন্য শীঘ্রই একটি বড় কারখানা প্রতিষ্ঠা করিবেন। সেজন্য ইংলণ্ড ও আমেরিকা হইতে বিশেষজ্ঞ আনয়নের ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং প্রচুর মূলধন লইয়া লিমিটেড্ কোম্পানী করার ব্যবস্থা হইয়াছে। তাহাদের এ চেষ্টা ফলবতী হইলে দেশের একটি বড় অভাব দূর হইবে।

উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষ—

অন্ধ্র স্বরাজ্য দলের সভাপতি শ্রীযুক্ত জি-ভি-সুব্বা রাও উড়িষ্যার অবস্থা দেখিয়া এক বিবৃতি প্রচারের দ্বারা জানাইয়াছেন যে গঞ্জাম ও ভিজাগাপটাম জেলার অবস্থা বাঙ্গালা দেশের মতই হইয়াছে। বালেশ্বর ও গঞ্জাম জেলায় যাহাতে এখনই সাহায্য দানের ব্যবস্থা করা হয়, সেজন্য তিনি বড়লাটকে অনুরোধ জানাইয়াছেন।

উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—

কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি স্বর্গত দেশনেতা উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৪৪ সালে কলিকাতা খিদিরপুরস্থ সোনাই গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বৎসর তাঁহার জন্মের শতবার্ষিক উৎসব সম্পাদন করিবার জন্য উদ্যোগ আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে। তাঁহার স্মৃতিতে একখানি গ্রন্থ রচনা করা হইবে, কলিকাতা



৺উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ডবলিউ-সি-বোনার্জ্জি)

বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার নামে একটি অধ্যাপকের পদ সৃষ্টির জন্য অর্থ সংগ্রহ করা হইবে ও কলিকাতার কোন সাধারণ গৃহে তাঁহার

একখানি তৈলচিত্র রক্ষা করা হইবে। উমেশচন্দ্রের কথা বাঙ্গালী আজ ভুলিতে বসিয়াছে; কাজেই এ সময়ে তাঁহার একখানি সম্পূর্ণ জীবনী প্রকাশ করাও প্রয়োজন হইবে। আমাদের বিশ্বাস, এই সৎকার্য্যে দেশবাসীর উৎসাহের অভাব হইবে না।

মিঃ জিন্না ও কংগ্রেস—

গত ২৪শে ডিসেম্বর করাচীতে নিখিল ভারত মুসলেম লীগের একত্রিংশ বার্ষিক সভায় মিঃ জিন্না বলিয়াছেন—যদি গভর্ণমেণ্ট বা হিন্দু সম্প্রদায় সম্মানজনক সর্ত্তে মুসলেম লীগের সহিত সহযোগ করিতে অগ্রসর হয়, তাহা হইলে তিনি কখনই তাহাতে অসম্মত হইবেন না। গভর্ণমেণ্ট কংগ্রেসের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, মুসলেম লীগের সহিতও সেইরূপ ব্যবহারই করিয়াছেন। গভর্ণমেণ্ট সকলকে সহযোগের জন্য আহ্বান করিয়াছেন বটে, কিন্তু কাহাকেও গভর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগ করিবার সুযোগ দেওয়া হয় নাই। কেহ শুধু সাহায্য করিয়া সন্তুষ্ট থাকিবে না। সহযোগের আহ্বানের পূর্ব্বে গভর্ণমেণ্টের এই বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত ছিল। মিঃ জিন্নার মুখে এতদিনে যে এই সকল কথা বাহির হইয়াছে, ইহা সুলক্ষণ বলা চলে।

মহামান্য পোপের বাণী—

খৃষ্টান জগতের ধর্ম্মগুরু মহামান্য পোপ গত বড়দিনে সকলকে অনাচার ত্যাগ করিতে অনুরোধ জানাইয়া এক বাণী প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু যুদ্ধরত খৃষ্টানগণ কেহ কি আজ পোপের কথায় কর্ণপাত করিবেন? খৃষ্ট স্বয়ং আসিলেও আজ এই যুদ্ধরত জাতিসমূহ তাঁহার কথা শুনিবে কি না সন্দেহ। পোপের পিছনে যে শক্তি আছে, তাহা আজ দুর্ব্বল—তাহার ফলই আমাদের সকলকে ভোগ করিতে হইতেছে।

ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাস—

গত ১৮ই ডিসেম্বর কলিকাতা ন্যাশানাল মেডিকেল ইনিষ্টিটিউটে ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস মহাশয়ের ৮৬তম জন্মোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। ডাক্তার দাস এই বয়সে যে কর্ম্মশক্তি ও অসামান্য ধীশক্তি লইয়া কাজ করেন, তাহা বাস্তবিকই দেখিবার জিনিষ। কলিকাতা মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল ডাক্তার উমাপ্রসন্ন বসু উৎসবে সভাপতিত্ব করেন। আমরা ডাক্তার দাসের সুস্থ কর্ম্মময় দীর্ঘজীবন কামনা করি।

রবীন্দ্রনাথ স্মৃতি-রক্ষা ভাণ্ডার—

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতি রক্ষার জন্য বিশ্ব-ভারতী যে ধন ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহাতে এ পর্য্যন্ত মাত্র ৬৭৯৬২ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের দানে বাঙ্গালী জাতি সমৃদ্ধ—তাঁহার স্মৃতি রক্ষা ভাণ্ডারে আরও অধিক অর্থ সংগৃহীত হওয়া উচিত।

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন—

আগামী ৯ই ও ১০ই মার্চ্চ দোলযাত্রার ছুটীতে দিল্লীতে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশন হইবে স্থির হইয়াছে। সিভিলিয়ান শ্রীযুক্ত দেবেশচন্দ্র দাসকে প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা করিয়া সেজন্য তথায় একটি কমিটী গঠিত হইয়াছে। দিল্লীতে এখন বহু প্রবাসী বাঙ্গালীর বাস; আমাদের বিশ্বাস তথায় সম্মিলনের অধিবেশন সাফল্যমণ্ডিত হইবে।

ত্রাণনাথ শোক সভা—

গত ১৯শে ডিসেম্বর ২৪পরগণা জেলায় পানিহাটী গ্রামে ত্রাণনাথ উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় ভবনে স্বর্গত ত্রাণনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতি-সভা হইয়া গিয়াছে। কলিকাতা মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল ডাক্তার উমাপ্রসন্ন বসু



পানিহাটীতে ডাক্তার উমাপ্রসন্ন বসু (তাঁহার অধ্যাপক রায় বাহাদুর ডাঃ ৺গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মর্ম্মর-মূর্ত্তির পার্শ্বে দণ্ডায়মান)

মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া কি ভাবে তিনি যৌবনে ত্রাণনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গ্রামোন্নতিকর কার্য্যে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন তাহার বর্ণনা করেন। সভায় স্থানীয় ও নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ—

বাঙ্গালার নিরন্ন ও মহামারী প্রপীড়িত দুঃস্থদিগকে রক্ষাকল্পে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ হইতে বর্ত্তমানে মেদিনীপুর, ২৪পরগণা, বর্দ্ধমান, ঢাকা, ফরিদপুর, খুলনা, যশোহর, বগুড়া, রাজসাহী, ত্রিপুরা, পাবনা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, বরিশাল প্রভৃতি জেলায় স্থায়ী ও নিয়মিতরূপে খাদ্য, কাপড়, কম্বল, ঔষধ পথ্য প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার সাহায্য প্রদান করা হইতেছে। ১৮টী কেন্দ্র হইতে

শিশু ও রোগীদিগকে দুগ্ধ, ২৮টী কেন্দ্র হইতে ঔষধ ও পথ্য, ১৫টী কেন্দ্র হইতে চাউল ও খিচুড়ী এবং ৩৯টী কেন্দ্র হইতে কাপড়, কম্বল, চাদর, জামা প্রভৃতি বিতরণ করা হইতেছে। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন জেলার প্রায় ৫০টী সেবা সমিতিকে অর্থ, বস্ত্র, কম্বল, ঔষধ পথ্যাদি বিতরণ করা হইয়াছে ও হইতেছে।

পণ্ডিত মালব্যের আবেদন—

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ৩০ লক্ষ টাকা দান প্রার্থনা করিয়া এক আবেদন প্রচার করিয়াছেন। তন্মধ্যে ২০ লক্ষ টাকা একটি মন্দির নির্ম্মাণের জন্য ও ১০ লক্ষ টাকা ঋণ-শোধের জন্য ব্যয় করা হইবে। অর্থ সংগ্রহের জন্য পণ্ডিতজী বোম্বাই, কাণপুর, আমেদাবাদ, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে গমন করিবেন।

মেধাবী ছাত্রের স্মৃতিসভা—

সুনীলকুমার সেন রিপন কলিজিয়েট স্কুলের ম্যাগাজিনের সম্পাদক ছিলেন ও স্কুলের একজন অসাধারণ মেধাবী ছাত্র ছিলেন। সম্প্রতি তাঁহার মৃত্যু-দিনে স্থানীয় ছাত্রগণের উদ্যোগে তাঁহার এক স্মৃতিসভা হইয়া গিয়াছে। সুনীলকুমার গুপ্তিপাড়া নিবাসী শ্রীকানন-বিহারী সেনের পুত্র, মাত্র ১৭ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।



৺সুনীলকুমার সেন

পরলোকে মাবেল পালিত—

সার তারকনাথ পালিতের পুত্রবধূ, সিভিলিয়ান লোকেন্দ্রনাথের পত্নী মাবেল পালিত এম্-বি-ই ৭৭ বৎসর বয়সে গত ২২শে ডিসেম্বর লণ্ডনে পরলোকগমন করিয়াছেন। বিধবা হওয়ার পর গত ২৫ বৎসর কাল তিনি বিলাতে নানা জনহিতকর কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বিলাতস্থ ভারতীয়গণকে সাহায্য করিবার জন্য তিনি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতেন।

পরলোকে মানকুমারী বসু—

প্রসিদ্ধ কবি ও লেখিকা মানকুমারী বসু গত ২৫শে ডিসেম্বর রাত্রিতে ৮১ বৎসর বয়সে খুলনায় পরলোকগমন করিয়াছেন। তথায় তিনি জামাতা ও দৌহিত্রগণের নিকট বাস করিতেন। যশোহরের সাগরদাঁড়ীর দত্ত বংশে বাংলা ১২৬৯ সালে তাঁহার জন্ম হয়। মাইকেল মধুসূদন তাঁহার জ্ঞাতি পিতৃব্য ছিলেন। ১২৭৯ সালে বিবুধশঙ্কর বসুর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়, কিন্তু অল্প বয়সে একটি মাত্র শিশুকন্যা লইয়া তিনি বিধবা হন। তদবধি তিনি কাব্য ও সাহিত্যের সেবায় দিন যাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার লিখিত প্রিয়-প্রসঙ্গ, কনকাঞ্জলি, কাব্যকুসুমাঞ্জলি, বীরকুমারবধ, পুরাতন ছবি, শুভ সাধনা, সোনার সিঁথি প্রভৃতি পুস্তক সর্ব্বজন-সমাদৃত। ১৯৪০ সালের ২৮শে জুলাই খুলনায় তাঁহার জয়ন্তী উৎসব সম্পাদিত হইয়াছিল।

পরলোকে অজয় ভট্টাচার্য্য—

খ্যাতনামা কবি ও সাহিত্যিক অজয়কুমার ভট্টাচার্য্য গত ২৪শে ডিসেম্বর অতি অল্পবয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা ব্যথিত হইলাম। ফিলিম্ ডিরেক্টার হিসাবে তিনি জনপ্রিয় হইয়াছিলেন এবং তাঁহার গান সকলকে মুগ্ধ করিত।

পরলোকে সুধীরচন্দ্র রায়—

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ জামাতা, প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার সুধীরচন্দ্র রায় গত ১৭ই ডিসেম্বর হাইকোর্টে কাজ করিতে করিতে সহসা পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার বয়স মাত্র ৫৪ বৎসর হইয়াছিল। কলিকাতায় এম-এ, বি-এল্ পাশ করিয়া পরে তিনি বিলাতে ব্যারিষ্টারী পড়িতে যান ও ফিরিয়া আসিয়া ঐ ব্যবসায়ে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিতেন। তাঁহার তিন পুত্র, তিন কন্যা ও বিধবা পত্নী অপর্ণা দেবী বর্ত্তমান।

পরলোকে প্রভাবতী বসু—

রাজবন্দী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু ও শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর জননী প্রভাবতী বসু গত ২৮শে ডিসেম্বর ৭৫ বৎসর বয়সে কলিকাতা ৩৮।২ এলগিন রোডস্থ বাটীতে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ২৪পরগণা কোদালিয়া নিবাসী কটকের উকীল জানকীনাথ বসুর পত্নী, মৃত্যুকালে তিনি সতীশচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, সুরেশচন্দ্র, সুধীরচন্দ্র, ডাক্তার সুনীলচন্দ্র, সুভাষচন্দ্র ও শৈলেশচন্দ্র ৭ পুত্র রাখিয়া গিয়াছেন।

বাঙ্গালার দুরবস্থা

মুন্সীগঞ্জে ৬০ হাজার মৃত—

ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জ মহকুমায় অনাহারে ও তজ্জনিত রোগে প্রায় ৬০ হাজার লোক মারা গিয়াছে। ২৩শে ডিসেম্বরের সংবাদ, তথায় নূতন চাউলও ২৭ টাকা মণ দরে বিক্রীত হইতেছে। সরিষার তেল পাওয়া যায় না—কাঠের মণ আড়াই টাকা ও কয়লার মণ ৬ টাকা।

রাণাঘাট—

নদীয়া রাণাঘাটে ভীষণ কলেরা দেখা দিয়াছে—নিকটবর্ত্তী তারাপুর, গাজীপুর, পলটি ও সাহেবডাঙ্গা গ্রামে বহু লোক মারা গিয়াছে। ম্যালেরিয়াও ভীষণভাবে দেখা দিয়াছে। চাউলের মণ ২০ টাকা। অন্যান্য জিনিষ দুর্লভ—চিনি ও কেরোসিন তৈল আদৌ পাওয়া যায় না।

রাজসাহী, পুটিয়া—

গত ৪ মাসে রাজসাহী জেলার পুটিয়া থানায় প্রায় ৮ শত লোক কলেরা ও ম্যালেরিয়ায় মারা গিয়াছে।

নোয়াখালি—

গত ৪ঠা ডিসেম্বর যে পক্ষ শেষ হইয়াছে সেই ১৫ দিনে নোয়াখালি সহরে কলেরায় ২৯৯ জন ও বসন্তে ৫৬ জন মারা

দিয়াছে। নোয়াখালি জেলায় কাপড়, কম্বল ও কুইনাইন বিতরণের জন্ত কলিকাতার মেয়র ভাণ্ডার হইতে ৭ হাজার টাকা প্রেরণ করিয়াছেন।

বরিশাল—

জেলার সর্ব্বত্র কলেরা ও ম্যালেরিয়া ভীষণভাবে দেখা দিয়াছে। চাষীদের অবস্থা শোচনীয়। লোকাভাবে মাঠের আমন ধান কাটা হইতেছে না, সেগুলি নষ্ট হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। প্রয়োজনের তুলনায় প্রাপ্ত কুইনাইনের পরিমাণ নগণ্য। শুধু বাসণ্ডা গ্রামে ম্যালিগ্‌নেণ্ট ম্যালেরিয়ায় কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ১৫ জন মারা গিয়াছে। গৌরনদী থানার খোজাপুর গ্রামে ৩ শত লোক মারা গিয়াছে।

ফরিদপুর—

ফরিদপুর জেলার মাদারীপুরের ঘাটমাঝি গ্রামে মৎস্যজীবী ও কুম্ভকার সম্প্রদায়ের শতকরা ৭০ জন লোক মারা গিয়াছে। কুমার ও আড়িয়াল নদীতে বহু শব ভাসিয়া যাইতেছে। কৃষাণের অভাবে কোন কোন স্থানে জমির ধান জমিতে নষ্ট হইয়া যাইতেছে।

মৈয়মনসিংহ—

গত জুন হইতে নভেম্বর মাসে অনাহার, ম্যালেরিয়া ও কলেরায় ৫০ হাজার লোক মারা গিয়াছে। বিভিন্ন মহকুমায় ঐ সময়ের মধ্যে প্রায় ৮৩ হাজার লোক মারা গিয়াছে।

বরিশাল—

গত জানুয়ারী হইতে মে পর্য্যন্ত ৫ মাসে বরিশাল জেলায় অনাহারে বা নানা রোগে ৩২৭০১ লোক মারা গিয়াছে।

দিনাজপুর—

দিনাজপুর জেলায় জুন হইতে সেপ্টেম্বর ৪ মাসে ১২০৬৯ লোক নানা রোগে মারা গিয়াছে।

২৪ পরগণা, বারাসত—

মহকুমার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামসমূহ আজ ম্যালেরিয়া ও কলেরার প্রকোপে জনশূন্য হইতে বসিয়াছে। খুব শীঘ্রই গ্রামের লোক-সংখ্যা অর্দ্ধেকের কাছাকাছি হইবে। মহকুমার প্রায় দুই লক্ষ লোক মরণাপন্ন হইয়াছে।

রংপুর, গাইবান্ধা—

গাইবান্ধা মহকুমায় কলেরার প্রকোপ কমিতে না কমিতে ম্যালেরিয়া ভীষণাকারে দেখা দিয়াছে। আনুমানিক ২ লক্ষ লোক ম্যালেরিয়ায় মরণাপন্ন হইয়া আছে। আক্রান্ত লোকদিগের শতকরা ৯০ জনের চিকিৎসার সামর্থ্য নাই।

নীলফামারী—

রংপুর জেলার নীলফামারী মহকুমায় নভেম্বর মাস পর্য্যন্ত অনশনে ও বিবিধ রোগে ৫০ হাজার লোক মারা গিয়াছে। শুধু ডিসেম্বর মাসে ম্যালেরিয়ায় ১২ হাজার কলেরায় ২ হাজার লোক মারা গিয়াছে। ৩১শে ডিসেম্বর তথায় চাউলের দর ছিল মণ প্রতি ১৬ টাকা। চিনি মোটেই পাওয়া যায় না।

মৌগ্রাম, বর্দ্ধমান—

বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার মৌগ্রামে ম্যালেরিয়া ও কলেরায় প্রত্যহ ৮।১০জন করিয়া লোক মারা যাইতেছে। ফলে গ্রামখানি শ্মশানে পরিণত হইতে বসিয়াছে।

আঘাত

শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার আই-সি-এস্

ঘুমন্ত রাজকন্যার গল্প সকলেই জানেন। রূপার কাঠির ছোঁয়া লেগে তিনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। অনেক দিন যায় কেটে, রাজকন্যার ঘুম আর ভাঙে না। শেষে এলেন এক রাজপুত্র, ছুঁইয়ে দিলেন কন্যার ললাটে মন্ত্রপূত সোনার কাঠি। রাজকন্যার ঘুম ভেঙে গেল।

নিদ্রার মাঝে ছিল একটানা আরাম—আলোকহীন, পুলকহীন, অলস, নিশ্চল আরাম। কোনো কিছুর অভাব জাগে নি, মনে কোনো কিছুর প্রয়োজন এসে চিত্তকে সচল ক'রে তোলে নি। সহসা যখন ঘুম ভাঙ্‌ল, আলোকের তীব্র তীর নয়নে এসে বিঁধ্‌ল, তখন সুরু হ'ল নতুন পথে যাত্রা। এ পথ সেই অলস আরামের নিশ্চেষ্ট পথ নয়, এখানে নানামূর্ত্তিতে দুঃখ এসে কাঁদাবে, দৈন্য এসে কাড়বে, ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কণ্ঠ হবে শুষ্ক। তখন সেই বিগত দিনের আরামের কথা মনে পড়ে যাবে, তাতে দুঃখের দাহ দ্বিগুণ জোরে পোড়াবে। কিন্তু তবু রাজকন্যার হৃদয় উঠবে অসহ্য পুলকে কেঁপে। সব দুঃখ সওয়া যায় যাঁর গুণে, সব কষ্ট সার্থক হয় যাঁর স্পর্শে—সেই রাজপুত্রের দেখা যে তিনি পেয়েছেন।

মানুষও ঐ ঘুমন্ত রাজকন্যার মতো। তার আয়োজনের আড়ম্বরে, দাস-দাসীর সেবায়, মণি-মাণিক্যের প্রাচুর্য্যে সে এমন আরামে অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠে, যে তার চোখের ওপর ধীরে ধীরে অন্ধকারের পরদা নামে, সে ধীরে ধীরে দীর্ঘ দিনের গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়। তার মনে হয়, এই তো বেশ আছি, আমার চেয়ে আর ভাল কে? সে তখন ভগবানকে প্রণাম জানায় আর বলে, প্রভু, আমার ওপর তোমার অসীম করুণা, তাই তো আমায় এমন আরামে রেখেছ। দেখো, সমস্ত জীবনই যেন এমনি আরামেই থাকি।

কিন্তু তিনি আমাদের ঘর ছাড়াবার, তিনি আমাদের ঘুম ভাঙবার রাজা। তিনি জানেন আমরা যাকে ভাল ব'লে জানি তা আমাদের যথার্থ ভাল নয়। তিনি বলেন, এম্‌নি করেই কি তুমি ঘুমিয়ে থাকবে, আমাকে কি তুমি চিনবে না!—তাই যেদিন তাঁর দয়া হয়, আঘাতের সোনার কাঠি তিনি সেদিন আমাদের ললাটে ছুঁইয়ে দেন, রূঢ় আলোকে আমরা জেগে উঠি।

কিন্তু এ জাগরণ সুখের নয়। যাকে আমরা সুখ বলে ভুল ভেবে-ছিলুম, আমাদের নতুন অনুভূতি, নতুন অভিজ্ঞতা তার সঙ্গে মেলে না ব'লে আমরা শোকাকুল হ'য়ে কাঁদি—প্রভু, এ কি করলে! চোখের জলে ভাসি আর বিগত দিনের জন্যে হাহুতাশ করি। অনুযোগ ক'রে বলি, প্রভু, তোমার এ কি বিচার! কি দোষ করেছিলুম আমি—যে এত বড় আঘাত আমায় দিলে! কি পাপ করেছি যে তার এত বড় প্রায়শ্চিত্ত! আমি যা ভালবেসেছিলুম তাই যখন কেড়ে নিলে, আমি যা গড়ে তুলেছিলুম তাই যখন ভেঙে দিলে, তখন কি লাভ আর আমার বেঁচে থেকে! আমি থাকব না আর এই জন্মমৃত্যুময় সংসারে, আমি বনবাসী হব, ভিখারী হব।

তিনি তখন হেসে আমাদের বুকের মধ্যে বলেন—

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।

—যাদের জন্যে শোক করা উচিত নয়, তুমি তাদের জন্যে শোক করছ, আবার বিজ্ঞের মতো কথাও বলছ।

তাঁর মৃত্যুর দূত এসে আমাদের গৃহ শূন্য ক'রে দিয়ে যায়, তাঁর ক্ষতির দূত এসে নিষ্ঠুর হাতে আমাদের যা কিছু আরামের সরঞ্জাম সব ভেঙে গুঁড়া ক'রে দিয়ে যায়। অসহ্য দুঃখে আমরা তাঁকে অভিশাপ দিই, বলি মানব না তোমায়। বলি, তোমার সৃষ্টি তোমারি থাক, আমি আজ বিদায় নিলুম। বলি, আমার ঘাড়ে সব ভার চাপিয়ে তুমি মজা দেখছ ব'সে, আমি নেব না সে ভার, দিলাম ফেলে এই তোমার পথের পাশে। ঠিক এমনি সব কথা বলেই একদিন অর্জুন তাঁর গাণ্ডীবধনু ত্যাগ ক'রে রথের একপাশে চুপ ক'রে বসেছিলেন—

এবমুক্ত্বার্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ॥

—এই কথা ব'লে যুদ্ধস্থলে অর্জুন সশর ধনু ত্যাগ ক'রে শোকাকুলমনে রথের উপর বসে রইলেন।

কিন্তু যিনি কেড়ে নেন, তিনি যে পরিপূর্ণ ক'রে দেবেন বলেই কাড়েন। মৃত্যুর রূপে এসে তিনি অমৃতলোকে ডাক দিয়ে যান। চেতনাহীনকে সচেতন করবার জন্যেই তিনি পাঠান তাঁর আঘাতের দূতকে। তিনি আমাদের হৃদয়ে আছেন এই কথাটি তিনি হৃদয়ের বেদনা দিয়েই জানিয়ে দেন।

একবার ভেবে দেখ, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধারম্ভে অর্জ্জুনের মনে যদি তিনি এই শোকের আঘাত না দিতেন তাহলে কর্মভক্তি জ্ঞান যোগের বাণী কেমন ক'রে লাভ হ'ত মানুষের? আমাদের মন যদি আজ আঘাত পেয়ে সচেতন হ'য়ে না উঠত, যদি অনাদর ক'রে অশ্রদ্ধা ক'রে তিনি আমাদের আরামের নির্বাসনে ফেলে রাখতেন, তাহলে কেমন ক'রে আমাদের ঘুমে জড়ানো মন তাঁর আহ্বান লিপি পেত?

তাই তিনি বারংবার আঘাত পাঠান আমাদের মনের দ্বারে দ্বারে। আমরা অনেকে ক্ষণেক জেগে উঠে আবার ঘুমিয়ে পড়ি, বিষয়ের মোহ কাটিয়ে উঠতে পারি না। দুদিন ফেলি চোখের জল, তারপর আবার সুরু হয় সুখ অন্বেষণ। মৃত্যু দেখে, ক্ষতি দেখে, অপমান, ব্যর্থতা দেখে, আমরা ভয়ে থরথরিয়ে কাঁপি—দূরে রাখতে চাই তাদের, আমাদের আরামের বাসগৃহ হ'তে যাতে না শোনা যায়, না দেখা যায়—এমনি অনেক দূরে রাখি শ্মশানভূমি। তিনিও ছাড়েন না। তিনি বারংবার তাঁর আঘাত পাঠান, টেনে টেনে নিয়ে যান সেইখানে যাকে আমাদের সবচেয়ে বেশী ভয়। এমনি ক'রে আবাসে আবাসে, ত্রাস হ'তে ত্রাসে আমাদের ব্যর্থ জীবনের জালবোনা চলে।

এমন করলে চলবে না। এমন ক'রে ভয়কে দূরে সরিয়ে সরিয়ে রাখলে, এড়িয়ে এড়িয়ে গেলে কখনো যে ভয় ভাঙবে না। সকল ভয় ভেঙে আজ আমাদের এগিয়ে যেতে হবে, প্রলয়ঙ্কর রুদ্রকে আমরা মাঝপথ থেকে আহ্বান করে নেব, ভয় করব না। আমরা বারংবার বলব—ভয় নেই, ভয় নেই! হে রুদ্র! তোমরা ললাটনেত্রে আজ অগ্নির জ্বালা, তোমার প্রলয় বিষাণ আজ শ্রবণ বিদারি। তবু আমার ভয় নেই। তোমার ধ্বংসের নৃত্য আজ কি সুন্দর, কি সুন্দর! তাতে আমার চিত্ত উঠেছে দুলে। হে ভয়াল, কি অনুপম তুমি! আমি তোমায় প্রণাম করি। তুমি আজ যে-বেশে এসেছ আমার দুয়ারে, আমি তোমার সেই বেশেই বরণ করব। যে-শান্তি আমায় আত্ম-বিস্মৃতির অতল পারাবারে ডুবিয়ে রেখেছিল, দূর হোক্ সে শান্তি। যে-আরাম তোমার পথে প্রাচীর তোলে, চূর্ণ করো, চূর্ণ করো সে আরাম। আমায় দগ্ধ করুক তোমার আগুন। আমার হৃদয়ের স্তরে স্তরে আজ আগুন ধরিয়ে দাও। আমার মনের এই কালো কঠিন অন্ধার সে-আগুনে আলো হ'য়ে জ্বলে উঠুক। মারো, আজ আমায় মৃত্যু দিয়ে মারো, অপমান দিয়ে মারো। বহ্নি দিয়ে মারো, ক্ষতি দিয়ে মারো। আঘাত করো, আঘাত করো প্রভু, আমার হৃদয়ের নিদ্রিত বীণার তারে তারে তোমার আঘাত ঝঙ্কৃত হ'য়ে বেজে উঠুক। হে আঘাত, হে অগ্নি, বন্ধু তুমি, তুমি সুপথ দিয়ে মহৈশ্বর্য্যে নিয়ে চল, অগ্রে নয় সুপথা রায়ে।

যেমন ক'রে আমরা এতদিন আমাদের আরাম শয্যায় জেগে উঠেছি, এ আমাদের তেমন জাগরণ নয়। যেমন ক'রে প্রভাতের অরুণালোকে পুষ্পকলিকা বিকশিত হ'য়ে উঠল, পাখী তার গান গাইল, এ আমাদের সে জাগরণ নয়। এ আমাদের ব্যথায় বিবর্ণ হ'য়ে অন্ধকারের মাতৃগর্ভ হ'তে রূঢ় আলোকের নবজীবনে জাগা। দুঃখের টীকা আজ ললাটে ছোঁয়ানো, অপমানের জ্বালা আজ সর্বাঙ্গে—এমনি ক'রে কি তুমি আমাদের মনুষ্যত্বের পথে আজ দাঁড় করিয়ে দিলে? আমাদের ভুলতে দিও না, এপথ যে কত কঠিন সে কথা যেন না ভুলি—

ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া।
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি॥

—এ পথ ক্ষুরধারার ন্যায় শাণিত, এ পথ দুরত্যয়, এ পথ দুর্গম, কবিরা এই কথা বলেন।

এর আগে কতবার কত নব জন্মদিনে, কত নববর্ষে তোমায় প্রণাম করে বলেছি, তুমি এস, এস, আমার ঘরে এস। সে আহ্বান যে কত বড় মিথ্যা, কত বড় দম্ভে পূর্ণ, আজ আঘাত দিয়ে, চৈতন্য দিয়ে তুমি তা বুঝিয়ে দাও। আজ আর দম্ভ ক'রে তোমায় ডাকব না, সৌখীন পূজার ঘরে আরামের নৈবেদ্য দিয়ে নিজের মন আর ভোলাব না। আজ একান্ত নিঃস্বের, একান্ত দুঃখীর, একান্ত অবনতের চোখের জলে মনে মনে তোমার পায়ের ধূলা মোছাতে মোছাতে তোমায় ডাকব। তুমি সহজ নয়, তুমি সুলভ নও—এই কথাটি মনে রেখে যাত্রা সুরু করব। মধ্যাহ্ন সূর্য্যের প্রচণ্ড তাপে তরুহীন তোমার প্রান্তরে যখন শ্রান্তিতে, যখন তৃষ্ণায় পড়ব শুয়ে, তখন তোমার দেবায়তনের স্নিগ্ধচ্ছায়ার ছবিখানি যেন ধীরে ধীরে ফুটে ওঠে চোখে। তখন তুমি কানে কানে বোলো প্রভু তোমার উৎসাহবাণী—

ক্লৈব্যং মাস্মগমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্তোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥

—ক্লৈব্যপ্রাপ্ত হ'য়ো না, এ তোমার সাজে না। ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্বল্য পরিত্যাগ ক'রে হে বীর তুমি ওঠো।

জানি তোমার করুণা আমাদের ত্যাগ করবে না। তুমি যে একহাতে আঘাত দিয়ে মারো, আর এক হাতে অমৃত দিয়ে বাঁচাও। মানুষকে মানুষ হবার সাধনা তুমিই দিয়েছ তার বুকে। সে যদি ঘুমিয়ে থাকে, তুমি তাকে জাগিয়ে দাও। সে যদি পথ ভোলে, তুমি তাকে নতুন পথে দাঁড় করিয়ে দাও। জন্ম হ'তে জন্মান্তরে নিয়ে নিয়ে তুমি তাকে নবজীবনের মাঝে যথার্থ সত্য হবার সাধনা করাও।

রবীন্দ্রনাথের 'অরূপরতনে' সুদর্শনা যখন তাঁর প্রিয়তমের কাছ থেকে গভীর আঘাত পেয়েছিলেন, তখন ঠাকুরদার সঙ্গে তাঁর যে কথা হয়েছিল, সে-কথা কি ভোলবার?—

সুদর্শনা। সমস্ত বুক দিয়ে ঠেলেছি, বুক ফেটে গেল, কিন্তু নড়ল না। ঠাকুরদা, এমন বন্ধুকে নিয়ে তোমার চলে কী ক'রে?

ঠাকুরদা। চিনে নিয়েছি যে—সুখে দুঃখে তাকে চিনে নিয়েছি। এখন আর সে কাঁদাতে পারে না।

সুদর্শনা। আমাকেও কি সে চিনতে দেবে না?

ঠাকুরদা। দেবে বই কি, নইলে এত দুঃখ দিচ্ছে কেন? ভাল ক'রে চিনিয়ে তবে ছাড়বে, সে তো সহজ লোক নয়।

হে আঘাত, তুমি সেই পরমতমকে চেনাবার অভিজ্ঞান, সেই প্রার্থিত-তমকে মেলাবার মিলনদূতী তুমি। তুমি ডাক দিয়েছ তাঁরই অভিসারে। অবহেলায় বিফল কাজে সারাদিন বৃথা কেটেছে, আজ বেলা যে পড়ে এল, এবার আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চল।

গরীব

শ্রীঅনিলকুমার বক্সী

এখান থেকে ডাউন মিক্সড-ট্রেনটা ছাড়তেই একটা লোক হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এসে একটা থার্ডক্লাস কামরায় উঠে পড়ল। লোকটার পা থেকে মাথা পর্যন্ত আগাগোড়া গরীবানার স্পষ্ট সাইনবোর্ড টাঙানো।

থার্ডক্লাস কামরা। সর্বদেশের এবং সর্বজাতির সমন্বয় ঘটেছে এখানে।

...বাণেশ্বর থেকে গাড়ীটা ছাড়তেই একজন চেকার উঠে পড়ল কামরাটাতে। সকলে আপন আপন টিকিটের খোঁজে হাত চালিয়ে দিল আপন আপন পকেটে; শুধু ঐ লোকটা চেকারকে দেখবামাত্র চোখে-মুখে আতঙ্কের ছবি ফুটিয়ে হাঁ ক'রে চেয়ে রইল ওর পানে। ওর আর বুঝতে বাকি রইল না যে লোকটা 'ডব্লিউটি'তে রান্ কর্ছেন। তাই ওর কাছে সকলের আগে এগিয়ে এসে তর্জনী হেলনে, জিজ্ঞাসা ক'র্লেন—তোমার টিকিট দেখি।

লোকটা মাথা হেঁট ক'রে আপন বিজ্ঞাপনের উপর ঘন ঘন চোখ বুলোতে লাগল—যদি গরীবের প্রতি দয়া হয়।

—এই টিকিট বের করনা তোমার? কি ভাবছ হাঁ ক'রে? ও সমস্ত কামরাটার দিকে আড়চোখে একবার চাইতেই দেখলে—অনেকগুলো চোখ ওর দিকে দৃষ্টির বৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রছে। ও রীতি-মত ঘাবড়ে গেল। ঢোক গিলে ব'ল্লে—নেই!

—নেই? তবে, ডবল মাশুল লাগবে দালশিংপাড়া থেকে। ওর মুখে আষাঢ়ের মেঘ নেমে এল।

চেকার দাঁড়িয়ে ছিলেন, একজনের গা ঘেঁসে বসতেই সে সসম্ভ্রমে খানিকটা জায়গা ছেড়ে দিল। লোকটা ব'সেছিল, একজন ওকে ধ'রে চেকারের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিল।

—কৈ? ডবল মাশুল বের কর্?—এদিকে যে গাড়ী কুচবিহার এসে গেল।

লোকটার বাক্‌যন্ত্র বুঝি বিকল হ'য়ে গেছে ও ঘাড় নেড়ে জানালে যে ওর কাছে পয়সা নেই।

—য়্যাঁ, তাও নেই! কথাটা বিকৃতস্বরে প্রয়োগ ক'রে তিনি নিজের রসিকতায় নিজেই উথলে উঠলেন।

কামরাশুদ্ধ লোক ওঁর রসিকতায় সায় দিয়ে হেসে উঠল। তিনি আর একটু মজা দেখবার জন্যে, ওর গেঞ্জিটা ধ'রে টান মারতেই ও খানিকটা এগিয়ে এল, ছেড়ে দিতেই আবার স্প্রিংএর মত পিছিয়ে গেল। আবার একটা হাসির তুবড়ী।

—নিশ্চয়ই তোর কাছে পয়সা আছে। কোথায় আছে বের কর্।

ও আবার মাথা নাড়লে।

—নেই কেমন দেখি তো। তোল তোর গেঞ্জি।

ও কিছুতেই গেঞ্জি তুলবেনা।

চেকার এক ধমক দিতেই ও গেঞ্জিটা খানিকটা তুলে ফেল্লে। ওটা তুলতেই বেরিয়ে প'ড়্ল ততোধিক ছিন্ন একটা সার্ট।

কামরাশুদ্ধ লোক আবার একটা হাসির ঝড় বইয়ে দিল।

—য়্যাঁ! গেঞ্জির নীচে সার্ট! সার্টের নীচে আবার সোয়েটার নেই তো?

—না বাবু।

—এই তো কথা ব'লতে পারিস দেখছি। আমি ভেবেছিলুম বোবা। তা যাক্, পয়সা যা আছে বের কর্, নইলে......

সে আবার মাথা নাড়লে।

চেকার এইবার ধৈর্য হারিয়ে ফেল্লেন। তিনি হঠাৎ উঠে পড়ে ব'ল্লেন—আমি তোর সব কিছু সার্চ ক'রে দেখব। তুই হাত তোল তো দেখি।

ও নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ ক'রতে বাধ্য হ'ল।

চেকার ওর সব কিছু হাতড়ে পেলেন—একটা আধ-খাওয়া বিড়ি, কিছু খইনি, একটা চূণের ডিবে, আর কিছু পয়সা একটা ছোট পুঁটলিতে বাঁধা।

পয়সা বেরুতেই চেকার উল্লাসে ব'লে উঠলেন—কি রে? কিছু নেই বল্লি? এগুলো কি? একটা একটা ক'রে গুণে দেখলেন সাড়ে সাত আনা হবে। পয়সা ক'টি অবিলম্বে নিজের পকেটে ফেলে—আর সব ফিরিয়ে দিলেন। ও শেষবারের মত ওগুলোর প্রতি বড় করুণদৃষ্টিতে চাইলে।

—কোথায় যাবি?

—লালমণি। হুজুর মা-বাপ্।

গাড়ী এসে থামল কুচবিহারে। ওকে ঘাড় ধ'রে নামিয়ে দিয়ে চেকার ব'ল্লেন—যা ভাগ্! টিকিট্ না কেটে ফের গাড়ীতে উঠ্‌বি তো চলন্ত গাড়ী থেকে ফেলে দেব।

ওর দুই চোখে ফুটে উঠ্‌ল একজোড়া জবাফুল। ও আপন মনে ব'লে উঠল—আল্লা!!

* * * *

কুচবিহার ষ্টেশন। ডাউন মিক্সড্ ট্রেনটা থামবার একটু পরেই আপ্ মেল ট্রেনটা ওর পাশে এসে দাঁড়াল। দুই ট্রেনের যাত্রীতে লোকে লোকারণ্য হ'য়ে উঠল প্লাটফর্ম। চেকারের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হ'য়ে গেল ওর এক পুরোণো বন্ধু পুষ্পেন্দুর সঙ্গে। পুষ্পেন্দু ক্যালকাটা কর্পরেশনের ভূতপূর্ব হেলথ্ অফিসারের ছেলে। সম্প্রতি বিলাত থেকে এসেছে।

প্রথম সাক্ষাতেই চেকার ওর সঙ্গে করমর্দন ক'রে ব'ল্লে—কবে এলি বিলাত থেকে?—একেবারে সাহেব হ'য়ে গিয়েছিস দেখছি!

তারপর পরস্পর পরস্পরের কুশল জিজ্ঞাসা করার পর চেকার বল্লে—এদিকে যাচ্ছিস্ কোথায়?

—যাচ্ছি একটু কাজে। তারপর ব'ল্লে—উঃ দার্জিলিঙ্ মেলে কি অকথ্য ভিড় ভাই। সারাটা রাস্তা আসতে কি কষ্টই না পেয়েছি। ইণ্টারে চাপা বড্ড ভুল হ'য়ে গেছে।

—ইণ্টারে তো ভিড় হবেই। আর তোদের মত লোক ইণ্টারে

চাপে নাকি ! আচ্ছা আহাম্মক্ যা হ'ক্ ! না, না, না—আয় নেমে আয়—ফার্ষ্ট ক্লাসে উঠবি চল্।

—যাঃ !

—যা বৈকি !—ব'লে ওকে এক রকম জোর করেই নামিয়ে নিয়ে ফার্ষ্ট ক্লাস একটা কামরায় উঠিয়ে দিয়ে ব'ল্লে—তোরা যদি ফার্ষ্ট ক্লাস কি সেকেণ্ড ক্লাসে না চাপিস্ তো আমাদের চোখে কেমন যেন ঠেকে !

উত্তরে ও কেবল মৃদু হাসলে। তারপর মাণিব্যাগ থেকে টিকিটের জন্যে পয়সা বের ক'রতেই চেকার ব'ল্লে—আরে রামঃ ! এখান থেকে এটুকু যাবি—তার আবার টিকিট কিসের ! আর এ লাইনের আমরাই তো মা-বাপ ! গার্ডসাহেবকে ব'লে দিচ্ছি, তুই নাক ডাকিয়ে ঘুমো।

মেল ট্রেনটা সিটি দিয়ে উঠ্ল। চেকার বিদায় নিয়ে সযত্নে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে নেমে পড়ে গার্ডের সঙ্গে কি সব কথা ব'ল্লেন।

কিছুক্ষণ পর মিকস্‌ড্ ট্রেনটাও ছেড়ে দিল। সেই লোকটা পাশেই গাড়ীটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল। ট্রেনটা যেন ওকে উপেক্ষা ক'রে চলে গেল !

ভক্তিরস

শ্রীবিভাসপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় এম-এ

মুক্তাফলের সপ্তমাধ্যায়ে (২৭) শ্লোক ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হেমাদ্রি বলেন, 'যস্মাদ্ ভক্ত্যাবেব বেদস্য তাৎপর্য্যম্।' ভক্তিতেই নিখিল বেদের তাৎপর্য্য।

প্রাচীন বেদ সংহিতায় হয়ত ভক্তি শব্দটী দৃষ্টিগোচর না হইলেও সেখানে উহার সমবাচী শ্রদ্ধা ও প্রমাপ প্রভৃতি শব্দ আছে। বৈদিক প্রার্থনাসকল ভক্তিমূলক। বিশেষতঃ পুরুষসূক্তের মত শ্রদ্ধাসূক্তও আছে। প্রাচীন উপনিষদ্ শ্বেতাশ্বতর বলেন,

'যস্যদেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথাগুরৌ
তস্যৈতে কথিতাহ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ। ৬।২৩

যাহার পরমেশ্বরে পরাভক্তি আছে, তাঁহার ন্যায় গুরুতে যাহার ভক্তি পূর্ব্ব-কথিত তত্ত্বসকল সেই মহাত্মার নিকট প্রকাশ পায়। শ্রদ্ধাভক্তিধ্যানযোগাদ-বেহি' (কৈবল্য উঃ ১।২) শ্রদ্ধাভক্তি ধ্যানযোগে সেই ঈশ্বরকে জানিও।

এই দুটী প্রাচীন উপনিষদে ভক্তিশব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। এতদ্ভিন্ন পরবর্ত্তীকালের উপনিষদসকলে ভক্তির অনেক কথা পাওয়া যায়।

গোপালোত্তরতাপনী শ্রুতি বলেন, 'বিজ্ঞানঘন আনন্দঘন সচ্চিদা-নন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি' (৭৯) সচ্চিদানন্দস্বরূপ ভক্তিযোগে বিজ্ঞানঘন আনন্দঘন ভগবান প্রকাশিত হন।

'ভক্তিরেবৈনং নয়তি, ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষঃ' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য ভাগবত সন্দর্ভে শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন। প্রেমভক্তিই ভগবানকে আকর্ষণ করিয়া সাধকের নিকট আনে, ভক্তিই ভগবানের স্বরূপ প্রকাশ করে, ভগবান ভক্তির বশ। 'ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধিনৈরাস্যেনামুষ্মিন্ মনঃ কল্পনমেতদেব নৈষ্কর্ম্ম্যং (গোঃ, তা, পু, ১৫) আনুকূল্যপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণভজনই ভক্তি। ইহলোক ও পরলোকের কামনা পরিত্যাগ করিয়া ভগবানে চিত্ত অর্পণ বা তন্ময়তাই ভক্তি।

'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং (কঠ, উ ২।২৫) স্বাম্' যিনি তাহাকে বরণ করেন, সেই সাধক ভগবানকে লাভ করে। শ্রীপাদ রামানুজ আচার্য্য শ্রীভাষ্যে বলেন, প্রিয়তমজনই বরণের যোগ্য। ভক্তি দ্বারাই জীব ভগবানের প্রীতির পাত্র হইয়া থাকে।

উপাসনাপর ভক্তিশব্দ নানাভাবে ও নানানামে উপনিষদে ব্যবহৃত হইয়াছে। ছান্দোগ্য শ্রুতিতে ধ্রুবানুস্মৃতি শব্দে ভক্তি অভিহিত হইয়াছে। যথা, 'স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ।' ৭।২৬।২ ধ্রুবানুস্মৃতি বা তৈলধারার মত প্রগাঢ় ধ্যান লাভ করিলে সকল গ্রন্থী বা চিত্তের রাগদ্বেষাদি কষায় বিনষ্ট হয়। এই ভক্তিই বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে প্রজ্ঞা শব্দে কথিত হইয়াছে, যথা, 'বিজ্ঞায়প্রজ্ঞন্ কুর্ব্বীত' ধীর ব্যক্তি সেই আত্মাকে শাস্ত্র হইতে ও গুরু মুখে জানিয়া তাঁহার ধ্যান করিবে।

ভক্তিবাদী আচার্য্যগণ ভক্তিকে জ্ঞানবিশেষ বলিয়াছেন—যে জ্ঞানে ভগবানের স্বরূপশক্তির লীলাবিলাস ও বৈচিত্রী, অশেষ গুণাবলী অনুভূত হয় তাহাই ভক্তি।

ভগবানকে লাভ করিতে হইলে ভক্তি যে পরম শ্রেষ্ঠ উপায় তাহা বেদাদি নিখিল শাস্ত্র হইতে প্রমাণিত হয়। অতএব ভক্তিতত্ত্ব যে বেদের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। এই মর্ম্মেই কলি-যুগ পাবনাবতার শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীকে বলিয়াছিলেন।

'গৌণ মুখ্যবৃত্তি, কি অন্বয় ব্যতিরেকে
বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহয়ে কৃষ্ণকে।'
(শ্রীচৈতন্য চঃ মধ্য ২০ পরিচ্ছেদ)

শাণ্ডিল্যসূত্রে বলেন,

'সা পরানুরক্তিরীশ্বরে' (শা, সূঃ, ১ম, আহ)

ঈশ্বরে পরম অনুরাগই ভক্তি। স্বপ্নেশ্বরাচার্য্য এই সূত্রভাষ্যে বলেন যে ঈশ্বরের স্বরূপ ও মহিমা অবগত হওয়ার পরে তাঁহার প্রতি যে আসক্তি হয় তাহাই ভক্তি। শ্রীনারদসূত্রে উক্ত আছে, 'ওঁ সা ত্বস্মিন্‌পরম প্রেমরূপা' (১অ ২ সূঃ) ভগবানে পরম প্রেমই ভক্তি। বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে যাজ্ঞবল্ক্য জনকের নিকট প্রিয়বাদ বলিয়াছিলেন। আত্মা নিরুপাধি প্রীতির বিষয়। পুত্রাদি সকল বাহ্য বস্তু হইতে আত্মা প্রিয়তম। আত্মাকে যে প্রিয়জ্ঞানে উপাসনা করে, সে অমৃতত্ব লাভ করে।

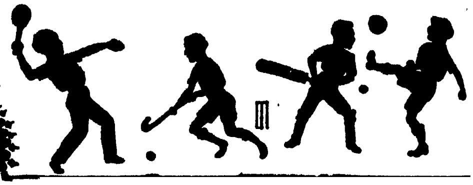
তৈত্তিরীয় শ্রুতির ব্রহ্মানন্দবল্লীতে ব্রহ্মকে পক্ষীরূপে কল্পনা করিয়া রূপকের দ্বারা একটী গভীর রহস্য প্রকাশিত হইয়াছে। সেখানে উক্ত আছে, 'তস্য প্রিয়মেব শিরঃ' ১।৩২ প্রিয় বা প্রিয় বস্তুর দর্শনজনিত আনন্দই এই আনন্দময়ের শিরঃ বা মস্তকস্থানীয়, কারণ উহাই আনন্দের মধ্যে প্রধান। যাহা হোক্ এখানেও ভঙ্গীক্রমে প্রিয়ত্ব ধর্ম্ম ব্রহ্মে ধ্বনিত হইয়াছে।

এইরূপে শ্রুতি স্মৃতি হইতে বহু বচন দ্বারা ভক্তি প্রতিপাদিত হইতে পারে। তবে শ্রুতিতে ভক্তি নিগূঢ়ভাবে অভিব্যক্ত আছে কারণ যাহা সাতিশয় গুহ্যতম তাহা সাধারণভাবে প্রকাশিত হইলে উহার গাম্ভীর্য্য তরলিত হইবে। গীতায় সেইজন্য ভক্তিযোগ 'রাজগুহ্য' বা গোপনীয় বিষয় সকলের মধ্যে পরম গুহ্য বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। 'ঈশ্বর প্রণিধানাদ্বা' ১।২৩ যোগসূত্রে ভক্তির বিষয় ভগবান পতঞ্জলি ইঙ্গিত করিয়াছেন। ব্যাসভাষ্যে প্রণিধানের অর্থভক্তি বিশেষ। চন্দ্রিকাটীকায় ইহা যে সুখসাধ্য উপায় তাহা উল্লিখিত আছে। তবে এই ভক্তি আরোপসিদ্ধা অর্থাৎ সকল কর্ম্মের ফল ভগবানে অর্পিত হওয়ায় উহার ভক্তিত্ব সিদ্ধ হইতেছে।

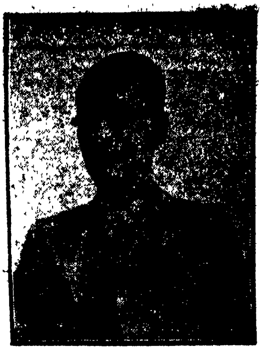
বেদান্তদর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ে 'আবৃত্তি রসকৃদুপদেশাৎ' ৪।১।১ সূত্রে ধ্যানাপন্না ভক্তির বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায়। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য বলেন যে প্রোষিতনাথা বা যে স্ত্রীর প্রিয়জন প্রবাসে গত হইয়াছে সে যেরূপ পতিকে নিরন্তর চিন্তা করে সেইরূপ ধ্যানই ভক্তি। অভিনব গুপ্তাচার্য্য ধ্বন্যালোকের লোচনটীকায় (৩।২২৭ পৃঃ) ভক্তির বিশেষ মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন। বিষয়তৃষ্ণাময়জনিত সুখ অথবা লোকোত্তর কাব্য-রসাস্বাদ হইতে উত্থিত সুখ ভক্তিসুখসাগরের কণিকা মাত্র।

'তদানন্দবিপ্রুম্মাত্রাবভাসো হি রসাস্বাদঃ। ইহা দ্বারাও ভক্তি রস-সাগরে যে সুখ উত্থিত হয় তাহা অনুমেয়।

খেলা ধূলা



শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়



৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

ক্রিকেট ঃ

বিহার ঃ ১৫৯ ও ২৬১

বাঙ্গালা ঃ ২৪৯ ও ৮৮ (৮ উইকেট)

পূর্ব্বাঞ্চলের খেলায় বাঙ্গালা প্রদেশ প্রথম ইনিংসের রান সংখ্যায় বিহারদলকে পরাজিত করেছে।

বিহার টসে জয়লাভ করে বাটিং আরম্ভ করে। আরম্ভ ভাল হ'ল না। মাত্র ১১ রানে ২টি উইকেট পড়ে গেল। মধ্যাহ্ন ভোজের সময় ২ উইকেটে ৫১ রান উঠল। লাঞ্চের পর বিহারদলের দারুণ ভাঙন সুরু হ'ল। বি মিত্র এবং কে ভট্টাচার্য্যের মারাত্মক বোলিংএ বিহারদলের ভাল ভাল উইকেট পড়ে গেল। ৯ উইকেট হারিয়ে বিহারদলের একশত রান উঠে। প্যাটেল এবং কে ঘোষ জুটী হয়ে খেলতে লাগলেন। চা-পানের সময় রান উঠল ৯ উইকেটে ১৩০, ঘোষ ২৮ এবং প্যাটেল ২০। চা পানের পর রান বেশ দ্রুত উঠতে থাকে। কে ঘোষ ৪৫ রান ক'রে ভট্টাচার্য্যের বলে 'বোল্ড' হ'লেন। বিহার প্রথম ইনিংসে ১৫৯ রান করলো ২৫৫ মিনিটে। প্যাটেল ৩০ রান ক'রে নট আউট রইলেন। পনের বছর বয়সের পার্শী খেলোয়াড় প্যাটেল বিহারদলের দারুণ ভাঙ্গনের মুখে দশম উইকেটে যোগ দিয়ে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। প্যাটেল দৃঢ়তার সঙ্গে না খেললে বিহারদলের অবস্থা আরও শোচনীয় হ'ত। প্রকৃতপক্ষে বি সেনের অসুস্থতার জন্যেই বিহারদলে প্যাটেল শেষ সময়ে স্থান পেয়েছিলেন; বি মিত্রের দ্রুতগামী বলকেও তিনি চার বার বাউণ্ডারীর ধারে পাঠিয়েছিলেন। প্রথম ইনিংসের উল্লেখযোগ্য, বিহারদলের তিনজন খেলোয়াড় 'রান আউট' হ'ন। এস ব্যানার্জীর ২৬ এবং এ দাশ গুপ্তের ২৩ রান উল্লেখযোগ্য। বি মিত্র ২৯ রানে ২ এবং কে ভট্টাচার্য্য ৫৭ রানে ৫টি উইকেট পান।

বাঙ্গালা দলের প্রথম ইনিংস আরম্ভ হ'ল এবং প্রথম দিনের খেলার শেষে ১ উইকেটে ২৬ রান উঠল। পি সেন ও পি ডি দত্ত যথাক্রমে ১২ এবং ১১ করে নট আউট থাকলেন।

দ্বিতীয় দিনের 'লাঞ্চের' সময় ৭ উইকেটে বাঙ্গালা দলের ১২৪ রান উঠল। এন চ্যাটার্জী এবং মুস্তাফী ব্যাট করছেন। চ্যাটার্জীর ৪০ রান, মুস্তাফীর কোন রান তখনও হয়নি। মহারাজা ৩৩ রান ক'রে আউট হয়েছেন। লাঞ্চের পর চ্যাটার্জি এবং মুস্তাফী উভয়ে বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে রান তুলতে লাগলেন। দলের ২০১ রানের সময় এন চ্যাটার্জি ১৪২ মিনিট খেলে ৭৮ রান ক'রে আউট হ'লেন। তাঁর একাধিক 'পুল' দর্শনীয় হয়েছিল, কিন্তু বলতে কি তিনি চার বার আউট হ'তে গিয়ে সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে যান। তাঁর রানে ৯টা বাউণ্ডারী ছিল। মুস্তাফী চমৎকার খেলে ৭৭ রান তুলে আউট হ'লেন এন চৌধুরীর কাছে। শেষ খেলোয়াড় বি মিত্র এস ব্যানার্জির সঙ্গে জুটী হলেন, কিন্তু রান না করেই আউট হলেন। ২৪৯ রানে বাঙ্গলার প্রথম ইনিংস শেষ হল। এস ব্যানার্জি (বড়) ৮৯ রানে ২টি, এন চৌধুরী ৭৫ রানে ৬টি, বি বোস ২৪ রানে ২টি উইকেট পেলেন। বিহারদলের ফিল্ডিং ভাল হয় নি। ফিল্ডিং ভাল না হওয়ার দরুণ অনেক বল বাউণ্ডারী সীমানায় যায়, এ ছাড়া অনেক 'ক্যাচ'ও নষ্ট হয়েছে।

চা-পানের পর ৩-৫০ মিনিটে লুন ও এস ঘোষকে দিয়ে বিহার-দলের দ্বিতীয় ইনিংস আরম্ভ হ'ল। ৩ উইকেটে ৬০ রান উঠবার পর সেদিনের মত খেলা বন্ধ হয়। বড় ব্যানার্জি শূন্য রান করে আউট হয়ে যান। জুনিয়ার এস ব্যানার্জি ১০ রান এবং এস ঘোষ ৩৫ রান করে নট আউট থাকেন।

তৃতীয় দিনে বিহার দলের ১২২ রানের সময় এন চ্যাটার্জি এই খেলায় প্রথম বল করতে এসে এস ঘোষের উইকেট নিলেন। ঘোষ ১৫৫ মিনিট খেলে ৬৩ রান তুলেছিলেন, তার মধ্যে ৯টী বাউণ্ডারী ছিল। লাঞ্চের সময় বিহার দলের ৬ উইকেটে ১৭০ রান উঠেছে। জুনিয়ার ব্যানার্জি ৬৪ রান ক'রে তখনও ব্যাট করছেন, তাঁর সঙ্গী হয়েছেন বি বোস, রান ৩। লাঞ্চের পর জুনিয়ার ব্যানার্জি দৃঢ়তার সঙ্গে খেলতে লাগলেন। দলের ২২৭ মিনিট খেলার পর ২০০ রান উঠল। ২০৫ রানের সময় বিহার দলের সপ্তম উইকেটের পতন হ'ল; বি বোস ১৬ রান করে বিদায় নিলে সুইনি ব্যানার্জির জুটী হ'লেন। ৭ উইকেটে ২৬১ রান উঠার পর বিহার ইনিংস ডিক্লেয়ার করলে। জুনিয়ার ব্যানার্জি ১০১ এবং সুইনি ৩৫ রান ক'রে নট আউট রইলেন। বিহার ১৭১ রান অগ্রগামী রইল।

৩-২০ মিনিটে বাঙ্গলা দ্বিতীয় ইনিংস আরম্ভ করলো। সূচনা ভাল হ'ল না। ১২ রানে ২, ২০ রানে ৩, ২৪ রানে ৪, ৩৫ রানে ৫ এবং ৪০ রানে ৬টী উইকেট পড়ে গেল।

বাঙ্গালা দলের ৮ উইকেটে ৮৮ রান উঠার পর খেলা শেষ হয়ে গেল। দলের সর্ব্বোচ্চ রান করলেন মুস্তাফী ১৮। এন চৌধুরী ১৫ ওভার বলে ৫২ রান দিয়ে ৩টে মেডেন এবং ৪টী উইকেট পেলেন। বি বোস পেলেন ৩টে ২৪ রানে ৮ ওভার বলে।

জুনিয়ার ব্যানার্জি চমৎকার খেলে ১০১ রান করেন। তাঁর

খেলায় কোথাও ভুল ত্রুটী ছিল না। একবার মাত্র ৪ রানের মাথায় আউটের সুযোগ দেন। তাঁর ড্রাইভস, পুলস এবং কার্টস দর্শনীয় হয়েছিল। শত রান তুলতে তিনি সময় নিয়ে ছিলেন ২০২ মিনিট।

বিহার দল টসে জয়লাভ করেও খেলায় প্রাধান্য লাভ করতে পারে নি। তাদের দুর্ভাগ্য যে নিয়মিত দু'জন খেলোয়াড় অসুস্থতার জন্ত শেষ সময়ে খেলায় যোগ দিতে পারেন নি। তাঁদের স্থানে অতিরিক্ত খেলোয়াড়দের নামাতে হয়েছিল। প্রথম দু'দিনের খেলায় নিজেদের তিনটি 'রান আউট' হওয়ায় এবং একাধিক ক্যাচ নষ্ট ক'রে তাঁরা যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা নষ্ট করেছিলেন। তৃতীয় দিনে বিহার দলের খেলোয়াড়রা নৈরাশ্যের মধ্যে খেলা আরম্ভ করে। রাস্তার দুর্ঘটনার ফলে বিহার দলের খেলোয়াড় পট্টনকার আর খেলায় যোগ দিতে পারেন নি। এ সমস্ত পারিপার্শ্বিক ঘটনার মধ্যেও বিহার দলের খেলোয়াড়রা নানা দিক থেকে ক্রীড়ামোদীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। এ পরাজয় তাদের কিছু অগৌরবের নয়। এ খেলাতে জয়লাভ করতে বাঙ্গালা দলের যতখানি কৃতিত্ব থাকুক না কেন, আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি বিহার দলের দুর্ভাগ্যে বাঙ্গলা দল যথেষ্ট লাভবান হয়েছিল। খেলা-ধূলায় যতখানি অনিশ্চয়তা থাকুক না কেন এ সুবিধা যে তাদের জয়লাভে সহযোগিতা করেছে—এ স্বীকার করতে এ ক্ষেত্রে কোন বাধা নেই।

হোলকার: ২২২ ও ৪২০ (৭ উ: ডিক্লেয়ার্ড)
ইউ পি: ১১৬ ও ২২৪

হোলকার ৩০২ রানে ইউ পি দলকে পরাজিত করেছে।

প্রথম দিনের খেলায় চা পানের পূর্ব্বেই হোলকার দলের প্রথম ইনিংস শেষ হয়। ক্যাপ্টেন সি কে নাইডু ১০৫ মিনিট উইকেটের চারিপাশে বল পাঠিয়ে ১০২ রান করেন; সহিদুল্লা ৬৬ রানে ৫টা উইকেট পান। ইউ পির প্রথম ইনিংসের আরম্ভ ভাল হ'ল না। কোন রান না করেই একটা উইকেট পড়ে গেল। প্রথম দিনের (১৭ ডিসেম্বর) খেলার শেষে 'ইউ পি'র ৩ উইকেট পড়ে গিয়ে ৫৫ রান উঠল।

দ্বিতীয় দিনে 'ইউ পি'র প্রথম ইনিংস শেষ হ'ল ১১৬ রানে। 'ইউ পি'র ক্যাপটেন দলের সর্ব্বোচ্চ ৬৮ রান করলেন। মুস্তাক আলি ৪ রানে ৩ উইকেট এবং নাইডু ৩৩ রানে ৪ উইকেট পান।

হোলকার দল ১০৬ রানে অগ্রগামী থেকে দ্বিতীয় ইনিংস আরম্ভ করলে। চায়ের সময় ২ উইকেটে ১৭৭ রান উঠে। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ৪ উইকেটে হোলকার দলের ৩০৬ রান দাঁড়াল। মুস্তাক আলি সুন্দরভাবে খেলে ১৬৩ রান করেন। মুস্তাক আলি এবং নিম্বলকারের তৃতীয় উইকেটের জুটিতে ১১৫ মিনিটে ১৭৬ রান উঠে।

তৃতীয় দিনে হোলকার দল ৭ উইকেটে ৪২০ রান উঠলে ইনিংস ডিক্লেয়ার করে। হোলকার দলের দ্বিতীয় ইনিংসে মুস্তাক আলির ১৬৩, জগদ্দলের ৬৭, নিম্বলকারের ৫৪ রান উল্লেখযোগ্য ছিল। পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে ইউ পির ৫২৬ রান প্রয়োজন। কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসে ২২৪ রান উঠল। খানসেলকার ৭৮ রান করলেন।

বোম্বাই: ৪৮৭
বরোদা: ২৯৭

বোম্বাই প্রথম ইনিংসের ১৯০ রানে গত বছরের রঞ্জিট্রফি বিজয়ী বরোদা দলকে পরাজিত করেছে। বোম্বাইয়ের আরম্ভ ভাল হয়নি। ১০ রানে একটা উইকেট পড়ে গেল। মধ্যাহ্ন ভোজের সময় রান উঠেছিল ৫ উইকেটে ৮৯। প্রথম দিনের ('১১ই ডিসেম্বর) খেলার শেষে বোম্বাই দল ৫ উইকেটে ২৫৯ রান করলে। ভি এম মার্চেন্ট ৮৮ এবং কে রঙ্গনেকার ৮৬ রান করে নট আউট রইলেন। আনওয়ার হোসেনের ৫৩ রানও উল্লেখ করা যায়। সি এস নাইডু ৩৮ ওভার বলে ৭১ রান দিয়ে ৯টা মেডেন এবং ৪টা উইকেট পান।

দ্বিতীয় দিনের খেলা আরম্ভ করলেন প্রথম দিনের নট আউট মার্চেন্ট এবং রঙ্গনেকার। দ্বিতীয় দিনের খেলায় ২৭৯ উঠলে পর রঙ্গনেকার আউট হলেন। রঙ্গনেকার ৪ ঘণ্টা ব্যাট করে মাত্র ২ রানের জন্তে সেঞ্চুরী করতে পারলেন না। ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে তাঁরা ১৯০ রান তুলেছিলেন। খোট এসে মার্চ্চেন্টের সঙ্গে যোগ দিলেন এবং মার্চ্চেন্টের নিজস্ব শত রান পূর্ণ করতে সহযোগিতা করলেন। ২৬৮ মিনিট খেলার পর দলের রান উঠলো ২৮৪। মার্চ্চেণ্ট ৩টে চারের বাড়ি মেরে দলের তিনশত রান ৩৮০ মিনিটে পূর্ণ করলেন। খোট কিন্তু মাত্র ৪ রান করেই নাইডুর বলে আউট হ'লেন। ৭টা উইকেটে তখন ৩১৬ রান উঠেছে। কুপার মার্চ্চেন্টের সঙ্গে জুটী হয়ে খেলাটা ঘুরিয়ে দিলেন। লাঞ্চের মাত্র পাঁচ মিনিট আগে নাইডুর বলে মার্চ্চেণ্ট ১৪১ রান করে আউট হয়ে গেলেন। মার্চ্চেণ্ট ৩৪৬ মিনিট উইকেটে খেলেছিলেন। কুপারের সঙ্গে রাইজী যোগ দিলেন। দু'জনার জুটিতে বেশ রান উঠতে লাগল। নাইডু ৯টা ওভার বলে ৩০ রান দিয়ে কিন্তু একটা উইকেটও নিতে পারলেন না। মোট ৪৯৫ মিনিট খেলায় বোম্বাই দলের ৪০০ রান পূর্ণ হ'ল। চা পানের পূর্ব্বের শেষ ওভারে কুপার ভিনোদের বলে আউট হ'লেন ৭৩ রানে। কুপার ১৬৫ মিনিট ব্যাট করেছিলেন, তাঁর ৯টা 'চার' ছিল। কুপার ও রাইজী তাঁদের নবম উইকেটের জুটীতে ১২০ মিনিটে ১৪২ রান তুলে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। চা পানের পরবর্ত্তী ওভারেই বোম্বাইয়ের প্রথম ইনিংস ৫৭৫ মিনিট খেলার পর শেষ হয়ে গেল। রাইজী ৮১ রান ক'রে নট আউট রইলেন। রাইজী মোট ১২৬ মিনিট খেলেছিলেন। কুপার এবং রাইজী উভয়েই সি এস নাইডুর বোলিং পর্য্যন্ত উপেক্ষা করে নির্ভীকভাবে উইকেটে ছিলেন।

বরোদা ৪-৪৫ মিনিটে তাদের প্রথম ইনিংস আরম্ভ করে আর দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে ১ উইকেট হারিয়ে ৭৫ রান তুলে। নিম্বলকার এবং অধিকারী যথাক্রমে ৪৩ এবং ৩১ রান ক'রে নট আউট থাকেন।

তৃতীয় দিনে নিম্বলকার এবং অধিকারীর জুটি ভেঙ্গে গেল দলের যখন ১২৩ রান উঠেছে। নিম্বলকার ১১০ মিনিট খেলে ৬৫ রান ক'রে আউট হলেন। নিম্বলকার মাত্র ৮ রানের মাথায় একবার আউট হ'বার সুযোগ দিয়েছিলেন তা ছাড়া তাঁর খেলা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর রানে ৮টা চার ছিল। নিম্বলকারের বিদায়ের পর বরোদা দলের খেলা নিষ্প্রভ হয়ে

পড়ল। অধিকারী এবং হাজারী খেলতে লাগলেন। অধিকারী ৩ ঘণ্টায় ৭৯ রান তুলে সারভাতের কাছে আউট হ'লেন। দলের রান তখন ৩ উইকেটে ১৯৫। এর পর হাজারী ভ্রাতৃদ্বয় জুটী হলেন; মধ্যাহ্ন ভোজের সময় তিন উইকেটে দলের ২০১ রান উঠল। মধ্যাহ্ন ভোজের পরই বরোদা দলের দারুণ ভাঙ্গন আরম্ভ হ'ল। খোট ও আনওয়ার হোসেন নতুন বল নিয়ে বোলিং আরম্ভ করলেন এবং খোট পর্য্যায়ক্রমে জুনিয়ার হাজারী, সি এস নাইডু এবং এস ইন্দুলকারকে তাঁর এক ওভারের প্রথম তিনটে বলেই আউট ক'রে 'Hat-trick' পেলেন। ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে খোটের এ মারাত্মক বোলিং রেকর্ড স্থাপন করেছে। এখানে মাত্র দুটি ক্ষেত্রের কথা উল্লেখ করা যায়, কিন্তু সে ক্ষেত্রে 'এল-বি', 'কট' প্রভৃতিতে পর্য্যায়ক্রমে তিনটি উইকেট পড়েছিল—খোটের মত 'All clean' bowled হয়নি। ১৯১২-১৩ সালের ট্রাঙ্গুলার ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় হিন্দু বনাম পার্শী দলের খেলায় পার্শী দলের এম ডি পারেখ পর্য্যায়ক্রমে ডেট, সি ভি মেটা এবং রাজকোটের ঠাকুর সাহেবকে আউট ক'রেছিলেন। এরপর ১৯৩৮ সালে পেণ্টাঙ্গুলার খেলায় মুসলীম দলের বিরুদ্ধে ইউরোপীয় দলের ওর্টন ব্রেবোর্ণ ষ্টেডিয়ামে মুস্তাক আলি, ওয়াজীর আলি এবং নাজির আলিকে একই ভাবে আউট করেন। খোটের এই মারাত্মক বোলিংয়ের ফলেই বরোদা দল ভেঙ্গে পড়ল। এই সঙ্কট সময়ে হাজারীর সঙ্গে খোরপদে যোগদান করলেন। হাজারী ৫০ রান করলেন ২ ঘণ্টা ব্যাট ক'রে, দলের রান তখন ২২৮। খোরপদে ৬ রান করে আউট হলেন—দলের রান যখন ৭ উইকেটে ২৩৮। ভিনোদ যোগ দিলেন এবং গুরুদাচারের বলে ৪ রান করে আউট হলেন। দলের রান ৮ উইকেটে ২৭৫ হয়েছে।

চা পানের সময় হাজারীর শত রান পূর্ণ করতে তখন ২ রান বাকি। চা পানের ১৫ মিনিট পরে দলের ২৯৩ রানের সময় প্যাটেল এল-বি-ডবলউ হলেন ৭ রান ক'রে। হাজারীর রান তখন ৯৯। গুরুদাচারের বল পাঠিয়ে ২ রান করলেন এবং পরবর্ত্তী বলে খোটের হাতে ধরা দিলেন। হাজারী ২২০ মিনিট ব্যাট ক'রে ১০১ রান তুলেন, তার মধ্যে ১০টা 'চার' ছিল। ২৯৭ রানে বরোদা দলের ইনিংস শেষ হ'লে বোম্বাই প্রথম ইনিংসের খেলায় ১৯০ রানে বিজয়ী হ'ল। গুরুদাচার ২টি এবং সারভাতে ৩টি উইকেট পান।

গুজরাট : ১২০ ও ১৩৬

সিন্ধু : ১৭৫ ও ১৩৬

সিন্ধু ৯ উইকেটে গুজরাট দলকে পরাজিত করে।

বোম্বাই : ৭৩৫

মহারাষ্ট্র : ২৯৮

বোম্বাই প্রথম ইনিংসের রানে মহারাষ্ট্র দলকে পরাজিত করেছে।

বোম্বাই টসে জয়লাভ ক'রে ব্যাটিং পায়। আরম্ভ ভাল হয়নি। লাঞ্চের সময় ৪ উইকেটে ৯০ রান উঠেছে। মহারাষ্ট্রের মারাত্মক বোলিংয়ের দরুণ বোম্বাইয়ের এ দুরবস্থা। ভি এম মার্চেন্ট এবং আর এস মোদী ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটী হয়ে খেলার মোড় একবারে ঘুরিয়ে দিলেন। ধীরে ধীরে বোম্বাইয়ের খেলোয়াড়দ্বয় মহারাষ্ট্রের বোলিং আয়ত্তে আনলেন। বারম্বার বোলার পরিবর্ত্তন করেও কোন ফল পাওয়া গেল না। চা পানের সময় রান উঠল ৫ উইকেটে ১৯৭। চায়ের কিছু পরই ২০০ রান উঠে গেল। নতুন বল পেয়েও মহারাষ্ট্র দল কোন পরিবর্ত্তন আনতে পারলো না। মার্চ্চেন্ট এবং মোদীর জুটী ভাঙ্গা গেল না।

সেদিনের খেলার শেষে ৫ উইকেটে ৩০৮ রান উঠল। মার্চ্চেন্ট ১১৯ রান এবং মোদী ১০২ রান করে নট আউট রইলেন।

দ্বিতীয় দিনের খেলায় পূর্ব্ব দিনের নট আউট খেলোয়াড়রা মহারাষ্ট্রদলের বোলিংয়ের সামনে কোন অসুবিধা বোধ করলেন না। বারম্বার বোলার পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও রান দ্রুত উঠতে লাগলো। মধ্যাহ্ন ভোজের সময় রান উঠলো ৪০৬। মার্চ্চেন্ট ১৬৯ এবং মোদী ১৪৫। লাঞ্চের পরও দ্রুতগতিতে রান উঠতে লাগলো। মার্চ্চেন্টের ডবল সেঞ্চুরীর পর মোদী যাদবের বলে কাট' মারতে গিয়ে বোল্ড হ'লেন। খোট এসে মার্চ্চেন্টের জুটী হ'লেন এবং ১৫ ক'রে আউট হলেন। চায়ের সময় ৭ উইকেটে রান উঠল ৫৫৭। মার্চ্চেন্ট ২৫৯ এবং কুপার ২২। চা-পানের পর উভয়েই দ্রুত রান তুলতে লাগলেন। দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে ৭ উইকেটে ৬৬৫ রান উঠল। মার্চ্চেন্ট ৩২২ রান এবং কুপার ৬৭ রান করে নট আউট রইলেন।

১৯৪০-৪১ সালে ভি এস হাজারী প্রতিষ্ঠিত ৩১৬ রানের ব্যক্তিগত রেকর্ড ঐদিন মার্চ্চেন্ট ৩২২ রান ক'রে ভঙ্গ করলেন। তাঁর খেলায় কোথাও ত্রুটি বিচ্যুতি দেখা যায় নি। মার্চ্চেন্ট এবং মোদীর ৬ষ্ঠ উইকেটের ২১৮ রানের নূতন রেকর্ডও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তৃতীয় দিনে ৭৩৫ রান উঠার পর বোম্বাই দলের প্রথম ইনিংস শেষ হ'ল। মার্চ্চেন্ট ৩৫৯ রান ক'রে নট আউট রইলেন। কুপার করলেন ৮৯ রান।

বেলা ১টার সময় মহারাষ্ট্র দলের প্রথম ইনিংস আরম্ভ হ'ল। খেলার শেষে ৭ উইকেটে ২৭২ রান উঠল। সোহনীর ৪৩ রান, মানকদের ৪৮ রান, পরাঞ্জপির ৪৯ এবং মানকদের নট আউট ৭৭ রান উল্লেখযোগ্য।

চতুর্থ দিনে খেলা আরম্ভের আধঘণ্টা পরই মহারাষ্ট্র দলের ইনিংস ২৯৮ রানে শেষ হ'ল। এই ইনিংস শেষ হ'তে ৩০৫ মিনিট সময় নেয়। ফাদকর দলের সর্ব্বোচ্চ ৮৮ রান করেন। সারভাতে ১০৪ রানে ৫টা উইকেট পেলেন।

বোম্বাই পশ্চিমাঞ্চলের ফাইনালে পশ্চিম ভারত রাজ্যের সঙ্গে খেলবে।

পশ্চিম ভারত রাজ্য : ৩৩৬

নওনগর : ২২১

পশ্চিম ভারত রাজ্য প্রথম ইনিংসের রানে নওনগরকে পরাজিত করেছে।

দিল্লী : ১৭৯ ও ৩৯৩

গোয়ালিয়র : ৯২ ও ৬১

দিল্লী ৪১৯ রানে গোয়ালিয়রকে পরাজিত করেছে। দিল্লীর প্রথম ইনিংসে গুরবাক সিং দলের সর্ব্বোচ্চ ৭৮ রান করেন। দয়াশঙ্কর ৫৭ রানে ৬টি উইকেট পান। দ্বিতীয় ইনিংসের

উল্লেখযোগ্য রান—ইদরীস ১০৩, কিরণ ভাণ্ডার ৮৪ ও সুজা ৪১ নট আউট।

সিন্ধু : ১৭২ ও ১৫৮ (৬ উইঃ)

পশ্চিমভারত : ২৭৪ ও ২৮৫

পশ্চিমাঞ্চলের সেমি-ফাইনালে পশ্চিম ভারত দল প্রথম ইংনিসে অগ্রগামী থাকায় বিজয়ী হয়েছে। পশ্চিম ভারত দলের দ্বিতীয় ইনিংসের ২৮৫ রানের মধ্যে শান্তিলাল ১২৩ রান করেন।

হায়দ্রাবাদ : ১৬০ ও ১০৭

সি পি এবং বেরার : ১৬৬ ও ৯৩

হায়দ্রাবাদ ১০ রানে বিজয়ী হয়েছে। সি পি এবং বেরার দলের দ্বিতীয় ইনিংসের ৯৩ রান রঞ্জি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় সর্ব্ব নিম্ন রান হিসাবে গণ্য হয়েছে।

মহীশূর : ৩৫৭ (ইথিওয়ার ৮১, বি ফ্রাঙ্ক ৮৬)

মাদ্রাজ : ৩৬৫ (রামসিং ৮০, রিচার্ডসন ৬৪)

মাদ্রাজ প্রথম ইনিংসের খেলায় বিজয়ী হয়েছে। মাদ্রাজ দক্ষিণাঞ্চলের ফাইনালে হায়দ্রাবাদের সঙ্গে খেলবে।

ইষ্টইণ্ডিয়া চ্যাম্পিয়ানসীপ ঃ

ইষ্ট ইণ্ডিয়া চ্যাম্পিয়ানসীপ ফাইনালে আমেরিকার উদীয়মান টেনিস খেলোয়াড় হল সার্ফেস ভারতের এক নম্বর খেলোয়াড় গস্ মহম্মদকে অতি সহজে ষ্ট্রেট সেটে পরাজিত ক'রে নিজ গৌরব অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। সারফেস গত বৎসর দিলীপ বসুকে ফাইনালে পরাজিত করেছিলেন। তাঁর এ বৎসরের খেলা প্রভূত উন্নত হ'য়েছে। গস্ সমর্থকদের এরূপ হতাশ ক'রবেন কেউ ভাবতে পারেনি। গসের শোচনীয় পরাজয় ও সারফেসের উন্নতি আশা করি ভারতের অন্যান্য খেলোয়াড়দের শিক্ষা দেবে। গস্ কোন বিষয়ে সারফেসকে পেরে ওঠেন নি। সারফেস যে ক'বার নেটে এসেছেন সব্বারই গস্ পরাজিত হ'য়েছেন। অন্যদিকে গস্ যেবারে নেটে এসেছেন সারফেস হয় বল তুলে দিয়ে কিম্বা সাইড-লাইনে ড্রাইভ করে তাকে হতাশ ক'রেছেন। ১৯৩৮-৩৯ সালের ফাইনালে গস ষ্ট্রেট সেটে ম্যাকনীলের কাছে হারলেও সেবারের খেলা এত শোচনীয় হয় নি। সেবার তাঁর সার্ভিসের ক্ষিপ্রতা ছিলো; স্ম্যাসিংও ছিলো চমৎকার। সারফেসের কাছে গস দাঁড়াতেই পারেননি। সেমি ফাইনালে ইফতিকার পরাজিত হ'লেও ভাল খেলা দেখিয়েছিলেন। তিনি স্বভাবতই চঞ্চল; ধীর মস্তিষ্কে খেললে আরও অনেক ভাল খেলা দেখাতে পারতেন। সমস্ত প্রতিযোগীদের মধ্যে ব্যাক হ্যাণ্ড ড্রাইভে অদ্বিতীয়, ভলি, হাফ ভলি ও নেটে কোন প্রতিযোগীর সঙ্গে তুলনা করা চলে না। সর্ব্বোপরি তিনি খুব ধীর ও বিচার বুদ্ধি দিয়ে খেলেছিলেন।

সারফেস ইফতিকারকে আর গস্ দিলীপকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেন। দিলীপ চাইনীজ খেলোয়াড় চয়কে ষ্ট্রেটে হারিয়ে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেন। অন্যদিকে চতুর্থ রাউণ্ডে সুমন্ত মিশ্রের অদ্ভুত ক্ষিপ্র ও দর্শনীয় সার্ভিস গসকে বিপর্য্যস্ত ক'রে তুলেছিলেন। গসকে এই জয় লাভের জন্য বিশেষ পরিশ্রম ক'রতে হয়।

ডবলস্ ফাইনালের খেলা বেশ দর্শনীয় হ'য়েছিলো। পূর্ণ পাঁচ সেট খেলে গস ও ইফতিকার সারফেস ও লেড সিঙ্গারকে পরাজিত ক'রতে সক্ষম হ'য়েছিলেন। ইফতিকার ও সারফেসের খেলা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ফলাফল :

ডবলস ফাইনালে গস্ মহম্মদ ও ইফতিকার আমেদ ৫—৭, ৮—৬, ৪—৬, ৬—৩, ৬—০ গেমে হল সার্ফেস ও লেডসিঙ্গারকে পরাজিত করেন।

সিঙ্গলসের ফাইনালে হল সার্ফেস ৬—১, ৬—২, ৬—২, গেমে গস্ মহম্মদকে পরাজিত করেন।

অল ইণ্ডিয়া ব্যাডমিণ্টন ঃ

অল ইণ্ডিয়া ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিভাগের ফাইনাল খেলার ফলাফল :

পুরুষদের সিঙ্গলসে—দবিন্দর মোহন (পাঞ্জাব) ১৫-৬, ১৫-৫ পয়েণ্টে পাঞ্জাবের প্রকাশনাথকে পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলসে—মিস তারা দেওধর (পুনা) ১১-৭, ৪-১১, ১১-২ গেমে মিস সুন্দর দেওধরকে (পুনা) পরাজিত করেছেন।

কার্ত্তিক বসুর বিবৃতি—

বাংলা বিহার খেলার পর আমরা কার্ত্তিক বসুর বিবৃতি পড়েছি। মনে পড়ছে বৎসরাধিককাল আগে বেঙ্গল জিমখানা ও সেই সময়ের 'সি, এ বি'র বিরোধের ফলে এক অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল; পরে 'সি এ বি'কে জিমখানার প্রাধান্য স্বীকার করতে হয়। অনেকের ন্যায় আমরাও তখন জিমখানার পক্ষেই সমর্থন করেছিলাম। নূতন 'সি এ বি'র স্বরূপ যে এত শীঘ্র এত প্রকটভাবে দেখা দিবে তা জনসাধারণের জানা ছিল না।

এ বছরের শ্রেষ্ঠ এ্যাথলেট ঃ

ইউনাইটেড প্রেসের উদ্যোগে আমেরিকার খেলাধূলার লেখকদের ভোটানুক্রমে প্রতি বছরের যে শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় নির্ব্বাচন করা হয় তাতে এ বছরে 'সুইডিস রানার' গুণ্ডার হেগের নাম প্রথম স্থান অধিকার করেছে। বিগত তের বছরের মধ্যে এ বছরই সর্ব্বপ্রথম একজন বিদেশী প্রথম স্থান অধিকারের সম্মান অর্জ্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। গুণ্ডার হেগ সর্ব্বসমেত ১০৭টি ভোট পেয়েছেন। দ্বিতীয় স্থান পেয়েছেন নিউইয়র্ক ইয়াঙ্কির 'বেসবল ষ্টার' স্পোয়ারজিয়োন চাণ্ডলার ৫৭টি ভোট পেয়ে।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য অনূদিত উপন্যাস "সান্‌ফ্রানসিস্‌কোর যাত্রী"—২৷০

শ্রীশশধর দত্ত প্রণীত রহস্যোপন্যাস "মোহন ও পঞ্চম বাহিনী"—২৲

"ফাঁসির মঞ্চে মোহন"—২৲

শ্রীদিলীপ দাশগুপ্ত প্রণীত (রূপক-নাটিকা) "অজাবতীর দেশ"—।৵০

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা ; ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত



শিল্পী—শ্রীযুক্ত রাধাচরণ বাগচি

মজনুর মৃত্যু

ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্



ফাল্গুন—১৩৫০

দ্বিতীয় খণ্ড | একত্রিংশ বর্ষ | তৃতীয় সংখ্যা

উপনিষদের আলোচ্য বিষয়

শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় আই-সি-এস্

[উপনিষদের জ্ঞানের প্রতি আকর্ষণের গভীরতা—জ্ঞান দুই প্রকার—অপরা ও পরা—অপরা বিদ্যার অর্থ—পরাবিদ্যা বা দার্শনিকবিদ্যার স্বরূপ—তার প্রতি উপনিষদের বিশেষ আকর্ষণ—উদাহরণ—নাচিকেতার গল্প, মৈত্রেয়ীর গল্প। দর্শনের লক্ষণ—উপনিষদের আলোচ্য বিষয়—সৃষ্টির মূলতত্ত্ব অর্থাৎ ভূমা বা ব্রহ্ম বা আত্মন্। দার্শনিকতত্ত্বের শ্রেণী বিভাগ—বস্তুতত্ত্ব—সৃষ্টির ধারা ও সৃষ্টির রূপ ; জ্ঞানতত্ত্ব—জ্ঞানের উৎপত্তি, জ্ঞানের গঠন, জ্ঞানের পদ্ধতি। উপনিষদের আলোচিত সমস্যা বস্তুতত্ত্ব বিষয়ক—সৃষ্টির উৎপত্তির ধারা, বস্তুরূপ তত্ত্ববিষয়ক—সৃষ্টি বা ব্রহ্ম এক না বহু, সৃষ্টি চেতন না জড় ; জ্ঞান তত্ত্ববিষয়ক—ব্রহ্মকে জানবার উপায় কি। নৈতিক সমস্যা—মানুষের পরমার্থ]

আমাদের বিশেষ আলোচনার বিষয় হবে উপনিষদগুলির প্রধান আলোচ্য বিষয় কি ছিল, তাই সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করা।

উপনিষদের যুগের একটি প্রধান লক্ষ্য করবার বিষয় হল, সে যুগের চিন্তাশীল ব্যক্তির বিদ্যা আহরণের প্রতি সুনিবিড় আকর্ষণ। অবিদ্যার সংস্পর্শ এবং অজ্ঞানের অন্ধকার তাঁদের কাছে অতি ঘৃণার বস্তু ছিল এবং তাকে পরিবর্জ্জন করবার জন্য তাঁদের মানসিক সংকল্প ও সেই পরিমাণ গভীর ছিল। উপনিষদের যুগের ঋষির প্রার্থনায়, কথায়, উপদেশে, অবিদ্যার প্রতি এই সুগভীর বিরাগের অভিব্যক্তি আমরা যথেষ্ট পরিমাণে খুঁজে পেয়ে থাকি। উপনিষদের ঋষির প্রার্থনায় তাই আমরা পাই যে তিনি কামনা করছেন, অজ্ঞান অন্ধকার হতে তাঁকে যেন বিশ্বশক্তি পরিত্রাণ করেন।(১) এমন কি উপনয়নান্তে ব্রাহ্মণ যে সাবিত্রী মন্ত্র জপ করে থাকেন তারও মূল প্রার্থনা এই যে, সূর্য্য যেন আমাদের ধীশক্তি-যুক্ত করেন।(২) সেইরূপ যারা অবিদ্যায় রত, সত্য এবং বিদ্যার পথ ভ্রষ্ট, তাদের উপনিষদকার ঘৃণা করেন এবং তাঁদের জন্য পরলোকে ভীষণ শাস্তির ব্যবস্থা রাখেন। ঈশ উপনিষদ বলেন যে "যারা অবিদ্যার উপাসনা করে তারা গভীর অন্ধকারে প্রবেশ করে।"(৩) বৃহদারণ্যক উপনিষদ অন্ধকারে পাঠিয়েই তাদের ক্ষান্ত হন না, তাদের জন্য পরলোকে আরও ভয়াবহ শাস্তির বিধান করেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদ বলেন "যারা অপণ্ডিত এবং বিদ্যাহীন মানুষ তারা মৃত্যুর পরে সেই লোকেতে গমন করে—যার নাম অনন্দ এবং যা গভীর অন্ধকারে আবৃত।"(৪) শুধু তাই নয় বিদ্যাহীন মানুষের শক্তিলাভ সম্ভব নয়। ব্যবহারিক জগতেও ত বিদ্যাহীন ব্যক্তি আমল পায় না। ছান্দোগ্য উপনিষদ বলেন "বিদ্যা এবং অবিদ্যা বিভিন্ন জিনিষ। মানুষ যা বিদ্যার সাহায্যে এবং শ্রদ্ধা এবং উপনিষদের সাহায্যে করে তাই পুষ্ট হয়।"(৫)

(১) বৃহদারণ্যক—১।৩।২৮ 'তমসো মা জ্যোতির্গময়'

(২) সবিতুর্বরেণ্যংভর্গোদেবস্য ধীমহিধিয়ো য়োনঃ প্রচোদয়াৎ ॥ নারায়ণ ॥৩৫॥

(৩) ঈশ—৯ (৪) বৃহদারণ্যক—৪।৪।১১

(৫) নানা তুবিদ্যা চাবিদ্যা চ যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতি ১।১।১০

একপক্ষে যেমন অবিদ্যার সহিত তুলনায় বিদ্যার প্রতি পক্ষপাত তাঁদের বেশী, অপরপক্ষে নিছক সাধারণ বিদ্যালাভের থেকে, দার্শনিক বিদ্যালাভের প্রতিই তাঁদের আকর্ষণ ছিল সর্ব্বপ্রধান। বিদ্যাকে এই কারণে, তাঁরা দুই প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করতেন, এক ব্যবহারিক বিদ্যা এবং দুই পারমার্থিক বিদ্যা। তাঁরা অবশ্য তার যে বিশেষ নামকরণ করেছিলেন তা হল অপরা ও পরা বিদ্যা। এই সম্পর্কে মুণ্ডক উপনিষদে শিক্ষা সম্বন্ধে আমরা যে উপদেশ পাই তা উদ্ধৃত করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। মুণ্ডক বলেন (৬) "আমরা শুনেছি যে ব্রহ্মবিদরা বলে থাকেন দুই রকম বিদ্যা আমাদের জানা প্রয়োজন, পরা এবং অপরা বিদ্যা। অপরা বিদ্যা হল—ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ এবং জ্যোতিষ। আর পরা বিদ্যা হল তাই—যার দ্বারা সেই অক্ষরকে ব্রহ্মকে জানা যায়।" এই অপরা বিদ্যার ব্যাখ্যা এখানে আপাত দৃষ্টিতে যা মনে হয়, তা হতে অনেক ব্যাপক এবং সেইটাই আমাদের এখানে ভালরূপ হৃদয়ঙ্গম করা একটু প্রয়োজন হয়ে পড়ে। বেদের যুগে যত কিছু শিক্ষার বিষয় ছিল সেই সমস্ত বিষয়কেই ছয়টি শ্রেণীতে ভাগ করা হত। সেই ছয়টি শ্রেণী হল শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ এবং জ্যোতিষ। এই ছয়টি শিক্ষণীয় বিষয় ছাড়া যা বাকি রইল তা হল ধর্ম্মগ্রন্থগুলি অর্থাৎ চারখানি বেদ। কাজেই, অপরা বিদ্যার তালিকায় যে সকল গ্রন্থের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তারা ধর্ম্মগ্রন্থ এবং তখনকার জগতের যা কিছু বিষয় ব্যবহারিক গ্রন্থ বলে পরিগণিত হয়ে পড়্‌ত, এই সবকিছুই তার মধ্যে জড়িত হয়ে পড়েছে। সুতরাং ব্যবহারিক প্রয়োজনের গ্রন্থ এবং তথা ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থ, এই দুইই উপনিষদের ঋষির কাছে সমস্থানীয়। তারা উভয়েই নিকৃষ্ট। যে বিদ্যা তাদের থেকে শ্রেষ্ঠ, যা হল পরাবিদ্যা—তা তাদের থেকে ভিন্ন। পরম সত্য যা, পরমতথ্য যা, তার সন্ধান যা দেয় তাই হল পরাবিদ্যা। দার্শনিক বিদ্যাই পরাবিদ্যা, দার্শনিক বিদ্যাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যা। তাঁদের মতে পুণ্য অর্জ্জনের জন্য বা দেবতার কৃপা লাভ করবার আশায় যাগযজ্ঞের বর্ণনা করে যে গ্রন্থ তাও যেমন স্বার্থপ্রণোদিত, তেমনি ব্যাকরণ, ছন্দ, জ্যোতিষ ইত্যাদি বিষয় কেবল ব্যবহারিক জীবনে কাজে লাগে মাত্র। পরম সত্যের সন্ধানে যে বিদ্যা আত্মনিয়োগ করে সেই হল পরাবিদ্যা এবং উপনিষদের বিষয়ও হল এই পরাবিদ্যা আহরণ।

এই পরাবিদ্যার প্রতি আকর্ষণ তখনকার মানুষের মনে কতখানি গভীর এবং ব্যাপক ছিল, এ বিষয় একটু বিস্তারিত আলোচনার এখানে প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তখনকার মনীষীদের এই পরম সত্য সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণের আকুলতা কত যে তীব্র ছিল, তা ভাব্‌লে বিস্ময়ের অবধি থাকে না। শুধু তাই নয়, বালক বা নারী কেহই সে আকর্ষণের প্রভাব হতে বাদ পড়তেন না। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের মনেই পরম সত্যকে মান্‌বার জন্য ছিল অপরিসীম কৌতুহল এবং তা জানবার কোন সুযোগ পেলেই সে সুযোগ কেহ ছাড়তেন না। এমন কি রাজনৈতিক কার্য্যে ব্যাপৃত রাজাও এর প্রয়োজনীয়তা ষোল আনা অনুভব করতেন।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা বর্ণনা পাই যে বিদেহরাজ জনক এই দার্শনিক আলোচনার সুবিধার জন্য বহু পণ্ডিতকে আমন্ত্রণ করতেন এবং তাঁদের মধ্যে পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে পরস্পরের জ্ঞানের পরিমাপ সম্বন্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা লাগিয়ে দিতেন। যিনি জিত্‌তেন তিনি বহু গরু বা বহু অর্থের দ্বারা পুরস্কৃত হতেন। এই সব দার্শনিক তর্কে সর্ব্বত্রই যাজ্ঞবল্ক্য সকলকে হারিয়ে দিতেন। জনকের এই সমালোচনার উৎসাহ প্রদানের জন্য খ্যাতি বহুদূর প্রচার লাভ করেছিল। ফলে তিনি যে অন্য প্রতিবেশী রাজার ঈর্ষার বস্তু হয়েছিলেন তাই নয়, অন্য রাজাও এ বিষয় তাঁর অনুকরণ করেছিলেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথমেই আমরা পাই যে রাজা অজাতশত্রু ক্ষোভ প্রকাশ করে বলছেন, সব মানুষই জনক জনক বলে তার সভাতেই ছুটে চলে; তাই তিনি ব্যবস্থা করলেন যে দৃপ্তবালাকি নামে এক দার্শনিককে তাঁর ব্রহ্ম সম্বন্ধে ব্যাখ্যার জন্য এক সহস্র মুদ্রা দান করবেন। (৭)

এই পরাবিদ্যা আহরণের কৌতুহল সেকালে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই যে কত তীব্র ছিল, তা উপনিষদে বর্ণিত দু'টী গল্প দ্বারা পরিষ্কার বোঝা যায়। কাজেই গল্প দুটিকে এখানে সংক্ষেপে বলার লোভ সংবরণ করা গেল না।

কঠ উপনিষদে গল্প আছে যে উশন্‌এর নাচিকেতা নামে এক ছেলে ছিলেন। এই উশন্ ছিলেন ভারি দাতা। তিনি একবার কতকগুলি গরু দান করছিলেন। ছেলে নাচিকেতা বালকসুলভ কৌতুহলপরবশ হয়ে বাপ্‌কে প্রশ্ন করলেন 'তুমি আমায় কাকে দেবে।' পিতার উত্তর না পেয়ে, তিনি বার বার সেই প্রশ্ন করে তাঁকে বিরক্ত করলেন। ফলে এ ক্ষেত্রে যেমন হয়ে থাকে, বাপ রেগে বললেন, 'তোমায় যমকে দেব।' যেমন বলা ঘটলও তাই। ব্রাহ্মণের মুখের কথা কি ব্যর্থ হয়? ফলে নাচিকেতা গিয়ে উপস্থিত হলেন যমের বাড়ী; কিন্তু পিতার উপর অভিমান করেই বোধ হয় অন্ন জল কিছুই স্পর্শ করলেন না, তিনটি দিন উপবাসী রইলেন। বাড়ীতে ব্রাহ্মণের সন্তান তিন দিন অভুক্ত অবস্থায় যাপন করেছেন, অতিথি বৎসল যম কি করে আর তা সহ্য করেন। অগত্যা তিনি স্বয়ং অনুনয় করবার উদ্দেশ্যে নাচিকেতার কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। এমনি কাজ হল না বলে যম শেষকালে তাঁকে বর দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। এইখানেই আমাদের আসল বিষয়টি অবতারণা করবার সময় এসেছে।

এই প্রতিশ্রুতির সুযোগ নিয়ে নাচিকেতা বর চাইলেন এই: "এই যে মৃতব্যক্তির সম্বন্ধে মানুষের এই বিতর্ক—কেউ বলে সে থাকে, কেউ বলে থাকে না, এ বিষয় সত্য কি তুমি আমায় বলে দেবে।" (৮) যম কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তর দিতে বড় রাজী নন। বললেন—বিষয়টা বড় জটিল, বোঝা শক্ত হবে, অতএব অন্য প্রশ্ন কর। নাচিকেতা কিন্তু ছাড়্‌বার পাত্র নন, যুক্তি দেখাতেও ওস্তাদ। তাই তিনি উত্তর করলেন—"প্রশ্ন যে শক্ত সে কথা ত সত্য; কিন্তু সেইটাই ত হল বড় যুক্তি, এ প্রশ্নের উত্তর তোমার কাছেই আদায় করতে হবে। কারণ প্রথমত প্রশ্ন শক্ত এবং দ্বিতীয়ত এ প্রশ্নের উত্তর দিতে উপযুক্ততম ব্যক্তি হলে তুমি, তোমার ত এই নিয়েই কারবার। কাজেই প্রশ্ন আমার বদ্‌লাবে না এই প্রশ্নের উত্তর আমি তোমার কাছেই চাই।"

যম দেখ্‌লেন মহামুস্কিল! ছেলেটি যেমন বাচাল তেমনি বুদ্ধিতে অকাল পরিপক্ক; কাজেই তাকে বিরত করতে হলে অন্যপথ অবলম্বন করা প্রয়োজন। করলেনও তাই। তাকে নানা বস্তুর এবং নানা উপভোগের লোভ দেখিয়ে ভুলিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন। এখানে যমের লোভ দেখাবার বিস্তারিত নমুনা একটু দেওয়া প্রয়োজন হবে। তিনি বললেন—"শত বৎসর আয়ুযুক্ত পুত্রপৌত্র নাও, বহু পশু, হস্তী, অশ্ব, সুবর্ণ যত চাও নাও; বড় জমীদারী নাও, যত বছর খুসী বেঁচে থাকবার বর নাও। তাতেও যদি মন না খুসী হয়, পৃথিবীতে যা কিছু কামনা দুর্লভ তা একে একে নাম কর, আমি পুরণ করে দেব। এই যে স্বর্গের অপ্সরারা রয়েছে এদের মত বস্তু মানুষের লাভ করা অসম্ভব। এদেরই তুমি নিয়ে যাও আমি সঙ্গে পাঠিয়ে দিচ্ছি। শুধু দয়া করে এই প্রশ্নের উত্তর হতে আমাকে অব্যাহতি দাও।"

---

(৬) মুণ্ডক—১।১।৪—৫।

(৭) বৃহদারণ্যক—২।১।১।

(৮) কঠ ১।১।২০। যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে এতদ্বিদ্যামনুশিষ্ট স্ত্বয়াহং বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ ॥১॥

নাচিকেতা কিন্তু এই লোভনীয় বস্তুর তালিকা দেখে ভুললেন না, তাঁর সঙ্কল্প এবং তাঁর ইচ্ছা তেমনি অটল হয়ে রইল। তিনি যে উত্তর দিয়েছিলেন সেইটাই আমাদের এখানে বিশেষ প্রণিধানের বিষয়। তিনি বল্লেন "জীবন যত বড়ই হক তা সীমাবদ্ধ, নৃত্য গীত অশ্ব সবই তোমার থাক। ভোগ সুখের দ্বারা মানুষ কখনও তৃপ্তিলাভ করে না।"

মানুষের অন্তরের তৃপ্তি যে বাস্তব সুখ ভোগে নয়, বিদ্যা আহরণে, এর থেকে বড় সত্য কিছু নাই। মানুষের তৃপ্তি বিদ্যা আহরণে, সত্য আহরণে, কেবল নিছক ঐহিক ভোগ সুখে নয়। সত্য সন্ধানের প্রতি মানুষের আকর্ষণ মানুষের সহজ ধর্ম্ম স্বরূপ। ঠিক বল্‌তে গেলে এই নিয়েই ত মানুষের অন্য জীবদের সঙ্গে প্রভেদ। অন্য জীবদের সকল শক্তি ও সামর্থ্য কেবলমাত্র নিজের আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষা কার্য্যেই পর্য্যবসিত হয়। সে কাজ করতেও তাদের বুদ্ধির সাহায্য নিতে হয় না এতটুকু, তারা প্রবৃত্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েই বেশ সুশৃঙ্খলার সঙ্গে জীব জীবনের এই দুটি মৌলিক কাজ সম্পাদন করে। অর্থাৎ তাদের জীবন ধারণের জন্য যেটুকু বুদ্ধি ব্যবহারের বা চিন্তা-শক্তির প্রয়োজন, সেটা জীব বিশেষ সম্পাদন করে না, প্রকৃতি দেবীই তাদের হয়ে সে চিন্তার ভার গ্রহণ করেন এবং তাই হ'ল জীবদের অন্তরে নিহিত প্রবৃত্তি-সমুদয়। (৯)

মানুষের বিষয় কিন্তু ব্যবস্থা স্বতন্ত্র। যে শক্তি বিশ্বের নাটমঞ্চে মানুষকে স্থাপন করেছেন, তিনি মানুষের ভাবনার বোঝা নিজের স্কন্ধে বহন কর্‌তে চান নি, তাঁর ব্যবস্থা হ'ল এই যে নিজের চিন্তা মানুষ নিজেই সেরে নেবে। ফলে অন্য জীবের জন্য প্রকৃতি করে দিলেন লোমশ বা তৎস্থানীয় অন্য জিনিষের পোষাক, কিন্তু মানুষের রইল রোমহীন দেহ। আত্মরক্ষার জন্য অন্য প্রাণীর কোন কিছু একটা ব্যবস্থা হলই, কেউ পেলে নখ, কেউ দাঁত, কেউ বা শিঙ—আর যে তার কোনটাই পেল না, সে পেল অন্তত ক্ষিপ্রগতি কিম্বা নিজেকে গোপন রাখ্‌বার একটা কিছু উপায়। কিন্তু মানুষের ভাগ্যে জুট্‌ল না একেবারে কিছুই। এর ইঙ্গিতই হল এই যে—মানুষ বুদ্ধি খাটিয়ে নিজেই নিজের আত্মরক্ষার বা আক্রমণের উপায় উদ্ভব করে নেবে। এইরূপে সামান্য জীবন ধারণের মৌলিক অভাবগুলি দূর কর্‌বার জন্যই, তার বুদ্ধিশক্তির যখন প্রয়োগের প্রয়োজন হয়ে পড়্‌ল, তখনই সত্য বল্‌তে কি, তার ভাগ্যোদয়ের সূচনা হ'ল। মানুষের বুদ্ধি নিজের প্রয়োগের এই বিস্তারিত ক্ষেত্র পাওয়ার ফলে তার দিন দিন তীক্ষ্ণতা বৃদ্ধি পেল। ফলে সে শক্তি একদিন এমন বিকাশ লাভ কর্‌ল, যে কেবল মাত্র নিছক জীবন ধারণের প্রয়োজনেই নিজেকে ব্যবহার করে তা তৃপ্তি বোধ কর্‌ত না। জীবনের যুদ্ধে অন্য জীবের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যেমনি মানুষ নিজেকে একটু নিরাপদ এবং শান্তির আবেষ্টনীর মধ্যে স্থাপন কর্‌বার সুযোগ পেল, অমনি সেই ধী শক্তি তার নব নব পথে নিজের পূর্ণতর বিকাশ খুঁজে বেড়াতে লাগ্‌ল। এই ভাবেই দার্শনিক জ্ঞান পিপাসা মানুষের মনে প্রথম জাগ্‌তে সুরু করেছিল।

এই যে পারিপার্শ্বিক বস্তু সন্দর্শনে বিস্ময় এবং কৌতুহল এবং তাদের মধ্যে যে অন্তর্নিহিত শক্তির লীলা চলেছে তার স্বরূপ জান্‌বার প্রয়াস, এ মানুষের অতি স্বাভাবিক বৃত্তি। এ বৃত্তির মূল চলে গেছে তার সত্তার অন্তরতম দেশ পর্য্যন্ত। তা যে মানুষের মধ্যে কত গভীর এবং কত শক্তি-সম্পন্ন, তা যে কোন শিশুর আচরণ পর্য্যবেক্ষণ কর্‌লেই আমরা সহজে হৃদয়ঙ্গম কর্‌তে সমর্থ হব। যে কোন শিশুই একটু বুঝবার বা দেখ্‌বার ক্ষমতা হলেই, তার পিতা মাতা বা অন্য সমস্থানীয় আত্মীয়দের, পারি-পার্শ্বিক নানা বিষয় সম্বন্ধে, নানা প্রশ্নে, ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। এটা কি জন্য হয়, ওটা কেন হয়, ইত্যাদি সহস্র প্রশ্ন তার কৌতুহলী মনে সদাসর্ব্বদা জাগে। কৌতুহল এবং জিজ্ঞাসা শিশুরও স্বাভাবিক ধর্ম্ম। অন্য বিভিন্ন উদ্দেশ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। কেবল জানা নিয়ে তার কথা, জ্ঞান সঞ্চয় হলেই তার পরিসমাপ্তি, কোন পরোক্ষ উদ্দেশ্য তার পেছনে নিহিত নাই।

শিশুর সম্বন্ধে সে কথা খাটে, বয়স্ক মানুষ সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে। বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক যখন তত্ত্বজ্ঞানের উদ্দেশ্যে সাধনা করেন তখন তাঁরা নিছক জ্ঞান আহরণ ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন না। জ্ঞান পিপাসা চরিতার্থ করাই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে। আধুনিক কালে বাস্তব জগতে অনেক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার আমাদের বাস্তব জীবনে বহু সুখ সুবিধার খোরাক জুগিয়েছে। যেমন রেল, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, বেতারবার্ত্তা ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সব দেখ্‌লে আপাত দৃষ্টিতে একটা ধারণা জন্মাতে পারে এই যে ব্যবহারিক জগতের সুখ সুবিধার প্রয়োজনের খাতিরেই বৈজ্ঞানিক এই সকল আবিষ্কারে মনোনিবেশ করেছেন। কিন্তু আদৌ তা সত্য নয়। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করেছেন তাঁর জ্ঞান পিপাসা চরিতার্থ কর্‌বার জন্যই। পরে গৌণ ভাবে সেই আবিষ্কার বা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে ভিত্তি করেই নানা বাস্তব যন্ত্রাদির উদ্ভব হয়েছে, মানুষের সুবিধা বিধানের জন্য। যন্ত্রাদি উদ্ভব ও বৈজ্ঞানিক তথ্য আহরণ দুটি বিভিন্ন জিনিষ। প্রথমটির নিয়ন্ত্রণ শক্তি নিশ্চিতই মানুষের ব্যবহারিক সুবিধা, কিন্তু দ্বিতীয়টির নিয়ন্ত্রণ শক্তি সম্পূর্ণরূপে মানুষের অন্তর্নিহিত জ্ঞানপিপাসা মাত্র। ষ্টিফেন যখন আবিষ্কার কর্‌লেন যে জল বাষ্পের আকারে পরিণত হলে তা নিজের সম্প্রসারণ সাধনের চেষ্টায় বিপুল শক্তি সঞ্চয় করে, তখন তিনি কেবল-মাত্র তাঁর জ্ঞান পিপাসা চরিতার্থ করেছিলেন। বাষ্পের এই শক্তিকে ভিত্তি করে যখন তাকে নিয়ন্ত্রণ করে কাজে লাগাবার চেষ্টায় যন্ত্র উদ্ভাবনের চেষ্টা হল, তখনই আমরা পেলাম বাষ্পের ইঞ্জিন এবং তারই ফলে পেলাম নানা সরবরাহ ও কলকারখানার শক্তি সঞ্চারী যন্ত্রাদি।

সুতরাং নাচিকেতা যখন যমকে বল্‌লেন যে নিছক পার্থিব ভোগসুখে মানুষ পরিতৃপ্তি আহরণ করতে পারে না, তার জ্ঞান পিপাসা চরিতার্থ না হলে তার তৃপ্তি নাই, তখন তিনি মানুষের এই স্বভাবজ ধর্ম্মের কথাই বলেছিলেন। বুদ্ধি শক্তির বিকাশ সাধন এবং তার সাহায্যে সত্য আহরণ—এই হল মানুষের সহজ ধর্ম্ম। একেই উপনিষদ সব থেকে বড় ধর্ম্ম বলে সর্ব্বত্র স্বীকার করে নিয়েছেন। ঠিক সেই কারণেই আবার উপনিষদের ঋষির কাছে, পরাবিদ্যা অপেক্ষা অপরা বিদ্যা আহরণের আকর্ষণ বেশী। ব্যবহারিক জগতে যে সকল বিদ্যা কাজে লাগে, মোটামুটি তাই পরাবিদ্যা। সেখানে সত্য বল্‌তে গেলে বলা উচিত, নিছক বিদ্যা আহরণের উদ্দেশ্যেই বিদ্যা আহরণ হয় না। সেখানে ঘটনাচক্রে বিদ্যা আহরণ হয়ে পড়ে গৌণ জিনিষ এবং দৈনন্দিন জীবনে তার ব্যবহারই হয়ে পড়ে মুখ্য জিনিষ। পরাবিদ্যা সম্বন্ধে কিন্তু এ কথা একেবারেই খাটে না। সে বিদ্যা আহরণে মানুষের ব্যবহারিক জীবনে কোন সুখ সুবিধাই নাই। সেখানে বিদ্যান্বেষীর তৃপ্তি পরাবিদ্যা আহরণেই পর্য্যবসিত হয়। নিছক জ্ঞান লাভের জন্যই যে জ্ঞান পিপাসার আদর্শ, সে আদর্শ এই পরাবিদ্যাতেই সম্পূর্ণ তৃপ্তি পায়।

এইবার আমাদের দ্বিতীয় গল্পটি বল্‌বার সুযোগ হয়েছে। এই গল্পটি আরও সংক্ষিপ্ত—তবে তার অন্তর্নিহিত নীতি একই।

যাজ্ঞবল্ক্যের দুই পত্নী ছিলেন মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী। (১০) দার্শনিক হিসাবে এই যাজ্ঞবল্ক্যের খ্যাতি ছিল সুদূরপ্রসারী। বাস্তবিক বল্‌তে কি উপনিষদের যুগে তাঁর মত নামকরা দ্বিতীয় দার্শনিক আর খুঁজে পাওয়া

(৯) অপি সর্ব্বং জীবিতমল্পমেব তবৈব বাহাস্তব নৃত্যগীতে॥ নহি বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ॥ কঠ॥১।১।২৬-২৭॥

(১০) বৃহদারণ্যক উপনিষদ—দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণ এবং চতুর্থ অধ্যায়ের পঞ্চম ব্রাহ্মণ দ্রষ্টব্য।

যায় না। তিনি ঠিক করলেন যে তিনি প্রব্রজিত হবেন। সেই কারণে তাঁর স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে ডেকে বললেন যে তিনি প্রব্রজন করবেন ঠিক করেছেন, অতএব তাঁর যা সম্পত্তি আছে তা তাঁর দুই স্ত্রীর মধ্যে বিভাগ করে দিয়ে যেতে চান। এদিকে মৈত্রেয়ী ছিলেন বাস্তব জীবনে উদাসীন এবং পরাবিদ্যায় আসক্ত। তাই তিনি যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করলেন—যদি এই সমগ্র পৃথিবী বিত্তে পরিপূর্ণ হয়ে আমার হত, তা হলে কি আমি অমৃতা হতাম? তিনি উত্তর দিলেন যে তা কখনই হয় না, বিত্তের দ্বারা অমৃতত্বের আশা আদৌ নাই। তখন মৈত্রেয়ী যে দৃপ্ত বাক্যটি বলেছিলেন সেই উক্তিটিই আমাদের বিশেষ আলোচনার বিষয়। তিনি বললেন—"যা পেয়ে আমি অমৃতা হব না, তা নিয়ে আমি কি করব? আপনি যা জানেন তাই আমাকে বলে যান।" (১১) তা শুনে যাজ্ঞবল্ক্য অত্যন্ত প্রীত হলেন এবং মোটামুটি তাঁর যা দার্শনিক মত তাই তাঁকে সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিলেন। সে বিষয় আমরা যথাস্থানে আলোচনা করব। মোটামুটি এখানেও আমরা সেই নাচিকেতার বাণীর সমর্থন পাই। মৈত্রেয়ীর মত সংসারবাসিনী নারী ও মানুষের তৃপ্তি পার্থিব ভোগ বিলাসে নয়, পরাবিদ্যা আহরণে, এ তথ্য হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন এবং সেই কারণেই যাজ্ঞবল্ক্যের কাছে প্রিয়বাদিনী বলে পরিগণিত হয়েছিলেন।

এই দুটি সুন্দর গল্প হতে আমরা সহজেই ধারণা করে নিতে পারি যে সেকালে পরাবিদ্যার আদর কত বেশী ছিল। পার্থিব ভোগ বিলাসের মোহ, ব্যবহারিক জগতে যা কাজে লাগে এমন বিদ্যার আকর্ষণ, এমন কি যাগ যজ্ঞ ইত্যাদি ধর্ম্ম বিষয়ক ব্যাপারের দাবীও সেকালের মানুষ সম্পূর্ণরূপে বিনা দ্বিধায় প্রত্যাখ্যান করতেন পরাবিদ্যাকে বরণ করে নেবার জন্য। নিছক জ্ঞান লাভের জন্যই জ্ঞান লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রবল ছিল। যে জ্ঞান কোন ব্যবহারিক কাজে লাগে না, যে জ্ঞান সৃষ্টির মৌলিক বিষয়গুলিকে নিয়ে যে রহস্য আমাদের মনে ধাঁধা লাগায় তার উচ্ছেদ সাধন করবে, সেই জ্ঞানই তাঁদের কাছে বরণীয়তম ছিল।

এখন তাহলে আমরা মোটামুটি এই ধারণা করতে সমর্থ হয়েছি যে পরাবিদ্যাই উপনিষদের মূল এবং একমাত্র আলোচনার বিষয়। এই পরাবিদ্যা অর্থে আমরা যাকে আজকাল দার্শনিক বিদ্যা বুঝি সাধারণ ভাবে তাই বোঝায়। সমগ্র বিশ্বের যা মূলগত বস্তু তার আলোচনা করা, তার স্বরূপ কি, তার সৃষ্টি হয় কিরূপে ইত্যাদি বিষয়ই হল দর্শনের সাধারণ আলোচনার বিষয়। পরাবিদ্যার অর্থও তাই। সৃষ্টির মৌলিক বিষয়গুলিকে নিয়ে আলোচনা এবং তাদের সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহই হ'ল পরাবিদ্যা সঞ্চয় করা। ক্রমশঃ

(১১) যেনাহং না মৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং—যদেব ভগবান্ বেদ তদেব মে বিব্রূহীতি ॥৪।৫।৪ বৃহদারণ্যক

খতেন্

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সেদিন আর এদিন।

আজ দুর্গাপঞ্চমী। সান্ধ্য-জ্যোৎস্না সেটা জানিয়ে দিলে। বোধহয় পূর্ব্বসংস্কার। প্রতি মাসেই পঞ্চমী তো আসে, কিন্তু ওকথা তো মনে আসেনা! বাল্যের দেখা সে ধারণাটি জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে, আজিও মুছে যায়নি।

তখন সত্যই যেন আনন্দময়ী আসতেন। আমরা ন-দশ বছরের ছেলে। সাথীরা এসেছে, এ-ওর পোষাক্ দেখা চলেছে। সে কি আনন্দ! তখন পূজোর কাপড়ই ছিল। নামটা পোষাক্ হলেও—পোষাক্ বলে কিছু ছিলনা। এখনকার হাফ্-প্যান্ট পরা ছেলেরা তা ছোঁবেনা। আট-পউরে নয় বলেই, তাকে পোষাক্ বলা হোতো। একখানা কোর্-মাখানো কালাপেড়ে, তার উপর তখনকার জামদানের উড়্নি, পায়ে একজোড়া বারো আনা থেকে আঠারো আনার জুতো—সামনেটা লাল রং করা চামড়া, মাঝখানে রবার দেওয়া। পূজার বেশের মধ্যে প্রধান ছিলো এরাই। অধিকন্তু একখানা করে রুমাল পেতুম। নতুন হিম—মাথায় বাঁধবার জন্যেই হবে; আর ক্ষুদে শিশিতে একটু করে' আতর। চুল আঁচড়াবার বালাই ছিলনা। মায়ের ইচ্ছা থাকলেও চুল আঁচড়ে সিঁতে কেটে দিতেন না; বোধহয় কর্ত্তাদের ভয়ে। এখন ও কাজটি ছ'মাসের ছেলে থেকেই আরম্ভ করা হয়। ছেলে হাঁটতে শিখলে চুল আঁচড়ে সিঁতে না কেটে, বাইরে বেরুতেই দেননা। আমি তকাৎটার কথাই বলছি।

সেই পোষাকেই আমরা এ-বাড়ি ও-বাড়ি প্রতিমা দেখে বেড়াতুম। দশবার জুতো মোছা চলতো, বার্নিস্ ঝক্ ঝক্ করে' উঠতো—মনটাও তার সঙ্গে। যেন কোন্ স্বর্গে পৌচেছি। ছুটি বোঁদে কি একখানা গজা মিললেই দিল্লীর বাদশা!

সহরতলীর ক্ষুদ্র গ্রাম হলে কি হয়, প্রতিমা তো দু'এক বাড়িতে নয়, অন্ততঃ দশ বাড়িতে। সব সেরে জ্যোৎস্না ডোবার আগেই ফেরা চাই। গ্রাম্য পথ, গাছপালার ছায়া পথে এসে পড়েছে নানা বিকট রূপ ধরে। কোনোটা হাত বাড়িয়ে, কোনোটা পা ফাঁক করে', কোনোটা মাথা নাড়ছে, কোনোটা হাঁ করছে। ছ'সাত জন সঙ্গ বেঁধে আছি, সকলেরি পরস্পরের ভরসা।

এ কথাটি উল্লেখ করবার কারণ আছে। তখনকার সহরতলীর ছেলেরা অধিকাংশই ভীতু ছিল। মা-বাপের নানা নিষেধের কারণেই হোক, বা কথায় কথায় উদাহরণসহ ভয় দেখিয়ে রাখবার কারণেই হোক্। যেমন বাঁড়ুয্যে পাড়ার ঐ রাস্তায়—ঐ চালাঘরে পরাণে ঘরামী গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল। এই সেদিনও তাকে ঐ তাল গাছটায় ১৬ হাত লম্বা হয়ে ঝুলতে—বিশু চাটুয্যে দেখেছিলেন—চেঁচিয়ে উঠে 'ভিরমি' যান। আর ঐ রায়েদের পুকুরে কোমোরদের বিলিসী ডুবে মরে। গত কালী পূজোর রাতে হিমে কামার পাঁটা কেটে খাঁড়া হাতে করে বাড়ি ফিরছিল, ঐ পুকুরধার দিয়ে। চেয়ে ছাখে বিলিসী দাঁড়িয়ে—হাতের খাঁড়াখানা ফেলে দিতে বলছে।

হিমে কামার সাহসী যুবা। বিলিসীর লম্বা কঙ্কাল মূর্ত্তি দেখে, সেও ভয় খেয়ে এক দৌড়ে বাড়িতে এসেই পড়ে অজ্ঞান হয়ে যায়। খাঁড়া হাতে ছিল তাই বেঁচে গিয়েছিল। বিলিসির হাত দুটো লম্বা হয়ে তার গলার কাছ পর্য্যন্ত এসেছিল। রাতে হিমে কামার আর কোনোদিন ও-পথ মাড়ায়নি—ইত্যাদি। কর্ত্তারা এই সব গল্প শুনিয়ে আমাদের সকল পথই যমের বাড়ির পথ বানিয়ে রেখেছিলেন। বড় হয়েও সে সব গল্পের প্রভাব মন থেকে মুছে যায়নি। মনে মনে "রাম রাম" আসে।

এইসব ও আরো অনেক কারণে আমরা জন্মভীরু থেকে যেতুম। জ্ঞানের দ্বারা তাদের মিথ্যা বলে বুঝলেও "সাবধানের বিনাশ নাই" বলে' জ্ঞানটি সঙ্গে থাকতো। যাক্।

(২)

পরে কিশোর অবস্থার প্রারম্ভের দুরবস্থাও বড় কম ছিলনা। তখন কেহ পাঠশালে, কেহ বঙ্গ বিদ্যালয়ে। এখনকার মতে অভব্যবেশী, কর্কশভাষী, উরুতের ওপর কাপড় গোটানো, প্রায়ই ধৈর্য্যহীন কদর্য্য মূর্ত্তি গুরুমহাশয়ের হাতে আমরা সমর্পিত হতাম। পাঠশালা ছিল আমাদের বন্দীশালা। কথায় কথায় সাজাই ছিল কত প্রকারের। তার বর্ণনা শোনবার জন্যে কর্ণ না উৎসুক হওয়াই ভাল।

গুরুমহাশয়দের জন্মাতে ছেলেরা কেউ দেখেনি। অনুমান করতে বাধা নাই—সম্ভবতঃ তারা বেত্রহস্তে ভূমিষ্ঠ হতেন। তাঁদের বেত্রবিহীন মূর্ত্তি ছেলেরা কখনো ভাবতেই পারেনা।

বঙ্গবিদ্যালয়ে তাঁদেরই পেয়ারীচরণ-পড়া, অপেক্ষাকৃত ভদ্র সংস্করণ মিলতো এবং শাসন কর্ম্মে তাঁদের মধ্যেও দুঃশাসনের আত্মীয় মিলতো। তাড়ন ও পীড়নই ছিল ছেলেদের মানুষ করবার প্রধান উপায়। ছাত্রবৃত্তি পাশ করার পর তারা নিষ্কৃতি পেত'।

* * * *

এইবার আসল বিদ্যার আরম্ভ অর্থাৎ 'কুঠীর' কেরাণী বানাবার বিদ্যা। এতদিনে বাঁদরেরা বাপের আদরের একটু আস্বাদ পেলে। বাপ বলতেন—"জানি অতুল বেস্পতিবারে জন্মেছে, শিবু আচায্যি ওর কুষ্ঠী করেই বলেছিল—ও গুষ্টির তিলক হবে।" ইত্যাদি।

মা-বাপের বা কর্ত্তাদের এত খুশি হবার আসল কথাটা পরে বুঝেছিলুম—সেটী বিদ্যালাভের জন্যে নয়, ঐ সঙ্গে চাকরি লাভের পথ খুলছে বলে বা কাছিয়ে আসছে বলে।

এটী সকল বাপ মার কাছেই স্বাভাবিক ও পরম প্রার্থনীয় ছিল—আজো আছে। ছেলে পণ্ডিত হয়ে বিদ্যের বাহাদুরি নিয়ে বসে বসে নানা ভাষার শ্লোক শুনিয়ে quotation ঝেড়ে লোককে কেবল "হোটেসন্" দেখাবে না হটিয়ে দেবে এই উদ্দেশ্য নিয়ে তো লেখাপড়া শেখা নয়। তার চেয়ে মুক্খু ছেলে গো-সেবা করবে, বাজার করবে, মাছ ধরবে—সেও ভালো। লেখাপড়া শিখে ছেলে সাহেবদের চাকরি করবে, তার বাড়া বড় আদিখ্যেতা বা গর্ব্ব আর ছিলনা। এই লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্যের কথা কারো মাথায় আসতো না। ওটা ছোট কাজের বা অসম্ভ্রমের কাজের মধ্যে পড়ে যেতে সুরু হ'য়েছিল। কেউ কোন দিন ভাবতেন না—সাহেব জাতটি কি করে বড় হয়েছে।

দেশ সুদ্ধু লোকের তখন সাহেবের চাকরির ঝোঁক পেয়ে বসেছে। খাসা বাবু-সেজে চাপকান ঝুলিয়ে, পান চিবিয়ে কাজ! গোণা টাকা হলে কি হয়—বাজারে না উঠতেই কেরাণীদের বাড়ি—কপি কড়াইসুঁটি সর্ব্বাগ্রে দেখা দেয়!

* * * *

তরুণ বয়সটা এলজ্যেবরার ফরমূলা ভেঁজে আর জিওমেট্রির সার্কল্ আর দাঁড়ি টেনেই কেটে গেল। 'এনট্রেন্স' পাশ করে'—হয়ে' দিন কতক চেন্তামেরে বেড়ালো, শিবে যেন নিবে গেল। বললে—"বাবা না মলে সুখ নেই! বলছেন—কলকেতায় কলেজ খুলেছে, নলেজ' বাড়িয়ে নে। দু'বেলা ৬।৭ মাইল হাঁটা বইত' নয়। আমরা খাজনা সাধতে হাসতে হাসতে সাত কোস গিছি এসেছি! সেটা তোদের এখনকার কমলালেবুর কোস ছিলনা, বাতাবি নেবুর বিচিভরা বিশুদে কোস, চক্রহারে টক্কোর খাওয়াতো—বুঝলি?—তিনি আমাকে সোনার মাদুলী পরাতে চান, সবটাই সুতো বা হাঁটুনি, আদ ইঞ্চি গালা-ভরা সোনা অর্থাৎ বই পড়া। বাড়ি ফিরে 'হেলে-গরুর' অবস্থা! পড়বে কে!"

শেষ কেউ ভবানীপুরে, কেউ চোরবাগানে পিসিমাসির বাড়িতে থেকে 'নলেজ' বাড়ায়।

তরুণ থেকে যৌবনের প্রারম্ভটাই হ'চ্ছে উৎসাহ, আনন্দের সময়। নিজেদের বা দেশের যা কিছু তা চেনবার বা উপভোগ করবার অবসর। দেশের বা গ্রামের যা কিছু, তার পরিচয় তখন থেকেই সবাই পেয়ে থাকে, আর সেইটাই হয় তাদের জীবনের পুঁজি, সারা জীবনে যা ভুলতে পারেনা। কাদের কোন্ কুলগাছটির কুল মিষ্টি তা আজো সে বলে দিতে পারে। কর্ম্ম-জীবনের ব্যস্ততাপূর্ণ দেখা শোনা বড় স্থায়ী হয়না;—অবশ্য সাংসারিক দুর্ঘটনা, বিরোধ প্রভৃতি ছাড়া।

(৩)

তখন ছেলেদের আনন্দ উপভোগের প্রধান "আইটেম্" ছিল যাত্রা শোনা। এখনকার থিয়েটার সিনেমাদি দেখার মত—সব সুখ-সুবিধা বজায় রেখে সে কাজ হ'ত না।—সারারাত জেগেই যাত্রা শোনা হোতো। পালা থাকতো পৌরাণিক—রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত বিষয়ক। উল্লেখযোগ্য ব্যতিরেকের মধ্যে ছিল কেবল "বিদ্যাসুন্দর"। কামিনীকুমার, বিজয়-বসন্ত, শ্রীমন্ত-সওদাগর—বেহুলার কথাও থাকত'। ছেলেরা তা একাগ্রে শুনতো। আমি পশ্চিমবঙ্গের কথাই বলছি। সব কথা খুঁটিয়ে বলা সম্ভবও নয়। কবির গান, হাফ্‌আখড়াই ক্রমে তখন ভাঁটার মুখে পড়েছে। কখনো কদাচ কলকেতার মল্লিক কি বোসেদের বাড়ি—শেষ দেখা দিয়ে ছিল। শিক্ষিত ভদ্রদের মধ্যেই তখন কবির (চাপান, উতোর) গান-বাঁধিয়ে দেখা দিয়েছিল। তার মধ্যে আমরা কেবল ৺মনোমোহন বসু আর কালী কাব্য-বিশারদকেই দেখেছি। ধনতায় জনতায় ব্যাপারটি বহু ব্যয়সাধ্য ছিল। সে সমারোহ সিনেমা-দর্শকদের স্বপ্নের বস্তু।

তরজা শোনার আনন্দ ছিল বটে কিন্তু সবটা শোনা হ'ত না। তার শেষটা (খেউড় বিভাগ), শিক্ষিতদের বা ভদ্রদের রুচি-বিরুদ্ধ ছিল,—ইতর সাধারণেই শুনতো। সেই সব নিরক্ষর গ্রাম্য তরজাওয়ালাদের সুপ্ত প্রতিভা কম ছিল না।

আর ছিল—কথকতা ও চণ্ডীর গান। বিখ্যাত ধরণীধর কথকের কথা ও জগা সেকরার চণ্ডীর গান শুনতে স্ত্রীপুরুষ ভেঙে পড়তো।

আমরা 'নলেজি' বা কলেজি শিক্ষায় দেশকে পাই নি। নিজের দেশের, দেশের জাতের ও ধাতের পরিচয়ও কিছু পাই নি। পেয়েছিলুম যাত্রায় ও কথকতায়। নিরক্ষর চাষীরা ও শ্রমিকেরা দেশকে ও নিজেদের জেনেছিল তারি মধ্য দিয়ে। সেই তাদের মানুষ করেছে, দেশকে চিনিয়েছে। তার প্রভাবই জীবন গঠন করে দিয়েছে। সহরে শিক্ষিতদের মধ্যে সুভব্য 'সমাজাদি' দেখা

দিতে আরম্ভ করলেও তার প্রভাব নষ্ট করতে পারে নি। ফল কথা, বই না পড়েও পুরাণাদির কথা তখন মেয়েপুরুষের এক প্রকার আয়ত্ব হয়ে যেত—ইতর ভদ্রের।

সহরে তখন সখের থিয়েটারের এবং 'অপেরার' সাড়া পড়ে গেছে, গ্রামে ঢোকেনি। আমাদের নাগালের বাইরেই ছিল। ভাগ্যে ঘটে গেল। গ্রামের কোনো বিশিষ্ট ধনীর বাড়ি কোজাগর লক্ষ্মীপূজার রাত্রে পাইকপাড়ার শিক্ষিত ভদ্র যুবকদের দ্বারা "মেঘনাদ বধ" অপেরা সেই প্রথম দেখি। তার সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, প্রভাব আমাদের মুগ্ধ করে যায়। সে পোযাক-পরিচ্ছদ, সাজ-গোছ, কায়দা-কানুন, গতিবিধি ও এক্‌টিং আজো যেন চখের সামনে রয়েছে। মেঘনাদের রূপ, অভিনয়, কণ্ঠ যেন সত্যকার মেঘনাদকে দেখিয়ে যায়। এটি আমাদের কেবল প্রথম দর্শনের মোহ নয়। তার পর বড়দের দলভুক্ত হয়ে অনেক কিছুই দেখা হয়েছে, কিন্তু সে মেঘনাদ আমাদের কাছে মেঘনাদই রয়ে গেছেন। তবে গিরীশ ঘোষ, অমৃত বোস, অর্দ্ধেন্দু মুস্তফী, বাংলার পাব্‌লিক ষ্টেজের জন্মদাতা ও অভিনয়ের অনবদ্য শিল্পীরূপে চিরদিন আমাদের শ্রদ্ধার ও গর্ব্বের বস্তু হয়ে থাকবেন—তাঁদের কথা স্বতন্ত্র। তাঁরাই এই আনন্দ প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠাতা ও প্রতিষ্ঠাতা। তাঁদের পরেই অমর দত্ত ও শিশির ভাদুড়ী ম'শায়ের আসন। এর সঙ্গে ঠাকুরবাড়ির কথা মেশালুম না। তবে তাঁদের মাঘোৎসবের কথা না বলেও থাকতে পারি না। সে সুভব্য সমারোহ ক্ষেত্রে যুবক রবীন্দ্রনাথের গান শোনবার জন্যে কত চেষ্টা, কত কষ্ট-স্বীকারই আমাদের ছিল।

আর ছিল নবগোপাল ঘোষের "মোহনমেলা" বা স্বদেশী মেলা। ছেলেদের স্বাস্থ্য বা শরীর চর্চ্চার জন্য জিমনাষ্টিক, সার্কাস্, মায় প্রতিযোগিতায় 'বাচ্' খেলা ছিল। তাতে উপহারের ব্যবস্থাও ছিল—নিশান, মেডেল প্রভৃতি। এইভাবে স্বদেশীর প্রতি অন্তঃশীলা আকর্ষণের প্রথম প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়। ছেলেদের উৎসাহ ছিল আমোদে বা নূতনের নেশায়। গঙ্গার দুধারে পাঁচ ছয় ক্রোশের মধ্যে গ্রামের ছেলেরাও সে বাচ্ খেলায় যোগ দিত। এ ব্যয়সাধ্য ব্যাপার বেশীদিন স্থায়ী হয় নি। নবগোপালবাবুর সখ কিন্তু ফুরোয়নি, তিনি শেষ পর্য্যন্ত যথাসাধ্য করেছিলেন—সর্ব্বস্বান্ত হয়েও।

ছেলেদের আনন্দ পাবার আর একটি স্থান ছিল—রাজা নরশিংয়ের বাগান। চার পাঁচ মাইল হেঁটে আমরা দেখতে যেতুম। সেইখানেই আমরা সেই প্রথম বাঘ, হায়না, অজগর প্রভৃতি দেখতে পাই, গোলোক ধাঁধাতেও ঢোকা হয়। দর্শন, শিক্ষা, আনন্দ যথেষ্ট উপভোগ করি। আমাদের নাগালের মধ্যে আর বেশী কিছু ছিল না। খেলার মধ্যে—বাল্যে ঘুড়ি ওড়ানো, হাডুডুডু, মুনকোট, ধাপ্‌সা। ক্রমে জিমনাষ্টিক এসে পৌঁছয়। ফুটবলের নামও শুনিনি। গঙ্গাতীরে গ্রাম,—সাঁতার কাটাটা খেলার মধ্যেই ছিল, এক্‌সারসাইজ্ বলে কেউ সাঁতার দিত না। এখন ছেলে সাঁতার দেয়—তিন রাত তিন দিন জল থেকে ওঠে না। বাপ দাঁড়িয়ে দেখেন, মাদুর্গার কাছে বোধকরি প্রার্থনা করেন—ছেলে যেন জয়ী হয়;—জোড়া পাঁঠা মানসিক চলে। আশায় বুক দশ হাত্ হয়। ছেলের যখন টাইফয়েড্ হয়েছিল, ডাক্তার জোটেনি, এখন দু'জন ডাক্তার হামেহাল—নাড়ী পরীক্ষা চলছে। সঙ্গে নৌকায় কমলালেবু, আঙুর, ব্রাণ্ডি ঘুরছে—তোয়াজ কতো! অক্সিজেনও বোধহয় রাখতে হয়। ছেলে যেন মড়া ভাসছে। সায়েন্টিফিক্ শিল্প!

সঙ্গীত বিদ্যা—যা সাধনাসাপেক্ষ ও শ্রেষ্ঠ রসশিল্প, আনন্দ থেকে যার উৎপত্তি, যা নিজেকে ও অন্যকে আনন্দ দেয়—ছেলেদের জন্যে সেটি ছিল অস্পৃশ্য। কোনো ছেলের কণ্ঠ হ'তে—অন্যমনস্ক অবস্থায় গুণগুণ শব্দ বেরিয়ে পড়লে ও কর্ত্তারা তা শুনে ফেললে, সে ছেলের আশা ভরসা আর কেউ রাখতেন না। তাতে এত বড় অপরাধ ছিল। তাতে সুরজ্ঞ ছেলের ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা হয়ে যেত "গোল্লা" বলে' এক অজানা স্থানে নির্ব্বাসনের, অর্থাৎ, "ও ছেলে গোল্লায় যাবে!"

যাক্ আমাদের আমোদ প্রমোদের পালা আগেই বলেছি—সেই পর্য্যন্তই শেষ। পুতুলনাচ্ দেখাটাও ছিল। তা'তে একটা দেড়ে লোক এসে কেবল হাঁ করতো আর বলতো "পয়সা খাবো—পয়সা খাবো।" এবারকার দুর্ভিক্ষে বোধ হয় সে আর পয়সা চাইবে না—চাইলেও পাবে না। পয়সা আবার কি! ফ্যান খাবো বলতে পারে বটে।

আর দেখেছিলুম Spencer সাহেবের বেলুন উড়তে। গড়ের মাঠে গিয়ে নয়, গ্রাম থেকে। অসম সাহসী রাম চাটুয্যের বেলুন যাত্রাও দেখি। আমরা এমন সাহসী ছিলুম—দেখে চোখ বুঁজতে হয়েছিল।

(৪)

তখন লেখাপড়ার দফা এক প্রকার রফা করা হয়েছে। অনেকেই চাপকান ঢাকা কেরাণী, দু' একটি নিবে, শিবে, কেউ মুনসেফ্ কেউ প্রফেসার। বাঁড়ুয্যে চাটুয্যে আর কেউ নেই—শিক্ষার গুণে সকলেই 'দাস'। শিবে বলে—"দুঃখু করা মুক্কুমী, তফাৎ কেবল মাইনেতে, মন সবারি সেই পূরবী ভাঁজছে। মুনসেফ্ হয়েছি তো হয়েছে কি? যে জীবটি কাপড় বয়—তারাও আমার 'জেলসির' জিনিস। আমার চেয়ে তারা ভালো আছে,—ভাবনা চিন্তা তো না-ই, আমার চেয়ে খাটুনিও ঢের কম। লেখাঁপড়া শিখে বুদ্ধিমান হয়েছি, বিচার-বুদ্ধি বেড়ে যথেষ্ট অবিচার করে চলেছি। কে যে ভালো আছে, সেটা ভাববার জিনিস ভাই।"

বাকি অধিকাংশই সাহেবদের কুঠীর কেরাণী। ঘড়ি ধরে নড়া-চড়া। বাইরে মুখোস-পরা my dearএর দল, আপিসে fear সর্ব্বস্ব। মনিবের হুকুম মত কাজ, নিজের ইচ্ছা বলে কিছু নেই—মনুষ্যত্ব বিকিয়ে বসেছি। বাপ-মার মুখাগ্নি বা শ্রাদ্ধের জন্যে রবিবারই প্রশস্ত। মুদী খাওয়ায়, মহাজনে বা আপিসের দরোয়ানে ধার দেয়—হলেই বা মোটা সুদ! সহজ হ'য়েছে কেবল বিবাহটা যা বংশ রক্ষার উপায়। আর না চাহিতে জলের মত—পুঁটির পেটের অসুখ, মান্তর ম্যালেরিয়া, রোঘোর রক্ত আমাশা, স্ত্রীর মুখভার তখন বেশ পাওয়া যাচ্ছে। এসব তিরিশের কোটাতেই লাভ করা গেছে। পরিবার ভাবনায় চিন্তায় হরদম খাটুনিতে হাড্ডিসার। হাওয়া বদলাতে নে যাবার তখন 'চাল' বা ব্যবস্থা ছিল না, অবস্থাও ছিল না। তিনি হাওয়া

খেতেন—এ-দাওয়ায়, নয় ও-দাওয়ায়, বিশেষ করে' রান্নাঘরে। সুতরাং কে রাখে আর বউমাষ্টার বা গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রার খবর বা দাশু রায়ের ভাই তিনকড়ি রায়ের পাঁচালী বা মতিরায়ের যাত্রা শোনায় সখ্। সার হয়েছেন কেবল সাহেব মাষ্টারের আপিস, আর আপিসের প্যাডে দুর্গানামের বা হরিনামের মন্ত্র।

বাবা তখন বেঁচে। বৃদ্ধ হয়েছেন। অধিকাংশ সময় বার-বাড়িতেই চণ্ডীমণ্ডপে কাটান;—বাড়ির মধ্যে কেবল আহার করে' যান। প্রতি বৎসর আঁব কাঁটালের সময় ৩।৪টি চাষাভূষো লোক হাঁটুর ওপর কাপড়, না পায়ে জুতো, না গায়ে জামা।—মাথায় মোট ৩।৪ ঝাঁকা আঁব, কাঁটাল, কলা, দাল-কড়াই, শাক সব্জি, তরি-তরকারি—আলু মোচা প্রভৃতি নিয়ে আসত। সে-সব বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়ে, বাবা তাদের নিয়ে—সে কি খাতির যত্ন,—কুশল জিজ্ঞাসা, গাই বলদের কুশল প্রশ্নও বাদ যেত না! তামাকের সরঞ্জাম এগিয়ে দিতেন, তারা সাজতো। চাষবাসের কত' কথাই হোতো। তারা এক কোঁচড় মুড়ি-গুড় নিয়ে, হাসি মুখে খেতে খেতে কত আনন্দেই চাষের কথা, ঘরের কথা কইতো!

আমাদের ভালো লাগত না, কেবলি পথের দিকে চাইতুম,—কোনো ভদ্রলোক না এসে পড়েন। Indecent ব্যাপার বলেই লাগতো—পাপ যেন বিদেয় হলেই বাঁচি!

তারা চারজনে পো-খানেক তেল মেখে গঙ্গাস্নান করে, কলাপাত কেটে এনে ব্রাহ্মণ বাড়ির প্রসাদ পেত। সে এক যজ্ঞের ব্যাপার—রাক্ষুসে খাওয়া। তার পর খাজনার টাকা দিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে' বৈকালে বিদায় হোতো। আমরা বাঁচতুম। বাবা আবার পরিচয় করিয়ে দিতেন;—ওষুধ গেলার মত শুনতুম, এ-কাণ দিয়ে ঢুকে ও-কাণ দিয়ে বেরিয়ে যেত।

আমরা তখন গাঁয়ের রত্ন, চাপকান পরি—চাকরি করি। এ সব আবার কি! ওদের সঙ্গে আবার সম্পর্ক রাখা! মনোভাবটা ছিল এই, যেন বিশেষ অপমানজনক।

বাবা একটু আধটু বুঝ্তেন—বলতেন—"ওরা আমাদের জমি করে, চন্দনপুকুর থেকে এসেছে। আবার রাজার হাট্, বেলঘর প্রভৃতির প্রজারাও আসবে। খাতির যত্ন কোরো। জমির আর ওদের সাহায্যেই সংসার চলেছে, তোমরা মানুষ হয়েছ, ওদের কখনো ছেড় না, অজন্মায় খাজনা ছেড়ে দিও। ওরা ভোলে না, পরে পূরো করে দেবে—ফাঁকি দেবে না।" ইত্যাদি

শুনে যেন মাথা কাটা যেতো। ভাবতুম—আমাদের মত মুঠোপোরা টাকা তো এক সঙ্গে দেখেন নি। আবার তা মাসে মাসে!

ভালো কোরে কোনোদিন ও-সব জমি জমার ছোট কথায় কাণ দিইনি। বাবা গত হলে, সহজেই সে সব go to hell হ'য়ে গেল। তারা দু' এক বার এসেছিল, বোধহয় আমাদের ভাব বা মেজাজ দেখে আর বড় আসে নি। সে জমি কোথায় কোন্ মুলুকে তার খোঁজও রাখিনি, জানিও না। তারাও সেটা বুঝে নিয়েছিল।

দুঃসময় অনেক সময় ধীরে ধীরে আসে। এখন সেই জমি ও সে সব প্রজার কথা মনে পড়ে—Too late.

"তবু ভুত সঙ্গে সঙ্গে আসে!" ছেলে হলেই তাকে চাক্রে বানাবার উদ্‌যোগ পর্ব্ব চলে আসছে—আজো। দারিদ্র্যই তার একমাত্র কারণ কি? বুঝতে পারি না।

তবে কর্ত্তাদের মনোভাবের কথা আমার "দেবতা বদল" বলে' লেখার মধ্যে পূর্ব্বে উল্লেখ করেছি "যুগান্তর" পত্রিকা ও "শনিবারের চিঠির" ১৩৫০-এর শারদীয়া সংখ্যায়।

মেয়েদের মধ্যেও (সকলের কথা জানিনা) অন্তরে অন্তরে সে ভাব ততোধিক সমর্থন পেতে আরম্ভ করেছিল, মর্য্যাদা পাচ্ছিল। সেটাও যে সাহেবদের চাকুরী স্বীকারের দিকে আমাদের ঝোঁক বাড়ায়নি ও প্রেরণা দেয়নি, এমন কথা বলতে পারি না। নানা কারণের অন্যতম হ'তে পারে। চাকুরিতে মাস গেলে কিছু নগদ টাকা নিয়মিতভাবে হাতে আসে, কিন্তু নিজেদের কতটা খুইয়ে—হাড়মাসের বদলে আসে, সেটা তাঁরা জানবেন কি করে'! জানলে নিশ্চয়ই বিদ্রোহ করতেন। চাকুরী স্বীকার করবার কয়েক বৎসর পরেই এ কথা মনে উদয় হ'য়েছিল। মেয়েরা তখন স্কুলে যেতে আরম্ভ করেছে। সেইটিই ছিল আমার বড় আশার কথা। "আর ১০।১২ বছর পরে, বড় জোর ১৫ বছর পরে, আমাদের মুখোস পরা অবস্থা তারা বুঝবে। আমাদের এ খাতির আর থাকবে না। সকলে না হোক, ভবিষ্যতে অনেক যুবকই, রোজগারের বিভিন্ন স্বাধীন পথে পরিচালিত হবেন,"—ইত্যাদি অনেক জল্পনা কল্পনা। আমার এ ধারণাটিকে (অনেক পরে) অসভ্য জুলু জাতির একটা প্রবাদও নূতন বল্ জুগিয়েছিল—সেটি হচ্ছে "Man is an animal trained by women." কারণ আমাদের সে সময়ের মেয়েরা সাহেবের কুঠীর কেরাণীদের বাহাদুরী দিতেন, প্রশংসা করতেন এবং লেখাপড়া শেখা ছেলেদের চাকরী করাটাকেই সবার বড় সম্মানের চক্ষে দেখতেন। মেয়েদের এই ভাবের প্রভাব কম নয়। বড় বড় একগুঁয়ে আত্মম্ভরীকেও তাঁদের ইচ্ছা অনিচ্ছা বুঝতে ও সেই মত চল্‌তে হয়।

তা বলে' কি কেউ চাকরি করবে না? সেটা সব দেশেই করে, কিন্তু তাকেই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলে' দেখে না। উপায় পেলেই স্বাধীন হ'তে চায়।

দেশের নাড়ী না বুঝে, এ সব ছিল তখন আমার অপরিণত বুদ্ধির খেয়াল। পরে দেখলুম—শিক্ষিতা মেয়েরা নিজেরাই শেষে চাকুরী করতে ঝুঁকলেন—বোধ হয় আমাদের বা সংসারের সাহায্য হবে বলে। বাপ মাও তাতে রাজি—তুষ্টও। চিন্তা চুকে গেল। সান্ত্বনা—সম্মানের চাকুরিও তো আছে।

মেয়েদের লেখাপড়া—উচ্চশিক্ষা, খুবই প্রার্থনীয়। দশ বিশ হাজারে দু-দশ জন (যে কারণেই হউক) চাকুরী স্বীকার করলেনই বা। সেটা অবস্থা বিশেষের কথা। আমার ছিল ভিন্ন কথা—ভাব বা কল্পনাত্মক। দাস-প্রবৃত্তি বেড়েই চলছিল ও চলছে দেখে, সেটা হতে নিবৃত্তির আর কোনো উপায় মাথায় না আসায় মনে হয়, সেটা ঘটেছিল! নিজের ভুলটা স্বীকার করবার জন্যেই, কথাটার উল্লেখ করলুম। এটা বাদানুবাদের কথা নয়, নিজের ভুল স্বীকার। যাক্।

এতদিনে চাকুরিতে আমরা সত্যই পাকা হলুম। চাকুরিই পরম জীবনোপায় হ'ল। বেশী বাঁচলে, তার শেষটাও চোখে পড়ে—তাও নজরে পড়লো। চাকুরি গেলে, এমন কি পেনসন্ হলেও

বাবুদের বাড়ীতে মড়াকান্নাও পড়তে দেখেছি। কেহ তো স্বচ্ছল ছিলেন না, এক পয়সাও রাখতে পারেন নি। রাখা সম্ভবও ছিল না। বিদেশে বহুস্থানে থেকে এও দেখেছি—রোজগেরে বাবু—মারা গেলে—সৎকারের সংস্থান নেই; পরিজনদের চাঁদা করে' দেশে পাঠাতে হয়েছে। এ সব স্বচক্ষে দেখা।

তাই ৩৫ কি ৪০ বৎসর থেকে পরিচিত মধ্যবিত্ত ও প্রিয়দের একটা অপ্রিয় কথা প্রায়ই বলে এসেছি—"ভাই রে, বেতনের অন্ততঃ দশমাংশ কোনোখানে জমা রেখো, অর্থাৎ ফেলে রেখো (যেন হারিয়ে গিয়েছে) তাতে যত কষ্টই হোক্—২।৩ মাসে সেটা সয়ে যাবে। পরে বুঝবে—সেটা তোমার লাখ টাকা।" ইত্যাদি—

কে শোনে? কি করে শুনবে? মধ্যবিত্তের চাকুরির মাইনেতে কয়জনের স্বচ্ছলে চলে? অভ্যাস-দোষে তবু বলি! নিশ্চয়ই বেচারাদের বিরক্তিকর লাগে। আর লাগবে না। এখন Physician heal thyself—মকরধ্বজ ও মহামাষের খোঁজ রাখি মাত্র। বাল্যকালের দুর্গোৎসব থেকে একেবারে মরণোৎসবে পৌঁছে দিয়েছে। বন্ধুরা এখন অনায়াসে "মধ্যম নারাণের" ব্যবস্থা দিতে পারেন। (৭।১২।৪৩.)

ভৈরবচন্দ্র চট্টোরাজ

শ্রীগৌরীহর মিত্র বি-এল্

বাঙলা ১২৩৭ সালের চৈত্র মাসে সর্ব্বানন্দী মেলের কাশ্যপগোত্রীয় কুলীন ব্রাহ্মণকুলে বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত পাত্রসায়রে ভৈরবচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করেন। পিতামহ রাধাকান্ত চট্টোরাজ বর্দ্ধমান জেলার পারাজ ষ্টেশন সন্নিকট খুড়রাজ গ্রামে বাস করিতেন। পিতা উদয়নারায়ণ পিতৃ-ভূমি ত্যাগ করিয়া পাত্রসায়রে আসিয়া বাস করেন।

উদয়নারায়ণ এখানে আসিয়া সুবিখ্যাত পণ্ডিত হরচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ভৈরবচন্দ্র মাহাতা রামচন্দ্রপুর, বহড়ান ও হৈমপুর (হেমপুর)—এই তিন স্থানে তিনবার বিবাহ করেন। তাঁহার প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত পাঁচটি এবং অপর এক স্ত্রীর গর্ভজাত একটী—এই ছয় পুত্র।

ভৈরবচন্দ্র প্রথমে সিউড়ী মধ্য ইংরাজী বাঙলা স্কুলের শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া সিউড়ী আগমন করেন, পরে তিনি সিউড়ী জেলা স্কুলের দ্বিতীয় পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হইয়া বহুকাল পর কার্য্যান্তে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি শিক্ষকতা করিবার সময় চিকিৎসা ব্যবসা করিয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়া ছিলেন। সর্প দংশনের অব্যর্থ চিকিৎসায় তিনি সিদ্ধ হস্ত ছিলেন। তাঁহার বংশধর তাঁহারই প্রণালী মত চিকিৎসা করিয়া সর্পদষ্ট ব্যক্তির প্রাণ রক্ষা করিয়া থাকেন—ইহা আমরা চাক্ষুস বহুবার দেখিয়াছি।

ভৈরবচন্দ্র স্থায়ীভাবে সিউড়ীতে বাসস্থান করেন, তিনি শুভঙ্করী বিদ্যায় সমধিক ব্যুৎপন্ন ছিলেন। কড়িকষা প্রণালীতে তিনি বহু কঠিন অঙ্কের অতি সহজেই অল্পকাল মধ্যেই সমাধান করিয়া দিতেন। তাঁহার রচিত একখানি শুভঙ্করী পুস্তক অদ্যাপি অপ্রকাশিত রহিয়াছে।

ভৈরবচন্দ্র অতি শৈশব কাল হইতেই গান রচনা করিতে পারিতেন। একদিন তাঁহার মাতামহ সুবিখ্যাত পণ্ডিত ৺হরচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় যুবক ভৈরবচন্দ্রের গান রচনার কথা শুনিয়া তাঁহাকে একটী গান রচনা করিতে বলিলে তিনি এই গানটী সঙ্গে সঙ্গেই রচনা করিয়া দেন।

কোথা গো শঙ্করি বল মা কি করি
মন করি আমার মত্ত অনিবার।
তব পদাশ্রয় করেছে নিশ্চয়
কৃপাঙ্কুশ দেহ একবার॥
ভক্তিরূপ রজ্জু কর মোরে দান
তব করী ধরে করি সমাধান
নহে যায় প্রাণ কিসে পাব ত্রাণ
বল মা বিধান কি আছে এবার।
আছে তন্ত্রে উক্তি যেই ভক্তি ভাবে
শক্তি নাম লবে সেই মুক্তি পাবে
এখন মা ভৈরবে রাখ মা ভৈরবে
তবে রবে নামের মহিমা অপার॥

ভৈরবচন্দ্র পাত্রসায়রের যাত্রার দলের জন্য অনেকগুলি পালা রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে 'রাম বনবাস', 'ভরত বিলাপ', 'বিজয় বসন্ত', 'দ্রৌপদীর সয়ম্বর', 'মান', 'মাথুর', 'রুক্মিনী হরণ' 'শ্রীমন্তের মশান' প্রভৃতি প্রধান, এতদ্ব্যতীত তাঁহার রচিত বহু সঙ্গীত আছে।

বাঙলা ১৩১৩ সালের ২৮এ মাঘ শিব-চতুর্দ্দশীর দিন রাত্রি ১টার সময় ৭৬ বৎসর বয়সে ভৈরবচন্দ্র সিউড়ীর বাটিতে পরলোকগমন করেন।

ভৈরবচন্দ্রের কয়েকটি গান তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ৺মনোজ্ঞ চট্টোরাজ মহাশয় কৃপাপূর্ব্বক আমাদের রতন-লাইব্রেরীর পুঁথিশালার জন্য সংগৃহীত করিয়া দিয়াছেন। এইস্থলে ভৈরবচন্দ্রের একটী গান প্রদত্ত হইল—

জানি না মা তোর কি বাসনা।
কেন আন্‌লি ভবে শবাসনা॥
বিশ্বমাতার বিশ্বজুড়ে 'দয়াময়ী' নাম ঘোষণা;
তোর নামের চোটে গগন ফাটে,
শুক্‌নো যশঃ আর যায় না শোনা॥
আবদারে এ তোর তনয়,
রাঙ্গ পেলে ত চায় না সোনা,
তবে বুঝ্‌তে নারি, ভেবে মরি
কি জন্যে ভালবাস না।
মা হ'য়ে পাষাণের অধিক,
ধিক্ তোরে ধিক্ দিগ্‌বসনা,
যদি পায়ে রাখ্‌তে বিপদ বাস,
কি জন্য তোর উপাসনা॥
আশী লক্ষ জন্ম গেল,
তবু তোর লক্ষ্য হ'ল না,
মিছে 'মা'-'মা' ব'লে কেন্দে বেড়ায়
ভৈরবের এ পাপ রসনা॥

আলোর লেখা

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

কল্যাণময়ী কল্যাণীকে পত্র লেখার ব্যাপার বিঘ্ন-সমাকুল। এ সত্য শ্রীঅমিয়কুমার মণ্ডলের দরদী প্রাণে গভীরভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করলে—যখন এ, আর, পীর যুবকরা তাকে আলোক-নিয়ন্ত্রণ-বিধি অনুসারে দোষী সাব্যস্ত করলে। বাহিরের আফিস ঘরে প্রেম-পত্রের ফোয়ারার স্রোত মুহুর্মুহু প্রতিরুদ্ধ হয়। ভাব-স্রোত বহুধা বিচ্ছিন্ন হয়ে নানা খাদে বহে। কারণ সে কক্ষে ঘণ্টায় একত্রিশ বার, এটা ওটা সেটা রাখতে ও নিতে তার পূজ্যপাদ পিতা প্রবেশ করেন। বারম্বার থতমত খেয়ে চিঠির কাগজের উপর ব্লটিং কাগজ ও পিনাল কোড চাপা দিলে, ভাব এবং ভাষার দমবন্ধ হয়। কাজেই বেচারা রজনীতে বিজলীর আলো জ্বেলে সাদা কাগজে সবুজ অক্ষরে মনের রঙীণ ভাব ঢালছিল। সে সময় পাড়ার এ, আর, পীর লোকেরা—আলো, আলো, আলো—ব'লে বে-সুরো চীৎকার করলে।

কোথায় আলো—
ওরে আলো, বিরহানলে জ্বালবে
তারে জ্বালো।

এ কবিতা। বাস্তব জীবন কঠোর। সে জানালা হ'তে মুখ বার করে দেখলে, ক্যাবলা, নণ্টু, ভোঁদা এবং ফটকে।

—অমী আলো নেবাও। আলো নেবাও।

অমী পাড়ার পাশ-করা ভালো ছেলে, এমন কি চেম্বার পরীক্ষায় সাফল্য-লাভ ক'রে হাইকোর্টের এডভোকেট হবার অধিকার লাভ করেছে। সাড়ে সাতশো টাকা জমা দিয়ে আর কী কী করলে গলায় সাদা ব্যাণ্ড বেঁধে, গাউন ঝুলিয়ে জজেদের এজলাসে বক্তৃতা দেবার সম্মান লাভ কর্ব্বে।

ক্যাবলা-নণ্টু কোম্পানী পাড়ার বকাটে ছেলে। তারা অকালে স্কুল ছেড়েছিল। কাজের মধ্যে ছিল—ইন্দ্রপুরী চামৃতালয়ে চা-পান, আর ফুটবল, সিনেমা, ক্রিকেট এবং থিয়েটার আর্টিষ্টদের সমালোচনা। এদের টিটকারী ছিল মারাত্মক, বাঁকা চাহনী ও টিপ্পনী বিরক্তিকর। অমিয়কুমার এদের অনিবার্য্য কারণে দূরে পরিহার করত। কিন্তু খাকী পোষাকে ফটিকচাঁদও সাদা পোষাক ভূষিত নামজাদাদের অপেক্ষা সরকার-প্রিয়। তাদের অভিযোগের প্রতিবাদে হাসিমুখ, ডিপ্লোমেসী।

অমিয়কুমার হাসিমুখে বারান্দায় এসে বল্লে—কী ব্যাপার!

ভোঁদা বল্লে—অমিয়দা, আলো!

ওঃ! ব'লে অমিয় জানালা বন্ধ করলে। কিন্তু রুদ্ধ গবাক্ষ এবং লাঞ্ছনার অভিমান ভাবস্রোতকে শুষ্ক করলে। সে পত্র শেষ করলে ছেঁদো কথায়—আসল প্রেমের স্রোত অবাধে বাহেনা।

আসল প্রেম, অবাধগতি প্রভৃতি আলোচ্য বিষয় হ'ল—পরদিন প্রভাতে যখন অমিয়র অন্তরঙ্গ কল্যাণকুমারের সঙ্গে দেশবন্ধু পার্কে তার সাক্ষাৎ হ'ল। এরা উভয়েই বাগানে ঘোরপাক খায়, যেহেতু দুজনেই স্বাস্থ্যকামী। প্রাতঃভ্রমণ মনোরম হয় প্রবাসী সহধর্ম্মিণীদের প্রসঙ্গে। পত্রে ব্যাঘাতরূপ ঘটনা আদ্যোপান্ত বিবৃত কোরে, অমিয়কুমার বল্লে—জীবনটা—বিশেষ এর প্রণয়ের অধ্যায়টা—কিছু না। কবির কথায়—কেবল একটা উঃ—আর একটা আঃ!

কল্যাণ প্রেমিক। কল্যাণ বিরহী। কিন্তু বিরহকে সে দীপ্ত মিলন সুখের কাজল-কালো পটভূমি ভাবতো। বিরহের কণ্টকময় দিনে আশার আশে হৃদয়-বাঁধলে, সকল কাঁটা ধন্য ক'রে মিলনের ফুল ফোটে। তাই মিত্রের নিরাশ-বাদের উত্তরে কল্যাণকুমার বল্লে—তোমার প্রণয়-জীবন তো আড়াই বছরের দুগ্ধ-পোষ্য শিশুর জীবন। এর মধ্যে স্বরবর্ণের পিঠে বিসর্গ লাগিয়ে হতাশ্বাস করলে প্রেমের দেবতা চমকে উঠবেন।

অমিয় জানতো কল্যাণের প্রেম তার বুকের চামড়া, মেরে কেটে তার নিচের ব্যায়াম-পুষ্ট মাংসপেশী অবধি বিস্তৃত। প্রেম তার হৃদয় ছোঁয়নি। তার ওপর কল্যাণ তার্কিক! অমিয়কুমার চলতে চলতে একটা মেদিপাতা ছিঁড়ে বল্লে—বেশ, তাই।

কিন্তু কল্যাণ ছাড়লে না। সে বল্লে—বলতে পার, আপাততঃ জীবনটা অতিষ্ঠ হয়েছে। কিন্তু প্রণয়ের প্রকৃত উঃ! আঃ! করবার জন্য সারা-জীবন বাকী।

—যথা?

—যথা? ভীষণ কাজের দিনে, স্ত্রীর সিনেমা দেখবার আবদার। হাতে পয়সা নাই, পরিবারের বোনপোর বিবাহে উপঢৌকন। ছেলের জ্বর, মেয়ের মাষ্টার খোঁজা—

—বাস্। বাস্। ভাঁড়ামী রসিকতা নয়।

শেষে তারা ঠিক্ করলে যে পঞ্চমী রাত্রে যৌথ মেল ট্রেণে তারা যাবে কাশী। সেখানে এক রাত্রি কাটিয়ে অমিয় যাবে দিল্লী, আর কল্যাণ যাবে লক্ষ্ণৌ। কারণ একজনের সহধর্ম্মিণী ছিল দিল্লী, অন্যের ছিল লক্ষ্ণৌতে।

কিন্তু ঝঞ্ঝাট হ'ল বন্যার সমস্যা। রেলের লাইন ভেসে গিয়েছিল। ট্রেণে স্থান পাওয়া দুর্ঘট।

কল্যাণ বল্লে—তার জন্যে ভাবনা নেই। যাত্রী-তারণ রায় বাহাদুর নিবারণ ঘোষ মশায়ের কৃপায় সকল বাধা-বিঘ্ন, নদ নদী পেরিয়ে যাব।

কল্যাণ সম্বন্ধে অমিয়র অভিমত বহুবার বদলে যেতো। সে অবশেষে বুঝলে যে কল্যাণ মুখে যত কিছু বাজে কথা বলুক না কেন, তার অন্তরে নিরন্তর প্রেম-ফল্গু প্রবাহিত। যার নামটা কল্যাণীর ঈকার ছাড়া, সে কী চমৎকার না হতে পারে?

বন্ধু-যুগল সুখের স্বপ্নে সারা রাত ইপ্সিত স্থলের দিকে অগ্র-গমন করলে। ট্রেণও আকারে অতি লম্বা—দুখানা ট্রেণের সম্মিলন। বন্ধুরা একটা কুপে কামরা পেয়েছিল। নির্ব্বিরোধে তারা হেসে, খেলে, নিদ্রায় এবং সুখ-স্বপ্নে একত্র নিশি-যাপন করলে।

প্রভাতে দুর্ভিক্ষ-ভিখারীর কাতর আর্তনাদে তাদের ঘুম ভাঙ্গলো। সর্ব্বনাশ—সারা রাত্র পথ চলে, ট্রেণ মাত্র বাঁকুড়া পৌঁছেচে। সেখানে কতক্ষণ অপেক্ষা করবে সে সমাচার কেহ দিতে পারলে না। ট্রেণ—ই, আই, আরের। বন্যার জন্য যাচ্ছে বি, এন, আরের রেল-পথে।

কল্যাণ বল্লে—একবার প্ল্যাটফরমে নেমে একটু চায়ের চেষ্টা করলে হয় না ?

অমিয় বল্লে—নামলে সুবিধা হবে না। এখনও ডাইনিং কারের খানসামা সাহেব-সেবাকেই চূড়ান্ত কর্ত্তব্য বলে মানে।

তারা প্ল্যাটফরমে নেমে দেখলে এক সুন্দরী মহিলা গাড়ির প্রকোষ্ঠের পর প্রকোষ্ঠ পরীক্ষা করছে, পিছনে কুলীর মাথায় চামড়ার ব্যাগ, বিছানা, মালপত্র।

অমিয় বল্লে—বেচারা। গাড়ি তো একেবারে প্যাক করা। ন স্থানং—

বাকী কথাগুলা উচ্চারিত হবার পূর্ব্বেই মহিলা তাদের কুপের সামনে এসে পড়লো। কক্ষটি পরীক্ষা করে বল্লে—ওঃ! আমি এই গাড়িতে উঠ্‌ব।

কল্যাণ সাহস ক'রে বল্লে—আজ্ঞে এটা রিজার্ভড্।

মহিলা হেসে বল্লে—তাই তো সুবিধা! সারা পথ আর অন্য আরোহী বিরক্ত করবে না।

অমিয় বল্লে—মানে হচ্চে আপনার অসুবিধা হবে।

—কিছু না। আপনাদের হয়তো একটু হবে। কিন্তু উপায় কি ?

কল্যাণ বল্লে—অন্যত্র দেখব? যেখানে মহিলা আছেন এমন কামরায়।

মহিলা বল্লে—আপনারা কামরা রিজার্ভ করেছেন অর্থাৎ এটা আপনাদের ভাড়া করা বাড়ি। একটি বিপন্ন নারী দ্বারস্থ হলে আপনারা কি তাকে গলা ধাক্কা দিয়ে—

অমিয় জিভ্ কামড়ে বল্লে—অমন কথা উচ্চারণ করবেন না। আমরা আপনার দিক্ থেকে বলছিলাম।

মহিলা বল্লে—আমার দিক্ থেকে ধন্যবাদ দেবার কথা, যদি আপনারা আশ্রয় দেন—সন্ধ্যা অবধি।

অমিয় হাতজোড় করে বল্লে—অমন কথা বলবেন না। এই কুলি—ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে কি দেখছ। মালপত্র রাখ।

কুলি বল্লে—নাম্মাইছি তো বাবু। এখ্‌খনি চাপ্পাইছি।

কল্যাণ ইত্যবসরে একটা খানসামা ধ'রে মহিলাকে জিজ্ঞাসা করলে—চা ?

গৃহিণীর মত আগন্তুক হুকুম দিলে—তিনটে চা, রুটি সব—শিঘ্‌ঘির।

গাড়ীর ভিতর উঠে সে জিনিষপত্র গুছিয়ে ফেললে। একটা ঝাড়ুদার ধরে গাড়ির কামরাটাকে পরিষ্কার করালে।

যখন চা এলো—চায়ের সঙ্গে দুধ চিনি মিশিয়ে, রুটিতে মাখন মাখিয়ে তাদের খেতে দিলে, নিজে খেলে। গাড়ি যখন ছাড়লো, বল্লে—কি জানেন—কি নাম আপনাদের ?

—শ্রীঅমিয়কুমার মণ্ডল।

—শ্রীকল্যাণকুমার চৌধুরী।

সে বল্লে—বাবু বলব, না মিষ্টার বলব ?

তারা একবাক্যে বল্লে—বাবুই ভাল।

সে বল্লে—কি জানেন অমিয়বাবু, কাজের জায়গা থেকে দূরে পালাতে পারলে লোকে ভাবে পরিত্রাণ পেলাম। আমার সেই দশা। বুঝলেন কল্যাণবাবু।

কল্যাণ বল্লে—জলের মত। তবে আরো বলি, অকেজো মানুষ কর্ম্মহীন স্থান থেকে পিট্টান দিতে পারলে ভাবে—

অমিয় কথা জুগিয়ে বল্লে—যঃ পলায়তি সঃ জীবতি।

আরও কথাবার্ত্তায় প্রকাশ পেলে যে তারা দু'জনে পূজার ছুটির পর হাইকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করবে এবং শ্রীমতী নমিতা চৌধুরী বাঁকুড়ায় শিক্ষয়িত্রীর কাজ করেন। পুরুষ দু'জন বিবাহিত, শ্রীমতী কুমারী।

কিন্তু আরও পরিচয়ের পর গোমোয় প্রকাশ পেলে যে তাদের নামগত সম্বন্ধ আছে। অমিয়র স্ত্রী কল্যাণী, কল্যাণের স্ত্রী অমিয়া চৌধুরী। শ্রীমতী, চৌধুরী।

অমিয়র মাঝে মাঝে বুক দুর দুর করছিল। সে চিরদিন, অর্থাৎ বিবাহজীবনব্যাপী কাল, কল্যাণীকে বুঝিয়েছে যে পৃথিবীতে মাত্র একটি সুন্দরী যুবতী আছে। বাকী কোনো মহিলার রূপ তার চোখেই পড়ে না। মরমে প্রবেশ করবার অবকাশই নাই। আলাপ সম্বন্ধেও তদনুরূপ কথা সে চিরদিন লাবণ্যময়ী কল্যাণীর কানে ঢেলেছে। বীণা বাজে মাত্র একটি কণ্ঠে। অবশ্য বিদ্যা, বুদ্ধি, বাক্-পটুতা প্রভৃতি রমণী-রত্ন-সুলভ-গুণ মাত্র তারই শ্বশুর-নন্দিনীতে বিদ্যমান।

একদিন কল্যাণী জিজ্ঞাসা করেছিল—তোমার মধ্যে সিভালরী নাই ? মহিলা দেখলে তাকে সেবা করবার, রক্ষা করবার, আনুগত্য দেখাবার সহজ বাসনা তোমার প্রাণে জাগে না ?

সে বলেছিল—বিবাহের পূর্ব্বে ওরকম সব দুঃস্বপ্ন দেখেছি। কিন্তু কল্যাণী, বিয়ের পর মহিলা দেখলে সরে যাই, কাকেও আমল দিতে প্রাণ চায় না, সুতরাং আনুগত্য, আধিপত্য প্রভৃতির প্রশ্নই ওঠে না।

বিজয়ের হাসি হেসে কল্যাণী জিজ্ঞাসা করেছিল—ধর খুব পরমা সুন্দরী—

বাধা দিয়ে অমিয়কুমার বলেছিল—পরমা সুন্দরী বিধাতা গড়েছেন মাত্র একটি।

হাস্যময়ী বলেছিল—ধর। মানে কল্পনা কর, এক পরমা সুন্দরী মেয়ে ধর্ম্মতলার মোড়ে ভর সন্ধ্যার মুখে তোমায় বল্লে—দেখুন মশায় আমি বিপদে পড়েছি। আমায় দয়া ক'রে শ্যামবাজারে পৌছে দিন। তারপর কাতর দৃষ্টিতে ফ্যাল ফ্যাল করে তোমার দিকে তাকালে। এমন ক্ষেত্রে তুমি কি কর ?

সে বলেছিল—প্রথমতঃ ভর সন্ধ্যায় আমি ধর্ম্মতলায় যাই না। দ্বিতীয়তঃ যদি যাই, কথা বলবার মত মুখ ক'রে মহিলাটি আমার দিকে তাকাবামাত্র, আমি হরিশ, হরিশ, কোথা গেলি, বলে পালাই।

—ধর কোন্‌ঠ্যাসা করেছে। পালাবার পথ নাই। আশে পাশে, হরিশ বা হলধর থাকতে পারে এমন সম্ভাবনা নাই। কি কর ?

অমিয় বলেছিল—মুখখানা বেকুব বেকুব ক'রে একটু পাড়া-গেঁয়ে ভাব দেখিয়ে বলি—আজ্ঞা কী বললেন—শ্যামবাজার ? শুনেছি সেটা রাধাবাজারের বাঁয়ে—কিন্তু ঠিক্ তার কোন দিকে তাতো আজ্ঞা জানি না।

একথায় বিরক্তি দেখিয়ে কল্যাণী বলেছিল—তা'হলে তোমার নারীর প্রতি শ্রদ্ধা নাই ?

অপদস্ত হ'য়ে কল্যাণ বলেছিল—সত্য কথা কল্যাণী, আমি মহিলাটিকে একখানা ট্যাক্সিতে চড়িয়ে ড্রাইভারকে শ্যামবাজারে নিয়ে যেতে বলি—আর তার নম্বরটা টুকে রাখি। সশ্রদ্ধভাবে মহিলাকে নমস্কার ক'রে বলি—আমায় নিজগুণে ক্ষমা করবেন।

তাতে তুষ্ট হ'য়ে কল্যাণী হেসেছিল।

কিন্তু আজ একি? এক কামরায় তাদের সঙ্গে এক অপরিচিতা নারী। একত্র পান, ভোজন, শয়ন। সে তার চায়ে চিনি মিশিয়ে দিচ্চে, ঝোল-ভাতে নুন মিশিয়ে দিচ্চে, গ্লাসে জল ঢেলে দিচ্চে। যদি কল্যাণী এ দৃশ্য দেখতো।

কে সে মহিলা?

অমিয়কে আপনার অন্তরে স্বীকার করতে হ'ল যে নমিতা সুন্দরী। অবশ্য কল্যাণীর লাবণ্য অতুলনীয়। কিন্তু নমিতার সরল ব্যবহার, নির্ভীক আত্ম-নির্ভরতা এবং আলাপ-আপ্যায়ন যে অমিয়র মত পত্নীপ্রাণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল তা' নিঃসন্দেহ। এর মধ্যে সিভালরী ছিল, নবীন যুগধর্ম্মের আভাষ ছিল। কিন্তু এমনভাবে দু'জন অপরিচিতের কুপে কক্ষে একাকিনী প্রবেশ করার মধ্যে অতি-নবীনতার বিকাশ অপেক্ষা যেন সীতার অগ্নি-প্রবেশের পুনরভিনয়ের আমেজ উপলব্ধি হচ্ছিল।

তার কথা-বার্ত্তা কৃষ্টির পরিচায়ক, সেকথা বুঝলে অমিয় মণ্ডল। নির্ভয়ে যুগল-বন্ধুর নির্দ্দিষ্ট কক্ষে প্রবেশ উটকো ব্যাপার। কিন্তু দুজন শিক্ষিত যুবক, তার আত্ম-নির্ভরতা, ইত্যাদি, ইত্যাদি, তার অগৌরবের কারণ হতে পারে না।

আস্রা পৌছে নমিতা দীর্ঘ-নিশ্বাস ছাড়লে। তরুণীর দীর্ঘশ্বাস বহু তরুণের শ্বাসরোধ করে। কিন্তু তেমন তরুণ প্রেম-তৃপ্ত নয়। এরা দুজনে কৃতদার। তবু একটু বিচলিত হ'ল। তাদের বিস্ময়-বিস্ফারিত আঁখি চাহনীর প্রত্যুত্তরে সে বল্লে—শস্য-শ্যামলা বাঙ্‌লা দেশ হা অন্ন হা অন্ন করছে—সে দৃশ্য আর দেখতে হবে না। কারণ এবার আমরা বাংলার সীমানা অতিক্রম করেছি।

তারপর প্রায় ধানবাদ অবধি তাদের মধ্যে দেশের কথার আলোচনা হ'ল। নানা প্রসঙ্গের পথে তর্কের রথ চললো।

শ্রীমতী নমিতা বল্লে—মোট কথা অমিয়বাবু, আমাদের দেশে মাত্র দুরকম কাজের লোক আছে যারা একেবারে ভিন্ন মুখ। অবশ্য আমি নামের কাঙাল, ভণ্ড, জুয়াচোর দেশ-হিতৈষীদের কথা ভাবছি না। কাজের লোকের একদল শান্ত শিষ্ট, নিজের ডাক্তারী, ওকালতী, সাহিত্য-সেবা এমন কি গোলামীতে দেহ-পণ ক'রে খাটে, স্বকার্য্য-সাধন ক'রে, আপনার সংসারের উন্নতি করে। গৌণভাবে অবসর মত দেশকে ভালবাসে। আর একদল আদর্শবাদী, জীবনের পরোয়া করে না। কিন্তু তারা বর্ত্তমানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ভবিষ্যতের কথা ভাবে না।

অমিয় বল্লে—আমার বন্ধু কল্যাণ ঐ রকম সব কথা কয়। কিন্তু এর মধ্যে ভ্রম আছে। আপনি হুবহু তার কথা বলছেন। আপনার সঙ্গে তর্ক চলে না। মতটা ভুল।

কল্যাণ হেসে বল্লে—ভ্রম এই যে তোমার মত ভার্য্যানুরক্তদের দ্বারা দেশের কথা চুলোয় যাক, কোনো তৃতীয় ব্যক্তির কল্যাণ অসম্ভব।

একজন বিদূষী মহিলার সম্মুখে এসব কী কথা। অমিয়র কৃষ্টি আহত হ'ল। কিন্তু স্বভাব জেগে উঠ্‌লো। সে বল্লে—তোমার না ব'লে আমার বল্লে, কথাটা সাজতো। তুমি মুখে বড় বড় কথা কও সত্য, কিন্তু বাইশটা শব্দর পর একবার স্ত্রীর মহিমা কীর্ত্তন কর।

কল্যাণ অত্যন্ত অপ্রতিভ হ'ল। সে নমিতার দিকে চাহিল। নমিতা গম্ভীর হ'ল। কিন্তু অচিরে তার রস-প্রিয়তা মাথা তুললে। সে বল্লে—এ দুই ভাগ্যবতীকে দেখবার সৌভাগ্য নিশ্চয় হবে।

কল্যাণ বল্লে—অন্ততঃ কল্যাণী দর্শনের সৌভাগ্য আমার বন্ধুর মহা দুর্ভাগ্যের কারণ হবে। যেহেতু, যাক্।

নমিতা বল্লে—আমার সঙ্গে একত্র ভ্রমণের জন্য। কিন্তু এই কুপে না পেলে তো অপরের সঙ্গে ভ্রমণ করতে হত। তখন সহযাত্রীদের মধ্যে আমার মত বেহায়া নারীও তো—

তারা প্রতিবাদ ক'রে তার কথা শেষ করতে দিলে না।

অমিয় বল্লে—আপনার মত সঙ্গিনী পেয়ে আমাদের এই ট্রেণের মন্দগতি উৎপীড়ক হ'চ্চে না।

নমিতা বল্লে—বলেন কি? লিখে দিন।

ধানবাদের পর গাড়ি যখন মনোরম উচু নীচু ভূখণ্ডের মাঝে অগ্রগমন করছিল, তারা তিনজনেই উৎফুল্ল হ'ল। জড়প্রকৃতির অপরিমেয় সৌন্দর্য্য মানব-প্রকৃতির সুষমা ছড়িয়ে দিলে তাদের চিত্তে। গিরি, নদী, উপত্যকা, বনানী এবং বন-ফুল মুছে ফেল্লে আড়ষ্ট ভাব। নবীন প্রাণ বিকশিত হ'ল সুন্দরের স্তুতি-গানে।

গয়ায় তিন বন্ধু অবাধে প্ল্যাটফরমে নেমে বেড়াতে লাগলো। অপরিচিতদের লজ্জা না ক'রে শ্রীমতী নমিতা গালার চুড়ি কিনলে অমিয়কুমারের নিকট তেরো আনা পয়সা ধার ক'রে। অবশ্য গাড়িতে ফিরে সে দেনা-শোধ করলে।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে তারা বেনারস ক্যান্টনমেণ্ট পৌছল। এর পূর্ব্বেই তাদের মিত্রতা গাঢ় হ'য়েছিল। সুতরাং সেখানে নেমে নমিতা চৌধুরী যে বিপদের সম্মুখীন হ'ল, এরা তিনজনে কৃতসঙ্কল্প হ'ল তাকে অতিক্রম করতে।

বেনারসে সেদিন নমিতার অগ্রজের পৌছিবার কথা; ঠিক্ ছিল যে ঐ সময় ষ্টেশনে সে সহোদরার প্রতীক্ষা করবে। কিন্তু তার কোনো চিহ্ন দেখা গেল না। এক্ষেত্রে উপায় কি?

বন্ধু-যুগলের নিজেদের অবস্থা, বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা। অসহায়া নারী বারাণসীর মত প্রকাণ্ড শহরে একেলাই বা যায় কোথায়? অমিয় ও কল্যাণ ধর্ম্মশালায় থাকবে। কিন্তু তিনজনে গাড়ির এক কামরা থেকে নামবে। তাদের সঙ্গিনী একাকিনী শোকাকুলা, মহিলা ধর্ম্মশালায় আশ্রয় খুঁজলে, কেহ তাকে নিরাশ্রয় ভাববে না। কু-লোকে ভাববে আলাদা থাকাটা ভণ্ডামী, ব্যাপারটার মূলে আছে কদাচার। নিদেন নিছক বেহায়াপনা। কারণ ধর্ম্মশালা প্রাচীনদের অস্থায়ী আবাস।

কিংকর্ত্তব্যমতঃ পরম্?

মোগল-সরাই ষ্টেশনে তারা সানন্দে সান্ধ্য-ভোজনে পরিতৃপ্ত হয়েছিল। তাড়াতাড়ি খুব ছিল না। কিন্তু কুলি তিনটে বড়ই হামজুল্লি করছিল বাহিরে যাবার জন্য। তাদের তাড়ায় তাড়াতাড়ি একটা সিদ্ধান্ত আবশ্যক। অনেক রকম যুক্তি সেই একই স্থলে তাদের ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে এলো। অতঃপর?

এবারে কল্যাণের রসবোধ এবং সাহিত্য-জ্ঞান একত্র হ'ল। সে বল্লে—এক সঙ্গে এমন ভাবে থাকার দুটো বড় নজীর আছে, নৌকাডুবিতে আর আর—

নমিতা হেসে বল্লে—মনোরমা গার্ল্‌স্ স্কুলে।

অমিয় হেসে বল্লে—কিন্তু উপসংহার দুটারই ওর নাম কি।

কাজেই কল্যাণকে বল্‌তে হ'ল—সে উপসংহারের দুর্ভাবনা নাই। কারণ আমরা উভয়েই বিবাহিত।

অত্যধিক, বল্লে নমিতা।

কিন্তু আবার যুক্তিতর্কের পর, ঘুরে ফিরে তারা পড়লো, যে তিমিরে ছিল, সেই তিমিরে।

কুলি বল্লে—চলিয়ে না বাবুজি।

—দাঁড়া না বাবা।

—ঘোড়ায় জিন চাপিয়েছিস না কি?

নমিতা একবার শেষ দেখা দেখে নিলে প্ল্যাটফরমের এক প্রান্ত হ'তে অন্য প্রান্ত অবধি। দাদার কোনো লক্ষণ নাই। তখন সে গম্ভীর হ'ল। বল্লে—আমি নিজেকে একজনের স্ত্রী বলে পরিচয় দিতে পারি। তাতে অবস্থাটা সরল হবে। একটা মাত্র কথার কথা। অভিনয়। তাতে জাত যায় না।

কল্যাণ বল্লে—বালাই ষাট।

নমিতা হেসে বল্লে—কিন্তু যাঁর স্ত্রী ব'লে নাম লেখাবো, পরে তাঁর নিজের কি নিগ্রহ হ'বে, সে কথা আমি বিচার কর্ব্ব না।

অমিয়র বুক দুর দুর ক'রে উঠলো। কল্যাণীর অভিমানভরা মুখ তার মানস-পটে ভেসে উঠ্‌লো। তার সঙ্গে পিতার রোষ-কষায়িত নেত্র, দুনিয়ার ধিক্কার, এ, আর, পীর ক্যাবলা নণ্টুর চামৃতালয়ে আলোচনা।

তার মুখের দিকে চেয়ে হাসছিল নমিতা। অবশ্য অতি মৃদু-হাসি।

কল্যাণ বল্লে—অবশ্য লেখা থাকবে কাগজে কলমে, ধর্ম্মশালার খাতায়। এ উপায়ে আমরা দু'টা ঘর পাবো। একটাতে আপনি থাকবেন, অন্যটায় আমরা দু'জনে থাকতে পারব। লোক-নিন্দার ভয় থাকবে না।

অমিয় অতর্কিতে বল্লে—অমিয়া? কল্যাণী?

কল্যাণ বল্লে—অমিয়া কল্যাণী নয়। মানে আমি মিসেস্ মণ্ডলের অসম্মান করছি না। অমিয় বোঝাবে না। সাহস হবে না। দুজনেই বোঝালে বুঝবে। এতো নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদন।

নমিতা বল্লে—অমিয়বাবুর বুক্ দুর দুর করছে। শব্দ শোনা যাচ্ছে। আপনি যখন সাহসী তখন বিবাহটা, মানে অভিনয়ের বিবাহটা আপনার সঙ্গেই হ'য়ে যাক্।

কল্যাণ বল্লে—হ্যাঁ। ধরুন আমরা যদি একটা সখের থিয়েটার করতাম। তাহ'লে—

—হ্যাঁ। আরও একটা যুক্তি আছে আপনার পক্ষে নাটকের হিরো সাজবার। আপনিও চৌধুরী, আমিও চৌধুরী। অত নাম বদ্‌লাবদলীর প্রয়োজন হ'বে না।

অমিয়র হৃদয়ে উত্তেজনা তখনও প্রশমিত হয় নি। হাস্‌তে হাস্‌তে কপাল ব্যথা হওয়া সম্ভব। পরে জবাব-দীহি, মান-অভিমান—কে জানে ব্যাপারটা কি কুৎসিত-রূপ ধারণ করবে।

কল্যাণ সত্যই নাটকের নায়কের মত বল্লে—ঠিক্ হায়। উঠাও মাল-পত্র।

পাণ্ডে ধর্ম্মশালায় গিয়ে তারা তিনতলার উপর দুটা কামরা পেলে। একটা লেখা হ'ল—শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার মণ্ডলের নামে, অন্যটি শ্রীযুক্ত কল্যাণকুমার চৌধুরী এবং মিসেস চৌধুরীর নামে। শ্রীমতী নিজের ঘর গুছিয়ে নিলেন, বন্ধুদের ঘর গুছিয়ে দিলেন। তার পর স্নান করে, ষষ্ঠীর নব-বস্ত্র পরিধান ক'রে তাদের সঙ্গে বিশ্বনাথ দর্শন করতে বাহির হ'লেন। অবশ্য যাবার পূর্ব্বে যথা-বিহিত প্রসাধন করলেন।

মন্দিরে পৌঁছে অমিয় ভীষণ আধ্যাত্মিক সংগ্রামের রণবাদ্য শুনলে নিজের অন্তরে। এক নির্ভীক রমণী, খেলার ছলে নিজেকে অন্যের স্ত্রী ব'লে পরিচয় দিয়েছে। তার পর তাদের সঙ্গে শুদ্ধ দেব-মন্দিরে এসে ভক্তি-নম্র প্রাণে শিবপূজা করছে। এটাও কি অভিনয়?

ঝঞ্ঝাট বাঁধবে কোনো পরিচিত লোকের সম্মুখীন হ'লে। রোমান্সেরও একটা সীমা আছে। এ রকম ব্যাপারে লোকে পুলিস কেসে পড়ে, সে কথা সে জানতো। বিলাতী পুস্তকে অনেক শোষণের মামলার কথা সে পড়েছিল। পুলিস কোর্টের উকীল সুধীর ঘোষের কাছেও শুনেছিল।

বিশ্বনাথ গলির মোড়ের দোকানে রাবড়ি, বালুসাই, প্যাঁড়া, ডালপুরী প্রভৃতি কিনে বন্ধুরা দুজনে উঠ্‌লো একটা সাইকেল রিক্সায়, আর নমিতাকে বসিয়ে নিলে অন্য একটায়।

পথে অমিয় জিজ্ঞাসা করলে—কল্যাণ, ব্যাপারটা কোথায় গড়াবে?

কল্যাণ বল্লে—চুলোয় গড়ালেই বা ক্ষতি কি? পূজার পর দুঃখ সাগরে ডাইভিঙ্। দশটায় হাইকোর্ট যাওয়া, আর চারটায় মন-মরা হয়ে ফেরা। মাঝে না হয় দু'দিন মজা হ'ল। চোরের রাত্রিবাস।

অমিয় এক্‌সটরসানের কেশ প্রভৃতির কথা বল্‌তে সাহস পেলে না। সাহসে সাহস আনে। সত্যিই তো তারা অচিন-দেশের রাজপুত্তুর নয় যে অর্থ শোষণ করবে কোনো অভিনেত্রী। কিন্তু এ চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই ভদ্র-মহিলাকে অভিনেত্রী শোষয়িত্রী প্রভৃতি ভাবার জন্য যে মনের কান মল্‌লে। হ্যাঁ চোরের রাত্রিবাসই লাভ।

অমিয় পাঁজি দেখে বাড়ির বার হয় নি। দেখলেও মান্‌তো না। কারণ ১৭ আশ্বিন ১৩৫০ সালে, পঞ্চমীর সন্ধ্যায়, তাদের যাত্রাকালে যোগিনী ছিল তাদের সম্মুখে। ই, আই, রেলের গাড়ি গোমো অবধি গো-শকটের গতিতে বি, এন, রেলের উপর দিয়ে এলো, পথে শিক্ষয়িত্রী-বন্ধুর অভিনয়-বিবাহ। সামনের যোগিনী আস্ত মানুষ গিলে খায়। বন্ধুকে তো গিলে খেয়েছিল। তাদের নৈশ-ভোজনের পর আর এক বিপদ মঙ্গলের মুখোশ পরে এসে উপস্থিত হ'ল। (আগামীবারে সমাপ্য)



ছলনা

রায় বাহাদুর শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ

নব অনুরাগিণী নানা ছলে প্রিয়তমের সহিত মিলিত হইবার জন্ম ব্যগ্র। কিন্তু সংসারে প্রতিকূলতা এবং বাধাও বহু। কাজেই প্রেমিকাকে অনেকক্ষেত্রে চতুরতার আশ্রয় লইয়া পরিত্রাণ পাইতে হয়। এই চতুরতা লইয়া অনেক কবিতা রচিত হইয়াছে; মিথিলায় তাহার নাম 'লাথ'। লাথ অর্থে ছলনা। বিদ্যাপতির একটি কবিতা এইরূপ লাথের সুন্দর নিদর্শন:

জাহি লাগি গেলি হে তাহি কহাঁ লইলি হে
তা পতি বৈরি পিতু কাহাঁ।
অছলি হে দুখ সুখ কহহ অপন মুখ
ভূসন গমওলহ জাহাঁ॥
সুন্দরি, কি কএ বুঝাওব কন্তে।
জহ্নিকা জনম হোইত তোহে গেলিহু
অইলি হে তহ্নিকা অন্তে॥
জাহি লাগি গেলহু সে চলি আএল
তেঁ মোয়ঁ ধাএল মুকাঈ।
সে চলি গেল তাহি লএ চলিলিহু
তেঁ পথ ভেল অনেআঈ॥
সম্বর-বাহন খেড়ি খেলাইত
মেদিনি-বাহন আগে।
জে সব অছলি সঙ্গ সে সব চললি ভঙ্গ
উবরি আএলহুঁ অতি ভাগে॥
জাহি দুই খোজ করইছথি সাহুহি
সে মিলু আপনা সঙ্গে।
ভনই বিদ্যাপতি সুন বর জউবতি
গুপুত নেহ রতি-রঙ্গে॥ বিদ্যাপতি ২য় সং

ননদিনী বধূকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন: তুই যার জন্যে গিয়াছিলি, তা আনিলি কই? (অর্থাৎ ঘাটে জল আনতে গিয়াছিলি, জল না নিয়া আসিলি কেন?) আর সেই জলের পতির শত্রুর পিতা কোথায়? (জলের পতি = সমুদ্র; সমুদ্রের বৈরি = অগস্ত্য; তাহার পিতা = ঘট) অর্থাৎ ঘট কোথায় ফেলিয়া আসিলি? যেখানে ভূষণ (বা অঙ্গরাগ) খোয়াইয়া আসিলি, সেখানে কি রকম সুখে দুঃখে ছিলি, নিজমুখে বল। সুন্দরি, কি বলে' কান্তকে বুঝাবি? যাহার জন্ম হতে তুই গেলি, তার শেষে তুই আসিলি (অর্থাৎ সেই কোন্ সকালে গিয়াছিস্ আর ফিরিয়া আসিলি দিনান্তে)।

তখন বধূ উত্তর করিতেছেন: যা আন্‌তে গিয়েছিলাম, সে এসে পড়িল (জল অর্থাৎ বৃষ্টি এলো); সেজন্য ছুটে গিয়ে আশ্রয় নিলাম। সে চলে গেল (বৃষ্টি ধরে গেল), তখন পথে আস্‌তে অন্যায় (বিলম্ব) হলো। (বিলম্বের কারণ আর কিছু নয়) দেখি পথে ষাঁড়ের (শম্বর-বাহন) লড়াই বেধে গেছে—আর একদিকে এক সাপ (মেদিনী-বাহন)। যারা সব সঙ্গে ছিল, তারা পলায়ন করলো। আমি অতিভাগ্যে বেঁচে এসেছি। শাশুড়ী যে দুইয়ের খোঁজ করছেন, তার আপনার সঙ্গে মিলিল (অর্থাৎ মাটীতে পড়িয়া ঘট চূর্ণ হইয়া মাটীর সঙ্গে এবং ঘাটের জল বৃষ্টির জলের সঙ্গে মিশিল)।

ছেলে বেলায় একটি সারি গানে এইরূপ উক্তি-প্রত্যুক্তি-মূলক ছলনার দৃষ্টান্ত পাইয়াছিলাম। গানটি আমাদের অঞ্চলে (যশোহর) পল্লীবাসীর মুখে সেকালে খুব শোনা যাইত। গানটি আমার যত দূর মনে পড়ে, তাহাই বলি:

ওলো ছোট বউ, সাঁঝের বেলা।
জল আনতি ঘাটে গেলি ফুল পালি কনে?
ছান করিতে গিয়েছিলাম শান বাঁধা ঘাটে;
ভাসে যাতি চাঁপা ফুল তুলে দিলাম কানে।
ওলো ননদী সাঁঝের বেলা।
ওলো ছোট বউ, সাঁঝের বেলা।
তোর চুল কেন আলো-খালো গাল কেন ফুলো।
ফুলের সঙ্গে ভ্রমর ছিল অধরে দংশিল।
ওলো ননদী সাঁঝের বেলা।

* * * * *

আমাদের অঞ্চলের ভাষা হইলেও বুঝিতে বোধ হয় কষ্ট হইবে না। অত ছেলে বেলায় গানের কথা এবং তাহার ইঙ্গিত যত বুঝি আর না বুঝি, সুরটি মর্ম স্পর্শ করিয়াছিল; সারি গানের সহজ মিষ্টত্ব থাকায় সুরটি অতি মধুর।

ছলনা কিন্তু নাগরীগণের একচেটিয়া নহে। নাগরদেরও অনেক সময়ে ছল-চাতুরীর আশ্রয় গ্রহণ করা ব্যতীত উপায়ান্তর থাকে না। বৈষ্ণব পদাবলীতে এইরূপ বিপদাপন্ন নায়কের এক সুন্দর উদাহরণ পাওয়া যায়। পদটি শশিশেখরের এবং অনেকেরই সুপরিজ্ঞাত। তাহা হইলেও ঐ পদটি এখানে উদ্ধৃত করি:

নীলোৎপল শ্রীমুখ মণ্ডল
ঝামর কাহে ভেল।
মদন জ্বরে তনু তাতল
জাগরে নিশি গেল॥

'খণ্ডিতা'য় শ্রীকৃষ্ণ যখন সারা নিশি চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে কাটাইয়া প্রভাতে শ্রীরাধার কুঞ্জে দর্শন দিলেন, তখন শ্রীরাধা জিজ্ঞাসা করিতেছেন: তোমার নীলকমল সদৃশ মুখখানি আজ এত ঝামর বা বিরস হইল কি জন্ম? শ্রীকৃষ্ণের উত্তর—তোমার বিরহে জর্জর হইয়া সারা নিশি জাগরণে কাটাইয়াছি।

শ্রীরাধা: নখ নির্ঘাত- ক্ষত বক্ষসি
দেয়ল কোন নারী।
শ্রীকৃষ্ণ: কণ্টকে তনু ক্ষত বিক্ষত
তোহে ঢুড়ইতে গোরি॥
শ্রীরাধা: সিন্দুর কাহে অলকা পরি
চন্দন কাঁহা গেল।
শ্রীকৃষ্ণ: গিরি গোবর্দ্ধন গৌরিক সেবি
সিন্দুর শিরে নেল॥

গিরি গোবর্দ্ধনে গিয়া তোমার জন্ম গৌরীর পূজা করিয়া তাঁহার প্রসাদী সিন্দুর কপালে পরিয়াছি।

শ্রীরাধা: নীলাম্বর তুঁহু পহিরলি
পীতাম্বর ছোড়ি।
শ্রীকৃষ্ণ: অগ্রজ সঞে পরিবর্ত্তিত
নন্দালয়ে ভোরি॥

তুমি আজ নীলাম্বর পরিয়াছ, এ কি ব্যাপার? তুমি ত চিরদিন

পীতাম্বরধারী। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, নন্দালয়ে (বাড়ীতে) আমি আর বলাইদাদা এক সঙ্গে শুইয়াছিলাম। ভোরে উঠিয়া আসিয়াছি, ভুল করিয়া দাদার নীলাম্বরখানি পরিয়া আসিয়াছি !

শ্রীরাধা : অঞ্জন কাঁহে গণ্ডস্থলে
হৃদি খণ্ডন অধরে।
উত্তর প্রতি উত্তর দিতে
পরাজয় শশিশেখরে।

শশিশেখর উত্তর দিতে পারেন নাই ; কিন্তু গোবিন্দদাসের একটি পদে ইহারও সমাধান আছে ; ধৃষ্ট নাগর বলিতেছেন :

কাজর ভরমে মরম কিয়ে গঞ্জসি
মৃগমদ-পদ পুন এহ।

সুন্দরি, তুমি কাজল বলিয়া ভুল করিতেছ, কিন্তু ইহা কাজল নহে, মৃগমদকস্তুরি। শোভার জন্য পরিয়াছি। আর হৃদয়ে যে রক্তিমচিহ্ন দেখিতেছ, উহা গৈরিক চিহ্ন। তোমারই বিরহে আমার হৃদয় সংসার-বিবাগী হইয়া উঠিয়াছে :

গৈরিক হেরি বৈরি সম মানসি
উরপর যাবক ভাগে।

উপনিবেশ

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

* * *

বর্মিটা মিথ্যা বলিয়াছিল লিসিকে। ডি সুজা কিন্তু মরে নাই।

ঝড়ের পর দিন সে ফিরিল গ্রামে। সমস্ত চর্ ইসমাইলে হুলুস্থুল সুরু হইয়াছে। জোহানকে যেন খুন করিয়াছে কাহারা। আর লিসি ? কোনোখানে তাহার এতটুকু স্বাক্ষর চিহ্ন ডি সুজা খুঁজিয়া পাইল না—সে যেন ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গেই দিগন্তে গেছে বিলীন হইয়া।

ডি সুজা ক্রমেই ক্লান্ত হইয়া উঠিতেছিল। আফিমের ব্যবসায়ে ইহাই অবশ্য তাহার প্রথম হাতে-খড়ি নয়। জীবনের ত্রিশটি বৎসর ইহারই মধ্যে কাটাইয়া দিল, নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতার ঘাত-প্রতিঘাতে সে নিজেকে গড়িয়া তুলিয়াছে। এই সব ব্যাপার লইয়া যাহারা কারবার করে, সমাজে কেহই তাহারা সাধু অথবা সচ্চরিত্র নয়—সাধু সাজিবার ভাণ সে-ও করে না। বরং সাধুতা জিনিসটা যে ক্লীব ও দুর্বলের লক্ষণ, এটাও সে ভালো করিয়াই জানে।

প্রথম যৌবন।

কলিকাতায় কর্মক্ষেত্র করিয়া সে তখন পেটেণ্ট্ ঔষধের ব্যবসা চালাইতেছিল। ঔষধগুলি সেই সব জাতের—যে-সমস্ত রোগের নাম ভদ্রসমাজে কখনো করিতে নাই এবং ভদ্রসমাজই যাহাদের প্রধান খরিদ্দার। পঞ্জিকার পৃষ্ঠায় চটকদার বিজ্ঞাপনগুলি কয়েক বছর যেন ছপ্পর ফুঁড়িয়া টাকা বৃষ্টি করিয়া গেল। ইচ্ছা করিলেই ডি সুজা তখন লাল হইয়া যাইতে পারিত। কিন্তু পারিল না। লাল দামী মদ এবং গড়ের মাঠের আশে পাশে সন্ধ্যার সময় দরজা জানালা বন্ধ যে সব রহস্যময় স্যাণ্ডো ঘুরিয়া বেড়াইত, তাহারাই সে ব্যাপারে বাদ সাধিল।

প্রতিযোগিতার বাজার। দেখিতে দেখিতে যত্রতত্র অসংখ্য ঔষধের কোম্পানী গড়িয়া উঠিল এবং তাহাদের প্রচণ্ড বিজ্ঞাপন-কোলাহলে ডি সুজার কণ্ঠস্বর চাপা পড়িয়া গেল। অতএব বাড়ীওয়ালাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া জাল গুটাইতে হইল। কিন্তু কেবল জাল গুটাইলেই তো চলে না, ব্যবসা-উপলক্ষে যে অংশীদারটি প্রাণপণে তাহার জন্য ঢাক পিটাইতেছিল, তাহাকেও একেবারে বঞ্চিত করিলে ধর্মে সহিবে কেন! ডি সুজা ধার্মিক লোক। সুতরাং একদিন প্রভাতে সমস্ত রাত্রির নেশা কাটাইয়া যখন তাহার সহকারী জার্ডিন উঠিয়া বসিল তখন তাহার রূপবতী স্ত্রী হিল্ডাকে এবং সেই সঙ্গে ঘরের বহু মূল্যবান্ জিনিসপত্র কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। বলা বাহুল্য, ডি-সুজাকে তো নয়ই।

সেই প্রথম হাতে খড়ি। তাহার পর কত হিল্ডা আসিল গেল্। জীবন এবং জগৎটাকে আরো ভালো করিয়া জানিয়া নিবার জন্য সমস্ত ভারতবর্ষটাই পরিভ্রমণ করিল সে। সঙ্গী জুটিল যোগ্যতম ব্যক্তি—ডেভিড্ গঞ্জালেস্।

অর্থ-রোজগারের চেষ্টায় যে সব পথ তাহারা তখন ধরিয়াছিল, তাহার ইতিহাস প্রকাশ পাইলে তিরিশ বছর পরে আজো অনায়াসেই দ্বীপান্তর হইতে পারে। ডাকাতি, নোট-জাল, দ্রুতগামী মেল্ ট্রেনের কামরায় একাকিনী মহিলাযাত্রীকে আক্রমণ —সভ্যতার আলোকিত রঙ্গমঞ্চটার নেপথ্যে যে অন্ধকার অংশটা —সেখানকার কোনো গলিঘুঁজি চিনিয়া লইতেই তাহার বাকী নাই।

মাতাল অবস্থায় মোটর চাপা পড়িয়া মরিল ডেভিড্। আর ডি-সুজা চট্টগ্রামের বন্দরে খালাসীদের কাছ হইতে বিপ্লবীদের জন্য রিভল্ভার সংগ্রহ করার ব্যাপারে এই নূতন পথটার সন্ধান পাইয়া গেল। যেমন অল্প পরিশ্রম, তেমনই আয়। ঝক্কি অবশ্য আছেই, রোজগারের পথ কবে আর কুসুমাস্তৃত হইয়া থাকে ?

আজই না হয় চর্-ইস্মাইলের বন্দর শোভায় সমৃদ্ধিতে ফাঁপিয়া উঠিতেছে, কিন্তু সেদিন কি এম্নি অবস্থা ছিল ? সেদিনও তেঁতুলিয়া এমন করিয়া নিজের বহিয়া আনা পলিমাটিতে নিজেরই মৃত্যুশয্যা রচনা করে নাই। চৈত্রের অসহ্য রৌদ্রে যখন আকাশটায় শুষ্ক চিড় খাইবার উপক্রম করিত, তখনও এই নদীতে বাঁও মিলিবার কল্পনাই করিতে পারিত না কেউ। আর-এস্-এন্ কোম্পানীর নূতন লাইন তো দূরের কথা, জল-পুলিশের নৌকা তখন ভোলা বা চাঁদপুরের কূল ছাড়াইয়া এদিকে পাড়ি জমাইবার

দুঃসাহসিক কল্পনাকে মনের কোণেও স্থান দিত না। ব্যবসার পক্ষে কি দিনগুলাই যে গিয়াছে।

তারপর তিরিশ বৎসর কাটিয়া গেল—সম্পূর্ণ তিরিশটা বৎসর। নদীতে চড়া পড়িল, পড়িল মানুষের মনেও। সেই দুঃসাহসিক ডি-সুজার প্রখর রক্তধারাও মন্থর হইয়া আসিল বুঝি। কয়দিন হইতেই ভয় করিতেছে। নিজের সুদীর্ঘ জীবনে পাশবিকতা আর বিশ্বাসঘাতকতার এত দৃষ্টান্তের সহিত তাহাকে মুখোমুখি করিতে হইয়াছে যে সাপের চাইতেও মানুষ নামক জীবটিকে সে অবিশ্বাস করে বেশি।

লিসির সম্পর্কে চীনাম্যানটার মনোভাব কি কে জানে? হয়তো ভালোই—কিন্তু বহুদিন পরে ডি-সুজার কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ হইতেছে। এ পথে প্রথম নামিবার সময় যেমনটা হইয়াছিল তেম্‌নিই। এই যে এতগুলি টাকা সে জমাইয়াছে বা জমাইতেছে, এ কেবল লিসির জন্তেই তো। কিন্তু ইহার জন্ত শেষ পর্যন্ত লিসিকেই যদি হারাইতে হয়, তাহা হইলে—

নাঃ, এ সবের কোনো অর্থ হয় না। নিজেই কি পরোয়া রাখে কাহারো? বয়স হইয়াছে—তা হোক, চীনাম্যানের চাইতে তাহার পর্তুগীজ বাহুতে কিছু কম শক্তি ধরে না। তেমন তেমন ঘটিলে সে-ও তাহার মহড়া লইতে জানে। আর টাকা? টাকা যে কাহারো বেশি হয় এ কথা কেউ কখনো শুনিয়াছে নাকি? সারাজীবন ভরিয়া উপবাসী থাকিয়া জমাইয়া যাও—ঘোড় দৌড়ের মাঠে তিনটা দিন বাজী ধরিয়াই একদম ফতুর। নিজের চোখেই তো এ সব সে কতবার দেখিল।

কাজেই সন্ধ্যার মুখে ভাঙা-গীর্জাটার তলা হইতে ডিঙি খুলিয়া দিতে হইল। আগে হইলে কি এত সব বালাই ছিল নাকি। দিনকাল এখন সত্যিই খারাপ পড়িয়াছে। শুধু খারাপ বলিলেই যথেষ্ট হয় না—যতদূর খারাপ হইতে হয়। এমন দিনও গিয়াছে যখন প্রকাশ্যে হাটে বসিয়া—হাঁ, এই গাজীতলার হাটে বসিয়াই দাঁড়ি পাল্লা দিয়া কালো খয়েরের সঙ্গে আফিং বিক্রী করিয়াছে ডি-সুজা। তখনকার দিনে তো সে এ তল্লাটে একরকম রাজত্বই করিত বলা চলে।

কিন্তু সে-সব এখন নিতান্তই স্বপ্ন-কল্পনা। আবগারী লোকের জ্বালায় এখন আর কোনোদিক সামলাইবার জো নাই। গ্রামে গ্রামে, হাটে বাজারে তাহাদের লোক নিতান্ত নিরীহ ভালো মানুষটির মতো ঘুরিয়া বেড়ায়, খোঁজ-খবর সংগ্রহ করে। তারপর কিছু সূত্র সংগ্রহ করিতে পারিলেই গলাটি টিপিয়া ধরিতে যা দেরী। এই তো সেদিন খোকা মিঞার পাঁচ পাঁচটি বৎসর শ্রীঘর হইয়া গেছে।

ডি-সুজা ধীরে ধীরে দাঁড় টানিতে লাগিল, কিন্তু টানিবার দরকার ছিল না কিছু। ভাঁটার মুখে নোনাজল খরস্রোতে নামিয়া চলিয়াছে তর্ তর্ করিয়া। নারিকেল বনের মাথায় জাগ্রত একখণ্ড চাঁদ হইতে বুনো-হাঁসের পাখার মতো নদীর জলে আলো-অন্ধকারের বিচিত্র রং ছড়াইয়া পড়িতেছে। গাজীতলার হাট পার হইলেই মুসলমানদের বস্তি, ছোট ছোট ঘরগুলি বাগানের আড়ালে আড়ালে একেবারে জলের ধার অবধি নামিয়া আসিয়াছে, আর তাহারই কোল ঘেঁষিয়া চলিতেছে নৌকা। নিবিড় দীর্ঘ ঘাসের বন সমস্ত তীরভূমিটাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, ইচ্ছা করিয়াই এ দেশের লোক বাড়িতে দিয়াছে ওদের। ঝড়-তুফান কিংবা জোয়ারের সময় যখন বড় বড় ফেনার মুকুট-পরা ঢেউ আসিয়া কূলকে আঘাত করিতে চায়, তখন এই ঘাসগুলিই বুক পাতিয়া সর্বপ্রথম সে আঘাত গ্রহণ করে, ডাঙা পর্যন্ত পৌঁছিতে দেয় না। এই ঘাসবন ভাঙিয়া ডিঙিটা খস্ খস্ করিয়া আগাইয়া চলিয়াছে। কী একটা ছোট মাছ অন্ধের মতো লাফাইয়া উঠিয়া ছলাৎ শব্দে একেবারে আসিয়া পড়িল নৌকার খোলের মধ্যেই।

গলুয়ের উপর অলস-ভাবে গা এলাইয়া দিয়া বর্মিটা সিগারেট টানিতেছে। অনুজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় তাহাকে ভালো করিয়া যেন চেনা যাইতেছে না। ডি-সুজার মনে হইতে লাগিল: ম্লান জ্যোৎস্নার আলোয় পৃথিবীতে সমস্ত দিগ্‌দিগন্ত যেন অদ্ভুতভাবে রহস্যময়—আশে পাশে কি আছে এবং কি যে নাই—দূরের তটরেখা যেমন সম্ভব-অসম্ভবের অসংখ্য ছায়ামূর্তি রচনা করিয়া একটা অজ্ঞাত জগতের রূপ লইয়া বসিয়া আছে—বর্মির সঙ্গে ইহাদের সব কিছুরই কি একটা সামঞ্জস্য আছে হয়তো। পুরাণো হইয়া আসা হাতীর দাঁতের মতো তাহার মুখের রঙ—সিগারেটের আলোয় থাকিয়া থাকিয়া সেই মুখটা আভাসিত হইয়া উঠিতেছে।

অস্বস্তি লাগিতেছিল। নীরবতাটা যেন পীড়িত করিতেছে ডি-সুজাকে। কিছু একটা বলিবার জন্তই সে জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের আসামের খবর কি?

অনাসক্ত গলার জবাব আসিল, খুব খারাপ।

—খুব খারাপ? কেন?

—পার্বতীপুরের রেল-ইষ্টিশনে তিনজনকে ধরে ফেলেছে। সাত আট হাজার টাকাই জলে গেল। ওদিকের ও পথটায় আর সুবিধে হবে না মনে হচ্ছে।

ডি-সুজা ভীত হইয়া উঠিতেছিল।

—বল কি! আসামের কাজ বন্ধ হয়ে গেলে তো সবই গেল।

—প্রায় গেলই তো। এদিকেও পুলিশ খুব জোর দেবে বোধ হচ্ছে। যতটা সম্ভব সাবধান হয়ে থেকো, কোনরকম কিছু আঁচ না পায়।

ভয়টা মনের ভিতর হইতে আবার ঠেলিয়া উঠিতেছে। গঞ্জালেস কবে আসিবে কে জানে। জোহানকে আর বিশ্বাস নাই, সবই যখন জানিয়া ফেলিয়াছে, তখন যে সময় যাহা ইচ্ছা তাই সে অনায়াসে করিয়া বসিতে পারে।

উত্তেজিতভাবে ডি-সুজা বলিয়া ফেলিল, যথেষ্ট হয়েছে, এবার আমাকে ছেড়ে দাও তোমরা। আমি আর এসব গোলমালের মধ্যে থাকতে চাই না।

মুখ হইতে সিগারেট্ নামাইয়া বর্মি উঠিয়া বসিল। সে যে খুব বিস্মিত হইয়াছে মনে হইল না: যেন এমন একটা কথার জন্তই সে এতক্ষণ প্রতীক্ষা করিতেছিল। সংক্ষেপে বলিল, তুমি তো পর্তুগীজ। তোমার পূর্বপুরুষেরা সারা দুনিয়ায় লুঠতরাজ করে বেড়াত—সুন্দরী মেয়েমানুষ পেলেই ছিনিয়ে নিয়ে আসত, তাদের বংশধর হয়ে তোমার এত ভয় কিসের?

পূর্বপুরুষদের গৌরবময় কীর্তিকলাপ স্মরণ করাইয়া দিয়া তাহাকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিবার মতো কথার সুরটা তাহার নয়। বরং ইহার মধ্যে অত্যন্ত স্পষ্ট এবং তীক্ষ্ণ একটা খোঁচা আছে।

বহুদিন ধরিয়াই ডি-সুজা লক্ষ্য করিয়া আসিতেছে, শাদা জাতিগুলির উপর ইহার অতি-প্রকট খানিকটা ঘৃণা যখন তখন আত্মপ্রকাশ করিয়া বসে। হয়তো স্বাধীন ব্রহ্মের স্মৃতিটা এখনো ভুলিতে পারে নাই ; শৃঙ্খল গ্রহণ করিয়াছে বটে, কিন্তু মান্দালয়ের রাজশক্তি যে আবার একদিন জাগিয়া উঠিবে গৌরবের পূর্ণ রূপ লইয়া—একথা ইহারা আজও বিশ্বাস করে হয়তো। তাই শ্বেত জাতিগুলি ইহাদের ঘৃণার বস্তু। একদিন—এবং সে তো আর খুব বেশিদিন আগেই নয়—ভারতবর্ষের কূল উপকূল ঘিরিয়া তাহার পূর্বপুরুষেরা যে ভাবে অত্যাচারের আগুন জ্বালাইয়াছিল, বিবাহের রাত্রে চন্দন-চর্চিতা কন্যাকে যে ভাবে ছিনাইয়া আনিয়া বজরার অন্ধকারে রাক্ষস মতে নিজেদের অঙ্কশায়িনী করিয়াছিল, গর্বোজ্জ্বল এই সমস্ত কাহিনী শুনিয়া ওর চোখ প্রশংসায় উজ্জ্বল হইয়া ওঠে না। হাতীর দাঁত যেন কালো হইবার উপক্রম করে গ্র্যানাইটের মতো। ডি-সুজার মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, ভারতবর্ষের উপর এই হলদে মানুষটির বেশ খানিকটা তীব্র সহানুভূতিই জাগিয়া আছে হয়তো।...

তিক্তভাবে ডি-সুজা কহিল ভয় নয়। বুড়ো হয়ে গেছি, শরীরে এখন আর এসব পোষায় না। আর যে কটা দিন বাঁচব, কোনো ঝক্কির ভেতরে থাকতে চাই না।

সিগারেটটাকে জলে ফেলিয়া দিল বর্মি। আস্তে আস্তে বলিল, সে একটা কথা বটে। কিন্তু মুস্কিল হয়েছে এই যে, এ পথে ঢোকা সহজ, কিন্তু বেরোনো সহজ নয়। তাই যতদিন বাঁচবে, ততদিন এই কাজই করে যেতে হবে তোমাকে। আজ দলের থেকে বেরিয়ে গিয়ে কালই যে তুমি সবাইকে ধরিয়ে দেবে না—তার কোনো প্রমাণ আছে ?

ডি-সুজা ম্লান হইয়া গেল।

—আমাকে বিশ্বাস করো না তোমরা ?

একটু হাসিল সে। তারপর আবার আধশোয়ার ভঙ্গিতে গলুইয়ে গা এলাইয়া দিয়া জবাব দিল, বিশ্বাস করা কি এতই সহজ।

ডি-সুজা চুপ করিয়া রহিল। সত্যিই বিশ্বাস করা সহজ নয়। অবিশ্বাস, মিথ্যা আর অন্যায় লইয়াই যে ত্রিশ বৎসর ধরিয়া কারবার চালাইল, বুড়ো বয়সে দলকে দল ধরাইয়া দিয়া সে যে মোটারকম একটা কিছু পাইবার প্রত্যাশা করিবে সেটা তাহার পক্ষে কিছু অস্বাভাবিক হয় না।

নারিকেল বনের চূড়ায় খণ্ড চাঁদ। ডি-সুজা অন্যমনস্কের মতো দাঁড় টানিয়া চলিল। কিন্তু ইহারই মধ্যে হঠাৎ খানিকটা ঢোল ও করতালের শব্দ উঠিয়া মথিত করিয়া দিল আকাশকে। দূরে নদীর মাঝখানে নূতন জাগা ছোট বালুচরটার উপরে নোঙর ফেলিয়া দাঁড়াইয়া আছে একখানা বড় নৌকা। ঘোলাটে জ্যোৎস্নাতেও দেখা যায়, তাহার দু-দিকে ছোট ছোট দুটি পতাকা উড়িতেছে। দুই একটা আলো জ্বলিতেছে মিট্ মিট্ করিয়া, আর তাহারই সঙ্গে সঙ্গে ঝমর্ ঝমর্ করিয়া বাজনা বাজিতেছে।

সজোরে দাঁড়ে কয়েকটা টান দিয়া ডি-সুজা নৌকাখানাকে আনিয়া ফেলিল একেবারে কূলের কাছে। ঝোপ জঙ্গলের এলোমেলো ছায়ায় জ্যোৎস্না এখানে তেমন স্পষ্ট হইয়া পড়ে নাই। তাহারই আড়ালে আড়ালে নৌকা বাহিতে বাহিতে ডি-সুজা বলিল, জলপুলিশ।

—জলপুলিশ! বর্মি সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল।

ডি-সুজা বলিল, ভয় নেই আমাদের ধরবার জন্যে নয়। এখানে কয়েকদিন আগে মস্ত একটা ডাকাতি হয়ে গেছে, তারই খোঁজ-খবর নিতে এসেছে ওরা।

—ডাকাতি ? ডাকাতি কারা করেছে ?

—কারা করবে আর ? আমাদের গাজী সাহেবের দল নিশ্চয়ই।

—চালাক লোক গাজী সাহেব। এদিকে তো ঢের জমিদারী আছে, আফিঙের কাজেও রোজগার একেবারে মন্দ হয় না, আবার ডাকাতির ব্যবসাও চলছে বেশ।

জলপুলিশের নৌকাটা ডি-সুজার মনটাকে বদলাইয়া দিয়াছে আকস্মিকভাবে। বর্মিটাকে যেন এই মুহূর্তে আর ততটা খারাপ বলিয়া বোধ হইল না। দুঃসাহসিক—বেপরোয়া ডি-সুজা। জীবন ভরিয়া কীই না করিল সে। আজই না হয় খুনাখুনির ব্যাপারে চিত্তটা চমকিয়া ওঠে—পুলিশের নামে তটস্থ হইয়া ওঠে সর্বাঙ্গ, কিন্তু কর্মমাতাল জীবনে যেদিন জোয়ার আসিয়াছিল, সেদিন মৃত্যুর চাইতে সহজ আর কিছু আছে বলিয়াই মনে হয় নাই। আম্বালা ষ্টেশনের সেই শিখ ষ্টেশন-মাষ্টারটার কথা মনে পড়িতেছে। ডেভিডের কুড়ালের একটি কোপে তাহার মাথার গোলাপী পাগড়ি উড়িয়া পড়িয়াছিল—আর খুলিটা চুরমার হইয়া রক্ত আর ঘীলু ছিট্‌কাইয়া দেওয়ালে গিয়া লাগিয়াছিল। ফিন্‌কি দিয়া খানিকটা গরম রক্ত আসিয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছিল ডি-সুজার নাকে মুখে।

ডি-সুজা নড়িয়া চড়িয়া ঠিক হইয়া বসিল। একটু আগেই কি দুর্বলতা যে পীড়িত করিতেছিল তাহাকে। লোকটাকে এমন অবিশ্বাস করিবার কি আছে! এতদিন ধরিয়াই তো লিসিকে দেখিয়া আসিতেছে সে। কিছু একটা করিবার মতলব থাকিলে কি এর মধ্যেই করিতে পারিত না!

বর্মির কথার কোনো স্পষ্ট উত্তর না দিয়া ডি-সুজা নীরবে দাঁড় টানিতে লাগিল। জলপুলিশদের নৌকাটা অত্যন্ত কাছে আসিয়া পড়িয়াছে, হোগ্‌লাবন ঘেঁসিয়া অত্যন্ত সাবধানে চলিল ডিঙিটা। আফিঙের বাণ্ডিলটাও সঙ্গেই আছে। চ্যালেঞ্জ্ করিলে কেবল যে হাতে দড়ি পড়িবে তাই নয়, অনেকগুলা টাকাই বরবাদ হইয়া যাইবে একেবারে।

জল-পুলিশের তখন এদিকে ভ্রূক্ষেপ করিবার মতো মনের অবস্থা নয়। নিরালা নদীর বুকে বসন্তের রাত্রি। বাতাসে বাতাসে স্নিগ্ধ পেলবতা। দূর পশ্চিম হইতে বাংলা দেশের এই প্রত্যন্ত সীমায় এমন অপূর্ব পরিবেশের মধ্যে আসিয়া রীতিমত রঙীণ হইয়া উঠিয়াছে তাহাদের মন। যুক্ত প্রদেশের কোন এক অখ্যাত পল্লীগ্রামে সর্বাঙ্গে রূপার গয়না পরিয়া যেখানে তাহাদের প্রেয়সীরা ঘর্ ঘর্ করিয়া জাঁতায় গম ভাঙিতেছে, সেখানকার স্মৃতি মনশ্চক্ষের সামনে ভাসিয়া উঠিয়া তাহাদের উদাস করিয়া দিতেছে। একজন দস্তুর মতো গান জুড়িয়া দিয়াছে :

"আরে সাত সমুন্দর পার পিয়া বাসে
আহা আওনে মেরা পাস্ তাকত্ নেহি—"

সঙ্গে সঙ্গে ঢোল এবং করতালও চলিতেছে সমান উৎসাহে। বোঝা যাইতেছে, সাত সমুদ্র তেরো নদী পারে যে প্রেয়সীটি বিদ্যমান আছে এবং যাহার বিরহে গায়কের বিক্ষোভের সীমা নাই—সে প্রেয়সীটির সম্বন্ধে কেহই নিতান্ত উদাসীন নয়। ঢোলকের উপর যেভাবে উদ্দাম আক্রমণ চলিতেছিল, তাহাতেই সেটা বোঝা যাইতেছিল।

নীরবে খানিকটা পথ পার হইতে গান ও করতালের শব্দটা যখন ক্ষীণ হইয়া আসিল তখন বর্মি প্রশ্ন করিল—আর কতটা যেতে হবে?

ডি-সুজা জবাব দিল, দূর আছে। সামনের অন্ধকারে ওই যে কালো বাঁকটা—ওটা পেরোলে আরো প্রায় এক কোশ।

—গাজী সাহেব কি বলে আজকাল?

—কোকেনের কথা বলছিল। বলছিল, কিছু কোকেন আনাতে পারলে সুবিধে হয়।

বর্মি হাসিল, খাঁই আর মিটছে না। ডাকাতির ব্যবসাও তো চলছে।

—তা চলছে! গাজী মানুষ কিনা, তাই রক্তের থেকে লড়াইয়ের নেশা আজো মেটেনি।

—গাজীরা কি লড়ায়ে জাত নাকি?

—তা বই কি। গাজী মানেই তো তাই। যুদ্ধ আর ধর্ম-প্রচার এক সঙ্গে যারা করে, তারাই গাজী।

বর্মি হালকাভাবে একটা মন্তব্য করিল, সেইজন্যেই শাদা জাতের সঙ্গে তাদের এতটা মেলে বোধ হয়।

কথাটা অনাবশ্যকভাবে টানিয়া আনা—ডি-সুজা আবার গম্ভীর হইয়া গেল। আলো-আঁধারে মিশানো এই বিচিত্র কালো রাত্রির তলায় কেমন যেন মনে হইতেছে লোকটাকে এই রাত্রিকে—এই মুহূর্তকে যেন বিশ্বাস করা চলে না। বাতাসের ছন্দটা অত্যন্ত লঘু—যেন অস্ফুট ভাষায় কি একটা কথা ক্রমাগত বলিয়া চলিয়াছে। চিত্র-বিচিত্র পাখা মেলিয়া বুনো হাঁসের মতো নদীর জল ভাঁটার মুখে সমুদ্রের নীড়ে চলিয়াছে বিশ্রামের সন্ধানে। দাঁড়ের মুখে জল ভাঙিয়া লবণ মিশানো ফস্‌ফরাস্ থাকিয়া থাকিয়া চির্ চির্ করিয়া উঠিতেছে। এমন একটি রাত্রে—এমন একটি মুহূর্তে কত কি যেন অঘটন ঘটিতে পারে। ডি-সুজা মাথার উপরে আকাশের দিকে তাকাইল—নিশি-সমুদ্রে স্নান করিয়া অত্যন্ত উজ্জ্বলভাবে তারাগুলি দপ্ দপ্ করিতেছে। অন্তত বারোটার কম হইবে না। রাত্রির প্রহরী কাল-পুরুষ যেন সজাগ সতর্ক চোখ মেলিয়া চাহিয়া আছে আকাশে অরণ্যে জলে স্থলে একাকার স্বপ্নাচ্ছন্ন পৃথিবীর দিকে।

বর্মি আবার একটা সিগারেট ধরাইল। কাজের লোক সে। এলোমেলো চিন্তা মনের মধ্যে একের পর একে আসিয়া ভিড় করিতেছে। কালই নৌকা ছাড়িয়া হয়তো বা যাত্রা করিতে হইবে আকিয়াবের পথে। এদিককার অবস্থা দিনের পর দিন জটিল হইয়া উঠিতেছে—আর বেশিদিন এখানে কাজ চালাইলে সব মাটি হইয়া যাওয়া আশ্চর্য নয়। নুরুল গাজী অত্যন্ত হুঁসিয়ার ও স্বার্থপর—তাহাকে কোনদিনই বিশ্বাস করা যায় নাই। ডি-সুজা কাজের লোক, কিন্তু বয়স হইয়াছে, মনের দিক দিয়া সে পড়িয়াছে পিছাইয়া। এখন তাহাকে রাখাও যায় না, ছাড়াও যায় না। এ অবস্থায়—

এ অবস্থায় যা করা যাইতে পারে সে তাহা আগেই ভাবিয়া রাখিয়াছে। কাজটা নানাদিক দিয়া তেমন ভালো হয়তো দেখাইবে না, কিন্তু এ ছাড়া উপায় নাই আর। তা ছাড়া এই পর্তুগীজের দল। সিবাষ্টিয়ান গঞ্জালেস্‌ই যাহাদের আদর্শ পুরুষ, নৃশংসতাই যাহাদের বীরকীর্তির চরম নিদর্শন, তাহাদের সঙ্গে এ ছাড়া আর কি করা যাইতে পারে? শুধু পর্তুগীজ কেন, যে কোনো শ্বেত জাতিকেই যে সে সত্যি সত্যি দেখিতে পারে না, এ কথা তো আর অস্বীকার করা চলে না! (ক্রমশঃ)

মহাকালী

শ্রীনির্মল দাশ

এক নিঃশ্বাসে নিঃশেষ সব; রহিল না কিছু তলানি শেষ।
তুলিছ ওষ্ঠে সুরা পুনরায় তান্ত্রিক তুমি—বাহবা বেশ!
হাতে খর্পর নিঃশঙ্কিনী
সঙ্গে লক্ষ প্রেত সঙ্গিনী
রক্তাম্বরী রণ-রঙ্গিণী
নাচিছ ছড়ায়ে মুক্ত কেশ
'কারণবারি'রে ফের লহ তবে, রেখ না ক' মোটে বিন্দু শেষ।

কোজাগরী চাঁদ, শারদ জ্যোৎস্না—মিঠেল মধুর হা হা হা হো হো!
হেসে প্রাণ যায় ইহারাই নাকি কবির নেত্রে কি সমারোহ!
আঁধার হইতে আরো আঁধিয়ার
অমানিশীথিনী কি চমৎকার;
নাই তার দাম, নাই ক' বাহার
নাইক তাহার কিছুই মোহ?
হেসে প্রাণ যায় কোজাগরী চাঁদ—মিঠেল মধুর হা হা হা হো হো!

কালের চরণে আরাম আয়েস শান্তি ও সুখ রহিবে সুখে
ক্ষিপ্ত চরণে এস তবে কালী মৃত্যুমাতাল এস গো রুখে।
আনো মহামারী, মরণোৎসব
আনো ভৈরবী, আনো ভৈরব
সিদ্ধি নেশায় শিব যেথা শব
হানো পদাঘাত উগ্র সুখে
চরণ-চিহ্ন রবে শাশ্বত যুগ-সঞ্চিত কালের বুকে।

যুদ্ধোত্তর—বিশ্ব-শান্তি

শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়

অধিকাংশ পশুর মত মানুষও ছিল চতুষ্পদ। সামনের পা দুখানাকে 'হাত' সংজ্ঞা দিয়ে সে হ'লো দ্বিপদী। তারপর মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়ালো সবাইকে উপেক্ষা ক'রে, নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে।

জ্ঞানে বিজ্ঞানে মানুষ নিজেকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করেছে। বাস্তব শ্রীসম্পদে, আর অবাস্তব আধ্যাত্মিকতায় মানুষের দেহমনের সমকালীন উন্নতি আজ অবিসংবাদিত। মানব-সভ্যতার একমাত্র সম্পাদ্য, ভগবদ-বিশ্বাসের ভিত্তিতে বিশ্ব-মানবিক একাত্ম-বোধ। সেই ধ্যানধারণা নিয়ে মানুষ আজ অসঙ্কোচে বলতে পারে—

সর্ব্বম্ খল্বিদং ব্রহ্ম।

বলতে পারে—

সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তং সর্ব্বতোঽক্ষি শিরোমুখম্
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোঁকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।

জলে স্থলে অন্তরীক্ষে যানবাহনের স্বচ্ছন্দ গতিবিধি, তারে ও বেতারে দিগ্ দিগন্তের ভাবাভিব্যক্তি ও তথ্যজিজ্ঞাসা, এক কথায়—তন্ত্রে, মন্ত্রে ও যন্ত্রে মানুষ হয়ে উঠেছে দিগ্‌বিজয়ী। ভৌতিক জগতের এই সম্পদ বৃদ্ধি ও আত্মিক ভাবধারার এই সার্ব্বজনীন-সম্প্রসারণের মধ্যে আছে বিশ্বমানবিক ঐক্যীকরণের একটা বিরাট পরিকল্পনা। ইহা আশা ও আকাঙ্ক্ষার কথা। মানব সভ্যতার বর্ত্তমান বিক্ষোভ দেখে আশাবাদীরা বলছেন প্রসব-বেদনাক্লিষ্ট পৃথিবীর বুকে তিনিই আসছেন—যিনি সত্য, শিব ও সুন্দর।

আসুন তিনি, তবু বলবো মানুষ দ্বিপদী হ'য়ে দাঁড়ালেও জাতিতে ছিল চতুষ্পদ। নিমকাঠ খোদাই ক'রে জগন্নাথ তৈরি করলেও তার কাঠের তিক্ততা বর্ত্তমান থাকে। কেউ চিবিয়ে না দেখলেও, বিশ্ব-প্রকৃতির রূপরসগন্ধের অপরিবর্ত্তনীয় ধারাবাহিকতাই তার প্রমাণ। অতএব রক্তমাংসের পশুধর্ম্ম মানুষকে কখনই পরিত্যাগ করবে না। আত্মিক উন্নতি ও ভৌতিক সম্পদ বৃদ্ধির ফলে, মানুষের অভাব যতই দূর হোক্, সে তার স্বভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত আছে ও থাকবে। ব্যক্তির সাধনাকে এ বিষয়ে পতাকার গৌরব দিলেও, সমষ্টির হিসাব ভূপৃষ্ঠের চতুষ্পদকে ছাড়িয়ে উঠতে, কখনো পারে না। তার প্রমাণ বর্ত্তমান পশুশক্তির নির্লজ্জ নগ্ন-বিকাশ ও আসুরিক বলদর্পীদের ক্ষমতালাভের তীব্র প্রতিযোগিতা। মানব-সভ্যতার হর্ম্ম্যচূড়া ভেঙে পড়েছে।

এই সৃষ্টিনাশা হানাহানির ধ্বংসস্তূপে যাঁর কল্পিত আসন আমরা চাই রচনা করতে—তিনি হবেন সত্য, শিব ও সুন্দর। একথা ভাবলে যারা আনন্দ পান, তারা শৈব, সত্যনিষ্ঠ ও চিরসুন্দরের উপাসক—এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু এ জগতে শক্তির প্রচার ও প্রতিষ্ঠা চিরদিনই চলবে। শাক্তের কাছে সবাই মাথা নীচু করবে। যাঁর মুষ্ট্যাঘাত যত শক্ত, তাকে আমরা তত ভক্তি শ্রদ্ধা ও পূজা করি। ইহা জীবধর্ম্ম।

শক্তি দ্বিবিধ, ভৌতিক ও আত্মিক। এই দুই শক্তি আবার অঙ্গাঙ্গী-ভাবে সম্বন্ধযুক্ত। একের অভাবে অন্যের অপচয়, একের প্রভাবে অন্যের বিপর্য্যয় স্বাভাবিক হ'য়ে ওঠে। প্রাচ্যের আত্মিক উন্নতি ও প্রতীচ্যের ভৌতিক সম্পদবৃদ্ধির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে সেই সত্যই প্রমাণিত হয়। যে শক্তির মুষ্ট্যাঘাত যত জোরে মানুষকে আক্রমণ করেছে, সে তত শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছে। সে হিসাবে, ভৌতিক শক্তি অপেক্ষা আত্মিক শক্তির আঘাত প্রাচ্য ভূখণ্ডের অতি নিম্নস্তরের মানুষকেও কম অভিভূত করে নাই। যুদ্ধের কারণে, রাষ্ট্রের প্রয়োজনে, অব্যবস্থিত শাসন-নীতির ফলে, ভারতে আজ যে লক্ষ লক্ষ নরহত্যার অনুষ্ঠান হলো, তার চঞ্চলতাহীন শান্ত ও সংযত সমাধান প্রাচ্যেই সম্ভব—প্রতীচ্যে সম্ভব নয়।

পৃথিবীতে মানবসভ্যতা আজ পূর্ণাঙ্গ। দ্বিবিধ শক্তিরই পূর্ণ-বিকাশ। কিন্তু বিশ্বকর্ম্মার লৌহ-বাসরের কোথায় ছিল সেই ছিদ্রপথ—যে পথে বিষধর এসেছেন, মানুষের সভ্যতার দম্ভকে দংশন করতে? দ্বিবিধ উন্নতির পরাকাষ্ঠা নিয়েও মানুষ আজ আত্মরক্ষায় অসমর্থ কেন? চতুষ্পদরা দ্বিপদীদের এই দুরবস্থা দেখে হাস্যসম্বরণ করতে পারছে না। তারা ভাবছে—স্বাজাত্য ত্যাগ করেও মানুষ তাদের গণ্ডী ডিঙিয়ে যেতে পারে নি। শুধু নখদন্তায়ুধ না-হয়ে, মানুষ হয়েছে আজ বহুবিধ মারণাস্ত্রের অধিকারী বৈ তো নয়?

জীবধর্ম্মের মূলে আছে, আত্মসংরক্ষণ ও আত্মবিস্তারের আকাঙ্ক্ষা। দ্বিপদ, চতুষ্পদ বা বহুপদ, সবাই চায় সবিস্তারে বেঁচে থাকতে। সুতরাং স্বার্থসংঘর্ষ ও প্রতিযোগিতা জীবন ধারণের পথে অপরিহার্য্য। মানব সভ্যতার লক্ষ্য, এই সংঘাতকে নিয়ন্ত্রিত করা, প্রেম ও পবিত্রতার পথে পরিচালিত করা, সত্য, শিব ও সুন্দরের দিকে লক্ষ্য রেখে। কিন্তু কেন এমন হ'লো? হঠাৎ কোন্ দাহ্য বস্তু হ'লো, এই বহ্ন্যুৎসবের কারণ—অনুসন্ধানের বিষয়।

মানব-সভ্যতার প্রাথমিক দান—'ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও সমষ্টিগত স্বাধীনতা নিয়ে বেঁচে থাকার অধিকার।' কিন্তু দেশ-কাল-পাত্রভেদে বুদ্ধিজীবী মানুষের মধ্যে রুচিভেদ স্বাভাবিক। তাই, জলবায়ুর বৈষম্যে খাদ্যাখাদ্যের বিচার আছে—শীতোষ্ণ আবহাওয়ার প্রয়োজনে পোষাক-পরিচ্ছদের পার্থক্য আছে এবং চৈতন্যের হ্রস্বতা ও দৈর্ঘ্য অনুসারে বিস্তৃত মানব সমাজে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন শিক্ষা ও সংস্কৃতি। সুতরাং বিশ্বমানবকে কোনো একটি নির্দ্দিষ্ট 'ইজম্' বা বিশিষ্ট মতবাদের মধ্যে টেনে নেওয়ার চেষ্টা বাতুলতা। কোনো সমষ্টিগত স্বার্থবুদ্ধির প্ররোচনাতেই হোক্, বা বিশ্বমানবিক একাত্মবোধের অনুপ্রেরণাতেই হোক, সে চেষ্টা কখনই ফলপ্রসূ হ'তে পারে না। প্রকৃতির বৈচিত্র্যের প্রতি লক্ষ্য রাখলে—Unity in diversity ছাড়া, Unity for unification কখনই সম্ভব হবে না। ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির চাপে, যদি কোনো ইংল্যাণ্ডবাসী পাতলা ফিন্‌ফিনে আদ্দির 'পাঞ্জাবী' পরতে বাধ্য হন্, অথবা বিলাতি রেওয়াজের তাগিদে কোনো ভারতবাসীকে মোটা পশমের 'আলষ্টার' পরানো হয়—তাহলে একজন মরবেন শীতে কাঁপতে কাঁপতে, আর একজন মরবেন গরমে ঘামতে ঘামতে। কারণ, তাঁরা দুজনেই স্বধর্ম্মত্যাগী।

এখানে যে ধর্ম্মের কথা ওঠে, সে ধর্ম্মের নাম সামাজিক ধর্ম্ম। দেশ কাল পাত্র ভেদে এ ধর্ম্মস্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে মানুষ বাধ্য। জগতের সব মানুষ যদি কোনো শুভ মুহূর্ত্তে হঠাৎ একদিন হিন্দুধর্ম্ম, মুসলমান ধর্ম্ম, বা খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করে, তাহলেও মানব-সভ্যতার কোনো ক্ষতি হবে না, বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ভগবানরাও উত্তেজিতভাবে মারামারি কাটাকাটি করবেন না—কিন্তু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও সমাজধর্ম্ম না মানলে সেই সমাজের প্রত্যেকটি মানুষ ধ্বংস হবে। তার কারণ, একের খাদ্য অপরের বিষ—একের কৌতুক অপরের মৃত্যু।

আজ যাঁরা বিশ্বশান্তির আগ্রহ নিয়ে 'ভ্যাটিকানে'র দিকে চেয়ে আছেন—সত্য, শিব, ও সুন্দরের শুভাগমন প্রতীক্ষা করছেন—তারা এ বিষয়ে অবহিত থাকতে পারেন। অপরের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও সমাজধর্ম্মের উপর যদি অপর-কেউ প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা না করেন, জগতের প্রত্যেক মানুষটি যদি সম্প্রীতিসম্মত আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতালাভে সমর্থ হয়, তবেই মানব-সভ্যতা অক্ষুণ্ণ থাকবে—বিশ্বশান্তি সম্ভব হবে। নতুবা প্রভাব ও প্রতিপত্তির আগ্রহ নিয়ে মানুষের এ চতুষ্পদবৃত্তি চিরন্তন। পশুধর্ম্মই জয়ী হবে।

কথাশিল্পী প্রভাতকুমার

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

মাত্র কয়েক বৎসর আগে প্রভাতকুমারের তিরোধান হইয়াছে। এই অল্প দিনের মধ্যেই দেশের লোক তাঁহাকে ভুলিতে বসিয়াছে। বৎসরান্তে কোন সভা সমিতি বা সংঘ, কোন বিদ্বৎসমাজ বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করে না। তিনি বহুকাল ধরিয়া একখানি প্রথম শ্রেণীর মাসিকপত্রের সম্পাদক ছিলেন। সে মাসিকপত্র এখন আর নাই। তাহার সহযোগী বহু মাসিকপত্র এখনো জীবিত আছে। তাহারাও তাঁহার সম্বন্ধে সামান্য কর্ত্তব্যটুকু সম্পাদন করে না। যে প্রতিভাবান সাহিত্যিক রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিচিত্র বিশাল প্রবাহের অন্ততঃ একটি ধারাকে বহুদিন ধরিয়া পরিচালনা করিয়া বর্ত্তমান যুগের সাহিত্য-ভূমিতে বহু শাখায় বিকীর্ণ করিয়া গিয়াছেন—যিনি প্রায় চল্লিশ বৎসর ধরিয়া অনাবিল সাহিত্যরস বণ্টন করিয়া বঙ্গবাসীর চিত্তরঞ্জন করিয়াছেন, বহুবর্ষ ধরিয়া 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'র সম্পাদকতা করিয়া বঙ্গসাহিত্যকে নানা ভাবে সমৃদ্ধ করিয়াছেন, দেশের লোক এত অল্পদিনের মধ্যে যদি তাঁহাকে ভুলিয়া যায়—তবে বুঝিতে হইবে এদেশ আপন সাহিত্যের প্রতিই শ্রদ্ধা হারাইয়াছে। প্রভাতকুমারই যদি এত অল্পদিনের মধ্যে দেশের লোকের স্মৃতিপট হইতে অপসারিত হ'ন, তবে বর্ত্তমান যুগের লেখকরাই বা ভবিষ্যতের জন্য কতটুকু আশা পোষণ করিতে পারেন? বর্ত্তমান যুগের লেখকগণ যদি পূর্ব্ববর্ত্তী সুলেখকদের, বিশেষতঃ প্রভাত-কুমারের মত প্রতিভাবান্ সাহিত্যরথীর স্মৃতির সম্মান না করেন এবং তদ্দ্বারা শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিককে কেমন করিয়া সম্মান করিতে হয় দেশের লোককে তাহা না শিখাইয়া যান, তবে চক্ষু মুদিবার পর তাঁহাদের স্মৃতির কি দশা হইবে?

যাঁহারা তাঁহার সৌহার্দ্য, স্নেহ ও সাহচর্য্যে উপকার ও আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন—তাঁহাদের মধ্যে আমরা দুই চারিজন আজিও জীবিত আছি। আমরা তাঁহাকে নিত্যই স্মরণ করি বটে, কিন্তু প্রকাশ্যভাবে আমরাও আমাদের কর্ত্তব্য প্রতিপালন করি নাই—সেজন্য লজ্জিত ও অপরাধী। সেই অপরাধের কথঞ্চিৎ ক্ষালনের জন্য আমি তাঁহার রচনা সম্বন্ধে আজ দুই চারিটি কথা বলিতে চাই।

এদেশে বিদেশী সাহিত্যিকদের সহিত তুলনা করিয়া সাহিত্যিকদের অভিনব উপনাম দেওয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল। বঙ্কিমকে বলা হইত—বাংলার স্কট, গিরীশচন্দ্রকে বলা হইত বাংলার শেক্সপীয়র, রবীন্দ্রনাথকে বলা হইত বাংলার শেলী এবং প্রভাতকুমারকে বলা হইত বাংলার মোপার্সা। স্কট কেবল রোমান্স লেখেন নাই—তিনি কাব্য-রচয়িতাও ছিলেন। বঙ্কিম কেবল রোমান্স লেখেন নাই, তিনি এদেশের চিন্তাগুরু, ভাবনায়ক ও চিত্তসংস্কারক ছিলেন। কাজেই বঙ্কিমকে বাংলার স্কট বলা যায় না। গিরীশচন্দ্রকে বাংলার শেক্সপীয়র বলিলে অত্যুক্তি করা হয়, শেক্সপীয়রের গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা সূচিত হয়। শেলীর কাব্যাদর্শ রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভার ক্রমোন্মেষের একটা স্তর মাত্র—রবীন্দ্রনাথ যৌবনেই সে স্তর অতিক্রম করিয়াছিলেন। একদিন রবীন্দ্রনাথকে হয়ত বাংলার শেলী বলা চলিত কিন্তু পরে তাঁহাকে ঐ আখ্যা দিলে তাঁহার প্রতিভার প্রতি অবিচারই করা হয়। প্রভাতকুমারকে যে বাংলার মোপার্সা বলা হইয়াছিল—এই উপনামটি যথাযোগ্য বলিয়াই মনে হয়। অবশ্য প্রভাতকুমারের রচনায় মোপার্সার গল্পের মত নরনারীর যৌন জীবনের প্রাধান্য নাই। রচনাভঙ্গীর দিক হইতে বিচার করিলে উভয়ের রচনাভঙ্গীর সগোত্রতা আছে।

রবীন্দ্রনাথ এদেশে ছোটগল্প রচনার প্রবর্ত্তক। প্রভাতকুমার তাঁহার প্রথম ও প্রধান শিষ্য। রবীন্দ্রনাথ শুধু ছোট গল্পরচনার প্রবর্ত্তক নহেন—তিনি ইহার বিবিধ ভঙ্গীরও প্রবর্ত্তক। তিনি সেই ভিন্ন ভিন্ন ভঙ্গীর কোন একটি বিশিষ্ট ভঙ্গীর দুই চারিটি মাত্র গল্প লিখিয়া সেই ভঙ্গীটিকে যেন প্রভাতকুমারের হাতে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। সেই ভঙ্গীটির কথা আমি এখানে বলিব।

রবীন্দ্রনাথ একটি প্রবন্ধে বলিয়াছেন—

"কলাবিদ্যা যেখানে একেশ্বরী, সেইখানেই তাহার পূর্ণ গৌরব। সতীনের সঙ্গে ঘর করিতে গেলে তাহাকে খাটো হইতেই হইবে। বিশেষতঃ সতীন যদি প্রবল হয়। রামায়ণকে যদি সুর করিয়া পড়িতে হয়, তবে আদিকাণ্ড হইতে উত্তরাকাণ্ড পর্য্যন্ত সে সুরকে চিরকাল সমান একঘেয়ে হইয়া থাকিতে হয়, রাগিণী হিসাবে সে বেচারার কোনকালে পদোন্নতি হয় না। যাহা উচ্চদরের কাব্য, তাহা আপনার সঙ্গীত আপনার নিয়মেই যোগাইয়া থাকে, বাহিরের সঙ্গীতের সাহায্য অবজ্ঞার সঙ্গে উপেক্ষা করে। যাহা উচ্চ অঙ্গের সঙ্গীত, তাহা আপনার কথা আপনার নিয়মেই বলে, তাহার কথার জন্য সে কালিদাস মিল্‌টনের মুখাপেক্ষা করে না—তাহা নিতান্ত তোম-তানা-নানা করিয়াই চমৎকার কাজ চালাইয়া দেয়। ছবিতে, গানেতে, কথায় মিশাইয়া ললিতকলার একটা বারোয়ারি ব্যাপার করা যাইতে পারে, কিন্তু সে কতকটা খেলা হিসাবে—তাহা হাটের জিনিস—তাহাকে রাজকীয় উৎসবের উচ্চ আসন দেওয়া যাইতে পারে না।"

গল্প বলার একটা পৃথক আর্ট আছে, মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের একটা পৃথক আর্ট আছে, সমস্যা বিশেষের গতি, প্রকৃতি ও সমাধান লইয়া আলোচনা একটা পৃথক আর্ট, আর কবিত্ব সৃষ্টিও একটা পৃথক আর্ট বটেই। রবীন্দ্রনাথের উক্তি অনুসারে বিচার করিতে গেলে এই সকল আর্টের মিশ্রণ 'একটা বারোয়ারি ব্যাপার—রাজকীয় উৎসবের উচ্চাসন তাহা লাভ করিতে পারে না।' রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ কবি—কবিধর্ম্মের শাসনে তাঁহার মন গঠিত, বহু বিচিত্র সুরে তাঁহার হৃদয়তন্ত্রী যন্ত্রিত। স্বতই গল্পের আর্টের সঙ্গে কবিতা ও সঙ্গীতের আর্টের সাঙ্কর্য্য ঘটিয়াছে তাঁহার অধিকাংশ ছোটগল্পে। রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি নহেন—তিনি মনস্তত্ত্ববিশারদ। স্বতই তাঁহার অনেক ছোট গল্পের মধ্যে মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ অনেকটুকু স্থান জুড়িয়া বসিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের মনে দেশের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও পারিবারিক সমস্যাগুলি সর্ব্বদা সমাধানলাভের জন্য তাঁহার চিন্তাশক্তিকে আলোড়িত করিত। ক্রমে তাঁহার ছোট গল্প, কবিতা ও সঙ্গীতের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া সমস্যা-বিশ্লেষণ-কলাকে সঙ্গিনী করিয়া তুলিয়াছিল।

ছোট গল্পে এই যে সাঙ্কর্য্য, কবি যাহাই বলুন, 'খেলার জিনিসও হয় নাই'—'হাটের জিনিসও হয় নাই'—চমৎকারই হইয়াছে 'রাজকীয় উৎস-বের উচ্চাসনই লাভ করিয়াছে।' বিশেষতঃ গল্পের সঙ্গে কাব্যের মিলন বঙ্গসাহিত্যে একটি অপূর্ব্ব বস্তু।

কিন্তু তাঁহার বক্তব্যের মূল কথাটা ভুলি নাই—"কলাবিদ্যা যেখানে একেশ্বরী সেইখানেই তাহার পূর্ণ গৌরব।" এই সূত্র অনুসারে অবিমিশ্র গল্প-বলার আর্টের যে একটা বিশিষ্ট গৌরব আছে—তাহা তিনি স্বীকার করিয়াছেন—আমরাও তাহা শিরোধার্য্য করি। এই অবিমিশ্র গল্প বলার আর্টেরও তিনিই প্রবর্ত্তক। নিজের চিত্তে কবিধর্ম্মের প্রাধান্যের জন্য এবং অন্যান্য রসবৃত্তির প্রাবল্যের জন্য এই অবিমিশ্র আর্টটিকে তিনি নিজের জিম্মায় রাখিতে পারেন নাই। এই আর্টটিকেই প্রভাতকুমারের হস্তে

সমর্পণ করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। যোগ্য হস্তেই তিনি এ ভার দিয়াছিলেন। কারণ প্রভাতকুমার এই আর্টে চরমোৎকর্ষ দেখাইয়া গিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ প্রথম যৌবনে এই অবিমিশ্র আর্টের যে কয়েকটি নিদর্শন দেখাইয়া গিয়াছিলেন—তন্মধ্যে নিম্নলিখিত গল্পগুলি উল্লেখযোগ্য—মুক্তির উপায়, যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ, সমস্যা-পূরণ, রামকানাইএর নির্বুদ্ধিতা, প্রায়শ্চিত্ত, শুভদৃষ্টি, রাজটীকা, পুত্রযজ্ঞ, সদর ও অন্দর, ফেল. উলুখড়ের বিপদ ইত্যাদি।

প্রভাতকুমার রবীন্দ্রনাথের এই গল্পগুলিতে অনুসৃত যে অবিমিশ্র আর্ট তাহাই নির্বিচারে অনুসরণ করিয়াছেন। এখন এই গল্প বলার অবিমিশ্র আর্টের সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিতে চাই।

ঠাকুরমা সন্ধ্যাবেলায় নাতি নাতনীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া গল্প বলেন। নাতি-নাতনীরা গল্প শুনিতে শুনিতে কখনও আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে, কখনও আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে, কখনও দুঃখে অবসন্ন হইয়া পড়ে, তাহাদের চোখে জল আসে—কখনও কৌতূহলে উৎকর্ণ হইয়া তাহারা দুরু দুরু বুকে ঠাকুরমার কোলের দিকে ঘেঁসিয়া বসে। কিন্তু ঠাকুরমা নির্বিকার। গল্পের মধ্যে তিনি তাঁহার নিজের আনন্দ, বেদনা বা অন্য কোন মনোভাব সঞ্চারিত করেন না,—তিনি না হাসিয়া হাসান—না কাঁদিয়া কাঁদান। সর্ববিধ হৃদয়াবেগের আলিঙ্গন হইতে মুক্ত এই নির্বিকার তটস্থ ভাবটিই খাঁটি গল্পকথকের বা লেখকের মনোভাব। যাহা ঘটিয়াছে তাহাই যথাযথরূপে বলিয়া যাওয়া ছাড়া অবিমিশ্র গল্পের লেখকের আর কোন কর্ত্তব্য বা দায়িত্ব নাই। তিনি কোন প্রশ্নের জবাব দিতে বাধ্য নহেন। কেন ঘটিয়াছে—ইহা না ঘটিয়া উহা ঘটিল না কেন—কি ঘটিলে ভাল হইত—এসব কথার উত্তর তিনি দিতে পারেন না। পত্রবাহক যেমন আমাদের হাতে পত্রখানি দিয়াই দায়মুক্ত—পত্রের মসীময় অক্ষরাবলীর মধ্যে কতটা আনন্দ—কতটা অশ্রু, কতটা ভয়—কতটা আশা নিহিত আছে—তাহা আমাদেরই ভোগ্য—পত্রবাহকের তাহাতে কিছু যায় আসে না। খাঁটী গল্পের আর্টের ভাবটা অনেকটা এইরূপ।

এই গল্পলেখক ঐতিহাসিকের মতই নির্বিকার। ঐতিহাসিকের মতই সে কোন টীকাটিপ্পনী বা মন্তব্য প্রকাশ করে না। ঐতিহাসিক দৃশ্যমান জগতের কথক—গল্পলেখক কল্পজগতের কথক। তবে একটা মস্ত প্রভেদ ঐতিহাসিকের সঙ্গে এই—গল্পলেখকের বলিবার ভঙ্গী সরস, হৃদয়গ্রাহী বা চিত্তকর্ষক। আর ঐতিহাসিকের বলিবার ভঙ্গীতে পদে পদেই কৌতূহল নিবৃত্ত হয়—নিত্য দুই বেলা আহারের দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তির মত। গল্পলেখক কৌতূহলকে বহুক্ষণ ধরিয়া সচেতন ও উৎকর্ণ করিয়া রাখিয়া শেষে একেবারে পরিতৃপ্ত করেন, অনেক সময় অপ্রত্যাশিতের অবতারণা করিয়া বিস্ময়ের দ্বারা আনন্দের সঞ্চার করেন। এ যেন কিছুকাল অনশনে রাখিয়া তীব্র ক্ষুধার মুখে সহসা খাদ্য জোগাইয়া দেওয়া। বলা বাহুল্য, খাদ্যের স্বাদুতা ইহাতে বহু গুণে বর্দ্ধিতই হয়।

পাঠকের কৌতূহল লইয়া এই খেলা করাই অবিমিশ্র গল্পের আর্ট। বলিবার ভঙ্গীর এই বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে আস্তে আস্তে কাহিনীটিকে বিকশিত করিয়া তোলা—সেই সঙ্গে কথক-জনসুলভ একটা শান্ত নির্বিকার ভাব প্রভাতকুমারের গল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

তাঁহার গল্প বলিবার ভঙ্গীটি এমনি সরস এবং কৌতূহলোদ্দীপক ছিল যে, যে কোন সঙ্গীকে তিনি কথায় কথায় ভুলাইয়া পথের শেষ পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে পারিতেন। তাঁহার কথা-প্রবাহে কল্লোল ছিল না—ছিল হিল্লোল। কল্লোলের আঘাতে আঘাতে নয়—হিল্লোলের মৃদু মধুর সঞ্চালনে ভাসিতে ভাসিতে শেষ পর্য্যন্ত না গিয়া পাঠকের উপায়ান্তর ছিল না। পাঠকের ইচ্ছাশক্তিকে এইভাবে বশীভূত ও সম্মোহিত করিবার ক্ষমতা ছিল প্রভাতকুমারের গল্পের।

মস্তিষ্কের জন্য অনেক কিছু আছে—বিজ্ঞান আছে, দর্শন আছে—ধর্ম্মতত্ত্ব আছে—তত্ত্বমূলক কাব্য-নাট্য আছে। এ সমস্ত বিষয় আলোচনা করিয়া মস্তিষ্ক ক্লান্ত হইয়া পড়ে। তখন সে চায় এমন জিনিস—যাহাতে সে ক্লিষ্ট হইবে না, পিষ্ট হইবে না—অবিমিশ্র আরামের আনন্দটুকু পাইবে। এই লঘুসঞ্চার আনন্দ যে চায় সে হৃদয়াবেগের প্রখর উদ্দীপনাও চায় না। এ আনন্দ প্রভাতকুমারের মত আর্টিষ্টই দিতে পারেন। প্রভাতকুমারের ছোট গল্প মস্তিষ্ককেও আলোড়িত করে না—হৃদয়কেও আন্দোলিত করে না—উভয়কেই আনন্দ দেয়। আনন্দ দেওয়া ছাড়া তাহার আর কোন দাবী বা দায়িত্ব নাই।

এখন একটি কথা উঠিতে পারে—নির্বিকার কথকের উক্তি—তাহাতে উচ্ছ্বাস নাই—কথকের মনের সুখ দুঃখের যোগ নাই—পাত্রপাত্রীর প্রতি স্পষ্ট কোন সহানুভূতি নাই—তবে সরস হয় কি করিয়া? সরস হইয়াছে কতকটা বলিবার কৌশলে—কতকটা রঙ্গরসে। আর যেখানে কৌতুকরঙ্গ নাই, সেখানে আছে কথকের কণ্ঠের দরদ। কণ্ঠের দরদের দাম যে কতখানি—যে বাল্যকালে দিদিমা ঠাকুরমার মুখে গল্প শুনিয়াছে সেই জানে। এই কণ্ঠের ও রসনার দরদ প্রভাতকুমার তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ কৌশলে রচনায় সঞ্চারিত করিতে পারিতেন।

প্রভাতকুমারের সহযোগী কোন কোন গল্পলেখককে গল্পের প্লটের জন্য ছুটাছুটি করিতে দেখিয়াছি। তাঁহারা বিলাতী নভেল ও গল্প হইতে যত দূর সম্ভব প্লট সংগ্রহ করিতেন—রবীন্দ্রনাথের কাছেও তাঁহারা প্লট ভিক্ষা করিতে যাইতেন। প্রভাতকুমার বলিতেন—'প্লটের ভাবনা কি? বিধাতা চারিদিকে নিত্য নূতন গল্প রচনা করিতেছেন। প্লট চুরি করিতে হয় বিধাতার সৃষ্টি হইতে চুরি করিলেই হইল।'

প্রভাতকুমার চারিদিকে ছড়ানো বিধাতার রচনা হইতেই রচনার বিষয়বস্তু গ্রহণ করিতেন। তবে বাস্তবতন্ত্রী শিল্পীদের মত নির্বিচারে গ্রহণ করিতেন না। প্রভাতকুমার আদর্শবাদী ছিলেন না—খাঁটী বাস্তববাদীও ছিলেন না—তিনি ছিলেন বিচিত্রবাদী। বিধাতার সৃষ্টির মধ্যে যাহা কিছু কৌতূহল, বিস্ময় বা কৌতুক সঞ্চার করিত—গল্পের বিষয়-বস্তুর জন্য তিনি তাহাই নির্বাচন করিতেন। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক শ্রীকুমারবাবুর মন্তব্যও এখানে উৎকলন করি—"জীবনের খণ্ডাংশ নির্বাচনে, তাহার ছোটখাটো বৈষম্য ও অসঙ্গতির উদ্‌ঘাটনের দ্বারা তাহার উপর মৃদু হাস্য কিরণসম্পাতে আলোচনার লঘুকোমল স্পর্শে, দ্রুত অথচ অকম্পিত রেখাঙ্কনে সকল প্রকার গম্ভীরতা ও আতিশয্যের সযত্ন পরিহারে, আকস্মিক অথচ অভ্রান্ত যবনিকাপাতের সমাপ্তি কৌশলে—এই সমস্ত দিক দিয়াই তিনি উচ্চাঙ্গের নিপুণতার নিদর্শন দিয়াছেন।"

রঙ্গরসিকতা ছিল প্রভাতবাবুর গল্পের প্রধান আভরণ। প্রভাতকুমার যে যুগে সাহিত্য সাধনা করিয়াছেন সে যুগে বঙ্গসাহিত্যে একটা রঙ্গ-রসিকতার আবেষ্টনী ছিল। শত দুঃখ কষ্টের মধ্যেও রঙ্গরসিকতা করা অথবা হাস্যকৌতুকের মধ্যে দুঃখকষ্টকে ভুলিয়া থাকা বঙ্গদেশের বিশেষতঃ পশ্চিম-বঙ্গের অধিবাসীদের চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট্য। এখনও তাহারা চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ হারায় নাই। এই হাস্যকৌতুকের আবেষ্টনীর মধ্যে পশ্চিম বঙ্গের যে কোন শক্তিমান লেখক সাহিত্য রচনা করিয়াছেন তাঁহারই রচনা রঙ্গরসে স্বচ্ছ ও রঞ্জিত হইয়াছেন। যে সাহিত্যিক আবেষ্টনীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কবিতায়, গল্পে, নাটকে, দ্বিজেন্দ্রলালের গানে ও নাটকে, অধ্যাপক ললিতকুমারের নক্সায় ও রস-নিবন্ধে গিরিশচন্দ্র ও অমৃতলালের নাটকে রঙ্গরসিকতার মহামহোৎসব চলিতেছিল—প্রভাতকুমার সেই আবেষ্টনীর মধ্যে তাঁহাদেরই সহযোগী একজন শক্তিমান সাহিত্য-সেবক।

প্রভাতকুমার যৌবনে ব্যারিষ্টারি পড়িতে গিয়া বিলাতে কিছুকাল ছিলেন—তাহার ফলে দরিদ্র ইংরাজ গৃহস্থদের জীবনযাত্রা ও বিলাত-প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদের আচার ব্যবহারের সঙ্গে পরিচিত হ'ন। পরে কর্ম্মজীবনে তিনি বাংলা দেশের উকিল, ব্যারিষ্টার ও বিচারকদের জীবন ও কর্ম্মক্ষেত্রের সঙ্গে পরিচিত হ'ন। তিনি যখন গয়ায় ব্যারিষ্টার, তখন দেশে স্বদেশী আন্দোলনের খুব প্রকোপ। দেশের নামে তখন

বহু লোক অপ্রকৃতস্থ। এই সকল পরিচয় ও অভিজ্ঞতার মধ্যে তিনি যে সকল কৌতুকাবহ অসঙ্গতি লক্ষ্য করিয়াছিলেন—তাহা লইয়া তিনি গল্পে হাস্যরসের সৃষ্টি করিয়াছেন। চারিদিকে কত আন্দোলন, আলোড়ন, চাঞ্চল্য ও বিক্ষোভ, তাহার মধ্যে আর্টিষ্টের কূটস্থ আসনে বসিয়া প্রভাতকুমার যাহা কিছু অস্বাভাবিক, অসঙ্গত, অদ্ভুত ও বিচিত্র সেইগুলিকে সংগ্রহ করিয়া ভুবন ভুলানো আনন্দলোক রচনা করিতেন। ইহা যেন অনিত্যের সমুদ্র-মন্থনে নিত্যামৃতের উদ্ধার। এই অমৃতই তাঁহার হাসির গল্পগুলিতে সঞ্চিত আছে। প্রভাতকুমারের রঙ্গকৌতুকের বৈশিষ্ট্য আছে। রবীন্দ্রনাথের রঙ্গকৌতুক বুদ্ধিগম্য, অমৃতলাল, রজনীকান্ত ও দ্বিজেন্দ্রলালের রঙ্গকৌতুক উপভোগ করিবার জন্য বুদ্ধির সহায়তার প্রয়োজন হয় না। প্রভাতকুমারের রঙ্গকৌতুক দুইএর মাঝামাঝি। প্রভাতকুমার এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের অনুগামী।

রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের হাস্যরস সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, প্রভাতকুমারের রচনার হাস্যরস সম্বন্ধে সেই কথাই সম্পূর্ণ না হউক কতকটা প্রযোজ্য।

"নির্ম্মল শুভ্র সংযত হাস্য বঙ্কিমই সর্ব্বপ্রথমে বঙ্গসাহিত্যে আনয়ন করেন এবং হাস্যরসকে সাহিত্যের উচ্চশ্রেণীতে উন্নীত করেন। তিনিই প্রথম দেখাইয়াছেন—কেবল প্রহসনের সীমার মধ্যে হাস্যরস বদ্ধ নহে। উজ্জ্বল শুভ্র হাস্যজ্যোতির সংস্পর্শে কোন বিষয়ের গম্ভীরতার গৌরব হ্রাস হয় না, কেবল ভাষার সৌন্দর্য্য ও রমণীয়তার বৃদ্ধি হয়। তাহার সর্ব্বাংশের প্রাণ ও গতি যেন সুস্পষ্টরূপে দীপ্যমান হইয়া উঠে।"

বঙ্কিমচন্দ্রের মতই প্রভাতকুমারের রঙ্গরস "নিম্নাসনে বসিয়া শ্রাব্য অশ্রাব্য ভাষা উচ্চারণ করিয়া সভ্যজনের মনোরঞ্জন করে নাই।" *

প্রভাতকুমারের রুচি ছিল মার্জ্জিত। আজকালকার কোন কোন বাস্তববাদী কলা-সাহিত্যিক মনে করেন, যাহা কিছু সত্য, তাহাই সাহিত্যের বিষয়ীভূত হইতে পারে—এ বিষয়ে লজ্জা সংকোচ বা সতর্কতার প্রয়োজন নাই। প্রভাতকুমার তাহা মনে করেন নাই। তিনি মনে করিতেন যাহা কিছু বিচিত্র, অথচ শুচি সুন্দর তাহাই সাহিত্যের পদবীতে আরোহণ করিতে পারে। নরনারীর যৌনজীবনের বহু রহস্য শুচি সুন্দর ও রুচিসম্মত নয় বলিয়া তিনি যতদূর সম্ভব পরিহার করিয়া গিয়াছেন।

'লেডি ডাক্তার' ও 'সচ্চরিত্র' এই গল্প দুইটিতে অবৈধ প্রণয়ের কথা আছে বটে, কিন্তু প্রভাতকুমারের মনের স্বভাবসিদ্ধ আভিজাত্য তাহাতে সুরুচির সীমা অতিক্রম করে নাই।

অবিমিশ্র গল্পের ধারা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ-প্রবর্ত্তিত কাব্যাভিমুখী ধারার গল্পও প্রভাতকুমার দুই চারিটি লিখিয়াছেন। এই ধারার রচনাতেও তিনি কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ—ফুলের মূল্য, আদরিণী, বাল্যবন্ধু, কাশীবাসিনী, মাতৃহীনা, সতী ইত্যাদির নাম করা যাইতে পারে।

আদরিণী গল্পটিকেই ধরা যাক। কেবল কবিত্ব নয়, মনোবিজ্ঞানসম্মত তত্ত্বেরও মিশ্রণ আছে—এই গল্পে। † মানুষের চরিত্রে যদি একটা কোন বৃত্তি অতিরিক্ত প্রবল থাকে—তবে তাহা উৎকেন্দ্রিকতায় (Eccentricity) পরিণত হয়। তাহা সমস্ত জীবনের ভারকেন্দ্র স্থানচ্যুত করিয়া দেয়। ঐ উৎকেন্দ্রিকতাই হয় চরিত্রের ছিদ্রপথ। ঐ ছিদ্রপথ দিয়াই সর্ব্বনাশ প্রবেশ করে। ইহাই মনোজগতের প্রাকৃতিক নিয়ম। কিন্তু এইরূপ মানুষকে সকলেই ভালবাসে। তাহাকে প্রবঞ্চিত করে—তাহাকে লইয়া আমোদ করে—পরিহাস করে, আবার তাহার ব্যথায় ব্যথিতও হয়। এইরূপ চরিত্র আদরিণী গল্পের জয়রাম মোক্তার। লেখক ইহাকে লইয়া হাস্য পরিহাসও করিয়াছেন—ইহার প্রতি দরদে আবার তাঁহার প্রাণও বিগলিত হইয়াছে। জয়রাম ডাক্তার বড় হৃদয়বান্, সচ্চরিত্র, সজ্জন ব্যক্তি, কিন্তু তাঁহার আত্মাভিমান ছিল সমস্তকে ছাড়াইয়া। এই আত্মাভিমানই তাঁহার জীবনকে কেন্দ্রভ্রষ্ট করিল। আত্মাভিমানে আঘাত লাগায় মোক্তার হইয়াও জয়রাম হাতী কিনিয়া বসিল। হাতী পোষা কত শক্ত মোক্তার তাহা অভিমানের মোহে ভাবিয়া দেখিল না। আত্মাভিমান আনিল হাতী, হৃদয়ের স্বাভাবিক মাধুর্য্য তাহাকে করিয়া তুলিল আদরিণী। মৃগশিশু ভরতের পরকাল ধ্বংস করিয়াছিল—হস্তিনী জয়রামের ইহকাল ধ্বংস করিল। চড়িয়া বেড়ানোর জন্য হাতী পুষিলে মালিকের বেশি বড় হইবার

---

* প্রভাতকুমার যে কোন একটি তুচ্ছ বিষয় বা তুচ্ছ কথা অবলম্বন করিয়া কিরূপ কৌতুকরসের গল্প রচনা করিতে পারিতেন, তাহার একটি উদাহরণ দিই। I don't know বাক্যটির অর্থ 'আমি জানি না'। এই বাক্যটিকে বীজ স্বরূপ অবলম্বন করিয়া প্রভাতকুমার তাহা হইতে একটি পুষ্পিত পল্লবিত রসলতার সৃষ্টি করিয়াছেন। I don't know বাক্যটির অর্থ যদি কাহাকেও জিজ্ঞাসা করা যায়—তবে সে বলিবে "আমি জানি না।" যে ইংরাজি জানে সে মনে করিবে—ঠিক অর্থই ত বলিল। যে ইংরাজি জানে না—সে ভাবিবে লোকটা ঐ বাক্যের অর্থ জানে না। ইংরাজি-না-জানা লোকদের মধ্যে এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া একজনকে ঠকানো যায়। এজন্য দুজন চাই—একজন ঠকাইবে, আর একজন ঠকিবে।—আর চাই শ্রোতা হিসাবে ইংরাজি-না-জানা লোক। প্রভাতকুমার দুইটি গ্রামের মধ্যে দলাদলির সৃষ্টি করিয়া দুই গ্রামের দুইটি মাষ্টারের চরিত্রের অবতারণা করিলেন I don't know বাক্যটিকে রসে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য। এ জন্য নির্বাচন করিলেন সেই সময়, যে সময়ে ইংরাজি শিক্ষা গ্রামে প্রবেশ করে নাই, স্থান নির্বাচন করিলেন—রেলওয়ে ষ্টেশন ও শহর হইতে বহু দূরবর্ত্তী গ্রাম। ইংরাজি শিক্ষার জন্য উচ্চাভিলাষ গ্রামের মধ্যে জাগিয়াছে—সুশিক্ষিত মাষ্টার তখন পাওয়া যায় না। অল্পশিক্ষিত দুই মাষ্টার দুই প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রামে আশ্রয় লাভ করিল। তাহার সঙ্গে মাষ্টারদের বিদ্যাবুদ্ধি, চরিত্র ও আচরণের কথা আসিল, সেকালের গ্রামের আবহাওয়া আসিল, গ্রাম্য লোকের চরিত্র ও প্রকৃতির কথা আসিল—দলাদলির একটা ইতিহাস আসিল। এই ভাবে I don't know বাক্যটাকে অবলম্বন করিয়া একটি সম্পূর্ণাঙ্গ সরস বাস্তবরূপক গল্পের সৃষ্টি হইল। ঐ ইংরাজি বাক্যটিকে কেন্দ্র করিয়া মনে মনে যে গল্পের পরিধির সৃষ্টি হইল—সেই পরিধির সীমারেখা হইতে ধীরে ধীরে কেন্দ্রের দিকে গতিই গল্পের লিখিত রূপ। উচ্চশ্রেণীর গল্প ইহা নয়, কিন্তু কৌতুক সাহিত্যের ইহা একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত।

† মানবেতর জীবের প্রতি মানবের প্রীতি গল্পটির ভাবকেন্দ্র। ইতর জীবও মানুষের ভালবাসা অনুভব করে, তাহাতে সাড়া দেয় এবং ভালবাসার প্রতিদানস্বরূপ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে—প্রভাতকুমার এই গল্পে তাহা দেখাইয়াছেন। মানবপ্রীতি ইতর জীবে আরোপিত হইলে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয় এবং ইতর জীবের প্রতি এইরূপ প্রীতি মানুষের পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও সত্যও বটে। এই জন্য সকল দেশের সকল যুগের সাহিত্যে ইহার স্থান আছে। সংস্কৃত সাহিত্যে শকুন্তলার মৃগমৃগীর প্রতি বাৎসল্য অপূর্ব্ব রসরূপ লাভ করিয়াছে। মেঘদূতে পালিত ময়ূরকে যক্ষনারীর কৃতক পুত্র বলা হইয়াছে। সংস্কৃত নাটকে শুক সারীর আদরের কথাও আছে। পৌরাণিক সাহিত্যে রাজর্ষি ভরতের জীবনে জীবপ্রীতির চরমোৎকর্ষ দেখানো হইয়াছে। বৌদ্ধ সাহিত্যে অহিংসাত্মক জীবপ্রীতি নানা ভাবেই প্রকাশিত হইয়াছে। জাতক সাহিত্যে বুদ্ধদেব নানা জন্মে নানা জীবের দেহ ধারণ করিয়া মৈত্রী করুণার বাণী প্রচার করিয়াছেন। বৈষ্ণব সাহিত্যে গোজাতির প্রতি প্রীতি ও বাৎসল্য সখ্যরসেরই একটি অঙ্গ। হস্তীকে আশ্রয় করিয়া জীবপ্রীতি প্রদর্শন বিচিত্র। বিচিত্রবাদী প্রভাতকুমারের এই গল্প ছাড়া অন্য কোথাও নাই। প্রভাতবাবু 'কুকুর ছানা' গল্পেও জীবপ্রীতির একটি চমৎকার চিত্র দেখাইয়াছেন।

প্রয়োজন হয় না—নিজে ছোট থাকিলেও চলে। কিন্তু হস্তিনীকে মৃগীর মত আদরিণী করিয়া তুলিতে হইলে নিজেকে হস্তিনীর চেয়ে ঢের বড় করিয়া তুলিতে হয়। এই বৃহত্ত্বের আদর্শ রক্ষা করা বড়ই কঠিন। হস্তিনী আসিয়াছিল আত্মাভিমান তৃপ্তির জন্য—সে যখন হৃদয় জুড়িয়া বসিল, তখনই হইল অপরিহার্য্য। হস্তিনীর প্রতি গভীর ভালবাসাই এ গল্পে কাব্যের রূপ ধরিয়াছে। জয়রাম মোক্তারের আত্মাভিমান ছিল বিরাট, বিশাল হৃদয়ের প্রীতিও ছিল বিরাট, সে প্রীতি একটি বিশাল বস্তুকেও অবলম্বন করিয়াছিল। এই বিরাট আত্মাভিমানকে বিরাট স্নেহের উদ্দেশে বিসর্জ্জন দিয়া সে শিশুর মত অসহায় হইয়া পড়িল। ‡ বিরাটের পতনে যে Tragedy ঘটে, এই গল্পে সেই Tragedyই ঘটিয়াছে। গল্পটি রবীন্দ্রনাথের লেখনীর উপযুক্ত।

প্রভাতকুমারের অন্তর্দৃষ্টি ছিল প্রখর। তিনি একজন ব্যারিষ্টার ছিলেন—তাই বলিয়া ইঙ্গবঙ্গ সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন না। সাধারণ হিন্দু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে সমস্ত জীবন কাটাইয়াছিলেন। কলিকাতার ধনীসম্প্রদায় ও ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের বহু ব্যক্তির সহিত তাঁহার বান্ধবতা ছিল। হুগলী জেলার গুরুপ নামে গ্রাম ছিল তাঁহার পিতৃভূমি। ফলে, বাংলার সাধারণ পল্লীর জীবনযাত্রা, নগরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের জীবনযাত্রা, ধনীসম্প্রদায়, ব্রাহ্মসম্প্রদায়, বাঙ্গালী খৃষ্টানসমাজ ও ইঙ্গবঙ্গ সম্প্রদায়ের আচার আচরণ—এ সমস্তের সম্বন্ধেই তাঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। ইহা ছাড়া, ইউরোপ ভ্রমণ ও ইংলণ্ডে কিছুকাল বাসের ফলে সাহেবদের জীবনযাত্রার সহিতও তিনি পরিচিত ছিলেন। তিনি এই সকল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জনতার মধ্যে কোথাও নিমগ্ন বা নিরুদ্দেশ হ'ন নাই। সর্ব্বদা তটস্থ থাকিয়া তিনি আর্টিষ্টের সংস্কার-মুক্ত দৃষ্টিতে এই সকল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নরনারীর আচার আচরণ লক্ষ্য করিয়াছেন। এ যেন ধীবরের মত তটে থাকিয়া জলে না নামিয়া জাল ফেলিয়া মাছ ধরার মত সাহিত্যের উপাদান উপকরণ আহরণ।

এই বিচিত্র-পিপাসু শিল্পী এই সকল সম্প্রদায়ের যাহা কিছু বিচিত্র, অদ্ভুত, কৌতুহলোদ্দীপক ও কৌতুকাবহ লক্ষ্য করিয়াছেন—তাহাকেই তাঁহার নিজস্ব ভঙ্গীতে বাণীরূপ দান করিয়াছেন। তাঁহার তটস্থ রচনাভঙ্গীর সহিত তাঁহার এই তটস্থ দৃষ্টির সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে।

প্রভাতকুমারের যে সকল রচনায় হৃদয়ের যোগ আছে—সে সকল রচনায় হৃদয়াবেগের সংযম অসাধারণ। এই অসাধারণ সংযম প্রথমশ্রেণীর শিল্পীরই ধর্ম্ম। কোথাও তিনি অতিরিক্ত emphasis দেন নাই—হৃদয়োচ্ছ্বাসের বা বিদ্যাবত্তা-প্রকাশের লোভ তিনি সর্ব্বত্র সংবরণ করিয়াছেন—স্বাভাবিকতার সীমা কোথাও লঙ্ঘন করেন নাই। করুণকে অতি করুণ করিয়া তুলিলে যে সাহিত্যের রস অশ্রুজলে লোণা হইয়া যায় তাহা তিনি বুঝিতেন। যাহা তিনি কখনো নিজের চোখে দেখেন নাই, তাহা দেখাইবার চেষ্টা কোথাও করেন নাই এবং কোথাও চোখে আঙুল দিয়া দেখাইবার জন্যও ব্যস্ত হইয়া উঠেন নাই। কোনো বিষয়ে আতিশয্যকেও প্রশ্রয় দেন নাই, অসম্যক্ দীনতাকেও আশ্রয় করেন নাই। যথাযথের প্রতি এই গভীর নিষ্ঠা অদ্ভুত মাত্রাজ্ঞানের ফল। এই মাত্রাজ্ঞানের অভাব এ দেশের কথা-সাহিত্যের বহু রচনাকে অপাঠ্য করিয়া তুলিয়াছে।

প্রভাতকুমারের রচনায় বিষয়-বৈচিত্র্যের অভাব ছিল না, কিন্তু বলিবার ভঙ্গীতে নানাপ্রকার বৈচিত্র্য সম্পাদনের তিনি চেষ্টা করেন নাই। অবিমিশ্র কথা-সাহিত্যের যে ভঙ্গীটি তাঁহার সম্পূর্ণ নিজস্ব—সর্ব্বত্র সেই ভঙ্গীকেই তিনি অনুসরণ করিয়াছেন—এ বিষয়ে তিনি কোথাও স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পরধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই। অভিনবত্ব ও অপূর্ব্বতা সৃষ্টির জন্য বা চমক লাগাইবার জন্য তিনি রচনার ভাষায়, ভূষায় বা ভঙ্গীতে কোন প্রকার অস্বাভাবিক, অপরিচিত, অদ্ভুত বা উৎকট একটা কিছুর অবতারণা করেন নাই। প্রাকৃতজনের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য চেষ্টাও তাঁহার রচনায় নাই। তিনি অতিভাষণের পক্ষপাতী ছিলেন না—নিজের জীবনেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত মিতভাষী। লোকের আচার আচরণ ও কথাবার্ত্তা হইতে তথ্য সংগ্রহ ও সঞ্চয়ের দিকে এত বেশি অবহিত ছিলেন, যে নিজে কথাবার্ত্তায় যোগ দিয়া তিনি সুযোগ হারাইতে চাহিতেন না। যেটুকু না বলিলে রচনার কলাশ্রীর হানি হয়—কেবল সেইটুকুই বলিতেন। তাঁহার সামসময়িক কবিদের মধ্যে অক্ষয়কুমার বড়ালের রচনা এইরূপ মিত-ভাষায় পরিকল্পিত ছিল।

একবাক্যে বলিতে গেলে—প্রভাতকুমারের রচনাভঙ্গী অনাড়ম্বর, অমুদ্ধত, স্বচ্ছ, অনাবিল, শান্তসংযত, সুরুচিসঙ্গত ও শুচিসুন্দর। নিরাভরণা শান্তসংযতা মিতভাষিণী কল্যাণময়ী প্রৌঢ়া সুগৃহিণীর সহিত তাঁহার রচনাভঙ্গী উপমিত হইতে পারে।

প্রভাতকুমার নৈরাশ্যবাদী ছিলেন না—তিনি ছিলেন আশাবাদী। তিনি নিয়তিকে নৃশংসা রাক্ষসীর রূপে দেখেন নাই—তিনি তাহাকে দাক্ষিণ্যময়ী জননীর রূপে দেখিয়াছেন। তাঁহার রচনার পাত্রপাত্রীগুলি যেন নিয়তির দুলাল-দুলালী। এ দেশের জাতীয় জীবন নানা দুঃখ-কষ্টে ক্লিষ্ট—সেই দুঃখকষ্টের ফাঁকে ফাঁকে বর্ষা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে প্রভাত অরুণের আলোকচ্ছটার মত আনন্দের দীপ্তিও বিকীর্ণ হয়। প্রভাতকুমার এই আনন্দদীপ্তিগুলি তাঁহার রচনায় ধরিয়া রাখিয়াছেন। গভীর দুঃখ বা অন্তর্গূঢ় বেদনার অনুভূতি, দুর্ব্বিসহ বিরহ-বিচ্ছেদ, মর্ম্মন্তুদ লাঞ্ছনা-নির্য্যাতন ইত্যাদি লইয়া তিনি গল্প রচনা করেন নাই। তাঁহার কৌতুক-রসঘন নির্ব্বিকার রচনাভঙ্গীর সহিত সে সমস্তের সামঞ্জস্যও হইত না। তাহা ছাড়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল, দেশের লোককে আনন্দ দেওয়ার জন্যই গল্প রচনা—যাহাদের জীবনে দুঃখের অবধি নাই, তাহাদের কাছে নানাবিধ পরিচিত অপরিচিত কাল্পনিক ও বাস্তব দুঃখের চিত্র প্রদর্শন করিলে আনন্দ অপেক্ষা দুঃখই দেওয়া হয় বেশি। যে জাতির জীবনে দুঃখ নাই—সাহিত্যে দুঃখের বিলাস সে জাতিরই উপভোগ্য হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রভাতকুমার ঠিক বাস্তববাদী নহেন—তিনি বিচিত্রবাদী। পুরা বাস্তববাদী হইলে তিনি কেবল দুঃখচিত্রই আঁকিতে বাধ্য হইতেন। দুঃখ আমাদের দেশের লোকের পক্ষে এমনই স্বাভাবিক, সুপরিচিত ও অভ্যস্ত, যে তাহাতে বৈচিত্র্য নাই। বিচিত্রবাদী প্রভাতকুমার তাই তাঁহার রচনায় যতদূর সম্ভব দুঃখ-দুর্দ্দশাকে পরিহার করিয়াছেন। তাই বলিয়া তিনি দুঃখকে একে-বারে বর্জ্জন করিয়াছেন—এ কথা বলিলে সত্য বলা হইবে না। যেখানে দুঃখের কথা আসিয়াছে সেখানে তিনি দুঃখকেই চরম পরি-ণতি বলিয়া ঘোষণা করেন নাই—দুঃখের সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ-মুক্তির কথাই বলিয়াছেন। এমনও বলা যায়—আগে দুঃখের মোচন-পথ উন্মুক্ত রাখিয়া তিনি দুঃখদুর্গতির অবতারণা করিয়াছেন। দুঃখবেদনার গভীরতা লইয়া গল্পগুলি রচিত নয় বলিয়া গল্পগুলির মধ্যে কোন গূঢ় ব্যঞ্জার্থ নাই—সার্ব্বজনীন আবেদনের (universal appeal) দাবি নাই। সেজন্য

‡ "আদরিণী গল্পে মোক্তার জয়রাম মুখোপাধ্যায়ের পৌরুষ-দৃপ্ত অথচ স্নেহবিগলিত চরিত্রটি উচ্চাঙ্গের সৃষ্টিপ্রতিভার নিদর্শন। জয়রাম আমাদিগকে রবীন্দ্রনাথের নয়নজোড়ের বাবুর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়, কিন্তু কুসুমের ঠাকুরদাদার সে মনোবৃত্তি করুণ আত্মপ্রতারণা ও অতীতের কল্পনাবিলাস মাত্র, তাহা জয়রামের দৃপ্ত পুরুষকারের পক্ষে অর্জ্জিত ঐশ্বর্য্যের বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। হাতীটি বিক্রয় করিবার সম্ভাবনায় যখন সে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছে তখন ইহা নিছক ভাবালুতা (Sentimentality) মাত্র নহে। আত্মপৌরুষের পরাজয় লাভ এই অশ্রুপ্রবাহকে লবণাক্ত করিয়াছে। ছোট জিনিসের সহিত বড়র তুলনা করিতে গেলে নেপোলিয়নের সিংহাসন-বর্জ্জনের তীব্র গ্লানি ইহার মধ্যে কিয়ৎপরিমাণে সঞ্চারিত হইয়াছে।" (বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা)

গল্পগুলি রূপক-কথার সগোত্র নয়—রূপকথারই সগোত্র। রূপকথার মধ্যে যে 'বিচিত্র' শিশুমনকে তৃপ্ত করে—এইগুলির মধ্যে সেই বিচিত্রই বিস্ময়করতা ও সমাপ্তির চমক লইয়া আমাদিগের গল্প-পিপাসু মনকে মুগ্ধ করে।

প্রভাতকুমার শুধু ছোট গল্প লেখেন নাই, তিনি কয়েকখানি উপন্যাসও রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু ছোট গল্পে তিনি যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন—উপন্যাসে তেমনটি হয় নাই। ইহার স্বাভাবিক কারণও আছে। আমাদের সামাজিক ও জাতীয় জীবন বৈচিত্র্যহীন ও গতানুগতিক। এ জীবন উপন্যাসের প্রেরণা দেয় না। জাতীয় জীবনের উত্থানপতন ও সামাজিক জীবনের জটিলতা উপন্যাস রচনার সহায়ক। বঙ্কিমচন্দ্র নিজের চারিপাশে উপন্যাসের উপাদান না পাইয়া বাংলার অতীত জীবন ও ইতিহাস হইতে তাহা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। রমেশচন্দ্রও তাঁহার অনুগামী হইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের পর রবীন্দ্রনাথ তাঁহার রোমান্টিক দৃষ্টির দ্বারা আমাদের সামাজিক জীবনে কতকটা বৈচিত্র্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন—কিন্তু প্রধানতঃ রচনাভঙ্গীর অভিনবত্বের দ্বারাই তিনি বৈচিত্র্য ও জটিলতার অভাবের ক্ষতিপূরণ করিয়াছিলেন। বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের মত প্রভাতকুমারের Romantic দৃষ্টি ছিল না। তিনি অতীতের দিকে দৃষ্টি প্রেরণ করেন নাই—বর্ত্তমানেই উপাদান খুঁজিয়াছিলেন। কিন্তু উপন্যাসের উপজীব্য বৈচিত্র্য কিছু লক্ষ্য করেন নাই: অথচ উপন্যাসের ধারা রক্ষা করা কথাসাহিত্যিক হিসাবে তিনি নিজের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যের অঙ্গস্বরূপ মনে করিয়াছিলেন। ছোট গল্প রচনার যে আর্ট তাঁহার পক্ষে স্বভাবসিদ্ধ ছিল—সেই আর্টকেই তিনি উপন্যাস রচনাতেও প্রয়োগ করিয়াছেন। ফলে, তাঁহার উপন্যাস ছোট গল্পেরই বিবর্দ্ধিত রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। যে আয়ত, অখণ্ড ও বহুশাখ দৃষ্টি উপন্যাস সৃষ্টির প্রধান উপকরণ—সে দৃষ্টি তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল না। তাঁহার ঋজু, অনায়াত, খণ্ডিত খরদৃষ্টি জীবন ও ভুবনের কোন একটি বিশিষ্ট অঙ্গেই প্রতিফলিত হইত এবং সেই অঙ্গের যাহা কিছু গুপ্ত ও পরিস্ফুট সমস্তই তাঁহার রচনায় রূপ লাভ করিত। তাহার ফলে তাঁহার কোন কোন উপন্যাস অনেকগুলি ছোট গল্পেরই অঙ্গাঙ্গীভাবে গুম্ফিত রূপ লাভ করিয়াছে।

কেবল প্রভাতকুমার কেন, এযুগের অধিকাংশ ঔপন্যাসিক সম্বন্ধেই এই কথাই বলা যায়। বর্ত্তমান যুগধর্ম্মই কাব্য-সাহিত্যে গীতিকবিতার এবং কথাসাহিত্যে ছোট গল্পেরই অনুকূল। ছোট গল্পই কথাসাহিত্যের ব্যালাড বা লিরিক। এ যুগে মহাকাব্য আর রচিত হয় না। বড় কাব্য যিনিই রচনা করিতে গিয়াছেন—তিনিই হয় বড় লিরিক লিখিয়াছেন—নয়ত অনেকগুলি লিরিকের একত্র গুম্ফন করিয়াছেন। উপন্যাস সম্বন্ধেও সেই কথা। শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ উপন্যাসই ছোট গল্পের বিবর্দ্ধিত রূপ।

পক্ষান্তরে উপন্যাসের অনেক ধর্ম্ম বর্ত্তমান যুগে ছোট গল্পের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছে। যেমন—সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ, সামাজিক ও নৈতিক জীবনের সমস্যালোচনা, নরনারীর নব নব সম্বন্ধের অবতারণা, তাহাদের চরিত্রের ও চিন্তার জটিলতা, নানা তত্ত্বের দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ ইত্যাদি। প্রভাতকুমার উপন্যাসের এই সকল উপজীব্যকে ছোট গল্পের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া ছোট গল্পের স্বকীয় বিশিষ্ট ধর্ম্ম ক্ষুণ্ণ করেন নাই।

যাহাই হউক, প্রভাতকুমারের নবীন সন্ন্যাসী, রত্নদীপ ও সিন্দুর-কৌটা—এই তিনখানি উপন্যাসকে উপেক্ষা করা চলে না। সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে—এই উপন্যাসগুলিতে প্রভাতকুমারের সামাজিক জীবনের সর্ব্বস্তরের সহিত পরিচয়, প্রখর অন্তর্দৃষ্টি ও চরিত্রাঙ্কনের প্রতিভার নিদর্শন পাওয়া যায়। উপন্যাসগুলি ঘটনা পরম্পরার বিচিত্র সমাবেশের দ্বারা পরিকল্পিত। মনস্তত্ত্বের জটিলতা এইগুলিতে নাই বটে, কিন্তু কোন কোন চরিত্রের গূঢ় অন্তস্তল পর্য্যন্ত উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। প্রভাতকুমার ভারতের বহু স্থলে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। এই সকল ভ্রমণের অভিজ্ঞতা উপন্যাসগুলিতে একদিকে যথাযোগ্য পরিবেষ্টনী সৃষ্টির সহায়তা করিয়াছে, অন্যদিকে মানুষের জীবনারণ্য হইতে পাঠককে মুক্তি দিয়াছে। শ্রীকুমারবাবু প্রভাতকুমারের উপন্যাসগুলি সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন—তাহা এখানে উদ্ধৃত করি।

"আমাদের বাঙ্গালীর স্বল্পপরিসর জীবনে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৈষম্য ও অসঙ্গতি, যে অলীক আশা ও কল্পনা, যে অতর্কিত দৈব সংঘটন ও ভুলভ্রান্তি হাস্যরসের উপাদান সৃষ্টি করে, সেগুলির উপর তাঁহার অকুণ্ঠিত অধিকার। তাঁহার উপন্যাসে কোন তীক্ষ্ণ কণ্টকিত সমস্যা মনকে বিদ্ধ করে না। কোন হৃদয়গত প্রহেলিকা বিভীষিকাময় ছায়া বিস্তার করে না, শোকমৃত্যুর অসহনীয় তীব্রতা চিত্তকে ভারাক্রান্ত করে না। তাঁহার উপন্যাসের পৃষ্ঠায় যে জীবনযাত্রার আমরা সন্ধান পাই, তাহার লঘু তরল প্রবাহ, সরল নির্দ্দোষ হাস্যপরিহাস সমস্যাভার-মুক্ত স্বচ্ছন্দগতি আমাদিগকে মুগ্ধ করে ও জীবনের যে আর একটা দুর্ব্বোধ্যসমস্যাসঙ্কুল দিক্ আছে—তাহা আমরা সাময়িকভাবে বিস্মৃত হই। * * তাঁহার সূক্ষ্ম সুকুমার পরিমিতি বোধ, তাঁহার অতন্দ্র সুরুচিজ্ঞান, সকল প্রকারের আতিশয্য হইতে সভয়ে পিছাইয়া গিয়াছে। এমন কি তাঁহার উপন্যাসের দুষ্ট লোকেরাও (villain) তাঁহার স্নিগ্ধ ক্ষমাশীল সহানুভূতির দ্বারা অভিষিক্ত হইয়াছে। * * এই সহানুভূতি, কঠোর নীতিবিচারের অভাব, এই পাপপুণ্যের অপক্ষপাত সমদর্শিতা ও পাপের প্রতি মৃদু সস্নেহ তিরস্কার—তাঁহার উপন্যাসের আকর্ষণের একটি প্রধান হেতু।"

এই হিসাবে প্রভাতকুমার বর্ত্তমান যুগের কথাসাহিত্যের অগ্রদূত। মানবচরিত্র দোষেগুণে জড়িত—তাহার জীবন মেঘ রৌদ্রের খেলা। আলো ও ছায়ার যথাযোগ্য সম্পাতেই তাহার স্বরূপটিকে প্রকাশ করিতে হয়। ইহাই স্বাভাবিক—ইহাই সত্য। শিল্পীর ইহাই লক্ষ্য করিবার বস্তু—নীতিপ্রচারকের দৃষ্টি ও লক্ষ্য স্বতন্ত্র। কেহই সম্পূর্ণ মন্দ নয়—কেহই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নয়। দুর্য্যোধন রাবণও সম্পূর্ণ মন্দ নয়, রাম-যুধিষ্ঠিরও সম্পূর্ণ নিশ্ছিদ্রচরিত্র নয়। অসৎকে ঘোরতর অসৎরূপে অঙ্কন করা কিংবা সৎকে অসামান্য সৎ করিয়া তোলা দুইই আতিশয্য। এই আতিশয্য শিল্পীর বর্জ্জনীয়।

পাপের যে দণ্ড স্বাভাবিক তাহার বেশি দণ্ডবিধান নীতিপ্রচারকের কার্য্য—শিল্পীর নয়। তাহাতে আমাদের সুবিচারবোধের (sense of justice) পরিতৃপ্তি হইতে পারে—রসবোধের তৃপ্তি হয় না। লঘু পাপে গুরুদণ্ড বিধান একপ্রকারের আতিশয্য, তাহাও শিল্পীর বর্জ্জনীয়।

মানুষ স্বভাবতঃ দুর্ব্বল। অন্নগত দৈন্য যেমন কৃপার বস্তু—চরিত্রগত দৈন্য তেমনি কৃপার বস্তু—অন্ততঃ শিল্পীর চক্ষে। শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজে জ্যাঠাইমা যখন রমেশকে হীনপ্রকৃতি পল্লীবাসীদের জন্য মাথা ঘামাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন—তখন রমেশ যাহা বলিয়াছিল—তাহাই শিল্পীর বক্তব্য। পাপীর প্রতি এই যে কৃপা—এই যে ক্ষমার ভাব—তাহা পাপের প্রতি সহানুভূতি নয়, হতভাগ্যের জন্য দরদ। এ বিষয়ে শিল্পী ও ধর্ম্মগুরুদের দৃষ্টিতে প্রভেদ নাই।

মানুষের জীবনে অনেক সময় পাপের দণ্ড হয়ই না—ইহাও অস্বাভাবিক নয়। শিল্পী যদি সাহিত্যের মধ্যে স্পষ্টভাবে পাপীর দণ্ড একেবারে নাই দেখান—তাহাতেও দোষ হয় না। পাপকে সমর্থন করাও অবশ্য শিল্পীর কাজ নয়। পাপ ও পুণ্যে সমভাবে ঔদাসীন্য শ্রেষ্ঠ কথা-শিল্পীর লক্ষণ।

প্রভাতকুমারের যে নির্বিকার নিরপেক্ষ তটস্থ দৃষ্টির কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি—সেই দৃষ্টিতেই তিনি পাপ ও পুণ্য উভয়কেই দেখিয়াছেন। পাপ ও পুণ্যের লীলাবৈচিত্র্যের যথাযথ আখ্যানই তাঁহার কাজ—ব্যাখ্যান তাঁহার কাজ নয়। এ বিষয়ে কোন দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেন নাই—নীতিবিচারের দাবি তাঁহার নাই। পাপপুণ্য সম্বন্ধে এই সাহিত্যিক সত্য বর্ত্তমান যুগের কথা-সাহিত্যিকগণ বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন। প্রভাতকুমার এ বিষয়ে তাঁহাদের গুরুস্থানীয়।

কাব্য ও আধুনিক কাব্য

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

আমার বক্তব্য বিষয় হচ্ছে, কাব্য ও আধুনিক কাব্য। রসজ্ঞ সমালোচক বল্‌বেন, এটা **paradoxical** বা স্ব-বিরোধী উক্তি কারণ ; কাব্য এক বস্তু এবং আধুনিক কাব্য আর এক বস্তু—কাব্য বিচারে এ পার্থক্যের কোনো মূল্য নাই। অতীত, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যত পাঠকগণের কাছে রস-পরিবেশক সত্যকার কাব্যই কাব্য। সময় নির্দ্ধারণের জন্য তাকে 'আধুনিক' বা 'সাম্প্রতিক' আখ্যা দেওয়া যেতে পারে কিন্তু সেটা কাব্যের বিশেষণ ততটা নয় যতটা সেটা উপলক্ষণ। রসোত্তীর্ণ কাব্যই কেবল কালোত্তীর্ণ হয়ে বেঁচে থাকতে পারে ; কোনো বিশিষ্ট কাল যদি তার পরমায়ু নির্দ্দেশ করে দেয় তাহ'লে তার আনন্দ দানের শক্তিও বিশেষ ভাবে সীমাবদ্ধ বলতে হবে। কাজেই সময় নির্দ্দেশ ছাড়া কাব্যের পরিচয় জ্ঞাপনের পক্ষেও "আধুনিক কাব্য" কথাটা অবান্তর বলে মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের কথায় বলা যায় "বিশেষ একটা চাপরাশ-পরা সাহিত্য দেখ্‌লেই গোড়াতেই সেটাকে অবিশ্বাস করা উচিত। তার ভিতরকার দৈন্য আছে বলেই'চাপরাশের দেমাক বেশি হয়। কোনো একটা উদ্ভট রকমের ভাষা বা রচনার ভঙ্গী বা সৃষ্টিছাড়া ভাবের আমদানির দ্বারা যদি একথা বলবার চেষ্টা হয় যে, যেহেতু এমনতরো ব্যাপার ইতিপূর্ব্বে কখনো হয়নি, সেই জন্যই এটাতে সম্পূর্ণ নূতন যুগের সূচনা হ'ল, সেটাও অসঙ্গত।" আসল কথা, যে যুগের কাব্যই হোক্ না কেন, সেটা সত্যকার কাব্য হল কিনা সেইটাই বিচারের বিষয়।

বাঙলা কাব্যের গঠন রীতি, বিন্যাস পদ্ধতি এবং রস ও অলঙ্কার সম্পর্কে বাঙলা সাহিত্যে দু'খানি বই উল্লেখযোগ্য ; যথা "কাব্য জিজ্ঞাসা" (অতুল গুপ্ত) এবং "কাব্য পরিমিতি" (যতীন্দ্র সেনগুপ্ত)। বস্তুতঃ কাব্যের বৈজ্ঞানিক আলোচনার জন্য "কাব্য পরিমিতি" বিশেষ কাজে লাগে। বর্ত্তমান প্রবন্ধের সূচনা বা সূত্র আমি তা'তে পেয়েছি।

কাব্য রসের স্থান

আমি মনে করি কাব্যে রসের স্থান সকলের উপরে, যে রস আলঙ্কারিকদের মতে ব্রহ্মস্বাদ-সোদর অর্থাৎ ব্রহ্ম আস্বাদের সমান। এই রস থাকে কবি চিত্তে, কবি সেই রস কাব্য-ধারায় পান করান পাঠক চিত্তকে। এ রস অনুভূতিসাপেক্ষ—সংজ্ঞা বা বর্ণনায় তাকে প্রকাশ করা যায় না। কাব্যের রস প্রথম কবির মনে পরিণতি লাভ করে, তারপর কবির লেখনী-মুখে সেটা অভিব্যক্ত হয় একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রসোত্তীর্ণ কবিতায়। পাঠক চিত্ত সেই রসে অভিষিক্ত হয়। যে আনন্দে নিমগ্ন হয়ে কবি কাব্য রচনা করলেন, সেই আনন্দ কাব্য-পাঠে লাভ হ'ল পাঠকের। কবিচিত্ত ও পাঠকচিত্তের মধ্যে রসের আনন্দ ধারায় যোগাযোগ সৃষ্টি হ'ল এইখানে। কাজেই শুধু ভঙ্গীটাকে বড় করে' কোনো কাব্যের বিচার চলে না। সাম্প্রতিক কবিরা "আঙ্গিক" নিয়ে যতই অঙ্গচালনা করুন না কেন, শুধু অঙ্গটা কোনো দিন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর কবিতার সৃষ্টি করতে পারবে না—এর প্রমাণ আমরা সাময়িক পত্রের পাতায় পাতায় দেখ্‌তে পাচ্ছি।

তবে আমি চিরকালই আশাবাদী এবং আধুনিক সাহিত্যের প্রতি আমি কোনো দিনই বিরূপ নই। আধুনিক কালের বাস্তবতার সংস্পর্শে এসে আমি যে কবিতা লিখে থাকি তাতে 'সাম্প্রতিক' কবিতার কাঠামো থাকাও আশ্চর্য্য নয়। তবে 'আঙ্গিক'এর অতি-অভিনয়ে মনকে পীড়া দিলেও আমি সাম্প্রতিক কবিদের সংস্কারক সেজে বসেছি—এ যেন কেও মনে না করেন।

মানুষের প্রথম ও শেষ পরিচয় এই মাটির সঙ্গে—কাজেই কবি মাটির মায়া ছেড়ে, পৃথিবীর বন্ধন কাটিয়ে এমন কোনো জগতের পরিচয় জানেন না—যার অধিবাসীরা তাঁকে অভাবনীয় কোনো মাল মশলার যোগান দিবে, অচিন্তিতপূর্ব্ব কোনো কাব্য রচনার জন্য। কাজেই কাব্য-জগৎ বস্তু-জগৎ ছাড়া নয়—অর্থাৎ বাস্তবের সঙ্গে তার যোগ থাক্‌বেই। একই বস্তু-জগতে কবি ও পাঠক থাকেন, রসিক থাকেন, অরসিকও থাকেন, যদিও 'অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং শিরসি মা লিখ, মা লিখ।'

ভাব ও ভাবস্মৃতি

বস্তু বা বিষয়ের সঙ্গে কবি-মনের ঘাত প্রতিঘাতে 'ভাব'-এর উৎপত্তি হয়, কেও কেও একে বলেন Emotion—কিন্তু চিত্তের বৃত্তি হচ্ছে ভাব বা ভাবাবেগ। অলঙ্কার শাস্ত্রে একে 'ভাব'ই বলা হয়েছে। এই ভাব শাস্ত্রকারগণ নয়টি ভাগে বিভক্ত করেছেন। রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা, বিস্ময় ও শম। এগুলি মানবমনের স্থায়ী ভাব। এগুলি ছাড়া অস্থায়ী ভাব আছে—তাকে বলে সঞ্চারী ভাব। সঞ্চারী ভাব যুগে যুগে আসে যায়—কখনো দুর্ব্বল কখনো প্রবল, কিন্তু আগেকার নয়টি ভাব মানবমনের চিরন্তন সম্পদ। মানুষের মত কবির মনও এগুলির প্রভাবের অধীন। এই ভাব-সম্পদ হতেই কাব্যের প্রেরণা আসে কবির প্রাণে। এই সম্পর্কে "কাব্য-পরিমিতি"র উদাহরণটি চমৎকার। মাটি যেমন তার অন্তরের রসে বেলা চামেলী গোলাপ ও রজনীগন্ধায় ধরণীকে বিভোর করে তুলছে—কবি তেমনি ভাবের রসে কাব্যকে নানা রূপে, নানা রসে, নানা গন্ধে তরঙ্গায়িত করে তুলছে ; নানা বিচিত্র কল্পনায় তার রূপের বৈচিত্র্য আমাদের মুগ্ধ করে রাখছে।

কিন্তু শুধু ভাবের উদ্রেকেই কবিতার উৎপত্তি হয় না। ভাবের উদয়ের পর তার স্মৃতি কবিচিত্তে জমা থাকে—'কাব্য পরিমিতি' তাকে বলেছেন 'ভাবস্মৃতি।' ভাবস্মৃতিকে কবি-কল্পনা সজাগ করে তোলে, কবিচিত্তে তখন চলে কবিতার গুঞ্জন, ছন্দে ছন্দে, তালে তালে, মাত্রায় মাত্রায়, যতিতে যতিতে, সেই 'ভাব-স্মৃতি' ঝঙ্কৃত হতে থাকে—প্রকাশের বেদনা তখন সুমধুর মূর্চ্ছনায় অধীর হয়ে ওঠে—তার পরিপূর্ণ পরিণতিতেই হয় প্রকৃত কাব্যের সৃষ্টি। জারমান কবি 'হাইনে' এই ভাব-স্মৃতিকে জাগিয়ে তোলবার জন্য বল্‌ছেন,—

> **Rise, old dreams, at this my bidding !**
> **fling thy gates wide, heart O' mine !**
> **Lo ! a mystery of sweet weeping**
> **And a flood of song devine.**
>
> **(Heine)**

রস ও আনন্দ

আর একটা মতও আছে—যথা : "কবিচিত্ত যদি আপনার সৃজন ক্ষেত্রে আপনি ডুবে যায় তবে তার সৃষ্টিশক্তি বা প্রতিভার দুর্ব্বলতাই সূচিত হয়। কবিকে আত্মসচেতন থাকতে হ'বে—তা'হলেই তার পক্ষে আনন্দলোকে অনায়াসে বিচরণ করা সম্ভব হবে। অর্থাৎ কবিকে ভুললে চলবে না যে তার উদ্দেশ্য রসকে নিজে ভোগ করা নয়, রসকে অপরের ভোগ্য করা ; সে ভোক্তা নয়, সে স্রষ্টা, সে প্রজাপতি নয়, সে মধুমক্ষিকা ; রসের মধ্যে ডুবে থাকার আনন্দ তার নহে, রসসমুদ্র সন্তরণ করে তাকে তীরে উঠ্‌তে হবে।" এ মতের সঙ্গে সায় দেওয়া যায় না, কারণ কবি একেবারেই রসভোক্তা নন, একথা স্বীকার করা যায় না।

এই মত যিনি পোষণ করেন তিনি নিজে কবি—কাব্য পরিমিতির লেখক। তিনি রসে ডুবে না গেলে, যে অসংখ্য রসোত্তীর্ণ কবিতা লিখে তিনি আমাদের আনন্দ দিয়েছেন সেটা কখনই সম্ভব হ'ত না।

তবে আত্মসচেতন থাক্‌তে হবে একথা ঠিক, কিন্তু তাই বলে রসসমুদ্র সন্তরণ করেই যদি কবি জীবন কাটান, রসের মধ্যে ডুবে না যান, তাহলে ব্রহ্ম-আস্বাদের সোদর যে আনন্দ, সে আনন্দ থেকে তাঁকে চিরবঞ্চিত থেকে যেতে হয়। আনন্দ সৃষ্টির জন্য কবিতা লিখি একথা সত্য—কিন্তু নিজে আনন্দ ভোগ করি না বা করব না, এমন ঔদাসীন্যকে প্রশ্রয় দিতে পারি না। তবে রসে বা আনন্দে যেন তলিয়ে না যাই সে সম্বন্ধে আত্মসচেতন থাক্‌তে হবে, মনে রাখতে হবে—সম্পূর্ণ অভিভূত চিত্তে কবিতা লেখা যায় না।

রসকে কাব্যের আত্মা বলা হয়েছে। রসাত্মক কাব্যে ছন্দ, অলঙ্কার, ব্যঞ্জনা, শব্দ-বিন্যাস কাব্যের অনুগত হয়ে চলে। এগুলি কাব্যের শিল্পকলার দিক। কোনো প্রকার আয়াস বা অধ্যবসায় কবিচিত্তকে পীড়িত করে' না তুল্‌লেই হোল। রসাত্মক কাব্যের কল্পনা আনন্দে, আনন্দের মধ্যেই তার ক্রমঃবিকাশ ও অনায়াসগতি, আনন্দেই তার অখণ্ড পরিণতি।

রস ও তত্ত্ব

আনন্দের কথা বল্‌তে গিয়ে তত্ত্বের কথাটাও এসে পড়ে। অর্থাৎ কাব্য শুধু কি আনন্দই দেবে? কাব্যে কি তত্ত্বের স্থান নাই? কাব্যে যখন সকল বস্তুরই স্থান আছে, তখন তত্ত্বেরই বা থাকবে না কেন? কবি-প্রতিভায় তত্ত্বও যদি রসে পৌঁছতে পারে তবে কাব্যে তাকে স্থান না দিয়ে উপায় কি? তত্ত্ব থেকে মানবমনে যে বাসনার উদ্রেক হয়, কল্পনায় তাকে বিচিত্র করে' রসাত্মক কবিতা রচনা একেবারে অসম্ভব নয়। রবীন্দ্র কাব্যে অনেক ভাবই (emotion) তত্ত্বরূপ গ্রহণ করে' রসে এসে পৌঁচেছে। রসোত্তীর্ণ কবিতায় তত্ত্বের প্রয়োজন অনিবার্য্য না হলেও, রসের পথে তা' অন্তরায় নয়। কারণ অনেক সময় আমরা দেখেছি যে প্রথমতঃ যা তত্ত্ব বলে মনে হয়, সেটা অন্তরের গভীর স্তরে নিদ্রিত অথচ লব্ধ বিষয়েরই বাসনার তরঙ্গ মাত্র। তা' থেকেই "মিষ্টিক" কবিতার সৃষ্টি। (ক্রমশঃ)

ইনফ্লুয়েন্স্

শ্রীঅশ্বিনীকুমার পাল এম-এ

মীরার সঙ্গে সরলকুমারের যে কি সম্বন্ধ তা সে অনেকদিন ভেবেছে; অনেক দিন পথে একা একা হেঁটে ভেবেছে, কোন কূলকিনারা খুঁজে পায় নি। মীরার কথা মনে পড়লেই সে একা থাকতে ভালবাসে; কোন অন্তরের বন্ধু আসলে সে তখন নানা কাজের ভান করে রাস্তায় বের হয়ে পড়ে। সোজা মাঠের দিকে গিয়ে একটা নির্জ্জন স্থান দেখে, সেখানে বসে পড়ে। মীরার কথা নির্জ্জনে ভাবতেই ভাল লাগে। এমন দিগন্তর ব্যাপী সবুজ মাঠ: এমন তৃণ পত্রের শ্যামল ঐশ্বর্য্য; এমন উচ্ছ্বাস-ভরা উন্মুক্ত বাতাস; এমন নিবিড় ঘন সুদূর সুনীল আকাশ; আর আকাশের প্রাণবন্ত আলো। মীরার স্মৃতিও যেন এখানে চারু ঐশ্বর্য্যে ভরে উঠে।

কিন্তু কেন? মীরার কথা ভেবে তার কি লাভ? মীরা তার কে? শুধু দু'দিনের জানা শুনা; মীরাদের বাড়ী থেকে সে এম-এ পড়তো; মীরা পড়তো আই-এ। তাতে হয়েছে কি? এমন ত অনেকে অনেকের বাড়ী থেকে পড়ে এবং অনেক বাড়ীতে মীরার মতো মেয়েও থাকে; সে কি তাদের মতোই একজন হতে পারত না; মেয়েদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন? নির্লিপ্ত? আসক্তিহীন? কেবল অধ্যয়নই তপঃ? এম-এ পাশ করে সে এখন কর্ম্মক্ষেত্রে ঢুকেছে; কলিকাতাই তার কর্ম্মস্থান। আর মীরাও চলে গেছে আগ্রায় একটা স্কুলের মিস্ট্রেস্ হয়ে; মুছে গেছে সব অতীতের স্মৃতি; এখন সে সব কথা ভেবে লাভ কি? সরলকুমার এ প্রশ্নের কোন উত্তর খুঁজে পায় না।

সরলকুমার কবি। সে কবিতা লেখে; কিন্তু কোন কাগজে তা এখনো ছাপানো হয় নি। সম্পাদকের মতে এখনো তার হাত কাঁচা। কিন্তু তাতে সরলকুমারের কোন দুঃখ নাই। তার কবিতার ভক্ত একজন আছে; সে মীরা। সরলকুমার কবিতা লেখে, মীরা পড়ে। মীরা পড়লেই সে নিজকে ধন্য মনে করে। কবিতা লিখে এক কপি নিজের কাছে রেখে, আর এক কপি মীরার কাছে পাঠিয়ে দেয়; আর মীরার পত্রের আশায় পুষ্পশুভ্র মন নিয়ে বসে থাকে। মীরার পত্রে নিশ্চয়ই তার কবিতার উচ্চ প্রশংসা থাকবে। ভেবে সরলকুমার আবার কবিতার কপিটা বার বার পড়তে থাকে:—

পরিস্ফুট কুসুমের রূপ-রশ্মি সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া,
কাছে এসে দাঁড়াইবে একদিন সুদূরের প্রিয়া।

বেশ হয়েছে এ স্থানটা। মীরা পড়ে নিশ্চয় খুসী হবে। মীরাকে খুসী এবং সুখী করতে পারলেই তার কবিতার সার্থকতা। দিনের পর দিন যেতে থাকে মীরার চিঠি আসে না; যত সব বাজে চিঠি আসে। পড়তে ইচ্ছে ত করেই না; বরং শরীর রাগে ভরে উঠে। ছোট বোন পারু লেখে—তার ছেলের—অসুখ; পত্রপাঠ কুড়ি টাকা পাঠাতে। বড় পিসিমা লেখেন তাঁর বড় মেয়ের বিয়ে; পঁচিশটী টাকা তাঁকে সাহায্য করতেই হবে। আত্মীয়স্বজনদের জ্বালায় আর টেঁকা যায় না। দরিদ্র সারা বাংলা দেশ; ঘরে ঘরে দুর্ভিক্ষ; ঘরে ঘরে অভাব, অভিযোগ, অনশন, অর্দ্ধাশন—ক্ষুধিত পীড়িত সারা দেশের ছবি। একেবারে অসহ্য হয়ে উঠেছে।

প্রায় মাসখানেক পরে শেষে মীরার চিঠি আসে। চিঠিখানা পড়বার আগে সরলকুমার কবিতার কপিটা আর একবার ভাল করে প'ড়ে দেখে। বেশ সুন্দর হয়েছে। মীরার এ পত্রে নিশ্চয়ই কবিতার প্রশংসা এসেছে।

চিঠি খুলে পড়তে থাকে। অন্তরে লক্ষ মাণিক্য জ্বলতে থাকে। ক্রমে সে মাণিক্য আলোতে ঘনিয়ে আসে বরষা-ঘন মেঘের ছায়া; কালো, সিক্ত। কেবল দুনিয়ার বর্ত্তমান খবর। গান্ধীর জেল; জহরলালের অসুখ; মহাদেব দেশাইএর মৃত্যু। এসব শুষ্ক সংবাদ চিঠিতে লিখে লাভ কি? খবরের কাগজে এসব সে আগেই পড়ে জেনেছে। এসব শুনতে কে চায়?

এর মধ্যে নূতনত্ব আছে কি? চিঠি পড়া শেষ হয়ে যায়, সরলকুমারের দেহমন দুঃখে ও রাগে ভরে উঠে। চিঠিখানা ছুড়ে ফেলে দিতে গিয়ে দেখে চিঠির অপর পৃষ্ঠে সামান্য একটু লেখা—আপনার কবিতা পড়লাম; মন্দ হয় নাই। কিন্তু বস্তুহীন; শুধু স্বপ্ন। কবিতাটির দেহ আছে কিন্তু সে দেহের ভিতরে জীবনের সত্যসুর নাই।

সরলকুমারের চোখ দুটী ছলছল করে ওঠে: হয়ত গোপনে দু'এক ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়ে বক্ষতলে। তার কবিতা বস্তুহীন? শুধু স্বপ্ন? প্রাণহীন দেহ? মীরার এই অভিমত? তা হলে সত্যের কবিতা কি? কাব্য কাকে বলে? কবিতাত সুন্দরেরই উপাসনা; যা চির সুন্দর, চির আনন্দময়, চির রস-ছন্দে টলমল; পুষ্প নম্র-পরশ-মাধুর্য্যে মধুর; দয়িত তাপিত পীড়িত মনের অমৃত-আহারই-ত কবিতার পুষ্প-শুভ্র-স্বপ্ন বিলাসী বাণী। তবে? সরলকুমার ক্ষুণ্ণ হয়ে চুপ করে বসে থাকে।

সেদিন সরলকুমার অফিস থেকে একটু সকাল সকাল বের হয়ে পড়ল; বেন্টিক্ ষ্ট্রীট ধ'রে এস্‌প্ল্যানেডের দিকে চলল। সেখান থেকে ট্রাম ধরে লয়্যাডস্ ব্যাংকে যাবে। পারুর স্বামীর একটা চাকুরীর খবর আছে; ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে হবে।

এস্‌প্ল্যানেডে যেতেই দেখে এক ভদ্রলোক একটি গাছের তলায় নানা মাসিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক কাগজের দোকান সাজিয়ে বসে আছে। চারিদিকে লোক ঘিরে দাঁড়িয়ে সতৃষ্ণ নয়নে কাগজগুলির দিকে চেয়ে আছে; কেউ হাতে দু'একখানা তুলে দু'একপৃষ্ঠা দেখে আবার যথাস্থানে রেখে দিচ্ছে। পয়সা ব্যয় করে কেউ কিনছে না; দেখা গেল এত ট্রাম্ বাস ভর্ত্তি এ ঐশ্বর্য্যশালী এস্‌প্ল্যানেডের আঙিনায়ও বাংলার শত শত দরিদ্র গোপনে চলা ফেরা করছে।

সরলকুমারও একখানা মাসিক পত্রিকা হাতে তুলে খুলতেই বের হয়ে পড়ল "কবিতার বিষয় বস্তু" নামক এক প্রবন্ধ, লেখিকা মীরা। সামান্য দু'পাতার প্রবন্ধ। সরলকুমার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই সবটা পড়ে ফেলল। শেষে কাগজখানা আট আনা দিয়ে কিনে, একটু এগিয়ে গিয়ে মাঠের এক কোণে বসল। সঙ্গে সঙ্গে গভীর দীর্ঘশ্বাস! বুকটা যেন ব্যথায় ভরে গেছে। মীরার কাছে তাহলে তার কবিতার কোন মূল্যই নেই? সব অর্থহীন!

অথচ এই প্রবন্ধে কতকগুলি অখ্যাত কবিদের কবিতার বিষয়-বস্তু নিয়ে মীরার কত উচ্ছ্বসিত প্রশংসা! তার মতে বাস্তব-জীবনের কঠোর কঠিন সত্যের ছবি ছন্দে গেঁথে তুললেই আসল কাব্য সৃষ্টি হয়। বহ্নিতপ্ত প্রবন্ধের সাথে সাথে ভর্ৎসনাতপ্ত মীরার মূর্ত্তিও সরলকুমারের চোখের সামনে ভেসে উঠল। সে উঠে দাঁড়াল।

এস্‌প্ল্যানেড থেকে ট্রাম বাস হু হু ক'রে ছুটে চলছে চারিদিকে; সরলকুমার সে দিকে চেয়ে রইল। ইচ্ছা হয় ট্রামে বাসে উঠে শহরের অক্লান্ত মানব-প্রবাহ-স্রোতে সে মিশে যায়; পশ্চাতে পড়ে থাক—এই স্বপ্নময় অর্থহীন মাঠের বিলাসিতা; আর মীরার অনল স্মৃতি।

সরলকুমার শেষে সোজা মাঠের উপর দিয়ে হাঁটতে সুরু করল; চৌরঙ্গী-রাস্তার এক পার্শ্বে এসে দাঁড়াল। চোখের সামনে যেন সিনেমা চলছে। ব্যস্ত পৃথিবীর কর্ম্ম-কোলাহল ধ্বনি। মীরার "কবিতার বিষয় বস্তু" প্রবন্ধটার জীবন্ত সুর যেন এখানে। সারিবন্দী ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি, লরি ব্যগ্র ব্যস্ত গতিতে ছুটে চলছে; ক্লান্তিহীন অবিরাম অবিশ্রান্ত গতি। শুধু ওঠা পড়া, শুধু ছুটে চলা; শুধু খোঁজ খবর; আকুল অন্বেষণ; টাকা পয়সা ধন দৌলত মান সম্মান ও অমৃতময় সুখের ও দুঃখময় দুঃখের পশ্চাতে। শুধু ক্ষুধা, তৃষ্ণা; শুধু বুক-কাঁপানো চপল-চিত্ত-চাঞ্চল্য হারিয়ে যাওয়ার ভয়ে; অতুল উৎসব আনন্দ পাওয়ার পুষ্পগন্ধে। মানব-জীবন-প্রবাহ যেন এখানে বিক্ষুব্ধ জলধি-তরঙ্গে বন্যার বেগে ছুটে চলেছে। মনে হলো সমস্ত পৃথিবী যেন একত্র জুটে এ চৌরঙ্গী রাস্তাটার বুকের উপর ঘা দিচ্ছে; সমস্ত পৃথিবীর ক্ষুধার্ত্ত মানবের অন্তহীন বক্ষের আশা ও নিরাশার খর-প্রবাহ যেন এই রাস্তাটার উপরই ঘাত-প্রতিঘাতে মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে। পিচ্ ঢালা রাস্তা; কৃষ্ণ-কালো বরণ। বেশ সুন্দর মসৃণ; আয়নার মত ঝলমল। ভিতর দিয়ে যেন সব দেখা যায়। কৃষ্ণের কালো রূপের মাঝে যেমন সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড প্রতিফলিত, চৌরঙ্গী রাস্তাটার কালো বুকের মধ্যেও তেমনি বিশ্ব-মানবের বক্ষ-চিন্তা-স্রোত প্রতিবিম্বিত, প্রতিফলিত, ঝংকৃত ও মুখরিত। বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মানবের উত্তপ্ত পদ-চিহ্ন এ পথের বুকে। লক্ষ লক্ষ হৃদয়ের লক্ষ লক্ষ আবেগ-শিখা এ পথের কোণে প্রদীপ্ত হয়ে রয়েছে। উন্মত্ত জীবন-গতির উত্তাল-তরঙ্গ-ক্ষত-চিহ্ন দিয়ে এ রাস্তার ইতিহাস রচিত। এ রাস্তার প্রতি ধূলিকণায় লিখিত হচ্ছে অন্তহীন বিশ্ব-ধারার সুগম্ভীর সুকঠিন বাণী ছন্দ। আদিহীন অন্তহীন যুগ যুগান্তরব্যাপী মহাকাল সৃষ্টি হচ্ছে এ রাস্তার মূক-ভাষা-সমৃদ্ধিতে। মানব-রচিত ইতিহাস মহাকাল-রচিত এ রাস্তার ইতিহাসের কাছে কত তুচ্ছ, কত অর্থহীন। কে তা বুঝে? কে তা কবিতার ভাষায় প্রকাশ করে? কবিতার বিষয়-বস্তু মীরার মতে এ রাস্তার উপরেই ছড়ান; প্রকৃত কবি-চক্ষুর দরকার তা খুঁজে বের করতে।

সরলকুমার শেষে চৌরঙ্গী রাস্তা পার হয়ে এপারে এসে হেঁটে হেঁটে লয়্যাডস্‌ব্যাংকে ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করলে। ম্যানেজার বললে প্রশংসাপত্রসহ দরখাস্ত করতে বলুন; বিবেচনা ক'রে দেখব।

সরলকুমার ক্ষুণ্ণ মনে চলে এল; এ বিবেচনা ক'রে দেখার ফল প্রায়ই ভয়াবহ। চাকুরী এখানে হবে না; পারুর কথা মনে পড়ল; দুঃখের জীবন ওর চিরকালের জন্য। কবিতার বিষয়-বস্তুর সুর পারুর জীবনেও পাওয়া গেল।

কিছুদূর এগিয়ে আর্ম্মি এণ্ড্ নেভি ষ্টোরের বাড়ীটা। সরলকুমারের চোখের সামনে বিদ্যুৎ খেলে গেল—বোমা, বিমান, মেসিন্‌গান, ট্যাংক্, সমর, সংগ্রাম, হিংসা, বিদ্বেষ, অত্যাচার, উৎপীড়ন, অপসরণ, ধ্বংস, প্রলয়, মৃত্যু। সরলকুমার ভাবল এই তো কবিতার শ্রেষ্ঠছন্দ।

সরলকুমার চলতে লাগল পার্ক ষ্ট্রীট ধ'রে। কিছুদূর এসে বাম-পার্শ্বে প্রকাণ্ড প্যালেস্।

সাহেবের বাস-ভবন। সামনে প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ড; চারিদিকে প্রাচীর ঘেরা। প্রাচীরের গায়ে গায়ে আইভি-লতার সূক্ষ্ম জাল; স্নিগ্ধ সতেজ উৎস। কম্পাউণ্ডের মধ্যস্থলে ফুলের বাগান।

নানা দেশী ও বিলেতী ফুলের মহা উৎসব; অজস্র সুরভী ধারা। মধু-পরিমলমাখা যেন সমস্ত বাড়ীখানা। কত মালি, দারোয়ান, বাবুর্চি, আয়া, চাকর! সুন্দর সমৃদ্ধ ধরার জীবন!

সরলকুমার ভাবলে কিন্তু এ সব স্বপ্ন; সব মিথ্যা। ক'জনের ভাগ্যে ঘটে এ অতুল ঐশ্বর্য্য? কচিৎ দু'একজন রাজপুত্রের। তার মতো যুগান্তরব্যাপী গলির ভিতরে নোংরা মেসের একতলা ঘরে থেকে রাস্তার ডাষ্টবিনের পচা গন্ধ খেয়ে খেয়ে বেঁচে থাকে লক্ষ লক্ষ লোক এবং ধরায় এ লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন ছবিই কঠোর সত্য, কবিতার প্রাণ। দিনরাত ঐ মেসের জান্‌লার কাছে বসে শুধু আমগাছটার ফাঁক দিয়ে ঈষৎ-দৃষ্ট আকাশের দিকে চেয়ে সে স্বপ্ন দেখে; সে কবিতা লিখে;—

রাজারকুমার এলো সোনার রথে,
মুকুতা-মানিক-দ্যুতি ছড়ায়ে পথে।

অথচ তার এ দারিদ্র্যপূর্ণ জীবনের সঙ্গে এ কবিতার ছন্দের কোন মিল নেই। জীবনে তার কঠিন সত্যের ছায়া নিয়ত ঘনীভূত। মেসের ঘরটা ভয়ানক অন্ধকার; আলো বাতাসের নাম গন্ধ নেই; জান্‌লাটা চব্বিশ ঘণ্টাই খুলে রাখতে হয়; নচেৎ অন্ধকারে মৃত্যু অনিবার্য্য। তক্তপোষটাও ভাঙ্গা, ছারপোকার ডিপো। সামনের আমগাছটা তার জান্‌লা সংলগ্ন; গাছের তলায় দুনিয়ার আবর্জ্জনা। ছেঁড়া কাগজ, ছেঁড়া কাপড়ের টুক্‌রা; ভাঙ্গা একটা কেরোসিন তেলের টিন; একটা মরীচা-পড়া পুরাণো জীর্ণ বাল্‌তি; একটা স্কন্ধ-ভাঙ্গা মাটীর কলসী; একটা ছেঁড়া মোজা; হিল খসা একটা জুতা; তার মধ্যে পিপড়ের বাসা। ভোরবেলা ঘুমে থেকে উঠে সকলের আগে চোখে পড়ে এ সব দৃশ্য; মনে হয় দিনটা না জানি কি অকুশলে যায়।

এ সবের ভিতর দিয়েই তার জীবন ছুটে চলেছে নিশিদিন এবং তার এ জীবনই সত্য, সম্পূর্ণ সত্য। তবু সে রাজকুমারের স্বপ্ন দেখে; তাকে দিয়ে তার কাব্য সুরু করে; কেন? লক্ষ লক্ষ যে জীবন আজ দুঃখ দারিদ্র্যের কঠোর স্রোতে ভেসে চলেছে অনাদরে, লোকচক্ষুর অন্তরালে—তাদের দুঃখের গান কি তার কবিতার প্রাণ হতে পারে না? মীরাই সত্য; সে সত্যই বলেছে তার কবিতা শুধু মরুমায়া-ছল; অর্থহীন।

সরলকুমার শেষে মেসে চলে এল। সে আজ কবিতার বিষয়বস্তু খুঁজে পেয়েছে; সে লিখল—

'দরিদ্রের বক্ষে আজ জ্বলে সদা ক্ষুধা-হোমানল,
হে রাজন্ এখনো কি রবে সুপ্ত পুষ্প শয্যাতল?
হের তার জীবনেরে ঘেরি কত ভাঙা আয়োজন,
প্রতিদিন প্রতি পলে ক্ষত করে ছিন্ন তার মন।
ছেঁড়া মোজা, ছেঁড়া জুতা বাল্‌তি কলসী সব ভাঙা,
গৃহে তার ভিড় ক'রে করে প্রাণ সদা রক্ত রাঙা।
আবর্জ্জনা মহাস্তূপে কাঁদে তার জীবনের সুর,
হে কবি, হে ধনী তুমি তারি তরে কর ছন্দ পূর।

পরদিন সরলকুমার কবিতাটী মীরার কাছে পাঠিয়ে দিল; মীরা উত্তরে লিখ্‌ল—

দরিদ্র বিশ্বের মাঝে এই তব ঐশ্বর্য্যের বাণী,
চির সত্য রূপ দিয়ে তব কাছে নিল মোরে টানি।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে বিরুদ কাব্য

শ্রীহরিদাস দাস

বিগত পঞ্চদশ শকাব্দায় শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্রমা শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের আবির্ভাবের পরে দুইশত কি আড়াই শত বৎসরের মধ্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগগনে যে কতিপয় উজ্জ্বল জ্যোতিষ্মানের উদয় হইয়া এই বঙ্গদেশকে, শুধু বঙ্গদেশ কেন, সমগ্র ভারতবর্ষকেই সম্যক্ আলোকিত করিয়াছিল—তাহা ঐতিহাসিকগণ সকলেই অবগত আছেন। শ্রীশ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপা প্রেরণায় ও শক্তি-সঞ্চারণে উদ্বুদ্ধ হইয়া শ্রীপাদ-শ্রীরূপ সনাতনাদি গোস্বামিগণ শ্রীবৃন্দাবনে এবং শ্রীলমুরারি গুপ্ত, শ্রীপরমানন্দ সেন, শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর ও শ্রীশ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর প্রমুখ মহামনস্বীগণ শ্রীগৌড়মণ্ডলে মহাপ্রেমভক্তিরসময় গ্রন্থরাজি প্রণয়ন করিয়া—বিশুদ্ধ ভজন-পন্থা নির্দেশ করিয়া প্রেমময় শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দের প্রেমসেবা-পরিপাটীর দিক্ নিরূপণ করিয়াছেন। সরল কথায় বলিতে গেলে—বঙ্গদেশ হইতে উত্থিত এই প্রেমভক্তিরসবন্যা ভারতবর্ষকে প্লাবিত করিয়া দিগদিগন্তে বিস্তৃত হইয়া মহামরুভূমি-সদৃশ বহু তাপিত নরনারীর হৃদয়ে অপূর্ব উন্মাদনা ও নবজাগরণ আনয়ন করিয়াছে। উক্ত রস-বন্যার মূলে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরই মহারস ও মহাভাবের অক্ষয় অনাবিল মহামহীয়ান্ উৎসরূপে বিদ্যমান থাকিয়া সকল জীবের মহাকল্যাণ সাধন করিয়াছেন। প্রকটকালে তিনি স্বয়ং নামপ্রেম প্রচার করিয়াছেন—আবার নিজ পার্ষদগণ দ্বারা উহারই পরিপোষণকল্পে সদ্‌গ্রন্থরাজির প্রচার করাইয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর কর্ত্তৃক রচিত কোনও গ্রন্থের সন্ধান না পাইলেও আমরা মুক্তকণ্ঠে একথা বলিতে পারি যে শ্রীশ্রীরূপ সনাতনাদি মহানুভব ভাগবতগণ যে সকল গ্রন্থরাজি রচনা করিয়াছেন—তাহাতে শ্রীমন্মহাপ্রভুরই ইঙ্গিত বর্ত্তমান আছে। এই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যিকগণের চিত্তক্ষেত্র 'প্রেমের ঠাকুরের' প্রেমরসনির্য্যাসে অভিষিক্ত থাকিত, সুতরাং তাঁহারা 'ভক্তিকেই' মুখ্য রসরূপে গ্রহণকরত জগতে প্রচার করিয়াছেন। ইঁহাদের মতে অনুবন্ধ-চতুষ্টয়ের মধ্যে প্রেমই চতুর্থ অনুবন্ধ বা প্রয়োজন তত্ত্ব। এই 'প্রয়োজন'-সাধন জন্য ইঁহারা শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ প্রভৃতি নববিধ ভক্তির আবশ্যকতা স্বীকার করিয়াছেন এবং এই উদ্দেশ্যে বহুবিধ গ্রন্থও রচনা করিয়াছেন। দর্শন, কাব্য, অলঙ্কার, নাটক, ছন্দঃ, স্মৃতি, ব্যাকরণ প্রভৃতি সকলক্ষেত্রেই তাঁহাদের অপ্রতিহত প্রভাব-প্রতিপত্তি ভাববিদ্‌গণ অনুভব করিয়া থাকেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সর্বশাস্ত্র আলোচনা করিয়া—সর্বশাস্ত্রের সার সঙ্কলন করিয়া—ইঁহারা স্বরচনার কৃতিত্ব ও পরিপাটী দেখাইয়াছেন এবং সর্বত্রই নায়করূপে নিজ অভীষ্টদেবকে সকলের চক্ষুর সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন।

সে যাহা হউক, আমরা এক্ষণে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের শ্রীচরণ বুকে ধরিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মহাসৌভাগ্য ও মহাগৌরবের পরিচায়ক—শ্রীগোস্বামিগণ ও তৎপরবর্ত্তী মহাজনগণ কর্ত্তৃক বিরচিত 'বিরুদ' কাব্যের যৎসামান্য আলোচনা করিতেছি। কাব্য প্রধানতঃ দৃশ্য ও শ্রব্য ভেদে দ্বিবিধ—বিরুদ শ্রব্যকাব্যেরই অন্তর্গত। সাহিত্যদর্পণকার ইহার লক্ষণ নিরূপণ করিয়াছেন—'গদ্যপদ্যময়ী রাজস্তুতির্বিরুদমুচ্যতে।' যথা—

বিরুদমণিমালা। গদ্যপদ্যাত্মক রাজস্তুতির নাম—বিরুদ। শ্রীগোস্বামিগণ ব্রজনবযুবরাজ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে অথবা তাঁহারই অভিন্ন প্রকাশ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরকে এই কাব্যের নায়ক করিয়া তাঁহারই গুণ-গরিমা বর্ণনা করিয়াছেন। সংস্কৃত-সাহিত্যে এ জাতীয় কাব্য বিরল। ইংরেজীতে এইরূপে লক্ষণ লিখিত হইতে পারে—'A viruda is a little alliterative kavya consisting of prose and poetry written in praise of a king, or a god or goddess' এই জাতীয় কাব্য একাধারে অসাধারণ মনীষা ও কৃতিত্বের সহিত শব্দযোজন-কৌশল ও অপূর্ব চমৎকারিত্ব-প্রদর্শনে সামাজিকের চিত্তে এক অভাবনীয় ও অননুভূত রস-প্রবাহের সৃষ্টি করে। যমক, অনুপ্রাস প্রভৃতি শব্দালঙ্কারের যথেষ্ট পৌনঃপুনঃ সংগঠন করিয়াও রস-মর্য্যাদা বা ভাবগাম্ভীর্য্য অক্ষুণ্ণভাবে সংরক্ষণ করা সুকঠিন ব্যাপার। অন্যবিধ কাব্য-রচনায় কবি সত্যই নিরঙ্কুশ, কিন্তু বিরুদ-রচনাকালে তিনি প্রতিপদেই শৃঙ্খলিত। প্রথমতঃ এই কাব্যের সর্বত্র নায়কের গুণোৎকর্ষই বর্ণিত হইবে, দ্বিতীয়তঃ ইহার অক্ষর-যোজনাও লক্ষণানুসারে নিয়মিত করিতে হইবে। কাজেই খ্যাতনামা কবিগণও প্রায়শঃ এই বিরুদ-রচনায় হস্তক্ষেপ করেন নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ কতিপয় বিরুদাবলী করিয়া সুরসিক কাব্য-জগতে এক চিরস্মরণীয়, অতুলনীয় ও পরম রচনা-সম্মানীয় কীর্ত্তিস্তম্ভ সংস্থাপন করিয়াছেন। তাহাই আমরা ক্রমশঃ আলোচনা করিতেছি।

প্রথমতঃ বিরুদ রচনা সম্পর্কে শ্রীপাদ শ্রীরূপ গোস্বামি বিরচিত "সামান্য বিরুদাবলী-লক্ষণং' নামক গ্রন্থের ছায়াবলম্বনে সংক্ষেপে দুই একটি কথা নিবেদন করিব। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে ব্রজনবযুবরাজের গদ্যপদ্যময় স্তুতিমালাই বিরুদ নামে অভিহিত। বিরুদাবলী বিবিধ লক্ষণাক্রান্ত (১) কলিকা (২) শ্লোক এবং (৩) বিরুদযুক্ত হওয়া চাই। তাহাতে নায়কের কীর্ত্তি, প্রতাপ, বীর্য্য, সৌন্দর্য্য ও মহত্ত্বাদির বর্ণনা-প্রাচুর্য্য থাকা চাই। কলিকার আদিতে ও অন্তে একটি করিয়া নির্দোষ পদ্য (শ্লোক) রচনা করিতে হয় এবং শব্দাড়ম্বর-পরিপূর্ণ রচনা-পারিপাট্য হওয়া চাই। আবার বিরুদাবলী-পাঠকেরও কতকগুলি গুণ থাকা চাই—তিনি ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন, সুস্থিরমতি, গ্লানিশূন্য, সুকণ্ঠ এবং কৃষ্ণভক্ত হইবেন। যথোক্ত-লক্ষণযুক্ত রম্য বিরুদাবলী দ্বারা স্তুত হইয়া বাসুদেব আশুতুষ্ট হইয়া প্রভূত কল্যাণ সাধন করেন। পক্ষান্তরে সল্লক্ষণ-রহিত বিরুদাবলী দ্বারা স্তব রচনা করিলে বা তাহা পাঠ করিলে শ্রীহরি তাহা আদৌ অঙ্গীকার করেন না।

(১) কলিকা :—তাল দ্বারা নিয়মিত পদ-সমূহকে 'কলা' বলে। কলা-সমষ্টি দ্বারাই এই কলিকা রচিত হয়। ইহার প্রধানতঃ ছয় প্রকার ভেদ স্বীকৃত হইয়াছে। যদি দুই বা তিনটী প্রভেদযুক্ত কলিকা দ্বারা ইহারা রচিত হয়, তবে ইহাদিগের নাম হয়—মহাকলিকা। সাধারণ কলিকা হইতে মহাকলিকার এইমাত্র বিশেষ যে মহাকলিকার পূর্বে দুইটি করিয়া শ্লোক রচনা থাকিবে এবং কাব্যের শেষাংশেও দুইটি শ্লোক রচনা করিতে হইবে। ৬৪ কলার অধিক বা ১২ কলার কমে কলিকা রচনা হইবে না—ইহাই প্রাথিক নিয়ম।

মহাকলিকা—(১) চণ্ডবৃত্ত, (২) দ্বিগাদিগণ-বৃত্তক ,(৩) ত্রিভঙ্গীবৃত্ত, (৪) মধ্যা (৫) মিশ্রা ও (৬) কেবলা। ইহাদের প্রত্যেকের বিভেদগুলি গণনা করিলে সর্বসমেত ৪৯ সংখ্যা হইবে। কিন্তু এই প্রকারে রচিত পাঁচ কলিকা হইতে ত্রিশ কলিকা মধ্যেই বিরুদাবলী রচিত হইবে, কলিকা-পরিমাণ এই সংখ্যার ন্যূন বা অধিক হইতে পারিবে না *

(২) শ্লোক :—কলিকার আদি ও অন্তে গুণোৎকর্ষবর্ণনাত্মক পদ্যকেই শ্লোক বলা হয়। মহাকলিকার আরম্ভে দুইটি করিয়া শ্লোক রচনা থাকিবে।

(৩) বিরুদ :—ইহার রচনা প্রায়ই কলিকার তুল্য। তবে বিশেষ এই যে ইহার কলা-পরিমাণ দুই হইতে দশ সংখ্যাতেই সীমাবদ্ধ। বিরুদ বা কলিকার অন্তে বীর, ধীর, শ্রীল, দেব, নাথ প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করিতে হইবে।

প্রসঙ্গক্রমে অন্যান্য বিরুদ কাব্যেরও সামান্য নির্দেশ করা হইতেছে।

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় 'Notices of Sanskrit manuscripts' নামক পুস্তকে দুইখানা বিরুদ কাব্যের ও একখানা টীকার সন্ধান দিয়াছেন।

2305. বীরবিরুদম্

2306. বীরবিরুদটীকা

A poem in praise of Krisna as the supreme divinity by Chandra Dutta of Mithila. The commentary is also by the author of the poem. Beginning :—

বিমলাজিন বসনে সুবিকটদশনে চঞ্চল রসনে ভীমরবে।
করধৃত-করবালে রণবিকরালে নগবরবালে ললিত শিবে॥
জয় ঘন সুন্দর নমিত-পুরন্দর নন্দিত চরণতলাগত নিজ-
শরণাগত বন্দিত.........ইত্যাদি।

End :—জয় জয় দিতি সুত লক্ষ যক্ষ বিক্ষেপ বিধায়ক পর
জন * * * * ফলদানদায়ক শায়কান্তকলিকা......।

Colophon :—ইতি বীরবিরুদং চন্দ্রদত্ত-নির্মিতং।
শ্রীকৃষ্ণস্য স্তোত্রব্যাখ্যান রূপগণাদি মাহাত্ম্য বর্ণনং॥

2361. শ্রীকৃষ্ণবিরুদাবলী—A hymn in praise of Krisna, describing in course of his form, his merits and his loveliness. By Chandra Dutta of Mithila.

Beginning :—বিমলাজিত বসনে ইত্যাদি......

End :—এষা মৈথিলচন্দ্র রচিতা কৃষ্ণস্তুতি র্যদ্যপি
কাব্যালঙ্কৃতি বর্জিতাপি সুধিয়াং সৎকারমেবার্হতি।
যদ্ভক্ত্যা জগদীশ্বরস্য চরিতং শ্রুত্বাপ্যসদ্ভাবয়া
হর্ষাশ্রুপ্রতিরুদ্ধ গদ্গদগিরা স্তামেব সৎকুর্বতে॥

Colophon :—ইতি মৈথিলচন্দ্র দত্ত কৃত শ্রীকৃষ্ণ বিরুদাবলী সম্পূর্ণা॥

---

* (ক) চণ্ডবৃত্ত			১
	(১) সামান্য—(অবান্তর ভেদ বহু)		
	(২) সলক্ষণ		
	(অ)	নখ	২০
	(আ)	বিশিখ—	
		পদ্ম	৬
		কুন্দ	১
		চম্পক	১
		বঞ্জুল	১
		বকুল—	১
		ভাস্বর	১
		মঙ্গল	১
		তুঙ্গ	১
(খ) দ্বিগাদিগণবৃত্ত			৫
(গ) ত্রিভঙ্গীবৃত্ত			৬
(ঘ) মধ্যা			১
(ঙ) মিশ্রা			২
(চ) গদ্য (কেবল)			২
			৪৯

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ লাইব্রেরীতে চারিখানা বিরুদ কাব্যের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

[Cal, Skt. College Cat of Mss. Kavya]

138. বিরুদাবলী—

Beginning :—

শবশশ্মশবাসন চক্রচকাসন ইত্যাদি।

ইদং বীরনৃপতেঃ পদ্যং।

139. A different work in the same style and under the same name by Raghudev, a maithila poet of the Harita family. *

140—141. Other works of the same name, the former being anonymous, the last one by Kalyan.

Bodlien universityর catalogueএ বিরুদাবলী সম্বন্ধে নিম্নলিখিত extract পাওয়া যাইতেছে :—

Virudabali :—(catalogus codicum Sanskriticorum)

By Raghudevas Visweswar misrae et Kumudinis filius, mithilae regem quendam celebravit Incipit—

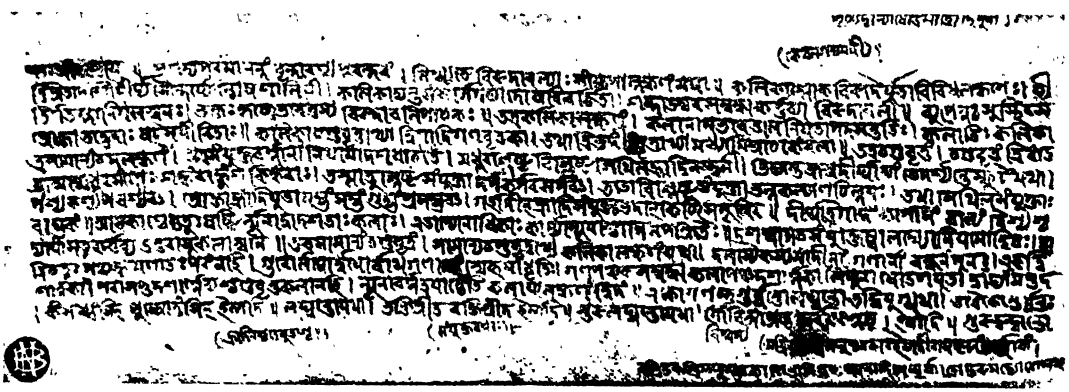
কলকঙ্কণলম্বিত চন্দন চুম্বিত চারু চতুর্ভুজ ভীমবলে
হিমশৈলশিখণ্ডিনি বৈরবিখণ্ডিনি কুণ্ডলমণ্ডিত-গণ্ডতলে।
দলদম্বুজ-গঞ্জিনি ভবভয়-ভঞ্জিনি মঞ্জুল মণিময়-মুকুটবরে
পঞ্চানন-চারিণি শশধর-ধারিণি জয় জয় জননি জয়ন্তি পরে॥

দৌহিত্রোঽচ্যুতঠক্কুরস্য কৃতিনঃ হারিতান্বাম্বর-
শ্রেষ্ঠোঽসৌ রঘুদেব-বালককবি বৈদেহ ভূমণ্ডলঃ॥
বিদ্যাহ্বয়মুখং মহীপতিমথ শ্রীবুদ্ধিনাথ স্তুতো
লক্ষ্মীদেব কুলাধিদেব-সহিত শ্রীমোহনো মোহনঃ।
নত্বা শ্রীহরিদেব দেবজনুষা জ্যেষ্ঠা ঘয়োক্তি গু ণৈঃ
কৃষ্ণেমাং বিরুদাবলীমিহ সদানন্দেঽম্বুজে স্তুতবান্॥
ইতি মৈথিল শ্রীরঘুদেব-বিরচিতা বিরুদাবলী সমাপ্তা।

Codex hujus secuti initro-exaratus est. (Wilson 519)

এক্ষণে আমরা শ্রীগোস্বামীপাদগণ ও তৎপরবর্ত্তী মহাজনগণ কর্ত্তৃক বিরচিত বিরুদাবলীর আলোচনা করিব। শ্রীপাদ শ্রীরূপগোস্বামিজিউ যে এই কাব্যের লক্ষণ নিরূপণ করিয়াছেন—তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

(১) তিনি 'শ্রীগোবিন্দ বিরুদাবলী' নামে এক কাব্যরত্নও রচনা করিয়াছেন। কথিত আছে—দাক্ষিণাত্য-নিবাসী জনৈক কবি-কর্ত্তৃক পঠিত 'দেব-বিরুদাবলীর' পদার্থ-লালিত্য আস্বাদনে প্রসন্ন হইয়া শ্রীগোবিন্দদেব তাঁহাকে নিজ কণ্ঠের মাল্য দান করিয়াছেন। 'দেব-বিরুদাবলী' শ্রবণে শ্রীগোবিন্দজির প্রসন্নতার কারণ চিন্তা করিতে করিতে শ্রীপাদ শ্রীরূপ শয়ন করিয়াছেন—এমন সময় স্বপ্নযোগে শ্রীগোবিন্দ তাঁহাকে বলিলেন—'শ্রীরূপ! তুমিও এই প্রকারে আমার বিরুদাবলী রচনা করিবে।' এই প্রত্যাদেশের ফলে শ্রীপাদ শ্রীরূপ শ্রীল গোবিন্দ-দেবের জন্মাদি সকল লীলাই সংক্ষেপে 'শ্রীগোবিন্দবিরুদাবলী' নামক কাব্যসম্পুটে নিহিত করিয়াছেন। শ্রীরূপের 'সামান্য বিরুদাবলী লক্ষণং'



শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর শ্রীহস্তাক্ষর—"শ্রীবিরুদাবলী লক্ষণং" পুঁথির প্রথম পৃষ্ঠার প্রতিলিপি (সিঁথি বৈষ্ণব-সম্মিলনীর সৌজন্যে)

Auctor strophis antificiosis trifaries usus est 1. Kantakalika, 2. Surasloka, 3, Viraviruda. †

In fine haec leguntur :—

শ্রীবিশ্বেশ্বরমিশ্রতঃ কুমুদিনী-দেবী-কুমারং কুলা-
লঙ্কারং সুষুবে লসত্তরগুণং গৌরী গিরিশাদিব।

* It may be the same work as noticed in Aufrecht's Oxford catalogue of Skt. mss. no. 224. (see the following page here.)

† Viruda vrcabuls practer eam, quam supra dedi, significatinem, carmen landatorium sive panegyricus intelligitur. of অজাগরীভূং বিরুদৈ র্ব এব জহাসি নিত্রামশিবৈঃ শিবারুতৈঃ। Kalyanraja-stuti II. 52 ; বন্দীরিতবিরুদাবলিরোচন in carmine nostro fol. 27a et supra. (p 117a)

নামক গ্রন্থ প্রণয়নের পূর্ব্বে অন্য কোনও লক্ষণ-নির্ণায়ক গ্রন্থ ছিল কিনা, তাহার কোনও নির্দেশ পাওয়া যাইতেছে না। যদিও সাহিত্যদর্পণ 'বিরুদমণিমালা' নামক গ্রন্থের নামকরণ করিয়াছেন, তাহা কিন্তু এখন লোকলোচনের অপরিচিতই আছেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। সে যাহা হউক—এ সম্বন্ধে যখন নিশ্চয় করিয়া কিছুই বলা যাইতে পারে না, তখন আমরা শ্রীপাদ শ্রীরূপকেই এই জাতীয় কাব্যের সর্বপ্রথম উদ্ভাবক না বলিলেও তিনি যে এ জাতীয় কাব্যে ভক্তিরস অন্তর্নিহিত করিয়া এই কঠিন কাব্যকেও সজীব করিয়া তুলিয়াছেন—এ কথা বলিলে কাহারও আপত্তি হইতে পারে না।

শ্রীপাদ শ্রীরূপের শ্রীগোবিন্দবিরুদাবলী হইতে দৃষ্টান্তস্বরূপে আমরা দুই একটি বিরুদ উদ্ধৃত করিতেছি—

ক। চণ্ডবৃত্তকলিকার নখভেদের 'অচ্যুত' প্রভেদ—

জয় জয় বীর স্মর রসধীর।
দ্বিজজিত হীর প্রতিভট বীর।
স্ফুরদুরু হার প্রিয় পরিবার। ইত্যাদি।

খ। চণ্ডবৃত্ত কলিকার বিশিখভেদের 'বঞ্জুল' প্রভেদ—

জয় জয় সুন্দর বিহসিত মন্দর
বিজিত পুরন্দর নিজ গিরি কন্দর
রতি রস শম্বর মণিযুত কন্ধর
গুণমণি মন্দির হৃদি বলদিন্দির ইত্যাদি।

গ। ত্রিভঙ্গীবৃত্ত কলিকার বিদগ্ধ ত্রিভঙ্গী—

চণ্ডীপ্রিয়নত	চণ্ডীকৃতবল	২য়, ৮ম ও ১৪শ অক্ষরে ভঙ্গ (একরূপ অক্ষর এবং দ্বিতীয় পংক্তির শেষে সুন্দর যমক।)
রণ্ডীকৃতখল	বল্লভ বল্লব।	
পট্টাম্বরধর	ভট্টারক বক-	
কুট্টাক ললিত	পণ্ডিত মণ্ডিত। ইত্যাদি	

ঘ। অক্ষরময়ী—

অচ্যুত জয় জয় আর্ত্তকৃপাময় ইন্দ্রমখার্দন ঈতিবিশাতল। ইত্যাদি	অ, আ ইত্যাদি ক্রমে প্রথম অক্ষর

ঙ। সাপ্তবিভক্তিকী—

(১) যঃ স্থিরকরুণ স্তর্জিত বরুণ
স্তর্পিতজনকঃ সংমদজনকঃ।
(২) প্রণতবিমায়ং জগুরনপায়ং
ঘনরুচিকায়ং সুকৃতিজনা যং। ইত্যাদি।

চ। সর্বলঘু—

চরণ-চলন-হত-জঠর-শকটক
রজকদলন বশগত পর কটক। ইত্যাদি।

এ জাতীয় কাব্য-রচনায় কবির অসাধারণ প্রতিভা এবং শব্দশাস্ত্রের উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য থাকা চাই। অনেক সময় যমক, অনুপ্রাস প্রভৃতির শব্দ সাম্য রক্ষণ করিতে কবিকে মহা বিপদেই পড়িতে হয়। যাহা হউক, ইহার শ্রুতি-মধুরত্ব গুণে কাব্যরসিক ব্যক্তিগণের হৃদয়কর্ষিণী ক্ষমতাই প্রশংসনীয়। শ্রীরূপের সাহসিক পদ-লালিত্যগুণ এই বিরুদ কাব্যেও সংরক্ষিত হইয়াছে দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি।

(২) শ্রীপাদ শ্রীরূপের স্বপ্নাদেশ পাইয়া শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিজিউ 'শ্রীশ্রীগোপাল বিরুদাবলী' রচনা করিয়াছেন। উহার রচনা শ্রীগোবিন্দ-বিরুদাবলীর আনুগত্যে বলিয়া ধারণা করা যায়। শ্রীজীব চণ্ডবৃত্তেরই অবান্তর নখের আটটি কলিকাতেই গ্রন্থ শেষ করিয়াছেন। আট কলিকায় গ্রন্থ রচিত হইলে যদিও বিরুদকাব্যের লক্ষণ-বিপর্য্যয় ঘটে নাই, তথাপি এই কবিপ্রবর যে কেন পরমসুন্দর দ্বিগাদিগণ বৃত্ত বা ত্রিভঙ্গী বৃত্ত স্পর্শও করিলেন না—তাহা এখনও বুঝিতেছি না। শ্রীপাদ শ্রীজীবের স্বাভাবিক অক্ষর-কার্পণ্য ও শব্দশ্লেষাদি যুক্ত হইয়া এই কাব্যখণ্ডকে দ্বিগুণতর কঠিন করিয়াছে। ইহাতেও শ্রীকৃষ্ণের বাল্যাদি লীলা বর্ণিত আছে।

ইহার আদিম শ্লোক—

'গোপাল সুখদা সেয়ং গোপাল বিরুদাবলী।
অর্থায় প্রভবতাং কল্পবীরুদাবলি কল্পতাং॥'১

অন্তিম শ্লোক—

মুরারিহতি শংসন-প্রথিত কংসবিধ্বংসনঃ
সুধীভবহতৌ বিধির্বিবিধ কীর্ত্তিভাসাং নিধিঃ।
বিধিপ্রভৃতি-বাঞ্ছিতং চরণ-লাঞ্ছিতং বস্তু তদ্
ব্রজস্ত নিজবংশজঃ স্ফুরতু নঃ স বংশপ্রিয়ঃ॥৩৮

এতদ্ব্যতিরেকে শ্রীপাদ শ্রীজীবপ্রভু তদীয় শ্রীগোপালচম্পূর শেষ পূরণে বিরুদচ্ছন্দে রচিত দুইটি স্তুতি সংযোজনা করিয়াছেন।

(৩) তৎপরে ১৬০০ শকাব্দায় জ্যৈষ্ঠী অমাবস্যায় শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর মহাশয় 'শ্রীনিকুঞ্জকেলি বিরুদাবলী' রচনা শেষ করিয়াছেন। তিনি এই কাব্যরত্নে যে নিকুঞ্জকেলি-বিলাসাদির লীলাসূত্র বর্ণনা করিয়াছেন তাহা অতি রসাল ও চিত্তচমৎকপ্রদই হইয়াছে। স্বরূপ-পরিচায়ক স্তুতি দ্বারা এই স্তুতিকাব্যে কবি যে ধীর ললিত নায়কোচিত গুণরাজির যথেষ্ট পরিবেশন করিয়াছেন—তাহা বাস্তবিকই সুরসিক কাব্য-রসপিপাসুদেরই আস্বাদ্য। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি যে যাঁহারা রাগানুগামার্গে শ্রীরাধামাধবের ভজন করিতেছেন তাঁহারা এই গ্রন্থের সাহায্যে, অনুশীলনে ও আস্বাদনে প্রতিপদেই পরম প্রেমানন্দ লাভ করিবেন—সন্দেহ নাই। শ্রীপাদ শ্রীরূপ শ্রীগোবিন্দ বিরুদাবলীতে নানা-জাতীয় পাঠকের বিভিন্ন রুচির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার গ্রন্থে পূতনাবধাদি লীলারও সমাবেশ রহিয়াছে। কিন্তু শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ অন্য কোনও দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া কেবল নিভৃত নিকুঞ্জলীলার পরম মনোজ্ঞ ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন। কাজেই কবি স্বয়ং নিঃসঙ্কোচে বলিয়াছেন যে এই গ্রন্থের আলোচনায় বাহ্যান্তর সাধনদ্বয়সম্পন্ন রসিক ভক্তগণের প্রীতি উৎপাদন করিবে এবং ইহার সেবায় শ্রীশ্রীযুগল কিশোরেরও প্রসন্নতা লাভ হইবে।

নিকুঞ্জকেলী বিরুদাবলীয়ং
নিকুঞ্জকেলী-রসিক-প্রসাদং।
স্বকীর্ত্তি-নৈপুণ্যজুষে প্রদত্তে
স্বকীর্ত্তি-নৈপুণ্যপুষে জনায়॥১॥

শ্রীমদ্ রূপগোস্বামির কাব্যরসলুব্ধ সজ্জনগণ ইহাতেও তজ্জাতীয় আস্বাদনা ও উন্মাদনা পাইবেন—সন্দেহ নাই। এই বিরুদের স্থলবিশেষের রচনা শ্রীপাদ শ্রীরূপ হইতেও সমধিক চিত্তাকর্ষক ও জাজ্বল্যমান হইয়াছে—তাহা ক্রমে ক্রমে নিবেদন করিতেছি।

ক। প্রিয়ায়া গচ্ছন্ত্যাঃ স্বয়মুপলক্ষো বন পথং
পরিষ্কুর্বন্ পুষ্পৈ র্বনবিটপ-বল্লী বিঘটয়ন্।
স্বপাণিভ্যাং লুম্পন্ নিজচরণ-চিহ্নং চলতি য
স্তদগ্রে তং নৌমি প্রণয়-বিবশং ত্বাং গিরিধরং॥১°॥

এই শ্লোকটিতে শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিক ভাব-প্রকটনে প্রিয়তমার অলক্ষিত-ভাবে গমনের ঔৎসুক্য, বনপথের কুশকঙ্করাদির পরিষ্কৃতি, ঘন ঘন বল্লী-বিটপাদির অপসারণ, বিশেষতঃ স্বকীয় চরণচিহ্নের বিলোপ-সাধন ইত্যাদি ব্যাপার-পরম্পরা সহজ প্রীতিরই পরিচায়ক।

খ। উন্নীতবামকরপদ্মধৃতাগ্রশাখাং—
রাধাং বিলোক্য কুসুম-প্রচয়ৈকতানাং।
পশ্চাদ্ বিবর্ত্তিতমুখীং সহসা বিধিৎসু—
র্বংশীংস্বরন্ জয়তি গূঢ়তমুর্মুকুন্দঃ॥৪২॥

এই শ্লোকেও শ্রীরাধার তাৎকালীন প্রিয়সঙ্গজ ভাববিকার দর্শনের অভিলাষী শ্রীকৃষ্ণের ধীর ললিত-নায়কযোগ্য পরিহাস-বিশারদত্ব, বিদগ্ধত্ব প্রভৃতি গুণই পরিবেশিত হইয়াছে।

গ। খণ্ডিতা নায়িকার বর্ণনা দিতেছেন—
বলদঘূর্ণাপূর্ণারুণনয়নমাকীর্ণাচিকুরং
নবালক্তারক্তালিকমধর-সক্তাঞ্জন-রসং।
প্রগে রাধা বাধা প্রকুপিত সখীতর্জ্জিতমলং
হরিং যুঞ্জে কুঞ্জে হৃদি কমপি ভাবং দধতি তং॥৫২॥

এইরূপে কবি ৫৩তম শ্লোকের শ্রীরাধার মানের ইঙ্গিত দিয়া পরবর্ত্তী বিরুদে মানের প্রকার ও তৎপ্রশমন বর্ণনা করিয়াছেন।

ঘ। সুরত-সমরে উৎসাহ-সূচক বাক্যে বর্ণনা করিতেছেন—
ঝনজ্ঝনদিতি প্রতিপ্রতিমিতা রতে কিঙ্কিণী
সনৎসনদিতি শ্বনাশ্বসিতি-সন্ততি র্বাং মুহুঃ।
ভ্রমদ্ভ্রমর-সংভ্রমা প্রচল-সৌরভালি র্দ্বিজো
ঝলজ্ঝলতি জাতু যে হৃদয়-সম্পুটে রত্নবৎ॥৫৮॥

ঙ। শ্রীল বিশ্বনাথের সাপ্তবিভক্তিকী কলিকাটী শ্রীপাদ শ্রীরূপের কলিকা হইতেও অধিকতর সহজ—

(১) মুখবিধুরিষ্টঃ সুদৃগভিমৃষ্টঃ
স্মরমদ ধৃষ্টঃ স ভবতু দৃষ্টঃ। ইত্যাদি
(২) গুণমভিধেয়ং তমপরিমেয়ং
জগতি সুগেয়ং রটতি বরেয়ং ॥ ইত্যাদি

চ। শ্রীকৃষ্ণ হস্তে শ্রীরাধার গণ্ডদ্বয়ে মকরিকা-রচনার সুন্দর চিত্র কবি অঙ্কিত করিতেছেন—

স্বীয়ং কৌশল-সূচকেন কুটিলা লোকেন কীর্ণোৎপ্যলং
কুর্বন্নেব কপোলয়োর্মকরিকে গান্ধর্বিকায়াশ্চিরম্।
প্রস্বিন্নাঙ্গুলিরাদিশ প্রভুবর ত্বং মাং কৃপাবারিধে !
যেন ত্বামপি বীজয়ানি বলিতানন্দাশ্রু সংপ্রেরসীম্ ॥ ৬৮॥

'বিশ্ববরেণ্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর এই নিকুঞ্জকেলিরস রহস্য-পরিপূরিত 'নিকুঞ্জকেলিবিরুদাবলী'র রচনা করিয়া বিরুদ কাব্যের কাঠিন্যবোধ স্থগিত করিয়া যে এক অপার্থিব বিমল আনন্দ-ধারায় সামাজিকগণের চিত্তকে অভিষিক্ত করিয়াছেন—তাহা বস্তুতঃই অননুভূত-পূর্ব এবং অতুলনীয়। এই কাব্যখানি আমাদের হস্তগত না হইলে হয়ত আমরাও অন্যান্য সমালোচকদের ন্যায় বলিতাম যে বিরুদ কাব্য সাধারণ অনুপ্রাসাত্মক শব্দাড়ম্বরপূর্ণ কাব্যবিশেষ। কিন্তু শ্রীল বিশ্বনাথের কৃপায় এক্ষণে বেশ বুঝিয়াছি যে 'শালকাঠ নিংড়াইলেও মধুর রস পাওয়া যায়।'

(৪) সপ্তদশ শকাব্দার শেষভাগে স্বনামধন্য শ্রীল রঘুনন্দন গোস্বামিপাদ 'শ্রীগৌরাঙ্গ বিরুদাবলী' নামে একখানা গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। শ্রীল বিশ্বনাথ'ও শ্রীবিদ্যাভূষণ মহাশয়ের পরে যাঁহারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যের সেবা করিয়াছেন—তাঁহাদের মধ্যে শ্রীরঘুনন্দনের আসনই সর্বোচ্চে—ইহাতে আর সন্দেহ নাই। ইঁহার সুমধুর কবিত্ব ও রচনা-নৈপুণ্য সর্বজনপ্রশংসনীয়। শ্রীরূপগোস্বামিচরণের শ্রীগোবিন্দ বিরুদাবলীর সহিত সর্বাংশে সমন্বয় রাখিয়া এই গ্রন্থ রচনা হইয়াছে। গ্রন্থকার স্বয়ং একথা বলিয়াছেন—

গোবিন্দস্য প্রকাশোঽভূদ্ যথা শ্রীগৌরসুন্দরঃ।
গোবিন্দবিরুদাবল্যা স্তথেয়ং বিরুদাবলী ॥ ১২৩ ॥

ক। ইঁহার গৌরাঙ্গ-বর্ণনা অতি সুন্দর ও জাজ্বল্যমান—

সত্যপরম সুখ শুদ্ধ সমুজ্জ্বল
নিত্য রুচিরতর বিশ্বগ-পুদ্‌গল।
সর্ববিবুধবরবুদ্ধি-সুদুর্গম
সর্বহৃদয়গত নির্মল-বিভ্রম ॥ ইত্যাদি

ইনি শ্রীগৌরাঙ্গকে কখনও মন্দার পর্বতের সহিত (৮), কখনও সিংহের সহিত (১৪ ও ৯১), কখনও মেঘের সহিত (১৮ ও ২০), কখনও সরোবরের সহিত (২৬), কখনও হস্তিবরের সহিত (৫৮), কখনও চন্দ্রের সহিত (৭৪), রূপক করিয়া পরম চমৎকার রস-প্রবাহ দান করিয়াছেন।

খ। শ্রীগৌরাঙ্গের কীর্ত্তনের প্রভাব বর্ণনা করিতেছেন—

দোর্দণ্ডদ্বয়-চণ্ডচালনভরাৎ পাপাণ্ডজান্ ডায়য়ন্
পাষণ্ডাবলিমুণ্ডমণ্ডলমতীবা খণ্ডয়ন্নঙ্ঘ্রিণা।
কাণ্ডে দণ্ডমপি প্রমণ্ডয়তু মে কাণ্ডও কোটিচ্ছবি-
গৌর তাণ্ডব-পণ্ডিতোঽলিকুলসৎপুণ্ড্রো মনোমণ্ডয়াং ॥ ৪৮

এইরূপে কবি শ্রীগৌরাঙ্গের চরণারবিন্দযুগল (৫১), তাঁহার লীলালি-কল্লোলিনী (৬০), ভক্তসেনাগণসহ কীর্ত্তন-বর্ণণ (৬৬), কীর্ত্তন গর্জন-প্রভাব (৭০), প্রভৃতির বর্ণনায় স্বীয় অসাধারণ রচনা-নৈপুণ্য ও অলৌকিক কাব্য নির্মাণের পরিচয় দিয়াছেন।

গ। শ্রীগৌরচরণে প্রার্থনাটিও কত মধুর—

গৌরঃ সচ্চরিতামৃতাসনিধি গৌরং সদৈব স্তবে
গৌরেণ প্রথিতং রহস্যভজনং গৌরায় সর্বং দদে।
গৌরাদস্তি কৃপালুরত্র ন পরো গৌরস্য ভৃত্যোঽভবং
গৌরো গৌরবমাচরামি ভগবন্ ! গৌর প্রভো রক্ষমাং ॥ ১১০

১১৫তম শ্লোকে এই জাতীয় প্রার্থনা আছে।

শ্রীপাদ কবিকর্ণপূর গোস্বামী তদীয় 'আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ'তে ১৫শ স্তবকে (২২০-২৫৬) বিরুদ ছন্দে রচিত একটি স্তুতি রচনা করিয়াছেন।

(৫) গত ১৩৪৯ বঙ্গাব্দে জয়পুর শ্রীগোবিন্দদেবের গ্রন্থাগারে আর একখানা বিরুদ কাব্য আমাদের হস্তগত হইয়াছে—ইহার নাম—'শ্রীকৃষ্ণবিরুদাবলী'। কিন্তু ইহা পূর্ব-কথিত মৈথিল কবি চন্দ্রদত্ত কর্তৃক রচিত গ্রন্থ হইতে সর্বাংশে পৃথক্। (Vide R. L. Mitra's Notices of Sanskrit Mss. 2361,)। দুঃখের বিষয় গ্রন্থ মধ্যে কবির নাম, ধাম বা অন্য কোনও পরিচয় নাই। শেষ (১২৪) শ্লোকের 'শ্রীকৃষ্ণ-শরণোদিতা' এই উক্তিবলে শ্রীকৃষ্ণশরণ নামক কোনও মহাজন কর্তৃক রচিত হইয়াছে বলিয়া কতকটা অনুমান করা যায়, কিন্তু এই শ্রীকৃষ্ণশরণ কে বা কোন্ দেশের লোক জানিবার উপায় নাই। তবে তিনি যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব এবং শ্রীরূপ গোস্বামির পরবর্ত্তী তাহা তাঁহার প্রথম শ্লোকে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বন্দনা শ্লোকে এবং ১২২ শ্লোকে 'সন্তমরূপানুসারিণী বাণী'—এই উক্তি হইতে বেশ বুঝা যায়। ইনিও প্রায়শঃ শ্রীরূপেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন—রচনারও বেশ মাধুরী আছে।

শ্রীকৃষ্ণকে ইনি তমাল (২৯), করীন্দ্র (৪১), সূর্য্য (২১), ও বিচিত্র দেবতরুর (৫৭) রূপকে নিরূপিত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের বহুবিধ দৃষ্টি সম্পাত (১৭), বাহুভঙ্গী (৮১, ১০৫), বক্ষঃ (৮৩) প্রভৃতির মনোজ্ঞ বর্ণনা করিয়া কবি ইঁহার মধুর মূর্ত্তিকে অপবর্গদাত্রী স্বরূপেই নির্ণয় করিয়াছেন—

পদ্মং করাঙ্ঘ্রি চরণে ফণবান্নব লোমরাজি-
র্বক্ত্রং বিধুর্ভ্রমরকা ভ্রমিতালকান্তে।
মুক্তা রদা ইতি পবর্গময়ী মুরারে
র্মূর্ত্তি স্তথাপি ভজতামপবর্গদাত্রী ॥ ৯১ ॥

শ্রীকৃষ্ণের পৌগণ্ড (৭৯) ও রাসলীলার (২৭) সুন্দর বর্ণনা করিয়া ইনি বংশীকেই বহুবার বহুভাবে স্তুতিমাল্য দান করিয়াছেন—বংশী পুরন্ধ্রীবৎ উত্তমবংশোৎপন্না, স্বীকৃত-সংনাগরা, মধুরালাপা ও কৃষ্ণাধর-দংশিনীরূপে জয়যুক্ত হইতেছেন (৪৯)। এই বংশীধ্বনি গোপ-ললনাদের মানহস্তি-নিরসনে সিংহ, বিশ্বপাপরূপ তুলারাশির দহনে দাবানল, বনসমূহে ঋতুরাজ বসন্ত, জগদ্বশীকরণে অনির্বাচ্য মন্ত্র এবং দৈত্যকুলের উচ্চাটন (৫৩)। বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে বরবংশজাতা বংশী কুলজাদেরই কুলধৈর্য্যবংশকে লোপ করিতেছে (৭৭) !! এইরূপে ৮৫ ও ৮৯ শ্লোকেও এই মোহন মুরলীরই প্রশংসা করা হইয়াছে।

অক্ষরময়ী কলিকার শেষ প্রার্থনাটিও অতি সুন্দর—

কর্ণে কম্পিত-কর্ণিকার-কলিকঃ কন্দর্পকেলিক্রিয়া-
কল্যাকল্যবিকল্পনাতি কুতুকী কৈশোরকালক্রমঃ।
কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত কোমলালককুলঃ কাদম্বিনী-কন্দলঃ
কৃষ্ণঃ কেকি-কলাপ-কীলিতকচঃ কং বঃ ক্রিয়াৎ কামদঃ ॥ ১১৫

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপাপ্রেরিত গোস্বামিগণের এই বিরুদ-পঞ্চক সম্বন্ধে যৎসামান্য আলোচনা করিলাম। মূল গ্রন্থের তাৎপর্য্য আস্বাদন করিয়া পাঠকগণ আনন্দানুভব করিলেই আমাদের উদ্দেশ্য সফল হয়।



কথা ঃ মনোজিৎ বসু   সুর ও স্বরলিপি ঃ জগৎ ঘটক

গানে গানে আমার কথা ফুটবে কি ?
আশার স্বপন সফল হ'য়ে উঠ্‌বে কি ?
মনের বনে চাঁপার কলি জাগ্‌লো রে
আনন্দ তাই লাগলো আজি লাগলো রে—
তার ভোম্‌রা এসে আমার ফুলে জুটবে কি ?

মলয় তাহার পরশ আজি আনুক্‌ না,
মনের কথা মনেই গিয়ে লাগুক না।
মোর নীল আকাশে চাঁদের আলো যায় ভাসি'
নদীর বুকে উঠ্‌লো জোয়ার উচ্ছ্বসি';
আজ আমার তরী তার সে কূলে ছুটবে কি ?

II { পা পনা ধনা | ধপা -া -া I (ক্ষা পা -া | -া ক্ষা গা I
গা নে॰ গা॰ নে॰ ॰ ॰ আ মা ॰ র ক থা

I রা -গা রগরা | রা সা -া I ন্‌া -র্‌া গা | পক্ষাপা -গা -ক্ষা)} I
ফু ট্‌ বে॰ কি ॰ ॰ ফু ট্‌ বে কি॰ ॰ ॰

I সা সন্‌া রা | রা রা -া I রা সরা -গমা | রা গা -া I
আ শা॰ র্‌ স্ব প ন্‌ স ফ॰ ॰ল্‌ হ' য়ে ॰

I ক্ষা -গা ক্ষা | পা -া -া I ক্ষা -ধ্‌া নধা | ক্ষপা -গা -ক্ষা II
উ ঠ্‌ বে কি ॰ ॰ উ ঠ্‌ বে কি ॰ ॰

II পা ক্ষপা গা | পা পা -া I পা পক্ষা ধা | ধা ধা -া I
ম নে র্‌ ব নে ॰ চাঁ পা র্‌ ক লি ॰

I পধা -নর্সা র্সধা | ধনা -া -া I -া -া -া | া া া I
জা॰ ॰গ্‌ লো রে ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰

I পা না -া | নর্সা র্সা -র্া I র্সা -র্গা গর্র্া | র্সা নর্সা -ধনা I
আ ন ন্ দ তা ই লা গ্ লো আ জি •

I র্সা -র্রা গর্র্া | র্সা -া -া I -া -া -া | া র্সা -া I
লা গ্ লো রে • • • • • • তা য়্

I না -নর্রা র্রা | ধা ধা -না I হ্মা পা -া | হ্মা গা -া I
ভো ম্ রা এ সে • আ মা য়্ ফু লে •

I রা -গা রগার | রসা -া -া I ন্া -রা গা | পহ্মাপা -গা -হ্মা II
জু ট্ বে কি • • জু ট্ বে কি• • •

II সা সা -া | ন্সা ধ্া -ন্া I সা সরা -া | গরা সা -ন্া I
ম ল য় তা• হা য়্ প র শ্ আ ঙ্গি •

I সা রগা -মা | রা গা -া I -া -া -া | া া া I
আ কু ক্ না • • • • • • • •

I মা মা -া | মা মা -া I মা মধা -পধা | ধপা মা -মগা I
ম নে য়্ ক থা • ম নে• •ই গি য়ে •

I গা রগা -পমা | গা -রগরা সা I সধ্া সরগা -পমা | গমা রা -গা I
লা গু• •ক্ না • • • লা গু• • •ক্ না• • •

I পা -া পা | হ্মাপা গা -া I পা পহ্মা ধা | ধা ধা -া I
নী ল্ আ কা• শে • চাঁ দে র্ আ লো •

I পধা -নর্সা ধা | ধনা -া -া I -া -া -া | া া া I
যা• •য়্ ভা সি • • • • • • • •

I পা না -া | নর্সা র্সা -র্রা | র্সা -র্গা গর্র্া | র্সা নর্সা -ধনা I
ন দী র্ বু কে • উ ঠ্ লো জো য়া র্

I র্সা -র্রা গর্র্া | র্সা -া -া | -া -া -া | া র্সা -া I
উ • চ্ছ্ব সি • • • • • • আ জ্

I না নর্রা -া | ধনা ধনা -া I হ্মা -পা পা | হ্মা গা -া I
আ মা র্ ত• রী • তা র্ সে কু লে •

I রা -গা গরা | রসা -া -া I ন্া -রা গা | পহ্মাপা -গা -হ্মা II II
ছু ট্ বে কি • • ছু ট্ বে কি • • •

জঙ্গম

বনফুল

২৩

গ্রামের ছোট ষ্টেশনটিতে শঙ্কর ট্রেন হইতে যখন নামিল তখন তাহার মনে হইল একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া সে যেন তাহার পরিচিত বিছানায় আবার জাগিয়া উঠিল। এতদিন একটা কদর্য্য ঘূর্ণাবর্ত্তে সে যেন হাবুডুবু খাইতেছিল। দেঁতো হাসি, ছেঁদো কথা, অনান্তরিক আলাপ, সবজান্তা উন্নাসিকতা, স্বার্থসর্ব্বস্ব মনোভাব, যুদ্ধের হিড়িক, তা ছাড়া দোকান দোকান দোকান—এই অল্প কয়েকদিনে কলিকাতার আবহাওয়া তাহার মনে যে গ্লানি জমাইয়া তুলিয়াছিল কুৎসিৎ-দর্শন ষ্টেশন-মাষ্টারের আকর্ণবিস্তৃত আন্তরিক হাসির স্পর্শে তাহার অনেকখানি যেন ধুইয়া মুছিয়া গেল।

"আমার জিনিস এনেছেন?"

হাসিয়া মাষ্টার মহাশয় আগাইয়া আসিলেন।

"এনেছি—"

ঝুড়ির ভিতর হইতে রবিন্‌সনের বার্লির কৌটাটি শঙ্কর বাহির করিয়া দিল।

"বিস্তর জিনিস এনেছেন দেখছি। আরে বা বা বা—চমৎকার—কুমোরটুলির নিশ্চয়—"

"হ্যাঁ। সমস্ত রাস্তা আগলে আগলে আসছি, পাছে কেউ ধাক্কা মেরে দেয়—"

সরস্বতী প্রতিমাটিকে শঙ্কর সস্নেহে একধারে সরাইয়া রাখিল। ছোট প্রতিমাটি কিন্তু নিখুঁত একেবারে।

"আপনার আনা চারেক ফিরেছে। এই নিন"

ঘাড় ফিরাইয়া শঙ্কর দেখিল মাষ্টার মহাশয় নিজ প্রকোষ্ঠে অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন। ক্ষণপরেই তিনি থার্মোফ্লাস্ক হইতে কাপে চা ঢালিতে ঢালিতে বাহির হইয়া আসিলেন।

"একটু ইষ্টিম্ করে' নিন—যা শীত"

"কোথা পেলেন এই ভোরে"

"আমার জন্যে এসেছিল বাড়ি থেকে। আমি আবার আনিয়ে নিচ্ছি"

"না না সেটা ঠিক হয় না"

"খুব ঠিক হয়। আমি আনিয়ে নিচ্ছি এখুনি। আপনি যা জিনিস এনেছেন—গিন্নি দুহাত তুলে আশীর্ব্বাদ করবে এখন আপনাকে"

"বাড়িতে কারো অসুখ না কি"

"তিন তিনটে মেয়ে পেটের অসুখে ভুগছে মশাই। গ্যাঁদাল পাতার ঝোল আর খেতে পারে না বেচারিরা। নটবর বার্লি খাওয়াতে বলেছে, কিন্তু এ অঞ্চলে ও বস্তু পাবার জো নেই—ভাগ্যে আপনি কোলকাতা গেলেন—ও ইয়েস—আপনার সব জিনিস নেবেচে তো—ও ইয়েস, অল রাইট, অল রাইট—"

মাষ্টার মহাশয়ের সমর্থন পাইয়া গার্ড সাহেব বাঁশী বাজাইয়া সবুজ পতাকা আন্দোলিত করিলেন। গাড়ি ছাড়িয়া দিল।

চা খুব খারাপ, তবু শঙ্করের অন্তর যেন পরিতৃপ্ত হইয়া গেল। চা পান করিয়া শঙ্কর পেয়ালাটি নামাইয়া রাখিল। ইতিপূর্ব্বে অনেকবার তাহার মনে হইয়াছে—এখন আবার মনে হইল এই কেরাণীরাই প্রকৃত ভদ্রলোক। ইহারা হয়তো 'এডুকেটেড্' নয়, কিন্তু ইহারাই ভদ্রলোক। ছাঁ-পোষা বেচারীরা তথা-কথিত কালচারের ধার ধারে না, কিন্তু স্বল্প আয় সত্ত্বেও ইহারাই সামাজিক সমস্ত দায়িত্ব বহন করে। থলি হাতে বাজারে যায়, ঋণগ্রস্ত হইয়া ছেলে পড়ায়, মেয়ের বিবাহ দেয়, অসমর্থ আত্মীয়কে প্রতিপালন করে, লোক-লৌকিকতা বজায় রাখে, চাঁদা করিয়া দুর্গাপূজা কালীপূজা করে, রাত জাগিয়া যাত্রা থিয়েটার শোনে। অথচ কোন অহমিকা নাই, সর্ব্বদাই যেন সঙ্কুচিত হইয়া আছে। স্বাতন্ত্র্যবাদী ড্রইংরুম-বিহারী আলোকপ্রাপ্ত সমাজে যে আন্তরিকতার অভাব ইহাদের মধ্যে বাঙালী জাতির সেই সহৃদয় আন্তরিকতা এখনও জীবন্ত হইয়া আছে—ওষ্ঠ-চটক অন্তঃসারশূন্য আপ্যায়নমাত্রে পর্য্যবসিত হয় নাই।

"আপনার চার আনা ফিরেছে এই নিন—"

"শস্তায় পেয়েছেন তাহলে। ওরে বজ্‌রঙ্গি পেয়ালাটা তুলে রাখ বাবা, পা লেগে ভেঙে গেলেই গেল। আচ্ছা, আমি এবার চলি, ঘানি কামাই দেবার জো নেই তো—"

হাসিয়া মাষ্টার মহাশয় নিজ অফিসে প্রবেশ করিলেন।

মুশাই গরুর গাড়ি আনিয়াছিল। কুলির সাহায্যে সে জিনিসপত্র গরুর গাড়িতে তুলিতে লাগিল। কাপড় চোপড়, বই খাতা, এক ঝুড়ি কমলালেবু, এক ঝুড়ি নারকুলে কুল, বাসনপত্র, গোটা দুই কোদাল, বাংলাদেশের কুলো ধুচুনি, এক বাক্স গ্রামোফোন রেকর্ড, তা ছাড়া স্যুটকেস, বিছানা—গাড়িতে বসিবার স্থান আর রহিল না। শঙ্কর ঠিক করিল হাঁটিয়াই যাইবে। সরস্বতী প্রতিমাটা লইয়া যাওয়াই সমস্যা। স্কুলের ছেলেদের ফরমাশ, অনেক কষ্টে বাঁচাইয়া বাঁচাইয়া এতদূর আনিয়াছে। ছোট প্রতিমা একটা কুলি মাথায় করিয়া লইয়া যাইতে পারিবে না? পারা তো উচিত। মুশাইকে জিজ্ঞাসা করিতে সে বলিল—"চেটিয়া—সেনি আইলোছে, ওহি লোগ লে যাইতে—"

"ওরা এসেছে? কই, কোথায়"

মুশাইয়ের অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে শঙ্কর দেখিল ষ্টেশন হইতে একটু দূরে যে প্রকাণ্ড বটগাছটা আছে তাহার নীচে একদল ছাত্র সত্যই বসিয়া রহিয়াছে। তাহাকে এখনও দেখিতে পায় নাই বোধহয়। এই ভোরে এতটা পথ তাহারা হাঁটিয়া আসিয়াছে। তাহার নিজের ছাত্রজীবন মনে পড়িল। সরস্বতী পূজাকে কেন্দ্র করিয়া ছাত্রজীবনে কি উৎসাহই না হইত। সরস্বতী পূজার আগের দিন রাত্রে চোখে ঘুমই আসিত না। দুবেজিকে মনে পড়িল। তিনি স্বহস্তে প্রতিমা নির্ম্মাণ করিতেন। খড় দেওয়া হইতে সুরু করিয়া রং দেওয়া পর্য্যন্ত প্রত্যহ দুবেজির বাড়িতে ধর্ণা দিয়া বসিয়া থাকিত সে। দুবেজির চেহারাটা স্পষ্ট মনের উপর ভাসিয়া উঠিল। বৃদ্ধ হইয়া একটু কুঁজো হইয়া পড়িয়াছিলেন,

মুখে একটি দাঁত ছিল না, কপালের মাঝখানে একটি চন্দনের ফোঁটা পরিতেন। বড় নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। প্রাণ দিয়া ঠাকুরটি গড়িতেন, প্রাণ দিয়া পূজাও করিতেন। ছাত্রজীবনের সেই অতীত দিনগুলি শঙ্করের মনে সজীব হইয়া উঠিল। দেবদারু পাতা আর রঙীণ কাগজের শিকল দিয়া স্কুল সাজানো, নিষ্ঠাভরে কুল না খাওয়া, পূজার দিন ভোরে উঠিয়া যবের শিষ্ সংগ্রহের জন্ম মাঠে যাওয়া, অঞ্জলি না দেওয়া পর্য্যন্ত উপবাস করিয়া থাকা···ছাত্রদল আসিয়া শঙ্করকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের চোখে মুখে কি প্রদীপ্ত উৎসাহ। তাহারা আশাই করিতে পারে নাই যে শঙ্করবাবু সত্যসত্যই তাহাদের জন্ম প্রতিমা লইয়া আসিবেন। 'যদি'র উপর নির্ভর করিয়াই তাহারা এতটা পথ হাঁটিয়া আসিয়াছিল। কুলির দরকার কি! প্রতিমা তাহারাই বহিয়া লইয়া যাইবে। অপেক্ষাকৃত বয়স্ক একজন বালক সোৎসাহে আগাইয়া আসিল। মুশাই গরুর গাড়ি লইয়া আগাইয়া চলিয়া গেল। ছাত্রদের সহিত শঙ্কর পথ হাঁটিতে লাগিল।

প্রভাত হইতেছে। দুই পাশে চাষের জমি। সরিষা কাটা হইতেছে। গম এবং যবের শিষ্ ধরিয়াছে। চতুর্দ্দিকেই স্নিগ্ধ শ্যামলশ্রী। ফুলে পাতায় শিশির বিন্দু টলমল করিতেছে। কোথায় যেন একটা শ্যামা পাখী শিস্ দিতেছে। বকের সারি উড়িয়া চলিয়াছে। একটা ক্ষেতের মাঝখানে বসিয়া কয়েকটা কাক কলরব তুলিয়াছে। কোথাও যেন কোন অভাব নাই, নীচতা নাই, কলহ নাই, সমস্তই যেন প্রাচুর্য্যে, দাক্ষিণ্যে, সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ। শঙ্করের মনে হইল এই তো আমার দেশমাতৃকা, অন্নপূর্ণা সদাহাস্যময়ী জননী। মুগ্ধনেত্রে শঙ্কর সম্মুখের দিকে চাহিল। ছাত্রের দল সরস্বতী প্রতিমাকে মাথায় করিয়া লইয়া চলিয়াছে—যে সরস্বতী কুন্দেন্দুতুষারধবলা, পুস্তক-শ্রী, বীণাপানি, সংশয়-অন্ধকার-বিনাশিনী জ্যোতির্ম্ময়ী বাণী···। তাহার মনে হইল ভারতবর্ষের বিশিষ্ট রূপটি আজ যেন এই প্রভাত আলোকে অপরূপ হইয়া ফুটিয়াছে। দিগন্তবিস্তৃত শস্যশ্যামল মাঠের বুক চিরিয়া সরু একটি পায়ে-চলার পথ—সেই পথ দিয়া বিদ্যার্থীর দল বাণীমূর্ত্তিকে বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছে—যুগযুগান্ত ধরিয়া চলিয়াছে—কত রাজ্যের কত উত্থান পতন হইল—ভারতবর্ষের এই মূর্ত্তিটি কিন্তু এখনও শাশ্বত হইয়া আছে।

২৪

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

প্রকাণ্ড হল-ঘরে প্রকাণ্ড টেবিলে প্রকাণ্ড একটা ম্যাপ বিস্তৃত করিয়া উৎপল তন্ময়চিত্তে কি যেন দেখিতেছিল শঙ্কর আসিয়া প্রবেশ করিল।

"ও কি"

তাহার স্বরটা যেন রুক্ষ। উৎপল চকিতে একবার তাহার দিকে চাহিয়া পুনরায় ম্যাপে দৃষ্টিনিবদ্ধ করিল এবং বলিল—"আধুনিক কুরুক্ষেত্র—"

"ম্যাপ দেখে খবরের কাগজ পড়ছ! যুদ্ধ নিয়ে খুব উন্মত্ত হয়ে উঠেছ তাহলে—"

"খুব। মানব-সভ্যতার এতবড় একটা উর্দ্ধোৎক্ষেপে তোমরা যে কি করে' অবিচলিত আছ আমি বুঝতে পাচ্ছি না"

"আমরা তো উদ্ভিদ মাত্র! মানব-সভ্যতার হর্ষ বিষাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কি। যাদের তুমি মানব বলছ, তাদের সঙ্গে আমাদের খাদ্যখাদক সম্বন্ধ। তুমি হয় তো মানব, কিন্তু আমি নই—"

উৎপল ঈষৎ ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া ক্ষণকাল শঙ্করের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল—তাহার পর টেবিল হইতে সিগারেট কেসটা তুলিয়া স্মিতমুখে খুলিয়া ধরিল।

"অনেকক্ষণ সিগারেট খাওনি মনে হচ্ছে—"

"সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি"

সবিস্ময়ে ভ্রূযুগল উত্তোলন করিয়া উৎপল বলিল—"হঠাৎ এ তুঙ্গী ভাব!"

শঙ্কর নির্ব্বাক হইয়া রহিল।

"ব্যাপার কি? ব'স্—দাঁড়িয়ে রইলি কেন"

শঙ্কর একটা চেয়ারে উপবেশন করিল। সিগারেট-প্রসঙ্গ লইয়া আলোচনা করিবার মতো মনের অবস্থা তাহার নয়—যাহা বলিতে আসিয়াছিল তাহাই বলিয়া ফেলিল।

"নিজে জামিন হয়ে ওদের ছাড়িয়ে নিয়ে এলুম"

"কাদের?"

"ফরিদ কারু পূরণ আর হরিয়াকে"

"কে তারা?"

"তোমার প্রজা। দারোগা সাহেব তাদের ধরে' নিয়ে গিয়ে মারধোর করছিলেন—অথচ তাদের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ নেই"

"ও"

উৎপল সন্তর্পণে সিগারেটে একটি টান দিল এবং ব্যাপারটা এইবার হৃদয়ঙ্গম করিল। এতক্ষণ সে সত্যই কিছু বুঝিতে পারে নাই। সিগারেটে মৃদু গোছের আর একটা টান দিয়া সে চুপ করিয়া রহিল।

শঙ্কর আর কোন কথা বলিল না, তাহার রগের শিরাগুলা দপদপ করিতেছিল। উৎপল ম্যাপটার উপরই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া নীরবে ধূমপান করিতে লাগিল। তাহার পর সহসা বলিল, "ওরা যে নির্দ্দোষ তা আশা করি তুমি ঠিক জান"

"না, জানি না"

"অথচ ওদের জন্যে জামিন হলে!"

"ওরা দোষী কি নির্দ্দোষ তা জানিনা বটে, কিন্তু আসল কথাটা জানি"

"কি সেটা?"

"ওরা নিরুপায়"

"বাই জোভ"

"ওরা চুরি করে কেন জান?"

উৎপলের চক্ষু দুইটি কৌতুকে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

"জানি এবং এর পর তোমার কি বক্তৃতা যে আসন্ন তা-ও জানি"

"সব জেনেও ওদের বিরুদ্ধে থানা পুলিশ করতে ইচ্ছে হল তোমার!"

"অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিয়মের খাতিরে অনেক জিনিস করতে হয়।"

বিশেষ করে ওদের বিরুদ্ধেই আমি কিছু করিনি—চুরি হলে থানায় খবর দেওয়া উচিত বলেই দিয়েছিলাম"

"থানায় খবর দিলেই চোর ঠিক ধরা পড়বে এটা তুমি বিশ্বাস কর ?"

"বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্নই উঠছে না। চুরি হলেই থানায় খবর দেওয়াই প্রতিকারের একমাত্র উপায়। সভ্যসমাজে ও ছাড়া দ্বিতীয় আর কি উপায় আছে বল"

"সভ্যসমাজের কথা জানিনা, নিজেদের সমাজের কথা জানি—"

"সেটা কি খুলেই বল না"

"ওই তো বললাম আমরা নিরুপায়"

উৎপল স্মিতমুখে ক্ষণকাল শঙ্করের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

"কি করতে বল তাহলে তুমি। চুরি হলে সহ্য করব ?"

"তোমার নিজের ভাই চুরি করলে থানায় খবর দিতে ? ধর যদি তোমার একটা চোর ভাই থাকত—"

"তা হয়তো দিতাম না। কিন্তু পৃথিবীসুদ্ধ সকলকে নিজের সহোদর বলে স্বীকার করতে হবে ? কার্য্যকালে তা পারি না, কাব্য করবার সময় পারি অবশ্য—"

শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল।

পুনরায় ভ্রূযুগল উত্তোলন করিয়া উৎপল বলিল, "হঠাৎ হল কি তোর! ছাড়িয়ে এনেছিস বেশ করেছিস, আমার ওপর তম্বি কেন, আমি কি আপত্তি করছি ?"

"মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা চালাতে দেব না তোমাকে আমি—"

হঠাৎ তাহার গলার স্বর কাঁপিয়া গেল। সে আর বসিল না, উঠিয়া বাহির হইয়া গেল। তাহার প্রস্থানপথের দিকে চাহিয়া উৎপল অস্ফুটকণ্ঠে পুনরায় বলিল—"বাই জোভ—"

শঙ্কর অন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। অন্তরের যুক্তিহীন ক্ষোভকে অকস্মাৎ ভাষায় প্রকাশ করিয়া সে যেন অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়াছিল। এলোমেলো নানাকথা মনে হইতেছিল। কি করিবে ভাবিয়া পাইতেছিল না—কি করা উচিত—কোথায় পথ—অসংখ্য অসহায় পল্লীবাসীদের কি করিলে উপকার হইবে—মনে হইতেছিল সে কিছুই জানে না—অথচ পল্লী-সংস্কার করিতে নামিয়াছে! নিজের অক্ষমতায় সে মনে মনে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। উৎপলের নিকট হইতে চলিয়া আসিবার পরমুহূর্ত হইতেই একটা নিদারুণ সঙ্কোচে সে যেন মরিয়া যাইতেছিল। এমন কি বাড়ি ফিরিয়া যাইতেও তাহার সঙ্কোচ হইতেছিল। একটা কথা বার বার মনে হইতেছিল—ভাবপ্রবণতার আধিক্য-বশতঃ সে হয় তো অমিয়ার প্রতি অবিচার করিতেছে। এই তুচ্ছ কারণকে কেন্দ্র করিয়া হয় তো ঝড় উঠিবে এবং সে ঝড়ে অমিয়ার ক্ষুদ্র নীড়খানি হয়তো ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইবে। নিজের প্রতি তাহার কিছুমাত্র বিশ্বাস নাই। হঠাৎ কখন যে কি করিয়া বসিবে অতর্কিতে কি হইয়া যাইবে তাহা নিজেও সে জানে না। অন্তরের অন্তস্তল হইতে মাঝে মাঝে কিসের যেন একটা ঘূর্ণা জাগে, সুবিন্যস্ত চিন্তাধারাকে অবিন্যস্ত করিয়া দেয়, সাজানো বাগান ছারখার হইয়া যায়। হঠাৎ খুকীর মুখটা মনে পড়িল……কচি দুষ্টু মুখটা…। না, না, উৎপলের সহিত ঝগড়া করা চলিবে না। কিন্তু উৎপল কেন তাহার মনের কথা বুঝিবে না, কেন সে এমন নির্ব্বিকারভাবে দূর হইতে মজা দেখিবে কেবল, সভ্যসমাজের আইন মানিয়া চলাটাই কি জীবনের একমাত্র নীতি। কিন্তু উৎপলই বা করিবে কি! আইন মানিয়া চলা ছাড়া যে উপায় নাই। চুরি হইলে থানায় খবর দেওয়াই উচিত…পরক্ষণেই ফরিদ কারু হরিয়ার মুখগুলি মনের উপর একে একে ভাসিয়া উঠিল—তাহাদের পিঠের বেতের দাগগুলিও……নিরীহ নিরুপায় বেচারারা…সুরমার শাড়ি গহনা উহারা যদি লইয়াই থাকে নিতান্ত পেটের দায়েই…সহসা মনে হইল সুরমা হয়তো উৎপলের নিকট সব শুনিয়াছে—হয় তো তাহার কথা লইয়া দুইজনে এতক্ষণ হাসাহাসি করিতেছে… হঠাৎ তাহার রাগ হইল, আবার পরক্ষণে লজ্জা হইল…

"শঙ্কর না কি"

"কে"

শঙ্কর হঠাৎ চমকাইয়া উঠিল।

"আমি নিপু"

"ও, নিপু-দা। বেড়াতে বেরিয়েছেন বুঝি—"

"না। আমি মুকুন্দ পোদ্দারের বাড়ি থেকে ফিরছি। তোমার সঙ্গেও একটু দরকার ছিল, একটা কথা বলতে চাই তোমাকে"

"কি বলুন। চলুন বাড়ির দিকেই ফেরা যাক"

"চল—"

নিপুদার সান্নিধ্যে শঙ্কর যেন আত্মস্থ হইল। যে দ্বন্দ্ব এতক্ষণ তাহার চিত্তকে ক্ষতবিক্ষত করিতেছিল তাহা অন্তর্হিত হইয়া গেল। উৎপলের জমিদারির সর্ব্বেসর্ব্বা ম্যানেজার জনৈক কর্ম্মচারীর প্রয়োজনীয় আলাপ শুনিবার জন্য সহসা অতিশয় স্বাভাবিকভাবে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কিছুই যেন হয় নাই।

"কি বলবেন, বলুন"

"মুকুন্দ পোদ্দারকে যে কথা বলবার জন্যে গিয়েছিলাম, তোমাকেও সেই কথাই বলতে চাই। আমি তোমাদের শত্রু—"

"শত্রু।"

শঙ্কর বিস্মিত হইল। মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার মন অজ্ঞাতসারেই যেন শত্রুর বিরুদ্ধে বর্ম্মাবৃত হইয়া গেল। কমিউনিষ্ট নিপু দা!

"আপনি আমাদের শত্রু ? বলেন কি!"

"হ্যাঁ শত্রু। আমি কমিউনিষ্ট তোমরা ক্যাপিটালিষ্ট, তোমাদের উচ্ছেদ করাই আমার ধর্ম্ম। তোমাদের সঙ্গে আপোষ করে' চলতে পারব না আমি—"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া শঙ্কর বলিল—"আমার ধারণা ছিল আমরা সবাই একদলের"

"ভুল ধারণা ছিল। আমি অন্য জাতের লোক"

"অন্য জাত মানে ? অ-ভারতীয় ?"

"না কমিউনিষ্ট"

শঙ্কর হাসিয়া উত্তর দিল—"একটা নামের লেবেল লাগিয়ে দিলেই যে জাত বদলে যায় তা'তো জানতুম না। যে লেবেলই লাগান নিপুদা—একটা কথা ভুলে যাবেন না আমরা সকলেই নিরুপায় পরাধীন ভারতবাসী—এখন ওই আমাদের একমাত্র পরিচয় জগতের কাছে—"

"ভুলব কেন! মুহূর্ত্তের জন্যেও ভুলি না সে কথা। ভুলি না বলেই, যে ক্যাপিটালিজ্‌ম্ এই পরাধীনতার কারণ—যে ক্যাপিটালি-

জমের তোমরা পৃষ্ঠপোষক—সেই ক্যাপিটালিজমকে ধ্বংস করতে চাই আমরা। আমরা চাই সাম্য—"

"কে না চায়! পৃথিবীতে যুগে যুগে সভ্য মানুষের ওই তো আদর্শ—ওই তো স্বপ্ন—"

"স্বপ্ন কিন্তু এখন আর স্বপ্নমাত্র নেই, রাশিয়ায় তা সফল হয়েছে। আমরাও যদি তাদের পন্থা অনুসরণ করি—"

"রাশিয়ায় কি সার্ব্বজনীন সাম্য হয়েছে বলে আপনার বিশ্বাস? আমার তো মনে হয় সেখানে চাকাটা ঘুরে গেছে শুধু। সেখানেও হিংস্র বর্ব্বরতা অসহায় দুর্ব্বলকে পেষণ করছে—ক্ষমতাপ্রাপ্ত শ্রমিকরা নির্য্যাতন করছে ক্ষমতাচ্যুত ধনিকদের। একে আপনি সাম্য বলবেন? শাদা চামড়া যেমন অস্পৃশ্য করে রেখেছে কালো চামড়াকে—সোভিয়েটও তেমনি অস্পৃশ্য করে রেখেছে 'কুলাক'দের—"

"কালা আদমি আর 'কুলাক' এক জাতীয় নয়। উপমাটা ঠিক হল না তোমার—"

"বিশেষ তফাত কি। কালো হয়ে জন্মানোটা যদি অপরাধ বলে' না ধরেন—ধনী হয়ে জন্মানোটাই বা অপরাধ বলে' ধরবেন কেন"

"ধনী হয়ে কেউ জন্মায় না, গরীবের রক্ত-শোষণ করে' তবে লোকে ধনী হয়—"

"সত্যি সত্যি গরীবের রক্ত-শোষণ যারা করে নি—ধনীর বংশে জন্মগ্রহণ করেছে এই মাত্র যাদের অপরাধ, তাদেরও আপনারা নিস্তার দেন নি।"

"রক্তবীজের বংশ নির্ম্মূল করাই উচিত"

"ওটা আপনাদের রাগের ভাষা। একটু তলিয়ে দেখেন যদি কালা আদমি আর ধনীদের উপমাটা নেহাত খেলো মনে হবে না। একটা বিশেষ প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষ যেমন কালো হয় তেমনি একটা বিশেষ অর্থ-নৈতিক পরিবেশে বুদ্ধিমানও ধনী হয়—গরীব হয় বোকারা। বৈজ্ঞানিক নিয়ম অনুসারেই এ সব হয়, এর জন্যে ন্যায়ত কাউকে অপরাধী করা যায় না। শক্তি অথবা বুদ্ধি থাকা পাপ নয়—"

"ডাকাতকেও তাহলে অপরাধী করা যায় না তোমার মতে,—তার শক্তি বুদ্ধি দুইই আছে—"

"শক্তি আর বুদ্ধির যুদ্ধে সে যদি জয়ী হয় বিজ্ঞানের চোখে নিশ্চয়ই সে অপরাধী নয়—বৈজ্ঞানিক তাকেই বাহবা দেবে—বিজয়ী সোভিয়েটকে এখন আপনারা যেমন দিচ্ছেন—"

"অসহায় দুর্ব্বলরা তাদের প্রাপ্য ফিরে পেয়েছে বলে দিচ্ছি—অন্য কোন হেতু নেই। আমরা অত্যাচারী শোষকের বিরুদ্ধে—"

"অসহায় উদ্ভিদ গরু ছাগল মুর্গি মাছ এদের দিক দিয়ে ভেবে দেখলে সমস্ত মানব জাতিটাকেই তাহলে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে হয়।"

"তোমার মতো ক্যাপিটালিষ্ট-সুলভ কল্পনাশক্তি আমার নেই। আমি মানুষ, মানুষের সুখ দুঃখের কথাই ভাবি। গরু-ছাগলের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাবার মতো বাজে কবিত্ব আমার নেই। মানুষের মধ্যে যারা বঞ্চিত দুর্গত সর্ব্বহারা, যাদের ঠকিয়ে ঠকিয়ে তোমরা বড়লোক হয়েছ আমি তাদের দলে। তুমি যতই না কবিত্ব কর—"

"কবিত্ব নয়, বায়োলজি। বায়োলজিষ্টের চোখে জীবজগতে দুটি মাত্র দল আছে—বিজিত এবং বিজেতা। উদ্ভিদ গরু ছাগল মুর্গি মাছ এবং আপনার ওই বঞ্চিত দুর্গত সর্ব্বহারারা বায়োলজিষ্টের বিচারে এক শ্রেণীভুক্ত—জীবনযুদ্ধে সক্ষম লোকের কাছে ওরা হেরে গেছে—কিম্বা যাচ্ছে—"

"যারা মানুষকে মুর্গি মাছের সামিল করে' দেখে তাদের বিরুদ্ধেই আমাদের যুদ্ধ। আমরা বঞ্চিতদের দলে, ওরাও যাতে পৃথিবীতে মানুষের মতো বাঁচতে পারে প্রাণপণে সেই চেষ্টাই করব আমি—"

"আমরাও তো সেই চেষ্টাই করছি। সেই জন্যেই তো আপনাকেও ডেকে এনেছি, আপনি আমাদের শত্রু ভাবছেন কেন"

নিপুদা চুপ করিয়া রহিল। অন্ধকারে কিছুক্ষণ পথ চলিয়া শঙ্কর আবার প্রশ্ন করিল—"হঠাৎ আপনার আজ এ কথা মনে হচ্ছে কেন"

"হঠাৎ হয় নি, বরাবর এই আমার মত। এতদিন সে কথা বলবার সাহস ছিল না। এখন মনে হচ্ছে দু' নৌকায় পা দিয়ে আমি চলতে পারব না"

"সত্যিই কি নৌকো দুটো? আমরা সবাই কি এক নৌকোতেই ভাসছি না?"

"না। কবিত্ব করে' আসল সত্যটা কিছুতেই ঢাকা দিতে পারবে না। তোমাদের সঙ্গে আমার অনেক তফাৎ। তোমরা সুখী। অন্তত দেহের স্বাভাবিক ক্ষুধা মেটাবার সঙ্গতি তোমাদের আছে, আমার নেই। কোনক্রমে কদন্ন খেয়ে, ভয়ে ভয়ে কুৎসিৎ নারী সঙ্গ করে, দেঁতো হাসি হেসে আমাকে যে দুর্ব্বহ জীবন যাপন করতে হয়—তার সঙ্গে তোমাদের জীবনের কিছুমাত্র মিল নেই। তোমাদের অধীনে থেকে তোমাদের অনুগ্রহ-প্রদত্ত যৎসামান্য বেতন নিয়ে হাড়ি পাড়ার কদর্য্যতার মধ্যে বাস করে' একথা কিছুতেই আমি মানতে পারব না যে আমরা এক নৌকোতে ভাসছি। আমাদের জাত আলাদা—আমরা বঞ্চিত, তোমরা বঞ্চক। মিথ্যা অভিনয় করতে পারব না আমি—"

শঙ্করের কানের দুই পাশ সহসা গরম হইয়া উঠিল। তবু আত্মসংবরণ করিয়া রহিল সে এবং ক্ষণকাল পরে সংযতকণ্ঠে প্রশ্ন করিল—"কি করবেন তাহলে"

"আজই কোলকাতা চলে যাব। মিথ্যার মুখোস পরে' তোমাদের অধীনে কাজ করা পোষাল না আমার—"

"বেশ"

"আচ্ছা, চলি তাহলে"

নিপুদা হঠাৎ বিপরীত দিকে ঘুরিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল। বিস্মিত শঙ্কর বিমূঢ়ের মতো দাঁড়াইয়া রহিল। উদীয়মান ক্রোধ কোথায় বিলীন হইয়া গেল, নিপুদার কাতর অন্তরটা সহসা যেন অতি স্পষ্টভাবে দেখিতে পাইল সে। শুধু নিপুদার নয় দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত যুবকদের করুণ মর্ম্মকথা নূতন করিয়া তাহার চিত্তকে উন্মথিত করিয়া তুলিল। সত্যই বঞ্চিত বেচারারা। লেখাপড়া শিখিবার সময় আদর্শ-জীবনের যে স্বপ্ন তাহারা দেখে, লেখাপড়া শেষ করিয়া কিছুতেই তাহারা বাস্তব জীবনে সে স্বপ্নকে সফল করিয়া তুলিতে পারে না। মরীচিকার মতো কেবলই তাহা দূর হইতে প্রলুব্ধ করে, কিছুতেই নাগালের মধ্যে

ধরা দেয় না। আদর্শ জীবন দূরে থাক স্বাভাবিক জীবন যাপন করিবারই সুযোগ মেলে না, অতিশয় স্থূল আধিভৌতিক ক্ষুধা মিটাইবারও সঙ্গতি নাই। ঘরের পরের সকলের অবজ্ঞা উপহাস শুনিয়া চাকরির চেষ্টায় আপিসের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া মুক্তির চেষ্টায় অবশেষে হয় স্বদেশী—না হয় সাহিত্যিক হয়। শঙ্কর আবার পথ চলিতে সুরু করিল। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল ফরিদ কারু হরিয়া পুরণই কেবল নয়—নিপুদা এমন কি সে নিজেও একদলভুক্ত—জীবন যুদ্ধে পরাজিত লাঞ্ছিত অপমানিত। নিপুদাদের দুঃখটা আরও বেশী মর্ম্মান্তিক। কল্পনায় তাহারা যে মহত্তর জীবনের স্বাদ পাইয়াছে, বাস্তবে কিছুতেই তাহাকে মূর্ত্ত করিয়া তুলিতে পারিতেছে না। পিপাসা জাগিয়াছে—কিন্তু পানীয় নাই—আছে শুধু স্বপ্ন। আলো কি তাহা জানে—মিলিয়াছে কিন্তু আলেয়া। ফরিদ কারু হরিয়াদের অভাব আছে কিন্তু স্বপ্ন নাই। তাই তাহারা অভাবের মধ্যেও সুখী। স্বপ্নই পাগল করিয়া তোলে। পরাজিত, লাঞ্ছিত, অপমানিত—এই কথাগুলাই বার বার মনে মনে আবৃত্তি করিতে করিতে শঙ্কর পথ চলিতে লাগিল। বার বার তাহার মনে হইতে লাগিল সুমহৎ হিন্দুসভ্যতার ঐতিহাসিক আস্ফালনে মাতিয়া যত বাগাড়ম্বরই আমরা করি না কেন এই বৈজ্ঞানিক সত্যকে কিছুতেই উড়াইয়া দেওয়া যাইবে না যে আমরা হারিয়া গিয়াছি। বিজয়ী প্রতিপক্ষের নিষ্ঠুর প্রহারে আমরা মরণোন্মুখ—কেবলমাত্র হিন্দুসভ্যতার জয়গান করিয়া গীতা-উপনিষদ্-রামায়ণ-মহাভারত আওড়াইয়া কিছুতেই সে মৃত্যুকে রোধ করা যাইবে না। সহসা তাহার মনে হইল—সনাতন আর্য্য-সভ্যতা সত্যই যদি এত মহৎ ছিল তবে তাহা সগৌরবে বাঁচিয়া থাকিতে পারিল না কেন? বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাব কেন সম্ভবপর হইল? মুসলমানই বা আসিল কেন? তা ছাড়া আর্য্যসভ্যতার যাহা লইয়া আমরা গর্ব্ব করি তাহার সহিত আমাদের অন্তরের নিবিড় যোগ কতটুকু? যাঁহারা রামায়ণ মহাভারত গীতা উপনিষদ রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহারা এবং আমরা কি একজাতের লোক? রামায়ণ মহাভারতে বর্ণিত চরিত্র কি আমাদের চরিত্র? কিছুমাত্র কি মিল আছে? মিল আছে বরং ইয়োরোপের। যে আর্য্যরা এখন ইয়োরোপে রাজত্ব করিতেছে সেই আর্য্যদেরই একটা অংশ ভারতবর্ষে একদা আসিয়াছিল, তাহাদেরই কীর্ত্তিকলাপ তাহাদেরই সভ্যতা বেদ-উপনিষদ রামায়ণ-মহাভারতে লিপিবদ্ধ আছে, ইয়োরোপের ইতিহাসে কাব্যে বিজ্ঞানে যেমন লিপিবদ্ধ আছে ইয়োরোপীয় আর্য্যসভ্যতার কাহিনী। আমরা কি আর্য্য? মোটেই নয়। ও সব লইয়া আমরা বৃথা গর্ব্ব করিয়া মরি। আমরা পরাজিত, লাঞ্ছিত, অপমানিত, শোষিত, পদদলিত এইটুকুই ঐতিহাসিক সত্য—এই সত্যটা যদি কাঁটার মতো মর্ম্মে বিঁধিয়া থাকে তবেই হয়তো উদ্ধারের উপায় আছে। সহসা তাহার মনে হইল মর্ম্মে কি বিঁধিয়া নাই? প্রতি পদে প্রতি কশাঘাতের সহিত কি মনে পড়িতেছে না আমরা অক্ষম অশক্ত অপটু নির্ব্বীর্য্য স্বপ্ন-বিলাসীর দল? কিন্তু কই উদ্ধারের উপায় তো দেখা যাইতেছে না। আমাদের অপটুতা লইয়া আমরা নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করিতেছি, আমাদের দুঃখ-দৈন্য লইয়া কবিত্ব করিতেছি, রাজনীতির নামে হয় খোশামোদ না হয় দলাদলি করিতেছি—উদ্ধারের উপায় সন্ধান করিতেছি কই! আমাদের শক্তি বাড়িতেছে কই! তা ছাড়া 'আমরা' মানে কাহারা? এই গ্রামের লোক? বেহারীরা? বাঙালীরা? ভারতবাসীরা, না এশিয়াবাসীরা? না, পৃথিবীর যেখানে যত দুর্গত দুর্ভাগারা আছে সকলে?...হাঁটিতে হাঁটিতে সহসা সে স্থির করিয়া ফেলিল—নিপুদাকে যাইতে দেওয়া হইবে না। নিপুদার বাসায় গিয়া যখন সে হাজির হইল তখন নিপুদা' তোরঙ্গ গোছানো শেষ করিয়া বিছানা বাঁধিতেছেন। বাহিরে একটা গরুর গাড়ি অপেক্ষা করিতেছে।

"নিপুদা, আপনার যাওয়া হবে না—"

নিপুদা শঙ্করের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল—তাহার মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না। যদিও সে যাইবে বলিয়াই ঠিক করিয়াছিল তবু শঙ্করের কথায় মনে মনে যেন একটু তৃপ্তি অনুভব করিল। মুখে বাঁকা হাসিটি ফুটিয়া উঠিল।

"আমি থাকতে পারব না ভাই, মাপ কর। যে কাজের ভার তুমি আমাকে দিয়েছ আমি তার উপযুক্ত নই। তা ছাড়া তোমার সঙ্গে মতেরও মিল নেই আমার—"

"আমার মত যে ঠিক, আমিই তা জানিনা। অন্ধকারে পথ হাতড়াচ্ছি কেবল। আপনি চলে যাবেন না নিপুদা—"

শঙ্করের কণ্ঠস্বরে এমন একটা মিনতি ফুটিয়া উঠিল যে নিপুদা অবাক হইয়া গেল। অন্ধকারে অসহায় পথভ্রান্ত পথিক যেন সাহায্য চাহিতেছে।

"তোমার মতের ঠিক নেই, অথচ তুমি দেশের কাজে নেবেছ? তোমার একটা উদ্দেশ্য আছে নিশ্চয়—"

"দেশের ভালো হোক সর্ব্বান্তঃকরণে এই আমি চাই—এর বেশী আর কোন উদ্দেশ্য নেই—"

"ভালো মানে কি? মাড়োয়ারিরা বেশী বড়-লোক হোক?"—

"সে সব আলোচনা পরে হবে, আপনি এখন বিছানা খুলুন"

পরস্পর উভয়ের দিকে নির্নিমেষে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিল। তাহার পর নিপুদা বলিল—"আচ্ছা, তুমি এত করে' বলছ যখন আজকে অন্তত যাওয়াটা স্থগিত রাখলুম, পরে কি করব বলতে পারি না"•

শঙ্কর বাড়ি ফিরিয়া দেখিল লক্ষ্মীবাগের মণি তাহার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। মণি স্বাস্থ্যবান যুবক। শুধু দেহ নয়, মনও তাহার বলিষ্ঠ। কলেজে পড়াশোনা শেষ করিয়া চাষ করিতেছে, চাকরি পাইয়াও চাকরি করে নাই। খুব ভাল শিকারী, কলেজে নাম-করা স্পোর্টস্‌ম্যান ছিল।

"কি হে, কি খবর"

"গুলাব সিং রোজ মোষ পাঠিয়ে আমার গমের ক্ষেতে চরিয়ে দিচ্ছিল, আমি দু'দিন লোক পাঠিয়ে ভদ্রভাবে তাকে মানা করেছিলাম, তবু কাল আবার তার মোষ এসেছিল—"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া মণি চুপ করিল।

"তার পর?"

"আমি গোটা দুই মোষ গুলি করে' মেরেছি কাল"

"মেরেছ!"

"না মেরে উপায় কি, ভদ্রভাবে বললে যখন শুনবে না। আমার একশ' বিঘে গম কি ভাবে নষ্ট করেছে আপনি যদি দেখেন গিয়ে—"

তাহার চোখ দুইটা জ্বলিয়া উঠিল।

"আমাকে কি করতে হবে"

"গুলাব সিং দাঙ্গাহাঙ্গামা করবে শুনে উৎপলবাবুর কাছে এসেছিলাম, তিনি আপনার কাছে পাঠিয়ে দিলেন"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শঙ্কর বলিল, "তুমি থানায় গিয়ে একটা ডায়েরি করে' দাও আপাতত"—বলিয়াই তাহার মনে পড়িয়া গেল এই থানা লইয়াই কিছুক্ষণ আগে উৎপলের সহিত তাহার ঝগড়া হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহা ছাড়া কি-ই বা করিবার আছে এখন। ওই ঘুসখোর দারোগাটার কাছেই প্রতিকারের জন্য ছুটিতে হইবে।

মণি উঠিয়া দাঁড়াইল।

"আপনি বলছেন যখন—যাচ্ছি আমি থানায়, কিন্তু ওতে কিছু হবে না। আমি এসেছিলাম গোটা কয়েক লাঠিয়াল সিপাহী চাইতে, বেশী নয় গোটা দশেক সিপাহী যদি আমাকে দেন—মেরে পস্তা উড়িয়ে দিতে পারি আমি ব্যাটাদের—"

"আচ্ছা, সে পরে দেখা যাবে। আগে আইনত চেষ্টা করে' দেখা যাক—"

মণি উঠিয়া গট্ গট্ করিয়া চলিয়া গেল। শঙ্করের ব্যবস্থাটা তাহার মনঃপূত হইল না।

রহিম আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

"হুজুর দশঠো রুপিয়া কা বড়া—"

শঙ্করের আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। এক মুহূর্ত্ত তাহাকে শান্তি দিবে না ইহারা।

"হিঁয়া কি রুপিয়া কা গাছ হ্যায়? ভাগো হিঁয়া সে—"

কণ্ঠস্বর অতটা উচ্চ করিতে সে চাহে নাই, কিন্তু উচ্চ হইয়া পড়িল।

রহিম সভয়ে বারান্দা হইতে নামিয়া গেল। তাহার ভীত চকিত দৃষ্টি শঙ্করকে কশাঘাত করিল যেন।

"শুনো—"

রহিম ফিরিয়া দাঁড়াইল।

"ক্যা করে গা রুপিয়া লেকে—"

"তিন দিন সে বালবাচ্চা সব ভুখা হ্যায় হুজুর। কুছ নেই খায়া। মোদিকা দোকান মে দশ রুপিয়া বাঁকি হ্যায়—ই রুপিয়া নেহি দেনে সে আর উধার নেহি মিলে-গা—"

সসঙ্কোচে সে থামিয়া গেল। আশা-আকাঙ্ক্ষা-ভরা দৃষ্টি তুলিয়া চকিতে শঙ্করের মুখের দিকে একবার চাহিল। নিরুপায় শঙ্কর পকেট হইতে ব্যাগটা বাহির করিল। দেখিল পাঁচটা টাকা আছে। ঘরে ঢুকিয়া ড্রয়ার হইতে আরও পাঁচটা টাকা বাহির করিয়া আনিল! টাকা লইয়া রহিম সেলাম করিয়া চলিয়া গেল। শঙ্কর বাড়ির ভিতর গেল না। বারান্দার ক্যাম্প চেয়ারটায় বসিয়া পড়িল। মনে হইল সে যেন আর দাঁড়াইতে পারিতেছে না, পা দুইটা যেন ভাঙিয়া পড়িতেছে। কেমন যেন ভয় করিতে লাগিল। অমিয়াকে ডাকিতে চেষ্টা করিল—কিন্তু গলা দিয়া কোন স্বর বাহির হইল না। পাথরের মত কি একটা যেন কণ্ঠ-রোধ করিয়া আছে। আর একদিন ঠিক এমনিই হইয়াছিল—যেদিন রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু-সংবাদ আসে।···একা অন্ধকারে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সহসা তাহার দুই চক্ষু জ্বালা করিয়া কয়েক ফোঁটা অশ্রু গণ্ড বাহিয়া গড়াইয়া পড়িল। ক্রমশঃ

এসো কাছে'—আরো কাছে!

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

কত রাত! রাত হোলো কত!
সবুজ গাছের ছায়া স্বপ্নভারাতুর।
কামনাকম্পিত শিখা জ্বলে কতদূর!
কৌতুকী আকাশে চাঁদ একখানি কবিতার মত।
মায়াবী মঞ্জুষা মাখা কুটিরের এই প্রান্ত হ'তে
প্রচ্ছন্না প্রেয়সী মোর পাঠাইয়া দাও মরুপথে
রাত্রি-সমীরণে তব সঙ্গীতের সুললিত সুর।
এসো কাছে—আরো কাছে,
পিপাসু নয়ন দুটি মাগে অভিসার;
তোমার ফিরাতে মন যৌবনের আবেষ্টনী মাঝে,
এমনি কত না রাত গিয়েছে আমার।
তুমি যে এসেছ আজি সেই কথা আনন্দেতে ভাবি,
তোমারে লভিব বলে স্পর্দ্ধা কভু করিনিক দাবী।
এসো কাছে,—সময় এখনো আছে
হিজলবনের ধারে চাঁদ নামে তরু সিঁথি 'পরে,
দুর্লভ সুযোগ এলো রজনীর স্তব্ধ অবসরে।

দীপের শিখা

শ্রীসুরেশ বিশ্বাস এম্-এ, ব্যারিষ্টার-এট্-ল

মুখপঙ্কজ স্মরিলে ব্যাকুল হই,
নিজেরে ভুলাই শত কর্ম্মের মাঝে।
একা একা যবে নিশীথ শয়নে রই
তব মুখশশী স্মৃতি-সরোবরে রাজে।

অনৃতবার্ত্তা নহে প্রিয়তমা মোর,
মিথ্যা কহিয়া কোথায় জিনিব বলো?
কর্ম্মক্ষেত্রে নিরত দ্বন্দ্ব ঘোর;
তোমারে স্মরিতে আঁখি দুটি ছলো ছলো।

এ দীর্ণবুকে নিয়ত আঘাত বাজে
সংসারে বুঝি বন্ধুও বন্ধু নয়
সত্য মিথ্যা দুয়েরি সমন্বয়—
ভালো ও মন্দ জড়ানো সকল কাজে।

আমার মরুতে নাহি আর মরীচিকা
তুলসী তলায় তুমিই দীপের শিখা।



ইভাদেবীর ভ্যানিটি ব্যাগ

(নাটিকা)

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

চরিত্র

পুরুষ

রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী
স্যার বিনয়কুমার মজুমদার
কুমার চন্দ্রনাথ
মিষ্টার হেরম্ব দত্ত
মিষ্টার সুশীল রায়চৌধুরী
মিষ্টার অরুণ বসু
শ্রীধর—খাস খানসামা

স্ত্রী

রাণী ইভা দেবী
পীতমপুরের মহারাণী প্রতিমা দেবী
রাজকুমারী রেণুকা দেবী
লেডি নীলিমা দেবী
লেডি মোহিনী দেবী
লেডি মেনকা দেবী
শ্রীমতী অরুণা দেবী
মিসেস্ অশোকা রায়
নয়নতারা—দাসী

প্রথম অঙ্ক

রাজা নরেন্দ্রনারায়ণের চা-পানের কক্ষ। ডানদিকে একটি পুস্তকে পরিপূর্ণ বুক-কেশ, আর একটি দেরাজ-ওলা টেবিল। বাঁ-দিকে চারখানি সোফা ও তার মাঝখানে চায়ের টেবিল। বাঁ-পাশে বাগানের দিকে জানলা, ডান্ পাশে একটি টেবিল ও খান-চারেক চেয়ার। ঘরে ঢোক্‌বার দরজা দু'টি—একটি মাঝখানে ও একটি ডান্ পাশে।

রাণী ইভা দেবী ডান্ দিকে টেবিলের সামনে ব'সে একটি নীল রঙের পাত্রে গোলাপ ফুল সাজাচ্ছেন।

শ্রীধরের প্রবেশ

শ্রীধর। রাণীজি কি আজ বাইরের লোকের সঙ্গে দেখা করবেন?

ইভা। হ্যাঁ। কে দেখা করতে এসেছেন?

শ্রীধর। স্যার বিনয়কুমার মজুমদার, রাণীজি!

ইভা। (একটু ইতঃস্তত করলেন) আচ্ছা, নিয়ে এস।

শ্রীধরের প্রস্থান

আজ সন্ধ্যার আগে স্যার বিনয়ের সঙ্গে দেখা করাই ভালো। তিনি এসেছেন ব'লে খুসি হয়েছি!

মাঝের দরজা দিয়ে স্যার বিনয়কুমারের প্রবেশ

স্যার বিনয়। কেমন আছেন রাণীজি?

শেক্‌হ্যাণ্ডের জন্য হাত বাড়ালেন

ইভা। কেমন আছেন, স্যার বিনয়? না, আমি আপনার হাতে হাত দিতে পারব না। এই শিশির-মাখানো গোলাপরা আমার হাত ভিজিয়ে দিয়েছে। গোলাপগুলি কি সুন্দর, না?

স্যার বিনয়। পরম সুন্দর! টেবিলের উপরে ও ভ্যানিটি-ব্যাগটি কার? ওটিও কি চমৎকার দেখতে! ওটি একবার নিতে পারি?

ইভা। স্বচ্ছন্দে! সত্যিই ও-টি চমৎকার! ওর উপরে আমার নামও লেখা আছে। আমার জন্মদিনে ওটি আমার স্বামীর উপহার। আপনি জানেন তো, আজ আমার জন্মদিন?

স্যার বিনয়। সত্যি নাকি?

ইভা। হ্যাঁ, আজ আমি সাবালিকা হ'লুম। আজকের দিনটা আমার জীবনের একটি স্মরণীয় দিন, কি বলেন? সেই জন্যেই তো আজ রাত্রে আমি একটি পার্টি দিচ্ছি। দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন!

ফুলগুলি পরিপাটি ক'রে সাজাতে লাগলেন

স্যার বিনয়। (বসলেন) রাণীজি, আজ আপনার জন্মদিন, আগে যদি এটা জানতুম! তাহ'লে আপনার প্রাসাদের সামনের রাস্তাটা পর্য্যন্ত ভরিয়ে দিতেম আমি ফুলে-ফুলে, আর আপনি চ'লে বেড়াতেন সেই ফুলের উপরে পা ফেলে ফেলে। ও-ফুলের সৃষ্টি হয়েছে আপনার জন্যেই।

দুজনে অল্পক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন

ইভা। স্যার বিনয়, কাল আপনি আমাকে জ্বালাতন করেছিলেন। ভয় হচ্ছে, আজও ফের জ্বালাতন করতে চান।

স্যার বিনয়। আমি, রাণীজি?

শ্রীধর ও একটি তক্‌মা-পরা বেয়ারা মাঝের দরজা দিয়ে ট্রের উপর চা ও খাবার নিয়ে প্রবেশ করলে।

ইভা। ঐখানে রাখো শ্রীধর। (রুমাল দিয়ে হাত মুছে চায়ের টেবিলের সামনে গিয়ে বসলেন) স্যার বিনয়, আপনিও কি এখানে আসবেন না?

শ্রীধর ও বেয়ারা চ'লে গেল

স্যার বিনয়। (চায়ের টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে) রাণীজি, আমার বড়ই দুর্ভাগ্য। আপনাকে কী জ্বালাতন করেছি, আমাকে বলতেই হবে।

বসলেন

ইভা। কাল সারা সন্ধ্যাটা আমার চাটুবাদে পরিপূর্ণ ক'রে তুলেছিলেন!

স্যার বিনয়। (হাসতে হাসতে) বাজার বা মন্দা পড়েছে! বা-কিছু করতে যাই, চাই টাকা! কিন্তু চাটুবাদ করতে গেলে একটি কাণাকড়িরও দরকার হয় না!

ইভা। (ঘাড় নাড়তে নাড়তে) না, সত্যি-সত্যিই বলছি। হাসছেন যে? হাসবেন না। সত্যি, যা বলছি আমি গম্ভীর

ভাবেই বলছি। চাটুবাদ আমার ভালো লাগে না। পুরুষরা কেন যে ভাবে, মিথ্যে বাজে কথা বললেই মেয়েরা আহ্লাদে আটখানা হয়ে নৃত্য করবে, আমি বুঝতেই পারি না!

স্যার বিনয়। না রাণীজি, আমি একটিও মিথ্যে বাজে কথা বলিনি।

ইভা দেবীর হাত থেকে চায়ের পেয়ালা গ্রহণ করলেন

ইভা। (গম্ভীরভাবে) আমি বিশ্বাস করি না। আপনার সঙ্গে মন-কষাকষি হ'লে দুঃখিত হব। আপনি জানেন, আমি আপনাকে অত্যন্ত পছন্দ করি। কিন্তু আপনিও যে আর-দশজন পুরুষের মতন ব্যবহার করবেন, এ আমি পছন্দ করি না। আমি আপনাকে আর-দশজন পুরুষের চেয়ে উচ্চশ্রেণীর মানুষ ব'লেই মনে করি। কিন্তু আমার এও মনে হয়, আপনি যেন সাধ ক'রেই দুনিয়ার সামনে নিজেকে মন্দ মানুষ ব'লে প্রমাণিত করতে চান্।

স্যার বিনয়। ভবের হাটে এক এক মানুষের এক এক রকম স্বভাব।

ইভা। কিন্তু ঐ লোক-দেখানো স্বভাবটাকেই আপনি নিজের বিশেষ স্বভাব ব'লে মনে করছেন কেন?

স্যার বিনয়। কারণ পৃথিবীর ধারা বড় অদ্ভুত। তুমি যদি নিজেকে সাধু ব'লে প্রচার কর, পৃথিবী তোমাকে নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবে। কিন্তু তুমি যদি নিজেকে অসাধু ব'লে প্রমাণ করতে চাও, পৃথিবী তোমাকে কিছুতেই বিশ্বাস করবে না।

ইভা। স্যার বিনয়, পৃথিবী আপনাকে সাধু ভাবে, এটা কি আপনি চান্ না?

স্যার বিনয়। না। পৃথিবী মাথায় তুলে নাচে কাদের নিয়ে? যত বাজে লোক—যাদের খেতাব আছে, যাদের চাপরাশ আছে, যাদের টিকি আছে। সত্যি বলছি, আর কেউ অবিশ্বাস করলে আমার কিছুই আসে যায় না, কিন্তু দয়া ক'রে আপনি আমাকে অবিশ্বাস করবেন না রাণীজি!

ইভা। আমাকে এমন বিশেষভাবে কেন আপনি দেখতে চান?

স্যার বিনয়। (একটু ইতস্তত ক'রে) কারণ আমার মনে হচ্ছে, আমরা দুজনেই দুজনের অন্তরঙ্গ বন্ধু হ'তে পারি। আসুন, আমরা এই ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বকে স্বীকার ক'রে নি। হয়তো একদিন আপনার এমন বন্ধুরই দরকার হবে।

ইভা। আপনি ও কথা বলছেন কেন?

স্যার বিনয়। আমাদের সকলেরই একদিন বন্ধুর দরকার হয়।

ইভা। স্যার বিনয়, এখন কি আমরা ঘনিষ্ঠ বন্ধু নই? আমরা চিরদিনই এম্নি বন্ধুই থাকতে পারি যদি আপনি—

স্যার বিনয়। যদি আমি—?

ইভা। যদি আপনি আমার চাটুবাদ না করেন। আপনি বোধহয় আমাকে রুচিবাগীশ ভাবেন? অস্বীকার করি না। আমি ঐ ভাবেই মানুষ হয়েছি। এজন্যে আমি দুঃখিত নই। শিশু-বয়সেই আমার মা মারা যান্। পিসিমার কাছে আমি মানুষ। পিসিমা ছিলেন অত্যন্ত কঠোর, কিন্তু আজ পৃথিবী যা ভুলে যাচ্ছে, তিনি আমাকে শিখিয়েছিলেন সেই সত্য-কথাটাই—অর্থাৎ কাকে বলে ন্যায়, আর কাকে বলে অন্যায়। তিনি ছিলেন সোজা মানুষ—হেলতেন না একবার এদিকে, একবার ওদিকে। আমিও তাই।

স্যার বিনয়। রাণীজি!

ইভা। (সোফার পিছনে হেলে প'ড়ে) আপনি ভাবছেন আমি বড়ই সেকেলে? হুঁ, আমি তাই। একাল আমার চোখের বালি।

স্যার বিনয়। একালকে আপনার এতই মন্দ লাগে?

ইভা। হ্যাঁ, আজ্‌কের দিনে মানুষ জীবনটাকে মনে করে একটা লটারীর খেলা। না, জীবন তা নয়। জীবন হচ্ছে পবিত্র। এর আদর্শ হচ্ছে প্রেম! আত্মবলিদানেই এর সমাপ্তি।

স্যার বিনয়। (হাসতে হাসতে) বলিদান? বলির পশু হওয়ার চেয়ে আর-যা-কিছু হওয়া ভালো!

ইভা। (সামনের দিকে ঝুঁকে প'ড়ে) ও-কথা বলবেন না!

স্যার বিনয়। ঐ-কথাই বলব! নাড়ীতে নাড়ীতে ঐ-কথাই আমি অনুভব করি!

মাঝের দরজা দিয়ে শ্রীধরের প্রবেশ

শ্রীধর। রাণীজি, উঠোনে কি কার্পেট পাত্‌তে হবে?

ইভা। স্যার বিনয়, আজ আর বোধ হয় বৃষ্টি হবে না, কি বলেন?

স্যার বিনয়। আপনার জন্মদিনে বৃষ্টি! এও কি সম্ভব?

ইভা। হ্যাঁ শ্রীধর, উঠোনেই কার্পেট পাতো গে।

শ্রীধরের প্রস্থান

স্যার বিনয়। শুনুন রাণীজি, অবশ্য সত্যি কথা নয়, একটা কাল্পনিক গল্পই বলছি। ধরুন, সদ্য-বিবাহিত দুই স্ত্রী-পুরুষ। বিবাহের পরেই স্বামী যদি হঠাৎ এমন-কোন নারীকে নিয়ে মেতে ওঠে—সমাজ যাকে সন্দেহ করে, স্ত্রী তাহ'লে কি করবে? সেও কি সান্ত্বনালাভের জন্যে আর কারুর কাছে যাবে না?

ইভা। (ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে) সান্ত্বনালাভের জন্যে?

স্যার বিনয়। হ্যাঁ। সান্ত্বনালাভের জন্যে স্ত্রী যদি আর কারুর কাছে যায়, আমি সেটাকে অন্যায় ব'লে মনে করি না।

ইভা। স্বামী অবিশ্বাসী ব'লে স্ত্রীও হবে অবিশ্বাসিনী?

স্যার বিনয়। অবিশ্বাস হচ্ছে একটা বিষম কথা রাণীজি!

ইভা। স্যার বিনয়, আপনি যে বিষম কথাই বলছেন!

স্যার বিনয়। আমার মনে হয়, সাধুরাই করছেন এই পৃথিবীর বিষম ক্ষতি। অসাধুতাকেই তাঁরা ক'রে তুলেছেন অসাধারণ। মানুষদের সাধু আর অসাধু ব'লে দুই দলে বিভক্ত করার কোন মানে হয় না। মানুষ হচ্ছে—হয় চমৎকার, নয় বিরক্তিকর! আমি আছি চমৎকারদেরই দলে! আর রাণীজি, এটাও না ব'লে থাকতে পারছি না, আপনিও আছেন সেই দলেই!

ইভা। স্যার বিনয়, (উঠলেন) আপনি ব'সেই থাকুন্। (ডানদিকে ফুলের টেবিলের কাছে যেতে যেতে) ঐ ফুলগুলোকে আর-একটু ভালো ক'রে সাজিয়ে আসি।

স্যার বিনয়। (উঠে দাঁড়ালেন এবং চেয়ারখানা টেনে সরিয়ে নিলেন) রাণীজি, আপনি দেখছি আধুনিক জীবনের উপরে বড়ই বিরূপ! অবশ্য, আধুনিক জীবনের বিরুদ্ধে অনেক কথাই বলবার

আছে। স্বীকার করি। যেমন ধরুন, একালের বেশীর-ভাগ মেয়েই হচ্ছে ব্যবসাদার!

ইভা। ও রকম মেয়েদের নিয়ে আলোচনা করবার দরকার নেই।

স্যার বিনয়। আচ্ছা রাণীজি, ও-দলের মেয়ের কথা ছেড়েই দিন। কিন্তু আপনি কি মনে করেন, পৃথিবীর বিচারে যে-সব মেয়ের একবার পদস্খলন হয়েছে তারা একেবারেই ক্ষমার অযোগ্যা?

ইভা। আমার মতে, কখনোই তাদের ক্ষমা করা উচিত নয়।

স্যার বিনয়। পুরুষরাও কি মেয়েদের মতন একই আইনের দ্বারা চালিত হবে?

ইভা। —নিশ্চয়ই!

স্যার বিনয়। আমার মনে হয়, জীবনের মতন জটিল জিনিষকে এমন বাঁধা-ধরা মাপকাঠিতে মাপা চলে না।

ইভা। মানুষরা যদি এই বাঁধা-ধরা মাপকাঠি মানতো, জীবন তাহ'লে হয়ে উঠত কি সহজ, কি সরল!

স্যার বিনয়। রাণীজি, ঐ বাঁধা-ধরা মাপকাঠির বাইরে জীবনের যে বিচিত্র শোভাযাত্রা চলেছে, আপনি কি তাকে স্বীকার করতে নারাজ?

ইভা। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

স্যার বিনয়। রাণীজি আপনি সেকেলে, কিন্তু কি মিষ্টি!

ইভা। দয়া ক'রে ঐ 'মিষ্ট' শব্দটি ত্যাগ করুন।

স্যার বিনয়। ত্যাগ করতে পারছি না। আমি সমস্তই ত্যাগ করতে পারি—ত্যাগ করতে পারি না কেবল প্রলোভনকে।

ইভা। একেলে ভণ্ডামির কথা!

স্যার বিনয়। (স্থিরদৃষ্টিতে ইভার দিকে তাকিয়ে) হ্যাঁ, রাণীজি, এটা একেলে ভণ্ডামিরই কথা বটে।

মাঝের দরজা দিয়ে শ্রীধরের প্রবেশ

শ্রীধর। পীতমপুরের মহারাণীজি আর রাজকুমারী রেণুকা দেবী এসেছেন।

শ্রীধরের প্রস্থান

মহারাণীজি ও রেণুকার প্রবেশ

স্যার বিনয় ও রাণীজি উঠে দাঁড়ালেন। নমস্কারের আদান-প্রদান হ'ল

মহারাণীজি। ভাই ইভা, তোমাকে দেখে বড় খুসি হ'লুম। স্যার বিনয়, কেমন আছেন? আমার মেয়ের সঙ্গে কিন্তু আপনার পরিচয় করিয়ে দেব না, আপনি যা দুষ্টু!

স্যার বিনয়। ও-কথা বলবেন না মহারাণীজি! দুষ্ট মানুষ হিসেবে আমি একেবারেই ব্যর্থ! শুন্‌ছি নাকি এমন লোকও অনেক আছে যারা বলে, জীবনে আমি কোনদিন কোনো কুকাজই করিনি! অবশ্য এই নিন্দেটা তারা আড়ালেই করে।

মহারাণী। বলেন কি, আড়ালে এমন নিন্দে করে! রেণুকা, ইনিই স্যার বিনয়! ওঁর একটা কথাও তুমি বিশ্বাস কোরো না। (স্যার বিনয় মহারাণীকে চা দিতে উদ্যত হ'লেন) না, না। চা নয়, ধন্যবাদ! (সোফায় গিয়ে বসলেন) শ্রীপুরের মহারাণীর বাড়ী থেকে এইমাত্র চা খেয়ে আসছি। আর, সে কী চা! সহ্য করা অসম্ভব। আমি অবশ্য অবাক্ হইনি। চা এসেছে তাঁর জামাইবাড়ী থেকে কিনা! ভাই ইভা, আজ তোমার এখানে নাচের আসর বসবে শুনে আমার রেণুকার কি আনন্দ!

ইভা। না মহারাণীজি, সামান্য ব্যাপার, এমন কিছু বেশী ঘটা হবে না।

মহারাণী। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঘটা হবে বৈকি। তোমার বাড়ীর ধারা কি আমি জানি না? আর তোমার বাড়ী ব'লেই তো রেণুকাকে আনতে পারলুম! সহরের আর কোনো বাড়ীতেই রেণুকাকে নিয়ে যাওয়া নিরাপদ নয়! আমার স্বামী বেচারিকেও আর কোথাও ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে পারি না। কালে-কালে সমাজের একি ছিরি হ'ল! সব জায়গাতেই যত সব ভয়ানক লোকের আবির্ভাব। প্রতিবাদ করা উচিত।

ইভা। আমি প্রতিবাদ করি মহারাণীজি! আমার বাড়ীতে এমন কারুর ঠাঁই হবে না, যার নামে আছে কলঙ্ক!

স্যার বিনয়। ও-কথা বলবেন না রাণীজি! তাহ'লে তো এ-বাড়ীতে আমার প্রবেশ নিষেধ!

মহারাণী। না, স্যার বিনয়, পুরুষের কথা স্বতন্ত্র। আমার আপত্তি মেয়েদের নিয়ে। কারণ আমরা সবাই ভালো—অন্তত অনেকেই। কিন্তু আজকালকার দিনে ভালো মেয়েরাই হয়েছে কোণ-ঠাসা। আমরা যদি মাঝে মাঝে খিট্ খিট্ না করতুম, তাহ'লে স্বামীরা তো ভুলেই যেতো আমাদের অস্তিত্ব!

স্যার বিনয়। এ এক অদ্ভূত ব্যাপার মহারাণীজি! বিয়েটা হচ্ছে বাঁদর-নাচের মতন। খেলা দেখিয়ে স্ত্রীরা সম্মান পায় যথেষ্ট, কিন্তু প্রায়ই হারিয়ে বসে আসল খেলোয়াড় বাঁদরটিকে!

মহারাণী। আসল খেলোয়াড়! তার মানে, স্বামী?

স্যার বিনয়। আধুনিক স্বামীর পক্ষে ও-নামটি মন্দ নয়!

মহারাণী। আপনি একেবারে গোল্লায় গেছেন।

ইভা। স্যার বিনয় ক্রমেই হীন হয়ে পড়ছেন।

স্যার বিনয়। ও-কথা বলবেন না রাণীজি!

ইভা। জীবনকে আপনি এমন তুচ্ছ ব'লে মনে করেন কেন?

স্যার বিনয়। কারণ জীবনটা হচ্ছে একটি অতিরিক্ত দরকারি ব্যাপার, তাকে নিয়ে কখনো গম্ভীরভাবে আলোচনা করাই চলে না!

মহারাণী। উনি কি বলতে চান? স্যার বিনয়, আপনার কথার মানে আমার মোটা মাথায় ঢুক্‌ছে না, বুঝিয়ে দিন।

স্যার বিনয়। (উঠে দাঁড়িয়ে) বুঝিয়ে দরকার নেই মহারাণীজি! আজকালকার দিনে বেশী বোঝাতে গেলে নিজেকেই ধরা পড়তে হয়। আসি, নমস্কার! (ইভার কাছে গিয়ে) এখন বিদায় হচ্ছি। কিন্তু আজ রাত্রে আমাকে বাড়ীতে ঢুকতে দেবেন তো?

ইভা। (উঠে দাঁড়িয়ে) হ্যাঁ, নিশ্চয়ই! কিন্তু আপনি কারুর কাছে লোক-দেখানো মিথ্যা প্রলাপ বকতে পারবেন না।

স্যার বিনয়। ও, আপনি দেখছি আমার চরিত্র শোধ্‌রাবার চেষ্টা করছেন! রাণীজি, কারুর চরিত্র সংশোধনের চেষ্টা হচ্ছে বিপদজনক।

মাঝের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন

মহারাণী। (উঠে দাঁড়িয়ে, একটু এগিয়ে) কি চমৎকার দুষ্টু মানুষ! ওঁকে আমি ভারি পছন্দ করি। কিন্তু উনি বিদায়

হয়েছেন ব'লে ভারি খুসি হয়েছি! ভাই ইভা, তোমাকে কি মিষ্টিই দেখাচ্ছে! ও-কাপড়খানা তুমি কোন্ দোকান থেকে কিনেছ? কিন্তু তোমার জন্যে আমার বড়ই দুঃখ হচ্ছে। (সোফার উপরে গিয়ে ইভার পাশে ব'সে) রেণুকা, মা!

রেণুকা। (উঠে দাঁড়িয়ে) কি বলছ মা?

মহারাণী। ঘরের ঐখানে টেবিলের উপরে একখানা ফোটোগ্রাফের 'এ্যালবাম্' রয়েছে না? তুমি ব'সে ব'সে ছবি দেখোগে যাও।

রেণুকা। আচ্ছা মা।

টেবিলের কাছে গিয়ে বসল

মহারাণী। সোনার মেয়ে! দার্জিলিঙের ফোটোগ্রাফ দেখতে ভারি ভালোবাসে। এমন সুরুচি ক'টা মেয়ের হয়! কিন্তু ভাই ইভা, তোমার জন্যে আমি বড়ই দুঃখিত।

ইভা। (হাসিমুখে) কেন মহারাণীজি!

মহারাণী। সেই সাংঘাতিক মেয়েটার কথাই বলছি। সে এমন গুছিয়ে কাপড় পরে, সাজগোজ করে যে, তাকে দেখলেই পুরুষদের মাথা ঘুরে যায়! তুমি আমার সেই দুষ্টু ভাই কুমার চন্দ্রনাথকে জানো তো? সে ঐ মেয়েটার জন্যে একেবারে পাগল হয়ে গেছে! বড়ই কেলেঙ্কারির কথা, কারণ সমাজে কিছুতেই এ-মেয়েটার ঠাঁই হ'তে পারে না। অনেক নারীর জীবনেই হয়তো একটি অতীত ইতিহাস আছে, কিন্তু আমি শুনেছি এর অতীত-ইতিহাস গুণতিতে হবে ডজন-খানেক!

ইভা। কার কথা বলছেন, মহারাণীজি?

মহারাণী। মিসেস্ অশোকা রায়।

ইভা। মিসেস্ অশোকা রায়? তাঁর নাম তো কখনো শুনিনি! তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি?

মহারাণী। বেচারি! রেণুকা মা!

রেণুকা। কি বলছ মা?

মহারাণী। তুমি কি একবার বাগানে বেরিয়ে সূর্য্যাস্তের শোভা দেখবে?

রেণুকা। আচ্ছা, মা!

পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল

মহারাণী। মিষ্টি মেয়ে! সূর্য্যাস্ত দেখতে পেলে আর কিছুই চায় না! এটা কি সুরুচির লক্ষণ নয়? প্রকৃতির চেয়ে ভালো আর কি আছে?

ইভা। মহারাণীজি, কি ব্যাপার? আমার কাছে এই অচেনা নারীর কথা তুললেন কেন?

মহারাণী। তুমি কি সত্যিই কিছু জানো না? কিন্তু আমরা যে এই ব্যাপারটা নিয়ে অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়েছি! এই কালকেই লেডি অণিমার বাড়ীতে আমাদের একটা পার্টি ছিল। রাজা নরেন্দ্রনারায়ণের মতন লোক সেখানে এমন ব্যবহার করলেন —যা ধারণায়ও আনা যায় না।

ইভা। ও-স্ত্রীলোকটার সঙ্গে আপনি আমার স্বামীর কথা তুলছেন কেন?

মহারাণী। হায়রে, তুলছি কেন? সেইটেই তো হচ্ছে কথা। রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ রোজ ঐ স্ত্রীলোকটার সঙ্গে দেখা করতে যান! আর তিনি যখন ওর বাড়ীতে থাকেন, তখন ওখানে আর কারুর প্রবেশ নিষেধ! রাজা নরেন্দ্রনারায়ণকে আমরা আদর্শ স্বামী ব'লেই জানি। কিন্তু ঐ স্ত্রীলোকটার সঙ্গে যে তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা হয়েছে, তাতে আর কোন সন্দেহই নেই। এই মিসেস্ রায় ছ'মাস আগে যখন কলকাতায় আসে, তখন সে ছিল একেবারেই সহায়-সম্পদহীন। কিন্তু রাজা নরেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর থেকেই সে দু-হাতে টাকা খরচ করতে সুরু করেছে। এখন বালীগঞ্জে তার মস্ত বাড়ী! নিজের মোটরে রোজ বৈকালে হাওয়া খেতে যায়!

ইভা। না, একথা আমি বিশ্বাস করতে পারি না।

মহারাণী। কিন্তু এটা সত্যি কথা, ভাই ইভা! সারা কলকাতা একথা জানে। তাইতো আমি তোমাকে একটা সৎ-পরামর্শ দিতে এলুম। বায়ু পরিবর্ত্তনের ওজরে রাজা নরেন্দ্রনারায়ণকে নিয়ে তুমি বাইরে কোথাও চ'লে যাও। আমার যখন প্রথম বিবাহ হয়েছিল, তখন ঐ-রকম ওজরের জোরেই আমার বিদ্রোহী স্বামীকে বাগে আন্‌তে পেরেছিলুম। যদিও আমি বলতে বাধ্য যে, আমার স্বামী কোন স্ত্রীলোকের জন্যে কখনো বেশী টাকা খরচ করেন নি। এদিকে তিনি ভারি হুঁসিয়ার! তিনি—

ইভা। (বাধা দিয়ে) মহারাণীজি, মহারাণীজি, এ অসম্ভব! (উঠে দু-পা এগিয়ে গেলেন) আমার বিয়ে হয়েছে মোটে দু'বছর! আমাদের খোকার বয়স মোটে ছ-মাস।

অন্য একখানা চেয়ারের উপরে গিয়ে ব'সে পড়লেন

মহারাণী। কি সুন্দর তোমার খোকাটি! সে ভালো আছে তো? কিন্তু সে খোকা না হয়ে যদি খুকী হ'ত, আমি হতুম বেশী খুসি! ছেলেরা বড়ই নষ্ট। আমার ছেলে এখনো কলেজ ছাড়েনি, কিন্তু এই বয়েসেই একটি গুণধর হয়ে উঠেছেন!

ইভা। পুরুষ মাত্রই কি মন্দ?

মহারাণী। হ্যাঁ ভাই ইভা, প্রত্যেক পুরুষই মন্দ। বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেও তারা ভালো হয় না। পুরুষরা বড় জোর বুড়ো হ'তে পারে, কিন্তু কখনই ভালো হ'তে পারে না।

ইভা। জানেন তো মহারাণীজি, রাজা আমাকে ভালোবেসেই বিয়ে করেছিলেন?

মহারাণী। হ্যাঁ, আমাদের সকলেরই বিবাহিত জীবনের প্রথম দৃশ্যটা হয় ঐ-রকমই। আমাদের মহারাজা-বাহাদুরটি বলেছিলেন, আমাকে না পেলে তিনি আত্মহত্যা করবেন! তাই ভয়ে তাঁকে বিয়ে ক'রে ফেললুম! কিন্তু আমার সঙ্গে বিবাহের পর বছর না ঘুরতেই দেখি, দুনিয়ায় যত-রকম রঙের আর যত-রকম পাড়ের আর যত-রকম ফ্যাসানের শাড়ীপরা মেয়ে আছে, তিনি ছুটোছুটি করছেন তাদের সকলের পিছনেই! দুঃখের কথা বলব কি ভাই ইভা, ফুলশয্যার পরের দিনেই দেখি, তিনি আমার সোমত্ত দাসীর দিকে রসের চোখে চেয়ে ইসারা করছেন! দাসীকে সেইদিনই আমার বোনের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিলুম, কারণ আমার ভগ্নীপতিটি অন্ধ! (উঠে দাঁড়িয়ে) ভাই ইভা, আজ আবার আর এক জায়গায় যেতে হবে, আমি চললুম। বেশী ভেবে মন-খারাপ কোরো না। রাজাকে নিয়ে কলকাতার বাইরে যাও, তিনি আবার তোমার পাশেই ফিরে আসবেন।

ইভা। কি বললেন? আবার আমার—কাছে—ফিরে আসবেন?

মহারাণী। হ্যাঁ ভাই ইভা, এই স্ত্রীলোকগুলো আমাদের স্বামীদের কেড়ে নিয়ে যায় বটে, কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারে না। স্বামীরা ঠিক আবার আমাদের কাছেই ফিরে আসেন—অবশ্য, অল্প-স্বল্প জখম হ'য়ে। কিন্তু তুমি যেন এ নিয়ে গোলমাল কোরো না, পুরুষরা তাতে আরো ক্ষেপে যায়!

ইভা। মহারাণীজি, আমার স্বামীকে এখনো অবিশ্বাস করতে পারছি না।

মহারাণী। ভাই ইভা, তুমি কি লক্ষ্মী মেয়ে! আমিও একদিন তোমারই মত ছিলুম! কিন্তু এখন আমার মতে, পুরুষ-মাত্রই হচ্ছে রাক্ষস। ওদের তুষ্ট করবার একমাত্র উপায় হচ্ছে, ভালো ক'রে রেঁধে-বেড়ে ওদের পেট-ভরাবার ব্যবস্থা করা। তা তোমার বাড়ী রান্নার ব্যবস্থা তো ভালো ব'লেই জানি! ভাই ইভা, তুমি কেঁদে ফেলবে না তো?

ইভা। ভয় নেই মহারাণীজি, আমি কখনো কাঁদি না।

মহারাণী। তাই উচিত। কেঁদে জেতে কুৎসিৎ মেয়েরা। ভাই ইভা, আর একটি কথা। তোমার আজকের পার্টিতে মিঃ অরুণ বসুকে আস্তে অনুরোধ কোরো। অরুণের বাবা এবারের যুদ্ধে কোটিপতি হয়েছেন। অরুণ আর রেণুকা পরস্পরকে অত্যন্ত পছন্দ করে। অরুণ আকৃষ্ট হয়েছে রেণুকার সুরুচি দেখেই। কিন্তু আমার পরামর্শ ভুলো না। রাজাকে নিয়ে কলকাতার বাইরে চ'লে যাও।

মহারাণী মাঝের দরজা দিয়ে প্রস্থান করলেন

ইভা। কী ভয়ানক কথা! না, না, একথা সত্যি নয়। মহারাণী ব'লে গেলেন, ঐ-স্ত্রীলোকটার জন্যে আমার স্বামী নাকি কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকা খরচ করছেন! রাজার চেক্-বই তো ঐ ডান্-দিকের দেরাজেই থাকে! চেক্-বইখানা একবার পরীক্ষা ক'রে দেখব নাকি! (উঠে দাঁড়ালেন) না, না, সবই ভুল কথা! মিথ্যা কুৎসা! রাজা আমাকে ভালোবাসেন—নিশ্চয়ই আমাকে ভালোবাসেন! কিন্তু একবার দেরাজটা খুলে দেখতে দোষ কি? এ-দেখবার অধিকারও আমার আছে। (এগিয়ে গিয়ে দেরাজ খুলে একখানা চেকবই বার করলেন। ব্যস্তভাবে তার পাতাগুলো উল্টে গিয়ে, একটা আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলে) আমি জানি, ও-কথা সত্যি নয়। এর কোন পাতাতেই মিসেস্ অশোকা রায়ের নাম নেই! (চেক-বইখানা দেরাজের ভিতরে রেখে সচমকে আর একখানা চেক্-বই বার ক'রে নিলেন। আবার একখানা চেক্-বই! কাগজের মোড়কে বন্ধ, ওপরে লেখা 'প্রাইভেট্'! মোড়ক ছিঁড়ে ফেলে চেক-বইয়ের মলাট খুলে প্রথম পৃষ্ঠাতেই দৃষ্টিপাত ক'রে, চমকিত স্বরে) মিসেস্ অশোকা রায়—তিন হাজার টাকা! (আর একখানা পাতা উল্টে) মিসেস্ অশোকা রায়—দশ হাজার টাকা! (আর একখানা পাতা উল্টে) মিসেস্ অশোকা রায়—ছ-হাজার টাকা! (চেক্-বইখানা মাটির উপরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে) হা ভগবান! তাহ'লে মহারাণীর কথা মিথ্যে নয়!

মাঝের দরজা দিয়ে রাজা নরেন্দ্রনারায়ণের প্রবেশ

রাজা। ইভা, দোকান থেকে তোমার ভ্যানিটি-ব্যাগটা দিয়ে গিয়েছে তো? (হঠাৎ মাটির উপরে চেক্-বইখানা দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি সেখানা কুড়িয়ে নিলেন) ইভা, তুমি আমার চেক্-বুকের মোড়ক ছিঁড়েছ! একাজ করবার অধিকার তো তোমার নেই!

ইভা। এখন ধরা প'ড়ে গিয়ে আমার কাজটা তুমি অন্যায় ব'লে ভাবছ?

রাজা। স্বামীর গোপনীয় জিনিষে হাত দেওয়া স্ত্রীর পক্ষে অন্যায়।

ইভা। আমি গোয়েন্দা নই। এই স্ত্রীলোকটার অস্তিত্ব আমি আধঘণ্টা আগেও জানতুম না। সারা কলকাতা যা জানে, এইমাত্র তার খবর দিয়ে গেলেন আমার এক বন্ধু। আমি শুনেছি, রোজ তুমি তার সঙ্গে দেখা করতে যাও, আর তার পায়ে ঢেলে আসো রাশি-রাশি টাকা!

রাজা। ইভা, মিসেস্ অশোকা রায় সম্বন্ধে তুমি ও-রকম সব কথা উচ্চারণ কোরো না।

ইভা। মিসেস্ অশোকা রায়ের মান বাঁচাবার জন্যে তোমার যথেষ্ট আগ্রহ দেখছি। কিন্তু আমার বোধ হয় নেই?

রাজা। তোমার মান অক্ষুন্নই আছে ইভা! তুমি মুহূর্ত্তের জন্যেও ভেবো না যে—

বলতে বলতে থেমে গিয়ে চেক-বইখানা আবার দেরাজের ভিতরে রেখে দিলেন

ইভা। প্রচুর টাকা তুমি অদ্ভুত উপায়ে খরচ করছ; এ ছাড়া আমি আর কিছুই ভাবছি না। মনে কোরো না, টাকার জন্যে আমার ভারি মাথাব্যথা। আমাদের যা-কিছু আছে, তুমি অনায়াসেই দু-হাতে উড়িয়ে দিতে পারো। কিন্তু একটা কথা মনে হচ্ছে। তুমি আমাকে ভালোবেসেছ, তুমি আমাকে ভালোবাসতে শিখিয়েছ। সেই তুমি আজ কি হয়েছ! যে-প্রেম আমি তোমাকে অনায়াসে বিলিয়ে দিয়েছি, সেই প্রেম ত্যাগ ক'রে তুমি কিনা বাজারে গিয়েছ নকল প্রেম ক্রয় করতে! ওঃ, এ-কথা ধারণারও আনা যায় না! (সোফার উপরে ব'সে পড়লেন) এর পরেও কোথায় রইল আমার মান? তুমি কিছু অনুভব করছ না, কিন্তু আমি অনুভব করছি—আমার আত্মা পর্য্যন্ত নোংরা হয়ে গিয়েছে! আজ ছ-মাস ধ'রে তুমি আমার যতবার চুম্বন করেছ, ততবারই আমার ওষ্ঠের ওপর মাখিয়ে দিয়েছ নূতন কলঙ্কের ছাপ!

রাজা। (কাছে এগিয়ে এসে) ও-কথা বোলো না ইভা! পৃথিবীতে তোমাকে ছাড়া আর কারুকেই আমি ভালোবাসি না।

ইভা। (উঠে দাঁড়িয়ে) তবে বল, কে এই স্ত্রীলোক? কেন তুমি তার জন্যে বাড়ী নিয়েছ?

রাজা। আমি তার জন্যে বাড়ী নিইনি।

ইভা। তুমি তাকে টাকা দিয়েছ, আর সেই টাকায় সে নিয়েছে বাড়ী! টাকা দেওয়া আর বাড়ী নেওয়া একই কথা।

রাজা। ইভা, মিসেস্ অশোকা রায়কে আমি যতটা জানি—

ইভা। মিসেস্! এই মিসেস্টির পাশে সত্যি-সত্যিই কোন মিষ্টার বিরাজমান আছেন নাকি? না, তিনি বাস করেন রূপ-কথার জগতে?

রাজা। তাঁর স্বামীর মৃত্যু হয়েছে অনেক দিন আগে। মিসেস্ রায় এখন পৃথিবীতে একেবারে একলা।

ইভা। আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই ?

রাজা। কেউ নেই।

ইভা। কথাটা আশ্চর্য্য ব'লে মনে হচ্ছে না ?

রাজা। ইভা, দয়া ক'রে আমার কথা শোনো। আমি যতদিন মিসেস্ রায়ের কাছে গিয়েছি, কোনদিন তাঁর কোন অন্যায় ব্যবহারই লক্ষ্য করিনি। তবে, অনেক দিন আগে—

ইভা। থামো। আমি মিসেস্ রায়ের জীবন-চরিত শুনতে চাই না।

রাজা। মিসেস্ রায়ের জীবন-চরিত বর্ণনা করবার আগ্রহ আমারও নেই। আমি তোমাকে খালি জানাতে চাই যে, সমাজে একদিন মিসেস্ রায়ের সব ছিল—অর্থ, যশ, মান। বড় ঘরে তাঁর জন্ম। তাঁর সব ছিল—কিন্তু তাঁর সব গিয়েছে। এই জন্যেই তাঁর জীবন হয়ে উঠেছে আরো বেশী তিক্ত—আরো বেশী বিস্বাদ! মানুষ দুর্ভাগ্য সহ্য করতে পারে, কারণ দুর্ভাগ্য আসে বাইরে থেকে, আর তা হচ্ছে দৈব-দুর্ঘটনা! কিন্তু নিজেরই ভ্রমের জন্যে, নিজেরই দোষের জন্যে দুর্ভাগ্য ভোগ করা, সে হচ্ছে জীবনের দুঃসহ আঘাত! কুড়ি বছর আগেকার দোষের জন্যে মিসেস্ রায় আজও করছেন শাস্তিভোগ! কুড়ি বছর আগে মিসেস্ রায় ছিলেন প্রায় বালিকা। তিনি বিবাহিত জীবনযাপন করবার অবসর পেয়েছিলেন তোমারও চেয়ে কম।

ইভা। আমি তার কথা শুনতে ইচ্ছুক নই। তুমি একসঙ্গে তার আর আমার নাম উচ্চারণ কোরো না।

একখানা চেয়ারে গিয়ে বসলেন

রাজা। ইভা, মিসেস্ রায়কে তুমি রক্ষা করতে পারো। তাঁর ইচ্ছা, আবার তিনি সমাজে ফিরে আসেন, আর তিনি চান তোমার সাহায্য।

ইভা। (সবিস্ময়ে) আমার!

রাজা। হ্যাঁ, তোমার।

ইভা। তার কি স্পর্দ্ধা!

রাজা। ইভা, তোমার কাছে আমার একটি বিশেষ অনুরোধ আছে। মিসেস্ রায়কে আমি যে প্রচুর অর্থ দিয়েছি, এ-সত্য তোমাকে জানাবার ইচ্ছা আমার ছিল না। যদিও তুমি সেটা আবিষ্কার ক'রে ফেলেছ, তবু তোমার কাছেই অনুরোধ করতে চাই। আজ তোমাকে আমাদের পার্টিতে আসবার জন্য মিসেস্ রায়কে নিমন্ত্রণ করতে হবে।

ইভা। তুমি পাগল!

উঠে দাঁড়ালেন

রাজা। তোমাকে মিনতি করি। নানা লোকে তাঁর প্রসঙ্গে নানা কথা বলতে পারে বটে, কিন্তু মিসেস্ রায় সম্বন্ধে কেউ বিশেষ কিছুই জানে না। সমাজে এর মধ্যেই মিসেস্ রায় অল্প-স্বল্প আনাগোনা করতে সুরু করেছেন, কিন্তু তাতে তিনি খুসি নন্। তিনি চান তোমার নিমন্ত্রণ!

ইভা। হুঁ, আমার মান চূর্ণ ক'রে নিজের মান পূর্ণমাত্রায় বাড়াবার জন্যে, কি বল ?

রাজা। না, তিনি জানেন তুমি হ'চ্ছ সুচরিতা, আর তুমি যদি তাঁকে নিমন্ত্রণ কর তবে তাঁর সাম্‌নে খুলে যাবে সমাজের সমস্ত দরজা। তারপরে তোমার সঙ্গে মেশবার জন্যে তিনি আর কোন চেষ্টাই করবেন না। এক অভাগা নারীকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য তুমি কি এ সাহায্যটুকুও করবে না ?

ইভা। না! যদি কোন নারী সত্যই অনুতপ্ত হয়, তবে যে-সমাজ তার পতন দেখেছে সেখানে কখনোই আর ফিরে আসতে চায় না।

রাজা। কথা রাখো, আমার বিশেষ অনুরোধ!

ইভা। (ডানদিকের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে) আমি পোষাক বদলাতে চললুম—ও-কথা আমার কাছে আর তুলো না। (আবার কাছে এগিয়ে এসে) রাজা, আমার মা নেই বাবা নেই, তুমি বুঝি তাই ভাবছ পৃথিবীতে আমি একলা, আমি একেবারে অসহায়া? আমাকে নিয়ে তুমি যা খুসি করবে? ভুল রাজা, ভুল! আমারও বন্ধু আছে।

রাজা। ইভা, অমন নির্ব্বোধের মতন কথা কোয়ো না। তোমার সঙ্গে আমি তর্ক করব না। আমার একমাত্র ইচ্ছা, মিসেস্ রায়কে আজ রাত্রে তুমি নিমন্ত্রণ কর।

ইভা। না, আমি করব না।

দূরে স'রে গেলেন

রাজা। আমার কথাও রাখবে না ?

ইভা। না!

রাজা। (কাছে এগিয়ে) ইভা, কেবল আমার মুখ চেয়ে তুমি এই কাজটি কর। এই হচ্ছে মিসেস্ রায়ের শেষ সুযোগ!

ইভা। তাতে আমার কি ?

রাজা। ভালো মেয়েরা কি নির্দ্দয়!

ইভা। মন্দ পুরুষরা কি দুর্ব্বল!

রাজা। ইভা, বিবাহের পরে কোন স্বামীই হয়তো স্ত্রীর কাছে দেবতার সম্মান পায় না। কিন্তু আমাকে যে তুমি অবিশ্বাসী ব'লে ভাবলে, এটা মনে করতেও আমার বুক শিউরে উঠছে!

ইভা। তুমিও তো আর সব পুরুষেরই মত! শুনলুম, কলকাতা সহরে এমন কোন স্বামী নেই, স্ত্রী যাকে বিশ্বাস করতে পারে।

রাজা। আমি ও-দলের লোক নই।

ইভা। ও-সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে।

রাজা। না, ও-সম্বন্ধে তোমার সন্দেহ থাকতে পারে না। ইভা, আমাদের মধ্যে আর বিচ্ছেদের পর বিচ্ছেদ সৃষ্টি কোরো না। ভগবান জানেন, এই ক'মিনিটের মধ্যেই পরস্পরের কাছ থেকে আমরা কতখানি তফাতে স'রে গিয়েছি! এখন বোসো, নিমন্ত্রণ-পত্রখানি লেখো।

ইভা। পৃথিবীতে কারুর সাধ্য নেই, আমাকে দিয়ে ঐ পত্র লেখায়!

রাজা। (দেরাজের কাছে গিয়ে) তাহ'লে আমিই লিখব।

বৈদ্যুতিক ঘণ্টা বাজালেন, তারপর ব'সে কার্ডের উপরে কলম চালনা করতে লাগলেন

ইভা। তাহ'লে এই স্ত্রীলোকটিকে তুমি বাড়ীতে ডেকে আনবে ?

কাছে এগিয়ে গেলেন

রাজা। হ্যাঁ।

স্তব্ধতা

শ্রীধর !

শ্রীধরের প্রবেশ

শ্রীধর। আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর !

রাজার দিকে খানিকটা এগিয়ে গেল

রাজা। খামের উপরের ঠিকানা দেখে এই চিঠিখানা এখনি মিসেস্ অশোকা রায়ের বাড়ীতে পাঠাবার ব্যবস্থা কর।

শ্রীধরের প্রস্থান

ইভা। রাজা, ঐ স্ত্রীলোকটা যদি এখানে আসে, তাহ'লে আমি তাকে অপমান করব।

রাজা। ইভা, অমন্ কথা মুখেও এনো না।

ইভা। আমি যা বলছি, তাই করব।

রাজা। কি শিশু তুমি ! ও-কাজ যদি তুমি কর, তাহ'লে সারা কলকাতার প্রত্যেক স্ত্রীলোক তোমাকে দয়ার চক্ষে দেখবে।

ইভা। না। সারা সহরের প্রত্যেক সুচরিত্রা নারী আমার প্রশংসা-গান করতে বাধ্য হবে। আমরা কিছু আমলে আনি না ব'লে পুরুষদের বড়ই সুবিধা হয়েছে। এইবারে আমাদেরও দৃষ্টান্ত দেখানোর দরকার—আর আজ থেকেই আমি দৃষ্টান্ত দেখাতে সুরু করব। (ভ্যানিটি-ব্যাগটি তুলে নিয়ে) আমার জন্মদিনে আজ তুমি আমাকে এটি উপহার দিয়েছ। ঐ স্ত্রীলোকটা যদি আমার বাড়ীর দরজা মাড়ায়, তাহ'লে এই ব্যাগটা আমি ছুঁড়ে মারব তার মুখের উপরে !

রাজা। ইভা, এমন কাজ তুমি করতে পারো না।

ইভা। তাহ'লে তুমি আমাকে চেন না ! শ্রীধর।

ডান্‌দিকে এগুলেন

শ্রীধরের প্রবেশ

শ্রীধর। আজ্ঞে, রাণীজি !

ইভা। শ্রীধর, সন্ধ্যার সময় সব যেন প্রস্তুত থাকে। আর শোনো শ্রীধর, আজ এখানে যখন মিসেস্ অশোকা রায় নামে একটি স্ত্রীলোক আসবে, তখন তুমি তার নাম আমার সামনে ভালো ক'রে উচ্চারণ ক'রে বোলো। বুঝলে ?

শ্রীধর। আজ্ঞে হ্যাঁ, রাণীজি।

ইভা। আচ্ছা !

মাঝের দরজা দিয়ে শ্রীধরের প্রস্থান

রাজার দিকে ফিরে

রাজা, যদি ঐ স্ত্রীলোকটা এখানে আসে—আমি তোমাকে জানিয়ে রাখছি—

রাজা। ইভা, তুমিই আমাদের সর্ব্বনাশ করবে !

ইভা। আমাদের ! এই মুহূর্ত্ত থেকে তোমার জীবনের সঙ্গে আমার জীবনের আর কোনই সম্পর্ক রইল না। কিন্তু তুমি যদি এই কেলেঙ্কারী বন্ধ করতে চাও, তাহ'লে এখনি তাকে লিখে জানিয়ে দাও যে, আমি তাকে এখানে আসতে মানা করেছি !

রাজা। আমি তা করব না—আমি তা পারব না—মিসেস্ রায় এখানে আসবেনই !

ইভা। তবে আমি নিরুপায় !

ডান্‌দিকে এগিয়ে গেলেন

যা বললুম, আমাকে তাই-ই করতে হবে।

ডান্‌দিকের দরজা দিয়ে প্রস্থান

রাজা। ইভা ! ইভা ! (একটু থামলেন) হা ভগবান ! কী করব আমি ? এই স্ত্রীলোকটি যে কে তাওতো আমি ওকে বলতে পারছি না ! ইভা যে তাহ'লে লজ্জায় আত্মহত্যা করবে !

একখানা চেয়ারের উপরে অবশ হয়ে ব'সে পড়লেন এবং দুই হাতে নিজের মুখ ঢেকে ফেললেন

(ক্রমশঃ)

পুত্রের প্রতি পিতা

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

শতজীবী হও তুমি হে মোর নন্দন !
তোমার আত্মায় মম আত্মার স্পন্দন।
তোমার প্রত্যেক রক্তবিন্দুতে আমার
ধমনীর রক্তধারা তুলিছে ঝঙ্কার।
তোমার চিত্তের জন্ম মম চিত্ত হোতে।
তোমার প্রবহমান অস্তিত্বের স্রোতে
ভেসে চলিয়াছি আমি। হে মোর সন্তান,
আমার স্বপ্নেরে তুমি কর ফলবান
মহাবীর্য্য দিয়ে। মোর অস্তিত্ব ধারারে
লয়ে যাও ঊর্দ্ধপানে। তোমার মাঝারে
অসমাপ্ত 'আমি' তার পরিপূর্ণতারে
লভিয়া হউক ধন্য। হে মোর তনয়।
তোমার জীবনে মোর জীবনের জয়।

পরলোকগত সুধীর রায়

মহারাজা শ্রীযোগীন্দ্রনাথ রায়

পতিব্রতারে সান্ত্বনা-বাণী
যে জন শুনাতে যায়,
বুঝিনা কেমনে—কেমন করিয়া
কি বাণী শুনাতে চায় !

আনন্দ-মেলা—মেলা আনন্দ
সঞ্চিত আছে জানি'
তুচ্ছ মানিয়া সব কিছু, আর
জুড়ি' তার দুই পানি—
ছুটিল ভক্ত সেই জন কাছে
কহিতে একটি কথা—
"তোমার চরণে রেখেছ আমারে—
মোর সব রেখো তথা।"

ক্রুক্‌স্ সাহেবের অধ্যাত্ম ও প্রেততত্ত্ব বিষয়ে গবেষণা

শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র (এটর্ণী)

(২)

পূর্ব্বে যে নিয়মে আরও দুই একবার এই বিষয়ে লিখিয়াছি, যদিও তাহা কোন কোন সমালোচকের সংস্কারবিরুদ্ধ বলিয়া তাহাতে দোষ ধরিয়াছেন তথাপি যখন কোয়ার্টার্লি জার্ণাল অফ সায়ান্স (quarterly journal of science) পত্রিকার পাঠকবর্গ অনুমোদন করিয়াছেন ভাবিবার যথেষ্ট কারণ আছে—তখন সেই ধারাতেই আমার পরিশ্রমের ফল আরও দুই একটি প্রবন্ধ সেই পত্রিকায় প্রকাশ করিতে ইচ্ছা ছিল, কিন্তু এই সমুদয় ঘটনা সম্বন্ধে আমি যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ তৎকালে লিখিয়াছিলাম তাহা পড়িতে গিয়া দেখিলাম যে উহাতে এত ঘটনার উল্লেখ ও তৎসম্বন্ধে প্রমাণের এত প্রাচুর্য্য আছে যে উহা সংগ্রহ করিয়া কোয়ার্টার্লি জারনাল অফ সায়ান্স (quarterly journal of science) কাগজের বহু সংখ্যা পূর্ণ করা যাইতে পারে। সুতরাং আমি বর্ত্তমানে আমার পর্য্যবেক্ষণের ফল কেবল একটা মোটামুটি পরিচয় দেওয়াই যথেষ্ট মনে করি। এ সম্বন্ধে প্রামাণাদি ও বিস্তৃত বিবরণ পরে প্রকাশ করিব। এ প্রবন্ধে আমার প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, যে সমস্ত ঘটনা আমার নিজের বাড়ীতে, বিশেষ বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষীদিগের সমক্ষে এবং যতদূর সম্ভব খুব কড়াকড়ি ব্যবস্থার মধ্যে ঘটিতে দেখিয়াছি, তাহা বর্ণনা করা। প্রত্যেকটি ঘটনা যাহা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহার প্রত্যেকটি অন্য স্থানে, অন্য সময়ে অন্যান্য নিরপেক্ষ স্বাধীন ব্যক্তিরাও প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ঘটনাগুলি একান্ত বিস্ময়কর এবং বর্ত্তমান যুগের কোন বৈজ্ঞানিক মত বা উপপাদক কল্পনার (theories) সহিত তাহা খাপ খায় না। কিন্তু ইহাদের সত্যতা সম্বন্ধে নিজে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া সমালোচকের বিদ্রূপের ভয়ে বা যাঁহারা এসব বিষয়ে কিছুই জানেন না বা যাঁহারা নিজেরা পূর্ব্বসঞ্চিত সংস্কার বশে এই বিষয়ের সত্যাসত্য নিরূপণ করিতে একান্ত অনিচ্ছুক, তাঁহাদের নিন্দার ভয়ে প্রকাশ না করা, আমি নৈতিক কাপুরুষতা মনে করি। যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং যাহা বার বার পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে, আমি তাহা মাত্র প্রকাশ করিব। 'কোন দুর্বোধ্য ঘটনার কারণ আবিষ্কার করার চেষ্টাই যুক্তিবিরুদ্ধ—এরূপ কথা শিখিতে এখনও আমার বাকী আছে।

লিখিবার প্রারম্ভেই জনসাধারণের মনে যে দুই একটি ভুল ধারণা আছে তাহা সংশোধন করা আবশ্যক মনে করি। একটি ভুল ধারণা এই যে এই সকল ঘটনা ঘটার পক্ষে অন্ধকার একান্ত আবশ্যক, কিন্তু তাহা মোটেই নহে। কেবলমাত্র যেখানে অন্ধকার কোন ঘটনা বিশেষের আবশ্যকীয় অংশ—যেমন কোন ভাস্বর বস্তুর আবির্ভাব —এবং আরও দুই একটি ঘটনা ব্যতীত এখানে যাহা উল্লেখ করা হইল তাহার সবগুলিই আলোতে ঘটিয়াছে। যেখানে কোন ঘটনা অন্ধকারে ঘটিয়াছে আমি তাহার বর্ণনায় তাহা যে অন্ধকারে ঘটিয়াছে তাহা স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করিয়াছি; সেখানে, হয় বিশেষ কারণে আলো বাদ্ দেওয়া হইয়াছে, না হয়, ঐ সমস্ত ঘটনাগুলি এমন সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্যভাবে পরীক্ষিত হইয়াছে যে যাহাতে চক্ষুর সাক্ষ্যর অভাবে প্রমাণ কোনরূপ অপর্য্যাপ্ত বলা যায় না। আর একটি প্রচলিত ভুল ধারণা এই যে ঐ সমস্ত ঘটনা কেবল মাত্র বিশেষ কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে বা নির্দ্দিষ্ট সময়ে দেখা যায়—যথা মিডিয়ামের গৃহে বা পূর্ব্ব হইতে যে সময় নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে কেবল সেই সময়ে তাহা ঘটে। এই ভুল ধারণার বশে প্রেত বা আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সম্বন্ধীয় বিবৃত ঘটনার সহিত পেশাদার যাদুকরের বা ভোজবাজীকরের ভেল্কীর—যাহা যাদুকর কেবল তাহার নিজের প্ল্যাটফরমের উপর, ভোজবাজীর আসবাব পত্র ও যন্ত্রপাতির সাহায্যে দেখায়—তাহার সহিত তুলনা করা হয়। এই কথা যে সত্য নয়, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য কেবল এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট যে আমি শত শত ঘটনার উল্লেখ করিতে পারি যাহা করিতে—হাউডিন্ (Houdin), বস্কো (Bosco) বা এণ্ডারসনের (Anderson) মত বিখ্যাত যাদুকরদিগের দক্ষতা তাহাদিগের সমস্ত যন্ত্রপাতির সাহায্য থাকা সত্ত্বেও একান্ত ব্যর্থ হইয়া যায়। আর এই সমস্ত ঘটনা আমার নিজের বাড়ীতে আমা কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট সময়ে ঘটিয়াছে, তথায় সামান্য একটিও যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিবারও সুযোগ দেওয়া হয় নাই।

তৃতীয় ভুল ধারণা এই যে প্রেতবাদীদিগের বৈঠক বা সিয়ান্সে মিডিয়াম্ কেবল তাহার নিজের বন্ধু বান্ধবদের বাছিয়া লয়—যেমন যাহারা মিডিয়ামের প্রত্যেক মতামতে বিশ্বাসী; আর স্বাধীনভাবে অনুসন্ধানকারী কোন ব্যক্তি উপস্থিত থাকিলে তাহার উপর এমন সর্ত্ত প্রয়োগ করা হয় যে তাহা দ্বারা যথাযথভাবে পরীক্ষা বা পর্য্যবেক্ষণ করা অসম্ভব হয়, সুতরাং প্রতারণার যথেষ্ট সুবিধা ঘটে। ইহার উত্তরে আমি বলিতে পারি যে দুই একটি ঘটনা ব্যতীত যেখানে আর যে কারণেই হউক বাহিরের লোককে যে বাদ দেওয়া হইয়াছে—তাহা প্রতারণা করিবার জন্য নহে। সেই কয়েকটী ঘটনা ছাড়া, প্রত্যেকটি ঘটনার সময় আমি আমার ইচ্ছামত আমার বন্ধুদের নির্ব্বাচন করিয়াছি, এমন কি যাঁহারা সহজে কিছু মানিতে চায় না, তাঁহাদের অনেককে বৈঠকে আহ্বান করিয়াছি এবং আমি আমার ইচ্ছামত সর্ত্ত নির্দ্দেশ করিয়াছি, যাহাতে প্রতারণার কোন সম্ভাবনা না থাকে। যেরূপ অবস্থায় এই সমস্ত ঘটনা সহজে ঘটিতে পারে তাহা ক্রমশঃ জানিতে পারিয়া ঐ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে আরও অধিক কৃতকার্য্য হইয়াছি। বিশেষতঃ যে সমস্ত স্থানে ভুল ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া নিতান্ত অকিঞ্চিতকর বিষয়ের জন্য জেদ করিয়াছিলাম (যাহাতে প্রকৃতপক্ষে প্রতারণা ধরা আরও কঠিন হয়) তদপেক্ষা বহুগুণে সাফল্য লাভ করিয়াছি। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে অন্ধকার মোটেই আবশ্যক নয়। তবে ইহা একটি পরীক্ষিত সত্য যে যেখানে শক্তি দুর্ব্বল সেখানে উজ্জ্বল আলো কোন কোন ঘটনা ঘটিবার পক্ষে প্রতিকূল হয়। মিষ্টার হোমের শক্তি এত অধিক ছিল যে তিনি তাঁহার সিয়ান্সে (seance অলৌকিক শক্তির প্রকাশের বৈঠকে) সর্ব্বদা অন্ধকারের বিরুদ্ধে ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে কেবলমাত্র দুইবার যেখানে আমার নিজের এক্সপেরিমেণ্ট বা পরীক্ষার জন্য অন্ধকার আবশ্যক হয় তাহা ছাড়া প্রত্যেকটি ঘটনাই আলোতে ঘটে। ঐ অলৌকিক শক্তির প্রকাশে নানা প্রকারের ও নানা বর্ণের আলোর কিরূপ প্রভাব আছে তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য আমার বহু সুযোগ ঘটেছে;—যেমন সূর্য্যের আলোতে, চাঁদের আলোতে, গ্যাসের আলোতে, ল্যাম্পের আলোতে, মোমবাতির আলোতে, বায়ুশূন্য কাঁচের নলের একই প্রকার স্থির হরিদ্রা বর্ণের (homogenous yellow) আলোতে, বিদ্যুতের আলো প্রভৃতি। যে আলো এই সমস্ত ঘটনায় বাধা দেয় তাহা স্পেক্‌ট্রামের (spectrum) শেষ সীমানায় রেখা পাত করে, অর্থাৎ বেগুনে রঙ্গের আলো। এক্ষণে আমি যে সমস্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি সেগুলিকে শ্রেণী বিভাগ করিয়া বর্ণনা করিব। সহজ হইতে ক্রমশঃ জটিল বিষয়ের বিবরণ দিব এবং প্রত্যেক শ্রেণীর ঘটনার নাম শীর্ষকের নিম্নে ঐ সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রমাণ দিতে পারি সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিব।

পাঠকবৃন্দ মনে রাখিবেন যে দুই একটি ঘটনা ব্যতীত—যাহা বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছি—প্রত্যেকটি ঘটনাই আমার নিজের বাড়ীতে, আলোতে এবং মিডিয়াম ভিন্ন আমার নিজের বন্ধুগণের

সম্বন্ধে ঘটিয়াছে। যে পুস্তক ভবিষ্যতে প্রকাশ করিব মনে করিয়াছি, সেখানে প্রত্যেকটি ঘটনা পরীক্ষা করিবার জন্য যেরূপ সতর্কতা অবলম্বন ও যেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছি তাহার বিশদ বিবরণ ও সাক্ষীদিগের নাম প্রকাশ করিব। বর্ত্তমান প্রবন্ধে ঐ সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে দুই চার কথা বলিব মাত্র।

প্রথম শ্রেণী

কোনরূপ মন্ত্রের সাহায্য ছাড়া কেবলমাত্র স্পর্শের দ্বারা ভারী জিনিষের নড়াচড়া

অলৌকিক ঘটনার মধ্যে ইহা একান্ত সাধারণ ব্যাপার। ইহা অনেক প্রকার গৃহের কম্পন ও গৃহ মধ্যের জিনিষ পত্রের সামান্য স্পন্দন হইতে খুব ভারী জিনিষ—যেমনি তার উপরে হাত রাখা হইল অমনি—শূন্যে উঠা পর্য্যন্ত। ইহার বিরুদ্ধে প্রচলিত—উত্তর এই যে মানুষ যখন কোন একটা গতিশীল পদার্থকে স্পর্শ করে, তখন হয় ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়, নতুবা টানিয়া আনে, নতুবা টানিয়া তোলে। কিন্তু আমি বহুবার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে উহা প্রকৃত সত্য নয়। যাহা হউক, এইরূপ ঘটনাগুলিকে আমি মোটেই প্রাধান্য দিই না বা উহা প্রামাণ্যের মধ্যে গ্রহণ করি না, তবে ইহার উল্লেখ করিলাম কারণ পূর্ব্বোক্ত ঘটনাগুলি হস্তস্পর্শ বিনা ও ঐ প্রকার ঘটনা ঘটার পূর্ব্ববর্ত্তী (অর্থাৎ ঐরূপ ঘটনা হস্তস্পর্শ ব্যতিরেকেও পরে ঘটিয়াছে)।

এই সকল নড়াচড়া ঘটনা ঘটিবার পূর্ব্বে সাধারণতঃ একরূপ অস্বাভাবিক প্রকারের ঠাণ্ডা বাতাস বহিতে আরম্ভ হয়। ঐ বাতাসে অনেক সময় আমার অনেক কাগজের পাতা (sheets) উড়িয়া গিয়াছে; থার্ম্মোমিটারের পারদ অনেক ডিগ্রী নামিয়া গিয়াছে। কোন কোন সময়ে (এ সম্বন্ধে পরে বিস্তারিত বিবরণ দিব) আমি কোন বাতাস বহিতে দেখি নাই, কিন্তু কয়েক ইঞ্চি জমাট পারদের মধ্যে হাত প্রবেশ করাইলে যেমন ঠাণ্ডা মনে হয়, তেমনি ভীষণ ঠাণ্ডা অনুভব করিয়াছি।

দ্বিতীয় শ্রেণী

বিভিন্ন কঠিন দ্রব্য আঘাতে যেরূপ শব্দ হয় সেইরূপ শব্দ ও অন্য নানা প্রকারের শব্দ উৎপন্ন করা

ঠক্‌ঠকে শব্দ (raps) বলিলে সাধারণতঃ যেরূপ শব্দ বুঝায় তাহাতে ভুল ধারণা জন্মে। আমি আমার পরীক্ষার কালে নানা সময়ে নানা প্রকারের শব্দ শুনিতে পাইয়াছি। কখনও যেন একটি আলপিন্ দিয়ে থর থর করিতেছে, কখনও বা ইণ্ডাক্‌সন্ কয়েল নামক একপ্রকার বৈদ্যুতিক যন্ত্র পুরাদমে চলিলে যেমন ধারাবাহিক শব্দ হয় তেমনি শব্দ; কখনও বা বাতাসে বিস্ফোরণের ন্যায় শব্দ (detonations in the air); কখনও কোন ধাতব পদার্থের আঘাতের ন্যায় তীব্র শব্দ, কখনও বা ঘসড়াইবার যন্ত্রে যেরূপ শব্দ উৎপন্ন হয় সেইরূপ, কখনও কোন জিনিষ আঁচড়াবের মত খরখর শব্দ—কখনও বিহঙ্গ কাকুলীর ন্যায় শব্দ ইত্যাদি। প্রত্যেক মিডিয়ামই এই প্রকারের শব্দ করিতে পারে; তবে এক এক মিডিয়ামে এক এক প্রকারের বিশেষত্ব দেখা যায়। আমি কখনও কাহাকে মিষ্টার হোমের মত এত বিভিন্ন প্রকারের শব্দ উৎপন্ন করিতে দেখি নাই এবং জোর শব্দ ইচ্ছা করিলেই উৎপন্ন করিতে মিস্ কেট্ ফক্সের সমকক্ষও কাহাকেও দেখি নাই।

বহু মাস ধরিয়া উক্ত মিস্ ফক্স নামক ভদ্রমহিলার উপস্থিতিতে যে সকল ঘটনা ঘটে আমি তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার অবাধ সুবিধা পাইয়াছি; আমি বিশেষভাবে এইরূপ শব্দ সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়াছি। কোন শব্দ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে সাধারণতঃ মিডিয়াম-দিগকে বৈঠকে (seance) বসিতে হয়। কিন্তু মিস্ ফক্সের বেলায় তাহার কোন প্রয়োজন হয় না; কোন একটা জিনিষের উপর হাত রাখিলেই যথেষ্ট। মৃদু স্পন্দন হইতে আরম্ভ করিয়া জোরে আঘাত করিবার মত উচ্চ শব্দ—যাহা কয়েক ঘর দূর থেকেও শোনা যায়—সেইরূপ শব্দ উৎপন্ন হয়। এই প্রকারের শব্দ আমি একটি সজীব বৃক্ষ হইতে, একখণ্ড কাঁচ হইতে, টানা লোহার তার হইতে, টানা অন্ত্রের আবেষ্টনী (membrane) হইতে,—টাম্বুরীণ বাদ্যযন্ত্র হইতে, ক্যাব নামক গাড়ীর ছাদের উপর হইতে, থিয়েটারের মেঝে হইতে উৎপন্ন হইতে শুনিয়াছি। এমন কি অনেক সময়ে স্পর্শ করিবারও প্রয়োজন হয় নাই। আমি এইরূপ শব্দ ঘরের মেঝেও দেয়াল ইত্যাদি হইতে উৎপন্ন হইতে শুনিয়াছি—যখন মিডিয়ামের হাত পা ধরে রাখা হইয়াছে, যখন সে চেয়ারের উপর দাঁড়াইয়া আছে—যখন সে গৃহের ছাদ থেকে ঝোলান দোলনায় দুলিতেছে—যখন সে তারের খাঁচার মধ্যে বদ্ধ আছে এবং সে শোফার উপর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছে। আমি এইরূপ শব্দ কাঁচের হারমোনিকন্ (harmonicon) নামক বাদ্যযন্ত্র হইতে উৎপন্ন হইতে শুনিয়াছি, এমন কি আমার নিজের কাঁধের উপর হইতে এবং নিজের হাতের নীচের দিক হইতে উৎপন্ন হইতে শুনিতে পাইয়াছি। এক সিট্ কাগজের এক কোণ একটি সূতা দিয়া ফুঁড়িয়া সেই সূতা যখন দুই আঙুলের মধ্যে ধরা আছে তখন তাহা হইতে ঐরূপ শব্দ উৎপন্ন হইতে শুনিয়াছি। এইরূপ শব্দ উৎপত্তি কত প্রকারে হইতে পারে এতদ্বিষয়ে যে সকল উপপাদক কল্পনা (theory) যাহা প্রধানতঃ আমেরিকায় প্রচলিত হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণভাবে অবগত হইয়াও আমি নানাপ্রকার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে এইরূপ (মিডিয়ামদিগের উপস্থিতিতে উৎপন্ন) শব্দের বাস্তব অস্তিত্ব আছে এবং উহা কোন কৌশলে বা যন্ত্র সাহায্যে উৎপন্ন করা হয় নাই এবং তাহা বিশ্বাস না করিবার উপায় নাই।

এখন একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে যে এইরূপ গতিও শব্দ বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কিনা? অনুসন্ধান করিতে গিয়া অতি অল্পদিনের মধ্যে দেখা গিয়াছে যে যে শক্তি দ্বারা এইরূপ নড়াচড়াও শব্দ উৎপন্ন হয় তাহা অন্ধশক্তি নহে। উহা বুদ্ধিবৃত্তির সহিত যুক্ত ও পরিচালিত। যে সব শব্দ সম্বন্ধে আমি উল্লেখ করিলাম উহা বার বার নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্টবার উৎপন্ন হইয়াছে এবং অনুরোধ অনুসারে বিভিন্নস্থানে উচ্চ বা মৃদু হইয়াছে এবং পূর্ব্ব হইতে সাংকেতিক পরিভাষা নির্দ্দিষ্ট থাকিলে প্রশ্নের অপেক্ষাকৃত সঠিক ও স্পষ্ট উত্তরও খবর পাওয়া গিয়াছে। এই সমস্ত ঘটনা যে বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহা অনেক সময়ে মিডিয়ামের বুদ্ধি বৃত্তি অপেক্ষা অনেক নিম্নস্তরের। অনেক সময়ে উহা মিডিয়ামের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করে; যখন কোন একটি কাজ করিবার সঙ্কল্প আছে বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে তখন যদি সে কাজ করা তেমন সঙ্গত না হয় তাহা পুনর্ব্বার চিন্তা করিয়া দেখিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়াছে। এই বুদ্ধিবৃত্তি এমন ধরণের যে উহা কোন উপস্থিত ব্যক্তি হইতে বিনির্গত হয় নাই ইহা বিশ্বাস করিতেই হয়।

পূর্ব্বোক্ত বিবরণের প্রত্যেকটির প্রমাণ স্বরূপ বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। তবে যখন এই বুদ্ধিবৃত্তির উৎপত্তির মূল সম্বন্ধে বলিব তখন এ সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করিব।

তৃতীয় শ্রেণী

নানাপ্রকার বস্তুর ওজনের পরিবর্ত্তন

নানাপ্রকার বস্তুর ওজনের সাময়িক পরিবর্ত্তন বিষয়ে নানা মিডিয়াম্ দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি ও উক্ত কোয়ার্টার্লি জার্ণালে প্রকাশ করিয়াছি; সুতরাং ঐ বিষয়ে আর উল্লেখ করিব না।

চতুর্থ শ্রেণী

মিডিয়াম হইতে দূরে ভারী জিনিষের নড়াচড়া

মিডিয়াম হইতে দূরে—যখন সে তাহা স্পর্শও করে নাই—বহু প্রকারের ভারী জিনিষ—যেমন, টেবিল, চেয়ার, সোফা ইত্যাদির নড়াচড়ার দৃষ্টান্ত অসংখ্য।

আমি অতি সংক্ষেপে কয়েকটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করিব। যখন আমার দুই পা মেঝে থেকে উচ্চে ছিল তখন আমি নিজে যে চেয়ারে বসিয়া আছি তাহা আংশিকভাবে ঘুরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। উপস্থিত সকলের সতর্ক দৃষ্টির সম্মুখে একখানি চেয়ার ঘরের এক কোণ হইতে ধীরে ধীরে টেবিলের নিকট সরিয়া আসিতে দেখা গিয়াছে। আর একবার একখানি আরাম কেদারা, আমরা যেখানে বসিয়াছিলাম সেখানে ধীরে ধীরে সরিয়া আসে এবং পরে আমার অনুরোধে প্রায় তিন ফিট্ পশ্চাতে সরিয়া যায়। পর পর ক্রমান্বয়ে তিন দিন সন্ধ্যায় একখানি ছোট টেবিল ঘরের একধার হইতে অন্যধারে মেঝের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। আমি পূর্ব্ব হইতে যেরূপ সতর্ক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলাম তাহাতে প্রমাণ সম্বন্ধে আর কোন আপত্তি উঠিতে পারে না। ডাইলেক্টিক্যাল সোসাইটীর কমিটির দ্বারা যে সমস্ত ঘটনা নিঃসন্দেহ প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হইয়াছে, সেইরূপ বহু ঘটনা আমি বহুবার পরীক্ষা করিয়াছি—যেমন পূর্ণ আলোতে ভারী টেবিলের একস্থান হইতে অন্যস্থানে সরিয়া যাওয়া। কতকগুলি কেদারার উপর কয়েকজন লোক হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া চেয়ারের পিঠ ধরিয়া আছে—সেই কেদারাগুলি টেবিল থেকে একফুট দূরে, কেহই টেবিল স্পর্শ করে নাই। সেই চেয়ারগুলি ধীরে ধীরে ঘুরিয়া গেল যাহাতে চেয়ারগুলির পৃষ্ঠদেশ টেবিলের দিকে হয়। একবার আমি যখন উঠিয়া কে কি ভাবে বসিয়া আছে তদারক করিতেছিলাম সেই সময়ে এইরূপ ঘটনা ঘটে। ক্রমশঃ

রঙ-ছুট্

শ্রীকানাই বসু

ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি। শীত আছে বলিলে আছে, নাই বলিলে নাই।

সকাল বেলা। যাহাকে ঘরের ভাষায় সক্কাল বেলা বলা হয়। লেপের ভিতর গুটিসুটি হইয়া শুইয়া মুকুল। সবে মাত্র সে ঘুমের রাজ্যের প্রত্যন্ত দেশে উপনীত হইয়াছে। তখনো সে-রাজ্য অতিক্রম করে নাই। কিসের যেন শব্দে চোখ মেলিয়া চাহিয়াই সে চীৎকার করিয়া উঠিল।

তাহার সামনে তিনটা রাক্কস—লাল, নীল, রূপালী ইত্যাদি হরেক রকম রঙের রঙীন মুখ—হাসিতেছে শাদা দাঁত বাহির করিয়া।

চীৎকার শুনিয়া মুকুলের মামাতো ভাই নন্দ আসিয়া পড়িল তাই রক্ষা। না হইলে কী হইত বলা যায় না। রাক্কস তিনজন, অর্থাৎ ভূতো ও তাহার দুই চেলা, তাহাদের ফাগের পুঁটুলি ও টিনের পিচকারি লইয়া ছুট দিল।

বৈপরীত্যের আকর্ষণে ভূতনাথ ও মুকুল পরম বন্ধু। বছর নয়েকের ছেলে মুকুল। মামার বাড়ীর গাঁয়ে সমবয়সী ছেলের অভাব নাই। এই কয় দিনের মধ্যেই ভাবও হইয়াছে অনেকের সঙ্গেই। কিন্তু ঐ শীর্ণকায় অতি-চঞ্চল অতি-দুষ্ট ভূতনাথের সঙ্গে যত, এত আর কাহারও সঙ্গে নয়। ভূতোর ক্ষিপ্র হাত-পা, উর্ব্বর মস্তিষ্ক ও কৌতুকোজ্জ্বল দৃষ্টি মুকুলের বিস্ময় ও ঈর্ষার বিষয়। অপর দিকে মুকুলের শান্ত ভীরু মুখ, মার্জিত চাল চলন ও ইংরাজি-মিশানো কথাবার্ত্তা ভূতনাথকে অতিশয় আকৃষ্ট করে। মুকুল ভাবিত, আহা ঐযে পথের ওপোর দিয়ে ও নারকেল পাতার ঘোড়ায় চড়ে চলেছে আগাপাশতলা ধুলো মেখে, ওর কী মজা!

ভূতনাথ ভাবিত, মুকুলের মতো যদি আমার নীল ভেলভেটের ইজের জামা আর ট্রাইসিকেল থাকতো, তাহলে য়্যাদ্দিন কবে আমি ম্যাজিষ্টার সাহেবের সঙ্গে দেখা করে' বলে আসতুম—ইয়েস সার, গুডমর্ণিং ভেরি গুড্ সার।

মামার বাড়ীর সামনেই পথের ওপারে ভূতোদের বাড়ী। ভূতো মুকুলকে ভালবাসে। তাই আজকের আনন্দমেলায় সে মুকুলকে সঙ্গী করিতে আসিয়াছিল সকাল হইতে না হইতে।

নন্দলালও মুকুলকে ভালবাসে, সে মুকুলের চেয়ে বছর চার পাঁচের বড়। তাহার ভালবাসাটা হেডমাষ্টারের ভালবাসা বা হোষ্টেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের ভালবাসার অপরিপক্ক সংস্করণ। সদাই মুকুলের ভাল করিবার চেষ্টায় উন্মুখ।

এরকমটা হইবার কিছু কারণ আছে। সুমিত্রা দেবী অর্থাৎ মুকুলের জননী, অর্থাৎ নন্দর পিসীমা এবার অনেক দিন পরে বাপের বাড়ী আসিয়া দেখিলেন সেই নন্দ এত বড়টি হইয়াছে। ওমা, তবে আর ভাবনা কী? এত বড় দাদা রয়েছে মুকুলের, তবে তো আমি নিশ্চিন্দি। কী বল বাবা, ছোট ভাইটির গার্জ্জেন হতে পারবে তো নন্দলাল?

এমন মিষ্ট কথা নন্দ কখনো শোনে নাই। মা বলেন, রাক্কোসটা চব্বিশ ঘণ্টা আমায় জ্বালিয়ে খেলে। বাবা বলেন, গাধাটা গেল কোথায়। সারা দিন বাড়ীতে তার চুলের টিকিটি দেখতে পাইনা। কিন্তু নন্দলাল বলিয়াও যে তাহাকে ডাকা যায়, একথা তো এ বাড়ীর কাহারও মাথায় আসে নাই।

পিসি বলিলেন, ভাইটিকে দেখো বাবা। কোথায় বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াবে, ডানপিটে দস্যি ছেলেদের সঙ্গে মিশে অসভ্য জংলী হয়ে যাবে, এই ভয়ে তোমার পিসেমশাই ওকে আসতেই দিতে চান নি। সায়েব মাষ্টার বাড়ীতে পড়াতে আসে। সায়েব বলে, এখন পড়া বন্ধ দেওয়া উচিত নয়। আসছে মাসে ওকে সায়েবদের ইস্কুলে ভর্ত্তি করে দেবেন কি না।

মুকুলের বাবা কলিকাতার জজসাহেব—ইহাই তো এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। কিন্তু ইহার চেয়ে আশ্চর্য্য ব্যাপার, সেই জজসাহেব নন্দর আপন পিসেমশায় হন। সুতরাং নন্দলাল মুকুলের রক্ষার সকল ভার হাতে তুলিয়া লইয়াছে এবং জমীদারদের চণ্ডীমণ্ডপ হইতে স্বরাজ ড্রামাটিক ক্লাব পর্য্যন্ত মুকুলকে সঙ্গে

করিয়া ঘুরিয়া তাহার এই অত্যাশ্চর্য্য পিতৃব্য-গৌরব প্রমাণ করিয়া বেড়ায়।

সুমিত্রার মুখে নন্দলালের প্রশংসা আর ধরে না। দুটিতে যেন রাম লক্ষ্মণ। কলিকাতায় যাইবার সময় তিনি নন্দকেও সঙ্গে লইয়া যাইবেন, যাহাতে রাম লক্ষ্মণের মধ্যে আর ভ্রাতৃবিচ্ছেদ না হয়।

ইহাতেই নন্দলালের ভ্রাতৃস্নেহ পুরাপুরি রামোচিত হইয়া উঠিয়াছে। মুকুল যতক্ষণ জাগিয়া থাকে ততক্ষণ যেদিকে ফিরায় আঁখি, কেবল নন্দদাকেই দেখে। সে ঘুমাইলেও নন্দলাল তাহার খবরদারি করে। কলিকাতায় যাইবার সাধ নন্দর অতি প্রবল এবং পিসিমার স্নেহ যদি বজায় রাখিতে পারে তবে সে স্বর্গ তাহার করায়ত্ত।

২

ভূতোর দল বিতাড়িত হইলে মুকুল বিছানা ছাড়িয়া জানালায় আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিল তিনটি রাক্ষস উঠান পার হইতে হইতে শূন্যে ঘুষি ছুঁড়িতেছে আর রৌদ্রের মধ্যে লাল মেঘের সৃষ্টি হইতেছে।

এতটুকুটুকু ছেলে যে এমন রঙ ও কালি মাখিয়া সঙ সাজিয়া রাস্তায় বাহির হইতে পারে, ইহা তাহার ধারণা ছিল না। কলিকাতায় উড্ স্ট্রীটে দোল হয় বটে, কিন্তু সে সেই মোড়ের কয়লা-ওলার দোকানে।

সেখানে রাস্তার ওপারের পানওলাটা যায়, মোটরের সহিস শ্যামলাল যায়, পুরাতন বেয়ারা বুড়া বদরীও গিয়া থাকে। কিন্তু ভদ্রলোকের বাড়ীর ছেলে? 'ন্যাষ্টি' বলিয়া মুকুল জানালা হইতে সরিয়া আসিল।

কলিকাতার সমাজে মিশিবার যোগ্য হইবার জন্য নন্দ ইংরাজি ভাষার চর্চ্চা করিতেছে। সে বলিল—'প্যাথেটিক।'

সম্প্রতি নন্দ প্রাতর্ভ্রমণ শুরু করিয়াছে। সরল স্বাস্থ্য সোপানে স্পষ্টই লেখা আছে, "সহজ ব্যায়ামের মধ্যে ভ্রমণই শ্রেষ্ঠ এবং উষাকালই ভ্রমণের পক্ষে প্রকৃষ্ট কাল। কারণ তখন বায়ু রাত্রিকালে শিশিরপাতের দ্বারা নির্ম্মল হইয়া থাকে।"

একথা সে পিসিমাকে পড়িয়া শুনাইয়াছে এবং তাঁহার অনুমোদন ও অনুমতিক্রমে মুকুলকে সঙ্গে করিয়া ভ্রমণ করিয়া থাকে। পথে যত পরিচিত লোকের সহিত দেখা হয় সে 'গুড্ মর্ণিং' বলিয়া কথা আরম্ভ করে ও কথার মধ্যে হঠাৎ তাহার পিস্তুতো ভাই মুকুলের, ঐ যে তাহার যে পিসা মহাশয় কলিকাতার জজ্, তাঁহার ছেলে এই মুকুলের, বাড়ী ফিরিতে ও পড়িতে বসিতে দেরী হইয়া যাইবে বলিয়া বিদায় লয়।

আজও মুকুল অভ্যাস মত ধোপদোরস্ত কাপড় পরিয়া বেড়াইতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলে সুমিত্রা দেবী বলিলেন—আজ আর ওকে বাইরে নিয়ে যাস নি বাবা নন্দ। কে কোত্থেকে চোখে নাকে ফাগ টাগ দিয়ে দেবে।

কোমর বাঁধা কাপড় আরও কসিয়া বাঁধিতে বাঁধিতে নন্দ উত্তর দিল—যার মরবার পালক উঠেছে সে দেবে মুকুলের গায়ে ফাগ। একটি গুঁড়ো রঙ ওর গায়ে পড়েছে কি অমনি তার হাতখানা মটাস্ করে ভেঙে দেব না? বলিয়া উঠানের জামরুল গাছটার একটা শুকনা সরু ডাল মটাস্ করিয়া ভাঙিয়া বোধকরি তাহার কথায় ও কাজে ঐক্য রক্ষা করিবার ক্ষমতা প্রমাণ করিল।

মুকুল বলিল—হ্যাঁ মা, একটু দেখে আসি মা। একটু পরেই চলে আসব। যাই মা নন্দদার সঙ্গে? নন্দদার সঙ্গে চালাকি নয় মা। দেবে ঠিক করে।

মা বলিলেন—দেখো, যেন রঙ টঙ মেখো না। বুঝলে?

নাক ঠোঁট কুঞ্চিত করিয়া মুকুল বলিল—ছিঃ, ঐ রকম ক্যাডাভারাস রঙ আবার ভদ্দরলোকে মাখে।

নন্দ বলিল—ন্যাষ্টি কোথাকার। সে বার কয়েক ডান হাতের মুঠি পাকাইয়া হাত মুড়িয়া ও খুলিয়া হাতের গুলি টিপিয়া টিপিয়া দেখিল ও দেখাইল।

তথাপি—নন্দলালের সবল দক্ষিণ হস্তের কঠিন পেশী দেখিয়াও সুমিত্রা দেবী নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। পশ্চিমা ভৃত্য বদরীকে ডাকিয়া ইহাদের সঙ্গে দিয়া দিলেন ও বলিয়া দিলেন, দেখো বাবা নন্দ, আজ আবার বিকেলে তোমার পিসে-মশাই আসছেন, জানো তো? খুব সাবধান।

পিসে মহাশয় আজ আসিতেছেন, ইহা আবার নন্দকে বলিতে হইবে! ক্যালেণ্ডারের পাতায় তবে নন্দ রোজ দাগ দেয় কী জন্য?

নন্দলাল ও বদরীনাথ, এই দুই দেহরক্ষীর দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া মুকুল ভ্রমণে বাহির হইল। পথে একে একে, দুইয়ে দুইয়ে, দলে দলে তাহার সমবয়সী, অসমবয়সী মানুষ রঙ লইয়া মাতিয়াছে। গ্রাম বড়ো নয়, মুকুলের পরিচয় জানিতে ছেলেদের প্রায় কাহারও বাকী নাই। যে অল্প কয়েকজন এখনো এ বিষয়ে অজ্ঞান, তাহারা জ্ঞানীদের কাছে জ্ঞান আহরণ করিয়া সাবধান হইল। বিলাত হইতে যাহার বাবা জজ সাহেব হইয়া আসিয়াছেন, লালমুখো সাহেবের কাছে যে ছেলে ইংরাজী পড়িতেছে, তাহার গায়ে রঙ দিবার দুঃসাহস কে করিবে। ইহার উপর আবার ঐ দারোয়ানটার লম্বা লাঠি আছে।

মাঠে ঘাটে পথে হোলিযুদ্ধের Holy war চলিল এবং সেই যুদ্ধরত সৈন্যরাজির রক্তরাগের অনতিদূরে মুকুলের সদ্য পাট-ভাঙ্গা আদ্দির পাঞ্জাবীর শুভ্রতা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া শোভা পাইতে লাগিল।

৩

নন্দ আসিয়া ডাকিল, ও পিসিমা, এই নাও তোমার মুকুলকে দিয়ে গেলুম। দেখ, আমার কথা রেখিচি কি না। ওর গায়ে এক ফোঁটা রঙ দেখতে পাচ্ছো?

এক ফোঁটা রঙ মুকুলের গায়ে দেখিতে পাইলেন না, তাহা সুমিত্রাদেবীকে স্বীকার করিতে হইল। তিনি আঁচল হইতে একটি আধুলি বাহির করিয়া নন্দর হাতে দিয়া বলিলেন—তাই তো বলি, নন্দলাল আমার বাহাদুর ছেলে। এই নাও বাবা, তোমার দোলের পার্ব্বনি।

পিসিমা বাড়ীর সব ছেলে মেয়েদের চার আনা করিয়া পার্ব্বণী দিয়াছেন, এ খবর নন্দ পথ হইতেই সংগ্রহ করিয়াছে। একত্রে চার আনা পয়সাই একটা সম্পত্তি। কিন্তু আট আনা যে ঐশ্বর্য্য।

সকাল হইতে নন্দর আজ দোল খেলা হয় নাই। মুকুলকে

অকলঙ্কিত বাড়ী পৌঁছাইয়া না দিলে তাহার খেলা সম্ভব হয় না, ভালোও দেখায় না। মন সেইদিকে টানিতেছে কিন্তু সম্ভ ঐশ্বর্য্য লাভ যাঁহার হাত হইতে ঘটিল, সেই পরম দয়াময়ী পিসিমাকে ছাড়িয়া যাইতে যেন ইচ্ছা করে না।

—জানো পিসিমা, একবার হয়েছে কি, ওপাড়ার হরিপদটা না দু হাতে দু মুঠো আবীর নিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে একেবারে প্রায় মুকুলের পেছনে এসে হাজির হয়েছে। আমার চোখ চারদিকে ঘুরছে। আমি দেখ্‌ছি কী করে। যেই না একবার আমার দিকে তাকানো—আর একেবারে কেঁচোর মতন সুড় সুড় করে পালাতে পথ পায় না।

কথাটা মিথ্যা নয়। পলাইবার আগে দুর্বৃত্ত হরিপদ নন্দর পানে তাকাইয়াছিল বটে। কিন্তু বদরীনাথের ছয়ফুট দেহ ও ছয়ফুট লাঠির দিকেও তাহার দৃষ্টি পড়িয়াছিল।

মুকুল বলিল—আর একবার, সেই যে নন্দদা? পুঁটে আর কিশোরী পিচকিরি নিয়ে আমার দিকে তাগ্‌ করছিল। আর সেই যে তুমি বল্লে, সরে আয় মুকুল; আমি বল্লুম, দাঁড়াও না, আমার গায়ে রঙ্‌ দেবে, দিক না দেখি। দেখি কত বড় সাধ্যি। কিশোরীটা কী বোকা জানো মা, পুঁটেকে বল্লে ওর বোধ হয় অসুখ করেছে, ওর গায়ে রঙ্‌ দিতে নেই, আয়। বলে পুঁটেকে ডেকে নিয়ে চলে গেল। হি হি হি—বলে অসুখ করেছে। ভয়ে পালিয়ে গেল, বলে কিনা অসুখ করেছে। হিহি হিহি।

—তোমার মুকুলটি কম ছেলে নয় পিসিমা। যাকে তাকে ডেকে বুক ফুলিয়ে সামনে দাঁড়াচ্ছে আর বলছে, কী হে, আমার গায়ে রঙ্‌ দেবে না? দাও না একবার, মজাটা দেখ। কত রকম দুষ্টু ছেলে আছে, কী বল পিসিমা, সবাইকে আমি যদি বাধা দিতে না পারতুম। তা হলে কী হত বল দিকি? অত মর‍্যাল কারেজ কি ভালো? বল তো পিসিমা?

পিসিমা বলিলেন—তা তো বটেই। কিন্তু একটু না হয় লাগলোই রঙ্‌। কেমন মুকুল?

দূর, কী যে বলে মা, তার ঠিক নেই। মুকুল ছুটিয়া পলাইয়া গেল, যেন এখনই তাহার গায়ে রঙ্‌ মাখাইয়া দিল আর কি!

বাড়ীর ও পাড়ার ছেলে মেয়েদের দোলের উৎসব তখনো শেষ হয় নাই। অতি হৃষ্ট চিত্তে নন্দ চলিয়া গেল উৎসবে যোগ দিতে। আর বড়লোকের সুসভ্য লক্ষ্মী-ছেলে মুকুল ঘরে গিয়া তাহার ইংরাজী ছবির বই লইয়া বসিল।

রঙ্‌ছুটের গল্প শেষ হইয়াছে। বাকীটুকু তাহার উপসংহার।

৪

বেলা প্রায় বারোটা। মুকুলের খাওয়া দাওয়া সারা হইয়াছে। বাড়ীর অপর কাহারও হয় নাই। মুকুলের খাওয়ার সময় ও ব্যবস্থা স্বতন্ত্র। এইবার তাহার ঘুমাইবার কথা। ইহাই পিতৃ-আজ্ঞা। অতএব সে নিজেদের ঘরে একাকী বসিয়া বসিয়া কাঠের টুকরার বাড়ী ঘর পোল তৈয়ারী করিতে শুরু করিল।

ভাল লাগিল না। উঠিয়া জানালায় আসিয়া দাঁড়াইল। জানালা হইতে মুকুল দেখিল, সামনের বাড়ীর উঠানে উবু হইয়া বসিয়া ভুতো চুল আঁচড়াইতেছে। এক একবার চিরুণি চালনা করে আর তাহার সামনে বিছানো একখানি খবরের কাগজের উপর ঝরঝর করিয়া ফাগ ঝরিয়া পড়ে। ভুতোর ছোট বোন সেই ফাগ কুড়াইয়া লইয়া তাহার কোলের পুতুলের মাথায় মাখাইয়া দিতেছে ও কী বকিতে বকিতে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতেছে। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া দেখিয়া মুকুল সরিয়া আসিল। চোখ পড়িল বাড়ীর ভিতরে ও পাশের বারান্দায়। সেখানে বড় মামা একখানা তোয়ালে দিয়া ক্রমাগত তাঁহার টাক ঘষিতেছেন এবং বড় মামীমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, দেখ তো গা, এইবার গেছে?

নীচে হইতে তাহার মায়ের কণ্ঠ কানে আসিল—আঃ, কী হচ্ছে ভাই ছোট বৌদি, এই চান করে এলুম, আবার তুমি লাগতে এলে? তোমার আর শেষ হয় না খেলা।

৫

নন্দলাল আসিয়া একটা পুরাণো গ্লাক্সোর টিন রাখিল আলমারির নীচে। মুকুল জিজ্ঞাসা করিল, কী নন্দদা?

নন্দ চুপিচুপি উত্তর করিল—ও আমি কুম্‌কুম্ তৈরী করব বিকেলে, কারুকে বলিস নি যেন। এখানে লুকোনো রইল। আমাদের ঘরে তো রাখবার জো নেই। যে রাক্কোস ভাই আছে আমার।

কুম্‌কুম কী নন্দদা?

সে দেখবি অখন, যখন করব।

নন্দ বাহির হইয়া গেল। তখনো তাহার স্নান হয় নাই। তাহার কাপড় জামা দেহ, সবেরই কী বিচিত্র বর্ণান্তর ঘটিয়াছে, দেখিলে চিনিবার জো নাই।

৬

বেলা একটা নাগাৎ মুকুলের আই-সি-এস্ পিতাঠাকুর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আসিবার কথা ছিল বিকালে সাড়ে পাঁচটার গাড়ীতে। কিন্তু তিনি নিজের মোটর হাঁকাইয়া চলিয়া আসিয়াছেন, কোম্পানীর সাড়ে পাঁচটার গাড়ীর পরোয়া করেন নাই। নিখুঁত বিলাতী বেশ ও পাইপ সমেত এই সাহেবটি যে তাহার আপন পিসেমহাশয় হন, ইহা ভাবিতে আনন্দে ও গর্ব্বে নন্দর হৃৎকম্প হইল।

এক সময়ে পিসিমাসহ পিসেমহাশয়কে একাকী পাইয়া নন্দ অনেক ইতস্তত: করিয়া একটা প্রণামই করিয়া ফেলিল। পিসে-মহাশয় হইলে সাহেবকে গুড্‌মর্নিং বলা যায় কিনা, একথাটা কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিয়া রাখা হয় নাই।

মিষ্টার মুখার্জী জিজ্ঞাসা করিলেন—ছেলেটি কে?

সুমিত্রা বলিলেন, ওযে আমাদের নন্দ গো, দাদার বড় ছেলে। দেখ, ওকে আমি এবার কোলকাতায় নিয়ে যাব বাপু। আমার মুকুলকে ও বড্ড ভালবাসে।

নন্দ মনে মনে বলিল—সকলের চেয়ে ভালবাসি তোমাকে, পিসিমা।

মুখার্জী বলিলেন—মুকুল কোথায় গেল? রোদে রোদে ঘুরতে বেরিয়েছে বুঝি?

না গো না, মুকুল খেয়ে দেয়ে ওপোরে ঘুমুচ্ছে। তোমার রুটীন ভঙ্গ হয় নি।

বেশ। তারপর? আজ রঙ্ খেলা হয়েছে তো? এই যে বাঃ, তোমার মাথায় যে এখনো—

ঐ ছোট বৌদিটা। আবার লাগিয়ে দিলে। তা, আমি তো আর সায়েব নই। মেমও হই নি। আমি দেশের মেয়ে, দেশে এলে রথ দোল চড়ক্ আমাদের সবই আছে।

সাহেব পাইপে লম্বা টান দিয়া বলিলেন—তা বেশ, তুমি তোমার রথ দোল কর, কিন্তু ছেলেটাকে?—সেটাকেও ভূত সাজিয়েছ তো?

প্রচুর সাহস সঞ্চয় করিয়া নন্দ বলিল—না পিসেমশাই, মুকুলকে আমি—

পিসেমহাশয় নন্দর দিকে ফিরিলেন।

নন্দর সঞ্চিত সাহস ফুরাইয়া গেল। কথাটা শেষ করিবার মতো এককণাও আর অবশিষ্ট রহিল না।

সুমিত্রা বলিলেন—ও বাবা, সে সায়েবের ছেলে ঠিক সায়েবই আছে। ফাগ দেখলে বলে স্লাষ্টি, ক্যাডাভারাস। সে খেলবে দোল!

ছাট্‌স্ রাইট্। তবে ক্যাডাভারাস বলা ঠিক হয় নি তার। ও সেন্‌সে কথাটা খাটে না। হ্যাঁ দেখ, আমাদের সেই চৌধুরীকে মনে আছে বোধহয় তোমার? শুনলুম সে এখানকার এস্‌-ডি-ও হয়ে এসেছে। তাই জন্যেই গাড়ীটা নিয়ে চলে এলুম। চল তার ওখান থেকে ঘুরে আসা যাক। নাও কাপড়টা বদলে নাও।

সুমিত্রা বলিলেন—কী যে বল তুমি। এই এলে, দুদণ্ড বসা নেই, এসেই অমনি হুট করে বৌ নিয়ে মোটর চড়ে বেড়াতে যাবে। এতেই আমাকে সবাই মেমসায়েব মেমসায়েব কোরে যা করে।

—তবে থাকো তুমি। আমি মুকুলকে নিয়ে ঘুরে আসি।

তা যাও। তোমরা সায়েব লোক, তোমরা যাও।

৭

স্বামীকে লইয়া সুমিত্রা উপরে আসিলেন। চুম্বকের আকর্ষণে লোহার মতো নন্দ পিছনে পিছনে আসিল। নিজের ঘরের সামনে আসিয়া সুমিত্রা দরজা ঠেলিলেন। দরজা খুলিয়া গেল, কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিতে ইঁহারা ভুলিয়া গেলেন।

ঘরের ভিতর অপর প্রান্তে বড় আলমারি-সংলগ্ন আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া মুকুল। তাহার গায়ে সকালের সেই আদ্দির পাঞ্জাবি। তাহার মাথা, মুখ, পাঞ্জাবি, কাপড় লালে লাল। দুই হাতের মুঠিতে আবীরের প্রলেপ। পাশে মেজের উপর একটা গ্লাক্‌সোর টিন।

আয়নার ভিতর আপন রঙীন ও অপরূপ রূপ সে পরম পরিতৃপ্তির সহিত দেখিতেছে মুগ্ধ হইয়া। গালের উপরে কোথায় বোধহয় রঙের কিছু অভাব দেখিল, সেইখানে ডান হাতের ফাগটুকু লাগাইতে গেল। গালে লাগিল অল্পই, অধিকাংশ ঝরিয়া পড়িল জামার উপর। মুকুল নীচু হইয়া গ্লাক্‌সোর কৌটার ভিতর হাত ঢুকাইল। সোজা হইয়া দাঁড়াইতে কেমন করিয়া তাহার দৃষ্টি আসিল দরজার দিকে।

মুহূর্ত্ত দুই বিমূঢ় হইয়া থাকিয়া মুকুল বলিয়া ফেলিল—আমি—আমি না বাবা—নন্দদা—। কিন্তু কথা শেষ করিতে পারিল না সে, পিতার ক্রোধ কল্পনা করিয়া ভ্যাঁক্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

মিষ্টার মুখার্জ্জীর মুখে কথা নাই এবং মিথ্যা অপবাদের এই বিনা মেঘে বজ্রাঘাত নন্দকে বজ্রাহতের মতো বিহ্বল করিয়া রাখিল। ইহারা কিছুই বুঝিতে পারিল না, স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কেবল অন্তর্যামী মাতৃহৃদয় দিয়া সুমিত্রা সকল কথা বুঝিলেন।

শুধু বুঝিলেন না, ছেলের এই নূতন সৌন্দর্য্য দুই চোখ ভরিয়া দেখিতে লাগিলেন। মনে হইল ইহাই যেন তিনি দেখিতে চাহিতেছিলেন। সকাল হইতে রঙ ও কতো দেখিলেন, রঙ্ মাখা শিশু, বালক, কিশোরও কম দেখিলেন না, কিন্তু রঙের খেলা তো এতক্ষণ সত্য হয় নাই, হইল শুধু এখনই।

কিন্তু সকল মানুষের দৃষ্টি সমান নয় এবং শরীর-বিজ্ঞান যাহাই বলুক, হৃদয় নামক বস্তুটি ভিন্ন ভিন্ন আধারে বিভিন্ন-রূপী। মিষ্টার মুখার্জ্জী গম্ভীর স্বরে ডাকিলেন—মুকুল।

ক্ষিপ্রপদে সুমিত্রা আগাইয়া গেলেন ও আঁচল দিয়া মুকুলের চোখ মুছাইয়া তাহাকে কোলের ভিতর টানিয়া লইয়া বলিলেন, দেখেছ গা? ফাগ মাখলে কী চমৎকার মানায় দেখেছ আমাদের মুকুলকে?

আদালতের উপর আদালত আছে। উপর আদালতের ডিক্রীর পর নীচু আদালতের বিচার করিতে যাওয়া শুধু ধৃষ্টতা নয়, বিড়ম্বনা। মুখার্জ্জি সাহেব বলিলেন—র‍্যাদার নাইস্। বলিয়া মুখখানি প্রসন্ন করিবার চেষ্টা পাইলেন।

সুমিত্রা বলিলেন, আমি কোথায় সকাল থেকে মনে করে রেখেছি যে মুকুল ঘুমুলে চুপি চুপি গিয়ে ওর মাথায় আচ্ছা করে ফাগ মাখিয়ে দিয়ে আসব। ওমা! তুই বুঝি আমার মনের কথা জানতে পেরেছিলি? কী দুষ্টু ছেলে গো!

মায়ের আঁচলে মুখ লুকাইয়া মুকুল মৃদু কণ্ঠে উত্তর দিল—হুঁ, পেরেছিলুমই তো।

গান

শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য

যে গান বাজে কণ্ঠে মম
সে নহে তব যোগ্যতম
জানি হে প্রিয় জানি'
তাহারি ক্ষীণ সুরটি ধরি
বীণাটি মম মুখর করি
বিফল তাহা মানি॥

তবুও প্রিয় প্রদীপ জ্বালি'
ব্যথার দীপে অর্ঘ ডালি
সাজায়ে রাখি চিত্ত ভরি অশ্রু মাল্যখানি।
যদি গো কভু দুঃখ রাতে
স্মরণে জাগি' ঘুমের সাথে
ব্যথাটি মম জাগায়ে তুলে একটি কুসুম দানি'।

দুর্ভিক্ষ ও যুদ্ধের চাপে বাংলার নরনারী

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ

ঈশ্বরের সৃষ্টিমাহাত্ম্যকে বিদ্রূপ করিয়া মহাযুদ্ধ ষষ্ঠবৎসরের দিকে অগ্রসর হইল। নিঃস্বার্থ দুঃখ সহিবার কীর্ত্তি আমাদের হয়তো শ্বেতপত্রে স্থান পাইবে, কিন্তু যে অদৃষ্ট-পরিচয় গত তিন বৎসর ধরিয়া পাইতেছি তাহা আর বছর দুয়েক চলিলে সে গৌরবভোগ করা সশরীরে সম্ভব হইবে না।

অনেকে বলিতে পারেন—দেশে টাকা বাড়িয়াছে, চাকুরী বাড়িয়াছে, চলমান বিংশ শতাব্দীর প্রাণস্পন্দনের সহিত মুখোমুখী পরিচয় ঘটিতেছে, তবে আর দুঃখ করিবার কারণ কোথায়? বাহির হইতে বহু বিজ্ঞ ব্যক্তিও বলিবেন—গ্রীসে রাজাপ্রজা একটুকুরো রুটির প্রত্যাশায় রাস্তায় সার বাঁধিয়া দাঁড়াইয়াছে, জার্ম্মানদের বিজয় ও অপসরণের মধ্যে রাশিয়ার জনসাধারণ কি অমানুষিক কষ্টই না সহ্য করিল, আর যুদ্ধের জন্য সামান্য সৌখীন সামগ্রী বিদেশ হইতে আসিল না বলিয়া যথেষ্ট টাকা এবং যথেষ্ট চাকুরী ও যুদ্ধভাতা পাইয়াও বাংলার অধিবাসী যে সুখী হইতে পারিল না ইহা তাহাদের পক্ষে সত্যই লজ্জার কথা। বাংলাদেশে বাস করিয়া এবং ঐতিহাসিক উনিশশো তেতাল্লিশ সাল পার হইয়া আমরা নিজেদের সম্বন্ধে এতখানি অবিচার করিতে পারি না, বরং যে সকল আপাত-মধুর সুযোগ সুবিধা যুদ্ধের দৌলতে লাভ করিয়াছি তাহারা আমাদের পক্ষে কতখানি বরণীয় ও কল্যাণপ্রদ সেকথা চিন্তা করিয়া দেখিলে হতাশ হইয়া যাই। মন্বন্তর দেশের শতকরা আশীজন কৃষিজীবি ও কৃষির উপর নির্ভরশীল অধিবাসীর সর্ব্বনাশ করিয়াছে, চাকুরী বা যুদ্ধভাতার সুবিধা লাভ করিয়াছে যাহারা তাহারা অধিকাংশই ভদ্র এবং শিক্ষিত অথবা শিল্পশ্রমিক শ্রেণীভুক্ত। সত্য বটে, দেশের একশত আটাত্তর কোটি টাকার নোটের স্থানে প্রায় আটশত ষাট কোটি টাকার নোট ছাপান হইয়াছে কিন্তু এই নোটগুলিও যাহারা পকেটস্থ করিয়াছেন তাঁহারা দেশের জনসাধারণ নহেন এবং তাঁহাদের সংখ্যা আঙ্গুল দিয়া গোনা যায়। ভাগ্যবান ব্যবসাদার বা জোগানদার এসব ব্যক্তি কোন্ সৌভাগ্যক্রমে এই যুদ্ধের মুখ দেখিয়াছিল জানি না, হয়তো এই যুদ্ধের দৌলতে তাহাদের অধস্তন চতুর্দ্দশ পুরুষের গতি হইয়া গেল, কিন্তু মারাত্মক বর্দ্ধিতব্যয়ের হাত হইতে চাকুরী ইত্যাদি পাইয়া যাহারা উপস্থিত কোনক্রমে বাঁচিবার চেষ্টা করিতেছে তাহারা ভবিষ্যতে কেমন করিয়া জীবনধারণ করিবে তাহা বাস্তবিকই ভাবিবার কথা। অন্নের সন্ধানে আজ বহু নারীর অবগুণ্ঠন ঘুচিয়া গিয়াছে, শিক্ষিতা অনেক মহিলা যুদ্ধ সম্পর্কিত চাকুরী লইয়াছেন, যুদ্ধ যেদিন শেষ হইবে সেদিন তাঁহাদের অফিসগুলি উঠিয়া গেলেও অর্থের প্রয়োজন এবং অর্থোপার্জ্জনের নেশা তাঁহাদিগকে ছাড়িবে কি? স্থায়ী অফিসগুলিতে এখনই স্বাভাবিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত বহুলোক যুদ্ধের জন্য স্থান পাইয়াছে, যুদ্ধান্তে ইহারাই স্বস্থানে বহাল থাকিবে কিনা সন্দেহ, বেকার কর্ম্মপ্রার্থিনীদের সেদিন চাকুরী সংগ্রহ করা অত্যন্ত কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে।

এই সর্ব্বব্যাপী স্থানচ্যুতির সমস্যাই এখন যুদ্ধের শেষপর্য্যায়ে বাংলার সর্ব্বাপেক্ষা বড় সমস্যা এবং ইহার সহিত আমাদের সমাজজীবনেরও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। ফিউডাল যুগের শ্রেণীগত নিশ্চেষ্টতা আজও এদেশে শিকড় গাড়িয়া আছে, লর্ড কর্ণওয়ালিশের ভুলের মাশুল দিতে এই বিংশ শতাব্দীর সঞ্চারমান যন্ত্রসভ্যতার প্রাণস্পন্দন বাংলার বুকে এখনও শোনা যায় নাই বলিলেই হয়। বন্যা আসিলে প্রস্তুত থাকার একটা বিশেষ মূল্য আছে, কিন্তু নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রব জীবনে যাহারা অভ্যস্ত এবং জীবিকাসংস্থানের সংকীর্ণ গণ্ডীতে যাহারা নিজেদের নিঃস্ব ও অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাহারা বানের মুখে পড়িলে নিরুপায়ের লাঞ্ছনার আর শেষ থাকে না। সাতসমুদ্র পারের গতবার যুদ্ধের সময় আমাদের নাবালকত্বের সুবিধা লইয়া ব্রিটিশ রাজশক্তি ভারতবর্ষকে একান্ত আপনজন রূপেই পাশে পাইয়াছিল, সেদিন স্থান-কাল-পাত্রের বিভেদ ভুলিয়া আমরা লাভের লোভ সম্বরণ করিতে পারি নাই। সেই যুদ্ধ ঈশ্বরের ইচ্ছায় ভালোয় ভালোয় শেষ হইয়াছিল, কিন্তু আমাদের আলোয় আলোয় বিদায় পুরস্কার লাভ ঘটে নাই। তারপর বহু দুঃখের ভিতর দিয়া এদেশ জগতের আসরে আপনার আসন প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়া চলিয়াছে। নিতান্ত নিজের পায়ে দাঁড়াইবার প্রভূত অসুবিধা স্কন্ধে বহিয়া আমরা যাহা কিছু করিয়াছি তাহার মূল্য দিতে আমাদের ঘরের পানে তাকানো সম্ভব হয় নাই। অপেক্ষাকৃত উন্নত জনমণ্ডলী যেমন একদিকে অগ্রসরণের মোহে ভুলিয়া দেশকে তিমিরান্ধকার হইতে মুক্তি দিবার প্রয়াসসাধনে সুযোগ পান নাই, অন্যদিকে তেমনি উদাসীন সরকারের নিরুৎসাহে জাতির অর্থ-নৈতিক মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। পশুশৌর্য্য আজ পৃথিবীর পুরাতন আর্য্যঅভিযানের প্রেরণা নবজাগ্রত জাতিদিগের মনে প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়াছে, দুর্ভাগ্যক্রমে উপনিবেশের দাবী সভ্যজাতির দাবী বলিয়া স্বীকৃত হইবার উজ্জ্বল যুগসন্ধিক্ষণেও আমরা নিজবাসভূমেই পরবাসী থাকিয়া গেলাম। ফল হইল এই যে আঘাত সংঘাতের প্রথম স্পর্শেই আমাদের পথচলা শেষ হইয়া গেল। ভূমিব্যবস্থার জগদ্দল পাষাণ বুকে বহিয়া বাঙ্গালী একদিন কুক্ষণে মাটিকে মা বলিয়া ডাকিয়াছিল, আজ শতাব্দীর রসনিঃসরণের ক্লান্তিতে সে মাটি মা হইবার যোগ্যতা হারাইয়াছে। সামাজিক বিধিনিষেধের বেড়াজাল পাতা আছে সারা দেশ জুড়িয়া, ধর্ম্মপ্রাণতার নেশায় বস্তুতান্ত্রিক জগতের জীব হইয়াও আমরা সত্যযুগের অধিবাসী হইবার অহঙ্কার করিয়া আসিয়াছি। এতদিন জিনিষপত্র আসা যাওয়ার ব্যবস্থা সহজ ছিল বলিয়া অতি সরল জীবনযাপন প্রায় নিঃস্ব আমাদের পক্ষেও অসম্ভব হইয়া উঠে নাই। আয় যতই কম হউক, ব্যয়ও অত্যন্ত কম থাকায় মৃত্যুদেবতাকে সামান্য দক্ষিণা দিয়াই আমরা এতদিন রেহাই পাইয়াছি। সহরে শাসনব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে, সারা দেশের নামে নূতন নূতন আইনকানুনও সৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু সত্যকার দেশ মাঠে, হরিসভায় আর শয়নঘরে কাটাইয়া আসিয়াছে চিরকাল।

ক্রমে একদিন স্বাস্থ্যহীনতার অজুহাতে ও অর্থনৈতিক বনিয়াদ আহত হওয়ায় সহরে লোকবৃদ্ধি হইয়াছে, সহরের সংখ্যাও বাড়িয়াছে যথেষ্ট পরিমাণে। গ্রাম হইতে সহরে আসিয়া বাঙ্গালী ভিড় বাড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের যে উৎসাহ তাহাদের মধ্যে সুরু হয়, সমাজবিধানের অপনীতির দরুণ ব্যবসায়ীদের অনেকেই অন্ততঃ ভয়ে ভক্তি পাইবার জন্য ব্যবসা গুটাইয়া বিত্তবিভব জমিতে আটকাইয়া ফেলায় সে উৎসাহ অল্পদিনেই ম্লান হইয়া পড়ে। এই জমিদারীবিস্তৃতির মোহ একদিক দিয়া বাংলার সম্ভাব্যশিল্পবিপ্লবকে অঙ্কুরেই নষ্ট করিয়া দিয়াছে। অর্থশালীদের অর্থ যদি জমিতে আটকাইয়া না যাইত তাহা হইলে সেই অর্থে নূতন অর্থ আমদানী করিয়া দেশের বর্ত্তমান দুরবস্থাকে সবদিক দিয়া ঠেকাইয়া রাখা সম্ভব হইত। শিক্ষার প্রসার হয় নাই অর্থের অভাবে, শাসনব্যবস্থার সংস্কার হয় নাই জনসাধারণ অশিক্ষিত থাকিয়া গিয়াছে বলিয়া। আমরা আইনসভায় প্রতিনিধি পাঠাইয়াছি সত্য, কিন্তু সেই প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের বেলায় তাঁহার কৃতিত্ব যাচাই

করিয়া দেখিবার যোগ্যতা আমাদের ছিল না। সহস্র দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া আমাদের নামে যাঁহারা আমাদের দেশ চালাইয়াছেন, তাঁহারা আর যাহাই করিয়া থাকুন, এই দেশবাসীর মুখের পানে নিঃস্বার্থভাবে চাহেন নাই বলিয়াই আজ বাংলার এমন শোচনীয় অবস্থা। আত্মসম্মানহানির আশঙ্কায় আত্মহত্যা করিবার দৃষ্টান্তও বিংশশতাব্দীর ইতিহাসে অপ্রতুল নয়, কিন্তু যে দেশ আমাদের বিত্ত-আহরণ দূরে থাক, শুধু মাথা গুঁজিবার ঠাঁই দিতেই আইন করিয়া অস্বীকার করিয়াছে, তাহাদেরই একজনকে মাথায় তুলিয়া রাখিবার মধ্যে সত্যকার লজ্জা যে কোনখানে তাহাও আমাদের অধিকাংশ দেশবাসীই বুঝিতে পারিল না।

যুদ্ধ এশিয়ার পুর্ব্বপ্রান্তে সুরু হইবার আগে বাংলার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অবহিত হইবার যথেষ্ট সময় ছিল। সেই সময়—ইচ্ছায় হউক বা অকর্ম্মণ্যতার দরুণই হউক—নষ্ট হইতে দেওয়া হইয়াছে। যুদ্ধ বাধিলে একদিকে যন্ত্রপাতির আমদানী যেমন বন্ধ হইয়া গেল, অন্যদিকে তেমনি বাংলাদেশের অবশ্য প্রয়োজনীয় ঘাটতি খাদ্যদ্রব্যাদি বাহির হইতে আনাও সম্ভব রহিল না। পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত না থাকার জন্য অবস্থার গুরুত্ব হঠাৎ অধিকাংশ দেশবাসী হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই, তাই ক্রমবর্দ্ধমান মূল্যবৃদ্ধির প্রথম অবস্থাকেই চরম ভাবিয়া লাভের লোভে ঘরের সঞ্চয় পরের হাতে তুলিয়া দিয়া নিজেদের ভবিষ্যত তাহারা অন্ধকার করিয়া ফেলিল। জাপানী যুদ্ধের প্রথম বৎসর কাটিয়াছিল জোড়াতাড়া দিয়া। তারপর যুদ্ধের গতি ঘোরালো হইবার সঙ্গে সঙ্গে এদেশের পণ্যমূল্য-রেখা যখন বাড়িয়া চলিতে লাগিল অথচ জমিদারী কায়েমী রাখিবার স্বার্থে ছোটবড় সকলেই নিজের বাঁচিবার নামে প্রভূত আয়োজন ও অপব্যয়ের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন, দেশের শতকরা নব্বই জনের অবস্থা তখন হইয়া উঠিল অসহায়। তাছাড়া সরকারী দৃষ্টিভঙ্গি ভবিষ্যতের শ্বেতবাণিজ্য অব্যাহত রাখিবার উপর নিবদ্ধ হওয়ায় কাঁচামালের অভাবেও দেশে শিল্পপ্রসার ব্যাহত হইয়াছে এবং ফলে অন্নসংগ্রহ যাহারা নানাভাবে নিজের চেষ্টায় করিতে পারিত তাহারাও জনতার ভিড়ে উপার্জ্জনের পথ খুঁজিয়া পায় নাই। এতবড় দেশে প্রয়োজনের তাগিদে যথেষ্ট শিল্পপ্রসার হওয়া উচিত ছিল, এই যুদ্ধে সরকারী ঔদার্য্যের ফাঁকে আমরা হয়তো সর্ব্ববিষয়ে স্বাবলম্বী হইতে পারিতাম, কিন্তু শ্রমিক ও কাঁচামালের অভাবে যুদ্ধ প্রচেষ্টার ব্যাঘাত ঘটিবার ছল করিয়া কাঁচামাল নিয়ন্ত্রণ করায় শিল্পাদি আশানুরূপ গড়িয়া উঠিতে পারে নাই; অথচ সরকারী প্রয়োজন মিটাইয়াও অসংখ্য লোক আজও বেকার জীবন যাপন করিতেছে। বাঁচিবার সামান্য উপায় থাকিলেও বাংলায় সহস্র সহস্র হতভাগ্য অবশ্যই চুপ করিয়া অনাহারে মৃত্যুবরণ করিত না। এতদিন পরে সাংসারিক প্রয়োজনের জন্য সামান্য পরিমাণ পিতল বাজারে ছাড়িবার ব্যবস্থা হইয়াছে, আয়রণ ও ষ্টীল নিয়ন্ত্রণ চলিতেছে মহাসমারোহে। স্বার্থপরতার নির্লজ্জ অভিনয়ে দেশী ও বিদেশী যাহারা সারাদেশকে বাঁচিবার শ্রেষ্ঠ সুযোগ গ্রহণে বঞ্চিত করিলেন তাঁহাদের দোষ বা বিচারের কথা তোলা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু দৈহিক অস্বাস্থ্যহীনতার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের ত্রুটির জন্য যে মনের অধঃপতনও সারাদেশে সংক্রামিত হইয়াছে একথা অস্বীকার করা যায় না। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যাহারা কৃষির উপর নির্ভর করিয়া থাকিত তাহাদের অবস্থাই আজ সবার চেয়ে শোচনীয়। জমি বিক্রী হইয়া গিয়াছে, রোগে শোকে তাহারা অনেকেই নিঃসম্বল, কেহ কেহ সরকারী বেসরকারী দানে ধন্য হইবার জন্য সহরের ফুটপাথ আশ্রয় করিয়া মৃত্যুবরণ করিয়াছে, কেহবা ভাগ্যক্রমে স্থান পাইয়াছে সরকারী অতিথিশালায়। যাহারা গ্রামে অতি কষ্টে বাঁচিয়াছিল, সাময়িক অসুবিধার জন্য জমির নূতন মালিক দু তিনগুণ মজুরী দিয়া হয়তো তাহাদের খাটাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু মজুরীর এই হার তো চিরদিন থাকিবে না। জমির সম্পূর্ণ ফসল পাইয়াও যাহাদের চলিত না, ভাগে জমি চাষ করিয়া অর্দ্ধেক ফসলে কি করিয়া তাহারা গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিবে? আমাদের বাংলা-দেশের অধিকাংশ কৃষিজীবীরই বর্ত্তমানে এই অবস্থা। জমিহীন কৃষিজীবিগণকে হয় জমি ফিরাইয়া দিতে হইবে, আর না হইলে তাহাদের জন্য অন্য উপজীবিকার ব্যবস্থা করিতে হইবে। স্যার জওলাপ্রসাদ শ্রীবাস্তব ব্যক্তিগতভাবে কৃষকদিগকে কৃষির প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কিনিবার টাকা ধার দিবার ও যুদ্ধকালে বিক্রীত জমি সামান্য কিস্তিতে ঋণ শোধের দ্বারা ফিরাইয়া দিবার কথা বলিয়াছেন, কিন্তু ইহা তো সরকারী আইন নয়। জমি-হারানো কৃষকদিগকে শিল্প-শ্রমিকরূপে দেখিবার কল্পনায় যাহারা বিভোর, তাঁহারাও কি নিশ্চিতরূপে বলিতে পারেন—দুই তিন কোটি লোকের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা বাংলার শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিতে সম্ভব হইবে। নূতন শিল্পপ্রতিষ্ঠা এবং পুরাতন শিল্প প্রসারের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করিয়া সরকার শুধু শ্বেতস্বার্থসংরক্ষণের সুবিধা করিয়া দেন নাই, ভাগ্যবিড়ম্বনায় যাহারা সাতপুরুষের সাধের ক্ষেতখামারের মায়া কাটাইয়া বাধ্য হইয়া অন্যত্র ঘর বাঁধিতে চলিয়াছে, তাহাদের বাঁচিবার পথও জানিয়া শুনিয়া রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। দুটি মহাযুদ্ধের সুযোগে সাম্রাজ্যভুক্ত অষ্ট্রেলিয়া, সাউথএ্যাফ্রিকা, নিউজিল্যাণ্ড, কানাডা প্রভৃতি দেশ প্রায় প্রত্যেক বিষয়েই স্বাবলম্বী হইয়া উঠিয়াছে, অথচ আমাদের দেশে সুযোগ ও সুবিধা যথেষ্টপরিমাণ থাকা সত্ত্বেও শিল্পপ্রসার মোটেই আশাপ্রদ হইল না। শিল্পের প্রসার যদি হইত তাহা হইলে এই সব কৃষকদের একটা নিশ্চিত আশ্রয় আছে মনে করিতে পারিতাম, কিন্তু এখন যাহারা সাধারণের দয়ায় বাঁচিয়া আছে, কিছুদিন পরে যুদ্ধ থামিলে তাহারা কাহার উপর নির্ভর করিবে কে জানে!

অথচ এই কৃষকদের মধ্যেই সবচেয়ে অধিক পরিমাণ সামাজিক বিপ্লব ঘটিয়া গিয়াছে। মন্বন্তরের চাপে ইহাদের অনেকে বাধ্য হইয়া সহরে আসিয়াছিল, অন্নের সন্ধানে অনিশ্চিৎ জীবনযাত্রার আবর্ত্তে পড়িয়া তাহাদের ন্যায়, নীতি ও মর্য্যাদাবোধ ভাসিয়া গিয়াছে। যাহারা ক্যাম্পে নীত হইয়াছে, তাহারা দীর্ঘকাল আত্মীয়স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাঁচিতে বাধ্য হইবে। গ্রাম হইতে আসিবার সময় পিতা, ভ্রাতা বা স্বামীর সহিত যে নারী সহরে পা দিয়াছিল, সরকারী অতি-ব্যস্ততায় হয়তো তাহাকে একাকিনী ক্যাম্পে আশ্রয় লইতে হইয়াছে এবং তাহাকে ফিরিতে হইবে একেলাই। তাহার পক্ষে এই অবস্থায় পদস্খলন হওয়া যেমন সম্ভব, ফিরিয়া গেলে অবিশ্বাসের বোঝা বহিবার শক্তি তাহার না থাকাও তেমনি স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে এমনি একদল নরনারী সহস্র বৎসরের সমাজনীতিকে অস্বীকার করিয়া পথে নামিয়া আসিলে তাহারা তাহাদের পরিচিত আরও দশজনকে প্রভাবিত করিয়া দলে আনিতে চেষ্টা করিবে। সহরের বৈদ্যুতিক আলোর চোখ-ঝল্সানো ঔজ্জ্বল্যের আড়ালে যে পাপপ্রবৃত্তি লুকাইয়া আছে তাহাও বহু অসহায় তরুণ-তরুণীকে গ্রাস করিয়াছে সন্দেহ নাই। একদল মানুষ-বেশী বিচিত্র জীব এই সব সর্ব্বহারাদের ধ্বংস করিয়া নিজেদের পকেট ভর্ত্তি করিবে। কিন্তু দুর্ভিক্ষ যখন হইয়াছে তখন দুর্ভাগা যাহারা অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় সম্পূর্ণ অনিচ্ছাসত্ত্বেও অন্ধকারে হারাইয়া গেল, তাহা-দের অপমৃত্যু দুর্ভিক্ষের অনিবার্য্য মাশুল বলিয়া ধরিয়া লওয়া ছাড়া আর উপায় নাই। সমাজের এই আসন্ন ভাঙ্গনের মুখে কঠোর হস্তে উদার দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া সরকারী আইন যদি দাঁড়াইতে পারে এবং পুরাতন জীবনযাপনের সুযোগগুলি যদি গ্রামছাড়া গ্রামবাসীদের হাতের কাছে আনিয়া দিতে পারে তাহা হইলে হয়তো গ্রামের সমাজ এবারের মত বাঁচিয়া যাইবে। এ ব্যবস্থা সম্ভব না হইলে একমাত্র উপায় শিল্পপ্রসার। শিল্পশ্রমিকদের জীবনযাত্রার ইতিহাসে নৈতিক বাঁধনের

কঠোরতা বা গ্রামের রক্ষণশীল সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি নাই, কাজেই যদি এইসব সমাজবহির্ভূত নরনারী শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিতে আশ্রয় পায় তাহা হইলে শিল্পজগতে নূতন সূর্য্যের উদয়ে জগতের উন্নতিশীল অন্যান্য জাতির পাশে দাঁড়াইবার যোগ্যতা অর্জ্জনে অন্য সব ক্ষতিই আমাদের সহিয়া যাইবে। সংস্কারগত এই স্খলনটুকু এমন কিছু মারাত্মক ব্যাপার নয় এবং পরিচালনার ভার যোগ্যহস্তে পড়িলে এ চাঞ্চল্য স্থির হইতে বেশীদিন সময়ও লাগিবে না।

কৃষকদের কথা এই প্রবন্ধে দীর্ঘ করিয়া বলা হইল এইজন্য, যে ইহারাই বর্ত্তমান মন্বন্তরে সবচেয়ে অধিক পরিমাণ আঘাত পাইয়াছে। সস্তার দিনেও তাহারা যাপন করিত দরিদ্র জীবন, তখনই কোন অসুখ বা অন্য আকস্মিক ব্যয়ের পর তাহাদের উপবাস দিতে হইত, এবার ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের উপর কতকটা সরকারী নির্ব্বুদ্ধিতার ফলে এবং কতকটা নিজেদের লোভের জন্য তাহারা দলে দলে মৃত্যুবরণ করিয়াছে। দুর্ভিক্ষ হইয়াছে যুদ্ধের জন্য, অথচ ভারতসরকার যুদ্ধের প্রয়োজনে যেমন মুক্তহস্তে ব্যয় করিতেছেন, এই দুর্ভিক্ষ দূর করিতে তাহার সামান্য অংশও করেন নাই। সম্মিলিত জাতিসমূহের পুনর্গঠন কমিটি তো প্রথমে ফতোয়া জারি করিয়াছিলেন—দুর্ভিক্ষপীড়িত ভারতবর্ষকে তাঁহারা কোন সাহায্যই করিতে পারিবেন না, কারণ এই দুর্ভিক্ষের সহিত যুদ্ধের যোগ নাই, ইহা ঘটিয়াছে প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে। মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদের প্রস্তাব গ্রহণের পর আমাদের ভরসা হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু প্রাপ্তির আশায় বার বার ঠকিয়াছি বলিয়া পুনর্গঠনের এতবড় সুযোগের সম্ভাবনা থাকা সত্বেও আমাদের মুখে হাসি ফুটিতেছে না। এদিকে অবস্থা এমন শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে যে আশু সাহায্য না পাইলে বাংলাদেশের শতকরা আশীজনের পক্ষে বাঁচিয়া থাকাও দুষ্কর হইবে। সৈন্যবিভাগে যাহারা নিযুক্ত, তাহাদের জন্য সামরিক পুনর্গঠন তহবিল সৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু যাহারা জমি হারাইয়া কৃষক বলিয়া পরিচিত হইবার অধিকারীও রহিল না, তাহাদের জন্য কার্য্যকরী কোন ব্যবস্থাই যুদ্ধোত্তর পুনঃসংগঠন পরিকল্পনায় স্থান পায় নাই। কৃষি-সম্পর্কেও যে সকল কথা পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে তাহাদের অধিকাংশই বাগাড়ম্বর মাত্র, কাজের বেলায় সেগুলির মূল্য কতখানি পাওয়া যাইবে তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না। পতঙ্গনিবারণ, খালখনন, উন্নততর রাসায়নিক সারের ব্যবস্থা, কৃষিজীবিদের অবসরের উপজীবিকা—এসব কথা আমরা যুদ্ধের আগেও শুনিয়াছি। মিঃ জন সারজেন্টের শিক্ষা পরিকল্পনা ব্যাপক এবং সত্যই কল্যাণপ্রদ, কিন্তু ব্যয়বাহুল্যের অজুহাতে ইহা নাকচ হইয়া যাইবার সম্ভাবনাই বড়লাটের কলিকাতা বক্তৃতায় প্রকাশ পাইয়াছে। অর্থের অজস্রতা পাছে দ্রব্যাদি বিনিময়ে অসুবিধার সৃষ্টি করে এইজন্য মুদ্রা-সম্প্রসারণ বন্ধের অজুহাতে লটারির নাম করিয়া ভারতসরকার জন-সাধারণের টাকা সরকারী কোষাগারে আটকাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই পদ্ধতির উচ্ছ্বসিত প্রশংসাও আমরা বিদেশের বহু পত্রিকা ও বিজ্ঞদের মুখে শুনিয়াছি। অবশ্য ভয়াবহ মুদ্রাস্ফীতি বন্ধ করিবার যে কোন প্রচেষ্টাকেই আমরা সাধুবাদ দিতে পারি, কিন্তু এমনি জুয়া-খেলার আশ্রয় না লইয়া শিল্পাদিগঠনে উৎসাহ দিলে এবং শিল্পপ্রচেষ্টা সম্ভব করিতে কাঁচামালের জোগানের নিয়মিত ব্যবস্থা করিলেও তো বাড়তি টাকায় জাতির স্থায়ী কল্যাণ হইতে পারিত। মুদ্রাবৃদ্ধির সহিত পণ্যবৃদ্ধি তাল রাখিয়া চলিলে তাহাকে মুদ্রাস্ফীতি বলে না, বরং ঘরের টাকায় পরের টাকা ঘরে আনিবার পথ খুঁজিয়া পাইলে দেশের আর্থিক বনিয়াদ সুদৃঢ় হইয়া উঠে। বিপ্লবের পরে রাশিয়ায় কাগজী মুদ্রার যথেষ্ট সম্প্রসারণ ঘটিয়াছিল কিন্তু তাহাতে তো সে দেশের ক্ষতি না হইয়া লাভের পথই খুলিয়া গিয়াছিল। আসল কথা জমিদারী মনোভাব একটু কমাইলেই এই মুদ্রাসম্প্রসারণ দ্বারাও দেশের কল্যাণ করা সম্ভব হইতে পারে।

যুদ্ধে যাহারা প্রত্যক্ষভাবে যোগ দেয় নাই এমন অনেক দেশবাসী যুদ্ধের পরে বেকার হইয়া যাইবে—অথচ তাহাদের স্থান হইতে পারে এমন নূতন শিল্প গঠনের ব্যাপক ব্যবস্থার কথা পরিকল্পনায় আশানুরূপ স্থান পায় নাই। নবগঠিত জাতীয় শিল্পাদি দাঁড় করাইতে যে রাজবৃত্তি এবং সংরক্ষণ সুবিধাদানের আবশ্যকতা আছে তাহাও উক্ত পরিকল্পনায় জোরের সহিত বলা হয় নাই। শুল্ক বা শিল্পের অবস্থা লইয়া বাদানুবাদ এদেশে নূতন নয় এবং তাহাতে দেশের কল্যাণ হইলেও এখন প্রয়োজন অধিকতর পরিমাণ নূতন ও বৃহৎ শিল্পগঠনের। মিঃ সারজেন্টের শিক্ষা পরিকল্পনায় বৃত্তিশিক্ষার যে উল্লেখ আছে তাহা কার্য্যকরী হইলে সাধারণ শিক্ষার সহিত শিল্প সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জন করা ছাত্রের পক্ষে একই সঙ্গে সম্ভব হইবে। যে শিক্ষার অভাবে এতবড় দেশের চল্লিশ-কোটি অধিবাসী সামান্য ব্যবহার্য্য বস্তুর জন্যও পরমুখাপেক্ষী হইয়া রহিয়াছে তাহাদের স্বাবলম্বী হইবার পরম প্রয়োজন স্বীকার করিয়া শিক্ষা সম্বন্ধে উদার হওয়া সরকারের অবশ্য কর্ত্তব্য। আমাদের কপালে সুখের মুখ দেখা নাই; জাপান যুদ্ধে হারিয়া 'কোরিয়া' ফিরাইয়া দিবে—অথচ আমরা অভিভাবক থাকা সত্বেও কুকুর বিড়ালের মত অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া মৃত্যুবরণ করিব— এই দুটি কথা একসঙ্গে মনে করিলে অস্বস্তি বোধ করা ছাড়া আমরা আর কিই বা করিতে পারি। লাহোর কংগ্রেসের পর গান্ধীজীর অর্থনৈতিক পরিকল্পনায়, করাচী কংগ্রেসে, ফৈজপুর কংগ্রেসে—জাতীয়তাবাদীগণ বারবার কৃষকদের খাজনার হার কমাইবার ও উন্নততর কৃষিকার্য্যের সুবিধা দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, কিন্তু প্রস্তাব কার্য্যকরী করা যাহাদের হাতে ছিল তাহারা অনুকম্পার দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিলে আর উপায় কি?

শিক্ষিত ও অশিক্ষিত প্রায় সকল বাঙ্গালীই এই দুর্ভিক্ষের চাপে জীবনসম্বন্ধে হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন। জনকতকের লক্ষপতি হইবার ফলে দেশের সমৃদ্ধি বাড়ে নাই, অধিকাংশ অর্থই আটক পড়িয়াছে ব্যাঙ্কের খাতায়। এই টাকায় শিল্পপ্রসার হইলে বহুলোকের স্থায়ী অন্নসংস্থান হইতে পারিত এবং ভূমিহীন কৃষকেরা শ্রমিকরূপে ও কর্ম্মহীন শিক্ষিত নরনারীরা কর্ম্মচারীরূপে পরিবার প্রতিপালনের যোগ্যতা অর্জ্জন করিলে তবেই দেশের সুখশান্তি ফিরিয়া আসিবার সম্ভাবনা থাকিত। যুদ্ধ হইতেছে, দুর্ভিক্ষ হইয়াছে, যুদ্ধ জয় ও দুর্ভিক্ষ জয় করিলেই আমাদের সমস্যা শেষ হইয়া যাইবে না। ভাঙ্গিয়া পড়া অর্থনৈতিক বনিয়াদ যদি গড়িয়া না তোলা যায়, অনাহারের অনুশোচনায় ম্লানমুখ ভদ্র দরিদ্রদের ও সর্ব্বহারা ক্ষুধিত কৃষকদের যদি বাঁচিবার পথ দেখান না হয় এবং নির্ব্বিকার সরকারের মনে যদি এ দেশ সম্বন্ধে বিবেচনা বোধ না জাগে, তাহা হইলে আমাদের আর কোনই আশা নাই। গত বৎসর আমেরিকার ভার্জ্জিনিয়া প্রদেশের হট্‌স্প্রিং কনফারেন্সে দারিদ্র্যকে সব সমস্যার মূল বলা হইয়াছে এবং বেকার-নিরোধী ব্যবস্থায় ও পরিবার পিছু সরকারী বৃত্তিদানে দারিদ্র্য নিরোধ সম্ভব বলিয়া মত প্রকাশ করা হইয়াছে। আমাদের সরকারও যদি যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনায় বেসামরিক জনগণের জন্য এই পারিবারিক ভাতার ব্যবস্থা না করেন এবং জনগণের শিক্ষা ও বেকারদের অন্নসংস্থানের দায়িত্ব স্কন্ধে তুলিয়া না নেন, প্রচারের বেলায় * তাঁহারা ভারতকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আটটি শিল্পপ্রধান দেশের অন্যতম বলিয়া যতই অন্যজাতির কাছে নিজেদের কীর্ত্তিমানরূপে জাহির করিতে থাকুন, বাংলার তেরশো পঞ্চাশী মন্বন্তর আগামী দশ বৎসরেও শেষ হইবে না।

* Fifty facts about India.

বাহির বিশ্ব

মিহির

রুশিয়ার শীতকালীন অভিযান

প্রচণ্ড বেগে সোভিয়েট বাহিনীর শীতকালীন অভিযান চলিতেছে। দেড় সহস্র মাইল রণাঙ্গনের কোন অঞ্চল সম্বন্ধেই সোভিয়েট সমর-নায়কগণ উদাসীন নহেন; প্রত্যেকটি অঞ্চলে আক্রমণের বেগ বাড়িয়াছে।

জেনারেল ভটুটিনের সেনাবাহিনী কিয়েভ অঞ্চলে অবিরাম আক্রমণ চালাইয়া পোল্যাণ্ডের ১৯৩৯ সালের সীমান্ত অতিক্রম করিয়াছে; ইতিমধ্যে তাহারা পোল্ রাজ্যে প্রায় ৫০ মাইল অগ্রসর হইয়াছে। প্রিপেট্ জলাভূমির উত্তরে জেনারল রকোসভস্কির সেনাবাহিনী মজীর অধিকার করিয়া শত্রুসৈন্যকে পশ্চিম দিকে বিতাড়িত করিয়াছে; সত্বর এই অঞ্চলেও সোভিয়েটবাহিনী পোল্ সীমান্ত অতিক্রম করিবে।

সম্প্রতি উত্তর রণাঙ্গনে রুশ সেনা যে সাফল্য অর্জন করিয়াছে, তাহার মূল্যই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। গত ২৭শে জানুয়ারী এই অঞ্চলের রুশ সেনাপতি জেনারেল গভোরভ্ রুশ সেনা, বাল্টিক নৌবাহিনীর নাবিক এবং লেনিনগ্রাডের শ্রমিকদের উদ্দেশে প্রচারিত এক বাণীতে ঘোষণা করিয়াছেন—লেনিনগ্রাড্ এখন সম্পূর্ণরূপে জার্ম্মাণীর অবরোধ হইতে মুক্ত!

জানুয়ারী মাসের মধ্যভাগে লেনিনগ্রাড্ অঞ্চলে রুশ সেনার প্রতি-আক্রমণ আরম্ভ হয়। দেখিতে দেখিতে গুরুত্বপূর্ণ রেল-সংযোগ নভোগ্রোড্, গাচিনা, ক্রাসনোয়ী সেলো, পিটারহফ্ প্রভৃতি রুশ সেনার আয়ত্তে আসে। তাহাদিগের এই সাফল্যে লেনিনগ্রাডের দক্ষিণে বিস্তারিত রেলপথগুলি জার্ম্মাণদের হস্তচ্যুত হইয়া পড়ে, লেনিনগ্রাডের সহিত স্বাভাবিক সংযোগ পুনঃস্থাপিত হয়। বর্ত্তমানে এই অঞ্চলে ৩ লক্ষ নাৎসী সৈন্যকে পরিবেষ্টিত করিবার উদ্দেশ্যে রুশ সেনার প্রচণ্ড আক্রমণ চলিতেছে। যদি তাহাদের এই প্রয়াস সফল হয়, তাহা হইলে জার্ম্মাণীর প্রতিরোধ-ব্যবস্থায় প্রচণ্ড আঘাত লাগিবে। অবশ্য, ষ্ট্যালিনগ্রাডের পর জার্ম্মাণ সৈন্য কোথাও সম্পূর্ণরূপে পরিবেষ্টিত হয় নাই; প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে তাহারা রুশ সেনাপতিদের কৌশল ব্যর্থ করিয়াছে। কাজেই লেনিনগ্রাড্ অঞ্চলে রুশ সেনাপতিদের কৌশল সম্পূর্ণ সফল হইবে কিনা, তাহা এখনও নিশ্চিত বলা যায় না।

লেনিনগ্রাড্ সুদীর্ঘ আড়াই মাস পরে সম্পূর্ণ অবরোধমুক্ত হইল; ১৯৪১ সালে ফন্ লীবের নেতৃত্বাধীন জার্ম্মাণ সৈন্য দক্ষিণ ও পূর্ব্ব দিক হইতে লেনিনগ্রাডের সমস্ত সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিয়া লুসেলবার্গে উপস্থিত হয়। উত্তর দিকে ফিনিস্ সেনাবাহিনী লেনিনগ্রাডের সহিত মুরমেনস্কের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে। গত বৎসর জানুয়ারী মাসে দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিক হইতে একটি স্বল্প পরিসর পথে লেনিনগ্রাডের সহিত সংযোগ স্থাপিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে লেনিনের নামাঙ্কিত নগরটি সম্পূর্ণরূপে অবরোধ-মুক্ত হইল।

লেনিনগ্রাড্ অবরোধমুক্ত হওয়ায় বাল্টিক সাগরের রুশ নৌবাহিনী পুনরায় তৎপর হইতে পারিবে। এখন ফিনল্যাণ্ডের বিরুদ্ধেও রুশিয়ার প্রবল আক্রমণ পরিচালন সহজ হইবে; দক্ষিণ দিকেও সোভিয়েট বাহিনীর আঘাত প্রচণ্ডতর পতিত হইতে পারিবে।

রুশ-পোল সমস্যা

রুশ সেনা পোল্যাণ্ডের সীমান্ত অতিক্রম করায় এক নূতন রাজনীতিক সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। ১৯৩৯ সালে সেপ্টেম্বর মাসে জার্ম্মাণীর সুপরিকল্পিত আক্রমণে পোল্যাণ্ড রাষ্ট্র যখন এক পক্ষ কালের মধ্যে তাসের ঘরের মত ভাঙ্গিয়া পড়ে, তখন রুশ সেনা পোল্যাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত পশ্চিম ইউক্রেণ ও বীলো অধিকার করিয়া লয়। পরে, ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদিগকে রুশিয়া যখন স্বায়ত্তশাসনাধিকার প্রদান করে, তখন তাহারা স্বেচ্ছায় সুপ্রীম সোভিয়েটের অন্তর্ভুক্ত হয়।

পোলাণ্ডের যে রাজ্যহারা গভর্ণমেণ্ট লণ্ডনে আশ্রয় লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা পশ্চিম ইউক্রেন ও বীলোর মায়া কাটাইতে পারেন নাই। ইতিপূর্ব্বে তাঁহারা এই বিষয়ে নিশ্চিত আশ্বাস পাইবার জন্য বৃটিশের ও আমেরিকার সরকারী দপ্তরে একাধিকবার ধর্ণা দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই, অন্ততঃ প্রকাশ্যে তাঁহারা এই বিষয়ে কোনরূপ আশ্বাস লাভ করেন নাই।

সে যাহা হউক, ১৯৪১ সালে পোল্যাণ্ডের নির্ব্বাসিত সিকোরস্কি-গভর্ণমেণ্টের সহিত সোভিয়েট রুশিয়ার এক জার্ম্মাণ-বিরোধী চুক্তি হয়।



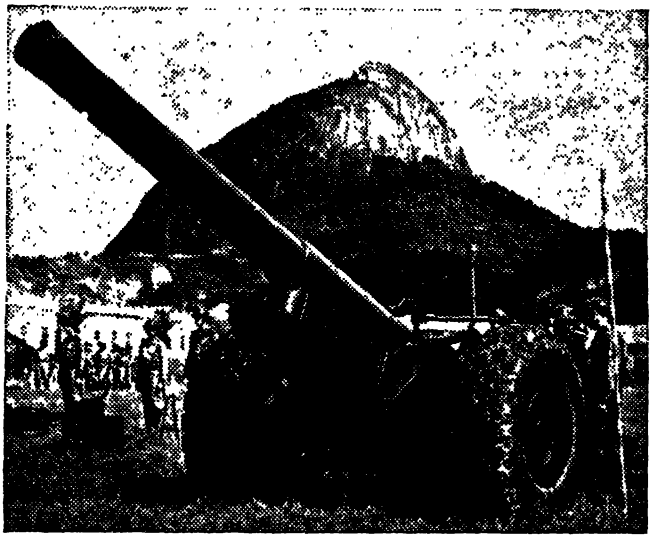
ওয়াশিংটন হাউস্ অব্ চেম্বার ভবনে আমেরিকার সেক্রেটারী অব্ ষ্টেট্ মিঃ কর্ডেল হল্

ইহাতে আশা হইয়াছিল যে, রুশ সৈন্য ও পোল্ সৈন্য যদি পাশাপাশি দাঁড়াইয়া জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তাহা হইলে যুদ্ধের পর পোলিস গভর্ণমেণ্টের দাবী সম্বন্ধে রুশিয়ার সহিত তাঁহাদিগের মীমাংসা হইতে পারিবে। কিন্তু ১৯৪৩ সালে মে মাসে পোলিস্ গভর্ণমেণ্ট জার্ম্মাণীর প্রচার-সচিব গোয়েবল্‌সের প্রতারণায় ভুলিয়া সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের সহিত সম্বন্ধচ্যুত হইয়াছেন। ঐ সময় গোয়েবলস্ প্রচার করেন যে, রুশিয়া ১০ হাজার পোলিস্ সামরিক কর্ম্মচারীকে স্মলেনস্কের নিকট হত্যা করিয়াছিল; সম্প্রতি তাঁহাদের মৃতদেহগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে। পোলিস্ গভর্ণমেণ্ট গোয়েবল্‌সের এই কৌশলী প্রচারে এতদূর বিভ্রান্ত হন যে, তাঁহারা এই বিষয়ে সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের জন্য সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের বক্তব্যও শ্রবণ করিতে চাহেন না; তাঁহারা আন্তর্জ্জাতিক রেডক্রস্কে এই বিষয়ে তদন্ত করিতে অনুরোধ জানান। পোলিস্

গভর্ণমেণ্টের এই ব্যবহারে প্রতিপন্ন হয় যে, সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিলেও তাঁহারা সোভিয়েট কর্তৃপক্ষকে বিশ্বাস করেন না ; যে জার্ম্মাণীর আক্রমণে পোল্যাণ্ড চূর্ণ হইয়াছে, সেই জার্ম্মাণীই যেন তাহাদিগের অধিক আস্থাভাজন। এইরূপ আচরণে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের বিরক্তি স্বাভাবিক। তাঁহারা এই সময়ে পোলিস্ গভর্ণমেণ্টের সহিত কূটনৈতিক সম্বন্ধ ছিন্ন করেন। আন্তর্জ্জাতিক রেড-ক্রস্ পরে পোলিস্ গভর্ণমেণ্টের অনুরোধ রক্ষায় অসামর্থ্য জানাইয়াছিলেন অর্থাৎ পোলিস্ কর্তৃপক্ষের "জাতি যায়, কিন্তু পেট ভরে না।"

বর্ত্তমানে পোলিস্ গভর্ণমেণ্ট রুশিয়ার সহিত বিচ্ছিন্ন-সম্বন্ধ। সেই রুশিয়া এখন পোল্যাণ্ড হইতে জার্ম্মাণীকে বিতাড়িত করিতেছে। সে স্পষ্ট জানাইয়া দিয়াছে যে, পশ্চিম ইউক্রেন ও বীলো-রুশিয়া সম্পর্কে তাহার দাবী সম্পূর্ণ সঙ্গত। পোলিস্ গভর্ণমেণ্ট এখন আর সরাসরি রুশ কর্তৃপক্ষের সহিত কথা বলিতে পারেন না। তাই তাঁহারা কাঁদুনী গাহিয়া বৃটেন ও আমেরিকার জনমতকে তাঁহাদের অনুকূলে প্রভাবিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। রুশিয়া জানাইয়াছিল যে, ১৯৩৯ সালের সীমান্তকে সে অপরিবর্ত্তনীয় মনে করে না ; ১৯১৯ সালে লর্ড কার্জ্জন কর্তৃক নির্দ্ধারিত পোল্যাণ্ডের পূর্ব্ব সীমান্ত সে মানিয়া লইতে প্রস্তুত আছে। পোলিস্ গভর্ণমেণ্ট এই সঙ্গত প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। আমেরিকান্ গভর্ণমেণ্ট রুশ-পোল্ দ্বন্দ্বে মধ্যস্থতা করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

পশ্চিম ইউক্রেন ও বীলো-রুশিয়া সম্পর্কে সোভিয়েট রুশিয়ার দাবী সত্যই সঙ্গত। এই দুইটি প্রদেশ প্রকৃতপক্ষে রুশিয়ার ইউক্রেন এবং হোয়াইট্ রুশিয়া প্রদেশদ্বয়ের অংশ। এই অঞ্চলের অধিবাসীদিগের সহিত পোল্ জাতির সংস্কৃতিগত যোগ নাই। ১৯১৯ সালে মিত্রশক্তির পক্ষ হইতে লর্ড কার্জ্জন এই দুইটি অঞ্চল রুশিয়ার প্রাপ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। পরে পিলসুডস্কি ফ্রান্সের সহযোগিতায় রুশিয়া আক্রমণ করেন এবং এই দুইটি প্রদেশ ছিনাইয়া লন। ১৯২১ সালে রিগার অন্যায় চুক্তিতে তরুণ বলশেভিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা মানিয়া লইতে বাধ্য হয়। রুশ কর্তৃপক্ষ কোনদিনই এই অপমান বিস্মৃত হন নাই। পোল্যাণ্ডের অধীনে পশ্চিম ইউক্রেণ ও বীলো-রুশিয়ার অধিবাসীরা অত্যন্ত দুর্ব্যবহার পাইয়াছে। পোল্যাণ্ডের ফিউড্যাল জমিদারদের অত্যাচারে তাহারা নিষ্পিষ্ট হইত ; তাহাদের বিদ্যালয় ও সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠানগুলি পোল সরকারের নির্দ্দেশে প্রায় নিশ্চিহ্ন হইয়াছিল। বস্তুতঃ পশ্চিম ইউক্রেন ও হোয়াইট রুশিয়া পোল্যাণ্ডের উপনিবেশ ছিল। এই অঞ্চলের শ্রমশিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি ভাঙ্গিয়া দিয়া পোল্যাণ্ডের শিল্পজাত পণ্য এখানে বিক্রয় করা হইত এবং এখান হইতে অল্প মূল্যে কাঁচা মাল সংগৃহীত হইত। এই অঞ্চলের অধিবাসীদিগকে সংযত রাখিবার জন্য তাহাদের পোল-প্রভুরা নির্ম্মমভাবে দমন-নীতি চালাইত। অথচ পোল সীমান্তের বাহিরে ইহাদের স্বজাতীয়রা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রজারূপে সুখে ও শান্তিতে বাস করিত। স্বভাবতঃ ইহারা পোল প্রভুদের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তাহাদের স্বজাতীয়দের সহিত এক পরিবারভুক্ত হইতে চাহিত। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে রুশ সেনা ইহাদিগের এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করে ; মুক্তিদাতারূপেই তাহারা পোল্যাণ্ডে আসিয়াছিল —আক্রমণকারীরূপে নহে।



ব্রেজিলে আমেরিকান লেণ্ড্‌-লীজ। জার্ম্মানীর বিপক্ষে ব্রেজিল কর্তৃক যুদ্ধ ঘোষণার অব্যাহতি পরে



মিত্রপক্ষ জার্ম্মাণীর আর্মাড্‌কার দখল করিয়া নিজেদের কাজে লাগাইয়াছে

ইতিমধ্যে রুশিয়া একটি পোল সেনাবাহিনী গঠন করিয়াছে, এই সকল

সৈন্য তখন রুশ সেনার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া পোল্যাণ্ডে যুদ্ধ করিতেছে। লণ্ডনস্থিত পোলিস্ গভর্ণমেণ্টকে অস্বীকার করিয়া ওয়ার্স'য় নূতন গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার আয়োজনও চলিতেছে; ইতিমধ্যে রুশিয়ায় ইউনিয়ন অব পোলিস্ প্যাট্রিয়টস্ নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে। রুশিয়া ইতিপূর্ব্বে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিল যে অক্ষশক্তির অধিকৃত দেশগুলির যে সব গভর্ণমেণ্ট লণ্ডনে মজুত আছেন, তাঁহারা বহুদিন তাহাদের দেশবাসীর সহিত সম্বন্ধশূন্য; তাঁহারা ঐ সব দেশের প্রতিনিধিস্থানীয় হইতে পারেন না। কাজেই, ইহা মনে করা সঙ্গত যে রুশ সেনা ওয়ার্স পর্য্যন্ত অগ্রসর হইবার পর তখন তথায় নূতন গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং সর্ব্বাগ্রে সোভিয়েট রুশিয়া উহাকে মানিয়া লইবে।

প্রাভ্দার রিপোর্ট

সম্প্রতি রুশ কম্যুনিষ্ট পার্টির মুখপত্র 'প্রাভদা'র কায়রোস্থিত সংবাদদাতা জানান—জার্ম্মাণ পররাষ্ট্র সচিব রিবেনট্রপের সহিত দুইজন বিশিষ্ট



আমেরিকান সৈন্যগণ যুদ্ধের সরঞ্জাম বহন করিতেছে

বৃটিশ রাজনীতিকের আলোচনা হইয়া গিয়াছে। 'প্রাভদায়' এই সংবাদ প্রকাশিত হইবামাত্র আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে বিশেষ চাঞ্চল্য আরম্ভ হয়। বর্ত্তমানে সম্মিলিত পক্ষ ইউরোপে জার্ম্মাণীকে আঘাত করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন; এই সম্পর্কে তাঁহাদের ব্যাপক আয়োজন চলিতেছে। সম্মিলিত পক্ষ একাধিকবার ঘোষণা করিয়াছেন—জার্ম্মাণীকে সম্পূর্ণ পরাজিত করিবার পূর্ব্বে তাঁহারা অস্ত্র সম্বরণ করিবেন না। অথচ এই সময় তাহাদিগের সহিত জার্ম্মাণ পররাষ্ট্র সচিবের গোপন আলোচনার জনরব! এই সংবাদে আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে চাঞ্চল্য স্বাভাবিক।

বৃটিশ পররাষ্ট্র বিভাগ হইতে এই সংবাদের প্রতিবাদ করা হইয়াছে। 'প্রাভদা' সেই প্রতিবাদ সম্পূর্ণরূপে মুদ্রিত করেন নাই; তৎসম্পর্কিত টাস্ এজেন্সীর সংবাদটি কেবল প্রকাশ করিয়াছেন। 'প্রাভদা'র কায়রো-সংবাদদাতা এখনও তাঁহার রিপোর্ট ভিত্তিহীন বলিয়া মানিয়া লন নাই। 'প্রাভদা'ও সম্পাদকীয় মন্তব্যে এই রিপোর্ট ভুল বলিয়া স্বীকার করেন নাই। বিষয়টি এই অবস্থায় আপাততঃ "ধামা-চাপা" রহিয়াছে।

ইতিপূর্ব্বে সন্ধির আলোচনা সম্পর্কে বহুবার নানারূপ জনরব শ্রুত হইয়াছে। এবার রুশ কম্যুনিষ্ট পার্টির মুখপত্র 'প্রাভদার' এই জনরব প্রকাশিত হওয়াতেই এত অধিক চাঞ্চল্য। হয়ত সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের অজ্ঞাতে 'প্রাভদার' এই রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে; হয়ত ইহার প্রকাশে কোন কূটনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রয়াস নাই। বৃটিশ পররাষ্ট্র বিভাগের প্রতিবাদের পর মানিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, কায়রোর সংবাদদাতার রিপোর্ট ভিত্তিহীন। কিন্তু রুশ কম্যুনিষ্ট পার্টির মুখপত্রে এই গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় ধরিয়া লওয়া যায় যে, বৃটিশ রাজনীতিকদের পক্ষে জার্ম্মাণীর সহিত গোপন আলোচনার সম্ভাবনায় রুশ কম্যুনিষ্ট দল বিশ্বাসী। মস্কৌ ও তেহরাণ সম্মিলনের পর জার্ম্মাণ-বিরোধী যুদ্ধে রুশিয়ার সহিত বৃটেন ও আমেরিকার ঘনিষ্ট সহযোগিতার কথা উচ্চৈস্বরে ঘোষিত হইলেও রুশ কম্যুনিষ্টদের সন্দেহ এখনও সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয় নাই।

ইটালীয় রণাঙ্গন

ইটালীয় রণাঙ্গনের বৈচিত্র্যহীনতা সম্প্রতি ভাঙ্গিয়াছে। ইটালীর পশ্চিম উপকূলবর্ত্তী অঞ্চলে যুদ্ধরত পঞ্চম বাহিনী ক্যাসিবো অধিকারের জন্য প্রয়াস করিতেছিল; ইহারা গারিগ্লিয়ানো নদী অতিক্রম করে। এই সময় এক দল বৃটিশ ও আমেরিকান সৈন্য রোমের দক্ষিণে অবতরণ করিয়াছে এবং নেটুনো বন্দর ও সহর অধিকার করিয়াছে। গারিগ্লিয়ানো নদীর উত্তর তীরে পঞ্চম বাহিনীর অবস্থানক্ষেত্র হইতে বৃটিশ ও আমেরিকান সৈন্যের নূতন অবতরণের ক্ষেত্র ৫৭ মাইল দূরবর্ত্তী। ইতিমধ্যে সম্মিলিত পক্ষের সেনা এই অঞ্চলে তাহাদিগের অধিকৃত অঞ্চল প্রসারিত করিয়াছে; তাহারা রোমের উদ্দেশে অগ্রসর হইতেছে। জার্ম্মাণরা রোমের নিকট বহু সৈন্য সমাবেশ করিয়া প্রবল প্রতিরোধে প্রবৃত্ত হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। গারিগ্লিয়ানো নদীর তীরেও জার্ম্মাণদিগের প্রতিরোধের প্রাধান্য বৃদ্ধি পাইয়াছে।

শীত শেষ হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই। সম্মিলিত পক্ষ শীতের অবসানে ইউরোপে জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করিবার ব্যাপক আয়োজন করিতেছেন। এই সময় দক্ষিণ ইউরোপেও তাহাদিগের আঘাত পতিত হইবে। দক্ষিণ ইউরোপে এই আসন্ন অভিযান সম্পর্কে ইটালীর গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক। ইটালীকে ঘাঁটীরূপে ব্যবহার করিয়া বল্কান্ অঞ্চলে আঘাত করাই হয়ত সম্মিলিত পক্ষের পরিকল্পনা। ঈজিয়ান সাগরের দ্বীপগুলি এখন সম্মিলিত পক্ষের হস্তচ্যুত। কাজেই এখন আক্রমণ-ঘাঁটীরূপে ইটালীর গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক। এইজন্যই সম্মিলিত পক্ষ এখন জার্ম্মাণীকে উত্তর ইটালীতে ঠেলিয়া লইতে প্রয়াস করিতেছেন। নাৎসী বাহিনী যদি পো নদীর উত্তরে বিতাড়িত হয়, তাহা হইলে ইটালী হইতে বল্কান অঞ্চলে আঘাত করা সহজসাধ্য হইবে।

বল্কান অঞ্চলে যুগোস্লেভিয়া এখন জার্ম্মাণ-বিরোধী যুদ্ধের ঘাঁটীরূপে ব্যবহৃত হইবার উর্ব্বর ক্ষেত্র। টিটোর নেতৃত্বাধীনে যুগোস্লাভ সেনা-বাহিনী তাঁহাদের স্বদেশের দুই-তৃতীয়াংশ শত্রুর কবলমুক্ত করিয়াছে। কাজেই মনে হয়, আগামী বসন্তকালে ইটালী হইতে যুগোস্লেভিয়ায় সম্মিলিত পক্ষের অভিযান আরম্ভ হইবে এবং পরে তথা হইতে বিভিন্ন দিকে তাহাদের আক্রমণ প্রসারিত হইবে।

দক্ষিণ ফ্রান্সে আক্রমণ আরম্ভ করিবার পক্ষে টিরালিয়ান্ সাগরের সার্দ্দিনিয়া ও কর্সিকাই ঘাঁটীরূপে ব্যবহৃত হইবে। এই দুইটি ঘাঁটীর নিরাপত্তার জন্যও ইটালীয় উপদ্বীপ জার্ম্মাণীর কবলমুক্ত হওয়া প্রয়োজন। কাজেই কেবল বল্কান অঞ্চলে নহে, দক্ষিণ ফ্রান্সে আক্র-মণ পরিচালনের জন্যও ইটালীর প্রতি অবহিত হইবার প্রয়োজনীয়তা আছে।

প্রাচ্য অঞ্চলের রণক্ষেত্র

গত বৎসর শীতকালে আরাকান্ অঞ্চলে সম্মিলিত পক্ষ যেমন তৎপর হইয়াছিলেন, এই বৎসরও তাহাদের সেইরূপ তৎপরতা প্রকাশ পাইয়াছে। গত বৎসর জাপান বিনা প্রতিরোধে মংড ও বুথিডং ত্যাগ করিয়া যায়; রথেডং রক্ষার জন্য তাহারা দৃঢ়তা প্রকাশ করে। ১৯৪২ সালে ডিসেম্বর মাসে এই অঞ্চলে সম্মিলিত পক্ষ অগ্রসর হন; পরে মার্চ্চ মাসে জাপানের প্রতি আক্রমণে তাহারা পশ্চাদপসরণে বাধ্য হইয়াছিলেন। এবার জাপান আর বিনা প্রতিরোধে স্থান ত্যাগ করিতেছে না। সম্মিলিত পক্ষ নাফ্ নদীর তীরবর্ত্তী মংড অধিকার করিয়াছেন বটে কিন্তু বুথিডংএর জন্য তাহাদিগকে প্রবল যুদ্ধ করিতে হইতেছে।

এবার উত্তরে হুকং উপত্যকায় এবং চিন্দুইন অঞ্চলেও সম্মিলিত পক্ষের তৎপরতা আরম্ভ হইয়াছে। এই সকল অঞ্চলেও জাপানের প্রতিরোধ অল্প নয়।

বাংলা ও আসামের পূর্ব্ব সীমান্তে এই সঙ্ঘর্ষ উপেক্ষণীয় না হইলেও ইহা সম্মিলিত পক্ষের ব্রহ্ম অভিযানের পূর্ব্বাভাস নয়। শত্রুকে সঙ্ঘর্ষে প্রবৃত্ত রাখিবার জন্য, তাহার প্রতিরোধ-কৌশল সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এবং সম্ভব হইলে সীমান্ত অঞ্চলে শত্রুর ঘাঁটী অধিকারের চেষ্টায় সীমান্ত-সঙ্ঘর্ষ চলিয়া থাকে। বর্ত্তমানে বাংলা ও আসাম সীমান্তে সঙ্ঘর্ষেরও ইহার অধিক কোন গুরুত্ব নাই।

ইউরোপে যদি আগামী বসন্তকালে সম্মিলিত পক্ষের অভিযান আরম্ভ হয়, তাহা হইলে সে অভিযান সাফল্যের সহিত কিছু দূর অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে সম্মিলিত পক্ষ ব্রহ্মদেশের প্রতি মনোযোগ প্রদান করিতে পারিবেন না। ইউরোপে অভিযানের জন্য তাহাদের নৌবহর বিশেষ-ভাবে ব্যাপৃত থাকিবে। এই অঞ্চলের নৌবহরের দায়িত্ব হ্রাস পাইবার পূর্ব্বে ব্রহ্ম অভিযানের জন্য তাঁহারা সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিতে পারিবেন না। ব্রহ্ম অভিযানে নৌবাহিনীর সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন; যতদিন ভারত মহাসাগরে সম্মিলিত পক্ষের বিশাল নৌবাহিনী সন্নিবিষ্ট না হইতেছে, ততদিন ব্রহ্ম অভিযানের প্রথম পর্ব্বই আরম্ভ হইবে না। কাজেই এই বৎসর বসন্তকাল হইতে শরৎকালের মধ্যে ইউরোপ অভিযান যদি সাফল্যের সহিত অগ্রসর হয়, তাহা হইলে ১৯৪৪-৪৫ সালের শীতে ব্রহ্ম অভিযান চলিবে মনে করা যাইতে পারে।

পূর্ব্বে মনে হইয়াছিল—জাপান এই বৎসর শীতকালে নানা উপায়ে পূর্ব্ব ভারতে আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিতে প্রয়াসী হইবে। কিন্তু তাহার সেরূপ তৎপরতা এখনও প্রকাশ পায় নাই। সীমান্ত সঙ্ঘর্ষের প্রাবল্যে তাহার এই অভিসন্ধিতে বিঘ্ন ঘটাইয়া থাকিবে। অনুকূল অবস্থার জন্য জাপানের প্রতীক্ষা করাও সম্ভব।

প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটে নাই। সম্মিলিত পক্ষ তখন নিউ বৃটেনের রাজধানী—জাপানের বিশালতম ঘাঁটী রবাউলে পুনঃ পুনঃ বোমা বর্ষণ করিতেছেন। গিল্বার্ট হইতে জাপানের ম্যাণ্ডেটেড্ দ্বীপপুঞ্জেও পুনঃ পুনঃ বোমা বর্ষিত হইতেছে।

দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে প্রধানতঃ শত্রুর শক্তি ক্ষয়কারী যুদ্ধ—ওয়ার অব্ য়্যাট্রিসান্ চালান হইতেছে। এখানে দুই একটি দ্বীপ অথবা দুই একটি অঞ্চলে অধিকার বড় কথা নয়। সম্প্রতি এই রণক্ষেত্রে জাপানের কিছু বিমান ও জাহাজ সত্যই ধ্বংস হইয়াছে। ইহাই এই অঞ্চলে সম্মিলিত পক্ষের উল্লেখযোগ্য সাফল্য। ৩০।১।৪৪

মানব মনের নিত্যধারা

শ্রীগুণেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী এম্-এ, বি-ই-এস্

আমাদের আলোচ্য বিষয়টীকে প্রথমতঃ একটু বিশ্লেষণ করে দেখা যাক্।

কবিতার একটী পংক্তির মত ছোট্ট একটী ছন্দোময় নামে এই যে বিষয়টীকে আলোচনার উদ্দেশে গ্রহণ করা হ'ল—তার ভিতরে প্রবেশ করলেই আমরা কিন্তু দেখ্‌তে পাব যেন এক আদিঅন্তহীন উত্তাল-তরঙ্গ-সঙ্কুল অসীম সমুদ্র! বাইরে থেকে মানবকে চিন্‌তে ত কোন হাঙ্গামাই নেই, কিন্তু তার বাইরেটাকে বাদ দিয়ে ভিতরের দিকে যদি তাকাই তবে যে কত অজ্ঞাত রহস্য প্রতিভাত হয়ে উঠ্‌বে তার আর সীমা নেই। মানবের অন্তর্নিহিত সেই সব অজ্ঞাত রহস্যের মধ্যে তার মন একটী বিরাট প্রহেলিকা। এই যে প্রহেলিকাময় মানব মন, এরই নিত্যধারা আমাদের আলোচ্য বিষয়। "নিত্য" কথাটার অর্থ একদিকে যেমন "দৈনন্দিন", আর একদিকে তেমনি "চিরন্তন"। "ধারা" কথাটার অর্থ প্রবাহ অথবা গতি। বিন্দু বিন্দু জল কণিকা নিয়ে যেমন মহাসমুদ্র সৃষ্টি হয়েছে তেমনি মানব মনের দৈনন্দিন গতি নিয়েই গড়ে উঠেছে তার সেই চিরন্তন গতি। যা চিরন্তন—যা নিত্য—তাই সত্য। সুতরাং মানব মনের নিত্যধারা কথাটার অর্থ দাঁড়ায় মানব মনের সত্যগতি অথবা সত্য পথ। মনের এই সত্য পথকে জান্‌তে হলেই আমাদের আগে দেখতে হবে যে এই মানব মনটী কি এবং মানুষের অন্তর্জগতে সে কতটা স্থানই বা অধিকার করে রয়েছে। কিন্তু এই চির-রহস্যময় তত্ত্বজ্ঞানের ভিতরে প্রবেশ করতে গেলেই নিজের অক্ষমতার কথা প্রথমেই প্রাণে জেগে ওঠে—প্রাণ মুষড়ে পড়ে। সাহসে বুক বেঁধে যদিও বা অগ্রসর হওয়া যায় তখনই উপনিষদের অনুশাসন বাক্যগুলি যেন জ্বল্ জ্বল্ করে চোখের উপরে ভেসে ওঠে। এ বাণী—উপনিষৎ আবার কোন মরজগতের মুনিঋষির কণ্ঠে দেননি—দিয়েছেন তাঁরই মুখে, যিনি মৃত্যুর পরপারের দেবতা;—স্বয়ং যমরাজ বলেছিলেন নচিকেতাকে :—

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ
স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
দন্দ্রম্যমাণাঃ পরিযন্তি মূঢ়া
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥

—আমাদের মত সংসারী যারা— অবিদ্যার অন্তরেই যারা বসে রয়েছে—জ্ঞানগর্ব্বে স্ফীত হয়ে এই সব নিগূঢ় তত্ত্বকথার আলোচনা করতে গিয়ে পণ্ডিতদের বিচরণ ক্ষেত্রে যদি তারা এমন অনধিকার প্রবেশ করে বসে, তবে অন্ধ পরিচালিত অন্ধের মতই তাদের দিশেহারা হয়ে বেড়াতে হবে। কাজেই এ কঠিন ক্ষেত্রে আমাদের মত লোকের চল্‌তে হবে খুবই সাব-ধানে—আমাদের সেই গৌরব-মণ্ডিত সুদূর অতীতের মুনিঋষিরা যে চির-

উজ্জ্বল আলো আমাদের জন্ত জ্বালিয়ে রেখে গেছেন তারই রশ্মি অনুসরণ করে—যে অত্যুজ্জ্বল আলোতে মানবের অন্তর্জগতকে সুস্পষ্ট দেখ্‌তে পেয়ে সেই অতীতের ঋষিরা বিস্ময়-বিমুগ্ধ কণ্ঠে বলে উঠেছিলেন—

ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্র তারকম্‌
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥

—এই যে মানুষের অন্তর্জগত যেখানে তার আত্মা বিরাজিত রয়েছেন, তাকে প্রকাশিত করতে পারে এমন ক্ষমতা সূর্য্য, চন্দ্র, তারকা, বিদ্যুত—কারোও নেই, অগ্নি ত দূরের কথা! কেমন করে থাকবে? মানুষের অন্তর্নিহিত সেই যে পরম জ্যোতির্ম্ময় আত্মা—তাঁরই দিব্য জ্যোতিতে যে সূর্য্য, চন্দ্র, তারকা সব উদ্ভাসিত—এই বিশ্বভুবন আলোকিত! পরমাত্মার আবাস যেথায় এমন যে অন্তর্জগত, সেথায়ই আজ আমরা আলোক সম্পাত করতে উদ্যত হয়েছি—সেই জগতেই আজ আমরা বিচরণ করব বলে অগ্রসর হয়েছি। পথটী কিন্তু বড় দুর্গম!—শাস্ত্র তাকে বলেছেন—"ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া—দুর্গং পথস্তৎ"।—একেবারে শাণিত ক্ষুরধার পথে পদচারণ করতে হবে। শুধু আজকে কেন!—আমাদের সারাটা জীবন-ব্যাপী এই ক্ষুরধার দুর্গম পথেই যে চল্‌তে হবে, কেননা, তা ছাড়া যে আমাদের "নান্যঃ পন্থা"—আর পথ নেই।

এইবার এই মানব মনটীর সঙ্গে একটু পরিচিত হবার চেষ্টা করা যাক্‌। গীতায় স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই মানব মনের বর্ণনা করতে গিয়ে অর্জ্জুনকে কত কথাই বুঝিয়েছেন—বলেছেন—

"ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি"

—"ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে আমি মন"। শ্রীকৃষ্ণ একথা বলেছেন যেখানে তিনি অর্জ্জুনকে বোঝাচ্ছিলেন যে যদিও এই বিশ্ব চরাচরের যাবতীয় বস্তু—বৃহত্তম হতে ক্ষুদ্রতম অণুপরমাণুটী পর্য্যন্ত—সকলেরই সৃষ্টিকর্ত্তা স্বয়ং ভগবান:—

যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্‌॥

—কিন্তু তবুও কোন বিশেষ বিশেষ স্থানে তিনি একটু বিশেষরূপে প্রকাশিত এবং ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে এই মনটাই তাঁর সেই বিশেষ লীলা-স্থল। শ্রীকৃষ্ণ আরও বলেছেন—"ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।" ইন্দ্রিয়গণ সকলেই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু মন তাহাদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। মানবের ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ এই যে মন তাকে নিয়ে কত মনোবিজ্ঞান কত মনস্তত্ব যুগে যুগে গড়ে উঠেছে কিন্তু তবুও যেন এর নিবিড় রহস্য কিছুতেই পূর্ণরূপে উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে না। বিশ্বকবির ভাষায় তাই বল্‌তে ইচ্ছা হয়—

চিরকাল এই সব
রহস্য আছে নীরব—
রুদ্ধ ওষ্ঠাধর।

এ হেন যে মানব মন, তারই চিরন্তন ধারাকে খুঁজে বের করতে হবে—তাকে সেই পথে চালিত করতে হবে। সেই আমাদের জীবনের সাধনা।

মনকে বলা হয়েছে ইন্দ্রিয়-শ্রেষ্ঠ, কেননা মনের সাহায্য ব্যতীত কোন ইন্দ্রিয়ের কোন ক্রিয়াই যে সম্পাদিত হতে পারে না। মন যদি উদাসীন থাকে তবে কামনা, বাসনা, লালসা, ভোগ কিছুই চরিতার্থ হতে পারে না। মনকে বাদ দিয়ে এসব কোন কিছুই যে কল্পনাও করা যায় না। কাজেই মানুষের সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি যার যা আকাঙ্ক্ষিত বস্তু তা ভোগ করবার জন্য এই মনকে নিয়ে কেবলই টানাটানি করছে, কিন্তু মন যদি এর কোন একটী ইন্দ্রিয়েরও অনুগত হয়ে পড়ে তবে মানুষের জীবন উত্তাল-তরঙ্গ-ময় সমুদ্রে কাণ্ডারীবিহীন নৌকার মত অনিবার্য্য ধ্বংস মুখে চল্‌তে থাক্‌বে। শ্রীকৃষ্ণ তাই অর্জ্জুনকে বলেছিলেন—

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি॥

—শুধু কি তাই? অর্জ্জুনকে পূর্ণরূপে সতর্ক করে দেবার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আরো বলেছিলেন—

যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ॥

শ্রীশ্রীচণ্ডীতেও ঋষিবর মেধা হৃত-সর্ব্বস্ব রাজা সুরথ ও স্বজন-বিড়ম্বিত বৈশ্য সমাধিকে ঠিক এমনি উপদেশ দিয়েছিলেন—ঋষি বলেছিলেন—

জ্ঞানিনামপি চেতাংসি
দেবী ভগবতী হি সা
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি।

—সাধারণ লোকের ত কথাই নাই—এমন কি—আত্মজ্ঞান লাভে দৃঢ়ব্রত বিবেকী ব্যক্তি যারা, এই প্রবল ইন্দ্রিয়গণ তাদেরও মনে বিক্ষোভ এনে দেয়। সেই সব সুদৃঢ় মনকেও এরা সবলে হরণ করে নেয়। তাই গীতায় ভগবান বলেছেন—

তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥

—এই সব ইন্দ্রিয়দের সংযত করে ভগবানের রাজীব চরণে মনকে নিবেদন করতে হবে—মানব মনের সেই একমাত্র সত্যধারা। এই সাধন-মার্গেই শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে নিযুক্ত করেছিলেন এবং সর্ব্বযুগে সর্ব্বকালে সমস্ত মানবের এই সাধনা।

এই সব প্রবল ইন্দ্রিয়দের যদি পূর্ণরূপে সংযত করতে হয় তবে একবার অন্তর্মুখী হয়ে দেখ্‌তে হবে যে কেমন করে ইন্দ্রিয়গণ মানুষের হৃদয়ে নিজ নিজ কার্য্য করে। কেমন করে তারা মনের উপর এমন অমোঘ প্রভাব বিস্তার করে। গীতা একথা বিশদরূপে বর্ণনা করে গেছেন—গীতা বলেছেন—

ধ্যায়তো বিষয়ান্‌ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতি বিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্‌ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥

—এই রূপ, রস, গন্ধময় পৃথিবী যে সব ভোগ্যবস্তু মানুষের জন্য সৃষ্টি করে রেখেছে—মানুষ তার আপন শক্তিতে আরও যে সব সুখ ও আরামের বস্তু সৃষ্টি করে নিয়েছে—সেই সমস্ত বিষয়গুলি মানব মনে প্রথমেই প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। মানুষ মনে মনে ভাবে—কেমন করে সে সমস্তকে তার নিজের আয়ত্ত করে নেবে। এমনি করে সে সমস্ত ভোগ্য-বস্তু এসে জড়িয়ে যায় মানব মনের পরতে পরতে। কাম্য বস্তু যখন মানুষ না পায়, তখনই তার মনে জেগে ওঠে ব্যর্থতাজনিত ক্রোধ। ক্রোধ যেমনি জেগে ওঠে অমনি মানুষ হয়ে যায় মোহে আচ্ছন্ন—ভুলে যায় তার মনুষ্যত্ব, আর সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হয়ে যায় তার বিবেচনা বুদ্ধি। কাজেই তার যে অবশ্যম্ভাবী ফল তাই ফলে অর্থাৎ মানুষ তখন বিনাশ-প্রাপ্ত হয়। এইরূপে বিনাশপ্রাপ্ত হবার পরের অবস্থা ঈশোপনিষৎ প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করেছেন—

অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥

—এমনি করে বিনাশপ্রাপ্ত হয়ে আত্মার অবমাননাকারী মানুষ যায় নিবিড় তমসাচ্ছন্ন দানবীয় লোকে। সুতরাং সে চরম দুর্দ্দশা থেকে আত্মরক্ষা করতেই হবে। মনের যে সত্যপথ সেই পথেই চলতে হবে—ইন্দ্রিয়দের সংযত করে। কিন্তু কেমন করে এই ইন্দ্রিয়ের দলকে আমরা সংযত ক'রব? যেমনি এ প্রশ্ন আমাদের মনে উঠ্‌বে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণী অমনি সেই সুদূর অতীত হতে আমাদের কানে ভেসে আসবে—"তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।" কিন্তু এরা যে বড় প্রবল—আর মনকে এদের সঙ্গেই মিশে থাক্‌তে চায়! অর্জ্জুনের মত তাই আমাদের নৈরাশ্যভরা কণ্ঠ হতে নিঃসৃত হবে—

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্‌।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্‌॥

—মন যে বড় চঞ্চল, তার শক্তিও যে দুর্দ্দমনীয়। হে কৃষ্ণ! ইন্দ্রিয়-চালিত এই প্রবল মনকে সংযত করে রাখা যে বায়ুর গতিকে রুদ্ধ করবার মতই অসম্ভব মনে হচ্ছে। কিন্তু, সঞ্জীবনী মন্ত্রের মত তখনই মেঘমন্দ্রে আশার বাণী ধ্বনিত হয়ে উঠ্‌বে—

অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে।

—অভ্যাস এবং বিষয়-বিরাগ! হে কৌন্তেয়! এই দুর্নিগ্রহ চঞ্চল মনকে সংযত করতে হলে চাই সাধনা—চাই বিষয়ে অনাসক্তি। ক্রমশঃ

সাময়িকী

খাদ্যবণ্টন বা রেশনিং—

যখন কোনও কারণে দেশের মধ্যে অন্নাভাব ঘটে অর্থাৎ যে খাদ্য পাওয়া যাইতে পারে তাহা সকলের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নয় বলিয়া মনে হয়, তখন বণ্টনের প্রয়োজন হইয়া পড়ে। নিত্য প্রয়োজন, ভবিষ্যতের সঞ্চয়—এমন কি অপচয় করিবার মত যখন খাদ্যাদি পাওয়া যায়, তখন বণ্টনের বিষয় কেহ ভাবে না। নিজে উৎপন্ন করিয়া অথবা অর্থের দ্বারা ক্রয় করিয়া লোকে অভাব মিটাইয়া থাকে। শস্যনাশ, অকস্মাৎ প্রচুর পরিমাণে প্রয়োজন-বৃদ্ধি, সঞ্চয়, আমদানী বন্ধ প্রভৃতি কারণে মোট পরিমাণ দ্বারা অভাব না মিটিলে দ্রব্যাদি দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠে এবং ক্রমে তাহা দুষ্প্রাপ্য হইয়া লোকের ক্লেশ বৃদ্ধি করিতে থাকে। অপেক্ষাকৃত অর্থহীন লোকেরা প্রথমেই দারুণ কষ্টে পড়ে। এই অভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইলে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়।

স্বভাবের ক্ষেত্রে বণ্টনের প্রয়োজনীয়তা আছে। যাহারা দরিদ্র, তাহাদের বাঁচিয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই এ-কথা কেহ বলিতে পারেন না; অথচ বণ্টনের প্রথা না থাকিলে তাহাদের অন্নসংস্থান হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। যখন প্রয়োজন হইলেই লোকে খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে পায়, তখন কেহ প্রার্থনা করিলে সহজেই সাহায্য করা যায় এবং সেই কারণেই বহু দরিদ্র লোক সমাজে বাস করিলেও ব্যক্তিগত দানের সাহায্যে কোনও রূপে জীবন ধারণ করিতে পারে। অন্নাভাব ঘটিলে দান বা সাহায্য বন্ধ হইয়া আসে, তখন যে যাহার নিজ নিজ প্রাণ পরিজন লইয়া ব্যস্ত হইয়া উঠে—অপরকে সাহায্য করিতে বিরত হয়। সেরূপ ক্ষেত্রে সমস্যার ভার লইয়া কোনও শক্তি বণ্টনের ব্যবস্থা করিলে সকলেই কিছু কিছু পাইয়া অভাবের সময়টা উদ্ধার করিবার আশায় বাঁচিতে পারে। মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র পরিবারে এই নীতি নিয়তই অনুসৃত হইতেছে। সুগৃহিণী (অনেক সময় নিজেকে বঞ্চিত করিয়া) সংগৃহীত দ্রব্য লোক হিসাবে বিভাগ করিয়া সকলকেই কিছু কিছু বণ্টন করিয়া দেন; তাহাতে সকলেই পায়। ধনীর গৃহেও এমন বস্তু আসে যাহা সকলেই ইচ্ছা করিলে প্রচুর পরিমাণে খাইতে বা পাইতে পারেন না। আমরা প্রতি-নিয়তই এই নির্দ্দিষ্ট বণ্টনের মধ্যে বাস করিয়া আছি, সুতরাং অভ্যাসের বশে ইহা আমরা তত বুঝিতে পারি না।

দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে এই বণ্টনের ব্যবস্থা সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই করিতে হয়। লোক সংখ্যা এবং প্রয়োজনীয় বস্তুর যোগানের পরিমাণ হিসাবে এই ব্যবস্থার গুরুত্ব ও কার্য্য-কারিতা নির্ভর করে। যদি মালের পরিমাণ প্রচুর হয়, তাহা হইলে তত চিন্তার কারণ হয় না। কিন্তু কোনও কারণে মালের যোগান কম হইলে তখন নানা অসুবিধা দেখা দিতে থাকে। প্রচুর ভোজ্য থাকিতেও, বহু লোক খাইতে না পাইতে পারে, কারণ ভোজ্য-ভাণ্ডারের চাবিকাঠি যদি শক্তিমান ভাণ্ডারী ছাড়িতে না চান, তাহা হইলে ঘরে ভোজ্য মজুত থাকিতেও অনাহার ঘটে। যখন বড় বড় কোম্পানী বারবার বাজার হইতে মাল ক্রয় করিয়া ভাণ্ডারজাত করিয়া বসিয়া থাকে, তখন সাধারণ গরীব গৃহস্থ মাল কিনিবার সুযোগ পান না। সেই ভাবে যদি দেশের নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য অপরের সাহায্যে বাহিরে চলিয়া যায়, নানা কারণে অপচয় ঘটিতে থাকে, যাঁহাদের প্রয়োজনাতিরিক্ত মাল আছে তাহা তাঁহারা ছাড়িতে না চান, তখন সাধারণকে বাঁচাইবার জন্য অনেক সময় অপ্রীতিকর ব্যবস্থার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। আমাদের দেশে না হইলেও অন্যান্য দেশে অন্নাভাবে চুরি ডাকাতি খুন জখম দ্বারা খাদ্যাদি উদ্ধারের চেষ্টা বুভুক্ষু লোকেই করিয়া থাকে। ইহা অপরাধ হইলেও যাহারা জীবনরক্ষার জন্য তাহা করিয়া থাকে, তাহা একেবারে সমর্থনযোগ্য নয়—তাহা বলা যায় না এবং সেই যুক্তিতে যখন অভাবের দিনে বণ্টন প্রথা প্রবর্ত্তিত হইতে থাকে এবং তাহাও যখন সকলের জন্য একই বিধির সাহায্যে হয়, তখন তাহার সম্পূর্ণ বিরোধিতা করা যায় না।

নীতি সমর্থন করিয়া যদি অন্য কোন দোষ ত্রুটী থাকে, তাহার পরিবর্ত্তন—এমন কি শক্তি থাকিলে উচ্ছেদ দ্বারা নূতন ব্যবস্থা করিতে হয়। যাহারা অতীত কার্য্যকলাপের দ্বারা সাধারণের আস্থা হারাইয়াছে, তাহারা এইরূপ কার্য্যের সম্পূর্ণ অনুপযোগী। তাহাদের প্রতি কার্য্যেই লোকে সন্দেহ প্রকাশ করে এবং তাহাতে বণ্টননীতির ভিত্তি দুর্ব্বল হয়। যে ভারপ্রাপ্ত লোক, সংসারে আয় বৃদ্ধির জন্য নিজের ভোজ্যের পরিমাণ ঠিক রাখিয়া গোপনে তণ্ডুল বিক্রয় করিয়া অপরকে অনাহারে রাখে, তাহার অপসারণ প্রয়োজন হইতে পারে, কিন্তু তাহা বলিয়া বণ্টননীতির সমর্থন করা যায় না—তাহা মনে করা সমীচীন নহে।

এইরূপ গুরুতর কার্য্যে, বিশেষতঃ রাষ্ট্রিক ব্যাপারে লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন ও স্বার্থ যখন বিপন্ন, তখন রাষ্ট্রনায়ক রাজপুরুষদের উপর আস্থাই প্রকৃত মূলধন। যেখানে সে আস্থা নাই, সেখানে পদে পদে দোষ ত্রুটী লক্ষিত হইবে, বিরুদ্ধ সমালোচনা জমিয়া উঠিবে এবং অশান্ত লোকে প্রকাশ্যে বা গোপনে বণ্টন সম্পর্কিত নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটাইতে চেষ্টা করিবে। মোট কথা বণ্টন প্রথার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

নানা কারণে ভারতবর্ষে অন্নাভাব ঘটিয়াছে এবং ১৩৪৯-১৩৫০ সালেই ইহার নগ্নমূর্ত্তি প্রকাশ পাইয়াছে। এই অভাব বাঙ্গালা, বোম্বাই, ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন ও মালাবারে প্রকাশ পায়। বাঙ্গালা ছাড়া সকল স্থলেই সরকারী বা বেসরকারীভাবে বাজারে মালের

সরবরাহ নিয়ন্ত্রিত হয়। বোম্বাই প্রদেশে ১৮ই বৈশাখ (২রা মে ১৯৪৩) হইতে সরাসরিভাবে সরকারী বণ্টননীতি অবলম্বিত হইয়াছে। বোম্বাই প্রদেশে, সাধারণতঃ বাঙ্গালার তুলনায় খাদ্য তণ্ডুলের যোগান কম—কিন্তু তাহা হইলেও সেখানে মহামারী হয় নাই। বাঙ্গালার মধ্যে কলিকাতা ও কলিকাতার উপকণ্ঠস্থিত কয়েকটী শিল্পবহুল স্থানে ১৭ই মাঘ (৩১শে জানুয়ারী ১৯৪৪) হইতে কঠোর বণ্টননীতি বা রেশনিং-এর ব্যবস্থা হইয়াছে।

কল্পনাতীত দুর্দ্দশা যাঁহারা নিজ চক্ষে ঘটিতে দেখিয়াছেন, তাঁহারা সহজ স্বভাববশেই এই নীতির প্রতি যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। প্রকৃত পক্ষে বহু ত্রুটী গলদ রহিয়াছে, যাহার বিপক্ষে নানা কথা বলা যায়। কিন্তু প্রতিদিন সরকারী মতামতের যে পরিবর্ত্তন প্রকাশিত হইতেছে, তাহাতে লোকের অসুবিধার অন্ত নাই। সরকারী কোনও আদেশ জারি হইবার পূর্ব্বে তাহা ভাবিয়া চিন্তিয়া প্রকাশ করা কর্ত্তব্য।

সাধারণ লোকে, এখন প্রতি বয়স্ক লোকের হিসাবে ১৬ সের চাউল ঘরে মজুত রাখিতে পারিবেন, ইহা কয়েকদিন পূর্ব্বে ১ মণ ১৬ সের ছিল। যাঁহারা ইহার অতিরিক্ত পরিমাণ রাখিতে চান, তাঁহারা সরকারী ছাড়পত্র লইবেন। (কিন্তু সাধারণ গৃহস্থ সম্ভবতঃ এককালীন ২০ মণের অধিক মজুত রাখিতে পারিবেন না)। এই ছাড়পত্র দিবার সময় রেশন কার্ড বা বরাদ্দ পত্রে এই অতিরিক্ত পরিমাণ চাউল কাটিয়া দেওয়া হইবে। নিয়ন্ত্রিত দ্রব্য অর্থাৎ চাউল, গম বা গমজাত দ্রব্য ও চিনি মাথা পিছু যথাক্রমে (বয়স্ক লোকের জন্য) আড়াই সের, দেড় সের ও এক পোয়া প্রতি সপ্তাহে দেওয়া হইবে। কোনও সপ্তাহে কেহ মাল না লইলে তাহা বাতিল হইয়া যাইবে। কোনও অনুপস্থিত লোকের জন্য, কোনও লোকের জন্য দুইবার (দুইখানি কার্ডের সাহায্যে) নিয়ন্ত্রিত খাদ্য লওয়া বা যাহার একখানি কার্ড আছে, তাহার জন্য অপর একখানি কার্ড সংগ্রহের চেষ্টা করা গুরুতর অন্যায় বলিয়া বিবেচিত হইবে।

জনসাধারণ অপেক্ষা সরকারের নিরপেক্ষতা ও কর্ম্মশক্তির উপর এই নীতির ফলাফল নির্ভর করিতেছে। লোক এমনিই যথেষ্ট ভয়গ্রস্ত আছে, আর নিত্য ভীতিপ্রদর্শনের প্রয়োজন নাই।

রেশনিংয়ে অব্যবস্থা—

গত ৩১শে জানুয়ারী হইতে কলিকাতায় রেশনিংপ্রথা চালু হইয়াছে এবং বহু প্রকার ত্রুটি সংশোধিত না হওয়া সত্ত্বেও উহা কার্য্যকরী হইয়াছে। মাত্র তিনটি খাদ্যদ্রব্য সম্বন্ধে রেশনিং হইয়াছে—(১) চাউল (২) গম ও গমজাত দ্রব্য (৩) চিনি। ইহা ছাড়া সরিষার তেল, লবণ, কেরোসিন তেল, ডাল প্রভৃতি জিনিষ সকলকে সাধারণ বাজার হইতে ক্রয় করিতে হইবে—অর্থাৎ সেগুলি বর্ত্তমান সময়ের (৩১শে জানুয়ারী) মত বাজারে পাওয়া যাইবে না বা মূল্য অত্যধিক হইবে। বর্ত্তমানে দুই টাকা সের দর দিয়া ও বাজারে নারিকেল তৈল পাওয়া যায় না, লবণের দর স্থানে স্থানে এক টাকা সের হইয়াছে, কেরোসিন তৈলের অভাবে অর্দ্ধেক লোককে অন্ধকারে রাত্রিযাপন করিতে হয়, চিনি 'সাদা বাজারে' না পাইয়া লোক 'কাল বাজারে' ১২ আনা সের দর দিতে বাধ্য হয়, ডাল কণ্ট্রোল দামের দ্বিগুণের কমে ক্রয় করা সম্ভব হয় না। হিন্দুদের গৃহদেবতার ভোগের জন্য কর্ত্তৃপক্ষ কোন প্রকার চাউলই বরাদ্দ করেন নাই। হিন্দু বিধবাদিগের জন্য আতপ চাউল প্রদানেরও তাঁহারা কোন প্রতিশ্রুতি দেন নাই। কলিকাতার লোক সংখ্যার অনুপাতে রেশনের দোকানের সংখ্যা কম হওয়ায় সেজন্য লোককে যে অসুবিধা ও দুর্ভোগ করিতে হইতেছে, তাহারও প্রতীকারের উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় নাই। অনেক লোক দুই বেলা ভাত খান, তাঁহাদের এক বেলার জন্য চাউল ও এক বেলার জন্য আটা দিলে তাঁহাদের অসুবিধা ও কষ্টের অন্ত থাকিবে না। সপ্তাহে ৪ সের খাদ্যও বহু লোকের পক্ষে পর্য্যাপ্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে না। তাঁহাদের আরও অধিক চাউল প্রয়োজন। তাঁহাদের জন্যও স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হওয়া উচিত। সকলে মোটা ও সরু একরকম চাউল খান না। হিন্দু বিধবারা যেমন আতপ চাউল ছাড়া সিদ্ধ চাউল খান না—তাঁহাদের ধর্ম্মে বাধে, তেমনই বহু লোক সরু চাউলের ভাত খাইতে অভ্যস্ত, তাঁহাদের মোটা চাউল দেওয়া হইলে তাঁহাদের উদরাময় প্রভৃতি রোগ হওয়ার সম্ভাবনা। সেইরূপ আটার পরিবর্ত্তে ময়দা না পাইলেও অনেকের বিষম অসুবিধা হইবে। যদি কর্ত্তৃপক্ষ এ সকল বিষয়ে চিন্তা না করিয়া কার্য্য করেন, তাহা হইলে লোক 'কাল বাজারে' যাইতে বাধ্য হইবে ও দেশে দুর্নীতি বাড়িবে। আইনের ভয়ে যে লোক দুর্নীতির আশ্রয় লইতে বিরত হয় না, তাহা গত কয় মাসের ঘটনার অভিজ্ঞতা হইতে বলা যায়। বহু রেশনিং অফিসে যাইয়া দেখা যায়, কর্ম্মচারীরা লোকের অভিযোগে এত বিরক্ত হইয়াছেন, যে তাঁহারা প্রায়ই সে বিষয়ে উদাসীন থাকেন। এইরূপ বহু অভিযোগের কথা বলিবার আছে, কিন্তু শুনিবে কে? কর্ত্তৃপক্ষ স্বৈরাচারের দ্বারা শাসন কার্য্য চালাইতে আগ্রহশীল—কাজেই আমরা অরণ্যে রোদন মাত্র করিয়াই সন্তুষ্ট হই।

ভারতে চিকিৎসকের অভাব—

দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনে চিকিৎসা-বিজ্ঞান শাখার সভাপতি ডাঃ কে-ভি-কৃষ্ণান বলিয়াছেন—ভারতে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা দানের ব্যবস্থা আরও ব্যাপক হওয়া উচিত। যে দেশে ৩৮ কোটি লোকের বাস, সে দেশে মাত্র ৩৭টি প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়। ভারতে লাইসেন্স প্রাপ্ত ডাক্তারের সংখ্যা মাত্র ৪২ হাজার। ডাক্তারের সংখ্যা ইহার ১০ গুণ হওয়া উচিত। সমগ্র ভারতে ১০টি মেডিকেল কলেজ ও ২৭টি মেডিকেল স্কুলে বৎসরে মাত্র ১৭শত নূতন ডাক্তার শিক্ষিত হন। ১৯১৪ সালে রাশিয়াতে ডাক্তারের সংখ্যা ছিল ২৫ হাজার। বৈজ্ঞানিক উপায়ে শিক্ষা পরিকল্পনার ফলে ১৯৪০ সালে তথায় ডাক্তারের সংখ্যা হইয়াছে—এক লক্ষ ২০ হাজার।

ফ্যাসিষ্ট বিরোধী লেখক সম্মেলন—

গত ১৫ই জানুয়ারী কলিকাতার ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে ফ্যাসিষ্ট বিরোধী লেখক সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র মূল-সভাপতি ও শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন। শ্রীযুক্ত মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়,

আবুল মনসুর আমেদ, গোপাল হালদার, শচীন দেববর্ম্মন, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য ও অতুল বসু বিভিন্ন শাখা সম্মিলনে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন।

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় শতবার্ষিকী—

গত ২৩শে হইতে ২৯শে জানুয়ারী এক সপ্তাহকাল স্বর্গত সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জন্মের শতবার্ষিক উৎসব সম্পাদিত হইয়াছে। ঐ উপলক্ষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে এক প্রদর্শনীও হইয়াছিল। ২৬শে জানুয়ারী বাঙ্গালার সকল বিদ্যালয়ে গুরুদাসের জীবন কথা আলোচনার জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। বহু মনীষী ব্যক্তি কয়দিন গুরুদাসের জীবনের বিভিন্ন দিকের আলোচনা করিয়াছেন। বর্ত্তমান ধর্ম্মহীন শিক্ষার দিনে গুরুদাসের মত ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তির আদর্শ সকলের নিকট প্রচার করার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে।

পরলোকে নেপালচন্দ্র রায়—

শান্তিনিকেতনের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ প্রসিদ্ধ কংগ্রেসকর্ম্মী নেপালচন্দ্র রায় মহাশয় গত ৮ই মাঘ শনিবার কলিকাতা বালীগঞ্জে ৭৭ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি সম্প্রতি হিন্দু মহাসভার সহিত একযোগে খুলনা জেলায় সেবাকার্য্য চালাইতেছিলেন। খুলনা জেলার মূলঘর তাঁহার বাসগ্রাম। প্রথমে তিনি কিছুদিন গ্রামের বিদ্যালয়ে ও সিটি স্কুলে শিক্ষকতা করিয়া এলাহাবাদে প্রধান শিক্ষক হইয়া যান। সেখান হইতে ফিরিয়া ১৯১০ হইতে ১৯৩৬ সাল পর্য্যন্ত তিনি রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। তিনি খুলনা জেলার কংগ্রেস আন্দোলনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং কতকগুলি স্কুলপাঠ্য পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন।

'ভারতের ইতিহাস' রচনা—

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদের চেষ্টায় ভারতের সম্পূর্ণ একখানি ইতিহাস রচনার জন্য যে ইতিহাস পরিষদ গঠিত হইয়াছিল, রাজেন্দ্রবাবু জেলে থাকা সত্ত্বেও তাহার কাজ অগ্রসর হইতেছে। সার যদুনাথ সরকার সাধারণ সম্পাদক হইয়া ২৪ খণ্ড পুস্তক প্রকাশ করিবেন। বোম্বায়ে ভারতীয় বিদ্যা ভবনে পরিষদের কার্য্যালয় স্থাপিত হইয়াছে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস্-চ্যান্সেলার ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার বোম্বাই হইতে সকল কার্য্য পরিচালনা করিবেন। তিন বৎসরের মধ্যে কার্য্য শেষ হইবে। আমরা এই শুভ চেষ্টার সাফল্য কামনা করি।

পরলোকে আর, এস, পণ্ডিত—

যুক্তপ্রদেশের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের স্বামী পুরাতন কংগ্রেস নেতা আর-এস পণ্ডিত গত ১৪ জানুয়ারী সকালে লক্ষ্ণৌ সহরে মাত্র ৫১ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার তিন কন্যা, তন্মধ্যে ২ জন আমেরিকায় শিক্ষালাভ করিতেছেন। পণ্ডিতজী প্রথম জীবনেই কংগ্রেসে যোগদান করেন এবং পরে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর কন্যা ও জহরলালের ভগিনীকে বিবাহ করেন। স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে একযোগে দেশ সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

যুদ্ধের ব্যয়ের হিসাব—

ভারত গভর্ণমেণ্টের দপ্তরখানা হইতে জানা গিয়াছে গত ১৯৩৯।৪০ হইতে ১৯৪৩।৪৪ এই ৫ বৎসরে ভারত রক্ষা ও সরবরাহ ব্যাপারে ভারত গভর্ণমেণ্টকে ৭ শত ১৫ কোটি টাকা ব্যয় করিতে হইয়াছে। তাহা ছাড়া বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ঐ বাবদে ভারতে ঐ কয় বৎসরে ৯ শত ২৬ কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছেন।

ছাত্রদের উপর লাঠি—

গত ১৮ই জানুয়ারী ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুল বন্ধ করার প্রতিবাদে কলিকাতার সকল স্কুল কলেজের ছাত্ররা হরতাল ও মিছিল করিয়াছিল। ছাত্রের দল মিছিল করিয়া থিয়েটার রোডে প্রধান মন্ত্রী সার নাজিমুদ্দীনের বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইলে প্রধান মন্ত্রী তাহাদের সহিত কথা বলিবার জন্য ৫ জন ছাত্রকে ভিতরে ডাকিয়া লইয়া যান। সে সময়ে যে সকল ছাত্র বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল, পুলিস তাহাদের উপর লাঠি চালাইয়াছিল। প্রধান মন্ত্রী পুলিসের ঐ কার্য্যের বিষয়ে তদন্ত করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

বেঙ্গল রিলিফ কমিটী—

গত ১৮ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত বেঙ্গল রিলিফ কমিটীতে জিনিষ ও নগদ টাকায় মোট ৩৫ লক্ষ টাকা সাহায্য সংগৃহীত হইয়াছে। ভারতের বিভিন্ন স্থান ছাড়াও কলম্বো, চীন, দক্ষিণ আফ্রিকা ও আমেরিকা হইতে সাহায্য আসিয়াছে।

বাঙ্গালায় আবার দুর্ভিক্ষ—

লণ্ডনের 'নিউজ ক্রনিকেল' পত্রের দিল্লীস্থ সংবাদদাতা জানাইয়াছেন—পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় এবার প্রচুর পরিমাণে ধান্য উৎপন্ন হওয়া সত্ত্বেও বাঙ্গালার লক্ষ লক্ষ অর্দ্ধাশন ক্লিষ্ট ও রোগ জর্জ্জরিত জনসাধারণের নিকট অধিকতর দুর্দ্দশা লইয়া পুনরায় দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। বিপদ কাটাইয়া উঠা গিয়াছে বলিয়া কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে যে আশা করা গিয়াছিল, তাহা বিলীন হইয়াছে।—এই সত্য কথা প্রকাশের জন্য সংবাদদাতা ভারতবাসী সকলের ধন্যবাদের পাত্র। পরে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট এই সংবাদের প্রতিবাদ করিয়াছেন।

ধান কাটার লোকাভাব—

রংপুর কুড়িগ্রাম হইতে সংবাদ আসিয়াছে, সেখানে ধানকাটার লোকের অভাবে আমন ধান ঠিক মত কাটা হইতেছে না। অনেক শ্রমিক মজুরী বেশী পাওয়াতে গ্রাম ছাড়িয়া শিল্পাঞ্চলে চলিয়া গিয়াছে। যাহারা এখন আছে তাহাদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোকই ম্যালেরিয়া বা অন্যান্য রোগে ভুগিতেছে।—শুধু কুড়িগ্রামে নহে, বাঙ্গালার বহু স্থানে এবার এই অবস্থা হইয়াছে। খাদ্যাভাবে জীর্ণ দেহ সহজেই রোগাক্রান্ত হয়—কাজেই উহার প্রতীকারের উপায় নাই।

খাদ্যশস্য বিভ্রাট—

গত আগষ্ট মাসে গভর্ণমেণ্ট হইতে কলিকাতা কর্পোরেশনের শ্রমিকদের জন্য যে খাদ্যশস্য সরবরাহ করা হইয়াছিল, তাহা

অখাদ্য বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় সেই বিষয় লইয়া কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষকে গভর্ণমেন্টের সরবরাহ বিভাগের সহিত বিবাদ করিতে হইয়াছে ও পরে সে বিবাদের মীমাংসা হইয়াছে। সম্প্রতি আবার গভর্ণমেণ্ট কতকগুলি খাদ্য শস্য মনুষ্যের গ্রহণের অনুপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিয়া বিক্রয় করিতেছেন—তাহা নাকি পশু খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হইবে। ইতিমধ্যে কত অখাদ্য যে খাদ্য হিসাবে সাধারণকে দেওয়া হইয়াছে এবং কত গ্রহণের অনুপযুক্ত চাল, ডাল, আটা খাইয়া আমাদের মত লোককে মরিতে হইয়াছে, তাহার হিসাব নাই। যে সময়ে দেশে খাদ্যশস্যের অভাবে লক্ষ লক্ষ লোক মারা যাইতেছিল, সেই সময়ে এই সব মাল কোথায় মজুত থাকিয়া নষ্ট হইয়াছে, সে বিষয়ে তদন্ত করা কি গভর্ণমেণ্ট কর্তব্য বলিয়া বিবেচনা করেন না। অবিলম্বে এ বিষয়ে তদন্ত হইয়া অপরাধীর শাস্তি হওয়া প্রয়োজন। যাহাতে এইরূপ ব্যাপার পুনরায় না ঘটে সে জন্যও লোক সতর্ক থাকিতে পারিবে।

ত্রিপুরায় ভয়াবহ অবস্থা—

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ত্রিপুরা জেলায় সফর করিয়া আসিয়া জানাইয়াছেন, সদর ও ব্রাহ্মণ-বাড়িয়ার কতকগুলি স্থানে বহু জেলে, নমশূদ্র ও মুচি বাস করিত। ঐ সকল শ্রেণীর প্রায় ১২ আনা লোক অনাহারে ও খাদ্যাভাব-জনিত রোগে মারা গিয়াছে। অবশিষ্ট ৪ আনা লোক তাহাদের যথাসর্বস্ব বিক্রয় করিয়া নিরাশ্রয় হইয়াছে। ঐ অঞ্চলে জানুয়ারী মাসের প্রথমেও চাউলের মূল্য ২০ টাকা ছিল। এই ব্যাপক দুর্ভিক্ষে কে কাহাকে রক্ষা করিবে?

ষ্টেটস্‌ম্যানের দুর্ভিক্ষ পুস্তিকা—

বাংলার দুর্ভিক্ষ ও সরকারী ঔদাসীন্য সম্বন্ধে ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় যে সকল সম্পাদকীয় প্রবন্ধ, ছবি ও পত্রাদি ছাপা হইয়াছিল, সেইগুলি একত্রিত করিয়া উক্ত পত্রিকার কর্তৃপক্ষ Mal-administration in Bengal নামক পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন। বাংলার চরম দুর্দ্দশার দিনে রাজরোষের ভয়ে অথবা যে কোন কারণেই হউক, অন্যান্য ভারতীয় পত্রিকাগুলি যখন প্রায় নিঃশব্দ ছিল, তখন ষ্টেটস্‌ম্যান কাগজেই সর্বপ্রথম বাংলার দুর্ভিক্ষ ও জনসাধারণের অন্নাভাবে শোচনীয় মৃত্যুর সংবাদ সচিত্র প্রকাশিত হয়। দুর্ভিক্ষের কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া বাংলা সরকার, ভারত সরকার ও ভারত সচিব—ইহাদের সকলকেই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষে দায়ী সাব্যস্ত করিয়া পুস্তিকা-খানিতে প্রত্যেকের কার্য্যের তীব্র সমালোচনা করা হইয়াছে। যদিও ইহাতে কংগ্রেসী দল, হক-শ্যামাপ্রসাদ মন্ত্রীমণ্ডলী ও হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের উগ্রভাষায় অহেতুক নিন্দা এবং ইউরোপীয় স্বার্থ সংরক্ষণসূচক সকল প্রকার সম্ভব-প্রচেষ্টা দেখা যায়—তবু জীবনমরণের সন্ধিক্ষণে আমাদের অসহায় অবস্থার কথা যে আন্তরিকতার সহিত ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকা দেশে দেশে পৌঁছাইয়া দিয়া অগণিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সহানুভূতি আদায় করিয়াছেন, তাহার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। সংবাদপত্রের প্রাত্যহিক বিবরণ নূতন সংবাদের ভিড়ে চাপা পড়িয়া যায়; পুস্তিকাখানির প্রকাশে ও বিনামূল্যে বিতরণের ব্যবস্থায় মানুষের সৃষ্ট এই সর্বগ্রাসী দুর্ভিক্ষের ধারাবাহিক ইতিহাস মানুষের কাছে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিল।

স্বাধীনতা দিবসে পুলিশের লাঠি—

গত ২৬শে জানুয়ারী কলিকাতায় স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে যে জনসভা হইয়াছিল, পুলিস তথায় লাঠি চালাইয়া সভাভঙ্গ করিয়া দিয়াছে ও ফলে কয়েকজন আহত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। ঐ দিন কর্পোরেশনের সভাতেও স্বাধীনতার সঙ্কল্প পঠিত হইয়াছিল। এই লাঠি-চালানো সম্বন্ধে তদন্ত হওয়া উচিত। পুলিস ত সভা আহ্বান নিষিদ্ধ করে নাই—কাজেই লাঠি চালনার কি প্রয়োজন হইয়াছিল তাহা জানিবার জন্য সকলেই উৎসুক আছেন।

বরিশালে বসন্ত—

১৫ জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, গত এক মাসকাল বরিশাল সহরে এত অধিক বসন্ত হইয়াছে যে বহুলোক ঐ রোগে মারা গিয়াছে। মিউনিসিপালিটী রোগের প্রকোপ কমাইতে না পারিয়া ১৪ই জানুয়ারী হাট, বাজার, ভোজনাগার, লঙ্গরখানা, দুধ-সত্র, চায়ের দোকান, মিঠায়ের দোকান, রেস্তোরা, স্কুল, পাঠশালা সমস্তই সাময়িকভাবে বন্ধ করিয়া দিয়াছেন, কদাহার ও অর্দ্ধাহারের ইহাই স্বাভাবিক পরিণতি।

বিলাতে ভারতীয় নাগরিক—

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বৈদ্য লণ্ডনে বাস করেন এবং আমেরিকার 'টাইম' ও 'লাইফ' সংবাদপত্রের লণ্ডনস্থ সম্পাদকীয় মণ্ডলীতে কাজ করিয়া জীবিকার্জ্জন করেন। তাঁহার বয়স ৩৩ বৎসর। বৃটীশ সৈন্যদলে যোগদানের জন্য তাঁহার নামে এক পরোয়ানা বাহির হইয়াছিল—তিনি উহা অমান্য করায় গত ১৮ই জানুয়ারী তাঁহাকে আদালতে হাজির করা হইয়াছিল ও পুলিশের হাতে সমর্পণ করা হইয়াছে। তিনি ভারতীয় নাগরিক বলিয়া নিজেকে পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার সে আপত্তি টিকে নাই।

নূতন পৃথিবী সৃষ্টি বা আবার যুদ্ধ—

মিঃ লুই ফিসার খ্যাতনামা আমেরিকান সাংবাদিক। তিনি 'এম্পায়ার' নামক যে নূতন পুস্তক লিখিয়াছেন তাহাতে বলিয়া-ছেন—"এই যুদ্ধে হয় নূতন পৃথিবীর সৃষ্টি হইবে, নতুবা আর একটি নূতন যুদ্ধ বাধিবে।" নেতৃবৃন্দ যদি মিঃ ফিসারের এই সব কথা কানে না তোলেন, তবে জনসাধারণকে সে কথা শুনিতে হইবে। যদি আর কেহ আমাদের রক্ষা না করে, তবে আমাদিগকেই আমাদের রক্ষা করিতে হইবে।—মিস্ পার্ল বাক 'এম্পায়ার' পুস্তকের সমালোচনা প্রসঙ্গে উপরোক্ত কথাগুলি বলিয়াছেন। কথাগুলি জগতের সকলের চিন্তার বিষয়।

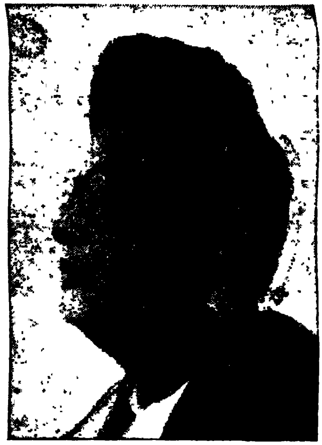
উড়িষ্যার চাল আমদানী—

উড়িষ্যা গভর্ণমেণ্ট বাঙ্গালার লোকদের জন্য বাঙ্গালা গভর্ণ-মেণ্টকে ১১ টাকা মণ দরে চাউল বিক্রয় করিতে সম্মত হইয়াছেন; সেই চাউল যাহাতে বেশী দামে বাঙ্গালায় বিক্রীত না হয়, সে নির্দেশও তাঁহারা দিয়াছেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার লোক কি ঐ চাউল সাড়ে ১২ টাকা মণ দরে পাইবে?

বৈজ্ঞানিকদের বার্ষিক অধিবেশন—

গত ৩রা জানুয়ারী হইতে ৬ই জানুয়ারী দিল্লীতে বিজ্ঞান কংগ্রেসের একত্রিংশ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়া গেল। ত্রিবাঙ্কুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে এই অধিবেশন ত্রিবান্দ্রমে হইবার কথা ছিল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ অনেক আয়োজন সম্পন্ন করিয়াছিলেন। যাতায়াতের হঠাৎ অসুবিধা সৃষ্টি হওয়ায় দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের নিমন্ত্রণে এই প্রথম বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন ভারতের রাজধানী দিল্লীতে হইল। বড়লাট লর্ড ওয়াভেল কংগ্রেসের উদ্বোধন করেন এবং ভারতের কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য ইত্যাদি জাতির জীবনের নানা অঙ্গে যে বিজ্ঞান চর্চ্চার প্রলেপ খুব গভীর ভাবে প্রয়োজন, তাহার উপর জোর দিয়া বৈজ্ঞানিকদের আরো ব্যাপকভাবে দেশের সমস্যার সহিত জড়িত করিয়া বিজ্ঞানানুশীলন করিতে অনুরোধ করেন। বড়লাট বিলাত হইতে আসিবার সময় ভারতের হীন অবস্থার প্রতি দৃষ্টি দিয়া বলিয়াছিলেন—যুদ্ধের জন্য এত অর্থসামর্থ্য প্রতি দেশের পক্ষে সম্ভব হয় কিন্তু শান্তির মধ্যেও যে অদৃশ্য দানবত্রয় দারিদ্র্য, রোগ ও শিক্ষার অভাব—প্রতি দেশকে হীনবল করিয়া রাখে তাহার সংহারের জন্য অর্থের জোগান সকল দেশের পক্ষে সম্ভব হয় না কেন? এই ইঙ্গিতের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বড়লাটকে ধন্যবাদ দেওয়ার সময় কংগ্রেসের পক্ষ হইতে বৈজ্ঞানিকদের পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেওয়া হয়। গভীর পরিতাপের বিষয় যে বৈজ্ঞানিকদের এই বৃহৎ মণ্ডলীকে রাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থায় যথোচিত বুদ্ধি ও কর্ম্ম দিয়া সাহায্য করিতে ভারত সরকার কখনও অগ্রণী হন নাই। অনেক বিজ্ঞান-প্রসারের বা চর্চ্চার প্রয়াসে অর্থানুকুল্য গভর্ণমেণ্ট করিয়া থাকেন কিন্তু সরকারী কাজে নিযুক্ত বৈজ্ঞানিক বাদে সর্ব্বদেশব্যাপী যে এক বিরাট বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি-সম্পন্ন দল গড়িয়া উঠিতেছে—অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় ও নানা শিল্পে নিযুক্ত বৈজ্ঞানিকের দল—তাঁহারা তাঁহাদের মতামত রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষের সমক্ষে উপস্থিত করিবার সুযোগ পান নাই। সম্প্রতি বিলাতের রয়াল সোসাইটির সম্পাদক ও পার্লামেণ্টের সভ্য অধ্যাপক এ, ভি, হিল (ইনি চিকিৎসাশাস্ত্রে নোবেল প্রাইজ পাইয়াছিলেন—মাংসপেশীর কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া) ভারত গভর্ণমেণ্টকে বিজ্ঞান চর্চ্চার প্রসারকল্পে উপদেশ দিতে আসিয়াছেন। তিনি ভারতের বৈজ্ঞানিকদিগকে সাড়ম্বরে সম্মান দেখাইলেন। যে চারিজন (গত ৬।৭ বৎসরের মধ্যে) রয়াল সোসাইটির সদস্য ভারত হইতে নূতন নির্ব্বাচিত হইয়াছেন তাঁহাদের স্বাক্ষর সোসাইটির নিয়মানুযায়ী ২৬১ বৎসরের খাতায় লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য বিজ্ঞান কংগ্রেসের সমাবেশের সুযোগে রয়াল সোসাইটির সভা সর্ব্বপ্রথম বিদেশে হইল। সাহনি, কৃষ্ণন, ভাবা, ভাটনাগর এই চারিজনের মধ্যে শেষের দুইজন স্বাক্ষর করিবার সুযোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন। হিল সাহেবের বক্তৃতায় প্রথম আমরা জানিলাম যে ১০২ বৎসর আগে ১৮৪১ সালে সর্ব্বপ্রথম ভারতীয়—যিনি রয়াল সোসাইটির সদস্য ছিলেন তিনি—এক পার্শী জাহাজের ইঞ্জিনিয়ার কুরশেটজী। হিল সাহেব এক সন্ধ্যায় বক্তৃতা দিয়াছিলেন বিলাতের বিজ্ঞান চর্চ্চার প্রতিষ্ঠানদের বিবরণ এবং তাহাদের পারস্পরিক সহযোগিতার বিষয় লইয়া। সেই প্রসঙ্গে ভারতের বৈজ্ঞানিকদের একতাবদ্ধ হইয়া প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে এবং দেশের মধ্যে আরো সবল বৈজ্ঞানিক চর্চ্চার আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে বলেন। উপদেশ অনেকটা রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যা সমাধানের স্পর্শদুষ্ট বলিয়া মনে হইল। যে কাঠামোতে বিজ্ঞান চর্চ্চা চলিতেছে এবং বৈজ্ঞানিকেরাও প্রায়ই দেশের সমস্যা ছাড়িয়া যে রকম অবান্তর বিষয়ে গবেষণা বলিয়া কাজ করিতেছেন তাহাতে দেশের প্রতি বৈজ্ঞানিকদের দানের অভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে, কিন্তু এই অবস্থার মূলটাকে অস্পষ্ট করিয়া রাখা হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক ও দেশের জনগণের মধ্যে এখনও কোন সেতু নির্ম্মাণ হয় নাই। টুকরা টুকরা নানা বিচ্ছিন্ন খবর ছাড়া আমাদের দেশের লোক এখনও বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিকদের চিন্তার ধারা এবং কার্য্যের প্রণালী সম্বন্ধে অজ্ঞ। অনিষ্টকারী রূপ ছাড়া বিজ্ঞানের সৃষ্টি প্রতিভার পরিচয় দেশের সমক্ষে প্রকাশ করা বৈজ্ঞানিক মহলের নিজেদের কর্ত্তব্য।

এইবারের অধিবেশনে মূল সভাপতি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু। আইনষ্টাইনের সঙ্গে তাঁহার গবেষণাপ্রসূ বস্তুর বাহ্যিক গুণাগুণের মাপকাঠির এক নূতন পদ্ধতি (Bose-Einstein statistics) আজ সমগ্র জগতে পরিচিত। তিনি বস্তুর গুণের পরিমাণের জন্য যে কণায় অস্তিত্ব স্বীকার (Quantun theory) প্রচলিত হইয়াছে তাহার বিকাশের বিবরণ সম্বন্ধে অভিভাষণ দিয়াছেন। বিভিন্ন ১২টী শাখায় একটি দেশের সমস্যাকে কেন্দ্র করিয়া সভাপতিরা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। অঙ্কশাখায় অধ্যক্ষ বি,এম, সেন নূতন অঙ্ক পদ্ধতির বিবরণ দিয়াছেন। পদার্থ-বিদ্যাশাখায় দিল্লীর অধ্যাপক কোঠারী আকাশের তেজোহীন গ্রহ-উপগ্রহের বস্তুর বিশ্লেষণ করিয়াছেন। রসায়ন শাখায় পাটনার অধ্যাপক রায় তাঁহাদের শাস্ত্রের এক অধ্যায় বিবৃত করিয়াছেন। ভূতত্ত্ব শাখায় বোম্বাইয়ের অধ্যাপক কালাপেসী বোম্বাই দ্বীপপুঞ্জের বিবরণ দিয়াছেন। উদ্ভিদ বিজ্ঞানশাখায় যুক্তপ্রদেশের



আচার্য্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু

সরকারী উদ্ভিদবিদ্ ডাঃ সাবনীস অর্থকরী বৃক্ষলতার বিকাশ ও প্রচলন বিবৃত করিয়াছেন। প্রাণীতত্ত্বশাখায় লাহোরের অধ্যাপক ভীষ্মনাথ প্রাণীকোষের প্রজননের নানা মতবাদ বিশ্লেষণ করিয়াছেন। মিঃ এলুইন (মধ্যভারতের বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ্, যিনি নিজে এক আদিম রমণীকে বিবাহ করিয়াছেন) নৃতত্ত্বশাখায় তাঁহার অভিভাষণে এই শাখাগত অনুশীলন ও চর্চ্চার ভুলত্রুটির বিষয় আলোচনা করিয়া উৎসাহী নূতন কর্ম্মীদিগকে সচেতন করিয়াছেন। কলিকাতার ইনষ্টিটিউট অব হাইজিনের অধ্যাপক কৃষ্ণন রোগ-চিকিৎসাশাখায় ভারতের চিকিৎসা বিদ্যার সংস্কারের পথ নিয়া আলোচনা করিয়াছেন। শরীর বিদ্যাশাখায় আগ্রার অধ্যাপক মাথুর আমাদের শরীরের পক্ষে বেশীমাত্রায় বিষ বলিয়া পরিগণিত কারবন ডাইঅক্সাইড গ্যাসের শরীর ক্রিয়ায় প্রয়োজনীয়তা বিবৃত করিয়াছেন। শিক্ষাশাখায় ভারত গভর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিষয়ে উপদেষ্টা মিঃ সার্জ্জেণ্ট তাহার তিনশত কোটি টাকায় শিক্ষা প্রসারের পরিকল্পনা পেশ করিয়াছেন। এই বিষয়ে সরকারী দপ্তরখানার জন্য তাঁহার স্মারকলিপি ইতিপূর্ব্বেই নানা স্থানে আলোচিত হইয়াছে এবং তাহার পরিকল্পনা হয় সমূলে গ্রহণ করিতে হইবে, আর না হয় তাহার কোন কার্য্যকরী ক্ষমতা থাকিবে না। শিল্প-বিদ্যাশাখায় টাটার লোহার

কারখানার অধ্যক্ষ মিঃ গান্ধী ভারতের পক্ষে শিল্প প্রসারের জন্য বিজ্ঞান চর্চ্চার উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অভিভাষণ ব্যতীত গবেষণার চলাচল সম্বন্ধীয় প্রবন্ধপাঠ বিজ্ঞান কংগ্রেসের এক মুল বিষয়। তাহা ছাড়া সর্ব্ব দেশে বিস্তৃত নানা বৈজ্ঞানিকমণ্ডলী এই কংগ্রেসের সুযোগে মিলিত হইয়া আলোচনা বৈঠক ও বিশদ বক্তৃতার ব্যবস্থা করেন। খাদ্য সমস্যার নানা দিক—পুষ্টি, শস্য উৎপাদন, কৃষি পদ্ধতির উন্নতি—এইবারের অধিবেশনে আলোচিত হইয়াছে। ভারতে ফটোগ্রাফীর সরঞ্জাম তৈয়ারীর গবেষণাপ্রসূ ফল এক বৈঠকে আলোচিত হইয়াছে। বিদ্যুৎ-শক্তি সাহায্যে রাসায়নিক শিল্পের প্রতিষ্ঠা আর এক আলোচনার বিষয় ছিল। বিবিধ ঔষধের গুণাগুণ নির্দ্ধারণের জন্য প্রাণীর উপর পরীক্ষার উপায় চিকিৎসা শাখা ও শরীর বিদ্যাশাখার আলোচনা-বৈঠকের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

অধিবেশন সাধারণতঃ সপ্তাহব্যাপী হয়। আগামী বৎসর নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয় অধিবেশনের ব্যবস্থা করিবেন এবং ভারত সরকারের বৈজ্ঞানিক গবেষণার অধ্যক্ষ স্যার শান্তিস্বরূপ ভাটনাগর এফ-আর-এস মূল সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

যদিও বার্ষিকঅধিবেশনের বিবরণী চারি খণ্ডে ইণ্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস এসোসিয়েশন প্রকাশ করিতেছেন, তবুও জনসাধারণ কিন্তু তাহাদের তিমির সাগরের মজ্জমান অবস্থা হইতে পরিত্রাণ পাইবার কোন সুযোগ পায় না। তাহাদের উপযোগী খবর ও বিবরণীর অংশ সুলভ মূল্যে প্রকাশের ব্যবস্থা করা এসোসিয়েশনের কর্তৃপক্ষের চিন্তার বিষয় বলিয়া আমরা মনে করি। অনেক গবেষণার বিষয় সাধারণ লোক জানিতে পারিলে অর্থানুকুল্য ও অন্যবিধ সহযোগিতা সুলভ হইয়া উঠিবে।

অখিল ভারত হিন্দু যুব-সম্মেলন—

অমৃতসরে নিখিল ভারত হিন্দু-মহাসভার রজত-জয়ন্তী অধিবেশনের সময় তিলকনগরে অগ্নিদল শিবিরে মহীশূরের জনপ্রিয় নেতা শ্রীযুক্ত ভূপালচন্দ্র শেখরিয়া এম-এল-এ মহাশয়ের সভাপতিত্বে অখিল ভারত হিন্দু যুব-সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। ১৯৪৪ সালের জন্য নিম্নলিখিত কর্ম্মকর্ত্তা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সভাপতি—স্বাতন্ত্র্যবীর ভি, ডি, সাভারকর; কার্য্যকরী সভাপতি —অধ্যাপক ভি, জি, দেশপাণ্ডে; সহ-সভাপতিগণ—শ্রীযুক্ত ভূপালচন্দ্র শেখরিয়া, গঙ্গারাম খান্না, ত্রিশূলধারী রবি কোঁদাদিয়া (ডিরেক্টর অগ্নিদল), ডাঃ এল, ডি, সাভারকর, ডাঃ সন্তোষকুমার মুখার্জ্জী, এস, ভি, গণপতি। সম্পাদক—মিঃ এম্, সর্ব্বাধিকারী; যুগ্ম সম্পাদক—শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ন, এন্, কে, কিঙ্কর।

প্রাচ্যবাণী—

ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী ও ডক্টর রমা চৌধুরী ভারতীয় সংস্কৃতির আলোচনার জন্য যে প্রাচ্যবাণী মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহার মুখপত্ররূপে ইংরাজি প্রাচ্যবাণী পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত পত্রিকায় দেশী বিদেশী বহু মণীষীর রচনা প্রকাশিত হইয়াছে। ভারতীয় সংস্কৃতির গবেষণা ও প্রচারের জন্য ডক্টর চৌধুরীদ্বয়ের এই চেষ্টা সর্ব্বথা প্রশংসনীয়।

বনগ্রামে শ্রীমধুস্মৃতি—

যশোহর জেলার বনগ্রামের অধিবাসীরা তথায় যশোহরের অমরকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের স্মৃতি রক্ষায় মনোযোগী হইয়াছেন। সে জন্য তাঁহারা খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সভাপতি করিয়া 'শ্রীমধুসূদন স্মৃতি সমিতি' প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সমিতি বনগ্রামে মধুসূদনের নামে একটি পার্ক, মধুসূদন হল ও তৎসংলগ্ন গবেষণা পাঠাগার এবং মহাকবির মর্ম্মর মূর্ত্তি স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন। সে জন্য অর্থ সংগ্রহ করা হইতেছে। আমাদের বিশ্বাস, মাইকেল মধুসূদনের স্মৃতিরক্ষায় অর্থের অভাব হইবে না।

কানাডার দান—

১১ই জানুয়ারী নয়া দিল্লীর খবরে প্রকাশ—ভারতের দুর্ভিক্ষে সাহায্যের জন্য কানাডা ভারতকে যে পরিমাণ গম দিতে স্বীকৃত হইয়াছিল তাহার মধ্যে ১০ হাজার টন গম ভারতবর্ষে পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। জাহাজে স্থানের অভাবে ইহার পূর্ব্বে গম পাঠান সম্ভব হয় নাই। কিন্তু বাহির হইতে গম আসিলেও আটার দাম আগের মত ৪ টাকা মণ হইবে ত?

শিল্প ও সাহিত্য—

কলিকাতা সাহিত্যিকার এক অধিবেশনে শিল্পী শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র ভূষণ গুপ্ত 'আধুনিক চিত্রকলা ও রবীন্দ্রনাথ' বিষয়ে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। সেই সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাগেশ্বরী অধ্যাপক শিল্পী শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার



শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

গঙ্গোপাধ্যায় একখানি পত্র লিখিয়া জানাইয়াছিলেন—"শিল্পীরা সাহিত্য জগতের হরিজন। নিরক্ষরতার কলঙ্ক কপালে নিয়ে আমরা বিদ্বৎ সমাজে, সাহিত্যের চণ্ডীমণ্ডপে, উপস্থিত হইতে ভয় পাই; কিন্তু শিল্পী হিসাবে আমার ইচ্ছা আছে—সাহিত্যসেবী বন্ধুদের সাহিত্যরসে রঞ্জিত করিয়া তাঁহাদিগকে রূপরসে রসিক করিয়া তুলি। সাহিত্য-রসিক ও রূপ-রসিক মণীষীরা পরস্পরের ছোঁয়াচ বাঁচাইয়া, ভিন্ন ভিন্ন কোঠায় বাসা বাঁধিয়া থাকিবেন—ইহা কোনও শিক্ষিত সমাজের পক্ষে স্বাস্থ্যকর নহে। যাঁরা রূপ-শিল্পের উত্তরাধিকারী, যাঁরা সেবক, যাঁরা সাধক, মনুষ্যত্বচর্চ্চার

ক্ষেত্রে, কৃষ্টির রাজ্যে, তাঁরা সাহিত্য সেবীদের প্রতিদ্বন্দ্বী নহেন, তাঁরা সহকর্ম্মী ও সহায়ক-সহকারী। এই দুই ভ্রাতার সম্মিলিত সাধনায় সারস্বত আয়তনের পূজা সার্থক হয়ে উঠবে।" গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের এই ইচ্ছা পূর্ণ হউক, আমরাও তাহাই কামনা করি।

বহরমপুরে অনাথ আশ্রম—

বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট মুর্শিদাবাদ বহরমপুরে ২২ একর জমী লইয়া একটি অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন ও তথায় একশত অনাথ শিশু রাখার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ঐ জমীতে ধান, গম প্রভৃতি চাষ করা হইবে; সঙ্গে পেঁপে, কলা, লেবু প্রভৃতির গাছ লাগান হইবে। ৪ বিঘা জমীতে ফলের বাগান এবং একটি বড় পুকুরে মাছের চাষ করা হইবে। পরে আরও শিশুকে ঐ আশ্রমে রাখার ব্যবস্থা করা হইবে।

দিল্লীতে চারুশিল্প প্রদর্শনী—

গত ১৬ই মাঘ নয়াদিল্লীর করোলবাগে স্থানীয় প্রবাসী বাঙ্গালীদের রসচক্র সংঘের চেষ্টায় সরস্বতী পূজার সহিত একটি চারুশিল্প প্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে। বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি প্রদর্শনীতে যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ গুপ্ত, রামগোপাল রায়, বিমল মজুমদার, অমিয় গুপ্ত, পরেশ সেন, মণি সেন, শঙ্কর কুণ্ডু, অবনী বন্দ্যোপাধ্যায়, নলিন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির চেষ্টায় উৎসব সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল।

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন—

আগামী ৯ই এবং ১০ই মার্চ দোলযাত্রার ছুটীতে দিল্লীতে প্রবাসীবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের একবিংশতি বার্ষিক অধিবেশন



সার মহম্মদ আজিজুল হক

হইবে। উক্ত অধিবেশনের বহুবিধ কর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য দিল্লীর ও নয়া দিল্লীর অধিবাসীদের মধ্য হইতে প্রয়োজনীয় সমিতিগুলি গঠন করা হইয়াছে। ভারত সরকারের বাণিজ্যসচিব স্যার মহম্মদ আজিজুল হক অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত দেবেশচন্দ্র দাশ, আই-সি-এস মহোদয় প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত



শ্রীযুক্ত দেবেশচন্দ্র দাস

হইয়াছেন। প্রধান অধিবেশন ব্যতীত সাহিত্য, সঙ্গীত, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন এবং "প্রবাসী" বাঙ্গালা সম্বন্ধে আরও ছয়টী শাখা অধিবেশন হইবে। বাঙ্গালী সাহিত্যিকগণকে এই সমস্ত অধিবেশনে যোগদান করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ রায়—

সাউথ সুবার্ব্বন অর্থাৎ বেহালা মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ রায় গত ১৫ই জানুয়ারী বেহালা মিউনিসিপালিটীর সাধারণ নির্ব্বাচনে বিনাবাধায় কমিশনার নির্ব্বাচিত হইয়াছেন; তিনি বর্ত্তমানে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারীর কাজ ও করিতেছেন।

গুড় সরবরাহ—

বাঙ্গালা দেশে চিনির মত গুড়ও একটি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য। গত বৎসর হইতে চিনির মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গুড়ের দামও বাড়িয়া গিয়াছে। সময়ে সময়ে চিনির দাম অপেক্ষা গুড়ের দাম বেশী হইতে দেখা যায়। অথচ বিহার, যুক্ত প্রদেশ ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ হইতে খবর আসিয়াছে তথায় সাড়ে ৪ লক্ষ টন গুড় জমা হইয়া আছে—যান বাহনের অভাবে তাহা বাঙ্গালায়

প্রেরিত হয় নাই। তথায় গুড়ের মণ সাড়ে ৫ টাকা—আর এখন এখানে নূতন গুড় উঠা সত্বেও গুড়ের মণ ২০ টাকা। সরকার কি অন্য প্রদেশ হইতে গুড় আনাইবার ব্যবস্থা করিতে পারেন না?

ধান চাউলের সর্বোচ্চ মূল্য—

বাঙ্গালার বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে—১৫ই জানুয়ারী হইতে বর্দ্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, যশোহর, খুলনা, ময়মনসিংহ, বাখরগঞ্জ, রাজসাহী, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ী, বগুড়া ও মালদহ জেলায় ব্যবসায়ীরা পাইকারী ১৪ টাকা মণ দরে এবং কৃষক ও চাউলের কলের মালিকরা ১৩৷০ মণ দরে চাউল বিক্রয় করিতে পারিবেন। ধান ব্যবসায়ীরা পাইকারী ৮৷০ মণ দরে ও কৃষকগণ ৮ টাকা মণ দরে বিক্রয় করিবেন। কলিকাতায় ও অন্যান্য জেলায় চাল যথাক্রমে ১৫ ও ১৪৷০ মণ দরে এবং ধান ৯৲ ও ৮৷০ মণ দরে বিক্রীত হইবে। ইহাই সর্ব্বোচ্চ মূল্য—গভর্ণমেণ্ট পরে ধান ও চাউলের সর্বনিম্ন মূল্য স্থির করিয়া দিবেন।

দুর্ভিক্ষ ও বেশ্যাবৃত্তি—

গত ১০ই জানুয়ারী কলিকাতা চৌরঙ্গী ওয়াই-এম-সি-এ হলে ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক সভায় বলা হইয়াছে—বাঙ্গালা দেশের দুর্ভিক্ষের ফলে গ্রামে গ্রামে শত শত স্ত্রীলোক নিরাশ্রয় হইয়াছে—তাহারা যাহাতে বেশ্যাবৃত্তি করিতে বাধ্য না হয়, সেজন্য দেশবাসী সকলের সমবেতভাবে চেষ্টা করা উচিত। ঐ সভায় বহু মহিলা উপস্থিত ছিলেন এবং ঐ বিষয়ে কাজ করিবার জন্য বহু মহিলা প্রতিনিধিকে লইয়া একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। কিন্তু বিষয়টি এমন গুরুতর যে এ বিষয়ে উপযুক্ত প্রচারকার্য্য না চালাইলে কোন ফললাভ করা সম্ভব হইবে না। আমরা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রকেই এ বিষয়ে মনোযোগী হইতে অনুরোধ জানাইতেছি।

হাইকোর্টের মন্তব্য—

কোন ঠিকাদার একজন সরকারী কর্ম্মচারীকে নগদ ২৫ টাকা ও ১ বোতল মদ ঘুস দিতে যাইয়া ধরা পড়ায় তাহার ৬মাস সশ্রম কারাদণ্ড হয়। ঐ দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল হয়—বিচারপতিরা পূর্ব্ব দণ্ডাদেশ বহাল রাখিয়া মন্তব্য করিয়াছেন—'আশ্চর্য্যের কথা এই যে, যে সময় বড় বড় ঘুসের কথা সহরময় প্রচারিত, তখন এই সামান্য ঘুসের মামলা আদালতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।" পূর্ব্বেও হাইকোর্টে কয়েকটি ঘুসের মামলার বিচারের সময় বিচারপতিরা এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।

কর্পোরেশনে প্রতিবাদ প্রস্তাব—

দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবান মিউনিসিপাল এলাকায় প্রবাসী ভারতীয়দের সম্পর্কে (যাঁহারা সেখানে বাস করিতেছেন) বৈষম্য-মূলক ব্যবহারের প্রতিবাদে গত ২০শে পৌষ কলিকাতা কর্পোরেশনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, দক্ষিণ আফ্রিকার ইউরোপীয় বাসিন্দাদের কাহাকেও কলিকাতা কর্পোরেশনে চাকরী দেওয়া হইবে না বা কর্পোরেশনের অধিকার-ভুক্ত কোন জমী কাহাকেও লীজ দেওয়া বা বিক্রয় করা হইবে না। বাঙ্গালার সকল স্থানের মিউনিসিপাল ও লোকাল বোর্ড গুলিতে যাহাতে অনুরূপ প্রস্তাব গৃহীত হয়, সে জন্য তাঁহাদের অনুরোধ করা হইয়াছে।

ভারত সম্পর্কে দাবী—

লণ্ডনে 'বিশ্ববিদ্যালয় শ্রমিক সংঘের' বার্ষিক সভায় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের নীতির পরিবর্ত্তন দাবী করিয়া যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তাহাতে বলা হইয়াছে—মিঃ আমেরীকে মন্ত্রীপদ হইতে অপসারিত করা হউক এবং ভারতীয় নেতৃবর্গকে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া হউক। বিলাতের নানাস্থানে ভারতবন্ধুগণের সভায় মধ্যে মধ্যে এইরূপ প্রস্তাব গৃহীত হইতে দেখা যায়। কিন্তু তথায় কি এই বিষয়ে অবিরাম আন্দোলন চালাইবার কোন ব্যবস্থা হয় না?

পরলোকে গোপেশ্বর পাল—

নদীয়া কৃষ্ণনগরের সুপ্রসিদ্ধ ভাস্কর গোপেশ্বর পাল গত ৯ই জানুয়ারী প্রাতে কৃষ্ণনগরে মাত্র ৫০ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। বাল্যকাল হইতে তিনি মূর্ত্তি নির্ম্মাণে নৈপুণ্য লাভ করিয়া বহু খ্যাতনামা ব্যক্তির মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে তাঁহার অসাধারণ শক্তি সকলেই স্বীকার করিতেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বিমান শিক্ষা—

আমরা জানিয়া আনন্দিত হইলাম, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ ভারতীয় বিমান বাহিনীর কর্ত্তৃপক্ষের সহযোগিতায় কলিকাতায় একটি বিমান শিক্ষা পরিকল্পনা প্রবর্ত্তনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সাজসরঞ্জাম ও শিক্ষক পাওয়া গিয়াছে। তিন মাস শিক্ষা গ্রহণের পর ছাত্রগণ বৈমানিক পদের জন্য কেন্দ্রীয় নির্ব্বাচন বোর্ডে উপস্থিত হইতে পারিবে। ছাত্রগণকে বৃত্তি দেওয়া হইবে ও প্রতি ৩ মাস অন্তর ৫০ জন করিয়া ছাত্র গ্রহণ করা হইবে।

পরলোকে কুমারী অণিমা ঘোষ—

প্রাইমা ফিল্মস্ ও রূপবাণীর ম্যানেজিং-ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ঘোষের কনিষ্ঠা কন্যা কুমারী অণিমা দীর্ঘ দুই বৎসর যাবৎ ফুস্‌ফুসের ব্যাধিতে ভুগিয়া মাত্র পনেরো বৎসর বয়সে অকালে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। কুমারী অণিমা এই অল্প বয়সে সঙ্গীত বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। ১৯৩৮ সালে দশ বৎসর বয়সে তিনি অল্

বেঙ্গল মিউজিক কম্পিটিশনে খেয়াল ও টপ্পা গানের জন্ত পুরস্কৃত হইয়াছিলেন। ১৯৪০ সালে ইটালী সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় খেয়াল, টপ্পা ও পুরাতন ষ্টাইলের বাঙ্‌লা গান গাহিয়া অনেকগুলি পদক ও প্রশংসা-পত্র লাভ করিয়াছিলেন।

'আপনি ও আপনার রেশন কার্ড'—

সম্প্রতি কলিকাতা ও তাহার শিল্প কারখানা এলাকাসমূহে রেশন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এতদ্‌সম্পর্কে সরকার কর্ত্তৃক প্রচারিত ও বিনামূল্যে বিতরিত 'আপনি ও আপনার রেশন কার্ড' নামক পুস্তিকায় বহু নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ঐ সকল নির্দ্দেশ যে সর্ব্বাংশে সুষ্ঠু, এমন কথা আমরা বলিতে পারি না। উপরন্তু আমরা উহা ত্রুটীপূর্ণ বলিয়া মনে করি। কারণ উক্ত পুস্তিকায় 'অতিথি অভ্যাগত' শীর্ষক স্তম্ভে লিখিত হইয়াছে—"কিন্তু যদি আপনি কোনো হোটেল জাতীয় প্রতিষ্ঠানে না থেকে কারও বসত বাড়ীতে থাকেন তাহ'লে আপনি অস্থায়ী রেশন কার্ড পেতে পারেন, কারণ হোটেল জাতীয় প্রতিষ্ঠানে আগে থাকতেই রেশন দ্রব্যগুলি সরবরাহ করা হয়। আপনি যে এলাকায় অস্থায়ীভাবে বাস করতে চান সেই এলাকার সাব-এরিয়া রেশনিং অফিসারের কাছে অস্থায়ী রেশন কার্ডের জন্ত আবেদন করবেন। আবেদনের পর সপ্তম দিনে আপনার অস্থায়ী রেশন কার্ড দেওয়া হবে। প্রথম ৭ দিন হোটেলে রেস্তরাঁ জাতীয় প্রতিষ্ঠানে খাবেন বা কোন বন্ধুর বাড়ীতে খাবেন।"—এই নির্দ্দেশটী সম্বন্ধে আমাদের প্রথম জিজ্ঞাস্য, অস্থায়ী রেশন কার্ড পাওয়ার নির্দ্দেশের সঙ্গে হোটেল জাতীয় প্রতিষ্ঠানে যে আগে থাকতেই রেশন দেওয়া হয় একথা জানাইবার তাৎপর্য্য কি? দ্বিতীয়তঃ অস্থায়ী রেশন কার্ডের জন্ত দরখাস্ত করিয়া ৭ দিন হোটেলে বা কোন বন্ধুর বাড়ীতে খাইবেন বলা হইয়াছে। হোটেলে খাওয়া না হয় পয়সা দিলে সম্ভব হইবে, কিন্তু বন্ধুর বাড়ীতে খাওয়া কি করিয়া সম্ভব হইবে? কেন না যে বন্ধুর গৃহে অতিথি উঠিবেন সেই বন্ধুর গৃহেও ত মাথা পিছু খাদ্যের বরাদ্দ থাকিবে। সুতরাং বন্ধুর বাড়ীতে খাওয়া কিরূপে সম্ভব হইবে সরকার তাহা সাধারণকে জানাইয়া দিবেন ইহাই আমরা আশা করি।

রেশন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হওয়ার ফলে অতিথি অভ্যাগত শব্দ দুইটী অভিধানে আর রাখা সম্ভব হইবে কি না সে বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তথাপি সরকার কর্ত্তৃক এইরূপে বন্ধুর বাড়ী দেখাইয়া দেওয়ায় আমরা একাধারে যেমন আশ্বস্ত হইয়াছি, অপর দিকে তেমনি আতঙ্কিতও হইয়াছি।

ইহা ব্যতীত আমাদের সম্মুখে আরও বহুবিধ সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। আমরা তাহার একটী যৎসামান্ত উদাহরণ দিতেছি মাত্র। মনে করুন, কোন হিন্দু বিধবা তাঁহার পুত্রের আকস্মিক পীড়ার সংবাদ পাইয়া কলিকাতা বা রেশন প্রবর্ত্তিত অঞ্চলে পুত্রকে দেখিতে আসিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার পক্ষে হোটেলে খাওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং কার্ডের জন্ত দরখাস্ত করিয়া তিনি কি ঐ দীর্ঘ ৭ দিন কলের জল পান করিয়া থাকিবেন? আশাকরি সরকার এইরূপ বহুবিধ সমস্যার সমাধানকল্পে রেশনিং অফিসে সংবাদ দেওয়া মাত্র যাহাতে কার্ড দেওয়া হয়, সেরূপ কোন ব্যবস্থা করিবেন।

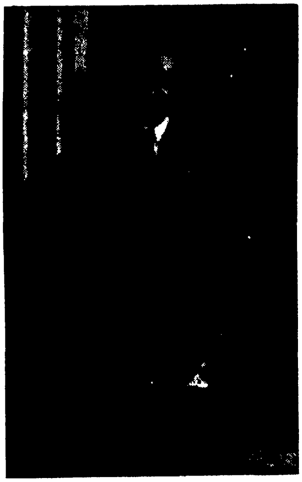
তৃতীয়তঃ 'আপনার রেশন' শীর্ষক স্তম্ভে আমরা দেখিতে পাই:—"রেশন তালিকা—

(ক) চাউল (চাউল বলতে চাউলের সঙ্গে ধানও বুঝিতে হইবে)।"

—এই চাউলের সহিত ধান বোঝার তাৎপর্য্য আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। ধান হইতে চাউল হয় তাহা আমরা জানি, কিন্তু চাউল বলিতে ধান বোঝা আমাদের পক্ষে সুকঠিন। আমাদের আশঙ্কা, ইহার পর আমাদের খড় বা বিচালি না বুঝিতে হয়!

বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিকের সম্মান—

ভারত গভর্ণমেণ্টের নৃতত্ত্ববিদ্ লব্ধপ্রতিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ডক্টর বিরজাশঙ্কর গুহ এম-এ, পি-এইচ্-ডি (হার্ভার্ড) আন্তর্জাতিক নৃতত্ত্ব কংগ্রেসের ১৯৩৮ সালের কোপেনহেগেনস্থ অধিবেশনে ভাইস-প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন—সম্প্রতি এ সংবাদ



ডাক্তার বিরজাশঙ্কর গুহ

পাওয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে অপর কোন ভারতীয় বৈজ্ঞানিক এ সম্মান লাভ করেন নাই। ডক্টর গুহ রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটী ও ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল ইনিষ্টিটিউটের ফেলো। ইনি দুই বৎসর-কাল এসিয়াটিক সোসাইটীর জেনারেল সেক্রেটারী ছিলেন।

ভারতে আর্থিক উন্নতি—

ভারতের কয়েকজন খ্যাতনামা শিল্প-পরিচালক আর্থিক উন্নতির একটি পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন—উহা প্রবর্ত্তিত হইলে ১৫ বৎসরের মধ্যে ভারতে জনসাধারণের জীবনযাত্রা প্রণালীতে যুগান্তকারী পরিবর্ত্তন ঘটিবে। পরিকল্পনায় তিনটি পঞ্চবার্ষিক কার্য্যসূচী স্থির করা হইয়াছে। তাহার ফলে ভারতের জাতীয় আয় তিনগুণ বৃদ্ধি পাইবে। ইতিমধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলেও মাথা পিছু আয় দ্বিগুণ হইবে। জাতীয় প্রয়োজনের নিকট দিয়া খাদ্য, পরিধেয়, বাসগৃহ, শিক্ষা ও চিকিৎসকের সাহায্য জনসাধারণের নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়া হইবে। বর্ত্তমানে কৃষিই ভারতবাসীর

প্রধান অবলম্বন। পরিকল্পনাটি কার্য্যে পরিণত হইলে অন্যান্য ক্ষেত্রেও অধিকসংখ্যক লোক জীবিকার্জ্জনের সুযোগ পাইবে। জাতীয় আয়ের শতকরা ৪০ ভাগ কৃষিক্ষেত্র হইতে, শতকরা ৩৫ ভাগ শিল্প কারখানা হইতে ও শতকরা ২০ ভাগ চাকরী হইতে পাওয়া যাইবে। এই পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে ১৫ বৎসরে মোট ১০ হাজার কোটি টাকা ব্যয় হইবে। সার পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস, মিঃ জে-আর-ডি-টাটা, শ্রীযুক্ত ঘনশ্যাম দাস বিরলা, সার আর্দেশীর দালাল, সার শ্রীরাম, শ্রীযুক্ত কস্তুরীভাই লালভাই প্রভৃতি প্রসিদ্ধ শিল্পপতিরা এই পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন।

পরলোকে সুরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—

বেঙ্গল বাস সিণ্ডিকেটের প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক সুরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গত ১১ই জানুয়ারী কলিকাতা শ্যামবাজারে ৬৫ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি কলিকাতার ষ্টেট্সম্যান, হিতবাদী ও বোম্বায়ের 'বোম্বাই ক্রনিকেল' পত্রে কাজ করিয়াছিলেন। সংবাদপত্র সম্পাদন ও পরিচালন সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। ভারত-বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় মিঃ এস্, ব্যানার্জ্জি তাঁহার অন্যতম পুত্র।

ভারতের প্রতিনিধি কে ?—

মাদ্রাজে নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মিলনের অধিবেশনের সময় ১০ই জানুয়ারী মাননীয় শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী সম্মিলনে সমাগত সম্পাদকগণকে এক প্রীতিসম্মিলনে সম্বর্দ্ধনা করেন। তাহাতে শাস্ত্রী মহাশয় সকলকে একটি কথা সর্ব্বদা মনে রাখিতে ও সে বিষয়ে সকলকে নিয়ত আন্দোলন করিতে বলিয়াছেন—'যুদ্ধের পর যে শান্তি বৈঠক হইবে তাহাতে ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে যেন মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুকে গ্রহণ করা হয়।'

খাদ্য আমদানী—

আমেরিকার ওয়াশিংটন হইতে ১১ই জানুয়ারী খবর পাঠানো হইয়াছে যে গত অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর ৩ মাসে মোট ৩৭ খানা খাদ্যশস্য বোঝাই জাহাজ ভারতবর্ষে পাঠান হইয়াছে। এবার এ দেশেও খাদ্যশস্য ভালই হইয়াছে। তাহার পরও আমাদের ২০৲ টাকা মণ দরে চাউল কিনিতে হইতেছে। অদৃষ্ট আর কাকে বলে ?

আরিয়াদহ অনাথ ভাণ্ডার—

আরিয়াদহ (২৪ পরগণা) অনাথ ভাণ্ডার সম্প্রতি নিম্নলিখিত দানগুলি পাইয়াছেন—(১) রায় সাহেব রাজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের স্মৃতিতে তাঁহার পুত্র লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল বিদ্যাপতি ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রদত্ত ১২ শত টাকা (২) বেঙ্গল রিলিফ কমিটী প্রদত্ত দ্বিতীয় কিস্তিতে ১৫৫ মণ চাউল ও আটা, কাপড়, কম্বল, আলোয়ান ও জমাট দুধ (৩) ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় প্রদত্ত কুইনিন (৪) গুজরাটী রিলিফ কমিটী প্রদত্ত এক গাঁট কাপড় ও এক গাঁট কম্বল (৫) ব্যারাকপুরের মহকুমা হাকিম প্রদত্ত কম্বল, কাপড়, কুইনিন ও জমাট দুধ (৬) গুজরাটী রিলিফ সোসাইটী প্রদত্ত ২০০ টাকা। অনাথ ভাণ্ডার হইতে (১) প্রত্যহ প্রায় ৫ শত লোককে বিনামূল্যে খাওয়ান হইয়াছে (২) ৭ শত দুস্থ লোককে কাপড়, কম্বল ও আলোয়ান দেওয়া হইয়াছে (৩) জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত ২৫০ দরিদ্র পরিবারকে সুলভে চাল ডাল দেওয়া হইয়াছে (৪) প্রত্যহ বহু শিশুকে দুধ ও বার্লি দেওয়া হইয়াছে (৫) ম্যালেরিয়া-গ্রস্তদিগকে বিনামূল্যে কুইনিন দেওয়া হইতেছে ও (৬) মধ্যবিত্ত পরিবার সমূহের মধ্যে তিন হাজার কণ্ট্রোলের কাপড় বিক্রয় করা হইয়াছে।

বন্দীর সংখ্যা—

বিলাতে পার্লামেণ্টে একটি প্রশ্নোত্তরে জানা গিয়াছে যে গত ১লা নভেম্বর তারিখে ভারতে কংগ্রেস আন্দোলনে দণ্ডিত বন্দীর সংখ্যা ছিল ১৫৭৬৩ এবং আটক বন্দীর সংখ্যা ছিল ৭২৬১ জন। যদিও দেশে কোন ধ্বংসমূলক আন্দোলন নাই, তথাপি ইহাদিগকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। বাঙ্গালার নূতন মন্ত্রিমণ্ডলী এক বৎসরে মাত্র ৩০০ বন্দীর মুক্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই ভাবে কাজ চলিলে সকলের মুক্তি প্রদানে কত সময় লাগিবে ?

পরলোকে মণীন্দ্রনাথ—

মেদিনীপুরের প্রবীণ সাহিত্যিক মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল গত ২২শে অগ্রহায়ণ ৬৭ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। যৌবনে স্বদেশী আন্দোলনের যুগে তিনি উহাতে যোগদান করেন। রাজনৈতিক জীবনে তিনি দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথের সহকর্মী ছিলেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের তিনি অন্যতম সদস্য ছিলেন। স্থানীয় 'হিজলী সাহিত্য-সমিতি' ও 'মীর্জাপুর সাহিত্য-সম্মিলনী' প্রতিষ্ঠা তাঁহার সাহিত্য ও স্বদেশপ্রীতির নিদর্শন।

ভারত গভর্ণমেণ্টের বাজেট—

১৯৪২-৪৩ সালে ভারত গভর্ণমেণ্টের আয় ব্যয় সম্পর্কে প্রাথমিক হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায়, এই বৎসরে ১১২ কোটি টাকা ঘাটতি পড়িবে। মোট আয় হইয়াছে ১৭৭ কোটি টাকা ও ব্যয় হইবে ২৮৯ কোটি টাকা। যুদ্ধের জন্য অতিরিক্ত ব্যয় ইহার প্রধান কারণ। এই ঘাটতি পূরণের জন্য দরিদ্র ভারতবাসীর ঘাড়ে কত নূতন ট্যাক্স চাপিবে কে জানে ?

কুটীর শিল্প হিসাবে চিনি উৎপাদন—

চিনি উৎপাদন সম্পর্কে যে সরকারী ইম্পিরিয়াল ইনিষ্টিটিউট আছে তাহার এক কেন্দ্র চিনি উৎপাদনের জন্য নূতন ধরণের যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই যন্ত্রের সাহায্যে যে কোন কৃষক নিজের পরিবারের লোকজনের সাহায্যে গরু বা মহিষ দ্বারা কল চালাইয়া দৈনিক ২৫।৩০ মণ আখ মাড়াই করিতে পারিবে। এই ধরণের চিনি উৎপাদন ব্যবস্থা আবগারী আইনে পড়িবে না।

ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ ও কুটীর শিল্প—

কলিকাতায় একটি কুটীর শিল্প ও হস্ত শিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিতে যাইয়া ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন—বিদেশের অর্থনীতিক শোষণের বিরুদ্ধে জাতীয়

অর্থনীতিক ভিত্তি দূর করিতে এবং বিশেষ করিয়া বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ বিধ্বস্ত বাঙ্গালাকে পুনরায় অর্থনীতিক জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে কুটীর শিল্প ও হস্ত শিল্প প্রসারের চেষ্টা এবং তাহার জন্য প্রয়োজনীয় বাজার সৃষ্টির ব্যবস্থা করা একান্ত কর্ত্তব্য।

বস্ত্র ব্যবসায়ে বিপুল লাভ—

আমেদাবাদের বস্ত্রব্যবসায়ী ও মিলমালিকগণের ১৯৪৩ সালের লাভের অঙ্ক হইয়াছে বিস্ময়কর। এই বৎসর আমেদাবাদের মিল মালিকদিগকে ১০ কোটি টাকা অতিরিক্ত লাভকর হিসাবে দিতে হইবে এবং বস্ত্র ব্যবসায়ীদিগকে অতিরিক্ত লাভ কর দিতে হইবে দুই কোটি টাকা। অথচ ঐ বৎসরেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক লোককে ছিন্ন বস্ত্র পরিয়া ও উলঙ্গ-অবস্থায় দিন যাপন করিতে হইয়াছে। এই অব্যবস্থা আরও কত দিন চলিবে?

কলেরা ও বসন্ত—

গভর্ণমেণ্ট এক ইস্তাহারে প্রচার করিয়াছেন যে চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, ত্রিপুরা, খুলনা, ২৪ পরগণা, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, বীরভূম, বর্দ্ধমান ও হাওড়া এই ১০টি জেলায় কলেরা এবং নোয়াখালি, ত্রিপুরা, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, মৈমনসিংহ, ঢাকা ও রংপুর এই ৭টি জেলায় বসন্তের প্রকোপ দেখা দিয়াছে। ইহা যে অর্দ্ধাহার ও অনাহারের ফল, তাহা আর আজ নূতন করিয়া কাহাকেও বলিয়া দিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু সেই ব্যবস্থার উন্নতি বিধানের জন্য সরকার এ পর্য্যন্ত কি করিলেন, তাহা কেহ জানিতে পারে নাই।

শ্রীপার্ব্বতীশঙ্কর সেন—

শ্রীমান্ পার্ব্বতীশঙ্কর সেন লণ্ডনের সোসাইটি অফ্ ইনকরপোরেটেড এ্যাকাউণ্ট্যান্টস্ এ্যাণ্ড অডিটারস্‌এর ইণ্টার মিডিয়েট



শ্রীপার্ব্বতীশঙ্কর সেন

পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করিয়াছেন। কুড়িজনেরও অধিক বাঙ্গালী ছাত্র পরীক্ষা দিয়াছিল, তন্মধ্যে মাত্র দুইজন কৃতকার্য্য হইয়াছে। তিনি ম্যাট্রিকুলেশন ও আই, এস্-সি পরীক্ষায় সরকারী বৃত্তি পাইয়াছিলেন এবং বি-কম্ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান ও এম্-এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

কুমারী দেবিকা রায়—

কাশিমবাজারের রাজা শ্রীযুক্ত কমলারঞ্জন রায়ের দশ বৎসর বয়স্কা কন্যা কুমারী দেবিকা এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের গত



কুমারী দেবিকা রায়

বৎসরের সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় সসম্মানে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। তাঁহার জীবন সাফল্যমণ্ডিত হউক।

আমেরিকা ও সাহায্য দান—

যুদ্ধে বিধ্বস্ত অঞ্চলের পুনর্গঠনে সাহায্যদানের জন্য সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের যে পরিকল্পনা হইয়াছে, গত ২৫শে জানুয়ারী আমেরিকার প্রতিনিধি পরিষদ ভারতবর্ষকেও তাহার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন। ইহাতে বলা হইয়াছে—সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের সামরিক অভিযানের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ যে সকল অঞ্চল দুর্ভিক্ষ বা মহামারীতে পীড়িত হইবে সাহায্য ও পুনর্গঠন ব্যবস্থা সেই সকল অঞ্চলে প্রযুক্ত হইবে। ঐ ব্যবস্থায় ভারতবর্ষ ১৩ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার ঋণ পাইবে। কিন্তু ঐ ঋণ যখন শোধ দিতে হইবে, তখন অবস্থা কিরূপ হইবে, তাহা পূর্ব্ব হইতে বিবেচনা করিয়া সে ঋণ গ্রহণ করা উচিত।

দিলীপকুমারের জন্মোৎসব—

বিগত ২৩শে জানুয়ারী, বালীগঞ্জ ১১ নং ডোভার লেনে বিচারপতি বি, বি, ঘোষের ভবনে, লব্ধপ্রতিষ্ঠ সঙ্গীত বিশারদ, কবি ও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়ের ৪৭তম জন্মোৎসব তাঁহার গুণমুগ্ধ বান্ধব বান্ধবীগণের উদ্যোগে বিশেষ ধূমধামের

সহিত অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। এতদুপলক্ষে কবি শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনীর পক্ষ হইতে তাঁহাকে একটী মানপত্র প্রদান করেন। পরে দিলীপবাবুকে উক্ত সম্মিলনী কর্ত্তৃক "সঙ্গীত-রত্নাকর" উপাধি প্রদত্ত হয়। পণ্ডিচেরী হইতে শ্রীঅরবিন্দের ও শ্রীমার আশীর্ব্বাণী সভায় পঠিত হয়। কুমার শ্রীধীরেন্দ্র-নারায়ণ রায়, শ্রীসুদাম চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়-চৌধুরী প্রমুখ সুধীবৃন্দ দিলীপবাবুকে অভিনন্দিত করেন। অভিভাষণের যথাযোগ্য উত্তর প্রদানের পর উক্ত উৎসবের জন্য লিখিত একটী দীর্ঘ কবিতা দিলীপবাবু পাঠ করেন এবং তাঁহার স্বাভাবিক সুকণ্ঠে ভজন ও কীর্ত্তন গাহিয়া সহস্রাধিক ভদ্র মহোদয়গণকে আনন্দ দান করেন। শতংজীব বৈষ্ণবাচার্য্য পণ্ডিত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহোদয় তাঁহার আশীর্ব্বাণী প্রেরণ করিয়াছিলেন।

পণ্ডিত রসিকমোহনের জন্মোৎসব—

খ্যাতনামা বৈষ্ণব সাহিত্যিক ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বয়স ১০৫ বৎসর হওয়ায় গত ৭ই ফেব্রুয়ারী



পণ্ডিত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ

সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনীর পক্ষ হইতে তাঁহাকে তাঁহার কলিকাতা ২৫নং বাগবাজার ষ্ট্রীটস্থ গৃহে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে। সার যদুনাথ সরকার মহাশয় ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং বহু বক্তা পণ্ডিতপ্রবরের জ্ঞান ও কর্ম্মশক্তির প্রশংসা করিয়া বক্তৃতা করেন। এই বয়সেও তাঁহার অটুট স্বাস্থ্য, অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ও কর্ম্মপ্রবণতা দেখিয়া সকলকে বিস্মিত হইতে হয়। আমরা তাঁহার দীর্ঘতর জীবন কামনা করি।

শ্রীমান সুনীল বরণ—

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মেদিনীপুর শাখার গত ৩ বৎসরের বার্ষিক অধিবেশনে শ্রীমান সুনীল বরণ নামক একটি শিশু আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় অদ্ভুত কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে তাহার বয়স মাত্র ৭ বৎসর। পরিষদ



শ্রীমান সুনীল বরণ

হইতেও তাহার এই অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য তাহাকে একটি বিশেষ পুরস্কার প্রদান করা হইয়াছে।

পরলোকে কুমারী শান্তি রায়—

প্রথম ভারতীয় একচুয়ারী শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের দৌহিত্রী ও শ্রীযুক্ত জ্যোতিপ্রসাদ রায় মহাশয়ের কন্যা কুমারী শান্তি রায় ১৫ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। দুর্ভিক্ষের



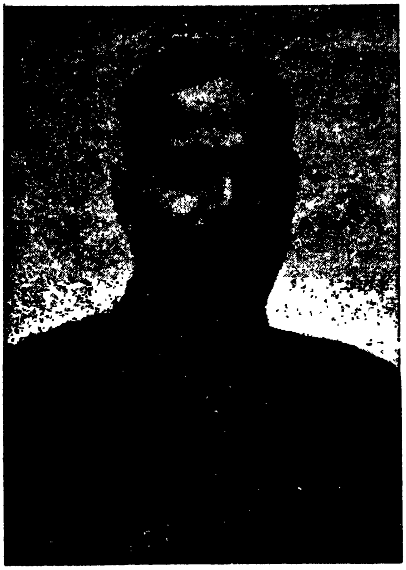
কুমারী শান্তি রায়

সময় সেবা কার্য্যে সে আত্মনিয়োগ করিয়াছিল এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, পরদুঃখকাতরতা প্রভৃতি গুণের জন্য সে জনপ্রিয় ছিল।

হিন্দু মহাসভার অমৃতসরের অধিবেশন

শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ন

১৯৪৩ সাল, ২২শে ডিসেম্বর। সকাল নয় ঘটিকায় বস্ত্রশয্যাদি লইয়া দুর্গানাম স্মরণ করিয়া এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের ভিতর দিয়া নৈহাটী হইতে বহির্গত হইলাম। শিয়ালদহ হইতে কলিকাতা সহরের উপর দিয়া হাওড়া ষ্টেশন অভিমুখে চলিলাম। ষ্টেশনে গিয়া দেখি—সঙ্গীরা সকলেই উপস্থিত। ষ্টেশন লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছে।



ডক্‌টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

হইবারই ত কথা। একে অন্যান্য ট্রেণযাত্রীদের ভীড়, তাহাতে আবার হিন্দু মহাসভা প্রতিনিধিদের সমাবেশ।

প্রচণ্ড উদ্দীপনার ভিতরে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বার-এট-ল, মেজর পি বর্দ্ধন, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিচরণ ঘোষ ও শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ মিত্র প্রমুখ নেতৃবর্গের সহিত গাড়ীতে গিয়া উঠিলাম।

গাড়ী নানা প্রদেশের উপর দিয়া চলিয়া উপস্থিত হইল পাঞ্জাব প্রদেশে। সিন্ধুনদের পাঁচটি উপনদী হাতের পাঁচটি আঙ্গুলের মত পাঞ্জাবের উপর অবস্থিত; এইজন্য ইহার নাম পঞ্চনদ বা পাঞ্জাব [পঞ্চ+অব (জল)]। এই প্রদেশ—

আর্য্যদের আদিবাস, সাম নিনাদিত।
কত বেদ, কত মন্ত্র, মহাযজ্ঞ কত
পবিত্রিলা এই দেশ। এই পঞ্চনদে
হৃদয়-শোণিত ঢালি, বীর পুরুরাজ
রক্ষিলা ভারত-মান।

বৃষ্টিপাতের অল্পতা, দক্ষিণাংশে মরুভূমি, উত্তরাংশে বন্ধুর পর্ব্বতমালা, সিন্ধুর প্রখর স্রোত—এই সকল প্রাকৃতিক অসুবিধা দূর করিবার জন্য এখানকার অধিবাসীগণকে সর্ব্বদা চেষ্টিত থাকিতে হয়। প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করিতে করিতে ইহারা সাহসী ও বলিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে।

এই শহরের একাংশে বিগত ২৫শে ডিসেম্বর নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার রজত-জয়ন্তী অধিবেশন আরম্ভ হয় এবং ২৮শে ডিসেম্বর ইহার পরিসমাপ্তি ঘটে। এই অধিবেশনে বিশেষ সমারোহ হইয়াছিল। ভারতের সকল প্রদেশ হইতেই প্রতিনিধিরা এই অধিবেশনে যোগদান করেন। এবারকার অধিবেশন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়। বীর সাভারকার, চীন সাধারণতন্ত্রের নয়াদিল্লীস্থ কমিশনার, ভারত সরকারের আইন সচিব স্যর অশোককুমার রায়, শ্রীযুক্ত কে. এম. মুন্সী, স্যর রাধাকৃষ্ণণ, স্যর সাদিলাল, কপূর্রতলার মহারাজা, সর্দ্দার বলদেব সিং, কৃষ্ণস্বামী আয়েঙ্গার, শ্রীযুক্ত যমুনাদাস মেহতা এবং অন্যান্য বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ অধিবেশনের সাফল্য কামনা করিয়া বাণী প্রেরণ করেন। ভারত সরকারের বৈদেশিক সদস্য ডাঃ এন-বি-খারে, সিন্ধুর দুইজন মন্ত্রী, রাজা মহেশ্বরদয়াল শেঠ রায় বাহাদুর মেহের চাঁদ খান্না, রায় বাহাদুর কুনোর গুরুনারায়ণ, রাওসাহেব গোকুলদাস. শ্রীযুক্ত বি, খাপার্দ্দে, অনুন্নত সম্প্রদায়ের শ্রীযুক্ত পৃথ্বী সিং, যুক্তপ্রদেশের শ্রীযুক্ত রাজন শাস্ত্রী, মহারাষ্ট্রের মিঃ ভোপৎকার, নাগপুরের অধ্যাপক দেশপাণ্ডে, মহাকোশলের পণ্ডিত রামকৃষ্ণ পাণ্ডা, সীমান্ত-প্রদেশের দেওয়ান দিলীপচাঁদ ও দেওয়ান মঙ্গল সাইন, বরোদার মিঃ আনন্দপ্রিয়, পুণার শ্রীযুক্ত খারাঙ্কিকার, রাজস্থানের শ্রীযুক্ত চাঁদকিরণ শর্দ্দা, আগ্রার শ্রীযুক্ত রামনিবাস, লায়ালপুরের সর্দ্দারলাল সিং, পাঞ্জাবের অর্থসচিব স্যর মনোহরলাল প্রমুখ হিন্দুনেতৃগণ অধিবেশনে উপস্থিত থাকেন।

কাশিমবাজারের মহারাজা শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র নন্দী জয়ন্তী-অধিবেশনের উদ্বোধন করেন। অধিবেশনের নির্ব্বাচিত সভাপতি বীর সাভারকার অসুস্থতা নিবন্ধন উপস্থিত থাকিতে না পারায় ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির কার্য্যভার গ্রহণ করেন স্যর গোকুলচাঁদ নারাঙ্।



মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী

মহারাজাশ্রীশচন্দ্রকে বিপুল সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ রাজোচিতভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। তাঁহাকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান

ও বহু ব্যক্তি বহু টাকার তোড়া উপহার দেন। সুত্রদালাল সমিতি তাঁহাকে একখানি তরবারি ও মানপত্র প্রদান করেন। একদল প্রতিনিধি হরিদ্বার হইতে আনীত পবিত্র গঙ্গাজলপূর্ণ একটি পিতলের কলসী



শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

তাঁহাকে উপহার দেন। তাঁহাকে লইয়া একটি বিরাট শোভাযাত্রা বহির্গত হয়। তিনি হস্তীপৃষ্ঠে বৃহৎ স্বুবর্ণছত্রের নিম্নে রৌপ্য নির্ম্মিত আসনে উপবেশন করিয়া থাকেন। শোভাযাত্রা বাহির হইবার পূর্ব্বে পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যগণকে জ্ঞাত করান যে সেনাদলের অনুরূপ পোষাক পরিহিত স্বেচ্ছাসেবকদিগকে শোভাযাত্রায় যোগদান করিতে দেওয়া যাইতে পারে না। স্বেচ্ছাসেবকগণকে যথারীতি এই সংবাদ দেওয়ার পরে শোভাযাত্রা অগ্রসর হয়। মহাবীর দলের স্বেচ্ছাসেবকগণের পোষাকের সহিত সামরিক বেশভূষার সামঞ্জস্য ছিল। সরকারী নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদে তাঁহারা শোভাযাত্রা বর্জ্জন করেন। শোভাযাত্রা প্রায় একঘণ্টা পরিচালিত হইবার পর স্থানীয় এক ম্যাজিষ্ট্রেট আসিয়া বলেন যে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট শোভাযাত্রার লাইসেন্স বাতিল করিয়াছেন। তাঁহাকে শোভাযাত্রায় মহাবীরদলের স্বেচ্ছাসেবকদের অনুপস্থিতির কথা অবগত করাইলে তিনি এই সংবাদ জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে জানাইবার প্রতিশ্রুতি দেন। সভাপতি ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ ম্যাজিষ্ট্রের নির্দ্দেশের অপেক্ষায় থাকেন। ইতিমধ্যে পুলিশ-সুপারের নেতৃত্বে অশ্বারোহী ও পদাতিক পুলিশবাহিনী এই শোভাযাত্রায় বাধা দিয়া উহা ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। ইহাতে অনেকে আহত হন।

মহাসমারোহের সহিত মহাসভার জয়ন্তী-অধিবেশনের উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষে মহাসভার কয়েকজন প্রাক্তন সভাপতিও উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনকারী মহারাজা শ্রীশচন্দ্রের উদ্বোধন-বক্তৃতার পরে রাজা নরেন্দ্রনাথ, ভাই পরমানন্দ, ডাঃ বি-এস-মুঞ্জে প্রমুখ বিশিষ্ট হিন্দু নেতাগণ বক্তৃতা করেন।

বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে ২৬শে তারিখ অনূন ৫০ হাজার দর্শকমণ্ডলীর সমক্ষে বিরাট সভামণ্ডপে বেলা সাড়ে তিনটায় হিন্দু মহাসভার অধিবেশন আরম্ভ হয়। প্রথমে জাতীয় সঙ্গীত বন্দেমাতরম্ গীত হইবার পরে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি স্যর গোকুলচাঁদ নারাঙ্ তাহার অভিভাষণে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির উপর বিশেষ জোর দেন। অতঃপর তিনি কংগ্রেস মন্ত্রীদের পদত্যাগের ফলে এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যাহাদের হাতে গিয়াছে তাহাদের কার্য্যকারিতার ফলে উদ্ভুত ভারতের রাজনৈতিক অচল অবস্থা অবসানের উপায় নির্দ্ধারণার্থ মহাসভা কর্ত্তৃক কমিটি নিয়োগের অনুরোধ জানান।

তৎপরে সভাপতি ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁহার তেজোদ্দীপ্ত অভিভাষণ পাঠ করেন। তিনি তাঁহার অভিভাষণে সময়োচিত উপক্রমণিকার পরে প্রথমেই বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষজনিত সঙ্কটে সমগ্র ভারত অনাহুতভাবে স্বেচ্ছায় যে সহানুভূতি দেখাইয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাদিগের প্রতিও বিশেষ করিয়া পাঞ্জাবের প্রতি বাংলার গভীর কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বলেন, "এই দুর্ভিক্ষে বাংলার দশ লক্ষাধিক লোক প্রাণ হারাইয়াছে। কিন্তু আমি একথা দৃঢ়ভাবে বলিতে চাই যে এই দুর্ভিক্ষ প্রকৃতির খামখেয়ালীর দ্বারা সংঘটিত হয় নাই। শাসন ব্যবস্থার যথেচ্ছাচারিতা ও অপশাসনের ফলে বাঙ্গালা দুর্ভিক্ষ-কবলিত হয়। জনসাধারণের ন্যূনতম দাবীগুলি পূরণ করিয়া তাহাদের দুঃখ ও দুর্দ্দশার হাত হইতে বাঁচাইতে না পারিলে, কোন গভর্ণমেণ্টেরই অস্তিত্ব বজায় রাখিবার অধিকার নাই। বাংলাকে যে দুর্গতি ভোগ করিতে হইয়াছে, সেই দুর্গতির সহস্রাংশের এক অংশও যদি ইংলণ্ড ও আমেরিকায় দেখা দিত তাহা হইলে সেখানকার তৎকালীন যে কোন গভর্ণমেণ্টের ভিত্তি টলিয়া উঠিত।"

ভারতের অচল অবস্থার উল্লেখ করিয়া ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ বলেন, "বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট যত প্রচারকার্য্য করুক না কেন, আসল কথা এই যে, ইংরেজ ভারতে ক্ষমতা পরিহার করিতে প্রস্তুত নহেন বলিয়াই ভারতের অচল অবস্থার অবসান ঘটিতেছে না। বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন যে বৃটিশ সাম্রাজ্য ভাসাইয়া দিবার জন্য তিনি প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন নাই। ২৫ বৎসর পূর্ব্বে ভারতবাসীদিগকে অবিরাম এই কথাই বলা হইত যে ভারত স্বায়ত্তশাসন লাভের উপযুক্ত নহে।



শ্রীযুক্ত আশুতোষ লাহিড়ী

আজ বলা হইতেছে যে ভারতে ধর্ম্মগত মতদ্বৈধের জন্য বৃটেন ভারতীয়দের হস্তে ক্ষমতা ত্যাগ করিতে পারিতেছে না। যুদ্ধকালে ভারতের সমস্যার

কোন সমাধান হইবে না ইহা প্রায় নিশ্চিত। কিন্তু যুদ্ধের পরেই কি অবস্থার উন্নতি হইবে? মিত্রশক্তি যুদ্ধে জয়লাভ করিলে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে কোন প্রকার ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করা হইবে, গ্রেট বৃটেন কর্ত্তৃক এমন কোন প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় নাই। শান্তি সম্মেলনে প্রত্যেক জাতিই তাহাদের নিজেদের সমস্যা সমাধানে যত্নবান হইবে কিন্তু ভারতের পক্ষে সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করিবেন বৃটিশ শাসকদের প্রিয় তাঁহাদেরই মনোনীতগণ। এই প্রতিনিধিগণ প্রভুর নির্দ্দেশানুসারে ভারতের মতদ্বৈধের কথা উল্লেখ করিয়া জগদ্বাসীর সমক্ষে নিজেদের মাত্র কৃপা ও ঘৃণার পাত্র করিয়া তুলিবেন। সে ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ বৃটেনের কবলমুক্ত না হইয়া ইংরেজ ও মিত্রশক্তি আমাদিগকে দয়া করিয়া স্বাধীনতা দান করিবেন বলিয়া যদি আমরা নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া থাকি তাহা হইলে আমরা চিরকাল পরাধীন হইয়া থাকিব, কিংবা আমরা যে স্বাধীনতা পাইব তাহা পাওয়া না পাওয়ারই নামান্তর হইবে। আমাদের শাসনকর্ত্তাদের মতে বর্ত্তমানে ভারতের স্বাধীনতা লাভের প্রধান অন্তরায় হিন্দু মুসলমান বিরোধ। এই বিরোধের ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই কিরূপে রাষ্ট্রীয় শক্তি ভেদনীতি অবলম্বন করিয়া ঐ বিরোধকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। গত ৩৫ বৎসর ধরিয়া বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট বহুপ্রকার মৌলিক গঠনতান্ত্রিক পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছেন, সাম্প্রদায়িক অনৈক্য তাহাতে কোন ব্যাঘাত জন্মায় নাই। ভারতীয় সমস্যার একমাত্র সমাধান হইতেছে জাতি ও ধর্ম্ম সংক্রান্ত সকল বিষয়কে রাজনীতি ক্ষেত্র হইতে কঠোরভাবে বর্জ্জন করা। আমরা চাই যে, সকল লোকই বিনা পক্ষপাতে সমান রাজনৈতিক অধিকার লাভ করুক। আমি স্বীকার করি যে অনুন্নত শ্রেণী ও সম্প্রদায়কেও আর্থিক ও শিক্ষা বিষয়ক বিশেষ সুবিধা দেওয়া আবশ্যক। গঠনতন্ত্রে বিভিন্ন শ্রেণীর সমাজ, ধর্ম্ম ও কৃষি বিষয়ক অধিকার রক্ষার প্রতিশ্রুতি থাকা উচিত।"

শেষে শ্যামাপ্রসাদ বলেন—"আমাদিগকে শুধু রাজনীতি লইয়া ব্যাপৃত থাকিলে চলিবে না। আমাদিগকে এমন একটা নূতন সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে হইবে যে নিতান্ত দরিদ্র এবং অসহায় হিন্দুও যেন অনুভব করিতে পারে—তাহার পিছনে এরূপ একটী সংহত শক্তি আছে যাহা তাহার অধিকার ক্ষুণ্ণ হইলে উহা রক্ষা করিবে। আমাদের আদর্শ পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া আমি কাহাকেও কোনদল বা সম্প্রদায়ের সহিত অন্যায়ভাবে বাদ বিসম্বাদ করিতে বলি না। কিন্তু একথা বলিব যদি কেহ অন্যায়ভাবে আমাদের স্বার্থ ও অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে আমাদিগকে সম্মিলিত হইয়া দ্বিধাহীন ও নির্ভীকভাবে এই চেষ্টার প্রতিরোধ করিতে হইবে।"

উপসংহারে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্বন্ধে বলেন "ভারতবর্ষের ভাগ্যনিয়ন্তা ভারতবর্ষই হইবে। যতদিন না পর্য্যন্ত আমাদের মনোস্কামনা সিদ্ধ হয় ততদিন পর্য্যন্ত পুরুষ পরম্পরায় আমাদের এই স্বাধীনতা সংগ্রাম চলিতে থাকিবে। কিন্তু ঐ সিদ্ধিলাভ করিবার উদ্দেশ্যে হিন্দু মহাসভার কার্য্যাবলী যেন নেতিবাচক নীতি এবং ধ্বংসমূলক বা ঘৃণাসূচক বুলির উপর নির্ভর না করে। ভাবাবেগে দাসের জাতিকে স্বাধীন জাতিতে পরিণত করা যায় না। আত্মসংযম, আত্মত্যাগ ও ব্যাপক জাতীয় আন্দোলনের দ্বারা উহা সম্ভব হইতে পারে।

অধিবেশনে ডাক্তার মুঞ্জে, ভি, জি, দেশপাণ্ডে, লালা কুশলচাঁদ, রায়বাহাদুর মেহেরচাঁদ খান্না, রাজা নরেন্দ্রনাথ, পণ্ডিত নীলকণ্ঠ দাস, ডাক্তার গুর গোকুলচাঁদ নারাঙ্গ, রাজা মহেশ্বরদয়াল শেঠ, শ্রীযুক্ত আশুতোষ লাহিড়ী, মিঃ এ, এস, সত্যার্থী, শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি নেতা বহু প্রস্তাব আনয়ন করেন এবং তাহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। তন্মধ্যে পাঞ্জাব সরকারের স্বৈরাচার নীতির নিন্দা, হিন্দু সংগঠন, হিন্দু সমাজে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, পাকিস্থান পরিকল্পনার তীব্র প্রতিরোধ, ভারতের অখণ্ডতা রক্ষা, সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি যথারীতি রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি, অবিলম্বে স্বাধীনতা ঘোষণা ও জাতীয় গভর্ণমেণ্টের দাবী, সমস্ত রাজবন্দীদের মুক্তি, যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্ত্তন, মিঃ আমেরীকে ভারত সচিবের পদ হইতে অপসারণ, দেশের জাতীয় মনোভাবসম্পন্ন নেতা ও প্রতিষ্ঠান-সমূহের সমন্বয় সাধন প্রভৃতি কয়েকটি প্রস্তাব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হিন্দুদের ধর্ম্মপুস্তক সত্যার্থ প্রকাশ সম্বন্ধে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া শ্রীযুক্ত চাঁদকারণ সর্দ্দা (রাজস্থান) বলেন, "মুসলমানেরা যখন ঔরঙ্গজেবের পন্থা অবলম্বন করিতেছে তখন হিন্দুদেরও শিবাজীর পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে।" শ্রীযুক্ত আনন্দপ্রিয় (বরোদা) প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলেন যে "মুসলমান যদি 'সত্যার্থ' প্রকাশ বাজেয়াপ্তের দাবী করেন তাহা হইলে হিন্দুগণও 'কোরাণ' বাজেয়াপ্তের দাবী করিতে বাধ্য হইবে। এক্ষণে সমগ্র হিন্দু সমাজকে সম্মেলনের প্রস্তাবসমূহ কার্য্যে পরিণত করিবার জন্ত কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। সর্ব্ববিধ নাগপাশ ছিন্ন করিয়া তাহাকে বর্ত্তমান সমস্যার সমাধানে উদ্যোগী হইতে হইবে।"

হে চির-জীবন নিত্যজয়ী

শ্রীকমলরাণী মিত্র।

মরণের মুখে দাঁড়ায়ে আমরা নব জীবনের স্বপ্ন দেখি,
অস্তরাগের ম্লান রাঙা রঙে অভ্যুদয়ের সূচনা লেখি।
কতো প্রলয়ের আঘাত-চিহ্ন ললাট-ফলকে র'য়েছে লিখা,
তবুও মনের মানস-প্রদীপে জ্বলিছে আশার আরত্রিকা।

ঘর ভেঙে' গেছে, ভেসে' গেছে সব বন্যা-প্লাবনে-কখনো তবু
নতুন জীবন রচনার সাধ কখনো মেটেনি কিছুতে কভু।
যতো মরি ততো মরিয়া হইয়া মৃত্যুর সাথে কঠিন যুঝি,
প্রাণপণ ক'রে প্রাণ বাঁচানোর চরম অমোঘ-পন্থা খুঁজি।

নাই নাই ভয়, নাই পরাজয়; হে চির-জীবন নিত্যজয়ী
মরণের মুখে দাঁড়ায়ে' রচিনু বন্দনা তব ছন্দোময়ী।



খেলা ধূলা



শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়



৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

:রঞ্জি ক্রিকেট ঃ

বাঙ্গলা ঃ ৩৮৭ ও ২১ (কোন উইকেট না হারিয়ে)

হোলকার ঃ ১৩৮ ও ২৬৬

বাঙ্গলাদল দশ উইকেটে হোলকার দলকে রঞ্জি ট্রফি'র পূর্ব্বাঞ্চলের ফাইনালে পরাজিত ক'রে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। এ জয়লাভ বাঙ্গলার পক্ষে বিশেষ গৌরবের। বিহারের সঙ্গে প্রথম খেলায় বাঙ্গলা দল জয়লাভ করলেও ক্রীড়ামোদীরা বাঙ্গলা দলের উপর বিশেষ আস্থা স্থাপন করতে পারেননি। সকলেরই ধারণা ছিল হোলকার দলের মত শক্তিশালী ক্রিকেট দলকে হারাতে বাঙ্গলাকে যথেষ্ট বেগ পেতে হবে। এমন কি বাঙ্গলা দলের নিশ্চয় পরাজয়ের কথাও বহুলোকের মনে সুদৃঢ় হয়েছিল এবং সেই ধারণা নিয়েই যাঁরা মাঠে খেলা দেখতে গিয়েছিলেন তাঁরা প্রথম দিনে বাঙ্গলা দলের ব্যাটিং দেখে নিশ্চিত জয়লাভের আশা না করলেও অন্তত: খুশী মনে মাঠ থেকে ফিরতে পেরেছিলেন। দল হিসাবে হোলকার শক্তিশালী। অধিকন্তু দলে সি কে নাইডুর মত একজন বিচক্ষণ অধিনায়কের উপস্থিতি দলের খেলোয়াড়দের উৎসাহ বর্দ্ধন ক'রে শক্তিশালী করে। কিন্তু এ সমস্তর সমন্বয় ক্রিকেট খেলায় অনেক সময় নিশ্চিত ফলাফলকে সুদৃঢ় করতে পারেনি। বহু শক্তিশালী দল অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল দলের কাছে পরাজয় স্বীকার করেছে—ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে ভাগ্য বিপর্য্যয়ের এ বিবরণ বিরল নয়।

টসে জয়লাভ ক'রে বাঙ্গলা দলের ব্যাট করতে এলেন জব্বর এবং এ চ্যাটার্জ্জি। দলের ৪১ রানের মাথায় জব্বর ৩৬ রান ক'রে ক'রে আউট হ'লে পি সেন চ্যাটার্জ্জির জুটি হলেন। একঘণ্টার খেলায় দলের ৪৬ রান উঠল। ৫০ রান উঠল ৬৫ মিনিটে। মধ্যাহ্নভোজের সময় বাঙ্গলা দলের রান উঠল ১০৮, একটা উইকেট হারিয়ে। চ্যাটার্জ্জির রান ৩৭ এবং পি সেন করেছেন ৩৪। লাঞ্চের কিছু পরই সেন দ্রুত রান তুলে ৫০ করলেন, ৮০ মিনিট খেলে। সেন বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে খেলছেন তাঁর মারগুলিও চমৎকার হচ্ছে। ইতিমধ্যে 'চার'টে তাঁর বাউণ্ডারী হ'য়েছে। দলের ১৩৭ রানে অসিত চ্যাটার্জি ৪৭ রান ক'রে এল-বি-ডবলউ হ'লেন। এন চ্যাটার্জি এসে জুটলেন। এন চ্যাটার্জি এসেই নাইডুর বল বাউণ্ডারীতে দু'বার পাঠিয়ে দলের ১৫০ রান পূর্ণ করলেন। এ উঠতে সময় নিল ১৫৫। এর পর রান উঠতে লাগল খুব ধীর ভাবে। মোট ১৯৫ মিনিট খেলার পর দলের ২০০ রান পূর্ণ হ'ল। সেনের রান তখন ৮৮। ২০৬ রানের মাথায় চ্যাটার্জি প্রতাপ সিংহের বলে নাইডুর হাত থেকে ফস্কে গিয়ে রক্ষা পেলেন। নতুন বলে 'চার' মেরে সেন ৯৪ রানে পৌঁছিলেন। পুনরায় গাইকোয়াড়ের বলে চার ক'রে এবং পরে মুস্তাকের বলে তিন তুলে সেন ব্যক্তিগত সেঞ্চুরী করার সম্মান এবং দর্শকগণের কাছ থেকে অভিনন্দন পেলেন। মাত্র ১২ রানের মাথায় আউট করার সুযোগ দেওয়া ছাড়া সেনের ইনিংস খুব ভাল হয়েছিল। একশত রান তুলতে সময় নিয়েছিল ১৫০ মিনিট, তার মধ্যে আহত হয়ে পড়ায় দশ মিনিট সময় শুশ্রুষার জন্যেই নষ্ট হয়। চা-পানের সময় দলের রান ২ উইকেটে ২৮২ উঠল। এন চ্যাটার্জি ৫১, পি সেন ১৩৭। চা পানের কিছু পরই তৃতীয় উইকেটের জুটী ভেঙ্গে গেল। সেন ১৪২ রান ক'রে টাটারাওয়ের বলে বোল্ড হ'লেন। দলের রান তখন ২৯৯। চ্যাটার্জির রান ৬৩। সেন এবং চ্যাটার্জির জুটিতে ১৬২ রান উঠেছিল ১০৫ মিনিটে। কমল ভট্টাচার্য্যের সহযোগিতায় চ্যাটার্জি দলের ৩৩০ রান তুলে টাটারাওয়ের বল ভুল মেরে সুব্রামানিয়ামের হাতে আটকে গেলেন। নির্ম্মল চ্যাটার্জি ১৩৫ মিনিট খেলে ৭৯ রান করেছিলেন, রানে ১২টা 'চার' ছিল। চ্যাটার্জির 'পুল' এবং 'ড্রাইভস' দর্শনীয় হয়েছিল। ভট্টাচার্য্য এবং মুস্তাফী দলের ৩৫৪ তুললে পর টাটারাও পুনরায় বোলিংএ কৃতিত্বের পরিচয় দিলেন। নিম্বলকার উইকেটের পিছনে মুস্তাফিকে চমৎকারভাবে বাঁহাত দিয়ে আটকে নিলেন এবং ঐ রান সংখ্যাতেই নাইডুও কে ভট্টাচার্য্যকে আউট ক'রে বাঙ্গলা দলের বিপর্য্যয় সৃষ্টি করলেন। রান দাঁড়াল ৬ উইকেটে ৩৫৪। মহারাজা এবং এম সেনের জুটী তখন উইকেটে। টাটারাওয়ের বল পর পর দু'বার বাউণ্ডারী পাঠিয়ে মহারাজা তাঁর খেলা আরম্ভ করলেন। দলের ৩৬৯ রানে এম সেন অতি লোভ ক'রে একটা অতিরিক্ত রান তুলতে গিয়ে রান আউট হ'লেন। চা পানের পরে পাঁচটা উইকেট গেল ৮৭ রানের যোগফলে। খেলার নির্দ্দিষ্ট সময়েতে বাঙ্গালা দলের ৭ উইকেটে ৩৭৭ রান উঠল। মহারাজা এবং এস ব্যানার্জি যথাক্রমে ১৬ এবং ১ রান করে নট আউট রইলেন। চা পানের পরে টাটারাওয়ের বোলিং খুব কার্য্যকরী হয়েছিল। ১৩ ওভার বলে মাত্র ২৩ রান দিয়ে ৭টা মেডেন এবং ৩টে উইকেট পান।

দ্বিতীয় দিনের খেলা আরম্ভের ১৫ মিনিটের মধ্যেই বাঙ্গলা দলের বাকি তিনটে উইকেট পড়ে গিয়ে রান দাঁড়াল ৩৮৭। মহারাজা ২৬ রান করলেন, বি মিত্র ২৩ রান করে নট আউট রইলেন।

১১-৩০ মিনিটে হোলকার দলের প্রথম ইনিংস আরম্ভ হ'ল সি ই হোলকার এবং এস কোলের জুটিতে। দলের ১০ রানে কোলে মাত্র ৪ রান করে বিদায় নিলেন। মুস্তাক আলি এসে জুটী হ'লেন। ৩৩ রান করে মুস্তাক কে ভট্টাচার্য্যের বলে স্লিপে মুস্তাফির হাতে ধরা পড়লেন। দলের রান তখন ৬৬। লাঞ্চের সময় রান উঠল ২ উইকেটে ৬৭। হোলকার ২২ এবং নাইডু ১। লাঞ্চের পর হোলকার দলের দারুণ ভাঙ্গণ দেখা দিল। দেড় ঘণ্টার কিছু বেশী খেলার মধ্যেই হোলকার দলের বাকি ৮টা উইকেট পড়ে গেল মোট রানে মাত্র ৬৯ রানের যোগফলে। কে ভট্টাচার্য্য ১৪ ওভার বলে ৫টা মেডেন এবং ৬টা উইকেট পেলেন মাত্র ২৪ রান দিয়ে। বি মিত্র পেলেন ২৪ রান দিয়ে ২টো উইকেট। চা পানের পরবর্ত্তী ৮টা উইকেটের মধ্যে পাঁচটা উইকেট ভট্টাচার্য্যই পেলেন। তাঁর বলে আউট হ'ন সি কে নাইডু, মুস্তাক আলি, ভায়া, নিম্বলকার এই চারজন শক্তিশালী 'ব্যাটসম্যান'। ২৫১ রানে অগ্রগামী থেকে বাঙ্গলা দল হোলকার দলকে 'ফলো অন' করালে।

খারাপ উইকেটের উপর হোলকার দল ভাগ্য অন্বেষণের জন্য দ্বিতীয়বার অবতীর্ণ হ'ল। এবারও তাদের সূচনা ভাল হ'ল না। মাত্র ১ রানে প্রথম উইকেট পড়ে গেল। কোলে আউট হ'লে মুস্তাক আলী গিয়ে সুব্রামানিয়ামের জুটী হ'লেন। মুস্তাক এসে দর্শনীয় ষ্ট্রোক মেরে খেলার গতি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনলেন। সুব্রামানিয়াম দলের ৪৩ রানে ১৫ রান ক'রে এস দত্তের বলে কে ভট্টাচার্য্যের হাতে ধরা দিলেন। তুমুল আনন্দধ্বনির মধ্যে মুস্তাকের জুটী হলেন নাইডু। মুস্তাক খুব শীঘ্রই পিটিয়ে খেলে প্রায় ৫০ মিনিট সময়ে ৫০ রান তুলে ফেললেন। এদিকে বারবার বোলার পরিবর্ত্তনও চলতে লাগল। এস দত্তের বল বাউণ্ডারীতে পাঠিয়ে মুস্তাক দলের ১০০ রান পূর্ণ করলেন। হোলকার দলের শতরান উঠতে ৭৩ মিনিট সময় লাগলো। এস দত্তের বল পরপর তিনবার বাউণ্ডারীতে পাঠিয়ে মুস্তাক নিজস্ব ৭০ রানে পৌঁছলেন। হোলকার দলের ১১১ রানে নাইডুকে কে ভট্টাচার্য্য সিপ্লে ধরে ফেললেন। দলের ঐ রানেতেই কে ভট্টাচার্য্য মুস্তাকের উইকেট পেলেন। মুস্তাক ৭০ মিনিট উইকেটে থেকে উইকেটের চারপাশে বল পিটিয়ে ৭০ রান তুলেছিলেন। তাঁর খেলা খুবই দর্শনীয় হয়েছিল। ৪ উইকেটের ১৪৩ রানে সে দিনের মত খেলা বন্ধ হ'ল। ভায়া এবং নিম্বলকার যথাক্রমে ১৯ এবং ১৩ রান ক'রে নট আউট রইলেন।

প্রথম দিনের খেলায় বাঙ্গালা দলের কোন কোন খেলোয়াড় যেমন ব্যাটিংয়ে কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন তেমনি বোলিংয়ে বোলারদের কৃতিত্ব দেখা গেল দ্বিতীয় দিনে। দ্বিতীয় দিনে কে ভট্টাচার্য্যের বলই হোলকার দলের মারাত্মক হয়েছিল। একদিনের খেলায় সর্ব্ব সমেত ১৭টা উইকেটের পতন হ'ল—৩টে বাঙ্গলার বাকি ১৪টা হোলকার দলের।

হাতে আর ৬টা উইকেট নিয়ে হোলকার দল তৃতীয় দিনের খেলা আরম্ভ করলো। ইনিংসের পরাজয় থেকে রক্ষা পেতে হ'লে হোলকার দলের ১০৮ রান প্রয়োজন। পূর্ব্ব দিনের রানের সঙ্গে মাত্র এক রান যোগ হ'লে পর ভায়া দুর্ভাগ্যক্রমে রান আউট হ'লেন। তাঁরার ২০ রান হয়েছিল। পরবর্ত্তী গাইকোয়াড়ের উইকেট গেল কোন রান না হয়েই। টাটারাও এবং নিম্বলকার সপ্তম উইকেটে জুটী হয়ে মোট রানে ২৭ রান যোগ করলে পর টাটারাও ৭ রান ক'রে আউট হলেন। মোট রান তখন ১৭১। নিম্বলকারের সঙ্গে প্রতাপ সিংহ জুটী হয়ে খেলার ভাঙ্গনের মোড় অনেকখানি ঘুরিয়ে দিলেন। ২১৯ রানে নিম্বলকারের উইকেট পড়লো। বি মিত্রের বলে ক্যাচ তুলে তিনি এ চ্যাটার্জির হাতে ধরা পড়লেন। নিম্বলকারের খেলা খুবই নির্ভুল হয়েছিল। তাঁর নিজস্ব ৫৭ রানে ৫টা বাউণ্ডারী ছিল। ইনিংসের পরাজয় থেকে রক্ষা পেতে এখনো ৩২ রান প্রয়োজন। হাতে আর মাত্র ২টো উইকেট। হোলকার দলের ইনিংসের পরাজয়ের সম্ভাবনাই বেশী। কিন্তু প্রতাপসিং এবং ইস্তাক আলী সে পরাজয় থেকে দলকে রক্ষা করলেন। লাঞ্চের সময় রান হ'ল ২৪৯। রামস্বামী ৩৫ এবং ইস্তাক ৮। দলের ২৫৮ রানে রামস্বামী প্রতাপ নিজস্ব ৩৬ রান করার পর একটা ক্যাচ তুলে এ চ্যাটার্জির হাতে ধরা দিলেন। তাঁর রানে ৫টা 'চার' ছিল। হোলকার ইস্তাক আলীর জুটী হলেন। দলের ২৬৬ রানে ইস্তাক ২১ ক'রে আউট হ'লে হোলকার দলের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হ'ল। ১৭ রানে তারা অগ্রগমী রইল।

বাঙ্গলা দলের দ্বিতীয় ইনিংস আরম্ভ করলেন এম সেন এবং এ চ্যাটার্জ্জি। বেলা ২-৫০ মিনিটে জয় লাভের প্রয়োজনীয় রানের থেকে ৩ রান অতিরিক্ত রান উঠলে খেলা বন্ধ হ'ল। কোন উইকেট না হারিয়ে বাঙ্গলা দলের ২১ রান দাঁড়াল। এম সেন ৩ এবং এ চ্যাটার্জ্জি ১৫ রান ক'রে নট আউট রইলেন। বাঙ্গলা ১০ উইকেটে বিজয়ী হ'ল।

বোম্বাই : ২৫৫

পশ্চিম ভারত রাজ্য : ৩৬৩ (৪ উইকেট)

রঞ্জিট্রফির পশ্চিমাঞ্চলের ফাইনালে পশ্চিম ভারত রাজ্য প্রথম ইনিংসের রান সংখ্যায় শক্তিশালী বোম্বাই দলকে পরাজিত করেছে।

রাজকোটে ১৪ই জানুয়ারী পশ্চিমাঞ্চলের ফাইনাল খেলা আরম্ভ হ'ল। বোম্বাই টসে জিতে প্রথম ব্যাটিং পেল। বোম্বাইয়ের আরম্ভ ভাল হ'ল না ; মাত্র ১৩ রানে ৩টে উইকেট পড়ে গেল। লাঞ্চের সময় ৩ উইকেটে মাত্র ৩১ রান উঠল। আর মোদী এবং ভি এম মার্চ্চেণ্ট জুটী হয়ে খেলতে লাগলেন। প্রথম দিনের খেলার শেষে বোম্বাই দলের ৪ উইকেটে ১৬৪ রান উঠল। ভি এম মার্চ্চেণ্ট ৫৩ রান করে আউট হলেন। মোদী ৮৪ রান করে নট আউট রইলেন।

দ্বিতীয় দিনে লাঞ্চের এক ঘণ্টা পর বোম্বাই দলের প্রথম ইনিংস শেষ হ'ল ২৫৫ রানে। মোদী দলের সর্ব্বোচ্চ ১২৮ রান করলেন। একমাত্র তিনি ছাড়া অন্য কেউ নিজেদের সুনাম অনুযায়ী খেলতে পারেননি। ভাঙ্গনের মুখে মোদীর ব্যাটিংই একমাত্র কার্য্যকরী হয়েছিল। তাঁর ১২৮ রান উঠতে ৩৭৭ মিনিট সময় লেগেছিল। তাঁর রানে ১১টা 'চার' ছিল। জয়ন্তীলাল ৭৪ রানে ৫টা এবং সৈয়দ আমেদ ৭৭ রানে ৪টা উইকেট পেলেন।

পশ্চিম ভারত রাজ্য প্রথম ইনিংসের খেলা আরম্ভ করলে এবং

খেলার নির্দ্দিষ্ট সময়ে ২ উইকেটে ১৫০ রান তুললে। পৃথ্বিরাজ এবং উমার যথাক্রমে ৭০ এবং ৫৫ রান করে নট আউট রইলেন।

তৃতীয় দিন খেলা আরম্ভ করলেন উমার এবং পৃথ্বিরাজ। রান দ্রুত উঠতে লাগল। বার বার বোলার পরিবর্ত্তন করেও কিছু ফল হ'ল না। দলের ৩৪১ রানে তৃতীয় উইকেটের জুটী ভেঙ্গে গেল। উমার ১৩৬ রান ক'রে মার্চ্চেন্টের বলে রাইজীর হাতে ধরা দিলেন। ৫৫ রানের মাথায় উমার একবার আউটের হাত থেকে বেঁচে যান। উমার উইকেটে ৩৮৫ মিনিট সময় খেলে নিজস্ব মোট রানে ১৪টী বাউণ্ডারী করেন। উমার এবং পৃথ্বিরাজের জুটিতে রান উঠেছিল ৩১৩, সময় লেগেছিল ৩৪৩ মিনিট। উমারের আউট হবার পাঁচ মিনিট পর পৃথ্বিরাজও ধরা পড়লেন মার্চ্চেন্টের বলে মন্ত্রীর হাতে। পৃথিরাজ ১৭৪ রান করলেন ৩৪৮ মিনিট খেলে। তাঁর রানে ছিল ১৬টা 'চার'। জয় লাভের প্রয়োজনীয় রান উঠে যাওয়ায় চা পানের পর খেলা স্থগিত হয়ে গেল। সৈয়দ আমেদ এবং শান্তিলাল যথাক্রমে ১২ এবং ৮ রান ক'রে নট আউট রইলেন। বোম্বাই প্রতিযোগিতা থেকে এ বছরের মত বিদায় নিল।

পশ্চিম ভারত রাজ্য দলের ব্যাটিংয়ে কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন উমার এবং পৃথ্বিরাজ। এদের জুটী যেন আর ভাঙ্গে না! বার বার বোলার পরিবর্ত্তন করেও অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হয়নি। এরা দুজন নির্ভিকভাবে বল পিটিয়ে খেলে গেছেন। বোম্বাই দলের খারাপ ফিল্ডিং পশ্চিমভারত রাজ্যকে জয়লাভে যথেষ্ট সাহায্য করেছে বলতে হবে।

এ বছর রঞ্জিট্রফি প্রতিযোগিতার খেলায় বোম্বাই প্রথম থেকেই উন্নত ক্রীড়াচাতুর্য্যের পরিচয় দিয়ে এসেছিল। বরোদার ২৯৭ রানের উত্তরে বোম্বাইয়ের ৪৮৭ রান এবং মহারাষ্ট্রের ২৯৮ রানের উত্তরে বোম্বাইয়ের ৭৩৫ রান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একাধিক নামকরা 'ব্যাটসম্যান' থাকা সত্ত্বেও দুর্ভাগ্যক্রমে ফাইনাল খেলায় তাঁরা নিজেদের স্বাভাবিক ক্রীড়াচাতুর্য্য দেখাতে পারেন নি। বোম্বাইয়ের দুর্ভাগ্য বলতে হবে।

মাদ্রাজঃ ৩৪৯ ও ১৯১

হায়দ্রাবাদঃ ১৮৩ ও ১৪১ (২ উইকেট)

রঞ্জিট্রফির দক্ষিণাঞ্চলের ফাইনালে মাদ্রাজ প্রথম ইনিংসের রান সংখ্যায় হায়দ্রাবাদ দলকে পরাজিত করেছে।

মাদ্রাজ প্রথম ব্যাটিং নিয়ে লাঞ্চের সময় ৫ উইকেটে ২১৬ রান তুলে। প্রথম দিনের খেলার শেষে মাদ্রাজের ৬ উইকেটে ২৮০ রান উঠে। অনন্তনারায়ণ এবং রামসিং যথাক্রমে ১০০ এবং ৮৯ রান করেন।

দ্বিতীয় দিনের খেলায় মাদ্রাজ দলের প্রথম ইনিংস শেষ হ'ল ৩৪৯ রানে। রামসিংয়ের ৮৯ রান ও অনন্তনারায়ণের ১০১ রান উল্লেখযোগ্য। হায়দ্রাবাদের মেটা ৯৩ রান দিয়ে ৫টী উইকেট পেলেন।

হায়দ্রাবাদ তাদের প্রথম ইনিংসের খেলা আরম্ভ ক'রে চা-পানের সময় ৫টা উইকেট হারাল। দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে হায়দ্রাবাদের ৭ উইকেটে রান দাঁড়াল ১৬৯।

তৃতীয় দিনের খেলায় আর মাত্র ১৪ রান যোগ হ'লে পর হায়দ্রাবাদের প্রথম ইনিংস ১৮৩ রানে শেষ হয়ে গেল। আসগর আলি ৭০ রান করলেন ৬টা বাউণ্ডারী সমেত। ৫৩ রানে তিনি যা একবার আউট হ'তে গিয়ে বেঁচে যান। রঙ্গচারি ৬৪ রানে হায়দ্রাবাদের অর্দ্ধেক উইকেট ফেলে দিলেন।

প্রথম ইনিংসের ১৬৬ রানে অগ্রগামী থেকে মাদ্রাজ দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করলো; আরম্ভ ভাল হল না, ২৬ রানে ২টো উইকেট পড়ে গেল। কিন্তু রাম সিং এবং গোপালনের তৃতীয় উইকেটের জুটী খেলার মোড় একেবারে ঘুরিয়ে দিলে। তাঁদের জুটীতে ৮৪ রান উঠলে দলের মোট সংখ্যা দাঁড়াল ১১০। মাদ্রাজের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হ'ল ১৯১ রানে। রাম সিং দলের সর্ব্বোচ্চ ৫৯ রান করলেন। মেটার বোলিং এবারও মারাত্মক হ'ল। ৫০ রানে ৬টা উইকেট তিনি পেলেন।

হায়দ্রাবাদের দ্বিতীয় ইনিংস আরম্ভ হ'ল। খেলায় জয়লাভ করতে তাদের ৩৫৮ রান প্রয়োজন, হাতে সময় এদিকে মাত্র ৯০ মিনিট। ২টো উইকেট পড়ে গেল মাত্র ২ রানে। আসগর আলি এবং আসাদুল্লা খেলার নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত খেলে চললেন। খেলার শেষে দেখা গেল ২ উইকেটে হায়দ্রাবাদের ১৪১ রান উঠেছে।

মাদ্রাজ রঞ্জিট্রফি প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে বাঙ্গালা দলের সঙ্গে মিলিত হবে।

দিল্লীঃ ৮৪ ও ১০৩

দক্ষিণ পাঞ্জাবঃ ৩৮৮

দক্ষিণ পাঞ্জাব এক ইনিংসে ও ২০১ রানে দিল্লী ডিষ্ট্রিক্ট দলকে পরাজিত করেছে। দিল্লী টসে জয়লাভ করে ব্যাটিং পায় এবং প্রথম ইনিংসে ৮৪ রান করে। অমরনাথ ১৮ রানে ৪টে উইকেট পেলেন। এছাড়া বদের ২৮ রানে ৩ এবং ইন্দ্রজিৎতের ৪ রানে ২ উইকেটও উল্লেখযোগ্য।

দক্ষিণ পাঞ্জাব প্রথম ইংনিংসের খেলা আরম্ভ করে দিনের শেষে ২ উইকেটে ২০৮ রান তুলে। অমরনাথ ১০৪ রান এবং মুরায়াত ৮৯ রান করে নট্‌আউট রইলেন।

দ্বিতীয় দিনের খেলায় দক্ষিণ পাঞ্জাব দলের প্রথম ইনিংস শেষ হ'ল ৩৮৮ রানে। অমরনাথ সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা উইকেটের চারপাশে ব্যাট করে ১৪৮ রান করলেন। তাঁর রানে ১০টা বাউণ্ডারী ছিল। ৫৫ রানে একবার তাঁকে 'এল-বি-ডবলউ' আবেদনে সম্মুখীন হ'তে হয় এবং ১৪০ রানে তিনি ভাগ্যক্রমে মাটিতে মঙ্কে পড়ে আত্মরক্ষা করেন। ইম্রাজ এবং সুজা উভয়েই ৫টা ক'রে উইকেট পেলেন।

দিল্লী ৩০৪ রান পিছনে পড়ে দ্বিতীয় ইনিংস আরম্ভ করলো। কিন্তু এবারও সুবিধা হ'ল না, মাত্র ৯৫ মিনিটে তাদের ইনিংস শেষ হয়ে গেল। সাহাবুদ্দিন ৩১ রানে ৫টী উইকেট পেলেন; বলিন্দর সিং পেলেন ৩টে ৩১ রানে। তিন দিনের খেলা দুদিনের খেলার ফলাফলেই শেষ হ'ল।

ভলিবল চ্যাম্পিয়ানসীপঃ

বেঙ্গল ভলিবল চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতার ফাইনালে 'ক্যালকাটা হোয়াইটস' ৫-১৫, ১৫-৪ এবং ১৫-৫ পয়েন্টে হাওড়া 'বি' দলকে পরাজিত করেছে।

বেঙ্গল অলিম্পিক স্পোর্টস ঃ

বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েসনের একবিংশতি বার্ষিক এ্যাথলেটিক স্পোর্টস সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ বৎসরের বার্ষিক স্পোর্টসে ৪০০ মিটার হার্ডল, ৪০০ মিটার দৌড়, হপ ষ্টেপ জাম্প ও ১৫০০ মিটার দৌড়ে নতুন বেঙ্গল রেকর্ড এবং ১৫০০ মিটার ভ্রমণে ভারতীয় রেকর্ড স্থাপিত হয়েছে। নিম্নে বিভিন্ন বিষয়ের ফলাফল দেওয়া হ'ল।

পুরুষদের—

১০০ মিটার দৌড় :—১ম এম ফেরন (ক্যালকাটা ওয়েষ্ট ক্লাব), ২য় আর এইচ ম্যাথুস (জামালপুর), ৩য় ডি এল ডি মর্গ্যান (সেণ্টপলস্ দার্জ্জিলিং) ১১ ১/৫ সেকেণ্ড।

২০০ মিটার দৌড় :—১ম—এম ফেরন (ক্যালকাটা ওয়েষ্ট ক্লাব), ২য়—আর এইচ ম্যাথুস (জামালপুর), ৩য়—ডি এল ডি মর্গ্যান (সেণ্ট পলস দার্জ্জিলিং), সময়—২৩ সেকেণ্ড।

৪০০ মিটার দৌড় :—১ম জি ই হাউইট (ক্যালকাটা ওয়েষ্ট ক্লাব) ২য়—সাজাহান (মহম্মদ স্পোর্টিং), ৩য়—এন দাস (আই এ ক্যাম্প), সময়—৫০ ৩/৫ সেকেণ্ড (বেঙ্গল রেকর্ড)।

৮০০ মিটার দৌড় (সাধারণ) :—১ম—লেঃ ডি জি পার্সিভ্যাল (সৈন্যদল), ২য়—এম বেভিজ (ক্যালকাটা ওয়েষ্ট ক্লাব), ৩য়—সাজাহান (মহম্মদ স্পোর্টিং), সময়—২ মিঃ ৪ ১/৫ সেকেণ্ড।

১৫০০ মিটার দৌড় (সাধারণ) :—১ম—লেঃ ডি জি পার্সিভ্যাল (সৈন্যদল), ২য়—জে ওয়্যাট (আর এ এফ), ৩য়—এম বেভিজ (ক্যালকাটা ওয়েষ্ট ক্লাব); সময়—৪ মিঃ ১৪ ২/৫ সেকেণ্ড (বেঙ্গল রেকর্ড)।

৩০০০ মিটার দৌড় (সাধারণ) :—১ম—লেঃ ডি জি পার্সিভ্যাল (সৈন্যদল), ২য়—আর সি ম্যানলে (আর এ এফ), ৩য়—জে ওয়্যাট (আর এ এফ); সময়—৯ মিঃ ২৫ ২/৫ সেকেণ্ড।

৫০০০ মিটার দৌড় (সাধারণ) :—১ম—আর সি ম্যানলে (আর এ এফ), ২য়—জে ওয়াট (আর এ এফ), প্রাইভেট জার্গেনসন (সৈন্যদল), সময়—১৬ মিঃ ৪৩ ১/৫ সেকেণ্ড।

১০,০০০ মিটার দৌড় :—১ম—লেঃ ডি জি পার্সিভ্যাল (সৈন্যদল), ২য়—এল এইচ ওয়েদারঅল (আর এ এফ), ৩য়—জে ওয়াট (আর এ এফ), সময়—৩৪ মিঃ ৫৮ ২/৫ সেকেণ্ড।

৫০০০ মিটার ভ্রমণ (সাধারণ) :—১ম—এ কে দত্ত (আই এ ক্যাম্প) ২য়—ফ্লাই সার্জ্জেণ্ট সাটন (আর এ এফ), ৩য়—আর কে দত্ত (জে জে সঙ্ঘ); সময়—২৬ মিঃ ১২ ১/৫ সেকেণ্ড।

১০০০০ মিটার সাইকেল রেস :—১ম—আর কে মেহেরা (শ্মশানেশ্বর স্পোর্টিং) ২য়—বি এন শীল (আই এ ক্যাম্প), ৩য়—এস কে মেটা (আই এ ক্যাম্প), সময়—১৯ মিঃ ২১ সেকেণ্ড।

উর্দ্ধ লম্ফ (সাধারণ)—১ম রুস্তম আলী (ক্যালকাটা এ আর পি), ২য়—সি এইচ কং (আই এ ক্যাম্প), ৩য়—বি বসু (আই এ ক্যাম্প); উচ্চতা—৫ ফিট ৮ ইঞ্চি।

দৈর্ঘ্য লম্ফ :—১ম—পি গডক্রে (ক্যালকাটা ওয়েষ্ট ক্লাব), ২য়—ডি ই ফেরন (ক্যালকাটা ওয়েষ্ট ক্লাব), ৩য়—জি ই হাউইট (ক্যালকাটা ওয়েষ্ট ক্লাব), দূরত্ব—২১ ফিট ½ ইঞ্চি।

হপ ষ্টেপ ও জাম্প (সাধারণ) :—১ম—পি গডক্রে (ক্যালকাটা ওয়েষ্ট ক্লাব), ২য়—জি হাউইট (ক্যালকাটা ওয়েষ্ট ক্লাব), ৩য়—এস কে মিত্র (বাটা কোঃ) দূরত্ব—৪৪ ফিট (বেঙ্গল রেকর্ড)।

পোল ভল্ট :—১ম আনন্দ মুখার্জ্জি (ক্যালকাটা পুলিশ), ২য়—এস চক্রবর্ত্তী (আই এ ক্যাম্প), উচ্চতা—৩১ ফিট ।০ ইঞ্চি।

বর্শা নিক্ষেপ :—১ম—এম এইচ হোসেন (ক্যালকাটা পুলিশ), ২য়—এ ডবলিউ বিড়লাস (বি এণ্ড এ আর), ৩য়—এ নাথ (বাটাস), দূরত্ব—১৫৪ ফিট ৬ ইঞ্চি।

ডিসকাস নিক্ষেপ (সাধারণ) :—১ম—জন কটার (আর এ এফ), ২য়—প্রাইভেট জার্গেনসন (সৈন্যদল); দূরত্ব—১১৩ ফিট ৯ ইঞ্চি।

লৌহ বল নিক্ষেপ (সাধারণ) :—১ম—জে কোটেজ (আর এ এফ), ২য়—এস কে মিত্র (বাটা কোম্পানী), ৩য়—এ দত্ত (২৪ পরগণা), দূরত্ব—৩৮ ফিঃ ½ ইঞ্চি।

১১০ মিটার হার্ডল্স :—১ম—জি ই হাউইট (ক্যালকাটা ওয়েষ্ট ক্লাব) ২য়—সি এইচ কং (আই এ ক্যাম্প) ৩য়—এস প্রামাণিক (আই এ ক্যাম্প), সময়—১৬ ১/৫ সেকেণ্ড।

৪০০ মিটার হার্ডল :—১ম—সি এইচ কং (আই এ ক্যাম্প) ২য়—প্রাইভেট জার্গেনসন (সৈন্যদল), ৩য়—পল এ্চেন (চাইনিজ ন্যাশন্যাল ও সি), সময়—৫৯।০ সেকেণ্ড (বেঙ্গল রেকর্ড)

৪ × ১০০ মিটার হার্ডল :—বিজয়ী ক্যালকাটা ওয়েষ্ট ক্লাব দল (এম ফেরন, আর পেরেরা, ডি ফেরন ও জি হাউইট), ২য়—ক্যালকাটা এ আর পি দল, সময়—৪৬ ৩।৫ সেঃ।

৪ × ৪০০ মিটার রীলে :—বিজয়ী ক্যালকাটা ওয়েষ্ট ক্লাব (এম বিভেবিজ ডি ফেরন, আর পেরেরা ও এম ফেরন) ছিলেন ২য়—আই এ ক্যাম্প দল; সময়—৩ মিঃ ৪২ ৪।৫ সেকেণ্ড।

মহিলাদের—

৫০ মিটার দৌড় :—১ম—মিস এম নিকলাস (ক্যালকাটা ওয়েষ্ট ক্লাব), ২য়—কুমারী পদ্মা দত্ত (শিশু মঙ্গল প্রতিষ্ঠান), ৩য় কুমারী যূথিকা দে (শিশু মঙ্গল প্রতিষ্ঠান); সময়—৭ ১/৫ সেঃ।

১০০ মিটার দৌড় :—১ম মিস এম নিকলাস (ক্যালকাটা ওয়েষ্ট ক্লাব), ২য়—কুমারী পদ্মা দত্ত (শিশু মঙ্গল প্রতিষ্ঠান), ৩য়—মিস আর ফেরন (ক্যালকাটা ওয়েষ্ট ক্লাব), সময়—১৪ ২/৫ সেকেণ্ড।

৮৩ মিটার নীচু হার্ডল :—১ম—মিস এম রোচ (ক্যালকাটা ওয়েষ্ট ক্লাব), ২য়—মিসেস এফ জনসন (ক্যালকাটা ওয়েষ্ট ক্লাব), সময়—১৫ সেকেণ্ড।

১৫০০ মিটার সাইকেল :—১ম—কুমারী যূথিকা দে (শিশু মঙ্গল প্রতিষ্ঠান), ২য়—কুমারী চিত্রা সেনগুপ্তা (শিশু মঙ্গল প্রতিষ্ঠান), সময়—৪ মিনিট ৩ সেকেণ্ড।

দৈর্ঘ্য লম্ফ :—১ম—মিস মার্গারেট নিকলাস (ক্যালকাটা

ওয়েষ্ট ক্লাব), ২য়—কলিন মানরো (ক্যালকাটা ওয়েষ্ট ক্লাব), ৩য়—মিসেস ই জনসন (ক্যালকাটা ওয়েষ্ট ক্লাব), দূরত্ব—১৩ ফিট ৩ ইঞ্চি।

ঊর্দ্ধ লম্ফ :—১ম—মিস এম রোচ (ক্যালকাটা ওয়েষ্ট ক্লাব), ২য়—মিস মার্গারেট নিকলাস (ক্যালকাটা ওয়েষ্ট ক্লাব), ৩য়—মিস কলিন মানরো (ক্যালকাটা ওয়েষ্ট ক্লাব), উচ্চতা ৩ মিনিট ১০½ ইঞ্চি।

লৌহ বল নিক্ষেপ :—১ম—মিস কলিন মানরো (ক্যালকাটা ওয়েষ্ট ক্লাব), ২য়—মিসেস ই জনসন (ক্যালকাটা ওয়েষ্ট ক্লাব), দূরত্ব—২৩ ফিট ৩½ ইঞ্চি।

ডিসকাস নিক্ষেপ :—১ম—মিসেস ই জনসন (ক্যালকাটা ওয়েষ্ট ক্লাব), ২য়—সি মানরো (ক্যালকাটা ওয়েষ্ট ক্লাব) ; দূরত্ব—৫৬ ফিট ৫ ইঞ্চি।

বর্শা নিক্ষেপ :—১ম—মিসেস ই জনসন (ক্যালকাটা ওয়েষ্ট ক্লাব), ২য়—টি গোমেস (ক্যালকাটা ওয়েষ্ট ক্লাব), দূরত্ব—১৬ ফিঃ।

ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ানসীপ :

পুরুষ : লে ডি জি পার্সিভ্যাল (সৈন্যদল)—২০ পয়েণ্ট।

মহিলা :—মিস মার্গারেট নিকলাস (ক্যালকাটা ওয়েষ্ট ক্লাব) ২০ পয়েণ্ট।

দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ :

পুরুষ :—ক্যালকাটা ওয়েষ্ট ক্লাব—৬১ পয়েণ্ট।

মহিলা :—ক্যালকাটা ওয়েষ্ট ক্লাব—৪৩ পয়েণ্ট।

২৪ পরগণা জেলা স্পোর্টস :

২৪ পরগণা জেলা স্পোর্টস এসোসিয়েসনের পঞ্চম বার্ষিক স্পোর্টস বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৩০টি ক্লাব এবং স্কুলের ছাত্রদের নিয়ে মোট ২১২ জন এ্যাথলিট প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন। প্রতিযোগিতায় সর্বক্ষণ একটি লক্ষ্য করবার ছিল পরিচালকমণ্ডলীর সুব্যবস্থা। এই সুব্যবস্থার একান্ত অভাব আমাদের দেশের অনেক নামকরা প্রতিযোগিতায় দেখা যায় বলে দর্শকমণ্ডলী ধৈর্য্যচ্যুত হয়ে পড়তে এবং অনুষ্ঠানে নানা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হতে দেখা গেছে। দেশের যুবকদের মধ্যে খেলাধূলার উৎসাহ বর্দ্ধনের জন্য ২৪ পরগণা জেলা স্পোর্টস এসোসিয়েশনের প্রচেষ্টা সত্যই প্রশংসনীয়। এই প্রসঙ্গে আমরা এসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রীযুক্ত শিবপ্রসন্ন ঘোষালকে প্রশংসা না ক'রে থাকতে পারি না।

ফলাফল :

১০০ গজ দৌড়—১ম আব্দুল হামিদ (প্যারাগন) ; ২য়—শিবু পরামাণিক (টি পি এম)। ৩য়—নির্ম্মল দাস (টি পি এম)।

২২০ গজ দৌড়—১ম—আব্দুল হামিদ (প্যারাগন) ; ২য়—শিবু পরামাণিক (টি পি এম) ; ৩য়—কালীপদ কর্ম্মকার (প্যারাগন)।

৪৪০ গজ দৌড়—১ম—কালীপদ কর্ম্মকার (প্যারাগন) ; ২য়—অজিত ধারা (এ এস সি) ; ৩য়—তারাচরণ মাইতি (নিমতা)।

৮৮০ গজ দৌড়—১ম—তারক ব্যানার্জ্জি (বি এ সি) ; ২য়—অজিত ধারা (এ এস সি) ; ৩য়—দাশরথী রায় (প্যারাগন)।

১০০ গজ হার্ডল—১ম—জহর চ্যাটার্জ্জি (প্যারাগন) ; ২য়—সুশীল লাহিড়ী (প্যারাগন) ; ৩য়—কাশীপতি নন্দী (বরাহনগর)।

বর্শা নিক্ষেপ—১ম—কমল দাস (প্যারাগন) ; ২য়—শান্তি দে (প্যারাগন) ; ৩য়—বীরেন সিকদার (প্যারাগন)।

লৌহ বল নিক্ষেপ—১ম—আশুতোষ দত্ত (বি এ সি) ; ২য়—অনিল শেঠ (টি পি এম) ; ৩য়—লতিফুল্লা (এ আর পি)।

দৈর্ঘ্য লম্ফন—১ম—আব্দুল হামিদ (প্যারাগন) ; ২য়—শক্তিপদ মিত্তা (বি এ সি) ; ৩য়—নির্ম্মল রায় (টি পি এম)।

উচ্চ লম্ফন—১ম—শক্তিপদ মিত্তা (বি এ সি) ; ২য়—জহর চ্যাটার্জ্জি (প্যারাগন) ; ৩য় নির্ম্মল ভট্টাচার্য্য। উচ্চতা ৫ ফিট ৮½ ইঞ্চি।

হপ ষ্টেপ জাম্প—১ম—শক্তিপদ মিত্তা (বি এ সি) ; ২য়—শৈলেন দত্ত (বি এ সি) ; ৩য়—জহর চ্যাটার্জ্জি (প্যারাগন)। দূরত্ব ৩৮ ফিট ৪ ইঞ্চি।

পোল ভল্ট—১ম—চন্দ্রনাথ পালিত (বি এ সি) ; ২য়—নির্ম্মল ভট্টাচার্য্য (বি এ সি) ; ৩য়—শান্তি রায় (প্যারাগন)।

এক মাইল ভ্রমণ—১ম—জহর কর্ম্মকার (ঘোষ বাগান) ; ২য়—বিষ্ণু মণ্ডল (এ এস সি) ; ৩য়—সুধীর দাস (এ এস সি)।

দুই মাইল সাইকেল—১ম—শম্ভুনাথ মান্না (এ এস সি) ; ২য়—জহিরুল হক (এ আর পি) ; ৩য়—প্রহ্লাদ শ্রীমানি (বি এ সি)।

রীলে রেস—১ম—প্যারাগন ; ২য়—বেলঘরিয়া এ সি।

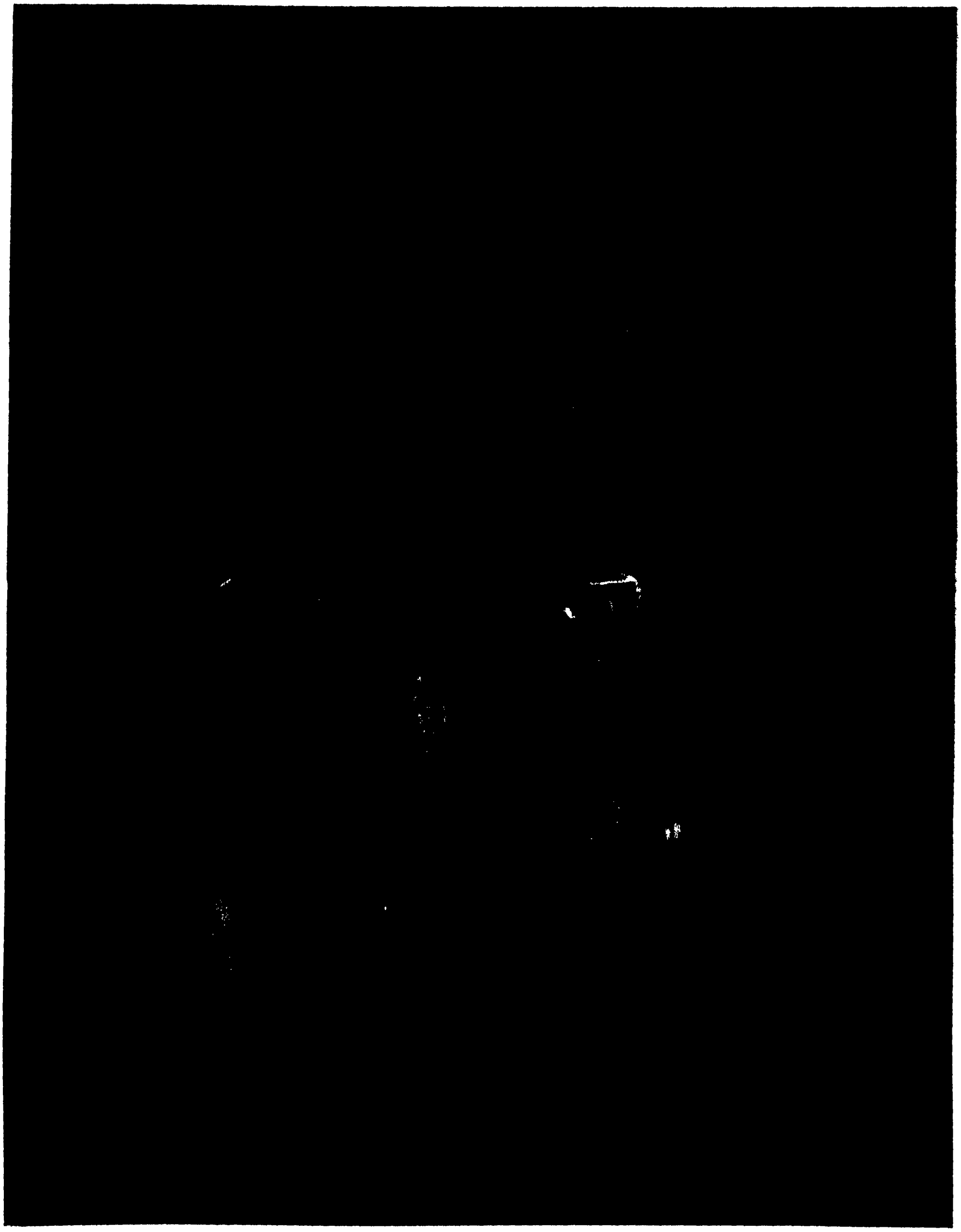
সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীঅলকা মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "নন্দিতা"—১৷০
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত "ভূত আর অদ্ভুত"—১৷৴০
শ্রীহারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "মা ও মাটি"—২৲
অধ্যাপক শ্রীঅনাথগোপাল সেন প্রণীত "যুদ্ধের দক্ষিণা"—১৷০
শ্রীঅনাদিনাথ পাল প্রণীত "মহাচীনের খবর"—১৷০
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "পঞ্চগ্রাম" (গণ-দেবতা)—৫৲
শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত জীবনী-গ্রন্থ "বলদর্পী হিটলার"—১৲
শ্রীশশধর দত্ত প্রণীত উপন্যাস "রমার দাবি"—২৲
শ্রীতুলসীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল লীলামৃত"—৷৷০
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত শিশুপাঠ্য "খেলার হাট"—২৲

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা ; ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত



শিল্পী—শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র মণ্ডল

ভোরের আলো

ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্



চৈত্র—১৩৫০

দ্বিতীয় খণ্ড | একত্রিংশ বর্ষ | চতুর্থ সংখ্যা

ব্রহ্মকারণবাদ

ডক্টর শ্রীমতী রমা চৌধুরী এম-এ, ডি-ফিল (অক্সন)

বেদান্তমতে ব্রহ্মই সর্ব্বোচ্চ তত্ত্ব।

'ব্রহ্ম' শব্দের অর্থ 'বৃহত্বশালী' (বৃহ+মন্) অর্থাৎ, তিনিই ব্রহ্ম যিনি বৃহত্তম, যাঁহার সমকক্ষ অথবা উচ্চতর কেহই নাই, যাঁহার দৈশিক, কালিক অথবা অন্য কোন প্রকার সীমা নাই, যাঁহার স্বরূপ, গুণ ও শক্তি অনতিক্রমণীয় ও অতুলনীয় ("স্বাভাবিক স্বরূপ-গুণ-শক্ত্যাদিভিঃ বৃহত্তমঃ")। ব্রহ্মই এই চিদচিদ্ বিশিষ্ট বিশাল পৃথিবীর একমাত্র মূল কারণ। এই জগতের ব্রহ্ম হইতেই উৎপত্তি, ব্রহ্মেই স্থিতি এবং ব্রহ্মেই লয়। ব্রহ্ম জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। যে বস্তু হইতে অপর একটী বস্তু কার্য্যরূপে উৎপন্ন হয়, তাহাকে সেই কার্য্যের উপাদান কারণ বলে; যেমন মৃত্তিকা মৃন্ময় ঘটের উপাদান কারণ। যে বস্তুর কর্মশক্তির সাহায্যে উপাদান কারণ কার্য্যোৎপাদনে সমর্থ হয়, তাহাকে নিমিত্ত কারণ বলে; যেমন কুম্ভকার মৃন্ময় ঘটের নিমিত্ত কারণ। সাধারণতঃ উপাদান ও নিমিত্ত কারণ পরস্পর ভিন্ন। কিন্তু ব্রহ্ম জগতের অভিন্ন উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। উপনিষদে একটী শ্লোক আছে—"তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি" (ছান্দোগ্য ৬-২৩)। তিনি চিন্তা করিলেন: 'আমি বহু হই; অর্থাৎ বহু হইতে ইচ্ছা করিয়া, ব্রহ্ম স্বীয় সত্তাকে (উপাদান কারণ) স্বীয় ইচ্ছা বলে (নিমিত্ত কারণ) এই দৃশ্যমান জগতে পরিণত করিলেন। এইরূপে, জগত ব্রহ্মের কার্য্য; ব্রহ্মের পরিণাম। ১

জগতের উপাদান কারণত্ব হেতু, ব্রহ্ম জগতে ওতপ্রোতভাবে বিলীন হইয়া আছেন। যেরূপ মৃন্ময় ঘটে মৃত্তিকা ব্যতীত আর কিছুই নাই, সেইরূপ ব্রহ্মকার্য্য জগতে সকলই ব্রহ্ম। সকল জড় ও অজড় বস্তু, ব্রহ্ম হইতে আপাতদৃষ্টিতে ভিন্ন বোধ হইলেও, বস্তুতঃ ব্রহ্ম পরিণাম বলিয়াই ব্রহ্ম সত্তাময়। এই কারণেই উপনিষদ্ বলিয়াছেন "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"। বস্তুতঃ, ব্রহ্ম জগতের বহির্ভূত অথবা জগদতিরিক্ত (Transoendent) হইলেও অন্তর্লীন (Immanent)। কুম্ভকার যেরূপ ঘটের বহিঃস্থিত কারণ অথবা উৎপাদক, ব্রহ্ম জগতের তাদৃশ কারণ নহেন। উপরন্তু, যদিও তিনি জীবজগৎ হইতে অভিন্ন নহেন এবং তাঁহার পূর্ণবিকাশ এই একটী ক্ষুদ্র জগতে সম্ভব নহে, তথাপি ইহার আত্মা ও অন্তর্যামীরূপে তিনি ইহাতে লীন হইয়া আছেন।

এইস্থানে ব্রহ্মকারণবাদের বিরুদ্ধে কয়েকটী আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। প্রথম প্রশ্ন এই হইতে পারে যে, ব্রহ্ম এই জগৎটী সৃষ্টি করিলেন কেন? পৃথিবীর সকল দর্শনশাস্ত্রেরই মূল প্রশ্ন এই। বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তির কার্য্য কদাপি উদ্দেশ্যহীন হয় না। যখনই আমরা কোনও কার্য্য করি, তখনই আমরা কোনও না কোনও উদ্দেশ্য সিদ্ধির আশায় উহা করিয়া থাকি। মহাজ্ঞানী ব্রহ্মের কার্য্যাবলীও নিরর্থক বা উদ্দেশ্যহীন হইতে পারে না। কিন্তু জগৎসৃষ্টির মূলে যে প্রেরণা তাহা কোন্ উদ্দেশ্য লাভের আশায়? আমরা দোষত্রুটীপূর্ণ অসম্পূর্ণ মানব; আমাদের অভাব ও প্রয়োজন অসংখ্য, কিন্তু শক্তি অল্প। তজ্জন্য আমাদের কার্য্যের মূলে থাকে এই অভাব পূরণের

১ অবশ্য শঙ্করের মতে জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত মাত্র, পরিণাম নহে।

প্রচেষ্টা ; যাহা আমাদের নাই, অথচ যাহা আমরা চাই, তাহারই লাভের প্রচণ্ড ইচ্ছা। কিন্তু ব্রহ্ম সকল অভাব, সকল অসম্পূর্ণতার বহু ঊর্দ্ধে বিরাজমান। তিনি আপ্তকাম—নিত্যতৃপ্ত, নিত্যমুক্ত, নিত্যবুদ্ধ। অতৃপ্ত ইচ্ছা বা অপ্রাপ্ত বস্তু তাঁহার কিছুই থাকিতে পারে না। তাহা হইলে এই জগৎ সৃষ্টি কার্য্যটি ব্রহ্মের কোন্ উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত? জগৎ সৃষ্টি করিয়া তিনি স্বয়ং কিছু লাভ করিতে পারেন না, কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে তাঁহার অভাব কিছুই নাই। পরন্তু, এই জগৎ সৃষ্টি জীবের মঙ্গলের জন্যও বলা যায় না, যেহেতু এই সংসার পরম দুঃখের আগার এবং সংসার ক্লেশ হইতে মুক্তি লাভই মোক্ষ অথবা চরম পুরুষার্থ।

এই প্রসঙ্গে অপর একটী প্রশ্নও স্বতঃই মনে উদিত হয়। পরম করুণাময় ব্রহ্ম কেন স্বেচ্ছাক্রমে জীব সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে এইরূপ দুঃখের অগ্নিতে দগ্ধ করিতেছেন? তিনি যদি এই সকল দুঃখ যন্ত্রণা রোধ করিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহাকে কিরূপে সর্ব্বশক্তিমান বলি? আর তিনি যদি রোধ করিতে পারেন, অথচ করেন না, তাহা হইলে তাঁহাকে পরম করুণাময়ই বলা যায় কি প্রকারে? হয় তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ নহেন, অথবা তিনি পরম করুণাময় নহেন। ইহা ছাড়া তৃতীয় পক্ষ আর কি হইতে পারে? এতদ্ব্যতীত, এই ব্রহ্মসৃষ্ট জগতে অসংখ্য অবস্থা ও গুণ বৈষম্য লক্ষিত হয়—কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র, কেহ সুখী, কেহ দুঃখী, কেহ স্বাস্থ্যবান্, কেহ রুগ্ন ইত্যাদি। অনেক সময়েই ধার্ম্মিকগণের দুঃখ ও অধার্ম্মিকের সুখ ও সাফল্য দৃষ্ট হয়। সুতরাং, ব্রহ্ম যদি সত্যই পৃথিবীর স্রষ্টা হন, তাহা হইলে তাঁহাকে দয়ামায়াহীন এবং ধর্ম্মবিচার ও বিবেকবুদ্ধি শূন্য বলা ছাড়া আর উপায় কি?

এই দুইটী প্রশ্ন—(১) ব্রহ্ম জগৎ সৃষ্টি করিলেন কেন? ব্রহ্মসৃষ্ট জগতে এত দুঃখের প্রাবল্যই বা কেন?—মানব মনের চিরন্তন প্রশ্ন; বিভিন্ন যুগের ও বিভিন্ন দেশীয় মনীষিবৃন্দ বিভিন্ন ভাবে ইহার সমাধানের প্রচেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু ইহার শেষ উত্তর—এই চরম প্রশ্নের চরম উত্তর প্রদানে অদ্যাপি কেহ সমর্থ হইয়াছেন কিনা সন্দেহ। কেহ কেহ বলেন, ঈদৃশ প্রশ্ন সম্পূর্ণ নিরর্থক। ক্ষুদ্র মানবের পক্ষে ঈশ্বরের প্রতি কার্য্যের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন বুঝিবার চেষ্টা ধৃষ্টতামাত্র। একবিন্দু সমুদ্রোদক যেরূপ বারিধির সীমাহীন বিশালতাও অতলস্পর্শী গভীরতা বিষয়ে ধরণামাত্রও করিতে পারে না, সেইরূপ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র, অণুপ্রমাণ মানববুদ্ধিও ব্রহ্মের জ্ঞান, চিন্তা, ইচ্ছা ও কার্য্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এই অজ্ঞতা দূর করিতে ইচ্ছা হইলেও উপায় কিছুই নাই, কারণ মানবের মননশক্তি সীমাবদ্ধ এবং অসীমের উপলব্ধি বিষয়ে অসমর্থ। তজ্জন্য, বিচারবুদ্ধির আড়ম্বর ও নিষ্ফল আস্ফালন পরিত্যাগ-পূর্ব্বক আমাদিগকে শান্তভাবে ও শ্রদ্ধার সহিত শ্রুতি-স্মৃতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। শ্রুতি বলিয়াছেন—ব্রহ্মই সৎ, ব্রহ্মই জগতের একমাত্র কারণ—জগৎ সৃষ্টিতে তাঁহার প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য যাহাই হউক না কেন। শ্রুতি বলিয়াছেন—ব্রহ্মই পরম করুণাময় পরিত্রাতা, ব্রহ্মই সর্ব্বদা জীবের মঙ্গলের জন্য সচেষ্ট, পৃথিবীতে দুঃখ, ক্লেশ, অধর্ম্ম, অত্যাচার প্রভৃতি যতই দৃষ্ট হউক না কেন। এই শ্রুতিকথিত তত্ত্ব নির্ব্বিচারে গ্রহণ করাই আমাদের কর্ত্তব্য, "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"

কিন্তু মানবের মননশক্তির ঈদৃশ রোধকরণ এবং শ্রুতিবাক্যে ঈদৃশ অন্ধ ভক্তি মানবমনের চিরন্তনী অনুসন্ধিৎসাকে তৃপ্ত করিতে পারে না। শ্রুতি বাক্যে শ্রদ্ধার প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না; কিন্তু অন্ধ ভক্তি ও বিচারমূলক শ্রদ্ধার মধ্যে প্রভেদ অনেক। যে বিচারবুদ্ধি মানবমনের প্রকৃষ্ট বৃত্তি এবং যাহা পরমবিচারশক্তিমান ঈশ্বরেরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবদান, সেই বিচারবুদ্ধিই যদি আমাদের ব্রহ্ম সম্বন্ধীয় জ্ঞানলাভের সহায়তা না করিয়া, বিরোধিতাই করে, তাহা হইলে তাহাতে আমাদের আর লাভ কি? এই বিচারবুদ্ধিই মানব মনে এই সকল গূঢ় তত্ত্ব বিষয়ক প্রশ্ন উত্থাপিত করে; এই বিচারবুদ্ধিই তাহার শেষ উত্তরদানে জ্ঞান-পিপাসা তৃপ্ত করিতে পারে। ব্রহ্মজ্ঞানও বিচারমূলকজ্ঞান। সকল জ্ঞানের আকর ব্রহ্মকে জানিতে ও লাভ করিতে হইলে যে আমাদের স্বাভাবিক ও ঈশ্বরদত্ত বুদ্ধিবৃত্তিকে সমূলে পেষণ করিতে হইবে, ইহা অতি অসঙ্গত কথা। সেইজন্য ভারতীয় দর্শন শ্রুতির প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাশীল হইয়াও, মননের অত্যাবশ্যকীয়তাও অস্বীকার করেন নাই। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বৈদান্তিকেরা তজ্জন্য এই সকল প্রশ্নকে হাস্যকর, নিরর্থক অথবা ধৃষ্টতামাত্র বলিয়া অবহেলাও করেন নাই; আবার কেবলমাত্র শ্রুতিকেই উত্তরদাতা বলিয়া গণ্য করেন নাই; কিন্তু যথাসাধ্য বিচারমূলক সমাধানের প্রচেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা এই সংসারকে ভগবানের লীলামাত্র বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ("লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্" ব্রহ্মসূত্র ২-১-৩২)। ব্রহ্মের জগৎসৃষ্টিরূপ কার্য্য কোনও প্রকার প্রয়োজন অথবা অভাব হইতে উদ্ভূত নহে, কারণ ইহা তাঁহার লীলা অথবা ক্রীড়া মাত্র। মহাপরাক্রমশালী কোনও সম্রাট্ যখন বিভিন্ন প্রকারের ক্রীড়া লিপ্ত হন, তাঁহার অভাব কিছুই থাকে না। উপরন্তু অভাব নাই বলিয়াই, সকল উদ্দেশ্যসিদ্ধি হইয়া গিয়াছে বলিয়াই, তিনি ক্রীড়া ও উৎসবে কালক্ষেপণ করিতে পারেন। ব্রহ্মও জগৎসৃষ্টি দ্বারা কোনও উদ্দেশ্যলাভের আশা করেন না। উপরন্তু নিত্যতৃপ্ত, আপ্তকাম বলিয়াই স্বকীয় নিত্য উদ্বেলিত ও পূর্ণ আনন্দ হইতেই এই জগৎ সৃষ্টিরূপ ক্রীড়ায় তিনি মত্ত হন। সেইজন্য উপনিষদে আছে—"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি"। তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ৩-৬।

অবশ্য ব্রহ্মের নিকট জগৎসৃষ্টি স্বতঃ উচ্ছ্বসিত আনন্দমূলক ক্রীড়ামাত্র হইতে পারে; কোনও প্রয়োজনমূলক অত্যাবশ্যকীয় কার্য্য নহে। কিন্তু সংসারচক্রপিষ্ট সৃষ্ট জীবগণের নিকট উহা অনাদিদুঃখের মূলীভূত কারণ-রূপেই প্রতীয়মান হয়। যিনি, এমন কি প্রয়োজনানুরোধেও নহে, কেবলমাত্র সামান্য ক্রীড়ার জন্যই, অসংখ্য জীবকে দুঃখসাগরে নিমগ্ন করেন, তাঁহাকে দয়াময় নামে অভিহিত করা যায় কি প্রকারে? ইহার উত্তর এই যে—ব্রহ্মের এই জগৎসৃষ্টিরূপ লীলা অথবা ক্রীড়া স্বপ্রয়োজন-হীন হইলেও সর্ব্বতোভাবে উদ্দেশ্যশূন্য নহে। ইহার একটী গূঢ় উদ্দেশ্য আছে অর্থাৎ বদ্ধ জীবগণকে মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে সাহায্য করা। সংসার দুঃখের আগার সন্দেহ নাই। কিন্তু ভোগ দ্বারাই কর্ম্মক্ষয় এবং কর্ম্মক্ষয় ব্যতীত মুক্তিলাভ হয় না। সুতরাং ভোগের নিমিত্ত ভোগাগার সংসারের প্রয়োজন অত্যাবশ্যকীয়। ভারতীয় দর্শনের মতে ফলেচ্ছু হইয়া কর্ম্ম করিলেই কর্ম্মকর্ত্তাকে তাহার ফল, ভাল অথবা মন্দ, ভোগ করিতেই হইবে, স্বর্গে অথবা নরকে বর্ত্তমান জীবনে অথবা পরবর্ত্তী জীবনে, অর্থাৎ এই সকল সকাম কর্ম্ম ফলপ্রসূ হইয়া উপভুক্ত হইলেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, অন্যথা সঞ্চিত হইয়া ক্রমাগত জন্মজন্মান্তরের কারণ হয়। ইহাই ন্যায়ের অমোঘ বিধান:—কর্ম্মের ফল হইতে নিষ্কৃতি কিছুতেই নাই। সুতরাং অনাদি সংসারচক্র হইতে মুক্তিলাভ করিয়া নিগূঢ় আনন্দময় মোক্ষের আস্বাদ গ্রহণেচ্ছুকে সর্ব্বপ্রথম ভোগের দ্বারা সঞ্চিত কর্ম্ম সমুচ্চয়ের বিনাশ সাধন করিতে হইবে—যেই হেতু তাহাকে সংসারে জন্মগ্রহণ করিতেই হইবে, অন্য উপায় নাই। ইহাই সংসার সৃষ্টির অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজন। অবশ্য সৃষ্টজীব পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মভোগমাত্র না করিয়া অজ্ঞানতাবশতঃ ঐহিক ও পারত্রিক ভোগ কামনায় নব নব সকাম কর্ম্মে পুনরায় প্রবৃত্ত হইতে পারে। এই সকল অজ্ঞানতমসাবৃত, মূঢ়বুদ্ধি ভোগলিপ্সু জীবের নিকট সংসার মুক্তির দ্বার-স্বরূপ না হইয়া পুনর্বন্ধের কারণই হয় মাত্র; যেহেতু নবকৃত সকাম কর্ম্মের ফলভোগের জন্য তাহাদিগকে বারংবার জন্মগ্রহণ করিতে হয়—জন্ম, সকামকর্ম্ম পুনর্জ্জন্ম, সকামকর্ম্ম পুনর্জ্জন্ম—এই অনাদি ও অনন্ত সংসারচক্রের আবর্ত্তনে তাহারা ক্রমাগত পিষ্ট হইতে থাকে, উদ্ধারের

কোনই উপায় থাকে না। কিন্তু মোক্ষলাভে দৃঢ়সংকল্প প্রেক্ষাবান্ জীব সংসারকে পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মফল ভোগের ক্ষেত্রস্বরূপ মাত্র গণ্য করিয়া, পুনরায় যাহাতে কর্ম্মসঞ্চয় না হয় তদ্বিষয়ে অবহিত হয়; অর্থাৎ কদাপি সকামকর্ম্মে পুনরায় প্রবৃত্ত হয় না। তাহারা শাস্ত্রানুমোদিত নিত্য (স্নান, আচমন ইত্যাদি) ও নৈমিত্তিক (শ্রাদ্ধ ইত্যাদি) কর্ম্মমাত্রে এবং জগতের হিতার্থে অন্যান্য নিষ্কাম কর্ম্মে সম্পূর্ণ স্বার্থলেশশূন্য ভাবে প্রবৃত্ত হয়। সেই হেতু এই সকল নিষ্কাম কর্ম্ম পুনর্জ্জন্মের কারণ হয় না এবং প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগদ্বারা ক্ষয় হইলে তাহারা মোক্ষলাভে অধিকারী হয়। সুতরাং সৃষ্টি যে জীবগণের জন্যই অতীব প্রয়োজনীয়, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য।

এই স্থলে স্বতঃই একটী প্রশ্নের উদয় হয়:—পূর্ব্ব সৃষ্টীকৃত কর্ম্মক্ষয়ের নিমিত্ত উত্তর সৃষ্টির প্রয়োজন অত্যাবশ্যকীয় সন্দেহ নাই; কিন্তু সর্ব্বপ্রথম সৃষ্টির প্রয়োজন কি ছিল? ইহার পূর্ব্বে ত কোনও সংসার সৃষ্ট হয় নাই এবং জীবগণও সৃষ্ট হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় নাই। সুতরাং জীবগণের কর্ম্মক্ষয় এবং মোক্ষলাভের নিমিত্ত জগৎসৃষ্টির প্রয়োজন কিছুই ছিল না। তাহা হইলে তৎকালীন ব্রহ্মলীন ও ব্রহ্মানন্দাপ্লুত মুক্ত জীবগণকে জগৎ-সৃষ্টিপূর্ব্বক সংসারপাশে বদ্ধ করার প্রয়োজন কি ছিল?

এই প্রশ্নের সমাধানের নিমিত্ত বৈদান্তিকগণ "বীজাঙ্কুর ন্যায়ের" অবতারণা করিয়া থাকেন। বীজ ও অঙ্কুরের সম্বন্ধ অনাদি সম্বন্ধ। বীজ হইতে অঙ্কুর ও অঙ্কুর হইতে পুনরায় বীজ জন্মে। কিন্তু বীজই অঙ্কুরের পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ;—অথবা অঙ্কুরই বীজের পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ এবং সর্ব্বপ্রথম বীজের উৎপত্তির কারণ কি, তাহা বলা যায় না। তদ্রূপ সংসার ও কর্ম্মের মধ্যে অনাদি সম্বন্ধ। সংসার হইতে কর্ম্ম এবং কর্ম্ম হইতে পুনরায় সংসার সৃষ্টি হয়। কিন্তু সংসারই কর্ম্মের পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ, অথবা কর্ম্মই সংসারের পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ এবং সর্ব্বপ্রথম সংসারসৃষ্টির কারণ কি, তাহা জানা যায় না। সেইজন্য সংসার ও কর্ম্ম উভয়কেই অনাদি বলিয়া স্বীকার করা হয়।

পূর্ব্বোক্ত সমাধান অবশ্য সমাধান-নামযোগ্যই নহে, কারণ স্বীকার করা হইয়াছে যে সর্ব্বপ্রথম সৃষ্টির কোনও প্রকার ন্যায়সঙ্গত ব্যাখ্যা আমাদের পক্ষে সম্ভবপরই নহে এবং তজ্জন্য সংসারের অনাদিত্বকে স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করা ব্যতীত অন্য উপায় নাই। কিন্তু সত্যই কি প্রথম সৃষ্টির কোনও সঙ্গত কারণ আমরা দেখিতে পাই না? বস্তুতঃ জগৎসৃষ্টি ব্রহ্মের স্বভাবজ কার্য্য, যেরূপ আলোক বিকীরণ সূর্য্যের এবং অঙ্কুর সৃষ্টি বীজের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। সূর্য্যের আলোক দান স্বীয় অসম্পূর্ণতা হেতুক নয়, কিন্তু ইহাই তাহার বিশিষ্ট স্বভাব। সেইরূপ ব্রহ্মের জগৎসৃষ্টি তাঁহার স্বীয় কোনও অভাব বা অসম্পূর্ণতা হেতুক নহে, কিন্তু তাঁহার আত্মস্বরূপোত্থিত ধর্ম্ম বিশেষ। স্বরূপলীন চিৎ ও অচিৎ শক্তিদ্বয়কে প্রকটীভূত করিয়া তিনি স্বীয় স্বরূপকেই প্রকাশ করিতেছেন। এই স্বপ্রকাশ, প্রকাশস্বভাব ব্রহ্ম যে স্বভাবতই বিশ্বসৃষ্টি করিবেন, তাহা আর বিচিত্র কি?

জীবের পক্ষ হইতেও প্রকাশস্বভাব ব্রহ্মের সৃষ্টিকার্য্য সার্থক। ব্রহ্মে শক্তিভাবে মাত্র লীন জীবের স্বাতন্ত্র্য থাকিলেও, পরিপূর্ণ সার্থকতা কোথায়? 'নিত্যমুক্ত' দিগের মুক্তি কেবল কথার কথা মাত্র। যে মুক্তি স্বকীয় প্রচেষ্টা ও সাধনালব্ধ নহে, তাহা মুক্তি নামধেয়ই নহে। তজ্জন্য সৃষ্ট জীব সংসারের সকল ক্লেশ ও পরীক্ষার মধ্যেই স্বীয় মুক্তির পথ স্বয়ং খুঁজিয়া লয়। অর্থাৎ ভগবৎ ক্রোড়চ্যুত জীব স্বচেষ্টায় ভগবৎ ক্রোড়েই পুনরায় গমন করে। ইহাই প্রকৃত মুক্তি ও একমাত্র সার্থকতা।

জগৎসৃষ্টি ব্রহ্মের পক্ষ হইতেও যে নিরর্থক, ইহাও বলা ভুল। স্বভাবধর্ম্ম পালন নিরর্থক ত নহেই, উপরন্তু সকল উদ্দেশ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আলোকদান কি রবির পক্ষ হইতে নিষ্ফল? যদি জগৎসৃষ্টিকে ব্রহ্মের লীলাও বলা হয়, তাহা হইলেও উহা কি ব্রহ্মের কোনই প্রয়োজন সিদ্ধি করে না? লীলাও উদ্দেশ্যবিহীন নহে; আনন্দের উৎকর্ষ সাধনই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য। স্বীয় পরিপূর্ণ আনন্দ হইতে সৃষ্ট বিশ্ব ব্রহ্মের আনন্দেরই পরিপোষক, নতুবা স্বভাব ধর্ম্মের ব্যাহতি অথবা স্বভাব বিপরীত কর্ম্ম উভয়ই আনন্দের পরিশোষক। সুতরাং স্রষ্টার আনন্দের অক্ষুণ্ণতা ও সৃষ্টের পরিপূর্ণ সার্থকতা—এতদুভয় সৃষ্টির আদি প্রয়োজন।

যাহা হউক—'ব্রহ্ম জগৎ সৃষ্টি করিলেন কেন?' এই প্রথম প্রশ্নের উত্তর বৈদান্তিকগণের মতে এই যে—ব্রহ্ম লীলাক্রমে স্বীয় প্রয়োজন ব্যতীতই জীবের মুক্তির জন্য এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর 'ব্রহ্ম সৃষ্ট জগতে এত দুঃখ ও অবস্থা বৈষম্য কেন?' এই দ্বিতীয় প্রশ্ন আলোচনীয়। ইহার উত্তর পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সৃষ্টি সর্ব্বদা জীবের কর্ম্মানুসারেই হইয়া থাকে। জীব স্বীয় কর্ম্মফলানুসারে জগতে বিভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া সুখোপভোগ অথবা দুঃখানুভব করে। সুতরাং অবস্থা বৈষম্য ও সুখদুঃখ-তারতম্যের জন্য দায়ী জীব স্বয়ং, ব্রহ্ম নহেন। বেদান্ত শাস্ত্রে ব্রহ্মকে 'পর্জ্জন্য ইব' অথবা মেঘের ন্যায় বলা হইয়াছে। জল-ভারাবনত বর্ষার মেঘ সকল স্থানেই, ভালমন্দ সকল প্রকার বীজের উপরই, নির্ব্বিচারে ও সমভাবে বারি বর্ষণ করিয়া থাকে। তথাপি সকল প্রকার বৃক্ষ সমান হয় না। ইহার কারণ কি? জলদানকারী মেঘ এই প্রভেদের কারণ হইতে পারে না, কারণ জলদানে মেঘ পক্ষপাতহীন। সুতরাং বিভিন্ন বীজগত প্রভেদই বৃক্ষসমূহের পরস্পর প্রভেদের একমাত্র হেতু। তদ্রূপ, ব্রহ্ম সৃষ্টি বৈষম্যের কারণ নহেন—তিনি মেঘেরই ন্যায় পক্ষপাতলেশহীন ও ন্যায়পরায়ণ। কিন্তু, জীবগত অনাদি কর্ম্মবীজই জীবগণের পরস্পর অবস্থা তারতম্যের একমাত্র কারণ।

এস্থলে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, ব্রহ্মকে জীবের অন্তর্য্যামী বলিয়া স্বীকার করা হয়। সুতরাং জীবের কর্ম্ম প্রবৃত্তির মূলে ব্রহ্মের ইচ্ছাই বলবতী, এবং ব্রহ্ম জীবের কর্ম্মের জন্য একেবারেই দায়ী নহেন, একথা বলা ভুল। আমরা ইহার উত্তর এই প্রকারে দিতে পারি যে 'অন্তর্য্যামিত্বের' অর্থ 'সর্ব্বকর্ম্মকর্ত্তৃত্ব' নহে। জীবের অন্তরাত্মরূপে স্থিত বলিয়া ব্রহ্মকে যদি জীবগণের সকল কর্ম্ম-প্রেরণার মূলীভূত কারণ বলিয়া মনে করা যায়, তাহা হইলে জীবকে পরচালিত, জড়যন্ত্র বিশেষ মাত্র বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে এবং প্রকৃতপক্ষে জড়জগৎ ও অজড় জীবের মধ্যে কোনও রূপ প্রভেদ থাকিবে না। চিৎ ও অচিতের মধ্যে কেবল এই প্রভেদই নহে যে, চিৎ জ্ঞানসম্পন্ন, অচিৎ জ্ঞানহীন; কিন্তু অপর একটী বিশেষ প্রভেদও তাহাদের মধ্যে আছে—অর্থাৎ জীব, বিশেষতঃ বিচার বুদ্ধি-সম্পন্ন উচ্চস্তরের জীব অথবা মানব, স্বাধীনপ্রবৃত্তিশীল ও স্বাধীনকর্ম্মী; জগৎ তাহা নহে। জীব স্বীয় প্রয়োজন ও প্রবৃত্তি অনুসারে বিভিন্ন কর্ম্মপন্থা স্বয়ং ও স্বাধীনভাবে স্থির করে; জড়বস্তুর ঈদৃশী শক্তি নাই, উহা বহিঃস্থিত অপর কোনও কারণ অথবা শক্তি দ্বারা চালিত হইলেই কার্য্যপ্রবৃত্ত হয়, স্বয়ং নহে। তজ্জন্য কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের প্রশ্ন জীবের পক্ষেই সম্ভব, জড়বস্তুর পক্ষে কদাপি নহে। স্বাধীনপ্রবৃত্তিবিশিষ্ট জীবই কেবল স্বকর্ম্মের জন্য দায়ী এবং স্বকর্ম্ম ফলভোগী হয়, অন্য কেহ নহে। যে কর্ম্ম, প্রথমতঃ বিচারবুদ্ধিমূলক, দ্বিতীয়তঃ স্বাধীন প্রবৃত্তি প্রসূত, কেবল সেই কর্ম্মই ন্যায় বিচারযোগ্য, অর্থাৎ তাহাই ভাল অথবা মন্দ, পুণ্য অথবা পাপ, প্রশংসনীয় অথবা নিন্দনীয়, পুরস্কার্য্য অথবা দণ্ডনীয়। কিন্তু যাহা বিচারবুদ্ধিপ্রসূত নহে, তাহা ন্যায়বিচারার্হ নহে; যথা, বুদ্ধিহীন শিশুর অথবা জড়বস্তুর কার্য্যাবলী, ব্যাত্যা, ভূমিকম্প ইত্যাদি। পুনরায়, যাহা স্বেচ্ছাকৃত নহে, তাহাও সমভাবে অবিচার্য্য। যথা, জীবের মরণশীলতা। প্রত্যেক জীবকেই কোন না কোন সময়ে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়, কিন্তু এই কর্ম্মটী স্বেচ্ছাকৃত নহে, উপরন্তু ইচ্ছাবিরুদ্ধ। প্রবলপ্রতাপান্বিত রাজচক্রবর্ত্তীর আদেশানুসারে কৃত স্বকীয় ইচ্ছাবিরুদ্ধ কার্য্যাবলীও তাদৃশ। সুতরাং, জীব বিচারবুদ্ধি ও স্বাধীন প্রবৃত্তিহীন হইলে, কর্ম্মফলের অমোঘ বিধান সম্পূর্ণ অর্থহীন ও অসম্ভব হইয়া পড়ে।

অতএব ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে জীবই স্বকীয় কর্ম্মের জন্ম পূর্ণ দায়ী, ব্রহ্ম নহেন।

তাহা হইলে ব্রহ্মকে অন্তর্যামী বলা যায় কিরূপে? 'অন্তর্যামিত্বের' অর্থ অন্তর্লীনত্ব ও সাক্ষিত্ব মাত্র। নিখিল জগৎ স্রষ্টা ব্রহ্ম যেরূপ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি অণুপরমাণুতে ওতপ্রোত হইয়া আছেন, সেরূপ তিনি চেতন জীবেরও অন্তরধীশ্বর দেবতা, সন্দেহ নাই; কিন্তু তিনি জীবের স্বাধীন চিন্তা ও কর্ম্মের পথে কোনও বাধা প্রদান করেন না। উপরন্তু তিনি নির্ব্বিকার সাক্ষিরূপেই কোনও প্রকার হস্তক্ষেপ না করিয়া, জীবের সকল প্রেক্ষা, প্রবৃত্তি ও কর্ম্ম নিরীক্ষণ করিতেছেন মাত্র। তিনি স্বয়ং নিশ্চেষ্ট থাকিয়া জীবকে স্বীয় চেষ্টার দ্বারা মুক্তির পথ স্বয়ং খুঁজিয়া লইবার সুযোগ দিতেছেন।

এস্থলে আপত্তি উঠিতে পারে যে, ব্রহ্ম যদি এইরূপ সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার-ভাবে অন্তরে বিরাজ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে জীবের প্রকৃত মঙ্গলকামী বলিয়া অভিহিত করা যায় কিরূপে? ইহার উত্তরে বলা যায় যে—ব্রহ্ম যে জীবের উন্নতির জন্ম কিছুই করেন না, ইহা মনে করা ভুল। উপরন্তু, তিনি সর্ব্বদাই জীবকে ন্যায় ও ধর্ম্মের পথে প্রোৎসাহিত করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার আদেশ প্রবল পরাক্রান্ত নৃপতির অনুজ্ঞার মত বাহ্যিক আরোপ মাত্র নহে, পরন্তু ইহা জীবের অন্তরোত্থ বিবেক অথবা আত্মারই বাণী মাত্র। ব্রহ্ম জীবের আত্মস্বরূপ, সুতরাং আত্মার নির্দ্দেশ প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মেরই অনুজ্ঞা। সেই জন্ম উপনিষদ বলিয়াছেন "আত্মানং বিদ্ধি" আত্মার আদেশ কি? "উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য-বরান্নিবোধত"—ইহাই আত্মার চিরন্তনী প্রেরণা। এই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া যে জীব কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তাহার মুক্তির পথ উন্মুক্ত। যে ইহা অবহেলা করে, তাহার কেবল জন্মজন্মান্তরই সার মাত্র, অপ-বর্গের আশা নাই। সুতরাং অন্তর্যামী ব্রহ্ম জীবকে নিয়ন্ত্রিত করেন বটে, কিন্তু মুখ্যতঃ নহে। মুখ্যতঃ, জীবই জীবের নিয়ন্তা, জীবই স্বয়ং স্বীয় প্রবৃত্তি ও কর্ম্মের অধিনায়ক ও পরিচালক, অপর কেহ নহে। কিন্তু বস্তুতঃ, ব্রহ্মই সর্ব্বনিয়ন্তা প্রভু। এই জন্মই বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্ম অন্তর্যামী হইলেও নির্ব্বিকার সাক্ষী মাত্র। অর্থাৎ ব্রহ্মাদেশ, আত্মাদেশ বলিয়াই জীবের নিকট প্রতিভাত হয় এবং ব্রহ্ম মুখ্যতঃ জীবের প্রবৃত্তি ও কর্ম্মে কোনও রূপ হস্তক্ষেপ করেন না।

উপরি প্রদর্শিত যুক্তির সাহায্যে ইহাই প্রমাণিত হইল যে, ব্রহ্মকে সৃষ্টি বৈষম্যের জন্ম দায়ী করা অনুচিত। এই একই প্রকারে আমরা প্রমাণ করিতে পারি যে, পাপ ও দুঃখ সৃষ্টির জন্মও ব্রহ্মকে নিষ্ঠুরতা দোষে দোষী করা যায় না। প্রথমঃ, সুখ ও দুঃখ, পুণ্য ও পাপ পরস্পরাশ্রয়ী; অর্থাৎ একের অপর ভিন্ন কোনই অর্থ হয় না। দুঃখ না থাকিলে সুখ, অথবা পাপ না থাকিলে পুণ্যের স্বরূপোপলব্ধি হয় না। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, কেবলমাত্র স্বাধীনেচ্ছাপ্রসূত কর্ম্মই নীতি শাস্ত্রানুসারে পুণ্য অথবা পাপ বলিয়া বিচার্য্য। জীব যাহাতে বিচার-পূর্ব্বক স্বেচ্ছায় একটী কর্ম্মপন্থা মনোনীত করিতে পারে, তজ্জন্ম দুই বা ততোধিক পন্থা তাহার নিকট উন্মুক্ত থাকা প্রয়োজন। অন্তথা স্বাধীন বিচার অথবা স্বেচ্ছাকৃত মনোনয়নের কোনই সম্ভাবনা থাকে না। তজ্জন্ম জীবের নিকট পুণ্য ও পাপ এই দুইপ্রকার পন্থাই উন্মুক্ত থাকা প্রয়োজন, যাহাতে সে একটাকে বর্জ্জন পূর্ব্বক অপরটাকে গ্রহণ করিতে পারে। ব্রহ্মজীবকে স্বাধীন প্রবৃত্তিশীলরূপে সৃষ্ট করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে পুণ্যের সহিত পাপেরও সৃষ্টি করিতে হইবে। যদি জীবের পক্ষে স্বভাবতঃ কেবল একটী পন্থানুসরণই সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে তাহা পাপও নহে, পুণ্যও নহে, কিন্তু সর্ব্বতোভাবে ন্যায়বিচারের অযোগ্য। সুতরাং, জগতে শুধু পুণ্যই থাকিলে, নীতি বিচারও লোপ পাইবে।

দ্বিতীয়তঃ পাপ কর্ম্মের অবশ্যম্ভাবী ফল দুঃখ। পাপ থাকিলেই দুঃখ আসিবে। ইহার জন্ম দায়ী ব্রহ্ম নহেন, জীব। জীব যদি স্বীয় কর্ম্ম স্বাধীনভাবে অন্যায্যভাবে প্রয়োগ করিয়া ভোগের পথই গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহার সংসার ও অনাদি দুঃখ অনিবার্য্য। এরূপ বলিলে চলিবে না যে, করুণাময় ভগবান্ অজ্ঞানতিমিরাবৃত জীবকে স্বাধীন কর্ম্মের অবসর প্রদানপূর্ব্বক দুঃখভাগী না করিয়া, তাহাকে স্বয়ং মুক্তির পথে চালিত করিলেই ভাল হইত, স্নেহময়ী মাতা যেরূপ সন্তানকে ক্রোড়ে করিয়া দুর্গম পথ অতিক্রম করাইয়া দেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, মুক্তি অথবা সিদ্ধি সাধনা লভ্য অর্থাৎ স্বপ্রচেষ্টা প্রাপ্য। ব্রহ্ম জীবকে প্রাপ্তব্য বস্তু এবং প্রাপ্তির উপায় মাত্র নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে পারেন, কিন্তু প্রাপ্তব্যকে প্রাপ্ত করাইতে পারেন না।

যাহা হউক, ব্রহ্ম কারণবাদে যে প্রথম এবং প্রধান আপত্তিদ্বয় উত্থাপন করা হইয়াছিল, তাহাদের খণ্ডনপূর্ব্বক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল যে, (১) আপ্তকাম হইলেও ব্রহ্মই জগৎস্রষ্টা এবং সৃষ্টি ব্রহ্ম ও জীব উভয়ের পক্ষ হইতেই সার্থক; (২) জগদ্বৈষম্য ও দুঃখ পাপের জন্ম ব্রহ্ম দায়ী নহেন।

অন্তিমে

৺মানকুমারী বসু

যে কুলে জন্মিলা কবি শ্রীমধুসূদন
সে কুলে জনম মম বিধির নির্দেশে
মাতা শান্তমণি পিতা আনন্দমোহন
বিবুধ শঙ্কর বসু পতিদেব মম

যদি প্রিয় বঙ্গবাসী ভালবাস মোরে
ক্ষণেক দাঁড়ায়ে দেখ তটিনীর তটে
স্নেহময়ী মা জননী বসুমতী কোলে
বঙ্গের 'মহিলা কবি' পড়েছে ঘুমায়ে!



অভিনয়ের শেষ

শ্রীরাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

ভলটুর একটা দ্বিচক্র যান আছে। এই দ্বিচক্র যানের সঙ্গে ভলটুর অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ।

ভলটু মফঃস্বল শহরে বাস করে। সেখানকার ডিষ্ট্রিক্ট্ ইঞ্জিনীয়রের ছেলে সে। মফঃস্বল শহরে দ্বিচক্র যান যে ছেলের নাই তাহার ষ্ট্যাটাস্ বলিয়াও কিছু নাই। ভলটুর ষ্ট্যাটাস্ অবশ্য নানাকারণে। প্রথম সে ফার্ষ্ট ইয়ারে পড়ে—ছাত্র নেহাত নিন্দার নয়। দ্বিতীয়তঃ, ঝকঝকে তকতকে একখানি বি-এস্-এ সাইকেলের সে অধিকারী। তৃতীয়তঃ, চেহারা তাহার বেশ লম্বা-চওড়া সুগৌর—এক কথায় দেখিলে ভাল লাগে। চতুর্থতঃ, সে ডিষ্ট্রিক্ট্ ইঞ্জিনীয়রের ছেলে—অর্থের স্বচ্ছলতা সহজ-অনুমেয়। এ-ছাড়াও বহু কারণ আছে—সব হিসাব করিয়া বলা কঠিন। কতকগুলি আবার উহ্য কারণও আছে—প্রকাশ্যে তাহার প্রকাশ নাই।

মোটের উপর ভলটু শহরে সবারই পরিচিত—বহু অন্দরমহলেও তাহার গতিবিধি আছে—সর্ব্বত্রই সে সমাদৃত। ভলটু সচেতন ছেলে—এ সৌভাগ্য সে ষোল আনা ভোগ করিয়া তবে ছাড়ে।

সকাল হইতে রাত বারোটা পর্য্যন্ত ভলটুর দ্বিচক্র যান একবার এ-বাড়ির দরজায় খাড়া, আবার হয়তো অন্য পাড়ায় আর এক দরজায় বাঁধা, আবার কিছু পরেই হয়তো অন্য আর এক পাড়ার আর এক দরজায়। কোথাও বেশীক্ষণ দেখা যায় না বটে, তবে সর্ব্বত্রই যেন আছে। শহরের লোক ভলটুকেও যেমন চেনে, তাহার দ্বিচক্র যানটিকেও তেমনি চেনে—ওর যে-কোন' একটিকে দেখিয়া তাহার উপস্থিতি তাহারা জানিতে পারে।

ভলটু রীতিমত একজন পীর-পয়গম্বর! যে কোন' স্বনামধন্য নেতার চাইতে তাহার অন্দরপুরীর এন্‌গেজমেণ্ট্ অনেক বেশী—কথার খেলাপ না হইয়াই পারে না—কলেজ যাইতে না হইলে হয়তো সে তিনভাগ এন্‌গেজমেণ্ট কোনরকমে সাম্‌লাইতে পারিত।

কলেজ ফাঁকি দেওয়ায় ভলটুর কসুর নাই, তবু এন্‌গেজমেণ্ট রাখা সম্ভব হইয়া ওঠে না।

ভলটু অনেকদিন ভাবিয়াছে, একটা ডায়রি-বহি সে রাখিবে কিনা? এন্‌গেজমেণ্টগুলি টুকিয়া রাখিলে তবু সময় হিসাব করিয়া একটা ব্যবস্থা করা যায়। কিন্তু নিয়মের মধ্যে বাঁধা পড়া ভলটুর স্বভাব নয়, কাজেই তাহা আর কোনদিন কার্য্যকরী হয় নাই।

দ্বিচক্র যান আরোহণে ভলটুকে দেখা সৌভাগ্যের কথা—অমন লাস্য, অমন ভঙ্গী, আর অমন গতি খুব কম ছেলেরই আছে। দ্বিচক্র যান তাহার কাছে যেন শকুনির পাশা—যেমন ইচ্ছা সে তাহাকে খেলাইতে পারে। অসাধারণ চাতুর্য্য সে আয়ত্ত করিয়াছে দ্বিচক্র যান পরিচালনে। কতদিন দল বাঁধিয়া মেয়েরা স্কুলে চলিয়াছে—আর ভলটু কোথা হইতে তীরবেগে ঠিক তাহাদের পিছনে আসিয়া বেয়াড়া হর্ণ বাজাইয়া সকলকে আতঙ্কে ইতস্ততঃ ছড়াইয়া দিয়া একটা পা মাটিতে ঠেকাইয়া সাইকেল নিশ্চল গতিহীন করিয়া মুচকি হাসিয়াছে। স্কুলের মেয়েরা যারপরনাই চটিয়াছে প্রথম, তার পরেই হয়তো মন্তব্য করিয়াছে, ওরে ভলটুদা!

অর্থাৎ সাত খুন মাপ!

খেলার মাঠে যাও—ভলটু! আর ভলটু!

ভলটু কলেজের ফুটবল টীমের ক্যাপ্টেন। সেণ্টার ফরওয়ার্ডে সে খেলে চমৎকার, কলেজে তাহার সমকক্ষ খেলোয়াড় আর কেহ নাই।

ক্লাবে যাও—ভলটু ক্যারম্ পিটিতেছে। সেখানে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ব্যাডমিণ্টন, টেনিসেও সমান দখল। সর্ব্বত্র তাই তার সমান সমাদর।

মেয়েদের চোখে ভলটু তাই অপরূপ। ভলটুর আরও যা গুণ আছে, মেয়েদের কাছে যা বিশেষ সমাদর লাভ করে তা ভলটুর আধুনিক গানে চমৎকার দখল। ভলটুর গলা বেশ একটু নূতন ধরণের, আর গানে তার দরদ আছে খুব। শিক্ষা বা প্রচেষ্টা তাহার খুব নাই, কিন্তু একবার কোথাও কোন গান গ্রামোফোন বা রেডিও বা সিনেমায় শুনিলেই সে হুবহু নকল করিয়া ছাড়িয়া দিতে পারে। দান অপরিসীম, কিন্তু সাধনা বলিয়া তাহার কিছু নাই।

কাজেই দূর হইতে ভলটুর ঝকঝকে দ্বিচক্র যান বা তাহার মর্ম্মভেদী হর্ণ কানে গেলেই অনেক ভেজানো দরজা খুলিয়া যায়। ভলটুর সব বাড়িতে নামিতে গেলে চলে না, মুচকি হাসিয়া তাই বলে, আচ্ছা, ফেরবার পথে হ'য়ে যাব'খন। কিন্তু ফেরা তো সেই রাত বারোটায়—তখন আর কোথাও কাহাকেও বিরক্ত করা চলে না, কাজেই ফেরার পথে আর হইয়া যাওয়া সম্ভব হয় না।

শহরের নাম-করা উকিল অনাদি ভাদুড়ীর বাড়িতে দ্বিপ্রহরে দৈনন্দিন মহিলা-মজলিশ জমিয়া ওঠে। সেখানে অনেকেই আসেন, যথা—সবজজ হরিশ সান্যালের স্ত্রী, প্রবীণ উকিল বিনয় বাগচীর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী, রাজপুর এষ্টেটের ম্যানেজার সদাশিব লাহিড়ীর স্ত্রী, হেল্‌থ অফিসার অরুণ সিংহের স্ত্রী, শহরের নাম-করা ডাক্তার অতীন সান্যালের স্ত্রী···এই প্রকার গণ্যমান্য এবং একেবারে নগণ্য নয় এমন অনেকের স্ত্রীই আসিয়া উক্ত দ্বিপ্রাহরিক মহিলা-মজলিশ জমাইয়া তোলে।

এই মজলিশে ভলটুকে নিয়া অনেক ছেঁড়াছিঁড়ি, অনেক মন-কষাকষি, আর অনেক বাগ-বিতণ্ডা হইয়া গেছে। অনেকেই ইহাদের মধ্যে ভলটুকে জামাই করিতে ইচ্ছুক। রেষারেষিও ইহাদের মধ্যে ভলটুকে লইয়া চলিতেছে মন্দ না। ভলটু যেখানেই যায় আদর-আপ্যায়নটাই উপভোগ করে—রেষটা আর তাহার গায়ে লাগে না এবং লাগাইতে কেহ চেষ্টা পাইলে সে লাজুক

হাসিতে সব ভাসাইয়া দিয়া নিজের দ্বিচক্র যানে চাপিয়া শিষ্ দিতে দিতে চলিয়া যায়।

ডিষ্ট্রিক্ট্ ইঞ্জিনীয়র গিন্নী সুরমা দেবীর কাছে ঠারে-ঠোরে এবং প্রকাশ্য ভাবেই এযাবৎ বহু আবেদন-পত্র পেশ হইয়াছে। ভল্টুর সঙ্গে তাহাদের সকলেরই কন্যাকে চমৎকার মানাইবে। সুরমা দেবী নির্ব্বিবাদে সমস্ত মানিয়া লইয়া বলে, সবই ঠিক, কিন্তু কর্ত্তা যে ছেলের এম্-এ পাশ না করা পর্য্যন্ত বিয়ে দেবেন না ঠিক ক'রে ব'সে আছেন। তার উপায়?

অনেকে বলে, তা বেশ, কথাটা এখন হ'য়ে থাক্, তা'পর ভল্টু একটা কেন দশটা পাশ করুক—তখনই না হয় বিয়ে হবে। কথা পেলে মেয়ে ঘরে বসিয়ে রাখা চলে, কিন্তু তা না হ'লে অন্য চেষ্টা তো করতেই হয়।

সুরমা দেবী বলে, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কথা দেওয়া কি ঠিক? শেষে হয়তো কথা ঠিক রাখতে পারবো না—কত কি পরিবর্ত্তন এরই মধ্যে হ'য়ে যাবে হয়তো। তারপরে আজ-কালকার ছেলে—কোথায় হয়তো নিজেই নিজের সম্বন্ধ পাকাপাকি ক'রে ব'সে থাকবে আমাদের কিছু না জানিয়েই। দিনকাল মোটেই ভাল নয়—কথা দেওয়া আমি তাই মোটেই ভাল বিবেচনা করি না।

একথা অকাট্য! সুরমা দেবীর কাছে কথা কেহ তাই আদায় করিতে পারে না।

ভল্টুর দিন ভালই কাটিতেছে। প্রায় বাড়িতেই তাহার জামাই-আদর। ভল্টু বুদ্ধিমান ছেলে—সে সমস্তই বোঝে—বুঝিয়া ষোল আনা সে আদায় করিয়া লয়, ইহাতে যে কোন' অপরাধ আছে তাহা সে মনে করে না।

ভল্টুর বিপদ হইয়াছে কথা ঠিক রাখা। প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও কথা সে ঠিক রাখিতে পারে না। দিন ও রাত্রি যদি আরও বড় হইত, আরও বিস্তৃত হইত, তাহা হইলে তাহার পক্ষে কথা ঠিক রাখা হয়তো সম্ভব হইত।

অনিমা সান্ন্যালদের বাড়ি হইতে বিদায় লইতে গেলে অনিমা ও তাহার মা একইকালে কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। অনিমা ভল্টুর একটা হাত দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া বলে, কাল এসো কিন্তু ভল্টুদা', আমি সেতার শোনাব', নতুন অনেক গৎ শিখেছি। আর চুক্কু তার আরতি নৃত্য দেখাবে। এবার চুক্কু স্কুলে নাচের জন্যে প্রাইজ্ পেয়েচে।

চুক্কু অনিমার ছোট বোন।

অনিমার মা বলে, এসো কিন্তু বাবা।

ভল্টু বলে, নিশ্চয় আসবো, নিশ্চয় আসবো, আপনি আর অত ক'রে বলবেন না।

ভল্টু তাহার দ্বিচক্র যানে চাপিয়া পথে নামিয়া পড়ে। তাহারা দরজায় দাঁড়াইয়া লক্ষ্য করে ভল্টু পাড়ার আর কোন বাড়িতে প্রবেশ করে কিনা।

রাস্তার মোড় পার হইয়া নূতন রাস্তায় পড়িলেই গীতা খাঁদের বাড়ি। বৈঠকখানায় বসিয়া গীতা খাঁ পড়াশুনা করিতেছে। ভল্টু ইচ্ছা করিয়াই তাহার হর্ণ বাজায়। গীতা লাফাইয়া দরজার বাহিরে আসে।

বলে, আরে এসো এসো ভল্টুদা'। তোমার যে আর দেখাই নেই। মা বলেন, 'ভল্টু এম্-এ পাশের পড়া পড়চে, ওর আজকাল সময় কোথায়—যে এদিকে আসবে?' তাই নাকি ভল্টুদা'?

ভল্টু সাইকেল হইতে নামিয়া দরজার একপাশে তাহাকে একটা সুপারি গাছের সঙ্গে চাবি দিয়া আটকাইয়া রাখিয়া বলে, না, না, ওসব মাসিমার বাজে কথা। আর নেকী, তুই তো এবার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিবি, তুই বুঝি জানিস্ না যে ফার্ষ্ট ইয়ারের কোন' ছেলে এম্-এ পাশের জন্য তৈরি হয় না।

গীতা ভল্টুর একটা হাত ধরিয়া তাহাকে টানিয়া ঘরের মধ্যে তুলিবার চেষ্টা করিয়া বলে, আমি অত কি বুঝি ছাই! যা শুনেচি তাই বললাম।

গীতা ভল্টুকে একেবারে অন্দরে নিয়া হাজির করে। গীতার মা রান্নাঘরে কাজে ব্যাপৃতা ছিল, তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের বারান্দায় বাহির হইয়া আসিয়া বলে, এসো বাবা, এসো। যাক্, তবু মনে পড়েচে মাসিমাকে। আর এসেচো যখন আজ দু'টো এখান থেকেই খেয়ে যাও বাবা, আমি চাকর পাঠিয়ে তোমার বাড়িতে খবর পাঠাচ্ছি।

ভল্টু সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া ওঠে, না মাসিমা, আজ আর হবে না অন্যদিন বরং। আমার এখুনি আজ বাড়ি ফিরতে হবে। কলেজের অনেকেই আসবে, রবিবারে বাইরে এক জায়গায় খেলতে যেতে হবে কলেজ টীম নিয়ে।

গীতার মা বলে, তবে আর বলি কি বাবা! ওরে গীতা, হারমোনিয়মটা নিয়ে এসে দু'টো গান শোনা না ভল্টুকে, আমি ততক্ষণে দু'খানা লুচি ভেজে দি। ওকে ভাল ক'রে যে বসিয়ে একদিন খাওয়াবো এমন কপাল ক'রে তো আসিনি।

ভল্টু তাড়াতাড়ি বলে, না মাসিমা, আমি একদিন নিজে সেধে এসে খেয়ে যাবো তোমার হাতের রান্না।

গীতার মা বলে, তাই ক'রো বাবা, তাই ক'রো বাবা।

গীতা গান শুনাইতে বসিয়া বলে, তুমিই একখানা গাও না ভল্টুদা', তোমার গান অনেকদিন শুনিনি।

ভল্টু বলে, নে ফাজলামি রাখ্ এখন। সেই হিন্দী গানখানা গা—যা তুই নূতন শিখেচিস্।

গীতা গান সুরু করে। গান শেষ হইলে ভল্টু বলে, গীতা আজকাল চমৎকার গান গাইচে মাসিমা। ওর যা গলা হ'য়েচে আজকাল, কেউ ওর সঙ্গে পাত্তা পাবে না। চমৎকার কাজ হ'য়েচে আজকাল ওর গলায়।

গীতার মা ভল্টুকে সামনে এক থালা লুচি সাজাইয়া দিয়া বলে, খেতে থাকো বাবা, চা এনে দিচ্ছি। তা গীতা আজকাল সত্যিই ভাল গাইচে, কর্ত্তা ওর গানের পেছনে খরচাও তো কম করচেন না। তা তুমি তো বাবা কালে-ভদ্রে ন'মাসে ছ'মাসে একদিন আসবে, কাজেই হঠাৎ তোমার কাছে আজ ওর গান তো ভালই লাগবে বাবা।

ভল্টু বলে, না মাসিমা, গলা ওর বরাবরই ভাল। আজকাল নতুন নতুন গান শিখেচে, দরদ দিয়ে গাইচে, কাজেই চমৎকার তো লাগবেই।

গীতার মা বলে, ও গীতা, হাঁ ক'রে কি শুনচিস্, আর একখানা

ধর্ না। সেই যে নতুন কি একখানা গান আজকাল গাস্, সেইটে গা না। সেই যে,—

শিস্ দিয়ে যায় আমার জানালায়
বনের বুলবুলি।—

গীতা আবার গান ধরে। গীতারও গান শেষ হয়, ভল্টুরও চা-পান শেষ হয়।

ভল্টু বলে, চমৎকার! তাহ'লে এবার উঠি, রাত হ'য়ে যাচ্ছে।

ভল্টু মাসিমার নিকট প্রণামান্তে বিদায় নেয় এবং বৈঠকখানায় আসিয়া গীতার নিকট বিদায় নেয়। বিদায়কালে গীতা বলে, কাল আবার এসো কিন্তু ভল্টুদা', তোমার জন্তে দু'খানা রুমাল তৈরি করেচি, সামান্ত একটু কাজ বাকী আছে, কাল এলেই পাবে।

ভল্টু বলে, নিশ্চয় আসবো। গুড্ নাইট্ গী—।

গীতা বলে, গুড্ নাইট্!

ভল্টু সাইকেলে লাফাইয়া উঠিয়া বসে।

গীতা বলে, কাল তা'হ'লে আসচো নিশ্চয়?

ভল্টু বলে, নিশ্চয়, নিশ্চয়! তারপরে গুন্ গুন্ করিয়া গান ধরে, "হৃদয় আমার হারালো, বুঝি হারালো।"—

গীতা গান শুনিয়া মৃদু হাসে।

(আগামীবারে সমাপ্য)

কাগজের টাকা ও বিদেশের বাণিজ্য

অধ্যাপক শ্রীকেশবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

অনেকেরই হয়ত ধারণা গবর্ণমেণ্ট আইন করিয়া দেশের মধ্যে কাগজের নোট (inconvertible paper currency) চালাইতে সমর্থ হইলেও বিদেশ হইতে জিনিষ কিনিবার সময় কাগজের নোট অচল। তখন সোনা রূপা বা এই প্রকার সকল জাতির পক্ষে গ্রহণীয় কোনও দ্রব্য না হইলে বৈদেশিক বাণিজ্য চলিতে পারে না। এইরূপ ধারণার কোন ভিত্তি নাই। লোক দেশের মধ্যে টাকা গ্রহণ করে টাকার জিনিষপত্র কিনিবার ক্ষমতা (purchasing power) আছে বলিয়া—ঐ টাকা কাগজের উপর মুদ্রিত বা রূপায় নির্ম্মিত অথবা ঐ কাগজের নোটের পারবর্ত্তে টাকশাল হইতে নির্দ্দিষ্টহারে সোনা পাওয়া যাইবে বলিয়া নহে। যদি দেশের মধ্যে কখনও বহুলোকের নিকট কাগজের নোটের অপেক্ষা রূপার টাকা অধিক আদরণীয় হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে হয় কাগজের নোটের টাকা দিয়া আর পূর্ব্বের মত জিনিষপত্র কিনিতে পারা যায় না—অথবা কোনও কারণে ধাতু হিসাবে রূপার মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেকে রূপার টাকা লুকাইয়া রাখিতেছিল। ইহা অতিশয় নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। কাগজের নোটের উপর যদি কোনও কারণে আস্থা চলিয়া যায় এবং রূপার দাম কমিবে না বলিয়া মনে হয় তাহা হইলে রূপার টাকা সঞ্চয় না করিয়া বাজার হইতে রূপা কিনিয়া জমাইলেই হয়। গবর্ণমেণ্ট বা কারেন্সীর কর্ত্তা যদি অত্যধিক টাকা না ছাপাইয়া এবং অন্য কোনওভাবে টাকার দ্রব্যক্রয় ক্ষমতা নষ্ট না করিয়া দেয় তাহা হইলে ঐ টাকা কাগজের নোট হইলেও দেশের ভিতরে ও বিদেশে সমানভাবে আদরণীয় হইতে পারে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যদি অত্যধিক টাকা প্রস্তুত করিয়া টাকার দ্রব্যক্রয় ক্ষমতা নষ্ট করিয়া দেয় তাহা হইলে কিছুদিন পরে লোকে আর ঐ টাকা গ্রহণ করিবে না এবং তখন শুধু আইনের সাহায্যে অধিক দিন পর্য্যন্ত মূল্যহীন টাকা চালান যাইতে পারে না। পারিলে গত মহা-যুদ্ধের পর জার্ম্মাণ প্রভৃতি দেশে মুদ্রা মূল্যহীন ও অচল হইত না। অথচ নেপাল বা আফগানিস্থানে ভারত সরকারের আইন চলে না কিন্তু সেই সব দেশে আমাদের দেশের টাকা অপ্রচলিত নয়। যে জিনিষ দিয়াই টাকা প্রস্তুত হউক না কেন যতক্ষণ আমরা টাকা দিয়া জিনিষ কিনিতে পারিব ততক্ষণ ঐ টাকা গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করিব না এবং যদি প্রয়োজনের অধিক কাগজের নোট ছাপান না হয় তাহা হইলে ঐ টাকার দ্রব্যক্রয় ক্ষমতা নষ্ট হইবে না। অতএব এই নীতি অনুসরণ করিয়া যে মুদ্রা প্রস্তুত করা হইবে তাহাতে দেশের ভিতর বিনিময় কার্য্য ঠিকমত চলিবে। কিন্তু প্রশ্ন উঠিতে পারে বিদেশ হইতে আমরা যখন জিনিষ-পত্র কিনিব তখন বিদেশী বিক্রেতা আমাদের দেশের কাগজের নোট গ্রহণ করিবে কেন?

উত্তর একই। যে কারণে দেশের মধ্যে লোকে টাকা গ্রহণ করিয়া মাল বিক্রয় করে সেই কারণে বিদেশী বিক্রেতাও আমাদের টাকা গ্রহণ করিয়া জিনিষ বিক্রয় করিবে। আমি যখন গৃহস্থের নিকট হইতে একটা দশ টাকার নোট দিয়া একমণ ধান ক্রয় করি গৃহস্থ তখন ঐ দশ টাকার নোট গ্রহণ করে। সে জানে তাহারও জিনিষপত্রের প্রয়োজন আছে এবং তাহা এই দশ টাকার নোট দিয়া সংগ্রহ করা যাইবে। সেই প্রকার আমি যদি আমেরিকা হইতে জিনিষ কিনিয়া আমেরিকার মহাজনকে কতকগুলি দশ টাকার নোট দেই আমেরিকার মহাজন তাহা গ্রহণ করিবে যদি ঐ দশ টাকার নোট দিয়া আমাদের দেশে ঠিকমত জিনিষ খরিদ করা যায় এবং আমেরিকায় আমাদের দেশের জিনিষ-পত্রের প্রয়োজন থাকে। মুদ্রার প্রয়োজন দ্রব্য বিনিময়ের জন্ম। ইহা ছাড়া মুদ্রার কোন নিজস্ব মূল্য নাই। ভারতীয় জিনিষপত্রের জন্ম যদি আমেরিকার প্রয়োজন থাকে এবং ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাগজের নোট দিয়া যদি ঐ সকল জিনিষপত্র সংগ্রহ করা যায় তাহা হইলে আমেরিকার মহাজন আমাদের কাগজের টাকা গ্রহণ করিবে। সুতরাং বিদেশে আমাদের নোট চলিবে কি না এই প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করিতেছে দুইটি জিনিষের উপর প্রথম কথা আমাদের দেশের জিনিষপত্রের চাহিদা বিদেশে আছে কিনা এবং দ্বিতীয় কথা আমাদের দেশের প্রচলিত নোট দিয়া এই সকল জিনিষপত্র কিনিতে পারা যায় কি না। যতক্ষণ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নোট দিয়া ধান পাট প্রভৃতি ক্রয় করা যাইবে এবং যতক্ষণ

আমেরিকার ধান পাট প্রভৃতির প্রয়োজন থাকিবে ততক্ষণ আমেরিকার কোনও মহাজনকে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নোট দিলে সে তাহা গ্রহণ করিবে। অবশ্য আমেরিকার দোকানে বাজারে এই নোট চলিবে না কিন্তু যে সকল ব্যাঙ্কার ও ব্যবসায়ী বৈদেশিক বাণিজ্য করিয়া থাকে তাহারা ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নোট গ্রহণ করিবে।

প্রশ্ন উঠিতে পারে দুই দেশের মুদ্রা বিনিময় হার (foreign rate of exchange) কি ভাবে নিরূপিত হইবে ? যদি উভয় দেশের মুদ্রা সোনা বা কোনও একটি ধাতুতে নির্ম্মিত বা পরিবর্ত্তনীয় (convertible) হয় তাহা হইলে বিনিময় হার হিসাব করা সহজ। যেমন ধরা যাউক, একটি টাকায় পনর ভাগের এক ভাগ আউন্স সোনা থাকে অথবা একটি টাকার নোট দিলে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে এই পরিমাণ সোনা পাওয়া যায় এবং এক পাউণ্ড নোটের পরিবর্ত্তে বিলাতে ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড হইতে এক আউন্স সোনা পাওয়া যায়। তাহা হইলে উভয় দেশের মুদ্রার বিনিময় হার হইবে পনর টাকা = এক পাউণ্ড। এরূপ ক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে সোনাই (Gold standard) উভয় দেশে মুদ্রার (medium of exchange) কাজ করিতেছে—টাকা বা পাউণ্ড শুধু নামের পার্থক্য। টাকার বা পাউণ্ডের পরিবর্ত্তে যখন নির্দ্দিষ্ট হারে সোনা পাওয়া যায় তখন এই সব দেশে টাকার হিসাবে বা পাউণ্ডের হিসাবে ক্রয় বিক্রয় না করিয়া সোনার ওজনে জিনিষপত্র ক্রয় বিক্রয় করা যাইতে পারে। যেমন ইংলণ্ডে কোনও দোকানে এক হাজার পাউণ্ড মূল্যের জিনিষ কিনিতে যাইয়া বলিতে পারি এক হাজার আউন্স সোনার জিনিষ পাঠান হউক এবং একজন ইংরাজও পনর শত টাকা মূল্যের পাট কিনিতে হইলে আদেশ করিতে পারে একশ আউন্স সোনার পাট পাঠান হউক। উভয় দেশের মুদ্রা একই ধাতুতে বাঁধা থাকিলে বুঝিতে ও হিসাব করিতে কোন কষ্ট হয় না এবং বৈদেশিক বাণিজ্যে খুব সুবিধা হয়। এক পাউণ্ড কত টাকা এবং একটাকা কত পাউণ্ড একটু হিসাব করিলেই বুঝিতে পারা যায়।

দুই দেশের মুদ্রা একই ধাতুতে বাঁধা (linked) থাকিলেও আমদানী রপ্তানী বাণিজ্যের তারতম্য অনুসারে বিনিময় হার কিছুটা কম বেশী হইতে পারে। ইংলণ্ড হইতে আমরা যত মূল্যের জিনিষ ক্রয় করি ঠিক তত মূল্যের জিনিষ ইংলণ্ডে বিক্রয় করিলে এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কের মারফৎ লেনদেন মিটান যাইতে পারে এবং এক দেশ হইতে অন্য দেশে সোনা পাঠাইবার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু ধরা যাউক, যদি এক সময়ে আমরা বিলাত হইতে এক লক্ষ পাউণ্ডের মাল বেশী ক্রয় করি তবে ঐ টাকার পরিমাণ সোনা বিলাতে মাল বিক্রেতার নিকট পাঠাইতে হইবে। প্রতি পনর টাকার সোনা পাঠাইতে যদি চারি আনা খরচ হয় তাহা হইলে এক লক্ষ পাউণ্ডের সোনা বিলাত পর্য্যন্ত পৌঁছাইতে সোয়া পনর লক্ষ টাকা লাগিবে। অর্থাৎ এক পাউণ্ডের দাম সোয়া পনর টাকা পর্য্যন্ত উঠিতে পারে। কিন্তু ইহার বেশী হইবে না। সেই প্রকার আমরা যদি বিলাতে অধিক মাল বিক্রয় করি তাহা হইলে পাউণ্ডের দাম পূর্ব্বের হিসাবে চৌদ্দ টাকা বার আনা পর্য্যন্ত হইতে পারে। ইহার কম হইবে না। অতএব আমদানী রপ্তানী বাণিজ্যের তারতম্য অনুসারে কিছু কম বেশী হইলেও মুদ্রার বিনিময় হার মোটামুটি ঠিকই থাকিবে।

উভয় দেশে যদি কাগজের নোট মুদ্রা হিসাবে প্রচলিত থাকে এবং তাহা যদি কোনও ধাতুর সঙ্গে সম্বন্ধহীন হয় তাহা হইলেও একই নীতিতে উভয় মুদ্রার বিনিময় হার নিরূপিত হইবে। স্বর্ণমান বা স্বর্ণমুদ্রায় আমরা সোনাকে মধ্যে রাখিয়া টাকা ও পাউণ্ডের সমতা বাহির করিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি এক টাকায় কতটা সোনা পাওয়া যায় এবং ঐ সোনা পাইতে কতটা পাউণ্ডের দরকার। অর্থাৎ পনর টাকা = এক আউন্স সোনা = এক পাউণ্ড। এখন আমাদিগকে দেখিতে হইবে এক টাকায় মোটামুটি জিনিষপত্র কতটা কিনিতে পারা যায় এবং ঠিক ঐ পরিমাণ জিনিষ কিনিতে কত পাউণ্ডের দরকার। শুধু সোনার দাম দেখিলে হইবে না, সাধারণ কতকগুলি জিনিষের দামের হিসাব বাহির করিতে হইবে। যদি দেখি বার টাকায় আমাদের দেশে যে পরিমাণ জিনিষ কিনিতে পারা যায় বিলাতে সেই পরিমাণ জিনিষ কিনিতে এক পাউণ্ডের দরকার হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে এক পাউণ্ডের দাম বার টাকা। আমদানী রপ্তানী বাণিজ্যের তারতম্য অনুসারে এই বিনিময় হার উঠানামা করিতে পারে। ধরা যাউক, এক সময়ে আমরা বিলাত হইতে পনর কোটি পাউণ্ডের মাল ক্রয় করিলাম এবং ষোল কোটি পাউণ্ডের মাল বিক্রয় করিলাম। যাহারা মাল বিক্রয় করিয়াছে তাহাদের হাতে ষোল কোটি পাউণ্ড আছে—তাহারা এই পাউণ্ড বদলাইয়া টাকা চাহিবে আর যাহারা মাল ক্রয় করিয়াছে তাহাদিগকে বিলাতে জিনিষের দাম বাবদ পাউণ্ড পাঠাইতে হইবে। তাহারা সেজন্য টাকা দিয়া পাউণ্ড কিনিতে চাহিবে। এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক টাকা দিয়া পাউণ্ড লইবে এবং ঐ পাউণ্ড আমাদের মালক্রেতাদের নিকট বিক্রয় করিবে। অতএব পাউণ্ড আছে ষোল কোটি এবং চাহিদা হইতেছে পনর কোটির। চাহিদা এবং সরবরাহের নিয়ম অনুসারে এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক প্রতি পাউণ্ডের জন্য বার টাকা দাবী না করিয়া অল্পটাকায় ধরা যাউক, এগার টাকায় প্রতি পাউণ্ড বিক্রয় করিবে। এইভাবে বাণিজ্য চলিলে হয়ত পাউণ্ডের দাম অনেক কমিতে পারে অথবা বাণিজ্যের গতি বিপরীত পথে চলিলে পাউণ্ডের দাম বাড়িতে পারে। অবশ্য উভয় দেশের ভিতর যদি মুদ্রার দ্রব্যক্রয় ক্ষমতা ঠিক থাকে, তবে পাউণ্ডের বিনিময় হার বেশী কমিতে বা বাড়িতে পারিবে না। এক পাউণ্ড যখন এগার টাকা হইল তখন বুঝিতে হইবে এক টাকায় এখন পূর্ব্বের চাইতে অধিক পাউণ্ড পাওয়া যায় এবং সেজন্য এক টাকায় বেশী বিলাতী জিনিষ কিনিতে পাওয়া যায়। তাহা হইলে বিলাতী জিনিষ আমাদের দেশে সস্তা হইবে। তখন তাহারা আমাদের দেশ হইতে কম জিনিষ কিনিবে। ফলে পাউণ্ডের দাম আবার বাড়িবে। অবশ্য কোনও দেশের ভিতর যদি মুদ্রার দ্রব্যক্রয় ক্ষমতা কমবেশী হয় তাহা হইলে বিনিময় হার পরিবর্ত্তিত হইবে। তাহা না হইলে বিনিময় হার ধাতুর মুদ্রা বা স্বর্ণমানের (Gold standard) ন্যায় মোটামুটি ঠিক থাকিবে।

স্থায়ী ও গুরুতর কারণ না থাকা সত্ত্বেও অনেক সময় কাগজের মুদ্রার বিনিময় হার সাময়িকভাবে উঠানামা করিতে পারে।

তাহাতে বৈদেশিক বাণিজ্যের ব্যাঘাত জন্মিতে পারে। সেজন্য কারেন্সীর কর্তারা Exchange equalisation Fund নিয়ন্ত্রিত করিয়া বিনিময় হার ঠিক রাখেন। বিলাতে ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড অনেক আমেরিকান ডলার কিনিয়া রাখিয়াছে। যদি কখনও সাময়িক কোনও কারণে ইংলণ্ড আমেরিকা হইতে বেশী মাল ক্রয় করে এবং ইংলণ্ডে ডলারের চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়া ডলারের দাম বৃদ্ধি পায় তখন এই সঞ্চিত ডলার বিক্রী করা হয়। তাহাতে ডলারের দাম আবার কমিতে থাকিবে। এইভাবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে যদি স্থায়ী গণ্ডগোল না হয়, দেশের অভ্যন্তরে মুদ্রার দ্রব্যক্রয় ক্ষমতা ঠিক থাকে এবং বড় বড় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সহযোগিতা থাকে তাহা হইলে কাগজের নোটের মুদ্রা বৈদেশিক বাণিজ্যে ভালভাবে চলিতে পারে।

উপনিবেশ

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

নৌকা চলিয়াছে। বৈশাখী নদী—চেহারায় কৃশতা আসিলেও টের পাইবার জো নাই এই রাত্রিতে। তবু যে রূপটা তাহার এই আলো অন্ধকারে অতি বিচিত্র ও অতি বিশাল বলিয়া বোধ হইতেছে সে রূপটা পুরাপুরি সত্য নয়। নদীর অনেকটা ভিতর দিয়াই নৌকা চলিতেছে। তবু যে তলায় খস্ খস্ শব্দ করিয়া বালি বাজিতেছে সেটা টের পাওয়া গেল। চর জাগিতেছে। দাঁড়ে বালি ঠেলিতে ঠেলিতে ডি-সুজা নৌকাটাকে একপাশে বেশি জলের মধ্যে ঠেলিয়া আনিল।

চর জাগিতেছে। ঠিক এবারে নয়—দু এক বছরের মধ্যেই তাহার সম্পূর্ণ চেহারাটা জলরেখার উপরে বেশ খানিকটা ঠেলিয়া উঠিবে—এমনি একটা অনুজ্জ্বল জ্যোৎস্না রাত্রিতে দূর হইতে তাহাকে দেখাইবে একটা উবুড় করা অতিকায় জেলে-ডিঙির মতো। তারপরেই আবার চলিবে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। নূতন উপনিবেশ—নূতন মানুষ। নব নব বর্বরতা—আদিমতার প্রায়ান্ধকারে সৃষ্টি শতদলের প্রথম উন্মেষ। সুখ দুঃখ, ভালো-মন্দ, ঘাত-প্রতিঘাতের নানা তরঙ্গে উপনিবেশ সার্থক হইবে, সেদিন আবার আসিবে তাহাকে লইয়া কাহিনী রচনার অবকাশ।……

বর্মি কথা কহিল। হঠাৎ কেমন করিয়া তাহার স্বর বদলাইয়া গেছে অনেকটা। ঠিক বদলাইয়া গেছে বলা চলে না—তাহার অনাসক্ত নির্লিপ্ত কণ্ঠস্বরে কিছুটা অনুভূতির ছোপ ধরিয়াছে যেন। শব্দের যদি রঙ থাকিত, তাহা হইলে বলা যাইত কালো রঙ; অথবা চর ইস্‌মাইলের দিগন্তে বৈশাখের যে আসন্ন প্রলয় মেঘচ্ছবি ফাটিয়া ওঠে তাহার রঙ। সে কহিল, পথ আর কতটা?

ডি-সুজা তখন তীরের দিকে পাড়ি ধরিয়াছে। দাঁড়ের টানে টানে ফস্‌ফরাস্ মিশানো জলে যেন লক্ষ লক্ষ জোনাকির অগ্নিবিন্দু জ্বলিতেছে। নারিকেল বনের মাথায় চাঁদের মুখের উপর একরাশ মেঘ বেশ খানিকটা আবরণ বিছাইয়া দিয়াছে। তীরের জঙ্গলগুলি দেখিলে এখন হয়তো বা হঠাৎ মনে হইতে পারে সারি সারি ঝাঁকড়া মাথা লইয়া অন্ধকারের মধ্যে বসিয়া আছে কাহারা—আর আসল জোনাকিগুলি পিট্ পিট্ করিতেছে তাহাদের রাশি রাশি চোখের মতো: ঠিক সেই সব চোখের মতো—পাথরের মতো ছিদ্রহীন আর জমাট রাত্রিতে যাহারা বত্রিশ দাঁড়ের ছিপ লইয়া সমুদ্রের কালো মোহনায় শিকারের সন্ধান করিয়া বেড়ায়।

ডি-সুজার আবার ভয় করিতেছে। অথচ ভয়টা অর্থহীন—সম্পূর্ণই অর্থহীন। তবুও এই রাত্রি। এমন রাত্রিকে বিশ্বাস করা চলে না।

কিন্তু ভরসা এই পথটা ফুরাইয়াছে এতক্ষণে।

ডি-সুজা বলিল, এসে পড়েছি প্রায়।

বর্মি চুপ করিয়া রহিল।

নৌকা খালের মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। এইখানে দাঁড় ঠেলিয়া আরো খানিকটা পথ। কচুরিপানা খালের বুক জুড়িয়া ঘন হইবার উপক্রম করিতেছে। এই নোনার দেশে আসিয়াও তাহাদের জীবনী-শক্তিতে এতটুকু নোনা ধরে নাই—বংশ-বিস্তৃতি চলিতেছে অপ্রতিহতভাবে। এমন একদিন হয়তো আসিবে যখন সমস্ত বঙ্গোপসাগর জুড়িয়া কচুরিপানার দুর্ভেদ্য আবরণ পড়িবে—আর হাজার হাজার মাইল জুড়িয়া বেগুনী ফুলগুলি হাওয়ায় হাওয়ায় মাথা দুলাইবে।

কচুরি বন ভাঙিয়া আগাইয়া চলিয়াছে নৌকা। খস্-খস্-খস্। কেমন একটা শব্দ—কানের মধ্যে শির শির করিতে থাকে। হঠাৎ নৌকাটা কিসে আট্‌কাইয়া গেল। তলা হইতে বিশ্রী দুর্গন্ধের একটা প্রবল উচ্ছ্বাস উঠিয়াছে। কোনো কিছুর একটা মড়া লাগিয়াছে নিশ্চয়ই।

টর্চের আলো ফেলিল বর্মি। মড়াই বটে। ফুলিয়া অস্বাভাবিক রকমের শাদা প্রকাণ্ড একটা ঢোলের মতো দেখাইতেছে। পেটের মাংস কাহারা খুবলাইয়া খুবলাইয়া খাইয়াছে বলিয়া মনে হয়, কালো একরাশ নাড়িভুঁড়ি দুই পাশে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। এক মাথা চুল জলে ভাসিতেছে—স্ত্রীলোকের দেহ। নারী-ঘটিত আসক্তি হইতে মুক্তি লইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে চায় যাহারা—এই নগ্ন বিকৃত দেহটাকে একবার দেখিলেই তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট।

শিহরিয়া সে টর্চটা নিবাইয়া দিল। অন্ধকারের মধ্যে দুর্গন্ধটা যেন পুরু ক্যান্‌ভাসের পর্দার মতো জুড়িয়া আছে। জোরে জোরে লগি ঠেলিয়া ডি-সুজা জায়গাটা পার হইয়া গেল। একটু দূরেই ঝোপের মধ্যে হঠাৎ একটা আলো জ্বলিয়াই নিবিয়া গেল—আলেয়া? যে শেয়ালগুলি এতক্ষণ বসিয়া বসিয়া মড়া খাইতে-ছিল তাহারাই কি হাই তুলিতেছে? এ দেশের লোক হইলে নিশ্চয় মনে করিত পেত্নী। অথবা সেই তাহারা—যাহাদের

মাথা নাই অথচ ঘাড়ের উপর দুইটা বড় বড় চোখ ভাঁটার মতো জলিতেছে ; অন্ধকারে পঞ্চাশগজী দুইটা হাত দুইদিকে প্রসারিত করিয়া যাহারা জীবজন্তু হাতড়াইয়া বেড়ায়।

শিয়ালের কোলাহল শোনা গেল। মড়াটাকে লইয়া নিশ্চয়ই। ওই মড়াটা বর্মির সমস্ত দ্বিধা-সংশয়কে যেন সমতল করিয়া দিয়াছে। গাজীকে বিশ্বাস করা আর নিরাপদ নয়। ডি-সুজার প্রয়োজন ফুরাইয়াছে—তা ছাড়া লিসি ! পর্তুগীজদের ঘৃণা করা যাইতে পারে, তাই বলিয়া তাহাদের মেয়েদেরও যে ঘৃণা করিতে হইবে তাহার কী মানে আছে। সিবাষ্টিয়ান গঞ্জালেস্‌ও তো জেন্টুদের ঘৃণা করিত—কিন্তু তাহাদের সুন্দরী মেয়েদের উপর তাহার আসক্তিও কিছুমাত্র কম ছিল না।

গাছপালার ঘন অন্ধকার। কচুরিপানা ঠেলিয়া একঘেয়ে শির শির শব্দে চলিয়াছে নৌকাটা। অন্ধকারে কাহারো মুখ দেখা যায় না। চকিত পোকামাকড়ের দল উড়িয়া উড়িয়া নৌকায় আসিয়া পড়িতেছে।

কাঠ-ফেলা বড় একটা ঘাটের গায়ে ডি-সুজা নৌকাটাকে ভিড়াইয়া দিল। কহিল, এসে পড়েছি।

মুরুল গাজী তাহাদের জন্য প্রতীক্ষাই করিতেছিলেন।

বাহিরের একটা ঘরে মিট্‌ মিট্‌ করিয়া একটা দেশী চৌকোণা লণ্ঠন জলিতেছে। অনুজ্জ্বল রক্তাভ আলো, ঘরময় পোড়া কেরোসিনের গন্ধ ভাসিতেছে। টিনের চালে সুপারির আড়ৎ হইতে কালো কালো একরাশ ঝুল দুলিতেছে ঝালরের মতো। আর নীচে একখানা মাদুর পাতিয়া বসিয়া কী যেন পড়িতেছেন গাজী সাহেব—রীতিমতো সুর করিয়াই।

ডি-সুজা এবং বর্মিটী ঘরে ঢুকিতেই গাজী সাহেব সাদরে তাহাদের অভ্যর্থনা করিলেন। ফকিরের মতো চেহারা। সাদা দাড়ি বুক অবধি ঝুলিয়া পড়িয়াছে সুদীর্ঘ চামরের মতো। পাকা গোঁফ দাড়ির দুইটি সীমান্ত রেখা তামাকের রঙে অনুরঞ্জিত। গলাতে কাঁচ এবং কড়িতে মিশানো দুই ছড়া মালা—থাকিয়া থাকিয়া খট্‌-খট্‌ শব্দে বাজিয়া ওঠে।

হাত দুটি সামনে বাড়াইয়া দিয়া গাজী সাহেব বলিলেন, এসো, এসো। তোমাদের জন্যই বসেছিলাম।

দুজনে মাদুরে আসিয়া বসিল। গাজী সাহেব শশব্যস্তে তাহাদের দিকে গোটা দুই তাকিয়া আগাইয়া দিলেন। তারপর ডাকিলেন, আবদুল্লা !

মালকোঁচা করিয়া লুঙ্গি পরা একটা ছোকরা চাকর তন্দ্রাজড়িত চোখ লইয়া দেখা দিল।

—জী !

—তামাক।

এক কোণে একটা গড়গড়া হইতে কল্‌কেটা তুলিয়া লইয়া আবদুল্লা বাহির হইয়া গেল।

গাজী সাহেব হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মাল কতটা ?

—পাঁচ সের ;

—পাঁচ সের ? বড্ড কম। গাজী সাহেবের স্বরে নৈরাশ্য প্রকাশ পাইল।

বর্মি সামান্য একটু ভ্রূকুটি করিল, কী করা যাবে ? বাজার বড় গরম। এমন যদি চলে তো এদিকের সব কাজ-কারবার তুলে দিতে হবে। পথে জল পুলিস দেখে এলাম।

—জল পুলিস ? গাজী সাহেব একটু হাসিলেন। ভালো করিয়া তাকাইলে দেখা যায়, গাজী সাহেবের চোখ দুইটা ঠিক কালো নয়। কিছুটা নীল্‌চে, কিছু পিঙ্গল—যেন বিড়ালের চোখ। হাসির ছন্দে সেই নীলাভ-পিঙ্গল চোখ দুটি চিক্‌চিক্‌ করিয়া উঠিল একটু।

—জল পুলিসের ভয় কিছু নেই। ওরা হাতের লোক—খাইয়ে-দাইয়ে মোটা ক'রে দিয়েছি। নেমকহারামী বোধ হয় করবেনা ! তবে—

ডি-সুজা বলিল, আবগারী ?

গাজী সাহেব কহিলেন, তাই ভাবছি। এখানে সুলেমান বলে একটা লোক আছে, তার চাল-চলন সুবিধে বোধ হচ্ছে না। ও লোকটা বোধ হয় খোঁজখবর দেয়। ভালোমত একটা হদিস একবার পেলে হয়, তারপর ধরে ঠিক জবাই করে দেব।

এরা দুইজনে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইল একবার। প্রায় এক সঙ্গেই জোহানের কথা মনের সামনে ভাসিয়া উঠিয়াছে তাহাদের। জবাই ! বর্মি নীচের ঠোঁটটাকে কামড়াইল শুধু।

আবদুল্লা ফুঁ দিতে দিতে কল্‌কেটা লইয়া আসিল, তারপর সেটাকে গড়গড়ার মাথায় বসাইয়া একেবারে সভার মাঝখানে আনিয়া রাখিল। বর্মি গড়গড়াটা নিজের দিকে টানিয়া আনিয়া কাঠের নলটায় মৃদু মৃদু টান দিতে শুরু করিল। কী একটা ভাবনায় চোখ দুইটা মুখর হইয়া উঠিয়াছে তাহার।

আফিঙের বাণ্ডিলটা বার কয়েক নাড়াচাড়া করিয়া গাজী সাহেব সেটাকে তুলিয়া লইয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন, তারপর খানকয়েক নোট আনিয়া তাহাদের সামনে রাখিলেন। বারকয়েক গণিয়া বিনাবাক্যব্যয়ে বর্মি সেগুলিকে ট্রাউজারের পকেটস্থ করিল।

গড়গড়াটা অধিকার করিয়া গাজী সাহেব বলিলেন, আমি ভাবছিলাম কিছু কোকেনের কথা। কলকাতা থেকে আমাদের যে লোক এসেছে সে বলছিল চালাতে পারবে।

বর্মি জিজ্ঞাসা করিল, সে লোক আছে এখানে ?

—আছে। ডাকব তাকে ? আবদুল্লা !

আবদুল্লা তন্দ্রাজড়িত চোখ লইয়া আবার দেখা দিল। মুখের ভাবে স্পষ্ট অপ্রসন্নতা। সারা রাত কি তাহাকে ঘুমাইতে দিবে না এরা ?

—ইয়াসিন, ইয়াসিন কোথায় রে ?

—গণিমিঞার বাড়িতে।

—গণিমিঞার বাড়িতে। গাজী সাহেব ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন। বলিলেন, আর মোতালেব ?

—সেও।

—বুঝেছি। গাজী সাহেব উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন, সঙ্গে সঙ্গে আবদুল্লাও মৃদু হাসিল।

ডি-সুজা প্রশ্ন করিল, কী হয়েছে ?

—আর বলো কেন সাহেব ! কোত্থেকে একটা জেলের মেয়ে নিয়ে এসেছে, তাকে নিয়ে রেখেছে গণিমিঞার বাড়িতে। তাই—কথাটা অসমাপ্ত রাখিয়া গাজী সাহেব আবার হাসিলেন।

আবদুল্লা লোভীর মতো ঠোঁট চাটিল। বলিল, খুব মৌজ হচ্ছে ওখানে। আমি মালিকের হুকুম পেলাম না, নইলে—সক্ষোভে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া আবদুল্লা চুপ করিল। এই মুহূর্তে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত মনে হইল তাহাকে। গাজী সাহেব ধমক দিয়া উঠিলেন, হয়েছে হয়েছে থাম। সবগুলো এবার জেলে যাবি তোরা, আমাকে শুদ্ধ ডোবাবি। যা এখন খানা-পিনার ব্যবস্থা করগে। আর ইয়াসিন কিংবা মোতালেব ফিরলেই আমাকে খবর দিবি।

ডি-সুজা হাসিতেছিল, কিন্তু বর্মির মুখের দিকে চোখ পড়িতেই তাহার হাসি গেল বন্ধ হইয়া। শুধু বিবর্ণ নয়—অদ্ভুতভাবে রেখাংকিত আর অপরিচিত হইয়া উঠিয়াছে তাহার মুখশ্রী। একটা ভয়ের শিহরণ উঠিয়া আসিয়া তাহার পা হইতে সুরু করিয়া সমস্ত মাথা পর্যন্ত কাঁপাইয়া দিল। নৌকায় আসিতে আসিতে কালো জল আর দিগন্তপ্লাবী অন্ধকারের মধ্যে যে অর্থহীন ভীতির শিহরণ তাহাকে আন্দোলিত করিয়াছিল—সেই অনুভূতি আবার যেন ফিরিয়া আসিতেছে। ডি-সুজা অনুভব করিল, তাহার বুকের লোমগুলি জামার তলায় ঘামে ভিজিয়া উঠিতেছে।

গল্প-গুজবের পর খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হইল। গাজী সাহেব আয়োজন মন্দ করেন নাই। বনিয়াদী বড়-লোক, লোককে কেমন করিয়া খাওয়াইতে হয় সেটা জানেন। ভালো পোলাও মাংস আস্ত মুরগীর রোষ্ট। পায়েসের বন্দোবস্তও আছে।

সব শেষে আসিল বোতল। গাজী সাহেব নিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি মদ স্পর্শ করেন না। বর্মিটি বেশি খাইল না, অতএব বোতলটা শেষ করার ভার ডি-সুজার উপরেই পড়িল।

বয়েস্ হইয়াছে—মদ খাওয়াটা ছাড়িয়াই দিয়াছে প্রায়। ডি-সুজা সামান্য আপত্তি তুলিল। গাজী সাহেব অনুযোগ করিয়া কহিলেন, ডি-সুজার পূর্বপুরুষেরা পিপার পর পিপা মদ টানিয়া পাচার করিয়া দিত, আর সামান্য একটা বোতলের জন্য ডি-সুজা ভয় পাইতেছে!

পূর্বপুরুষ! যাদুমন্ত্রের কাজ করিল কথাটা, চন্ করিয়া মাথায় রক্ত চড়িয়া গেল ডি-সুজার। দেখিতে দেখিতে নিঃশেষ হইয়া গেল বোতলটা। তারপর ডি-সুজা টলিয়া পড়িল মেজেতে—

নেশা ছুটিল পরের দিন—শেষ বেলায়।

আচ্ছন্ন চোখ দুটি কচ্‌লাইয়া লইয়া ভারী গলায় ডি-সুজা বর্মির সন্ধান করিল।

গাজী সাহেব বলিলেন, চলে গেছে। ইয়াসিনের সঙ্গে কথাবার্তা হয়ে যেতে সকালেই চলে গেল।

—চলে গেছে! আমাকে ফেলে! অকৃত্রিম বিস্ময়ে ডি-সুজা সোজা উঠিয়া বসিল।

—হাঁ, কী একটা জরুরি কাজ ছিল তার।

সন্দেহে ডি-সুজার মনটা মুহূর্তে ঘোলা হইয়া উঠিল। বর্মি চলিয়া গেল—তাহাকে একলা ফেলিয়াই!

লিসি বাড়িতেই আছে—আর—আর—

বিদ্যুৎ-চকিতের মতো ডি-সুজা কহিল, আমাকে এক্ষুণি যেতে হবে গাজী সাহেব। নৌকো আছে না?

—তা আছে। কিন্তু এখন তুমি কী ক'রে যাবে সাহেব? আকাশের অবস্থা দেখেছ?

আকাশের অবস্থা—হাঁ, সেটা দেখিবার মতোই বটে। শিকারী বাজের মতো প্রান্তে প্রান্তে কালোমেঘ উড়িয়া আসিতেছে। ঋজু দীর্ঘ সুপারির বন প্রত্যাশায় নিস্তব্ধ। সামনে প্রকাণ্ড একটা নিমগাছের মাথায় অসংখ্য বক আসিয়া বসিতেছে রাশি রাশি সাদা ফুলের মতো। চারিদিকে নিঃশব্দ সমারোহ।

ঝড় আসিতেছে।

অতএব ঝড় না থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইল। বাতাস বৃষ্টি। সমস্ত মনটায় তোলাপাড়া চলিতে লাগিল। এমন ঝড় এ বৎসর আর হয় নাই। ঘর বাড়ী কিছু পড়িয়া গেল কিনা কে জানে। তা ছাড়া লিসি এক্‌লা আছে বাড়ীতে। জোহান—বর্মি—বিশ্বাস নাই কাহাকেও।

ঝড়ের পরে নৌকা লইয়া ডি-সুজা ফিরিল চর্ ইস্‌মাইলে। রাত্রি শেষ হইয়া আসিয়াছে। চোখের সামনেই জ্বলিতেছে শুকতারা। বাড়ীর সামনে দু তিনটা সুপারি গাছ পড়িয়া—দরজাটা খোলা।

—লিসি!

কেহ সাড়া দিল না।

ডি-সুজা প্রায় আর্তনাদ করিয়া উঠিল, লিসি।

এবারে সাড়া আসিল। তবে লিসির নয়। একটা পরিচিত তীব্র তীক্ষ্ণ চীৎকারে চারিদিক যেন চিরিয়া ফাড়িয়া খান্ খান্ হইয়া গেল। ডি-সুজা সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, বাড়ির প্রাচীরের উপর বীরের মতো গলা ফুলাইয়া তাহার সেই বড় মোরগটা তীব্র কণ্ঠে প্রভাতী ঘোষণা করিতেছে। গ্রামের কেহ তাহাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল—বোধহয়, সুযোগ পাইয়া সে যথাস্থানে ফিরিয়া আসিয়াছে।

মোরগটা যথাস্থানেই ফিরিয়াছে, কিন্তু লিসি আর ফিরিল না। খবরটা সমস্ত চর্ ইসমাইলে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিল। জোহানকে খুন করিয়া বর্মিটা লিসিকে লইয়া সরিয়া পড়িয়াছে। ডি-সিলভা তিন দিন যাবৎ শয্যাগত। ভয়ানক ভয় পাইয়াছে লোকটা, আছাড় খাইয়া নিজের একটা পা-ও ভাঙিয়াছে। (ক্রমশঃ)



অপরাধ-বিজ্ঞান

শ্রীআনন ঘোষাল

৬

নাটা বা বেঁটে চেহারা আর এক প্রকার ক্যামাফ্লেজ। আমি কোনও এক বেঁটে দুর্বৃত্তকে বাল্যকাল থেকেই জানি। স্ত্রীঘটিত ব্যাপারে সে একবার অভিযুক্ত হয়, প্রহৃতও হয়। নিম্নের বিবৃতিটুকু শিক্ষামূলক।

"আমার বয়স যখন ১২, আমার আত্মীয়-বন্ধুটীর বয়স তখন ১৮, কিন্তু আমা অপেক্ষা তাকে অনেক ছোট দেখাত। তার সঙ্গে কোনও গৃহস্থ বাড়ীতে গেলে, মেয়েরা বেরিয়ে এসে, বাবা এস, বাবা এস—বলে, বুকে জড়িয়ে তাকে ভিতরে নিয়ে যেত। আমি তার চেয়ে অনেক ছোট হলেও আমাকে দেখাত একজন ২০ বছর বয়স্কের মত। মেয়েরা আমাকে দেখে ঘোমটা টেনে, সরে গিয়ে বলত—'ওরে একজন ভদ্রলোক এসেছে রে, বাইরের ঘরে বসা'। চোখ ফেটে আমার জল আসত। এর পর আমি তার সঙ্গ ত্যাগ করি। পরে শুনেছি তার সেই বেঁটে চেহারার সুযোগে সে অনেক অপকার্য্য করে। প্রহৃতও হয় বহুবার।"

প্রায় দেখি অভিভাবকেরা সমুচ্চ ও স্বাস্থ্যবান ছেলেদের দেখে ভীত হন, গৌরবান্বিত হন না। মেয়েরাও স্বাস্থ্যবতী হলে তারা ভীত হয়ে পড়েন। অথচ খর্ব্বাকৃতি মেয়েদের সম্বন্ধে সাবধান হন না। এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গি বদলান উচিত। উপরিউক্ত ছেলেটীর কাছে শুনেছি, বড় হয়েও সে রেহাই পায় নি। সে যখন ২৪ বৎসর বয়স্ক তখন তাকে দেখাত ৩৪ বৎসরের ন্যায়, এমনি হৃষ্ট-পুষ্ট ও দীর্ঘাকৃতি ছিল সে। বিবাহের সময় কন্যাপক্ষীয়রা বলে যেতেন—পাত্রের বয়স একটু বেশী মনে হয়। মেয়ের বয়স মাত্র ১৯। একটু কম বয়সের ছেলে চাইছিলাম, মশাই'। এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গিও অভিভাবকদের বদলান উচিত। আমার বিশ্বাস এইজন্যই, পরিবার বিশেষ, এমন কি বাঙ্গালী জাতিও দুর্ব্বল হয়ে যাচ্ছে। আমি নিজে একজন ভুক্তভোগী।

মেয়েদের আয়ত্তাধীন করবার জন্য দুর্বৃত্তরা বহু ছল ও কৌশলের আশ্রয় নেয়। এই সব দুর্বৃত্তদের অনেক চিঠিপত্র আমার হস্তগত হয়েছে। কোনও এক দুর্বৃত্তের পত্র থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করলাম। পত্রটী পাঠ করে আমি ক্রুদ্ধ ও স্তম্ভিত হই।

"আমি একটী মেয়েকে এইরূপে বশ করি। তুমিও চেষ্টা করলে পারবে। তবে বিশেষ সাবধানতার প্রয়োজন। মেয়েটীকে কাছে বসিয়ে গল্প করবে। ছোট বোন, দিদি বা বৌদি সম্পর্কেও আপত্তি নেই। নানারূপ কথাবার্ত্তার পর, তাকে বলবে—'দেখুন আমার মামার বাড়ী নবদ্বীপে (বা ভাটপাড়ায়); ইষ্টবেঙ্গলের ছেলেমেয়েরা সকলেই যেমন সাঁতার কাটে, নবদ্বীপের সকলেই তেমনি হাত দেখতে জানে। হাত দেখাটা ছেলেবেলায় আমাদের খেলার সামিল ছিল।

এরপর মেয়েটী নিশ্চয়ই বলবে—সত্যি। তাহলে দেখে দিন না—আমার হাতটা।

সাবধানে হাতটা হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে একটু চাপ দেবে। তারপর বাম হাতে তার কনুই ধরে, হাতখানা সোজা করবে। হাতটা নিয়ে অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া দরকার। ভবিষ্যত সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলবে। তারপর কাছে সরে এসে বলবে—এইবার কপালটা একটু কোঁচকান ত। কপালের রেখাগুলি দেখব।

এরপর মেয়েটী নিশ্চয়ই কপাল কোঁচকাবে। রেখা গণনার অছিলায় কপালে হাত দেবে।

কাঁধটা ধরে একটু ঘুরিয়ে দেবে। যেন মনে করে, রেখা গোনার সুবিধের জন্য তুমি তা করছ। অসাবধানতায় (ইচ্ছাকৃত) হাতটা পিঠে, গণ্ডে ও স্কন্ধে ফেলবে। সে যেন বোঝে—এগুলি accidentally হচ্ছে। যেন ইচ্ছাকৃত না মনে করে। তা হলেই বিপদ। এতে যদি আপত্তি জানায় সেদিনকার মত ক্ষান্ত দেবে। তা না হলে কোমলভাবে জিজ্ঞেস করবে—রাগ করছেন আপনি।

উত্তরে যদি মেয়েটী বলে—'না না' এবং সে যদি সরে না যায় ত বুঝবে তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে অর্থাৎ মেয়েটীর যৌন প্রবৃত্তি জাগ্রত হয়েছে। এর পর আর একবার জিজ্ঞেস করবে—সত্যি বলছ। আমার কিন্তু ভয় করছে। উত্তরে সে বলবে—না রাগ করি নি। সত্যি। কি করেছেন আপনি, রাগ করব। এর পর মেয়েটী নিজেই হয়ত বলবে—দাঁড়ান, মা কোথায় দেখে আসি।

ছলে বা কৌশলে বা যৌন প্রবৃত্তি জাগ্রত করে, যে সকল দুর্বৃত্তরা নারীর ক্ষতিসাধন করে তাদের কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত। মেয়েদের এই বিশেষ দুর্ব্বলতার জন্য আইনদাররা তাদের সম্মতির উপর কোনও মূল্য দেন নি। বরং যৌন প্রবৃত্তি জাগ্রত করে যে সম্মতি আদায় করা হয়, সে সম্মতি সম্মতিই নয়, এইরূপ বিধান দিয়েছেন। স্বাভাবিক অবস্থায় প্রস্তাব মাত্রেই হয়ত মেয়েটী মারমুখী হয়ে উঠত। অস্বাভাবিক অবস্থায় সে তা নাও হতে পারে।

এ সম্বন্ধে অপর একটী ঘটনার কথা বলা যাক। ১৯৩৮ সালে ঘটনাটী ঘটে। কোনও একটী যুবক পাড়ার একটী কুমারী মেয়ের সহিত ভাব করে, সৌভাগ্যক্রমে সময়ে বাটীর লোকেরা ব্যাপারটী জানতে পারে, সবিশেষ সাবধানতা অবলম্বনও করে। বাটীর সকলে ব্যাপাটী জানলেও বাটীর কর্ত্তাকে তাহা জানায় না, কারণ কর্ত্তাটী রাসভারী ও রাগী ছিলেন। ওদিকে ছেলেটী পত্র দ্বারা মেয়েটীকে মনোভিলাষ জানাতে বদ্ধপরিকর। সেইদিনই সে মেয়েটীকে নিয়ে যেতে চায়। বাটীর চাকরবাকর পূর্ব্বেই বিতাড়িত হয়েছে। শেষে নিরুপায় হয়ে এক অদ্ভুত উপায়ে মেয়েটীকে পত্র পাঠায়। সে এক তাসের আড্ডায় খোদ কর্ত্তার সঙ্গেই দেখা করে। কর্ত্তাকে সে বলে—"দেখুন ম্যাট্রিকের 1st Paperএর কয়েকটা Question জানা গেছে। গোপনে টুকে এনেছি, প্রীতিকে দেবেন।" কর্ত্তা কাগজটা উল্টে পাল্টে পড়ে দেখেন, কিন্তু বুঝতে পারেন না। খুসী হয়েই তিনি নিজ

হাতে মেয়েকে প্রেম পত্রটী দিয়ে আসেন। পত্রটীর অনুলিপি লিখে দেওয়া হল।

Matriculation Examination 1936

English I Paper

Total marks—100

Translate either of the following three passages

(1) দুদিন তারে দেখেছিলাম। কাঁচা সোনার মত তার গায়ের রঙ্। কৃষ্ণ কেশদাম হতে মুক্ত স্বচ্ছ নখ পর্য্যন্ত তার বিধাতার এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। সুন্দর নিটোল তার দেহ। বাংলার একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত পর্য্যন্ত ঘুরেছি, এমনটী কোথাও চোখে পড়ে নি। পরবর্ত্তী জীবনে হয়ত ভারত থেকে জাপ, জাপ থেকে ব্রেজিল, পরে সারা য়ুরোপও ঘুরব। কিন্তু তাতেও কি কোনও ফল হবে? বাংলার এই অরূপার সন্ধান কোথাও মিলবে কি? না কখনই মিলবে না। সারা জীবন বাংলাতেই থেকে যাব। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করব, বাংলা দেশেই। জীবন যদি নিঃশেষ করতেই হয়, ত এই দেশেই করব। অবশ্য যদি ভাগ্যবিরূপ হয়।

(2) টাকা কিছু বটে, কিন্তু সব নয়। রাজা রাজপ্রাসাদে সুখী নয়, কিন্তু গৃহস্থ পর্ণ-কুটীরেও সুখী। আমি বলছি আমার ভবিষ্যৎ আছে, তোমারও। আমি কর্ম্মী, আমি বীর। প্রয়োজন শুধু অনুপ্রেরণা। কিছুটা পেয়েছি, কিন্তু আরও চাই। তোমার প্রেরণা আমায় এগিয়ে দেবে, রাণী। ঈপ্সিত অনেককেই আমি পিছনে ফেলে এগিয়ে যাব। কলেজি শিক্ষা আজ অকেজো। কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও বুদ্ধিই মানুষকে বড় করে, নামী করে। আমার মন বলছে আমি বড় হব। বড় আমি হবই? আমার মানসীকে আমি সুখী করবই। মানুষ বদলায়, কিন্তু মনুষ্য জাতি একই থাকে, একথা যেন ভুলে যেয়ো না।

(3) সাত রাজার ধন মাণিক, তার চেয়েও প্রিয় আমার। তুমি এমনই নিঠুর, এমনিই কঠিন। তুমি নিঠুর হতে পার, কঠিন হতে পার, কিন্তু তুমি ভীরু না। আমার ভবিষ্যৎ হৃদয়রাণী ভীরু হতে পারে না। আমার লিপিকা যেন তোমায় নূতন বলে বলীয়ান করে। মিথ্যা মায়ার খাঁচা যেন তোমায় না আটকে রাখে। মুক্ত বিহঙ্গমের ন্যায় আমার হৃদয় কুলায় উড়ে এস, পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ রেখ। চাঁদ উঠবে মধ্য রাত্রে। তার আগেই হবে তুমি মুক্ত, তা আমি জানি। চাঁদ উঠে যেন তোমায় পায় আমার ঘরে। আমি দুয়ারেই এসে অপেক্ষা করব। চাঁদের সঙ্গে হয়ত দেখা হবে, মধ্য পথে। যদি হয় ত সে হবে মোদের সাথী। সে পৌছে দেবে মোদের গন্তব্য স্থানে। সাহস হারিয়ো না। ক্ষণিকের দুর্ব্বলতা দূর করো। ক্লৈব্য আমাদের সাজে না, তোমারও না, আমারও না। নদী যদি সাগরে আসে, ত তাকে কেউ কি রুখতে পারে? পারে না, পারেও নি কেউ।

দুর্বৃত্তদের এইরূপ বহুপ্রকার কার্য্য পদ্ধতি আছে। এ বিষয়ে আমি বহু তথ্য তল্লাস করেছি। এ সম্বন্ধে বেশী কিছু আলোচনা করা অনুচিত। এতদ্দ্বারা অভিভাবকদের কোনও উপকার হোক আর না হোক, দুর্বৃত্তরা (নূতন) নব নব অস্ত্রে সজ্জিত হতে পারে। তা ছাড়া এইরূপ আলোচনার সাহিত্যে স্থান নেই। ৬০ বৎসরের উর্দ্ধ বয়স্কদের সভায় এ সম্বন্ধে কিছু বলা যায় মাত্র। বিপথগামী নারীর (দুর্বৃত্তদেরও) চালচলনের বিশেষত্বটুকু এরপর অভিভাবকদের চোখে পড়বে। নারীরাও দুর্বৃত্তদের উদ্দেশ্যটুকু পূর্ব্বাহ্নেই বুঝে সাবধান হবে।

অনেক উপার্জ্জনক্ষম দুর্ব্বৃত্ত আছে, যারা গরীব অভিভাবকদের অর্থ সাহায্য করে এবং নানারূপ সুবিধা আদায় করে। দূর থেকে তাদের দাতা মনে হয়, আসলে সুন্দরী বোন বা বৌ না থাকলে তারা দান করে না। বিবাহের অছিলায়ও অনেক দুর্ব্বৃত্ত মেয়েদের সর্ব্বনাশ করে। অনেক অশিক্ষিত নির্ব্বোধ অভিভাবক এ বিষয়ে (ইচ্ছা করেই) অন্ধ হন। মেয়েদের বশীভূত করার চেষ্টার অন্ত নেই। কোকেনাদি ঔষধের সাহায্যে সংগ্রাহিকারা কিরূপে কন্যা সংগ্রহ করে সে সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলেছি। (ভারতবর্ষ আষাঢ় সংখ্যা দেখুন)। কাজেই তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সহরে এমন অনেক অসাধু সাধু, তান্ত্রিক, জ্যোতিষী আছে যারা নানারূপে দুর্ব্বৃত্তদের সাহায্য করে। মন্ত্রে তন্ত্রে মানুষের কোনও ক্ষতি হয় না, কিন্তু অনেক সময় অভিপ্সীতা কন্যাটীকে ঔষধাদি খাওয়ানো হয়। লোভী চাকর বামুনের সাহায্যেই এই সব করা হয়। অজ্ঞাতে মেয়েরা বিষ পান করে, অনেক সময় রুগ্ন বা উন্মাদ হয়েও পড়ে। আমি একজন নাম-করা তান্ত্রিককে জানতাম, দুর্ব্বৃত্তরা তাঁকে বহু অর্থ দিয়েছে। তিনি একটী মহামূল্য মন্ত্র দান করতেন, মন্ত্রটীর নাকি দুইটী গুণ আছে। যথাক্রমে উহাদের Negative ও Positive বলা হত। অনেকটা চুম্বকের South বা Northএর ন্যায়। মন্ত্রটী নিজ স্ত্রীর কানে গেলে, সে তৎক্ষণাৎ পরের হয়ে যাবে। তাকে ধরে রাখা তখন অসম্ভব। কিন্তু পরস্ত্রীর কানে বিপরীত ফল দেবে অর্থাৎ পরস্ত্রী মন্ত্র পাঠকের হবে। সে স্বামীকে ছেড়ে মন্ত্রপাঠককে বরণ করবে। আমি ছদ্মবেশে সাধুর সঙ্গে দেখা করি এবং এর বৈজ্ঞানিক দিকটা আলোচনা করি। সাধু আমাকে এইরূপ বুঝান। Poligametic tendency (বহুপতিত্ব-স্পৃহা) মেয়েদের মেদ মজ্জায় নিহিত। মন্ত্রের শব্দ বিন্যাস একটী বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করে। এই আলোড়ন মজ্জা ও স্নায়ুতে আঘাত হেনে তৎনিহিত সুপ্ত যৌন-বোধ জাগ্রত করে। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি—আচ্ছা নিজ স্ত্রীর উপর পরীক্ষা করার পর যদি দেখি—স্ত্রীটী হস্তচ্যুত হয়েছে তাহলে তাকে ফিরাবার উপায় কি? উত্তরে সাধু বলেন—কোনও উপায় নেই। তবে তিনি পরস্ত্রী হলে, পরস্ত্রী বিধায় মন্ত্র পাঠে তাকে পুনরায় নিজস্ত্রী করা যায় এবং তা করা যায় তিনি পরস্ত্রী হওয়ার পর। আমার স্ত্রী নেই, তাই নির্ভয়ে মন্ত্রটী টুকে নি। মন্ত্রের শব্দগুলি এইরূপ ছিল—"হুং ক্রীং ক্রীর ক্রীং হুম্ হাম্ হুম্ হিম্ ক্রীং হুম্।" মন্ত্রটীর উচ্চারণ পদ্ধতিও চমকপ্রদ। এজন্য বিশেষ দিন ও ক্ষণেরও ব্যবস্থা আছে। মন্ত্রটীর পরীক্ষার কোনও প্রয়োজন দেখিনি। দুর্বৃত্তদের বহুমুখী প্রচেষ্টার কথাই আমি বলতে চাই। অপর একটী ঘটনার কথা বলি। কোনও এক চতুর্দ্দশী বালিকা আফিম খায়, কিন্তু মরে না। মেয়েটী পাড়ার এক স্কুলে পড়ত। অন্যান্য মেয়েদের মত সেও পায় হেঁটে বাড়ী ফেরে। অন্য মেয়েদের পিছনে কাউকে দেখা যায় না। সেই মেয়েটীরই পিছনে একদল ছোকরা ঘুরে। শিক্ষয়িত্রী ও আত্মীয়রা সিদ্ধান্ত করেন মেয়েটীরও কিছু দোষ আছে। তার চেয়েও সুন্দরী সুন্দরী

মেয়ে আছে, শুধু তাকেই তারা বাছে কেন। মেয়েটী বলে, তাদের কাউকে সে চেনে না, কিন্তু কেউ বিশ্বাস করে না। নাচার হয়ে সে অহিফেন্ খায়। বহু তথ্য তল্লাসের পর আমি প্রকৃত সত্য আবিষ্কার করি। এ সম্বন্ধে একটা গল্প লিখেছিলাম। গল্পটীর কতকাংশ উদ্ধৃত করলাম।

এক নম্বর, দু নম্বর। এই তিন তিন তিন চার। পাঁচ ছয়, সাত নম্বর।

লাল কাঁকরের রাঙা রাস্তাটা গঙ্গার দিকে চলে গিয়েছে। রাস্তার ধারে একটা খালি বাড়ী, আর তার সামনে ভাঙা রক। রকটী বহু ঘর্ষণে চকচকে ও তেলা হয়ে গেছে। সন্ধ্যায় সেখানে বখা ছেলেদের আসর বসে। রোজকার মত সেদিনও একটা দল সে যায়গাটায় হাজির আছে। দল তাদের একটা নয়, অনেকগুলি। শ্রেণীভেদে নিষ্কর্ম্মা ছেলেদের নিয়ে দলগুলি গঠিত। কথিত দলটীর ডিউটী ছিল তিনটা থেকে সন্ধ্যা পাঁচটা পর্য্যন্ত। পাঁচটার পর তাদের হটিয়ে অপর দল জায়গাটা দখল করবে। ব্যস্ত হয়ে তারা পথের দিকে তাকাতে সুরু করল।

অদূরের মেয়ে স্কুলের ঘড়িটাতে ঢং ঢং করে চারটা বাজল। সঙ্গে সঙ্গে দলে দলে মেয়ের দল রাস্তায় বেরুল, আশে পাশের বাড়ী থেকে তারা পড়তে আসে। সকলেই পাড়ার মেয়ে, নিঃসংকোচে তারা পথ চলছে। সঙ্গে সঙ্গে বখা ছেলেগুলোও সজাগ হয়ে উঠল। কেউ বলল—এক, কেউ বলল—দুই। অপরের অবোধ্য ভাষায় তারা বলে চললো—তিন চার পাঁচ ছয়…। আসলে কিন্তু তারা মেয়েগুলোকে নম্বরী করে দিচ্ছিল। নাম-ধাম না জানলেও নম্বর অনুযায়ী পরে তাদের চেনা যাবে, এইটাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য, মেয়েদের দলে একজন অল্পবয়স্কা বস্তির মেয়েও ছিল। কাছাকাছি একটা বাড়ীতে ঝিয়ের কাজ করত। ঘটনাচক্রে সেও সেদিন ঐ পথে মেয়েদের ভিড়ের মধ্যে এসে পড়েছে, সঙ্গে সঙ্গে তারও নম্বর হয়ে গেল, সতেরো।

মেয়েদের দল তখনও বেশী দূর যায় নি। আড় চোখে তাদের একবার দেখে নিয়ে দলের একজন ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল—এই মেধো ঘুঁটি বার কর শীঘ্র। সাজিয়ে ফেল্ শা—

মেধো প্রস্তুতই ছিল, ট্যাঁক থেকে, পর পর সতের পর্য্যন্ত নম্বর দেওয়া সতেরটা চাকতি বার করে রকের উপর ছড়িয়ে দিলে; শুধু তাই নয়, নিমিষে এক টুকরা ইট দিয়ে আঁচড় কেটে, কতকগুলো চৌক ঘরও এঁকে নিল।

দশ সাত, সতেরো, মাইরী ভাই। জিতে নিয়েছি। ১৭ নং আমার।

সেদিনকার জুয়োতে ১৭ নম্বর মেধোর ভাগেই উঠল। ব্যবস্থামত সকলে মেধোর ১৭ নং লাভে নিঃস্বার্থভাবে সাহায্য করতে বাধ্য। শুধু সামর্থ্য দিয়ে নয়, অর্থ দিয়েও।

একজন বলে উঠল—সাবাস ভাই মেধো, তোর কপাল ভাল।

হৈ চৈ করে সকলে নেমে পড়ল, সতের নম্বরের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে তারা চলতে সুরু করল।

মেয়েরা যে যার বাড়ী নির্ব্বিঘ্নে পৌছে গেল। সতের নম্বরের বাড়ী ছিল একটু দূরে, একটা বস্তির মধ্যে; ছোকরাগুলো তার নজর এড়াই নি। বস্তির মেয়ে সে। এ বিষয়ে সেও অভ্যস্ত। মুচ্কি হেসে সে জানাল—কাল আসিস্।

পরদিন আবার জুয়ো বসেছে। প্রথমেই উঠল ১৩ নম্বর। ১৩ নং ছিল পাড়ার হরো ঠাকুরের মেয়ে রাধা।

আপন মনে রাধা পথ চলছিল। হঠাৎ সে লক্ষ্য করল, অপর মেয়েদের গতিরোধ না করে, মাত্র তারই পিছনে ছেলেগুলো দুর্ব্বোধ্য ভাষায় কি বলতে বলতে ধাওয়া করছে।

ছুটতে ছুটতে এসে, বাড়ীর দরজায় ধাক্কা দিয়ে ভীত কম্পিত স্বরে রাধা চেঁচিয়ে উঠল—ও দাদা।

রাধাকে চেঁচাতে দেখে মেধো সদলে পিছিয়ে এসে পাশের গলিটায় ঢুকে পড়ে। তার পর মেধোর কাঁধে একটা গাঁট্টা মেরে বলে—ও এমনে হবে না। চল, দা-ঠাকুরের কাছে। শিকটা নিয়ে আসি। চাকর টাকর কারুর সঙ্গে ভাব করে, কায়দা মাফিক ওষুধটা খাওয়াতে হবে। তার পরই ব্যাস্ ১৩ নং আমার।

দলের সকলে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ল; নিয়মমত মেধোকে তারা সাহায্য করতে বাধ্য, যত তাড়াতাড়ি কার্য্য সমাধা হয় সকলের পক্ষেই তা ভাল, কারণ ১৩ নংকে মেধোর হাতে তুলে না দেওয়া পর্য্যন্ত পরদিনের জুয়ো বন্ধ থাকবে। এই ছিল দলের নিয়ম।

বাড়ীর চাকর এসে দরজা খুলে দিতেই রাধা হুড়্মুড়্ করে ভেতরে ঢুকে পড়ল। দিদিমণির এই অস্বাভাবিক ব্যবহারে চাকর ভিকু হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল, সেইখানেই থমকে দাঁড়িয়ে, ইতস্তত: দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করল। ভিকুকে দূর থেকে লক্ষ্য করে রেধো মেধোর কাঁধে আর একটা গাঁট্টা মেরে বলে উঠল—এই যে এসে গেছে চাঁদ। দে, দে দেখি কার কাছে কত আছে। আমার কাছে মাইরি আছে শুধু এক টাকা।

দলের রেধোর কাছে ছিল দেড় টাকা। সে তাড়াতাড়ি একটা টাকা টেঁকে গুঁজে শুধু আধুলিটি বার করে বলল—আমার কাছে আছে আটআনা।

একটা পরব উপলক্ষে স্কুলটা দিন দুই বন্ধ ছিল। রাধাকেও স্কুল যেতে হয় নি। সকাল বেলা নিশ্চিন্ত মনে সে পড়ার উপক্রম করছিল। হঠাৎ বইয়ের পাতা খুলে সে দেখতে পেলে, পাতার মধ্যে কতকগুলো মাথার চুল, একটা সিঁদুরমাখা শিকড়। ব্যাপারটা তার কাছে অদ্ভুত ঠেকল। তাড়াতাড়ি সেগুলো বার করে বাইরে ফেলে দিল, কিন্তু বলি বলি করেও কাউকে সে কথা বলল না। বললে হয়ত কেউ তা বিশ্বাসও করত না, তাকেই হয়ত এজন্য পাঁচটা কৈফিয়ৎ দিতে হত।

রাধা অনেকক্ষণ পড়ার ঘরে বসে রইল, কিন্তু কিছুতেই মনস্থির করে পড়ায় মন দিতে পারল না। ধীরে ধীরে উঠে পড়ে কলঘরের দিকে চলে গেল চান করবার জন্য।

মাত্র মিনিট পনের রাধা চানের জন্য কলঘরে গেছে। আরও কিছুক্ষণ সেখানে তার থাকবার কথা। হঠাৎ দরজা খুলে বারণ্ডায় বেরিয়ে রাধা চেঁচিয়ে উঠল—ওমা-আ—।

রাধার চীৎকারে সকলে দৌড়ে এসে দেখল, ভিজে কাপড়ে দাঁড়িয়ে রাধা ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে, হাতে তার নীল রঙের শুক্না কাপড়খানা, কাপড়টার একটা দিক রাধা মুঠো করে ধরে, অপর দিকটা ভিজে মেঝেয় লুটিয়ে পড়ছে।

কাপড়টার একটা খুঁটে সেই কদর্য্য জিনিসগুলোই বাঁধা ছিল।

খুঁটের গেরো খুলে জিনিসগুলো দেখে সে আঁতকে উঠে। নিজেকে সে কিছুতেই ঠিক রাখতে পারে নি।

জিনিসগুলো পরীক্ষা করতে করতে রাধার মা শিউরে উঠে বললেন—এ কি রে রাধা—এ্যাঁ—। সর্ব্বনেশে কাণ্ড। এ যে তুক।

ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে রাধা লক্ষ্য করল, চাকর ভিকু বারণ্ডার দরজাটা দিয়ে ভিতর দিকে একবার উঁকি দিয়ে পরক্ষণেই সরে গেল।

প্রায় সপ্তাহ খানেক পরের ঘটনা। সন্ত্রস্ত ভাবে হাঁপাতে হাঁপাতে রাধা স্কুলে এসে ক্লাশ ঘরে ঢুকতে যাচ্ছে; এমন সময় দরোয়ান ভিখন সিং তাকে ডেকে জানাল—আপকো সরকার বাবা সেলাম দেতে।

মিস্ সরকার স্কুলের হেড-মিষ্ট্রেস্। হেড্ মিষ্ট্রেস্ ডাকছেন শুনে রাধা তাড়াতাড়ি বই কটা টেবিলে রেখে, অফিস ঘরে এল।

হেড মিষ্ট্রেস্ রাধার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করলেন—রোজ রোজ তোমার পিছন পিছন ছোকরার দল ঘোরে শুনেছি। তোমার কি বলবার আছে, কারা ওরা।

কথাটা মিথ্যে নয়। রাধা নিজেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে, লজ্জায় সে কাউকে সে কথা বলে নি। কেঁদে ফেলে সে উত্তর করল—সত্যি দিদিমণি। কাউকে আমি চিনি না। ওরা—

রাধার গার্জেনের উদ্দেশ্যে একটা চিঠি লিখতে লিখতে সরকার বাবা জিজ্ঞেস করলেন—স্কুলে ত অনেক মেয়েই হেঁটে আসে, কাউকে ওরা 'ফলো' করে না; তোমাকেই বা করে কেন, তুমি বোঝাতে চাও কি। তোমাকে আমি স্কুলে রাখব না। (ক্রমশঃ)

আলোর লেখা

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

মনোমোহন ধর্ম্মশালার সঙ্গে ছোট একটি পাঠাগার সংযুক্ত। একটি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকও এখানে রোগী দেখেন। মহাপ্রাণ বীরেশ্বর পাণ্ডে মহাশয়ের বংশের একটি যুবকও ধর্ম্মশালার তত্ত্বাবধান করে। তার এবং ডাক্তারবাবুর যৌথ সৌজন্যে কয়েকটি শিক্ষিত ভদ্রলোক পাঠাগারে পড়তে আসার অজুহাতে এস্থানকে এক মিলন-ক্ষেত্র করেছে। ক্লাবের স্বধর্ম্ম অনুসারে এখানে রাজা উজীর মরে, নাটক নভেল মাসিক-পত্রের সমালোচনা হয়, ধ্যানচাঁদ অমরচাঁদ, ক্রিকেটী বাঁড়ুজ্যে, বিষ্ণু ঘোষ, বোকা ঘোষ প্রভৃতির দোষ গুণ আলোচনা হয়। এই গোষ্ঠীর একটা অনুষ্ঠান ধর্ম্মশালায় সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসব এবং তদুপলক্ষে দরিদ্র-নারায়ণের সেবা।

আগন্তুকত্রয় যখন আহারান্তে ছাদের উপর দাঁড়িয়ে ষষ্ঠীর চাঁদের বাঁকা আলোয় কাশীর মৌচাকের মত লোকালয় দেখছিল, পাঁচটি যুবক এসে আত্ম-পরিচয় দিলে। পটোল, সন্তোষ, নিমাই, হরিচরণ এবং রাখাল।

—অনুমতি করুন—বল্লে অমিয়।

—আপনাদের সঙ্গে পরিচয়ে পরিতৃপ্ত হলেম—বল্লে কল্যাণ।

শ্রীমতী কিছু বল্লে না। এ অভিযান তার ভালো লাগ্‌লো বলে মনে হ'ল না। সে একটু সরে গেল। কিন্তু কান খাড়া ক'রে শুনলে তাদের কথাবার্ত্তা। কথা সেই সনাতন—কিঞ্চিত ভিক্ষা, পূজার জন্য। ধর্ম্মশালায় সার্ব্বজনীন দুর্গাপূজা হবে পাঁচ-জনের দেওয়া চাঁদায়।

গণ্ডগোল বাড়লো যখন এক প্রৌঢ় হাসি-মুখে পরিচিতের মতো এসে সবুজদের দলে যোগ দিলেন। তিন তলায় উত্তর দিকে তিনখানা ঘর। পূর্ব্বের ঘরে ছিল নমিতা, পশ্চিমের ঘরে বন্ধুদ্বয়, আর এই ভদ্রলোক ছিলেন সপরিবারে মাঝের ঘরে।

ভদ্রলোক কলিকাতার এক কলেজের প্রফেসার। সমুদ্রে রত্ন পাবার লোভে মানুষ ছোটে, নক্রের ভয়ে তার কাছে ঘেঁষতে ভয় পায়। প্রফেসার কৃষ্ণ সেনের অবস্থা সমুদ্রের মত। তিনি তরুণদের ভালবাসেন, তাদের হিতকামী। কিন্তু তাদের সঙ্গে গল্প করবার সময় যদি গাছ-পালা, জীব-জন্তু, গ্রহ-নক্ষত্র কিম্বা দেশ-বিদেশের কথা ওঠে, তা হ'লে একটা শিক্ষাপ্রদ বক্তৃতা অবশ্যম্ভাবী। চাঁদা-চাওয়ার দল অধ্যাপককে দেখে আনন্দিত হ'ল। কিন্তু এক আকাশ তারা—তার ওপর চাঁদ। একটু ভয় দেখা দিল তাদের প্রাণে। বুঝিবা সেন মশায় অনুরাধা, বিশাখার জ্যোতিতে তাদের কাজকে মলিন করেন। কলিকাতার যুবকেরা মনের মাঝে নিছক ভয় পেলে। কী কাণ্ড! কৃষ্ণবাবু তাদের প্রতিবেশী? তাঁরই ডাহিনে, বাঁয়ে, তারা এত বড় একটা অভিনয় করছে।

কৃষ্ণসেনের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী পৃথ্বীদেবী কান টানার মাথা। অধ্যাপককে টানলেই দেবী এসে হাজির হন। সেকালের মানুষ। কর্ত্তা যেমন ছেলেদের বক্তৃতা শোনাতে ভালবাসেন, শ্রীমতী পৃথ্বীদেবীর তেমনি তৃপ্তি, যুবকদের জঠর সেবায়।

—কিসের জটলা?—ব'লে সেন মশায় একেবারে ব্যূহের মাঝে এসে পড়লেন। আগন্তুকদের দেখে বল্লেন—আরে! এরা তো কল্‌কাতার ছেলে—ইন্‌ষ্টিটিউটে এদের দেখেছি।

ইত্যবসরে অর্দ্ধ-পরিক্রমার পাক মেরে শ্রীমতী পৃথ্বীদেবী শ্রীমতী চৌধুরীকে ধরলেন।

—কলকাতা থেকে এসেছ মা? বেশ বেশ! দর্শন হ'য়েছে?

শ্রীমতী বল্লে—আজ্ঞে হ্যাঁ! দর্শন ক'রে এসেছি।

পৃথ্বীদেবী বল্লেন—লক্ষ্মী মেয়ে। দাঁড়াও মা অন্নপূর্ণার সিঁদুর পরিয়ে দি। নবীন মেয়ে, কোথায় চুলের তলায় বুঝি সিঁদুর পর। সিঁদুরে ভয় কি?

কাশীর তরুণেরা এ তিরস্কারে অতি কষ্টে হাসি চাপ্‌লে। কলিকাতার জোড়া তরুণ হাসবে কি কাঁদবে ঠিক্ করতে পারলে না। অধ্যাপক হেসে বল্লে—ওরা নবীন জগতকে চেনে না। তবে সিঁদুর বিজ্ঞানসম্মত। বকুনি খেয়ে রাগ করনি মা?

নমিতা বল্লে—এ বিষয়ে ছেলেদের সঙ্গে মেয়েদের তফাৎ

আছে। মেয়েরা বাপমার ধমক খাওয়া সৌভাগ্য ভাবে। ছেলেরা হয়তো স্যার রাগে।

—ঠিক্ কথা—বল্লে অধ্যাপক।

সন্তোষ ভাবলে—যাক ভদ্রমহিলার প্রত্যুত্তর তাদের পক্ষে শুভ হ'ল, কারণ না হ'লে এখনি সিঁদুর-বিজ্ঞানের একটা বক্তৃতা শুনতে হ'ত।

শ্রীমতী পৃথ্বীদেবী বিল্বপত্র হ'তে মা অন্নপূর্ণার সিঁদুর নিয়ে শ্রীমতী নমিতা চৌধুরীর সিঁথিতে পরিয়ে দিলেন। বল্লেন—রাজরাণী হও মা। স্বামী-সোহাগিনী হও।

চাঁদের আলোয় সিঁদুরের রেখা জ্বলে উঠ্‌লো।

নমিতা পৃথ্বীদেবীর পদধূলি গ্রহণ করলে।

অমিয় শিহরে উঠ্‌লো—মনোরমা গার্লস স্কুলের উপসংহারটা মনে পড়লো। ঘটনা-স্রোত কোন্ খাদে বহিবে, শেষ অবধি?

রাত্রে আর এক দফা কাঁপলো অমিয়। বন্ধুকে বল্লে—কী কাণ্ডর মধ্যে পড়ছি বল্ তো। মিসেস সেন তো দিব্যি ওর সিঁথিতে সিঁদুর মাখিয়ে দিলেন। ওর দাদা যদি সত্য এসে পৌছায়, কি কাণ্ড হ'বে একবার ভাব।

কল্যাণ বল্লে—সার বুঝেছি, কি হবে না হবে বোঝবার শক্তি কোনো বড়-মিঞার নাই। আমরা তো ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র। ঘটনার স্রোতে গা ভাসিয়ে চলোনা ব্রাদার। অত বন্দরের ভাবনা কেন?

অমিয় বল্লে—এটা হাসির ব্যাপার মোটে নয়।

কল্যাণ বল্লে—ভবিষ্যতে কি হবে কে জানে। আপাততঃ ব্যাপারটা নিশ্চয় মজার। কাল সকালে নমিতা চৌধুরী ঠাকুর-দালানে আল্পনা দেবে, পূজার ফল কাটবে, আমরাও কাঁসর ঘণ্টা বাজাব।

অমিয় বল্লে—পরে জেলে গিয়ে কি কর দেখব। পাথর ভাঙ্গা মোটেই মজার কাজ নয়।

—কেন তুমিও যাবে সঙ্গে। সৎসঙ্গে স্বর্গবাস।

—এক যাত্রায় আর পৃথক ফল হবে কেমন ক'রে? তবে বাসটা স্বর্গে হবে কি জাহান্নমে তা জানি না।

রাত্রে সে কল্যাণীকে স্বপ্ন দেখলে। অভিমানে তার মুখখানা তিন ইঞ্চি বেড়ে গেছে। স্বপ্নরাজ্যে আরও সব অঘটন ঘট্‌লো।

প্রভাতে উঠে বন্ধুরা চা-পান করতে পেলে না। নমিতা প্রতিশ্রুত হ'য়েছিল নিজের ষ্টোভে চা সিদ্ধ ক'রে তাদের খাওয়াবে। কিন্তু তৃষিত চাতকদের ভাগ্যে চা জুটলো না। এরা একটা ঠিকা চাকর নিযুক্ত করেছিল, সে লোকটার কোনো পাত্তা পাওয়া গেল না। নিচের ঠাকুর দালান হতে একটা মিশ্র শব্দ আসছিল।

বীর কল্যাণ উঠে দেখলে—নমিতার ঘর তালা বন্ধ। অঙ্গনের পাল একটু সরিয়ে দেখ্‌লে নীচে লোকজন জড় হয়েছে। বাঙ্‌লা-দেশের সার্ব্বজনীন পূজায় ছেলের পাল চীৎকার করে। ধর্ম্মশালায় বাঙ্গালীর ছেলে ছিল না। কাজেই পূজার দালান তাদের শব্দ-মুখর নয়।

অমিয় বল্লে—কী হ'ল? চায়ের কোনো সন্ধান পেলে!

কল্যাণ বল্লে—চা তিনের মিলন, চা, চিনি, দুধ। তাদের তো সন্ধান নাই। যে চা করবে সেও উবে গেছে।

—বল কি?

—বলব আর কি? এক নম্বর ঘরের নাকে নোলকের মত এক প্রকাণ্ড তালা ঝুলছে।

অমিয় বল্লে—মাষ্টার মশায়ের স্ত্রীই তাকে ভাগালেন। আই-বুড়ো মেয়ের মাথায় সিঁদুর ঘষে দিলে কি আর সে থাকে।

কল্যাণ বল্লে—কেন ব্রাদার, তুমি তো তার ভয়ে বেছে বেছে স্বপন দেখছিলে। কল্যাণীর মুখ লম্বা হ'য়ে গেছে। তুমি কুঁকড়ে জিলিপির মত পাক খেয়ে গেছ, তোমার কাঁধে কে জল-বিচুটি—

অধীর অমিয় বল্লে—সে কথা নয়। একজন লোক আমাদের সঙ্গে এলো, হঠাৎ উবে গেল, খোঁজ নেওয়া উচিত না?

কল্যাণ বল্লে—দেখ অমিয়, প্রভাতে উঠে এক পেয়ালা চা' না খেতে পেলে আমার মেজাজ জাহান্নমে যায়। তোমার দরদী প্রাণ। আবশ্যক হয়, পুলিসে খবর দাও। যাবার পথে ঐ হোটেলওয়ালাকে বোলো আমায় এক পেয়ালা চা দিয়ে যাবে।

অমিয় বল্লে—সে তোমার স্ত্রী। বদনাম তোমার হবে।

এবার কল্যাণ রেগে উঠ্‌লো। তর্কের লগ্নজ্ঞান নাই বন্ধুর।

সে কাচা আঁটতে আঁটতে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামবার পথে প্রথম সাক্ষাৎ পেলে প্রফেসার কৃষ্ণ সেনের। ভদ্রলোক একেবারে ভোল্ বদলে ফেলেছেন। কলিকাতায় তিনি অধিকাংশ সময় সাহেবী পোষাক পরেন, খাদ্যাখাদ্য-বিচার নিয়ে নিজের দেহের প্রতি অবিচার করেন না। সুবোধ বালকের মত যা' পান তা খান—অবশ্য পান সম্বন্ধে বিশেষ নিয়মাধীন। এমন কি গাছের পান-খাওয়াও পানদোষ মনে করেন। এ হেন অধ্যাপক গরদের কাপড় চাদরে দেহসজ্জা করেছেন। কপালে সাদা চন্দনের উপর রক্ত-চন্দনের ফোঁটা। কাঁধে চাদরের ফাঁকে ফাঁকে ধবধবে যজ্ঞোপবীতের জ্যোতি পরিদৃশ্যমান।

—এই যে স্যার।

—আরে চানটান কর। আজ যে নটার মধ্যে পূজা শেষ।

কল্যাণ বল্লে—আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার। নীচে দেখতে যাচ্ছি পূজার দালান।

প্রফেসার বল্লে—দেখ্‌তে হবে না। এক মহা-পণ্ডিত পূজায় বসেছেন—বিভূতি ন্যায়াচার্য্য। ওর বাপজ্যাঠা দারুণ পণ্ডিত।

কল্যাণ উপলব্ধি করলে, তাঁদের পাণ্ডিত্য অপেক্ষা তার নিজের চায়ের তৃষ্ণা দারুণ।

—হ্যাঁ, স্যার—ব'লে সে দ্রুত নেমে গেল নীচে।

আঃ গেল! পালাবে কোথা?

প্রাতঃস্নান করে পৃথ্বীদেবীর সঙ্গে গল্প করছিল নমিতা ঠাকুর-দালানে। গরদের সাজ, ভিজে কোঁকড়া চুলের অর্দ্ধেকটা অবগুণ্ঠনের ভিতর হ'তে বেরিয়ে কাঁধ উত্তীর্ণ করে বুকের উপর পড়েছে। আজ সিঁথির সিঁদুর আরও উজ্জ্বল।

পৃথ্বীদেবী ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে বল্লেন—নমিতা কেমন সুন্দর সব আলপনা দিয়েছে।

কল্যাণ প্রকাশ্যে বল্লে—হ্যাঁ মন্দ না।

কিন্তু অন্তরে বল্লে—তার চেয়ে প্রভাতের এক পেয়ালা চা তৈরি চারু-শিল্প।

নমিতা যেন তার প্রাণের কথা শুনতে পেলে। তাড়াতাড়ি তার কাছে এসে বল্লে—চায়ের জন্য মেজাজ বিগড়েছে বুঝি?

—বিলক্ষণ। মায়ের সেবা। হ্যাঁ তবে একটু হ'লে হ'ত।

ঠিক সেই সময় ধর্ম্মশালার হোটেলের ছোকরা একখানা ট্রেতে চা নিয়ে উপরে উঠ্‌ছিল।

নমিতা হেসে বল্লে—ঐ চা' যাচ্ছে। উপ-দেবতার ভোগের আয়োজন না ক'রে কি আর দেব-সেবায় মন দিয়েছি?

বেলা ১০টা অবধি পূজা হ'ল। বারোয়ারী পূজা, বারো জন ইয়ার না হ'লে হয় না। পূর্ব্ব রাত্রের যুবকেরা শুদ্ধাচারে মাতৃ-পূজায় লাগলো। আরো তাদের দলের তরুণেরা এলো—রাম মল্লিক, মন্মথ। এদের মুরুব্বি শম্ভুবাবুর জোর গলা। চাকরগুলা শশব্যস্ত হ'ল।

কিন্তু শ্রীমতী নমিতা চৌধুরী ভক্তিভরে পূজার আয়োজনে আত্ম-নিবেদন করলে। শ্রীমতী পৃথ্বীদেবী সেকালের লোক, আড়াল হ'তে পূজার পুলক-শিহরণ অনুভব করলেন। যুবকেরা স্নেহ-তৃপ্ত হ'ল—কিন্তু সহায়তা পেলে অধ্যাপকের। প্রৌঢ় নূতন বল আনলে তাদের মাঝে—কারণ মানুষটা পাগলাটে, যখন যা' করে, আত্মহারা হ'য়ে সেই কাজে আত্ম-নিবেদন করে। তরুণেরা তার সঙ্গে সুখ পায়, কিন্তু ভয়ও পায় পাছে মা দুর্গার দশ হাতের উপর একটা লেকচার শুনতে হয়। পুরোহিত স্মায়াচার্য্য, তাঁর তন্ত্রধারক অগ্রজ হেমেন্দ্র, অধ্যাপকের হট্ ফেবারিট—কারণ তাঁর পাণ্ডিত্যের উত্তরাধিকারী। তাঁদের একটি ছাত্র যেন মশায়কে বিমোহিত করলে।

কলিকাতার তরুণযুগল মন্ত্রণা সভায় আলোচনা করলে—বর্ত্তমান পরিস্থিতি।

অমিয় বল্লে—কিছু বোঝা যাচ্ছে না, কোথায় গিয়ে পড়ছি। কিন্তু মিস নমিতা—

বাধা দিয়ে কল্যাণ বল্লে—এই! মিসেস্ চৌধুরী।

অমিয় বল্লে—শেষ অবধি দু'নম্বর মিসেস্ না হয়। কিন্তু দেখ কল্যাণ, ব্যাপারটার মাঝে রহস্য আছে।

—থাকে থাক্। এ দেশে তো আমরা ভক্ত পরিবার ব'লে প্রশংসা পেলাম।

অষ্টমীর দিন কল্যাণ আরও প্রশংসিত হ'ল! কারণ উদ্যোগী তরুণেরা অষ্টমীর দিন অক্লান্ত পরিশ্রমে দরিদ্রনারায়ণের সেবা করলে। নিমাই, রামচন্দ্র, হরিচরণ, রাখাল, সরল—নিমাই অবশ্য স্যাণ্ডোর ছোট ভাই। সন্তোষ অক্লান্তকর্ম্মী। ডাক্তার হোমিওপ্যাথিক আকারে বচন দেয়, তাতে এরা অনুপ্রেরণা পায়। পটোল সঙ্ঘপতি, শম্ভু হুকুম দেয়, মন্মথ অল্প শ্রমের কাজ করে। সবাই মিলে এরা দরিদ্রনারায়ণের সেবা করলে। কল্যাণ অবাধে এদের সঙ্গে মিশে গেল। কিন্তু অমিয় পারলে না। তার চিত্তের পটভূমিতে ছিল শঙ্কার বিভীষিকা। মাষ্টার মশায়ের কিছু করবার মত দেহের বল নাই। তাঁর সহযোগিতা যুবক-সঙ্ঘের হ'ল মনোরম অনুপ্রেরণা।

নবমীর দিন বিজয়া। সেদিন বিসর্জ্জনের প্রাক্কালে অমিয় ও কল্যাণকে আড়ালে ডেকে প্রফেসার বল্লে—পূজার হাঙ্গামাটা কাট্‌লে, আর একটা হাঙ্গামা আছে।

অমিয় বল্লে—আমি স্যার পরশু চলে যাব।

—কিন্তু লোকটার শাস্তি আবশ্যক।

শাস্তি! লোকটার! কে সে দুর্বৃত্ত?

পৃথ্বীদেবী ধীরে ধীরে বোঝালেন। একটা লোক ক্যামেরা নিয়ে ঘোরে। সুবিধা পেলেই নমিতার ছবি তোলে। তিনি যখন নমিতাকে নিয়ে গঙ্গার ধার হ'তে অষ্টমীর দিন ফিরছিলেন, সে লোকটা ছবি তুলেছে। এমন কি পূজার দালানেরও ছবি নিয়েছে।

প্রফেসার সেন বল্লেন—কথাটা এদের বলিনি। নিমাই বলবান। স্ত্রীজাতিকে শ্রদ্ধা করে। ধরলে তাকে নিগ্রহ কর্ব্বে, টিপে মারবে।

অমিয়র বুকটা কেঁপে উঠ্‌লো। কল্যাণ মুখখানা গম্ভীর ক'রে বল্লে—হ্যাঁ, হরিচরণের কথায়, বড়ি জোড়সে ওটাকে ওরা ঘায়েল করবে। প্রথমে আমরা তাকে ধরব। তার পর এদের হাতে দ'ব।

রাত্রে যখন বজরার উপর প্রতিমার পদপ্রান্তে তারা সদলবলে বসেছিল, পৃথ্বীদেবী কল্যাণকে বল্লে—ঐ দেখ বাবা।

সন্তোষ বলে উঠলো—আমাদের আলো খুব জোর হ'য়েছে। ঐ দেখ লোকে ছবি তুলছে।

রামচন্দ্র বল্লে—মশায় দাঁড়ান। চেহারাটা ঠিক্ ক'রে নি। মাগো! যেন কার্ত্তিকটির মত আমায় দেখ্‌তে হয়।

হরিচরণ বল্লে—বড়ি জোর রসনি হ'য়েছে।

কিন্তু কলিকাতার বন্ধুযুগল দেখবার পূর্ব্বেই লোকটা ঘোঁড়া-ঘাটের ভিড়ের মধ্যে লুকিয়ে গেল।

রাত্রে বন্ধু দু'জন আলোচনা করলে।

অমিয় বল্লে—ব্যাপারটা যেন রহস্যময়।

—হ্যাঁ সেই রকম একটা কিছু হওয়াই সম্ভব।

তার পর সুর ক'রে কল্যাণ বল্লে—ডুবেছি না ডুবতে আছি, পাতাল কত দূরে দেখি।

—তুমি ডুববে—ব'লে পাশ ফিরলে অমিয়।

শেষে ঠিক হল একদিন পরে তারা চলে যাবে। নমিতাকে মোগলসরাইয়ে কানপুরের ট্রেণে চড়িয়ে দেবে। বেনারস হতে অমিয় সোজা লক্ষ্ণৌ যাবে। কল্যাণ অন্য ট্রেণে দিল্লি যাবে। এখানে কেহ সন্দেহ করবে না। তারপর যা করেন মা জগদম্বা!

কিন্তু পরদিন গণ্ডগোলের দেবতা যেন আর একটু মজার খেলা খেললেন।

তারা নৌকায় চড়ে হরিশ্চন্দ্রের ঘাট পেরিয়ে যখন শিবালয় ঘাটের কাছে পৌছল, চাতালের উপর একটি যুবক দৃষ্ট হল। সে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে এদের দেখছিল।

—কে ভদ্রলোক?—জিজ্ঞাসিল কল্যাণ।

নমিতা তাকে দেখে দাঁড়িয়ে উঠ্‌লো। হর্ষে তার মুখ উৎফুল্ল হ'ল। সে চীৎকার ক'রে ডাকলে—দাদা, দাদা। নৌকা ভেড়াও। নৌকা ভেড়াও।

অমিয় কল্যাণকে বল্লে—কোমরটা বেঁধে নাও। একটা লড়াই অবশ্যম্ভাবী। লোকটা বলবান।

কল্যাণ বল্লে—নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিয়েছি—মার অমনি পড়ে আছে—দরকার হয় নিমাই-সন্তোষ কোম্পানীকে ডাকব।

জগদ্ধাত্রী পূজা অবধি কোনো ঝঞ্ঝাট হ'ল না। অমিয় লক্ষ্ণৌতে মিলনসুখের মাঝে কাশীবাসের বিভীষিকা দেখত।

কলিকাতায় ফিরে একদিন কল্যাণ বল্লে—অমিয়, কাল মা বাবা কেহ ঘরে থাকবে না। তাদের ভয়ে আমরা নবীনভাবে

মিশতে পারি না, কাল তোর কল্যাণীকে নিয়ে আমাদের বাড়ি চল—আমার স্ত্রীর সঙ্গে তোর আলাপ করে দেব।

—কোন্ নম্বর?

কল্যাণ বল্লে—চুপ! চুপ! নবীন জগতে বহু বিবাহ নাই। কল্যাণীকে বলিসনি তো।

অমিয় বলে—পাগল?

যেদিন তারা সান্ধ্য-ভোজনে গেল, কল্যাণীর সঙ্গে অমিয়া তার দাদার পরিচয় ক'রে দিলে। ভদ্রলোকের নাম সুধীর রায়। সে তাদের দুই বন্ধুর ফটোগ্রাফ তুললে। কারণ সুধীরের সখের খেয়াল আলোক-চিত্র।

তার শিল্পের আরও নমুনা পেলে সমবেত বন্ধুমণ্ডলী যখন সে সন্ধ্যার পর তাদের ছায়াচিত্র দেখালে কল্যাণদের বিস্তৃত ড্রয়িং রুমে। তারপর কল্যাণী ও অমিয়া—অমিয় ও কল্যাণের সাথে পরিচিত হবে। সরমের জড়তাটা একত্র চলচ্চিত্র দেখলে কেটে যাবে।

ছায়াচিত্রের নাম—আলোর খেলা।

প্রথম দৃশ্য—দুই রমণী বন্ধু। অবাক চিত্র। চিত্রে লিখিত বর্ণনা। "প্রথম বন্ধু—আমার স্বামী খাঁটি সোনা—সিভালরীর দাবী মানে না। দ্বিতীয় বন্ধু—মুখের বড়াই পুরুষ-ধর্ম্ম।"

অমিয় দাঁড়িয়ে উঠলো। কল্যাণ হাত ধরে তাকে বসালে।

কল্যাণী বল্লে—তাই বুঝি আমাদের ছবি তোলা হ'ল?

অমিয়া বল্লে—দাদার খেয়াল। তোমার স্বামীকে নিয়ে একটু রঙ্গ করলেন।

তার পরের দৃশ্য দেখে অমিয় কল্যাণকে একটা ঘুষি মারলে। সে হাসলে। কিছু বল্লে না।

দৃশ্য বাঁকুড়া ষ্টেশন। ট্রেণের ধারে দুই বন্ধু দাঁড়িয়ে। নমিতা এলো। কথাবার্ত্তা হ'ল। করজোড়ে অমিয়। লেখা দেখা গেল পটে—"আশ্রয় ভিক্ষা। সাদর আমন্ত্রণ"।

তারপর ধানবাদ। গয়ায় অমিয়র পয়সায় চুড়ি কেনা, মোগলসরাইয়ে একত্র ভোজন ইত্যাদি। বারাণসী ষ্টেশনে গবেষণা, গঙ্গাস্নানের পর নমিতা ও পৃথ্বী দেবী, পূজা বাড়ি, প্রফেসার সেন, দুর্গা পূজা, কাঙালী ভোজন ইত্যাদি ইত্যাদি। চিত্রের বাহাদুরী এই যে, যে সব স্থলে কল্যাণকুমার নমিতার সঙ্গে অধিক বন্ধুত্ব দেখায়, সেই ঘটনাগুলি ফুটে উঠেছে। অবশ্য নমিতা, অমিয়া স্বয়ং।

অমিয়া বল্লে—দেখছ তো ভাই। তোমার ওঁর কীর্ত্তি। আমাকে অসহায় ভেবে সত্যি খুব যত্ন করেছেন।

—ছবি নিলে কে?

—আবার কে? যড়যন্ত্রে আমাকেও দাদা আর উনি টেনেছিলেন। লুকিয়ে লুকিয়ে দাদা আমাদের ছবি নিতেন। কিন্তু মাষ্টার মশায়ের স্ত্রী ঠিক ধরে ফেলেছিলেন। পাকা গৃহিণী, ভারি দরদী। আমি আমার দিদির কাছে বাঁকুড়ায় ছিলাম।

শেষ চিত্রে আবার অমিয়া ও কল্যাণী—লেখা—"নমিতা—কেমন ভাই আলোর লেখা? কল্যাণী—সুস্পষ্ট। কিন্তু পরাজয় আমার নয় ওঁর। যখন ঘরে আলো জ্বললো, তখন অমিয়কে কেহ খুঁজে পেলে না। (সমাপ্ত)

ভক্ত

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

ভক্তের নাই বিনাশ, ভক্ত ধ্বংস হবার নয়,
যুগ যুগ ধরি আসিতেছে শুধু তাহারি যে পরিচয়।
তাহার কথাই শুনিয়া তৃপ্তি,
দুখে-সান্ত্বনা—আঁধারে দীপ্তি,
কেবল তাহারি মহিমা কীর্ত্তি, জানে না কো অপচয়।

২

ভক্ত যা বলে তাহাই সত্য, তীর্থ যেখানে থাকে।
চঞ্চল হয় স্বর্গ মর্ত্ত মুহূর্ত্তে তার ডাকে।
সেই খেলা করে ভগবানে লয়ে,
ধরা করে ধনী—রহে দীন হয়ে,
এই পৃথিবীকে গৌরবময়ী সেই শুধু করে রাখে।

৩

সব ত্যাগ করি এক লয়ে থাকে তাহাতেই মিলে সব।
শ্রবণে সদাই বংশীর সাড়া—হৃদয়ে মহোৎসব।
তার চক্ষেতে সবই মন্দির
হরি-চরণামৃত সব নীর,
সকল গন্ধ তার কাছে হরি অঙ্গের সৌরভ।

৪

তাহার দুঃখ, দীর্ঘশ্বাস, লাঞ্ছনা অপমান,—
রচে মেঘ, আনে অমৃতবৃষ্টি ভুবন জুড়ানো দান।
বিষ সুধা হয় পরশে তাহার,
পদে লুয়ে পড়ে উচ্চ পাহাড়
সাগর তাহারে বুকে লয়ে নাচে, করে তার জয় গান।

৫

নব রূপ দেয় সেই নারায়ণে—রাঙায় বসুন্ধরা,
দলে দলে আসে অমৃতযাত্রী তার আহ্বানে ত্বরা।
কাল স্রোত যায় সব ধুয়ে লয়ে,
সে রয় উজ্জল অক্ষয় হয়ে,
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বজ্যেষ্ঠ জানে না মৃত্যু জরা।

৬

অবিনশ্বর ভক্ত তাহার শক্তি অলৌকিক,
তাহারি দানেতে জগৎ পুষ্ট সে ফেরে মাগিয়া ভিখ্।
জমাট বাষ্পে বিদ্যুৎ আনে,
নব জীবনের মন্ত্র সে জানে।
সব চেয়ে বীর, সব চেয়ে ধীর, সব চেয়ে নির্ভীক।

৭

দেয় নব শোভা, নব মাহাত্ম্য পত্রে পুষ্পে জালে,
বাঞ্ছাকল্পতরু সাথে যোগ, তার ইচ্ছাই ফলে।
সেই সে মহৎ রচে ধ্রুবলোক
পুণ্যপুঞ্জ—পুণ্যশ্লোক,
তাহার হাস্তে রবি শশী হাসে, রোদনে পাষাণ গলে।

৮

সবচেয়ে মানী সবচেয়ে জ্ঞানী, ধরণীর বিস্ময়!
বক্ষে তাহার বিশ্বম্ভর জয় জয় তারি জয়।
ভাব বন্যায় ভুবন ভাসায়,
পরমানন্দে কাঁদায় হাসায়,
তাহাকেই ঘিরে চলে বিচিত্র সৃষ্টি স্থিতি লয়।

শতাব্দীর শিল্প—রিভেরা

শ্রীঅজিত মুখোপাধ্যায় এম-এ (লণ্ডন), এফ-আর-এ-আই (লণ্ডন)

"I was not one of those fools who are capable of producing something rather graceful but entirely without significance." পৃথিবীর যে চারজন শিল্পী ফরাসী শিল্পাদর্শ সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করে শিল্পকে সমাজচ্যুত হতে দেননি তাদের মধ্যে মেক্সিকোর বিখ্যাত শিল্পী ডিয়েগো রিভেরা একজন।

যখন গ্রস্ গত মহাযুদ্ধে জার্মাণীর অবস্থা জনসাধারণের সম্মুখে তুলে ধরেছিলেন, যখন অজ্ঞাত অখ্যাত শিল্পী বেণ্টনের হাতে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সামাজিক ইতিহাস ফুটে উঠছিল তখন মেক্সিকোর দুজন শিল্পী দেশের বিপ্লব আন্দোলনে যোগ দিয়ে এক অভূতপূর্ব্ব প্রাচীর চিত্র আঁকতে সুরু করে দেন। তাদের দেশের মানুষদের দুঃখ দুর্দ্দশার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হওয়ার ফলে শিল্পী দুজনের হাতে ফুটে উঠল এক জীবন্ত প্রাচীরগাত্র চিত্র। রিভেরাই এই দুজন শিল্পীদের মধ্যে একজন।

শিল্পজগতে যখন রিভেরার প্রবেশ তখন বিলাসীদের মনস্তুষ্টির জন্যে যুবক শিল্পীরা শিল্পে সৌখীনতার পথ অবলম্বন করেন। কিন্তু রিভেরা বহু বাধা বিপদ সত্ত্বেও এর বিরুদ্ধে ঘোষণা জানালেন এই বলে—যে শিল্পে কোন বুজরুকির স্থান নেই ; যে শিল্প মানুষের এবং সমাজের সঙ্গে সম্বন্ধচ্যুত, শিল্পজগতে তা অভিনয় মাত্র। এই বিদ্রোহে রিভেরা প্রথম সত্যিকারের ধাক্কা পেলেন যখন ডেট্রয়টের "ইন্‌ষ্টিটিউট্ অফ্ আর্ট"এর প্রাচীর চিত্র আঁকার জন্যে তাঁকে ডেকে পাঠান হল। রিভেরার অঙ্কিত গাত্রচিত্রগুলি গতানুগতিক তথাকথিত সুন্দর চিত্রগুলির অনুকরণ ছিল না— যা ধনতান্ত্রিকদের খুসী করতে পারে। যদিও ইজেল ফোর্ড রিভেরার প্রাপ্য অর্থ চুকিয়ে দিলেন কিন্তু একটা চাপা বিদ্রোহের ভেতর দিয়েই রিভেরাকে নিউইয়র্ক ত্যাগ করতে হল।

শিল্পে গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে রিভেরা সম্পূর্ণভাবে বিদ্রোহ করে বসলেন যখন পুনরায় "রকফেলার সেণ্টারের" গাত্রচিত্রগুলির অঙ্কন শেষ হতে না হতেই তাঁকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। রিভেরা অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত বেরিয়ে এলেন— তীব্র ও প্রখর। তিনি পরিষ্কার বুঝতে পারলেন শিল্পে এই ভেদাভেদ মধ্যবিত্ত মনোবৃত্তি নিস্তেজহীন সমাজের একান্ত পরিণাম। রিভেরার এই উক্তি দাম্ভিকতাপূর্ণ নয় ; এর মধ্যে প্রকাণ্ড সত্য নিহিত আছে। যে সমাজে ধনীরা একচ্ছত্রাধিপতি, কৃষক মজুরেরা উৎপীড়িত, যেখানে সয়তান ও ধাপ্পাবাজীদের কারবার চলেছে সেই সমাজে সৎভাবে জীবনধারণ অসম্ভব এবং শিল্প নিম্নস্তরে নেমে আসতে বাধ্য।

অন্যদিকে যে সমাজ মানুষকে উন্নত করে, সংস্কৃতিকে ভালবাসে, সেই স্বার্থহীন, দ্বন্দ্বহীন সমাজের আশ্রয় পেতে রিভেরা মনযোগী হয়ে



জনমজুরদের সেবায় শ্রম-শিল্প



জুনিটা রোমা

উঠলেন। পৃথিবীতে একমাত্র গণতান্ত্রিকতাই এই ব্যবধানের সমাধান করতে পেরেছে বলে রিভেরা কম্যুনিষ্ট আদর্শে অনুপ্রাণিত হল। আধুনিক ও পুরাতনপন্থীদের অঙ্কন পদ্ধতির সঙ্গে নিজেকে ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত করে রিভেরা যখন ইউরোপ ঘুরে দেশে ফিরে এলেন তখন মেক্সিকোতে এমন কি আমেরিকার মধ্যেও



কম্রেড



ধনতান্ত্রিকতার চাপে পৃথিবী

রিভেরার নাম একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী হিসেবে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

অল্পদিনের মধ্যেই রিভেরা এক নূতন পদ্ধতিতে ফ্রেস্কো চিত্রাঙ্কণে দক্ষ হয়ে উঠলেন ; তাঁর চিত্রগুলি তুলির টানের ছন্দে এক অনবদ্য রূপ পেল। কিন্তু একদিকে যেমন তাঁর প্রতিভা ফুটে উঠল সৃষ্টির আনন্দে,



বিকাশ

তেমনি দেশব্যাপী আন্দোলন সুরু হল রিভেরার প্রাচীর চিত্রের নূতন ছন্দের বিরুদ্ধে। মেক্সিকোর যেসব বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানে রিভেরার ফ্রেস্কোগুলি ছিল সেগুলি তুলে ফেলবার নানারূপ ফন্দীর ব্যবস্থা চলল। দেশের প্রেসিডেন্ট থেকে সুরু করে স্কুলের ছাত্ররা এই আন্দোলনে যোগ দেয়। "শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের" বিখ্যাত চিত্রগুলির ওপর ছাত্ররা ছুরী দিয়ে দেওয়ালে দাগ কাটল, নাম কুঁদল। খবরের কাগজে রিভেরাকে "হনুমান" আখ্যা দিয়ে হাজার হাজার প্রবন্ধ ছাপা হল। লোকের মুখে ঐ একই কথা, রিভেরার ছবি কুৎসিত, তাঁর আঁকা নরনারী দেখতে কদর্য্য, তিনি ছবি আঁকতে জানেন না, মেক্সিকোর নাম একেবারে ডুবল। "Departn.ent of Fine Arts" থেকে বলা হল রিভেরার ছবিগুলি চূণকাম করে দেওয়া হোক, মেক্সিকোর শিল্পে ওসব জনমজুরদের বিষয়বস্তুর স্থান নেই। এমন কি প্রসিদ্ধ রঙ্গমঞ্চে রিভেরাকে ব্যঙ্গোক্তি করে অভিনয় চলল এবং জনসাধারণকে সাবধান করে দেওয়া হল যেন তারা ঘর সামলে রাখে, নতুবা রিভেরার হস্তে পড়ে সবাই কুৎসিত হয়ে উঠবে।

এই বিরুদ্ধ আন্দোলনে রিভেরা কিন্তু মোটেই দমে পড়লেন না। বরঞ্চ যেদিন এক বিরাট সভায় তাঁর চিত্রগুলির সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করা সাব্যস্ত হল সেদিন থেকে রিভেরা প্রতিজ্ঞা করলেন যে শিল্পজগতে তাঁর প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি এই অবিচারের বিরুদ্ধে অভিযান করবেন।

রিভেরা তাঁর ছবির ভেতর দিয়ে প্রচণ্ড প্রতিবাদ জানিয়ে চারিদিকে জনমজুরদের গান ছড়িয়ে দিতে লাগলেন। তাঁর শিল্প বলে উঠল বিদ্রোহের জয়ধ্বনি, তাঁর রেখার টানে ফুটে উঠল শিল্পে এক সাহসিক প্রলেপ ও স্পষ্ট ভাষা। এই সময় রিভেরা "মেক্সিকোর নরনারী ও পৃথিবী" প্রাচীর চিত্রখানি এঁকে শিল্পজগতে এক বিস্ময় এনে দিলেন। সমগ্র আমেরিকায়, এমন কি ইউরোপের মধ্যেও চিত্রখানির সমতুল্য আর নেই। শিল্পজগতে অবশেষে রিভেরার জয়জয়কার সুরু হল। সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তিকে প্রতিহত করে যশ ও খ্যাতি তিনি প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হলেন। প্রতিভার এই উচ্চশিখরে যখন রিভেরা তখন এই বিদ্রোহী শিল্পী জীবনের সর্ব্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার জন্যে মস্কোর দিকে রওনা দিলেন। মস্কো তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা করে নিল।

রিভেরা যখন সোভিয়েট মাটিতে পা দিয়েছেন তখন মস্কোতে অক্টোবর বিদ্রোহের দশম সমাবর্ত্তন উৎসব চলেছে। তিনি ঘর থেকে দেখলেন ক্রেমলিনের উচ্চ-শিখর আর লালফৌজের কুচকাওয়াজ, সারাদিনব্যাপী লক্ষ লক্ষ নরনারীর আনন্দ কোলাহল। বিমুগ্ধ শিল্পী নোটবুকে দৃশ্যগুলির 'স্কেচ' তখনই করে ফেললেন এবং সবচেয়ে আশ্চর্য্য হলেন তাঁর এই ছবিগুলির খবরের কাগজে প্রকাশ এবং তাঁর সম্বর্দ্ধনার বিরাট আয়োজন দেখে।

নানাভাবে চারিদিকে রিভেরার চিত্রগুলির প্রশংসা ও সমালোচনা বের হতে লাগল। সোভিয়েট সরকার মস্কোর বহু জাতীয় প্রতিষ্ঠানে ফ্রেস্কো আঁকার জন্যে রিভেরাকে সাদরে আহ্বান করলেন। তরুণ শিল্পীরা রিভেরার চিত্রাঙ্কনে সহজ সরল পদ্ধতিতে যেমন আকৃষ্ট হয়ে পড়ল তেমনি প্রৌঢ়েরা বিরুদ্ধ সমালোচনাও সুরু করে দিলেন। সোভিয়েট ভূমিতে যে কোন ব্যক্তি তার স্বাধীন মনোভাব ব্যক্ত করতে পারে তাই রিভেরা গর্জ্জে উঠে প্রৌঢ়দের বললেন, "Look at your icon painters and at the wonderful embroideries and lacquer boxes and wood carvings and leather-work and toys. A great heritage which you have not known how to use and have despised."

এই কঠোর উক্তি সত্ত্বেও সোভিয়েট ইউনিয়নের যাবতীয় সম্মান মাথায় নিয়ে রিভেরা দেশে ফিরে এলেন। মেক্সিকোতে ট্রট্স্কির সঙ্গে তাঁর ভাব হল এবং ফ্রিডা নাম্নী এক সুন্দরীর ভালবাসায় পড়লেন। ফ্রিডা রিভেরার ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ জীবনকে তার সহজ সরল ব্যবহারে শান্ত ও সুন্দর করে তোলে এবং রিভেরা ফ্রিডাকেই তাঁর জীবনসঙ্গিনী রূপে গ্রহণ করেন। এই সময় থেকে শেষ পর্য্যন্ত তিনি গঠনমূলক কাজে জীবন উৎসর্গ করেন এবং রিভেরা "San Carlos Academy of Fine Arts"এর ডিরেক্টর হয়ে শিল্প শিক্ষায় গতানুগতিক পন্থা ভেঙেচুরে এক নূতন ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করেন।

রিভেরার বিরুদ্ধে পুনরায় আন্দোলন সুরু হল কিন্তু তিনি এবার রইলেন শান্ত ও ধীর। উত্থান পতনের ভেতর দিয়ে ধাক্কা খেতে খেতে রিভেরা যথেষ্ট শক্তি অর্জ্জন করেছেন এবং নিজের প্রতিভায় ওপরও তত বিশ্বাস জন্মেছে। মেক্সিকো তাঁকে বিদায় দিল কিন্তু আমেরিকার বিভিন্ন জায়গা থেকে তাঁর ডাক পড়ল। যুক্তরাষ্ট্রের বহু বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের গাত্র চিত্রগুলি তিনি এঁকে দিলেন এবং সুখ্যাতিও পেলেন প্রচুর, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিরুদ্ধ আন্দোলনও আবার মাথা তুলে দাঁড়াল।



নারী

দুঃখ কষ্টের ভেতর দিয়ে, নিজের জীবনকে লাঞ্ছিত করে, ফ্রিডার জীবনকে আসন্ন করেও রিভেরা ফ্রেস্কোগুলির অঙ্কন শেষ করে আসেন এবং এর পর তিনি আর কোনদিনই গাত্র চিত্রে হাত দেন নাই।

নির্জ্জনতা এখন তাঁর ভাল লাগে। রিভেরা বেশীদিন এক জায়গায় থাকতে চাইতেন না। বিদ্রোহী শিল্পীর মন ছুটে চলে যায় দেশ-দেশান্তরে, লোকের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যে। শুধু সময়ের ফাঁকে ফ্রিডাকে নিয়ে ছোট ছোট স্কেচ ও ছবি আঁকাই রিভেরার এখন প্রধান কাজ।

যে জীবনে শক্তি, সামর্থ্য ছিল অথচ সেই শক্তি ও সামর্থ্যের অপচয় ঘটাতে যারা রিভেরাকে বাধ্য করেছে সেই কুৎসিত সমাজ, স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিদের বিচারের দিন কবে আসবে তাই ভাবি।

জঙ্গম

বনফুল

২৫

শঙ্করের সহিত তর্ক করিবার পর হইতে কুন্তলা মনে মনে কেমন যেন একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার কেবলই মনে হইতেছিল নিজের কাছেই যেন সে ছোট হইয়া গিয়াছে। কলেজের ডিবেটিং ক্লাবে সে তর্ক করিত—সেই অভ্যাসবশেই সেদিন সে নিজেকে সংযত করিতে পারে নাই। ভুলিয়াই গিয়াছিল কলেজের ডিবেটিংক্লাবে যাহা শোভন, শ্বশুর বাড়িতে তাহা শোভন নহে। তাছাড়া তর্ক করিয়া লাভ কি। তর্ক করিয়া কখনও কাহারও স্বভাব বা মত পরিবর্তন করা যায় না। মুখে স্বীকার করিলেও মনে মনে যে যাহা তাহাই থাকিয়া যায়। তর্ক করিয়া সময় নষ্ট হয়, নিজের মর্য্যাদাও নষ্ট হয়। কুন্তলা তর্ক করা ছাড়িয়া দিয়াছে। সুরমার সঙ্গেও আর সে তর্ক করে না। সে অনুভব করিয়াছে সুরমা তর্ক করে সত্য-উদ্ঘাটনের জন্য নয় তাহার গোঁড়ামিকে ব্যঙ্গ করিবার জন্য। সুরমা অবশ্য কোন অভদ্রতা করে না, কোন অপ্রিয় কথা বলে না। তাহার সভ্য শিক্ষিত আচরণে এমন কিছুই প্রকাশ পায় না যাহা লইয়া ন্যায়সঙ্গতভাবে রাগ করা চলে। কুন্তলার গোঁড়ামিতে সুরমা বিস্ময় প্রকাশ করে, প্রতিবাদ করিলেও এমন সুষ্ঠু সহাস্য ভঙ্গীতে করে যে তাহাতে সোজাসুজি অসন্তুষ্ট হওয়া যায় না। কিন্তু তাহার চোখের দৃষ্টিতে, হাসির টুকরায়, বিস্মিত ব্যাজস্তুতিতে যাহা প্রকাশিত হয় তাহা যে সূক্ষ্ম ব্যঙ্গই তাহা বুঝিতে কুন্তলার বিলম্ব হয় না। অনেক সময় সুরমা কুন্তলার কথায় সায়ও দেয় কিন্তু তাহা যেন বয়স্ক ব্যক্তির শিশুর অসঙ্গত কথায় সায় দেওয়ার মতো। কুন্তলা তাই আর তর্ক করে না। যাহা তাহার অন্তরের বস্তু, যাহাকে সে জীবনের আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, যাহার প্রতি সামান্যতম অশ্রদ্ধাও সে সহ্য করিতে পারে না তাহা লইয়া এই মূঢ়দের সহিত সে আর বচসায় প্রবৃত্ত হইবে না। টেনিস বল লইয়া লোফালুফি করা যায়, অন্তরের বেদনা লইয়া যায় না। আজকাল সুরমার সঙ্গ তাই সে এড়াইয়া চলিতেছে। তাহার ভয় হয় হয়তো কথায় কথায় এমন কিছু বলিয়া ফেলিবে যাহা তাহার আদর্শের পক্ষে গ্লানিকর। ইহাদের চক্ষে নিজের আদর্শকে সে কিছুতেই কোন কারণেই খাটো করিবে না। যে স্বার্থসর্বস্ব পাশ্চাত্য সভ্যতার মুখোস পরিয়া ইহারা নাচিয়া বেড়াইতেছে সে সভ্যতার অন্তঃসারশূন্যতাকে লইয়া ব্যঙ্গ করিতে যাওয়াটাও গ্লানিকর। ক্ষুদ্রকে ব্যঙ্গ করিতে গেলে নিজেকেও ক্ষুদ্রের পর্য্যায়ে নামাইয়া আনিতে হয়। একবার তাহার ইচ্ছা হইয়াছিল পাশ্চাত্য সভ্যতার যে অগ্রগতির প্রশংসায় সকলে পঞ্চমুখ সেই অগ্রগতির স্বরূপটা বিশ্লেষণ করিয়া প্রবন্ধ লিখিতে। ওদেশের মনীষা নানারকম আশ্চর্য্য যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছে সন্দেহ নাই, চমৎকৃত হইতে হয়। কিন্তু আরও চমৎকৃত হইতে হয় সে যন্ত্রের ব্যবহার দেখিয়া। ওই সব অদ্ভুত অত্যাশ্চর্য্য যন্ত্র লইয়া সকলে চুরি ডাকাতি রাহাজানি করিয়া বেড়াইতেছে। তা না করিলে অগ্রগতি হইবে কি করিয়া। কিন্তু প্রবন্ধ রচনা করিবার বসনাও সে ত্যাগ করিয়াছে। সে কিছুই করিবে না, কাহারও কথায় থাকিবে না, কাহারও সহিত মিশিবে না। অনাড়ম্বরে নিজের আদর্শকে অনুসরণ করিবে কেবল, আস্ফালন করিবার প্রয়োজন কি। সে স্বতন্ত্র, স্বতন্ত্রভাবে থাকিবে। হরিহর-পর্য্যন্ত কুন্তলার পরিবর্তিত আচরণে বিস্মিত। তাহার স্বামী-ভক্তি যেন বাড়িয়া গিয়াছে। প্রত্যহ স্বামীর পাদোদক পান করে। হরিহর প্রথমে একটু আপত্তি করিয়াছিল—কিন্তু তাহার আপত্তি টেকে নাই। সেদিন দ্বিপ্রহরে কুন্তলা নিবিষ্ট-চিত্তে বসিয়া নিপুণভাবে ছুরি দিয়া দাঁত খুঁটিবার খড়কে প্রস্তুত করিতেছিল। দুইবেলা আহারের পর হরিহরের খড়কে না হইলে চলে না। এতদিন ন্যাংড়াই খড়কে প্রস্তুত করিত, কোনটা বেশী সরু, কোনটা বেশী মোটা হইত। হরিহরের খুব যে একটা অসুবিধা হইত তাহা নয়, কোনদিন এ বিষয়ে কিছু বলেও নাই সে—তবু স্বামীর এতটুকু অসুবিধাই বা কুন্তলা হইতে দিবে কেন!

হরিহর আসিয়া প্রবেশ করিল।

"তোমাকে নেবার জন্যে উৎপলের বাড়ি থেকে গাড়ি পাঠিয়েছে—"

"আমি আর এখন যাব না"

"ওগুলো তো ন্যাংড়াও করতে পারে—তুমি ঘুরে এস না—"

কুন্তলা কোন কথা বলিল না, কেবল—যেমন তাহার স্বভাব—হাসিভরা চোখ তুলিয়া স্বামীর দিকে একবার চাহিয়া দেখিল মাত্র।

২৬

উৎপলের আজ জন্মতিথি। সমস্ত দিন শঙ্কর বাড়ি ছিল না। তাহাকে যাইতে হইয়াছিল লক্ষ্মীবাগে—মণির ব্যাপার তদন্তের জন্য। তাই দুপুরবেলা সে আসিতে পারে নাই। সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরিয়া দেখিল সুরমার চিঠি লইয়া একজন চাকর তাহার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। চিঠিতে তেমন বিশেষত্ব কিছু ছিল না। সাধারণ কাগজে সংক্ষিপ্ত নিমন্ত্রণ লিপি।

শঙ্করবাবু,

আজ আপনার বন্ধুর জন্মদিন। দুপুরে তো আপনাকে পাওয়াই গেল না। অমিয়া একা মেয়ে নিয়ে এসেছিল। আপনি সন্ধ্যায় এখানে নিশ্চয়ই আসবেন, রাত্রে আমাদের এখানেই খেয়ে যাবেন। আসবেন কিন্তু নিশ্চয়। আপনার জন্য অপেক্ষা করব আমরা। ইতি—সুরমা

সেদিনের পর হইতে শঙ্কর আর উৎপলের কাছে যায় নাই। উৎপলের আজ যে জন্মদিন সে কথাও তাহার মনে ছিল না। চিঠিটার দিকে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তাকাইয়া থাকিয়া এ সঙ্কল্পও সে একবার করিল যে যাইবে না। কিন্তু পরক্ষণেই আবার মনে হইল,

না গেলে ব্যাপারটা আরও দৃষ্টিকটু হইয়া উঠিবে। তাছাড়া না যাইবার কোন সঙ্গত কারণ তো নাই। একা একা বাড়িতে বসিয়া কি করিবে এখন? অমিয়া বাড়ি নাই। দাইটা বলিল খুকীকে লইয়া স্যানিটেশন বিভাগের চৌধুরীদের বাড়িতে বেড়াইতে গিয়াছে সে। চৌধুরীর স্ত্রীর সহিত তাহার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব, প্রায়ই সেখানে যায়। সুরমা কুন্তলা অথবা হাসির সহিত তাহার তেমন ভাব নাই, যত ভাব চৌধুরীর স্ত্রীর সহিত! শঙ্কর বাড়ির ভিতরে জামা বদলাইবার জন্য একবার ঢুকিল। ঘরে তালা বন্ধ—সমস্ত বাড়িটা যেন খাঁ খাঁ করিতেছে। সমস্ত বাড়িটাই যেন ফাঁকা হইয়া গিয়াছে। ছোট্ট দুইটি প্রাণী কিন্তু সমস্ত বাড়িটাকে যেন পূর্ণ করিয়া রাখে। মুশাই বাহিরের ঘরে ষ্টোভ জ্বালিয়া চা করিয়া দিল। চা পান করিয়া শঙ্কর ঠিক করিয়া ফেলিল যাইবে। মনটা তবু একটু খুঁত খুঁত করিতে লাগিল। সেদিনের ওই হাস্যজনক কাণ্ডের পর সহজভাবে উহাদের সম্মুখে সে যাইবে কি করিয়া। সেদিন তাহার অন্তরের অন্তস্তল হইতে যাহা উৎসারিত হইয়াছিল তাহা যুক্তির আলোকে আজ তাহার নিকটও হাস্যজনক বলিয়া মনে হইতেছে!

সূর্য্যালোক-স্পর্শে কুয়াসা যেমন বিলুপ্ত হয়, সুরমার হাসির স্পর্শে শঙ্করের মনের সমস্ত গ্লানি তেমনি নিমেষে মুছিয়া গেল যেন! অতিশয় তুচ্ছ কারণে সহসা-উদ্দীপ্ত-উত্তেজনায় উৎপলের সহিত তাহার যে মনোমালিন্য ঘটিয়া গেল বলিয়া শঙ্করের ধারণা হইয়াছিল এবং যে ধারণাকে কেন্দ্র করিয়া তাহার মন অস্বস্তিতে আশঙ্কায় বিতৃষ্ণায় ক্ষোভে সম্ভব-অসম্ভব নানা কাল্পনিক বিভীষিকা সৃষ্টি করিতেছিল তাহা নিঃশেষে অবলুপ্ত হইয়া গেল স্মিতমুখী সুরমার সানন্দ অভ্যর্থনায়।

"আসুন—"

একটি কথা মাত্রই সুরমা বলিল। কিন্তু তাহার আলোকিত দৃষ্টি, হাস্যোজ্জ্বল অধর, অভ্যর্থনার প্রসন্ন ভঙ্গিমায় যাহা প্রকাশ পাইল তাহাতে তাহার মনের গ্লানিই শুধু মুছিয়া গেল না, মনে রঙও ধরিয়া গেল। যে বীণার তার বহুকাল অনাহত ছিল তাহা সহসা ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল যেন। শঙ্কর স্পন্দিত বক্ষে বিস্মিত মুগ্ধ নয়নে সুরমার দিকে চাহিয়া রহিল। বহুকাল পূর্ব্বে যে সুরমা তাহাকে স্বপ্নলোকের পথ দেখাইয়া লইয়া গিয়াছিল সেই সুরমাই সহসা যেন আজ আবির্ভূত হইয়া তাহাকে ডাক দিল—"আসুন"।

সেই সুরমা! দীর্ঘ দিনের ব্যবধান চকিতে অতিক্রম করিয়া পরিবর্ত্তনের বাধা-পুঞ্জ নিমেষে অবলুপ্ত করিয়া দিয়া সহসা তাহার এ কি অপ্রত্যাশিত অপূর্ব্ব আবির্ভাব। শঙ্করের বয়স সহসা যেন কমিয়া গেল। সেকালের-সুরমা-স্বপ্ন-বিহ্বল শঙ্কর পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়া সেকালের মোহে সেকালের বিস্ময়ে সেকালের আকুলতায় আত্মহারা হইয়া ক্ষণকালের জন্য মন্ত্র বলে যেন রূপ-কথার দেশে উত্তীর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু তাহা ক্ষণকালের জন্যই।

"লোকগুলোর কাণ্ড দেখেছ!"

উৎপলের কণ্ঠস্বরে অকস্মাৎ চুরমার হইয়া গেল সব। উৎপলকে সে দেখিতে পায় নাই—তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধেই এতক্ষণ সচেতন ছিল না সে। ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল প্রশস্ত হলটার কোনে একটা সোফায় ঠেস দিয়া উৎপল বসিয়া আছে। গায়ে কারুকার্য্যমণ্ডিত দামী একখানা শাল, হাতে লাল রঙের ছোট একখানা বই, চোখে মুখে চাপা হাসি। শিয়রের দিকে টেবিলের উপর সুদৃশ্য একটা বাতিও জ্বলিতেছে।

"আপনারা গল্প করুন, আমি আসছি"

সুরমা চলিয়া গেল।

"কি কাণ্ডর কথা বলছ?"

শঙ্কর আগাইয়া গিয়া একটা চেয়ার টানিয়া বসিল।

"এই ম্লেচ্ছ ব্যাটাদের"

লাল বইখানা তুলিয়া দেখাইল সে। পেঙ্গুইন সিরিজের বই, "সায়েন্স ইন ওয়ার—"। শঙ্কর একটু মুচকি হাসিল।

"কি কাণ্ড! কোথায় আধ্যাত্মিক চিন্তা করবে—তা না কাঠ থেকে চিনি করছে, বাতাস থেকে নাইট্রোজেন টেনে নিয়ে নাইট্রেট তৈরি করে' তা দিয়ে বোমা বানাচ্ছে! সিন্থেটিক রবারই বানিয়ে ফেল্‌লে! সিন্থেটিক সিল্ক—"

উৎপল সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল এবং টেবিল হইতে সিগারেট কেসটা তুলিয়া বলিল—"যাচ্ছেতাই কাণ্ডকারখানা ব্যাটাদের। এই নাও—"

সিগারেট কেসটা আগাইয়া দিল। পরক্ষণেই সেদিনের কথা মনে পড়িয়া গেল তাহার।

"ও, আই অ্যাম সরি, মনেই ছিল না"

নিজে সিগারেট বাহির করিয়া নিপুণভাবে সেটি ধরাইল, তাহার পর চোখের দৃষ্টিতে হাসি বিকীরণ করিয়া বলিল, "কতদিন এ কৃচ্ছ্র সাধন চলবে তোমার?"

"যতদিন চালাতে পারি—"

উৎপল ভ্রূযুগল উত্তোলন করিয়া আবার নামাইয়া লইল, কোন কথা বলিল না। শঙ্করও চুপ করিয়া রহিল। অস্বস্তিকর নীরবতা কিন্তু বেশীক্ষণ স্থায়ী হইল না, সুরমা আসিয়া প্রবেশ করিল।

"কুন্তলা এ বেলাও এল না—"

"ও"—উৎপল সন্তর্পণে সিগারেটে একটা টান দিল।

"আর একটা কথা শুনেছ? শঙ্কর সিগারেট ছেড়ে দিয়েছে—"

"ভালই তো—"

উৎপল শঙ্করের দিকে ফিরিয়া চোখে মুখে ছদ্ম-উদ্বেগ ফুটাইয়া প্রশ্ন করিল—"মাছ মাংস খাচ্ছিস তো?"

শঙ্করের কানের দুই পাশ সহসা গরম হইয়া উঠিল। সুরমার সম্মুখে উৎপলের এ ব্যঙ্গ তাহার ভাল লাগিতেছিল না। তবু আত্মসম্বরণ করিয়া রহিল সে। কোন উত্তর দিল না, একটু মুচকি হাসিল শুধু।

"চা খাবেন?"—সুরমা প্রশ্ন করিল।

"না, এইমাত্র খেয়ে আসছি"

উৎপলের চোখের দৃষ্টি পুনরায় কৌতুক-প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সে দৃষ্টির অর্থ—"ও চা-টা ছাড় নি তাহলে? ভাল!"—শঙ্করও সে দৃষ্টির অর্থ বুঝিল, মনে মনে আর একটু উত্তপ্তও হইয়া উঠিল, কিন্তু কিছু বলিল না।

সুরমার দিকে চাহিয়া উৎপল বলিল—"অকূল সমুদ্রে পড়ে' ও একটা ভেলা খুঁজছে, উদ্ধার কর ওকে"

"শঙ্করবাবু সমর্থ লোক, সমুদ্রে যদি পড়েই থাকেন, সাঁতরে পার হয়ে যাবার শক্তি আছে ওঁর। ভেলার দরকার হবে না—"

"আহা, তবু একটা ছুঁড়ে দিতে ক্ষতি কি! বিশেষ কিছু করতে হবে না, একটা গান কর শুধু। অনেকটা প্রকৃতিস্থ হবে। তোমার চেয়ে ওকে আমি বেশী চিনি—"

স্বাভাবিক হইবার চেষ্টা করিয়া শঙ্করও হাসিয়া বলিল, "গান শুনতে আপত্তি নেই। করুন না একটা গান, অনেকদিন গান শুনি নি আপনার—"

উৎপল ফরমাস করিল—"কাল রবিবাবুর যে গানটা শিখলে সেইটে ধর। উৎরেছে গানটা—"

সুরমার চোখে মুখে স্নিগ্ধ সলজ্জ হাসির আভা ফুটিয়া উঠিল। পরদা সরাইয়া সে পাশের ঘরে গেল এবং অর্গ্যানের ডালাটা তুলিয়া বসিল। একটু বাজাইয়া ধরিল—

"সেদিন দু'জনে দুলেছিনু বনে
ফুল-ডোরে বাঁধা ঝুলনা
এই স্মৃতিটুকু কভু ক্ষণে ক্ষণে
যেন পড়ে মনে, ভুলো না।
ভুলো না ভুলো না ভুলো না··· "

অন্ধকার রাত্রে শঙ্কর হাঁটিয়া বাড়ি ফিরিতেছিল। সুরমার কণ্ঠস্বর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত তাহার অন্তরের গভীরতম স্তরে যে ছন্দ-স্পন্দন তুলিয়াছিল তাহারই আবেশে আত্মহারা হইয়া সে পথ চলিতেছিল। একের পর এক রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি গানই আজ সুরমা গাহিয়াছে। সকলগুলিরই নিগূঢ় আবেদন এক। হে প্রিয়, হে দয়িত, কোথা তুমি, কত আয়োজন করিয়া যুগ যুগান্ত যে তোমার জন্যই বসিয়া আছি। জানি আঁধার ঘরে বিজন রাতে একদিন তুমি আসিবে, সকল কাঁটা ধন্য করিয়া গোলাপ হইয়া একদিন তুমি ফুটিবে, তোমার পায়ের শব্দ, গায়ের গন্ধ পাইতেছি, তোমার জন্যই যে আকাশ ভরিয়া নক্ষত্রের দীপালী তাহা জানি, বনে বনে কুসুম-কিশলয়ের উৎসব তোমারই প্রতীক্ষা করিয়া আছে, শুক্লা একাদশীর মধ্যরাত্রে নিদ্রাহারা শশী তোমার পথ চাহিয়াই স্বপ্ন-পারাবারের খেয়া বহিতেছে—কিন্তু হে প্রিয়, আভাসে-ইঙ্গিতে স্বপ্নে-কল্পনায় প্রচ্ছন্ন হইয়া আর কতকাল লুকাইয়া থাকিবে তুমি! আগ্রহে অধীর হইয়া আর কতকাল অপেক্ষা করিব? মূর্ত্ত হও, হে জীবনবল্লভ, দেখা দাও, ধরা দাও। তোমাকে পাইয়াও যে পাই না। একটুকু ছোঁয়া লাগে, একটুকু কথা শুনি, সেইটুকু লইয়া আর কতদিন ফাল্গুনী-স্বপ্ন রচনা করিব? কোথায় তুমি, কবে আসিবে? হয় তো নিশীথ রাতের বাদল ধারার সুরে আমার একলা ঘরে চুপে চুপে তুমি আস, কিন্তু তখন চোখে আমার ঘুম, চারিদিকে অন্ধকার, তোমাকে কাছে পাইয়াও পাই না। যখন জাগিয়া উঠি তখন দেখি তুমি নাই, দখিন হাওয়াকে পাগল করিয়া আঁধার ভরিয়া তোমার গন্ধ কেবল ভাসিয়া বেড়াইতেছে তুমি চলিয়া গিয়াছ। আকুল চিত্তে কল্পনা করি তোমার মালার পরশ আমার বুকে লাগিয়াছিল কি···

রবীন্দ্রনাথের কথা ও সুর, সুরমার আবেগ-কম্পিত কণ্ঠস্বর! শঙ্কর ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছিল। সুরমা বিশেষ করিয়া এই গানগুলিই গাহিল কেন? তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়াই গাহিল কি? সুরমার অন্তরের অন্তঃস্তলে এমন কোন কথা কি লুকানো আছে যাহা সহজ ভাষায় সে বলিতে পারে না, যাহা সহজ ভাষায় বলা যায় না, যাহার রূপ-রস-নিবিড়তা একমাত্র গানের সুরেই প্রকাশ করিতে পারে? আশ্চর্য্য কি! হয় তো আছে। কিন্তু···! কিন্তু-ভাব কিন্তু বেশীক্ষণ রহিল না। ঈষৎ জাগ্রত বিবেককে সম্মোহিত করিয়া তাহার চিরন্তন পুরুষচিত্ত সেই স্বপ্ন-সৃজন করিতে লাগিল—যে স্বপ্নে সামাজিক নীতির ভেজাল নাই, সংস্কারকের সংযম যাহাকে কুণ্ঠিত করিতে পারে না, অবিমিশ্র আবেগে যাহা চিরকাল সুস্থ পুরুষের মর্ম্মমূলে কবিত্ব উৎসারিত করিয়া আসিয়াছে, আদিম উদ্দাম প্রেরণায় স্বকীয়া-পরকীয়ার কৃত্রিম গণ্ডী উল্লঙ্ঘন করিয়া যাহা নরনারীর আপাত-সামাজিক বন্ধনকে যুগে যুগে শিথিল করিতেছে, চিরকাল করিবে। বহুকাল পরে অকস্মাৎ শঙ্করের চিত্ত সুরমাকে ঘিরিয়া স্বপ্ন-মধুর হইয়া উঠিল। শুধু মধুর নয়, মদিরও। সবিস্ময়ে সে আবিষ্কার করিল তাহার অন্তরতম সত্তা দেশের দুঃখে এতটুকু ম্রিয়মান নয়! বাহিরে সে একটা অভিনয় করিয়া চলিয়াছে শুধু। তাহার সংস্কারকের কর্ত্তব্য-বোধ কর্ত্তব্য-বোধ মাত্র—অন্তরতম সত্তার সহিত তাহার কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই। যে নিগূঢ় বেদনা আজ বহুকাল পরে সত্যই তাহার চিত্তকে বিচলিত করিতে পারিয়াছে তাহা পল্লীবাসীর দুঃখজনিত বেদনা নয়, তাহা বিরহ-বেদনা। সুরমার গান শুনিয়া তাহার অন্তর বেতস-পত্রের ন্যায় আজ যে আকুলতায় কম্পিত হইতেছে, সুরমার মনের কথাটি জানিবার জন্য অবুঝের মতো যে আগ্রহে সে উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে—সে আকুলতা সে আগ্রহ কি তাহার দেশ-সেবায় ফুটিয়াছে কখনও? দেশকে ঘিরিয়া এমন তীব্র তীক্ষ্ণ অনুভূতি জাগিয়াছে? সুরমার সান্নিধ্যে আজ তাহার অন্তর যেমন সম্পূর্ণভাবে উদ্বুদ্ধ হইল এমন কি দেশের কাজে কোন দিন হইয়াছে? সত্যটা আবিষ্কার করিয়া মনে মনে সে অপ্রতিভ হইয়া পড়িল এবং পরমুহূর্ত্তেই তাহার রাগ হইল। শুধু নিজের উপর নয়, দেশের শিক্ষা দীক্ষার উপর—এমন কি রবীন্দ্রনাথের উপরও।

তাহার মনে হইল তাহার চিত্তকে এমন উন্মনা স্বপ্নবিলাসী করিয়া তুলিয়াছেন রবীন্দ্রনাথই। কবিই দেশের চিত্ত-গঠন করেন। এ কি করিয়াছেন তিনি! পেলব মধুর ভাষায়, মর্ম্ম-স্পর্শী ছন্দে সুরে মানবমনের প্রেম-বিহ্বলতাকে না-পাওয়ার আকুলতাকে সুদূরের পিপাসাকে রূপে রসে রঙে এমন মনোহারিণী করিয়া গিয়াছেন যে দেশের সমস্ত যুবক-যুবতী ভাবাকুল-লোচনে কল্পনার কুঞ্জকুটিরে আজ কেবল স্বপ্ন দেখিতেছে। বলিষ্ঠতা কোথাও নাই—কেবল স্বপ্ন! অর্জ্জুন একজনও নাই ঘরে ঘরে কেবল রাধা! একটা তূর্য্যধ্বনি শোনা যায় না, চারিদিকে কেবল বাঁশের বাঁশী বাজিতেছে। সত্য বটে রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী সঙ্গীত লিখিয়াছেন, 'নৈবেদ্য' রচনা করিয়াছেন, নানা প্রবন্ধে দেশাত্ম-বোধকে জাগ্রত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, "মূঢ় ম্লান মূক মুখে" ভাষা দিতে চাহিয়াছেন কিন্তু তাঁহার সে সব রচনা দেশের মনে প্রেরণা দিতে পারিল কই? দেশ যত আবেগভরে "মম যৌবন নিকুঞ্জে গাহে পাখী—সখি জাগো" গাহিল ঠিক তত আবেগভরে কি "আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে" গাহিতে পারিল? হুজুগে মাতিয়া দুই চারিদিন হয় তো গাহিয়াছিল কিন্তু সে গান তাহাদের মর্ম্মে প্রবেশ করে নাই—তাহাদের মর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছে "কদম্বেরি কানন ঘেরি আষাঢ় মেঘের ছায়া নামে—"। কেন? শঙ্করের সন্দেহ হইল হয়তো রবীন্দ্রনাথই ঠিক তেমন প্রাণ ঢালিয়া ওই দেশাত্মবোধক রচনাগুলি লেখেন নাই, ওগুলি

সুশিক্ষিত সুন্দর রচনা, কিন্তু ওগুলিতে ঠিক যেন তাঁহার প্রাণের সুর বাজে নাই তাই দেশের কর্ণে প্রবেশ করিলেও দেশের মর্ম্মে উহারা প্রবেশ করিতে পারিল না। তিনি অচিন পথের উন্মনা পথিক ছিলেন, ছিলেন বাউল সুফী মরমিয়া। দেশকে নয় প্রিয়কে সুন্দরকেই তিনি আহ্বান করিয়াছেন, ধ্যান করিয়াছেন। পচা পানাপুকুরের পঙ্কোদ্ধারের কথা তিনি মাঝে মাঝে চিন্তা করিয়াছেন বটে কিন্তু তাহাতে 'সোনার তরী' ভাসাইতেই তিনি বেশী ব্যস্ত ছিলেন। কালিদাসের ভাববিলাস অথবা বৈষ্ণব কবিদের কান্ত কোমলতা ভারতের যে স্বাচ্ছন্দ্যের যুগে স্বাস্থ্যকর ছিল—পরাধীন নিরন্ন ভারতের পক্ষে তাহা যে মারাত্মক সে খেয়াল থাকিলেও তাহার প্রতিবিধান করিবার উপায় তাঁহার হাতে ছিল না—কারণ নিজের সংস্কারকে, নিজের প্রতিভার বৈশিষ্ট্যকে তিনি অতিক্রম করিতে পারেন না, কোন কবিই পারে না। কোকিলের গান যদি কোন কারণে দেশের পক্ষে অনিষ্টকর হয় কোকিল কি নিজের সুর বা স্বর পরিবর্ত্তন করিতে পারে?…

সমস্ত দোষটা রবীন্দ্রনাথের স্কন্ধে চাপাইয়া নিপুণভাবে আত্মবিশ্লেষণ করিয়া শঙ্কর যেন নিজের কাছেই জবাবদিহি করিল। পতনের কারণ নির্ণয় করিয়া পতনের গ্লানি হইতে অব্যাহতি পাইবার প্রয়াস পাইল—একটুও অনুতপ্ত হইল না। সুরমার হাসি, গান, মার্জ্জিত আলাপ, তন্বী দেহ-শ্রী, শাড়ির রং, অলকের কম্পন, অপাঙ্গের মাধুর্য্য ঘিরিয়া যে কল্পলোকে তাহার মুগ্ধ মন উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া ফিরিতে লাগিল সে কল্পলোকে কল্পনাই—সম্রাজ্ঞী যুক্তির স্থান সেখানে নাই। পুলকিত চিত্তে শঙ্কর আবিষ্কার করিল তাহার যৌবন এখনও সজীব আছে, যে ভয়ে সে কলিকাতায় চুনচুনের সহিত দেখা করে নাই তাহা তাহার লুব্ধ বাসনারই ভীত রূপ। তাহার কবি-মানসে যে মানসী-লিপ্সা চিরকাল চিরন্তনী প্রিয়ার স্বপ্নে বিভোর হইয়া আছে তাহা মরে নাই—প্রচ্ছন্ন হইয়া ছিল, আজ সহসা সুরমাকে ঘিরিয়া তাহা আকুল হইয়া উঠিয়াছে। মুগ্ধ মদির হৃদয়ে সে পথ চলিতে লাগিল। শীতের আকাশে শীর্ণ চাঁদ উঠিয়াছে; দূর রাস্তায় ক্যাঁচ কোঁচ করিয়া একটা গরুর গাড়ি চলিয়াছে, সমস্ত পল্লী ধূম ও কুয়াসায় আচ্ছন্ন, শিউলি ফুলের এক ঝলক গন্ধ যেন কোথা হইতে ভাসিয়া আসিল। "আজি মম অন্তর মাঝে কোন পথিকের পদধ্বনি বাজে"—মনের মধ্যে গুঞ্জরণ করিয়া ফিরিতেছে সুরমার গানের সুর। একটা নিদারুণ চীৎকারে সহসা তাহার স্বপ্নভঙ্গ হইল। সে দাঁড়াইয়া পড়িল। মনের সুরটা কাটিয়া গেল। বিরক্তিতে মনটা ভরিয়া উঠিল। কে এমন বেসুরা চীৎকার করিতেছে? চাহিয়া দেখিল পাশেই মুশাইয়ের বাড়ি—চীৎকারটা সেখান হইতেই আসিতেছে। শঙ্কর আগাইয়া গিয়া ডাকিল। হাঁউ মাউ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাহির হইয়া আসিল যমুনিয়া। তাহার রুক্ষ চুল, ছিন্ন বসন অসম্বৃত। এমন সময় এখানে শঙ্করকে দেখিতে পাইবে সে প্রত্যাশা করে নাই। শঙ্করকে দেখিয়া তাহার দুঃখ যেন আরও উথলাইয়া উঠিল। কাপড় সামলাইবার কথা পর্য্যন্ত তাহার মনে রহিল না, অসম্বৃত বসনেই সে ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। মুশাই তাহাকে মারিতেছে—এইমাত্র কোথা হইতে সে 'পিইয়া' আসিয়াছে। ম্লান জ্যোৎস্নার স্বল্পালোকেও শঙ্কর দেখিতে পাইল যমুনিয়ার পাঁজর গোনা যায়, জীর্ণ বুকে হাড়গুলা উঁচু হইয়া রহিয়াছে, স্তনযুগল শুষ্ক বিশীর্ণ—যেন রুগ্ন পুরুষ মানুষের বুক। নিজের ভাষায় যমুনিয়া বকিয়া চলিয়াছিল। অত দাম দিয়া মুশাইকে সেদিন একটা 'মোটিয়া' কিনিয়া দিল কোথায় ফেলিয়া আসিয়াছে—কোনও ছুঁড়িকে দিয়া আসিয়াছে কিনা তাহারই বা ঠিক কি। ইহার জন্য সে কিন্তু কোন অনুযোগ করে নাই—সে 'কিরিয়া খাইতে' (শপথ করিতে) প্রস্তুত আছে —বরং নিজের গায়ের চাদরখানা তাহাকে দিতে গিয়াছিল, তখন অবশ্য বলিয়াছিল—নে এটাও নে—আমার যথাসর্ব্বস্ব গ্রাস কর তুই। এই কথাতেই তাহাকে মারিতে সুরু করিয়া দিল—চুলের ঝুঁটি ধরিয়া মুক্কা, থাপ্পড়, লাত্ (কিল, চড়, লাথি)…। শঙ্কর ভিতরে প্রবেশ করিল। উঠানের মাঝখানে 'ঘুর' জ্বলিতেছে—তাহার পাশে মুশাই দাঁড়াইয়া আছে—বিস্ফারিত নাসারন্ধ্র—আরক্ত চক্ষু।

"যমুনিয়াকে কেন মেরেছিস?

মুশাই সাধারণত নীরব প্রকৃতির। কিন্তু মদের ঝোঁকে বলিয়া বসিল—"হমারা খুশী"—

"খুশী?"

ঠাস করিয়া তাহার গালে শঙ্কর প্রচণ্ড একটা চড় বসাইয়া দিল। মুশাই পড়িয়া গেল।

"ওঠ—ওঠ শিগ্‌গির—খুন করে' ফেলব তোকে আজ—"

মুশাই ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল এবং নত-মস্তকে বসিয়াই রহিল। উঠানের এক কোণে শুষ্ক মুখে যমুনিয়া দাঁড়াইয়াছিল, বলিয়া উঠিল—

"আব ছোড়ি দে মুন্নু—পিলো ছে—"

(এবার ছেড়ে দে বাবা—মদ খেয়ে ওরকম করছে)

শঙ্কর ফিরিয়া দেখিল যমুনিয়া ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে—শুধু ভয়ে নয়, শীতেও। গায়ে কাপড় নাই—নিজের একমাত্র গায়ের কাপড়খানি মাতাল চরিত্রহীন স্বামীকে দিয়াছে! শঙ্কর নিজের গায়ের র‍্যাপারটা খুলিয়া তাহার দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া বাহির হইয়া গেল। চেঁচামেচিতে যে দুই চারিজন পাড়ার লোক বাহির হইয়া আসিয়াছিল তাহার মধ্যে ফুলশরিয়া একজন। শঙ্কর কাহারও দিকে না চাহিয়া দ্রুতপদে পথ চলিতে লাগিল। ফুলশরিয়া অবাক হইয়া গেল।

বাড়ি পৌঁছিয়া দেখিল—অমিয়াও তাহার অপেক্ষায় জাগিয়া আছে। খুকীকে ঘাড়ের উপর শোয়াইয়া পায়চারি করিতেছে। আসন্নপ্রসবা সে, নিশ্চয়ই কষ্ট হইতেছে।

"এখনও ঘুমোও নি?"

"খুকীর পেটব্যথা করছে, কিছুতে ঘুমুচ্ছে না। পারুলের বাড়িতে পান-ফল-টল খেলে কতগুলো যা তা"

শঙ্করের সাড়া পাইয়া খুকী মাথা তুলিল এবং ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, "পেত ব্যাতা কত্তে—"

"এস আমার কাছে"

সমস্ত দিন একটিবারও আজ সে বাবাকে পায় নাই, একমুখ হাসিয়া ঝাঁপাইয়া কোলে আসিল।

সুরমার মোহ স্বপ্নের মতো ভাঙিয়া গেল।

সে স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যে নামিল, না মর্ত্ত্য হইতে স্বর্গে উঠিল বুঝিতে পারিল না।

পরদিন সকালে যখন উঠিল তখন দেখিল মনের আকাশ নির্ম্মেঘ। কম্প দিয়া যে জ্বরটা সহসা আসিয়াছিল তাহা সহসাই ছাড়িয়া গিয়াছে। মুশাই আসিয়া প্রবেশ করিল এবং অন্যদিনের মতো টেবিল ঝাড়িতে লাগিল, যেন কিছুই হয় নাই! ক্রমশঃ

কাব্য ও আধুনিক কাব্য

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

কাব্যে আত্ম-সচেতনা

রস বা তত্ত্বের আধার হচ্ছে—সুসংযত ও সুসংহত চিত্ত এবং সুসংযত ও সুসংহত চিত্তই যে কাব্যের লীলাভূমি, একথা বলতে আমার দ্বিধা নাই। অতি বিশৃঙ্খল বিক্ষিপ্ত জনতার ভয়াবহ আচরণ, কিম্বা নিদারুণ দুঃখ-দৈন্যের শোকাবহ পরিস্থিতি, কিম্বা অকরুণ যৌনজীবনের অনিবার্য্য পরিণতি, যা' ভদ্রমনকে পীড়া দেয়, সুরুচি ও নীতিজ্ঞানকে বিপর্য্যস্ত করে তোলে, শ্লীলতার অভ্রান্ত পথকে এড়িয়ে পঙ্কিল পঙ্কে ডুবতে চায়—এমন সব বাস্তব ঘটনা কিম্বা কোনোও সত্যকার বিপ্লব বিদ্রোহ, তা সে রাষ্ট্রিকই হোক আর সামাজিকই হোক, যার মধ্যে আশাহতের বিক্ষোভ আছে, হৃতসর্ব্বস্বের প্রতিবিধিৎসা আছে, নবীনালোক সন্ধানের অধীর আগ্রহ আছে, অগ্রগতির অদম্য উৎসাহ আছে, নোতুন পথে অভিযান করার দুর্দম দুঃসাহস আছে—তার যে আসল রূপ, বাস্তব সত্ত্বা, তাকে কাব্যে রূপ দিতে গেলে কবির চিত্তেও বিপ্লব বিদ্রোহের ভাব-সঞ্চার ঘটবে, বাস্তবতার প্রভাব কবির মনকেও আচ্ছন্ন করে দেবে; তার সমগ্রতার অনুভূতিই কবিকে সত্যকার প্রেরণা দেবে সত্য, কিন্তু সমগ্র পরিবেশের সঙ্গে মিশে গিয়েও কবি থাক্‌বেন আত্মস্থ হয়ে তাঁর চিত্তলোকে। সেখানে বিদ্রোহ ও বিপ্লবের, ধ্বংস ও ভাঙ্গনের অসম ছন্দের গতি থাক্‌বে নিয়ন্ত্রিত, বন্ধুর পথেও তাঁর লেখনীর গতি যাবে না মাত্রা ছাপিয়ে, যতিকে অতিক্রম করে। এইখানে আসে আমাদের পূর্ব্ব-আলোচিত কবির আত্ম-সচেতন অবস্থার কথা। কবি সেখানে নিজের যুগ্ম ব্যক্তিত্ব (Duel personality) বজায় রাখবেন—যেমন আমরা দেখি পাশ্চাত্য সাহিত্যের সমরোত্তর কবিতায় (Post-war-poem)। সেখানে যোদ্ধা, কবিতায় বর্ণনা করেন যুদ্ধের মর্ম্মন্তুদ কাহিনী। যুদ্ধের মধ্যে বা যুদ্ধ-অবসানে যুদ্ধক্ষেত্রের পরিবেশের বাহিরে—নিদারুণ শোক দুঃখের মর্ম্মভেদী সে কাহিনী হৃদয় স্পর্শ করে, চোখের সামনে আমরা সেই প্রত্যক্ষ ধ্বংসলীলার বাস্তব ছবি দেখি, নির্ব্বাক বিস্ময়ে। যিনি যুদ্ধে বন্দুক ঘাড়ে নিয়ে শত্রুর সম্মুখীন হয়েছেন, স্বচক্ষে গোলার মুখে অগ্নি উদ্গীরণ হ'তে দেখেছেন, কানে তার বিকট শব্দ শুনেছেন—এক হাতে মৃত্যু দিয়েছেন আর এক হাতে সেই মৃত্যুকে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছেন—তাঁর চাইতে আর বড় বাস্তব কবি কে?—কিন্তু মন যখন তাঁর যুদ্ধপরিবেশের বাহিরে সাময়িক যুদ্ধ-বিরতির মধ্যে আত্মস্থ হয়েছে, তিনি যখন সুসংযত ও সুসংহত কবিচিত্ত নিয়ে সমগ্র ব্যাপারটাকে উপলব্ধি করতে পেরেছেন—তখনি না তাঁর কবিতা লেখা সম্ভব হয়েছে। সেই জন্যই আমরা Post-War বা সমরোত্তর কবিতায় বাস্তবের এমন প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি দেখতে পাই—

Now, light the Candles ; one ; two ; there's a moth ;
That silly beggars they are to blunder in
And scorch their wings with glory liquid flame—
No, no, not that,—it's bad to think of war,
When thoughts you've gagged all day
come back to scare you ;
And it's been proved that soldiers don't go mad
Unless they lose control of ugly thoughts
That drive them out to jabber among the trees.
* * * *
There must be crowds of ghosts among the trees,—
Not people killed in battle—they're in France ;—
You are quiet and peaceful, summering safe at home,
You would never think there was a bloody war on !...
O yes, you would, why ? you can hear the guns
Hark ! Thud, thud, thud,—quite soft
...They never cease—
Those whispering guns—O Christ ! I want to go out
And screech them to stop—I'm going crazy ;
I'm going stark, staring mad because of the guns.

"Repression of war experience" — Siegfried Sassoon

অথবা,

Neck deep in mud
He moved and raved—
He who had braved
The field of blood—
And as a lad
Just out of school
Yelled: "April fool !"
And laughed like mad.

"Mad" — W. W. Gibson.

অথবা—

I do not fear to die
'Neath the open sky,
To meet death in the fight
Face to face, upright.
But when at last we creep
In a hole to sleep,
I tremble, cold with dread,
Lest I wake up dead.

"The fear" — W. W. Gibson.

কবি এখানে কবিতার প্রসাদগুণেই পাঠকচিত্তকে আকর্ষণ করতে পেরেছেন। একদিকে যেমন বলবার মধ্যে নিষ্ঠা আছে আন্তরিকতা আছে চিত্তসংযম ও আত্মসচেতনা আছে—অন্যদিকে রয়েছে তেমনি সর্ব্বান্তকরণে সেটা গ্রহণ করবার মত সহানুভূতি, একাগ্রতা ও সমবেদনা।

Gibson সম্বন্ধে সমালোচক বলছেন—

Mr. Gibson gets his inspiration direct from life. ** Human nature itself is the metaphysic of his art—human nature in its endless variety and immeasurable depth and Mr. Gibson has an astonishing capacity for absorbing human nature.

Gibson এর মত Herbert Read ও একজন সৈনিক কবি—তাঁর অভিজ্ঞতাও ব্যক্তিগত—একটা ছোট কবিতা দিয়ে তাঁর সে অভিজ্ঞতার

পরিচয় দেওয়া যায়। কবিতাটির নাম হচ্ছে The Crucifix—খুব ইঙ্গিতপূর্ণ—

His body is smashed
Through the belley and chest,
And the head hangs topsided
From one nailed hand.
Emblem of agony,
We have smashed you!

আর একজন মৃত্যোন্মুখ সৈনিকের মুখে শুনতে পাই—কবির অন্তরের বেদনামথিত সত্য কথা—

"Life ebbs with an easy flow
and I've no anguish now.
This falling light
is the world's light : it dies
like a lamp
flickering for want of oil."

প্রতিকূল পরিবেশের অজুহাত

আমি ইচ্ছা করেই যুদ্ধ সম্পর্কের এই কবিতাগুলি এখানে উদ্ধৃত করলাম, কারণ আজকাল 'সাম্প্রতিক' কবিদের মুখে শুনতে পাওয়া যায় যে, বাস্তব নিয়ে অভিজ্ঞতা নিয়ে কবিতা লিখ্‌তে গেলে বর্ত্তমানের উচ্ছৃঙ্খল মন ও বিশৃঙ্খল পরিবেশের প্রতিচ্ছবি কাব্যে ত থাকবেই—তাতে imagery থাকলেই যথেষ্ট হ'ল, কালের ছাপমারা ভঙ্গি থাকলেই চলবে। যখন, সময় চলছে নিত্য নোতুন পরিবর্ত্তনের পথে, কোনও নিয়মানুবর্ত্তিতা সে মানছে না,—এখন চোখে যা দেখছি, কাণে যা শুনছি, মনে যা ভাবছি, অন্তরে যা' অনুভব করছি—তার মধ্যে যখন না আছে শৃঙ্খলা—না আছে কোনো সঙ্গতি বা সংলগ্নতা, বিষয়বস্তু সম্প্রতি যখন এমনি খাপছাড়া,—চারিদিকের আবহাওয়ার যখন এমনি এলোমেলো গতি, বল্‌গা-হীন মন যখন ছুটে চলেছে এমনি এক অনির্দ্দিষ্ট পথে, পারিপার্শ্বিকতার চাপে চিত্তবৃত্তিও যখন এমনি উদ্‌ভ্রান্ত—তখন আমাদের কাব্য রচনায় সংহত ও সংযত রীতি বজায় না থাকাই ত স্বাভাবিক। সম্প্রতি মানুষের জীবনে যখন আনন্দই নাই তখন সাম্প্রতিক কাব্য পড়ে আনন্দ পেতে চাও কোন আক্কেলে? অথচ আধুনিক সাহিত্যে যিনি যশস্বী হয়েছেন সেই বুদ্ধদেব বসুর মতে "বেকার সমস্যা দেশে বাস্তবিকই ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। যুবকদের কিছু করবার নেই; নৈরাশ্য এত গভীর যে কলেজের পড়াশুনাতেও তারা মন দেয় না।" তাঁর "দৃঢ়-বিশ্বাস যে নির্দ্দিষ্ট নিয়মিত কোনো কাজ করবার থাকলে * * * 'সাহিত্যিক' যুবকরা ভদ্র ও সুস্থভাবেই জীবন কাটাতেন, কাজের অভাবেই সাহিত্য চর্চ্চার উৎকট চেষ্টায় নিজেদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করছেন।"

এ সম্বন্ধে আর একজন বিশিষ্ট সাম্প্রতিক কবি বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত "কবিতা" পত্রিকায় লিখেছেন—"এই রেডিও-পীড়িত, সিনেমা-জর্জ্জরিত, ফুটবল-উৎকণ্ঠিত শ্রেণীর জীবনযাত্রা শেষ পর্য্যন্ত মহৎ কবিতার পরিপন্থী। ফলে আমাদের দেশের বিশিষ্ট আধুনিক কবিরা নিঃসঙ্গ এবং নিঃসঙ্গতায় লাভের চেয়ে লোকসান বেশি। যতদিন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে কোনো আমূল সমাজবিপ্লব না ঘটে, কুটিল কালচক্রে ভাঙন না ধরে, ততদিন এই নিঃসঙ্গতা, হতাশা আর অবিশ্বাস বর্ত্তমান সভ্যতার যতগুলি বিশেষত্ব, তাঁদের ঘিরে থাকবে, ততদিন তাঁদের শ্রেষ্ঠ রচনা প্রাণবান মূল সূত্রের অভাবে পীড়িত হবে। ইতিমধ্যে নেই-মামার চেয়ে কানা-মামার অন্বেষণ করাই ভাল। রিয়ালিটির থেকে নিষ্কৃতির চেষ্টা পরাজয়ের দুর্ব্বল ভঙ্গি, প্রকৃতির স্বপ্নলোক ক্লীবের অলীক স্বর্গলোক"—আধুনিক কবির পক্ষে এ স্বীকৃতি কৌতুকাবহ হলেও বিবেচনা সাপেক্ষ, কিন্তু সিদ্ধান্তে আসতে সময় লাগে না। কাব্যরসের উদ্ভবেই ত আনন্দের সৃষ্টি হয়, সে আনন্দ শুধু সুখ-সম্পদে উৎসাহ ও শান্তিতেই যে পাওয়া যাবে তা নয়। "বিক্ষুব্ধ বহির্জগত" থেকেই "অন্তঃপ্রেরণা" আসবে এবং সেটা যত গভীর, হবে—"মহৎ কবিতা" রচনার প্রেরণাও হবে তত গভীর; অশ্রু-সাগর মন্থন করেও আনন্দের অমৃত লাভ হতে পারে।

যুদ্ধ আমরা বহু যুগ করি নি, কিন্তু জীবন-যুদ্ধ যা করে চলেছি—তার দুঃখ বিড়ম্বনা, অপমান ও লাঞ্ছনার বৈচিত্র্যই কি কম? রাষ্ট্র-বিপ্লব, সমাজ-বিপ্লব দেশের চিন্তা, ভাবুকতা ও অনুভূতিকে নাড়া দিয়ে গেল বহুবার, বহু রকমে—কবিচিত্তে যে তার বাস্তব রূপ ধরা পড়বে না, এ আমি কল্পনা করতে পারি না। দুঃখের যেখানে অন্ত নাই, কান্নার যেখানে বিরাম নাই, বিড়ম্বনা ও গ্লানির হলাহল যেখানে অবিরাম উথ্‌লে উঠ্‌ছে সেখানে কঠিন নিষ্ঠুর বাস্তবতা আমাদের মনকে ধাক্কা দেবে না? বেদনায় আমাদের অন্তর উদ্বেল হয়ে উঠ্‌বে না? অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করতে হবে আমাদের এজ্‌রা পাউণ্ড, এলিয়ট প্রভৃতির কাছ থেকে? নিষ্ঠা (sincerity) কাব্যকে উজ্জ্বল করে', বেদনা-বোধ কাব্যকে জীবন্ত করে তোলে। কাব্যের প্রেরণা সত্য ও ঐকান্তিক না হ'লে কেহ সত্যকার কবিতা লিখ্‌তে পারে না। রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলেছেন, সেগুলি উদ্ধৃত করা প্রাসঙ্গিক হবে—

"অন্যান্য সকল বেদনার মতোই সাহিত্যে দারিদ্র্য-বেদনারও যথেষ্ট স্থান আছে। কিন্তু ওটার ব্যবহার একটা ভঙ্গিমার অঙ্গ হয়ে উঠেছে—যখন-তখন সেই প্রয়াসের মধ্যে লেখকেরই শক্তির দারিদ্র্য প্রকাশ পায়। "আমরাই রিয়ালিটির সঙ্গে কারবার করে থাকি, আমরাই জানি কা'কে বলে লাইফ্‌" এই আস্ফালন করবার ওটা একটা সহজ এবং চলতি প্রেস্‌ক্রিপসনের মতো হয়ে উঠছে। অথচ এঁদের মধ্যে অনেকেই দেখা যায় নিজেদের জীবনযাত্রায় "দরিদ্র-নারায়ণের" ভোগের ব্যবস্থা বিশেষ কিছুই রাখেন নি; ভালো রকম উপার্জ্জনও করেন, সুখে স্বচ্ছন্দেও থাকেন;—দেশের দারিদ্র্যকে এঁরা কেবল নব্য সাহিত্যের নূতনত্বের ঝাঁজ বাড়াবার জন্যে সর্ব্বদাই ঝাল মসলার মতো ব্যবহার করেন। এই ভাবুকতার কারি-পাউডারের যোগে একটা কৃত্রিম শস্তা সাহিত্যের সৃষ্টি হয়ে উঠছে। এই উপায়ে বিনা প্রতিভায় এবং অল্প শক্তিতেই বাহবা পাওয়া যায়, এই জন্যেই অপটু লেখকের পক্ষে এ একটা মস্ত প্রলোভন এবং অবিচারক পাঠকের পক্ষে একটা সাহিত্যিক অপথ্য।"

যাইহোক্‌, আধুনিক কবিদের লেখা উচ্চাঙ্গের ভাল কবিতা সংখ্যায় অল্প হ'লেও মাঝে মাঝে আমাদের চোখে পড়ে, তার কিছু কিছু নমুনা পরে দেওয়া যাবে।

কামতন্ত্র ও বস্তুতন্ত্র

কামতান্ত্রিক কাব্যের বিরোধী কোনো কবি হতে পারে না—কারণ কাব্যের প্রথম প্রকাশই হয় ক্রৌঞ্চমিথুনের যৌন-সম্ভোগকে উপলক্ষ করে। কিন্তু আমার বক্তব্য এই যে বস্তুতান্ত্রিক কবিতার দোহাই দিয়ে আমরা যদি শুধু কামতন্ত্রের উগ্রতায় সাহিত্যকে "বিশিষ্ট জারক রসে জারিয়ে" তুলি—তাহ'লে তা' পানশালার 'চাটের' পক্ষে মুখরোচক হ'বে কিন্তু আমাদের জীবনে কদর্য্য জঞ্জাল যে তাতে স্তূপীকৃত হয়ে উঠ্‌বে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নাই। যাঁরা যুদ্ধের কবিতা লিখেছেন তাঁরা প্রেমের কবিতা লিখেও সার্থকনামা হয়েছেন। যুদ্ধ ব্যাপারটা যেমন তাঁদের কাছে প্রত্যক্ষ, প্রেম বস্তুটিও তাঁদের কাছে তেমনি সত্য। যেমন দেখি, তাঁদেরি মধ্যে একজন লিখ্‌ছেন—

"Lay thou thy cheek against my cheek,
So there be but one flood of weeping!
Upon my heart press close thy heart,
So together their flames may be leaping!

And when to that mighty flame at last
The flood of our tears draws nigher—
My strong arm about thee
and holding thee fast—
I shall perish of desire,"

কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে, সাম্প্রতিক কবিরা প্রেম বা কামতন্ত্রকে মুখ-রোচক করবার প্রলোভনে অতিমাত্রায় শশব্যস্ত।

শুনতে পাওয়া যায়—আমাদের এবম্বিধ সাম্প্রতিক সাহিত্যের উৎপত্তি নাকি বস্তু-জগতেরই সুনিবিড় সংস্পর্শে। সেগুলি তাঁদের মতে "realistic" কবিতা। যথা :

"হাসপাতাল
পাগল
ভিড়
ফ্রয়েডের ভিড়।
সহর
সহরের গোঙানি—
শ্মশানের দুর্গন্ধ
আর সাপের জঙ্গল ছেড়ে পালিয়েছি
বেঁচেছি।
আথিক মূল্যে
বেশ্যার কাছ থেকে ভালোবাসা কেনা
অথবা
কলেজের ছাত্রীর
একান্ত প্রার্থীর
গা ঘেঁষে আনাগোনা
আর
সেই সুখ্যাতা গায়িকার
দেহভঙ্গির অর্থে
ও অনর্থের বিপাকে
অর্থ গোনা
ভেবোনা,
(প্রেম কেউ বিলোয় না
সেখানেও ভালোবাসা কেনা)
* * *
ওগো সুন্দরী কিশোরী কুমারী
বৃথা হানো তুমি নয়নবাণ
হাটের মাঝারে !
দরের দস্তুর শেখোনি
—ফিরে যাও
সহর বন্দর আজ
সমুদ্রের নোনাজলে বান চাল"

—এর পরই হয়ত উক্ত কবিতার গুণগ্রাহীরা হাঁ হাঁ করে উঠে বল্‌বেন—

কালিদাস পণ্ডিতে কয়—
যা' ভেবেছ তা নয়।

কিন্তু আরো অনেক রকম আছে, কিছু উপহার দিই :—

"পৃথিবীতে চরি—সমস্বরে—রক্তগোধিকার মত লাল ;
দণ্ডী সত্যাগ্রহে আমি বিকোষিত জীবনের করুণ আভাস
অনুভব করি ; কোনো গ্লাসিয়ার-হিম শুষ্ক কর্মোরেন্ট পাল
বুঝিবে আমার কথা ;

অবুঝের মতই স্বীকার করি বুঝলাম না। পণ্ডিতবর অমিয় চক্রবর্তী আধুনিকতার উগ্রপন্থী আর একজন কবি, যাঁকে অধ্যাপক-সমালোচক ধূর্জটিপ্রসাদ বলেছেন "একেবারেই আধুনিক, একেবারেই অভিনব * * উগ্র রকমের আধুনিক। ঠাট্টা করতে লোভ হয়। কিন্তু দু'চারটে কবিতা পড়তে পড়তে উপহাসের ঝোঁকটা লজ্জিত ও পরাস্ত হয় ; বিস্মিত মন সানন্দে স্বীকার করে যে এখানে প্রকৃত কবিত্বশক্তির সাক্ষাৎ পেলুম।"—এই সাক্ষাতের নমুনা দিই ;—

নীল কল। লক্ষ টাকা। মর্চে পড়া।
শব্দের ভিড়ে'
পুরোনো ফ্যাক্টরি ঘোরে।
নিযুত নিযুত মজুরি খাটে পৃথিবীকে
বালি বানায়, গ্রাস করে মাটি, ছেড়ে দেয়, দ্বীপ রাখে
দ্বীপ ভাঙে ; পাহাড়, প্রবাল পুঞ্জ, নুন যন্ত্রে
ঘর্ঘর ঘোরায়। ধোঁয়া নেই। নব্যতন্ত্রী
ঐটুকু।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে, "বড় গাছ, ছোট পাতা, লাল ফুল, বাড়ী যাও, ঝড় ওঠে ; পাতা নড়ে, গোপাল তুমি কি করিতেছ, সুবোধ তুমি মুখ ধোও, পড়িতে বস। এই আধুনিক কবিরই আর একটি লেখা :—

'পাহাড় দ্বীপের সারি রাঙা-ছাত বাড়ি—'
'রঙের মাছের স্বপ্ন সচল, নৌকো তলায়'
'রেলের ষ্টেশন, সবুজ আলো, ঘুম-হারা'
জান্‌লায়"

—এগুলি লক্ষ্য করে উক্ত সমালোচক বলছেন "অল্প কথায় গতিশীল ও রঙীণ ছবি ফোটাতে তিনি দক্ষ।—এ সব পংক্তির সংহত দৃঢ়তা উপভোগ্য।—এর উপর মন্তব্য আপনারা করবেন।

আর একজন কবির আধুনিক পরিবেশ সৃষ্টির নমুনা দিই :—

"ও দিকে যত যুবকেরা বধূ ছেড়ে বসে' অন্য ঘরে
সুরা আর নারী লয়ে মাঝরাতে মাতামাতি করে ;
হাত ধরে টান মেরে আচমকা কাছে টেনে আনে,
হেসে ওঠে হো হো ক'রে—চুমো খায় চাঁদমুখ পানে।"

এই সকল বস্তুতান্ত্রিক নামধেয় অধিকাংশ আধুনিক প্রেমের কবিতা—হয় বিকৃত, না হয় অতি মাত্রায় "Sexy"—আর গণতান্ত্রিক কবিতাগুলি মার্কস্‌বাদের জগাখিঁচুড়িতে দুষ্পাচ্য, যথা—

"মধ্য রাত্রে মিড্‌ল রোড্‌-এ নৈঃশব্দ ঝুলছে
গরুর মাংসের মতো।
নিঃশব্দ, নিঃশব্দ রাত্রি ঘন মেঘে।
মনে পড়ে নিথর এক রাত্রি প্রতিজ্ঞা-কাতর
ট্রেঞ্চে মৃত্যুর বিবর্ণ ছায়া সৈনিকের চোখে,
লেহন করছে যারা তৃষ্ণার্ত্ত ঠোঁট্।
* * * *
কমরেড্ কমরেড্ বাঁচাও আমায়
রক্ষা করো নৈঃশব্দের উদ্যত বজ্র মুষ্টি হ'তে
রাষ্ট্রগত যন্ত্ররা কি রুদ্ধবাক ?"

বুদ্ধদেববাবু অনেক উপভোগ্য সাম্প্রতিক কবিতা লিখেছেন এবং নামও করেছেন যথেষ্ট, তাঁকেও এই প্রকার নোতুন ঢংয়ের মোহে আচ্ছন্ন দেখলে দুঃখ হয়—তিনি আরও লিখছেন—

"আর এই পৃথিবী ঠুকরে খাচ্ছে আমার হৃৎপিণ্ড
বাড়িয়ে দিচ্ছে স্যাঁৎসেঁতে সাঁড়াশীর মত তার অসংখ্য শুঁড়
আমাকে ধরতে, আমাকে জাপটে ধরতে,
ছিঁড়ে টেনে আনতে চাইচে আমার মাংস
আমার মাংস মোমের মত গলে যাচ্ছে কষ্টে"

কিন্তু আশ্চর্য্য ! তিনিই আবার কলম বদলে অতি সুন্দর কবিতা লিখলেন :—

ভাঙাও ভাঙাও সূর্য্যের ঘুম তবে,
জাগাও জাগাও শিশু-সূর্য্যের কুঁড়ি,
জ্বালাও জ্বালাও ভাঙা হৃদয়ের শুক্‌নো ডালে
সূর্য্যের মঞ্জরী

কিম্বা

পৃথিবী সূর্য্যের শিশু, আমরা যে সূর্য্যের সন্তান।
কতকাল, কতকাল এ উজ্জ্বল উত্তরাধিকারে
বঞ্চিত, বাঁচিবে প্রাণ ? উদ্দাম, আদিমতম পিতা,
হে সূর্য্য, হে মহাবীর্য্য, তোমার বন্দনা গান যদি
আমারও আনন্দ গান নাহি হয়, ব্যর্থ তবে সব।
কারুশিল্প, কবিতার বাণী মূর্ত্তি। দাও ফিরে দাও
তোমার জ্যোতির স্পর্শ আমাদের রক্তে, হে ভাস্বর
আঁকো তব জ্বলন্ত স্বাক্ষর মর্ম্মমূলে।

অথবা

তামসী রাত্রি থম্‌থমে ঘুমে রুদ্ধশ্বাস
হানো তার বুকে চৈত্র হাওয়ার সর্ব্বনাশ,
রাত্রি শেষের দুঃস্বপ্নের পাষাণ পটে
ঝলসি উঠুক তোমার বাহুতে সূর্য্যের তলোয়ার।

—অতি চমৎকার—একই কবির হাতে লীলাকমল ও মাকাল ফল দেখে আশ্চর্য্য হতে হয়। কিন্তু এই কবির সাম্প্রতিক শ্রেষ্ঠ কবিতারও অভাব নাই—কিন্তু তার মধ্যে হঠাৎ একটা আচমকা Break কশার উৎসাহে অনেক উপভোগ্য কবিতার রসাভাস ঘটেছে। এমন সাম্প্রতিক-লেখকও আছেন যাঁরা তাঁদের "নূতনত্ব" বা নূতন ভঙ্গীকে "অরিজিন্যাল" বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করে থাকেন এবং রবীন্দ্রনাথের গদ্য কবিতার বইগুলির নজির টেনে মকর্দ্দমা জিততে চান। কিন্তু তাঁদের এই "অরিজিন্যালিটি"কে লক্ষ্য করেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"বড়ো সাহিত্যের একটা গুণ হচ্ছে অপূর্ব্বতা, ওরিজিন্যালিটি। সাহিত্য যখন অক্লান্ত শক্তিমান থাকে তখন সে চিরন্তনকেই নূতন করে প্রকাশ করতে পারে। এই তার কাজ। এ'কেই বলে ওরিজিন্যালিটি। যখনি সে আত্মগর্বিকে নিয়ে গলা ভেঙে, মুখ লাল ক'রে, কপালের শিরগুলোকে ফুলিয়ে তুলে ওরিজিন্যাল হোতে চেষ্টা করে, তখনি বোঝা যায় শেষ দশায় এসেছে। জল যাদের ফুরিয়েছে তাদের পক্ষে আছে পাঁক। তারা বলে সাহিত্যধারার নৌকো চলাচলটা অত্যন্ত সেকেলে ; আধুনিক উদ্ভাবনা হচ্ছে পাঁকের মাতুনি—এতে মাঝিগিরির দরকার নেই—এটা তলিয়ে যাওয়া রিয়ালিটি। ভাষাটাকে বেঁকিয়ে চুরিয়ে, অর্থের বিপর্য্যয় ঘটিয়ে, ভাবগুলোকে স্থানে অস্থানে ডিগবাজি খেলিয়ে পাঠকের মনকে পদে পদে ঠেলা মেরে, চমক লাগিয়ে দেওয়াই সাহিত্যের চরম উৎকর্ষ। চরম সন্দেহ নেই। সেই চরমের নমুনা যুরোপীয় সাহিত্যের ডাডায়িজ্‌ম্‌। এর একটিমাত্র কারণ হচ্ছে এই, আলাপের সহজ শক্তি যখন চলে যায়, সেই বিকারের দশায় প্রলাপের শক্তি বেড়ে ওঠে। বাইরের দিক থেকে বিচার করতে গেলে প্রলাপের জোর আলাপের চেয়ে অনেক বেশি, এ-কথা মানতেই হয়। কিন্তু তা নিয়ে শঙ্কা না ক'রে লোকে যখন গর্ব্ব করতে থাকে তখনি বুঝি সর্ব্বনাশ হোলো ব'লে।"

একটা আচম্‌কা ব্রেক কষার 'মোহ' বা "আঙ্গিকের" অজুহাতে দুর্ব্বোধ্যতার সৃষ্টি অথবা কবিতা নামধের বস্তুটির সাম্প্রতিক রূপকে 'অরিজিন্যাল' বলে জাহির করার জোর গলার মধ্যে ফুটে ওঠে—অক্ষমের নির্লজ্জ আর্ত্তনাদ। ভাল কবিতার অসময়ে অকারণ মৃত্যুর শোচনীয়তাকেই যাঁরা আজ নূতন ভঙ্গী ব'লে চালিয়ে দিতে চান, তাঁরাও যে সত্যকার ভাল কবিতা লিখ্‌তে পারেন।

এ বিষয়ের সমর্থনে তাঁদের বহু কবিতাই উদ্ধৃত করা যায়।

মানুষের বিশেষতঃ বাঙ্গালীর ক্ষুধার তীব্রতা কতখানি তা জানি—জানি বলেই কামাক্ষী চট্টোপাধ্যায় লিখিত—

"শেষহীন স্বর্ণবালু, মরুভূমি ক্ষুধায় শ্মশান
তোমার কম্পিত আলো সেখানেও ভরে যায়
অকৃপণ দান।
কত মৃত্যু পৃথিবীর হাড়ের পাহাড়ে
নিয়ে এল ঝড়
বর্ব্বর দুর্ভিক্ষ এলো, বন্যা মহামারী,
বৎসরের বন্ধ্যা অসুর্ব্বর।

এই কবিতাটি সুন্দর লাগে।

"নক্ষত্রের মণিদীপ্ত অকৃপণ আকাশের তলে
কৃপণা ধরিত্রী বুকে জেগে আছি পিশাচের মত-
অগ্নিরিক্ত হতাশায় শান্ত উদাসীন।"

*　　*　　*

"জীবনের নাই ছন্দ, নাই আত্মা, নাই ব্যাকরণ
অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ, অনিশ্চিত আগামী সংসার।"

অমিতাভ ঘোষের কবিতার এই পাঁচটি লাইন তাঁকে কবি বলে আখ্যাত করতে পারে। কিন্তু 'আঙ্গিক' নিয়ে যখন কসরৎ চলে তখন আবার সংশয় জাগে—মনে হয়,—"অসন্তুষ্ট জীবনের কে ঘুচাবে অন্নরিক্ত ব্যথা ?"

তরুণ কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় "অগ্নিবর্ণ সংগ্রামের পথে প্রতীক্ষায়" আছেন, তিনি "শরীরের প্রত্যেক ভগ্নাংশ দিয়ে আত্মরক্ষার প্রাচীর" গড়তে চান, "বিদ্যুৎ জীবন" এ "উজ্জ্বল রৌদ্রের দিন যৌথ কর্ষণায় কার্টুক" "আর ক্ষুরধার প্রত্যঙ্গ তরঙ্গ তুলুক কারখানায়"—এই তাঁর কবি জীবনের কামনা। উজ্জ্বল ভবিষ্যত নিয়ে জন্মেছেন এই কবি, আমরা তাঁকে স্বাগত আহ্বান জানাই। তিনি মনে করেন—"কর্ম্মঠ যুবক নিখুঁত যন্ত্রের মধ্যতায় দুর্ঘটনাকে বেঁধে দেবে।" তিনি আশা করেন "অরণ্যকে ছেঁটে দেবার দিন এসেছে আজ।" কিন্তু নোতুনত্বের মোহে আবিষ্ট হয়ে বা দলগত সুলভ হাততালিতে যদি তিনি আত্মসম্বিৎ হারান, তাহলে তাঁকে সাবধান করে দিতেও দ্বিধাবোধ করব না। তাঁদের মনে রাখা উচিত, ক্ষুধার প্রতিকার লাঙল কাস্তে খোস্তা কুড়লের কবিতা লিখেই হবে না।—কৃষক ও শ্রমিকের মোক্তার সাজার মধ্যেও কোনো বাহাদুরী নাই—ওটা expl ded theory। চাই জীবনের দুর্ম্মূল্য শ্রম ও সাধনা দিয়ে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অর্জ্জন, যার কষ্টিপাথরেই কেবল কাব্যনিষ্ঠার সঠিক যাচাই হতে পারে—সে সাধনার উপযুক্ত মূল্য দিতে পারলে সামাজিক সমস্যা নূতন পথে তার সমাধান খুঁজে নেবে এবং সেই সময় 'কবি-কমরেড্‌দের' কাছ থেকে যে অবদান বাঙলা সাহিত্য লাভ করবে তার যোগ্য মর্য্যাদা দিতে আমরা সবাই প্রস্তুত থাকব।

(ক্রমশঃ)



মানব মনের নিত্যধারা

শ্রীগুণেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী এম-এ, বি-ই-এস

(২)

বিষয়ে অনাসক্তি! যেমনি এ কথাটা আমাদের প্রাণের তারে বেজে উঠ্‌বে অমনি আমাদের দৃষ্টিকে অন্তর্মুখী করে চাইতে হবে আমাদের অন্তর্জগতে। সমাহিত চিত্তে যেমনি তা করব—অমনি দেখ্‌তে পাব যে আমাদের হৃদয়ে প্রতি নিয়তই দুইটী বিভিন্ন শক্তির সংঘর্ষ চলেছে। কেমন করে চলেছে একটু বিশ্লেষণ করেই দেখা যাক্;—আমাদের সকলের জীবনেই এমন এক একটা সময় আসে যখন মনটা উদার হয়ে ওঠে—যখন ইচ্ছা হয় আপনাকে বিলিয়ে দিতে মানুষের কল্যাণে, কিন্তু সেই পবিত্র মুহূর্ত্তে কি একটা শক্তি যেন হৃদয়ের অভ্যন্তর থেকে কেবলি প্রবল বেগে আমাদের টান্‌তে থাকে তারই স্বরচিত সঙ্কীর্ণতার গণ্ডির ভিতরে—তারই স্বার্থে ঘেরা দুর্গটীর আড়ালে। সে যেন তীব্র স্বরে মনকে বলে—"ওরে যাদের জন্য তুই নিজের সব খোয়াতে চাস্—তারা তোর কে?" মানুষ থমকে দাঁড়ায়। মনে ভাবে "তাই ত, সাময়িক একটা উত্তেজনায় আমি সত্যিই তো নিছক পরের জন্য নিজের বড় ক্ষতি করতে চলেছিলাম।" মানুষ ফিরে যায়। হয়না তার জনমানবের কল্যাণে আত্মোৎসর্গ করা। তেমনি আবার মানুষ যখন অন্যায়ের পথে পা বাড়িয়ে দেয় তখনও কে যেন তার বুকের ভিতর থেকে বলে ওঠে—যদিও বড় শান্ত কণ্ঠে—"ওরে! কাজটা কি তুই ভাল কর্‌ছিস্! একবার ভেবে দেখ্! তোর প্রাণে যে বাসনা জেগেছে ওটা শুধু ক্ষণিকের মোহ, কিন্তু একবার যদি ঐ মোহের ঘোরে গিয়ে পড়িস্—তবে যে আর ফিরতে পারবি না!" মানুষ ভাবে সে কি করবে—কিন্তু, যিনি উপদেষ্টা তিনি কথা বলেন ধীর কণ্ঠে—আর প্রলুব্ধকারী যে, সে কথা বলে তার-স্বরে। তাই সাধারণ মানুষ সেই প্রলুব্ধকারীর নির্দ্দেশেই চালিত হয়ে যায়।

মানুষের মনের ভিতরে এই যে দুই শক্তির অবিরাম সংঘর্ষ চলেছে—তার একটী টান্‌ছে মানুষকে ভোগের দিকে, আর এক শক্তি তাকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশে কেবলি দেখাচ্ছে ত্যাগের মহিমা;—একজন ভোগী আর একজন ত্যাগী—একেবারে বিপরীত মুখী— ঠিক আলো ও ছায়ারই মত—

"ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি।"

যে ভোগী সেই আমাদের "অহং", আর যিনি ত্যাগী তিনিই আমাদের "আত্মা"। এই আত্মার বর্ণনা করতে গিয়ে শাস্ত্র বলেছেন যে তিনি জন্মানও না মরেনও না, তিনি অনাদি—তিনি অনন্ত—তিনি নির্ব্বিকার! —দেহের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক—যেমন আমাদের সঙ্গে আমাদের এই পরিধেয় বসনখানির সম্পর্ক। গীতা তাঁকে বলেছেন—

> ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং
> ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
> অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
> ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥

উপনিষদ্ তাঁকে বলেছেন—

> সূর্য্যো যথা সর্ব্বলোকস্য চক্ষু
> র্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ।
> একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
> ন লিপ্যতে লোক দুঃখেন বাহ্যঃ॥

—সূর্য্য যেমন সকলকে দৃষ্টিশক্তি দান করেন কিন্তু ব্যক্তিগত দৃষ্টির সঙ্গে জড়িত হয়ে বাহ্য দোষে লিপ্ত হ'ন না—তেমনি এক এবং অদ্বিতীয় আত্মা সর্ব্বভূতেরই অন্তরে বিরাজমান থেকেও লোকের সুখে দুঃখে একেবারেই নির্লিপ্ত হয়ে থাকেন। দেহের ভিতরে বিরাজিত থেকেও তিনি কিন্তু অচ্ছেদ্য—তিনি অদাহ্য—তিনি অক্লেদ্য—তিনি অশোষ্য—তিনি সর্ব্বব্যাপী—তিনি নিত্য—তিনি সনাতন—তিনি নির্ব্বিকার। গীতা তাঁকে বলেছেন—

> অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
> নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ।

—শুধু তাই নয়—

"যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ"।

—সেই আত্মা আমাদের বুদ্ধিরও অতীত।

উপনিষৎ আবার বলেছেন—

> "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
> ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।"

—শাস্ত্র অধ্যয়নে, মেধায় কিংবা বহুল শাস্ত্র শ্রবণে কোন মতেই সে আত্মাকে পাওয়া যাবে না।

কিন্তু তবুও সেই আত্মাকেই জান্‌তে হবে, কেন না, সেই আমাদের জীবনের সাধনা, মনের চিরন্তন ধারা। তাঁকে জানা ছাড়া আমাদের যে আর অন্য কোন উপায়ই নেই—

"নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"

—যিনি বুদ্ধির অগম্য তাঁকে জান্‌তে হবে—এ যে এক দারুণ সমস্যা! কিন্তু যে শাস্ত্র আমাদের এ সমস্যার সৃষ্টি করেছেন সেই শাস্ত্রই আবার এর মীমাংসা করে রেখেছেন।

উপনিষৎ বলেছেন—

> ন সংদৃশে তিষ্ঠতে রূপমস্য,
> ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চিদেনম্।
> হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো
> য এনং বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।

—কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা তাঁকে পাওয়া যাবে না বটে, কিন্তু তিনি প্রকাশিত হবেন স্থিত-প্রজ্ঞ মানবের সমাধিস্থ হৃদয়ে—আর পূর্ণ করে দেবেন সেই হৃদয়কে অমৃতের নিবিড় অনুভূতিতে।

এই যে অমৃতের অনুভূতি, যাকে আমরা নিবিড় আনন্দের অনুভূতিও বল্‌তে পারি, সেই অনুভূতিকে হৃদয়ে জাগিয়ে তোলাই মানব মনের চরম লক্ষ্য—মানবের জীবনব্যাপী সাধনার চরম সার্থকতা, কেননা সেই আনন্দের ভিতর দিয়েই যে পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার পূর্ণ মিলন ঘটবে। কিন্তু এ অনুভূতি আমরা কেমন করে লাভ করব? আত্মা যে আমাদের সুখ দুঃখে নির্লিপ্ত! তিনি তো আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন না।

আত্মা নির্ব্বিকার, কিন্তু তাঁর প্রতিনিধিরূপে মানব-হৃদয়ে বসে রয়েছেন যিনি তাঁকে আমরা বলি "বিবেক"। আত্মার অবমাননা হতে পারে এমন কোন কার্য্যে ইন্দ্রিয়-পরিচালিত হয়ে মানুষ যেমনি অগ্রসর হয়—তার অন্তর্নিহিত বিবেক তখনই তাকে বাধা দেন, কিন্তু তিনি যে বড় শান্তভাবী—"ইন্দ্রিয়ানি প্রমাথীনি"র মত তিনি "হরন্তি প্রসভং মনঃ" এ পন্থা অনুসরণ করেন না—তিনি মানবের মনকে সবলে হরণ করে নেন্‌না। আর, আমাদের ভিতরে এই যে ভোগী অহং রয়েছে তার ভোগ লালসা মিটাবার জন্য আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিই যেন উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে। এর ভোগ্য বস্তু সংগ্রহ করে দেবার জন্য কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য—যাদের আমরা বলি মানবের রিপু—তারা সকলেই যেন প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। সেই ভোগ্যবস্তুগুলিও ছড়িয়ে

রয়েছে এই রূপ—রস—শব্দ—স্পর্শ—গন্ধময় সংসারটাকে একেবারে পরিব্যাপ্ত করে। অহং চায় এই সমস্ত সংসারটাকে গ্রাস করতে। কিছুতেই তার যেন তৃপ্তি নেই। কামনার চরিতার্থতা সে যতই করবে, কামনা তার ততই বেড়ে যাবে। তার ক্রোধকে যতই সে শৃঙ্খল-মুক্ত করে ছেড়ে দেবে, ক্রোধের তাণ্ডবলীলা ততই ভীষণতর আকার ধারণ করবে। তার লোভকে সে যতই প্রসারিত করবে, লোভ তার লেলিহান জিহ্বা ততই বিস্তার করতে থাকবে। স্তন্যপায়ী যে শিশু সেও যেমন হাতের কাছে যা পায় সবই নিয়ে তার মুখে পুরবার চেষ্টা করে—আবার বাধা পেলেই কাঁদে, পূর্ণবয়স্ক মানুষও তেমনি তার আকাঙ্ক্ষিত বস্তুগুলিকে তার আমিত্বের গণ্ডির ভিতরে নিয়ে ফেলবার জন্য ব্যগ্র হৃদয়ের আকুল আগ্রহ নিয়ে ঘুরে বেড়ায়—ব্যর্থ হলেই সে ক্ষেপে যায়। কামনার তীব্রতা তাকে শিশুর মতই অবুঝ করে তোলে। যতই সে পায়, ততই আরও বেশী করে সে চাইতে থাকে। এ চাওয়ার যেন আর বিরাম নেই! হৃদয়ে তার সদাই যেন এক হাহাকারের কলরোল। যা সে পায় দুদিনে তা পুরানো হয়ে যায়—তাই কেবলি নূতন নূতন কাম্যবস্তুর পেছনে সে উন্মাদের মত ছুটতে থাকে। যে পাওয়া তার চাওয়াকে বিরত করতে পারে না, সে যে তার সত্যিকার পাওয়া নয় এ কথা সে কিছুতেই বুঝতে চায়না, কিন্তু এ অনুভূতি যতদিন তার প্রাণে না জাগবে ততদিন এ চাওয়ার তীব্র দহনকে সে যে কিছুতেই প্রশমিত করতে পারবে না। নচিকেতার মত যতদিন না মানুষ উদাত্তস্বরে বলে উঠবে—"ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যো"—ততদিন এই চাইবার দারুণ জ্বালায় তাকে জ্বলতেই হবে।

তার মন মাঝে মাঝে এই কথাটাকেই বলবার জন্য যেন ব্যাকুল হয়ে ওঠে, কিন্তু তার অহং—আর সেই অহংএর অনুচর ইন্দ্রিয়বর্গ যেন মনের কণ্ঠরোধ করে দেয়—তাকে সবলে নিজেদের গণ্ডির ভিতরেই রাখতে চায়। কিন্তু মন তো সেখায় শান্তি পায় না। মন যে চায় এই স্থূলচারী ইন্দ্রিয়দের অতিক্রম করতে। তারা যা দেয় মন তো তাকেই সব কিছু বলে মেনে নিতে পারে না। তাই পার্থিব প্রাচুর্য্যের মধ্যেও মন থেকে থেকে গুমরে ওঠে কি যেন অজানা বেদনায়—তাইতো মন অজ্ঞাতে কেবলি খুঁজে খুঁজে মরে কোথায় তার সেই পরম প্রাপ্তি—যা পেলে সে আর কিছুই চাইবে না। এই রূপ রস-বর্ণ-গন্ধময় সংসারে ইন্দ্রিয়ভোগ্য যা কিছু আছে তা সব আহরণ করবার জন্তে যেমন রয়েছে মানুষের বিষয়াসক্ত ইন্দ্রিয়বর্গ—তেমনি বাইরে যা প্রকাশিত নয়, স্থূলচারী ইন্দ্রিয়েরা যাকে ধরতে ছুঁতে পারে না, যা গূঢ়—যা অপ্রকাশিত—যা বিরাজ করে শুধু মানব-হৃদয়ের নিবিড়তম অনুভূতির মাঝে, তাকে উপলব্ধি করবার জন্তেও মানুষের গভীরতম অন্তরলোকে রয়েছে তার সূক্ষ্মচারী অন্তরিন্দ্রিয়। তাই, মানুষ কেবল সুখভোগের প্রাচুর্য্য দিয়েই তার মনকে পরিতৃপ্ত করতে পারে না—কেন না, জ্ঞাতেই হোক্ আর অজ্ঞাতেই হোক্ তার মন যে চায় তাঁকেই উপলব্ধি করতে যিনি—

"গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং"—

যিনি গূঢ়—যিনি অনুপ্রবিষ্ট—যিনি হৃদয়ের নিভৃত গুহায় অনন্ত রহস্যময় গোপনতার অন্তরালে আপনাকে লুকিয়ে রেখেছেন। কিন্তু হৃদয় গুহার গোপন গভীরে যাবার পথটি যে বড়ই দুর্গম—একেবারে তীক্ষ্ণ ক্ষুর-ধারারই মত দুরতিক্রমণীয়,—আবার, সতর্ক প্রহরীর মত সে পথ রোধ করে রয়েছে অহংএর যত অনুচরবৃন্দ। তারা চায় মনকে কেবলি বাইরের জিনিষে মুগ্ধ করে রাখতে—আমিত্ব-বোধের সঙ্কীর্ণতায় আচ্ছন্ন করে দিতে—অহংএর নানা বৈচিত্র্যময় স্বৈরতা দিয়ে অভিভূত করে ফেলতে। তাই, দেহের কামনাকে তারা জাগিয়ে তোলে—ভোগ-লালসাকে তারা উদ্দীপ্ত করে। এই ইন্দ্রিয়গণের শক্তিও যেমন প্রবল—মানব-মনের উপরে এদের প্রভাবও তেমনি দুর্দ্দান্ত, কিন্তু তবুও মানুষের মনকে এরা চিরদিন ভোগলুব্ধ সুখসেবী করে রাখতে পারে না, কেননা, মন যে এদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ—

"ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ"—

তাই, মন এদের রচিত আমিত্বের দুর্গ-প্রাকারের মাঝে চিররুদ্ধ হয়ে থাকতে চায় না—থেকে স্বস্তি পায় না। মন চায় আমিত্বের অবরোধ চূর্ণ করে—স্বার্থের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর অতিক্রম করে—সেই অগোচরের সঙ্গে নিবিড়তম যোগসূত্র স্থাপন করতে—সেই গূঢ়তমের নিগূঢ় আকর্ষণে ধরা দিতে—সেই প্রগাঢ় গভীরতার অনির্ব্বচনীয় সুধা-রসে পরিপূর্ণরূপে নিমগ্ন হতে।

এইখানেই আরম্ভ হয় মানব-জীবনের দুঃসাধ্য সাধনা—মানব-মনের যত দ্বন্দ্ব—যত সংঘর্ষ—যত সংগ্রাম, আর, এই সংগ্রামের মাঝেই আরম্ভ হয় মানুষের যথার্থ জীবন। (ক্রমশঃ)

অন্নদান

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু, গীতারত্ন

মহাত্মা তুলসীদাস অন্নদান সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে,

'লেনেকো হরিনাম
দেনেকো অন্নদান
কলিযুগমে নহি ইনকা সমান।'

কলিযুগে অনবরত হরিনাম লইবে এবং সর্ব্বদা অন্নদান করিবে। কলি-যুগে ইহার তুল্য আর দান নাই। তুলসীদাস অন্যত্র বলিয়াছেন যে কলিযুগে অন্নদান ও অভয় দানের তুল্য মহৎ পুণ্য-জনক আর দান নাই।

এই যুগে অন্নাভাব সমস্যা পৃথিবীব্যাপী সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, বাঙলা দেশে বিশেষ করিয়া ইহার করাল মূর্ত্তি অতি ভয়াবহ এবং প্রায় সকল লোককেই ভীতভাবে জীবন কাটাইতে হইতেছে। কখন যে কি বিপদ বা দৈব দুর্ঘটনা ঘটে তাহার ঠিক নাই। এই জন্য অন্নদানের সহিত অভয় দানও খুব আবশ্যক।

মহাভারতে অন্নদান সম্বন্ধে অনেক প্রশংসা করা হইয়াছে।

অন্নদানের প্রশংসা করিয়া দেবর্ষি নারদ ভীষ্মদেবকে যাহা বলিয়া-ছিলেন তাহা মহাভারত হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।

নারদ উবাচ।

অন্নমেব প্রশংসন্তি দেবা ঋষিগণাস্তথা।
লোকতন্ত্রং হি যজ্ঞাশ্চ সর্ব্বমন্নে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥
অন্নেন সদৃশং দানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি।
তস্মাদন্নং বিশেষেণ দাতুমিচ্ছন্তি মানবাঃ ॥
অন্নমূর্জ্জস্করং লোকে প্রাণাশ্চান্নে প্রতিষ্ঠিতাঃ।
অন্নেন ধার্য্যতে সর্ব্বং বিশ্বং জগদিদং প্রভো ॥

অনুশাসনপর্ব্ব ৯৮।৫-৭

নারদ বলিলেন, দেবতা এবং ঋষিগণ অন্নকেই প্রশংসা করেন, লোকযাত্রা এবং যজ্ঞ অন্নেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। অন্নদান সদৃশ দান হয় নাই, হইবেও না, এই নিমিত্ত মানবগণ বিশেষরূপে অন্নদান করিতে ইচ্ছা করেন। ইহলোকে অন্নই বলকর, প্রাণসমুদয় অন্নে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সমুদয় বিশ্বজগৎ অন্ন দ্বারা বিধৃত আছে।

অন্নাৎ ভবন্তি বৈ প্রাণাঃ প্রত্যক্ষং নাত্র সংশয়ঃ ॥

অনুঃ ৯৮।৮

অন্ন হইতে প্রাণ জন্মে, ইহা প্রত্যক্ষ, এ বিষয়ে সংশয় নাই।

কি মনোভাব লইয়া অন্নদান করিতে হইবে, সে বিষয়েও মহাভারতে উক্ত আছে।

ক্রোধমুৎপতিতং হিত্বা সুশীলো বীতমৎসরঃ।
অন্নদঃ প্রাপ্নুতে রাজন্দিবি চেহ যৎ সুখম্॥
নাবমন্যেদভিগতং ন প্রণুদ্যাৎ কদাচন।
অপি শ্বপাকে শুনি বা নান্নদানং প্রণশ্যতি॥

অনুঃ ৯৮।১২, ১৩

রাজন! ক্রোধ ও ঔদ্ধত্য পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সুশীল ও মৎসর-শূন্য হইয়া যিনি অন্নদান করেন, তিনি স্বর্গে ও ইহলোকে সুখলাভে সমর্থ হন। উপস্থিত অতিথিকে অবজ্ঞা করিবে না এবং কদাচ তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করা কর্ত্তব্য নহে, যেহেতু চণ্ডাল ও কুক্কুরকে অন্নদান করিলেও সে দানের ফল বিনষ্ট হয় না।

এই যুগে প্রায়ই দেখা যায় যে অন্নদান কত অবহেলা ও অবজ্ঞার সহিত করা হয়। একমুষ্টি অন্নদান করিয়া গ্রহীতাকে শত তিরস্কার করা হয়, অন্নদানের পরিবর্ত্তনে তাহাকে শত লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হয়।

এই সময় অন্নদাতা ও অন্নগ্রহীতা দুই জনকেই ভগবান পরীক্ষা করিতেছেন। দাতার দানশক্তিকে ও গ্রহীতার সহ্য-শক্তিকে তিনি পরীক্ষা করিতেছেন।

অন্নদানের ফল সম্বন্ধে মহাভারতে বলা হইয়াছে যে,

অন্নং প্রাণা নরাণাং হি সর্ব্বমন্নে প্রতিষ্ঠিতম্।
অন্নদঃ পশুমান্ পুত্রী ধনবান্ ভোগবানপি॥২৫
প্রাণবাংশ্চাপি ভবতি রূপবাংশ্চ তথা নৃপ।
অন্নদঃ প্রাণদো লোকে সর্ব্বদঃ প্রোচ্যতে তু সঃ॥

অনুঃ—৯৮।২৫, ২৬

অন্নই মনুষ্যগণের প্রাণ-স্বরূপ, অন্নেই সমুদয় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, অন্নদাতা পশুমান্, পুত্রবান্, ধনবান্, প্রাণবান্ ও রূপবান্ হন। অন্নদাতা ইহলোকে প্রাণদ এমন কি তিনি সর্ব্বদ বলিয়া উক্ত হন।

প্রদাতা সুখমাপ্নোতি দৈবতৈশ্চাপি পূজ্যতে॥ অনু ৯৮।২৭

অন্নদান করিলে প্রদাতা সুখলাভ করেন এবং দেবগণ কর্ত্তৃক পূজিত হন।

প্রত্যক্ষং প্রীতিজননং ভোক্তৃদাতুর্ভবত্যুত।
সর্ব্বাণ্যন্যানি দানানি পরোক্ষ ফলবন্ত্যুত॥২৯

ভোক্তা ও দাতা উভয়ের যে প্রীতি জন্মে তাহা প্রত্যক্ষ হয়, অন্যান্য দান সমুদয় পরোক্ষ ফলবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

অন্নাদ্ধি প্রসবংযান্তি রতিরন্নাদি ভারত।
ধর্ম্মার্থাবন্নতো বিদ্ধি রোগনাশং তথান্নতঃ॥৩০

হে ভারত! অন্ন হইতেই প্রসব অর্থাৎ পুত্রাদি প্রাপ্ত হওয়া যায়, অন্ন হইতেই রতি জন্মে, ধর্ম্ম ও অর্থ অন্ন হইতেই হইয়া থাকে এবং অন্ন হইতেই রোগ নষ্ট হয় জানিবে।

অন্নং হ্যমৃতমিত্যাহ পুরা কল্পে প্রজাপতিঃ।
অন্নং ভুবং দিবং খংচ সর্ব্বমন্নে প্রতিষ্ঠিতম্॥৩১

পূর্ব্বকল্পে প্রজাপতি অন্নকেই অমৃত কহিয়াছেন, অন্নই ভূলোক, দ্যুলোক ও স্বর্গস্বরূপ, অন্নেই সমুদয় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

অন্নপ্রণাশে ভিদ্যন্তে শরীরে পঞ্চধাতবঃ।
বলং বলবতোঽপীহ প্রণশ্যত্যন্নহানিতঃ॥৩২

অন্ননাশ হইলে শরীরে পঞ্চধাতু বিভিন্ন হয়, অন্নহানি হেতু বলবান্ ব্যক্তির বল বিনষ্ট হইয়া যায়।

আবাহাশ্চ বিবাহাশ্চ যজ্ঞাশ্চান্নমৃতে তথা।
নিবর্ত্তন্তে নরশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মচাত্র প্রলীয়তে॥৩৩

হে নরবর! অন্ন ব্যতিরেকে লোকযাত্রা, বিবাহ ও যজ্ঞ সমুদয় নির্ব্বাহ হয় না। অন্নে বেদও বিলীন হয়।

অন্নতঃ সর্ব্বমেতদ্ধি যৎকিঞ্চিৎ স্থাণু জঙ্গমম্।
ত্রিষু লোকেষু ধর্ম্মার্থমন্নং দেয়মতো বুধৈঃ॥৩৪

স্থাবর জঙ্গম যাহা কিছু আছে, এই সমুদয় অন্ন হইতে হয়, অতএব ত্রিভুবন মধ্যে পণ্ডিতগণের ধর্ম্মার্থ অন্নদান করা কর্ত্তব্য।

তস্মাদন্নং প্রযত্নেন দাতব্যং মানবৈর্ভুবি॥৫২

অতএব ভূমণ্ডলে মানবগণের সর্ব্বপ্রযত্নে অন্নদান করা কর্ত্তব্য।

অন্নদান সম্বন্ধে মহর্ষি পরাশরের উক্তি মহাভারত হইতে উদ্ধৃত করিলাম।

অন্নং বৈ প্রথমং দ্রব্যমন্নং শ্রীশ্চ পরা মতা।
অন্নাৎ প্রাণঃ প্রভবতি তেজো বীর্য্যং বলং তথা॥৫৮

অন্নই প্রথম দ্রব্য, অন্নই পরম শ্রীরূপে সম্মত, অন্ন হইতে প্রাণ তেজ বীর্য্য ও বল প্রাদুর্ভূত হয়।

সদ্যো দদাতি যশ্চান্নং সদৈকাগ্রমনা নরঃ।
ন স দুর্গাণ্যবাপ্নোতীত্যেবমাহ পরাশরঃ॥৫৯

যে মানব সতত একাগ্রচিত্ত হইয়া যাচকের প্রার্থনামাত্র অন্নদান করেন, তিনি দুর্গ সমুদয় প্রাপ্ত হন না, পরাশর এইরূপ কহিয়া থাকেন।

অনুঃ ১০১।৫৯

অন্নদান সম্বন্ধে মহামতি ভীষ্ম প্রজাপতি ব্রহ্মার মত যাহা যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন, মহাভারত হইতে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

ভীষ্ম উবাচ

অন্নাৎ প্রাণভৃতস্তাত প্রবর্ত্তন্তে হি সর্ব্বশঃ।
তস্মাদন্নং পরংলোকে সর্ব্বদানেষু কথ্যতে॥ ৫
অন্নাদ্বলং চ তেজশ্চ প্রাণিনাং বর্ধতে সদা।
অন্নদানমতস্তস্মাচ্ছ্রেষ্ঠমাহ প্রজাপতিঃ॥ ৬

ভীষ্ম বলিলেন, অন্ন হেতু সমস্ত প্রাণভৃৎমাত্রই বর্ত্তমান রহে, অতএব সর্ব্বলোকেই অন্ন উৎকৃষ্টরূপে উক্ত হইয়া থাকে। অন্ন হইতে প্রাণিগণের বল ও তেজ সতত বর্দ্ধিত হয়। অতএব প্রজাপতি অন্নদানকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কহেন। অনুঃ ১০২।৫, ৬ *

বাঙলা দেশে অন্নাভাবে প্রতিদিন শত শত লোক ক্ষুধার তাড়না সহ্য করিতে না পারিয়া মারা যাইতেছে। এই রাজধানীর রাস্তায় নরকঙ্কালের শ্রেণী ও মৃতের শব দেখিয়া হৃদয় হাহাকার করিয়া উঠে। আজ যে সব ধনবান বাঙালী বর্ত্তমান, তাঁহাদের বিরাট ধনের একাংশ যদি জাতির রক্ষার জন্য তাঁহারা ব্যয় করেন তাহা হইলে জাতি এই আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা পায়। বাঙালী বাঙালীকে রক্ষা না করিলে কে তাহাকে রক্ষা করিবে? অনেক অবাঙালী প্রতিষ্ঠান এই নিরন্নদের রক্ষা করিবার জন্য অনেক চেষ্টা ও অর্থ ব্যয় করিতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টাকে সাফল্য-মণ্ডিত করিবার জন্য ধনবান বাঙালীর এই অন্নদান ব্যাপারে অগ্রণী হওয়া উচিত।

আজ এই নিরন্নদের পক্ষ হইতে এই আবেদন প্রত্যেক বাঙালীর নিকট উপস্থাপিত করিতেছি। যে সব মধ্যবিত্ত ভদ্রগৃহস্থ প্রকাশ্যভাবে ভিক্ষা করিতে পারেন না, তাঁহাদের গোপনে যাঁহার যা সাধ্য সাহায্য করা উচিত। যে শিশুর দল দুগ্ধাভাবে শীর্ণ হইয়া যাইতেছে প্রতি মধ্যবিত্ত অভাবগ্রস্ত গৃহস্থেরা যাহাতে তাঁহাদের সন্তানদের দুগ্ধ দিতে পারেন সমাজের সে বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

আজ বাঙালী বাঙালীকে রক্ষা না করিলে তাহার আর বাঁচিবার উপায় নাই। জাতির সেবা মানে, মহামায়ার পূজা। মহামায়াই 'সর্ব্বভূতেষু জাতিরূপেণ সংস্থিতা'।

বহু আক্ষেপ করিয়া বাঙলার ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার আনন্দমঠে লিখিয়াছেন যে 'বাঙ্গালী কাঁদে আর উৎসন্ন যায়'।

বাঙালীর কান্না শেষ হইবার দিন কি এখনও আসে নাই?

---

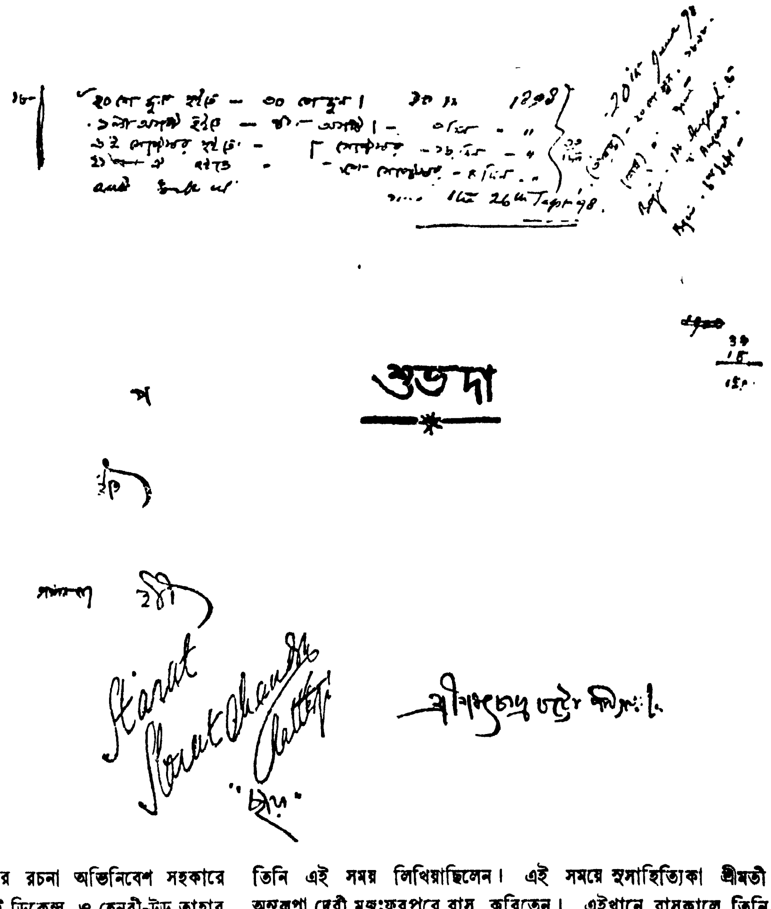
* কুম্ভঘোণে সম্পাদিত মহাভারতের মতানুসারে অধ্যায়াদিও শ্লোকের সংখ্যার পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে।

শরৎচন্দ্রের "শুভদা" *

অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল

ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর প্রায় এক বৎসরের মধ্যেই গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্ কর্ত্তৃক শরৎচন্দ্রের অপ্রকাশিত উপন্যাস শুভদা প্রকাশিত হয়। গ্রন্থকারের মৃত্যুর পর প্রকাশিত হইলেও ইহা শরৎবাবুর প্রথম জীবনের রচনাবলীর অন্যতম এবং কিশোর শরৎচন্দ্রের লেখনী যাহা লিখিয়াছিল, প্রকাশক তাহাই অবিকৃত অবস্থায় মুদ্রিত করিয়াছেন। একথা প্রকাশিত শুভদা গ্রন্থের প্রথমে শরৎচন্দ্রের একখানি আলোকচিত্র ও যে খাতায় শুভদা লিখিত হইয়াছিল সেই খাতার প্রথম পৃষ্ঠার প্রতিলিপি দিয়া প্রকাশক নিজেই উল্লেখ করিয়াছেন।

এই প্রতিলিপি হইতে দেখা যায় যে, এই উপন্যাসখানি শরৎবাবু ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ২০এ জুন হইতে ২৬-এ সেপ্টেম্বরের মধ্যে লিখিয়াছিলেন। এই কয়মাস ধরিয়া রোজ তারিখেই যে লিখিতেন তাহা নহে, সর্ব্বশুদ্ধ মাত্র তেত্রিশ দিনে শুভদা শেষ করিয়াছিলেন। তখন শরৎবাবুর বয়স ছিল মাত্র বাইশ বৎসর (জন্ম ৩১-এ ভাদ্র ১২৮৩, ইং ১৮৭৬ খৃঃ)।



এই সময়ের কিছু পূর্ব্ব হইতেই শরৎচন্দ্রের সাহিত্যজীবন আরম্ভ হইয়াছিল। ১৮৯৪ খৃঃ শরৎবাবু ভাগলপুরের তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজিয়েট স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। এণ্ট্রান্সের ফলাফল প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই শরৎচন্দ্র তাঁহার প্রথম উপন্যাস রচনা করেন। এখানির নাম দিয়াছিলেন "বাসা"। এই উপন্যাসখানি খাতা হইতে কেহ কেহ পাঠ করিয়াছেন বলিয়া শোনা যায়, কিন্তু পরে এখানি শরৎচন্দ্রের নিজের মনোমত হয় নাই বলিয়া তিনি নিজেই ইহা ফেলিয়া দিয়াছিলেন। ইহার পরে তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজে ফার্ষ্ট আর্টস ক্লাসে ভর্ত্তি হন এবং থ্যাকারে, ডিকেন্স, হেন্‌রী-উড্ ইত্যাদি ইংরাজী ঔপন্যাসিকের রচনা অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিতে থাকেন। এই সময় হইতেই ডিকেন্স ও হেন্‌রী-উড তাহার বিশেষ ভাল লাগিত (শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত 'ব্রহ্মপ্রবাসে শরৎচন্দ্র') এই সমস্ত ইংরাজী ঔপন্যাসিকদের প্রভাবও এই সময় হইতেই তাঁহার উপর নানা ভাবে পরিলক্ষিত হইতে থাকে। তাঁহার দ্বিতীয় উপন্যাস 'অভিমান' মিসেস্ হেন্‌রী-উডের ইংরাজী উপন্যাস 'ঈষ্টলীনের' অনুকরণে রচিত। এখানিও কোনদিন মুদ্রিত হয় নাই, তবে হস্তলিখিত অবস্থায় ইহা অনেকেই পাঠ করিয়াছেন। ঈষ্টলীন গ্রন্থের প্রভাব শুধু যে 'অভিমানে'ই পর্য্যবসিত হইয়াছে তাহা নহে, ইহা শরৎচন্দ্রের 'বিরাজ-বৌ' গ্রন্থেও পড়িয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। মেরী করেলীর রচিত "মাইটি এটম" নামক উপন্যাসখানিও শরৎচন্দ্রকে এরূপ মুগ্ধ করিয়াছিল যে, তিনি উহার অনুবাদ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। অবশ্য এখানিও কোনদিন মুদ্রিত হয় নাই। এ ছাড়া "কোরেল" নামক আর একটি ইংরাজী গল্পের অনুবাদ ও "পাষাণ" নামক একটি মৌলিক উপন্যাসও তিনি এই সময় লিখিয়াছিলেন। এই সময়ে সুসাহিত্যিকা শ্রীমতী অনুরূপা দেবী মজঃফরপুরে বাস করিতেন। এইখানে বাসকালে তিনি ভাগলপুর নিবাসী শরৎচন্দ্রের এই সমস্ত পাণ্ডুলিপির কতকগুলি পাঠ করিয়াছিলেন এবং মাইটী এটমের অনুবাদখানিতে বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন। অনুবাদ ছাড়া শরৎচন্দ্রের কতকগুলি মৌলিক রচনাও শুভদার পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল; সেগুলি যথাক্রমে শিশু (পরে ইহাই নাম পরিবর্ত্তন করিয়া 'বড়দি' নামে প্রকাশিত), চন্দ্রনাথ, দেবদাস,

* বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রদত্ত তথ্যাবলীর কতকগুলি শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা নিরুপমা দেবীর সহিত লেখকের যে পত্রালাপ হইয়াছিল, তাহা হইতে গৃহীত, অন্যান্য কতকগুলি তথ্য শরৎচন্দ্রের জীবনী পুস্তক হইতে সংগৃহীত।

কাশীনাথ ও অনুপমার প্রেম। এগুলি কলেজে প্রবেশের অব্যবহিত পূর্ব্বে ও পরে শরৎচন্দ্র তিনখণ্ড খাতায় লিখিয়া রাখিতেন। এই তিন খণ্ড খাতার একত্রে নাম দিয়াছিলেন "বাগান"। বাগানে এই সমস্ত রচনার পরে শরৎচন্দ্র শুভদা নামক উপন্যাসখানি স্বতন্ত্র একটি খাতায় উপন্যাস আকারে লিখিয়াছিলেন। ১৩৫০ সালে ভারতবর্ষের কার্ত্তিক সংখ্যায় শ্রদ্ধেয় ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, পি-এইচ্-ডি মহাশয় শুভদাকে শরৎচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস বলিয়া কেন যে আখ্যা দিলেন, তাহার কোন কারণ তিনি সেখানে দেন নাই। রচনার পারম্পর্য্য দেখিলে শুভদাকে কোনমতেই প্রথম উপন্যাস বলা যায় না, কারণ ইহার পূর্ব্বে উপরে উল্লিখিত গল্প বা উপন্যাসগুলি লিখিত হইয়াছিল ; কিন্তু অন্যদিক দিয়া ইহাকে প্রথম বলা যায় এই কারণে যে, শুভদার পূর্ব্বের রচিত কতকগুলি লেখন আদৌ প্রকাশিত হয় নাই, অন্যান্যগুলি শরৎবাবু পরিণত বয়সে প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে পরিণত বয়সের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দিয়া ইচ্ছামত পরিশোধন করিয়াছেন, কিন্তু বাইশ বৎসর বয়সে রচনার পর হইতে একমাত্র শুভদার পাণ্ডুলিপিতেই কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই বলিলেই চলে। কিশোর বয়সের রচনা গ্রন্থকারের মৃত্যুর একবৎসর পরে প্রায় অবিকৃত অবস্থাতেই মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। এই কারণেই গ্রন্থখানির বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। ঔপন্যাসিকের তরুণ অথচ অগঠিত মনের আলেখ্য এই গ্রন্থের পত্রে পত্রে সন্নিবিষ্ট। সাহিত্যসম্রাটের কিশোর বয়সের ভাবভঙ্গী কিরূপে কোনদিকে প্রধাবিত হইতেছিল, তাহার পরিচয় এই শুভদাতে যেমন পাওয়া যায় এমন অপর কোন গ্রন্থেই মিলে না। কারখানার সুসংস্কৃত পণ্যের মধ্যে ঢালাইয়ের আভাসমাত্রও থাকে না, কিন্তু শুভদার মধ্যে অসম্পূর্ণ শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-সাধনার প্রয়াস এবং ত্রুটী ও বিচ্যুতিপূর্ণ পদক্ষেপের সহিত স্থির লক্ষ্যের পূর্ণ আভাস বহুলাংশে পাওয়া যায়। সেই হিসাবে বর্ত্তমানের মুদ্রিত শরৎ গ্রন্থাবলীর মধ্যে শুভদাকে প্রথম উপন্যাস বলা যাইতে পারে—শরৎসাহিত্যের ঐতিহাসিক আলোচনা করিতে শুভদাই এখন আমাদের প্রথম সোপান।

শুভদা গ্রন্থ রচনার কিছু পূর্ব্ব হইতেই শরৎচন্দ্রের আর্থিক অবস্থা নিতান্ত সঙ্কীর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। এণ্ট্রান্স পরীক্ষার এক বৎসর পরে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তাঁহার মাতৃ-বিয়োগ হয় এবং ভাগলপুরে মাতুলালয়ে আশ্রিত বা গলগ্রহরূপে বাস করা নিতান্ত কষ্টকর হইয়া পড়ায় শরৎচন্দ্র ও তাঁহার পিতা মতিলাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া খঞ্জরপুর নামক ভাগলপুরের অন্য এক পাড়ায় স্বতন্ত্র বাসায় নিতান্ত দীনভাবে বাস করিতে আরম্ভ করেন। শরৎচন্দ্রের পিতা মতিবাবু জীবনে বিশেষ কিছু উপার্জ্জন করেন নাই। আর্থিক অভাবের জন্যই তিনি শরৎচন্দ্রের শৈশবাবস্থায় হুগ্লী জেলার দেবানন্দপুরের ভিটাবাড়ী বিক্রয় করিয়া ভাগলপুরে ধনী শ্যালকের গৃহে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এবার অর্থাগমের অন্য কোন উপায় না করিয়াই ধনীগৃহের আশ্রয় ত্যাগ করিলেন, কাজেই এই সময়ে যে তাহাদের বিশেষরূপ অর্থাভাব হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। শরৎচন্দ্রের এই সময়ের অর্থকষ্ট ইহা হইতেই অনুধাবনযোগ্য যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্ষ্ট আর্টস পরীক্ষার প্রবেশমূল্য সেকালে ছিল মাত্র বারো টাকা, কিন্তু তাহাও সংগ্রহ করিতে না পারায় তিনি শেষ পর্য্যন্ত পরীক্ষাই দিতে পারেন নাই। শুভদা উপন্যাসের মূল কারণবস্তু অর্থকষ্ট, এই গ্রন্থের কাহিনী বর্ণিত আত্যন্তিক অর্থকষ্টের বিবরণে সম্ভবতঃ শরৎচন্দ্রের তৎকালীন আর্থিক অস্বচ্ছলতাই কিয়দংশে রূপগ্রহণ করিয়াছেন।

খঞ্জরপুরের বাসাবাটীতে বাসকালে শরৎচন্দ্র সুলেখক শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট ও তাহার সহোদরা সুসাহিত্যিকা শ্রীমতী নিরুপমা দেবীর সহিত ঘনিষ্ঠতর হইয়াছিলেন। সেই সময় হইতেই ইহাদের মধ্যে অকৃত্রিম বন্ধুত্ব স্থাপিত হইয়াছিল এবং একত্রে সাহিত্যালোচনা, বিভূতিবাবুর সহিত শরৎচন্দ্রের একত্রে রঙ্গমঞ্চে অভিনয় ইত্যাদি চলিতে থাকে। (একবার এইরূপ অভিনয়ে বিভূতিবাবু ও শরৎবাবু একই নাটকের দুইটি বিভিন্ন ভূমিকায় সজ্জিত হইয়া একখানি আলোকচিত্র পর্য্যন্ত তুলিয়াছিলেন। এই ছবিখানি নিরুপমা দেবীর নিকট এখনও পর্য্যন্ত রক্ষিত আছে। তিনি এই সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ রচনা করিয়া পাঠক সমাজকে শীঘ্রই উপহার দিবেন বলিয়া বর্ত্তমান লেখককে আশা দিয়াছেন) অবশ্য এই দুই পরিবারের মধ্যে এতাদৃশ ঘনিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও তৎকালীন বাঙ্গালী পর্দ্দানশীন সমাজের নিয়ম মানিয়া নিরুপমা দেবী শরৎচন্দ্রের সহিত মৌখিক আলাপ করিতেন না, কিন্তু শরৎচন্দ্রের হাতে-লেখা খাতাগুলি পাঠ করিয়া এই সময় হইতেই তিনি তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই খঞ্জরপুরেই নিরুপমা দেবী শরৎচন্দ্রের হাতে-লেখা খাতা হইতে শুভদা উপন্যাস পাঠ করিয়াছিলেন। শুভদা যদিও শরৎচন্দ্রের পরিণত বয়সের রচনার তুলনায় অনেকাংশে নিষ্প্রভ, তৎসত্ত্বেও সেই সময়ে নিরুপমা দেবী ইহা পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০এর জয়শ্রীতে নিরুপমা দেবী লিখিয়াছেন, "অন্নপূর্ণার মন্দির লিখিতে গিয়া অলক্ষ্যে শরৎদার শুভদার আভাসও যে গল্পের মধ্যে আসিয়া গিয়াছে. ইহা খুবই সত্য"। ইহার প্রায় দশ বৎসর পরে ১১।২।৪৩ তারিখে শ্রীমতী নিরুপমা দেবী বর্ত্তমান প্রবন্ধ লেখককে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন যে. শুভদার পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া তাঁহার খুবই ভাল লাগিয়াছিল এবং বহুদিন পরে যখন শরৎচন্দ্রের মাতুল সুরেন্দ্রনাথের মুখে তিনি শুনিতে পান যে শুভদা হারাইয়া গিয়াছে তখন 'এতই দুঃখিত হই, যে সেই আবেগে নিজেই 'অন্নপূর্ণার মন্দির' লিখিয়া ফেলি'। লেখকের পক্ষে ইহা কম গৌরবের কথা নহে যে, পাঠক গ্রন্থটি পাঠ করিয়া বিনা আয়াসে উহা স্মরণ রাখিবেন এবং উহা নষ্ট হইয়াছে শুনিলে দুঃখিত হইবেন। ইহাতেই শরৎচন্দ্রের তরুণ বয়সের রচনার আদর অনুমিত হইতে পারে।

শরৎচন্দ্রের শুভদা উপন্যাস বিশ্লেষণ করিবার পূর্ব্বে ইহা বলা যায় যে, এই পুস্তকে শরৎবাবুর নিজ ব্যক্তিগত জীবনের ছাপ আছে, তবে সে ছাপ যে উপন্যাসের কতখানি জুড়িয়া আছে তাহা নির্ণয় করা কঠিন। উপন্যাসের নায়ক নায়িকাদের মধ্যে সদানন্দ বা সদা পাগ্লা যে নিঃসন্দেহে শরৎচন্দ্রের বাল্যবন্ধু তাহা জোর করিয়া বলা যায়, তবে অন্যের কথা অনুমানসাপেক্ষ। তরুণ ঔপন্যাসিক কাহার জীবনের কোন কাহিনীকে যে তাঁহার উদীয়মান লেখনীমুখে অমর করিয়া গিয়াছেন, তাহা তিনিই জানেন। এই সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের শেষ জীবনের অন্তরঙ্গ শ্রীনরেন্দ্র দেব তাঁহার সাহিত্যাচার্য্য শরৎচন্দ্র নামক জীবনীগ্রন্থে যাহা উল্লেখ করিয়াছেন (পৃঃ ৮৯) তাহা অনুধাবনযোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন, "শুভদা উপন্যাসখানি ছাপিতে দেবার জন্যে যতবারই বন্ধুরা শরৎচন্দ্রকে অনুরোধ করেছেন, তিনি প্রতিবারই কঠিন অসম্মতি জানিয়েছেন ; বলেছেন, এ বই ছাপলে আমার পরিচিত কোন লোককে সাধারণের চক্ষে অত্যন্ত ছোট হয়ে পড়তে হবে। আমি তা পারবো না। যদি কখনও শুভদা ছাপি, আগাগোড়া বদ্‌লে নতুন করে লিখতে হবে'। কিন্তু শরৎবাবুর এই ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই, তাঁহার মৃত্যুর এক বৎসর পরে শুভদা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। প্রকাশের সূচনায় প্রকাশক লিখিয়াছেন, "শরৎচন্দ্রের প্রথম রচনাবলীর মধ্যে পাষাণ, অভিমান, কোরেল প্রভৃতির পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় নাই। শুভদাও তাঁহার প্রথম রচনাবলীর অন্যতম, ইহা তাঁহার সম্পূর্ণ পরিমার্জ্জিত করিয়া প্রকাশ করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু প্রথম দুই তিন পৃষ্ঠায় সামান্য দুই একটি কথা বদ্‌লান ভিন্ন আর কিছুই করিতে পারেন নাই। পাণ্ডুলিপিতে যেরূপ ছিল, এক্ষণে ঠিক সেইরূপই ছাপা হইল"। সেই জন্যই বলা যায় যে, শুভদা গ্রন্থে শরৎচন্দ্রের প্রথম জীবনের রচনাভঙ্গী যথাযথরূপে রক্ষিত আছে। শরৎ-সাহিত্যের বিকাশের ইতিহাসরূপে পাঠকবর্গের নিকট এই উপন্যাসখানির সেইজন্যই বিশেষ মূল্য আছে।

শরৎচন্দ্রের শুভদা দুইটি অধ্যায়ে ত্রিশটি পরিচ্ছেদে ২৫৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। গল্পাংশটি সংক্ষেপতঃ এইরূপ :—

কলিকাতা হইতে পনর বিশ মাইল দূরবর্ত্তী গঙ্গাতীরস্থ হরিদ্রাগ্রাম নামক স্থানে জমীদার ভগবান নন্দীর সেরেস্তার চাকুরে হারাণ মুখোপাধ্যায় মধ্যবয়সে কাত্যায়নী ওরফে বামুনপাড়ার 'কাতি' নাম্নী এক পতিতার মোহ ও গঞ্জিকা ইত্যাদিতে আসক্ত হইয়া সঞ্চিত সমস্ত অর্থ নিঃশেষ করিয়া জমীদার সেরেস্তা হইতে ক্রমে ক্রমে তিন হাজার টাকা ভাঙ্গিয়া জমীদার কর্তৃক ধৃত হন। হারাণের সাধ্বী স্ত্রী শুভদা তাহার সখিস্থানীয়া বিন্দুবাসিনী নাম্নী পল্লীর অপর একটি মেয়ের পরামর্শে জমীদারবাবুর নিকট যাইয়া অনুনয় করিয়া স্বামীকে মুক্ত করিয়া আনেন বটে, কিন্তু ইহার পর হারাণচন্দ্রের বেকার হওয়ার ফলে তাহাদের সংসারে দারিদ্র্য প্রখর হইয়া উঠিতে থাকে। হারাণের সংসারে স্ত্রী শুভদা, বিধবা ভগ্নী রাসমণি, দুই কন্যা—জ্যেষ্ঠা বালবিধবা ললনা, কনিষ্ঠা অবিবাহিতা ছলনা এবং শিশুপুত্র চিররুগ্ন মাধব এই কয়টি মাত্র প্রাণী থাকিত। এ ছাড়া প্রতিবাসী নিতান্ত কলহস্বভাবা কৃষ্ণপ্রিয়া ঠাকুরাণী, সদানন্দ নামক ক্ষেপাটে স্বভাবের স্বচ্ছল অবস্থার এক ব্রাহ্মণকুমার এবং বহুবিত্তশালী হরমোহন ও তাহার নিতান্ত বশংবদ পুত্র সারদাচরণ এই উপন্যাসের ঘটনাবলীর সহিত সংশ্লিষ্ট। বেকার হওয়ার পর হারাণের সংসার যখন নিতান্তই বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তখন বিন্দুবাসিনী সদানন্দ ও কৃষ্ণপ্রিয়ার সাহায্যে কিছুদিন সংসার চালাইলেও ক্রমে ক্রমে অবস্থা এমনিই হইল যে, দৈনিক গ্রাসাচ্ছাদন একেবারে অচল হইয়া পড়িল। এই অবস্থার প্রতীকার মানসে ললনা একদিন তাহার পূর্ব্বপরিচিত সারদাচরণকে গোপনে ডাকিয়া তাহার ভগিনী ছলনাকে বিবাহ করিবার জন্য অনুরোধ করিল, কিন্তু সারদাচরণ ইচ্ছা সত্ত্বেও তাহা করিতে চাহে না, কারণ সে জানিত যে, তাহার পিতা অর্থলোভী এবং দুঃখীর কন্যা ছলনাকে বিবাহ করিতে তাহার সম্মতি পাওয়া অসম্ভব। ইহার পর ললনা মনে করলে যে, তিলে তিলে সকলের অনাহারে মৃত্যু না দেখিয়া ইহার প্রতীকার করা প্রয়োজন। প্রথমে সে মনে করিয়াছিল যে, সে একা গঙ্গায় আত্ম-বিসর্জ্জন দিয়া এই দুঃখ হইতে অব্যাহতি লাভ করিবে, কিন্তু ইহাতে সংসারের কোন উপকার হইবে না ভাবিয়া সে ঠিক করিল যে, আত্মবিসর্জ্জন দিয়া সে পতিতাবৃত্তি অবলম্বন করিবে এবং কলিকাতায় গিয়া এইরূপে অর্থার্জ্জন করিয়া সেই অর্থে সংসারের দুঃখ নিবারণ করিবে। গ্রন্থকার ইহাই স্পষ্ট করিয়া ফুটাইতে চাহিয়াছেন যে, এইরূপে স্বেচ্ছায় পতিতা জীবন বরণ করায় দেহের ক্ষুধা ত নাই-ই, পরন্তু ইহা পরের জন্য আত্মত্যাগের অন্য এক অপূর্ব্ব নিদর্শন, দেবতাদের উপকারের জন্য দধীচির অস্থিদানেরই মত। উপরন্তু এইরূপ চিন্তা ললনার মনে আদৌ অস্বাভাবিক নহে, কারণ সে জানে যে পিতা তাহার কষ্টার্জ্জিত সমস্ত অর্থ এক পতিতার নিকট সমর্পণ করিয়াছেন এবং ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া চুরী করা তিন হাজার টাকাও তাহারই হস্তে দিয়াছেন। ইহাতে পল্লীর সরলা ললনার মনে এইরূপ ধারণাই সম্ভব যে, পতিতাবৃত্তিতে অর্থের অভাব নাই এবং ইহা ছাড়া অন্য কোন উপায়ে অর্থ প্রাপ্তির কোন পথই নাই। অতএব অন্য কোন চিন্তা না করিয়া এইরূপে আত্মবলি দিবার জন্যই সে প্রস্তুত হইল।

ইহার পর উপন্যাসের দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ। দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখা যায়, ললনা মৃত্যুর সহিত যুদ্ধ করিয়া নিতান্ত ভাগ্যবশেই সুরেন্দ্রনাথ নামক এক ভাবপ্রবণ বিপত্নীক জমিদারের দ্বারা নূতন জীবন লাভ করে ও তাঁহার ভালবাসা ও যত্নে তাঁহার স্ত্রীরূপে বাস করিতে থাকে। এদিকে দেশে রটে যে ললনা গঙ্গায় ডুবিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। ইহার পর আত্মীয়হীনা সদানন্দ ললনার মাতা শুভদাকে সাহায্য করিবার মানসে স্বেচ্ছায় তাহাদের সহিত এক সংসারে বাস করিতে আরম্ভ করে অর্থাৎ সংসারের সমস্ত ব্যয়ভার নিজের মাথায় তুলিয়া লয় এবং নিজের সঞ্চিত অর্থে অর্থগৃধ্নু হরমোহনকে তৃপ্ত করিয়া তাহার পুত্র সারদার সহিত ছলনার বিবাহ দেয়। এই সময় কলিকাতা হইতে ললনা তাহার মাতাকে সাহায্য করিবার জন্য বেনামীতে ডাকযোগে অর্থ প্রেরণ করিলে শুভদা এই অর্থ কে পাঠাইয়াছে তাহা না জানিয়া গ্রহণ করা অনুচিতবোধে সদানন্দের দ্বারা কলিকাতার যে ঠিকানা হইতে টাকা পাঠানো হইয়াছে সেই ঠিকানায় টাকা ফেরৎ পাঠাইতে চেষ্টা করেন। সেই উপলক্ষে সদানন্দ আসিয়া ললনার বিষয় ইঙ্গিতে কথঞ্চিৎ অবগত হইয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত না করিয়া দূর হইতেই উদ্দেশে তাহাকে আশীর্ব্বাদ জানাইয়া প্রস্থান করে। এইখানেই গ্রন্থের শেষ।

রচনাশৈলীর দিক হইতে উপন্যাসখানির তেমন কোন স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয় না। বঙ্কিমচন্দ্রের অব্যবহিত পরেই যে সমস্ত উপন্যাস রচিত হইত, শুভদার কাঠামোটিও ঠিক তাহাদেরই অনুরূপ। ভাষা ও লিখনভঙ্গী বঙ্কিমচন্দ্রের ইন্দিরা বা তারক গঙ্গোপাধ্যায়ের স্বর্ণলতার অনুরূপ অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের সামাজিক উপন্যাস যে ভাবে লিখিত হইত, ইহাও সেই ভাবের। নায়ক নায়িকার কথোপকথন সরল ও স্বাভাবিক, চরিত্রগুলির বিকাশ অন্যান্য সমসাময়িক উপন্যাসের তুলনায় অধিক প্রাণবন্ত, মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ পরিণত শরৎ-সাহিত্যের তুলনায় খর্ব্ব হইলেও যে-সময়ে গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছিল, সে যুগের তুলনায় কোন অংশে হীন নহে। কলহশীলা কৃষ্ণপ্রিয়ার পুকুরঘাটের কথোপকথন, পতিতা কাত্যায়নীর ঝঙ্কার ও উপদেশ, জয়াবতীর মাতার সরল গ্রাম্যতা—সে যুগের যে কোন বিখ্যাত গ্রন্থের সমকক্ষ। অবশ্য এই সঙ্গে বলিতে হয় যে উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদটি সম্পূর্ণ অবান্তর ও পরিত্যাজ্য। তবে মোটের উপর সেকালের সুখপাঠ্য পুস্তকগুলির মধ্যে ইহাকে অন্যতম বলা যায়। সাহিত্যে কোন একটি পুস্তকের স্থান নিরূপণ করিতে হইলে ইহাই প্রথম দেখিতে হইবে যে, গ্রন্থখানিতে সেই যুগের ধারা কিরূপে ও কতটা ফুটিয়াছে এবং ইহার পর দ্বিতীয় লক্ষ্যবস্তু এই যে, গ্রন্থের মধ্য দিয়া আগামী কালের কতটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বিচারের এই দুইটি স্পষ্ট ধারা ধরিয়া বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, শুভদার প্রথম অংশ অর্থাৎ সমসাময়িক ধারা শুভদায় অটুট রহিয়াছে এবং দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ সাহিত্য ভবিষ্যতে যে-পথে অগ্রসর হইবে সেই পথের ইঙ্গিত প্রদান বাইশ বৎসরের তরুণ লেখকের নিকট হইতে যতটা আশা করা যাইতে পারে, শুভদায় তাহা অপেক্ষা অনেক বেশীই পাওয়া যায়। আর তাহাই যদি না হইবে তবে শরৎচন্দ্রের বাল্যবন্ধুগণ তাঁহাকে অত প্রশংসার চক্ষে দেখিবেনই বা কেন। শরৎ-জীবনী হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, কিশোর শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-সাধনার পরিচয়টুকুতে নির্ভর করিয়া পরিণত বয়সে তাঁহারই রচনা যে বাংলা সাহিত্যে উচ্চ আসন পাইবে, শরৎচন্দ্রের বাল্যবন্ধু প্রমথবাবু তাহা স্পষ্টভাবে সকলকে বলিতেন। অন্যত্র শরৎবাবুর বাল্য-সঙ্গীরা শরৎচন্দ্রের বাল্যের রচনা পাঠ করিয়াই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে 'শরৎদা একজন উঁচু দরের লেখক' এবং যে-বৎসর শরৎচন্দ্রের রচিত গল্প 'মন্দির' কুন্তলীন পুরস্কারে প্রথম স্থান অধিকার করে সেই বৎসর এই গল্প লিখিতে তাহার বন্ধুরাই তাঁহাকে উদ্বুদ্ধ করেন—কারণ উক্ত বন্ধুদের ঐ পুরস্কারের অর্থে বিশেষ প্রয়োজন ছিল। ইহা হইতেই অনুমিত হয় যে বন্ধুরা তাঁহার উপর এই ধারণা পোষণ করিতেন যে, শরতের রচনা প্রতিযোগিতায় যে কোন ক্ষেত্রেই প্রথম স্থান অধিকার না করিয়া যায় না।

শুভদা লইয়া বিশেষভাবে আলোচনা করিতে হইলে বলিতে হয় যে কাঠামোর দিক দিয়া শুভদা তৎকালীন উপন্যাসের অনুরূপ। ইহা পরিচ্ছেদ ও অধ্যায়ে বিভক্ত, গ্রাম্য স্ত্রীলোকগণের কথোপকথন বঙ্কিম ও তৎপন্থী লেখকদের অনুরূপ। গ্রন্থের প্রথম অংশের কথোপকথনগুলি লিপিবদ্ধ করিবার রীতিও সেই যুগের, অর্থাৎ

"ঝি। কিসের কষ্ট!

পি। কষ্ট কি একরকমের ?"

ইত্যাদি, যদিও শুভদা গ্রন্থের মধ্য অংশ হইতে আরম্ভ করিয়া শেষের দিকে নামের প্রথম অক্ষরের সংকেত দিয়া পাঠককে বক্তা কে ইহা বুঝাইবার এই রীতি আর পাওয়া যায় না এবং তাহার স্থলে শরৎচন্দ্রের পরবর্ত্তীকালে গৃহীত আধুনিক রীতিই পরিলক্ষিত হয়।

বাহিরের এই সমস্ত তুচ্ছ আবরণ ভেদ করিয়া গ্রন্থের মধ্যে প্রবেশ করিলে দেখা যায় যে, সেখানে বাইশ বৎসরের তরুণ গ্রন্থকার উপন্যাস সাহিত্যের নূতন এক দিক নির্ণয় করিয়া অর্দ্ধস্খলিত অথচ অর্দ্ধ দৃঢ়পদে সেইদিকেই চলিতে সুরু করিয়াছেন। বঙ্কিম সাহিত্যে নায়ক নায়িকারা ছিলেন জ্ঞানী, ধনী ও উচ্চস্তরের। নায়ক নায়িকাদের এই আভিজাত্য ঐ যুগের সমস্ত উপন্যাসেই পরিলক্ষিত হয়। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসেও এই রীতি অবলম্বিত হইয়াছে। কিন্তু শরৎ-সাহিত্যেই নায়কনায়িকাদের আভিজাত্য ভাঙ্গিয়া চরিত্রহীন, নেশাখোর, ভবঘুরে নায়ক হইতে আরম্ভ করিয়া মেসের ঝি এবং বাইজীকে পর্য্যন্ত নায়িকার আসন দান করিয়াছে। সাহিত্য-দর্পণের গ্রন্থকার বিশ্বনাথ কবিরাজের 'ধীরোদাত্ত সুমহান্' ছাড়াও যে মহৎপ্রাণ থাকিতে পারে, আপাতঃদৃষ্টিতে যে অধম, তাহার মধ্যেও যে উত্তমের সাময়িক বিকাশ পাওয়া যায়, আধুনিক যুগের এবং আধা-বোহিমিয় সাহিত্যের এই সত্য উনবিংশ শতাব্দীতেই দ্বাবিংশ বর্ষ বয়সের লেখক যে আংশিকভাবেও দিতে সক্ষম হইয়াছেন, ইহাই তাঁহার কৃতিত্ব। ভাবীকালে শরৎ-সাহিত্যে যে-সত্য বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, এই গ্রন্থে তাহার প্রাথমিক বিকাশ স্পষ্টই পরিলক্ষিত হয়। সাধারণ সমাজ যাহাদের ভালো বলে তাহাদের অপদার্থতা এবং সাধারণে যাহাদের মন্দ বলে তাহাদের মহত্ত্ব প্রকাশ করা, পরিণত শরৎ-সাহিত্যের এই যে অন্যতম বৈশিষ্ট্য ইহাও এই গ্রন্থে সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এ ছাড়া মন্দ যে নিরবচ্ছিন্ন মন্দই নহে তাহাও এই গ্রন্থের কয়েকটি চরিত্রের মধ্য দিয়া সজীবভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। পুরোবর্ত্তী এবং সমসাময়িক গ্রন্থের সহিত তুলনামূলকভাবে বিচার করিলে শুভদা যে-সময়ে রচিত হইয়াছিল, উহা যে সেই সময়ের একটি অভিনব গ্রন্থ তাহা জোর করিয়া বলা যায়। বলা বাহুল্য, সেই সময়েই উহা যদি নূতন ধরণের বলিয়া না লাগিত, তাহা হইলে পাণ্ডুলিপির পাঠকগণ উহা পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইতেন না, তবে বর্ত্তমানে শরৎ-সাহিত্যের পাঠকগণের নিকট উহা তত মধুর বলিয়া হয়ত নাও লাগিতে পারে। ইহার কারণ অতি সহজ। শরতের পূর্ণ চন্দ্রের উজ্জ্বল আলোকে যাহারা অভ্যস্ত, অপরিণত চন্দ্রের আলোক তাঁহাদের নিকট ম্লান মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু উপন্যাস-সাহিত্যের ক্রমিক ধারা—বিশেষতঃ শরৎ-সাহিত্যের ক্রমবিকাশ আলোচনা করিবার কতকগুলি মূলসূত্র যে শুভদা হইতে পাওয়া যায়, একথা নিঃসন্দেহে স্বীকার করিতে হইবে।

এই প্রসঙ্গে শুভদা উপন্যাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য ললনা চরিত্রের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাইতে পারে। ললনা সম্বন্ধে বলা যায় যে, আত্যন্তিক অর্থকষ্টের মধ্যে ভবিষ্যতের কোন আশা না দেখিয়া সে সমসাময়িক উপন্যাসের অন্যান্য নায়িকাদের মত আত্মহত্যার বিষয় চিন্তা করিয়াছিল, অষ্টম পরিচ্ছেদে ভ্রাতার সহিত কথোপকথন হইতে ইহাই প্রণিধান করা যায়, কিন্তু পরে সে কলিকাতায় যাইয়া নিজের যৌবনের বিনিময়ে অর্থোর্জ্জন করিয়া পারিবারিক অর্থকষ্ট নিবারণ করিতে কৃতসংকল্প হয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে এইরূপ চিন্তাধারা বাস্তবিকই প্রচণ্ড সাহসিকতার পরিচয়। এই উপন্যাসখানি সেই যুগে প্রকাশিত হইলে সমালোচকমহলে যে ইহা লইয়া একটা তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হইত, সে বিষয়ে তিলমাত্রও সন্দেহ নাই। কিন্তু অপর দিক দিয়া ললনার এই চিন্তা সত্যই স্বাভাবিক। চরিত্রহীন পিতা কাত্যায়নী নাম্নী পতিতাকে সর্ব্বস্ব দান করিয়াছেন, ইহাই বোধ হয় সংসারানভিজ্ঞা ললনার মনে ক্রমাগতই জাগিতেছিল। সংস্কারগত লজ্জাবশে এ বিষয়ে কাহারও সহিত পরামর্শ না করিয়া ললনা কলিকাতায় আসিবার জন্য এক অভিনব পন্থা আবিষ্কার করিয়া গঙ্গায় আসিয়া নামিল এবং মৃত্যুর সহিত যুদ্ধ করিয়া সুরেন্দ্রনাথের নিকট আশ্রয় পাইল। সুরেন্দ্র যখন তাহার মনোভাবের কতকটা আভাস পাইলেন, তখন তাহাকে বলিলেন, "তুমি রূপসী, তুমি যুবতী, কলিকাতায় যাইতেছ—এখন আর তোমাকে অর্থের ভাবনা ভাবিতে হইবে না—কলিকাতায় অর্থ ছড়ান আছে দেখিতে পাইবে"। ইহাতে পতিতা-জীবনের প্রথম ও স্পষ্ট ইঙ্গিতে ললনা এতই বিচলিত হইয়াছিল যে তাহার "বোধ হইল অকস্মাৎ বজ্রপাতে তাহার মাথাটা খসিয়া নীচে পড়িয়া গিয়াছে…যেন সে মূর্চ্ছিত হইয়া একজনের কোলের উপর ঢলিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু সে কোল যেন অগ্নিবিক্ষিপ্ত ; বড় কঠিন, বড় উত্তপ্ত। তাহাতে যেন একবিন্দু মাংস নাই—এতটুকু কোমলতা নাই। সমস্ত পাষাণ, সমস্ত অস্থিময়। মূর্চ্ছিত অবস্থায়ও সে শিহরিয়া উঠিল"। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ললনা অন্তরে অন্তরে কতটা পবিত্রা ও রক্ষণশীলা ছিল কিন্তু নিতান্ত অভাবে পড়িয়াই সে এই পথে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেই অগ্রসর হইতে বাধ্য হইয়াছিল। এই বালবিধবা ললনাই যখন সুরেন্দ্রনাথের অকপট ভালবাসা পাইয়াছিল তখন তাহার "সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইল, সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল। সে আর সে নয়, সে ললনা নয়, সে মালতী নয়—সে কেহ নয়—শুধু এখন যাহা আছে, সে তাহাই ; সুরেন্দ্রনাথের চিরসঙ্গিনী আজন্মের প্রণয়িনী ; সে সীতা, সে সাবিত্রী, সে দময়ন্তী, সীতা সাবিত্রীর নাম কেন, সে রাধা, সে চন্দ্রাবলী ; কিন্তু তাহাতেই বা ক্ষতি কি ? সুখ, শান্তি, স্বর্গের ক্রোড়ে আবার মান অপমান কি ? ললনা নিস্পন্দ অচেতন স্বর্ণপ্রতিমার ন্যায় সুরেন্দ্রনাথের ক্রোড়ের উপর পড়িয়া রহিল ; সে ক্রোড় আর অস্থিময়, পাষাণ, অঙ্গার-বিক্ষিপ্ত নহে, এখন শান্ত, স্নিগ্ধ, কোমল মধুময়"। যে যুগে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, সেই সময়ে পতিতা সম্বন্ধে এইরূপ উল্লেখে হয়ত ইংরাজী গ্রন্থের আভাস কেহ কেহ অনুমান করিতে পারেন, কিন্তু ইহা যে গ্রন্থকারের পক্ষে নিতান্ত দুঃসাহস ও তেজস্বিতার পরিচয় তাহাতে সন্দেহ নাই। এই বালবিধবা ললনা যে আত্মসুখের প্রয়াসী ছিল না, পৃথিবীতে যে তাহার কোন ব্যক্তিগত কামনাই ছিল না, তাহা গ্রন্থে বরাবরই পাওয়া যায়। সুরেন্দ্রকে সে শ্রদ্ধা করিত, সেইজন্যই সুরেন্দ্রনাথের নিতান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও সামাজিকভাবে তাহাকে বিবাহ করিতে সে বরাবরই বাধা দিয়াছে, কারণ ললনার মনে সর্ব্বদা এই আশঙ্কাই জাগরূক ছিল যে পাছে এইরূপ বিবাহের ফলে সমাজে সুরেন্দ্রনাথের তিলমাত্রও অবনতি হয়, অথচ সে চিরদিন সুরেন্দ্রের রক্ষিতারূপে বাস করিয়া নিজেকে হীনাদপি হীন করিতেও দ্বিধা বোধ করিল না। দেহে মনে ললনার এই প্রকাণ্ড আত্ম-অনাদরই অন্য দিক দিয়া তাহার অসীম নির্লিপ্তি ও আত্মত্যাগের অপূর্ব্বতায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহার অন্তরের এই বৈরাগ্য এত উজ্জ্বলভাবে তাহার দেহের উপর বিকসিত হইয়া থাকিত যে ভোগী সুরেন্দ্রনাথের ভোগবাসনা পর্য্যন্ত তাহার নিকটে আসিয়া সঙ্কুচিত হইয়া পড়িত। সুরেন্দ্র যখন ললনাকে বিলাসিতার প্রাচুর্য্যের মধ্যে রাখিয়াও দেখিলেন যে, কোন বিলাসিতাই ললনাকে স্পর্শ করিতে পারে না, তখন একদিন নিরুপায় হইয়াই তাহাকে বলিয়াছিলেন, "তোমার এই নিরাভরণা মূর্ত্তি বড় জ্যোতির্ম্ময়ী—স্পর্শ করিতেও সময়ে সময়ে কি যেন একটা সঙ্কোচ আসিয়া পড়ে—দেখিলেই মনে হয় যেন আমার এই পাপগুলা ঠিক তোমারই মত উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। তোমাকে বলিতে কি—তোমার কাছে বসিয়া থাকি—কিন্তু কি একটা অজ্ঞাত ভয় আমাকে কিছুতেই ছাড়িয়া যাইতেছে না বলিয়া মনে হয়। আমি তেমন সুখ পাই না—তেমন মিশিতে পারি না"। ইহার দ্বারা গ্রন্থকার যেন বুঝাইতেছেন যে বাহিরের অবস্থা-নিরপেক্ষ যে আত্মার শুচিতা, তাহা সর্ব্বকালে এবং

সর্ব্বসমক্ষেই আপনার তেজ বিকীরণ করিবে, কোন পার্থিব পরিবেশই তাহাকে ম্লান করিতে পারে না। কিন্তু ললনার অন্তরের এই অপার্থিব নিষ্ঠা যে কেবল শুষ্ক, নীরস তেজস্বিতার মধ্য দিয়া গ্রন্থকার শেষ করিয়াছেন তাহা নহে, বালবিধবার নিরুদ্ধ ভালবাসার সমস্ত উৎসই তিনি সুরেন্দ্রনাথের অভিমুখে মুক্ত করিয়াছেন; অথচ এই ভালবাসার প্রবাহে কোন চাপল্য বা দৈহিক অভিব্যক্তি নাই, সরল ও স্বাভাবিক গতিতে ইহা আপাতঃপঙ্কিল গণ্ডীর মধ্য দিয়া অনাবিল গতিতেই প্রবাহিত করাইয়াছেন। শরৎচন্দ্র এই ভালবাসাকে প্রথম দর্শনের ভালবাসা করেন নাই, কারণ যে অবস্থায় উভয়ের সাক্ষাৎ হয় সেই অবস্থায় দরিদ্রা ললনার পক্ষে অন্য কোন চিন্তার সম্ভাবনা থাকিতেই পারে না। সুরেন্দ্রনাথের নৈকট্য, অকপটতা ও আন্তরিকতাই সুরেন্দ্রের উপর ললনার শ্রদ্ধাকে ক্রমে ক্রমে আকর্ষণ করিয়াছিল এবং এই শ্রদ্ধাই ললনার প্রেমকে ক্রমশঃ সুপ্রতিষ্ঠিত করে। দুঃখ ও বিপদের মধ্য দিয়া ললনা চরিত্রের গম্ভীর, সরল প্রশান্তির এই অপূর্ব্ব চিত্র পাঠককে বরাবরই মুগ্ধ করে, গ্রন্থশেষে জয়াবতীর মাতার সহিত কথোপকথনে ললনার সহজ পরিহাস বুদ্ধি এবং সেই সঙ্গে দুঃখীর উপর সহানুভূতিও সুন্দর ভাবে প্রকাশ পায়। মোটের উপর সংক্ষেপে ইহাই বলা যায় যে, ললনা চরিত্র কেবল যে সে-যুগের সাহিত্যেই অভিনব তাহা নহে, বর্ত্তমান যুগেও ইহার একটি বিশেষ স্থান আছে। তবে শরৎচন্দ্রের অপরিণত লেখনীতে ভাষা ও প্রকাশভঙ্গীর অপটুতার জন্য এই চরিত্রটি যতটা উজ্জ্বলভাবে প্রবীণ শরৎচন্দ্রের দ্বারা ফুটাইয়া তুলা সম্ভব ছিল, তরুণ শরতের দ্বারা ততটা হয় নাই।

শুভদা গ্রন্থে ললনা ছাড়া অন্যান্য চরিত্রও মন্দ হয় নাই। বাস্তববাদী শরৎচন্দ্রের লেখনী মুখে বামুনপাড়ার কাত্যায়নী নাম্নী পেশাদারী পতিতার সহজ সরল গ্রাম্যরূপ সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কাত্যায়নী হারাণচন্দ্রের রক্ষিতারূপে বহু অর্থ শোষণ করিয়া শেষে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতেছে, অথচ হারাণের সাংসারিক দুঃখ, বিশেষ করিয়া অর্থাভাব তাহার পুত্রের আহার বা ঔষধ পথ্য হয় নাই শুনিয়া হারাণের হাতে দশটি টাকা দেওয়ার মধ্যে পতিতার যে মাতৃত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা বোধ হয় শরৎচন্দ্রের পূর্ব্বে কোন বাঙ্গালী ঔপন্যাসিকের লেখনীতে ব্যক্ত হয় নাই। এইরূপে কৃষ্ণপ্রিয়া তাহার ঝগড়াটে মূর্ত্তিতেই সকলের নিকট সুপরিচিতা, কিন্তু তাহার অন্তরে যে মমতার প্রস্রবণ সংগুপ্ত ছিল, তাহা শরৎচন্দ্রই প্রকাশ করিয়াছেন। সেই সঙ্গে সদানন্দ। সে ললনাকে গোপনে অর্থ সাহায্য করিয়া বলিতেছে, একথা কাহাকেও বলিও না, তবে নিতান্ত যদি বলিতে হয়, বলিও যে সদা পাগলা টাকায় চারি পয়সা হিসাবে সুদ লইয়া টাকা ধার দিয়াছে। এই সদানন্দই গোপনে অর্থ সাহায্য দিয়া ছলনার বিবাহ দিয়াছিল (ইহার অনুরূপ বর্ণনা আমরা শ্রীকান্তের শেষের দিকে পাই, শ্রীকান্তও তাহার সম্পর্কিত নাতিনীর বিবাহে এইরূপেই গোপনে অর্থ সাহায্য করিয়াছিল)। মোটের উপর শুভদা গ্রন্থের এই কয়টি চরিত্রের মধ্য দিয়া মন্দ যে নিরবচ্ছিন্ন মন্দ নয়, তাহার মধ্যেও যে ভাল আছে, শরৎচন্দ্রের অন্যতম প্রতিপাদ্য এই সত্যই নানাভাবে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।

শুভদার আলোচনা শেষ করিবার পূর্ব্বে একটি কথা না বলিলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকে। তাহা শুভদার দোষ। শুভদা গ্রন্থের আরম্ভ এবং অধ্যায় ও পরিচ্ছেদের বিভাগ বঙ্কিমী ছাঁচের হইলেও ইহার শেষটি সেরূপ মনোজ্ঞ হয় নাই। অবস্থার সংস্থান ও ঘটনার সন্নিবেশ হইতে কাঁচা হাতের অপটুতা স্পষ্টই অনুভূত হয়। ভাবের দিক দিয়া চরিত্র গঠন অনবদ্য হইলেও ভাষা ও প্রকাশভঙ্গীর সামান্য ত্রুটির জন্য পাঠকের মনকে এই অপূর্ব্ব চিত্রগুলি যেভাবে আকর্ষণ করা উচিত ছিল, সেভাবে পারে না। গ্রন্থের মধ্যে শরৎচন্দ্রের বাংলা ভাষা ও বাংলা ভাষায় বিরাম চিহ্ন প্রয়োগের অজ্ঞতাও নানা স্থানে সূচিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ :—

বানান ভুল—*

তিনি সম্ভ্রান্ত এবং বর্দ্ধিষ্ঠ লোক (পৃঃ ১৩)

ভাঙ্গা ঘরের কলম (পৃঃ ২৩৩)

গুরুতর বৈষয়িক আলোচনা (এই বানানটি পৃঃ ১৬৫, ১৬৯ এবং ১৭০এ পাওয়া যায়)

তোমাদের সবাইকে উপুস করতে হবে (পৃঃ ৪৫)

বাক্যবিন্যাস ও বিরাম চিহ্নাদির ভুল :—

চুরী করেছেন বলে, নন্দীরা হাজতে দিয়েছে (পৃঃ ১৯)

সমস্ত টাকাটা না দিয়ে বিশ্বাস হয়, আনা চারেক পয়সারও বিশ্বাস রাখতে হয় (পৃঃ ৩৮)

হৃদয়ের মহত্বতা, শৌর্য্য, বীর্য্য, গাম্ভীর্য্য ইত্যাদি (পৃঃ ৩৯)

সেও, সে টাকা হাসিয়া দিতে পারে নাই (পৃঃ ৫৩)

বলিও যে সদা পাগলা টাকা চারি পয়সা হিসাব সুদে টাকা ধার দিয়াছে (পৃঃ ৬১)

বালিকা কাল হইতেই সারদার সহিত তাহার ভাব ছিল, তাহার পর, তাহার বিবাহ হয়। হারানবাবুর অবস্থা তখন মন্দ ছিল না, ক্ষুদ্র আয়তনে যতখানি সম্ভব, ঘটা করিয়া বড় মেয়ের বিবাহ দেন (পৃঃ ৭৩)

সদানন্দ, পুণ্যশরীরা পিসিমাতার দেহ বারাণসী ধামে গঙ্গাবক্ষে দাহ করিয়া হলুদপুরে ফিরিয়া আসিলেন (পৃঃ ১৩০)

হারানচন্দ্র এখন গুণ গুণ স্বরে গলার সুর লইয়া সমস্ত বামুন পাড়াটা ঘুরিয়া বেড়ান (পৃঃ ১৬১)

ঘরে আসিয়া, ডাক্তারে যাহা দেখে তাহা তিনি দেখিলেন, তাহার পর বাহিরে আসিয়া সদানন্দকে ডাকিয়া বলিলেন (পৃঃ ১৮৪)। ইহা একটি ইংরাজীর পেরেস্থিসিস্, বাংলায় বিসদৃশভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে। এই কয়টি ভাষাগত ত্রুটী শুভদায় পাওয়া যায়।

দোষে গুণে শরৎচন্দ্রের তরুণ বয়সের রচনা শুভদার আলোচনা করিয়া শেষ পর্য্যন্ত ইহাই বলা যায় যে, উপন্যাস হিসাবে গ্রন্থখানি উঁচুদরের নয় বটে, কিন্তু ঔপন্যাসিকের চিন্তাধারার ক্রমাভিব্যক্তি অনুসরণ করিতে গেলে শুভদাই শরৎচন্দ্রের তরুণ মনের একমাত্র পরিচায়ক। সে হিসাবে গ্রন্থটি শরৎচন্দ্রের পরিণত বয়সের রচনা অপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়।

পরিশেষে, অচলিত সংগ্রহ প্রকাশের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিয়াছেন, শরৎচন্দ্রের শুভদা সম্বন্ধেও আমরা বিশ্বকবির ভাষায় তাহাই বলিতে পারি,—"যাঁরা পড়বেন, তারা এই সব কাঁচা বয়সের অকালজাত অঙ্গহীনতার নমুনা দেখে যদি হাসতে হয় ত হাসবেন, তবু একটুখানি দয়া রাখবেন মনে এই ভেবে যে, ভাগ্যক্রমে এই আরম্ভেই শেষ নয়।"

---

* শরৎচন্দ্রের নামের বানানটি ভুল বলিয়া এক সময় এক বিরুদ্ধ সমালোচনা উঠিয়াছিল। শুভদা পাণ্ডুলিপির প্রথম পৃষ্ঠায় আমরা "শরৎচন্দ্র" এই বানানই দেখিতে পাই, পরে কিন্তু ছাপার অক্ষরে তিনি এই ভ্রম সংশোধন করিয়া "শরচ্চন্দ্র" এই বানান লিখিতেন। ভারতবর্ষে প্রকাশিত শ্রীকান্ত প্রথম পর্ব্বের লেখক হিসাবে ১৩২৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখ পর্য্যন্ত এইরূপ শুদ্ধ বানানই লিখিয়াছিলেন, কিন্তু এই বৎসরের জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে শ্রীকান্তের শিরোনামেই পুরাতন অশুদ্ধ বানান 'শরৎচন্দ্র' পাওয়া যায়। ইহার পর হইতে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত শরৎচন্দ্র ছেলেবেলাকার অভ্যস্ত ভুল বানানেই সগৌরবে স্বাক্ষর করিতেন।

দাবী

শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়

বোমা পড়িবে এই আশঙ্কাতেই যারা আধ-মরা হইয়া কলিকাতার বাহিরে পালাইয়াছিল, আমিও তাদেরই একজন। বলা বাহুল্য, পাণ্ডবদের নীতি অনুসরণে অর্দ্ধেক ত্যাগ করিয়া যাই নাই, সস্ত্রীকই গিয়াছিলাম। কাশীতে কয়েকজন পরিচিত এবং আত্মীয় ছিলেন, তাঁরাই চেষ্টা করিয়া একটা বাড়ী ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেইখানেই গিয়া উঠিতে হইল। বাড়ীটা কিন্তু আসল সহর হইতে একটু দূরে। সহর হইতে বাহির হইয়া যে পথ দিয়া সারনাথের দিকে যাওয়া যায় সেই দিকে। জায়গাটা নিরিবিলি বটে, কিন্তু সহরের এত কাছে হওয়া সত্ত্বেও 'দেহাত'। বাজার-হাট সবই এখান হইতে দূরে, সকাল আটটার পর হইতেই এদেশে গরম এমনি প্রচণ্ড যে পায়ে হাঁটিয়া যাতায়াত করে কার সাধ্য! সুতরাং অধমতারণ সাইকেল-রিক্স ভিন্ন গতি নাই। টাঙ্গা প্রভৃতি অভিজাতদের জন্য—কারণ সেগুলির ভাড়া বেশী। কিন্তু দিনের মধ্যে রিক্‌সা ভাড়াই বা ক'বার দেওয়া যায়?

ভাবিয়া চিন্তিয়া গৃহিণীকে বলিলাম, আটা ময়দা চাল···এগুলো মাসকাবারী আনা থাকবে, শাক-সবজী, তরিতরকারী এসব রাস্তার ফিরিওয়ালাদের কাছে কিনে নিলেই চলবে।

গৃহিণী কহিলেন, মাছ? মাছ নৈলে ছেলেরা খাবে কি দিয়ে—

ভাবিবার বিষয় বটে। বাঙ্গালীর সংসারে মাছ নহিলে চলিবে কি করিয়া? আর ফেরিওয়ালারা মাছ লইয়া ফেরি করিতে যায় কদাচিৎ। মাছের জন্য সেই বাঙ্গালীটোলার কাছাকাছি বাজারটায় না গিয়া উপায় বোধ হয় নাই। ভাবিতে লাগিলাম।

পরদিন কিন্তু দৈবানুগ্রহে সুযোগ একটা মিলিয়া গেল। গ্রাম অঞ্চল হইতে অনেক ফেরীওয়ালাই মাথায় আনাজপত্র লইয়া সহরের বাজারের দিকে যায়। খুব ভোর বেলাতেই তাদের কলরবে পথ একেবারে মুখর হইয়া উঠে। স্ত্রী-পুরুষ সবাই মাথায় একটা করিয়া ঝুড়ি লইয়া গল্পগুজব করিতে করিতে বেচা-কেনা করিতে যায়। তাদেরই অপেক্ষায় পথে দাঁড়াইয়াছিলাম। দু'একজনের সঙ্গে কথাবার্ত্তা পাকা করিয়া ফেলিলাম; রোজ সকাল বেলায় তারা তরিতরকারী কিছু কিছু দিয়া যাইবে। কিন্তু বাঙ্গালী মেয়ের জীবনে যে বস্তুটা সিঁথির সিঁদুরের পরেই উল্লেখ-যোগ্য—সেই মাছ?

দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিলাম। হঠাৎ চোখে পড়িল পথের ধারে প্রকাণ্ড আমগাছটার তলায় একটা ভাঙা খাটিয়ার উপর বসিয়া একটা লোক বারবার আমাকে হাত তুলিয়া প্রণাম করিতেছে। খালি-গায়েই বাহির হইয়াছিলাম, ভাবিলাম ব্রাহ্মণত্বের চিহ্নটুকু স্কন্ধে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া লোকটার ভক্তির সমুদ্র একেবারে উথলিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু প্রায় মিনিট দশেক দাঁড়াইয়া থাকিবার পরও যখন তাহার হাত তুলিয়া ঘন ঘন প্রণাম নিবেদনের কসরৎটা বন্ধ হইল না, তখন একটু বিরক্ত হইয়াই তার সেই তিনটি পদযুক্ত খাটিয়াটির দিকে অগ্রসর হইলাম। কাছে গিয়া বলিলাম, কেয়া মাঁগতা?

লোকটি সবিনয়ে বলিল, গোড় লগি মহারাজ।

অর্থাৎ এতক্ষণ যে ভক্তির অভিব্যক্তি দেখিতে পাইতেছিলাম, মুখেও সেটা ব্যক্ত হইল।

লোকটা এইবার—বলা বাহুল্য নিজের ভাষায়, আমি কতদিন এখানে থাকিব, কোন রকম অসুবিধা হইতেছে কি না ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিয়া আমাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল; এমন কি সকাল হইতে বাড়ির বাহিরে কেন দাঁড়াইয়া আছি সে সম্বন্ধেও জেরা সুরু করিয়া দিল। কারণটা তাহাকে খুলিয়া বলিলাম। লোকটা আমাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিল, হাঁ, মছরি ভি মিলেগা। অভি জায়গা।

সুতরাং আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষায় থাকিতে হইল। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া লোকটিকে ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলাম। একটা পা কাটা এবং নানাপ্রকার ময়লা, দুর্গন্ধ কাপড় দিয়া জড়ান। অপর পা-টা অস্বাভাবিক স্ফীত, বোধ হয় গোদ হইয়াছে। খাটিয়ার পায়ার কাছে একটা হুঁকো ঠেস দিয়া রাখা আছে দেখিলাম। তাহারই কাছে মাটীর একটি ভাঙা ভাঁড়ে কিছু কাঠকয়লা, খানিকটা তামাক এবং একটা চকমকি। বুঝিলাম এগুলি লোকটির তামাক খাইবার সাজ-সরঞ্জাম। এত সকালে কথা বলিবার মত একটি লোক পাইয়া বুড়া একেবারে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। বয়স তাহার ষাট-পঁয়ষট্টির কম হইবে না। কিছুকাল আগে পর্য্যন্ত দুই ছেলে, দুই ছেলের বউ এবং নাতি নাতনীগুলি লইয়া লোকটা বেশ আরামেই দিন কাটাইতেছিল। কিন্তু হঠাৎ 'পিলেগে' এক সপ্তাহের মধ্যে তার দুই ছেলে মারা গেল, ছেলের বউ দুটিও ধড়ফড় করিয়া মরিল এবং তিনটি নাতি নাতনীর মধ্যে দশ বছরের এক নাতনী ছাড়া আর কেউ বাঁচিয়া রহিল না। সেই হইতেই রোজ সকাল বেলা এবং বিকালে কিছুক্ষণ এই গাছতলাই তার আশ্রয়। নাতনী যমুনিয়া (বোধ হয় যমুনার অপভ্রংশ) সকালে এবং বিকালে হাত ধরিয়া তাকে এইখানটিতে পৌঁছাইয়া দিয়া যায় এবং সে এইখানটিতে বসিয়া সারনাথের যাত্রীদের পথ বলিয়া দেয়; যাহাদের পথঘাট জানিবার দরকার নাই তাহাদেরও পথ বলিয়া দিতে কসুর করে না। বাবু ভেইয়ারা খুসী হইয়া তাহাকে দুই একটি পয়সা দেন; দিনান্তে তাহার উপার্জ্জন কোন কোন দিন তিন চার আনা পর্য্যন্ত হয় এবং তাহাতেই তাহাদের দুই-জনের—ঠাকুর্দ্দা ও নাতনীর ছাতু আর আটার সংস্থান হইয়া যায়।

বুড়ার নাম সুখলাল। যমুনিয়া সুখলালকে কেবল গাছতলায় পৌঁছাইয়া দিয়া যায় না, আবার হাত ধরিয়া দুই বেলা পঙ্গু ঠাকুর্দ্দাটিকে বাড়ীতেও লইয়া যায়। রুটী পাকানই বলো, আর ছাতু মাখাই বলো—সব কাজের ভার সেই দশ বছরের মেয়েটির উপর। দাঁত ফোক্‌লা, নাকে ছোট একটি নথ—সিঁথিতে মেটে সিঁদুরের চিহ্ন—একটা মেয়েকে মাঝে মাঝে এই গাছতলায় দেখিয়াছি। বুঝিলাম, সেই যমুনিয়া। সুখলালের ছেলেরা বাঁচিয়া থাকিতেই যমুনিয়ার বিয়ে হইয়া গিয়াছে, কিন্তু 'দামাদ'

অর্থাৎ জামাইয়ের বয়স নেহাৎ অল্প তাই যমুনিয়া এখনও 'শ্বশুরায়' যায় নাই।

ভাগ্যে যমুনিয়া শ্বশুরঘর করিতে যায় নাই, নহিলে অসহায় সুখলালের অবস্থাটা কি হইত দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাই বোধ হয় ভাবিতেছিলাম। এমন সময় সুখলাল আঙ্গুল দেখাইয়া বলিল, মছরীওয়ালী আই।

অর্থাৎ মাছওয়ালী আসিয়া পড়িয়াছে।

দুই হাতের প্রকোষ্ঠ পর্যন্ত উল্কির চিহ্ন, মাথায় মেটে সিঁদুরের মস্ত বড় একটা টিপ এবং এয়তির রেখা, নিচের হাতে একরাশ গালার চুড়ি—মাছওয়ালী আসিয়া পড়িল। বয়স চল্লিশ পার হইয়াছে, শরীরের আয়তন রীতিমত প্রকাণ্ড।

সুখলালই মাছওয়ালীর কাছে কথা পাড়িল। কিন্তু মাছওয়ালী কিছুতেই রাজী হইবে না। সে কেবলি বলে, নেহি। তার আপত্তির কারণটা বুঝিতে না পারিয়া রাগ করিয়া চলিয়াই আসিতেছিলাম। সুখলাল আসিতে দিল না এবং অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া মাছওয়ালীকে শেষ পর্য্যন্ত রোজ সকালে কিছু মাছ আমাকে দিয়া যাইবার জন্য রাজী করাইল। মাছওয়ালী চলিয়া গেলে খুসী হইয়া সুখলালকে দুটি পয়সা দিলাম। আনন্দে ও কৃতজ্ঞতা নিবেদনে সুখলাল আমাকে অস্থির করিয়া তুলিল। সেদিনের বরাদ্দ মাছগুলি লইয়া তাড়াতাড়ি বাড়ীর দিকে ফিরিলাম। হাতে মাছ দেখিয়া গৃহিণী খুসী হইলেন, মুখে হাসি দেখিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইলাম।

সুখলালের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ক্রমশঃ রীতিমত ঘনিষ্ঠ হইয়া দাঁড়াইল। মাছওয়ালীর অপেক্ষায় প্রতিদিন গাছতলায় গিয়া দাঁড়াইতে হয় এবং সেই অবসরে সুখলালের দীর্ঘ জীবনের সুখ-দুঃখের বিচিত্র গল্পও কিছু কিছু না শুনিলে চলে না। আসিবার সময় তাহার বিবর্ণ মুখ, বিশীর্ণ দৃষ্টির দিকে চাহিয়া কখন যে পকেট হইতে দুইটি পয়সা বাহির করিয়া বেচারীর হাতে গুঁজিয়া দিই তাও যেন সব সময় ঠিক বুঝিতে পারি না। বাড়ীতে আসিয়া মনকে প্রবোধ দিই, সুখলালের মধ্যস্থতায় মাছওয়ালীর সঙ্গে একটা ব্যবস্থা না হইলে এতদিনে সাইকল-রিক্সার পিছনে কত পয়সাই খরচ হইয়া যাইত! কিন্তু হিসাব করিয়া দেখিলে সুখলালের লাভটাও খুব কম নয়। গৃহিণী প্রায়ই সুখলালের জন্ম ভাত তরকারী পাঠাইয়া দেন এবং সেগুলি সে গাছতলায় বসিয়া পরম পরিতৃপ্তি সহকারে আহার করে। তারপর যমুনিয়া যখন দুপুর বেলায় ঠাকুর্দ্দার উচ্ছিষ্ট থালাবাটি মাজিয়া ফেরৎ দিতে আসে তখন সেই ফোক্‌লা মেয়েটার হাতেও একটা পেঁড়া বা দুখানা জিলিপি না দিলে চলে না। এগুলো ফাউ, আমার দৈনিক দুটি পয়সা তো আছেই।

সেজন্য দুঃখ করি নাই। কল্পিত বোমার ভয়ে দেশ ছাড়িয়া বিদেশে আসার মানেই অর্থ শ্রাদ্ধ। সে যাই হোক, দিন একরকম মন্দ কাটিতেছিল না।

কিন্তু আফিস হইতে হঠাৎ একদিন জরুরী চিঠি আসিয়া হাজির। অবিলম্বে আমি যেন কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়া বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করি। আমাকে বাদ দিয়া অফিসের কাজকর্ম্ম নাকি অচল হইয়া পড়িয়াছে।

সুতরাং স্ত্রীর কাছে একদিন ক্ষুণ্ণমনে বিদায় লইয়া কলিকাতা-গামী ট্রেণের কামরায় উঠিয়া বসিলাম। কাশীতে যে কয়জন আত্মীয়স্বজন ছিলেন তাঁদের সবাইকে একবার করিয়া বলিয়া আসিলাম, প্রবাসিনী অসহায়া মহিলাটীর খোঁজ খবর যেন তাঁহারা প্রত্যহ একবার লইয়া লন। একজনকে রাত্রিতে পাহারা দিবার জন্যও অনুরোধ জানাইয়া আসিলাম।

কলিকাতায় আসিয়া কাজকর্ম্ম মিটাইতে এবং বড় সাহেবের মেজাজ বুঝিয়া আবার মাসখানেকের ছুটির ব্যবস্থা করিতে প্রায় পনের দিন কাটিয়া গেল। যেদিন ছুটী মঞ্জুর হইল সেই দিনই দুপুরে পুনরায় ডেরাডুন এক্সপ্রেসে উঠিয়া বসিলাম। বিশেষ একটি মুখ ধ্যান এবং সস্তা ইংরেজী নভেল পাঠ করিতে করিতে কখন যে ট্রেণ আসানসোলে পৌছিয়াছে, কিছুই ভাল করিয়া লক্ষ্য করি নাই। হঠাৎ কোটপ্যান্টপরা এক ভদ্রলোক বেতের ও চামড়ার কতগুলি সুটকেশ এবং অনেকগুলি ছেলেমেয়ে ও তাহাদের যাকে লইয়া আমাদের কামরায় ঢুকিয়া পড়িলেন। মুখের দিকে চাহি-তেই দেখি, আমারই এক আত্মীয়। চিরকাল তাঁহাকে অফিসে বসিয়া সাহেবী ষ্টাইলে কাজ করিতে দেখিয়াছি, এমন অবস্থায় তাঁহার দেখা পাইব ভাবিতে পারি নাই। তিনিও আমাকে দেখিয়া রীতিমত বিস্মিত এবং বিব্রত।

By Jove! আমরা যে তোমার ওখানেই যাচ্চি হে! ছেলেপুলেগুলির দিকে চাহিয়া হৃৎকম্প হইল। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, কোথায় কাশীতে?

রাজীববাবু ঘর্ম্মাক্ত মুখটী রুমাল দিয়া মুছিতে মুছিতে বলিলেন, তা নইলে আর কোথায়? তোমার টুনীদি (রাজীববাবুর স্ত্রী, রুল অফ থ্রীতে আমার শ্যালিকা, বয়সে আমার স্ত্রীর চেয়ে বড়) বললেন, খুকীরা (অর্থাৎ আমার স্ত্রী) কাশীতে রয়েচে। চলো ঘুরে আসি। কিন্তু তোমরা কি এখন কাশীতে নেই নাকি? এদিকে যাচ্চই বা কোথায়?

ব্যাপারটা খুলিয়া বলিলাম। চাকরীজীবী মানুষ, সাহেবকে সন্তুষ্ট করিতে গিয়াছিলাম। রাজীববাবু আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন, তবু ভাল, আমি তো ভাবলাম টিকিট কখানার টাকাগুলো মিছিমিছি নষ্ট হলো।

তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন। আমার দেহের ঘর্ম্মপ্রবাহ বাড়িয়া গেল। একটি, দুটি…সাতটি ছেলে মেয়ে, বিভিন্ন বয়সের এবং বিভিন্ন আকারের। তার উপর স্বয়ং রাজীববাবু এবং টুনী-দি। ফাউ হিসাবে একটী চাকরও আছে দেখিলাম। ইহার উপর আমরা দুজন এবং আমাদের দুটি ছেলে-মেয়ে। আমাদের ছোট্ট ভাড়াটে বাড়ীতে এতগুলি লোককে ঠাঁই দিব কোথায় ভাবিতেই তালু যেন আরও শুকাইয়া উঠিল। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনাদের যাবার কথাটা চিঠি লিখে জানিয়ে দিয়েচেন নিশ্চয়ই?

রাজীববাবু অমায়িক হাসিতে মুখ উদ্ভাসিত করিয়া বলিলেন, সময় পেলাম কই। তা ছাড়া খুকীর পক্ষে it will be a pleasant surprise.

আমোদের ব্যাপারই বটে! মনের ভাবটা যথাসাধ্য গোপন করিবার জন্য ইংরেজী ডিটেকটিভ উপন্যাসখানার একটা পাতার দিকে অকারণে চাহিয়া রহিলাম। হরফগুলো খুব দুর্ব্বোধ্য মনে হইতে লাগিল।

বাড়ীতে পৌঁছিবার পর মুহূর্ত্ত হইতে এমন দক্ষ যজ্ঞ শুরু হইয়া গেল যে মনে হইল, ইহার চেয়ে কলিকাতায় থাকিয়া বোমা খাইয়া মরিয়া যাওয়া ঢের ভাল ছিল। টুনী-দির 'we are seven' স্বল্প পরিসর বাড়ীখানার মধ্যে ছুটাছুটি করিয়া, বিছানায় উঠিয়া, গাছে চড়িয়া এবং চড়িতে গিয়া পড়িয়া গিয়া মাথা খারাপ করিয়া দিল। গৃহিণী মুখে কিছু বলিতে পারিলেন না, খাতিরের যাহাতে ত্রুটি না হয় সেজন্য আগ্রহের আতিশয্য দেখাইতে লাগিলেন। রাজীববাবু সাহেবী আদব-কায়দার মানুষ, তিনি ছেলেগুলোকে শান্ত করিবার জন্য বার কয়েক প্রচণ্ড ধমক দিলেন। তাহারা মিনিট কয়েক স্থির হইয়া রহিল, তাহার পর যে-কে সেই। এই গণ্ডগোলের ফাঁকেই গৃহিণী এক সময় আর একটি সুসংবাদ দিলেন।

—কাল মুটুবাবু এসেছিলেন কয়েকটা টাকার জন্যে। বললেন, বিশেষ দরকার। আমি তাঁকে বলে দিয়েচি তুমি আজ কলকাতা থেকে ফিরবে—তারপর—

তারপর আর শুনিবার ইচ্ছা ছিল না। মুটু আমার অনেক দিনের বন্ধু। মাস কয়েক হইতে সেও কাশীতেই আছে। হঠাৎ দরকার পড়িলে বন্ধুর কাছে টাকা চাওয়া এমন কিছু অন্যায় নয়, বিশেষতঃ এই বিদেশে। কিন্তু—গৃহিণী এইবার কণ্ঠস্বর একটু নিচু করিয়া বলিলেন, মাছওয়ালী এখুনি মাছ দিতে আসবে। ভাল মাছ কিছু বেশী করে নিও—

ঘিয়ের টিন হইতে খানিকটা ঘি হড় হড় করিয়া ঢালিয়া লইয়া গৃহিণী রান্না ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন। বুঝিলাম, লুচি ভাজা হইবে। অতিথি নারায়ণ।

মুখ হাত ধুইয়া চায়ের প্রতীক্ষা করিতেছি—মাছওয়ালীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া বাহিরে ছুটিতে হইল। দৈনিক এক পোয়া মাছ মাছওয়ালী আমাদের জন্য বরাদ্দ করিয়া রাখিয়াছে। দাঁড়িপাল্লা ঠিক করিয়া তা'ই সে ওজন করিতেছিল।

বলিলাম, দেখি আর কি মাছ আছে ?

মাছওয়ালী বিরক্ত পুরুষালী কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, কাহে ?

বলিলাম, দরকার আছে। দেখি না আর কি মাছ আছে তোর ?

অনিচ্ছা সত্ত্বেও মাছওয়ালী ঝুড়ির চাপাটা একটু সরাইয়া দিল। দেখিলাম উরুল, পাবদা, রুই অনেক রকম মাছে তাহার ঝুড়িটি বোঝাই হইয়া আছে।

বলিলাম, আমাকে একটা রুই আর কিছু পাবদা দিয়ে যা। মাছওয়ালী সবেগে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, নেহি।

বিরক্ত হইয়া বলিলাম, তোর সবতাতেই নেহি! বাজারেও পয়সা পাবি, এখানেও পয়সা পাবি, তোর আপত্তি কিসের? প্রশ্নের উত্তর না দিয়া মাছওয়ালী বলিল, তোমারা যো হিস্‌সা ওহি লেও।

তাহাকে অনেক করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম—এখানে মাছগুলি বেচিয়া গেলে সে অনেক তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরিতে পারিবে, খরিদ্দারের অপেক্ষায় বাজারে তাহাকে হাঁ করিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে না। কিন্তু কিছুতেই তাহাকে রাজী করান গেল না।

আমি যতই তাহাকে অনুনয় বিনয় করি ততই সে ঘাড় ঘুরাইয়া বলে, আরে বাবু, ঘরমে যাকে কর্‌ব কা? পড়োশী লোগনকে বোলব কা?

তাহার কথার মাথামুণ্ড কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। বলিলাম বাড়ীতে 'মেহমান' অর্থাৎ অতিথি আসিয়াছে, বেশী মাছ না পাইলে আমার ইজ্জৎ থাকিবে না।

ইজ্জতের কথা শুনিয়া মাছওয়ালী কি যেন ভাবিতে লাগিল। মনে করিলাম, এইবার হয়ত তার দয়া হইবে। কিন্তু কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিবার পর সে বলিল; আজ না দেব্‌ বাবু। কল্‌সে তোঁহার বাস্তে লে আওয়ব।

অর্থাৎ আজ সে বেশী মাছ কিছুতেই দিবে না। কাল আমার জন্য দয়া করিয়া বেশী মাছ লইয়া আসিবে।

দৈনিক বরাদ্দের মাছগুলিও ফেরৎ দিয়া বলিলাম, তবে নিয়ে যা তোর মাছ। আমি বাজার থেকেই সব নিয়ে আসবো। মাছওয়ালী বিনা বাক্যব্যয়ে মাছ কটি তুলিয়া লইয়া চলিয়া গেল। মাছওয়ালীর বিরুদ্ধে 'জেহাদ' ঘোষণা করিব বলিয়া পথের ধারের গাছতলাটীর দিকে চাহিলাম, কিন্তু দেখিলাম গাছতলায় ত্রিভঙ্গ খাটিয়াটা পড়িয়া থাকিলেও সুখলাল নাই। বিরক্তির মাত্রাটা বাড়িয়া গেল, ভিতরে চলিয়া আসিলাম।

গৃহিণীর কাছে খবর পাওয়া গেল, বুড়া সুখলাল গত চার পাঁচ দিন গাছতলায় আসে নাই। মাঝে যমুনিয়া একদিন আসিয়াছিল, তাহার মারফতে খবর পাওয়া গিয়াছে—সুখলাল জ্বরে বেহুঁস হইয়া পড়িয়া আছে। অন্য সময় হইলে হয়ত সুখলাল সম্বন্ধে একটু ভাবিতাম; কিন্তু এখন রাজীব এণ্ড কোম্পানীর জন্য মাছ সংগ্রহ করাই আমার সর্ব্বপ্রধান কাজ। গৃহিণীকে বলিলাম, টাকা দাও বাজারে যাব।

বাজারে যখন আসিলাম তখন মাছ ছাড়াও কতকগুলি আবশ্যক ও অনাবশ্যক জিনিষ না কিনিয়া পারিলাম না। মাছের বাজারে ঢুকিতেই মাছওয়ালীর সঙ্গে দেখা। আমি তাহাকে এড়াইয়া অন্যদিকে যাইবার চেষ্টায় ছিলাম; মাছওয়ালী নিজেই ডাক দিয়া বলিল, আও, লে যাও মছরী।

প্রতিশোধ গ্রহণের ভাব লইয়া বলিলাম, নহি।

মাছওয়ালী বলিল, কাহে ?

বললাম, তখন দিলি না কেন? তা হলে ত আর—

মাছওয়ালী বলিল, তোকর কহলি তো সব, তু না সামঝবি তো হাম কা করি!

অর্থাৎ আমাকে সে সবই বলিয়াছে, আমি যদি না বুঝিতে পারি, সে কি করিবে? কি যে সে বলিয়াছে এবং কি যে আমি বুঝিতে পারি নাই, সেটা ঠিক উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। সে যাই হোক, শেষ পর্য্যন্ত তাহার কাছ হইতে কিছু মাছ কিনিতেই হইল।

বাড়ী ফিরিবার জন্য মাছ ও তরিতরকারী এবং ফলমূল সমেত রিক্সায় উঠিয়া বসিয়াছি, মুটুর সঙ্গে দেখা।

—কখন এলি রে? আমি যে তোর বাড়ী যাব ভাবছিলাম। বলিলাম, শুনেচি। কিন্তু ভয়ানক মুস্কিলে পড়ে গেছি ভাই, বাড়ীতে গুটি নয়েক অতিথি এসে হাজির হয়েচেন। খরচের পরিমাণটা কি রকম বেড়ে গেছে দেখতেই পাচ্ছিস। ঠিক এই সময়—

মুটু চালাক ছেলে, বুঝিতে পারিল। তবু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, থাক, এমন কিছু জরুরী দরকার নেই। আচ্ছা ভাই চলি—

ঘুটু চলিতে সুরু করিল। আমার দ্বিচক্রযান-বাহিত রিক্সাও ছুটিতে লাগিল। ঘাড় ফিরাইয়া ঘুটুর অপস্রয়মান মূর্ত্তির দিকে চাহিলাম। সত্যিই কি তার টাকার দরকার খুব বেশী ছিল না? না থাকিলে সে একেবারে আমার বাড়ী গিয়া টাকার কথা বলিয়া আসিয়াছিল কেন? তবে? একবার ভাবিলাম, ঘুটুকে ডাকিয়া বলিয়া দিই, বিকালে বাড়ীতে গিয়া সে যেন টাকা লইয়া আসে। তখনই আবার রাজীববাবু, টুনী-দি এবং তাঁহাদের সপ্তরথীর কথা মনে পড়িল। তাঁহাদের বারাণসী পরিদর্শন কতদিনে শেষ হইবে তারই বা ঠিক কি? তা ছাড়া, ঘুটুর দরকার খুব বেশী হইলে সে নিশ্চয়ই আমাকে জোর করিয়া বলিত।

বাড়ীতে ফিরিয়া মাছের এবং তরিতরকারীর রাশি উঠানে ঢালিয়া দিলাম। হিন্দুস্থানী ঝিটী আসিয়া মাছ কুটিতে বসিল। গৃহিণী পাশে দাঁড়াইয়া নির্দ্দেশ দিতে লাগিলেন। টুনী-দির সাতটি ছেলেমেয়ে নানাবিধ মৎস সন্দর্শনে পুলকিত হইয়া স্বল্প পরিসর উঠানের চতুর্দ্দিকে উদ্দাম নৃত্য জুড়িয়া দিল। আমাদের দুটিও তাদের সঙ্গে যোগ দিল।

ঘরে ঢুকিয়া গায়ের জামাটা খুলিবার উপক্রম করিতেছি, খোলা জানালার পথে গাছতলাটার দিকে চোখ পড়িয়া গেল। দেখিলাম বুড়া সুখলাল সেই ভাঙ্গা খাটিয়াখানার উপর বসিয়া আমাদের বাড়ীর দিকে চাহিয়া আছে। আমাকে দেখিয়াই সে দুই হাত তুলিয়া ঠিক সেই প্রথম দিনের মত উদ্দেশে প্রণাম নিবেদন করিতে লাগিল। দেখিয়া দয়া হইল। বোধ হয়, আমি ফিরিয়া আসিয়াছি শুনিয়া অসুস্থ অবস্থাতেই গাছতলায় আসিয়া বসিয়াছে।

টুনী-দির বড় ছেলে মণ্টুকে ডাকিয়া বলিলাম, যা' ওকে দুটো পয়সা দিয়ে আয়।

মণ্টু পয়সা লইয়া চলিয়া গেল। আমি বাজারের খরচটা মনে মনে হিসাব করিতে লাগিলাম। খানিক পরেই দেখি মণ্টু ফিরিয়া আসিয়াছে। পয়সা দুইটি ফেরৎ দিয়া বলিল, নিলে না।

আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম, কেন?

মণ্টু কহিল, বুড়োটা বললে, আরও সাড়ে সাত আনা ও আপনার কাছে পায়। সব ওর একসঙ্গে চাই।

মণ্টুর কথার বিন্দু-বিসর্গ বুঝিতে পারিলাম না। আশ্চর্য্য হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছি দেখিয়া মণ্টু বলিল, বিশ্বাস না হয় চলুন আমার সঙ্গে।

খানিকটা অবিশ্বাস এবং খানিকটা কৌতূকের ভাব লইয়া সুখলালের কাছে গিয়া দাঁড়াইলাম। বেশ একটা ধমকের সঙ্গে প্রশ্ন করিলাম, পয়সা দুটো নিসনি কেন?

রোগ ভোগ করিয়া সুখলালের কণ্ঠস্বর বেশ দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। ক্ষীণকণ্ঠে সে জবাব দিল, এক আঠ আন্নি মিলি, দো পয়সা লেব কাহে?

বিরক্ত ও উত্তেজিত হইয়া প্রশ্ন করিলাম, আট আনা কি জন্যে পাবি?

সুখলাল আমার মুখের দিকে চাহিয়া বেশ সপ্রতিভ ভাবেই বলিল, দো পয়সা হিসাব সে বোলা দিন্—জোড় লিজিয়ে মহারাজ।

এতক্ষণে ব্যাপারটা বেশ সহজে বোঝা গেল। পনের দিন আমি অনুপস্থিত ছিলাম, আজ লইয়া ষোল দিন, সুতরাং প্রত্যহ দুই পয়সা হিসাবে ধরিলে পুরোপুরি আট আনাই হয় বটে।

না, হিসাবে কোন গোলমাল হয় নাই। হাসিব না রাগ করিব ভাবিতেছি, সুখলাল বলিতে লাগিল, বহুৎ বোখার ভেল্। লেকিন আজ খবর মিলল্ তু কলকাত্তা সে লৌট আই—বুঝলাম, অনুমান মিথ্যা হয় নাই। আমি কলিকাতা হইতে ফিরিয়াছি এই খবর পাইয়াই সে ধুঁকিতে ধুঁকিতে ছুটিয়া আসিয়াছে।

পকেট হইতে পুরোপুরি একটা আধুলিই বাহির করিয়া দিতে হইল। সুখলাল সহজ কৃতজ্ঞতায় উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিল, গোড় লগি মহারাজ।

চলিয়া আসিতেছি, সুখলাল জিজ্ঞাসা করিল, মছরীওয়ালী রোজ আতি হায় না?

বলিলাম, তা আসে কিন্তু আজ সকালে কিছু বেশী মাছ চেয়েছিলাম, কিছুতেই সে দিলে না। তার কাছে আর মাছ নেব না।

সুখলাল একান্ত বিস্মিত ভাবে বলিল, কাহে?

উত্তেজিত হইয়া বলিলাম, কাহে! ও আমাকে অপমান করে গেল, আর আমি ওর কাছে মাছ নেব!

সুখলাল বলিল, নহি বাবুজী। উনকা ও মতলব নহি থা।

অর্থাৎ আমাকে অপমান করিবার ইচ্ছা তাহার ছিল না। বিরক্ত হইয়া বলিলাম, তুই কি করে জানলি?

সুখলাল বিজ্ঞভাবে হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, ও লোককা এহি দস্তুর হ্যায়।

—তা না হয় বুঝলাম। কিন্তু এরকম অদ্ভুত দস্তুরের মানে কি? আমার প্রশ্নের উত্তরে সুখলাল যাহা বলিল, তার সার মর্ম্ম এই যে নানাস্থান হইতে মাছ সংগ্রহ করিয়া হাটে বাজারে আসিয়া সেগুলি বেচিতে ইহারা যে আনন্দ পায়, একজনের কাছে সবগুলি মাছ বেচিয়া ফেলিলে সে আনন্দ পাইবে কি করিয়া? ইহাদের আত্মীয় স্বজন বড় একটা নাই; ভোর রাত্রি হইতে মাছ সংগ্রহ এবং সেগুলি বাজারে লইয়া গিয়া বেচা এবং বসিয়া বসিয়া আর পাঁচজন মছরীওয়ালা মছরওয়ালীর সঙ্গে বেলা দুইটা তিনটা পর্য্যন্ত গল্প গুজব, হাসি-তামাসা—এই তাদের প্রতিদিনের জীবনের আনন্দ ও উত্তেজনার খোরাক। সব মাছ যদি সে পথেই বেচিয়া ফেলে তাহা হইলে বাজারে গিয়া সে করিবে কি? খরিদ্দারের সঙ্গে একটু দরকষাকষি···একটু বচসা, এসব নইলে সমস্ত দিনটাই যে তার মাটি হইয়া যাইবে। তা ছাড়া আজ যদি সকাল সকাল বাজার হইতে চলিয়া যায়, তখন পাঁচজনে তাকে ঠাট্টা-তামাসা করিবে এবং কাল যখন সে আবার পূরা মাল লইয়া বাজারে বেচিতে যাইবে, তখন সবাই বলিবে—এ মছরীওয়ালী, রস্তে মে কোই গাহক না মিলল্? তখন কি জবাব দিবে মাছওয়ালী?

রাস্তায় মাছ বেচিয়া গেলে যে এত রকম গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার উদ্ভব হইতে পারে সেটা সত্যই ভাবিতে পারি নাই। আমরা জীবনের যে রূপের সঙ্গে পরিচিত তাহাতে হয়ত এই সব প্রশ্নই অর্থহীন এবং অবান্তর। কিন্তু সুখলালের মুখের কথা শুনিতে শুনিতে এ বিষয়ে আমার কোন সংশয়ই রহিল না যে মাছওয়ালী যাহা করিয়াছে ঠিকই করিয়াছে, আমাকে অপমানিত করিবার কোন ইচ্ছাই তাহার ছিল না। আমি ঠিক যে অদ্ভুত কারণে রাজীববাবুর আবির্ভাবে প্রসন্ন না হইয়াও তাঁহার মনস্তুষ্টির জন্য

বাজারের সেরা জিনিষপত্রগুলি কিনিয়া আনিয়া ঘর বোঝাই করিয়াছি, মাছওয়ালীর পথে মাছ বেচিয়া না যাওয়ার কারণটা বোধ হয় তাহার চেয়ে অদ্ভুত নয়। আমাদের সামাজিকতার রূপ—আর ওদের সামাজিকতার রূপ এক হইবার কোন কারণ নাই, তবুও ক্ষীণ একটা যোগসূত্র বোধ হয় চেষ্টা করিলে খুঁজিয়া পাওয়া যায়। আমি জানি যে আমার মত অবস্থার মানুষের দশ পনের দিন রাজীব এবং কোম্পানীর লেহ্য এবং পেয়র ব্যবস্থা করা শুধু অন্যায় নয়, অপরাধও। কিন্তু তবু সামাজিক শিষ্টাচারের খাতিরে রাজীববাবুরা যতদিন এখানে থাকিবেন ততদিন মুখে হাসি ফুটাইয়া তাঁহাদের মনস্তুটির বিবিধ আয়োজন আমাকে করিয়া যাইতে হইবে। এমন কি সে জন্য যদি বিপন্ন বন্ধুকে প্রতিশ্রুত টাকাও না দিতে হয় সেও বরং ভাল। তেমনই এই অশিক্ষিতা গ্রাম্য স্ত্রীলোকটিও হয়ত জানে যে হাটে-বাজারে না গিয়া পথেই সমস্ত মাছ বেচিয়া তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরিয়া যাইতে পারিলে তার লাভ বই লোকসানের কোন সম্ভাবনা নাই—কিন্তু নিজের লাভ ক্ষতির বিচারের চেয়ে আর পাঁচজনে কি বলিবে সেই ভাবনাটাই তার কাছে অনেক বড়। এটা তার কাছে তাদের সামাজিকতার দাবী।

মানুষের বিচিত্র জীবনধারায় বৈষম্যেরও যেমন অন্ত নাই, তেমনি ফল্গুর আপাতঃ অদৃশ্য স্রোতের মত ঐক্যেরও বোধ হয় অভাব নাই। খালি সভ্যতার স্তরভেদের সঙ্গে তার একটু রকম ফের—তাই দেখিয়া আমাদের চমক লাগিয়া যায়। মুটুকে গৃহিণী কথা দিয়াছিলেন, আমি কলিকাতা হইতে ফিরিয়া তাকে টাকা দিব। সেই আশ্বাসে সে অপেক্ষা করিয়া বসিয়াছিল; কিন্তু সামাজিক ভদ্রতা রক্ষার চাপে ব্যক্তিগত ভদ্রতা রক্ষার প্রয়োজন আমি বোধ করি নাই। মুটুও জোর গলায় তার বক্তব্যটা আমার কাছে জানাইবার সাহস করে নাই—কারণ সে পুরাদস্তুর বিংশ শতাব্দীর মানুষ। কিন্তু সুখলাল আমি কলিকাতা হইতে ফিরিয়াছি শুনিয়াই জরাক্রান্ত দেহ লইয়া ছুটিয়া আসিয়াছে সেই গাছতলায় এবং ষোল দিনের হিসাবে পূরা আটটি আনা দাবী করিতে এতটুকু কুণ্ঠা বোধ করে নাই। তার ধারণা এই আটটি আনা আমার কাছে তার ন্যায্য পাওনা; সে পাওনা হইতে আমি কোন মতেই তাকে ফাঁকি দিতে পারি না। সুখলাল কোন দিন এই পয়সাগুলি ফেরৎ দিবে না; তবু তার দাবীর জোর এত বেশী; আর ধার চাহিয়াও মুটুর এতখানি কুণ্ঠা।

সভ্যতার দাবী আমাদের আর কিছু করুক বা নাই করুক, ভদ্র করিয়া তুলিয়াছে পূর্ণমাত্রায়।

বাড়ী ফিরিয়া ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে শুনিলাম টুনী-দি বারান্দায় দাঁড়াইয়া গৃহিণীকে বলিতেছেন, এত রকম মাছ কি করতে আনাতে গেলি খুকী, তার চেয়ে মাছ কিছু কম করে যদি আধ-সেরটাক মাংস……উনি আবার মাংস নইলে খেতেই পারেন না।

বুঝিতে পারিলাম টুনী-দির ভগিনী এখুনি ঘরে ঢুকিয়া কিছু মাংসের ব্যবস্থা করিবার জন্য আমায় সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইবেন এবং আমাকে আর একদফা রিক্সা ভাড়া করিয়া এখুনি বাজারে ছুটিতে হইবে।

লোকে কত সহজে অন্যায় দাবী করিতে পারে—আর সহজ দাবীটা জানাইতে কত বেশী ভয় পায়—সেকথা ভাবিয়া মনে মনে শুধু একটু হাসিলাম।

ভাব-অলঙ্কার

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন ঘোষ

(পরিশিষ্ট)

গত পৌষের প্রবন্ধে যে ভাব-অলঙ্কারের কথা বলিয়াছি, তাহার গোড়া-পত্তন আরম্ভ হয় নব বিবাহিত জীবনে।

ভাব অলঙ্কারই মানব-জীবনে শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এই দিব্য ভূষণের গুণেই ঘরসংসার হয় পুণ্যাশ্রম, আনন্দ-নিকেতন, নব বৃন্দাবন। গৃহাশ্রমের আনন্দময় আদর্শ সম্বন্ধে, চণ্ডীদাস গাহিয়াছেন :—

[নব বৃন্দাবন]

শুনরে মানুষ ভাই।
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই॥
নব বৃন্দাবন নব নাম হয়
সকলই আনন্দময়।
নব বৃন্দাবনে ঈশ্বরে মানুষে
মিলিত হইয়া রয়॥

সবই "ভাব" বা দৃষ্টি-ভঙ্গী অর্থাৎ mentality নিয়া কথা। শ্রীচৈতন্যদেব তাই বলিয়াছেন :—

আন জনার আন মন
আমার [মন] বৃন্দাবন
মনে বনে
এক করি মানি॥

বৃন্দাবন একটা স্থান-বিশেষ মাত্র নহে। "বৃন্দাবন" একটা ভাব, বোধ বা অনুভবের বিষয়। যেখানে, যে অবস্থাতে, যে ভাবে, [বৃন্দা] অর্থাৎ, শ্রীভগবানের হ্লাদিনী অর্থাৎ আনন্দদায়িনী শক্তির 'অবন' অর্থাৎ রক্ষণ, পোষণ, স্ফুরণ হয়—তাহাই বৃন্দাবন। 'ভাব'ই মূলকথা। শ্রীচৈতন্যদেব স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন, যথা চরিতামৃতে :—

সেই ভাব সেই কৃষ্ণ, সেই বৃন্দাবন।
যদি পাই, তবে হয় বাঞ্ছিত পূরণ॥

ভগবানের আনন্দ-ক্রীড়া নিত্য সত্য এবং বৃন্দাবনও নিত্য। "এ কূলে ও কূলে"—ইহপরকালে—চিন্ময় আনন্দর সই একমাত্র লোভনীয়, কাম্য বস্তু—যেমন ভগবানের, তেমনই জীবের। ভগবানের নরলীলাতেই উহার চরিতার্থতা এবং সার্থকতা।

বস্তুতঃই গৃহসংসারে পরস্পরের সকল সম্বন্ধে, সব অনুষ্ঠানে, সব ভোগে, উপভোগে, সকল কর্ম্মে, সকল শ্রমে, সকল বিশ্রামে, তাবত দৈনন্দিন ব্যাপারে—লীলারসময় পুরুষোত্তমের ব্রজ-লীলার অহর্নিশ স্ফুরণ অনুভব ও আস্বাদনেই নব বৃন্দাবন সত্য হয়।

বহিরঙ্গ ভূষা, সাজপোষাক ও ভোগ বিলাসের প্রাচুর্য্যের মধ্যেও যাহাতে ভাব-ভূষা উপেক্ষিত না হয়—ঘরসংসার যাহাতে নববৃন্দাবনের ভাবে অনুপ্রাণিত হয়, ভগবদ্ভাবভাবিত থাকে—তৎপ্রতি চিত্তের উদ্বোধন কল্পে সকলের যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য।

ইভা দেবীর ভ্যানিটি-ব্যাগ

(নাটিকা)

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

দ্বিতীয় অঙ্ক

রাজা নরেন্দ্রনারায়ণের প্রশস্ত ড্রয়িং-রুম

বড় হল-ঘর। আধুনিক কেতায় সাজানো। কৌচ, সোফা, চেয়ার, ছোট-বড় টেবিল ও অন্যান্য সাজ-সরঞ্জামের অভাব নেই।

একদিকে একটি ছোট্ট রঙ্গমঞ্চের মত উঁচু জায়গা। সেখানে রাজকুমারী বেণুকা আর দুটি মেয়েকে নিয়ে নৃত্য করছেন। আর কয়েকটি মেয়ে নাচের গান গাইছেন।

হলঘরের পিছন থেকে আলোকমালায় সমুজ্জ্বল উদ্যানের কতক-কতক দেখা যাচ্ছে।

হলঘরের এপাশে-ওপাশে অন্য ঘরে যাবার দরজা। পাত্র-পাত্রীদের কথাবার্ত্তার সময়ে সেখান থেকেও মাঝে মাঝে 'অর্কেষ্ট্রা' বাদ্যধ্বনি শোনা যাবে।

হলঘরের সামনের দিকে অতিথিরা ব'সে নাচ দেখছেন।

নাচ-গান বন্ধ হ'ল। সবাই করতালি দিয়ে নৃত্যগীতকে অভিনন্দিত করলেন। বেণুকা মঞ্চ থেকে নেমে নীচে এলেন।

দর্শকদের অনেকে এদিক-ওদিকে অন্য ঘরে চ'লে গেলেন। অন্য ঘর থেকে কেউ কেউ হলঘরে প্রবেশ করলেন। অভিনয়ের সময়েও এইরকম আসা-যাওয়া চলতে থাকবে।

মহারাণী। ভারি আশ্চর্য্য তো, রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ কোথায়? অরুণকেও দেখতে পাচ্ছি না। বেণুকা, তোমার নাচ দেখতে পেলে না, এটা হচ্ছে অরুণের দুর্ভাগ্য!

বেণুকা। হ্যাঁ, মা।

মহারাণী। (সোফার উপরে ব'সে) আমার লক্ষ্মীমেয়ে বেণুকা! আচ্ছা,অরুণের সাম্‌নে তুমি না-হয় আর একবার নেচো।

বেণুকা। হ্যাঁ, মা।

মিষ্টার হেরম্ব দত্ত ও তাঁর স্ত্রী লেডি নীলিমা এবং অরুণা দেবী ও আরো দু-তিনজন স্ত্রী-পুরুষের প্রবেশ

হেরম্ব। নমস্কার, মোহিনী দেবী! এবারে সহরের প্রত্যেক পার্টিতেই নাচের মরশুম প'ড়ে গেছে দেখছি।

মোহিনী। যা বলেছেন, মিষ্টার দত্ত। আমরা কিন্তু খুব উপভোগ করেছি—চমৎকার। কি বলেন?

হেরম্ব। হ্যাঁ, চমৎকার—চমৎকার! নমস্কার মহারাণীজি! এবারে নাচের মরশুম প'ড়ে গেছে।

মহারাণী। হ্যাঁ, মিষ্টার দত্ত। আমার কিন্তু ভারি একঘেয়ে লেগেছে, রাবিস! নয় কি?

হেরম্ব। হ্যাঁ,একেবারে একঘেয়ে—একেবারে একঘেয়ে! রাবিস!

মেনকা দেবী, মিষ্টার অরুণ বসু ও আরো তিন-চারজন অতিথির প্রবেশ

অরুণ। নমস্কার রাণীজি, কেমন আছেন? নমস্কার মহা-রাণীজি, কেমন আছেন? নমস্কার বেণুকা দেবী, কেমন আছেন?

মহারাণী। প্রিয় অরুণ, তুমি খুব সকাল-সকাল এসে পড়েছ দেখে খুসি হ'লুম। তুমি কাজের মানুষ, কলকাতা সহরে তোমার কত কাজ!

অরুণ। খাসা জায়গা, এই কলকাতা! আমাদের ফরিদপুর হচ্ছে একটা নিতান্ত বাজে দেশ!

মহারাণী। বেণুকা, মা।

বেণুকা। কি বলছ, মা?

মহারাণী। অরুণকে একবার বাগানে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে এস, কেমন সব খাসা ফুল ফুটেছে!

বেণুকা। (উঠে দাঁড়িয়ে) যাই, মা!

অরুণ ও বেণুকার প্রস্থান

রাজা নরেন্দ্রনারায়ণের প্রবেশ

রাজা। ইভা, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

ইভা। যাই।

উঠে দাঁড়ালেন

কুমার চন্দ্রনাথের প্রবেশ

কুমার। নমস্কার, রাণীজি!

মহারাণী। (উঠে দাঁড়িয়ে) তোমরা কথা কও, আমি একটু ওদিকটায় ঘুরে আসি।

প্রস্থান

স্যার বিনয় এবং আরো কয়েকজন স্ত্রীপুরুষের প্রবেশ

কুমার। (রাজা নরেন্দ্রনারায়ণের কাছে গিয়ে) রাজা, বিশেষ ক'রে তোমাকেই আমার দরকার। ভেবে ভেবে আমি কঙ্কালসার হয়ে পড়েছি—যদিও আমাকে দেখলে তা মনে হয় না। বাইরে থেকে আমাদের দেখলে যা মনে হয়, আমাদের কারুরই ভেতরটা ঠিক সে-রকম নয়। এ-একটা বহুৎ-আচ্ছা মজার ব্যাপার। আমি কি জানতে চাই জানো? কে এই মিসেস্ রায়? এতদিন কোথায় ছিলেন? তাঁর কোন আত্মীয়-স্বজন নেই কেন? অবশ্য, আত্মীয়-স্বজনের বাড়াবাড়ি মোটেই বহুৎ-আচ্ছা ব্যাপার নয়! তবে কি জানো, আত্মীয়-স্বজন থাকলে বাহির থেকে দেখতে কিন্তু বহুৎ-আচ্ছাই হয়!

রাজা। ছ-মাস আগে আমি মিসেস্ রায়ের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত জানতুম না।

কুমার। বহুৎ-আচ্ছা, দাদা! তারপর কিন্তু মিসেস্ রায়ের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তুমি হঠাৎ অতিরিক্ত সচেতন হয়ে উঠেছ।

রাজা। (বিরক্ত কণ্ঠে) হ্যাঁ, তারপর তাঁর সঙ্গে আমার অনেক বারই দেখা হয়েছে। আমি এইমাত্র তাঁকে দেখে আসছি।

কুমার। হরি, হরি! মিসেস্ রায় কিন্তু সহরের মেয়েদের চোখের বালি। মিসেস রায় যে কি 'চিজ', আমি কিছুই বুঝতে

পারছি না। এতদিনে হয়তো আমি তাঁকে রীতিমত বিয়ে ক'রে ফেলতুম। কিন্তু আমাকে দেখলেই তাঁর ভাবখানা হয়, ঠিক উদাসিনী রাজকন্যার মত। সেও এক বহুৎ-আচ্ছা ব্যাপার। আর কি চালাক মেয়েই বাবা! দুনিয়ার সমস্ত ব্যাপারই তিনি প্রাঞ্জল ভাষায় জলের মত বুঝিয়ে দিতে পারেন। হরি, হরি! তিনি তোমার সম্বন্ধেও চমৎকার কৈফিয়ৎ দিয়েছেন।

রাজা। মিসেস্ রায়ের সঙ্গে আমার যে-শ্রেণীর বন্ধুত্বের সম্পর্ক, তার জন্যে কৈফিয়তের দরকার হয় না।

কুমার। হুম্! বৎস, শোনো। এই যে যাচ্ছেতাই বহুৎ-আচ্ছা ব্যাপার, আমরা যার নাম দিয়েছি সমাজ, তুমি কি মনে কর, মিসেস্ রায় কোনদিনই তার ভিতরে পা বাড়াতে পারবেন? তোমার স্ত্রীর সঙ্গে তুমি কি তাঁর আলাপ করিয়ে দিতে পার? শাক্ দিয়ে মাছ ঢাকবার চেষ্টা কোরো না. ঠিক বল দেখি বাপু—তুমি কি পারো?

রাজা। মিসেস্ রায় আজ এখানে আসছেন।

কুমার। তোমার স্ত্রী তাঁকে 'কার্ড' পাঠিয়েছেন?

রাজা। মিসেস্ রায় নিমন্ত্রণের 'কার্ড' পেয়েছেন।

কুমার। বহুৎ-আচ্ছা—বহুৎ-আচ্ছা! তাহ'লে তাঁকে নিয়ে আর আমার কিছুই ভাববার দরকার নেই। হরি, হরি! এত বড় খবরটা তুমি আগে আমাকে দাওনি কেন ভায়া, তাহ'লে আমার যে কত মুস্কিলেরই আসান্ হ'ত!

বেণুকা এবং অরুণ ঘরের একদিক দিয়ে ঢুকে, আর একদিকে বেরিয়ে গেলেন

মিষ্টার সুশীল রায়-চৌধুরীর প্রবেশ

সুশীল। নমস্কার রাণীজি—নমস্কার রাজাবাহাদুর! ও কি রাজা, মুখ বন্ধ ক'রে রইলে কেন? আমি চাই লোকে ঘন ঘন আমাকে জিজ্ঞাসা করে, আমি কেমন আছি। তাহ'লে আমার মনে হয়, সকলেই আমার স্বাস্থ্যের খবর জানবার জন্যে অত্যন্ত উন্মুখ হয়ে আছে! আজ আমি মোটেই ভালো নেই। আমার বাবা সন্ধ্যার সময় সুনীতি আর দুর্নীতি নিয়ে প্রচুর উপদেশ বর্ষণ করেছিলেন। এখনো উপদেশগুলো হজম করতে পারিনি। আরে, আরে, আমাদের মোটকু যে! শুনছি নাকি তুমি আবার বিয়ে করতে চাও? আমি ভাবতুম, বার বার বিয়ে ক'রে এইবারে তুমি শ্রান্ত হয়ে পড়েছ!

কুমার। তুমি বড়ই বাজে কথা কও ভায়া, বড়ই বাজে কথা কও।

সুশীল। আচ্ছা মোটকু, আমার একটা সন্দেহ-ভঞ্জন করো তো? তুমি কি দু-বার বিবাহ, আর একবার পত্নী-ত্যাগ করেছ? না, তুমি দু-বার পত্নীত্যাগ, আর একবার বিবাহ করেছ?

কুমার। আমার স্মরণশক্তি বড়ই খারাপ; আমি কিছুই মনে করতে পারছি না।

ডান্ দিকে চ'লে গেলেন

নীলিমা। রাজা, আপনাকে আমি একটি বিশেষ কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই।

রাজা। আপাতত আমাকে দয়া ক'রে মাপ্ করুন—স্ত্রীর সঙ্গে আমার বিশেষ দরকার আছে।

নীলিমা। ছিঃ ছিঃ রাজা, স্বপ্নেও অমন্ কাজ করবেন না! আজকালকার দিনে প্রকাশ্যে নিজের স্ত্রীর দিকে দৃষ্টি দেওয়া বিশেষ বিপদজনক। লোকে তাহ'লে ভাববে, আড়ালে আপনি নিশ্চয়ই স্ত্রীকে ধ'রে প্রহার করেন। সুখের বিবাহিত-জীবন দেখলেই আজকাল আমরা সন্দিগ্ধ হয়ে উঠি। আচ্ছা রাজা, আপনার সঙ্গে আমার কথা পরে হ'লেও চলবে।

অন্য দিকে চ'লে গেলেন

রাজা। ইভা, আমাকে এইবার তোমার সঙ্গে কথা কইতেই হবে।

ইভা। স্যার বিনয়, আপনি কি দয়া ক'রে আমার এই 'ভ্যানিটি-ব্যাগ'টি একবার ধরবেন? ধন্যবাদ!

রাজার কাছে এগিয়ে গেলেন

রাজা। (ইভার সঙ্গে খানিক স'রে এসে) ইভা, বৈকালে তুমি নিশ্চয়ই আমাকে মিথ্যা ভয় দেখাচ্ছিলে?

ইভা। সেই স্ত্রীলোকটা আজ এখানে আস্‌বে না তো?

রাজা। মিসেস্ রায় আজ এখানে আসবেন। কিন্তু তুমি যদি তাঁর সঙ্গে কোন অন্যায় ব্যবহার কর, তাহ'লে আমরা খালি লজ্জিতই হ'বনা, আমাদের দু'জনেরই জীবন হয়ে উঠ্‌বে দুঃখময়। ইভা, কেবল আমাকে বিশ্বাস কর! স্ত্রীর উচিত স্বামীকে বিশ্বাস করা।

ইভা। স্বামীকে যারা বিশ্বাস করে, কলকাতার যেখানে-সেখানেই এমন-সব নারী দেখা যায়—আর দেখলেই তাদের অভ্যস্ত চেনা যায়! তাদের চোখে-মুখে এতই দুঃখের ছাপ! আমিও তাদের একজন হ'তে চাই না। (একদিকে এগিয়ে গেলেন) স্যার বিনয়, এইবার দয়া ক'রে আমার ভ্যানিটি-ব্যাগটি ফিরিয়ে দেবেন? ধন্যবাদ!......'ভ্যানিটি-ব্যাগ' ভারি দরকারি জিনিষ,......নয় কি?......স্যার বিনয়, মনে হচ্ছে আজ রাত্রে একজন বন্ধু না হ'লে আমার চলবে না।

স্যার বিনয়। রাণীজি! জানতুম, একদিন আপনি বন্ধুর অভাব মনে করবেন! কিন্তু আজ রাত্রেই কেন?

ইভা জবাব না দিয়ে অন্য দিকে গেলেন

রাজা। ইভার কাছে তাহ'লে সব-কথাই খুলে বলতে হবে। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। নইলে এখনি একটা বিষম-দৃশ্যের অবতারণা হতে পারে......ইভা......

শ্রীধরের প্রবেশ

শ্রীধর। মিসেস্ অশোকা রায় এসেছেন!

রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ চমকে উঠলেন। মিসেস রায় প্রবেশ করলেন। তাঁর সাজসজ্জা অপূর্ব্ব-সুন্দর, অথচ সুসঙ্গত। রাণী ইভা দৃঢ়-মুষ্টিতে নিজের ভ্যানিটি-ব্যাগটি চেপে ধরলেন। কিন্তু তারপর তাচ্ছিল্যের সঙ্গে নমস্কার করলেন। মিসেস্ রায় মিষ্ট হাসি হেসে প্রতি-নমস্কার ক'রে ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন

স্যর বিনয়। রাণীজি, আপনার হাত থেকে ভ্যানিটি-ব্যাগটি প'ড়ে গেছে যে!

কুড়িয়ে ইভার হাতে দিলেন, ইভা আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন

মিসেস্ রায়। (অগ্রসর হয়ে) রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ, আপনি কেমন আছেন? কী সুন্দর দেখতে আপনার স্ত্রীকে! ঠিক একখানি ছবি!

রাজা। (নিম্ন স্বরে) এমন বিষম বেপরোয়ার মত এখানে আসা আপনার উচিত হয় নি!

মিসেস্ রায়। (হাসিমুখে) জীবনে এর চেয়ে সুবুদ্ধির কাজ আমি আর কখনো করিনি। আজ কিন্তু আমার দিকে বিশেষ নজর দিতে ভুলবেন না। মেয়েদের দেখে আমার ভয় হচ্ছে। ওদের কারুর কারুর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিন দেখি। পুরুষদের জন্যে ভাবি না, তাদের বশ করতে পারি খুব সহজেই। ...কেমন আছেন, কুমার বাহাদুর? আপনি দেখছি আমাকে আজকাল একেবারেই ত্যাগ করেছেন! কাল থেকে আপনার মুখ দেখি নি। সকলের মুখেই শুনি, আপনি নাকি এমনি অবিশ্বাসী!

কুমার। হরি হরি! বলেন কি? মিসেস্ রায়, তাহ'লে আসল কারণটা আপনাকে বুঝিয়ে দি শুনুন—

মিসেস্ রায়। থাক্ কুমার বাহাদুর, থাক্। কারুকে কিছুই বোঝাবার শক্তি আপনার নেই। এটুকুই আপনার প্রধান মাধুর্য্য।

কুমার (আনন্দে গদ্গদ হয়ে) মিসেস্ রায়, আমার মধ্যে আপনি যদি মাধুর্য্যই লক্ষ্য ক'রে থাকেন—

দুজনে এগিয়ে গেলেন এবং তারপর চুপিচুপি কথা কইতে লাগলেন। রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ অত্যন্ত অসচ্ছন্দভাবে এদিকে-ওদিকে ঘুরতে ঘুরতে মিসেস অশোকা রায়ের উপরে বারংবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করতে লাগলেন

স্যর বিনয়। রাণীজি, আপনাকে কী ম্লান দেখাচ্ছে!

ইভা। ভীরুদের ম্লানই দেখায়।

স্যর বিনয়। মনে হচ্ছে আপনি এখনি অজ্ঞান হয়ে পড়বেন। চলুন, বাগানে একটু বেড়িয়ে আসি।

ইভা। চলুন।

মিসেস্ রায়। রাণীজি, আপনার বাগানটি কি সুন্দর!

ইভা জবাব না দিয়ে নীরব হাসি হেসে স্যর বিনয়ের সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন

মিঃ রায়চৌধুরী, উনিই কি আপনার খুড়ী মেনকা দেবী নন? ওঁর সঙ্গে আলাপের সুযোগ পেলে খুসি হব।

সুশীল। (একটু ইতস্তত ক'রে) নিশ্চয়, নিশ্চয়! আসুন।... খুড়ী-মা, ইনি হচ্ছেন মিসেস্ অশোকা রায়।

মিসেস্ রায়। মেনকা দেবী, আপনার দেখা পেয়ে সুখী হলুম। (সোফায় মেনকা দেবীর পাশে ব'সে) মিঃ রায়চৌধুরী আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ওঁর রাজনৈতিক জীবন উজ্জ্বল! উনি চিন্তা করেন পাকা 'মডারেটে'র মত, কিন্তু কথা বলেন কাঁচা 'এক্স্ট্রিমিষ্টে'র মত—এমন লোক উন্নতির শিখরে উঠতে বাধ্য! আর মিঃ রায়চৌধুরীর গল্প করবার শক্তিও কি অসাধারণ! কিন্তু কুসুমপুরের মহারাজার মুখে শুনলুম, উনি অমন চমৎকার গল্প বলতে শিখেছেন ওঁর খুড়ীমার কাছ থেকেই।

মেনকা দেবী। (গাম্ভীর্য্য ত্যাগ ক'রে হেসে) এই মিষ্টি কথাগুলির জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ!

দুজনে বাক্যালাপ করতে লাগলেন

হেরম্ব। হ্যাঁ হে সুশীল, তোমার খুড়ীর সঙ্গে তুমিই বুঝি মিসেস্ রায়ের পরিচয় করিয়ে দিলে?

সুশীল। উপায় ছিলনা, দিতে বাধ্য হলুম। ঐ স্ত্রীলোকটি সকলকে দিয়েই নিজের মনের মত কাজ করিয়ে নিতে পারে। কেমন ক'রে, তা জানিনা।

হেরম্ব। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, ও যেন আবার আমার সঙ্গেও কথা-টথা বলবার চেষ্টা না করে!

নীলিমা দেবীর কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন

মিসেস্ রায়। আসছে বৃহস্পতিবার? হ্যাঁ মেনকা দেবী, নিশ্চয়ই যাব! (উঠে রাজা নরেন্দ্রনারায়ণের কাছে গিয়ে) এই সব সেকেলে মহিলার সঙ্গে আলাপ জমাতে গেলে গায়ে যেন জ্বর আসে!

নীলিমা। (হেরম্বকে) রাজা নরেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে কথা কইছেন ঐ যে একটি চমৎকার পোসাক-পরা মহিলা, কে উনি?

হেরম্ব। ওঁকে আমি একেবারেই চিনি না। চেহারা দেখলে তো মনে হয়, কলেজ-ষ্ট্রীটে ছাপা বটতলার একখানি রাবিস নভেলের 'রাজ-সংস্করণ'—অতি-আধুনিক পাঠকদের মন চাঙ্গা করবার জন্যে তৈরি।

মিসেস্ রায়। রাজা, বেচারা হেরম্ব দত্তের পাশে উনিই বুঝি তাঁর স্ত্রী নীলিমা দেবী? শুনেছি নীলিমা দেবী নাকি তাঁর স্বামীকে একটিবারও চোখের আড়াল করতে চান্ না। তাই আমার সঙ্গে আজ আলাপ করবার জন্যে ওঁর স্বামী-রত্নটিরও বিশেষ আগ্রহ আছে ব'লে মনে হচ্ছে না। মিষ্টার দত্ত বোধ হয় তাঁর স্ত্রীকে ভয়ানক ভয় করেন। রাজা, আমার ইচ্ছে আজ আপনি পিয়ানো বাজাবেন, আর সেই সঙ্গে আমি গাইব গান। (রাজা ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে ওষ্ঠ দংশন করলেন) তাহ'লে আমাদের কুমার-বাহাদুর হিংসেয় একেবারে ফেটে পড়বেন।......কুমার বাহাদুর! (কুমার কাছে এগিয়ে এলেন) একটু আগে আপনি বলছিলেন, আপনার পিয়ানোর সঙ্গে আমাকে গান গাইতে হবে, কিন্তু সেটা আর হ'ল না। রাজা বাহাদুর বলছেন, পিয়ানোর ভার গ্রহণ করবেন উনি নিজেই। এটা হচ্ছে ওঁরই বাড়ী, কি ক'রে ওঁর কথা ঠেলি বলুন? যদিও আমি মনে করি, পিয়ানোয় আপনার হাত ভারি মিষ্টি!

কুমার। (হাসিমুখে) মিসেস্ রায়, আপনি কি সত্যিই তাই মনে করেন?

মিসেস্ রায়। নিশ্চয়! আপনার পিয়ানোর সুর শুনতে শুনতে আমি ইহ-জীবনটাই খরচ ক'রে দিতে পারি।

কুমার। (বুকের উপর হাত রেখে) বহুৎ আচ্ছা! ধন্যবাদ, ধন্যবাদ! আপনাকে দেখলেই দেবীর মতন পূজা করবার সাধ হয়। আপনার তুলনা নেই!

মিসেস্ রায়। কি সুন্দর বক্তৃতাই করলেন! কত খাঁটি,

কত সরল! আমি পছন্দ করি এই ধরণের বক্তৃতাই। আচ্ছা, আমার হাতের এই ফুলটি আপনিই উপহার গ্রহণ করুন! (রাজা নরেন্দ্রনারায়ণের হাত ধ'রে কয়েকপদ অগ্রসর হয়ে, মিষ্টার হেরম্ব দত্তের প্রতি) ও, মিষ্টার দত্ত যে! কেমন আছেন? আপনি তিনদিন আমার বাড়ীতে গিয়েও আমার দেখা পাননি ব'লে আমি অত্যন্ত দুঃখিত! আমি বাড়ীতে ছিলুম না! আচ্ছা, আসছে শুক্রবারে আপনার নিমন্ত্রণ রইল।

হেরম্ব। (একেবারে নির্ব্বিকারভাবে) আমার সৌভাগ্য!

নীলিমা দেবী ক্রুদ্ধ ও প্রদীপ্ত দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকালেন, রাজা নরেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে মিসেস রায় ঘরের বাইরে চ'লে গেলেন এবং কুমার চন্দ্রনাথ চললেন তাঁদের পিছনে পিছনে

নীলিমা। (স্বামীকে) ওঃ, তুমি কি অসম্ভব দুরাত্মা! তোমার কোন কথাই আমি বিশ্বাস করতে পারি না। এইনা তুমি বললে ওকে একেবারেই চেনো না? অথচ তুমি নাকি ওর বাড়ীতে তিন দিন গিয়েও দেখা পাওনি? আবার, তুমি নাকি ওর বাড়ীতে নিমন্ত্রণে যাবে? আচ্ছা, গিয়েই দেখ না, তারপর কি হয়!

হেরম্ব। পাগল! ওর নিমন্ত্রণ আমি রাখব? স্বপ্নেও অত আশ্চর্য্য কথা ভাবতে পারি না।

নীলিমা। ওর নাম পর্য্যন্ত এখনো তুমি আমাকে বলোনি! কে ও?

হেরম্ব। (কাশতে কাশতে ও মাথার চুল গুছোতে গুছোতে) শুনেছি ওর নাম নাকি মিসেস্ অশোকা রায়।

নীলিমা। ও···, সেই স্ত্রীলোকটা?

হেরম্ব। হ্যাঁ, তাইতো সবাই বলে।

নীলিমা। তাই নাকি, তাই নাকি? মজার কথা—মজার কথা! তাহ'লে তো ওকে আর একবার ভাল ক'রে দেখতে হচ্ছে! (উঠে দরজার কাছে গিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে) আমি ওর বিষয়ে নানান্ কথাই শুনেছি। লোকে বলে, ওর জন্যে রাজা নরেন্দ্রনারায়ণকে সর্ব্বস্বান্ত হ'তে হবে। আর রাণী ইভা—যাঁর সুনাম প্রত্যেকের মুখে মুখে, তিনিই কিনা ওকে নিমন্ত্রণ ক'রে ডেকে এনেছেন নিজের বাড়ীতে! মরি, মরি! তাহ'লে তুমিও ওখানে যাচ্ছ শুক্রবারে পাত্ পাত্তে?

হেরম্ব। আমি যাব, না ঘোড়ার ডিম! কেন যাব?

নীলিমা। কেন? আর একটি বিবাহবন্ধন-চ্ছেদের মামলা আনবার জন্যে।

মিঃ হেরম্ব দত্ত ও নীলিমা দেবী বাইরে বেরিয়ে গেলেন এবং রাণী ইভা ও স্যর বিনয় বাগান থেকে ঘরের ভিতরে এসে ঢুকলেন

ইভা। হ্যাঁ। ওর এখানে আসাটা হচ্ছে অসহনীয়, ধারণাতীত! বৈকালে চা-পানের ঘরে আপনি যে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, এখন আমি সেটা বুঝতে পারছি। কিন্তু তখনি কথাটা স্পষ্ট ক'রে বলেন নি কেন? আপনার বলা উচিত ছিল!

স্যর বিনয়। আমি বলতে পারি নি! কোন পুরুষ আর কোন পুরুষ সম্বন্ধে এমন-সব কথা স্পষ্ট ক'রে বলতে পারে না। তখন যদি জানতুম রাজা আপনার দোহাই দিয়ে মিসেস রায়কে এখানে ডেকে আনবেন, তাহ'লে হয়তো সব কথাই বলতে বাধ্য হতুম। অন্তত, রাজা তাহ'লে আজ আপনাকে এত-বড় অপমানটা করতে পারতেন না।

ইভা। হ্যাঁ, আমি নিশ্চয়ই ঐ স্ত্রীলোকটাকে নিমন্ত্রণ করিনি। আমার স্বামী আমাকে বাধ্য করলেন—আমার মিনতির—আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই। হা ভগবান! আমার কাছে এ-বাড়ী আজ নরকের মত। আমি ঐ স্ত্রীলোকটার গান শুনতে পাচ্ছি—ওর সঙ্গে পিয়ানো বাজাচ্ছেন আমার স্বামী! আমাকে এ-ভাবে অপমানিত করবার কি অধিকার ওঁর আছে? আমি ওঁকে সমস্ত জীবন দান করেছি। উনি তা গ্রহণ করেছেন—ব্যবহার করেছেন—কলঙ্কিত করেছেন। আজ নিজেকেই আমার নিজের চোখে ঘৃণিত ব'লে মনে হচ্ছে।. কিন্তু কিছু বলবার সাহস আমার নেই।

সোফার উপরে হতাশ হয়ে ব'সে পড়লেন

স্যর বিনয়। আপনার পক্ষে এ-শ্রেণীর লোকের সঙ্গে বাস করা অসম্ভব। এঁর সঙ্গে কি-ভাবে আপনি জীবন-যাপন করতে পারেন? পদে-পদে, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আপনার মনে হবে যে, উনি যা বলছেন সব মিছে কথা। আপনার মনে হবে ওঁর চোখের দৃষ্টি মিথ্যা, ওঁর কণ্ঠের স্বর মিথ্যা, ওঁর হাতের স্পর্শ মিথ্যা, ওঁর সমস্ত আবেগ মিথ্যা। বাইরে গিয়ে উনি যখন শ্রান্ত হয়ে পড়বেন, তখন উনি ফিরে আসবেন আপনার কাছে—তখন আপনাকেই দিতে হবে সান্ত্বনা! বাইরে আর একজনের পায়ে শ্রদ্ধার অঞ্জলি দিয়ে উনি ফিরে আসবেন আপনার কাছে—তখন আপনাকেই করতে হবে ওঁকে মুগ্ধ। আপনাকে হ'তে হবে ওঁর কালো জীবনের আলো-মাখা মুখোস—ভালো ক'রে ওঁর গুপ্তকথা ঢেকে রাখবার জন্যে।

ইভা। ঠিক বলেছেন—একেবারে ঠিক কথাই বলেছেন। কিন্তু কী করতে পারি? আপনি বলেছেন, আপনিই হবেন আমার বন্ধু! স্যর বিনয়—বলুন, আমার কি করা উচিত? বন্ধু যদি হ'তে চান্, আজই আমার বন্ধু হোন্।

স্যর বিনয়। পুরুষ আর নারীর মধ্যে বন্ধুত্ব হওয়া অসম্ভব। পুরুষ আর নারীর মধ্যে আছে আবেগ, শত্রুতা, শ্রদ্ধা, প্রেম, কিন্তু সেখানে নেই বন্ধুত্ব। আমি তোমাকে ভালোবাসি—

ইভা। না, না, না!

উঠে দাঁড়ালেন

স্যর বিনয়। আমি তোমাকে ভালোবাসি! তুমি আমার কাছে পৃথিবীর যা-কিছুর চেয়ে শ্রেষ্ঠ! তোমার স্বামী কী দেন তোমাকে? কিছু না, কিছু না! তাঁর মধ্যে যা-কিছু আছে, সমস্তই গ্রহণ করে এই দুষ্ট স্ত্রীলোকটা—যাকে আজ তিনি নিক্ষেপ করেছেন তোমার সমাজে, তোমার নিজের বাড়ীতে, পৃথিবীর সামনে তোমার মুখ পুড়িয়ে দেবার জন্যে। আমার সমস্ত জীবন আমি আজ তোমাকেই নিবেদন করছি—

ইভা। স্যর বিনয়!

স্যর বিনয়। আমার জীবন—আমার সমস্ত জীবন! গ্রহণ

করো, একে নিয়ে যা-খুসি করো। আমি তোমাকে ভালোবাসি—এত ভালোবাসি যে আর-কোন জীবন্ত বস্তুকে তত ভালো বাসিনি। যে-মুহূর্ত্ত থেকে তোমাকে দেখেছি, তখন থেকেই তোমাকে আমি ভালোবেসেছি—হ্যাঁ, ভালোবেসেছি তোমাকে অন্ধের মত, ভক্তের মত, উন্মত্তের মত! আগে তুমি জানতে না—আজ কিন্তু জানলে! এখনি এই বাড়ী ছেড়ে চলো! পৃথিবী কিছু নয়, পৃথিবীর প্রতিবাদ কিছু নয়, সমাজের ধিক্কার কিছু নয়—একথা তোমাকে আমি বলব না, কারণ পৃথিবী আর সমাজকে অবহেলা করা চলে না—অবহেলা করা অসম্ভব! কিন্তু মানুষের জীবনে এমন-সব মুহূর্ত্ত আসে যখন তাকে ভাবতে হয়, নিজের জীবনকে সে পূর্ণ, পূর্ণতর, পূর্ণতম ভাবে ভোগ করবে, না মিথ্যা, অগভীর, অপমানকর অস্তিত্বের মাঝখানে আত্মদান করবে—পৃথিবীর মিথ্যা দাবি মেটাবার জন্যে। আজ তোমার জীবনে সেই মুহূর্ত্ত এসেছে। কী করবে তুমি? বল প্রিয়তমে, কী করতে চাও তুমি?

ইভা। (স্যর বিনয়ের কাছ থেকে ধীরে ধীরে স'রে যেতে যেতে এবং তাঁর মুখের পানে সচকিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে) আমার সাহস নেই।

স্যর বিনয়। (ইভার সঙ্গে সঙ্গে এগুতে এগুতে) হ্যাঁ, সাহস আছে তোমার! প্রথম ছ-মাস কাটবে হয়তো যন্ত্রণার—এমন কি লাঞ্ছনার ভিতর দিয়েও; তারপর যখন তোমার স্বামীর পদবী ত্যাগ ক'রে গ্রহণ করবে আমার পদবী, তখনই হবে সমস্ত দুঃখ-দুশ্চিন্তার অবসান। ইভা, একদিন তুমি আমার স্ত্রী হবে—হ্যাঁ, আমার স্ত্রী। একথা তুমি জানো! এখন তুমি কিছুই নও! তোমার নিজের আসন দখল করেছে এই স্ত্রীলোকটা। তবে কিসের সঙ্কোচ? হাস্‌তে হাস্‌তে, সপ্রতিভ চোখে, মাথা উঁচু ক'রে বেরিয়ে চল এই বাড়ী থেকে। সারা কলকাতা জানবে, কেন তুমি এ-কাজ করেছ। তখন আর কে তোমাকে দুষবে? কেউ না, কেউ না! আর যদিই বা দোষ দেয়, তাতেই বা কি?

ইভা। আমাকে ভাবতে দিন! আমাকে অপেক্ষা করতে দিন! স্বামী আবার হয়তো আমার কাছে ফিরে আস্‌বেন।

সোফার উপর ব'সে পড়লেন

স্যর বিনয়। তিনি ফিরে এলেই তুমি আবার তাঁকে গ্রহণ করবে! ও, যা ভেবেছিলুম তুমি তা নও দেখছি। তুমিও ঠিক আর-পাঁচজন নারীর মতই। এক হপ্তা পরেই দেখব, তুমি এই স্ত্রীলোকটারই হাত ধ'রে বাগানে বেড়াতে বেরিয়েছ। সে হবে তোমার নিত্যকার অতিথি—প্রিয়তম বন্ধু! এক আঘাতে তুমি এই সৃষ্টিছাড়া বন্ধনকে ছিঁড়ে ফেলতে চাও না, মাথা পেতে সমস্ত সহ্য করতে চাও। তুমি ঠিক বলেছ। তোমার কোন সাহস নেই।

ইভা। আমাকে ভাববার সময় দিন। এখন আমি আপনার কথার উত্তর দিতে পারব না।

সঙ্কুচিত ভাবে কপালের উপরে হস্তচালনা করতে লাগলেন

স্যর বিনয়। উত্তর এখনি চাই। হয় এখন, নয় কখনো নয়!

ইভা। (সোফা থেকে উঠতে উঠতে) তাহ'লে কখনো নয়!

দু-এক মুহূর্তের স্তব্ধতা

স্যর বিনয়। তুমি আমার হৃদয় ভেঙে দিচ্ছ।

ইভা। আমার হৃদয় আগেই ভেঙে গিয়েছে।

দু'এক মুহূর্তের স্তব্ধতা

স্যর বিনয়। কাল সকালেই দেশ ছেড়ে আমি চ'লে যাচ্ছি। আর কখনো আমি তোমাকে দেখতে পাব না। তুমিও দেখতে পাবে না আমাকে। আমাদের জীবনে জীবনে মিলন হ'ল কেবল এক মুহূর্ত্তের জন্যে—আমাদের আত্মা লাভ করলে পরস্পরের ক্ষণিক স্পর্শ। তারা কেউ আর কারুর স্পর্শ পাবে না। বিদায়, ইভা!

প্রস্থান

ইভা। জীবনে আজ আমি কী একলা!

দূরে অন্য ঘরের ভিতর থেকে এতক্ষণ গান-বাজনার ধ্বনি ভেসে আসছিল, এখন সব থেমে গেল। পীতমপুরের মহারাণী একজন পুরুষ অতিথির সঙ্গে কথা কইতে কইতে ও হাসতে হাসতে প্রবেশ করলেন। অন্যান্য অতিথিরাও একে একে আসতে লাগলেন।

মহারাণী। ভাই ইভা, এতক্ষণ আমি মিসেস্ রায়ের সঙ্গে ভারি মিষ্টি গল্প করছিলুম। আজ বৈকালে তাঁকে নিয়ে যে-সব কথা বলেছিলুম, তার জন্যে আমি লজ্জিত। আর তুমি যখন তাঁকে নিমন্ত্রণ ক'রে এনেছ, তখন নিশ্চয় তাঁর কোন ত্রুটিই থাকতে পারে না। ভারি চমৎকার মেয়ে, কথাবার্ত্তাও বলেন ভারি বুদ্ধিমতীর মত! বললেন, মেয়েদের দ্বিতীয়বার বিবাহ করা উচিত নয়। শুনে আমার ভাই চন্দ্রনাথের বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত হলুম। লোকে যে কেন মিসেস্ রায়ের নিন্দে করে, তা বুঝতে পারি না। তবু আমাকে কলকাতা ছাড়তে হবে দেখছি। মিসেস্ রায়, নিজের অজান্তেই আগুনের মতন আকর্ষণ করেন পতঙ্গকে। এখানে থাকলে আমার স্বামীটিকে বোধ হয় আর সামলাতে পারব না।

প্রস্থান

মোহিনী। ভাই ইভা, যে সুন্দরী মেয়েটি তোমার স্বামীর কাছে ব'সেছিলেন, তাঁর গানের গলা কি মিষ্টি! আমি যদি তুমি হতুম, তাহ'লে আমার কি হিংসেই হ'ত! ঐ মহিলাটি কি তোমার বিশেষ বন্ধু?

ইভা। না।

মোহিনী। তাই নাকি! আচ্ছা ভাই, আসি—

প্রস্থান

হেরম্ব। ইভা দেবী হচ্ছেন বুদ্ধিমতী নারী! অধিকাংশ নারীই মিসেস্ রায়কে নিমন্ত্রণ করতে নারাজ হতেন। কিন্তু রাণী ইভার সেই অসাধারণতা আছে, যাকে আমরা বলি সাধারণ বুদ্ধি।

সুশীল। রাজা নরেন্দ্রনারায়ণকেও বাহাদুর বলতে হবে।

হেরম্ব। হ্যাঁ। আমাদের রাজা-বাহাদুরটি প্রায় অতি আধুনিক হয়ে উঠেছেন। এটা কখনো ভাবতে পারিনি।

ইভাকে নমস্কার ক'রে বেরিয়ে গেলেন

মেনকা। আজ তাহ'লে আসি, রাণীজি! মিসেস্ রায় কি খাসা মানুষ! বেস্পতিবারে আমার বাড়ীতে তাঁর নিমন্ত্রণ, তুমিও আসতে পারবে কি?

ইভা। মাপ করবেন। সেদিন আমার অন্য কাজ আছে।

মেনকা দেবী এবং আরো কোন কোন অতিথি একে একে বিদায় নিলেন বা অন্য ঘরে চলে গেলেন

মিসেস্ অশোকা রায় এবং রাজা নরেন্দ্রনারায়ণের প্রবেশ

মিসেস্ রায়। আজকের এই আনন্দ-সভা ভালো লাগল। আমার পুরানো দিনের কথা মনে হচ্ছে। (সোফার উপরে বসলেন) দেখছি সেদিনের মত আজও সমাজে নির্ব্বোধের অভাব নেই। বিশ বছরেও কিছুই বদলায় নি দেখে খুসি হয়েছি।

সুশীল রায়-চৌধুরী ও অন্যান্য অতিথিদের প্রস্থান। ইভা দূরে দাঁড়িয়ে ঘৃণা ও যাতনা-মাখা মুখে মিসেস্ রায় ও তাঁর স্বামীকে লক্ষ্য করতে লাগলেন। তাঁরা তাঁর উপস্থিতি টের পেলেন না।

মিসেস্ রায়। কুমার বাহাদুর কাল দুপুরে আমার বাড়ীতে যাবেন। তিনি আজকেই তাঁর সঙ্গে আমার বিয়ের দিনটা ঠিক ক'রে ফেলতে চাইছিলেন। কিন্তু আমি বলেছি, কাল দুপুরের আগে পাকা জবাব দিতে পারব না। বাইরে থেকে কুমার বাহাদুর মানুষ মন্দ নন্, আর তাঁর স্ত্রী-হিসাবে আমিও নিতান্ত মন্দ হব ব'লে মনে হচ্ছে না। রাজা, এই ব্যাপারে আমি তোমার সাহায্য চাই।

রাজা। আমায় কি করতে বলেন? কুমার-বাহাদুরের উৎসাহ-বর্দ্ধন?

মিসেস্ রায়। না, না! উৎসাহ-বর্দ্ধনের ভার নেব আমি। তোমার কাছ থেকে চাই আমি অর্থ-সাহায্য।

রাজা। (ভ্রুকুঞ্চিত ক'রে) আপনি কি এই-সব কথা কইবার জন্যেই আজ এখানে এসেছেন?

মিসেস্ রায়। হ্যাঁ।

রাজা। (অধীরভাবে) ও-সব কথা নিয়ে আমি এখানে আলোচনা করব না।

মিসেস্ রায়। (হাসতে হাসতে) তবে বাগানে চল। চারিদিকে রঙিন্ ফুল দিয়ে চিত্রিত সবুজের শোভা—সে-এক কবিত্বপূর্ণ আবহ! এমন আবহের ভিতরে গিয়ে নারীরা সব-ব্যাপারেই সফল হয়।

রাজা। এ-সব কথা কাল হ'লে চলে না?

মিসেস্ রায়। কাল দুপুরেই তো আমার বিয়ের কথা পাকা হয়ে যাবে। তার আগেই কুমার-বাহাদুরকে যদি বলি যে—আচ্ছা, কি বলি বলো তো? বলব কি, আমি আমার কোন আত্মীয়ের, বা আমার দ্বিতীয় স্বামীর সম্পত্তির অধিকারিণী? আমার আয় মাসে দু-হাজার টাকা? তাহ'লে কি এ-বিবাহের ভিত্তি আরো সুদৃঢ় হয়ে উঠবে না? বল রাজা, তোমার মত কি? আমার মাসিক আয় কত হবে? দু-হাজার? না, আরো কিছু বেশী? আধুনিক জীবন মাত্রাধিক্যই ভালোবাসে। আরো কিছু বেশী হ'লেও মন্দ হবে না। নরেন, তোমার কি মনে হয় না, এ পৃথিবীটা হচ্ছে মজার ঠাঁই? আমার কিন্তু মনে হয়……না, চল, বাগানে যাই।

দুজনে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। বাহির থেকে ভেসে এল সঙ্গীতের ধ্বনি

ইভা। আর এ-বাড়ীতে থাকা অসম্ভব। আজ একজন আমার কাছে চেয়েছিলেন জীবন-মন সমর্পণ করতে, কিন্তু আমি করেছি তাঁকে প্রত্যাখ্যান! অন্যায় করেছি, বোকামি করেছি! এবারে আমিই করব তাঁর কাছে জীবন-মন সমর্পণ! যাব, আমি তাঁর কাছেই যাব!

তাড়াতাড়ি দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন, তারপর আবার ফিরে এলেন। টেবিলের ধারে ব'সে একখানি চিঠি লিখলেন এবং চিঠিখানা খামে পুরে টেবিলের উপরেই রেখে দিলেন।

রাজা কোনদিনই আমাকে বুঝতে পারেন নি। এই চিঠিখানা পড়লেই সব বুঝতে পারবেন। তিনি তাঁর নিজের জীবন নিয়ে যা-কিছু করতে পারেন। আমিও নিজের জীবন নিয়ে যা উচিত বুঝব তাই করব। আমাদের বিবাহের বন্ধন ছিঁড়ে ফেলেছেন রাজা নিজের হাতেই—সেজন্যে আমি দায়ী নই। আমি ছিঁড়লুম কেবল দাসত্বের বন্ধন।

প্রস্থান

একদিক দিয়ে শ্রীধরের প্রবেশ এবং অন্যদিক দিয়ে প্রবেশ করলেন মিসেস্ অশোকা রায়

মিসেস্ রায়। রাণীজি কোথায়?

শ্রীধর। এইমাত্র বেরিয়ে গেলেন।

মিসেস্ রায়। বেরিয়ে গেলেন! কোথায়? বাগানে?

শ্রীধর। না, তিনি বাড়ীর বাইরে চ'লে গেলেন।

মিসেস্ রায়। (চমকে শ্রীধরের মুখের দিকে হতভম্বের মত তাকিয়ে) বাড়ীর বাইরে? আজকের দিনে বাড়ীর বাইরে!

শ্রীধর। আজ্ঞে হ্যাঁ। রাণীজি যাবার সময় আমাকে ব'লে গেলেন, টেবিলের ওপরে রাজাবাহাদুরের জন্যে একখানা চিঠি আছে।

মিসেস্ রায়। রাজাবাহাদুরের চিঠি?

শ্রীধর। আজ্ঞে হ্যাঁ।

মিসেস্ রায়। আচ্ছা, তুমি এখন যাও।

শ্রীধরের প্রস্থান। দূরের সঙ্গীত-ধ্বনি থেমে গেল

বাড়ীর বাইরে গিয়েছে! যাবার সময় চিঠি লিখে রেখে গেছে স্বামীর জন্যে? (টেবিলের কাছে গিয়ে চিঠিখানা তুলে নিলেন, তারপর সভয়ে কেঁপে উঠে আবার চিঠিখানা টেবিলের উপরে রেখে দিলেন।) না, না! অসম্ভব! জীবনের দুর্ভাগ্য এমনভাবে পুনরুক্তি করতে পারে না! হায়! কেন আমার এখানে আসবার খেয়াল হ'ল? জীবনের যে-মুহূর্ত্তকে ভুলতে চাই, কেন আমি আবার তাকে স্মরণ করছি? (চিঠিখানা তুলে নিয়ে, ছিঁড়ে পড়লেন, তারপর যন্ত্রণাবিকৃতমুখে একখানা চেয়ারের উপরে ব'সে পড়লেন।) হা ভগবান, কি ভয়ানক—কি ভয়ানক! বিশ বছর আগে ইভার বাবাকে আমি যে ঠিক এই কথাগুলোই লিখে গিয়েছিলুম! আর তার জন্যে কি শাস্তিই

না আমি পেয়েছি! না, না, আমার সত্যকার শান্তির দিন হচ্ছে আজকের রাত্রি।

রাজা নরেন্দ্রনারায়ণের প্রবেশ

রাজা। আপনি আমার স্ত্রীর কাছ থেকে বিদায় নিয়েছেন?

কাছে এগিয়ে গেলেন

মিসেস্ রায়। (চিঠিখানা পাকিয়ে মুঠোর ভিতরে চেপে ধ'রে) হ্যাঁ।

রাজা। ইভা কোথায়?

মিসেস্ রায়। সে ভারি শ্রান্ত হয়ে পড়েছে। মাথা ধরেছে ব'লে শুতে গিয়েছে।

রাজা। (ব্যস্ত হয়ে) মাপ করবেন, আমাকে এখনি ইভার কাছে যেতে হবে।

মিসেস্ রায়। (তাড়াতাড়ি উঠে প'ড়ে) না নরেন, না! বাড়ীতে এখনো অতিথিরা খাওয়া-দাওয়া করছেন। ইভা ব'লে গেছে, তার হয়ে তুমি যেন তাঁদের দেখাশোনা করো। সে চায় না, আজ আর কেউ তাকে বিরক্ত করে। (হাত থেকে চিঠিখানা প'ড়ে গেল) তোমাকে এই সব কথা বলবার জন্য সে বলে গিয়েছে।

রাজা। (চিঠিখানা কুড়িয়ে নিয়ে) আপনার হাত থেকে কি প'ড়ে গেল।

মিসেস্ রায়। (চিঠিখানা নেবার জন্যে তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে) হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওখানা আমারই।

রাজা। (চিঠির দিকে তাকিয়ে) কিন্তু এযে দেখছি ইভার হাতের লেখা?

মিসেস্ রায়। (চিঠিখানা টেনে নিয়ে) হ্যাঁ, এটা হচ্ছে— একটা ঠিকানা। নরেন, আমার গাড়ীখানা আনতে বলবে কি?

রাজা। নিশ্চয়ই!

বেরিয়ে গেলেন

মিসেস রায়। কি করি? কি করি? আমি আজ যে উত্তেজনা অনুভব করছি, এমন আর কখনো করিনি। এর মানে কি? মেয়ে নিশ্চয় তার মায়ের মতন হবে না—তাহ'লে সর্ব্বনাশ হবে! আমি কি ক'রে তাকে বাঁচাব? আমি কেমন ক'রে আমার মেয়েকে রক্ষা করব? এক মুহূর্ত্তে ধ্বংস হয়ে যাবে তার সমস্ত জীবন! এ সত্য আমার চেয়ে ভালো ক'রে আর কে জানে? যেমন ক'রে হোক্, রাজাকে এখনি বাড়ীর বাইরে পাঠিয়ে দিতেই হবে। (একদিকে এগিয়ে গেলেন) কিন্তু কেমন ক'রে তা হবে? (আর একদিকে চেয়ে আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলে) আঃ, বাঁচলুম!

হাতে একটি ফুলের তোড়া নিয়ে কুমার চন্দ্রনাথের প্রবেশ

কুমার। প্রিয় মিসেস্ রায়, দোটানায় প'ড়ে প্রাণ যে যায়! আজকেই কি উত্তরটা পেতে পারি না?

মিসেস্ রায়। কুমারবাহাদুর, আমার কথা শুনুন। আপনাদের একটা ক্লাব আছে না?

কুমার। হরি, হরি! আছেই তো! বহুৎ আচ্ছা ক্লাব!

মিসেস্ রায়। কুমারবাহাদুর, রাজা নরেন্দ্রনারায়ণকে নিয়ে আপনাকে এখনি সেই ক্লাবে যেতে হবে। আর রাজাকে সেইখানে বসিয়ে রাখতে হবে যতক্ষণ পারেন। বুঝেছেন?

কুমার। হরি, হরি! এই যে একটু আগেই বলছিলেন, রাত্রে বেশীক্ষণ আমার বাইরে থাকা আপনি পছন্দ করেন না?

মিসেস্ রায়। (অধীর ভাবে) যা বলি তাই করুন—যা বলি তাই করুন!

কুমার। আমার পুরস্কার!

মিসেস রায়। আপনার পুরস্কার? আপনার পুরস্কার? আচ্ছা, পুরস্কার পাবেন কালকেই। কিন্তু আজ রাত্রে রাজা নরেন্দ্রনারায়ণকে একবারও চোখের বাইরে যেতে দেবেন না। তা যদি না করেন তাহ'লে আমি কখনো আপনাকে ক্ষমা করব না। তাহ'লে আর কখনো আপনার সঙ্গে কথা কইব না। আর কখনো আপনার সম্পর্কে আমি আসব না। মনে রাখবেন, রাজাকে বসিয়ে রাখতে হবে ক্লাবের মধ্যে, আর আজ কিছুতেই তাকে বাড়ীতে ফিরতে দেবেন না।

দ্রুতপদে প্রস্থান

কুমার। হরি, হরি—বহুৎ আচ্ছা! আমি মিসেস্ রায়ের স্বামী হ'ব কি—এর মধ্যেই দস্তরমত স্বামী হয়ে পড়েছি।

মিসেস্ রায়ের পিছনে পিছনে অগ্রসর হলেন হতভম্বের মত

ক্রমশঃ

বসন্তের প্রতীক্ষা

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

বসন্ত আসিয়া দেখে প্রকৃতির বাল্যভাব
নয় তিরোহিত,
নীড়ে নীড়ে বিহগেরা শাখে শাখে কলিকারা
নয় জাগরিত।
বসন্ত অধীর নয় প্রতীক্ষা করিয়া রয়
সহিষ্ণুতা ভরে,
কিংশুকের শাখে শাখে রসালের কুঞ্জে কুঞ্জে
নীরবে বিহরে।

অধীর হইয়া যদি করিত সে অধিকার
স্বরাজ অকালে,
অনল উঠিত জ্বলে দীপ্তরোষে স্মরারির
প্রশান্ত কপালে।
ভস্ম হয়ে যেত সবি গ্রীষ্ম এসে কুঞ্জবন
করিত মথিত।
রতি বিলাপের গীত প্রকৃতির বয়ঃসন্ধি
করিত ব্যথিত।

বাঙ্গালার বাৎসরিক হিসাব নিকাশ

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

বাঙ্গালার সরকারী বর্ষশেষ আসন্ন; হিসাব নিকাশ লইয়া বাঙ্গালার অর্থসচিব মহাব্যস্ত, এক তরফা বিবরণ প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে, তাহা লইয়া এখন ওয়াকিব-হাল মহলে আলোচনা চলিতেছে। তবে বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে বাঙ্গালা সরকার জনসাধারণের সুবিধা অসুবিধা বিচার না করিয়া, ভোটের জোরে যে ভাবে আপনাদের মতামত চালাইতে বদ্ধ-পরিকর, তাহাতে কোনও আলোচনা-প্রতিবাদের অর্থ আছে বলিয়া মনে হয় না। তথাপি আমাদের এ সকল আলোচনা করিবার, মতামত নির্ভয়ে বলিবার অধিকার আছে।

অর্থসচিবের বিবরণ আলোচনা করিবার পূর্ব্বে একটা কথা মনে হয়, যে এই বিভাগের কার্য্য পরিচালনার ভার তাঁহার উপর না পড়িলেই ভাল হইত। সারা জীবন কংগ্রেসের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া, কেন্দ্রীয় পরিষদে কংগ্রেস মনোনীত সভ্য হিসাবে যে সকল মতামত প্রকাশ করিয়া আসিয়াছেন, আজ হয়ত অবস্থার গতিকে তাঁহাকে সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া কাজ করিতে হইতেছে। অর্থ সম্বন্ধে, আয় ব্যয় হিসাবে এবং প্রয়োজনের গুরুত্ব বুঝিয়া অর্থব্যয় সম্বন্ধে তাঁহার যে জ্ঞানের পরিচয় বাঙ্গালা দেশ জানে, তাহাতে বাঙ্গালার অর্থসচিবের পদ গ্রহণ না করিয়া, তাঁহার পাণ্ডিত্যের যোগ্যতা হিসাবে, শিক্ষাসচিবের পদ শোভা পাইত। কিন্তু তাহাতে সেকেণ্ডারী এডুকেশন বিল বা মাধ্যমিক শিক্ষা বিষয়ক আইন সম্বন্ধে ভার পড়িলে, মোসলেম লীগের মত বাঙ্গালায় প্রচলিত হইবার পথে হয়ত সামান্য বাধা পড়িত, সেই কারণে তাঁহার জনপ্রিয়তার সুযোগ লইয়া, বাঙ্গালার বুকে নূতন করভার চাপাইবার জন্য অর্থ-সচিবের পদ দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব্ব-সংস্কার বলিয়া বস্তু সম্ভবত: রাজনীতি-ক্ষেত্রে, বিশেষত: মন্ত্রীত্বের মান ও স্থূল বেতনের নিকট অতি তুচ্ছ বস্তু। তাহা না হইলে তিনি আজ কি করিয়া বাঙ্গালার মোসলেম লীগ দলে কাজ করিতেছেন, তাহাই বিস্ময়ের বিষয়।

বাঙ্গালার বাজেটের আলোচনায় প্রথমেই মনে পড়ে, তুলসীচন্দ্রের পাণ্ডিত্যের পরিচয়। ইহাতে মহাপুরুষদের বচন উদ্ধৃত করা আছে; তন্মধ্যে একটী বড়ই উপদেশপূর্ণ। তিনি নাকি বাল্যকাল হইতে তাহা পালন করিয়া আসিতেছেন "Wor's which were my lesson in early youth, words which have been the stand by of the latter part of my own little existence." বিনয় সহকারে নিজ "ক্ষুদ্র" বা "সামান্য" অস্তিত্ব বা জীবনের শেষের কয়দিনের নির্ভরযোগ্য বচন: "Perhaps even these (dreadful) things it may one day be pleasing to remember. Toil on and preserve yourselves for happier circumstances." সত্যই কংগ্রেসের কাজে যাঁহারা দুর্ভোগ ভুগিয়াছেন এবং তুলসীচন্দ্রের নেতা এখনও ভুগিতেছেন, অথচ তাঁহার ভাগ্যে কেবল সুখ ও সম্মানটুকু জুটিয়াছে, ইহা স্মরণ করিতে আজ তাঁহার আনন্দ হইয়া থাকে। আর এত দিন কংগ্রেসের সহিত সংস্রব রাখিয়া যে আনন্দদায়ক অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন তাহা অবশ্যই কঠোর শ্রমের ফল। তিনি অবশ্যই এখনও শ্রম করিয়া আত্মরক্ষা করিলে, (এবং মোসলেম লীগের সাহচর্য্য রক্ষা করিলে) আরও উচ্চতর স্থান অধিকার করিবেন বলিয়া বিশ্বাস রাখি।

এবার প্রকৃত পক্ষে বাজেটে ব্যয়ের খাতে তিনটী বস্তুর পরিচয় পাওয়া যায়; অর্থাৎ ভারতবর্ষে অভূতপূর্ব্ব (extraordinary) বা অসাধারণ ব্যয়, ৮ কোটী ৫১ লক্ষ টাকা; দুর্ভিক্ষ ২ কোটী ৬১ লক্ষ টাকা এবং কৃষি ১ কোটী ৩০ লক্ষ টাকা। ইহাই মোট বাৎসরিক ৩০ কোটী ৪৪ লক্ষ টাকার মধ্যে প্রধান ব্যয়। ১৯৪২-৪৩ সালে ইহা ১৬ কোটী ৭৭ লক্ষ, ১৯৪৩-৪৪ সালে ৩২ কোটী ৫৪ লক্ষ টাকা হইয়াছিল।

প্রথমেই একটা কথা বলিয়া রাখা ভাল। বাঙ্গালা দেশে, তথা ভারতবর্ষে, কোনও জাতীয়তামূলক গঠন কার্য্যের কথা তুলিলেই ভারতের দুঃখে বিগলিতপ্রাণ, ভারতীয় দরিদ্র প্রজার অর্থকষ্টে সহানুভূতি-সম্পন্ন রাজপুরুষরা অর্থের অভাবের কথা তুলিয়া তাহা ধামা চাপা দিয়া থাকেন। এই সেদিনও সার্জ্জেণ্ট-রিপোর্ট বা ভারতে অবৈতনিক শিক্ষা বিস্তারকল্পে খোদ ভারত সরকারের শিক্ষা বিভাগের মুখ্য পরামর্শদাতা মিঃ জে, সার্জ্জেণ্ট যে পরিকল্পনা প্রচার করেন, তাহা অর্থাভাবের অজুহাতে চাপা পড়িয়া প্রসূতি গৃহেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। তাহা অপেক্ষা, বড়লাট বাহাদুরের মতে, প্রদেশে প্রদেশে যোগাযোগের জন্য রাজপথ অধিক প্রয়োজনীয়। এক বড়লাট সাত বৎসর রাজত্ব কালে ভারতের পুনর্গঠনের মঙ্গল কামনায় প্রজনন-বৃষ (stud bull) সম্বন্ধে বক্তৃতা এবং সম্ভবতঃ কিছু কিছু কাজও করিয়া গিয়াছেন। যাহাই হউক, ভারতের অর্থাভাবই যে ভারতের মঙ্গলের পরিপন্থী সে বিষয়ে স্মরণ করিতে করিতে জীবন সম্বন্ধে আমরা সবই ভুলিবার উপক্রম করিয়াছি। আবিসিনীয় যুদ্ধের টাকা ভারতের ঋণ, তুরস্কের সুলতানের তুষ্টির জন্য ইউরোপীয় মহিলার দ্বারা নৃত্যের আসর (ball) ভারতের ব্যয়, যুবরাজের ভারত পরিদর্শনেরও ব্যয় ভারতের দেয়। সে-দেশে অর্থ নাই—যে-দেশের রাজপুরুষরা সকল দেশের প্রধান রাজকর্ম্মচারী অপেক্ষা বেশী বেতন লাভ করেন। সে দেশে অর্থ নাই—যে দেশ ১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধের বাবদ বিরাট ব্যয়ভার বহন করিয়া, ইংলণ্ডকে ১৯০ কোটী টাকা দান করিয়া একটা কাগজ মারফত কৃতজ্ঞতা লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছে; তাহার অধিক কিছু না পাইয়াও এবার যুদ্ধে ৫৫ কোটী টাকা ব্যয় করার স্থলে ৮০০ কোটী টাকা ইতোমধ্যেই ব্যয় করিয়াছে এবং আরও কত করিতে হইবে তাহার স্থিরতা নাই। পরিবর্ত্তে যাহা পাওয়া যাইবে, তাহার আভাষ ইঙ্গিত কোনও শ্রেণীর ভারতবাসীর আনন্দ বিধান করিতে পারে নাই, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে।

আজ তাই বাঙ্গালার অর্থনৈতিক সালতামামি পড়িতে পড়িতে সেই কথা পুনরায় মনে পড়ে। বাঙ্গালা দেশ যদি এক অসাধারণ ব্যয় বাবদ সাড়ে ৮ কোটী টাকা ব্যয় করিতে পারে, তাহা হইলে এত দিন সে শক্তি তাহার কোথায় ছিল? এবং এই খরচ করার যখন আর প্রয়োজন থাকিবে না, তখন এই টাকায় কোন্ খেলা চলিবে? আমাদের মনে হয় শ্রীমান্ তুলসীচন্দ্র গোস্বামী তখন বর্ত্তমান থাকিয়া এই অর্থের কোনও সদ্ব্যবহার করিতে পারিবেন।

এই সাড়ে ৮ কোটী টাকার মধ্যে ৮ লক্ষ টাকা "charged" অর্থাৎ ব্যবস্থা পরিষদ এই ব্যয় সম্বন্ধে কোনও আলোচনা করিতে পারিবে না; রাজপুরুষদের নির্দ্দেশমত এই টাকা যোগাইতে হইবেই। ইহার সহিত অ-সামরিক জনরক্ষা কল্পে ১৯৪৩-৪৪ সালে ১ কোটী ৩১ লক্ষ টাকা খরচ হইতেছে; ১৯৪৪-৪৫ সালে ১ কোটী ৩০ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে। অগ্নি-নির্ব্বাপক দল পাইবে ৮১ লক্ষ টাকা, প্রাথমিক সাহায্য ও এ্যাম্বুলেন্স ৩৯ লক্ষ টাকা, আশ্রয় (shelters) ২৯ লক্ষ টাকা, বোমাবর্ষণে আশ্রয়হীন ব্যক্তিদের সাহায্য ৩৩ লক্ষ টাকা (১৯৪২-৪৩ সালে ৩২ লক্ষ এবং ১৯৪৩-৪৪ সালে ৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে),

অসামরিক মাল চলাচল ২৪ লক্ষ টাকা ; এ. আর. পি. ও অ-সামরিক জনরক্ষা কর্ম্মচারীদিগের ভাতা দানের ঘাট্‌তি ২০ লক্ষ, অ-সামরিক খাদ্য বিভাগের কর্ম্মকর্ত্তার খাতে ৪০ লক্ষ টাকা, খাদ্যবণ্টন বিভাগের কর্ম্মকর্ত্তা ৯৭ লক্ষ টাকা, খাদ্য বিক্রয় খাতে লোকসান ৫ কোটী, ৪০ লক্ষ টাকা ও অপরাপর মিলিয়া মোট ৮ কোটী ৫৮ লক্ষ টাকা। প্রত্যেকটী সম্বন্ধেই নানা প্রশ্ন করা চলে, কিন্তু স্থানাভাব ও পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতির কথা ভাবিয়া বিস্তারিত আলোচনা পরিত্যাগ করিতে হইল। খাদ্য বিক্রয় খাতে লোকসানের কথা ভাবিয়া কিঞ্চিৎ সন্দেহ স্বতঃই মনে উঠে। এত টাকা অর্থাৎ এ. আর. পি. প্রভৃতির হিসাব ধরিলে প্রায় ৬ কোটী টাকা (১৯৪৩-৪৪ সালে ৫ কোটী টাকা) কেন লোকসান হইল। কত মাল পড়িয়া নষ্ট হইয়াছে তাহার হিসাব কে দিবে? যাহার তত্ত্বাবধানে থাকিবার কথা, তাহাকে কি আইন আমলে আনা হইবে? মেসার্স ইস্পাহানিকে কি দরে মাল ক্রয় করিতে দেওয়া হইয়াছিল? আমরা জানি দর বাঁধিয়া দেওয়া হয় নাই, যতক্ষণ "economical" (প্রকৃত অর্থ হিসাবে কিছুই বলা যায় না) হয় ততক্ষণ তাহারা ক্রয় করিবে এবং যে দরই হোক, মোট টাকার উপর শতকরা একটাকা কমিশন তাহারা পাইবে, (Gregory Committee Report pp. 54 & 58) ইহার ফলে যে বাঙ্গালা দেশ মাত্র ৬ কোটী লোকসান দিয়া পার পাইয়াছে, ইহা অতিশয় সৌভাগ্যের কথা।

তাহা ছাড়া এ ব্যয় বাঙ্গালার—দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত বাঙ্গালার নিকট আদায় করিবার ব্যবস্থা কেন হইয়াছে? ভারতবর্ষ যে ৮০০ কোটী টাকা এ পর্য্যন্ত যুদ্ধে ব্যয় করিয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালার কোনও অংশ কি নাই? প্রতি দিন যখন ১ কোটী টাকার নোট ছাপা হইতেছে, তখন এক সপ্তাহ আর ১ কোটী করিয়া বাড়াইয়া দিলে হতভাগিনী বাঙ্গালা বাঁচিয়া যাইত। খাদ্য তণ্ডুলের উপর সরকারী সাহায্য পড়িয়াও সরকারী নিয়ন্ত্রিত দোকানে ১৬।০ দরে প্রতি মণ চাউল বিক্রীত হইতেছে। এখন মাঘ ফাল্গুন; শ্রাবণ-ভাদ্রে কি দাঁড়াইবে বলা যায় না। তাহা হইলে মনে হয়, সরকারী সাহায্য করিতে সরকার দরিদ্র প্রজার নিকট কর আদায় করিয়া যে অর্থ পাইতেছেন, তাহার কিয়দংশ দিয়া কতক লোক বাঁচাইতে চেষ্টা করিলেও লোকের দারুণ কষ্ট থাকিয়া যাইতেছে। জমির রাজস্ব মোটে কমে নাই, ১৯৪২-৪৩ সালে ৩ কোটী ৬১ লক্ষ, ১৯৪৩-৪৪ সালে ৩ কোটী ৭৩ লক্ষ টাকা আদায় হইয়াছে। ১৯৪৪-৪৫ সালে তাহা ৩ কোটী ৭৯ লক্ষ টাকায় ধার্য্য হইয়াছে। পাইকারী জরিমানা ১ লক্ষ টাকা আদায় হইয়াছে; এবারও ১ লক্ষ হইবে বলিয়া হিসাবে ধরা হইয়াছে।

দুর্ভিক্ষ হিসাবে ২ কোটী ৬১ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে, তাহার মধ্যে মাহিনা বাবদ (Salaries and Establishment) ব্যয় ১ কোটী ১১ লক্ষ টাকা। ১৯৪২-৪৩ সালে খরচ হইয়াছিল ২ লক্ষ টাকা; ১৯৪৩-৪৪ সালে ২ লক্ষ। ১৯৪৩-৪৪ সালে ৯০ লক্ষ হইয়া এখন কোটী টাকা পার হইয়াছে। প্রতিদানের আশা না রাখিয়া (Gratuitious Relief) দান করিবার জন্য এক কোটী টাকা ধরা হইয়াছে।

এই দুই হিসাবে অর্থাৎ অ সাধারণ ব্যয় ও দুর্ভিক্ষ, যে টাকা এখন ব্যয় করা হইতেছে, তাহাতে অপব্যয় কতদূর হইতেছে, তাহা একবার ভাবিয়া দেখিবার কথা। এ, আর, পি মৃতদেহ অপসারণ করিবার দল, অগ্নি-নির্ব্বাপক দল সবই আছে, ব্যয়ের বহরও মন্দ নয়, কিন্তু ইহা ত সকলই যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যাপার, দেশ রক্ষার জন্য, যাঁহারা দায়ী—তাহারা এ ব্যবস্থার জন্য কেন অর্থ ব্যয় করিবে না? তাহা ছাড়া আরও ভাবিয়া দেখা দরকার প্রয়োজনের তুলনায় ইহা বেশী কি না তাহা কে বলিবে। আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া কাজ করিলে লোকে তাহার কাজের তারিফ করিতে পারে না। ১৯৪২ সালের এপ্রিল মাসে পূর্ব্ববঙ্গের কতকগুলি অঞ্চল হইতে ধান্য ও চাউল অপসারণ করা হয় এবং ২৫,০০০ নৌকা ডুবাইয়া দেওয়া হয়, তাহাতে সরকারী মহলে যে আতঙ্কের পরিচয় প্রকাশ পায়, তাহা আর্থিক ক্ষতি অপেক্ষা অনেক বেশী। শত্রুর শক্তির পরিমাপ যে সেনাপতি অধিক করিয়া ধরে এবং তাহার ফলে দেশের মূল্যবান্ সম্পত্তি নষ্ট বা স্থানান্তর করিতে হয়, সে সেনাপতির বা কর্ম্মকর্ত্তার উপর নির্ভর করিয়া কাজ না করাই উচিত। নানা বিষয় আলোচনা করিলে দেখা যায়, এবারকার বাজেট বড় মহলে অতীতের অনেক ভুলের ফসল এবং দরিদ্র বাঙ্গালী আজ তাহার জন্য অর্থ দিতে বাধ্য। দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে নূতন এক হিসাব খোলা হইয়াছে, "Capital Outlay on Provincial Schemes Connected with the War, 1939." ইহাতে দেখা যায় ১৯৪৩-৪৪ সালে ৪১ কোটী ৯৪ লক্ষ টাকার তণ্ডুলাদি ক্রয়ের জন্য খরচ হইয়াছে, আর ১৪ কোটী টাকা অগ্রিম বা দাদন (advance) দেওয়া হইয়াছে, অর্থাৎ ৫৬ কোটী টাকার কারবার হইয়াছে। সরকারী খাতাপত্রে দেখা যায় যাহারা এই কারবার করিয়াছে, তাহারা শতকরা একটাকা কমিশন পাইয়াছে, অর্থাৎ ৫৬ লক্ষ টাকা কমিশন বাবদ পাওয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া কি দামে কেনা হইয়াছে তাহার কোনও বাধা নিষেধ ছিল না, এ কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। সরকারী হিসাব মতে তণ্ডুলাদি ক্রয় বিক্রয় খাতে ১৯৪৩-৪৪ সালে আড়াই কোটী টাকা লোকসান ধরিয়া কাজ চালাইয়া দেখা গেল—প্রকৃতপক্ষে সাড়ে তিন কোটী টাকা লোকসান গিয়াছে এবং ১৯৪৪-৪৫ সালে ৫ কোটী দাঁড়াইবে। সরকারী কর্ম্মচারিদিগকে চাউল-গম খাওয়াইতে ১৯৪৩-৪৪ সালে পৌনে দুই কোটী টাকা লোকসান হইয়াছে। খাতাপত্রের হিসাবে ১৯৪৩ সালে ৩০ কোটী টাকা মাল সরকারের হাতে মজুত ছিল বলা হইয়াছে; এক বৎসর কাজ চালাইলে তাহা সাড়ে ১২ কোটী টাকায় দাঁড়াইবে। ইহার মধ্যে কত বরবাদ যাইবে এবং কত কাজে লাগিবে, তাহার হিসাব ধরার উপায় নাই। অর্থসচিব মহাশয় কৃষির জন্য ১ কোটী ৩১ লক্ষ টাকা ব্যয় দেখাইয়া কিছু আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিকই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহা কর্ম্মকর্ত্তা বা কর্ম্মচারিদিগের বেতন বাবদ খরচ হইবে। একটা মোটা হিসাব দেওয়া আছে—অধিক খাদ্য শস্য উৎপাদন আন্দোলনের জন্য ৪২ লক্ষ টাকা বীজ প্রভৃতির সাহায্য করা হইবে। কৃষি শিক্ষা বাবদ এক লক্ষ টাকাই পর্য্যাপ্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। খাদ্য তল্লাসী (Anti-hoardi g Drive) কার্য্যে বাঙ্গালীকে সাড়ে ১৬ লক্ষ টাকা দণ্ড দিতে হইয়াছে; কৃষির মধ্যেই হিসাবে ছিল, তাহার পর কি বুঝিয়া "Extraordinary Charges"এর মধ্যে দেওয়া হইয়াছে। এই টাকায় লোককে চাউল কিনিয়া খাইতে দিলে আরও কয়েক সহস্র লোকের জীবন রক্ষা পাইত।

বাজেট পড়িলে এবং সেই সঙ্গে গতবৎসরের হিসাব আলোচনা করিলে মনে হইবে, জাতি এই অ-সাধারণ ব্যয়, দুর্ভিক্ষ ও (নাম-মাত্র) কৃষি লইয়া বাঁচিয়া থাকিবে। এখানে শিক্ষার ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধি পায় নাই এবং পুলিশ অপেক্ষা এক কোটী দশ লক্ষ টাকা কম ব্যয় হইবে; পুলিশ পাইবে ৩ কোটী ২ লক্ষ, শিক্ষা বিভাগ ১ কোটী ৯১ লক্ষ টাকা। চিকিৎসা বিভাগ মাত্র ৬৩ লক্ষ, জনস্বাস্থ্য ৬১ লক্ষ, শিল্প বিভাগ কেন রাখা হইয়াছে জানা নাই, মাত্র ৩৪ লক্ষ টাকা পাইবে। জাতি যাহাতে বাঁচে তাহার নামে 'অষ্টরম্ভা', অথচ ১৯৪০-৪১ সাল হইতে ১৯৪৪-৪৫ সালে কেবল সরকারী আদায়ের পরিমাণ বাড়িয়াছে সাড়ে ৮ কোটী টাকা। ইহার উপর কেন্দ্রীয় সরকার দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির সহায়তা করিয়াছেন; আমদানী শুল্ক বাড়িয়াছে, আবগারী এমন কি তামাকের উপর কর বসিয়াছে; খাম পোষ্টকার্ডের মূল্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা। রেলের মাশুল ১৲ স্থলে পাঁচ সিকা হইতেছে। আয় কর নিত্য বর্দ্ধিত হারে দেখা দিতেছে।

অর্থ সচিব আশা দিয়াছেন, আরও দশ কোটী কর তিনি শীঘ্র বৃদ্ধি করিবেন, এ বৎসরও যে বিক্রয় শুল্ক, কৃষিকর দিয়া লোকে নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিবে, তিনি আশ্বাস দিয়াছেন, আরও ট্যাক্স এ বৎসরে বৃদ্ধি পাইতে পারে। অনাহারক্লিষ্ট বাঙ্গালী এবার অর্থসচিবের শোষণ, খাদ্য সচিবের বাক্যাড়ম্বর প্রভৃতি শুনিয়া বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

হিন্দুধর্ম্মের স্বরূপ ও বিশ্বরূপ

অধ্যাপক শ্রীসরোজকুমার দাস এম-এ, পি-এইচ্-ডি

কোনও কোনও পণ্ডিতের মত এই যে সিন্ধু পরিবেষ্টিত আর্য্যাবর্ত্ত নামক ভৌগলিক ভূখণ্ডের অধিবাসীদিগকেই "হিন্দু" নামে অভিহিত করা হইয়াছে। মতান্তরে "হিন্দু" শব্দটী পারস্যদেশসম্ভূত এবং "হিন্দু" বলিতে পারসীকেরা কৃষ্ণকায় আফ্রিকাবাসী, আরবদেশীয় বা ভারতবর্ষীয় কৃষ্ণবর্ণ জাতি বুঝিতেন। তথ্যের দিক হইতে এই ইতিবৃত্তের যে মূল্যই থাকুক, তত্ত্বের দিক্ হইতে ইহার বিশেষ সার্থকতা নাই। এই সম্পর্কে স্যর সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্ তদীয় অপূর্ব্ব চিন্তা ও রচনাসম্ভারে সমৃদ্ধ "হিন্দুর জীবন-বেদ" নামক গ্রন্থে হিন্দুধর্ম্মের কি কারণে জীবনীশক্তির হ্রাস ও আধ্যাত্মিক অবসাদ ঘটিয়াছে তাহারই অনুসন্ধানক্রমে একটি সারগর্ভ উক্তি করিয়াছেন,—"মতবাদ অথবা প্রয়োগবিধির দিক্ হইতে অনন্য-বৃত্তি, অচল বা অপরিবর্ত্তনীয় 'হিন্দুত্ব' নামে কোনও পদার্থ নাই। হিন্দুধর্ম্ম মুখ্যতঃ একটি গতিশক্তি—কোনও পরিস্থিতি নয়, প্রগতি—কিন্তু পরিণতি নয়, এক উপচীয়মান ঐতিহ্য—কিন্তু কোনও সুনির্দ্দিষ্ট প্রত্যাদেশ বা শ্রুতিবাক্য নয়।" ["There has been no such thing as a uniform, stationary, unalterable Hinduism whether in point of belief or practice. Hinduism is a movement, not a position; a process, not a result; a growing tradition, not a fixed revelation."] ইহার শাস্ত্রীয় নজীর পাই ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণে। ব্রাহ্মণঋষি-তনয় শূদ্রীগর্ভজাত মহীদাস ছিলেন ইহার রচয়িতা। শিক্ষা ও দীক্ষা বিষয়ে পিতা কর্ত্তৃক অবজ্ঞাত হইয়া জ্ঞানভিক্ষু পুত্র মাতার নির্দ্দেশক্রমে আদিমাতা বসুন্ধরার শরণাপন্ন হইলেন। মাতা মহীর দীক্ষায় দীক্ষিত সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত আপনাকে "মহীদাস" এবং "ঐতরেয়" বা "ইতরাপুত্র" অর্থাৎ "ব্রাহ্মণেতরা শূদ্রীরপুত্র" এই নামকরণেই স্বীয় গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের ইতিহাসে উপহাসেরই ভূমিকায় এই ঐতরেয় ব্রাহ্মণ প্রাগৈতিহাসিক হিন্দুধর্ম্মের এক অপূর্ব্ব জয়তিলক রচনা করিয়া গিয়াছে। ইহারই এক অখ্যাত আখ্যায়িকা প্রসঙ্গে রূপকের ভাষায় গ্রন্থকার ধর্ম্মের মর্ম্মবাণী ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। রাজপুত্র রোহিত দীর্ঘকাল পর্য্যটন করিয়া ক্লান্ত হইয়া বিশ্রামলাভের আশায় যখন গৃহাভিমুখে চলিয়াছেন ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্র তাঁহার সম্মুখীন হইয়া এই প্রত্যাদেশ উচ্চারণ করিলেন:—"হে রোহিত চিরকালই শুনিয়া আসিতেছি যে ব্যক্তি চলিতে চলিতে শ্রান্ত তাহার শ্রীর অন্ত থাকে না। শ্রেষ্ঠজনও যদি চলিতে বিমুখ হয় সে অধোগামী অপদার্থ হইয়া যায়, আর যে চলে স্বয়ং ইন্দ্র তাহার সখা ও সহচর হন;—অতএব হে রোহিত চলিতে থাক, চলিতে থাক। যে চলে তাহার প্রতিপদক্ষেপে পুষ্পিত হইয়া উঠে তাহার চলার পথ, বৃহৎ হইতে বৃহত্তর ফললাভ করে তাহার আত্মা। মুক্তপথে চলার শ্রমে হতবীর্য্য হইয়া ঝরিয়া পড়ে তাহার যত পাপক্লেদ;—অতএব চলো, চলো।...(কারণ) নিদ্রাতুর হইয়া শয়ন করাই কলিযুগ, জাগরণই দ্বাপর, গাত্রোত্থান করিয়া দণ্ডায়মান হওয়াই ত্রেতা এবং অগ্রসর হওয়াই সত্যযুগ—অতএব চলো, চলো। যে চলিতে থাকে সেই অমৃতলাভ করে, সেই স্বাদুফল আস্বাদন করে। চাহিয়া দেখ সূর্য্যের কী আলোক সম্পদ্, কারণ সে যে সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে একদিনের জন্যও চলিতে চলিতে তন্দ্রাবিষ্ট হয় না। অতএব হে রোহিত এগিয়ে চল, এগিয়ে চল।" ["চরন্ বৈ মধু বিন্দতি চরন্ স্বাদুমুদুম্বরম্। সূর্য্যস্য পশ্য শ্রেমাণং যো ন তন্দ্রয়তে চরন্। চরৈবেতি, চরৈবেতি।"]

ধর্ম্মের এই মনোজ্ঞ ব্যাখ্যান একাধারে এত প্রাচীন অথচ এত নবীন। যুগ যুগান্তের এই অনাদৃত বাণী বিস্মৃতির অতল গর্ভ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া নব-জীবন পাইয়াছে, রবীন্দ্রনাথের গানে—"পান্থ তুমি, পান্থজনের সখা হে, পথে চলা সেই তো তোমায় পাওয়া।" বলা বাহুল্য, ধর্ম্মের তথা হিন্দুধর্ম্মের এই পান্থজীবন, সনাতনপন্থী বলিবেন, মরণেরই অভিযান, সর্ব্বনাশেরই পথ। তাঁহাদের মতে ধর্ম্মের পথও যেমন দুর্গম, পথের শেষও তেমনি অচল, অটল, কূটস্থ নিত্য। ধর্ম্মের এক অচলায়তনই উহার গতি ও মুক্তি, উহার আশ্রয় ও অলঙ্কার। প্রকৃতপক্ষে সনাতন-পন্থীগণ "সনাতন" কথাটির অপব্যাখ্যা করিয়া স্বতোবিরোধিতা ও ধর্ম্মান্ধতার ভ্রমে নিপতিত হন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই "সনাতন কাহাকে বলে" কুৎস নামে এক প্রাচীন ঋষি তাহার সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়াছেন—"সনাতনমেনমাহুরুতাদ্য স্যাৎ পুনর্ণবঃ"—"ইহাকেই বলা হয় সনাতন কিন্তু অদ্যই ইহা নবজীবনে সঞ্জীবিত।" অতএব সনাতনের অপব্যাখ্যা হেতু যে দৃষ্টিবিভ্রম ঘটে তাহার কারণ দূরীভূত হইলেই দেখিতে পাই হিন্দুর ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির মধ্যে এক বিরাট্ প্রাণশক্তি—যাহার শাশ্বতরূপ বিচিত্র দেশে ও কালে নব নব রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া আপনাকে সার্থক করিয়া তুলিতেছে। ইহার কোন একটি বিশেষ সাময়িক রূপ একান্ত করিয়া দেখিলে ধর্ম্মসাধনা শবসাধনারই নামান্তর হইয়া উঠে।

বর্ত্তমান যুগের ভারতীয় কোন প্রসিদ্ধ বিশেষজ্ঞের মতে "ভারতে যত সংস্কৃতি বা ধর্ম্ম এসেছে সবার সব দান একত্র মিলিত হয়েছে যে ধর্ম্মে তাকে কোন ব্যক্তিবিশেষের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম না বলে তার জন্মভূমির ভৌগলিক নামে তাকে ভারতীয় ধর্ম্ম বলাই সংগত। ভারতকে 'হিন্দ' বলে তাই এই দেশের সর্ব্ব সংস্কৃতির সমন্বয়ে বিধাতার নির্দ্দেশে যে ধর্ম্মটি যুগের পর যুগের সাধনায় গড়ে উঠেছে তাকে হিন্দের অর্থাৎ ভারতের হিন্দু অথবা ভারতীয় ধর্ম্ম বলাই ঠিক্। ধর্ম্মসাধনায় এই সমন্বয়কেই মহাত্মা কবীর ভারতের তপস্যা বলছেন। তাই তার পন্থাকে 'ভারতপন্থ' বলা হয়েছে। সুখের বিষয় এই যে, আধুনিক যুগের দুইটি ঋষিকল্প ভারতপন্থের পথিক হিন্দুধর্ম্মের এই মর্ম্মকথা সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার "অনুশীলন" প্রসঙ্গে বিশ্বমানব ধর্ম্ম (Religion of Humanity) প্রবর্ত্তক অগস্ত্ কঁৎ-এর উক্তি সাগ্রহে উদ্ধৃত করিয়াছেন—"ব্যক্তিগত জীবন নিয়ন্ত্রিত করা ও স্বতন্ত্র ব্যক্তিসমূহের মিলনক্ষেত্র রচনা করাই ধর্ম্মের অর্থ ও উদ্দেশ্য" ["Religion consists in regulating one's individual nature, and forms the rallying point for all the separate individuals.) প্রচলিত সকল ধর্ম্মতত্ত্ব ব্যাখ্যার মধ্যে এইটিকেই "উৎকৃষ্ট" জ্ঞানে তিনি উক্ত প্রসঙ্গের উপসংহারে বলিয়াছেন, "আর এই ব্যাখ্যা যদি প্রকৃত হয়, তবে হিন্দুধর্ম্ম সকল ধর্ম্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।" এই শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিপাদনকল্পে তদীয় অনবদ্য সুন্দর ভাষায় রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন: "বহুর মধ্যে ঐক্য-উপলব্ধি, বিচিত্রের মধ্যে ঐক্যস্থাপন—ইহাই ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত ধর্ম্ম। ভারতবর্ষ পার্থক্য বলিয়া জানে না—সে পরকে শত্রু বলিয়া কল্পনা করে না। এইজন্য ত্যাগ না করিয়া, বিনাশ না করিয়া, একটি বৃহৎ ব্যবস্থার মধ্যে সকলকেই সে স্থান দিতে চায়। এইজন্য সকল পন্থাকেই সে স্বীকার করে—স্বস্থানে সকলেরই মাহাত্ম্য সে দেখিতে পায়। আমরা ভারতবর্ষের বিধাতৃনির্দ্দিষ্ট এই নিয়োগটি যদি স্মরণ করি, তবে আমাদের লক্ষ্য স্থির হইবে, লজ্জা দূর হইবে—

ভারতবর্ষের মধ্যে যে একটি মৃত্যুহীন শক্তি আছে, তাহার সন্ধান পাইব।" ইহাই হিন্দুধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব—একযোগে ইহার স্বরূপ ও বিশ্বরূপ। এই বিশ্বরূপ দর্শন ব্যতীত কোন ধর্ম্মসাধনাই সত্যদৃষ্টি বা সার্থকতা লাভ করিতে পারে না। প্রতীচীর ধর্ম্মসাধনায় এই প্রকৃতিগত অভাব দর্শনে আধুনিক চিন্তা-জগতের অন্যতম নায়ক তদীয় গ্রন্থে 'ভবিষ্যমান' বা 'ভাবীকালের ধর্ম্মের ("Religion in the Making") লক্ষণ নির্দ্দেশক্রমে বলিয়াছেন "বিশ্ববোধপরতাই ধর্ম্ম" (Religion is world-loyalty")। যুগে যুগে হিন্দুর ধর্ম্ম বিরাট্ বনস্পতির ন্যায় উদার উন্মুক্ত আকাশে নিজ শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া বিভিন্ন জাতি, ধর্ম্ম ও সংস্কৃতিকে আশ্রয় দিয়া আসিয়াছে। কেবলমাত্র আশ্রয়দান করে নাই কিন্তু আত্মীয়জ্ঞানে আহ্বান করিয়াছে—"আয়ান্তু বিশ্বতঃ স্বাহা"। কারণ স্বধর্ম্মের প্রেরণায় ভারতবর্ষ যুগে যুগে চাহিয়াছে মিলিতে ও মিলাইতে—সকল জাতিবিরোধ, বর্ণ-বৈষম্য এবং ধর্ম্মদ্রোহিতা। তবেই সম্ভব হইয়াছে ভারতে ইহাদের একাত্মবোধে একনীড় হইয়া অবস্থান—"যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্।" অথচ যে দেশের জল, বায়ু, আকাশ অভেদ ও সমন্বয়ের সামগানে ওতপ্রোত, সেখানে দেখিতেছি নিত্য বিরোধ ও সংগ্রামে মানুষের মন ক্লিষ্ট ও রিক্ত! ভারতপন্থের সাধক কবীরের ভাষায় বলিতে হয়—"পানীমে হায় মীন পিয়াসী"—জলের মধ্যে বাস করিয়াও মীন পিপাসা কাতর থাকে"। বৈদিক ঋষিও যে বলিয়াছিলেন —"অপাং মধ্যেতস্থিবাংসং তৃষ্ণাবিদজ্জরিতারম্"—জলের মধ্যে বাস করিয়াও তৃষ্ণায় জর্জ্জরিত—আমাদের সেই অবস্থা। তাই আমাদের প্রার্থনা হৌক্ তাঁরই উদ্দেশে—"য একোঽবর্ণো বহুধাশক্তিযোগাদ্ বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি"—যিনি এক ও বর্ণহীন কিন্তু বহুশক্তিযোগে যিনি তাহাদের অন্তর্নিহিত শক্তিরূপে নানা বর্ণ আপনার মধ্যে ধারণ করেন—"বিচেতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ"—যিনি সমস্ত বিশ্বের আদিতে ও অন্তে সক্রিয়—"স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু"—তিনিই শুভবুদ্ধির প্রেরণা দ্বারা সকলকে যুক্ত করুন। আজ আমাদের চিত্ত প্রণত হউক সেই চিরপ্রাচীন অথচ চিরনবীন ভারতবর্ষের ভাববিগ্রহ সম্মুখে যাঁহার ঐক্যবিধায়িনী মহাশক্তি এই "ভাব হ'তে রূপে অবিরাম যাওয়া-আসার" মধ্যে লীলা করিয়া চলিয়াছে। "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া"—আমাদের অর্চ্চনা, আমাদের অন্বেষণা, আমাদের সেবাকে সার্থক করিয়া প্রকাশিত হউক হিন্দুধর্ম্মের এই বিশ্বরূপ, সমাহৃত হউক আমাদের ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণ, চরিতার্থ হউক আমাদের সকল ধর্ম্মসাধনা ও কর্ম্মপ্রেরণা!

ভারতের আর্থিক পুনর্গঠন পরিকল্পনা

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ

স্যার পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস প্রমুখ আটজন শিল্পপতি ভারতের যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক পুনর্গঠন সম্পর্কে একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। যুদ্ধ এখন বিশেষজ্ঞদের মতে শেষ পর্য্যায়ে উপনীত, অনেকে আশা করেন হয়তো ১৯৪৪ সালের মধ্যেই যুদ্ধ শেষ হইয়া যাইবে। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ও প্রধানমন্ত্রী চার্চ্চিল পরামর্শ করিয়া আটলান্টিক সনদ্ নামক এক ফতোয়া জারী করিয়াছেন, তাহাতে পৃথিবীর প্রায় সব শিল্পপ্রধান দেশই অল্পবিস্তর লাভবান হইবে, কিন্তু ভারতের ও চীনের মত যে সকল দেশ কৃষির উপর নির্ভর করিয়া থাকে এবং যাহাদের অগাধ প্রাকৃতিক সম্পদ দুর্ভাগ্যক্রমে শিল্পে নিয়োজিত হইতে পারে নাই, তাহাদের অন্ধকার হইতে আলোকে আসার বিশেষ সম্ভাবনা থাকিবে না। আসলে এই সনদের দ্বারা মধ্য ইউরোপের শিল্পপ্রধান জাতিগুলি ভারতবর্ষ প্রভৃতি স্থান হইতে প্রয়োজনমত কাঁচা মালের যোগান পাইয়া পূর্ণ উদ্যমেই সুগঠিত চলতি ব্যবসাগুলি চালাইয়া যাইবে, ভারতবর্ষ অথবা চীন যদিই বা উদ্বৃত্ত কাঁচা মাল পায়—নুতন ব্যবসা পত্তনের স্বাভাবিক অসুবিধার সম্মুখীন হওয়া তাহাদের পক্ষে মোটেই সহজ হইবে না। এই অবস্থায় ভারতকে অনাগত উজ্জ্বলতর দিনগুলির যোগ্য করিয়া তুলিবার যে কোন প্রচেষ্টারই প্রয়োজন আছে এবং সেদিক দিয়া চিন্তাশীল এই সব শিল্পপতির পরিকল্পনার নিজস্ব মূল্যও যথেষ্ট।

পরিকল্পনা রচয়িতারা পরিষ্কার করিয়া ভারতের সর্ব্বমুখী অবনতির কথা বিবৃত করিয়াছেন। স্বাস্থ্যে, শিক্ষায়, শিল্পে, কৃষিতে, যানবাহন বা পথঘাট সম্বন্ধে, এমন কি মাথা গুঁজিয়া থাকিবার স্থানটুকুর দিক দিয়া ভারতবর্ষ এখন জগতের সভ্য জাতিগুলির বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছে। পাঁচ বৎসরের অধিকবয়স্ক জনসংখ্যার শতকরা মাত্র ১৪·৬ ভাগ শিক্ষিত, বাকী ৮৫·৪ ভাগ নিরক্ষরতার অভিশাপ বহিয়া বিংশতাব্দীর উন্নততর সভ্যতার সহিত মুখোমুখী পরিচয়ের আশাও রাখে না। এখানে জন্মহারও যেমন সবচেয়ে বেশী, মৃত্যুহারও সেইরূপ, ফলে অস্বাস্থ্য সারা দেশে সংক্রমিত হইয়া আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মাথাপিছু আয় ১৪০৬ টাকা, ক্যানাডায় ১০৩৮ টাকা, ব্রিটেনে ৯৮০ টাকা, এমন কি সরল জীবনযাপনে অভ্যস্থ জাপানেও জনপ্রতি আয় ২১৮ টাকা, কিন্তু ভারতবর্ষের প্রতিজনের গড়ে মাত্র ৬৫ টাকা আয়। আর্থিক নিদারুণ অস্বচ্ছলতা ভারতবাসীকে সবদিক হইতে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে। শিক্ষার অভাবে নিজের কথাও যেমন তাহাদের ভাবিবার সাহস নাই, পরের বা দেশের ভালো মন্দের হিসাবও তাহারা রাখিবার স্পর্দ্ধা করে না। এই সব অসহায় হতভাগ্য গৌরবোজ্জ্বল অতীতকে বুকে বহিয়া নিষ্করুণ হতাশায় দিনের পর দিন বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার জয়যাত্রা দেখিয়া চলিয়াছে, উৎসব-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিবার অধিকার পাইতেছে না;—ইহাদের বাঁচাইবার দায়িত্ব এদেশের প্রত্যেক অধিবাসীর। ইহাদের পরিচয়েই ভারতের পরিচয়। শিল্পপতিরা জানেন তাঁহাদের বড় হওয়ার সমস্ত মর্য্যাদাই মিথ্যা হইয়া যাইবে, যদি তাঁহাদের দেশের অসংখ্য অধিবাসী নিষ্ফলতার বেদনায় এমন করিয়া অকৃতির লজ্জা ঢাকিবার জন্য অন্ধকারে আত্মগোপন করিতে বাধ্য হয়।

পরিকল্পনাটি গঠিত হইয়াছে স্থান, কাল ও পাত্রের মুখ চাহিয়া রচয়িতারা একদিকে স্মরণ রাখিয়াছেন ভারতবর্ষের ১৫,৮০,০০০ স্কোয়ার মাইল পরিধির কথা, অন্যদিকে পরিকল্পনাটির বাস্তব-দিকও তাঁহারা ভুলিয়া যান নাই। এইজন্যই আপাত দৃষ্টিতে এই অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে প্রয়োজনীয় অর্থ অত্যন্ত বেশী মনে হইলেও চিন্তা করিলে দেখা যাইবে এত বড় দেশের প্রায় চল্লিশ কোটি লোকের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টি করিবার পক্ষে এ আয়োজন ব্যয়বহুল বলা চলে না। অন্নবস্ত্রের সংস্থানের পর উপার্জ্জনের উদ্বৃত্ত অংশে যাহাতে এদেশবাসী জীবনের আনন্দ সঞ্চারের মত সামান্য বিলাস ও কৃষ্টিগত

উৎকর্ষতা অর্জ্জন করিতে পারে, পরিকল্পনার রচয়িতারা সেই কল্যাণী ইচ্ছাই প্রকাশ করিয়াছেন।

তিন হইতে পাঁচ বৎসর আবশ্যকীয় আয়োজনের জন্য ব্যবহার করিয়া পরিকল্পনাটি কার্য্যকরী করিবার সময় লাগিবে পনেরো বৎসর। ১৯৩১ সাল হইতে এদেশে প্রতি বৎসর প্রায় ৫০ লক্ষ লোক বাড়িতেছে, মাথা পিছু আয় যদি এই পনেরো বৎসরে দ্বিগুণ করিয়া তোলা যায় তাহা হইলে এখনকার জাতীয় আয় ১৫ বৎসর পরে তিনগুণ হইতে পারে। অর্থাৎ এখনকার জাতীয় আয় ২,২০০ কোটি টাকা, পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইয়া গেলে ৬,৬০০ কোটি টাকায় দাঁড়াইবে।

পরিকল্পনাটিকে কাজে লাগাইতে প্রয়োজন হইবে ১০,০০০ কোটি টাকার। প্রত্যেকটি ৫ বৎসর করিয়া ৩টি অংশে ইহা বিভক্ত হইবে এবং কার্য্যকরী করিয়া তুলিতে প্রথম ও দ্বিতীয় অংশের অসুবিধা তৃতীয় পর্য্যায়ে অনেকখানি কমিয়া যাইবে বলিয়া রচয়িতারা আশা করেন। আমাদের এদেশে কাঁচা মাল আছে কিন্তু শিল্পাদি সুগঠিত নয় বলিয়া এখানে যন্ত্রপাতিরও যেমন অভাব—দক্ষ শিল্পীদের অভাবও তেমনি বেশী। প্রথমদিকে যন্ত্রপাতি তৈয়ারীতে ও শিল্পদক্ষতা গঠনে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গেই ভোগ্যবস্তু (consumption goods) প্রস্তুতের কারখানাগুলিও চালু হইতে থাকিবে। এমনি ভাবে অল্প দিনেই আমাদের পক্ষে স্বাবলম্বী হওয়া সম্ভব হইবে এবং শিল্প পরিচালনার উপযোগী কোন কিছুর জন্যই বিদেশের মুখাপেক্ষী হইতে হইবে না।

এই ১০,০০০ কোটি টাকার মধ্যে শিল্পে ৪,৪৮০ কোটি টাকা (মূল শিল্পে ৩,৪৮০ কোটি এবং ভোগ্যবস্তুর উৎপাদন-শিল্পে ১,০০০ কোটি), কৃষিতে ১,২৪০ কোটি, যানবাহন ও পথঘাটে ৯৪০ কোটি, শিক্ষা ব্যবস্থায় ৪৯০ কোটি, স্বাস্থ্যবিভাগে ৪৫০ কোটি, সমস্ত দেশবাসীর বাসস্থানের উন্নতিসাধনে ২,২০০ কোটি ও অন্যান্য বাবদে ২০০ কোটি ব্যয় হইবে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। এই বিপুল পরিমাণ টাকা কোথায় পাওয়া যাইবে সে সম্বন্ধেও রচয়িতাগণ সুচিন্তিত ইঙ্গিত করিয়াছেন। পরকল্পনাটি জনগণের সহানুভূতি সাপেক্ষ এবং জনসাধারণের সাহায্য ছাড়া ইহা সার্থক হইতে পারে না। যে পরিমাণ স্বর্ণ বিদেশে রপ্তানী হইয়া গিয়াছে তাহা ছাড়াও যাহা এদেশে এখনও ঘরে ঘরে সঞ্চিত আছে তাহার মূল্য কমপক্ষে ১,০০০ কোটি টাকা। জনসাধারণ যদি পরিকল্পনাটির সুফল ভালভাবে বুঝেন ইহা হইতে অন্ততঃ ৩০০ কোটি টাকার স্বর্ণ তাহারা মূলধন হিসাবে লগ্নী করিবেনই। যুদ্ধের সময় আমাদের জিনিষের পরিবর্ত্তে ব্রিটেনে যে ষ্টার্লিং বণ্ড জমিতেছে, তাহার পরিমাণ যুদ্ধের মধ্যেই ১,০০০ কোটি টাকায় পৌঁছাইবে এবং শিল্প গঠনের প্রথমদিকে বিদেশ হইতে যন্ত্রপাতি আনানো উপলক্ষে সেই টাকা আমরা ব্যয় করিতে পারিব। বাণিজ্যের গতি বরাবরই ভারতের পক্ষে, যান্ত্রিক উন্নতিসাধনে ইহা আরও উন্নত হইবে এবং তখন ১৫ বৎসরে এখনকার বাৎসরিক ৪০ কোটি টাকা হিসাবেই অন্ততঃ ৬০০ কোটি টাকা এই বাণিজ্য উদ্বৃত্ত হিসাবে আমরা বিদেশ হইতে পাইব। জাতীয় আয়ের শতকরা মাত্র ছয়ভাগ বাঁচাইতে পারিলে নির্দ্ধারিত সময়ে ৪,০০০ কোটি টাকা মূলধন হিসাবে জাতীয় আয় হইতেও পাওয়া যাইবে। বৈদেশিক মূলধন নিয়োগের ব্যাপারে ভারত চিরকালই পৃথিবীর কাছে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছে, ধার চাহিলে তাহাকে ঋণ দিতে সকলেই উৎসুক। অধিক দায়িত্ব না লইয়া এই বৈদেশিক ঋণ বাবদ লওয়া হইবে ৭০০ কোটি টাকা। বাকী ৩,৪০০ কোটি টাকার নোট রিসার্ভ ব্যাঙ্ককে বিনা স্বর্ণ তহবিলে ছাপাইবার অনুমতি দেওয়া চলে। উদ্দেশ্য যখন জাতীয় আয়বৃদ্ধি এবং জনসাধারণের উপকারই যখন এ পরিকল্পনার লক্ষ্য, তখন এভাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে নোট ছাপিবার অনুমতি দেওয়া অসঙ্গত হইবে না। বিপ্লবের পর রাশিয়া বা যুদ্ধের পর জার্ম্মাণীও স্বর্ণ বিনিময় সাপেক্ষ না করিয়াই, নোট ছাপিয়া নিজের দেশকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। এই সকল দেশের চেয়ে ভারতের প্রয়োজন অনেক বেশী, কাজেই এই অনুমতি দানে জাতির অর্থনৈতিক বনিয়াদ দৃঢ়তরই হইবে, ক্ষয়িষ্ণু হইবে না।

পরিকল্পনাটিতে ভারতের সকল অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির সম্বন্ধেই আলোচনা হইয়াছে এবং শিল্পপ্রসার কৃষির উন্নতির চেয়ে অপেক্ষাকৃত অধিক স্থান পাইয়াছে এইজন্য যে কৃষির আয় প্রায় স্থির, কিন্তু শিল্প প্রসারের দ্বারা ভারতের জাতীয় আয় আশাতীত বৃদ্ধি পাইতে পারে। আয় না বাড়িলে ভারতবাসী বাঁচিবার ব্যবস্থা করিতে পারিবে না এবং মানুষের মত বাঁচিবার ব্যবস্থা না হইলে এই শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিবার কোন অর্থ হয় না। অনেকে সন্দেহ করেন টাকার বিরাট অঙ্ক নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা অর্থশালী ব্যক্তিদের হাতে যাওয়াই যখন স্বাভাবিক, তখন এই পরিকল্পনাতে তাঁহারাই অধিকতর লাভবান হইবেন, দরিদ্র যাহারা আজও ধনিক শ্রেণীর পায়ের তলায় নিঃশব্দ প্রতিবাদে গুমরিয়া মরিতেছে, তাহাদের স্থায়ী এবং লক্ষণীয় কল্যাণ ইহা দ্বারা সম্ভব হইবে না। অবশ্য শিল্পপতিদের গঠিত এই পরিকল্পনা পরিচালনার আংশিক দায়িত্ব ধনিকশ্রেণীর উপর পড়িবে সন্দেহ নাই, কিন্তু যে দারুণ অভাবের অনুশোচনায় এদেশবাসী সর্বদিক হইতে মৃত্যুমুখী হইতেছে, সেই দৈন্যের সমাপ্তির সম্ভাবনাও কি কিছুই নহে? রাশিয়ার সমগ্র জনসংখ্যা ১৭,০০,০০,০০০, দক্ষ শিল্পী ও শিক্ষক ইহাদের মধ্যে ৯৫,৯১,০০০ জন। ভারতের সুবিপুল জনমণ্ডলীর মধ্যে এখন কয়জন দক্ষশিল্পী আছেন? আজও তো বিদেশ হইতে লোক না আনিলে আমাদের কাজ চলে না। সম্প্রতিই তো কয়লা সরবরাহ পরিচালনার জন্য ভারত সরকার ইউরোপ হইতে লোক আনাইয়াছেন। বিশেষজ্ঞ পরিকল্পনার উপস্থিত সুফলের ভাগও সর্ব্বসাধারণ লাভ করিবেন সন্দেহ নাই এবং চেতনাবোধ যদি একবার হয়, নিজের প্রাপ্য আদায় করা কাহারও পক্ষেই কঠিন হইবে না।

সমগ্র পরিকল্পনাটি আশাবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। যুদ্ধের পরে এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিয়া তোলার ভার যে সরকারের স্কন্ধে পড়িবে তাহাকে অবশ্যই জাতীয় সরকার হইতে হইবে এবং সর্ব্বদলীয় প্রতিনিধিদের সেখানে স্থান দিতে হইবে। এরূপভাবে গঠিত না হইলে শুল্ক ব্যবস্থা হইতে সুরু করিয়া সমস্ত বাণিজ্যিক নিয়ন্ত্রণ ভারতের অনুকূলে হওয়ার ভরসা আমরা কেমন করিয়া করিতে পারি? আইনসভা ও অর্থনৈতিক উপদেষ্টাদের পরামর্শ অনুসারে যুদ্ধোত্তর জাতীয় সরকার কৃষি ও শিল্পাদির কথা আপেক্ষিকভাবে বিশেষ বিবেচনা করিয়া পরিকল্পনার প্রসারমূলক ব্যবহার করিবেন; যে সম্ভাব্য শিল্পবিপ্লব ভারতের দুয়ারে অপেক্ষা করিতেছে, কৃষির উন্নতিকরণে কাঁচামাল যোগানের সুবিধা সৃষ্টি করিয়া এবং স্বাস্থ্য ও শিক্ষার সংস্কারে মানুষের শ্রমমূল্য বাড়াইয়া প্রদেশ এবং কেন্দ্রের প্রগতিশীল সহযোগিতার ভিত্তিতে এই জাতীয় সরকার সমগ্র জাতিকে স্বাবলম্বী করিয়া তুলবেন।

সর্বদিক হইতে ভারতের উন্নতি করিবার সঙ্কল্প যেমন পরিকল্পনাটিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তেমনি আবার ইহাকে কার্য্যকরী করিয়া তুলিবার জন্য সকলের সমবেত সহানুভূতির প্রয়োজন স্বীকার করা হইয়াছে। জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে প্রত্যেক ভারতবাসী নিজের শিক্ষা ও যোগ্যতার দৌলতে এই পরিকল্পনার সুযোগ লইয়া বড় হইতে পারিবে। শুধু সুবিধা না পাইয়াও তো আমাদের দেশে কম প্রতিভার অপচয় হয় নাই, যদি এ পরিকল্পনা কার্য্যকরী হয়, প্রতিষ্ঠা লাভের সার্থক উত্তেজনায় এদেশবাসীর চোখের সমুখে নূতন আলোর রাজ্য খুলিয়া যাইবে।

আগেই বলা হইয়াছে, ভারতের দারিদ্র্য, শিল্পবিমুখতা প্রভৃতির উপর দৃষ্টি রাখিয়া পরিকল্পনাটি রচনা করা হইয়াছে। আয় না বাড়িলে জীবনযাত্রা সাবলীল হইতে পারে না, জীবনযাপনে আত্মশ্রদ্ধার উপাদান থাকিলে বাঁচিয়া থাকার কোন মূল্য নাই। এই পরিকল্পনা অনুসারে পনেরো বৎসরে শিল্পক্ষেত্রে শতকরা ৫০০, কৃষিক্ষেত্রে শতকরা ১৩০ এবং

ব্যবসা বাণিজ্যে ও চাকুরীক্ষেত্রে শতকরা ২০০ টাকা আয়বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে। ইউরোপীয় শাসনযন্ত্রের অধীনে আমরা যতদিন আসিয়াছি আর্থিক দুরবস্থা আমাদের ততদিনের। বলিতে গেলে শুধু শিল্পপতিদের দিক দিয়া নয়, কার্য্যকরী করিয়া তোলা সম্ভব এমন একটা পরিকল্পনা ইহার আগে ভারতবাসীর কাছে কখনই কেহ আনিয়া দেয় নাই। মুদ্রাস্ফীতিতে ভয় পাইবার কিছু নাই, একগুণ শুভেচ্ছামূলক দায়িত্ব লইয়া দশগুণ কল্যাণ আমরা লাভ করিতে পারিব; সঞ্চয় ও যুদ্ধঋণ কিনিয়া মুদ্রাসম্প্রসারণ বন্ধ করার স্বপ্ন দেখার চেয়ে ইহা ঢের বেশী কার্য্যকরী হইবে। তাছাড়া সবটাকা একসঙ্গেও লাগিবে না, সুদীর্ঘ সময়ে আমাদের শিল্পের ক্রমবর্দ্ধমান আর্থিক উন্নতিও অর্থের যোগানে কিছু পরিমাণ সহায়তা করিবে সন্দেহ নাই। আর তাছাড়া লাভের পথ দেখিলে টাকা লগ্নী করিতে ভিড় জমিয়া যাইবে। এই শতাব্দীর প্রথম দশকে টাটা কোম্পানীর মূলধন সংগ্রহের ইতিহাস ভুলিয়া যাইবার নয়।

বর্দ্ধিত আয় কেমন করিয়া জনসাধারণের মধ্যে বিতরিত হইবে এবং সরকার ও দেশবাসী পরিকল্পনার লব্ধ ফলগুলির উপর কতখানি অধিকার বিস্তার করিবেন তাহা অবশ্য ইহাতে ভাল করিয়া বলা হয় নাই। জাতীয় সরকার জাতীয়তার ভিত্তিতে শাসন করিবেন ইহাই আমরা আশা করি। সেই সরকারের গঠনও হইবে জনসাধারণের প্রতিনিধি লইয়া। এক্ষেত্রে জাতির নিজস্ব সম্পত্তিভোগে তাহাদের কেহই বঞ্চিত করিবে না। তাছাড়া যে ক্ষেত্রে রাষ্ট্র জনসাধারণের বিশ্বাস ও সাহায্যের উপর মূলধনের জন্য নির্ভর করিয়া থাকিবে, সে ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কাঠামোও সমাজতান্ত্রিক হওয়াই সম্ভব। পরিকল্পনাটির অনুপূরক অংশ প্রকাশিত হইলে তাহাতেই এই সব সমস্যার আলোচনা থাকিবে বলিয়া আমরা মনে করি। যে পরিকল্পনা সারাদেশে উৎসাহের বন্যা বহাইয়া দিয়াছে, যাহার পিছনে ভারতের শিল্পসম্রাটগণের বুদ্ধি, সহানুভূতি, ভবিষ্যত ও মর্য্যাদা রহিয়াছে, তাহার প্রথম আবির্ভাবে হয়তো সামান্য সূক্ষ্ম ত্রুটি থাকিতে পারে, কিন্তু স্বাধীন চিন্তার বিকাশে ও আলোচনার অঙ্গাঙ্গী সংস্কার সুবিধায় সে ত্রুটি শেষ অবধি টিকিতে পারিবে না।

বড়লাট সম্প্রতি উভয় পরিষদের সম্মুখে দিল্লিতে যে বক্তৃতা করিয়াছেন তাহাতে এই পরিকল্পনাটির উল্লেখ আছে। সরকারী মহলে ইহার সম্ভাবনা সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে, আমাদের দেশের প্রত্যেক ভবিষ্যতকামী ব্যক্তির এ সম্বন্ধে অবহিত হওয়া উচিত। পরিকল্পনাটির মুখবন্ধেই আশা করা হইয়াছে যুদ্ধ শেষ হইলে অথবা যুদ্ধের কিছু পরেই আর্থিক ব্যাপারে সমস্ত ক্ষমতাসম্পন্ন একটি জাতীয় শাসনযন্ত্র কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং তাহার দ্বারাই এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিয়া তোলা যাইবে। হাওয়া দেখিয়া এবং নিজেদের আকাঙ্ক্ষার উগ্রতায় আমরাও এমনি কিছু আশা করি। অনেকবার অনেক কিছু চাহিয়া ঠকিয়াছি, ভাগ্য আমাদের খুবই মন্দ, তবু সমগ্র জগতের উপর যুদ্ধের তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিতেছে, হয়তো ভারতের মত এতবড় দেশের ঐকান্তিক চাওয়াকে অস্বীকার করিবার ন্যায় যুক্তি আমাদের বর্ত্তমান শাসকসম্প্রদায়ের থাকিবে না। আর এ আশা যদি ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে হাজার পুনর্গঠন ব্যবস্থাই হউক বা ভিক্ষার দানে ভারতবর্ষ নিজের পায়ে দাঁড়াইবার যত স্বপ্নই দেখুক, সমস্তই মিথ্যা হইয়া যাইবে।

জাতীয় পরিকল্পনা সমিতির পরিকল্পনার সহিত স্যার ঠাকুরদাসের পরিকল্পনার যথেষ্ট মিল আছে। দুইটিতেই সংস্কৃতি ও মানবতার দিক সম্পূর্ণ স্বীকার করিয়া জীবনমান বাড়াইয়া তোলার বিষয় বিবেচনা করা হইয়াছে। ইহার ব্যাপক আয়তনে নেহেরু জাতীয় পরিকল্পনা হইতে সুরু করিয়া, ওয়ার্দ্ধা শিক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নতি পরিকল্পনা, হিন্দু মহাসভার ভারতের শিল্পপ্রসার পরিকল্পনা, এমনকি মিঃ সারজেন্টের শিক্ষাপ্রসার পরিকল্পনা পর্য্যন্ত সমস্তই কার্য্যকরী হইবার উপযুক্ত রূপে স্থান পাইয়াছে। শক্তিসম্পদ (Power) ও যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণের প্রয়োজন সর্ব্বাগ্রে স্বীকৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু দেশবাসীর দরকারী দ্রব্যগুলিও প্রথম হইতে প্রস্তুত হইবে বলিয়া পরিকল্পনায় আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে। ভারতের দুর্দ্দশা দেখিয়া যাহারা সত্যই ব্যথা অনুভব করেন, এই পরিকল্পনার সর্ব্বমুখী কল্যাণী সংকল্প তাহাদিগকে অবশ্য আশান্বিত করিয়া তুলিবে।

পরিকল্পনাটিকে ব্রিটিশ সরকার কেমনভাবে গ্রহণ করেন, তাহারই দ্বারা তাহাদের এদেশ সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গি পরিষ্কার বুঝা যাইবে। মুখে যাহাই বলুন, আমাদের আর্থিক উন্নতি প্রভুরা সত্যই চাহেন কি না, এই কার্য্যকরী পরিকল্পনাটির মারফৎ যাচাই করিয়া লইব।

রবে মোর জীবনে

বন্দে আলি মিয়া

আজি মাধবী রাতে
রূপালি চাঁদের আলো
আসে মোর আঙিনাতে।
যদি একেলা ঘরে মোরে পড়ে গো মনে
এসে দাঁড়ায়ো বারেক তব বাতায়নে
মোরে ভুলিয়া যেও—যদিগো আসে জল
তব আঁখির পাতে।
মধু জোৎস্না নিশি আঁকে স্বপন চোখ
আজি আসে না ঘুম
হের কৃষ্ণচূড়া আজি ছড়ায় তব
রাঙা হাসির কুসুম।
তব কবরী হতে খুলি চাঁপার কলি
মোরে স্মরিয়া তায় যেও চরণে দলি,
সেই দলিত কুঁড়ি লবো বক্ষে তুলি—
রবে জীবন সাথে।

ব্যর্থ জীবন

অধ্যাপক শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

সুদীর্ঘ নহেক তবু খুব ছোট নয়
এই জীবনেরে হেরি' লাগিছে বিস্ময়—
কেমনে বাঁচিয়া আছি। কেমনে নিয়ত
দৈন্যক্লিষ্ট শোকবিদ্ধ জীর্ণ ব্যথাহত
আমারে বাঁচায়ে রাখি' পরম যতনে
চ'লে আসি গুরুভার মন্থর গমনে।

কেঁদে উঠি, মুছি আঁখি, চাপি আর্ত্তনাদ,
পদে পদে, দুর্ব্বিপাক দুঃখ, পরমাদ।

উদাস আকাশে চাহি' হৃদয় শুধায়—
কবে শেষ, কবে শান্তি, কোথায় কোথায়?

কে শোনে সে মর্ম্ম-ব্যথা কে দেবে উত্তর?
সম্মুখে গহন বন, উত্তপ্ত প্রান্তর।

এ জীবনে পেনু কিবা, কি সাধিনু কাজ,
কেন এনু কে আমারে বুঝাইবে আজ?

চিত্রে দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট বাঙ্গালা

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু

সম্প্রতি কলিকাতায় বাঙ্গালা দেশের দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট নর-নারীর বিষয়-বস্তুকে কেন্দ্র করিয়া একটী চিত্র প্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে। "কারুকলা সঙ্ঘ" ইহার আয়োজন করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এই সঙ্ঘের সভাপতি। কর্পোরেশনের কমার্শিয়াল মিউজিয়াম হলে অনুষ্ঠিত এই বিশেষ চিত্রপ্রদর্শনীটি দর্শন করিয়া দর্শকেরা একাধারে বেদনা ও আনন্দ উভয়ই অনুভব করিয়াছেন। শিল্পীদের শ্রম ও উদ্যোক্তাদের আয়োজন যে সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

প্রদর্শনীতে খ্যাতনামা চিত্রশিল্পীদের অঙ্কিত দেড় শতাধিক স্কেচ্,



শিশু-ক্রোড়ে মাতা —শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

জল রং ও তৈলচিত্রের সাহায্যে বাঙ্গালার এই ১৩৫০ সালের মন্বন্তরের যে ভয়াবহরূপ অতি সুস্পষ্টভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা সুদূর ভবিষ্যতেও দেশবাসীর চক্ষুর সম্মুখে প্রকট থাকিবে।

প্রদর্শনীর দ্বারোদঘাটনের সময় ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন—"যে বিপদের মধ্য দিয়া আমরা গত কয়েক মাস ধরিয়া চলিয়াছি, সেই বিপদ এখনও শেষ হয় নাই। এই ৫০এর মন্বন্তরের একটা চিরস্থায়ী প্রমাণ আমাদের রাখা দরকার। সংবাদপত্রে এ বিষয়ে অনেক কিছু লেখা হইয়াছে; সাহিত্যিকগণও কিছু কিছু লিখিয়াছেন। যে সমস্ত চিত্রকর চিত্রের সাহায্যে বাঙ্গালার এই দুর্দ্দশার কাহিনী অঙ্কন করিয়াছেন, আমি তাঁহাদের ধন্যবাদ দিতেছি।"

শিল্পীরা কলিকাতার রাজপথে ও অন্যান্য স্থানে দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ রূপ প্রত্যক্ষ করিয়া যে সকল স্কেচ্ করিয়াছিলেন, প্রধানতঃ সেইগুলিই একত্রিত করিয়া এই প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। শিল্পী জয়নাল আবেদিনের স্কেচ্গুলির বিশিষ্টতা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। মাত্র কয়েকটা স্থূল রেখাপাতে তিনি যে অপূর্ব্ব চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহা দর্শক



মৃত্যুর প্রতীক্ষা —শ্রীশৈলা চক্রবর্ত্তী

মাত্রকেই মুগ্ধ করিয়াছে। অধ্যক্ষ রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর অঙ্কিত নাতিবৃহৎ তৈলচিত্রখানি প্রদর্শনীর গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছিল। শ্রীযুক্ত পূর্ণচক্রবর্ত্তীর স্কেচ্ ও জলরংচিত্রগুলি তুলনা বিহীন। শ্রীযুক্ত বিমল মজুমদার, ফণীগুপ্ত, আদিনাথ মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দত্ত, গোবর্দ্ধন আশ, ইন্দুগুপ্ত, ত্রিভঙ্গ রায়, শরদিন্দু ঘোষ, শৈল চক্রবর্ত্তী, বরদা গুহ, অনিল মুখোপাধ্যায়, সিদ্ধেশ্বর মিত্র প্রভৃতি শিল্পীগণের অঙ্কিত চিত্রগুলিও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আমরা কলিকাতা সহরে থাকিয়াই দুর্ভিক্ষের খণ্ডচিত্র রাজপথের বিভিন্ন অংশে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কোথাও এক কণা খাদ্যের জন্য



দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা —জয়নাল আবেদিন

কঙ্কালসার নরনারী আবর্জ্জনাস্তূপ অন্বেষণে রত, কোথাও বা অনাশন মৃত স্বামীর দেহের পার্শ্বে পড়িয়া ক্ষীণদেহা নারী মস্তকে করাঘাত করিতেছে। পথের ধারে মৃত মাতার বক্ষের উপর অবোধ শিশু ক্ষুধার তাড়নায় ক্রন্দন রত। মৃত শিশু কোলে করিয়া মাতা বসিয়া আছে, চোখে জল নাই, মুখে কথা নাই, দৃষ্টি উদাস। মৃত পশু দেহের পার্শ্বেই মৃত মানবের দেহ। রাস্তায় রাস্তায় নরনারী ও শিশুর কঙ্কাল অতিকষ্টে কেবলমাত্র ক্ষুধার তাড়নাতেই কোন রকমে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে, কোন সময়ে যে তাহাদের জীবনপ্রদীপ নিভিবে তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। স্বামীস্ত্রীর, স্ত্রীস্বামীর, মাতাপুত্রের এবং পুত্রমাতার মৃতদেহ পথের ধারে ফেলিয়াই সরিয়া যাইতেছে, নিজের বাঁচিবার আশা তখনও ত্যাগ করিতে পারে নাই। একের সংগৃহীত অন্ন অপরে কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু গ্রহণ বা বাধা দিবার শক্তি উভয়েরই অভাব। এই খণ্ড দৃশ্যগুলির চিত্র সুদক্ষ শিল্পীগণের তুলিকায় যেন মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। প্রদর্শনী কক্ষে এই চিত্রগুলি একসঙ্গে দেখিয়া মনে হইয়াছিল, এ কোথায় আসিলাম, এখানে না আসিলেই ভাল হইত! অন্তরে বেদনা বোধ হইতে লাগিল।

যখন প্রকৃতিস্থ হইলাম, তখন আনন্দ হইল। বুঝিলাম, শিল্পীদের শ্রম সার্থক হইয়াছে, তাঁহাদের অঙ্কিত চিত্র দর্শকের অন্তর স্পর্শ করিয়াছে। দুর্ভিক্ষের ফটোচিত্র সংবাদপত্রাদিতে দিনের পর দিন কত দেখিয়া আসিয়াছি, তাহাতে অন্তরে এমন বেদনার সৃষ্টি করিতে পারে নাই। ফটোচিত্রে বাহিরের রূপকে মাত্র প্রতিফলিত করিতে পারে, কিন্তু সুদক্ষ চিত্রশিল্পীর তুলিকা যে অন্তরের রূপকেও চিত্রে প্রতিফলিত করিতে সক্ষম তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

ক্ষুদ্রপ্রবন্ধে পৃথকভাবে উল্লেখযোগ্য সকল চিত্রের বিবরণ দেওয়া সম্ভবপর নয়। তবে, কয়েকখানি চিত্রের প্রতিলিপি ইহার সঙ্গে মুদ্রিত করা হইল। যে উদ্দেশ্য লইয়া প্রদর্শনীর আয়োজন করা হইয়াছিল, তাহা যে সার্থক হইয়াছে তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।



স্নেহময়ী মাতা —শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত

বাহির বিশ্ব

মিহির

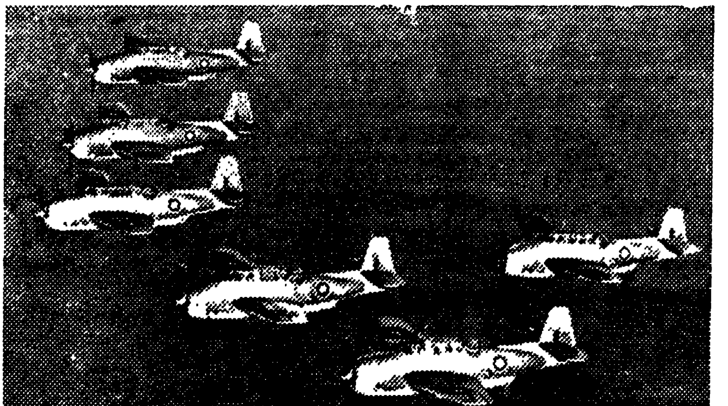
ইউরোপে সম্প্রতি কতকগুলি রাজনৈতিক সমস্যা দেখা দিয়াছে। পোল্যাণ্ডের আয়তন ভবিষ্যতে কিরূপ হইবে, যুগোস্লাভিয়ায় টিটোর প্রাধান্য স্বীকৃত হইবে কি না, ইটালীতে বাদোগ্লিও-ইমানুয়েল্ কত দিন প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন প্রভৃতি প্রশ্ন ইউরোপে গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। এই সকল সমস্যা সম্পর্কে রাশিয়ার সহিত তাহার পাশ্চাত্য মিত্রদের মতবিরোধ ঘটিতে পারে বলিয়া আশঙ্কার সৃষ্টি হইতেছিল। এই জন্য বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিলের বক্তৃতার জন্য আগ্রহের সহিত প্রতীক্ষা করা হইতেছিল। গত ২২শে ফেব্রুয়ারী মিঃ চার্চ্চিল এই প্রত্যাশিত বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

ইউরোপীয় রাজনীতি সম্পর্কে মিঃ চার্চ্চিল

মিঃ চার্চ্চিলের এই বক্তৃতায় সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইয়াছে যে, ইউরোপীয় রাজনীতি সম্পর্কে সম্মিলিত পক্ষে মতদ্বৈধ ঘটে নাই; রাজনীতির সঙ্গত ও স্বাভাবিক পরিণতি সকলেই মানিয়া লইতে বাধ্য হইতেছেন। পোলিস্ সমস্যা সম্পর্কে মিঃ চার্চ্চিল্ সোভিয়েট সরকারকে সর্ব্বতোভাবে সমর্থন করিয়াছেন। তিনি জানাইয়াছেন যে, পোল্যাণ্ডের ভিল্না অধিকার তাঁহারা কখনও সমর্থন করেন নাই; কার্জ্জন লাইনকেই তাঁহারা পোল্যাণ্ড ও রুশিয়ার সঙ্গত সীমান্ত বলিয়া মনে করেন। মার্শাল্ ষ্ট্যালিনের সহিত সুর মিলাইয়া বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী বলিয়াছেন—তাঁহারা পোল্যাণ্ডকে শক্তিশালী দেখিতে চাহেন; উত্তর ও পশ্চিম দিকে জার্ম্মাণ রাজ্য অধিকার করিয়া পোল্যাণ্ড তাহার কলেবর বৃদ্ধি করুক, ইহাই তাঁহাদের ইচ্ছা।

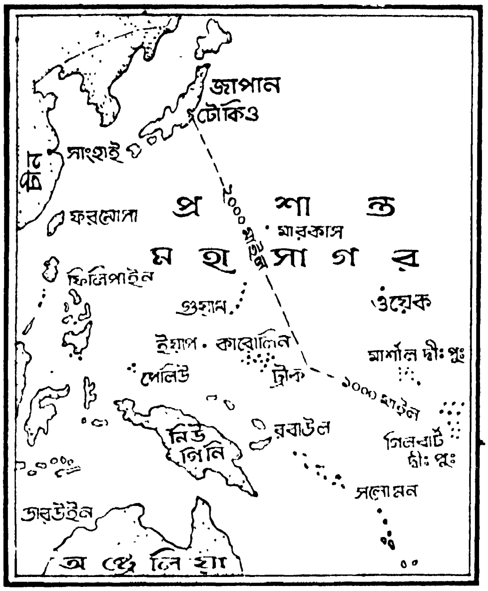
মিঃ চার্চ্চিলের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া লণ্ডনে আশ্রিত পোলিস্ সরকার নিরাশ হইলেও তাঁহারা তাঁহাদের দাবী ত্যাগ করিতে অসম্মত হইয়াছেন। এখনও তাঁহারা তাঁহাদের অন্যায় আব্দারের সমর্থনে জনমত সৃষ্টির জন্য তারস্বরে চীৎকার করিতেছেন।

পোল্ জনসাধারণের সহিত সম্বন্ধশূন্য নির্ব্বাসিত পোলিস্ সরকারের এই চীৎকারে বিশেষ ফল হইবে বলিয়া মনে হয় না। এই সরকারের



উড্ডীয়মান 'টারপুণ্'—ব্রিটেনের অতি দ্রুতগামী টরপেডো বোম্বার

অন্যায় জিদ যদি বৃটিশ অথবা মার্কিনী সরকারের সমর্থন লাভ করিত, তাহা হইলে উহাতে সত্যই জটিল সমস্যার সৃষ্টি হইত। কিন্তু বৃটিশ সরকারের সমর্থন ইঁহারা স্পষ্টতঃই পান নাই; মার্কিনী সরকারও বৃটিশ সরকারকে সমর্থনই করিবেন। কাজেই ঘরে ও বাহিরে সমর্থকহীন এই সরকারের চীৎকারে কি আসিয়া যায়? রুশ সেনা এখন পোলিস্



প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধক্ষেত্র

রাজ্যের অভ্যন্তরে যুদ্ধ করিতেছে; তাহাদের সহিত সহযোগিতা করিয়া যে সকল পোল্ তাহাদের মাতৃভূমির শৃঙ্খল মোচনে সহায়তা করিবে, তাহাদের প্রভাব কেহ রোধ করিতে পারিবে না। বস্তুতঃ স্বাধীনতা-সংগ্রামের মধ্য দিয়াই পোলিস্ গণ-প্রতিনিধিরা শক্তিশালী হইয়া উঠিবেন; তাঁহারাই ভবিষ্যতে পোল্যাণ্ডের ভাগ্য-নিয়ন্তা হইবেন। লণ্ডনস্থিত পোলিস্ সরকার যদি অন্যায় জিদের বশবর্ত্তী হইয়া এই স্বাধীনতা-সংগ্রামে পরিপূর্ণ সহযোগিতা না করেন, তাহা হইলে হয়ত নির্ব্বাসিত অবস্থাতেই তাঁহাদের অস্তিত্বের অবসান ঘটিবে; তাঁহারা আর স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিবেন না।

যুগোস্লাভিয়া সম্পর্কে মিঃ চার্চ্চিল মার্শাল্ টিটোর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন এবং তাঁহার প্রভাবই যে যুগোস্লাভিয়ায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তাহা তিনি স্বীকার করিয়াছেন। কায়রোস্থিত যুগোস্লাভ্ সরকারকে অস্বীকার করিয়া মার্শাল্ টিটোর নেতৃত্বাধীন অস্থায়ী সরকারকে যথারীতি

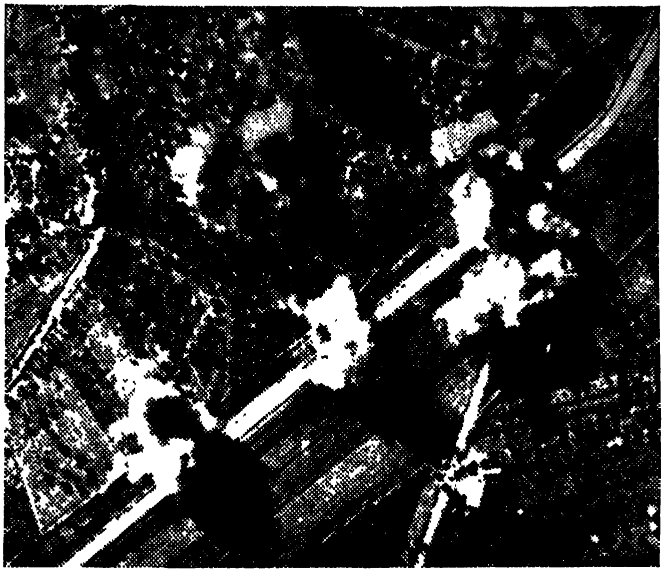
মানিয়া না লইলেও মিঃ চার্চ্চিলের এই উক্তির গুরুত্ব অল্প নহে। যুগোস্লাভিয়ার সামরিক ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে বৃটিশ প্রধান-মন্ত্রীর এই উক্তিতে প্রতিপন্ন হইল যে, জার্ম্মাণ-বিরোধী যুদ্ধের মধ্য দিয়া যাহারা ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিতেছেন, তাহাদের প্রভাব অপ্রতিরোধ্য। যুগোস্লাভিয়ার প্রাগ্-যুদ্ধকালীন সরকার বৃটিশের আশ্রিত। এই সরকারের অন্যতম মন্ত্রী মিহাইনোভিক্ যুগোস্লাভিয়ায় টিটোর প্রতিদ্বন্দ্বী। অথচ বৃটিশ সরকার মিহাইনোভিক্‌কে ত্যাগ করিয়া টিটোকে স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন!

ইটালী সম্পর্কে মিঃ চার্চ্চিল বলিয়াছেন যে, রোম অধিকৃত হইবার পূর্ব্বে বাদোগ্‌লিও-ইমানুয়েল্ সরকারের পরিবর্ত্তন সাধনের কোন প্রয়োজন নাই। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর এই উক্তি ইটালীর ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী দলগুলির দাবীর বিরোধী। সম্প্রতি বারিতে ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী ইটালীয়দিগের এক সম্মিলনী হইয়াছিল। এই সম্মিলনীতে অবিলম্বে বাদোগ্‌লিও-ইমানুয়েল্ সরকারের পরিবর্ত্তন দাবী করা হয়। এত দিন ইটালীর ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী রাজনীতিকরা আপনাদের প্রভাব বিস্তৃতির সুযোগ পান নাই। এই জন্যই তাহাদের দাবী এইভাবে প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব হইতেছে। প্রসঙ্গতঃ বলা যাইতে পারে, মিঃ চার্চ্চিল্ পাকা রক্ষণশীল; তাঁহার নেতৃত্বাধীন সরকারে এখনও রক্ষণশীল মনোভাব প্রবল। নিতান্ত বাধ্য না হইলে তাঁহার সরকারের পক্ষে গণ-প্রতিনিধি-দিগকে স্বীকার করিয়া লওয়া স্বাভাবিক নয়। যুগোস্লাভিয়ায় গণ-প্রতিনিধিরা আপনাদের শক্তির পরিচয় দিয়াছেন; কাজেই বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী তাঁহাদের প্রভাব মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু ইটালীতে এখনও সেরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয় নাই। তবে, সত্বর ইটালীতেও ফ্যাসিষ্টবিরোধীরা তাঁহাদের প্রভাব অপ্রতিরোধ্য করিয়া তুলিতে পারিবে বলিয়া মনে হয়; বেশী দিন তাহাদের দাবী অস্বীকার করিয়া চলা সম্ভব হইবে না।

তুরস্ক ও বৃটেনে মতবিরোধ

বৃটিশ সামরিক ডেলিগেশনের সহিত তুরস্কের সেনাপতিমণ্ডলীর আঙ্কারায় আলোচনা চলিতেছিল। পাঁচ সপ্তাহ আলোচনা করিবার পর গত ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথমে আলোচনা-বৈঠক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; কোনরূপ সিদ্ধান্ত হয় নাই। কোন্ বিষয়ে মতানৈক্যের জন্য আলোচনা বিফল হইল, তাহা প্রকাশ পায় নাই; কারণ সামরিক প্রসঙ্গ অপ্রকাশ্য। অথচ তুরস্কের প্রধান মন্ত্রী মঃ সারাজগ্লু ইতিমধ্যে এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন—তাঁহারা সম্মিলিত পক্ষে যোগ দিয়া জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে প্রস্তুত; এই বিষয়ে তাঁহারা ইঙ্গ-মার্কিণ রাজনীতিকদিগকে আশ্বাসও দিয়াছেন।

এক দিকে আঙ্কারা বৈঠকের বিফলতা এবং অন্য দিকে মঃ সারাজগ্-লুর বিবৃতি পাঠে মনে হয়, যুদ্ধের অবস্থা সম্মিলিত পক্ষের অনুকূল হওয়ায় তুরস্ক এখন তাহাদের সহিত যোগ দিয়া যুদ্ধে লিপ্ত হইতে প্রস্তুত। কিন্তু অবিলম্বে জার্ম্মানীর সহিত শত্রুতা সাধনে সে সাহসী হইতেছে না।



মিত্রপক্ষের বোমা বিদীর্ণ হওয়ার পর ইতালীর রাজপথ

১৯৩৯ সালে তুরস্কের সহিত বৃটেন ও ফ্রান্সের যে যুক্তি হয়, সেই চুক্তি অনুসারে তখন তুরস্কের যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার কথা উঠিয়াছে। ঐ



ইতালীর সহরে মিত্রপক্ষের বোমা বিদীর্ণ হওয়ার পর আমেরিকার নূতন অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনী যাইতেছে

চুক্তিতে তুরস্ক প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল যে, ভূমধ্য সাগরে আক্রমণাত্মক সংগ্রাম আরম্ভ হইলে অথবা রুমানিয়া ও গ্রীসকে রক্ষার প্রয়োজন ঘটিলে

সে যুদ্ধে লিপ্ত হইবে। ১৯৪০ সালে ইটালীর যুদ্ধ ঘোষণায় ভূমধ্য সাগরে আক্রমণাত্মক যুদ্ধ আরম্ভ হয়; কিন্তু তুরস্ক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় না। ঐ বৎসরের শেষভাগে ইটালী কর্ত্তৃক গ্রীস আক্রান্ত হইবার পরও সে তাহার দায়িত্ব এড়াইয়া চলে। ১৯৪১ সালে জুন মাসে তুরস্ক জার্ম্মানীর সহিত আক্রমণাত্মক যুদ্ধ চালাইয়াছিল। এইভাবে তুরস্ক এতদিন দুই দিক বজায় রাখিয়া চলিতেছিল। কিন্তু এখন, যুদ্ধান্তে সন্ধির বৈঠকে আসন পাইবার আশায় তুরস্ক সম্মিলিত পক্ষে যোগ দিয়া তাহাদের বিজয়ের অংশ লইতে আকাঙ্ক্ষী। কিন্তু জার্ম্মানী এখনও ডোডেকেনীজ দ্বীপপুঞ্জে, বুলগেরিয়ায় এবং দক্ষিণ-পশ্চিম রুশিয়ায় প্রতিষ্ঠিত আছে। বর্ত্তমান অবস্থায় যুদ্ধ ঘোষণা করিলে জার্ম্মানীর প্রথম আঘাতে তুরস্ককে বিশেষ বিপন্ন হইতে হইবে। বিশেষতঃ, রুশ রণাঙ্গনে জার্ম্মানীর বিফলতায় এবং পশ্চিম ইউরোপে ইঙ্গ-মার্কিণ বিমানবাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণেও নাৎসী সমরযন্ত্র দুর্ব্বল হইবার লক্ষণ এখনও স্পষ্ট নয়। এতদ্ব্যতীত, সম্মিলিত পক্ষ এখনও দক্ষিণ ইউরোপে জার্ম্মানীকে প্রবল আঘাত হানিতে পারেন নাই; ইটালীতে যুদ্ধের অবস্থা উৎসাহজনক নয়, বল্কানে গরিলা



ব্রিটাশের মজুরগণ রোমের রাস্তা মেরামত করিতেছে

প্রতিরোধ বর্দ্ধিত করিয়া তথায় বড় রণক্ষেত্র গড়িয়া তুলিবার জন্য সম্মিলিত পক্ষের চেষ্টাও দেখা যায় নাই। এইরূপ অবস্থায় যুদ্ধ ঘোষণায় তুরস্ক অনিচ্ছুক না হইলেও তাহার পক্ষে অবিলম্বে অস্ত্র ধারণে ইতস্ততঃ করা অস্বাভাবিক নহে।

ফিন্ল্যাণ্ডের সন্ধির আগ্রহ

সম্প্রতি ফিন্ল্যাণ্ডের পক্ষ হইতে ডাঃ প্যাসিভিকি সুইডেনের রুশ প্রতিনিধি ম্যাডাম্মোজেল্ কলোণ্টের নিকট সন্ধির সর্ত্ত জানিতে গিয়াছিলেন। ম্যাডাম্মোজেল্ কলোণ্টে জানাইয়াছেন—ফিন্ল্যাণ্ড যদি জার্ম্মানীর সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া সমস্ত জার্ম্মান সৈন্য আটক করে, ১৯৪০ সালের সন্ধির সর্ত্ত মানিয়া লয় এবং সম্মিলিত পক্ষের ও রুশিয়ার সমস্ত বন্দী প্রত্যর্পণ করে, তাহা হইলে রুশিয়া ফিন্ল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে অস্ত্রত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছে।

১৯৪০ সালের মার্চ্চ মাসে রুশিয়ার সহিত ফিন্ল্যাণ্ডের যে সন্ধি হয়, তাহাতে (১) রুশিয়া সমগ্র ক্যারেলিয়ান্ যোজক, ল্যাডোগা হ্রদের সমস্ত উপকূল, উত্তরে ফিসারমেন্স্ উপদ্বীপ এবং পূর্ব্ব ফিন্ল্যাণ্ডের কতকাংশ রুশিয়া লাভ করে; (২) উত্তরাঞ্চলে প্রহরীর কার্য্য করিবার জন্য যে সকল ছোট ছোট জাহাজ প্রয়োজন, তাহা ব্যতীত ঐ অঞ্চলে ফিন্ল্যাণ্ড কোন রণপোত অথবা সাবমেরিণ রাখিতে পারিবে না বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়; (৩) পেট্সামের পথে রুশিয়ার পণ্য চলাচলে শুল্ক সংক্রান্ত বিঘ্ন উপস্থিত করা হইবে না; (৪) নৌঘাঁটী স্থাপনের জন্য বার্ষিক ৫০ লক্ষ মার্ক খাজনায় হাঙ্গেরী রুশিয়াকে ৩০ বৎসরের ইজারা দেওয়া হইবে।

রুশিয়ার প্রদত্ত সর্ত্তে দেখা যায়, ফিন্ল্যাণ্ডকে জার্ম্মানীর প্রভাব হইতে মুক্ত করিয়া সে তাহাকে ১৯৪০ সালের এই ব্যবস্থায় ফিরাইয়া লইতে চাহিতেছে। ফিন্ল্যাণ্ডের পক্ষ হইতে এই প্রস্তাব সম্পর্কে এখনও কোন কথা স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই। তবে, সে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিবে বলিয়া মনে হয় না; কারণ ইহা অপেক্ষা উদার প্রস্তাব সে আশা করিতে পারে না। ১৯৩৯ সালে রুশিয়া লেনিনগ্রাড্ রক্ষার জন্য ফিন্ল্যাণ্ডের নিকট ক্যারেলিয়ান্ যোজকের পার্শ্বে সামান্য স্থান চাহিয়াছিল এবং তাহার পরিবর্ত্তে অন্যত্র দ্বিগুণ স্থান এবং আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে সম্মত হইয়াছিল। কিন্তু রুশ-বিরোধী মিত্রদের প্ররোচনায় ফিন্ল্যাণ্ড তখন এই প্রস্তাবে সম্মত হয় নাই। অতঃপর রুশিয়া বাধ্য হইয়া ফিন্ল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে। এই যুদ্ধে ফিন্ল্যাণ্ড যখন পরাজিত হয়, তখন রুশিয়া ইচ্ছা করিলে তাহাকে নিষ্পিষ্ট করিতে পারিত কিন্তু তাহা না করিয়া পূর্ব্বোক্ত সঙ্গত সর্ত্তে সে সন্ধি করে। এই মহানুভবতার পরিবর্ত্তে ফিনিস্ রাষ্ট্রনায়করা অত্যন্ত হীনতার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহারা গোপনে জার্ম্মানীর সহিত রুশবিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন এবং ১৯৪১ সালে রুশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। তখন ফিন্ল্যাণ্ড প্রায় জার্ম্মানীর সহিত সংযোগ শূন্য হইয়া পড়িয়াছে; অতি সত্বর এই সংযোগ সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া তাহার বিশেষ বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা। এই কৃতঘ্ন ফিন্ল্যাণ্ডকে অসহায় অবস্থায় হাতে পাইয়া রুশিয়া তাহাকে সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ করিতে পারিত। কিন্তু তাহা না করিয়া সে অত্যন্ত উদার প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়াছে। ম্যাডাম্মোজেল্ কলোণ্টে কেবল বলিয়াছেন—সোভিয়েট সরকার বর্ত্তমান ফিনিস্ সরকারকে বিশ্বাস করিবার কোন কারণ দেখিতে পান না; তবে, অন্য কোন উপায় না থাকায় তাঁহারা আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে প্রস্তুত আছেন।

রুশ শাসনতন্ত্রে পরিবর্ত্তন

গত ২রা ফেব্রুয়ারী রুশিয়ার সুপ্রীম সোভিয়েটের অধিবেশনে স্থির হইয়াছে যে, সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন রিপাবলিক স্বাধীনভাবে পররাষ্ট্রীয় সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিবে এবং স্বতন্ত্র সেনাবাহিনী রাখিতে পারিবে।

এই ব্যবস্থার কথা শ্রবণ করিয়া প্রথমেই মনে হইবে—সোভিয়েট ইউনিয়নের সংহতি নষ্ট হইল। বিশেষতঃ বৃটীশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ডোমিনিয়নের বিচ্ছিন্ন হইবার লক্ষণ ইতিমধ্যে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বৃটিশ কমনওয়েলথ, ও সোভিয়েট ইউনিয়নে পার্থক্য এই যে, একটি ব্যবস্থা সাম্রাজ্যবাদী, অন্যটি সমাজতান্ত্রিক। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানুষের দ্বারা মানুষের ও জাতির দ্বারা জাতির শোষণের অবসান ঘটিয়াছে। তাই সেখানে অর্থ-নৈতিক স্বার্থের সজ্ঘাতে মানুষে মানুষে এবং জাতিতে জাতিতে আর বিরোধ নাই। স্বার্থের সজ্ঘাতে মানুষের সহিত মানুষের বিরোধ ঘটে। আর এই সজ্ঘাতের অবসানে মানুষ মানুষকে ভালবাসে, পরস্পরের সহিত ঐক্যবদ্ধ হয়। এই জন্য ধনতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী ভিত্তিতে গঠিত বৃটিশ কমনওয়েলথে বিচ্ছিন্নকারী শক্তির ক্রিয়া প্রবল; আর সমাজতান্ত্রিক রুশিয়ায় স্বাভাবিক প্রবণতা ঐক্যের দিকে। এই কারণেই রুশ পররাষ্ট্র-সচিব মঃ মলোটভ, বলিয়াছেন—শাসনতান্ত্রিক নব-ব্যবস্থায় রুশ রিপাবলিকগুলির ঐক্য বর্দ্ধিতই হইবে।

রুশিয়ার এই শাসনতান্ত্রিক নব-ব্যবস্থাকে সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব-রাষ্ট্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা বলা যাইতে পারে। যুদ্ধের পর ইউরোপে একাধিক রাষ্ট্রে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। এই সকল রাষ্ট্র যদি সোভিয়েট ইউনিয়নের সহিত সংযুক্ত হইতে চায়, তাহা হইলে তাহাদের অধিকতর স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন। নব-ব্যবস্থায় সেই স্বাধীনতা প্রদানের ব্যবস্থা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত দূরবর্ত্তী রিপাবলিকগুলি এখন স্বতন্ত্রভাবে তাহাদের সন্নিহিত বিভিন্ন রাষ্ট্রের সহিত কূটনীতিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া তাহাদের প্রতি প্রভাব বিস্তারের সুবিধাও লাভ করিবে। এই নব-ব্যবস্থার দ্বারা সোভিয়েট রুশিয়া তাহার শত্রুদিগের কুৎসাপ্রচারের অস্ত্র চূর্ণ করিয়া দিয়াছে। সোভিয়েট ইউনিয়নে এই বিধান প্রবর্ত্তিত হইবার পর কোন রাষ্ট্র স্বেচ্ছায় ঐ ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হইলে সেই ব্যবস্থাকে যদি রুশিয়ার সাম্রাজ্যবাদী প্রচেষ্টা বলিয়া অভিহিত করিবার প্রয়াস হয়, তাহা হইলে সে অপ-প্রচারের অন্তসারশূন্যতা আপনা হইতে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

রুশ-রণাঙ্গন

উত্তরাঞ্চলে লেনিনগ্রাডের দক্ষিণাংশ সম্পূর্ণরূপে শত্রু-মুক্ত হইয়াছে। সোভিয়েট বাহিনী এখন এস্থোনিয়ার উত্তর-পূর্ব্ব কোণে নার্ভায় এবং দক্ষিণ দিকে ল্যাট্‌ভিয়া ও এস্থোনিয়ার প্রবেশদ্বার স্কভে প্রবল আঘাত করিতেছে। আরও দক্ষিণে হোয়াইট্ রুশিয়ায় রুশ সেনার আক্রমণ প্রবলতর হইয়া উঠিয়াছে; জার্ম্মানদিগের শক্তিশালী ঘাঁটী ভাইটেব্স এখন বিপন্ন। পোল্যাণ্ডের অভ্যন্তরে যে রুশ বাহিনী প্রবেশ করিয়াছিল, তাহারা রভ্‌নো ও লাক্ অধিকারের পর আরও পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইয়াছে।

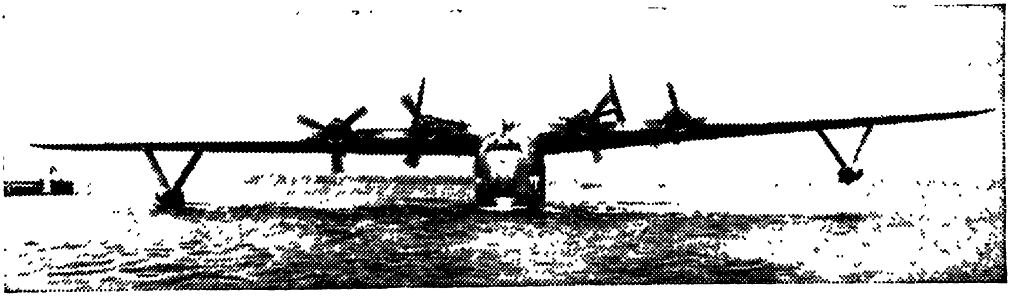
দক্ষিণ অঞ্চলে জার্ম্মাণ সেনা রুশদিগকে প্রবলভাবে প্রতিরোধ করিয়াছে; কারণ এই অঞ্চলে প্রতিরোধ ব্যর্থ হইলে রুমানিয়ার প্লোয়েস্তি তৈলখনি বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা। দৃঢ় প্রতিরোধে প্রবৃত্ত হইবার ফলে জার্ম্মানীকে নীপার বাঁকের অভ্যন্তরে একটি ক্ষেত্রে প্রায় ২ লক্ষ সৈন্য হারাইতে হইয়াছে। ইতিমধ্যে রুশ সেনা ক্রিভয়-রগ অধিকার করিয়াছে। তবুও একমাত্র এই অঞ্চলেই রুশ সেনার সাফল্যের গতি মন্দীভূত। অন্য সর্ব্বত্র তাহারা প্রচণ্ড বেগে অগ্রসর হইতেছে।

ইটালীয় রণাঙ্গন

গত জানুয়ারী মাসে রোমের দক্ষিণে আন্‌জিও অঞ্চলে ইঙ্গ-মার্কিন সেনাবাহিনী অবতরণ করে। বর্ত্তমানে ইটালীতে এই নূতন রণক্ষেত্রের গুরুত্বই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সর্ব্বতোভাবে রোমকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে জার্ম্মানী এই অঞ্চলে প্রবল প্রতি-আক্রমণ চালাইতেছে। ইঙ্গ-মার্কিন সেনাবাহিনীকে বিতাড়িত করিবার উদ্দেশ্যে জার্ম্মান সেনাপতি কেসারলিংএর দুইটি বড় আক্রমণ ইতিমধ্যে হইয়া গিয়াছে; এখন তৃতীয় আক্রমণ চলিতেছে। ক্যাসিনোর নিকট যুদ্ধরত পঞ্চম-বাহিনী অগ্রসর হইয়া আন্‌জিও অঞ্চলের সহযোদ্ধৃগণের সহিত মিলিত হইতে প্রয়াস করিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের সে প্রয়াস সফল হয় নাই।

এই যুদ্ধের ফলাফল কি হইবে, তাহা বলা যায় না। মিঃ চার্চ্চিল্ বলিয়াছেন—জার্ম্মানী যে এইরূপ প্রবলভাবে প্রতিরোধ করিবে, তাহা অনুমান করা যায় নাই; এই জন্যই এই অঞ্চলে যুদ্ধের অবস্থা আশানুরূপ নহে। তবে জার্ম্মানীর অপ্রত্যাশিত প্রবল প্রতি-আক্রমণ রোধ করিবার শক্তি মধ্য প্রাচীতে তাঁহাদের আছে; আবহাওয়ার অবস্থা উন্নত হইলে তাঁহারা উত্তমরূপে যুদ্ধ করিতে পারিবেন।

যে কারণেই ইটালীতে যুদ্ধের অবস্থা আশানুরূপ না হউক, ইহার ফলে এবং তুরস্কের সহিত বৃটিশ সামরিক ডেলিগেশনের মতদ্বৈধে দক্ষিণ ইউরোপে সম্মিলিত পক্ষের প্রতিশ্রুত অভিযানের পরিকল্পনা বাধা পাইল বলিয়া মনে হয়।



আমেরিকার অতিকায় ফ্লাইং বোট

সুদূর প্রাচী

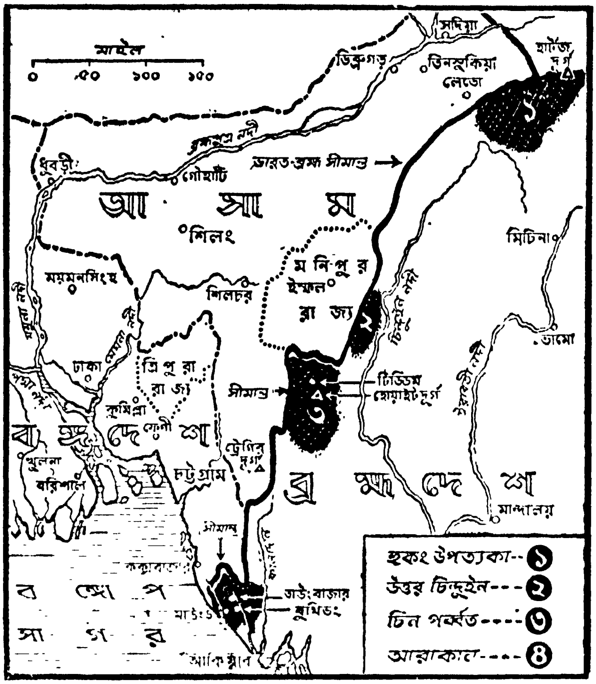
ব্রহ্মদেশের পশ্চিম সীমান্তে সম্মিলিত পক্ষের তৎপরতা চলিতেছে। সম্প্রতি আরাকান্ অঞ্চলে বৃটিশ সেনা উল্লেখযোগ্য বিজয় লাভ

করিয়াছে। জাপানীদিগের প্রতি-আক্রমণে চতুর্দ্দশ বৃটিশ বাহিনী পরিবেষ্টিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল; সাম্প্রতিক বিজয়ে বৃটিশ বাহিনীর এই বিপদ দূরীভূত হইল। শীত শেষ হইয়া আসিতেছে; ব্রহ্মদেশের পশ্চিম সীমান্তে বর্ষা আরম্ভ হইতে আর বিলম্ব নাই। অতি সত্বর সম্মিলিত পক্ষের শীতকালীন তৎপরতার লাভালাভ হিসাব করিবার সময় আসিবে। এই হিসাব গত বৎসরের হিসাব অপেক্ষা উৎসাহজনক হয় কিনা, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

ইতিমধ্যে প্রশান্ত মহাসাগরে মার্কিনী সমর-নায়কের এক নূতন রণকৌশল সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। এই কৌশল যদি সাফল্যমণ্ডিত হয়, তাহা হইলে জাপানের প্রত্যক্ষ বিপদ বৃদ্ধি পাইবে। গত নভেম্বর মাসে মার্কিনী সেনা মধ্য প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানের ম্যাণ্ডেটেড্ দ্বীপপুঞ্জের নিকটবর্ত্তী গিলবার্ট দ্বীপপুঞ্জও অধিকার করিয়াছিল। তাহার পর ম্যাণ্ডেটেড্ দ্বীপমালার অন্তর্গত মার্শালসে তাহারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই মার্শালসের বিমানঘাঁটী হইতে সম্প্রতি জাপানের বিশালতম নৌঘাঁটী ট্রুকে প্রবল আক্রমণ চালান হইয়াছে। মার্কিনী সেনার এই তৎপরতা লক্ষ্য করিয়া মনে হয়—গিল্‌বার্টস্ হইতে মার্শাল্‌স্ এবং মার্শাল্‌স্ হইতে ক্যারোলিন্‌স্ এবং ক্যারোলিন্‌স্ হইতে ল্যাড্রোন্‌সে পৌঁছানই মার্কিনী সেনাপতিদিগের উদ্দেশ্য। এইভাবে অগ্রসর হইয়া তাঁহারা হয়ত ফিলিপাইন্‌সে আঘাত করিতে চান। জাপানী দ্বীপপুঞ্জের সহিত জাপানী সাম্রাজ্যের সংযোগ বিপন্ন করাও হয়ত তাঁহাদের উদ্দেশ্য।

ঠিক এই সময় উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরের আলিউসিয়ান দ্বীপপুঞ্জ হইতে মার্কিনী বিমান কিউরাইল্ দ্বীপমালার প্যারামুসির দ্বীপে একাধিকবার আক্রমণ চালাইয়াছে। সম্প্রতি মার্কিনী নৌবহরও প্যারামুসিরে আঘাত করিয়াছিল।

উত্তর দিকে মার্কিনী সেনাপতিদিগের এই তৎপরতা লক্ষ্য করিয়া মনে হয়—দক্ষিণ ও পূর্ব্ব দিক হইতে জাপানের উদ্দেশ্যে সাঁড়াশী আক্রমণ প্রসারিত করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। তবে এই রণকৌশলের সাফল্য নৌযুদ্ধের ফলাফলের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করিবে। জাপানী নৌবাহিনী কিছুতেই মার্কিনী নৌবাহিনীর প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বানে এখন সাড়া দিতেছে না। সম্প্রতি মার্কিনী নৌসচিব কর্ণেল নক্স বলিয়াছেন—



পূর্ব্ব ভারতীয় রণক্ষেত্র

জাপান হয়ত আমেরিকান্ সৈন্য ও নৌবাহিনী আরও বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত হইবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে। জাপানের প্রতীক্ষার কারণ যাহাই হউক না কেন, যতদিন এই অঞ্চলের সমুদ্রবক্ষে উভয় পক্ষের শক্তি-পরীক্ষা না হইতেছে, ততদিন মার্কিনী রণকৌশলের সাফল্য সম্পর্কে নিশ্চিত আশা পোষণ করা যায় না। ৩।৩।৪৪

এক আর দুই

"ভাস্কর"

(জার্মান হইতে)

কান তোমার দুটি, একটি মোটে মুখ—
বিধাতার অবিচার?
তোমায় শুনতে হয় যে অনেক,
কিন্তু কম কথাতেই সুখ।

চোখ তোমার দুটি, একটি মোটে মুখ—
কিন্তু রেখো মনে,
দেখ্‌তে তোমায় হ'লেও অনেক
নীরব থেকেই সুখ।

হাত তোমার দুটি, একটি মোটে মুখ—
একটু বুঝে দেখো,
করতে হয় যে কাজ অনেক·
কিন্তু কম খেয়েই সুখ।

বৎসরান্তে

শ্রীমমতা ঘোষ

বৎসরান্তে দেখিলাম পুত্রকন্যাসহ
এসেছে জননী তোর। দারুণ বেদনা
লভেছে করুণ কান্তি। আজি যা দুর্ব্বহ
কাল সে আপন মাঝে লভিছে সান্ত্বনা।
বিশ্ব-বিধাতার কী এ আশ্চর্য্য বিধান!
শুকায়ে গিয়াছে ক্ষত, দাগটুকু তার
দেয় যেন শুধু নিজ অস্তিত্ব সন্ধান।
যেমনি চলিত আজো তেমনি সংসার
চলিছে বিরতি নাহি। করে কলরব
শিশুগণ উচ্চকণ্ঠে পূর্ণ প্রাণরসে।
জীবনের সমারোহ আনন্দ উৎসব
দেখি জননীর আঁখি অমৃত বরষে।
বুঁজিয়া গিয়াছে ফাঁক। হায় বৎস হায়,
সকলেই আছে তুমি রয়েছ কোথায়।

আগামী কাল

[একাঙ্ক নাটিকা]

শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার আই-সি-এস

বাংলাদেশের কোনো এক সহরে ডিষ্ট্রিক ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এম সিন্‌হা আই-সি-এস সাহেবের বাংলো-মধ্যস্থ অফিসঘর। ঘরটিতে কয়েকখানি চেয়ার, একটি টেব্‌ল, বুককেসে নানাবিধ আইনের বই, সিভিললিষ্ট, গেজেটিয়ার ও নানাপ্রকার সরকারি রিপোর্ট, বুকর‍্যাক্‌, অফিসের ঝুড়ি, কলিং বেল প্রভৃতি নানাবিধ সরঞ্জাম। দেওয়ালে জেলার ম্যাপ টাঙানো। একপাশে ছোট একটি টেব্‌লে একটি টাইপ-রাইটারের সামনে বসিয়া কন্‌ফিডেন্‌স্যাল অ্যাসিষ্টান্ট, আধাবয়েসী রজনীবাবু খুট্‌ খুট্‌ করিতেছেন। এই ঘরের দক্ষিণদিকে ড্রয়িংরুম (দেখা যাইবে না)। সেখানে রেডিও যন্ত্রে মৃদু সঙ্গীত বাজিতেছে। ড্রয়িংরুম ও অফিস ঘরের মাঝখানে সুদৃশ্য সিল্কের পরদা ঝুলিতেছে, কিন্তু অফিস ঘরের সামনে অর্থাৎ বারান্দার দিকে ঝুলিতেছে ধূলায় ধূসর নীলবর্ণের পরদা। উহাতে চাপরাশিরা কখনো কখনো ময়লা নিব্‌ মুছিয়া থাকে এবং কন্‌ফিডেন্‌স্যাল্‌ বাবু রুমালের অভাবে কখনো ঘরে ঢুকিবার আগে নিজের মুখ ও মুছিয়া থাকেন। তাছাড়া সম্ভ্রান্ত অতিথি অভ্যাগতের জন্ম ড্রয়িংরুম নির্দিষ্ট হইলেও ননডেস্‌ক্রিপ্ট্‌ দর্শনপ্রার্থীরা এই অফিস কামরাতেই বসেন। তাঁহাদের জন্ম ধূসর পরদাই যথেষ্ট। অফিস ঘরের সামনে (অর্থাৎ ষ্টেজের পিছন দিকে) টানা বারান্দা, তারপর রাস্তা ও বাগান। ঘরের পরদা ও জানালার ফাঁক দিয়া বারান্দা ও বাগানের কিয়দংশ দেখা যাইতেছে। বারান্দায় চাপরাশি ও বডিগার্ড বসিয়া বিড়ি ফুঁকিতেছে। চাপরাশির বসিবার জন্ম মাদুর এবং বডিগার্ডের বসিবার জন্ম একটি পিঠভাঙা পালিশবিহীন কাঠের চেয়ার (এসব বারান্দায় আছে বলিয়া অফিসঘর হইতে দেখা যাইবে না।

উর্দ্দী-পরা চাপরাশি একগাদা ফাইল আনিয়া রজনীবাবুকে দিল

চাপরাশি। সেলাম বাবু। ছিনিয়র ডিপুটি পাঠিয়েছেন। বহুৎ জরুরি।

রজনীবাবু। আচ্ছা দেখছি। তুমি যাও। (ফাইলে মনোযোগ দিলেন, চাপরাশি তখনো যায় না দেখিয়া বলিলেন) কি রুস্তম, দাঁড়িয়ে রইলে যে।

চাপরাশি। সাহেব বাহাদুর মোর একটাকা জরিমানা করেছেন বাবু। মুই গরীব মানুষ, বালবাচ্চা অনেক, রেশনে যে চাল পাই—

রজনীবাবু। জরিমানা হ'ল কেন? কি কসুর করেছিলে?

চাপরাশি। কসুর কিছুই না বাবু। সায়েব বাহাদুর গোস্‌সা ছিলেন, আর গোস্‌সা ছিল মোর নসীব।

রজনীবাবু। তবু ব্যাপারটা কি শুনি।

চাপরাশি। মুই মোর উর্দ্দীর পকেট থেনে সাহেব বাহাদুরের নামের ডাক যখন বার করতে ছিলাম তখন—হায় রে মোর কড়া নসীব—

রজনীবাবু। তখন হল কি?

চাপরাশি। তখন সাহেব বাহাদুরের লেখা মেমসায়েব বাহাদুরের নামের একখানা চিঠি আমার পকেট থেনে বেরিয়ে এল অন্য সব চিঠির সঙ্গে! হা রে পোড়া নসীব!

রজনীবাবু। সে চিঠি তোমার পকেটে আসে কেমন ক'রে?

চাপরাশি। সায়েব বাহাদুর যখন মাসখানেক আগে ডালিমহাটের ডাকবাংলায় সফর করছিলেন তখন চিঠিখানা লিখে আমায় ডাকে দিতে দিয়েছিলেন।

রজনীবাবু। আর তুমি ডাকে না দিয়ে পকেটেই ফেলে রেখেছিলে, শেষে এম্‌নি ক'রে ধরা পড়ে গেছ।

চাপরাশি। ঠিক বলেছেন বাবু।

রজনীবাবু। (সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চাপরাশির দিকে চাহিয়া) না, আর কোন মৎলব ছিল তোমার? যেমন টিকিটখানা চুরি করা, কিম্বা মেমসাহেবকে সাহেব কি লিখলেন সেটা পড়ে দেখার কৌতূহল—

চাপরাশি। আল্লার কিরা বাবু, তেমন মতলব আমার কখনো ছিল না। মুই গরীব মানুষ, বালবাচ্চা অনেকগুলি—রেশনে যা চাল পাই—

রজনীবাবু। হুঁ, তাতো আগেই বলেছ। আচ্ছা এখন যাও, যদি সাহেবের মেজাজ ভাল থাকে, তাহলে কথাটা একবার ব'লে দেখব'খন।

চাপরাশির প্রস্থান

রজনীবাবু ফাইলে মন দিলেন। এমন সময় হিড়হিড় করিয়া গার্ডকে হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে মিঃ সিন্‌হার দশমবর্ষীয় জ্যেষ্ঠপুত্র অজিত অফিস ঘরে ঢুকিল।

অজিত। এক দফে দেখলাও না গার্ড তুমারা রিভল্‌ভার।

গার্ড। আরে বাপ, হামারা নোক্‌রি টুটে যাবে। ই সব খেলনে কো চীজ্‌ না আসে বাবা।

অজিত। আচ্ছা তব তুমারা গুলি দেখলাও।

গার্ড। গোলি ওলি হামারা পাশ কিস্সু নেই আসে বাবা।

অজিত শুনিল না, বডিগার্ডের খাকি হাফ্‌প্যাণ্ট, সার্ট ও কোমরে গুলির অনুসন্ধান শুরু করিল

গার্ড। (ব্যতিব্যস্তভাবে) নেহি বাবা নেহি। হামারা নোক্‌রি টুটে যাবে যে!

অজিত। আচ্ছা, তব গুলিকা খালি খাপ দেও। তুম্‌ বোলাথা দেগা, ইয়াদ্‌ নেই?

গার্ড। জরুর, জরুর। টার্কিট পিরাক্‌টিস্‌ হো যানে সে আপ্‌কো খালি খাপ জরুর দেঙ্গে।

অজিত। রোজ তুম্‌ ঐ বাত্‌ বোলকে হাম্‌কো ফাঁকি দেতা। এত্তা রোজ গো গিয়া, তোমরা টার্গেট্‌ প্র্যাক্‌টিস্‌ নেহি হুয়া! আজ তোমকো দেনেই পড়েগা—

এমন সময় অজিতের মাষ্টার মশায় আসিলেন

মাষ্টার। অজিত, পড়ার ঘরে পড়তে না গিয়ে এখানে গার্ডকে জ্বালাতন করছ কেন? চল, পড়বে চল।

গার্ড। (কৃতজ্ঞভাবে) রাম রাম মাষ্টার জী। সাহেব

বাহাদুর, বাবা লোগকা সাথ শিলং সে লউটকর আউর আপকো সাথ মুলাকাত নেহী হুয়া। সব খবর আচ্ছা তো?

মাষ্টার। হ্যাঁ হ্যাঁ, সব খবর ভাল। শিলং তোমার কেমন লাগল বাহাদুর সিং?

গার্ড। হাঁ, জাগা তো আচ্ছাই আসে, লেকিন হুঁয়া গাঙা নেহি। হামারা মুলুক ছাপরে মে গাঙাজী আসেন। কাল্‌কাত্তে মে য্যায়সা গাঙা, শিলং মে ঐ সা গাঙা নেহি।

মাষ্টার। সব জায়গায় কি আর গঙ্গা থাকে? চল অজিত, পড়বে চল।

মাষ্টার ও ছাত্রের প্রস্থান

ড্রয়িংরুমের পরদা ঠেলিয়া জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ সিন্‌হা অফিস ঘরে ঢুকিলেন। গোঁফ দাড়ি কামানো, বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, মোটা-সোটা চেহারা, মধ্যদেশ ঈষৎ স্ফীত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, মাথার চুলে পাক ধরিতেছে, মাথার পিছনে টাকের আভাস দেখা দিতেছে। মিঃ সিন্‌হা ঘরে ঢুকিতেই রজনীবাবু উঠিয়া দাঁড়াইয়া অভিবাদন করিলেন, গুডমর্ণিং সার। চাপরাশি আসিয়া মাথা নীচু করিয়া সেলাম করিল। গার্ড আসিয়া মিলিটারি কায়দায় খট্‌ খট্‌ করিয়া পা ঠুকিয়া হাত তুলিয়া স্যালিউট্‌ করিল।

মিঃ সিন্‌হা। গুড্‌মর্ণিং রজনীবাবু। সেলাম। সেলাম।

গার্ড ও চাপরাশি বাহিরে চলিয়া গেল

রজনীবাবু। সিনিয়র ডেপুটি সাহেব একটা ফাইল পাঠিয়েছেন সার।

মিঃ সিন্‌হা। কিসের ফাইল?

রজনীবাবু। প্রফিটিয়ারিং কেস্‌।

মিঃ সিন্‌হা। ওঃ, সেই আড়াই ছটাক কেরোসিন এক টাকায় বেচেছে। রাস্কেল! দাও, প্রসিকিউট্‌ ক'রে।

রজনীবাবু। যে আজ্ঞে। কিন্তু সার সাক্ষী সেই—যাকে বেচেছে সে আর তার এক চাচাতো কাজিন্‌।

মিঃ সিন্‌হা। তাই নাকি! কন্‌ভিক্‌সান্‌ টেঁকলে হয়। জজ যে রকম! Hopeless judicial! আরে বাপু, এসব কাজ কি কেউ একপাল ডিস্‌ইন্‌টারেস্‌টেড্‌ উইট্‌নেস্‌ এর সামনে কোটো তুলতে তুলতে করে! Hopeless judicial তা বুঝবে না!

রজনীবাবু। জজ সায়েব বড্ড acquitting সার।

মিঃ সিন্‌হা। দাও তবু প্রসিকিউট্‌ ক'রে। না হয় বেটা আপীলে খালাস পাবে। কিছু টাকা তো খসবে।

রজনীবাবু। যে আজ্ঞে।

বেয়ারার প্রবেশ

বেয়ারা। রেডিয়াম্‌ ঠো বন্‌ কর দেঙ্গে হুজুর?

মিঃ সিন্‌হা। আচ্ছা দেও। দেখো বেয়ারা, তুমকো কেৎনা দফা বোলা হায়, রেডিয়াম্‌ নেহি—রেডিও, রেডিও।

বেয়ারা। বহুৎ আচ্ছা হুজুর।

প্রস্থান

অত্যন্ত ব্যস্তভাবে মিসেস্‌ সিন্‌হার প্রবেশ। তাঁহার বয়স এখনো ত্রিশ পার হয় নাই। গৌরবর্ণ মোটাসোটা চেহারা, মুখশ্রীতে মাতৃত্বের কমনীয় আভা আসিয়া লাগিলেও এখনো যৌবনের লীলাচাঞ্চল্য যায় নাই।

মিসেস্‌ সিন্‌হা। আচ্ছা তুমি এক পেয়ালা চা খেয়েই চলে এলে যে! সকাল বেলাতেই এত রাগ কেন!

মিঃ সিন্‌হা। রজনীবাবু, আপনি বাইরে যান। (রজনীবাবু উঠিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। এখন এই দাম্পত্য কলহের সূত্রপাতেই বাহিরে চলিয়া গেলেন)। না, রাগ করবে না! ডিম নেই, টোষ্ট্‌ নেই, কিস্যু নেই, খালি কতকগুলা লুচি আর আলু ভাজা! নিউসেন্স্‌!

মিসেস্‌ সিন্‌হা। তা আমি কি করব বল! যাকে সংসার চালাতে হয় সেই বোঝে! কাল বাজারে দশপয়সা দিয়েও ডিম পায় নি।

মিঃ সিন্‌হা। কী! একটা ডিমের দাম দশ পয়সারও বেশী চায়! মাই গড্‌!

মিসেস্‌ সিন্‌হা। হ্যাঁ গো হ্যাঁ। তোমার কোন্‌ দিকে খেয়াল আছে শুনি! ছ আনাতে যে রুটি দেয় তাতে দুখানি কি তিনখানি মাত্র টোষ্ট্‌ হয়। সে আমি কার মুখে দেব? তাই তো আমি সকালে আলুভাজা আর লুচির ব্যবস্থা করেছি।

মিঃ সিন্‌হা। তা বেশ করেছ। তবে রোজ ঐ একঘেয়ে লুচি তো আর খাওয়া যায় না—খেলে অম্বল হয়। ভ্যারাইটি করো।

মিসেস্‌ সিন্‌হা। ভ্যারাইটি করব আমার মাথাটি কেটে! আছে আর কি, যা দিয়ে ভ্যারাইটি করব।

মিঃ সিন্‌হা। রজনীবাবু! (রজনীবাবু ভিতরে ঢুকিয়া বলিলেন—'সার') ডিমওলাদের প্রসিকিউট্‌ করা যায় না! বেটারা দশ পয়সাতেও একটা ডিম দিচ্ছে না।

রজনীবাবু। (মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে) না সার, ওটা তো কন্‌ট্রোল্ড কমোডিটি নয়। এখনো তো ডিমের রেশন হয় নি।

মিঃ সিন্‌হা। না তা হয় নি বটে। আচ্ছা বাড়ীতে মুর্গী পাললে তো হয়। আগে তো পালতে।

মিসেস সিন্‌হা। সব খবরই তো রাখো। মুর্গী রাখবার আর জো আছে। কুকুরটা মরার পর থেকে যে শেয়ালের উপদ্রব বেড়েছে!

মিঃ সিন্‌হা। শেয়াল!

মিসেস্‌ সিন্‌হা। হ্যাঁ গো হ্যাঁ, শেয়াল। তাকে তো আর তুমি প্রসিকিউট করতে পারবে না। তোমার তো ঐ এক মুরদ—প্রসিকিউট করো।

মিঃ সিন্‌হা। রজনীবাবু আপনি বাইরে যান (পুনশ্চ দাম্পত্য কলহের সূত্রপাতে নির্দ্দেশ মতো রজনীবাবু বাহির হইয়া গেলেন)। আঃ, তুমি কেরাণীদের সামনে আমাকে অমন শ্লেষ ক'রে কথা বলো কেন? ওরা বাইরে গিয়ে গপ্‌পো করবে যে!

মিসেস্‌ সিন্‌হা। গপ্‌পো করতে তো ব'য়ে গেল। আমার হয়েছে মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল। সকাল হতে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত কি যে খেতে দেব এই ভাবনায় আমার ঘুম হয় না। চাল নেই, ডাল নেই, মাছ মাংস ডিম দুষ্প্রাপ্য, আটা ময়দা সব তেতো হয়ে গেছে—কয়লা পাওয়া যায় না, বিশ্রী কাঠের ধোঁয়াতে ঘর দুয়ার হাঁড়ি ডেকচি সব কালো ঝুল হয়ে গেল।

মিঃ সিন্‌হা। কেন, এই তো সেদিন দেখলাম এক বস্তা কয়লা এল।

মিসেস্ সিন্‌হা। সে কি তোমার বাজারের দোকান থেকে নাকি! স্কুল মিস্‌ট্রেসের বোন্‌পো কোত্থেকে খবর এনেছিল—কে একজন লুকিয়ে পাঁচ টাকা মণে কয়লা বেচছে। আমি তাকে অনেক সাধ্য সাধনা ক'রে তোমাকে লুকিয়ে সেই কয়লাই মণ দুই আনিয়েছি।

মিঃ সিন্‌হা। অ্যাঁ সর্বনাশ! ব্ল্যাক-মার্কেট! তুমি ব্ল্যাক-মার্কেট থেকে কিনলে!

মিসেস্ সিন্‌হা। হ্যাঁ কিনলুম। না কিনে উপায় কি! তুমি এনে দিতে পারো কয়লা? দাও, আমাকে প্রসিকিউট্ ক'রে দাও।

মিঃ সিন্‌হা। ছাখো, এ তোমার ভারি অন্যায়। আমার বাড়ীতেই যখন এমন বেআইনি ব্যাপার চলছে, তখন বাইরে law and order পরিচালনা ক'রে আমার লাভ!

মিসেস্ সিন্‌হা। আইন টাইন বুঝিনে বাপু। রাত পোয়াতেই যার স্বামীপুত্রদের খেতে দেবার ভাবনায় অস্থির হ'তে হয় তার পক্ষে আইন-বেআইন ভাববার সময় কোথায় বলো! খেতেই বা দেব কি, আর খাবোই বা কি ছাই! উনুন থেকে যে চাট্টি গরম গরম ছাই খাবো তারও জো নেই।

মিঃ সিন্‌হা। দেখ সুরমা, তুমি বড্ড বেশী উত্তেজিত হচ্ছ। মাথা ঠাণ্ডা করো। ধৈর্য্য ধরো। আমরা তো রাজার হালে আছি। কত গরীব বেচারা না খেতে পেয়ে মারা যাচ্ছে। এই ভেবে ধৈর্য্য ধরো যে এই দারুণ যুদ্ধের সময় আমরা দুবেলা দুটি খেতে পাচ্ছি, মাথার ওপরে ছাত রেখে শুয়ে ঘুমুতে পাচ্ছি—

মিসেস্ সিন্‌হা। তাতে তোমার কোনো গাফ্‌লতি আছে, একথা তোমার পরম শত্রুতেও বলতে পারবে না। শুধু কি ঘুমুচ্ছ! বাস্‌রে! সে কি নাসিকার গর্জ্জন। যেন ট্রেণে ট্রেণে কলিসান হ'য়ে গেল, এমনি শব্দ। সাইরেন্ শুনে তোমার কোনোদিনই ঘুম ভাঙে না, কানের কাছে ঢাক বাজালেও বোধ করি ঘুম ভাঙানো যায় না!

মিঃ সিন্‌হা। আচ্ছা, এখন তুমি যাও। আমার অনেক কাজ পড়ে আছে। এখুনি চাপরাশি ডাক নিয়ে আসবে।

মিসেস্ সিন্‌হা। যাচ্ছি, যাচ্ছি। আমি গেলেই তুমি বাঁচো। যে জন্যে এসেছিলুম—একবার দয়া করে খাবেন চলুন হুজুর।

মিঃ সিন্‌হা। আহা রাগ করো কেন? আমি কি তাই মিন্ ক'রে তোমাকে যেতে বলেছিলাম! ছিঃ রাগ করে না সুরমা। লক্ষ্মীটি।

মিসেস্ সিন্‌হা। থাক থাক, আর আদরে কাজ নেই। আজ ক'বচ্ছর তুমি আমায় একটা কোনো ভালো জিনিষ দিয়েছ। যত সব খেলো সাড়ী, আর খেলো জিনিষ। কেবল বলো, যুদ্ধ থামুক তারপর। দেখে এসো গে তোমার জজ সায়েবের মেমকে। রোজ রোজ নতুন সাড়ী, নতুন গয়না। ওদের বেলা যুদ্ধ নেই, যুদ্ধ কেবল আমার বেলা, না?

চাপরাশি ডাক লইয়া আসিয়া টেব্‌লের উপর রাখিল

মিঃ সিন্‌হা। (চিঠি বাছিতে বাছিতে) এই নাও তোমার দুখানা চিঠি। এই একখানা অজিতের। এই নাও, তাকে দিও। আমার কোনো চিঠি নেই।

মিসেস্ সিন্‌হা। (চিঠি খুলিয়া পড়িতে পড়িতে) দিদির চিঠি। আচ্ছা আমি যাচ্ছি। তুমি খেতে এসো।

প্রস্থান

মিঃ সিন্‌হা। (ডাক দেখিতে দেখিতে) রজনীবাবু আসুন। (রজনীবাবু প্রবেশ করিলেন) (সরকারী চিঠিপত্র পড়িতে পড়িতে) রট্! স্কাউণ্ড্রেল! রাস্কেল! কেবল প্রফিটিয়ারিং! নিন রজনীবাবু, এটা জরুরি। এখুনি জবাব দিতে হবে। (একখানি চিঠি রজনীবাবুকে দিলেন)। যাঃ, হাইকোর্ট খালাস ক'রে দিয়েছে! সেই হাটলুটিং কেস্‌টায়! হোপ্‌লেস্ জুডিসিয়ারি! এ রকম করলে We are helpless, administration চালাবো কেমন ক'রে!

চিঠিপত্রের উপর খস্ খস্ করিয়া নীল পেন্সিলে কি সব লিখিতে লাগিলেন ও ঝুড়িতে ফেলিতে লাগিলেন। ওধারে রজনীবাবু খট্ খট্ করিয়া টাইপ করিতে লাগিলেন। এমন সময় বারান্দার পরদা ফাঁক করিয়া একজন ভিক্ষুক উচ্চৈঃস্বরে ভিক্ষা চাহিল। তাহার হাতে পায়ে অতি নোংরা বস্ত্রখণ্ডের ব্যাণ্ডেজ বাঁধা

ভিখারী। দুটি ভিক্ষে পাই বাবা! তিনদিন না খেয়ে আছি বাবা!

মিঃ সিন্‌হা। আঃ, এখানে জ্বালাতন করছিস কেন? ওদিকে যা। চাপরাশি, চাপরাশি! ওরা সব কোথায় উধাও হ'য়ে গেল! ভিকিরি আট্‌কাতে পারে না!

ভিখারী। তোমরা বড় আদমি বাবা। তোমরাও যদি আটকাও তবে গরীব নাচার কোথায় যায় বাবা!

মিঃ সিন্‌হা। আচ্ছা এই নে, চারটে পয়সা নে। যাঃ পালা—

ভিখারী। পয়সা নিয়ে কি করব বাবা! মুড়িও পাওয়া যায় না যে একমুঠো মুড়ি কিনে খাবো। পয়সা তুমি তোমার পকেটেই রেখে দাও বাবা। আমায় শুধু দুটি খেতে দাও বাবা।

মিঃ সিন্‌হা। বেয়ারা, বেয়ারা! (বেয়ারার প্রবেশ) উস্কো লে যা কে খোড়া চাউল দে দেও। যাও।

বেয়ারা। বহুৎ আচ্ছা। দশ বাজে ফিন্ রেডিয়েটার ঠো চালায় দেগা হুজুর?

মিঃ সিন্‌হা। হাঁ দেও। রেডিয়েটার নেহি, রেডিও, রেডিও।

বেয়ারা। বহুৎ আচ্ছা হুজুর।

প্রস্থান

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মিসেস্ সিন্‌হা প্রবেশ করিলেন

মিসেস্ সিন্‌হা। বড়ো যে চাল দেবার হুকুম দেওয়া হ'ল! চাল কোথায় শুনি! কণ্ট্রোল্ থেকে মাত্র একটাকার ক'রে চাল দিচ্ছে, তাও মানুষ ছেড়ে ভূতে খেতে পারে না।

মিঃ সিন্‌হা। (ভিখারীকে) তবে তুই এই আধুলিটা নে। ঐ দিয়ে কিছু কিনে খাস।

ভিখারী। আধুলিতে কি হবে বাবা! তিন দিন ধরে উপোষ আছি বাবা।

মিঃ সিন্‌হা। দূরে হোক গে! তবে নে এই টাকাটা নে। যা পালা, আর বিরক্ত করিস নি।

ভিখারীকে একটা টাকা দিলেন

ভিখারী। আল্লা তোমার ভাল করবেন বাবা। গরীবের প্রাণ বাঁচালে বাবা।

উচ্চৈঃস্বরে আশীর্বাদ করিতে করিতে ভিখারী চলিয়া গেল

মিসেস্ সিন্‌হা। এ রকম ক'রে টাকা ছড়াচ্ছ, আর আমার সংসার খরচের বেলাই তোমার টাকা নেই।

মিঃ সিন্‌হা। কি করব, ওযে তিনদিন কিছু খায়নি। আর তুমিই তো বললে দশ পয়সাতেও একটা ডিম মিলছে না। রজনীবাবু, জিনিষ পত্রের দাম কি রকম বেড়ে চলেছে দেখছেন! এত সব জিনিষ যাচ্ছে কোথায়! সব বেটা প্রফিটিয়ার! স্কাউণ্ড্রেল! দেখছেন চালের অবস্থা। ভিখিরিকে দেবার মতো চালও একমুঠো ঘরে নেই! absurd!

রজনীবাবু। (সলজ্জ বিনয়ে চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া) আজ্ঞে হ্যাঁ সার।

মিসেস্ সিন্‌হা। কেবল তোমার ঘরেই চাল নেই! অথচ দেখ গে যাও—আমি নাম করতে চাই না,—রাশি রাশি চাল ডাল আটা তেল নুন নাকি ঘরে একেবারে ঠাসা।

মিঃ সিন্‌হা। কে কে! কার ঘরে! কেমন ক'রে হবে! পুলিস রয়েছে, থানা রয়েছে—absurd!

মিসেস্ সিন্‌হা। তোমার তো সব খোঁজই আছে! যেমন তুমি, তেমনি তোমার থানা পুলিস। তোমাদের গর্জনের মধ্যে কেবল নাসিকার গর্জন।

মিঃ সিন্‌হা। রজনীবাবু, বাইরে যান। (বেচারা রজনীবাবু আবার বাহিরে চলিয়া গেলেন)। আঃ, তুমি কি সমস্ত কথা বলো! বাইরের লোকের সামনে থানা পুলিসের নামে, আমার নামে তোমার ওসব কথা কি বলা উচিত!

মিসেস্ সিন্‌হা। যা সত্যি কথা তাই তো বলছি। কালকের খবরের কাগজে লিখেছে—

মিঃ সিন্‌হা। রট! যেমন তুমি, তেমনি তোমার খবরের কাগজ। ওরা সব বিলকুল বাজে কথা লেখে।

মিসেস্ সিন্‌হা। আর যত খাঁটি কথা বলো তোমরা। সেটা তো এই ঘরে বসে বসেই টের পাচ্ছি। এখন খেতে আসা হবে কিনা তাই বলো। ওদিকে লুচি সব জুড়িয়ে জল হয়ে গেল।

মিঃ সিন্‌হা। তবে থাক, ও আর খাবো না। তার চেয়ে আমাকে এক পেয়ালা কফি আর খান দুয়েক বিস্কিট খাওয়াতে পারো?

মিসেস্ সিন্‌হা। কফি? বিস্কিট! ছাতাধরা একটুখানি কফি পড়ে আছে মরচে ধরা টিনে, আর কাগজের ঠোঙায় মোড়া সাতবাসটে মিইয়ে যাওয়া বিস্কিট আছে দু'চারখানা।

মিঃ সিন্‌হা। বাস্ বাস্, তাতেই হবে, তাতেই হবে।

আবার কাগজপত্রে মনোনিবেশ করিয়া ডাক দিলেন—রজনীবাবু। রজনীবাবু ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, সার

মিসেস্ সিন্‌হা। না, তাতে হবে না। তুমি তাড়াতাড়ি কাজ সেরে নাও, সকাল সকাল লাঞ্চ খেও। তৈরী হলেই ডেকে পাঠাবো। দেখো, যেন দুবার ডাকতে না হয়।

প্রস্থান

মিঃ সিন্‌হা। রজনীবাবু, আজ সকাল থেকে আমাদের কাজকর্মে যে রকম ক্রমাগত বাধা পড়ছে, বাইরের লোক কেউ দেখলে ভাববে বুঝি এরকম রোজই হয়! ভাববে, সরকারি কাজ আমরা করি কেমন ক'রে! না, রজনীবাবু?

রজনীবাবু। (সলজ্জ বিনয়ে) আজ্ঞে না সার।

আবার বেয়ারার প্রবেশ

বেয়ারা। দশ বাজনে কো পাঁচ মিনিট বাকি হায় হুজুর। আভ্ ভি রেডিয়েশান্ কো চালু কর দেগা হুজুর?

মিঃ সিন্‌হা। হাঁ দেও। থোড়া জোর করকে দেও। যেইসে হিঁয়াসে শুনা যায়। আর দেখো। রেডিএশান্ নেহি, রেডিও, রেডিও।

বেয়ারা। বহুৎ আচ্ছা হুজুর।

প্রস্থান

মিঃ সিন্‌হা। রজনীবাবু, কালকের সেই এ-আর-পি-র ফাইলটা দিন। (রজনীবাবু ফাইল দিলেন) এইখানটা ঠিক হয় নি। একটু পাল্‌টাতে হবে। আমার মাথায় একটা নতুন প্ল্যান এসেছে।

রজনীবাবু। ডিক্টেশান্ দেবেন কি সার?

মিঃ সিন্‌হা। হ্যাঁ।

রজনীবাবু শর্টহ্যাণ্ড্ নোটবুক বাগাইয়া ধরিলেন—এমন সময় বারান্দার দিকের পরদা একটু তুলিয়া আর একজন ভিখারী উঁকি মারিল

ভিখারী। খানা বিনা মরি বাবা!

মিঃ সিন্‌হা। আঃ, জ্বালাতন ক'রে মারলে! এ আবার কে! কোথা থেকে এল! চাপরাশি টাপরাশি সব গেল কোথায়!

ভিখারী। মুই কেমেণ্ডার-ইন্-সীফ্, লড়াইএর মালিক।

চাপরাশি ও গার্ড না-জানি কোথায় গিয়াছিল। হাঁ হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিয়া ভিখারীকে ধরিল। ভিখারী শুধু ভিখারীই নয়, পাগল

পাগল। টানাটানি করিস্ ক্যান্ বাপ সকল! কেমেণ্ডার-ইন্-সীফ্‌রে টানাটানি বালা না। ঐ তোপ শুনসেন, দুম্ দুম্ দুম্। ঐ মেসিন্ গান্, ক্যাট্ ক্যাট্ ক্যাট, তেরে কেটে দুম্। ঐ এরোপ্লেন—ভোঁ ভোঁ! শুয়ে পড়্ শুয়ে পড় বাপ সকল—প্রাণ বাঁচান দায় অইব!

পাগলকে লইয়া চাপরাশি ও গার্ডে দস্তুর মত ঝটাপটি সুরু হইল

মিঃ সিন্‌হা। ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলোটা শেষে পাগলা গারদ হয়ে উঠবে নাকি! উঃ, আর পারা যায় না! This is the limit! অসহ্য! অসহ্য! ঘরে বাইরে এরকম অশান্তি আর ভাল লাগে না!

সহসা সশব্দে পার্শ্ববর্তী ড্রয়িংরুমে রেডিও বাজিয়া উঠিল। বেশ স্পষ্ট শুনা গেল, রেডিও বলিতেছে—

নেপথ্যে রেডিও। This is All-India Radio. Here is a most momentous announcement. The axis forces have been completely smashed. Our

victorious armies are knocking at the gates of Tokio. Tojo's Government has fallen. Tojo has fled. The newly formed Japanese Government has appealed to the Allied Powers for cessation of hostilities. The prayer has been granted. His Majesty's Government has ordered that there should be an empire-wide thanksgiving to God for this great and final victory of the allied arms. Ladies and Gentlemen, the war is at an end!

মিঃ সিন্‌হা। Did you hear, Rajani Babu! The war is at an end. Thank God, we have won the war. (উচ্চৈঃস্বরে) ওগো শুনছ, সুরমা, অজিত—The war is at an end!

এই কথা বলিতে বলিতে মিঃ সিন্‌হা একলাফে অফিস কামরা পার হইয়া ড্রয়িংরুমে চলিয়া গেলেন। ধাক্কা লাগিয়া টাইপরাইটার সমেত ছোট টেব্‌ল উল্টাইয়া গেল। ড্রয়িংরুমে রেডিও তখনও বাজিতে ছিল। মিঃ সিন্‌হা বোধহয় তাহা বন্ধ করিয়া দিলেন, কারণ আর কোনো আওয়াজ শোনা গেল না।

পাগল। তোমাগোর সাহেবডা ইকৃড়ি মিকৃড়ি আবি জাবি কি কয়! বোঝ্‌তে লারলাম। আমার মনো অয় সাহেবডা পাগল অই গিসে।

রজনীবাবু চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া বোধকরি ভগবানের নাম স্মরণ করিতে ছিলেন। যুক্তকর বারংবার কপালে ঠেকাইতে ছিলেন

চাপরাশি। কি খবর দিল বাবু রেডিওতে?

গার্ড। ক্যা খবর আয়া বাবু?

রজনীবাবু। যুদ্ধ থেমে গেছে। জাপানের পতন হয়েছে। আমরা জিতেছি।

চাপরাশি। ইয়া আল্লাহ্‌!

মাটিতে নতজানু হইয়া বসিয়া জগদীশ্বরকে প্রণতি জানাইল

গার্ড। হর হর, হর হর, বোম্‌ মহাদেও! জয় ভাগোয়ান্‌!

বারংবার মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিতে লাগিল

পাগল। (এ সমস্তের তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া) এ্যাঁ! কয় লড়াই থামসে। মুই কেমেগুার-ইন্‌-সীফ্‌, লড়াই মুই না থামাইলে থামায় কেডা? মনো **অয় ইহারা** পাগল অইয়ে গিসে। হগ্‌গোল বাউরার মইধ্যা মুই থাকলে মুইও বাউরা অইব। জাই পালাই বাবা!

প্রস্থান

মিঃ সিন্‌হা, অজিত, বিনয় ও কমলার (পুত্রদ্বয় ও কন্যা) সহিত উত্তেজিত ভাবে অফিস ঘরে প্রবেশ করিলেন। পিছনে পিছনে আসিলেন মাষ্টার মহাশয়

মিঃ সিন্‌হা। ওঃ বাঁচলাম। Thank God. এই ক'বছর ধরে বুকে যেন জগদ্দল পাথর চেপে ছিল। (উচ্চৈঃস্বরে) বয়, মেমসাহেব গোসল কামরা সে য্যারসা নিক্‌লেঙ্গে অইসি সেলাম দেও।

নেপথ্যে বেয়ারা। বহুৎ আচ্ছা হুজুর।

অজয়। বাবা, এবার আমায় খুব ভাল ভাল জিনিষ কিনে দিতে হবে। একটা খুব ভালো এয়ার রাইফ্‌ল্‌, একটা টেলিস্কোপ, একটা খুব সুন্দর টয় এরোপ্লেন যা সত্যি সত্যি ওড়ে, একসেট্‌ যন্ত্রপাতি, সেই যে তুমি বলেছিলে কিনে দেবে—

মিঃ সিন্‌হা। নিশ্চয়, নিশ্চয়! তা আর বলতে! তোমায় আমি দুশো টাকা দেব, তোমার যা ইচ্ছা কিনো।

অজয়। ওঃ, দুশো টাকা! ওঃ কি মজা কি মজা!

আনন্দে লাফাইতে লাগিল

বিনয়। বাবা, আমাকে বিস্কিট, চকোলেট, সসেজ, আর আখ্‌রোট কিনে দিতে হবে। আর অনেক নতুন খেলনা দিতে হবে। দাদার পুরাণোগুলো নিয়ে আর আমি খেলব না। আচ্ছা বাবা, খেলনার সাব্‌মেরিণ হয় না? আমি পুকুরে ছাড়ব।

মিঃ সিন্‌হা। নিশ্চয়, নিশ্চয়! তোমাকেও আমি দুশো টাকা দেব। তুমি তোমার ইচ্ছামত সব কিনো।

বিনয়। ও বাবা! আমাকেও দুশো টাকা দেবে! ওঃ কি মজা!

লাফাইতে লাগিল

কমলা। বা রে, আর আমি বুঝি ফাঁক যাবো। দাদারা তবু নতুন খেলনা দু একটা পেয়েছে, আমি তো খেলনাই পাই নি। জন্মে থেকেই শুনছি যুদ্ধ যুদ্ধ যুদ্ধ!

মিঃ সিন্‌হা। কুছ্‌ পরোয়া নেই, তুমিও দুশো টাকা পাবে। এখন কি কি কিনবে ভেবে ভেবে তার লিষ্ট তৈরী কর তোমরা।

ছেলে মেয়েরা নাচিতে নাচিতে চলিয়া গেল

চাপরাশি। হুজুর মেহেরবান্‌। আমার জরিমানাটা—। মুই গরীব মানুষ, বালবাচ্চা অনেক। কন্‌ট্রোল থেকে যে চাল দেয়—

মিঃ সিন্‌হা। আর কন্‌ট্রোল নেই, এখন রাশি রাশি চাল, ভারে ভারে চাল। যাও, তোমার জরিমানা মাফ।

চাপরাশি। হুজুরের বহুৎ দয়া।

গার্ড ও চাপরাশি চলিয়া গেল

মাষ্টার। (যোড় হাতে) আমার একটা প্রেয়ার ছিল সার।

মিঃ সিন্‌হা। কি বলুন।

মাষ্টার। ঐ যে নটবর পাল—

মিঃ সিন্‌হা। What Natabar Pal?

মাষ্টার। ঐ যে প্রাফিটিয়ারিং কেস্‌এ সার যাকে প্রসিকিউট্‌ করতে হুকুম দিয়েছেন—

মিঃ সিন্‌হা। Oh, that Kerosine man! Scoundrel!

মাষ্টার। সার, তিনি আমার মেশো হন।

মিঃ সিন্‌হা। যৎপরোনাস্তি পাজী মেশো, নচ্ছার মেশো! You should be ashamed of your মেশো।

মাষ্টার। মাফ করুন সার, আর কখনো এ কাজ করবে না সার, যুদ্ধ থেমে গেছে সার!

মিঃ সিন্‌হা। (একটু ইতস্ততঃ করিয়া) রাইট্‌ ও! The war is over! রজনীবাবু, don't prosecute.

রজনীবাবু। (ফাইলগুলি তুলিয়া লইয়া) যে আজ্ঞে সার। আমরা তাহলে এখন আসি সার।

মাষ্টার। নমস্কার সার। আপনার দয়া চিরদিন মনে থাকবে সার।

উভয়ের প্রস্থান

রজনীবাবু। গুড্‌ মর্ণিং সার।

মিঃ সিন্‌হা। গুড্‌ মর্ণিং, গুড্‌ মর্ণিং।

মিসেস্‌ সিন্‌হার প্রবেশ। তিনি স্নান সারিয়া আসিয়াছেন

মিসেস্‌ সিনহা। ব্যাপার কি! দু'মিনিটের জন্যে একটু বাথরুমে ঢুকেছি, আর তুমি বাড়ী মাথায় করচ যে। ছেলেরা সব গেল কোথায়? হয়েছে কি?

মিঃ সিন্‌হা। কি হয়েছে বল দেখি ?

মিসেস্ সিন্‌হা। বদলীর খবর এসেছে ? (মিঃ সিন্‌হা ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন—না) টুরে যেতে হবে ? (মিঃ সিন্‌হা জানাইলেন—না) তবে কি ?

মিঃ সিন্‌হা। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। জাপান হেরে গেছে।

মিসেস সিন্‌হা। এঁ্যা, সত্যি ?

মিঃ সিন্‌হা। সত্যি।

ক্রমে ক্রমে উভয়ে উভয়ের কাছে সরিয়া আসিলেন এবং আলিঙ্গনবদ্ধ হইলেন। বাহিরে মালী, মেথর প্রভৃতি নিম্নতম ভৃত্যরা ঢোলোক বাজাইয়া গান গাহিতেছে শোনা গেল—

মিসেস সিন্‌হা। হ্যাঁ গা, রেডিওতে সোনার দর নেমেছে কি না বললে ?

মিঃ সিন্‌হা। সকলের সব চিন্তা, তোমার কেবল ঐ চিন্তা।

মিসেস্ সিন্‌হা। আশী টাকা ভরি হলে কি আর গয়না গড়ানো যায় ? এবার নিশ্চয় ষোলো টাকায় নামবে। আর দেখ, ডেকচি, সসপ্যানগুলো সব একেবারে তেব্‌ড়ে তুব্‌ড়ে গেছে।

মিঃ সিন্‌হা। ওগুলা সব ফেলে দাও। সব নতুন সেট কেনো।

মিসেস্ সিন্‌হা। ফেলে দেব কি গো! ওগুলো সব ফেরিওয়ালাকে বেচে দেব।

মিঃ সিন্‌হা। দেখ, আমার মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে। একসেট হাঁড়ি ডেকচি সসপ্যান হাতা খুন্তি বেড়ি তোমায় প্রেজেন্ট্ দেব। অনেকদিন কিছু দিইনি তো তোমায়।

মিসেস্ সিন্‌হা। খুব চমৎকার প্রেজেন্ট্! যেমনি দরকারি, তেমনি ব্যয়বাহুল্যবর্জ্জিত। আর এর মধ্যে একঢিলে দুই পক্ষী বধের নির্দ্দোষ আনন্দটুকুও রয়েছে!···দেখ, আমার মাথাতেও একটা মতলব এসেছে। এ কয় বছর তোয়ালে, ন্যাপকিন, টেবলক্লথ এসব প্রায় কিছুই কেনা হয়নি। পাওয়াই তো যেত না।······

মিঃ সিন্‌হা। বুঝেছি, বুঝেছি। তা দাও, এক ডজন ক'রে তোয়ালে, ন্যাপকিন, লেপের ওয়াড়, বালিসের ওয়াড় এই সব কিনে আমাকে উপহার দাও। সে বেশ চমৎকার হবে।

উভয়ের হাস্য

মিসেস্ সিন্‌হা। দেরী হয়ে যাচ্ছে। তুমি স্নানে যাও। বেয়ারা—বয়—

বেয়ারার প্রবেশ

সাহেব কো গোসল তৈয়ার করো।

বেয়ারা। হুজুর, টপ্ মে পানি তো বিলকুল কম্‌তি হায়।

মিঃ সিন্‌হা। পানিওয়ালাকো বোলো টব্ ভরতি কর দেগা।

বেয়ারা। হুজুর, পানিওয়ালা মাতাল হায়।

মিঃ সিন্‌হা। মাতাল হায়! স্কাউণ্ড্রেল! মাতাল হুয়া কাহে ?

বেয়ারা। হুজুর লড়াই শেষ হো গিয়া উসি সে মাতাল।

মিঃ সিন্‌হা উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন

মিঃ সিন্‌হা। আচ্ছা কুছ্ পরোয়া নেহি। তুমলোককো সব নোকর কো পাঁচ পাঁচ রূপেয়া বখ্‌শিষ মিলে গা। লড়াই ফতে হুয়া।

বেয়ারা। বহুৎ আচ্ছা হুজুর। সেলাম হুজুর, সেলাম মেমসাব।

প্রস্থান

মিঃ সিন্‌হা। আজ স্নান করব না, আফিস যাবো না, এখুনি বেরব। মোটরে যতখুসী পেট্রল নেব, একট্যাঙ্ক পেট্রোল আর যতখুসী জোরে গাড়ী চালাব। সুরমা আজ তোমার জন্যে খুব চওড়া পাড়ের কয়েকটা মুর্শীদাবাদী সিল্কের সাড়ী কিনে আনব। জানি এ তোমার ভারি পছন্দ।

মিসেস্ সিন্‌হা। সত্যি ?

মিঃ সিন্‌হা। সত্যি। আর শোনো, আমার পুরো একমাসের মাইনে তোমায় দেব, তাদিয়ে তুমি যা খুসী কিনো।

মিসেস্ সিন্‌হা। ওরে বাবা! হুজুর আজ যে দাতাকর্ণ দেখছি! (হঠাৎ বাগানের কোন্ একটা গাছের মাথায় ঘুঘু ডাকিয়া উঠিল) শোনো, শোনো, ঐ ঘুঘু ডাকছে। এতদিন দুমদাম্ বন্দুকের গুলিফাটা, এরোপ্লেনের ভোঁ ভোঁ আর বোমার আওয়াজে পাখীপক্ষীরা সব যে কোথায় পালিয়েছিল! আজ লড়াই থেমে গেছে, মেঘ কেটেছে, রোদ উঠেছে, তাই ঐ শোনো কি মিষ্টি ডাকছে ঘুঘু—

মিঃ সিন্‌হা। দেখ ছেলেবেলায় যখন ঠাকুরমার কোলঘেঁষে শুয়ে রূপকথা শুনতাম, তখন তাঁর কাছে শুনেছি, ঘুঘু কি ব'লে ডাকে জান ?

মিসেস্ সিন্‌হা। ঘুঘু—ঘু, এই ব'লেই তো ডাকে।

মিঃ সিন্‌হা। উঁহু, ঘুঘু বলে, বউ, বউ দুঃ—খু পাবার বউ।

মিসেস্ সিন্‌হা। হঠাৎ সে কথা আজ তোমার মনে পড়ে গেল কেন ?

মিঃ সিনহা। তোমার কথা মনে ক'রে। তুমি যে আমার দুঃখু পাবার বউ। আর আমি হলুম একটি আসল ঘুঘু পক্ষী, কি বল ? আমাকে তুমি বাস্তুঘুঘুও বলতে পার। এতদিন কত দুঃখই না গিয়েছে তোমার ওপর দিয়ে, আমি চেয়েও দেখিনি, নিশ্চিন্ত আরামে ছিলুম।

মিসেস্ সিন্‌হা। কিসের দুঃখ! বরং দিনরাত কত কড়া কথা শুনিয়েছি তোমায়। আমার মাথার ঠিক ছিল না। যে দুর্দ্দিন গেছে, উঃ ভাবতেও পারি না। তুমি কিছু মনে কোরো না গো। বল, আমায় তুমি ক্ষমা করেছ।

মিঃ সিন্‌হা। ক্ষমা কিসের! ও কি, আবার প্রণাম করছ কেন! কোথাকার পাগলী এটা! ওঠো ওঠো! আমিই বরং অধৈর্য্য হ'য়ে তোমায় কত কি বলেছি। বলেছি এটা চাই, ওটা নইলে নয়, এইটে খেতে দাও, ঐটে খেতে দাও—অথচ একবার ভেবেও দেখিনি সে সব জিনিষ কত দুষ্প্রাপ্য। ভেবেছি তোমার কাছে যখনি যা চাওয়া যাবে তখনি তা পাওয়া যাবে। তুমি আমায় আজ মাফ্ করো।

মিসেস্ সিন্‌হা। ছিঃ ওকথা কি বলে পাগল!

দূরে ব্যাণ্ড্ বাজিতে লাগিল। অনেক লোকের আনন্দধ্বনি হাসি ও গান ভাসিয়া আসিতে লাগিল

সাময়িকী

পরলোকে রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—

মানুষের মৃত্যু অনিবার্য্য, কিন্তু সেই মৃত্যু যখন অসময়ে অকস্মাৎ আসিয়া আমাদের অতি-আদরের পাত্রকে আমাদের মধ্য হইতে ছিনাইয়া লইয়া যায়, তখন সে শোকে সান্ত্বনার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। গত ২৩শে ফাল্গুন সকাল ৬টার সময় বসুমতীর স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের একমাত্রপুত্র রামচন্দ্রের পরলোকগমন সেইজন্য সমগ্র বাঙ্গালাদেশের লোককে কি ভাবে স্তম্ভিত করিয়াছে, তাহা বর্ণনা করিবার ভাষা নাই। রামচন্দ্রের বয়স হইয়াছিল মাত্র ২৪ বৎসর—কিন্তু এই অল্প বয়সের মধ্যেই সে তাহার অসাধারণ প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের দ্বারা সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল—একবার যে তাহার সম্পর্কে গিয়াছে, সে কখনও রামচন্দ্রের কথা ভুলিতে পারিবে না। ছাত্র জীবনে সে শুধু লেখাপড়ায় সাফল্য দেখাইয়া সকলকে তৃপ্ত করে নাই, একদিকে যেমন সে বি-এ পরীক্ষায় অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হইয়া ঈশান স্কলার হইয়াছিল, এম-এ পরীক্ষায় সংস্কৃতে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিল, অপরদিকে তেমনই সে ছাত্রমহলে নিজেকে এমন প্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল যে ছাত্রসমাজে সকলেই তাহার প্রশংসায় মুখর হইয়াছিল। তাহার পর কর্ম্মজীবনে প্রবেশ করিয়া সে বসুমতীর কর্ম্মীদের সকলের আদরের পাত্র হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে বৃহত্তর সাহিত্যিক সমাজের মধ্যেও নিজের সহৃদয়তার দ্বারা নিজের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিল। সেইজন্য সকলেই আশা করিয়াছিলেন, রামচন্দ্রের দ্বারা বাঙ্গালার সাহিত্য ও সাহিত্যিক সমাজ প্রভূত লাভবান হইতে পারিবে। কিন্তু বিধির বিধান অলঙ্ঘ্য, তাই সকলের সে আশা অঙ্কুরে বিনাশ করিয়া রামচন্দ্র তাহার সকল আরব্ধ কার্য্য অসম্পূর্ণ রাখিয়া চলিয়া গিয়াছে—ইহা বিধির কি বিধান, তাহা নির্ণয় করতে আমরা অক্ষম।

স্বর্গত সাধক উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁহার গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কৃপালাভ করিয়া বসুমতীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং সেই বসুমতীর সাফল্যে ও যশ-গৌরবে বঙ্গবাসী সকলেই গৌরবান্বিত হইয়াছিল। উপেন্দ্রনাথের স্বর্গগমনের পর তাঁহার উপযুক্ত পুত্র সতীশচন্দ্র যেভাবে বসুমতী সাহিত্য মন্দিরকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন, তাহা অতীতের ইতিহাস নহে, তাহার বিবরণ আজ সকলের সম্মুখে উজ্জ্বল হইয়া বর্ত্তমান। সতীশচন্দ্র তাঁহার পুত্রকে উপযুক্ত শিক্ষাদান করিয়া উপযুক্ততর করিয়া গড়িয়া তুলিতেছিলেন, তাঁহার আশা ছিল, তিনি নিজে যেমন পিতার আরব্ধ কার্য্য অধিকতর সাফল্যমণ্ডিত করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার পুত্রও তেমনই বসুমতী সাহিত্য মন্দিরকে সর্ব্বসাধারণের কার্য্যে নানাভাবে নিযুক্ত করিতে সমর্থ হইবেন। তাঁহার সে চেষ্টা ব্যর্থ হইল—তাঁহার আজিকার এই শোক, শুধু তাঁহার একার শোক নহে, বাঙ্গালা দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই তাঁহার এই শোকে অভিভূত হইয়াছেন—কারণ সুলভ সাহিত্য ও শিক্ষা প্রচার ক্ষেত্রে বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের দানের কথা আজ কাহারও অবিদিত নহে এবং সেজন্য বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের পরিচালকের নিকট সকলেই কৃতজ্ঞ।

রামচন্দ্র কৈশোরেই পিতার এই সাহিত্য সাধনা ও সাহিত্য প্রীতির অধিকারী হইয়াছিলেন এবং সেইজন্যই ছাত্রাবস্থায় তিনি



রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

'কিশলয়' নামক মাসিক পত্র প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালার সাহিত্যিক সমাজকে সংঘবদ্ধ করিতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন।

বাঙ্গালা দেশে দৈনিক সংবাদপত্রের ইতিহাসের সহিত বসুমতীর ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। 'দৈনিক বসুমতী' এদেশে ১৬পৃষ্ঠার প্রথম বাংলা দৈনিক এবং বসুমতীর পরিচালকগণই সর্ব্বপ্রথম সাহস করিয়া রোটারী যন্ত্রে বাংলা সংবাদপত্র মুদ্রণের ব্যবস্থা করেন। বাঙ্গালার সাংবাদিকগণের নিকট সে এক

নবযুগের কথা। রামচন্দ্রকে নূতনভাবে নূতন উত্তম লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে দেখিয়া বাঙ্গালা দেশের সাংবাদিকগণের আশা হইয়াছিল যে সংবাদপত্র জগতে ও সাংবাদিক জীবনে রামচন্দ্রের চেষ্টায় অভাবনীয় পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে—কিন্তু সকলের সে আশা আজ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইল।

যাঁহারা রামচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তাঁহারা রামচন্দ্রের অসাধারণ বুদ্ধি ও অসাধারণ কার্য্যক্ষমতা দেখিয়া বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারেন নাই। কি করিয়া দেশের অভাব পূর্ণ করিয়া দেশকে সমৃদ্ধ করা যায়, কি করিয়া দেশের শিক্ষিত বেকারগণকে কার্য্য প্রদান করা যায়, রামচন্দ্র সর্ব্বদা সে বিষয়ে চিন্তা করিত এবং সেজন্য সে নানাপ্রকার কারখানা প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হইয়াছিল। সে-জন্য সে রসায়নশাস্ত্র সম্বন্ধে বহু মূল্যবান পুস্তক ক্রয় করিয়া নিজে তাহা পাঠ করিয়াছিল এবং স্বগৃহে গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করিয়া গবেষণায় সে সাফল্য-লাভ করিয়াছিল। কিন্তু কে আজ তাহার সেই অসমাপ্ত কার্য্য সম্পাদন করিবে?

রামচন্দ্রের বৃদ্ধা পিতামহী, পিতা, মাতা, ভগ্নীগণ, বালবিধবা পত্নী ও শিশুকন্যাকে তাঁহাদের এই দারুণ শোকের কথা মনে করিয়া সকল লোক আজ যে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছে, তাহা কি তাঁহাদের শোক প্রশমিত করিতে সমর্থ হইবে? শ্রীভগবান তাঁহাদের মনে শান্তি দান করুন, আমরা সর্ব্বান্তকরণে আজ শুধু এই প্রার্থনাই করিব। দেশের দুর্ভাগ্য, জাতির দুর্ভাগ্য, তাই আজ আমরা রামচন্দ্রের মত একজন সহৃদয় কর্ম্মীকে হারাইয়াছি।

ভারত সম্পর্কে ব্রিটীশ জনসাধারণ—

গত ২৩শে জানুয়ারী উত্তর লণ্ডনে ভারত সম্পর্কে এক জনসভা হয়। উক্ত সভায় পার্লামেণ্টের সদস্য রেভারেণ্ড সোরেন্সন ও মিঃ ডি, এন, প্রিট বক্তৃতা করেন। রেঃ সোরেন্সন বলেন—'ভারতের যে সকল নেতা কারারুদ্ধ আছেন তাঁহাদের মুক্তি দেওয়া উচিত। সার অসোয়াল্ড মোসলে মুক্তি পাইলেন অথচ ভারতের বিশিষ্ট দেশ-প্রেমিক পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু এখনও কারারুদ্ধ আছেন। ভারতের ১০ কোটি লোক অর্দ্ধাশনে কাল কাটায়। এ দেশের লোকের গড়পড়তা বাঁচিবার সম্ভাবনা ৬০ বৎসর, আর ভারতে ইহা মাত্র ২৩ বৎসর।' মিঃ প্রিট প্রসঙ্গক্রমে বলেন—'যুদ্ধ প্রচেষ্টার সাহায্যার্থে ভারতের নিকট সুপ্রচুর দ্রব্য-সম্ভার আদায় করা হইয়াছে; কিন্তু মূল্য বৃদ্ধি দমন ইত্যাদির জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ দ্রব্য আমদানী করা হয় নাই।'

এতৎসম্পর্কে বার্মিংহামেও একটী জনসভা হয়; উক্ত সভায় খ্যাতনামা সাহিত্যিক মিঃ এডওয়ার্ড টমসন বলেন—'এ দেশের ন্যায় ভারতেও একটী ওয়ার ক্যাবিনেট থাকা প্রয়োজন এবং ভারতের প্রয়োজনের সমস্যাটীর ভার তথাকার নেতাদের গ্রহণ করিতে বলা এবং তাঁহাদের পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া কর্ত্তব্য।'—উপরোক্ত মতামত আমাদের দেশের নেতাদের নহে। যাঁহারা এই সকল সমস্যার কথা বলিয়াছেন তাঁহারা আমাদের প্রতিবেশীও নহেন। কিন্তু তথাপি কি আমরা আশা করিতে পারি যে শাসনকর্ত্তারা এ বিষয়ে চিন্তা অথবা বিবেচনা করিবেন?

নূতন কমিশন (?)—

পার্লামেণ্টের যে সকল সদস্য ভারতবর্ষের ক্রমিক অবনতি সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের নাকি ভারত সচিবের দপ্তরের প্রণীত দুইটী উন্নতিমূলক ব্যবস্থার কথায় আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথমটী আগামী সপ্তাহ কয়েকের মধ্যে কংগ্রেসের বন্দীগণ সম্পর্কে বিবেচনা। অর্থাৎ যাঁহারা ছয় মাসের অধিককালের জন্যে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন, তাঁহাদের অবস্থা সম্পর্কে পুনর্ব্বিবেচনা। দ্বিতীয় ব্যবস্থাটী এই যে, ইংরাজ ও ভারতীয় সদস্য লইয়া গঠিত একটী কমিশন ভারতের আর্থিক পুনর্গঠন সম্পর্কে বিবেচনার জন্য শীঘ্রই ভারতবর্ষে যাইবেন। এই কমিশনের উপর কৃষি, শিল্প ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে বিবেচনার ভার অর্পিত হইবে। কৃষি ও শিল্প সম্পর্কে ভারতীয় সদস্যেরা বিবেচনা করিবেন এবং ব্রিটীশ সদস্যগণ নাকি স্বাস্থ্য সম্পর্কে বিবেচনা করিবেন। এতবড় খবর সংবাদটীর পিছনে নাকি ভারত সচিবের দপ্তরের সমর্থন মিলে নাই। কিন্তু পার্লামেণ্টের সদস্যগণ এবং আরও অনেকে এই প্রস্তাব দুইটীকে ব্রটীশ সরকারের আন্তরিক প্রস্তাব বলিয়াই মনে করেন। আমরাও আন্তরিক আগ্রহে কমিশনের আগমন প্রতীক্ষা করিব।

ভারতীয় বাহিনীর অফিসার—

ভারতের লোক সংখ্যা ৪০ কোটি। এদেশে সর্ব্বমোট ১৮টী বিশ্ববিদ্যালয়ে ন্যূনপক্ষে ১ লক্ষ যুবক উচ্চ শিক্ষালাভ করিতেছেন। উক্ত একলক্ষ যুবকদের মধ্যে ভারতীয় বাহিনীতে উপযুক্ত সংখ্যক অফিসার সংগ্রহ করা কষ্টসাধ্য নহে। কিন্তু ভারতীয় বাহিনীতে যথেষ্ট সংখ্যক ভারতীয় অফিসার নাই। এতদসম্পর্কে সম্প্রতি শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন—"ট্রেণে ভ্রমণের সময় ভারতীয় অফিসারদের সহিত মধ্যে মধ্যে আমার আলাপ হয়। আমি যদি বলিতে পারিতাম যে বন্ধুগণ অগ্রসর হও; ইহা আমাদের দেশ, এই দেশের জন্য যুদ্ধ কর, তাহা হইলে তাঁহাদের মনে যে প্রেরণা জন্মিত, সেই প্রেরণা ভারতীয় অফিসারগণের মধ্যে দেখিতে পাই না।" রাজাগোপালাচারীর এই উক্তি সম্পূর্ণ সত্য। আমরা এ বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের পক্ষপাতিত্বহীন বিবেচনার দাবী করি।

বিলাতে ভারত কথা প্রচার—

বিলাতে পার্লামেণ্টের কমন্স সভায় ১৪ই ফেব্রুয়ারী ভারত গভর্ণমেণ্টের নিন্দা করিয়া দুইটি প্রস্তাব উপস্থিত করা হইয়াছিল—প্রথমটিতে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর উপর নিষেধাজ্ঞা প্রদানের জন্য কর্ত্তৃপক্ষের কার্য্যের আলোচনা করা হয়। দ্বিতীয়টিতে ভারতরক্ষা আইনের অপপ্রয়োগের কথা বলা হইয়াছে। তাহার পরই পার্লামেণ্টের ৫০ জন সদস্যের স্বাক্ষরিত এক তার শ্রীমতী নাইডুর নিকট প্রেরিত হইয়াছে এবং তাহাতে তাঁহাকে বিলাতে যাইয়া ভারতের স্বাধীনতার দাবীর কথা সকলকে জানাইতে বলা হইয়াছে। শ্রীমতী নাইডু যাইতে সম্মত হইলে তাঁহারা বৃটীশ গভর্ণমেণ্টকে দিয়া তাঁহার গমনের ব্যবস্থা করিয়া দিতে চাহিয়াছেন।

আমেরিকায় ভারতবাসী—

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র অপর দেশের স্বাধীনতার জন্ম আন্দোলন করিলেও ভারতবাসী বা চীনবাসী ঐ দেশে গমন করিলে তথায় তাহাকে সাধারণ নাগরিকের অধিকার প্রদান করা হইত না। সম্প্রতি এ বিষয়ে এক নূতন আদেশ প্রচার করিয়া চীনবাসীদের এ বিষয়ে যে অসুবিধা ছিল তাহা দূর করা হইয়াছে। কিন্তু ভারতবাসী সম্বন্ধে কেন নূতন আদেশ জারি করা হয় নাই, তাহা অজ্ঞাত। মার্কিন সৈন্তরা যেমন চীনা সৈন্তের পাশে দাঁড়াইয়া এবার যুদ্ধ করিতেছে, তেমনই ভারতীয় সৈন্তদের সহিতও তাহারা একযোগে কাজ করিয়াছে। এ অবস্থায় এক দেশের লোক যখন সুবিধা পাইল, অন্ত দেশের লোক সে সুবিধা পাইবে না কেন?

বাঙ্গালায় বসন্ত রোগের সম্ভাবনা—

হাওড়া, যশোহর, খুলনা, রাজসাহী, বগুড়া, দিনাজপুর, পাবনা, চট্টগ্রাম ও মুর্শিদাবাদ—বাঙ্গালা দেশের এই ৯টি জেলায় বসন্ত রোগের আশঙ্কা আছে বলিয়া ফাল্গুন মাসের প্রথমেই বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট প্রচার করিয়াছেন। অনাহারে যাহারা মরে নাই, তাহাদের একাংশ ম্যালেরিয়া, কলেরা প্রভৃতি রোগে মারা গিয়াছে—বাকী অংশ যে বসন্তে মারা যাইবে তাহা আর বিচিত্র কি? অর্দ্ধাহার ও অনাহারে কতদিন লোক জীবিত থাকিতে পারে?

শ্রীযুক্ত শচীন সেন—

কলিকাতা বৃটীশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের কর্ম্মী শ্রীযুক্ত শচীন সেন 'বাঙ্গালার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ঐতিহাসিক ভূমিকা' সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখিয়া সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'পি-এইচ্-ডি' উপাধি লাভ করিয়াছেন; শচীনবাবু খ্যাতনামা লেখক। তাহার প্রবন্ধের পরীক্ষকগণ (১) অধ্যাপক এইচ্-এইচ্ ডড্ওয়েল (২) অধ্যাপক আর-বি রাম্‌সবোথাম ও (৩) বিচারপতি শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস—তিনজনেই একমত হইয়া তাঁহার প্রবন্ধের প্রশংসা করিয়াছেন। আমরা শচীনবাবুকে তাঁহার এই সম্মান প্রাপ্তিতে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

সাজাদপুরে সাহিত্য সম্মেলন—

গত ১৯শে ও ২০শে মাঘ পাবনা সাজাদপুর বাণী সম্মিলনীর উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিপূত কবিতীর্থ সাজাদপুরে শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর সভানেত্রীত্বে এক সাহিত্য সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় দিনে সভানেত্রী মহাশয়া বর্ত্তমান সময়ে বাংলার নারীসমাজের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। মহিলা সভার পক্ষ হইতে সভানেত্রীকে এক মানপত্র প্রদান করা হয়। সাহিত্য সম্মেলনের সহিত সঙ্গীত ও ধর্ম্মসভারও ব্যবস্থা ছিল।

লবণের অভাব—

গত মাসেই আমরা সংবাদ দিয়াছিলাম, বাঙ্গালা দেশের বহু স্থানে এক টাকা সের দরে লবণ বিক্রীত হইয়াছে। লবণের অভাব না কমিয়া বরং দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। কলিকাতা ও সহরতলীতেও লবণ দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। দুষ্প্রাপ্য হইলেই দামও বাড়িয়া যায়। লবণ সমুদ্রের এত নিকটে থাকিয়াও কেন যে আমাদের লবণের অভাব বোধ করিতে হয় জানিনা। সরকারী প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও বাজারে মাল আসে নাই।

ট্রাম ও বাসে ভিড়—

কলিকাতা সহরে ট্রাম ও বাসের ভীড় দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। এ জন্ম প্রায় সকল শ্রেণীর লোকেরই দুর্দ্দশার সীমা নাই। পেট্রোলের অভাবে যাঁহারা ট্রাম বা বাসে চড়িতে বাধ্য হন, তাঁহাদের ত কথাই নাই। এই অবস্থার প্রতীকারের জন্ম কি গভর্ণমেণ্টের কোন কর্ত্তব্য নাই? ট্রাম কোম্পানী বা বাস-ওয়ালারাও এ বিষয়ে যাত্রীদের কোন অভিযোগে কর্ণপাত করেন না। এ বিষয়ে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্ম যাত্রীদের সংঘবদ্ধ হইয়া চেষ্টা করা উচিত।

সত্য কি?—

পত্রান্তরে স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার "বাঙ্গলার দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে কয়েকটী কথা" নামক প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে জানাইয়াছেন—"আজ শাসকতন্ত্র সাম্যবাদকে কি দৃষ্টিতে দেখেন অথবা, সাম্যবাদ কতখানি দেশের জনসাধারণকে প্রভাবিত করিতে পারিয়াছে। কিন্তু ইহা জানা শক্ত নহে, যে বর্ত্তমানের ভারতীয় 'কম্যুনিষ্ট' শুধু মাত্র সরকারের হস্তের অস্ত্রস্বরূপ এবং তাহা শুধু শাসক সম্প্রদায়ের প্রচার কার্য্যের জন্মই নিযুক্ত—এমন একটী অস্ত্র—যাহার সাহায্যে, প্রয়োজন হইলে, কংগ্রেসকে দুই চারি ঘা পিটাইয়াও দিতে পারা যায়।" স্যার নৃপেন্দ্রনাথের এই উক্তির প্রতিবাদ কমেরেড্ ভাইদের দ্বারা সম্ভব হইবে কিনা জানিনা। কিন্তু কথা কয়টী হাটে হাঁড়ী ভাঙ্গার শব্দের ন্যায় আমাদের কাণে বাজিতেছে।

তৈল সরবরাহের নূতন ব্যবস্থা—

যুক্তরাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্রসচিব মিঃ হ্যারল্ড্ আইক্‌স্ সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন যে, মার্কিণ গভর্ণমেণ্ট আনুমানিক ১৩ কোটি ডলার হইতে সাড়ে ১৬ কোটী ডলার ব্যয়ে পারস্য উপসাগর হইতে ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্বতীর পর্য্যন্ত একটী সুদীর্ঘ তেলের পাইপ বসাইবেন। ঐ লাইন ১২৫০ মাইল লম্বা হইবে। উহাতে খুব সুবিধাজনক সর্ত্তে সেনা ও নৌবাহিনীর ব্যবহারের জন্ম একশত কোটি পিপা তেল মজুদ রাখা যাইতে পারিবে। উক্ত পাইপ লাইন বসাইবার জন্ম ইতিমধ্যে কয়েকটি তৈল ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে চুক্তি হইয়া গিয়াছে। ঐ চুক্তি অনুসারে স্থির হইয়াছে যে, পেট্রোলিয়াম রিজার্ভ কর্পোরেশন উক্ত পাইপ লাইন বসাইবেন এবং উহার মালিক হিসাবে রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন।

আটার মূল্যের পার্থক্য—

লাহোরের একটি সংবাদে প্রকাশ, অষ্ট্রেলিয়া হইতে ভারতের কোন বন্দরে যে গম আসিয়াছে, তাহার দাম পড়িয়াছে মণ প্রতি ৭ টাকা ৫ আনা। পাঞ্জাব লায়ালপুরেও আটার দাম সাড়ে ৭ টাকা হইতে ৯ টাকার মধ্যে। কিন্তু কলিকাতায় আটার মূল্য এখনও সাড়ে ১২ টাকা। সহরতলীতে আবার সেই আটাই কণ্ট্রোলের দোকানে সাড়ে ৬ আনা সের দরে বিক্রীত হইতেছে। এই অদ্ভুত পার্থক্যের কারণ কি?

বেতন ও ভাতা বৃদ্ধি—

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদ ও ব্যবস্থাপক সভার সদস্যগণ মাসিক ১৫০ টাকা বেতন ও সভাধিবেশনের সময় দৈনিক ১০ টাকা ভাতা পাইয়া থাকেন। উহা বাড়াইয়া যথাক্রমে ২৫০ টাকা ও ১৩ টাকা করার প্রস্তাব করা হইয়াছে। এই প্রস্তাবে হয় ত সদস্যরা কেহই আপত্তি করিবেন না।

বড়লাট ও ভারতের ভবিষ্যৎ—

নূতন বড়লাট লর্ড ওয়াভেল এত দিন পরে গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী দিল্লীতে ব্যবস্থা পরিষদ ও রাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্যগণের নিকট তাঁহার রাজনীতিক মত ব্যক্ত করিয়াছেন। এই অভিমত যে একেবারে মামুলী ধরণের তাহা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। বড়লাট ভারতের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য কংগ্রেসের সহযোগিতাই কামনা, করিয়াছেন, কিন্তু তিনি সহযোগিতার পথ মুক্ত করিতে সম্মত নহেন। তিনি রাজনীতিক মুক্তি দিতে সম্মত নহেন—অথচ তাঁহাদের কর্ম্মক্ষমতা ও উচ্চমনের কথাও অস্বীকার করেন না। কংগ্রেস যখন একসময়ে যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সাহায্য করিতে সম্মত হইয়াছিল, তখন বড়লাট যদি তাঁহাদের প্রকৃত সহযোগ কামনা করিতেন, তখন কখনই দুর্লভ হইত না। দেশে এখনও একদল মধ্যস্থের অভাব নাই। বড়লাট ইচ্ছা করিলে তাঁহাদের মারফত ও কংগ্রেসের সহিত আপোষের চেষ্টা করিতে পারিতেন। সেরূপ কিছু না করিয়া শুধু সহযোগের আহ্বান জানাইলে সে আহ্বানে সাড়া পাওয়া যাইবে না। অধিকন্তু যাঁহারা সাড়া দিবেন, তাঁহাদের নিকটে কারাগারে সে আহ্বান পৌছিবে কি না সন্দেহ।

অমৃতবাজার পত্রিকা ও গভর্ণমেণ্ট—

গত অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে ৫০ দিন অমৃতবাজার পত্রিকায় কোন সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হয় নাই। কেন ঐরূপ হইয়াছিল, তাহাও সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত হয় নাই। গত ১লা ফাল্গুন বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে প্রশ্নোত্তরে জানা গিয়াছে, গত ২৮শে ও ২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে অমৃতবাজার পত্রিকায় আপত্তিজনক সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ায় সম্পাদকীয় মন্তব্যগুলি প্রকাশের পূর্ব্বে গভর্ণমেণ্টকে দেখাইতে বলা হয়। তাহার প্রতিবাদে সম্পাদকীয় প্রকাশ বন্ধ হইয়া যায়। ব্যাপারটি যে কেন এতদিন গোপন করিয়া রাখা হইয়াছিল, তাহার কারণ অজ্ঞাত।

বাঙ্গালার কৃষির উন্নতি—

বাঙ্গালা দেশে কৃষির উন্নততর ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের জন্য গভর্ণমেণ্ট উদ্যোগী হইয়াছেন—ইহা অবশ্যই সুসংবাদ। সেজন্য পাঞ্জাব লায়ালপুর কৃষি কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ও পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস-চ্যান্সেলার খান বাহাদুর মিঞা মহম্মদ আফজল হোসেনকে বাঙ্গালা দেশে বিশেষ পরামর্শদাতারূপে আনা হইবে। পাঞ্জাব কৃষি বিষয়ে যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, তাহা বাঙ্গালায় অনুসৃত হইলে বাঙ্গালার লোক উপকৃত হইবে। বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের পর বাঙ্গালায় যাহাতে ব্যাপক উন্নত প্রণালীর কৃষি ব্যবস্থা থাকে, এখন হইতে সকল দেশহিতৈষী ব্যক্তির সে বিষয়ে যত্নবান হওয়া উচিত।

পরলোকে চন্দ্রমুখী বসু—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা গ্র্যাজুয়েট চন্দ্রমুখী বসু গত ২রা ফেব্রুয়ারী ৮৩ বৎসর বয়সে ডেরাডুনে পরলোকগমন করিয়াছেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার মহানাদ গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি রেভারেণ্ড ভুবনমোহন বসুর কন্যা। ১৮৮৪ সালে তিনি এম-এ পাশ করেন ও পরে বেথুন কলেজের প্রথম ভারতীয় প্রিন্সিপাল হন। অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি ডেরাডুনে বাস করিতেন।

কারারুদ্ধ এম-এল-এ—

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের ৯ জন সদস্যকে বিনাবিচারে কারারুদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। তাঁহারা পরিষদের সভায় উপস্থিত হইতে না পারায় যে সকল কেন্দ্র হইতে তাঁহারা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, সেই সকল কেন্দ্রের লোকদিগকে অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। গভর্ণমেণ্ট যদি পুলিশ প্রহরী সঙ্গে দিয়া তাঁহাদিগকে পরিষদে উপস্থিত হইবার সুযোগ দেন, তাহা হইলেও জনসাধারণ উপকৃত হইতে পারে।

বেআইনি প্রতিষ্ঠান—

বাঙ্গালা দেশে নিখিল ভারত কাটুনী সংঘ, খাদি প্রতিষ্ঠান, অভয় আশ্রম প্রভৃতি নামীয় ১৭টি প্রতিষ্ঠান গত দেড় বৎসর কাল বেআইনি ঘোষিত হওয়ায় তাহাদের ব্যবসায়ের লক্ষাধিক টাকার মাল বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বাজেয়াপ্ত হইয়া আছে। এই লক্ষাধিক টাকার বস্ত্র বা খাদ্য বাঙ্গালার এই দুর্দিনে জনসাধারণকে প্রদান করা হইলে বহু লোক উপকৃত হইত। সে দিক দিয়াও কর্ত্তৃপক্ষ কেন জিনিষগুলির সদ্ব্যবহার করেন নাই, তাহাই বিস্ময়ের বিষয়।

রাজবন্দী ও দুর্ভিক্ষে সাহায্য—

১৯৪৩ সালের ৩০ আগষ্ট প্রেসিডেন্সি জেলের ৩০ জন রাজবন্দী বাঙ্গালার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে এক পত্র দিয়া জানাইয়াছিলেন, দুর্ভিক্ষ সাহায্যে গভর্ণমেণ্টের সহিত একযোগে কাজ করিবার জন্য তাঁহারা মুক্তি চাহেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁহাদিগকে মুক্তি দান করেন নাই। ইহাই সরকারী মনোভাব?

সংবাদপত্রের বিপদ—

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে প্রশ্নোত্তরে জানান হইয়াছে যে সম্প্রতি ১৬ খানি দৈনিক, সাপ্তাহিক ও সাময়িক পত্রিকা ও ছাপাখানার বিরুদ্ধে সরকার শাস্তির ব্যবস্থা করেন। তাহাদের নাম—অভিযুক্ত করা হইয়াছে (১) আনন্দবাজার পত্রিকা (২) ভারত (৩) বসুমতী, দৈনিক (৪) নবযুগ (৫) শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস (৬) বিশ্বামিত্র। জামানত তলব—(১) জয়শ্রী। মুদ্রণের পূর্ব্বে সেন্সার—(১) অমৃতবাজার পত্রিকা (২) ইত্তেহাদ (৩) শক্তি প্রেস (৪) বীর ভারত। জামানত দাবী—(১) আজাদ (২) মহম্মোদী প্রেস (৩) নিউ সারদা প্রেস। প্রকাশ বন্ধের আদেশ—(১) আজাদ (২) বসুমতী, দৈনিক (৩) নবযুগ (৪) ষ্টার অফ ইণ্ডিয়া।

বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে সাধারণভাবেই সংবাদপত্রসমূহের অসুবিধার অন্ত নাই। তাহার উপর সরকারী বিধিনিষেধ সকল ত আছেই।

পরলোকে শিশুরাজ মহেন্দ্রজী—

ফরিদপুরস্থ প্রভু জগবন্ধু অঙ্গনের সেবাইত ও মহানাম সম্প্রদায়ের আচার্য্য শিশুরাজ মহেন্দ্রজী গত ২৩শে মাঘ ইহলোক



শিশুরাজ মাহেন্দ্রজী

ত্যাগ করিয়াছেন। বাল্যকালে ডায়মণ্ডহারবারে থাকিয়া বিদ্যা-শিক্ষার সময় তিনি ব্রাহ্মনেতা উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের দ্বারা ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত হন ও ২০ বৎসর বয়সে সংসার ত্যাগ করেন। পরে বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থান ঘুরিয়া ফরিদপুরে যান ও তথায় গত ২০ বৎসরেরও অধিককাল অবিচ্ছিন্ন নাম-কীর্ত্তন করিতেন ও অঙ্গনের বাহির হইতেন না।

পরলোকে সরোজিনী ঘোষ—

প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত সরোজনাথ ঘোষ মহাশয়ের পত্নী শ্রীমতী সরোজিনী ঘোষ সম্প্রতি ৬৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন



সরোজিনী ঘোষ

করিয়াছেন। তিনি অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন এবং নানা সাংসারিক শোকেও কর্ত্তব্য সাধনে রত ছিলেন।

পরলোকে মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—

বাঙ্গালা দেশের স্বনামখ্যাত ব্যবসায়ী মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় গত ১০ই ফেব্রুয়ারী ৮৬ বৎসর বয়সে কাশীধামে পরলোকগমন করিয়াছেন। ত্রিপুরা জেলার বীটঘর গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি কুমিল্লায় অপরের বাড়ী রান্না করিয়া বিদ্যাশিক্ষা করেন। ৬২ বৎসর পূর্ব্বে তিনি কলিকাতায় আসিয়া দোকানে চাকরী আরম্ভ করেন ও পরে নিজে হোমিওপ্যাথিক ঔষধের দোকান করেন। জীবনে তিনি যেমন প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন, তেমনি অকাতরে অর্থ দান করিয়াছেন। কত প্রকারে যে তিনি সদনুষ্ঠানে সাহায্য করিতেন, তাহার



মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

হিসাব নাই। ব্যবসায়ে সাফল্যের জন্য যেমন, তাঁহার পরদুঃখ কাতরতার জন্যও তেমনই বাঙ্গালী জাতি চিরদিন তাঁহার নাম শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিবে।

ভারতে খাদ্যাভাবের জন্য দায়ী—

মিঃ পি-জে-গ্রিফিথস্ ভারতে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য ছিলেন। তিনি বিলাতে যাইয়া গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী লণ্ডনে ইষ্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েসনের এক সভায় বলিয়াছেন—ভারতে খাদ্যাভাবের জন্য কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট ও বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টই সম্পূর্ণ দায়ী। তিনি বলিয়াছেন—যে সকল ব্যবসায়ী সামরিক বিভাগে কাজ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে বাঙ্গালার শাসন কার্য্যে নিযুক্ত করা হইলে ভবিষ্যতে এইরূপ ঘটনা ঘটিবে না। কর্ত্তৃপক্ষ যাহার উপরই দোষারোপ করুন না কেন, তাঁহারা উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে বাঙ্গালায় এই দারুণ দুরবস্থা উপস্থিত হইত না।

পরলোকে কস্তুরীবাঈ গান্ধী—

বর্ত্তমান জগতের শ্রেষ্ঠ মানব মহাত্মা গান্ধীর পত্নী এবং সকল কার্য্যে তাঁহার সহকর্ম্মী শ্রীযুক্তা কস্তুরীবাঈ গান্ধী গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী বন্দী অবস্থায় পুনার আগা খাঁ প্রাসাদে দেহত্যাগ



কস্তুরীবাঈ গান্ধী

করিয়াছেন। তিনি মহাত্মাজীর প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন এবং ৬৩ বৎসর বিবাহিত জীবনযাপন করিয়া গিয়াছেন। মহাত্মাজীর সকল দুর্দ্দিনে তিনি তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার কার্য্যে উৎসাহ ও সাহায্য দান কস্তুরীবাঈ জীবনের ধর্ম্ম হিসাবেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। জীবনে বহুবার তাঁহাকে কারাগারে যাইতে হইয়াছিল এবং কারারুদ্ধ অবস্থাতেই তাঁহাকে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে হইয়াছে। তাঁহার এইভাবে মৃত্যু সমগ্র ভারতবাসীর বন্ধন দশার কথাই সর্ব্বদা আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে। মহাত্মাজীর পক্ষে এই শোক কিরূপ কষ্টদায়ক, তাহা বলিবার নহে। আমরা এই দুর্দ্দিনে মহাত্মাজীর দীর্ঘ ও সুস্থ জীবন কামনা করিতেছি।

বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের অর্থাভাব—

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে প্রশ্নোত্তরকালে অর্থসচিব শ্রীযুত তুলসীচন্দ্র গোস্বামী জানাইয়াছেন যে—১৯৪৩ সালের অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট ভারতগভর্ণমেণ্টের নিকট ঋণ ও আগাম বাবদে ১৭ কোটী ৬৭ লক্ষ ২১ হাজার টাকা লইয়াছেন। তন্মধ্যে ঋণের পরিমাণ ১৪ কোটি ৬৬ লক্ষ ২১ হাজার টাকা। এই অবস্থার সহজে শেষ হইবে না। ভারতগভর্ণমেণ্টকে আরও কত টাকা ঋণ দিতে হইবে কে জানে?

ভারতীয় সমস্যার মীমাংসা—

ভারতীয় শাসনতান্ত্রিক সমস্যার মীমাংসার জন্য নাকি বিলাতে আবার একদল লোক তৎপর হইয়াছেন। এইরূপ সর্ত্তে মীমাংসার কথা উঠিয়াছে—(১) ভারত সরকার যদি বুঝিতে পারেন যে কংগ্রেস যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সম্পূর্ণরূপে সহযোগিতা করিবেন, তাহা হইলে নেতৃবর্গকে মুক্তিদানের পূর্ব্বে আগষ্ট প্রস্তাব প্রত্যাহার করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করা হইবে না। (২) সকল দল কর্ত্তৃক সমর্থিত গঠনতন্ত্রের ভিত্তিতে যুদ্ধের পর ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দান করা হইবে বলিয়া বৃটীশ পক্ষ হইতে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইবে, ভারতীয়গণ তাহা মানিয়া লইবেন। (৩) যুদ্ধের সমসাময়িকভাবে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠন করা হইবে। এই গভর্ণমেণ্ট বড়লাটের নিকট দায়ী থাকিবেন। এতদ্ব্যতীত প্রদেশগুলিতে জনসাধারণ কর্ত্তৃক সমর্থিত মন্ত্রিসভাসমূহ পুনপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।—ভারতের প্রতিনিধি মহাত্মা গান্ধী যতদিন মুক্তি না পাইবেন, ততদিন এ সকল সর্ত্তের কথা বলিবেন কে?

নূতন ডি-এস্-সি ও পি-এইচ্-ডি—

গত ২২শে জানুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য নির্ব্বাহক পরিষদের সভায় শ্রীযুক্ত এল্-কে-দেকে ডক্টর অব সায়েন্স ও শ্রীযুক্ত শশাঙ্কশেখর ভট্টাচার্য্যকে পি-এইচ্-ডি উপাধি দানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত দে ভাইটামিন সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করিয়া এই উপাধি লাভ করিলেন।

ডাক্তার ভাগবতুল্লা বিশ্বনাথ—

দিল্লীতে যে ইম্পিরিয়াল এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনিষ্টিটিউট আছে তাহার প্রথম ভারতীয় ডিরেক্টার ছিলেন রাও বাহাদুর ডাক্তার ভাগবতুল্লা বিশ্বনাথ। কৃষি রসায়ন ও মৃত্তিকাতত্ত্বে



ডাঃ ভগবতুল্লা বিশ্বনাথ

তাঁহার ন্যায় বিশেষজ্ঞ ভারতে আর কেহ নাই। তাঁহার চেষ্টায় ভারতের কৃষি বিভাগের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে। গত

৩১শে জানুয়ারী তিনি নিজ কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন ও আগামী ১লা এপ্রিল হইতে মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্টের কৃষি বিভাগের ভার গ্রহণ করিবেন।

শ্রীযুক্ত ভূপেশচন্দ্র দত্ত—

গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্পোর্টসে ঢাকা হলের এম-এসসি দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র শ্রীযুক্ত ভূপেশচন্দ্র



শ্রীভূপেশচন্দ্র দত্ত

দত্ত চ্যাম্পিয়ন হইয়াছেন। তিনি লেখা পড়াতেও যেমন, খেলাতেও তেমনই সুদক্ষ। ইহার পূর্ব্বেও তিনি একবার ঢাকা হলের স্পোর্টসে চ্যাম্পিয়ন হইয়াছিলেন।

রেলের ভাড়া বৃদ্ধি—

গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী দিল্লীতে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদ রেলের বাজেট উপস্থিত করিতে যাইয়া ভারপ্রাপ্ত সদস্য জানাইয়াছেন যে রেলের ব্যয় অপেক্ষা আয় এই তিন বৎসরের নিম্নলিখিতভাবে বেশী হইয়াছে—১৯৪২-৪৩ সালে ৪৫ কোটি ৭ লক্ষ, ১৯৪৩-৪৪ সালে ৪৩ কোটি ৭৭ লক্ষ এবং ১৯৪৪-৪৫ সালে ৫২ কোটি ২১ লক্ষ। সহরতলীর সিজন টিকিট ছাড়া আর সকল রেল-টিকিটের দাম শতকরা ২৫ টাকা বাড়ান হইবে। তাহার ফলে রেলের আয় যে ১০ কোটি টাকা বাড়িবে, তাহা অন্য কোন বাবদে খরচ না করিয়া নিম্নশ্রেণীর যাত্রীদের সুখ-সুবিধা বিধানের জন্য ব্যয় করা হইবে। এক সময়ে রেল কোম্পানীগুলি আয় বাড়াইবার জন্য যাত্রীর সংখ্যাবৃদ্ধির চেষ্টা করিত। এখন তাহার বিপরীত চেষ্টা করা সত্ত্বেও রেলের আয় ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ভাড়া বাড়াইয়া যে কেন দরিদ্র করদাতাদের বিপন্ন করা হইল তাহা বুঝা কঠিন। বর্ত্তমান অবস্থায় বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত কেহ রেলে গমনাগমন করে না। তাহা জানিয়াও কর্ত্তৃপক্ষের এই ভাড়া বৃদ্ধির হেতু বুঝা কঠিন।

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন—

দোল পূর্ণিমার সময় ইং ৯ই এবং ১০ই মার্চ্চ নয়া দিল্লীতে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের একবিংশতিতম বার্ষিক অধিবেশন হইবে। মূল অধিবেশন ব্যতীত সাহিত্য, দর্শন, সঙ্গীত, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও "প্রবাসী বাঙ্গালী" এই ছয়টি শাখার অধিবেশনও হইবে। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার মূল-সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন এবং যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন কালে বাঙ্গালীর কি পথ সে সম্বন্ধে তাঁহার অভিভাষণ হইবে। প্রবীণ সাহিত্যরথী শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু (পরশুরাম) সাহিত্যশাখার সভাপতি হইবেন এবং তাঁহার অভিভাষণের বিষয় "সংকেতময় সাহিত্য।" শান্তিনিকেতন হইতে আচার্য্য শ্রীক্ষিতিমোহন সেন দর্শন-শাখার সভাপতিত্ব করিবেন এবং সম্ভবত বিশ্বমানবতার দর্শন শাস্ত্রে ভারতবর্ষের বাণী সম্বন্ধে অভিভাষণ দিবেন। বিজ্ঞান ও ইতিহাস শাখার সভাপতিরূপে যথাক্রমে ডক্টর শ্রীযুক্ত নীলরতন ধর ও শ্রীযুক্ত বিজনরাজ চট্টোপাধ্যায় যাইবেন। এবারকার সম্মেলনের বিশেষত্ব এই যে বর্ত্তমান পরিস্থিতি ও রেলপথে ভ্রমণের ব্যাঘাত সত্ত্বেও যেরূপ সুসাহিত্যিক সমাগম হইবে তাহা ইতিপূর্ব্বে এক কলিকাতা ছাড়া সম্মেলনের অন্য কোন অধিবেশনে হয় নাই। বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখকগণ অনেকেই যাইতেছেন। যদি কেহ কোন ক্রমে না যাইতে পারেন, প্রবন্ধ পাঠাইবেন বলিয়া আশা করা যায়। সাহিত্য গৌরবে এবার সম্মেলন বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হইবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। এতদ্ব্যতীত বহু বাঙ্গালী মনীষীর নিকট বিশেষ বিশেষ বিষয়ে প্রবন্ধের জন্য আমন্ত্রণ গিয়াছে। এইভাবে ডক্টর মেঘনাদ সাহা, হেমেন্দ্রকুমার সেন, বিমানবিহারী দে, সরোজেন্দ্রনাথ রায়, ধূর্জ্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য



প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের দিল্লী অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির কর্ম্মীরা

উপবিষ্ট—রায় বাহাদুর দ্বিজেন মৈত্র, মোহিত সেনগুপ্ত, শ্রীমতী কমলাদাস, রায় বাহাদুর অমৃত বন্দ্যোপাধ্যায়

দণ্ডায়মান—নীহার ঘোষ, শচীন বসু, প্রিয়রঞ্জন সেন, মণি মৈত্র, গগন সাহা, মহিম ভট্টাচার্য্য

প্রভৃতি মনীষীদিগের নিকট তাঁহাদের বিশেষ বিষয় সম্বন্ধে প্রবন্ধ আশা করা যাইতেছে।



জব্বলপুরে সরস্বতী পুজা—১৩৫০

জব্বলপুরে সারস্বত উৎসব—

জব্বলপুর প্রবাসী বাঙ্গালী সমিতির উদ্যোগে গত ১৬ই মাঘ তথায় দেবেন্দ্র বেঙ্গলী ক্লাবে সারস্বত উৎসব হইয়া গিয়াছে। ঐ দিন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ সুর পরিচালিত 'ছোটদের আসর'এ শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বক্সী রচিত ও পরিচালিত নৃত্যগীতসমন্বিত 'কল্পনা' নাটিকার অভিনয় ও তাঁহার ছাত্রী কুমারী শুভা বন্দ্যোপাধ্যায় ও গীতা মণ্ডলের রাধাকৃষ্ণ নৃত্য সকলের মনোরঞ্জন করিয়াছিল। শ্রীযুত সুশান্ত এন্দ, শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার দে প্রভৃতি কর্ম্মীদিগের এই প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়।

পরলোকে শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ল্যাড্‌কো (লিষ্টার এন্টিসেপ্‌টিক এণ্ড ড্রেসিং কোং লিঃ) প্রতিষ্ঠানের পরিচালক বোর্ডের চেয়ারম্যান শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় গত ৮ই ফেব্রুয়ারী মাত্র ৬৩ বৎসর



শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

বয়সে শ্রীরামপুরে নিজ বাটীতে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি প্রথম জীবন হইতে ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন এবং পরবর্ত্তীকালে ল্যাড্‌কো প্রতিষ্ঠান ক্রয় করিয়া উহাকে সাফল্য মণ্ডিত করেন। তাঁহার বহু গুণ ছিল এবং সেই জন্যই সামান্য অবস্থা হইতে তিনি বিরাট ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ল্যাড্‌কোর সার্জ্জিকাল ড্রেসিং, ফিনাইল, টিংচার্স, সিরাম, ভ্যাকসিন্ প্রভৃতি ছাড়াও নানাবিধ প্রসাধন দ্রব্য এখন সর্ব্বজন-সমাদৃত হইয়াছে।

পরলোকে ব্যারিষ্টার শৈলেন্দ্রনাথ—

কলিকাতা হাইকোর্টের খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার, বাঙ্গালার হিন্দু সংগঠন আন্দোলনের নেতা এস-এন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়



শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

গত ৪ঠা মার্চ্চ শনিবার কলিকাতায় ৬১ বৎসর বয়সে পরলোক-গমন করিয়াছেন। তাঁহার পিতা স্বর্গত মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দার্জ্জিলিং-এর সরকারী উকীল ছিলেন। ১৯০৬ সালে ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া আসিয়া তিনি ঐ ব্যবসায়ে অসাধারণ সাফল্য ও প্রভূত অর্থ লাভ করেন। প্রথম হইতেই খেলাধূলায় তাঁহার আগ্রহ ছিল এবং গত কয়েক বৎসর তিনি হিন্দু মহাসভা আন্দোলনে সম্পূর্ণভাবে যোগদান করিয়াছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশনের সহিতও তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। তিনি কলিকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ছিলেন এবং মানুষ হিসাবে খুবই জনপ্রিয় ছিলেন।

বোম্বায়ে বাণী অর্চ্চনা—

গত ১৬ই মাঘ বোম্বাই প্রবাসী বাঙ্গালীগণের উদ্যোগে বোম্বাই হর্ণবী রোডস্থ বেঙ্গল লজে সমারোহের সহিত বাণী-অর্চ্চনা হইয়া গিয়াছে। ঐ দিন শ্রীযুক্ত উমাপদ চট্টোপাধ্যায়ের পৌরহিত্যে তথায় একটি সঙ্গীত-আসর হইয়াছিল এবং লজের শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ চন্দ সকলকে প্রীতিভোজে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন।



বোম্বায়ে সরস্বতী পূজা—১৩৫০

পরলোকে প্রভাবতী দাশ—

প্রসিদ্ধ লেখক, জলপাইগুড়ীর মুন্সেফ্ শ্রীযুক্ত মতিলাল দাশ মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী প্রভাবতী দাশ গত ২রা ফাল্গুন মাত্র ৩০ বৎসর বয়সে ৬টি শিশুপুত্রকন্যা ও স্বামীকে রাখিয়া পরলোকগমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা ব্যথিত হইলাম। তিনি তাঁহার স্বামীর সাহিত্য সাধনায় সাহায্য করিতেন এবং মতিবাবু যে ধারাবাহিক বেদের পদ্যানুবাদ রচনা করিতেছেন, প্রভাবতী তাহার প্রকাশক ছিলেন। আমরা মতিবাবুর এই শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করি।

শিক্ষকদের সাহায্য ব্যবস্থা—

বাঙ্গালার বর্ত্তমান আর্থিক দুর্গতির দিনে বাঙ্গালার শিক্ষকগণ যত অধিক কষ্ট ভোগ করিয়াছেন, তত অধিক কষ্ট আর কাহাকেও ভোগ করিতে হয় নাই। প্রকাশ, বাঙ্গালার গভর্ণমেণ্ট দুস্থ শিক্ষকগণের সাহায্যের জন্য ৫০ লক্ষ টাকার এক পরিকল্পনা স্থির করিয়াছেন। ঐ টাকায় উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের ১৫ হাজার শিক্ষক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩৫ হাজার শিক্ষক সাহায্য পাইবেন। যত শীঘ্র এই সাহায্য দানের ব্যবস্থা হয়, ততই মঙ্গলের কথা।

মন-মন্দির

শ্রীরাণু সাঁতরা সাহিত্য-প্রভা

মন্দির-দ্বার রুদ্ধ যে আজি বুঝি অচেতন সব
ঘণ্টার ধ্বনি বাজেনা নাহি মানুষের রব!
দেব-পদতলে পুষ্পের মাঝে কত শত জঞ্জাল
ভক্তজনার সমারোহ নাই—আছে শুধু কঙ্কাল!

পঞ্চ-প্রদীপে দীপ-শিখা নাই সেথায় আঁধার ভরা
দেবতারে তাই, না পাই দেখিতে নয়ন মুগ্ধ করা।
মন্দিরও যেন ক্লান্ত কণ্ঠে আশ্রয় মাগে আজ;
নাহিক দেবতা—দেবালয়ে তাই ফুরায়েছে সব কাজ।

খেলা ধুলা



শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়



৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

রঞ্জি ক্রিকেট ঃ

বাঙ্গলা ঃ ২৩৫ ও ২৬৬

মাদ্রাজ ঃ ১০২ ও ২৬৫

রঞ্জি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার সেমি ফাইনালে বাঙ্গলা দল ১৩৪ রানে দক্ষিণাঞ্চলের ফাইনাল বিজয়ী মাদ্রাজ দলকে পরাজিত ক'রে প্রতিযোগিতার ফাইনালে উঠেছে। বাঙ্গলা দল টসে জয়লাভ ক'রে ব্যাট করতে পাঠালো জব্বর এবং অসিত চ্যাটার্জিকে। আরম্ভ মোটেই ভাল হ'ল না। কোন রান হবার আগেই চ্যাটার্জি আউট হ'লেন। দেখতে দেখতে বাঙ্গলার চারটে উইকেট পড়ে গেল মাত্র ৩১ রানে। পি সেন ৯, নির্ম্মল চ্যাটার্জি ৪ এবং ধ্রুব দাস ২ রান ক'রে আউট হলেন। দলের এই দারুণ ভাঙ্গনের মুখে কে ভট্টাচার্য্য জব্বরের জুটী হয়ে খেলার অবস্থা একেবারে ফিরিয়ে দিলেন। লাঞ্চের সময় ৪ উইকেটে দলের রান উঠল ৭১। জব্বর ৪০ এবং ভট্টাচার্য্য ২২। খেলা আরম্ভের কিছু পরই বাঙ্গলার ৫০ রান পূর্ণ হ'ল ১২৫ মিনিটে। জব্বর ৫০ রান পূর্ণ করলেন লাঞ্চের পর আরও আধ ঘণ্টা ব্যাট করে। ভট্টাচার্য্য ৮৮ মিনিট খেলে নিজস্ব ৫০ রান করলেন। রামসিংয়ের বল পিটিয়ে ভট্টাচার্য্য দলের খেলা অনেকখানি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনলেন। ১৬০ মিনিটে দলের ১৫০ রান উঠল। শেষ ৫০ রান উঠল ৩৫ মিনিটে। দলের ১৫২ রানে রঙ্গচারী ভট্টাচার্য্যের উইকেট পেলেন। ভট্টাচার্য্য নির্ভীকভাবে ৬১ রান ক'রে আউট হলেন। তাঁর ৮টা বাউণ্ডারী ছিল।

জব্বর এবং মুস্তাফির জুটী ১৭৩ রান তুললে পর রামসিংয়ের বলে প্রাণকুসুম মুস্তাফিকে কভার পয়েণ্টে ধরে ফেললেন। মহারাজা জব্বরের জুটী হ'লেন। জব্বর ১৭৫ মিনিট খেলে ৮০ রান তুলে রঙ্গচারীর বলে শ্রীনিবাসনের হাতে আটকালেন। জব্বর খুব ধীরভাবে খেলেছিলেন এবং এ ছাড়া পূর্ব্বে আউট হবার কোন সুযোগ দেন নি। দলের ১৮৫ রানে জব্বর আউট হ'লে এম সেন মহারাজার জুটী হ'লেন। চায়ের সময় ২২০ মিনিট খেলে বাঙ্গলা দল ২০০ রান পূর্ণ করলো। বাঙ্গলার পরবর্ত্তী তিনটে উইকেট রামসিং নিলেন। ২৫৫ মিনিট খেলে বাঙ্গলা দলের প্রথম ইনিংস শেষ হ'ল ২৩৫ রানে। রামসিং ৩৬ ওভার বলে ১৫৪ রান দিয়ে ৭টা উইকেট পেলেন।

মাদ্রাজ দল তাদের প্রথম ইনিংস আরম্ভ করলো। নির্দ্দিষ্ট সময়ে ষ্ট্যাম্প তুলে নেবার পর দেখা গেল মাদ্রাজ দলের ২ উইকেটে ১৪ রান উঠেছে।

দ্বিতীয় দিনে মাদ্রাজ দলের নট আউট ব্যাট ভাদ্রী এবং শ্রীনিবাসন খেলতে নামলেন। দলের ৩১ রানে ভাদ্রী ২৩ রান করে আউট হলেন। ৪র্থ উইকেট ৫৬ রানে এবং ৫ম উইকেট ৭১ রানে পড়ে গেল লাঞ্চের সঙ্গে সঙ্গে। লাঞ্চের পর মাদ্রাজ দলের দারুণ ভাঙ্গন দেখা গেল। ৯২ রানে ৬ষ্ঠ উইকেট, ৯৫ রানে ৭ম উইকেট, ৯৬ রানে ৮ম, ১০২ রানে ৯ম এবং ১০ম উইকেট পড়ে গেলে মাদ্রাজ দলের প্রথম ইনিংস শেষ হয়ে গেল। রামসিং দলের সর্ব্বোচ্চ ৩৬ রান করলেন। এস ব্যানার্জি ২৭ রানে ৫টা এবং বিমল মিত্র ২৩ রানে ৩টে উইকেট পেলেন। এম সেন এবং কে ভট্টাচার্য্যও একটা করে উইকেট নিলেন।

প্রথম ইনিংসের ১৩৩ রানে অগ্রগামী থেকে বাঙ্গলা দলের জব্বর এবং অসিত চ্যাটার্জি দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করলেন। উভয়েই খুব ধীরে এবং সতর্কতার সঙ্গে খেলতে লাগলেন। দলের ৪০ রানে রামসিংয়ের বলে জব্বর ২৩ রান ক'রে রঙ্গচারীর হাতে ধরা পড়লেন। ধ্রুবদাস এসে চ্যাটার্জির জুটী হলেন। দলের ৭৩ রানে ধ্রুবদাস ২৩ রান করে আউট হলেন রঙ্গচারীর বলে। ধ্রুবদাস কয়েকটি দর্শনীয় ষ্ট্রোক মেরে উইকেটে খেলেছিলেন। নির্ম্মল চ্যাটার্জি এসে তার ভাই অসিত চ্যাটার্জির জুটী হ'লেন। উভয়েই রঙ্গচারীর বলে সতর্ক হয়ে খেলছিলেন। ১৪০ মিনিট খেলে অসিত নিজস্ব ৫০ রান পূর্ণ করলেন। নির্ম্মলের রানও দ্রুত উঠতে লাগল। দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে বাঙ্গলা দলের ২ উইকেটে রান উঠল ১৪৭। নির্ম্মল এবং অসিত চ্যাটার্জি যথাক্রমে ৪৯ এবং ৫১ রান ক'রে নট আউট রইলেন।

তৃতীয় দিনে পূর্ব্ব দিনের 'নট আউট' নির্ম্মল ও অসিত চ্যাটার্জি খেলতে নামলেন। দর্শকেরা করতালি দিয়ে তাঁদের শুভেচ্ছা জানালেন। রান খুব ধীরে উঠতে লাগলো। দলের ১৬১ রানে অসিত চ্যাটার্জি ৫৩ রান করে শ্রীনিবাসনের বলে আউট হলেন। এম সেন চ্যাটার্জির জুটী হলেন। নির্ম্মলের ৫৮ রানে গোপালন তাঁকে ধরতে পারলেন না। এরপর রামসিংয়ের বল জোরে মেরে কাসনের হাতে নির্ম্মল একটা ভারী 'ক্যাচ' তুললেন। রামসিংয়ের দুর্ভাগ্য যে, সৌভাগ্যক্রমে এবারও নির্ম্মল বেঁচে গেলেন। ২০৫ মিনিটে দলের ২০০ রান পূর্ণ হ'ল। কিন্তু ২০৩ রানে ৪র্থ উইকেট পড়ল; এম সেন ২০ রান ক'রে রামসিংয়ের বলে আউট হলে পর পি সেন নামলেন কিন্তু

রামসিংয়ের পরবর্ত্তী বলের সম্মুখীন হ'তে গিয়েই দলের ঐ রানেতেই সিডনীর হাতে ধরা দিলেন। নির্ম্মল চ্যাটার্জির সঙ্গে মুস্তাফি জুটী হলে উভয়েই বেশ চমৎকার খেলতে লাগলেন। রঙ্গচারীর বলে বাউণ্ডারী করে নির্ম্মল চ্যাটার্জি নিজস্ব শতরান পূর্ণ করলেন। কিন্তু দলের ২৭১ রানে রঙ্গচারীর বলেই 'এল-বি-ডবলউ' হয়ে আউট হলেন ১১২ রান ক'রে। মুস্তাফি কোন রান না ক'রে রামসিংয়ের বলে 'এল-বি-ডবলউ' হলেন এবং কে ভট্টাচার্য্য রান-আউট হলেন ২ রান করে। লাঞ্চের সময় ৮ উইকেটে ২৫৮ রান উঠল। মহারাজা এবং এস ব্যানার্জি লাঞ্চের পর খেলতে লাগলেন। ১০ রানে ব্যানার্জি আউট হ'লে শেষ খেলোয়াড় বি মিত্র এলেন। দলের খেলা শেষ হল ২৬৬ রানে। মহারাজা ১২ রান করে নট আউট রইলেন।

রামসিং এবারও বোলিংয়ে কৃতিত্ব দেখালেন ৯০ রানে ৭টা উইকেট নিয়ে। রঙ্গচারী পেলেন ২ উইকেট।

বেলা ২-১০ মিনিটে মাদ্রাজ দল তাদের দ্বিতীয় ইনিংস আরম্ভ করলো ৩৯৯ রান পিছনে পড়ে। দিনের শেষে ৫ উইকেটে মাদ্রাজের রান উঠল ১৮৩। কৃষ্ণস্বামী, ভাদ্রী উভয়েই ৩২ রান করলেন। গোপাল ১৪ এবং রামসিং ১৩ রান ক'রে আউট হ'লেন। রিচার্ডসন এবং ক্যাপটেন গোপালন যথাক্রমে ৩২ এবং ৪২ করে নট আউট রইলেন। কে ভট্টাচার্য্য ৪টে উইকেট পেলেন।

চতুর্থ দিনের খেলা আরম্ভ হ'ল। রিচার্ডসন এবং গোপালন দৃঢ়তার সঙ্গে খেলতে লাগলেন। তাঁরা একটা অসাধ্য কিছু করবেন এমন ধারণাও দর্শকদের মধ্যে দৃঢ় হয়ে উঠল। ক্রিকেট খেলায় নাটকীয় ঘটনা নূতন নয়, সকলেরই মন চঞ্চল হয়ে উঠল সেই কথা ভেবে। দলের ২০০ পূর্ণ হ'ল ১৯৫ মিনিট খেলার পর। গোপালন প্রথমে নিজস্ব ৫০ রান পূর্ণ করলেন ৭০ মিনিটে। রিচার্ডসন কিন্তু ৫০ রান তুলতে ১০৭ মিনিট সময় নিলেন। রান বেশ ধীর গতিতে দৃঢ়তার সঙ্গে উঠতে লাগল কিন্তু ২৪৭ রানে রিচার্ডসন কে ভট্টাচার্য্যের বল পিটতে গিয়ে বি মিত্রের হাতে ধরা দিলেন ৬২ রান করে। রিচার্ডসনের বিদায়ে দলের আশা ভরসা আর রইল না। রিচার্ডসনের বিদায়ের পর দলের মোট রানে আর ৪ রান যোগ হ'লে পর গোপালন ৭৬ রান ক'রে এস ব্যানার্জির বলে আউট হলেন। তাঁর রানে ১১টা চার' ছিল। ২৫১ রানে ৭টা উইকেট পড়ে গেল, হাতে আর মাত্র তুটো। তার মধ্যে তু'টো চমৎকার ক্যাচ নিয়ে মুস্তাফি তুজনকে আউট করলেন। মাদ্রাজের দ্বিতীয় ইনিংসে মুস্তাফী সর্ব্বসমেত ৪টা 'ক্যাচ' লুফলেন। কে ভট্টাচার্য্য বোলিংয়ে কৃতিত্ব দেখালেন ৮৩ রানে ৭টা উইকেট নিয়ে। মাদ্রাজ দলের দ্বিতীয় ইনিংস ২৬৫ রানে শেষ হ'য়ে বাঙ্গলা ১৩৪ রানে বিজয়ী হ'ল।

বাঙ্গলা এবং মাদ্রাজ দলের সেমি-ফাইনাল খেলাটি খুব উচ্চাঙ্গের হয় নি। এই খেলাতে উভয় দলের বোলারদের বেশী প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল। বাঙ্গলার নির্ম্মল চ্যাটার্জি ছাড়া ব্যাটিংয়ে কেউ নিজের সুনাম অনুযায়ী চলতে পারেন নি। অবশ্য জব্বর, গোপালন এবং রিচার্ডসনের নাম করা যায় নির্ম্মলের পর। মাদ্রাজের দ্বিতীয় ইনিংসে গোপালন এবং রিচার্ডসনের জুটীতে ১৩০ রান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শোচনীয় পরাজয়ের মুখে তাঁদের খেলায় দৃঢ়তা দর্শকদের বিশেষ চঞ্চল করে তুলেছিল। এ পর্য্যন্ত রঞ্জিক্রিকেট প্রতিযোগিতার সেমিফাইনালে বাঙ্গলা দল তিনবার মাদ্রাজ দলের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। ১৯৩৫-৩৬ সালে সর্ব্বপ্রথম খেলে বাঙ্গলা মাদ্রাজের কাছে পরাজিত হয়। ১৯৩৮-৩৯ সালে দ্বিতীয়বার মিলিত হয়ে মাদ্রাজকে শোচনীয় ভাবে এক ইনিংস ২৮৫ রানে পরাজিত করে।

নিখিল ভারত অলিম্পিক স্পোর্টস ঃ

নিখিল ভারত অলিম্পিক স্পোর্টসের একাদশ বাৎসরিক অনুষ্ঠান পাতিয়ালায় সুসম্পন্ন হয়েছে। পাতিয়ালার প্রতিযোগীরা ১২৯ পয়েন্টে প্রথম স্থান পেয়ে সার দোরাবজী টাটা কাপ পায়। বোম্বাই ৩৯ পয়েন্টে দ্বিতীয় এবং পাঞ্জাব ৩০ পয়েন্টে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। বাঙ্গলা দেশের প্রতিনিধিরা বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নি। একমাত্র ৫০০০ মিটার ভ্রমণে এবং ভারোত্তোলনে বাঙ্গলা দেশ প্রথম স্থান অধিকার করে। অন্য সকল বিষয়ের মত আমাদের দেশের ছেলেরা যে খেলাধূলাতেও শোচনীয় ভাবে পিছনে হোটে আসছে তার পরিচয় আমরা গত কয়েক বছরে পেয়েছি। বাঙ্গলার ক্রীড়ামহলেও দলাদলি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে—আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য অতিক্রম ক'রে আমরা আজ ব্যক্তিগত স্বার্থকে বেশী রকম প্রাধান্য দিয়েছি। এই দলাদলির পটভূমিকায় খেলাধূলার অনুশীলন ছাড়া অপর সকল রাজনীতির প্যাঁচ চলতে পারে। প্রতিযোগিতায় জয় লাভই একমাত্র মুখ্য উদ্দেশ্য নয়—এই সাধু সঙ্কল্প আমাদের এমন আদর্শ হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, বার বার পরাজয়েও লজ্জার বালাই নেই।

আলোচ্য বৎসরের বাৎসরিক স্পোর্টসে নিম্নলিখিত বিষয়ে ভারতীয় রেকর্ড স্থাপিত হয়েছে।

(১) ৩০০০ মিটার দৌড়—চাঁদসিং (পাতিয়ালা) সময় ৮ মিঃ ৪৫.৫ সেকেণ্ড।

(২) হাতাড়ী নিক্ষেপ: সাকিশা সিং (পাতিয়ালা) দূরত্ব—১৪৭ ফিট ১০ ইঞ্চি।

(৩) ১০০০ মিটার সাইকেল: (প্রথম হিটে) কর্ডার (বোম্বাই) সময় ১ মিঃ ২৪.৫ সেকেণ্ড।

(৪) ৪০০ মিটার হার্ডস: (দ্বিতীয় হিট) প্রতীন সিং (পাতিয়ালা) সময়—৫৬.২ সেকেণ্ড।

(৫) ১০০ কিলো মিটার সাইকেল: কর্ডার (বোম্বাই) সময় ৩ মিঃ ৪০ সেকেণ্ড।

(৬) ২০০ মিটার হার্ডস (দ্বিতীয় হিট): প্রতীন সিং (পাতিয়ালা) সময় ২২-১ সেকেণ্ড।

(৭) হাই জাম্প: গুরুনাম সিং (পাতিয়ালা) উচ্চতা: ৬ ফিট ২½ ইঞ্চি।

(৮) ১০০০০ মিটার সাইকেল (প্রথম হিট): আমিন (বোম্বাই) সময়—১৬ মিঃ ১০.২ সেঃ

(৯) ১৫০০ মিটার দৌড়—চাঁদ সিং (পাতিয়ালা) সময় ৪ মিঃ ৪.২ সেঃ

(১০) ১১০ মিটার হার্ডস—ভিকার্স (বোম্বাই) সময় ১৫.৬ সেকেণ্ড

ফুটবল খেলা ৪

ইতিপূর্ব্বে ফুটবল খেলার পদ্ধতি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের অভিমত ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করেছিলাম। বাঙ্গলা দেশের নানা স্থানের খেলোয়াড় এবং ক্রীড়ামোদীদের কাছ থেকে বিশেষ উৎসাহ পেয়েছিলাম তাঁদের চিঠিপত্রের মধ্যে। ফুটবল বিদেশী খেলা সুতরাং বিদেশী খেলোয়াড় এবং সমালোচকের অবলম্বিত পদ্ধতি যে বিশেষ কার্য্যকরী হবে সে সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহের অবকাশ নেই। তাঁদের বহুদিনের অভিজ্ঞতার বিবরণ আমাদের দেশের ফুটবল খেলোয়াড়দের অনুশীলনে সহায়তা করবে জেনে পুনরায় আলোচনা আরম্ভ করলাম। ক্রমশ ইহা প্রকাশ করিব।

রক্ষণভাগ ঃ

গোলকিপার, দু'জন ব্যাক এবং তিনজন হাফব্যাক মোট এই ছ'জনকে নিয়ে রক্ষণভাগ। প্রধানত এই ছ'জন খেলোয়াড়কেই বিপক্ষের আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয় বলে এদের রক্ষণভাগের খেলোয়াড় বলি। কিন্তু এদের একজনও কেবলমাত্র রক্ষণ-ভাগের কথা ভাবতে পারে না। এমন কি গোলরক্ষকও খেলার অবস্থা বুঝে লম্বা কিক্ মেরে দলের খেলোয়াড়কে বল দিয়ে আক্রমণের সূচনা করতে পারে। ব্যাক দু'জন নির্ভুল বল clear ক'রে এবং লম্বা কিক মেরে দলের হাফব্যাকদের বল দিলে হাফব্যাকরা বলগুলি দলের ফরওয়ার্ডদের সরবরাহ ক'রে তাদের আক্রমণে সহায়তা করতে পারে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে খেলায় আত্মরক্ষা এবং আক্রমণ উভয় ক্ষেত্রেই রক্ষণভাগের সমান দায়িত্ব। যে কোন একটি পন্থা বাদ দিলে খেলায় প্রাধান্যলাভ করা চলে না। রক্ষণভাগের খেলোয়াড়রা যদি দলের খেলোয়াড়দের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বল না দিয়ে কেবল বিপক্ষের আক্রমণ ব্যর্থ করতে বলগুলি ইতস্তত সর্ট করে তাহলে ফুটবল খেলায় দলের প্রাধান্য রাখা সম্ভব হবে না। রক্ষণভাগের খেলোয়াড়রা কি পদ্ধতিতে আক্রমণভাগের সঙ্গে সহযোগিতা রেখে খেলায় যোগদান করবে সে সম্বন্ধে সম্যক অভিজ্ঞতা খেলোয়াড়দের থাকা উচিত। হাফ-লাইনই রক্ষণ এবং আক্রমণভাগের সংযোগ রক্ষার প্রধান অবলম্বন। তার স্থানই সেই কারণে মাঠের মধ্যিখানে এবং তার প্রসঙ্গও সর্ব্বপ্রথম।

সেণ্টার হাফ ঃ

হাফ-লাইনের প্রধান দায়িত্ব সেণ্টার হাফের। সেণ্টার হাফের কাজ মাঠের মাঝে নিজের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রেখে বিপক্ষের আক্রমণ ব্যর্থ করা এবং সেই সঙ্গে দলের আক্রমণভাগের খেলোয়াড়দের বল সরবরাহ ক'রে আক্রমণের সূচনা করা। সেণ্টার হাফ হবে দীর্ঘাকৃতি; বিপক্ষের সঙ্গে লড়বার (tackle) যথেষ্ট ক্ষমতা তার থাকবে। খেলার প্রত্যেকটি গতিবিধি (movement) অনুধাবন করবার তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং সঙ্গে সঙ্গে দলের খেলোয়াড়দের নির্ভুল বল পাস দেবার দক্ষতা তার একান্ত প্রয়োজন। ক্ষিপ্রগতি তার খুব বেশী প্রয়োজন নেই। কিন্তু খেলার সর্ব্বক্ষণই বলের গতিবিধি অনুধাবন এবং অনুমান করে সে দক্ষতার সঙ্গে বিপক্ষের পাসগুলির সম্মুখীন হবে। সেণ্টার হাফকে কখনও কখনও 'pivot' এই নামে সম্মানিত করলে অন্যায় হবে না। সেণ্টার হাফকে কেন্দ্র করেই সমস্ত দলটি খেলছে। দলের প্রত্যেকটি খেলোয়াড়ের সঙ্গে এক সেণ্টারহাফই কেবল প্রত্যক্ষ সংযোগ রাখতে পারে। সেইহেতু তার খেলা অল্পবিস্তর দলের প্রত্যেকের খেলার উপর প্রভাব বিস্তার করে।

আক্রমণাত্মক খেলায় ঃ

বল তার নির্দিষ্ট সীমানায় প্রবেশ করলেই তার কাজ হবে বলটি নিজের আয়ত্বে এনে দলের আক্রমণভাগের খেলোয়াড়দের 'পাস' করা। আউটের দু'পাশের খেলোয়াড়কে সোজা বলটি কিক মেরে পাঠাবার পূর্ণ দক্ষতা সেণ্টার হাফের থাকা উচিত। কারণ অনেক সময়ই হয়ত একজন মাত্র খেলোয়াড় unmarked অবস্থায় থাকবে। এক্ষেত্রে নির্ভুল বল কিক করবার দক্ষতা না থাকলে এ সুযোগের সদ্ব্যবহার হবে না, খেলার মোড়ও প্রতিকূল অবস্থায় যাবে।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

সুবোধ বসু প্রণীত উপন্যাস "রাজধানী"—২৲
শ্রীশৈলেশচন্দ্র সেন প্রণীত "পনের দিনে বাঙ্গালীর হিন্দুস্থানী শিক্ষা"—১৷৹
অমিয়জীবন মুখোপাধ্যায় প্রণীত "নার্স ও নার্সিং"—২৲
শ্রীশশধর দত্ত প্রণীত রহস্যোপন্যাস "মোহন ও গুপ্ত-শাসক"—২৲
শ্রীঅতুলচন্দ্র রায় প্রণীত "ধনঞ্জয় জ্যোতিষী"—১৲
শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ প্রণীত জীবনী-গ্রন্থ "হেমলতা দেবী"—১৲
শ্রীনবেন্দুভূষণ ঘোষ প্রণীত "নায়ক ও লেখক"—১৷৹
শ্রীঅনিল চক্রবর্ত্তী প্রণীত কবিতা পুস্তক "প্রবাহ"—১৲
শ্রীঅখিল নিয়োগী প্রণীত (অভিযান সিরিজ) "নিশিপট"—৷৹
অধ্যাপক শ্রীহরিদাস চৌধুরী প্রণীত ব্যাখ্যা শ্রীঅরবিন্দের "মা"—৷৹

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ

২০৩৷১৷১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা ; ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত



শিল্পী—শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

প্রতীক্ষা

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্



বৈশাখ—১৩৫১

দ্বিতীয় খণ্ড	একত্রিংশ বর্ষ	পঞ্চম সংখ্যা

প্রাচীন ভারতের ভৌগলিক অবস্থা

ডক্টর শ্রীবিমলাচরণ লাহা এম-এ, বি-এল্, পি-এইচ্-ডি, ডি-লিট্

যে দেশকে আমরা ভারতবর্ষ বলিয়া জানি তাহাই বৌদ্ধগণের নিকটে জম্বুদ্বীপ নামে বিখ্যাত এবং জৈন ও ব্রাহ্মণগণের নিকটে ভারতবর্ষ (ভরহবাস) নামে পরিচিত। পৌরাণিক যুগে জম্বুদ্বীপ সপ্তদ্বীপের একটী দ্বীপ বলিয়া গণ্য হইত। সেকালে পৃথিবী সপ্তদ্বীপে বিভক্ত ছিল। ভারতবর্ষ নয়টী বর্ষের মধ্যে একটী বর্ষ বলিয়া পরিগণিত হইত১। জম্বুদীব-পন্নত্তি নামক জৈন পুস্তকে জম্বুদ্বীপের যে বিবরণ আমরা পাই পুরাণেও ঐরূপ বিবরণ পাওয়া যায়। বৌদ্ধগ্রন্থগুলি ও তাহাদের টীকা হইতে জানিতে পারা যায় যে জম্বুদ্বীপ চারিটী মহাদ্বীপের একটী মহাদ্বীপ। সুমেরু (সিনেরু) পর্বত তাহাদের মধ্যভাগে অবস্থিত। পূর্ববিদেহ বা প্রাচ্য মহাদেশ সুমেরু পর্বতের পূর্বাংশে অবস্থিত। 'অপরগোদান' বা 'অপরগোয়ান' অর্থাৎ পশ্চিম মহাদেশ পশ্চিমদিকে প্রতিষ্ঠিত। উত্তর-কুরু বা উত্তর মহাদেশ উত্তর দিকে অবস্থিত। জম্বুদ্বীপ বা দক্ষিণমহাদেশ দক্ষিণাংশে অবস্থিত।

পূর্ববিদেহাগত জনবর্গ জম্বুদ্বীপে যে ভূমিখণ্ডে আসিয়া বাস করে তাহাদের নামানুসারে তাহার বিদেহ নামকরণ হয়। অপরগোদানাগত জনগণ যে দেশে আসিয়া বাস করে উহা অপরান্ত বলিয়া পরিচিত। উত্তর-কুরু হইতে আগত জনবর্গ যে স্থানে বাস করে তাহার নাম কুরু২।

১ Matsya Purana, 114, 85.
২ Papancasudanis (sinhalese ed.), I, p. 484; Dhammapadatthakatha (sinhalese ed.) II, p. 482.

বৌদ্ধ 'সিনেরুর' অনেক নাম পাওয়া যায়: মেরু, সুমেরু, হেমমেরু এবং মহামেরু। ইহা পৃথিবীর কেন্দ্ররূপী সর্বোচ্চতম পর্বত। সমুদ্রাভ্যন্তরে ইহার ভিত্তিটী সুপ্রতিষ্ঠিত; এই ভিত্তিটীর গভীরতা চতুরশীতি সহস্র যোজন। ইহার চতুর্দিকে সপ্ত পর্বতশ্রেণী আছে। এই সপ্ত পর্বতমালার নাম যুগন্ধর, ঈশধর, করবীক, সুদস্সন, নেমিন্ধর, বিনতক ও অস্সকন্ন। ইহার শীর্ষদেশে 'তাবতিংস' নামে ত্রয়োত্রিংশৎ দেবগণের স্বর্গ প্রতিষ্ঠিত। ইহার পাদদেশে 'অসুর ভবন' দৈত্যদিগের রাজ্য। ইহার চতুর্দিকে চারিটী সুবিশাল মহাদেশ১। বৌদ্ধগণ এবং ভারতের অপরাপর ধর্মাবলম্বীগণের মতে সুমেরু পর্বত অত্যন্ত প্রাচীন।

পুরাণের মতে ইলাবৃত বর্ষ জম্বুদ্বীপের নয়টী২ বর্ষের মধ্যস্থলে অবস্থিত। ইহার দক্ষিণদিকে নিষধ পর্বতশ্রেণী, ইহার দক্ষিণে হরিবর্ষ; এই হরিবর্ষ আবার ভারতবর্ষের ঠিক উত্তরদিকে অবস্থিত। আবার এই উভয়ের মধ্যস্থলে হিমালয় পর্বত; হেমকূট পর্বত ইহার ঠিক উত্তরে। হিমালয় পর্বতশ্রেণী পূর্বপশ্চিমদিকে ১,৬০০ যোজন প্রসারিত। দক্ষিণদিকে এই পর্বতমালাকে কার্মুকের সূত্রের ন্যায় দেখায় (হিমবান্ উত্তরেণাস্য

১ Anguttara, IV, p. 100 f.; Samantapasadika, I, p. 119; Visuddhimagga, p. 206; Paramatthajotika, 11. pp. 443, 485; Divyavadana, p. 217.
২ Seven, according to Jambudiva-pannatti.

কার্মুকস্য যথাগুণঃ)১। জম্বুদীব-পন্নত্তি ও পুরাণের মতে হরিবর্ষকে ভারতবর্ষ ও হিমালয়ের উত্তরে অবস্থিত বলিয়া নির্দেশ করে, উহাতে আরও পাওয়া যায় হিমালয় শ্রেণী দুইভাগে বিভক্ত—মহাহিমবন্ত বা বৃহত্তর হিমালয় এবং চুল্ল হিমবন্ত বা ক্ষুদ্রতর হিমালয়। একটী পূর্বদিকে প্রাচ্য সাগর অর্থাৎ বঙ্গোপসাগরে পর্য্যন্ত প্রসারিত, অপরটী পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইয়া পরে দক্ষিণদিকে বর্ষধর পর্বতের নিম্নস্থিত সাগর পর্য্যন্ত অর্থাৎ আরব সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত২।

পালি "মহাগোবিন্দ সুত্তন্ত" হইতে জানা যায় যে ভারতবর্ষ উত্তরদিকে সুবিস্তৃত এবং দক্ষিণে গোযানাকৃতি সদৃশ৩। মার্কণ্ডেয় পুরাণের মতে ভারতবর্ষ কূর্মপৃষ্ঠ সদৃশ৪। জম্বুদীব-পন্নত্তি হইতে জানা যায় যে বৈতাঢ্য (বিন্ধ্য) পর্বতশ্রেণী ভারতবর্ষকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে। উত্তর অর্দ্ধাংশের নাম উত্তরার্দ্ধ, পরবর্তীকালে আর্য্যাবর্ত এবং দক্ষিণাংশের নাম দক্ষিণার্দ্ধ, পরবর্তীকালে দাক্ষিণাত্য বা ডেকান৫।

পালিগ্রন্থে হিমালয় হিমবা, হিমাচল এবং হিমবন্ত প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ। ইহা গন্ধমাদনপর্ব্বতবেষ্টনকারী সপ্ত পর্বতশ্রেণীর মধ্যে একটী৬। ইহা তিন লক্ষযোজন বিস্তৃত৭, চতুরশীতি সহস্র কূটবান্, তাহাদের সর্ব্বোচ্চতম শিখর উচ্চতায় পঞ্চশত যোজন৮। এই ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য, সংখ্যা এবং উচ্চতা সমস্তই কাল্পনিক তাহা সহজেই অনুমেয়। হিমালয়ের সপ্ত মহাহ্রদের উল্লেখ পাওয়া যায়: অনোতত্ত, কণ্ণমুণ্ড, রথকার, ছদ্দন্ত, কুণাল, মন্দাকিনী এবং সীহপ্পপাতক৯। ইহারা প্রত্যেকেই দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে ও গভীরতায় পঞ্চাশৎযোজন বিস্তৃত১০। কুণাল জাতকে হিমালয়ের শৃঙ্গসমূহের মধ্যে মণিপর্বত, হিঙ্গুলপর্বত, অঞ্জনপর্বত, সানুপর্বত এবং কড়িকপর্বতের উল্লেখ পাওয়া যায়১১। সুত্তনিপাত ভাষ্যে প্রায় পঞ্চশত নদ-নদীর উল্লেখ আছে১২। মিলিন্দপঞ্হের১৩ মতে ইহাদের মধ্যে দশটী উল্লেখযোগ্য। দশটী নদীর১৪ মধ্যে প্রথম পাঁচটীর নাম গঙ্গা, যমুনা, অচিরবতী, সরভু ও মহী; ইহাদিগকে পঞ্চমহানদী১৫ বলা হইত। এই পাঁচটী নদী লইয়া গঙ্গা-গুচ্ছ গঠিত। অপর পাঁচটি নদীর নাম সিন্ধু, সরস্বতী, বেত্রবতী, বিতংসা, চন্দ্রভাগা; ইহাদের মধ্যে সরস্বতীকে বাদ দিলে সিন্ধু-গুচ্ছ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম পাঁচটি নদী জৈন মহাহিমবন্ত হইতে উদ্ভূত; অন্য পাঁচটি ক্ষুদ্রতর শ্রেণী হইতে সম্ভূত।

কুণালজাতক হইতে জানা যায় যে সুবর্ণতল এবং হিঙ্গুতল নামে দুইটি মনোরম স্থান ছিল; একটি হিমবন্ত পর্বতের পূর্বদিকে এবং অপরটি পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত১৬। মিলিন্দপঞ্হ নামক বৌদ্ধগ্রন্থে হিমালয় খণ্ডে রক্ষিততল নামে একটি মালভূমির উল্লেখ আছে১৭।

বৌদ্ধগণের মতে একটি জম্বুবৃক্ষ হইতেই জম্বুদ্বীপ মহাদেশের নাম উদ্ভূত হইয়াছে। উহার কাণ্ডটি পঞ্চদশ যোজন বিস্তৃত; শাখা-প্রশাখা দৈর্ঘ্যে পঞ্চাশৎ যোজন বিস্তারিত; ছায়া বিস্তারে একশত যোজন; উচ্চতাও একশত যোজন১। এই মহীরুহের অবস্থান হেতু মহাদেশটি জম্বুবন২ ও জম্বুসণ্ড৩ নামেও পরিচিত। জম্বুবৃক্ষ জম্বো (জম্বু) নদীতীরে অবস্থিত। মহাদেশটির ব্যবধান দশযোজন বিস্তার, ইহার মধ্যে চারি সহস্র যোজন সমুদ্র লইয়া বিস্তৃত; তিন সহস্র যোজন ব্যাপ্ত করিয়া হিমালয় অবস্থিত এবং মাত্র তিন সহস্র যোজনে মানবদিগের বাস ছিল৪। ছোট বড় ৮৪,০০০ সহর ইহার অন্তর্ভুক্ত। অঙ্গুত্তরনিকায়ের মতে জম্বুদ্বীপে আরাম, নিকুঞ্জ, হ্রদ প্রভৃতির সংখ্যা কম ছিল, কিন্তু দুর্গম পর্বত, নদী প্রভৃতির সংখ্যা ছিল বেশী৫।

জম্বুদ্বীপ-পন্নত্তিতে দেখা যায় যে ভারতবর্ষ হিমালয়ের দক্ষিণে এবং পূর্ব ও পশ্চিম সাগর সমূহের অভ্যন্তরে অবস্থিত। এখানে দুঃখ, দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি, রোগ বেশী রকম ছিল। উত্তর দিক হইতে ইহাকে দেখিতে পর্য্যঙ্কের অনুরূপ, দক্ষিণ দিক হইতে ধনুক সদৃশ। দুইটী সুবৃহৎ নদী, গঙ্গা ও সিন্ধু এবং বৈতাঢ্য পর্বতশ্রেণী ইহাকে ছয়টী অংশে বিভক্ত করিয়াছে৬।

পালি সাহিত্যে মহাভারতের মতই চারিটী মহাদেশের উল্লেখ আছে। সুমেরু পর্বতের চতুর্দিকে উহাদের স্থান। পশ্চিমের মহাদেশটীকে কেতুমাল বলা হয় (অপ্পরগোদান নয়); পূর্বদিকের মহাদেশটী পূর্ব-বিদেহের পরিবর্তে ভদ্রাশ্ব নামে পরিচিত।

উত্তরে মহাদেশটী উত্তরকুরু নামে খ্যাত, পালি গ্রন্থ সমূহেও তদ্রূপ৭। হরিবর্ষের উত্তরদিকে এবং নীল ও নিষধ পর্বতশ্রেণীদ্বয়ের মধ্যভাগে আরও দুইটী পর্বতশ্রেণী আছে; তন্মধ্যে যেটী পূর্বদিকে তাহার নাম মাল্যবৎ এবং যেটী পশ্চিমদিকে তাহার নাম গন্ধমাদন। এই দুইটী শ্রেণীর মধ্যভাগে মেরুপর্বত অবস্থিত৮। পালি গ্রন্থাবলী, জম্বুদীব-পন্নত্তি, পুরাণ ও মহাভারতে দেখিতে পাওয়া যায় যে জম্বুদ্বীপের নামটী সুদর্শন নামে একটী বিরাট জম্বুদ্রুম হইতে উৎপত্তি। বৃক্ষটী নীল-নিষধ পর্বতের মধ্যবর্তী একটী স্থানে অবস্থিত৯। জম্বুদ্বীপে ছয়টী বর্ষ পর্বত ছিল যথা: হিমবান্, হেমকূট, নিষধ, নীল, শ্বেত এবং শৃঙ্গবান্। প্রত্যেকেই সাগর হইতে সাগরান্তরে, সমুদ্র হইতে সমুদ্রান্তরে দীর্ঘ-শ্রেণীবদ্ধরূপে প্রসারিত হইয়া চলিয়াছে১০। ভারতবর্ষ অবশ্য প্রথমটীর দক্ষিণদিকে অবস্থিত। উহাতে সাতটী নদী ছিল:—নলিনী, পাবনী, সরস্বতী, জম্বু, সীতা, গঙ্গা এবং সিন্ধু১১। গঙ্গার উৎস বিন্দুসর হ্রদে। বিন্দুসর হ্রদ কৈলাস, মৈনাক এবং হিরণ্যশৃঙ্গ নামে তিনটী গিরিশৃঙ্গের মধ্যভাগে অবস্থিত১২। জম্বুদীব-পন্নত্তি গ্রন্থের মতে গঙ্গার উৎস মহাপদ্ম হ্রদ। বৃহত্তর হিমালয় শ্রেণীতে ও ঐরূপ একটী হ্রদের উল্লেখ আছে। বৌদ্ধমতে পঞ্চমহানদী অনোতত্ত হ্রদ হইতে উদ্ভূত। অনোতত্ত ও জৈনদিগের পদ্মহ্রদ অভিন্ন। সিংহমুখ, অশ্বমুখ এবং বৃষভমুখ নামে চারিটী সরোবর ছিল১৩। পদ্মহ্রদের চতুর্মুখ হইতে গঙ্গা, রোহিতা, সিন্ধু ও হরিকান্তা নামে চারিটী নদী প্রবাহিত হইতেছে১৪।

১ Bhagavata Purana, Dvipavarsa-varnana-skandha, ch. xix.
২ Jambudiva-pannatti, I, 9. ৩ Digha, II, p. 235.
৪ Markandeya Purana, chaps. 57 & 58.
৫ Jambudiva-pannatti, I, 12.
৬ Paramatthajotika, II, p. 66; Malalasekera, Dict. of Pali Proper Names, II, p. 1325.
৭ Paramatthajotika, II, p. 224
৮ & ৯ Auguttara Nikaya, IV, p. 101; Manorathapurani, II, p. 759; Paramatthajotika, II. p. 443.
১০ Jataka, v. p 415.
১১ Paramotthajotika, II. p. 437. ১২ Milinda, p. 114.
১৩ cf. Markandeya Purana, 57, 16-18.
১৪ Auguttara, IV, 101; Vin. II, 237; Samyutta II, 135; V, 401.
১৫ Jataka, v, 415. ১৬ Milinda, p. 6
১৭ Vinaya, I, p. 30; Samantapasadika, I, p. 119; Paramatthajotika, II, p. 443; Visuddhimagga, I, p. 205.

১ Law, Geography of Early Buddhism, p xvi
২ Sutta-nipata, verse 552; Paramatthajotika, II, p 121.
৩ Paramatthajotika, II, 437
৪ Ibid., II, p. 59; cf. Jataka, iv, p. 84.
৫ Auguttara, I, p. 35 ৬ Jambudiva-paunatti, I, 9.
৭ Mahabharata, Bhismaparva 6, 12, 13; 7. 13; 6. 31; 7. 13, 14. ৮ Ibid., 6. 9, 10.
৯ Ibid., 7. 19, 20. ১০ Ibid., 6. 3.5.
১১ Ibid., 6. 49-50. ১২ Ibid., 6. 43-44.
১৩ Pahancasudani, II, p. 586.
১৪ Jambudiva-pannatti, IV, 34, 35.

অনোতত্ত হ্রদোদ্ভুত গঙ্গা, যমুনা, অচিরবতী, সরভু ও মহী এই পাঁচটী নদীর দীর্ঘ বিবরণ আমরা পালিভাষ্যে পাই[১]।

গঙ্গা ও সিন্ধুর প্রভব ও প্রবাহের ইতিহাস জম্বুদীব-পণ্ণত্তিতেও পাওয়া যায়। অন্যান্য অনেক নদী গঙ্গায় পড়িয়াছে[২]। অনোতত্ত হ্রদ, বিন্দুসর হ্রদ এবং মানস সরোবর এই তিনটী অভিন্ন। পূর্ব্বেরটীর ন্যায় অপরটীও কৈলাস পর্বতের সহিত সংশ্লিষ্ট। পালিভাষ্য সমূহে প্রমাণ পাওয়া যায় যে উহা সুদর্শনকূট, চিত্রকূট, কালকূট, গন্ধমাদন এবং কৈলাস নামক পঞ্চশৃঙ্গ দ্বারা পরিবেষ্টিত। ইহারা সকলেই হিমালয়ের শৃঙ্গ[৩]।

জৈনমতে বৃহত্তর হিমালয় শ্রেণীর অষ্টকূট ও হ্রস্বতর শ্রেণীর একাদশ কূট আছে। বৈতাঢ্যশ্রেণী ভারতবর্ষকে আর্য্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্য এই দুই অংশে বিভক্ত করিয়াছে। ইহার কূট সংখ্যা নয়টী। মহাহিমবন্তের অষ্টকূটের নাম, সিদ্ধায়তন, মহাহিমবদধিষ্ঠাত্রী, হৈমবতপতি, রোহিত-নদীশ্বরী, হ্রীশ্বরী, হরিকান্তানদী শ্বরী, হরিবর্ষপতি এবং বৈদূর্য[৪]। ক্ষুদ্রতর শ্রেণীর একাদশটী শৃঙ্গ : সিদ্ধায়তন, ক্ষুদ্রহিমবদ্‌গিরি, কুমারদেব ইত্যাদি[৫]। বৈতাঢ্যশ্রেণীর নয়টী শৃঙ্গ সিদ্ধায়তনসহ আবদ্ধ[৬]।

মার্কণ্ডেয়-পুরাণে ভারতবর্ষের আকৃতি পূর্বমুখাম্বিত[৭], প্রসারিত কূর্মবৎ ; অন্য একটী বর্ণনায় পাওয়া যায়, উহা উপদ্বীপ প্রায় ; হিমালয় পর্বতশ্রেণী উহার উত্তরদিকে ধনুর্গুণ সদৃশ বিদ্যমান[৮]। চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন সাং বলেন যে উত্তরাংশ প্রশস্ত, দক্ষিণাংশ সংকীর্ণ। জম্বুদীব-পণ্ণত্তির মতে ইহার আকৃতি অর্দ্ধচন্দ্রবৎ[৯]।

মহাভারত[১০], পুরাণসমূহ ও জম্বুদীব-পণ্ণত্তিতে দেখা যায় যে ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য রাজা ভরতের নামানুসারেই এই মহাদেশের নাম করণ হইয়াছে। ইহাতে উত্তর ভারতে ছয়টী বিভাগ এবং দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম, ও মধ্যভারতে তিনটী বিভাগের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সমস্ত প্রকৃত ভারতের আভ্যন্তরিক বিভাগ। বরাহমিহিরের নয়টী অংশ দিক-যন্ত্রের কেন্দ্র ও দশটীর মধ্যে আটটী যথা, পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ-পূর্ব, দক্ষিণ-পশ্চিম, উত্তর-পশ্চিম, উত্তর-পূর্ব, সমস্তই আভ্যন্তরিক। জৈনগণেরও এই মত। মার্কণ্ডেয় পুরাণ হইতে জানা যায় যে নয়টী দ্বীপ লইয়া ভারতবর্ষ গঠিত। অন্যত্র কুমার, কুমারী বা কুমারিক বলিয়া বিদিত। উহাই প্রকৃত ভারতবর্ষ[১১]।

জম্বুদীব-পণ্ণত্তি[১২] গ্রন্থের জম্বুদ্বীপ আর মূলপালি গ্রন্থসমূহে[১৩] জম্বুদ্বীপ অভিন্ন। পালিগ্রন্থসমূহে জম্বুদ্বীপ মহাদেশরূপে উল্লিখিত আছে[১৪]। অশোকের সময়ে জম্বুদ্বীপ আয়তনে তাহার রাজ্য (বিজিত) অপেক্ষা বৃহত্তর ছিল[১]।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে এই সকল দেশের উল্লেখ আছে : (১) মধ্যদেশ, (২) উদীচ্য, (৩) প্রাচ্য, (৪) দক্ষিণাপথ, (৫) অপরান্ত, (৬) বিন্ধ্য-অঞ্চল এবং (৭) পার্বত্য অঞ্চল[২]। মহাভারতে[৩] প্রাচ্য, উদীচ্য, দক্ষিণ, অপরান্ত ও পার্বতীয় এই বিভাগগুলির উল্লেখ আছে। হুয়েন সাংএর সি-য়ু-কি ও পুরাণান্তর্গত ভুবনকোষে ভারতের এইরূপ বিভাগের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়—প্রথমটীতে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম ও মধ্যে,[৪] এবং অপরটীতে মধ্যদেশ, উদীচ্য (উত্তর), প্রাচ্য (পূর্ব), দক্ষিণাপথ (দাক্ষিণাত্য) ও অপরান্ত (পশ্চিম[৫])। রাজশেখরের কাব্যমীমাংসায় দেখা যায় যে বারাণসী বা কাশীর পূর্বে পূর্বভারত, মাহিষ্মতীর দক্ষিণে দাক্ষিণাত্য, দেবসভার পশ্চিমে পশ্চিম ভারত, উত্তরে (অর্থাৎ উত্তর-পশ্চিমে) উত্তর (অর্থাৎ উত্তর-পশ্চিম)। বিনশন ও প্রয়াগ এবং গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী স্থলই অন্তর্দেশ[৬]।

কানিংহাম হুয়েন সাংএর "পঞ্চভারতের" (Five Indias) তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন :—(১) উত্তর ভারত—প্রকৃত পাঞ্জাব, কাশ্মীর, পার্শ্ববর্তী শৈলরাষ্ট্রগুলি, সিন্ধুনদের পরতীরান্তর্গত সমগ্র প্রাচ্য আফগানিস্থান, সরস্বতী নদীর পশ্চিমান্তর্গত বর্তমান সিস্-সাট্‌লেজ রাষ্ট্ররাজি (২) পশ্চিম-ভারত—সিন্ধুদেশ, রাজপুতানা, তৎসহ কচ্ছদ্বীপ, গুর্জরপ্রদেশ, নর্মদার নিম্নহ উপকূলের একাংশ ; (৩) মধ্যভারত—সমগ্র গাঙ্গেয়প্রদেশ, স্থানেশ্বর হইতে ব-দ্বীপের (ডেল্‌টা) শীর্ষ পর্য্যন্ত এবং হিমালয় পর্বতসমূহ হইতে নর্মদার তীর পর্য্যন্ত ; (৪) পূর্ব-ভারত—আসাম, খাস বঙ্গ তৎসহ জব্বলপুর, উড়িষ্যা ও গঞ্জাম লইয়া সমগ্র গাঙ্গেয় দেশ ; (৫) দক্ষিণ-ভারত—সমগ্র উপদ্বীপটী, পশ্চিমে নাসিক হইতে, পূর্বে গঞ্জাম হইতে, দক্ষিণে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত বর্তমান বেরার ও তেলিঙ্গ, মহারাষ্ট্র ও কঙ্কন্, তৎসহ হায়দ্রাবাদ, মহীশূর ও ত্রিবাঙ্কুরের বিভিন্ন রাষ্ট্রসমূহ ইহার অন্তর্গত ; অর্থাৎ নর্মদা ও মহানদীর দক্ষিণস্থ প্রায় সমগ্র উপদ্বীপটী।

প্রাচীন পালিগ্রন্থ হইতে ভারতের ছয়টী বিভাগ ছিল জানা যায় :—মধ্যদেশ (মজ্‌ঝিম দেশ[৭]), (১) হিমালয় প্রদেশ (হিমবত বা হিমবন্ত[৮]), (৩) উত্তর পশ্চিমান্ত অঞ্চল (উত্তরাপথ[৯]), (৪) দাক্ষিণাত্য বা ডেকান্ (দক্‌খিনা পথ[১০]), (৫) পূর্বভারত (পুব্বন্ত), এবং (৬) পশ্চিম ভারত (অপরান্ত)।

জম্বুদ্বীপান্তর্গত ১৬টী মহাজনপদের নাম পালিগ্রন্থে পাওয়া যায় :—কাসী, কোসল, অঙ্গ, মগধ, বজ্জি, মল্ল, চেতী, বংস, কুরু, পঞ্চাল, মচ্ছ, সুরসেন, অসসক, অবন্তী, গন্ধার এবং কম্বোজ[১১]। যে সমস্ত লোক যে

---

১ Papancasudani, sinhalese ed., II, 586 ; Manorathapurani, II, 759-60 ; Paramatthajotika, II, p. 437-9.

২ Jambudiva pannatti, IV, 34

৩ Papancasudani II, p. 585 ; Manorathapurani, II, p. 759.

৪ Jambudiva-pannatti, IV, 80,

৫ Ibid, IV. 35

৬ Ibid., I 12

৭ Markandeya Purana, chaps. 57 & 58

৮ Ibid., ch. 57

৯ Beal, Buddhist Records of the Western world, I. p. 70

১০ Mahabharata, Bhisma-parva, iii, p. 41

১১ Law, Geographical Essays, p. 120 f.

১২ Jambud va pannatti, iii, 41.

১৩ Auguttara-Nikaya, IV, p. 90.

১৪ Samantapasadika, I, p. 41

---

১ M. R. E and R. E. XIII.

২ Markandeya Purana. ch

৩ Bhismaparva. ch. 9

৪ Beal Records of the western world, I. p. 70 ; Cunningham, Ancient Geography, p. 136.

৫ Law, Geography of Early Buddhism, p. xx.

৬ Kavya mimamsa, p 93.

৭ Vinaya, I, p 197 ; Jataka, I, pp. 49-80.

৮ Mahaxamsa, xii. 41.

৯ Vinaya II, p. 6 ; Samantapasadika. I, p. 175 ; Jataka. II. p 277 ; IV. 79 ; Divyavada p. 470 ; Mahavastu III. p 303 ; Petavatthu-anahakatha, p 100 ; Theragatha-atthakatha, I, 339.

১০ Sutta-nipata, verse 976 ; Vinaya, I, pp 195-6 II, p. 298 ; Jataka, III, p. 463 ; v, p. 133 ; Sumangalavilasini, I, p. 265.

১১ Auguttara. I, p. 213 ; IV. pp. 252, 256, 260.

স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল তাহাদের নাম হইতে প্রত্যেকটীর নামকরণ করা হইয়াছে। দীঘ নিকায়ে মাত্র দ্বাদশটীর নামোল্লেখ আছে। চুল্লনিদ্দেস গ্রন্থে উক্ত তালিকায় কলিঙ্গ যোগ হইয়াছে এবং গন্ধারদেশের পরিবর্তে যোন দেশের উল্লেখ আছে। ভগবতীসূত্রে নিম্নলিখিত দেশগুলির নাম পাওয়া যায়—অঙ্গ, বঙ্গ, মগধ, মালব, অচ্ছ বচ্ছ (পালি বংস), কোচ্ছ, পাঢ় (?), লাঢ় (রাঢ়), বজ্জী, মোলি (মল্ল) ? কাসী, কোসল, অবহ (?), এবং সম্ভুত্তর (?)।

১। মধ্যদেশ :—বৌধায়নের ধর্মসূত্রে মধ্যদেশের বিবরণ পাওয়া যায়। উহা সরস্বতী নদী যেখানে অন্তর্হিত হইয়াছে সেই অঞ্চলের পূর্বদিকে কৃকবনের (কালকবনের১) পশ্চিমে, পারিপাত্রে পর্বতের উত্তরে এবং হিমালয়ের দক্ষিণে অবস্থিত২। পূর্ব সীমায় বঙ্গ ও বিহারের উল্লেখ নাই। মনুর মতানুসারে মধ্যদেশ উত্তর হিমালয় হইতে দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্য্যন্ত এবং পশ্চিমে বিনশন হইতে পূর্বে প্রয়াগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত৩। ইহার অন্য নাম অন্তর্বেদী বা অন্তর্দেশ ; ইহা পূর্বে কাশী পর্য্যন্ত বিস্তৃত৪। বৌদ্ধ লেখক মধ্যদেশের সীমা পূর্বদিকে আরও অধিকতর প্রসারিত করিয়াছেন অঙ্গ ও মগধকে ইহার অন্তর্গত করিবার জন্য। বিনয় পিটকের৫ মহাবগ্গ অনুসারে ইহা পূর্বদিকে কজঙ্গল৬ নগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ; কজঙ্গলের পরবর্তী স্থান ছিল মহাশাল নগর। দক্ষিণ পূর্বদিকে সলড়বতী (সরাবতী) নদী পর্য্যন্ত ; দক্ষিণে সেতকন্নিক নগর পর্য্যন্ত ; পশ্চিমে ব্রাহ্মণগণের বসতি থূন৭ জেলা পর্য্যন্ত এবং উত্তরে উশীরধ্বজ৮ পর্বত পর্য্যন্ত। দিব্যাবদান৯ গ্রন্থে ইহার পূর্ব সীমা আরও বিবর্দ্ধিত। পুণ্ড্রবর্দ্ধনকে ইহার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রাচীনকালে বরেন্দ্র পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের অন্তর্গত ছিল।

মনুসংহিতায়১০ কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, পঞ্চাল এবং সুরসেন, ব্রহ্মর্ষি দেশে অন্তর্ভুক্ত। মার্কণ্ডেয় পুরাণের মতে উহারা সমস্তই মধ্যদেশের অন্তর্গত। মনুর মধ্যদেশ বিনশন ও প্রয়াগের অন্তবর্তী স্থান। পালি মহাপরিনির্বাণ সুত্তন্তে১১ ছয়টি প্রধান নগরের উল্লেখ পাওয়া যায়—যথা চম্পা, রাজগহ, শ্রাবস্তী, সাকেত, কৌশাম্বী এবং বারাণসী। ইহাতে প্রতিভাত হইতেছে যে পশ্চিমে কাশী, কোশল এবং বংস ইহার অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু অবন্তী ও শূরসেন ছিল ইহার বহির্ভুক্ত। বিনয়পিটক গ্রন্থে দেখা যায় যে এই দুইটী দেশ মধ্যদেশের অন্তর্ভুক্ত নহে।

১ Cunningham, Ancient Geography of India Li and XLi, fn 1.

২ Baudhayana, I, 1, 2, 9, etc.

৩ Manu, ii. 21.

৪ Kavya-mimamsa. p. 93.

৫ Vol v. pp 12-13.

৬ Identical with K-chu-wen-kilo of Yuan chwang which lay at a distance of above 400 li east from Campa (Bhagalpur). Cf Sumangalavilasini, II, 429, as to Kajangala forming the eastern boundary of the Mashyadesa. Also see Jat- III, 226-7 ; IV, 310

৭ Consult Cunningham, Ancient Geography of India, Intro. xliii, fn. 2 as to the identification of Thuna with Thanesvara : also see Jat. vi, 62.

৮ It may be said to be identical with Usiragiri. a mountain to the north of Kakhal. I. A. 190. 1908.

৯ Pp. 21-22.

১০ II, 19.

১১ Digha, II, p, 146.

এই বিভাগের সাতটী প্রধান নদীর নাম পাওয়া যায়—বাহুকা (বহুকা ১), অধিকক্কা, গয়া, সুন্দরিকা, সরস্বতী, প্রয়াগ এবং বাহুমতী ; অপর একটী তালিকায় দেখা যায় : গঙ্গা, যমুনা, সরভু, অচিরবতী, মহী এবং মহানদী ২। শোণ এবং তিষর বাহুকা ও গয়ার সহিত একত্রে জাতকে৩ উল্লিখিত আছে। এখানে নিশ্চয়ই বাহুকা মহাভারতের ৪ বাহুদা নদী। মার্কণ্ডেয় পুরাণে ৫ ইহাকে গঙ্গা ও যমুনা সহ হিমালয়ের সহিত সংযুক্ত করিয়াছে। অধিকক্কার সনাক্তকরণ এখনও প্রতীক্ষাপরায়ণ। গয়া ফল্গু ব্যতীত অন্য কোন নদী নহে। নেরঞ্জরা (নৈরঞ্জনা) নদী এবং মহানদী (মোহানা) মিলিত হইয়াছে ৬। সুন্দরীকা কোশলের একটী পুণ্য নদী। সরস্বতী হিমালয় হইতে উদ্ভূত হইয়া বিনশনে পড়িয়াছে। প্রয়াগ গঙ্গাযমুনার সঙ্গমক্ষেত্র ৮। ভাগীরথী গঙ্গা পঞ্চালের ভিতর দিয়া প্রবাহিতা হইয়া উহাকে উত্তর পঞ্চাল ও দক্ষিণ পঞ্চাল এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। ভাগীরথীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত কম্পিল্ল দক্ষিণ পঞ্চালের রাজধানী। যমুনা শূরসেন ও কোশলের এবং বংস ও কোশলের সীমা নির্দেশক। শূরসেনের রাজধানী মথুরা ও বংশের রাজধানী কৌশাম্বী যমুনার দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। সরভু রামায়ণের সরযূ নদী ; ইহার বামতীরে কোশলের (উত্তর কোশলের) প্রাচীন রাজধানী অযোধ্যা। অচিরবতী বর্তমান রাপ্তি ; ইহার দক্ষিণ তীরে কোশলের শেষ রাজধানী শ্রাবস্তী অবস্থিত ৯। মহী (মহাময়ী গঙ্গা) গঙ্গার উপনদী। বাহুমতী, শোণ এবং তিষর নদীগুলির এখনও অভিন্নতা প্রমাণিত হয় নাই।

জৈন ভগবতীসূত্রে এবং মনোরথপূরণী১০ নামে পালি গ্রন্থে মহাগঙ্গার উল্লেখ আছে। এই মহাগঙ্গা নৈরঞ্জনা ও মহানদী বা সোণ নদীর সঙ্গমস্থল ১১। গঙ্গা কাশী ও মগধরাজ্যের মধ্যে প্রবাহিতা। কাশীর রাজধানী বারাণসী উহার বামতীরে অবস্থিত। আরও নিম্নদিকে উহা উত্তরে বিদেহ ও বৈশালী এবং দক্ষিণে মগধ১২ অঙ্গ ও কজঙ্গলের মধ্যে সীমা নির্দেশক। উহার দক্ষিণতীরে অবস্থিত মগধের শেষ রাজধানী পাটলিপুত্র এবং অঙ্গ রাজধানী চম্পা। প্রাচীন পালি গ্রন্থে মধ্যদেশে আরও তিনটী নদীর উল্লেখ আছে, অনোমা, রোহিণী ও ককুধা। প্রথম নদীটা কপিলবস্তুর পূর্বে ৩০ যোজন দূরে অবস্থিত ১৩। রাজধানী হইতে উহার দূরত্ব মাত্র ছয় যোজন ছিল ১৪। দ্বিতীয়টী রোহিণী অতি ক্ষুদ্র নদী ; উহা শাক্য ও কোলীয় রাজ্যকে বিভক্ত করে ১৫। কানিংহামের মতে উহা বর্তমান রোওয়াই বা রোওয়াইনি (Rohwai or Rohwaini), ক্ষুদ্র নদী, রাপ্তির সহিত গোরক্ষপুরে মিলিত হইয়াছে ১৬। ধর্মপালের মতে উত্তর হইতে দক্ষিণাভিমুখী হইয়া রাজগৃহের উত্তর-পশ্চিমে এই

১ Jataka, V, p. 389.

২ Visuddhimagga, I, p. 10.

৩ Jataka v, p. 388 f.

৪ Mahabharata, iii, 84. 67

৫ Ch. 37

৬ Barua, Gaya & Buddhagaya, I. p. 87 f.

৭ Ibid.

৮ Ibid., 1, p. 87.

৯ Law, Sravasti in Indian literature, p. 9.

১০ Sinhalese ed., ii, p. 761 f.

১১ Ibid.

১২ Majjhima I, Vatthupamasutta.

১৩ Jataka, I, p. 64 f ; Paramatthajotika, II, 382 ; Malalasekera, op. cip., I, p. 102.

১৪ Lalitavistara, ed., Lefmaun.

১৫ Jataka, v, p. 412 ; Paramatthajotika II, p. 358.

১৬ Arch. surv. of India, xii, p. 190 f.

নদী প্রবাহিত ১। ককুথা নদী কুশীনারার নিকটে প্রবাহিত ২ এবং মল্লরাজ্যদ্বয়ের সীমা নির্দেশক। ইহা ব্যতীত অন্যান্য নদীর ও উল্লেখ পাওয়া যায়: চম্পা, কোসিকী, মিগসম্মতা, হিরঞ্ঞবতী, সপ্পিনী, সুতনু, সলড়বতী এবং বেত্তবতী। ইহাদের মধ্যে চম্পা পূর্বে অঙ্গ ও পশ্চিমে মগধের মধ্যে সীমা নির্দেশক ৩। কোসিকী বর্তমান কুশী, গঙ্গারই শাখানদীমাত্র ৪। মিগসম্মতা নদী হিমালয় হইতে উদ্ভূত হইয়া গঙ্গায় পতিত হইয়াছে ৫। হিরঞ্ঞবতী ছোট গণ্ডক ও কুশীনারার সন্নিকটস্থ অজিতবতী অভিন্ন। উহা গোরক্ষপুর জেলার মধ্য দিয়া বৃহৎ গণ্ডকের চারিক্রোশ পশ্চিমে প্রবাহিত হইয়া সরযূ নদীতে পড়িয়াছে। ইহার তীরে কুশীনারার মল্লদিগের শালবন অবস্থিত ৬। সপ্পিনী (বর্তমান পঞ্চান) নদী রাজগৃহের একটা ক্ষুদ্র নদী ৭। সুতনু শ্রাবস্তীর নিকটস্থ একটা ক্ষুদ্র নদী ৮; নিশ্চয়ই উহা অচিরবতীতে পড়িয়াছে। সলড়বতী (দিব্যাবদানের সরাবতী শরণবতী) বোধ হয় বর্তমান সুবর্ণরেখা নদী; উহা মধ্যদেশের দক্ষিণপূর্ব সীমা নির্দেশক। বেত্তবতী [ভুপালের অন্তর্গত বেট্ওয়া (Betwa)] যমুনার একটা উপনদী; উহার তীরে বেত্তবতী নগর অবস্থিত, এবং আরও দক্ষিণ-পশ্চিমে ভিলসা বা প্রাচীন বিদিশা অবস্থিত ৯।

গিরি সমূহের মধ্যে গয়াশীর্ষের উল্লেখ বেশী পাওয়া যায়। উহা গয়ার প্রধান ভূধর ১০ এবং আধুনিক ব্রহ্মযোনি গিরি। মহাভারতে১১ এই গিরিকেই আমরা গয়শির নামে দেখিতে পাই এবং পুরাণসমূহে ১২ গয়াশির নামে পরিচিত। ইহার আকৃতি দেখিতে ঠিক হস্তীর মস্তকের মত (গজসীস বা গজশীর্ষ ১৩)। মহাভারতে গয়ার ২৫টী পর্ব্বতের উল্লেখ আছে, তাহার মধ্যে গয়শির অন্যতম; কিন্তু প্রাচীন বৌদ্ধমূলগ্রন্থগুলি গয়াসীস ব্যতীত সকলগুলিকেই অগ্রাহ্য করেন। হুয়েন সাং ১৪ কথিত প্রাগ্‌বোধি গিরিমালা গয়া নদীর অপর তীরে অবস্থিত।

সম্রাট অশোকের বরাবরগিরিগুহোৎকীর্ণলিপিতে ও পতঞ্জলির মহাভাষ্যে ১৫ খলতিক নামে একগুচ্ছ গিরির উল্লেখ আছে। উহাই আবার মহাভারত, হাথিগুম্ফা ও অন্য দুইটী উৎকীর্ণ লিপিকায় গোরথগিরি বা গোরধগিরি নামে প্রচলিত। এই গোরধগিরি হইতেই মগধের প্রাচীন রাজধানী রাজগৃহ বা গিরিব্রজকে ১৬ দেখিতে পাওয়া যায়। এই গিরিগুচ্ছ প্রবরগিরি নামেও পরিচিত। প্রবরগিরি হইতে বর্তমান বরাবর নামের উৎপত্তি।

পালি ইসিগিলি সুত্তে পাঁচটী ভূধরের নাম পাওয়া যায়: ইসিগিলি, বেভার, পণ্ডব, বেপুল্ল এবং গিজ্‌ঝকূট ১৭। মহাভারতে বৈহারবিপুল, বারাহ, বৃষভ, ঋষিগিরি শুভচৈত্যক ১, চৈত্যক, পাণ্ডর এবং মাতঙ্গ ২ নামগুলি পাওয়া যায়। বিশেষ গবেষণার ফলে দেখা যায় যে বিপুল আর বৈহারবিপুল একই পর্বত, চৈত্যক ও শুভচৈতক অভিন্ন, বৃষভ ও মাতঙ্গ পাণ্ডর (পালি পণ্ডব) ও ঋষিগিরির (পালি ইসিগিলির) পরিবর্তে প্রয়োগ করা হইয়াছে ৩। চৈত্যক বা শুভচৈত্যক বৌদ্ধ গিজ্‌ঝকূট বা গৃধ্রকূট পর্বত ব্যতীত অন্য কোন গিরি নয়।

জৈনদিগের মতে সাতটী গিরির এই প্রকার নামোল্লেখ আছে: বৈভারগিরি, বিপুলগিরি, রত্নগিরি, ছটাগিরি, শৈলগিরি, উদয়গিরি এবং সোণগিরি। বৈভারগিরি দক্ষিণদিকে ও পশ্চিমদিকে প্রবর্দ্ধিত হইয়াছে ৪। পালি গ্রন্থে আরও দুইটা পর্বতের নাম পাওয়া যায়, কালসিলা ৫ ও পটাভাণকূট ৬। কালশিলা ঋষিগিরির পার্শ্বে একটা কৃষ্ণবর্ণ শৈল; পটিভাণকূট, অনুধ্বনিকর শৃঙ্গ, সুভবানক-পপাত উহারই একটা অঙ্গ; গৃধ্রকূটের সন্নিকটে উহা অবস্থিত। গৃধ্রকূটের সন্নিকটে ইন্দ্রকূট ৭ ও বেদিয়কগিরি (ক্যানিংহাম সাহেবের মতে গিরিয়কগিরির সহিত ইহা অভিন্ন) অবস্থিত। এই বেদিয়ক পর্বতে ইন্দ্রশাল গুহা ৮ নামে একটী বিখ্যাত গহ্বর আছে। রাজগিরের পঞ্চগিরিগুচ্ছ ও বেদিয়কগিরি একই গিরিশ্রেণীর শীর্ষ ও পুচ্ছ রচিত করিয়াছে। এই গিরিশ্রেণী পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে সাড়ে চারিক্রোশ ধরিয়া ব্যাপ্ত।

রাজগৃহের পঞ্চভূধরের মধ্যে ইসিগিলি ব্যতীত অপর পর্বতগুলি সকলেই ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন নাম ধারণ করিয়াছে ৯। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বেপুলপর্বতই ধরা যউক; পাচীনবংস (প্রাচীনবংশ নামে উহা অতি প্রাচীন যুগে প্রচলিত ছিল। সেই স্থানের লোকেরা তিবর নামে পরিচিত। পরবর্তীকালে ঐ পর্বতের নাম হয় বঙ্কক এবং স্থানীয় লোকদিগকে রোহিতস্স বলা হইত। তৎপরবর্তীকালে পর্বতটীর নাম হয় সুপস্স এবং তৎস্থানবাসীগণ সুপ্পিয় নামে পরিচিত। শেষকালে গিরিটীর নাম হয় বেপুল্ল এবং সেখানকার লোকেরা মগধ নামে পরিচিত ১০।

হুয়েন সাং বলেন যে পি-পু-লো (বিপুল, বৈহার বিপুল) পর্বত রাজগৃহের উত্তর তোরণের পশ্চিমদিকে অবস্থিত। এখানে পাঁচশত উষ্ণ প্রস্রবণ ছিল। ইহাদের উৎস অনোতত্ত হ্রদে ১১। জৈনবিবিধতীর্থকল্পে বৈভারগিরি পুণ্য পর্বত বলিয়া উল্লিখিত, ইহাতে ঈষদুষ্ণ শীতলাম্বু কুণ্ড প্রচুর আছে। বৌদ্ধটীকাকার বুদ্ধঘোষের মতে বেভারগিরির সহিত উষ্ণ প্রস্রবণের সংযোগ আছে ১২।

বেদিয়কগিরিতে ইন্দসালগুহা রাজগিরের পর্বত শ্রেণীর মধ্যে একমাত্র গুহা নহে। রাজগৃহের পর্বতমালায় গুহা, কন্দর, গহ্বর, রন্ধ্র ছিল। এই গহ্বরগুলির মধ্যে পিপ্পলি (পিপ্‌ফলি) এবং সত্তপণ্ণি (সপ্তপর্ণী) উল্লেখযোগ্য। রন্ধ্র সমূহের মধ্যে কপোত-কন্দার, গোমট-কন্দার, তিন্দুক-কন্দার এবং তপোদ-কন্দার উল্লেখযোগ্য ১৩। রাজগৃহের নিকটে পাষাণকচেতিয় নামে একটা পুণ্য শৈল ছিল ১৪।

---

১ Therigatha-atthakatha, I, p. 501; Malalasekera, op. cip., II, p. 762.
২ Digha. II pp. 120, 139 f.
৩ Jataka, iv, p. 454
৪ Ibid., v, pp 2, 5, 6.
৫ Ibid. vi, p. 72.
৬ Digha II. p. 137.
৭ Auguttara, II p. 29.
৮ Samyutta, v, p. 297.
৯ Jataka, IV, p. 388
১০ Vinaya I, p. 34 f., ii, p. 199
১১ iii, 95. 9, op. cit. I, p. 74
১২ Barua, op cit., I, p. 68
১৩ Saratthappakasini, iii, 4.
১৪ Beal, Buddhist Records, ii, p. 114.
১৫ Mahabhasya I. 2. 2.
১৬ Mahabharata, Sabhaparva, ch. xx, v. 30. e
১৭ Majjhima, p. 68 f.

১ Mahabharata II, 21 2.
২ Ibid., II, 21. 11.
৩ Law, Rajagrha in Ancient Literature, pp. 2f, 28f.
Ibid., p. 3.
Digha, II, pp. 116-7.
Samyutta, v p. 448.
Ibid., I, p. 206.
Digh i II, p. 263; Sumangalavilasini, III p. 697.
৯ M jjhima III, p. 68 f.
১০ S myutt , II p. 190 f., Law, op. cit., p. 32
১১ W tters on Yu n chw ng II. pp 153-4.
১২ S ratth ppakasini, I, p. 38.
১৩ Ud na. IV, 4; Law, op. cit. p. 11.
১৪ Sutta Nipata, verse 1013.

উপনিবেশ

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

আর ওদিকে বলরাম ভিষগ্‌রত্ন আবার সামাজিক হইয়া উঠিতেছেন।

কিছুদিন তিনি তো একেবারে অসূর্যম্পশ্য হইয়াছিলেন বলিলেই হয়। মুক্তো—মুক্তো—মুক্তো! তাহার শাড়ীর খস্‌ খস্‌ শব্দ শুনিবার জন্ম তিনি উৎকর্ণ হইয়া থাকিতেন, তাহার চুড়ির শব্দ তাঁহার কাণে জল-তরঙ্গ বাজাইত। মুক্তোর পায়ের শব্দ শুনিয়া তাঁহার হাতের তালু হইতে ক্রম গোলায়মান বটিকা টুপ্‌ করিয়া মাটিতে পড়িয়া যাইত এবং অসাবধানে ছাগলাগু ঘৃতের পাত্রটা উল্‌টাইয়া স্রোত বহাইয়া দিত। আর রাত্রি! সেগুলি যেন বাস্তব নয়—স্বপ্ন আর অনুভূতির ঘনত্ব।

কিন্তু আকস্মিকভাবে বলরাম আবার আদি ও অকৃত্রিম হইয়া উঠিলেন। বাহিরের জগৎটাকে আবার তিনি নিজের করিয়া লইলেন। নির্বিঘ্ন সুখ শান্তি তিরোহিত হইয়া গেল রাধানাথের —দিনের মধ্যে তিরিশ বার করিয়া তামাক যোগানো সুরু হইল। তাসের আসরে যথাযোগ্য উৎসাহ এবং উদ্দীপনা প্রকাশ পাইতে লাগিল বলরামের।

তাস খেলার সঙ্গীদের তিনি আবার জোটাইয়া লইয়াছেন। এবার আর হরিদাস সাহা নাই, তা তিনি না-ই থাকিলেন। মাঝে মাঝে তাঁহার কথা মনে পড়িলেই শুধু বলরাম অস্বস্তি বোধ করেন। অলক্ষুণে আর মুখফোঁড় হইলেও লোকটা তাঁহাকে ভালোবাসিত—হয়তো তিনিও তাহাকে সত্যিই ভালোবাসিতেন। তা ছাড়া তাসের আসরে এমন জমাট গল্প বলিতে আর কেউ পারেও না। কিন্তু কোথায় হরিদাস! ঝড়ের রাত্রে তেঁতুলিয়ার সেই তাণ্ডব—হরিদাসের এক মাল্লাই নৌকা কি সে ধাক্কা সামলাইতে পারিয়াছে!

তাসের আসরে বসিয়া বলরাম অন্তমনস্ক হইয়া যান, ভুল করিয়া বসেন। সঙ্গীর সক্ষোভ চীৎকারে চেতনা ফিরিয়া আসে।

—আহা-হা তুরুপ করলেন না কবিরাজ মশাই! পিটটা শুধু শুধুই গেল।

কবিরাজ লজ্জিত হইয়া তাসে ফিরিয়া আসেন।

নূতন পোষ্টমাষ্টারও বেশ মজলিস জমানো লোক। তা ছাড়া খাসমহল অফিসের যোগেশবাবুও আসেন। মোটের উপর আড্ডাটা মন্দ জমে না।

তাস বাঁটিতে বাঁটিতে যোগেশবাবু বলেন, বুড়ো ডি-সুজা বোধ হয় পাগল হয়ে গেছে। কবিরাজ বলেন, তাই নাকি!

—হুঁ। সারাদিন চুপ করে বসে থাকে। কারো সঙ্গে কথা কয়না। রাত্রে চীৎকার করে কাঁদে। বড্ড শোক পেয়েছে লোকটা!

কবিরাজ বলেন, বদলোকের অমনিই হয়। মগ-টগগুলোর স্বভাবই ওই রকম।

যোগেশবাবু হাসেন, শয়তানের বন্ধুত্বই অমনি! তা ছাড়া বিশ্বাস করার নিয়মই এই। যে তোমাকে বেশি বিশ্বাস করবে, তাকেই তুমি বেশি করে ঠকাবে, তত বেশী করে সর্বনাশ করবে তার। এ নইলে আর কলিকাল বলে কেন!

খচ্‌ করিয়া কথাটা তীরের মতো আসিয়া বলরামের পাঁজরে বিঁধিয়া যায়। মুক্তোও তাহাকে বিশ্বাস করিত, খুব বেশি করিয়াই বিশ্বাস করিত। বলরাম তাঁহার যথাযোগ্য প্রতিদানই দিয়াছেন বটে। করবীর গোটা খাইয়া মুক্তো এখন তাহার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করিতে চায় বুঝি।

বলরাম জোর করিয়া হাসেন। মৃদু মৃদু হাসেন—তারপরে হো হো করিয়া অট্টহাসি। যোগেশবাবু খানিকটা বিস্ময় বোধ করেন। তাঁহার কথার মধ্যে হাসাইবার এতটা উপাদান যে আছে সে কথা তিনি জানিতেন না। তাঁহার চোখের দিকে চোখ পড়িতেই আকস্মিকভাবে বলরাম থামিয়া যান—আরো বিস্ময়কর বলিয়া যোগেশবাবুর মনে হয় সেটাকে।

—কবিরাজ মশাই এই সাত সকালেই কিছু মোদক খেয়েছেন বুঝি?

—মোদক! না তো—অকারণেই কবিরাজের চোখ মুখ রাঙা হইয়া ওঠে।

তারপর সভা ভাঙিয়া যায়। সকলে বাহির হইয়া গেলে কবিরাজ একা বসিয়া থাকেন চুপ করিয়া। ফরসীর আগুন আপনা হইতেই নিবিয়া আসে, তারপর হাওয়ায় হাওয়ায় ঘরময় ছাই উড়িয়া বেড়ায়। দেওয়ালে কাঁচ ভাঙা ঘড়িটা কাঠ ঠোকরার মতো রুক্ষভাবে ঠক্‌ ঠক্‌ করে। বাজনাটায় কেমন করিয়া টান লাগিয়াছে—ন'টার সময় ঢং ঢং করিয়া বারোটা বাজিয়া যায়। কবিরাজের একবার মনে হয় উঠিয়া বাজনাটা ঠিক করিয়া দিবেন, কিন্তু দেহে মনে কোথাও কোনো প্রেরণা আসিতে চায় না। চীনা ছবির অনাবৃতাঙ্গ মেয়েটির মোহিনী হাসির উপর মাকড়সারা নিঃশব্দে জাল বুনিয়া চলে।

ওদিকে অন্তঃপুরে খোলা জানালার সামনে মুক্তোও নীরবে বসিয়া থাকে। দূরে দেখা যায় নদী—একটা মরুভূমির মতো ধূ ধূ করে যেন। বাতাসে মুক্তোর রুক্ষ চুলগুলি মুখের উপর পড়িয়া কাঁপে। সমস্ত চেহারায় রুক্ষ পাণ্ডুরতা, কেবল চোখ দুটি কিসের স্পর্শে অত্যন্ত উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। দেহের পরিবর্তন অতিশয় সুস্পষ্ট।

মুক্তো কী ভাবে কে জানে। বলরাম তাহার মনের কোনো সন্ধান পান না, তলও পান না আজকাল। মুক্তো যথাসাধ্য এড়াইয়া চলে তাহাকে। রাত্রে ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দেয়। আশ্চর্য এই যে, চরম যাহা কিছু তাহা ঘটিবার পরে সে বলরামকে ভয় করিতে সুরু করিয়াছে।

আগে দরজা সে বন্ধ করিত না। কিন্তু দু'দিন আগে একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেছে।

ঝড়ের পর হইতে বলরাম আলাদাই থাকেন। নিজের মধ্যে কেমন একটা অপরাধীর ভাব আসিয়াছে তাঁর, মুক্তোকে

স্পর্শ করিতেই যেন তিনি সংকোচ বোধ করেন। তা ছাড়া সে-ও যে তাঁহাকে এড়াইয়া চলিতে পারিলেই খুশি থাকিবে, ইহাও বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হয় নাই।

কিন্তু মধ্যরাত্রে ঘুম ভাঙ্গিয়া বলরাম অত্যন্ত নিঃসঙ্গ বোধ করিলেন। সেই নিঃসঙ্গতা—মুক্তো চব্বিশমাইলে আসিবার পূর্বেকার সেই অনুভূতি। দেহ এবং মন একটা সুতীব্র বেদনায় আচ্ছন্ন হইয়া উঠিতেছে। বলরাম বিছানায় উঠিয়া বসিলেন। জানালার ও-পারে চাঁদ উঠিয়াছে। বাতাসে চামেলির গন্ধ। নদীর হাওয়ায় শীত করিতেছে—অভ্যন্ত খানিকটা দেহের উত্তাপ পাইবার জন্ম যেন লালায়িত হইয়া উঠিলেন বলরাম। স্বপ্নচারণার মতো নিঃশব্দে দরজা ঠেলিয়া তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। পাশের ঘরে মুক্তো অঘোরে ঘুমাইতেছে। দরজাটা ভেজানো, ধাক্কা দিতেই খুলিয়া গেল।

বিড়ালের মতো সতর্ক পা ফেলিয়া বলরাম আসিয়া দাঁড়াইলেন মুক্তোর পাশে। নিদ্রিত শান্ত মুখের উপর জ্যোৎস্নার পত্ররচনা। চোখের কোণে জল শুকাইয়া আছে—বাঁ গালের উপর উজ্জ্বল একটা সরল রেখা। নাকের সোনার ফুলটা করুণভাবে জ্বলিতেছে। পূর্ণায়মান দেহশ্রী অসম্বৃত বস্ত্রের অবকাশে উদ্ঘাটিত হইয়া আছে—যেন আত্মসমর্পণ করিতেছে নিজেকে। একটা অহেতুক করুণায় বলরামের মনটা ভরিয়া উঠিল।

ধীরে ধীরে নত হইয়া বলরাম মুক্তোকে স্পর্শ করিলেন।

ঘুমের মধ্যে যেন সাপে কামড়াইয়াছে ঠিক এম্নি ভাবে চমকিয়া মুক্তো উঠিয়া বসিল। খোলা চুলগুলি তাহার ঘাড়ে বুকে ছড়াইয়া পড়িল, তাহার চোখের দৃষ্টি মনে হইল যেন পাগলের মতো। তারপর বলরাম কিছু ভাবিবার বা বলিবার আগেই মুক্তো তারস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, যাও তুমি!

বলরাম হকচকিত হইয়া পিছাইয়া আসিলেন! সবিস্ময়ে বলিলেন, মুক্তো!

মুক্তো কান্নায় প্রায় ভাঙিয়া পড়িল, না—না—যাও তুমি।

বলরামের স্বর করুণ হইয়া উঠিল, আহা-হা, কেন তুমি—

—তুমি যাও, নইলে আমি চেঁচিয়ে সব জাগিয়ে তুলব বলছি—উত্তেজনায় মুক্তো সোজা দাঁড়াইয়া উঠিল একেবারে। তাহার সর্বাঙ্গ তখন থর থর করিয়া কাঁপিতেছে।

বলরাম কয়েক মুহূর্ত নির্বোধের মতো দাঁড়াইয়া রহিলেন, তারপর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে অপরাধীর মতো বাহির হইয়া গেলেন। মুক্তো দিনের পর দিন যেমন দুর্বোধ, তেমনি দুরধিগম্য হইয়া উঠিতেছে। জ্বরাতিসারের লক্ষণগুলিও এমন জটিল নয় বোধ হয়। নিদানেরও অতীত।

বলরাম বাহির হইয়া গেলে মুক্তো সজোরে দরজায় খিল আঁটিয়া দিল। বলরাম সম্পর্কে সম্প্রতি কেন যে এই অহেতুক ভয় তাহার মনে জাগিয়াছে সে তাহা নিজেও বুঝিতে পারেনা।

প্রথম মনে হইয়াছিল সে আত্মহত্যা করিবে। রাত্রির সেই কুৎসিৎ মোহগ্রস্ত আত্ম-সমর্পণগুলি মাঝে মাঝে তাহাকে পীড়া দিত বটে, কিন্তু মোটের উপর সেগুলিকে সে সহজ করিয়াই লইয়াছিল একরকম। তারপর যখন সন্তান আসিয়া সাড়া দিল, তখন ঘৃণা এবং লজ্জায় মুক্তো আত্ম-বিস্মৃত হইয়া গেল একেবারে। হইলই বা পাণ্ডব-বর্জিত দেশ, লোক লজ্জা না হয় না-ই থাকিল, কিন্তু মনকে সে বুঝাইবে কী বলিয়া এবং কী করিয়া!

অতএব সে আত্মহত্যার সংকল্প করিল। কিন্তু ভয় করে আত্মহত্যা করিতে। মনে পড়িয়া যায় গ্রামের বলাই পালকে, গলার নলীতে একটা ভোঁতা ক্ষুর বসাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছিল। তবুও একবার সে সাড়ীটাকে বেশ করিয়া দড়ির মতো পাকাইয়া চালের পাটাতনের উচ্চতাও হিসাব করিয়াছিল পর্যন্ত। কিন্তু ধীরে ধীরে একটা অদ্ভুত কৌতূহল তাহার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া দিল।

সন্তান আসিতেছে। তাহার দেহের অভ্যন্তরে ছোট একটি মাংস পিণ্ডের আকারে একটা নূতন বিস্ময় রূপ পাইতেছে। নিজের রক্ত দিয়া, আয়ু দিয়া মুক্তো পালন করিতেছে তাহাকে—গড়িয়া তুলিতেছে প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে তাহাকে পূর্ণ করিয়া। নিজের মধ্যে এই বিরাট্ শক্তি—এই বিশাল সৃষ্টি-ক্ষমতার কথা ভাবিয়া আজ আর মুক্তোর বিস্ময়ের সীমা রহিলনা। স্বামী-পরিত্যক্ত বিড়ম্বিত তাহার জীবন—গ্রামের মেয়ের পরম কাম্য এবং একান্ত লোভের বস্তু সন্তানকে পাইবার দুরাকাঙ্ক্ষা সে ভুলেও করিতে পারে নাই। অন্যের শিশুকে লোভীর মতো বুকে টানিয়া লইয়াছে, কিন্তু তাহাতে ব্যথাই বাড়িয়াছে শুধু, কিছুমাত্র কমে নাই! সেই সন্তান! সেই সন্তানের জননী হইতে চলিয়াছে সে! অকস্মাৎ নিজের জীবনের প্রতি মুক্তোর অত্যন্ত মমতাবোধ হইল। সে বাঁচিতে চায়, নিজের সৃষ্টিকে সে স্থায়ী করিয়া যাইতে চায় এই পৃথিবীর বুকে। কিন্তু পিতৃ-পরিচয়? না—অত কথা, অত ভবিষ্যতের ভাবনা সে ভাবিতে চায়না। এক মাত্র মাতৃত্বেই তাহার লোভ—দুর্বার এবং প্রচণ্ড।…

বলরামকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিয়া মুক্তো যখন জানালার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন তাহার ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতেছে, হৃৎপিণ্ড দুইটায় আন্দোলন চলিতেছে প্রমত্তভাবে। এতক্ষণে—এতক্ষণে সে বুঝিয়াছে বলরামকে কেন সে এত ভয় করিতেছে। এই পিতৃত্ব বলরাম চায়না—এই পিতৃত্ব তাহার পক্ষে অভিশাপ। তাই বলরামের ভীরু দৃষ্টির মধ্যে মুক্তো দেখিয়াছে হত্যাকারীর চোখ—তাহার সন্তানকে হত্যা করিয়া কাপুরুষ দায়মুক্ত হইতে চায়। নির্বোধ সারল্যের নেপথ্যে ঝকঝক করিতেছে তীক্ষ্ণাগ্র ছুরির ফলক।

তড়িৎগতিতে একটা তীব্র বেদনা পেটের মধ্য হইতে ঠেলিয়া উঠিয়া ব্যথায় যেন সর্বাঙ্গ অবশ করিয়া দিল মুক্তোর। তাহার দেহের নিভৃত রহস্যলোক হইতে একটা জীবন্ত সত্তা কিসের যেন ক্রুদ্ধ আক্রোশে থাকিয়া থাকিয়া তাহার পাঁজরে ক্রমাগত আঘাত করিতেছে। ব্যথায় মুক্তোর সমস্ত শরীর আচ্ছন্ন হইয়া আসিল, চোখ দুটি বুঁজিয়া আসিল। জানালার শিক ধরিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল সে।

মণিমোহনের দিনগুলি কাটিতে লাগিল পুরাতনের পুনরাবৃত্তি করিয়া। প্রজাদের ডাকাইয়া আনা, টাকার জন্ম তাগিদ দেওয়া। অপরিচ্ছন্ন অমার্জিত নানাস্তরের লোকের ভিড়। অশ্রান্ত বকুনি শোনা এবং অবিশ্রামভাবে বকিয়া যাওয়া।

দেখা গেল—দেনাটা মজাঃফর মিঞারই সব চাইতে বেশি এবং সেই জন্ম তোবামোদটাও তাহার দৈনন্দিন হইয়া দাঁড়াইল। ব্যাপারটা গোপীনাথই অনুধাবন করিল সব চাইতে আগে এবং আর যাই হোক, মণিমোহনের নৌকায় মুরগীর অভাব রহিল না।

মজাঃফর মিঞা অনুতপ্ত বোধ করিতে লাগিল। শৃগালকে ভাঙা বেড়া দেখানো সম্পর্কে প্রচলিত প্রবচনটি মনে পড়িল তাহার। এইভাবে প্রতিদিন মন যোগাইবার দুষ্কর চেষ্টা না করিয়া কয়েকটা টাকা ফেলিয়া দিলেই তো চুকিয়া যাইত। কিন্তু যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে—এখন প্রায়শ্চিত্ত চলিবে।

গোপীনাথের তাহাতেও তৃপ্তি নাই—তাহার উদরে ভূমা আসিয়া বাসা বাঁধিয়াছে। বলে, রোজ রোজ আর মুরগী খেতে ভালো লাগেনা মিঞা, খাসী টাসী খাওয়াও একটা।

—খাসী!—জাফরাণ রাঙানো দাড়ির মধ্যে মজাঃফর মিঞার বিপন্ন আঙুলগুলি শক্ত হইয়া আসে; তাইতো খাসী!

গোপীনাথ অধৈর্য হইয়া ওঠে, হাঁ-হাঁ, খাসী। বেশ তেল চুক্‌চুকে। আমরা হিঁদুর ছেলে, তোমাদের ওই কুকড়ো মুকড়ো আর কতদিন সহ্য হয়! জুৎসই একটা খাসী পেলে বেশ প্রেম্ সে—গোপীনাথ জিভ্ দিয়া একটা অর্থপূর্ণ সলোভ শব্দ করে।

—তাই তো বাবু, খাসী কোথায় পাওয়া যাবে।

কোথা হইতে কাসেম খাঁর ব্যাটা আসিয়া ছোঁ মারিয়া কাড়িয়া নেয় কথাটা। মজাঃফর মিঞাকে বিপন্ন করিবার জন্যই যেন সে সব সময়ে খাপ পাতিয়া আছে!

বলে, কেন চাচা, অমন ইয়া ইয়া তোমার খাসী, দশ পনেরো সের গোস্ত হবে এক একটায়। তারই একটা দিয়ে দাওনা বাবুদের।

গোপীনাথ সোৎসাহে বলে, বটে, বটে!

দুই চোখে আগুন জ্বলিয়া ওঠে মজাঃফর মিঞার। এই হতভাগা ছোকরাটাই তাহাকে ডুবাইবে। কবে সে তাহার ক্ষেতে মহিষ নামাইয়া জোর করিয়া ধান খাওয়াইয়াছে, তাহার শোক আজো ভুলিতে পারিল না। কোথায় থাকে কে জানে—ঝোপ বুঝিয়া কোপ মারিয়া দেয় নির্ঘাৎ।

মজাঃফর করুণ কণ্ঠে বলে, বিশ্বাস করবেন না হুজুর, বিশ্বাস করবেন না। ও চ্যাংড়া ভয়ানক মিথ্যেবাদী। দিনকে রাত করতে পারে ও।

ছোকরাও ছাড়িবার পাত্র নয়। সে সভাস্থ সকলকে তৎক্ষণাৎ সাক্ষী মানিয়া বসে। বলে, আমি মিথ্যে বলছি? তা হলে হুজুর নিজেই যাচাই করে নিন। এই ইয়াকুব রয়েছে, এই আলিমুদ্দীন আছে, ওই জাফর—সবাইকে জিজ্ঞেস্ করুন, মজাঃফর চাচার তিনটে বড় বড় খাসী আছে কিনা।

এসব কথা আর আলোচনা খুব বেশি করিয়া সাড়া তোলেনা মণিমোহনের মনে। তাহার সমস্ত চেতনায় কেমন একটা আলোড়ন সুরু হইয়াছে। এই জল, এই আকাশ বাতাস—উপনিবেশের এই সব বিচিত্র মানুষের দল। ইহারা ক্রমেই মণিমোহনের ভাবনায় প্রেতচ্ছায়া ফেলিতেছে, যেন কী একটা অদ্ভুত জিনিস সঞ্চার করিতেছে তাহার রক্তে। বিদ্রোহী প্রমিথিয়ুস্ যেদিন আগুন আনিয়াছিল, সেদিন সে আগুনের ব্যবহার কাহারো জানা ছিলনা—সে আগুন নিজেদের ঘরে লাগাইয়া দিয়া অন্ধ উল্লাসে তাহারা উৎসব করিয়াছিল হয়তো। সেই মূঢ় আনন্দ আসিয়া যেন তাহাকে আচ্ছন্ন করিতে চায়, নিজের শিক্ষা-দীক্ষা সব কিছুকে বিদ্রোহের আগুনে দগ্ধ করিয়া—

বোটে বসিয়া মণিমোহন দেখে জল বহিয়া চলিয়াছে। অবিশ্রাম—অতলস্পর্শ। পাল তুলিয়া মাঝে মাঝে নৌকা যায়। মহাজনী নৌকার দীর্ঘ মাস্তুলের আগায় কাক বসিয়া থাকে ধ্বজার মতো।

মণিমোহনের মাঝিয়া আলাপ করিতে চায়। ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করে, নৌকা কোথা থেকে আসছে ভাই!

হয়তো জবাব আসে, লালমোহন।

—কোথায় যাবে?

—ওপারে। আমতলী হয়ে বগার বন্দরে।

বগা। নামটা অপরিচিত নয় একেবারেই। পটুয়াখালি মহকুমার স্বনামধন্য বন্দর আর গঞ্জ। এত বড় প্রকাণ্ড ধান আর চাউলের আড়ত বাংলা দেশের শস্যভাণ্ডার এই জেলাতেও খুব বেশি নাই। লক্ষপতি মহাজনেরা ওখানে ধান চাউলের পাহাড়ের উপর বসিয়া দেশের ক্ষুধার্ত অঞ্জলিতে মুষ্টিভিক্ষা বর্ষণ করিতেছে—অবশ্য মূল্য বিনিময়ে। আর—সেই সঙ্গে ভাবিয়া বিস্ময় লাগে যে বরিশাল জেলায় দুর্ভিক্ষ চলিতেছে। সরকার হইতে বীজধান কিনিবার ও আবাদ করিবার জন্য চাষীদের যে টাকা ধার দেওয়া হইয়াছিল, সে টাকা আদায় করিবার জন্যই তাহার এই অভিযান।

গোপীনাথ আসিয়া বলে, এবার তো খুব ভালো ধান হয়েছিল বাবু। তবু দেশের অবস্থা যে কে সেই।

ভালো ধান হইয়াছিল তা সত্য। মণিমোহন নিজের চোখেই তো দেখিয়াছে। এই কালুপাড়া—শুধু কালুপাড়া কেন—আশে পাশের যে কোনো চরের দিকে তাকাইলেই লক্ষ্মীশ্রীতে চোখ ভরিয়া তুলিত একেবারে। বৃষ্টি হইয়াছে নিয়মিত, বর্ষার বানে নতুন পলি পড়িয়া ধানের ক্ষেত উর্বরা হইয়াছে। আর ধানের শীষগুলি পরিপুষ্ট শাঁসে সমৃদ্ধ হইয়া বাতাসে দোল খাইতেছে। ধীরে ধীরে মেঘ-বরণ সেই ধানে সোনার আভা লাগিল। দুদিন পরেই কাস্তে পড়িবে—দেশ ও জাতির সমস্ত স্বপ্ন আর আশা উদ্‌গ্রীব চোখ মেলিয়া তাকাইয়া আছে এই ধানের দিকেই।

কিন্তু স্বপ্ন আর আশা। কতটুকু তাহার ফলিল, সার্থকতা লাভ করিল কী পরিমাণে। পৃথিবীর খনি হইতে যাহারা জীবন-মূল্যে এই সোনা আহরণ করিল, তাহাদের বুভুক্ষু চোখের সামনে দিয়া তাহা চলিয়া গেল বগায়, সাহেবগঞ্জে, টর্কীতে আর ঝালকাঠির বন্দরে। মহাজনের গোলায় বস্তা ভরিয়া সেই ধান আশ্রয় পাইল। তারপর—তারপর?

তারপর যাহা চিরকাল ঘটিয়া আসিতেছে। দুর্ভিক্ষ—ওটা তো লাগিয়াই আছে—গাছে পাতা এবং মাঠে ঘাস থাকিতে কোনো দুশ্চিন্তা নাই সেজন্য।

কিন্তু এ সব ভাবিয়া মণিমোহনের বিশ্রী লাগে। কেন সে

ভাবিতে চায় এত কথা ? চাকরী করিতে আসিয়াছে, চাকরীই করিয়া যাইবে।

গোপীনাথ আসিয়া মাঝে মাঝে গল্প করিতে চায়। দেশের কথা, বউয়ের কথা। মণিমোহনকে সে সমব্যথী বলিয়াই জানে।

বলে, এবার বিশে ফাল্গুন দোলযাত্রা।

মণিমোহন হাসিয়া বলে, তাই নাকি ? কী করে জানলে ?

—বাঃ জানব না ? গোপীনাথ চোখ বড় বড় করিয়া বলে, হিন্দুর ছেলে !

—কিন্তু জেনে কী লাভ ?

—কী লাভ ? তাই বটে। সব সময়ে সে কথা মনে থাকেনা। গোপীনাথ বিষণ্ণ আর গম্ভীর হইয়া যায়। যা দেশ ! দোল-দুর্গোৎসব যাহা কিছু, কাহারো কোনো মূল্য নাই। চাকুরীর দুর্ভাগা জীবন। খাতা খুলিয়া হিসাব লেখা, প্রজাদের সঙ্গে বকাবকি করা, টাকা পয়সা গুণিয়া লওয়া আর মাঝে মাঝে এক আধটা মুরগীর ঠ্যাং চর্বণ। ইহাই আদি এবং ইহাই অন্ত।

—গত বছর দোলের সময়—বলিয়াই থামিয়া যায় গোপীনাথ। মনটা ব্যাকুল হইয়া ওঠে তাহার। এ-ও তো বাংলা দেশ—বাংলা দেশ ? এ যেন আর এক পৃথিবী। এখানকার মানুষগুলি প্রক্ষিপ্ত। দোল ইহাদেরও আছে, কিন্তু মানুষের রক্তে। জমি লইয়া, ধান কাটা লইয়া।

গোপীনাথ বসিয়া বসিয়া খানিকক্ষণ দেশের গল্প করে, বউয়ের কথা বলে, নিজের পাঁচ বছর ছেলেটার কথা ভাবিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তারপর উঠিয়া যায় রান্না চাপাইতে। বজরার বাহিরে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসে, ডায়েরীর লেখাগুলো ক্রমশঃ অস্পষ্ট হইয়া মিলাইয়া যায়, মণিমোহন আসিয়া দাঁড়ায় বজরার ছাদের উপর। নদী অসম্ভব শান্ত। যেন ঘুম-পাড়ানি গান গাহিয়া চলিয়াছে। (ক্রমশঃ)

ব্রহ্মের নরনারী

শ্রীরমোলা দে

রেঙ্গুণে থাকবার সময়ে ওদেশের নারী ও পুরুষদের সম্বন্ধে আমার যে সামান্য অভিজ্ঞতা হয়েছিল এখানে তাই কিছু বলব।

রেঙ্গুণে পদার্পণ ক'রে প্রথম নজরে পড়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাস্তাগুলি। তারপর পুরুষ ও নারীর বেশ, তারা নানা রঙের লুঙ্গি ও এঙ্গি প'রে রাস্তা দিয়ে চলেছে। মেয়েরা এখন আগেকার দিনের মত কেশ রচনা করে না, কেবল পিছনে একটা বড় চিরুণী গুঁজে তার চারিদিকে চুলগুলি জড়িয়ে দেয়। বিবাহ, শ্রাদ্ধ, এই সব সামাজিক ব্যাপারে, গার্ডেন্-পার্টি ও রেসে যেতে হ'লে প্রাচীনকালের মত খোঁপা বাঁধে। ওরা কিন্তু ফুল নিত্যনিয়মিতভাবে মাথায় দেয়। তাজা ফুল না পেলে কাপড়ের ফুল খোঁপায় গোঁজে।

কোন বার্ম্মিস্ বাড়ীতে গেলে সদর দরজা পার হ'য়ে জুতো খুলে রাখতে হয়, প্রতি গৃহে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি আছে ছোট্ট মন্দিরের মধ্যে, তাই এই ব্যবস্থা। আমাদের দেশের মতন এরা অতিথিকে সরবৎ, পান দিয়ে অভ্যর্থনা করে। আমাদের মতন মাছ, ও ভাত এদের প্রধান খাদ্য, নানা রকম শাকপাতা ও শুকনো মাছ এদের বড় প্রিয় জিনিষ। তরুণীরা ঠাকুমা দিদিমাদের মত আর বড় বড় সিগার খায় না, কেউ কেউ সিগারেট খায়। পুরুষদের মধ্যে পান-দোষ অতিরিক্ত রকম দেখা যায়।

জুয়া খেলায় এদের ভীষণ রকম নেশা। একজন বার্ম্মিস পুরুষ বলেছিলেন—ব্রহ্মদেশের প্রধান ব্যবসা কি ? না—জুয়া।

দোকান ও বাজারে মেয়েরাই জিনিষ পত্র কেনাবেচা করে, যে কজন পুরুষ দোকানী আছে, সকলেই প্রায় ভারতবর্ষের লোক।

এত স্বাধীনভাবে থেকেও ওদেশের মেয়েরা শান্ত ও বিনয়ী, অবগুণ্ঠনহীনা হ'য়েও লজ্জাকে দেশছাড়া করেনি।

ওদের একটা খুব সুন্দর রীতি দেখলাম, ছুটির দিন হ'লেই বাড়ীর সকল মেয়ে ও ছেলেরা টুকরী বা টিফিন-ক্যারিয়ারে ক'রে খাবার নিয়ে বাগান কি হ্রদের ধারে গিয়ে বনভোজন করে, সারাদিন আনন্দ উৎসব ক'রে সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে আসে।

আমাদের দোলের উৎসবের মতন ওদের বর্ষা-আবাহন ক'রে একটি জল-খেলার উৎসব হয়, মোটর, লরী, বাস ইত্যাদিতে মেয়ে পুরুষ সকলে উঠে পিচকারী, Hose pipe দিয়ে রাস্তার পথিকদের গায়ে জল ছিটোতে থাকে, প্রত্যেক বাড়ীতে বাড়ীতে উৎসব চলে। স্নান করাবার পর সরবৎ, মিষ্টান্ন, পান খেতে দেয়।

বর্ম্মাতে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা সমাজ শাসন করেন, স্ত্রী-পুরুষ দুই দলেরই এঁদের প্রতি খুব ভক্তি আছে। উৎসবের দিনে স্বামী স্ত্রী সকল ছেলে মেয়েগুলিকে নিয়ে, ফুল, ফল ধূপধুনা দিয়ে পুজো করেন বৌদ্ধ মন্দিরে গিয়ে।

আমাদের দেশের মতন এরা দাসদাসীকে অনাদর করে না, তারা মনিবের সমান আহার্য্য পায়, সেবা যত্ন পায়। দাসদাসীরাও বড় বিনয়ী, মনিবকে কোন কথা জানাতে হ'লে বা কোন জিনিষ দিতে হ'লে, পাশে জানু পেতে ব'সে তবে সে-কাজ করে।

একটি ব্যাপারে আমার মন মুগ্ধ হয়েছিল, এদের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরাও নিজেদের জাতীয় পরিচ্ছদ ত্যাগ করেনি, ঘরে বাইরে এরা প্রায় সকলেই লুঙ্গি, এঙ্গিও শিরস্ত্রাণ ছাড়া আর বিদেশী কোন কাপড় পরেনা।

এদেশের মেয়েরা যেমন কর্ম্মঠ, পুরুষেরা তেমনি অলস। এই অলসতার সুযোগ নিয়ে ব্রহ্মদেশ এতদিন নানাজাতীয় পুরুষের ব্যবসাক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল, আজকের এই প্রলয়নৃত্যের পর হয়ত ব্রহ্মের পুরুষেরা আবার শক্তিশালী ও কর্ম্মপ্রিয় হয়ে উঠবে। এদের সম্বন্ধে একটি গল্প ওখানে শুনেছিলাম। একটি বৃদ্ধা বলেছিল,—আমাদের নিজের জাতের পুরুষদের চেয়ে, ভারতবর্ষের পুরুষদের আমরা পছন্দ করি, বিয়ে করি, কেন ? এদেশের ছেলেদের বিয়ে করলে নিজেদের ত খেটে খেতে হয়, উপরন্তু আমাদের রোজগারের পয়সা নিয়ে ওরা জুয়া খেলে নেশা ক'রে নষ্ট করবে। কিন্তু ভারতবর্ষের লোকেরা সেরকম নয়, তারা জুয়াও খেলে, নেশাও করে, কিন্তু আমাদের খাওয়ার পয়সা আগে দিয়ে তবে বদ্‌খেয়াল করে।

অভিনয়ের শেষ

শ্রীরাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

২

প্রীতি বাগচী আর অনুভা সেন চাকর সঙ্গে লইয়া কোন্ বাড়ি যেন বেড়াইতে গিয়াছিল, বাড়ি ফেরার পথে এবং প্রীতি বাগচীদের বাড়ির খুব কাছেই ভল্টুর সঙ্গে তাহাদের দেখা। ভল্টু চট্ করিয়া তাহাদের সাম্‌নে সাইকেল থামাইয়া মাটিতে একটা পা নামাইয়া দিয়া দাঁড়াইয়া গেল।

প্রীতি বলিল, কথার তোমার খুব ঠিক থাকে ভল্টুদা'। কাল আসবে কথা দিয়েছিলে, খুব এলে কিন্তু।

ভল্টু বলিল, ও আসিনি বুঝি? সময় করতে পারিনি প্রীতি, কাল নিশ্চয় আসবো। কাকীমাকে বলিস্, কাল আমি নিশ্চয় আসবো।

প্রীতি বলিল, আসবে শুধু নয়, একটু বেলা থাকতেই আসবে, আমি স্কুল থেকে দু'ঘণ্টা আগে ছুটি ক'রে চ'লে আসবো, তোমার সঙ্গে অনেকদিন ক্যারম্ খেলিনি—খেলবো। তোমার সঙ্গে না খেললে কারও সঙ্গে খেলে সুখ হয় না। তোমার সঙ্গে হেরেও সুখ আছে ভল্টুদা'।

বলিতে বলিতে প্রীতি ভল্টুর সাইকেলের হ্যাণ্ডেলটা চাপিয়া ধরিল। বলিল, কই কথা দাও, কাল নিশ্চয় আসবে।

—নিশ্চয় আসবো। তারপরে অনুভা যে একটি কথাও কইচো না! ব্যাপার কি!

অনুভা বলিল, প্রীতির কথাই আগে শেষ হোক্।

প্রীতি বলিল, কথা আমার শেষ হয়েচে, এইবার বল্ না মুখপুড়ি কত তোর কথা আছে?

অনুভা ও ভল্টু একসঙ্গেই প্রায় হাসিয়া উঠিল।

তাহাদের পাশ দিয়া দ্রুতগতিতে রাস্তার একপাশ চাপিয়া সাইকেলে করিয়া কে যেন চলিয়া গেল, খানিকটা আগাইয়া গিয়া সে বলিল, কে, ভল্টু না?

ভল্টু কোন' জবাব দিল না।

আচ্ছা, আজ তা'হ'লে আসি প্রীতি, আসি অনুভা—গুড্ নাইট!—বলিয়া সাইকেলটা পায়ে পায়ে একটু ঠেলিয়া নিয়া রীতিমত জোরেই সে সাইকেল চালাইয়া চলিয়া গেল।

বাগচী পাড়ার মুখের কাঠের পুল পার হইয়াই ভল্টু মহা সমস্যায় পড়িল। একবার এ-পাড়ায় ঢুকিলে আর রক্ষা নাই, ঘণ্টা চার পাঁচের পূর্ব্বে ছুটি মিলিবার কোন' সম্ভাবনা নাই।

পুল পার হইয়াই প্রথম বাড়ি হইল যামিনী বাগচীর। যামিনী বাগচী একজন ধনী জমিদার, আবার একজন ভাল ডাক্তারও। পসার তাহার খুব আছে। যামিনী বাগচীর মেয়ে সুনন্দা বাগচী শহরের মধ্যে সুরূপা বলিয়া খ্যাতি আছে। সুনন্দা চমৎকার অভিনয় করে।

ভল্টু সাইকেল হইতে নামিয়া বন্ধ দরজার কড়া খট্ খট্ করিয়া নাড়িল। যামিনী বাগচীর চাকর আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল।

ভল্টু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, বাবু কোথায়?

—বাবু কল্-এ গেচেন গোঁসাইপাড়া।

—দিদিমনি আছেন?

—আছেন। খবর দেব' তাঁকে?

—দাও।

সুনন্দা আসিয়া হাজির। একগাল হাসিয়া খুসি জানাইয়া সুনন্দা বলিল, আজ তুমি না এলে, কাল আমাকে লোক পাঠাতে হ'তো তোমার কাছে। তোমাকে একটা মস্ত কাজ করতে হবে ভল্টুদা'। পরশু আমরা পাড়ার মেয়েরা সব একটা প্লে করবো—আমাদের ভেতর বাড়ির উঠোনে ষ্টেজ বাঁধা হবে। তোমাকে প্রম্পটারের কাজ করতে হবে। মেজদা' একদিকের প্রম্পটারের কাজ চালাবেন, কিন্তু আর একদিক তোমাকে চালাতে হবে। আমরা সবাই তাই ঠিক করেচি।

ভল্টু বলিল, তথাস্তু সুনন্দা, কিন্তু পেট ভ'রে খাওয়া চাই।

সুনন্দা বলিল, তা লুচি-মাংস যত খেতে পারো—খাওয়াবো।

ভল্টু বলিল, কিন্তু কি প্লে হবে শুনি?

সুনন্দা বলিল, এভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তো আর সব শোনা যায় না, ভেতরে এসো, সবই শুনতে পাবে।

ভল্টু বলিল, না, আজ আর ভেতরে যাবো না সুনন্দা, আমার আজ অনেক কাজ, তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে। এইখান থেকেই আমাকে ছুটি দাও আজ। ভাল কথা, একখানা বই আমাকে দিয়ে দিলে পারতে সুনন্দা, একটু প'ড়ে রেখে দিতাম, নইলে হঠাৎ প্রম্পট্ করা একপ্রকার দুঃসাধ্য ব্যাপার।

সুনন্দা বলিল, তবে একটু দাঁড়াও, আমি বই এনে দি একখানা।

সুনন্দা অল্পপরেই তাহার হাতে আনিয়া একখানা 'বিল্বমঙ্গল' বই ধরিয়া দিল।

ভল্টু বলিল, যাক্, এ বই প্রম্পট্ করতে খুব অসুবিধা হবে না। কারণ, আমার নিজের করা আছে এ বই। তোমাদের বিল্বমঙ্গল সাজচে কে শুনি?

সুনন্দা বলিল, স্বয়ং সুনন্দাই সাজচে বিল্বমঙ্গল। কাল একবার বিকেলের দিকে আসবে ভল্টুদা'—আমাদের ফুল ড্রেস্ রিহার্শ্যাল আছে কাল। তা' হ'লে সব দেখে শুনে নিতে পাবো—কোন' অসুবিধা তা' হ'লে আর হয় না।

ভল্টু বলিল, আসতেই হবে। পরশু প্রম্পট্ করতে হ'লে কাল তো আসাই উচিত। নিশ্চয় আসবো। আজ কিন্তু এখুনি বিদেয়-নেব' সুনন্দা, কিছু মনে করতে পারবে না।

সুনন্দা বলিল, আচ্ছা, আজ তা' হ'লে এসো ভল্টুদা'।

ভল্টু বিদায় লইয়া চলিয়া গেল।

ইহারও পরে আরও পাঁচ বাড়িতে কাল সে নিশ্চয় আসিবে ও দেখা করিবে বলিয়া যখন বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হইল তখন রাত প্রায় সাড়ে বারোটা বাজে।

আজ রাত্রে সুনন্দাদের বাড়ি পাড়ার মেয়েরা 'বিল্বমঙ্গল' অভিনয় করিবে।

ভোরে উঠিয়াই ভল্টু তাই তাহার দ্বিচক্র যান লইয়া বাগচী পাড়ার উদ্দেশ্যে রওনা হইয়া পড়িল। ভল্টু আস্তে সাইকেল চালাইতে যেন জানেই না—একেবারে পূর্ণ গতিতে সাইকেল ছাড়িয়া দিল।

কাল রাত্রে বেশ ঝড় বৃষ্টি হইয়া গেছে। পথ-ঘাট এখনও কাদা আর জলে পিছল হইয়া আছে। সেদিকে ভল্টুর কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নাই। কাল রাত্রের ঝড় বৃষ্টির পরে বাগচীপাড়ার পুরাতন কাঠের পুলের উপর দিয়া একখানা ঘোড়ার গাড়ী পার হইতে গিয়া পুল ভাঙ্গিয়া মহাকাণ্ড বাঁধাইয়া তোলে। গাড়ী কোন' রকমে ওপারে টানাটানি করিয়া লইয়া যাওয়া হয়, কিন্তু পুলটা একেবারে অকেজো হইয়া যায়।

ভল্টু তীরবেগে আসিয়া সেই পুলের উপর সাইকেল লইয়া উঠিল। তারপরেই পুলের দুরবস্থা দেখিয়া তাহার মাথা কেমন ঘুরিয়া গেল, কিন্তু ভাবিয়া কিছু ঠিক করিবার পূর্ব্বেই সাইকেলটা একটা পাক খাইয়া একটা ফাটলের মধ্যে দলমোচা পাকাইয়া জমিয়া গেল, আর ভল্টু উল্টাইয়া ঘুরিয়া পড়িয়া একেবারে জলের মধ্যে আসিয়া সশব্দে আশ্রয় লইল। ভল্টুর কপাল ভাল—মাথায় কোন' চোট লাগিল না, ডান পায়ের হাঁটুটায় চোট লাগিয়া গেল। পুলের একটা তক্তা যেন তাহার সঙ্গে খসিয়া পড়িল, কিন্তু তাহাতে পায়ের হাঁটুতে ভিন্ন অন্য কোথাও তাহার চোট লাগে নাই।

সুনন্দা বাগচী ও অতসী সান্ন্যাল ঠিক এই সময়েই পুলটা দেখিতে আসিতেছিল। কারণ পূর্ব্বরাত্রে পুল ভাঙ্গার কাহিনী বাগচীপাড়ার সকলেই তখন জানিয়া গেছে। সুনন্দা ও অতসী যদি আর দুই তিন মিনিট আগেও বাড়ি হইতে বাহির হইত তাহা হইলে ভল্টুর এ দুর্গতি আর হইত না। তাহারা দূর হইতেই ভল্টুকে সাবধান করিয়া দিতে পারিত।

সুনন্দা ও অতসী দূর হইতে একটা লোককে সাইকেল লইয়া যেন পাক খাইয়া নিচে পড়িতে দেখিল। তাহারা দ্রুত তাই পুলের কাছে আসিয়া পড়িল।

ভল্টু তখন জল হইতে উঠিয়া পুলের নিচেকার ডাঙ্গার উপর উঠিয়া বসিয়াছে। ডান পায়ের হাঁটুতে তাহার বিশেষ চোট লাগিয়াছে—জল দিয়া তাহাই সে সাধ্যমত মালিশ করিতেছে।

সুনন্দা ও অতসী কাছে আসিয়া পুলের উপর তালগোল পাকানো সাইকেল দেখিয়াই আঁৎকাইয়া উঠিল। তাইতো! সর্ব্বনাশ! তবে তো ভল্টুদারই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। কিন্তু ভল্টুকে তাহারা প্রথম দেখিতে না পাইয়া মহাশঙ্কিত হইয়া উঠিল। ভল্টুদা' কি চোট খাইয়া জলের মধ্যেই ডুবিয়া রহিল নাকি?

সুনন্দা আতঙ্কে চীৎকার করিয়া ডাকিল, ভল্টুদা'।

ভল্টু বলিল, এই যে আমি, কোন' ভয় নেই, চোট বেশী লাগেনি।

সুনন্দা পুলের নিচে নামিয়া ভল্টুর কাছে আসিয়া বলিল, আমার হাত ধরো। এখানে প'ড়ে থাকলে কোন' ব্যবস্থাই হবে না। কোন রকমে অতসী আর আমি তোমাকে ধরাধরি ক'রে আমাদের বাড়ি নিয়ে যাই, তারপর সেখানে সব ডাক্তারি ব্যবস্থা হবে'খন। তুমি আমাদের হাত ধ'রে যেতে পারবে তো, না আরও লোকের ব্যবস্থা করবো, বোঝ'?

ভল্টু বলিল, আর কাউকে ডাকতে হবে না, তোমাদের দু'জনার সাহায্য পেলেই আমি তোমাদের বাড়ি পর্য্যন্ত পৌঁছুতে পারবো। ভগবান তোমাকে যথাসময়ে পাঠিয়েছেন দেখছি সুনন্দা।

সুনন্দা বলিল, আর একটু আগে পাঠালে তো এ দুর্দ্দশা তোমার হ'তো না। আমরা ভাঙ্গা পুল দেখতেই তো আসছিলাম।

সুনন্দা ও অতসী দুইদিক হইতে ভল্টুকে ধরিল, ভল্টু তাহাদের উভয়ের কাঁধের উপর যথাসম্ভব ভার রাখিয়া উপরে উঠিয়া আসিল। এই অবস্থায় কোন রকমে তাহারা ভল্টুকে সুনন্দাদের বৈঠকখানা ঘরে আনিয়া তুলিল। একটা চাকরকে ডাকিয়া ভল্টুর কাপড়-চোপড় বদলাইয়া দেওয়া হইল এবং আর একজন লোককে পাঠাইয়া দেওয়া হইল সাইকেলটা পুলের উপর হইতে লইয়া আসার জন্য।

যামিনী বাগচী কল্-এ বাহির হইয়াছিল, অল্প পরেই ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, তাহারই বৈঠকখানায় ভল্টু স্বয়ং জখমী রোগী। সুনন্দার মুখে আদ্যোপান্ত সব শুনিয়া যামিনী বাগচী ভল্টুর কাছে আগাইয়া গিয়া বলিলেন, কোথায় চোট লেগেচে দেখি?

ভল্টু ডান পায়ের হাঁটু দেখাইয়া দিয়া বলিল, এই হাঁটুতে, আর কোথাও লাগেনি।

যামিনী বাগচী ভাল করিয়া চোট পরীক্ষা করিয়া বলিল, না, তেমন কোন জখম হয় নি, ভাববার কিছু নেই। খানিকটা চূণ-হলুদ গরম ক'রে বেঁধে দিলেই ও-বেলার মধ্যে ব্যথা ক'মে যাবে।

সুনন্দা আনন্দে তখনি চূণ-হলুদ গরম করিতে চলিয়া গেল। তারপরে চূণ-হলুদ ভাল করিয়া মাখাইয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিয়া বলিল, এই সোফাতেই শুয়ে থাকো, আমি তোমার জন্যে গরম দুধ নিয়ে আসচি এক বাটি।

ডাক্তারির কোন প্রয়োজন হইল না। সুনন্দার সেবা-পরিচর্য্যায় ভল্টু ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই রীতিমত চাঙ্গা হইয়া উঠিল। সামান্য চোটটাও সে যেন ভুলিয়া গেল।

কিন্তু নিজের দ্বিচক্র যানটার প্রতি চাহিয়া চোখে তাহার জল আসিয়া গেল—একদিনের সচল দ্বিচক্র যান এখন বৈঠকখানার একপাশে তালগোল পাকাইয়া পড়িয়া আছে। সারাইয়া আবার ঠিক করা হইবে, কিন্তু পূর্ব্ব গৌরব আরতো তাহার ফিরিয়া আসিবে না।

সুনন্দা কিছুতেই শুনিল না। লোক মারফৎ ভল্টুর বাড়িতে চিঠি লিখিয়া সংবাদ পাঠাইয়া দিল এবং ভল্টুকে এখানেই লুচির দ্বারা ভালভাবে আহারাদি শেষ করাইল। যামিনী বাগচী ভাত দিতে নিষেধ করায় লুচির ব্যবস্থা করা হইল। রাত্রেও ভাত খাইতে নিষেধ করিয়া দিল। বেলা বারোটা একটার সময় একখানি সাইকেল রিক্শা ডাকাইয়া একজন লোক সঙ্গে দিয়া ভল্টুকে সুনন্দা বাড়ি পাঠাইয়া দিল।

বিদায় কালে সুনন্দা বলিল, রাত্রে আমাদের থিয়েটার। বাড়ি গিয়ে আর দু'একবার চূণ-হলুদ গরম ক'রে লাগিয়ে দিও। ব্যথাটা যদি আর না বাড়ে, তা'হ'লে এসো কিন্তু ভল্টুদা—প্রম্প্টার কিন্তু আমরা আর কাউকে ঠিক করিনি।

ভল্টু বলিল, ব্যথা যেমনই থাক্ আমি আসবো, আসবো।

সুনন্দা হাসিয়া বলিল, কৃতজ্ঞতা!

ভলটু বলিল, না, আরও বড় কিছু, আর একদিন শুনো।

সুনন্দা বলিল, আচ্ছা!

ভলটু যথাকালে আসিয়া হাজির। সাইকেল রিক্শা হইতে তাহাকে ধরিয়া নামাইতে হইল। সঙ্গে সে একখানি লাঠিও লইয়া আসিয়াছে। লাঠি দেখিয়া সুনন্দা হাসিল। ভলটু বলিল, প্লে খারাপ করলে এই লাঠির সদ্ব্যবহার করা হবে তোমার পিঠে সুনন্দা।

সুনন্দা হাসিল।

ষ্টেজ বাঁধা হইয়া গিয়াছিল। আয়োজন সমস্তই ঠিকঠাক। দর্শকের মধ্যে মহিলাই বেশী—বাগচীদের উঠান একেবারে স্ত্রী-পুরুষের ভিড়ে জম্ জম্ করিতে লাগিল।

অভিনয় সুরু হইল।

সুনন্দার প্রম্প্‌টার ভলটু। ভলটু সুনন্দার অভিনয়ে আরও প্রম্প্‌ট্ করিয়াছে বহুবার, কাজেই তাহাদের পরস্পরকে জানা আছে, মিলও আছে।

সুনন্দা একাই অভিনয় জমাইয়া দিল।

অভিনয় শেষ হইলে সুনন্দা সোজা ভলটুর কাছে আসিয়া বলিল, কেমন, খুসি হয়েচো ভলটুদা, না লাঠির সদ্ব্যবহার করবে?

ভলটু এতক্ষণে বইখানি পাশের টুলে নামাইয়া রাখিল। তারপরে উত্তেজনায় সুনন্দার একটা হাত ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে যাইতেছিল, সুনন্দা বাধা দিয়া আবার তাহাকে বসাইয়া দিয়া বলিল, কি বলতে যাচ্ছিলে বলো।

ভলটু বলিল, সুনন্দা, তোমার তুলনা হয় না। তোমার সেবা, তোমার অভিনয় সব আমাকে একেবারে অভিভূত ক'রে ফেলেচে সুনন্দা। তুমি কি আমার কাছে কোনদিন কিছু মুখ ফুটে চাইবে সুনন্দা—চেয়ো—আমি অকাতরে তা তোমাকে দেব।

সুনন্দার ললাটে দুষ্টু হাসি নাচিয়া উঠিল, বলিল, ধরো, আজই এখুনি যদি কিছু চাই?

—পাবে। সুনিশ্চিত তা পাবে।

সুনন্দা বলিল, চাইলাম তবে—তোমাকে।

ভলটু বলিল, চাইলে না—পেলে।

সুনন্দা হাসিয়া বলিল, অভিনয় করচো না তো আবার?

ভলটু সুনন্দার একটি হাত নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া নিয়া বলিল, তোমার সঙ্গে অভিনয় করবার মত নির্লজ্জতা আমার নেই সুনন্দা। তোমার প্রতি শ্রদ্ধা ভালবাসায় অন্তর আমার কাণায় কাণায় ভরপুর!

দ্বিচক্র যানে দুরন্ত ভলটু আর ঘুরিয়া বেড়ায় না। সে এখন গম্ভীর হইয়াছে—কথাও আর কাহাকেও সে দেয় না, কথার খেলাপও সে আর করে না। ভলটু সহসা বদলাইয়া গেছে। ইহার কারণ কেহ জানে না। জানে শুধু সুনন্দা।

(সমাপ্ত)

এস ভগবান

কুমারী পীযূষকণা সর্ব্বাধিকারী

কালচক্র অবিশ্রান্তে অবিরাম ঘুরে
বসন্তের মধুমাসে আসিয়াছে ফিরে।
শতাব্দীর অন্তরালে শতবর্ষ আগে
এমনই সে ফাল্গুনের শেষ নিশিভাগে—
দ্যুলোক ছাড়িয়া বিশ্বে এলে দেবাত্মন,
সুপ্ত বিশ্বে হ'ল তা'র নব জাগরণ।

* * * *

অধরে অমিয়মাথা সুমধুর হাসি
"কথামৃত"—সুধারাশি পড়িল ঝরিয়া;
সমাধিস্থ জ্যোতির্ম্ময় দেবতনু পাশে
পাপী-তাপী-ধনী-দীন বসিল ঘিরিয়া।

ত্রিলোকবন্দিত ওগো গুরু-মহারাজ
প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সুধী, অনুরাগীজন
চরণারবিন্দে তব নমিতেছে আজ—
দুর্দ্দিনে দুর্গত করে শরণ্য-স্মরণ।

রোগ-শোক-দীনতায় ক্লিষ্ট বিশ্ববাসী
কাতর পরাণে প্রভো ডাকিছে তোমায়,
দূর কর পাতকীর যত পাপরাশি
স্থান দাও তাহাদের শ্রীপদ ছায়ায়।

ভক্ত আজ করিতেছে তোমারে আহ্বান,
আশ্রিতে তারিতে এস ফিরে ভগবান।

কোরক

শ্রীপ্রতিভা বসু

রুদ্ধ গোপন হৃদয় তোমার উন্মুখ প্রকাশিতে।
সঞ্চিত নব সুষমার ভার নিমেষে নিঃশেষিতে॥
দখিন হাওয়ার পরশ যখন
করিবে শিথিল দলের বাঁধন,
সেই শুভক্ষণ, সে মধু লগন, আপনারে বিকশিতে॥

রিক্ত করিতে নিজেরে তোমার ব্যগ্র ব্যাকুল প্রাণ,
নহ প্রত্যাশী, শুধু দিয়ে যাও, সার্থক তব দান,
স্বপন জড়ানো তব আঁখিপাতে,
চাঁদিমা তাহার মায়া জালপাতে,
তব উন্মেষ সাদরে বরিতে সমীরণ গাহে গান।

মুগ্ধ করিয়া লভিছে যে 'ফুল' জগতের ভালবাসা।
অন্তর দিয়া রচিয়া তাহারে, তুমিই দিয়েছ ভাষা।
তোমার গোপন মরম খুলিয়া,
আলোকের পানে দাও মুকুলিয়া,
পুলকে পরাণে ওঠে শিহরিয়া—সহজ প্রাণের আশা।
নীরব নয়নে চেয়ে আছ তুমি, ভাষাহীন, দিনমান।

ভাবিছ কি মনে আসিলে সময় সফল হইবে প্রাণ?
আকুল হৃদয়, অতুল বিভবে,
হবে উছলিত নব গৌরবে,
নব যৌবন সমাগমে হবে—বাল্যের অবসান।

বাংলা সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলালের দান

শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯০৫ সালে জাতীয়জীবনে যে দ্বন্দ্ব সংঘাত, উন্মাদনা ও প্রচণ্ড গতিবেগ আরম্ভ হয়, 'হাসির গান', 'পাষাণী' ও 'সীতা' নাটকে যশস্বী, ছন্দের রাজা দ্বিজেন্দ্রলাল সেই ভাবস্রোতে তাঁহার প্রতিভার তরী ভাসাইয়া দেন। 'প্রতাপসিংহ', 'দুর্গাদাস', 'মেবার পতন', 'সাজাহান', 'চন্দ্রগুপ্ত' প্রভৃতি উৎকৃষ্ট নাটকে ও অন্যান্য রচনায় তিনি তাঁহার চিত্তবৃত্তি ও হৃদয়াবেগ সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করিয়া নিজস্ব ভাষা ভাব ও ছন্দে নূতন সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন। স্থানে স্থানে ভাবাতিশয্য ও আবেগ-চাঞ্চল্য তাঁহার রচনাকে ব্যাহত করিয়াছে ও (অনেকের মতে) তাঁহার কবিপ্রতিভার সম্যকবিকাশে অন্তরায়স্বরূপ হইয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহার তীব্র একাগ্রতার ফলে আমরা পাইয়াছি ছন্দে-গাথা উচ্ছ্বাসময় গদ্য, মনুষ্যত্ব-পিপাসার মহিমাবোধ, মিথ্যা আত্মাভিমানের দুঃখ, দেশপ্রেম ও বৈরাগ্যের মহনীয় রূপ ও ভবিষ্যতের আশার আলো। পাই নাই বিচিত্র রূপবিলাস, নানা ছন্দে লীলায়িত রাগিণী, রসপিপাসা-নিবৃত্তির ষোড়শোপচার ও কুঞ্জকাননের কামকাকলি।

তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী আদর্শ সুরুচির দ্বারা মার্জ্জিত, সহজবোধ্য ও প্রেরণাময়। তাঁহার সঙ্গীতের সুরই প্রাণ, কথা দেহমন্দির। তিনি আগে সুর, পরে গানের কথাগুলি স্থির করিতেন। বাংলার 'কোরাস্ গান' বা সমবেত সঙ্গীত তাঁহারই সৃষ্টি; বিদেশ হইতে সুর লইয়া বাংলা সঙ্গীতে প্রচলনের দুঃসাহস তাঁহার ছিল বলিয়াই আমরা কয়েকটি সুবিখ্যাত 'জাতীয় সঙ্গীত' পাইয়াছি।

রবীন্দ্রনাথ এই সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছেন "দ্বিজেন্দ্রলালের গানের সুরের মধ্যে ইংরেজী সুরের স্পর্শ লেগেছে বলে কেউ কেউ তাঁকে হিন্দু সঙ্গীত থেকে বহিষ্কৃত করতে চান। যদি দ্বিজেন্দ্রলাল হিন্দু-সঙ্গীতে বিদেশী-সোনার কাঠি ছুঁইয়ে থাকেন, তবে সরস্বতী নিশ্চয় তাঁকে আশীর্ব্বাদ করবেন। হিন্দু-সঙ্গীত বলে কোনো পদার্থ যদি থাকে তবে সে আপনার জাত বাঁচিয়ে চলুক, কারণ তার প্রাণ নেই, তার জাতই আছে।"

দ্বিজেন্দ্রলাল বিলাতী ও দেশী সঙ্গীতের পার্থক্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন:—

"একটি যেন রাজপথে নির্ভয় স্বাধীনগতি, স্বাবলম্বা বিংশতিবর্ষীয়া সুকুমারী ইংরেজ মহিলা, অপরটি যেন গৃহপ্রাঙ্গণে সশঙ্কগতি গৃহপ্রবেশোন্মুখী ষোড়শী সুন্দরী বঙ্গবধূ...একটি আশাময়ী উন্মুখী সূর্য্যমুখী—অপরটি যেন সন্ধ্যা বিনতনয়না অপরাজিতা। একটি হাস্য অপরটি বিলাপ।"

তাঁহার সঙ্গীতে একটি বিশেষত্ব এই যে, তিনি তাহাতে প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছেন, রাখিয়া ঢাকিয়া বলিবার চেষ্টামাত্র নাই; ইহাকে সংযমের অভাব বলিব না, বলিব হৃদয়াবেগ। বর্ষা নামিয়াছে, আকাশে ঘনঘটা, মনে গভীর দুঃখ যেন উথলিয়া পড়িল—এই চিত্রটি "সিংহল বিজয়ের" একটি গানে সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে:—

"বরষা আইল ওই ঘনঘোর মেঘে দশদিক তিমিরে আঁধারি;
আকুল বেদনা আর হৃদয় আবেগে রাখিতে রাখিতে নাহি পারি;
সঘন আঁধার ওই ঘনাইয়া আসে, বিষাদে আকাশ আসে ছেয়ে—
বাতাস মিশায়ে যায় সজল বাতাসে—শূন্য হৃদয়ে রহি চেয়ে"

শান্তমধুর খাঁটি বাঙ্গালীসুলভ প্রীতি কল্পনার ভাব তাঁহার সঙ্গীতে মূর্ত্ত না হইলেও ছন্দোমাধুর্য্যে, শব্দচয়নে ও সরলতায়, ঝঙ্কারের মনোহারিত্ব হীন হয় নাই। আমি তাঁহার বিখ্যাত গান "বকুলের তলে" উল্লেখ করিতেছি—"তখন গাহিতেছিল সে তরুশাখা পরে সুললিত স্বরে পাপিয়া, তখন দুলিতেছিল সে তরুশাখা ধীরে প্রভাত সমীরে কাঁপিয়া"—বাস্তবের নিখুঁত ছবি মনোপটে আঁকিয়া যায় অনবদ্য ভাষায়, নূতন ছন্দে, চিরপুরাতন বেদনার সুরে। তিনি মেবারের দুঃখ বর্ণনায় যে অপূর্ব্ব সঙ্গীত সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা বাঙ্গালীর হৃদয়কন্দরে চিরকাল ধ্বনিত হইবে।

"মেবার পাহাড় হইতে তাহার নেমে গেছে এক গরিমা হায়
ঘন মেঘরাশ ঘেরিয়া আকাশ, হানিয়া তড়িৎ চলিয়া যায়
মেবারের বন বিষাদ মগন আঁধার বিজন নগর গ্রাম
পুরবাসী সব মলিন নীরব বিষাদ-মগন সকল ধাম।
গেছে যদি সব সুখ কলরব অতীতের বাণী বাঁচিয়া থাক্
চারণের মুখে সান্ত্বনা সুখে শূন্য মেবারে ধ্বনিয়া যাক্"

ছন্দোময় গদ্য যে নিছক পদ্য অপেক্ষাও মধুর হইতে পারে, তাঁহার সঙ্গীতের মধ্যে তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। আমরা ইহা হইতে বাংলা ভাষার শব্দ-সম্পত্তির বিপুলতা কতকটা বুঝিতে পারি। শব্দ চয়ন ও যোজনার গুণে ভাব ও ছন্দের যোগ্য নির্ব্বাচনে "কটমট" বা সমাসঘটিত গদ্যের কথাগুলি পদ্যমাধুর্য্যে কেমন মনোবীণার তারের উপর অবলীলাক্রমে খেলিয়া যায় তাহার পরিচয়:—

"ঘন তমসাবৃত অম্বর ধরণী, গর্জ্জে সিন্ধু চলিছে তরণী" ইত্যাদি

"ঐ ভেসে আসে কুসুমিত উপবন সৌরভ
ভেসে আসে উচ্ছল জলদল কলরব
ভেসে আসে রাশি রাশি জ্যোছনার মৃদুহাসি
ভেসে আসে পাপিয়ার তান"

আর একটি—

"সধবা অথবা বিধবা তোমার রহিবে উচ্চ শির
উঠ বীরজায়া বাঁধো কুন্তল মুছ এ অশ্রুনীর" ইত্যাদি।

আবেগে তিনি বাঁধনহারা হইতেন। তাঁহার ভাবোচ্ছ্বাস-মাধুরী বিচিত্র সঙ্গীতে উৎসারিত হইয়া বঙ্গদেশকে ধাত্রী ও জননীরূপে আবাহন করিয়াছে; সাগরোত্থিতা মাতার রূপশ্রীর অপূর্ব্ব কল্পনা বাস্তবের পটভূমিতে ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করিয়াছে, কবির হৃদয়বীণার তারে তারে নবতম ঝঙ্কারে রণিয়া উঠিয়াছে ধনধান্যে পুষ্পে ভরা এই দেশটির বন্দনা: হিন্দুর অন্তিম প্রার্থনা কলনাদিনী জাহ্নবীর তরঙ্গে তরঙ্গে তিনি মিশাইয়া দিয়াছেন: মহাসিন্ধুর ওপার থেকে ভেসে আসা দূরাগত বাঁশরী-ধ্বনির ন্যায় সুমধুর আহ্বান ও আশ্বাস বাণী পরম সান্ত্বনার সুরে শুনাইয়াছেন। তাজমহলকে বলিয়াছেন 'সম্রাটের অনিমেষ ভালোবাসা সাম্রাজ্ঞীর প্রতি'—কিন্তু স্মৃতি মন্দিরই যে চিরস্থায়ী নহে একথায় বড় দুঃখে বলিয়াছেন "কিন্তু যবে ধূলিলীন হইবে তুমিও, কে রাখিবে তব স্মৃতি? সে সমাধি! চিরস্মরণীয়" তাঁহার ব্যঙ্গ কবিতা ও হাসির গান অল্পাধিক পরিমাণে ইংরাজী comic রচনা ধারার (এমন কি ইংরাজি সুরের পর্য্যন্ত) অনুকরণ হইলেও তাঁহার প্রতিভার স্পর্শে বাঙ্গালীর নিজস্ব সম্পদ স্বরূপ হইয়াছে। কয়েকটি আবেগময় 'হাসির গানে'র প্রধান উদ্দেশ্য—দেশাত্মবোধ-জাগরণ ও সমাজ সংস্কার। এইগুলি তাঁহার গভীর দুঃখের প্রতীক—"He loughed to save himself from weeping" (Charles Lamb সম্বন্ধে একজন বিশিষ্ট সমালোচক যেমন বলিয়াছিলেন)। উপরোক্ত উদ্দেশ্যের সীমার মধ্যে বাঁধা না পড়িলে দ্বিজেন্দ্রলালের হাস্য রসের প্রতিভা পূর্ণবিকাশ লাভ করিতে পারিত। Wit, Humour ও Fun এই তিনটি আয়ুধই তাঁহার করায়ত্ত ছিল; সংস্কারের প্রবল ইচ্ছা লইয়া না লিখিলে এই তিনটিকেই তিনি পরিপূর্ণ প্রকাশ দিয়া বঙ্গসাহিত্যকে আরও হাস্যোজ্জ্বল করিতে পারিতেন।

শ্লেষ, কৌতুক, বিদ্রূপ, রসিকতা, ব্যঙ্গ প্রভৃতি হাস্যরসের উপাদান যত সূক্ষ্ম, প্রচ্ছন্ন ও রসঘন হইবে, হাস্যরসের অভিব্যক্তি তত মধুর হইবে।

নিজে না হাসিয়া হাসাইতে পারা একটি কৌশল। বিদ্রূপের বিষয়বস্তুকে নগ্নমূর্ত্তিতে প্রকাশ করিলে বিদ্রূপের তীক্ষ্ণতা ও হাস্যরসের হানি হয়। ইঙ্গিতের দ্বারা ব্যঙ্গ বিদ্রূপের কার্য্য (প্রকৃত হাস্যরস সৃষ্টি) সুসম্পন্ন হয়। কিন্তু কঠোর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মরুতে হাস্যরস শুকাইয়া যায় ও আনন্দের পরিবর্ত্তে ঘৃণার সঞ্চার হইয়া হাস্যরসিক কবির রসসৃষ্টি আহত হয়। দ্বিজেন্দ্রলালের কয়েকটি 'হাসির গানে' রাজনৈতিক ও সমাজ সংস্কারের বক্তৃতার ধ্বনি শোনা যায়, সুতরাং সেখানে শ্লেষ ও বিদ্রূপপূর্ণ, বিকাশলাভ করিতে পারে নাই। 'বিলেত দেশটা', আমি যদি পীঠে তোর Inferiority Complex এর বিরুদ্ধে রসরচনা, কিন্তু তাহাতে উপরোক্ত বক্তৃতার ধ্বনি খাঁটি হাস্যরসকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। 'শুঁতোর চোটে বাবা বলায়' একটু বেশী জোরালো হওয়ায় কৌতুক অপেক্ষা ক্রোধের সঞ্চার করে। ক্রোধ বা রৌদ্ররস স্থায়ী হাস্যরসের পরিপন্থী। "ক্ষুব্ধ বা বিচলিত হইলে দ্বিজেন্দ্রলাল ভাষার সংযম রক্ষা করিতে পারিতেন না।" —ইহা তাঁহার জনৈক বিশিষ্ট সমালোচকের অভিমত।

"বিলেতফেরতা ক' ভাই" এ তিনি সাহেবী পোষাক পরিহিত ভারতীয়কে "বিলাতী বাঁদর" বলিলেন, কিন্তু উহাকেই লক্ষ্য করিয়া ঈশ্বরগুপ্ত বলিয়াছিলেন –

"বুঝি হুট্ বলে' বুট পায়ে দিয়ে
চুরুট ফুঁকে স্বর্গে যাবে?"

কোনটি ভাল লাগে? মনীষী রমেশচন্দ্র দত্ত বলিয়াছেন "The richest wit sparkles in every line of his (ঈশ্বর গুপ্ত's) flowing poetry" ঈশ্বর গুপ্তের ও দীনবন্ধুর ব্যঙ্গ বিদ্বেষ শূন্য; হুতোম প্যাঁচার নক্সা বিদ্বেষে পরিপূর্ণ; যে ব্যঙ্গে বিদ্বেষ নাই তাহা তীব্র হইলেও উপভোগ্য। বিদ্বেষপূর্ণ ব্যঙ্গ গালির নামান্তর। 'Wit'এর উদাহরণ দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে স্থানে স্থানে হীরকখণ্ডের মতো দীপ্যমান, কিন্তু তাঁহার "আষাঢ়ে" ছাড়া অন্য 'হাসির গানে' তেমন পরিচয় পাই না। প্রচণ্ড কষাঘাতে উদ্ধত মন তাহার দৃঢ় উদ্দেশ্য ছাড়িয়া তৎক্ষণাৎ মধুরসাশ্রিত হইতে পারে কি? রসবুদ্ধির লীলা এই কারণে কয়েকটি 'হাসির গানে' ব্যাহত হইয়াছে।

Humourএ তাঁহার 'হাসির গান' ভরপুর—অসঙ্গতির জন্য হাস্যোদ্রেক, অথচ একটি প্রচ্ছন্ন সহানুভূতি, একটি দীর্ঘশ্বাস মনকে সজাগ করিয়া তোলে; ক্ষণপরেই দুঃখ ও নিরাশায় হৃদয় ভরিয়া ওঠে, কবির রসসৃষ্টির স্বার্থকতা করিয়া Humour Pathosএ ডুবিয়া যায়।

তাজা মনে ও নিছক স্ফূর্ত্তিতে ক্ষণতরে আত্মভোলা হইয়া কবি যে 'Pleasant Nonsense' রূপে আনন্দরস "বিষ্যুৎবারের বারবেলায়" পরিবেশন করিয়াছেন তাহা Funএর চমৎকার অভিব্যক্তি। রসসাহিত্যে ইহার স্থান উচ্চে। মোটের উপর একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে তাঁহার 'হাসির গানে' তিনি কবিত্ব সমালোচকের যুগপৎ অধিকার করিয়াছেন। 'হাসির গানে' তাঁহার স্বদেশ প্রেম ক্ষীণকায়া অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো বহে নাই—দুর্ব্বার তরঙ্গভঙ্গে বর্ষার গঙ্গার মতো কূল ছাপাইয়া চলিয়াছে। তাই তরঙ্গের ঘূর্ণীপাকে পরিপূর্ণ রস-সৃষ্টির ব্যাঘাত ঘটিয়াছে।

তাঁহার নাটকগুলির মধ্যে কয়েকটি চরিত্রে তাঁহাকেই দেখিতে পাই—'প্রতাপসিংহে' তিনি যোশী, 'মেবার পতনে' শঙ্কর, 'দুর্গাদাসে' দুর্গাদাস, 'সাজাহানে' দিলদার, 'বিজয়সিংহে' বিজয়সিংহ। বাংলার নাট্যজগতে তাঁহার দানের তুলনা নাই। রঙ্গমঞ্চে সুরুচির অধিষ্ঠান, কুসুমপেলব আসবগন্ধী কিন্নরী-ভাষার স্থলে বীর্য্যময় প্রকৃচন্দনস্নাত অভিমন্যুর প্রাণবাণী, একটা পবিত্রতার আবহাওয়া—নাট্যজগতে তাঁহার কীর্ত্তির পরিচায়ক। তাঁহার পূর্ব্বে কেহ কি লিখিয়াছেন—"বিস্মিত আতঙ্ক" "বিরাট স্বেচ্ছাচার", "সৌন্দর্য্যে কম্পমান", "নিঃস্বহাসি", "উদ্ধত স্বর্ণচূড়া" "অপার শুভ্র করুণা" "তরল কোমল যে জল", "দৃপ্তিহীন প্রাণ" ইত্যাদি? এই নবতম দানে তিনি নাট্যভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন—যেমন একদিন আর এক বীর্য্যবান কবি অমিত্রাক্ষর ছন্দে ও প্রথাবহির্ভূত নিয়মে ক্রিয়াপদ নিষ্পাদনে কাব্যের ভাষাকে বরেণ্য করিয়াছিলেন।

'আমার নাট্যজীবনের আরম্ভ' নামক প্রবন্ধে দ্বিজেন্দ্রলাল লিখিয়াছেন যে ইংরাজী Drama তাঁহাকে কৈশোরে আকৃষ্ট করিয়াছিল তিনি Shakespeareএর নাটকগুলির সুবিখ্যাত অংশ-বিশেষ বারবার পড়িতে ও আবৃত্তি করিতে ভালবাসিতেন এবং অনেকগুলি তাঁহার মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল; Shakespeareএর অনুকরণে অমিত্রাক্ষরছন্দে নাটক লিখিতে চেষ্টা করেন এবং Shellayর অনুসরণে 'সোরাব-রুস্তম' নামক 'অপেরা' রচনা করেন। বিলাত গমনের পূর্ব্বে তিনি Julius Cœsar ইংরাজীতে অভিনয় দেখিয়াছিলেন এবং বিলাতে গিয়া বহু অভিনয় দেখিয়া ও নূতন ধরণের সুর শুনিয়া নিজের দেশের অভিনয় ও সুর পদ্ধতির পরিবর্ত্তন করিতে দৃঢ়সংকল্প হন। বিদেশের এই অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতা তিনি কিভাবে কাযে লাগাইয়াছেন তাহার পরিচয় দিবে—বাংলার রঙ্গমঞ্চ, "স্বদেশী" সঙ্গীতগুলি ও কয়েকটি 'হাসির গান'। প্রথাসম্মত পদ্য ছাড়িয়া আবেগময় গদ্যে আবৃত্তি (বিশেষতঃ প্রধান চরিত্রগুলির ও প্রধান প্রধান দৃশ্যে) বাংলা নাটকে তাঁহার রচনার মধ্যেই প্রথম দেখা যায়।

তাঁহার প্রবন্ধগুচ্ছ "চিন্তা ও কল্পনা" অনেক চিন্তা ও কল্পনার ফল হইলেও প্রাঞ্জল, সংক্ষিপ্ত ও হৃদয়গ্রাহী। ভাষা অনবদ্য, কোথাও ফেনিল উচ্ছ্বাসময়, কোথাও ধীর শান্ত অনুরাগস্নিগ্ধ। 'প্রেম কি উন্মত্ততা' শীর্ষক ক্ষুদ্র নিবন্ধটির ভাষা বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার মতো মধুর। উপন্যাস ও ছোট গল্প তিনি লেখেন নাই—বুঝি বা লিখিবার মন ছিল না। উক্ত প্রবন্ধগুচ্ছে "গল্পের নমুনা" নামক একটি ছোট গল্পের কাঠামো মাত্র আছে। রবীন্দ্রনাথের 'গোরার' সমালোচনা ক্ষুদ্র হইলেও সমালোচনার ধারা বজায় রাখিয়াছে। 'কালিদাস ও ভবভূতি' নামক গ্রন্থে দ্বিজেন্দ্রলাল অভিজ্ঞান শকুন্তল ও উত্তর-চরিতের' বিস্তারিত সমালোচনা করিয়াছেন ও শ্রেষ্ঠ ইংরাজী সমালোচকদিগের ন্যায় নিরপেক্ষতা, অন্তর্দৃষ্টি, সহানুভূতি, গবেষণা, তুলনামূলক ব্যঞ্জনা ও গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি প্রকৃত নাটকের স্থানবিচারে এবং ছন্দ, ভাষা ও উপমার অনুশীলনে যাহা বলিয়াছেন তাহা অপূর্ব্বভাবগ্রাহিতা, রসজ্ঞান ও বিচার নৈপুণ্যের পরিচায়ক। সুতরাং সমালোচক হিসাবে সাহিত্যক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলাল উচ্চস্থানে সমাসীন। সমালোচনার প্রণালী তাঁহার উক্ত পুস্তকে আদর্শস্বরূপ।

তাঁহার প্রহসন "পুনর্জ্জন্ম" সাহিত্যে খ্যাতিলাভ করিয়াছে। ইহা উদ্দেশ্যমূলক না হওয়ায় তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ হাস্যরস ইহাতে পূর্ণ প্রকাশ পাইয়াছে। 'একঘরে' প্রহসনের তীক্ষ্ণ আঘাত বা 'কল্কি অবতারে'র জ্বালা ইহাতে নাই, 'হাসির গানের' দোষ ত্রুটি ইহাতে দেখি না, ইহা অশ্লীলতা ও ভাঁড়ামি বর্জ্জিত, গুরুগম্ভীর শব্দসম্ভারে ভারী নহে—ইহা একটি নির্ম্মল হাস্যকৌতুকময় বিদ্বেষবিহীন লঘু রচনা।

তাঁহার গীতিকাব্য "মন্দ্র" ও 'ত্রিবেণী' সুখপাঠ্য, হাস্যরস-সমুজ্জ্বল ও গতানুগতিকতা হইতে মুক্ত। তিনি আঁধারকে ভয় করিতেন, বর্ষা তাঁহার ভাল লাগিত না—আনন্দের আবেষ্টনের প্রতি অনুরাগ তাঁহার কাব্যের বহুস্থানে সুপ্রকাশ। 'আলেখ্য' তাঁহার প্রাণের পরশ পাইয়া প্রেম ও সৌন্দর্য্যের সুষমা ও সংজ্ঞার আভাস দিয়াছে।

এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাঁহার বিরাট ব্যক্তিত্ব, অসাধারণ প্রতিভা, চরিত্র-মাধুর্য্য ও বাংলা সাহিত্যে তাঁহার দানের দীর্ঘ আলোচনা সম্ভব নহে। তাঁহার বিরাট অথচ সংক্ষিপ্ত কর্ম্মজীবনের কথা ভাবিলে মনে হয় তিনি শেষের দিকে নিরাশায় পীড়িত হইলেও বঙ্গবাণীর আশ্রয়ে অগ্নিময় মানসিক তেজে দুঃখকে দহন করিয়াছিলেন। "মরম ভেদিয়া যখন যখন গভীর নিরাশা" ফুটিয়া উঠিল—তখন বলিয়া উঠিলেন "ধিক্ ধিক্ জনম হামারি।" কিন্তু একথা কখনও ভুলিবার নহে যে, এই কবি কাব্যামৃত রসাস্বাদে মজিয়া আনন্দের সন্ধান দিয়া গাহিয়াছেন—

"মরুভূমি সম যখন তৃষায় আমাদের মাগো বুক ফেটে যায়,
মিটায়েছি মাগো সকল পিপাসা তোমারি হাসিটি করিয়া পান।
জননি বঙ্গভাষা এ জীবনে চাহিনা অর্থ চাহিনা মান"।"

একটী সার্বিয়ান রাত

শ্রীনরেন্দ্র দেব

রাত এগারোটা। প্যারীর থিয়েটারগুলির দরজা এই সময়টাতেই বন্ধ হয়। আধঘণ্টা আগে কাফে ও রেস্তোরাঁগুলি তাদের পেটোয়াদের বিদায় দিয়েছে।

আমাদের দলটী বড়ো রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আছে বিমূঢ় হয়ে—কী করা যায়। আশে পাশের প্রমোদ স্থানগুলি থেকে বেরিয়ে এসে জনতা ছায়ার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়। রাস্তার ঠুলিপরা বাত্তির প্রেতাত্মিক আলো রাত্রির অন্ধকারে ডুবে গেছে। নক্ষত্রভরা কালো আকাশটা চেয়ে আছে অস্বস্তিকর ভাবে। একদা রাত্রিতে ছিল শুধুই তারা। এখন সার্চ-লাইটের আকস্মিক হল্দে রশ্মিরেখায় হয়তো জেপেলিনের তৈলস্ফটিক সিগারের মত অংশটী দেখা যাবে।

রাতটা জেগে কাটাবার ইচ্ছা হতে থাকে আমাদের। আমরা দলে চারজন। একজন ফরাসী লেখক, দুজন সার্ব ক্যাপ্টেন ও আমি। কিন্তু অন্ধকার প্যারীর কোথায় যাই এখন, যখন এখানকার সবগুলি দরজাই বন্ধ হয়ে গেছে। একটী সার্ব বললে কোন একটী কেতাদুরস্ত হোটেলের কথা—যেটা অতিথিদের জন্ত সারা রাতই খোলা থাকে। সমস্ত অফিসাররা নাকী ওইখানে গিয়ে সেঁদোয়—যেন ওটা ওদের নিজের ডেরা! রহস্ত বলে মনে হয় যে বিভিন্ন জাতির হাতিয়ার-ভাইরা প্যারীতে কদিন কাটাতে এলে এখান থেকেই পরস্পরের মধ্যে সংযোগ সাধন হয়। অতি সতর্কভাবে আমরা আলোকোজ্জ্বল সেলুনটায় গিয়ে ঢুকলাম। আলোকিত এ জায়গাটী অন্ধকার পথের একেবারে বিপরীত। ঘরটা যেন একটা বৃহৎ লাইট-হাউসের অভ্যন্তর। অসংখ্য আয়নায় বিজলী পোস্তফলের থলোগুলির ছবি প্রতিফলিত। মনে হলো আমরা যেন দু বছর পিছিয়ে এসেছি। গালে রং-মাখা সৌখিন মহিলার দল, শ্যাম্পেন, নিগ্রো নাচ ও হৃদয়বিদারক করুণ গানের ভাবময় সুরের সংগে বেহালার দীর্ঘশ্বাস—এ সব তো যুদ্ধ-পূর্ব দিনগুলির দৃশ্য! কিন্তু উপস্থিত লোকগুলির কারুর অংগেই সান্ধ্য-পোযাক নেই। ফরাসী, বেলজিয়ান, ইংরেজ, রুশ, সার্ব সকলেরই ধূলিমলিন ছেঁড়া উর্দি। কতকগুলি ইংরেজ সৈনিক বেহালা বাজাচ্ছে। মার্বেলের মতো ওদের শীতল চিক্কণ মৃদু হাসিতে জনতার বাহবার প্রাপ্তি স্বীকার। পূর্বের লাল জ্যাকেট-পরা জিপসীগুলোর স্থান দখল করেছে ওরা! ওদের মধ্যে একজনের দিকে আঙুল দেখিয়ে সেই লোকটীর পিতা উচ্চকুল ও ঐশ্বর্য বিখ্যাত অমুক লর্ডের নামোল্লেখ করে মেয়েরা ফিস্ ফিস্ করে বলাবলি করছে।

"এস আমরা আনন্দ করি, কালই হয়তো হতে পারে আমাদের মৃত্যু—"

হাস্ত করে, গান করে, ভালোবেসে জীবনকে উপভোগ করতে চায় এই লোকগুলি—ওদের মনে নাবিকদের সেই দুর্দম উদ্দীপনা, যারা তুফানকে উপেক্ষা করে দিবসের আগমনের সংগে সংগে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হবার জন্ত উপকূলে রাত কাটায়।

সার্ব দুটী তরুণ। বেশ বোঝা যাচ্ছে, প্যারীতে এসে তারা খুব খুসী হয়েছে—প্যারী! ওদের স্বপ্ননগরী। প্রাদেশিক দুর্গ নগরীতে থাকার সময়ে প্যারীর স্বপ্ন দেখে ওরা একঘেঁয়ে দিনগুলি কাটাতো।

কী করে গল্প জমাতে হয়, তারা দুজনেই তা জানে।

শ্যাম্পেনের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে ক্যাপ্টেন দুটীর কয়েক মাস পূর্বের পশ্চাদপসরণের দুর্দশার কাহিনী মনে পড়ে যায়; অনাহার ও শীতের বিরুদ্ধে তুষার ঝটিকার মধ্যে যুদ্ধ, যুদ্ধ দশজনের বিরুদ্ধে একাকীর; মানুষ ও পশুর ভয়াবহ বিশৃঙ্খলভাবে দলে দলে পলায়ন; সৈন্তব্যূহের পশ্চাতে মেসিনগান ও রাইফেলের অবিরাম গুলিবর্ষণ। দহ্যমান গ্রামগুলি। অগ্নিশিখার মাঝে আহত ও বাহিনী-বিচ্ছিন্ন সৈনিকদের চীৎকার। অংগহীন নারী ও কাকের পরিচক্রমণ। বাতরোগে পংগু বুড়ো রাজা পিটার অন্ত সাহায্য না পেয়ে একটী লাঠির ওপর ভর দিয়ে অশ্বারোহী বাহিনীর সংগে শ্বেত শিখরগুলি পেরিয়ে পালাচ্ছিলেন—সেকস্পীয়রের রাজাদের একজনের মতো ভাগ্যকে উপেক্ষা করে।

তারা বক্ বক্ করতে থাকে—আমি ওদের দিকে চেয়ে থাকি। সবল ছিপছিপে মাংসপেশীবহুল চেহারা সার্ব দুটীর। ঈগল চক্ষুর মতো বক্রাগ্র নাক। তীক্ষ্ণ সরু গোঁফ। ছোট্ট বাড়ীর উল্টানো ছাদের মতো টুপীর তলা দিয়ে বীরসুলভ চুলের গুচ্ছ উঁকি মারছে। ওদের চেহারা ঠিক সেইরকমের, যে রকম চেহারা চল্লিশ বছর পূর্বে ভাবালু যুবতী মহিলারা স্বপ্ন দেখতেন। কিন্তু দেহে ওদের সর্বে রংয়ের উর্দি। বীরত্বব্যঞ্জক প্রশান্ত ভাব; মৃত্যুকে যেন ওরা সর্বদা কনুইএর আঘাতে হটিয়ে রেখেছে।

কথা কয় ওরা। আমাদের ফরাসী বন্ধুটী বিদায় নেয়। গল্প বলতে বলতে জ্যেষ্ঠ ক্যাপটেনটী কেবলই পাশের টেবিলের দিকে তাকিয়ে চঞ্চল হয়ে ওঠে, গল্প থামায়। একটা পালকের টুপীর কিনারার নীচে রেখান্বিত একজোড়া কালো চোখের দৃষ্টি ওকে বিঁধছে। ঘাড়ে শাদা বোয়ার রেশমী পালক। চোখ জোড়ার প্রতি তার মনোযোগ আকৃষ্ট হয় নিঃসন্দেহে। অবশেষে সে উঠে পড়ে। দুর্দম প্রেরণাচালিতের মতো পাশের টেবিলের দিকে এগিয়ে যায়। মুহূর্তপরেই আর তাকে দেখা যায় না—পালকের টুপী ও ঘাড়ের বোয়াও অদৃশ্য হয়ে যায় সেই মুহূর্তে।

কনিষ্ঠ ক্যাপটেনটীর সংগে একলা পড়ে থাকি আমি। সে কথা কয় খুব কম। পানীয় গ্রহণ করে বারের উপরে ঘড়িটার দিকে তাকায় সে। আরো একবার পান করে আমার দিকে তাকায়। দৃষ্টিতে তার গভীর প্রত্যয়ের পূর্বাবস্থা। মনে হয় সে আমাকে কিছু বলতে চায়—কিছু অস্বস্তিকর তার মনকে পীড়িত করছে। সে ঘড়ির দিকে চায় আবার। একটা বেজেছে।

"ঠিক এই সময়ে—" হঠাৎ সে শুরু করে তার নীরব চিন্তাকে বাক্যান্বিত করে। "চার মাস আগে ঠিক আজকের দিনে—"

সে বলতে আরম্ভ করে। সেই কালো রাত্রিটাকে আমি

তখন দেখতে পাই। দেখি তুষারমণ্ডিত উপত্যকা; বীচ-পাইন সমাচ্ছাদিত শ্বেত পর্বতমালা গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে বাতাস এসে ঝরিয়ে দিচ্ছে তুলোর মতো তুষারকণাগুলিকে। একটা গ্রামের ধ্বংসাবশেষ চোখে পড়ে আমার—সেই ধ্বংসাবশেষের মধ্য দিয়ে য়্যাড্রিয়াটিকের দিকে ছুটে চলেছে পশ্চাদপসরণকারী জীর্ণ এক সার্বিয়ান বাহিনী।

এই রক্ষী-বাহিনীর পশ্চাদ-ব্যূহ পরিচালনা করছে আমার বন্ধু—জনসমষ্টি এককালে একটা কম্প্যানী ছিল, কিন্তু এখন তা কতকগুলো হাংগামাকারী লোকের দলে পরিণত হয়েছে। চাষাদের যোগদানে সেখানকার সামরিক ঘাঁটিটা দলে ভারী হয়েছে। কিন্তু কষ্ট ও ভয়ে ওরা এমন বিহ্বল হয়ে পড়েছে যে নিজস্ব ইচ্ছাশক্তির অভাব ঘটেছে ওদের। ওরা চলছে স্বয়ংক্রিয় কলের গাড়ীর মতো; ওদের তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে পশুর মতো। আহত নারীর দল শিশুদের মধ্য দিয়ে গোঙাতে গোঙাতে এগিয়ে চলছে। অন্যান্য স্ত্রীলোকগুলি—কালো লম্বা পেশল চেহারা—শোকাবহ নীরবতার মধ্যে মৃত দেহগুলির উপর নীচু হয়ে ঝুঁকে মৃত সৈনিকের বন্দুক ও কার্তুজের বেল্ট খুলে নিচ্ছে।

ধ্বংসস্তূপের মধ্যে গোলার কম্পমান লাল আভায় অন্ধকার চিত্রিত হয়ে উঠেছে। রাত্রির গহ্বর থেকে অন্যান্য মরণাত্মক আলোক রেখার জবাব আসে। কালো বাতাসে বুলেটের গুঞ্জন শোনা যায়—রাত্রির অদৃশ্য কীটগুলি!

সকালের সংগে সংগেই আসবে প্রচণ্ড সর্বগ্রাসী আঘাত। অন্ধকারের সুযোগে শত্রুরা তাদের বিরুদ্ধে লাইনে জড়ো হচ্ছে—তারা জানে না ওরা তাদের কোন শত্রু। ওরা জার্মান, না অষ্ট্রিয়ান্, না বুলগেরিয়ান্, নয়তো কী তুর্কী?…এতগুলি শত্রুর সম্মুখীন হতে হবে ওদের।

"আমরা পিছু হটতে বাধ্য হয়েছিলুম—" সার্বটী বলে, "যারা আসতে দেরী করছিল, তাদের পেছনে ফেলে—ভোরের আগেই আমাদের পাহাড়ে পৌঁছানো চাই—"

স্ত্রীলোক, শিশু ও বৃদ্ধের লম্বা শ্রেণী বাহক পশুর সারির সংগে মিশে গিয়ে রাত্রির অন্ধকারে বিলীন হয়ে গেছে। গ্রামে রয়ে গেছে শুধু সবল সমর্থ লোকগুলি। ধ্বংসস্তূপের আড়াল থেকে তারা গোলাবর্ষণ করছে। এদের মধ্যে থেকেও কেউ কেউ পিছু হটতে সুরু করেছে।

সহসা ক্যাপটেনের একটা নিষ্ঠুর কথা মনে পড়ে!

"আহতরা! ওদের কী করবো?"

খামার-বাড়ীটার ছাদ গোলার ফুটো হয়ে গেছে। সেখানে খড়ের ওপর শুয়ে আছে পঞ্চাশেরও বেশী লোক—কেউ যন্ত্রণায় সংজ্ঞাহীন, কেউ হাত পা ছুঁড়ছে। কয়েকদিন পূর্বেই ওরা আহত হয়েছে। এদ্দূর পর্যন্ত কোনক্রমে নিজেদের টেনে এনেছে। পূর্বের আহত ছাড়া সেই রাত্রিরও আহত আছে অনেক—তাজা রক্তপাত বন্ধ করার জন্যে তাদের তাড়াতাড়ি যাহোক একটা ব্যাণ্ডেজ দেওয়া হয়েছে। এসব ছাড়া ওখানে আছে, গোলার কুঁচিতে আহত নারীরা।

গলিত মাংস, জমাট রক্ত, ময়লা পরিচ্ছদ, কলুষিত শ্বাস-প্রশ্বাসের বিশ্রী গন্ধে আশ্রয় স্থানটী ভরে উঠেছে। ক্যাপটেন আসে এখানে। তার কথা শুনতে পেয়ে আহতরা নির্জন লণ্ঠনের ধোঁয়াটে আলোর তলায় অস্থিরভাবে নড়ে ওঠে। কাতরানি থেমে যায়। নিস্তব্ধতা বিরাজ করে—বিস্ময় ও ভয়ে মুমূর্ষু লোকগুলি মৃত্যু অপেক্ষাও ভয়ংকর কীসের প্রতীক্ষায় ভীত হয়েছে।

শত্রুর করুণার তলায় তাদের ফেলে যাওয়া হবে শুনে তারা উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করে; কিন্তু অধিকাংশই আবার পড়ে যায়।

ক্যাপটেন ও তার সংগী সৈন্যদের কাছে ওরা সমস্বরে কাতর অনুনয় ও প্রার্থনা করতে থাকে—"ভাইরা, আমাদের পরিত্যাগ করো না। ভাইসব, যিশুর নামে—"

ধীরে ধীরে ওরা বুঝতে পারে পরিত্যাগ করার আবশ্যকতা। ভাগ্যকে ভগবানের করুণার হাতে ছেড়ে দেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না আর। কিন্তু শত্রুর হাতে পড়া! শতাব্দীর পর শতাব্দীর শত্রু বুলগার বা তুর্কীদের দয়ায় নির্ভর করে থাকা! ঠোঁট যা উচ্চারণ করতে পারে নি, তাই তাদের চোখে প্রতিফলিত হয়। সার্ব হওয়া একটা অভিশাপ, যদি বন্দীত্ব প্রাপ্ত হয়। মৃত্যুর দ্বারে উপনীত হলেও মুমূর্ষুরা স্বাধীনতা হরণের চিন্তায় ভীত হয়ে ওঠে।

বল্‌কানের প্রতিশোধ মৃত্যুর চেয়েও ভয়ানক।

"ভাই সব, ভাইরা—"

ওদের চীৎকারের অন্তর্নিহিত অর্থ অনুমান করে ক্যাপটেন চোখ ফিরিয়ে নেয়।

"কী করতে হবে আমাকে—" সে কবার জিজ্ঞেস করে।

সকলেই ঘাড় নাড়ে অর্থবোধকভাবে। পরিত্যাগ যখন অবশ্যই, তখন তার উচিত পশ্চাতে একটীমাত্রও সার্বকে জীবিতাবস্থায় ফেলে না রাখা।

পশ্চাদপসরণের ফলে যুদ্ধোপকরণের অভাব সৈন্যগণকে তাদের টোটাগুলি ঈর্ষ্যান্বিতভাবে রক্ষা করতে বাধ্য করেছে। ক্যাপটেন তার তরোয়ালটাই খাপ থেকে টেনে বার করে। কজন সৈনিক ইতোমধ্যেই তাদের কাজ সুরু করে দিয়েছে বেঅনটনের সাহায্যে। কিন্তু ওদের কাজ হয়ে ওঠে দুর্বল, শৃঙ্খলাহীন, এলোপাতাড়ী। অবিশ্রাম আঘাত, অনন্ত যন্ত্রণা ও রক্তধারা। আহতরা সবাই ক্যাপটেনের দিকে নিজেদের টেনে নিয়ে যায়। তার পদমর্য্যাদাই ওদের আকৃষ্ট করে: তার হাতে মৃত্যু হলে সেটা সম্মানকরই হবে এবং তাছাড়া, তার নিপুণ চাতুর্যে মৃত্যুটাও হয়ে উঠবে কম যন্ত্রণাদায়ক।

"আমাকে ভাই, আমাকে…"

তরবারীর ফলকটা সে তাদের গলায় বসিয়ে দিতে থাকে। এক আঘাতেই ধড়টি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

"টাক্ টাক্—" ক্যাপটেনটি জীভে শব্দ করে আমার চোখের সম্মুখে সেই ভয়াবহ দৃশ্যটা তুলে ধরতে চায়।

চারদিক থেকেই আহতরা আসে হামাগুড়ি দিয়ে। গহ্বর থেকে যেন শূককীট বেরিয়ে আসছে। তার পায়ের চারধারে জড়ো হয় ওরা। প্রথমটায় নিজের চোখে যাতে দেখতে না হয়, এইজন্যে সে মুখটা ফিরিয়ে নেয়। কিন্তু চোখ ওর জলে ভরে উঠেছে। আর এই দুর্বলতার জন্যেই তার হাত কেঁপে যায়—ওদের যন্ত্রণা বেড়ে ওঠে। তাকে পুনরায় আঘাত করতে হয়।

স্থির হও, অতঃপর! চাই অকম্পিত সবল বাহু ও দৃঢ় হৃদয়। টাক্…টাক্…

ওরা ভয় পেয়ে গেছে। ভাইরা ওদের বধ করবার আগেই হয়তো শত্রুরা এসে পড়বে। কে আগে নিহত হবে, এই নিয়ে ওদের ঝগড়া বেঁধে যায় নিজেদের মধ্যে। কী-ভাবে থাকলে আঘাতের সুবিধা হবে, তা ঠিক করে নেয় ওরা। প্রত্যেকেই তারা মাথা ফেরায় একপাশে—মৃত্যুপ্রদ আঘাত গ্রহণের পক্ষে ঘাড় ও রক্তনালী যাতে শক্ত হয়ে থাকে ও দেখতে পাওয়া যায়।

"ভাইরা, এবার নাও আমাকে—" রক্তের ধারা ছুটতে থাকে। আরো একজন পড়ে যায় পিছনের দেহগুলির উপর, লাল মদের থলিয়ার মতো যেগুলো ধীরে ধীরে খালি হ'তে থাকে।

হোটেল নির্জন হয়ে আসে। উর্দি-শোভিত বাহুবন্ধে দেহ নিক্ষেপ করে মেয়েরা বেরিয়ে আসে সুরভি প্রসাধন ও পাউডারের সুবাস ছড়িয়ে। হাল্কা হৃদয়ের হাসির অজস্রতার মাঝে ব্রিটিশদের বেহালাগুলি শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করে।

সার্বটীর হাতে ক্রীম-রংয়ের একটী ছুরী। যেন সে ভুলতে পারে নি এবং পারবেও না ভুলতে এমন ভংগীতে ক্রমাগত সে টেবিলের ওপর আঘাত করতে থাকে যান্ত্রিকভাবে—টাক্…টাক্…*

* বিদেশী গল্প অবলম্বনে।

ইংরেজী রোমাণ্টিক যুগে অতিপ্রাকৃত বিষয়ক কবিতা

অধ্যাপক ডক্টর শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, পি-এইচ্-ডি

কোলরিজের 'The Ancient Mariner', 'Christabel' ও Kubla Khan' অতিপ্রাকৃত-বিষয়ক কবিতার শীর্ষস্থানীয়। কবি ভৌতিক অনুভূতি বর্ণনায় এক সম্পূর্ণ অভিনব প্রণালী প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। আধুনিক বিজ্ঞান অলৌকিক রহস্যে আস্থা স্থাপন করিতে পারে না। কারণ ইহার দাবী হইতেছে সর্ব্বজনগ্রাহ্য প্রমাণ। মধ্যযুগে এই বিশ্বাস এত সহজ ও স্বাভাবিক ছিল যে ইহা অসমর্থিত অভিজ্ঞতাকেই প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিত; দ্বিধাহীন ও সর্ব্বব্যাপী বিশ্বাস অনিচ্ছাকৃত আত্মপ্রতারণার সাহায্যে ভৌতিক আবির্ভাবকে আবাহন করিয়া আনিত। কোলরিজ এই উভয়ের মাঝামাঝি এক পন্থা আবিষ্কার করিলেন। অপ্রাকৃতের সত্যতা নির্ভর করে ভূতগ্রস্ত ব্যক্তির অনুভূতির উপর, কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণের উপর নহে। সুতরাং এই অনুভূতি যদি তীব্র হয়, তাহার বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে যদি অখণ্ড ঐক্য ও সামঞ্জস্য থাকে, মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া তাহা যদি ক্রটীহীন ও নিশ্ছিদ্র হয় তবে তাহা পাঠকের বিশ্বাস উৎপাদন করিতে পারে। প্রেত লোকের উপস্থিতিতে—তাহা সত্যই হউক বা কাল্পনিকই হউক—যে অন্তর্বিপ্লব ঘটে, বক্ষোরক্তে যে তাণ্ডবনৃত্য আরম্ভ হয়, যে দৃষ্টিবিভ্রম কল্পনাতে সত্যরূপ আরোপ করে, পরিচিত দৃশ্যের উপর যে অস্থির মায়ালোক কাঁপিতে থাকে, কবি তাহাই নিঁখুতভাবে ফুটাইয়া তোলেন—অতিপ্রাকৃতের তুহিন-শীতল স্পর্শ অতি নিগূঢ় উপায়ে পাঠকের মনে সঞ্চারিত করেন। এই যাদুমন্ত্রে পাঠকের মনের অবিশ্বাস ও সন্দেহ ক্ষণিকের জন্য ঘুমাইয়া পড়ে; সহানুভূতির তীব্রতা ঘটনার বস্তুগত অসম্ভাব্যতার কথা ভুলাইয়া দেয়। অতিপ্রাকৃতের অনুভূতি ক্ষণস্থায়ী দুঃস্বপ্নের মত সমস্ত চিত্তকে এমন সম্পূর্ণভাবে অধিকার করে যে সেই সময়ের জন্য ইহা একমাত্র সত্য বলিয়া মনে হয় ও স্থূল, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ তাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হারাইয়া ইহারই অধীনতা স্বীকার করে।

প্রতিবেশ-রচনার অসামান্য নৈপুণ্য এই ভৌতিক বিশ্বাস উৎপাদনের একটা প্রধান উপায়। পটভূমিকা-নির্ব্বাচন প্রেত-আবাহনের অপরিহার্য্য অঙ্গ। আকাশ-বাতাসটী এমনভাবে প্রস্তুত করিতে হইবে যাহাতে অশরীরীর সূক্ষ্ম আভাস-ইঙ্গিত বায়ুস্তরের প্রত্যেক রন্ধ্রে ছড়াইয়া পড়ে। প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর মধ্যে সুদূর অপরিচয়ের রহস্য, আসন্ন আবির্ভাবের স্তব্ধ প্রতীক্ষা এমনভাবে ফুটাইতে হইবে যাহাতে অতিপ্রাকৃত সেখানে নিজ আসনটী প্রস্তুত দেখিতে পায়। প্রকৃতির মুখে এমন একটা উত্তেজিত বিস্ময় আরোপ করিতে হইবে, তাহার বর্ণের লীলা ও প্রাণের বিকাশের মধ্যে এমন একটা উদ্দাম অজস্রতার হিল্লোল বহাইতে হইবে, যাহাতে মনে হইবে সে তাহার স্বাভাবিক ঔদাসীন্য ও নিশ্চলতা হারাইয়া অতিপ্রাকৃতের প্রতি ব্যগ্র আলিঙ্গনে নিজহস্ত প্রসারিত করিয়াছে। কোলরিজের 'The Ancient Mariner' ও 'Christabel' এর দৃশ্য নির্ব্বাচনে এই নীতি অত্যন্ত দক্ষতার সহিত অনুসৃত হইয়াছে। প্রথম কবিতায় বৃদ্ধ নাবিকের তরণী সুদূর মেরুপ্রদেশে ও বায়ুলেশহীন গ্রীষ্ম-প্রধান দেশের সন্নিহিত মহাসমুদ্রে তাহার অপরূপ ভৌতিক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হইয়াছে। সেই মনুষ্যের সংস্রবশূন্য নির্জ্জনপ্রদেশে প্রকৃতির রূপ আমাদের পরিচিত জগতের রূপ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বিরাট তুষার স্তূপের ফাটলের মধ্যে যে শব্দ শুনা যায় তাহা যেন দৈত্যের ক্ষুব্ধ গর্জ্জন; সূর্য্যোদয় যেন স্বয়ং ভগবানের জ্যোতির্মণ্ডিত শিরোদেশ; ঝটিকা যেন হিংস্র পক্ষীর অশান্ত পক্ষ বিক্ষেপ; আবার ঝড়-জল ও বিদ্যুৎ-বিকাশের ফাঁকে ফাঁকে নক্ষত্রপুঞ্জের মুহুর্মুহু প্রকাশ-বিলয় যেন এক অদ্ভুত প্রেতনৃত্য; অন্ধকার রাত্রে সমুদ্রজলে নানাবর্ণের আলোকরশ্মির কম্পন যেন কোন পৈশাচিক কটাহের ফুটন্ত তৈল; সূর্য্যাস্তের পর প্রদোষান্ধকার ও তারকারাজির দ্রুত-পদবিক্ষেপে আগমন—এই সমস্তই প্রকৃতির উত্তেজিত ও বেগবান প্রাণশক্তির পরিচয়।

বাহিরের মত অন্তরেও সেই একই তীব্র ও বর্দ্ধিত গতিবেগের প্রবাহ। আশা-নৈরাশ্য, আনন্দ-বিষাদ, অনুশোচনা-আত্মপ্রসাদ, নরকভীতি ও ঐশী করুণার অনুভূতি সমস্তই বক্ষপঞ্জরে প্রবলবেগে আন্দোলিত হইয়াছে। ভয় নাবিকের বক্ষোরক্ত যেন চুমুক দিয়া পান করিতেছে। অন্যান্য নাবিকদের মৃতদেহ যেন প্রস্তর—কঠিন দৃষ্টি দিয়া অপরাধী নাবিককে মৌন ভৎর্সনা জানাইতেছে। নাবিকের পুনর্জীবিত ভ্রাতুষ্পুত্র তাহার সঙ্গে নীরবে একই রজ্জু আকর্ষণ করিয়াছে—তাহাদের মধ্যে মৃত্যুর দুস্তর ব্যবধান কোন ভাববিনিময়ের দ্বারা সেতুবদ্ধ হয় নাই। অনন্তপ্রসারিত লবণ-সমুদ্রের দ্বারা অপ্রশমিত তৃষ্ণার যন্ত্রণা, নিদ্রার স্নিগ্ধ সান্ত্বনা, নিঃসঙ্গতা-ক্লিষ্ট মনের মধ্যে মানব ও জলজন্তুর সৌন্দর্য্যের অভিনব উপলব্ধি, প্রেতানুভূতির শিহরণ, মোহজাল ছিন্ন হইবার পর পরিচিত দৃশ্যের অপরূপ আকর্ষণ—এই সমস্ত ভাবই অভূতপূর্ব্ব তীব্রতার সহিত অভিব্যক্ত হইয়াছে। এই প্রাণশক্তিতে হিল্লোলিত আবেষ্টনে অতিপ্রাকৃত রহস্য তাহার অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া মানুষের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ হইয়াছে। এইখানেই ন্যায়-বিচার ও করুণার দেবদূতেরা মানুষের ভাগ্য লইয়া পরস্পরের সহিত বাক্-বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। এইখানেই মৃত্যু ও মৃত্যুগ্রস্ত জীবন (Death and Life-in Death) দ্যূতক্রীড়ায় মানুষের ভবিষ্যৎ অদৃষ্ট নির্ণয় করিয়াছে। এইখানেই প্রেতলোকের সমস্ত

অমীমাংসিত রহস্য, অদৃষ্টের সমস্ত ঝঞ্ঝাবাত, ইন্দ্রহস্ত-নিক্ষিপ্ত বজ্রের সমস্ত আঘাত-বেদনা মানুষের গভীরতম অনুভূতিতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া অতি সহজ সরল নীতি-বোধে অঙ্কুরিত হইয়াছে। নিয়তির বজ্রনির্ঘোষ মানবাত্মার অন্তরদেশে দেবমন্দিরের শঙ্খ-ঘণ্টাধ্বনি মুখরিত—সুপরিচিত, অথচ নবপ্রেরণার ফলে নূতনভাবে অনুভূত-ভক্তি-মাধুর্য্যের মধ্যে বিলীন হইয়াছে।

'Christabel' ও প্রতিবেশ-রচনা অনায়াসেই সম্ভব হইয়াছে। মধ্য-যুগের দুর্গ, তাহার পাশে ঘন অরণ্য; সেই নির্জ্জন বনপ্রদেশে, নিশীথরাত্রে প্রবাসগত প্রণয়ীর কল্যাণে প্রার্থনা-পরায়ণা, ভক্তিবিশ্বাসে উদ্বেলিত-হৃদয়া এক তরুণীর চক্ষুর সম্মুখে অকস্মাৎ অলৌকিক জগতের দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে। দুর্গের আকাশ-বাতাসে মধ্যযুগসুলভ অপ্রাকৃত আবির্ভাবের ছায়া খুব সূক্ষ্মভাবে বিচরণ করিতেছে। তরুণী Christabelএর স্বর্গগতা জননীর অদৃশ্য আত্মা তাহাকে ঘিরিয়া আছে; সেই অশরীরী উপস্থিতি দুর্গের পশু-পাখী নিজ সহজাত সংস্কার বলে অনুভব করে। এই অতিপ্রাকৃতের অনুভূতি কবি আশ্চর্য্য সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনায়, প্রায় অলক্ষিত আভাস-ইঙ্গিতে ব্যক্ত করিয়াছেন। মোরগের নিদ্রালস ডাকে, কুকুরের চাপা তর্জ্জনে, প্রকৃতি-বর্ণনায় রহস্যময় জিজ্ঞাসাভঙ্গীতে, মন্ত্রোচ্চারণের মত একপ্রকার গূঢ়ার্থ, তির্য্যক ভাষাপ্রয়োগে কবি বায়ুমণ্ডলকে প্রেত-লোকের অস্ফুট গুঞ্জনধ্বনিতে পূর্ণ করিয়াছেন; সন্ত্রস্ত পদক্ষেপের ক্ষীণ প্রতিধ্বনিতে পাঠকের বক্ষোরক্তে এক অজ্ঞাত শঙ্কার শিহরণ জাগাইয়াছেন। এইরূপে পাঠকের মন প্রস্তুত হইলে কবি অসঙ্কোচে তাহার সম্মুখে এক সুন্দরী যুবতীর ছদ্মবেশে ডাকিনী Geraldineকে উপস্থিত করিয়াছেন। তাহাকে লইয়া দুর্গে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় ও তৎপরে চারিদিকে অজ্ঞাত বিপদের পূর্ব্বসূচনা ব্যঞ্জিত হইয়াছে। দুর্গপ্রবেশের পূর্ব্বে তাহার আকস্মিক মূর্চ্ছা ও ক্রিষ্টাবেলের সাহায্যে দুর্গদ্বার অতিক্রম; নির্ব্বাপিত-প্রায় অগ্নির হঠাৎ ঝলকে তাহার ক্রূর, সর্পের ন্যায় কুটিল দৃষ্টির উপর আলোকপাত; অদৃশ্য প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত তাহার শক্তি পরীক্ষা; প্রার্থনায় যোগদানে অনিচ্ছা; তাহার উদ্‌ভ্রান্ত, রহস্যময় ব্যবহার; সর্ব্বোপরি ক্রিষ্টাবেলের সহিত এক শয্যায় শয়নকালে তাহার বক্ষোদেশে এক ভয়াবহ ক্ষতচিহ্নের ইঙ্গিত—নিপুণহস্তে গ্রথিত এই সংশয়জাল অভ্যাগতার প্রকৃতি-রহস্যটী নিবিড় করিয়া তুলিয়াছে। পরবর্ত্তী দ্বিতীয় খণ্ডে কবির এই অদ্ভুত কুহকশক্তি, প্রেতলোকের মায়াবিস্তারের নৈপুণ্য অনেকটা হ্রাস হইয়াছে। দিবালোকে রাত্রির সূক্ষ্ম মায়া ক্ষীণ হইয়াছে। দুর্গের কোলাহলময় সাধারণ জীবনযাত্রার মধ্যে ভৌতিক অনুভূতির তীব্রতা মন্দীভূত হইয়া ইহা স্বপ্ন ও রূপকের মৃদুতর পর্য্যায়ে নামিয়া আসিয়াছে। অনেক সমালোচক ইহাকে কোলরিজের গুরুতর ত্রুটী মনে করিয়াছেন—কিন্তু এই পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী ও স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। যেমন প্রবল শোক কালক্রমে অশ্রুরেখার সজল আভাসের মত মনের প্রান্তে লগ্ন হইয়া থাকে, সেইরূপ নিশীথরাত্রের তীক্ষ্ণ অপ্রাকৃত অনুভবও পরদিন প্রভাতে দুঃস্বপ্নের স্মৃতির মত অনেকটা সহনীয় হইয়া আসে। মনোজগতে যাহা ঘটে কবি তাঁহার বর্ণনা-প্রণালীর পরিবর্ত্তন দ্বারা তাহাই সূচিত করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় এই চমৎকার কবিতাটী অসম্পূর্ণ অবস্থায় রহিয়া গিয়াছে।

Kubla Khan কোলরিজের আর একটী অদ্ভুত সৃষ্টি। ইহা ঠিক অতিপ্রাকৃত বিষয়ের উপর রচিত নহে, যদিও ইহার মধ্যে স্থানে স্থানে অতিপ্রাকৃতের ইঙ্গিত ও প্রতিধ্বনি মিলে। স্বপ্নলোকের মায়াময় ও নিগূঢ় সৌন্দর্য্য এই কবিতায় আশ্চর্য্য অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। ইহার বিশেষত্ব এই যে ইহাতে কোন বুদ্ধির সক্রিয়তা বা চিন্তার ধারাবাহিকতার নিদর্শন নাই। এই কবিতায় মস্তিষ্ককে সম্পূর্ণ অবসর দিয়া কবি কেবল তাঁহার স্বপ্নলোক হইতে স্বতঃ উদ্ভূত, কুণ্ডলীকৃত ধূমরাশির ন্যায় অবাধ সঞ্চরণশীল, অসংবদ্ধ চিত্র-সৌন্দর্য্য-সমষ্টিকে বাণীময় রূপ দিয়াছেন। বিভিন্ন দৃশ্যসমূহের মধ্যে কোন চিন্তাগত ঐক্য নাই, তথাপি মনে হয় যে ইহাদের অন্তর্নিহিত ধ্বনি-প্রবাহ এক গূঢ় ভাব-ঐক্যের হেতু হইয়াছে। কবি এই কবিতাটীর উৎপত্তি সম্বন্ধে পাঠককে জানাইয়াছেন যে ইহার ভাব, ভাষা, ছন্দোরূপ ও দৃশ্যাবলীর পারম্পর্য্য সমস্তই স্বপ্নানু-ভূতির স্বচ্ছন্দ-বিকাশ; নিদ্রাভঙ্গের পর এই অনবদ্য স্বপ্নসুষমাটী লিপিবদ্ধ করাই তাঁহার একমাত্র সক্রিয় দায়িত্ব। কবি আরও বলেন যে এই স্বপ্ন-বিকশিত সৌন্দর্য্য-শতদলের সব কয়টী পাঁপড়িই তাঁহার জাগ্রত স্মৃতির সম্মুখে বিস্তৃত ছিল—কিন্তু লিখিবার সময় এক ব্যবসায়ীর তাগিদে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া এই অপরূপ স্বপ্ন অকস্মাৎ মিলাইয়া গেল; তারপর তিনি আর শতচেষ্টাতেও ইহার বিস্মৃত খণ্ডাংশগুলির পুনরুদ্ধার করিতে পারিলেন না। কাজেই কবিতাটী অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। স্বপ্ন-সাগরের তল হইতে উত্থিত এই সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মী কাব্যজগতে অর্দ্ধাভিব্যক্তি লাভ করিয়া স্বপ্ন ও জাগ্রত সত্যের অনিশ্চিত সীমারেখায় চিরন্তন প্রহেলিকার মতই দণ্ডায়মান।

কীটসের অতিপ্রাকৃত কবিতার মধ্যে একটী ছাড়া আর কোথাও এই ভয়াবহ অনুভূতি নাই। সাধারণতঃ কীটস যে সমস্ত পরী, যক্ষ প্রভৃতি অতিমানব জীব আঁকিয়াছেন, তাহারা মানবেরই প্রতিবেশী ও মানবিক গুণসম্পন্ন। 'Lamia'তে যে তরুণীর ছদ্মবেশধারিণী সর্পিণী বর্ণিত হইয়াছে, সে মানুষের মতই প্রেম যাচ্ঞা করে; তাহার ইন্দ্রজাল বিদ্যা কেবল তাহার তীব্র প্রেমাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করার উপায় স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছে; ইহার মধ্যে কোন ভীতি-শিহরণ নাই। বরং যখন পরুষস্বভাব দার্শনিকের রূঢ়স্পর্শে তাহার মায়াজাল ছিন্ন হইয়াছে, তাহার ইন্দ্রজাল-রচিত সৌধ বায়ুস্তরে বিলীন হইয়াছে, মোহভঙ্গের নিদারুণ আঘাতে প্রেমিকযুগলের জীবনান্ত ঘটিয়াছে, তখন কবির সহানুভূতি এই অবাস্তব, ক্ষণস্থায়ী প্রেম-মাধুর্য্যের উপরই বর্ষিত হইয়াছে। তিনি বিজ্ঞানের সৌন্দর্য্য-বিধ্বংসী প্রভাবের বিরুদ্ধে বেদনা-বিদ্ধ আক্ষেপবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। 'Isabella'র গোপন ছুরিকাঘাতে নিহত লরেঞ্জোর প্রেতাত্মা তাহার প্রণয়িণীর নিকট স্বপ্নযোগে আবির্ভূত হইয়া অতি করুণভাবে নিজ সঙ্গীহীন একাকীত্ব, প্রাণযাত্রা-প্রবাহের সহিত তাহার সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ও সহানুভূতির স্পর্শলাভের জন্য ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষার কাহিনী বিবৃত করিয়াছে। ইহাতে ভৌতিক ভয় নাই, আছে নির্ম্মল কারুণ্যরস, যাহাতে গলিত, দুর্গন্ধময় শবদেহের সমস্ত বীভৎসতা ও বিকৃতি ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছে। কেবল La Belle Dame Sans Merci নামক গীতি-কবিতাতে কীট্‌স্ প্রেতলোকের শিহরণ, ইহার ভয়াবহ সাঙ্কেতিকতার সুরটী ফুটাইয়াছেন। মধ্যযুগের এক অশ্বারোহী সৈনিক শীতের রিক্ত, দীর্ঘ বিজনতার মধ্যে উদ্‌ভ্রান্তভাবে বেড়াইতেছে। কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে এক ছলনাময়ী পরী-সুন্দরীর সহিত তাহার সর্ব্বনাশা প্রেমের কাহিনী বিবৃত করিয়াছে। এই সুন্দরীর মোহিনী মায়া ও মদির চুম্বনের নিকট সে আত্মসমর্পণ করিয়া আবেশময় সুষুপ্তিতে ঢলিয়া পড়ে। নিদ্রার মধ্যে সুন্দরীর দ্বারা পূর্ব্ব-প্রতারিত প্রেমিক-সঙ্ঘ শুষ্ক, শীর্ণ ওষ্ঠে অঙ্গুলি স্থাপন করিয়া তাহাকে সাবধান করিতে চেষ্টা করে। নিদ্রাভঙ্গে যে দেখে সে এই বিজন পার্ব্বত্যপ্রদেশে পরিত্যক্ত হইয়াছে। বর্ণনার অত্যধিক সংযম, চাপা ফিস্‌ফিস্ শব্দের মত হ্রস্বায়তন ছন্দের গতিধ্বনি যেন নামহীন ভয়ের তাড়নায় ভাষাভিব্যক্তির অর্দ্ধস্ফুট কণ্ঠরোধ সূচিত করিয়াছে। প্রেতলোকের গূঢ় ব্যঞ্জনা যেন ইহার মধ্যেই রূপ ধরিয়াছে।

ইভা দেবীর ভ্যানিটি-ব্যাগ

(নাটিকা)

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

তৃতীয় অঙ্ক

স্যর বিনয়ের বাড়ীর একটি ঘর। সামনের দিকে একখানা বৃহৎ সোফা। পিছনদিকে ঘরের ঠিক মাঝখানেই পর্দ্দা-ঢাকা একটি বড় জানলা। দু-পাশে ডাইনে ও বামে দরজা। ডানদিকে একটি লেখবার টেবিল। মাঝখানে একটি টেবিলের উপর রয়েছে সুরার 'ডিক্যাণ্টার' ও কাঁচের গেলাস প্রভৃতি। বামদিকের একটি ছোট টেবিলের উপরে সিগার ও সিগারেটের বাক্স প্রভৃতি। এদিকে ওদিকেও খানকয় চেয়ার।

ইভা। (ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে) এখনো তিনি এলেন না কেন? এমনভাবে অপেক্ষা করা হচ্ছে ভয়াবহ। আমি শীতার্ত্ত—সূর্য্যহারা সূর্য্যমুখীর মতন শীতার্ত্ত! তিনি আসুন—তাঁর উত্তপ্ত আবেগ দিয়ে আমার প্রাণের আগুন জ্বালিয়ে তুলুন··· ···এতক্ষণে রাজা নিশ্চয়ই আমার চিঠি পড়েছেন। আমার জন্যে তাঁর একটুও সহানুভূতি থাকলে এতক্ষণে তিনি আমার খোঁজে এখানে আসতেন, আমাকে আবার টেনে নিয়ে যেতেন জোর ক'রে। কিন্তু তিনি তো তা চান না! তিনি যে এখন ঐ স্ত্রীলোকটার গোলাম হয়ে পড়েছেন! সুচরিতারা পুরুষদের দেবতা ক'রে তোলে, তাই তারা তাদের ত্যাগ ক'রে চ'লে যায় পায়ে দ'লে! ভ্রষ্টারা পুরুষদের ক'রে তোলে পশু, আর তাই তারা বিশ্বস্ত পালিত পশুর মতনই তাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে ফেরে। জীবন কি কুৎসিত!······হা ভগবান! নিশ্চয় আমি পাগল হয়ে গিয়েছি, নইলে এখানে আসতুম না। যাঁর কাছে এসেছি, যাঁর কাছে জীবন সমর্পণ করতে চাই, তিনি কি চিরদিন আমাকে ভালোবাসতে পারবেন? এই ওষ্ঠ—যার উপরে আনন্দের রং নেই, এই দৃষ্টি—অশ্রুধারায় যার মাধুর্য্য নষ্ট হয়ে গিয়েছে, এই শীতার্ত্ত আর ভগ্ন হৃদয়—আমি যে লোভনীয় কিছুই আনতে পারিনি! এখান থেকে আবার আমাকে পালিয়ে যেতে হবে—না, না, আর ফিরে যাওয়া অসম্ভব, যে চিঠি লিখে এসেছি তারপর আর ফিরে যাওয়া চলে না—রাজাও আর আমাকে গ্রহণ করবেন না! তার চেয়ে স্যর বিনয়ের সঙ্গে দেশ ছেড়ে চ'লে যাওয়াই ভালো। (কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ ক'রে ব'সে রইলেন। তারপর হঠাৎ সচমকে দাঁড়িয়ে উঠে) না, না! আমি ফিরেই যাব, রাজা আমাকে নিয়ে যা খুসি করুন। আর আমি অপেক্ষা করতে পারছি না। (দু-পা এগিয়ে) কী সর্ব্বনাশ! ঐ যে কার পায়ের শব্দ শুনছি! এখন কি করি? তাঁকে কি বলব? তিনি কি আর আমাকে ফিরে যেতে দেবেন?······ ভগবান!

দু-হাতে নিজের মুখ ঢেকে ফেললেন

মিসেস্ অশোকা রায়ের প্রবেশ

মিসেস্ রায়। রাণী ইভা! (ইভা চমকে মুখ তুলে দেখলেন। তারপর ঘৃণায় মুখ বিকৃত ক'রে দু-পা পিছিয়ে গেলেন) ধন্য ঈশ্বর, ঠিক সময়েই এসে পড়েছি। রাণী ইভা, স্বামীর কাছে আপনাকে এখনি ফিরে যেতে হবে।

ইভা। যেতে হবে? তাই নাকি?

মিসেস্ রায়। (হুকুমের স্বরে) হ্যাঁ, যেতে হবে! আর এক মুহূর্ত্ত সময়ও নষ্ট করা চলবে না। স্যর বিনয় যে-কোনো মুহূর্ত্তে এসে পড়তে পারেন।

ইভার দিকে এগিয়ে গেলেন

ইভা। আমার কাছে আসবেন না!

মিসেস্ রায়। আপনি অতল পাতালের ধারে এসে পড়েছেন, এখনি এ-বাড়ী ছেড়ে চ'লুন। দরজায় আমার গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। আসুন আমার সঙ্গে।

ইভা একখানা সোফার উপরে ভালো করে বসলেন। তাঁর মুখে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞার ভাব

আপনি যে আবার ব'সে পড়লেন?

ইভা। মিসেস্ রায়, আপনি যদি এখানে না আসতেন, তাহ'লে নিশ্চয়ই আমি ফিরে যেতুম! কিন্তু আপনাকে যখন চোখের সামনে দেখছি, তখন সমস্ত পৃথিবী এখান থেকে আমাকে আর এক পা নড়াতে পারবে না। আপনাকে দেখলে আমার ভয় হয়! আপনাকে দেখলে রাগে আমি পাগল হয়ে যাই! বুঝেছি, আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে রাজাই আপনাকে পাঠিয়েছেন, আমাকে সাম্‌নে রেখে পৃথিবীর চোখে ধুলো দেবার জন্যে!

মিসেস্ রায়। ছি, ছি! অমন কথা বলবেন না—অমন্ কথা মুখেও আনবেন না!

ইভা। আমার স্বামীর কাছে ফিরে যান্ মিসেস্ রায়! আমার স্বামী হচ্ছেন আপনার নিজস্ব, আমার নন্। বোধ হয় তিনি এই কেলেঙ্কারি ঢাকা দিতে চান্। পুরুষরা এম্‌নি কাপুরুষ! তারা পৃথিবীর সমস্ত আইন ভাঙবে, অথচ ভয় করবে পৃথিবীর জিহ্বাকে! আমার স্বামীকে গিয়ে বলুন, প্রস্তুত হয়ে থাকতে। একটা কেলেঙ্কারির সৃষ্টি হবেই। আমার আর তাঁর নাম ছাপা হবে যত সব নীচ খবরের কাগজে!

মিসেস্ রায়। না—না—

ইভা। হ্যাঁ, হ্যাঁ। তিনি নিজে এলে আমি ফিরে যেতুম—হ্যাঁ, ফিরে যেতুম, আপনারা আমার জন্যে যে নরক তৈরি ক'রে রেখেছেন তার মধ্যেই। কিন্তু তিনি নিজে এলেন না, পাঠিয়ে দিলেন কিনা আপনাকেই দূতী ক'রে? উঃ! কি জঘন্য কথা!

মিসেস্ রায়। রাণী ইভা, আপনি আমার আর আপনার স্বামীর উপরে বিষম অবিচার করছেন। রাজা জানেন না, আপনি এখানে—রাজা জানেন আপনি আছেন নিজের বাড়ীর ভিতরেই। তিনি জানেন, আপনি নিজের ঘরেই শুয়ে

ঘুমিয়ে পড়েছেন। আপনি যে চিঠি লিখেছেন তিনি তা এখনও পড়েন নি।

ইভা। এখনো পড়েন নি!

মিসেস্ রায়। না—তিনি চিঠির কথা কিছুই জানেন না।

ইভা। আপনি আমাকে কি নির্ব্বোধই মনে করছেন! (তাঁর দিকে এগিয়ে গিয়ে) আপনি মিছে কথা বলছেন।

মিসেস্ রায়। (কষ্টে আত্মসংবরণ ক'রে) না, আমি সত্য কথাই বলছি।

ইভা। আমার স্বামী যদি সে চিঠি না প'ড়েই থাকবেন, তাহ'লে কেমন ক'রে আপনি এখানে এলেন? কে বললে আপনাকে, আমি বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে এসেছি? কে বললে আপনাকে, আমি এখানে এসেছি? আমার স্বামীই বলেছেন, আর আমাকে ভুলিয়ে ফিরে নিয়ে যাবার জন্যে আপনাকে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

পিছন ফিরে দাঁড়ালেন

মিসেস্ রায়। আপনার স্বামী সে-চিঠি দেখেন নি। সে-চিঠি আমি দেখেছি, আমি খুলেছি, আমি পড়েছি।

ইভা। (সামনের দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে) যে-চিঠি আমি লিখেছি আমার স্বামীকে, সেই চিঠি আপনি খুলে দেখেছেন? এত সাহস আপনার!

মিসেস্ রায়। সাহস! আপনাকে পাতাল থেকে উদ্ধার করবার জন্যে পৃথিবীতে যা-কিছু করবার সাহস আমার আছে। এই সেই চিঠি। আপনার স্বামী এখনো এখানা পড়েন নি। কখনো তিনি পড়বার সুযোগও পাবেন না।

চিঠিখানা ছিঁড়ে কুচি কুচি করে জানলা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন

ইভা। (চক্ষে ও কণ্ঠে অসীম ঘৃণার ভাব ফুটিয়ে) ওখানা যে আমারই চিঠি, কেমন ক'রে তা বুঝব? আপনি কি শিশুকে ভোলাতে এসেছেন?

মিসেস্ রায়। কি দুর্ভাগ্য! আমার সমস্ত কথাই কেন আপনি অবিশ্বাস করছেন? আপনাকে রক্ষা করা ছাড়া, আপনার একটা কুৎসিত ভ্রম সংশোধন করা ছাড়া, আমার আর কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে? এ-চিঠি আপনারই, শপথ ক'রে বলছি!

ইভা। (ধীরে ধীরে) আমি দেখবার আগেই চিঠিখানা আপনি ছিঁড়ে ফেলে দিলেন। আপনাকে বিশ্বাস করতে পারি না। আপনার সারা জীবনই হচ্ছে মিথ্যায় পরিপূর্ণ। কোন বিষয়ে সত্য বলবার শক্তি কেমন ক'রে আপনার হবে?

মিসেস্ রায়। (দ্রুত স্বরে) আমাকে আপনি যা খুসি ভাবুন—যা খুসি বলুন, কিন্তু ফিরে যান, ফিরে যান আপনার স্বামীর কাছে—যে-স্বামীকে আপনি ভালোবাসেন।

ইভা। (অবহেলা ভরে) আমি তাঁকে ভালোবাসি না।

মিসেস্ রায়। হ্যাঁ, আপনি বাসেন। আর আপনার স্বামীও যে আপনাকে ভালোবাসেন তাও আপনি জানেন।

ইভা। প্রেম কাকে বলে, আমার স্বামী তা বোঝেন না—যেমন বোঝেন না, আপনি! আমি বুঝেছি আপনি কি চান? আমি ফিরে গেলে আপনার খুব সুবিধাই হবে। হায়রে ভাগ্য, তারপর আমি কী জীবনই যাপন করব! আমাকে নির্ভর করতে হবে এমন এক স্ত্রীলোকের দয়ার উপর—যার দয়া-মমতা কিছুই নেই, যার সঙ্গে দেখা করাও মহাপাপ, যে স্বামী-স্ত্রীর মাঝখানে বাধার মত এসে দাঁড়ায়!

মিসেস্ রায়। (হতাশ ভাবে) রাণী ইভা, রাণী ইভা, এমন সব ভয়ানক কথা বলবেন না! আপনি জানেন না কি ভীষণ, কি অন্যায় কথা উচ্চারণ করছেন! শুনুন আমার কথা! আপনার স্বামীর কাছে ফিরে যান্। আমি অঙ্গীকার করছি কোন ওজরে কখনো আর তাঁর সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখব না। যে-টাকা তিনি আমাকে দিয়েছেন, আমাকে ভালোবেসে দেন্ নি, দিয়েছেন ঘৃণার সঙ্গে! তিনি যে আমার বাধ্য—

ইভা। (উঠে দাঁড়িয়ে) হুঁ, এতক্ষণে আপনি মানলেন আমার স্বামী আপনার বাধ্য।

মিসেস্ রায়। হ্যাঁ, কেন বাধ্য তাও শুনুন্। রাণী ইভা, তিনি আপনাকে ভালোবাসেন ব'লেই আমার বাধ্য হয়েছেন।

ইভা। এ-কথাও আমাকে বিশ্বাস করতে বলেন?

মিসেস্ রায়। আপনি বিশ্বাস করতে বাধ্য! এ সত্য কথা। আপনাকে ভালোবাসেন ব'লেই তিনি ভয়ে আমার বাধ্যতা স্বীকার করেছেন। তিনি আপনাকে লজ্জা থেকে মুক্তি দিতে চান্—হ্যাঁ, লজ্জা! লজ্জা আর অপমান থেকে!

ইভা। আপনার কথার মানে কি? অদ্ভুত আপনার ধৃষ্টতা! আপনাকে নিয়ে আমি কি করব?

মিসেস্ রায়। (বিনীতভাবে) কিছু না। আমি জানি ব'লেই বলছি যে, রাজা আপনাকে ভালোবাসেন—আর সে এমন ভালোবাসা যে, সারা জীবনে তেমন ভালোবাসা আর পাবেন না—পাবেন না সারা জীবনে তেমন ভালোবাসা আর কোথাও; —আর যদি আজ তা আপনি ত্যাগ করেন, তবে ভালোবাসার অভাবে চিরদিন উপবাসী হয়ে থাকবে আপনার আত্মা, তখন ভিক্ষা করলেও আর তা মিলবে না। রাণী, নরেন আপনাকে ভালোবাসে!

ইভা। নরেন? আমার স্বামীর নাম ধ'রে ডাকছেন আপনি! অথচ আপনি বলতে চান আপনাদের মধ্যে কোনই সম্পর্ক নেই?

মিসেস্ রায়। রাণী ইভা, আপনার স্বামী সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। যদি জানতুম, যদি বুঝতুম যে, আমাকে নিয়ে আপনার মনের ভিতরে এমন ভয়ানক সন্দেহ প্রবেশ করতে পারে, তাহ'লে আপনাদের বাড়ীতে না এসে আমি মৃত্যুরও সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারতুম—হ্যাঁ, পরম আনন্দে মৃত্যুকেও বরণ করতুম।

ডানদিকে স'রে গিয়ে একটা সোফার কাছে দাঁড়ালেন

ইভা। আপনার কথা শুনলে সন্দেহ হয় যেন আপনার হৃদয় আছে। কিন্তু আপনাদের মতন স্ত্রীলোকের হৃদয় থাকে না। আপনারও হৃদয় নেই। ইচ্ছা করলেই আপনাকে কেনা যায়, আর বিক্রী করা যায়।

বাঁদিকে স'রে গিয়ে সোফার উপরে বসলেন

মিসেস্ রায়। (চমকে উঠলেন, তাঁর মুখে ফুটে উঠল

যাতনার রেখা! তারপর আত্মসংবরণ ক'রে ইভার সামনে এসে দাঁড়ালেন) আমাকে আপনি যা ভাবতে চান তাই ভাবুন। আমি এক মুহূর্ত্তেরও সহানুভূতির যোগ্য নই। কিন্তু আমার জন্য নষ্ট করবেন না আপনার এই সুন্দর তরুণ জীবন! আপনি বুঝতে পারছেন না যদি এখনি এই বাড়ী ছেড়ে চ'লে না যান, তাহ'লে কত-বড় দুর্ভাগ্য আপনার জন্য অপেক্ষা করবে। আপনি জানেন না, পঙ্ক-শয্যায় প'ড়ে সমাজচ্যুত জীবের মত পরিত্যক্ত, ঘৃণিত, নিন্দিত, উপহসিত, অপমানিত হওয়া কতখানি ভয়ানক! চোখের সামনে সমস্ত দরজা বন্ধ হয়ে যাবে, পাছে লোকের সুমুখে মুখোস খুলে পড়ে সেই ভয়ে অলি-গলি দিয়ে লুকিয়ে বেড়াতে হবে, আর সর্ব্বদা কাণের কাছে বাজতে থাকবে সেই হাস্যধ্বনি—পৃথিবীর সেই ভয়াবহ হাস্যধ্বনি, বিশ্বের সমস্ত বস্তুর চেয়ে যে-হাসি বেশী দুঃখময়, গ্লানিময়, বেদনাময়। আপনি জানেন না, সে কী দুঃসহ জীবন! পাপ করলে তার মূল্য দিতে হয়, সারা জীবন ধ'রে পৃথিবীর রাজপথে প্রতি পদে তার মূল্য দিতে হয়। আপনি তো তা জানেন না! আমার কথা যদি বলেন, দুঃখভোগে যদি পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়, তাহ'লে এই মুহূর্ত্তেই হয়েছে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত;—কারণ আজ রাত্রে আপনি এক হৃদয়হীনা নারীকে দিয়েছেন নূতন হৃদয়,—দিয়েছেন, কিন্তু আবার তাকে চূর্ণও করেছেন।—কিন্তু সে-কথা যাক্; আমি নিজের হৃদয়কে হয়তো ধ্বংস করেছি, কিন্তু আপনাকেও তা করতে দেব না। আপনি তো একরত্তি একটি বালিকা, দুর্ভাগ্যের অরণ্যে ঢুকলে এখনি কোথায় হারিয়ে যাবেন। সেখানে পথ ক'রে নেবার মতন বুদ্ধি বা বয়স আপনার এখনো হয়নি! সে সাহস আর জ্ঞানও আপনার নেই। অপমান আপনি সহ্য করতে পারবেন না। ফিরে চলুন রাণী ইভা, ফিরে চলুন সেই স্বামীর কাছে যিনি আপনাকে ভালোবাসেন, যাঁকে ভালোবাসেন আপনি। আপনার কোলে একটি খোকা আছে রাণী ইভা। ফিরে চলুন সেই খোকার কাছে, হয়তো এখনই সে হাসতে হাসতে কি কাঁদতে কাঁদতে 'মা' 'মা' ব'লে আপনাকে ডাক্‌ছে। (রাণী ইভা উঠে দাঁড়ালেন) ভগবানই আপনাকে দান করছেন সেই স্বর্গীয় শিশু! আপনার জন্যে যদি তার নিষ্পাপ জীবন বিষাক্ত হয়ে ওঠে, তবে কি জবাব দেবেন আপনি ভগবানের কাছে? ফিরে চলুন রাণী ইভা—ফিরে চলুন নিজের সংসারে—আপনার স্বামী আপনাকে ভালোবাসেন। এক মুহূর্ত্তের জন্যেও তিনি প্রেম-বিচ্যুত হননি। কিন্তু যদি তাঁর সহস্র উপপত্নীও থাকে, তবু আপনার ঠাঁই হচ্ছে আপনার খোকার পাশে। স্বামী নির্দ্দয় ব্যবহার করলেও খোকার পাশ ছেড়ে আপনি উঠতে পারবেন না। তিনি আপনাকে ত্যাগ করলেও আপনাকে ব'সে থাক্‌তে হবে খোকার পাশেই।

ইভা উচ্ছ্বসিত স্বরে কেঁদে উঠে দু-হাতে নিজের মুখ ঢেকে ফেললেন

(ইভাকে ধ'রে) রাণী ইভা!

ইভা। (অসহায় শিশুর মতন দু-হাতে মিসেস্ রায়ের দুই বাহু জড়িয়ে ধ'রে) বাড়ী নিয়ে চলুন—আমাকে বাড়ী নিয়ে চলুন!

মিসেস্ রায়। (ইভাকে আলিঙ্গন করতে গিয়েই নিজেকে সামলে নিলেন। তাঁর দুই চক্ষে ফুটে উঠ্‌ল আনন্দের উচ্ছ্বাস!) আসুন রাণী ইভা, আসুন।

তাঁরা তাড়াতাড়ি দরজার কাছে এগিয়ে গেলেন

ইভা। (থমকে দাঁড়িয়ে প'ড়ে) দাঁড়ান্! গলার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন না?

মিসেস্ রায়। না, না! কোথাও কেউ নেই।

ইভা। হ্যাঁ, আছে! শুনুন্! ও যে আমার স্বামীর গলা! আমার স্বামী আসছেন! আমাকে রক্ষা করুন! ও, বুঝেছি—এ হচ্ছে চক্রান্ত! আপনিই তাঁকে এখানে আনিয়েছেন!

বাইরে একাধিক কণ্ঠস্বর

মিসেস্ রায়। চুপ্! আমি যখন এখানে আছি, আপনাকে বাঁচাবার চেষ্টা করব। কিন্তু হয়তো সে চেষ্টা সফল হবে না! ঐখানে যান! (জানলার পর্দ্দার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করলেন।) সুযোগ পেলেই পালিয়ে যাবেন—অবশ্য যদি সুযোগ পান!

ইভা। কিন্তু আপনি?

মিসেস্ রায়। আমার কথা ভাব্‌বেন না। আমি ওদের সুমুখেই দাঁড়িয়ে থাকব।

ইভা জানলার পর্দ্দার আড়ালে গিয়ে লুকোলেন

কুমার। (নেপথ্যে) আরে হরি, হরি! ভায়া নরেন, আজ আর আমায় ছেড়ে তোমায় যেতে দেব না!

মিসেস্ রায়। কুমার চন্দ্রনাথ! তাহ'লে আমারই সর্ব্বনাশ!

দু-এক মুহূর্ত্ত ইতস্তত ক'রে চারিদিকে তাকিয়ে দেখলেন, তারপর ডান্ দিকের দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেলেন

স্যর বিনয়, মিষ্টার হেরম্ব দত্ত, রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ, কুমার চন্দ্রনাথ ও মিষ্টার সুশীল রায়-চৌধুরীর প্রবেশ

হেরম্ব। কি জ্বালাতন! এই রাত্রে ক্লাব থেকে আমাদের বিদায় ক'রে দিলে! এইতো মোটে রাত দুটো! (একখানা চেয়ারের উপরে ব'সে পড়লেন) এইতো মোটে সান্ধ্য-জীবনের আরম্ভ!

মস্ত একটা হাই তুলে দুই চোখ মুদে ফেললেন

রাজা। স্যর বিনয়, ধন্যবাদ! কুমার-বাহাদুরের কথা শুনে আপনি যে আমাদের এখানে নিয়ে এলেন, এ-হচ্ছে সৌভাগ্যের কথা। কিন্তু আমি তো আর বেশীক্ষণ থাকতে পারব না।

স্যর বিনয়। তাই নাকি! শুনে ভারি দুঃখিত হলুম। আসুন, একটা সিগার গ্রহণ করুন।

রাজা। ধন্যবাদ!

বসলেন

কুমার। (রাজাকে) হরি, হরি, চ'লে যাবে কি? হ'তেই পারে না। একটা বড্ড-আচ্ছা দরকারি কথা নিয়ে তোমার সঙ্গে এখন আমাকে আলোচনা করতে হবে।

রাজার পাশেই ব'সে পড়লেন

সুশীল। ও দরকারি কথাটা কি, আমরা সবাই জানি! যেমন কানু ছাড়া গীত নেই, আমাদের মোট্‌কুর মুখে তেমনি মিসেস্ রায় ছাড়া কথা নেই।

রাজা। সুশীল, পরের চরকায় তেল্ দিয়ে তোমার কিছু লাভ আছে ?

সুশীল। কিছু না। সেইজন্যেই তো ওটা আমার ভালো লাগে। নিজের চরকা চালাতে গেলেই অবসাদে আমার হাত-পা নেতিয়ে আসে। তাইতো আমি অপরের চরকাই পছন্দ করি।

স্যর বিনয়। কিছু পান-টান করুন। সুশীল, হুইস্কির একটা পেগ্ তোমার চল্‌বে নাকি ?

সুশীল। ধন্যবাদ! (রাজার টেবিলের সামনে ব'সে পড়লেন) মিসেস্ রায়কে আজ ভারি সুন্দরী দেখাচ্ছিল, না ?

রাজা। আমি তাঁর ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে গণ্য নই।

সুশীল। আমিও তো ছিলাম না। কিন্তু এখন ভক্ত হয়ে পড়েছি। বলেন্ কি মশায়, মিসেস্ রায় কিনা খুড়িমার সঙ্গে তাঁকে পরিচয় করিয়ে দিতে আমাকে বাধ্য করলেন! শুনছি খুড়িমা নাকি তাঁকে নিমন্ত্রণ করেছেন!

স্যর বিনয়! (বিস্মিত স্বরে) যাও, বাজে বোকো না!

সুশীল। হ্যাঁ, যা বলছি, ঠিক্।

স্যর বিনয়। বন্ধুগণ, আমাকে একটু ক্ষমা করতে হবে। কাল্‌কেই আমাকে বাইরে যেতে হচ্ছে। খান্‌কয়েক চিঠি-লেখা এখনো বাকি আছে।

উঠে লেখবার টেবিলের সামনে গিয়ে বসলেন

হেরম্ব। (হঠাৎ চোখ খুলে) ভারি চালাক মেয়ে, এই মিসেস্ রায়!

সুশীল। আরে হেরম্ব! আমি ঠাউরেছিলুম তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ।

হেরম্ব। হ্যাঁ, সচরাচর ঘুমিয়ে পড়াই হচ্ছে আমার স্বভাব।

কুমার। সত্যিই বড় চালাক্ মেয়ে! আমি যে কি-রকম একটি বহুৎ-আচ্ছা গাধা সেটা কেবল আমি জানি না, তিনিও দস্তরমত ধ'রে ফেলেছেন। (সুশীল হাসতে হাসতে তাঁর দিকে এগিয়ে এলেন) যত খুসি হাসো ভায়া, যত পারো হাসো, কিন্তু যে-নারী আমাকে বোঝে তাকে সঙ্গী পাওয়া ভাগ্যের কথা।

হেরম্ব। এ হচ্ছে ভয়ানক একটা বিপদের কথা। এ-রকম সব কথার শেষে থাকে কেবলমাত্র উদ্বাহ-বন্ধন!

সুশীল। কিন্তু মোট্‌কু, আমি যে ভেবেছিলুম এ-জীবনে মিসেস্ রায়ের মুখ তুমি আর কখনো দেখবে না! হ্যাঁ, এই কাল্‌কেই ক্লাবে এ-কথা তুমি আমাকে নিজের মুখে বলেছ। বললে, মিসেস্ রায়ের নামে নাকি তুমি শুনেছ—

কানে কানে ফিস্ ফিস্ ক'রে কি বললেন

কুমার। ও, এই কথা? মিসেস্ রায় তার একটা বহুৎ-আচ্ছা কৈফিয়ৎ দিয়েছেন।

সুশীল। আর সেই কুসুমপুরের যুবরাজের ব্যাপারটা ?

কুমার। তিনি তারও একটা ভালো কৈফিয়ৎ দিয়েছেন ?

হেরম্ব। আর তাঁর মাসিক আয়ের কথা? মোট্‌কু, তুমি তারও কি কোনো কৈফিয়ৎ পেয়েছ ?

কুমার। (খুব গম্ভীরভাবে) মিসেস্ রায় বলেছেন, তিনি তাঁর আয় সম্বন্ধেও কাল একটা বহুৎ-আচ্ছা কৈফিয়ৎ দেবেন।

সুশীল আবার ঘরের মাঝখানে গিয়ে বসলেন

হেরম্ব। এ-কালের মেয়েরা হয়ে উঠেছে বিষম ব্যবসাদার। আমাদের ঠাকুমা-দিদিমারা বিয়ের পণের টাকা নিয়ে যেতেন স্বামীর ঘরে, কিন্তু তাঁদের আধুনিক নাত্‌নিরা স্বামীর ঘরে যেতে চান কেবল দু-হাতে টাকা লোঠ্‌বার জন্যে।

কুমার। তুমি মিসেস্ রায়কে দুষ্টা নারী ব'লে প্রমাণ করতে চাও। না, তিনি তা নন্।

সুশীল। ভায়া, দুষ্ট মেয়েরা করে জালাতন, আর শিষ্ট মেয়েরা আনে অবসাদ। দুষ্ট আর শিষ্টের মাঝখানে এইটুকু তফাৎ!

কুমার। (সিগার টান্‌তে টান্‌তে) মিসেস্ রায়ের সামনে আছে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।

হেরম্ব। আর মিসেস্ রায়ের পিছনে আছে সমুজ্জ্বল অতীত।

কুমার। যাদের উজ্জ্বল অতীত আছে, আমি সেই-সব নারীকেই পছন্দ করি। তারা বহুৎ-আচ্ছা, তাদের সঙ্গে কথা কইলেও প্রাণ ঠাণ্ডা হয়!

সুশীল। ভয় নেই মোট্‌কু, ভয় নেই। মিসেস্ রায়ের সঙ্গে তোমাকে অনেক বিষয় নিয়েই বাক্যালাপ করতে হবে।

উঠে কুমারের দিকে অগ্রসর হ'লেন

কুমার। তুমি বড়ই বিরক্তিকর হয়ে উঠ্‌ছ ভায়া, বড়ই বিরক্তিকর হয়ে উঠ্‌ছ।

সুশীল। (কুমারের ভুঁড়ির উপরে হাত বুলোতে বুলোতে) মোট্‌কু, তুমি তোমার দেহের গঠন হারিয়েছ, তুমি তোমার চরিত্রও হারিয়েছ। কিন্তু সাবধান, তারপর যেন তোমার ধৈর্য্যও হারিয়ে ফেলোনা।

কুমার। ছোক্‌রা, আমি যদি অতিশয় ভালোমানুষ না হতুম—

সুশীল। তাহ'লে আমরা তোমার সঙ্গে খুব সম্মানজনক ব্যবহার করতুম, না মোট্‌কু ?

হেরম্ব। আজকালকার ছোকরারা বড়ই ফাজিল হয়ে উঠেছে। কলপ্ দেওয়া পক্ক কেশকেও তারা শ্রদ্ধা করেনা।

কুমার ফিরে সক্রোধে হেরম্বের দিকে তাকালেন

সুশীল। কিন্তু আমাদের মোট্‌কুর প্রতি মিসেস্ রায়ের অসাধারণ শ্রদ্ধা।

রাজা। দেখ, তোমরা বড়-বেশী বাজে বাক্যব্যয় করছ। তোমরা মিসেস রায়ের প্রসঙ্গ ছাড়ো। তোমরা মিসেস্ রায়ের বিষয়ে কিছুই জান না, অথচ সর্ব্বদাই তাঁর নামে কুৎসা রটনা কর।

সুশীল। (রাজার দিকে অগ্রসর হয়ে) ভাই নরেন, আমি কখনই কুৎসা-রটনা করি না। আমি রটনা করি কেবল জনরব।

রাজা। জনরব আর কুৎসার ভিতরে তফাৎটা কোথায় শুনি ?

সুশীল। জনরব হচ্ছে চমৎকার! যেমন ইতিহাসের

নামান্তর হচ্ছে জনরব। কিন্তু জনরবকে যখন নীতির পোষাক পরিয়ে বিরক্তিকর ক'রে তোলা হয় তখনই তার নাম দেওয়া যায় কুৎসা!

কুমার। আমারও ঐ মত ভায়া, আমারও ঐ মত!

সুশীল। শুনে দুঃখিত হ'লুম, মোট্‌কু। যখনই কেউ আমার মতে সায় দেয়, তখনি আমার মনে হয় আমার মত ভুল। কিন্তু ও-কথা যাক্। বিনয় কি করছে বল দিকি? এখনো ব'সে ব'সে চিঠি লিখ্‌ছে! যে-পত্র লিখতে এত দেরি হয়, তা প্রেম-পত্র না হয়ে যায় না।

স্তর বিনয়। (টেবিল ছেড়ে উঠে) না বন্ধু, যার প্রেম নেই সে প্রেম-পত্র লিখ্‌বে কাকে?

সামনে এগিয়ে এসে বসলেন

সুশীল। আজ যে তোমায় বড় 'রোমান্টিক' ব'লে মনে হচ্ছে হে! নিশ্চয় তুমি প্রেমে পড়েছ। নারীটি কে?

স্তর বিনয়। কথা যখন তুললে, তখন বলতে পারি। যে-নারীকে আমি ভালোবাসি, সে স্বাধীন নয়, কিংবা সে নিজেকে স্বাধীন ব'লে মনে করে না।

কথা কইতে কইতে আড়চোখে একবার নরেন্দ্রনারায়ণের দিকে তাকালেন

সুশীল। তাহ'লে নিশ্চয়ই তিনি বিবাহিতা স্ত্রীলোক। পরকীয়া প্রেম বড়ই মধুর।

স্তর বিনয়। কিন্তু তিনি আমাকে ভালোবাসেন না। তিনি হচ্ছেন সতী, জীবনে আমি যথার্থ সতী এই প্রথম দেখলুম।

সুশীল। এর আগে তুমি আর কখনো যথার্থ সতী দেখোনি?

স্তর বিনয়। না।

সুশীল। (একটা সিগারেট ধরিয়ে) ওঃ, তাহ'লে তুমি একটি ভাগ্যবান কুকুর! হায়রে, জীবনে আমি দেখেছি—অর্থাৎ দেখতে বাধ্য হয়েছি শত শত সতীকে! সতী ছাড়া কারুর সঙ্গে আলাপ করবার সৌভাগ্য আমার হয়নি। আমার পৃথিবীটা যেন কেবল সতী নারীর বিপুল জনতায় পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। অসীম দুর্ভাগ্য!

হেরম্ব। (স্তর বিনয়কে) তাহ'লে এই মহিলাটি তোমাকে ভালোবাসেন না?

স্তর বিনয়। না, বাসেন না।

হেরম্ব। সুশীল, যে-নারী তোমাকে ভালোবাসে না, তাকে তুমি কতদিন ভালোবাসতে পারো?

সুশীল। ও, চিরদিন ভাই, চিরদিন! ভালোবাসা পাওয়া মানেই তো নারীকে পাওয়া, আর সেইখানেই তো প্রেমের মৃত্যু!

স্তর বিনয়। দেখছি তোমরা বেজায় 'সিনিক' হয়ে উঠেছ।

সুশীল। (সোফার পিছনে ব'সে প'ড়ে) 'সিনিক্' কাকে বলে?

স্তর বিনয়। যে সব-কিছুরই দাম জানে, কিন্তু কোন-কিছুরই মূল্য বোঝে না।

সুশীল। (কোন জবাব দিলেন না। হেঁট হয়ে সোফার ভিতর দিকে তাকিয়ে রাণী ইভার ভ্যানিটি-ব্যাগটি দেখতে পেলেন। তারপর মৃদু হেসে উঠে দাঁড়িয়ে) বিনয়, তুমি নিশ্চয়ই এই সতী নারী ছাড়া আরো দু-একজনকে ভালোবাসো?

স্তর বিনয়। সুশীল, যখন কেউ সত্য সত্যই কোন নারীকে ভালোবাসে, তখন তার কাছে পৃথিবীর আর সব নারীই হয়ে পড়ে একেবারে অর্থহীন। প্রেম মানুষের স্বভাবকে বদলে দেয়—আমারও স্বভাব বদ্‌লে গেছে!

সুশীল। আহা, কি চিত্তাকর্ষক কথা! মোট্‌কু, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে—এদিকে এস।

সুশীলের কথা কুমার গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলেন না

হেরম্ব। মোট্‌কুর সঙ্গে কথা কয়ে কোনই লাভ নেই। তার চেয়ে তুমি দেওয়ালের সঙ্গে কথা কইবার চেষ্টা কর।

সুশীল। আমি দেওয়ালের সঙ্গেই কথা কইতে ভালোবাসি—দুনিয়ায় দেওয়ালই হচ্ছে একমাত্র জিনিষ যে কখনো আমার কথার প্রতিবাদ করেনি। মোট্‌কু!

কুমার। তুমি আবার কি বলতে চাও ভায়া?

অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠে সুশীলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন

সুশীল। এখানে এসে দেখ। (নিম্ন স্বরে) বিনয় এতক্ষণ পবিত্র প্রেম নিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছিল, অথচ তার ঘরের ভিতরেই স্ত্রীলোক এনে রেখেছে।

কুমার। না, না। কী যে বল!

সুশীল। হ্যাঁ, ঐ দেখ তার 'ভ্যানিটি-ব্যাগ!'

কুমার। (একগাল হেসে) হরি, হরি! বহুৎ আচ্ছা!

রাজা। (উঠে দাঁড়িয়ে) স্তর বিনয়, আপনি কলকাতা ছেড়ে যাচ্ছেন শুনে দুঃখিত হলুম। ফিরে এসে আবার আমার সঙ্গে দেখা করবেন। তাহ'লে আমি আর আমার স্ত্রী দুজনেই অত্যন্ত সুখী হ'ব।

স্তর বিনয়। (রাজার সঙ্গে এগুতে এগুতে) আমি বোধহয় এখন আর কিছুকালের জন্যে ফিরব না! 'গুড নাইট্'।

সুশীল। নরেন?

রাজা। কি?

সুশীল। একবার এদিকে এস।

রাজা। (টেবিলের উপর থেকে টুপি তুলে নিয়ে) না ভাই, আর আমার সময় নেই।

সুশীল। আরে শুনেই যাও না! ভারি মজার কথা! শুন্‌লে আর দেখলে খুসি হবে!

রাজা। (সহাস্যে) বুঝেছি সুশীল, আমায় তোমার কোন বাজে প্রলাপ শোনাতে চাও আর কি!

সুশীল। প্রলাপ নয় ভাই, রীতিমত রঙিন্ সংলাপ।

কুমার। উঁহু, উঁহু! যাবে কোথায়? এখনো আমার অনেক কথাই বলবার আছে। আর সুশীল তোমাকে দেখাবে একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য বস্তু!

রাজা। (তাঁদের কাছে গিয়ে) ব্যাপার কি বলো দিকি?

সুশীল। বিনয় ঘরে একজন স্ত্রীলোককে এনে লুকিয়ে রেখেছে। ঐ দেখ তার ভ্যানিটি-ব্যাগ। মজার কথা নয়?

অল্পক্ষণের স্তব্ধতা

রাজা। হা ভগবান!

তাড়াতাড়ি হেঁট হয়ে ব্যাগটি তুলে নিলেন—হেরম্ব দাঁড়িয়ে উঠল

সুশীল। কি হ'ল নরেন?

রাজা। (কঠোর স্বরে) স্যর বিনয় !

স্যর বিনয়। (ফিরে দাঁড়িয়ে) কি বলছেন ?

রাজা। আমার স্ত্রীর এই 'ভ্যানিটি-ব্যাগ'টা তোমার ঘরে কেন ? (ক্রুদ্ধভাবে অগ্রসর হ'তে উদ্যত হলেন, সুশীল তাঁকে বাধা দেবার চেষ্টা করলেন) ছেড়ে দাও সুশীল ! আমাকে স্পর্শ কোরো না।

স্যর বিনয়। (সবিস্ময়ে) আপনার স্ত্রীর 'ভ্যানিটি-ব্যাগ' ?

রাজা। হ্যাঁ ! এই দেখ !

স্যর বিনয়। (অগ্রসর হয়ে দেখে) আমি এর কিছুই জানি না।

রাজা। তুমি নিশ্চয়ই জানো। আমি এর কৈফিয়ৎ চাই। (সুশীলকে) ছেড়ে দাও সুশীল !

স্যর বিনয়। (নিম্ন স্বরে) তাহ'লে সত্যই তিনি এখানে এসেছেন ?

রাজা। বল, আমার স্ত্রীর জিনিষ এখানে কেন ? উত্তর দাও। আমি এখনি খুঁজে দেখব আমার স্ত্রীও এখানে আছে কিনা !

অগ্রসর হ'বার চেষ্টা করলেন

স্যর বিনয়। (বাধা দিয়ে) আমার ঘর আপনি খুঁজে দেখতে পারবেন না। আপনার খুঁজে দেখবার কোনই অধিকার নেই। আমি নিষেধ করছি !

রাজা। (সক্রোধে) বদ্‌মাইস্ ! আমি তোমার বাড়ীর প্রত্যেক জায়গা খুঁজে না দেখে এখান থেকে যাব না। ঐ পর্দার পিছনে কি নড়ছে ?

অগ্রসর হ'তে উদ্যত

মিসেস্ অশোকা রায়ের প্রবেশ

মিসেস্ রায়। রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ !

রাজা। (সবিস্ময়ে) মিসেস্ রায় !

প্রত্যেকে চমকে ফিরে দাঁড়িয়ে সবিস্ময়ে মিসেস্ রায়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন। পিছনে ইভা সভয়ে পর্দার ভিতর থেকে বেরিয়ে সকলের অগোচরে নিঃশব্দ দ্রুতপদে ঘরের বাইরে চ'লে গেলেন।

মিসেস্ রায়। রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ ! আপনার বাড়ী থেকে আসবার সময় ভুল ক'রে আমি রাণী ইভার ভ্যানিটি-ব্যাগটি নিয়ে এসেছি। এজন্যে আমি অত্যন্ত দুঃখিত !

ব্যাগটি রাজার হাত থেকে টেনে নিলেন। রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন। স্যর বিনয়ের মুখে ক্রোধ-মিশ্রিত বিস্ময়ের চিহ্ন। কুমার চন্দ্রনাথ বিরক্ত ও হতাশ চোখে মিসেস্ রায়ের দিকে তাকিয়ে করুণভাবে প্রস্থান করলেন। সুশীল ও হেরম্ব পরস্পরের দিকে সহাস্য দৃষ্টি বিনিময় করলেন।

(আগামীবারে সমাপ্য।)

নিজামীর কাব্যে শিরীণ

শ্রীগুরুদাস সরকার

শিরীণ শব্দের অর্থ মিষ্ট। আমরা সত্যনারায়ণ অথবা সত্যপীরকে যে 'শিরণী' দিয়া থাকি তাহা এই মিষ্টবাচক পারসীক শব্দ হইতেই উদ্ভূত (১)। ভারতবাসিনী পারসীক মহিলাদিগের মধ্যে অদ্যাবধি শিরীণ নামের যে প্রচলন রহিয়াছে, হয়তো প্রাচীন ইতিকথার শিরীণ বিষয়ক আখ্যায়িকার জনপ্রিয়তাই তাহার মূলীভূত কারণ। নিজামীর কাব্যে খস্‌রু ও শিরীণের কাহিনী যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে তাহা এইরূপ :—

নৃপতি হরমুজদ্‌এর পুত্র রাজকুমার খস্‌রু যেরূপ মৃগয়াসক্ত ছিলেন ঠিক সেইরূপই ছিলেন কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতে অনুরক্ত। একজন সুকবি ও গায়ক ছিলেন তাঁহার প্রিয় বয়স্য। একবার মৃগয়ায় বহির্গত হইয়া তিনি কোনও গ্রামবাসীর গৃহ তাঁহার অস্থায়ী আবাসস্থান বলিয়া মনোনীত করেন এবং তথায় বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিয়া গীতবাদ্যে এরূপ নিমগ্ন হইয়া পড়েন, যে সেই স্থানেই সারারাত্রি অতিবাহিত হইয়া যায়। কুমারের একজন দাস এই উপলক্ষে বিনানুমতিতে অপরের দ্রাক্ষাক্ষেত্র হইতে দ্রাক্ষাফল অপহরণ করিয়া আনে এবং তাঁহার অশ্বও ছাড়া পাইয়া কোনও দরিদ্র ব্যক্তির কৃষিক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া তাহার শস্য বিমর্দিত করিয়া দেয়। হরমুজদ্‌এর আদেশ ছিল যে কেহ কোনও প্রতিবেশীর বা রাজ্যের কোনও প্রজার অনিষ্টসাধন করিলে তিনি যেই হউন না কেন তাঁহাকে কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। তাঁহার এ অনুশাসন তিনি পূর্ব্বেই দেশ মধ্যে প্রচারিত করিয়া দিয়াছিলেন সুতরাং খসরু ও তাঁহার অনুচরদিগের এ অকার্য্যের কোনও সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ রাজসকাশে উপস্থিত করিয়া যে বিশেষ ফললাভ হইবে তাহার সম্ভাবনা ছিলনা। রাজ্যের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী, যুবরাজ খসরু স্বয়ংই এইরূপ অপরাধ করিয়াছেন শুনিয়া নৃপতি হরমুজদ্‌এর আর ক্রোধের পরিসীমা রহিল না। যে ব্যক্তির শস্যের ক্ষতি হইয়াছিল তাহাকে শাহেনশাহ নিজ পুত্রের অশ্বটি প্রদান করিলেন, আর দ্রাক্ষাপহারী সেই ক্রীতদাসটিকে দিলেন দ্রাক্ষাক্ষেত্রের ক্ষেত্রস্বামীকে; যে গ্রামবাসীর গৃহে রাজকুমার অনধিকার প্রবেশ করিয়াছিলেন, খস্‌রুর সাজসজ্জা সমস্তই তাহাকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ-প্রদত্ত হইল। খস্‌রু পিতৃ-সমীপে উপস্থিত হইয়া নিতান্ত দীনভাবে ক্ষমাভিক্ষা করায় (২) অপর শাস্তি হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন।

(১) বোম্বাই প্রদেশে নানাস্থানে শিরীণ বাইয়ের সন্ধান মিলে বটে কিন্তু বঙ্গদেশে স্ত্রী-জাতির মিষ্টবাচক নাম সেরূপ প্রচলিত নাই। আমি "মাধুরী", "অমিয়া" প্রভৃতি আধুনিক সৌখীন নামের কথা ধরিতেছি না। পূর্ব্বে, গ্রামাঞ্চলে, কখনও কখনও 'চিনি' নাম শুনিতাম, হয়তো বা তাহা একাধিক স্থলে 'চিন্ময়ী'রই অপভ্রংশ। সাম্প্রতিক সাহিত্যে একা "বনফুল"ই "মিষ্টি দিদির" আবির্ভাব ঘটাইয়াছেন।

(২) নিজামীর খাম্‌সা নিহিত চিত্রগুলির মধ্যে এই ক্ষমাপ্রার্থনার চিত্রও প্রদত্ত হইয়াছে। লরেন্স বিনিয়ন (Laurence Binyon) প্রণীত নিজামীর খাম্‌সা বিষয়ক ইংরাজী গ্রন্থে যে কাব্য পঞ্চকের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে এ চিত্রটি তাহারই অন্তর্গত "খস্‌রু ওয়া শিরীণ" নামক কাব্য হইতে গৃহীত। লেখক এ প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর জন্য বিনিয়নের গ্রন্থের নিকট তাঁহার ঋণ স্বীকার করিতেছেন।

ইহার পর খস্রু স্বপ্ন দেখিলেন যে তাঁহার পিতামহ আসিয়া যেন তাঁহাকে বলিতেছেন "তুমি যেমন তোমার অশ্ব ও তোমার সুগায়ক চারণটিকে হারাইয়াছ তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর অশ্ব ও চারণ-তো পাইবেই, উপরন্তু শিরীণ নাম্নী রূপেগুণে অতুলনীয়া এক অলোকসামান্যা কন্যাকে পত্নীরূপে লাভ করিবে।"

খস্রু শাপুর নামক একজন চিত্রকরের বন্ধুত্ব লাভ করিয়াছিলেন। একদিন এই প্রিয়বয়স্য প্রমুখাৎ তিনি অবগত হইলেন যে আর্মেনিয়ার রাজকুমারী শিরীণ তাঁহারই পিতামহ বর্ণিত স্ত্রীরত্নেরই অনুরূপ এবং তিনি অদ্যাপি অনূঢ়া রহিয়াছেন। শিরীণের নাম ও তাঁহার সৌন্দর্য্যের কথা শ্রবণ করিয়াই খস্রুর মনে প্রণয় সঞ্চার হইল। তিনি শাপুরকে অবিলম্বে আর্মেনিয়ায় গমন করিয়া শিরীণের সহিত তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিতে অনুরোধ করিলেন। শাপুর রাজপুত্রের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি নিজে একজন উৎকৃষ্ট চিত্রকর ছিলেন। শুধু স্বহস্ত-অঙ্কিত কুমারের তিনখানি চিত্র উদ্দেশ্য সাধনের সহায়রূপে গ্রহণ করিয়া তিনি আর্মেনিয়া অভিমুখে যাত্রা করিলেন। গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়া তিনি কোনও কথাই প্রকাশ করিলেন না শুধু তাঁহার প্রণয়বিধুর বন্ধুর একখানি আলেখ্য রাজান্তঃপুরের অনতিদূরে একটি বৃক্ষে, অতি সঙ্গোপনে সংলগ্ন করিয়া রাখিলেন। সহচরী পরিবৃতা রাজকুমারী চিত্রখানি দেখিয়া একেবারে আত্মবিস্মৃতা হইলেন। প্রেমাশ্রুতে তাঁহার অক্ষিদ্বয় ভারাক্রান্ত হইল। মুগ্ধা রাজবালা সখীগণ সমক্ষেই সে চিত্রে বারম্বার ওষ্ঠপুট স্পর্শ করাইতে লাগিলেন। চিত্রদর্শনে হঠাৎ এইরূপ প্রণয়লক্ষণ প্রকাশ পাইতে দেখিয়া সঙ্গিনীগণ মনে করিল বুঝিবা শিরীণ কোনও দুষ্ট প্রেতযোনির প্রভাবে আবিষ্ট হইয়াছেন। ভয়বশতঃ তাহারা সে চিত্রখানি নষ্ট করিয়া ফেলিল। অপর চিত্রখানিও বৃক্ষসম্বদ্ধ অবস্থায় দৃষ্ট হইয়া একইভাবে বিনষ্ট হইল। রক্ষা পাইল কেবল তৃতীয় আলেখ্য; রাজকন্যা সেখানি হস্তগত করিতে সমর্থা হইলেন (৩)। অবশেষে শাপুরের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিলে শিরীণ জানিতে পারিলেন যে চিত্র-নিহিত মধুরমূরতি মনোমোহন যুবরাজ কুমার খস্রু ব্যতীত অপর কেহই নহেন। চিত্রদর্শন মাত্রেই তিনি যে প্রেমপাশে আবদ্ধ হইয়াছেন একথা অকপটে স্বীকার করিয়া, তিনি শাপুরের নিকট হইতে, দ্বিধাশূন্যচিত্তে, কোন পথে পারস্যের রাজধানীতে যাইতে হয় তাহা সবিস্তারে জানিয়া লইলেন এবং একদিন মৃগয়ার ছলে বাহির হইয়া তাঁহার সাব্‌দিজ (Shabdig) নামক দ্রুতগ অশ্বটি এরূপ তীব্রবেগে চালনা করিলেন যে সঙ্গিনীগণ সকলেই পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। সপ্তদিবস অশ্বপৃষ্ঠে যাপন করিয়া ক্লান্তা নায়িকা যখন জনপদ হইতে দূরে অবস্থিত সুন্দর একটি জলাশয়ে কটিতটে মাত্র একখণ্ড বস্ত্রবেষ্টন করিয়া স্নানে নিরতা ছিলেন নায়ক খস্রু অতর্কিতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চিত্রে শিরীণের নীলবর্ণ কটিবস্ত্র বৈষ্ণব কবির নীলশাড়ীর কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। সেই লোকললামভূতা সুন্দরীর প্রতি দৃষ্টি নিপতিত হইতেই খস্রু আর চক্ষু ফিরাইতে পারিলেন না, সতৃষ্ণনেত্রে রূপসীর রূপরাশি পান করিতে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাতেই যেন তন্ময় হইয়া রহিলেন। চিত্রে নিহিত, তাঁহার স্থির ও পলকশূন্য দৃষ্টি দেখিয়া কাহারও বুঝিতে বাকি থাকে না যে নায়ক শুধু চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে নয়, যেন সর্ব্বাঙ্গ দিয়াই, নায়িকাকে দর্শন করিতেছেন। প্রাচীন কবিরা যাহাকে নয়নোৎসব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া শিরীণও সেইরূপ খস্রুর নয়নোৎসব সম্পাদন করিলেন।

শিরীণ খস্রুকে দেখিতে পান নাই। হঠাৎ একবার সেদিকে চক্ষু ফিরাইতেই লজ্জায় অভিভূতা হইলেন বটে, কিন্তু সাধারণ রমণীর ন্যায় একেবারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া পড়িলেন না। পলকের মধ্যে জল হইতে উঠিয়া বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিলেন এবং অশ্বপৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়া বিদ্যুৎলেখার ন্যায় অদৃশ্য হইয়া গেলেন। খস্রুও নিজের অসংযত আচরণের জন্য বিক্ষুব্ধ ও বিচলিত হইয়া অবিলম্বে সে স্থান ত্যাগ করিলেন। পথিমধ্যে প্রণয়ী ও প্রণয়িনীর এইরূপে চারি চক্ষুর মিলন হইল বটে, কিন্তু কেহ কাহাকেও ঠিকমত চিনিতে পারিলেন না। পারসীক চিত্রকর এ ঘটনাটি সাদরে চিত্রিত করিয়াছেন। একাধিক পুঁথিতে এ চিত্র দেখিতে পাওয়া যায় (৪)। কৃষ্ণবর্ণ অশ্ব সাব্‌দিজ্ বৃক্ষকাণ্ডে বাঁধা রহিয়াছে। শিরীণের অশ্বারোহণ সজ্জা বৃক্ষশাখায় দোদুল্যমান। সরসীর জলে সুন্দরীর আনন কমল কমলেরই ন্যায় শোভা পাইতেছে। তীরপ্রান্তে দণ্ডায়মান খস্রু যেন সংজ্ঞাহারা হইয়া বাঞ্ছিতার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন।

শিরীণ চলিয়া গেলেন বটে কিন্তু এ সন্দেহ তাঁহার মনে রহিয়া গেল যে মূর্ত্তিমান কন্দর্পের ন্যায় এই পরমরূপবান যুবা তাঁহারই প্রণয়ী খস্রু ব্যতীত অপর কেহ নহেন। চকিতের এই দৃষ্টি বিনিময় উভয়ের বিচ্ছেদের (ভূমিকার) সূত্রপাত ঘটাইল।

খস্রু রাজরোষে পতিত হইয়া পিতৃ-সদন ত্যাগ করিয়া যাইতেছিলেন। তিনি আর রাজধানীতে ফিরিয়া গেলেন না। শিরীণ একাকী খস্রুর প্রাসাদে উপনীত হইলেন এবং শাপুর কর্ত্তৃক অভিজ্ঞান স্বরূপ প্রদত্ত একটি অঙ্গুরীয়ক দেখাইতেই তথায় সাদরে অভ্যর্থিত হইলেন বটে কিন্তু খস্রুবিহীন সে প্রাসাদ তাঁহার অসহ্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, সেখানকার সকল সজ্জা, সকল উপকরণই তাঁহাকে স্বদেশত্যাগী বিরহী রাজপুত্রের কথা স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিল। শিরীণ নিজের বাসের জন্য একটি সুরক্ষিত ও সুরম্য আবাসগৃহ নির্ম্মাণ করাইলেন। উহার ধ্বংসাবশেষ আজিও "কাস্‌র্-ই শিরীণ" অর্থাৎ শিরীণের দুর্গ নামে অভিহিত হইয়া থাকে (৫)। এ দিকে খস্রু শিরীণের সহিত সাক্ষাৎ মানসে আর্মেনিয়ায় আসিয়া উপস্থিত। তাঁহারও সন্দেহ জন্মিয়াছিল যে তিনি যে স্নাননিরতা সুন্দরীকে দেখিয়াছেন তিনিই শিরীণ হইবেন। চিত্রকর শাপুর আর্মেনিয়াতেই অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার নিকট সকল কথা অবগত হইয়া খস্রু শিরীণকে ফিরাইয়া আনার জন্য তাঁহাকে অবিলম্বে পারস্যে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু ভাগ্য বিমুখ। এবারও প্রণয়ীযুগলের মিলন ঘটিল না।

ইতিমধ্যে হরমুজ্‌দের কঠোরতায় দেশে বিদ্রোহ উপস্থিত হইল এবং পারস্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে রাজকুমারই সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইবেন,

---

(৩) ১৪৯৪ খৃঃ অব্দে লিখিত নিজামীর খাম্‌সা পুঁথির একখানি চিত্রে শিরীণ চিত্রকর শাপুরের হস্ত হইতে স্বয়ং একখানি প্রতিকৃতি গ্রহণ করিতেছেন এইরূপ দেখান হইয়াছে।

(৪) সুলতান মহম্মদ কর্ত্তৃক অঙ্কিত এতদ্‌বিষয়ক একখানি চিত্র, রঙের খেলায় মোহন মাধুর্য্যে রসজ্ঞ দর্শককে সহজেই মাতোয়ারা করিয়া তুলে। চিত্রকরের তুলিকা প্রয়োগ কৌশলের এবং বর্ণ-সমূহের ঐক্য (hermony) ও বৈপরীত্য (contrast) যোজনার এমনই বাহাদুরী! সোনালী আকাশের পীঠভূমিকায় একটি চেনার (Plane) বৃক্ষ দাঁড়াইয়া। এ গাছের পাতাগুলি কোথাও পাণ্ডুর, কোথাও অসিতাভ। শিরীণ স্নান করিতেছেন কিন্তু অঙ্কন ভঙ্গী দেখিয়া বোধহয় যেন তিনি জলের উপরেই উপবিষ্টা। প্রবাহিনীর রূপালী স্রোতোধারা কালবশে নিকষে পরিণত হইয়াছে।

(৫) কাস্‌র্-ই-শিরীণের ভগ্নাবশেষ সান্নিধ্যে জাগ্রস শৈলের ঢালু অংশে খস্রু যে প্রাসাদটি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন তাহা ইমারৎ-ই-খস্রু নামে বিখ্যাত। ইহার আনুমানিক নির্ম্মাণ কাল সপ্তম শতাব্দীর প্রথম পাদেই নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে।

প্রধান সেনাপতি বাহ্‌রাম চুবিনের নিকট হইতে এই সংবাদপ্রাপ্ত হইয়া, খস্‌রু আর কালবিলম্ব না করিয়া রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পারস্যের সিংহাসন তখন শূন্য রহিয়াছে, হরমুজদ্‌ শত্রুহস্তে পতিত। নিষ্ঠুর আততায়ী তাঁহার চক্ষুদ্বয় বিনষ্ট করিয়াছে।

খস্‌রু রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন বটে কিন্তু তাঁহার জানিতে বিলম্ব হইল না যে সেনাপতি স্বয়ং সিংহাসন লাভ করিবার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রহিয়াছেন। সিংহাসন যখন আর নিরাপদ নহে তখন নিতান্ত সমীচীনবোধে স্থানত্যাগনীতিই যে অবলম্বিত হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? খস্‌রু পুনরায় আর্ম্মেনিয়া-অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সুযোগ বুঝিয়া পিতৃরাজ্য অধিকার করিবেন ইহাই রহিল তাঁহার গোপন অভিপ্রায়। এবার পথেই শিরীণের সাক্ষাৎ মিলিল, প্রণয়ীযুগলের সুখের আর পরিসীমা রহিল না। শিকারে, পোলো খেলায়, গীতবাদ্যে, নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণে, সখা সখীর ন্যায় উভয়ে বড় সুখেই দিন কাটাইতে লাগিলেন (৬)। নায়ক নায়িকার পরস্পরের প্রতি যে প্রগাঢ় অনুরাগ তাহা সঙ্গীতে ব্যক্ত করিত খস্‌রুর গায়ক বর্‌বাদ্‌ ও শিরীণের গায়িকা নিকিসা। সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরে প্রণয়ের এইরূপ মধুর অভিব্যক্তি, শুকসারী সঙ্গীতের ন্যায় এই দ্বৈত সঙ্গীতে অবিরাম স্রোত, উভয়ের সাহচর্য্য আরও মধুময় করিয়া তুলিয়াছিল। খস্‌রু রাজ্যলাভের কথা ভুলিয়া গেলেন, শিরীণকে অঙ্কলক্ষ্মীরূপে পাইবার কামনায় তাঁহার সংযমের বাঁধ একদিন প্রায় ভাঙ্গিবার উপক্রম করিল। শিরীণ সকল প্রলোভন উপেক্ষা করিয়া দয়িতকে জানাইলেন যে যিনি রাজপদের উত্তরাধিকারী—রাজ্যলাভই তাঁহার প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য, এ কার্য্যের অবহেলা করিলে তাঁহার যশঃ গৌরব কদাচ বর্দ্ধিত হইবে না। শিরীণের বাক্যে বিদ্ধ হইয়া, খস্‌রু পরদিন প্রত্যুষেই রোমক সম্রাটের সাহায্য-লাভের জন্য রোম রাজ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সাহায্য মিলিল বটে এবং খস্‌রু পৈতৃক সিংহাসনও পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু কৈসারের সন্তোষবিধানার্থ তাঁহাকে রাজপুত্রী মরিয়মের সহিত পরিণীত হইতে হইল। খস্‌রুকে পাঠাইয়া অবধি শিরীণের মনে আর শান্তির লেশমাত্র ছিল না, তিনি কিছুতেই আর সান্ত্বনা লাভ করিতে পারিতেছিলেন না। এই সময়ে তাঁহার মাতৃস্বসা পরলোকগমন করায় শিরীণই আর্ম্মেণিয়ার অধিশ্বরী হইলেন, কিন্তু প্রিয় বিরহে সিংহাসনেই বা সুখ কোথায়? তাহার পর মিরিয়মের সহিত খস্‌রুর উদ্বাহসংবাদে তাঁহার হৃদয় নিদারুণ দুঃখে মথিত হইতে লাগিল।

খস্‌রুর বন্ধু চিত্রশিল্পী শাপুর শিরীণের সঙ্গত্যাগ করিয়া যান নাই। খস্‌রু না হয় সম্রাটদুহিতাকে পত্নীরূপে পাইয়া পর হইয়া গিয়াছেন তবু শাপুর যে দূরে যান নাই ইহাও কতকটা মন্দের ভাল। সুদূর আর্ম্মেণিয়ার সেই রাজ্যপাট শিরীণের আর ভাল লাগিতেছিল না, তিনি কাস্‌র্‌-ই-শিরীণে ফিরিয়া আসিলেন। শাপুর খস্‌রু সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে এ সংবাদ জানাইতে বিলম্ব করিলেন না (৭)। শিরীণ কাছে আসিলেন বটে কিন্তু এবারও একটু গোল বাধিল। কাস্‌র্‌-ই-শিরীণে সকল সুবিধাই ছিল—ছিল কেবল এক দুধ যোগানের যা অসুবিধা। পশুচারণ ক্ষেত্র ছিল বিসিতুন পর্ব্বতের অপর পারে, আর দুগ্ধবতী ছাগীগুলি পাহাড়ের সেই পার্শ্বেই রক্ষিত হইত। শিরীণের প্রভাতকালে দুগ্ধপান করা অভ্যাস ছিল। এতদূর হইতে কাস্‌র্‌-ই-শিরীণে সময় মত দুগ্ধ আসিয়া পৌঁছিত না। শাপুরের ফার্‌হাদ্‌ নামে এক বন্ধু ছিলেন। সে যুগে স্থাপত্যে ও পূর্ত্তকার্য্যে তাঁহার সমকক্ষ কেহই ছিল না। দুগ্ধ সম্পর্কে শিরীণের অসুবিধার কথা অবগত হইয়া শাপুর তাঁহার এই বন্ধুটির শরণাপন্ন হইলেন। শিরীণের সন্নিধ্যে উপনীত হইতেই ফার্‌হাদের বাক্‌শক্তি ও শ্রবণশক্তি যেন একসঙ্গেই লোপ পাইয়া গেল। প্রণয়াতিরেকে তিনি কোন কথাই বলিতে পারিলেন না, শিরীণের একটি বাক্যও তাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইল না। শিরীণকে দর্শনমাত্রেই তাঁহার হৃদয় যে গভীর প্রেমে সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল, সেই বিকারজনিত চিত্তচাঞ্চল্যের ইহা কেবল বাহ্যিক লক্ষণ মাত্র। অবশেষে, সম্বিত ফিরিয়া আসিলে, শিরীণের অভিপ্রায় অবগত হইয়া ফার্‌হাদ্‌ বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া তৎক্ষণাৎ সেই দুরূহ কার্য্যে নিরত হইলেন। একমাস যাইতে না যাইতেই উহা সুসম্পন্ন হইয়া গেল। সুকৌশলে গিরিগাত্র ভেদ করিয়া বিচক্ষণ স্থপতি যে রন্ধ্র নির্ম্মাণ করিলেন, সেই রন্ধ্রমুখে দুগ্ধ ঢালিয়া দিলেই সদ্যদোহন করা দুগ্ধ অবিলম্বেই শিরীণের আবাসে আসিয়া পঁহুছিত। প্রাত্যহিক দুগ্ধ সরবরাহের অসুবিধা এইরূপে দূর হইল বটে কিন্তু শিরীণের কোনও পুরস্কারই ফার্‌হাদ্‌ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। তিনি অন্তরে অন্তরে চাহিতেছিলেন শুধু তাঁহার প্রণয়ের প্রতিদান। একথা খস্‌রুর কর্ণগোচর হইতেই তিনি ঈর্ষা বিষে জর্জ্জরিত হইতে লাগিলেন। প্রেমোন্মাদ ফার্‌হাদকে পার্ব্বত্য অঞ্চল হইতে ডাকাইয়া আনিয়া সম্রাট তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য পুরস্কারের প্রলোভন, রাজদণ্ডের ভয়প্রদর্শন প্রভৃতি শাম দানাদি নীতি সমন্বিত নানা পন্থা অবলম্বন করিলেন কিন্তু ফার্‌হাদ্‌ কিছুতেই বিচলিত বা নিরস্ত হইলেন না। অবশেষে তাঁহাকে জানান হইল যে যদি তিনি বিসিতুন পর্ব্বত কাটিয়া রাজপথ প্রস্তুত করিতে পারেন, কিম্বা অন্য একটি আখ্যায়িকামতে, যদি তিনি পর্ব্বতের দুই পার্শ্বস্থিত দুইটি স্রোতোধারা একত্র সম্মিলিত করিতে পারেন, তবেই তিনি শিরীণকে লাভ করিতে পারিবেন। ফার্‌হাদ্‌ অমানুষিক পরিশ্রমের সহিত এই অসাধ্য সাধনে ব্রতী হইলেন। তিনি প্রথমেই শিরীণের একটি মূর্ত্তি শৈলগাত্রে এরূপ স্থানে ক্ষোদিত করিলেন যেন উহা সর্ব্বক্ষণই তাঁহার নয়নগোচর হয়, যেন তিনি আরাধ্যার এই পাষাণময়ী প্রতিকৃতির সমক্ষে তাঁহার হৃদয়োচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতে পারেন। একদিন সত্যসত্যই তাঁহার উপাস্যা জীবন্তমূর্ত্তিতে তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূতা হইলেন। শিরীণকে দেখিয়াই ফার্‌হাদ্‌ আনন্দাতিশয্যে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন (৮)। আর্ম্মেনিয়ার অধিশ্বরীর সমক্ষে শিল্পী ফার্‌হাদ্‌, তাঁহাদের উভয়ের ব্যবধান বিস্মৃত হইয়া তাঁহার হতাশ প্রেমের কথা নিজমুখেই ব্যক্ত করিলেন। ইহা সম্রাটের কর্ণগোচর হইতে বিলম্ব হইল না, শুনিয়া তিনি ভয়ে ও ক্রোধে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। এদিকে ফার্‌হাদ্‌ও তাঁহার প্রারব্ধ কার্য্য প্রায় সমাপ্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া খস্‌রু তাঁহার কূটবুদ্ধি মন্ত্রিগণের শরণাপন্ন হইলেন। সিংহাসনের আড়ালে বসিয়া যাহারা মানুষের কাঁদে মানুষ ধরিতেই অভ্যস্ত, মানবচিত্তের কোমলবৃত্তির সহিত যাহাদের কোন সম্পর্কই নাই, সেই হৃদয়হীন সচিববৃন্দের পরামর্শে এক জরতীকে ফার্‌হাদের নিকট পাঠান হইল। শিক্ষামত সে যাইয়া ফার্‌হাদকে সংবাদ দিল যে শিরীণ হঠাৎ দেহরক্ষা করিয়াছেন। এই অলীক উক্তিতেই ফার্‌হাদের হৃদয় ভগ্ন হইয়া গেল। তাঁহার সে

(৬) ক্ষুদ্রক চিত্রে উভয়ের এই পোলো ক্রীড়া একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। পরমাসুন্দরী পরীসদৃশী ললনাদিগের সহিত খস্‌রুর এই পোলো খেলার বর্ণনা করিতে গিয়া কবি নিজামী বিষয়-মাধুর্য্যে মুখর হইয়া উঠিয়াছেন। শিরীণ একক খেলিতেন না, তাঁহার সহচরীবৃন্দ এ খেলায় যোগদান করিতেন।

(৭) এই 'শাপুর সন্দেশ' একখানি ক্ষুদ্রক চিত্রে অঙ্কিত রহিয়াছে। এ চিত্রে বিখ্যাত পারসীক চিত্রকর মিরাকের নাম লিখিত থাকিলেও চিত্রখানি তাঁহার অঙ্কিত বলিয়া মনে হয় না। কার্পেটের নক্সার অনুকরণে ভূমিতল যে সকল পুষ্প গুল্মাদিতে সমাকীর্ণ সেগুলি সবই বেমানান রকমের বড়, আর দুই সখা খস্‌রু ও শাপুর পরস্পরের প্রতি যে ভঙ্গীতে অগ্রসর হইতেছেন তাহা বিসদৃশ বলিয়াই বোধহয়।

(৮) ক্ষুদ্রক চিত্রে এ ঘটনাটিও সযত্নে স্থান পাইয়াছে।

মর্ম্মন্তুদ আক্ষেপোক্তি, কবির কাব্যে, তাদৃশরূপই বর্ণিত হইয়াছে। "হায়! আমার যৌবনের সকল শ্রমই নিরর্থক হইল, হৃদয়ের কোণে যে আশা এতদিন পোষণ করিতেছিলাম তাহা সত্যসত্যই নির্ম্মূল হইল! পাহাড় কাটিয়া সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণ করিলাম, দেখ, আমার ভাগ্যে কি পুরস্কার মিলিল! এ দুঃখ আমি সহ্য করিব কি করিয়া!" এই বলিয়া ফার্‌হাদ্ ভূমিতলে পতিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ জীবনলীলা সম্বরণ করিলেন (১)। খস্‌রুর শঠতায় জীবনমধ্যাহ্নেই এই তরুণ শিল্পীর অপূর্ব্ব প্রতিভার এইরূপ শোকাবহ পরিসমাপ্তি ঘটিল।

একথা কর্ণগোচর হইলে পর খস্‌রুর প্রতি শিরীণের যে বিরূপভাব জন্মিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ফার্‌হাদের এই আকস্মিক মৃত্যুর জন্য শিরীণ শোকে সমাচ্ছন্ন হইলেন। এই ভাগ্যহীন একনিষ্ঠ প্রেমিককে তিনি ঘৃণা বা তাচ্ছিল্যের পাত্র বলিয়া বিবেচনা করিতে পারেন নাই। ফার্‌হাদের প্রতি প্রীতিমতী না হইলেও শিরীণের হৃদয়ে অনুকম্পার অভাব ঘটে নাই। ফার্‌হাদের সমাধির উপর তিনি একটি গম্বুজ সমন্বিত স্মৃতি-মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। কালে উহা একনিষ্ঠ প্রণয়ীদিগের তীর্থস্থানে পরিণত হইল।

ইহার পর শিরীণের প্রসন্নতা সম্পাদন করিয়া, তাঁহাকে লাভ করার বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও খস্‌রু সহজে সফলকাম হইতে পারেন নাই। কৈসারদুহিতা রাজ্ঞী মরিয়ম্ দেহরক্ষা করিলে পর তবেই শিরীণ, বহুসাধ্য সাধনায়, খস্‌রুকে বিবাহ করিতে সম্মত হন। পারস্যের একেশ্বর সম্রাট স্বেচ্ছাচারতন্ত্রে দীক্ষিত নরাধিপ খস্‌রুকে মর্ম্মে মর্ম্মে কবির উক্তির যথার্থ উপলব্ধি করিতে হইয়াছিল—

"............রমণীর মন,
সহস্র বর্ষেরি সখা সাধনার ধন।"

কবির বর্ণনামতে খস্‌রু যখন শিরীণের পার্শ্বে নিদ্রাগত, তাঁহার পিতৃদ্রোহী পুত্রের প্ররোচনায় গুপ্ত ঘাতক সেই সময়েই তাঁহার বক্ষে ছুরিকা বিদ্ধ করে। পাছে শিরীণের নিদ্রাভঙ্গ হয় এই ভয়ে সম্রাট কোনও যন্ত্রণাসূচক শব্দও উচ্চারণ করিলেন না। মরণাহত নৃপতি তৃষ্ণায় কাতর হইয়াও সুষুপ্তিমগ্না শিরীণকে জাগরিত করিতে বিরত রহিলেন।

এদিকে শিরীণের চরিত্রে একনিষ্ঠতা ও পতিপ্রেমের যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত লক্ষিত হয় তাহাতে নিজামীর কাব্যের সৌন্দর্য্য ও উচ্চাদর্শ যে সমধিক বর্দ্ধিত হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। শিরোয়া নামক সপত্নীপুত্রের কলুষদৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষা করার জন্য শিরীণ ভাণ করিলেন যেন খস্‌রুর মৃত্যুতে তিনি তিলমাত্র বিচলিত হন নাই।

শোভন পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া রাজরাণীর বেশেই তিনি স্বামীর শবের অনুগমন করিলেন। সহগমনকালে ভারতীয় রমণীগণ এইরূপ সুসজ্জিত হইয়াই শ্মশানে উপস্থিত হইতেন। শিরীণের মনের কথা কেহই জানিতে পারিল না। খস্‌রুর দেহ তাঁহার সমক্ষেই সমাধিকক্ষে নীত হইল। তখন আর এ কপট অভিনয়ের প্রয়োজন ছিল না। শিরীণ অকস্মাৎ নিজবক্ষে ছুরিকা বিদ্ধ করিয়া স্বামীর শবের উপর নিপতিতা হইলেন। সতী শিরোমণি পতির বক্ষেই দেহরক্ষা করিয়া তাঁহার অনুগামিনী হইলেন, দেহত্যাগ করিয়া পাতিব্রত্য ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পরাঙ্মুখ হইলেন না।

(১) অন্য বর্ণনামতে শিরীণের মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করিয়া ফার্‌হাদ্ ভৃগুপাতদ্বারা দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু কাব্যের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া দেখিলে কবি নিজামীর বর্ণনাই অধিক মনোজ্ঞ বলিয়া বোধ হইবে।

নবদ্বীপ-পঞ্জী

শ্রীজনরঞ্জন রায়

বাঙলা দেশে সর্ব্ব প্রথম যে পঞ্জিকা প্রকাশিত হয় তাহার নাম "নবদ্বীপ পঞ্জিকা"। ইহা 'নবদ্বীপাধিপতেরনুজ্ঞয়া' অর্থাৎ কৃষ্ণনগরাধিপের অনুমোদনক্রমে প্রকাশিত হয়। নবদ্বীপাধিপতি সংজ্ঞা দ্বারা কৃষ্ণনগরের মহারাজাকেই বুঝাইত। কৃষ্ণনগরের মহারাজাই পশ্চিম বঙ্গের হিন্দু-সমাজপতি বলিয়া গণ্য হইতেন।

এই পঞ্জিকার এক এক খণ্ড বাঙলা দেশের হিন্দু জমিদারগণ লইতেন। তাহা ছিল হাতে লেখা—ছাপা নয়। ছাপাখানার প্রচলন তাহার অনেক পরে হয়। এই পঞ্জিকা ধর্ম্মকর্ম্মাদি পালনে বাঙলার হিন্দুদের দর্পণ স্বরূপ ছিল। তাহার দ্বারা নবদ্বীপের মত—স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের মত বাঙলা দেশে বিশেষভাবে প্রচারিত হয়। তাহা সমাজপতি কৃষ্ণনগরের রাজার অনুমোদিত বলিয়া, সকলে ইহার বিধি ব্যবস্থাই মানিয়া লইতে থাকে (১)। মুর্শিদাবাদ নবাব সরকার, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী, হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্ট এবং বাঙলা লাট দপ্তরে তাহা গৃহীত হইতে থাকে।

নদীয়া জেলার নাটুদহ মজ্‌ঋমপুর হইতে নবদ্বীপে আগত রামরুদ্র বিদ্যানিধি গ্রহাচার্য্য বংশ ১৭১৮ খ্রীঃ পর্য্যন্ত কৃষ্ণনগর রাজসভার জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত ছিলেন। প্রথমে রামরুদ্র, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় গ্রহাচার্য্য নিযুক্ত হন। রামরুদ্রের বংশধর রামকৃষ্ণ বিদ্যামণি, প্রাণনাথ বিদ্যাভরণ, রামজয় শিরোমণি, শ্রীদাম বিদ্যাভূষণ, তারিণীচরণ বিদ্যাবাগীশ ও দুর্গাদাস বিদ্যারত্ন যথাক্রমে সেই পদ প্রাপ্ত হন। দুর্গাদাসের মৃত্যুর পর ফরিদপুর জেলার বাঁধুলী-খালকুলা হইতে নবদ্বীপে আগত বিশ্বম্ভর জ্যোতিষার্ণব মহাশয় কৃষ্ণনগররাজ ক্ষিতীশচন্দ্রের সভায় কিছুকাল ঐ পদে কার্য্য করেন। ক্ষিতীশচন্দ্রের সময়ই কৃষ্ণনগর রাজপণ্ডিত-সভা উঠিয়া যায়।

এই নবদ্বীপ পঞ্জিকাতে হিন্দু-পর্ব্বগুলির উল্লেখ থাকিত। ক্রমে এমন সময় আসিল যখন হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টান প্রত্যেক জাতির পর্ব্ব দিনে সরকারী আফিস-কাছারী বন্ধ করিবার প্রয়োজন অনুভব হইতে থাকে। তখন বাঙলা-সরকার সেইভাবে একখানি পঞ্জিকা প্রণয়ন করাইবার জন্য সচেষ্ট হন। ১৭৯৯ খ্রীঃ এই জন্য নদীয়ার (কৃষ্ণনগরের) কালেক্টার সাহেবকে খোদ সরকার হইতে আদেশ দেওয়া হয় যে—যেহেতু একখানি নির্ভুল বাঙলা পঞ্জিকা না পাওয়ায় অনেক অসুবিধা হইতেছে, সেই জন্য তিনি ব্রাহ্মণ (হিন্দু) জ্যোতিষ অনুমোদিত একখানি পঞ্জিকা প্রস্তুত করাইয়া দিবেন তাহা সরকারী দপ্তরখানায় ব্যবহৃত হইবে (২)।

(১) ..."Almanacs were prepared by them which were supplied to the Nawab's court of Murshidabad as well as to the East India Company, the Supreme Court, the High Court, the Bengal Government etc ...the Nabadwip Panjika under the imprimatur of Nabadwipadhipati ranujnaya was accepted by all the landlords of Bengal."—

A History of Indian Logic by Mahamahopadhyaya Satish Chandra Bidyabhusan—p 527.

(২) Letter from Secretary to Board stating that—he has repeatedly found difficulty in procuring an accurate Bengalee almanac and suggesting that Collector Nadiya be directed to transmit one properly authenticated by

বিশম্ভর জ্যোতিষার্ণব মহাশয় সরকারী দপ্তরে এই প্রকার হাতেলেখা পঞ্জিকা দিতেন। তিনি এইরূপ প্রতিখানা পঞ্জিকার জন্য সরকার হইতে ৫৲ পাঁচটাকা পারিশ্রমিক পাইতেন। এই পঞ্জিকা পুঁথির আকারে কাগজে লিখিয়া দেওয়া হইত। পেটফোঁড়া পুঁথির মতো তাহা গাঁথা হইত। তাহাতে থাকিত বাঙলা ইংরাজী ও মুসলমানী মাসের বার, তারিখ, ইংরাজী মতে সূর্য্য উদয় অস্তের ঘণ্টা মিনিটাদি, বাঙলা লগ্নমানের উদয় অস্তের ভুক্তমান ও দৈনিক স্নাতাহ। শেষে থাকিত হিন্দু মুসলমান ও খ্রীষ্টানে পর্ব্বদিনের তালিকা। তাহা দেখিয়াই আফিস স্কুল প্রভৃতি বন্ধের 'টেবিল' প্রস্তুত হইত। হাইকোর্ট, বাঙলা সরকার, আসাম সরকার সকলেই বিশম্ভর জ্যোতিষার্ণব মহাশয়ের নিকট ৫৲ পাঁচ টাকা মূল্যে এই প্রকার হাতেলেখা পঞ্জিকা লইতেন। বিশম্ভর জ্যোতিষার্ণবের মৃত্যুর (১।৯।১৯১২) পর তাঁহার সুযোগ্য ছাত্র শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র জ্যোতিষার্ণব মহাশয় বাঙলা সরকারের জ্যোতিষী মনোনীত হন।

দেশে ছাপাখানা আসিয়া পড়ায় তৎপরে ছাপা পঞ্জিকার প্রচলন হয়। সুপ্রাচীন ছাপা পঞ্জিকা হিসাবে গুপ্তপ্রেস-পঞ্জিকা প্রসিদ্ধ। তাহা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৬৯ খ্রীঃ, আজ হইতে ৭৫ বৎসর পূর্ব্বে। দুর্গাচরণ গুপ্ত মহাশয় কলিকাতায় নিজের ছাপাখানা 'গুপ্তপ্রেস' হইতে ইহা প্রকাশ করেন। বিশম্ভর জ্যোতিষার্ণব মহাশয় আমরণ ৩৮ বৎসর গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার প্রধান গণক ছিলেন (৩)। গুপ্তপ্রেস হইতে তিনি বার্ষিক ৩১০৲ পারিশ্রমিক পাইতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীশ্রীশচন্দ্র জ্যোতিরত্ন কিছুদিন গুপ্তপ্রেসের গণক ছিলেন।

তাহার পর ১৮৯০ খ্রীঃ মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 'বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত' পঞ্জিকা প্রকাশ করেন। শ্রীরামপুর পঞ্জিকা, পি-এম-বাগচী পঞ্জিকা, বটকৃষ্ণপাল পঞ্জিকা প্রভৃতি অনেক ছাপা পঞ্জিকা ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহার পূর্ব্ব হইতেই পঞ্জিকা-সংস্কার আন্দোলন আরম্ভ হয়। ১৮৮৮ খ্রীঃ তেলিনীপাড়ার জমিদার মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সংবাদপত্রে প্রকাশ করেন যে, গ্রীন্‌উইচ্‌ মানমন্দির হইতে প্রকাশিত নাবিক পঞ্জিকায় উল্লিখিত চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণের ফল ঠিক মিলিতেছে, কিন্তু প্রাচ্য সিদ্ধান্তমতে গণনাকাল মিলিতেছে না। ১৮৯৩ খ্রীঃ কাশী হইতে পণ্ডিত বাপুদেব শাস্ত্রী কলিকাতায় আসিয়া সংস্কৃত কলেজে মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সহযোগিতায় পঞ্জিকা সংস্কারের জন্য একটি সভা আহ্বান করেন। কিন্তু কোনো কার্য্যকরী সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারেন নাই। ১৯০৪ খ্রীঃ দ্বারকার শঙ্করাচার্য্য মহারাজ ও বরদাধিপতি গুইকুমার পঞ্জিকা সংস্কার জন্য ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যাপকগণকে লইয়া বোম্বাই সহরে একটি সভা করেন। এজন্য ভারতের সর্ব্বত্র প্রতিনিধি পাঠাইয়া আমন্ত্রণ করা হয়। বাঙলা দেশে আমন্ত্রণ করিতে আসেন মহাদেব শাস্ত্রী ঘাটে ও গণেশলক্ষ্মণ পাগে। তজ্জন্য ১৯০৪ খ্রীঃ ২০ শে নভেম্বর তারিখে মহামহোপাধ্যায় রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন মহোদয়ের সভাপতিত্বে সংস্কৃত কলেজে একটি সভা হয়। তখন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ। বোম্বাই সভায় বাঙলার প্রতিনিধি নির্ব্বাচন জন্যই এই সভা আহূত হয়। সেই সভায় সংস্কারবিরোধী পণ্ডিতগণের যুক্তি খণ্ডন পণ্ডিত ভগবতীচরণ স্মৃতিতীর্থ মহোদয় যাহা বলিয়াছিলেন তাহা তাঁহার মনীষার পরিচয় দেয়। সংস্কার-বিরোধীগণ বিশিষ্ট স্মার্ত্ত বলিয়া তাঁহাদের আপত্তি গুলিতে গুরুত্ব আছে মনে হইতে পারে। কিন্তু তাঁহারা স্বীকার করেন যে জ্যোতিষশাস্ত্রে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা নাই। তাঁহারা বলেন—ধর্ম্মকর্ম্মে তিথি সংস্কার করা অন্যায়, তাহা ছাড়া সূক্ষ্ম গণনা চর্ম্মচক্ষুর অসাধ্য, দ্বাপর যুগ হইতে যাহা চলিতেছে তাহাই ঋষি সম্মত সদাচার…ইত্যাদি (৪)! ইহা শুনিয়া পণ্ডিত ভগবতীচরণ স্মৃতিতীর্থ মহাশয় বলেন—"…যাঁহারা জ্যোতিষের এক বর্ণও পড়েন নাই তাঁহাদের মুখে জ্যোতিষ সিদ্ধান্তের সমালোচনা ভাল দেখায় না। প্রত্যেক কথারই একটা আগাগোড়া ঠিক থাকা উচিৎ।… হিন্দু জ্যোতিষে চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহের যে কয়টি 'সংস্কার' দিবার নিয়ম আছে। এক্ষণে মাধ্যাকর্ষণের সিদ্ধান্ত স্বীকৃত হওয়ায় তাহা অপেক্ষা অনেকগুলি নূতন সংস্কার আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেই সকল সংস্কার দিয়া তিথি নির্ণয় প্রভৃতি করিতে হইবে। সুতরাং দৃগ্‌গণিতের ঐক্য করিয়া পঞ্জিকা সংস্কার করিতে হইলে বাণবৃদ্ধি রসক্ষয়ের সিদ্ধান্ত টিকে না।…পঞ্জিকা সংস্কার হওয়া একান্ত আবশ্যক সে বিষয়ে সন্দেহ নাই…"। তৎপরে নিম্নোক্ত দশ জন প্রতিনিধিকে বোম্বাই সভায় পাঠাইবার জন্য প্রস্তাব গৃহীত হয়; কাশীশ্বর বিদ্যারত্ন (ঢাকা), নারায়ণচন্দ্র জ্যোতির্ভূষণ (ভট্টপল্লী), মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (কলিকাতা), হরিনাথ বেদান্তবাগীশ (বর্দ্ধমান), যোগেশচন্দ্র রায় এম-এ (কটক), রাজকুমার সেন এম এ (ঢাকা), সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ (কলিকাতা) ও ভগবতীচরণ স্মৃতিতীর্থ। বোম্বাই পঞ্চাঙ্গ শোধন সভায় স্থির হয় যে,—'আদি বিন্দু' ও বর্ষমান সংস্কার সভাসমিতি কর্ত্তৃক স্থির হইতে পারে।

পঞ্জিকা সংস্কার আজও হয় নাই। সংস্কারকের কাছে তিনটি গুরুতর সমস্যা দেখা দিয়াছে: (ক) নিরয়ণ-মেষাদি-বিন্দু নির্ণয়, (খ) অয়নাংশ নির্ণয় ও (গ) ধর্ম্মশাস্ত্রের সহিত মিল রাখা। (ক) রেবতী যোগতারাকে হিন্দু জ্যোতিষ আদিবিন্দু বলিয়া মানিয়া নিয়াছেন। কিন্তু কোন্ তারা রেবতী তাহা ঠিক করা কঠিন। রেবতী ও অশ্বিনী বিভাগদ্বয়ের সংযোগ কোথায় তাহাও সুনির্দ্দিষ্ট নাই। রেবতীনক্ষত্র বিভাগের অন্ত নাই। কাজেই আদি-বিন্দু কোন্‌টি তাহা স্থির হইতেছে না। পাশ্চাত্য জ্যোতিষীদের মতে 'জিপটিসিয়ম' তারকাই রেবতী যোগতারা। প্রাচ্য জ্যোতিষে সাতাশটি যোগতারার অবস্থান জানা যায়। সুতরাং প্রাচ্য মতে প্রত্যেক যোগতারা হইতে এক একটি বিন্দু স্থির হইতে পারে। সেগুলির মধ্যে প্রধান কোন্‌টি তাহা লইয়া তর্কের অবধি নাই। (খ) অয়নাংশ একটি কল্পিত পদার্থ। অঙ্কশাস্ত্রের দ্বারা তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। নিরয়ণ মেষাদি বিন্দুর অবস্থানের সহিত

Brahmanical astronomy for the use of office—July 5, 1799 no. 8217—Hunters unpublished Bengalee Mss. records,

Collector transmits the same—August, 1799—Ibid no. 8305

—নবদ্বীপ মহিমা—কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী প্রণীত—৩৬১ পৃঃ

(৩) সরল বাঙ্গলা অভিধান—সুবলচন্দ্র মিত্র প্রণীত—বিশম্ভর জ্যোতিষার্ণবের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

(৪) মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার বলেন—"আমি জ্যোতিষ সম্বন্ধে কিছু জানি না…ধর্ম্ম কর্ম্মে তিথি সংস্কার অন্যায্য (রঙ্গনাথ)…তিথি নির্ণয়াদি কার্য্যে স্থুলানয়নই কর্ত্তব্য সূক্ষ্মানয়নের আবশ্যকতা নাই (হেমাদ্রি), স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য ও হেমাদ্রির মতে ধর্ম্মকর্ম্মে তিথির সংস্কার উচিত নহে…"। মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ বলেন—"যদিচ আমি জ্যোতিষ পড়ি নাই…বায়ুপুরাণ বলেন—গ্রহাদির সূক্ষ্মগণনা চর্ম্মচক্ষুর অসাধ্য…দৃশ্য গ্রহণাদি কার্য্যের জন্য সূক্ষ্ম গণনা হউক।… বাণবৃদ্ধি রসক্ষয়ের ব্যতিক্রমে শ্রাদ্ধাদি কার্য্যের বিশেষ গোলযোগ হয়"। (মহামহোপাধ্যায়) যদুনাথ সার্ব্বভৌম বলেন—ত্রেতা ও দ্বাপরাদিতে তিথির ক্ষয়বৃদ্ধি লইয়া যে কোন গোল বা সংশয় হইত তাহার কোনই প্রমাণ নাই। ত্রেতাযুগ হইতে এ পর্য্যন্ত যখন কোনই পরিবর্ত্তন হয় নাই তখন একালে সে পরিবর্ত্তন হওয়া অসম্ভব"—পঞ্জিকা সভার বিবরণী—সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা—৭ই পৌষ, ১৩১১।

অয়নাংশের সুসামঞ্জস্য আছে। এখন যে অয়নাংশ স্বীকৃত হইতেছে তাহা ভুল, ইহা সপ্রমাণ হইয়াছে। সায়ন মেষাদি বিন্দু গতিশীল। তাহা নিরয়ণমেষাদি বিন্দু হইতে চুলিতে চুলিতে দূরে গিয়া পড়ে। এই দুইটি বিন্দুর দূরত্বের নাম অয়নাংশ। এই দুই বিন্দু গত ১৪৪৫ বৎসর পূর্ব্বে (৪২০ শকের ৩০শে চৈত্র) এক সঙ্গে মিলিত হইয়াছিল। তাহার পর হইতে বিন্দু দুইটি আবার পরস্পর হইতে সরিয়া যাইতেছে। একটি বিন্দু পূর্ব্বদিকে সরিয়া যাইতেছে, অন্যটি পশ্চিম দিকে সরিয়া যাইতেছে। এই সরিয়া যাওয়ার দূরত্বকে ২৭ অংশে ভাগ করা হয়। এক অংশ যাইতে ৬৬ বৎসর ৮ মাস লাগে। সুতরাং ৭২০০ বৎসরে একবার উভয়ে একত্রে মিলে। প্রাচ্য জ্যোতিষে সায়ন ও নিরয়ণ এই দুই প্রথারই আবশ্যকতা আছে। পাশ্চাত্য জ্যোতিষে নিরয়ণমেষাদি বিন্দুর নামও নাই। মতান্তরে ১৮ হইতে ২৩ অয়নাংশ আছে। তাহার কোনটিকে স্বীকার করা সঙ্গত তাহা স্থির হইতেছে না। (গ) তিথি ও গ্রহণাদি দৃক্‌সিদ্ধ বিষয়। নাবিক পঞ্জিকা হইতে তাহা জানিয়া লইলেই হিন্দুর সব কাজ চলে না। নিরয়ণ গণনা দ্বারা শ্রুতিস্মৃতিবিহিত ধর্ম্মকর্ম্মাদি অনুষ্ঠান বিশুদ্ধ হয়। পাশ্চাত্য নাবিক পঞ্জিকা মতে সায়ন গণনা হইতে কল্পিত অয়নাংশ বাদ দিয়া, ভ্রান্ত নিরয়ণ গ্রহণ করিয়া যে সব পঞ্জিকা প্রকাশিত হইতেছে সেগুলি অশুদ্ধ। "নিরয়ণ ছাঁচে পাঁজি গণনা করিতে হইলে অয়নাংশ অবিশুদ্ধ হওয়া একান্ত আবশ্যক। নচেৎ অয়নাংশের ভ্রম হেতু যাবতীয় নিরয়ণ গণনা ভ্রমাত্মক হইয়া থাকে এবং তাহার ফলে রবি সংক্রমণ কাল, মাসের তারিখ, সৌরমাস, নক্ষত্র, যোগ, গ্রহ সঞ্চার, অয়নাংশ শোধিত লগ্নমান, দৈনিক লগ্নভুক্তি, মলমাস, চান্দ্রমাসের সংজ্ঞা, গুরুরাহুযোগ জন্য অকালাদি বহু বিষয়—যাহা হিন্দুর ধর্ম্মকর্ম্মে একান্ত আবশ্যক তাহা সমস্তই ভুল হইয়া পড়ে" (৫)।

(৫) পঞ্জিকা-সংস্কার প্রদীপ—হরিচরণ স্মৃতিতীর্থ প্রণীত—২১ পৃঃ

কিন্তু কেন ?

শ্রীসুনীলকুমার রায়চৌধুরী

দেখিতে দেখিতে পূজার শেষ দিন আসিল। মতিরামের চিন্তা কাল তাহার চাকুরী যাইবে। মতিরাম সকলকে অনুরোধ করে—কাহারও বাড়ীতে চাকুরী করিয়া দিবার জন্য। প্রতিমা নিরঞ্জন হইল। ঢাকের বাদ্যির সঙ্গে পাড়ার ছেলেরা নাচিতে নাচিতে চলিয়াছে। মতিরাম চলিয়াছে মাথায় ঘট লইয়া। বিদায় ব্যথায় মতিরামের মুখখানি শুষ্ক। বিসর্জ্জনের পর মতিরামকে তাহার প্রাপ্য কিছু টাকা দিয়া বিদায় দেওয়া হইল। টাকা পাইয়া মতিরাম একবার হাসিল আবার চক্ষু ছলছল করিয়া বলিল—'বাবু একটা থাকবার ব্যবস্থা যদি করে দেন, স্বামী স্ত্রীতে চাকুরী করি।'

মতিরামের বিনীত প্রার্থনা নামঞ্জুর হইয়া গেল।

মতিরামকে আর প্রয়োজন নাই…তাহার কাজের মেয়াদ শেষ হইয়াছে। সহস্র ভিখারীর শবাস্তীর্ণ পথে মতিরাম আবার মিলাইয়া গেল। কোথায় গেল জানিনা। দুইদিন তাহাকে দেখি নাই। তারপর যেদিন দেখিলাম—রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে তাহাকে চিনিতে পারি নাই।

রুটী দিতে আসিয়া দেখিলাম মতিরাম কাঁদিতেছে। প্রশ্নের উত্তরে বুঝিলাম 'কাল তাহার ছেলেটাকে এম্বুলেন্সে তুলিয়া লইয়া কোথায় চলিয়া গেছে। সে জিজ্ঞাসা করিতেছে: কোথায় যাইলে তাহার সন্ধান মিলিবে।

মতিরাম চক্ষু মুছিয়া বলিল—'মায়ের পূজায় এত খাটলাম, ভক্তিভরে মায়ের আশীর্ব্বাদী ফুল লইলাম, কিন্তু আমার একি হইল।'

বিশ্বজননীর নিকট আমাদেরও প্রশ্ন এই—"কিন্তু কেন ?"—আমাদের এ অবস্থা কেন হইল ?

বেশ ধমক দিয়াই কহিলাম—'না হবে না—রাতদিন মাগো আর বাবাগো !'

"বাবু চিনতে পারলেন না আমি মতিরাম"—অন্ধকারে ভাল করিয়া দেখিলাম হ্যাঁ মতিরামই বটে—স্বর নামাইয়া বলিলাম—'বস্—দেখি কি আছে।' রাজপথের অগণিত ভিখারীর মধ্যে মতিরামকে আপনার করিয়া দেখিয়াছি। মতিরামের দেশ কাকদ্বীপে। বন্যার সময় অগ্রে সে স্ত্রীপুত্র লইয়া গাছে উঠিয়াছিল বলিয়া বাঁচিয়া গিয়াছিল, জিজ্ঞাসা করিলেই মতিরাম চোখ বড় বড় করিয়া বলে।

পূজার আয়োজন চলিতেছে—মাচা বাঁধা হইয়া গিয়াছে—প্রতিমাকে সাজান হইতেছে—আগামী কাল মায়ের ষষ্ঠী পূজা। মতিরাম কোথা হইতে আসিয়া বলিল—'বাবু কাজ দ্যান্… কাজ না কোরলে গায়ে ছট্‌ফট্ লাগে'। ভালই হইল। মতিরাম পূজার চারদিনের জন্য নিযুক্ত হইল। অসুরের মত পরিশ্রম করে সে। পূজামণ্ডপের কিছু দূরে গাছতলায় মতিরামের সংসার। মতিরাম বক্‌শিস পায়—দৌড়াইয়া স্ত্রীর নিকট জমা দিয়া আসে। পূজার প্রসাদ ছেলেটার জন্য আর একটু চাহিয়া লইয়া যায়। ভোগের অন্ন না খাইয়া—স্ত্রীপুত্রের জন্য লইয়া যায়। মতিরাম তেল মাখিয়া স্নান করিয়াছে। তাহাকে আর ভিখারী বলিয়া মনে হয় না। মনে হয় বাংলা দেশের রোজ এনে রোজ খাওয়া একজন দিনমজুর। মতিরামের মুখে হাসি ফুটিয়াছে—মায়ের পূজার জন্য ঘড়ায় করিয়া সে গঙ্গাজল আনিয়াছে—এই তাহার গৌরব। সে নিজহস্তে হোমের বেলকাঠ জোগাড় করিয়াছে। মতিরাম করযোড়ে প্রার্থনা করে—"শুধু দুবেলা দু'মুঠো খাওয়ার বন্দোবস্ত কোরে দিও মা।'



আমরা কি পূর্ব্ববর্ত্তীদের চেয়ে সুখী?

শ্রীঅরুণকুমার দত্তগুপ্ত

আধুনিক সভ্যতার কামারশালায় আমাদের জীবনটাকে আজ লোহা পেটার মতো গড়ে তোলা হচ্ছে। বিজ্ঞান মুক্তহস্তে সে অগ্নিকুণ্ডে দিচ্ছে ইন্ধন। কর্ম্মের অবিরাম চাপ সেখানে হয়েছে হাতুড়ী। রসহীন ভাবহীন এক একটি জীবন সেখানে প্রথমাবস্থায় কাঁচা লোহার আকারে ঢুকছে, আর পরক্ষণেই বেরিয়ে আসছে নবনির্ম্মিত কুড়াল খন্তা ইত্যাদির আকারে। প্রাণ সেখানে যেন চাপা মর্দ্দিত অবস্থায় পড়ে' থাকে নিঃসাড় হ'য়ে। কাজ দেয় সে, কিন্তু তাতে সন্তুষ্টি আসে না। মরুভূমির বৃষ্টির মতো এর ব্যর্থতা। এই হ'লো আধুনিক মানুষের জীবন। ফেলে-দেওয়া কাপড়ের টুকরোর মতো এদের জোড়াতালি দিয়ে চালানো যায়; কিন্তু চক্ষু তাতে আকৃষ্ট হয় না, মন তাতে পায় না কোনো বৈচিত্র্যের সন্ধান। যেখানে ভাব নেই, যেখানে শান্তির গভীরতা নেই সেখানে সুখ আসতে পারে, কিন্তু তৃপ্তি আসে না। ক্ষণিকের সুখস্বপ্নের মতো সেখানে একটা উল্লাস আসে বটে, কিন্তু সেটা পরক্ষণেই চলে' যায়। সদ্যসুপ্তোত্থিত ব্যক্তির মতো আবার অশান্তিতে জ্বলে' পুড়ে' আত্মহত্যা করতে চায় জীবন, ফেলে-আসা সুখের স্মৃতিটাকে সে আঁকড়ে থাকতে পারে না। আমরা বর্ত্তমানে জীবনের যে-ধারায় ভেসে চলেছি তাতে অকূল সিন্ধুর জলে গিয়ে মিশতে পারবো না—পথেই কোথাও কোনো অগ্নিবর্ষী মরুর বুকে হারিয়ে যাবো—যথার্থ বলতে পারি নে। তবে যে-জঞ্জাল আমাদের বর্ত্তমান প্রগতির সাথে বিজড়িত হয়ে পুঞ্জীভূত হচ্ছে তাতে আমরা সহজভাবে এগুতে পারবো কিনা সন্দেহ। আধুনিকতার শত বন্যার জলেও সেই বোঝাকে ভাসিয়ে নিয়ে তাকে মুক্ত করতে পারবে বলে' মনে হয়না। মন যেখানে অপরিষ্কার, বাহির সেখানে ফিটফাট হ'লেই তো আর প্রকৃত পরিচ্ছন্ন থাকা হ'লো না! উন্নতির সাধনায় মানসিক পবিত্রতা যে দরকার, ইতিহাস তার প্রমাণ। ভোগৈশ্বর্য্যের গৌরবে যে জাতি একদিন জগতে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করেছিলো, আজ তার পরিচয় পর্য্যন্ত ধরাতলে অবলুপ্ত। বিজ্ঞানের কল্যাণে আজ আমাদের এত গৌরব এত উন্নতি (?), তার স্থায়িত্ব সম্বন্ধেও অনেকে সংশয়ান্বিত। যদি সত্যকার ঐহিক অমরতা লাভ করতে চাও তবে আধ্যাত্মিক দৃষ্টি-ভঙ্গীতে সমৃদ্ধ হ'বার, নিজের প্রতিভাকে সম্পূর্ণ করবার শক্তি অর্জ্জন করো, ভোগকে কমিয়ে ত্যাগকে বাড়িয়ে তোলো, সমুদয় বস্তুর অন্তরের উৎস সন্ধানে যত্নবান হও, আপন বিবেক-বুদ্ধিকে দম্ভের নির্ব্বিচারের লোক-ভয়ের দণ্ডাঘাতে আহত হ'তে দিওনা—সর্ব্ব-যুগের মহামানবগণের উপদেশাবলীর এই মর্ম্মার্থ।

আমরা কি আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তীদের চেয়ে সুখী?—এ কথা এদিক দিয়ে বিচার করলে আমরা স্পষ্ট অনুভব করতে পারবো। আগেকার চেয়ে আমাদের সংসারের সুখশান্তি বহুগুণে বেড়ে গেছে বলে' মনে করিনে। বিংশশতাব্দীতে বসে' কোটি কোটি বিশ্ববাসী সকলে পরম নির্ভরতার গুণে সুখে জীবন যাপন করছে, একথা স্বীকার্য্য নয়। আজিকার দিনে পৃথিবীর সর্ব্বজাতি কি সেই সাম্যের আশ্রয় নিয়েছে যাতে তারা স্পর্দ্ধা করে' বলতে পারে যে, তাদের রাজ্যে একটি লোকও দুঃখের মুখ দেখেনি? বিজ্ঞানের এই বহুল অগ্রগতির যুগে আমরা যেসব সুখ-সুবিধা ভোগ করছি তাতে কি আমাদের সব দুঃখ সব গ্লানি দূর করতে পেরেছে? সকলে খুঁজে আসুন দেখি, জগতে আজ দুঃখীর সংখ্যা আগের অনুপাতে বেড়েছে, না কমেছে? আমাদের দেশেই দেখুন না কেন অবস্থাটা মূলতঃ কি রকম। বাহ্যিক নয়, ভিতরের ছবিটাই দেখবেন। বরং আগেই এর চাইতে ভালো ছিলুম। বস্তুভারহীন সেই বিগত জীবনে আমাদের শান্তি ছিলো নিবিড়, আনন্দ ছিলো অফুরন্ত। অনাবশ্যক বাহুল্যের জালে আমাদের জীবন তখন এমন জড়িয়ে যায় নি। সমস্ত দ্বিধা ও সংশয়ের হাত সে ছিলো মুক্ত। বিহঙ্গের মতো সেই জীবনে আকাশের অসীম বৈচিত্র্যের আস্বাদন করা চলতো। আজ তা নেই। আজ সে-বিহঙ্গ ভূ-পৃষ্ঠের নিকৃষ্ট গলিত খাদ্যের দিকে আকৃষ্ট হয়েছে। তাই সে আজ আকাশের উদারতা তেমন ভালোবাসে না। তার সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ চুকিয়ে দিয়ে আজ সে জড়তার নিম্নভূমিতে এসে আশ্রয় নিয়েছে। ঠিক তেমনি আমাদের মনও আজ অসার ভোগ্য-বস্তুর প্রতি লুব্ধ; নির্ব্বুদ্ধিতায় তাকে করেছে বিষাক্ত, ফলে সহজ প্রাকৃত বুদ্ধি করেছে আত্মহত্যা; আর অজ্ঞান মন গ্লানি ও দৈন্যে, হীনতায় ও মোহে, জড়বুদ্ধির প্ররোচনায় অধঃপতনের শেষ প্রান্তে এসে পৌঁচেছে। ভোগ অসঙ্গত নয়। তবে ভোগের বিভিন্নতা আছে। যে-ভোগে সারবস্তুর আভাস আছে, যাতে পরিণামে শারীরিক ও মানসিক উভয়দিক দিয়ে লাভবান্ হ'তে পারবো বলে আশা করতে পারি, তা-ই ভোগের যোগ্য, তা-ই সঙ্গত ভোগ। অসার যে ভোগ, অর্থহীন ক্ষণস্থায়ী যে ভোগ তা নিষ্ফল। তাতে আমাদের মর্য্যাদাযুক্ত করবে না, বরং গ্লানির বোঝাই বাড়িয়ে দেবে। আর কামনার অগ্নিশিখায় আত্মাহুতি দিয়ে সমগ্র অন্তর জ্বলে' জ্বলে' নিঃশেষ করে' দিতে চাইবে।

অতীতে আমরা এত দীন ছিলুম না। "সারং ততো গ্রাহ্যমপাস্য ফল্গু: হংসৈর্যথা ক্ষীরমম্বুমধ্যাৎ"—এই ছিলো সেকালের লোকাচরিত নীতি। এত 'ফ্যাসান', দুনিয়ার এত নব নব হালচাল তখন আমাদের মধ্যে বিস্তৃত হয়নি। সহজ বুদ্ধিই ছিলো সর্ব্বত্র জয়যুক্ত। সে সময়ের জীবনযাত্রা ছিলো সরল অনাড়ম্বর অথচ উন্নত। বিজ্ঞানের বিচিত্র বিস্ময়কর অবদানগুলি থেকে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বঞ্চিত ছিলেন বটে, কিন্তু তাতে অসুবিধা কিছু অনুভব করতেন না। বরং বিজ্ঞানের দ্বারা এতটা প্রভাবিত না হ'য়েই তাঁরা ভালো ছিলেন। অথচ আজ আমরা বিজ্ঞানবলে প্রাকৃতিক যে মহাশক্তিকে করায়ত্ত করে' ফেলেছি, তাতে কোথায় আমরা প্রগতির ধাপে ধাপে এগিয়ে যাবো তা না হ'য়ে বরং অবনতিরই গুহাগর্ভে নেমে যাচ্ছি। সে-শক্তির সদ্ব্যবহার আমরা জানিনে; তাই বাইরে জাগতিক উন্নতির লক্ষণটা একটু অতিরঞ্জিত মাত্রায় প্রকাশ পেলেও ভিতরে কিছুই উৎকর্ষ সাধিত হয় নি। ভোগের আনন্দের সহস্র সম্ভার হাতের মুঠোয় পেয়েও আজ আমাদের ঘরে শান্তি নেই। বিরোধের অগ্নিশিখা, হিংসার দাবানল সেখানে সব পুড়িয়ে ছারখার করে' দিচ্ছে। স্বার্থপরতার মোহে আমরা ক্রমশঃ অপরিণামদর্শী হয়ে পড়ছি। ভায়ের দুঃখে ভায়ের প্রাণ আজ কেঁদে উঠে না, মায়ের বেদনা আজ পুত্র অপলকনেত্রে চেয়ে দেখে, ভ্রাতৃত্ব ও স্নেহের এমনি করুণ পরিণতি! স্বার্থ ছাড়া আজ কোনো কাজের কোনো উদ্দেশ্য নেই। যে-যুদ্ধ আজ সমগ্র পৃথিবীর বুকে রক্তস্রোত সঞ্চালিত করেছে, তার গোড়ায় রয়েছে স্বার্থ—ব্যক্তিগত না হ'লেও জাতিগত বটে। যে-বিজ্ঞান আমাদের জীবনযাত্রাকে তার বিচিত্র উপহারপুঞ্জে মণ্ডিত করে দিয়েছে, সে-ই এখানে সম্পূর্ণ আলাদা মূর্ত্তিতে ওই নরমেধযজ্ঞের ইন্ধন যোগাচ্ছে। মানসিক নীচতাও আমাদের ঘিরে রেখেছে। শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য ভুলে গিয়ে আজ আমরা তাকে বিকৃত করতে বসেছি; তাতে শিক্ষা হ'য়েছে বিকলাঙ্গ, বন্ধ্যা।

অতীতে এ অনর্থ ছিলো না। আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তীরা এ থেকে মুক্ত ছিলেন। সহজ শক্তিময় জীবনযাপন করে' পরার্থে নিঃস্বার্থ ত্যাগ

স্বীকার করতে পারলেই তাঁরা নিজেদের ধন্য মনে করতেন। আমাদের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ নিয়ে তারা শিক্ষিত বলে গর্ব্ব করতেন না। অথচ তাঁরাই ছিলেন প্রকৃত জ্ঞানের তপস্বী। তাঁরা জানতেন যে, কতকগুলো বিষয় নিয়ে অনর্থক কথা কাটাকাটি বা তর্কাতর্কি করলেই প্রকৃত জ্ঞানলাভ করা যায় না ; প্রকৃত জ্ঞানার্থী হ'বেন অহিংস, একাগ্র, সমস্ত স্বার্থবিদ্বেষবিহীন—এটা বুঝতেন বলেই তাঁরা মূল্যবান্ ছাত্র জীবনটাকে রেশারেশি ও নিষ্ঠাহীন প্রতিযোগিতায় কাটিয়ে না দিয়ে গভীর জ্ঞান-সাধনায় নিমগ্ন হ'য়ে থাকতেন। নির্জ্জনে তাঁদের এ জ্ঞানানুশীলন চলতো। তাতে তাঁরা যে দিব্যজ্ঞানের সন্ধান পেতেন, তা তাঁদের সমস্ত পার্থিব দীনতার বহু উর্দ্ধে নিয়ে যেতো। এতেই হ'তো তাঁদের চিত্তবৃত্তিগুলির সুচারু স্ফূর্ত্তি, শিক্ষার পরিপূর্ণ পরিণতি। তাঁরা হ'তেন একাধারে ঋষি ও গৃহী, জ্ঞানী ও বিনয়ী। কিন্তু আমরা কি হয়েছি? যে অজ্ঞতার বোঝা দিনের পর দিন আমাদের চেপে ধরে' শ্বাসরোধ করে' মারবার উপক্রম ক'রেছে, তাকে আমরা পরিহার করছি না, বরং উদাসীনভাবে প্রশ্রয় দিয়ে যাচ্ছি। যে সর্ব্বনাশা ব্যক্তি স্বার্থের মোহ আজ আমাদের ছিন্নভিন্ন করে' দিতে চাইছে তাকে তো আমরা সর্ব্বথা বিনষ্ট করছি না! যেদিন আমরা সেই অতীতের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হ'য়ে তার সঙ্গে সব সম্বন্ধ মুহূর্ত্তে চুকিয়ে দিয়ে নতুন আত্মম্ভরিতার প্রশস্ত নদীখাত ছেড়ে সঙ্কীর্ণ ঝরণার খাতে জীবনযাত্রা সুরু করেছি, সেদিন থেকেই আমাদের অধঃপতনের সূচনা। জীবনের সার্থকতা ভুলে আজ আমরা তাকে অর্থহীন বাজে কাজে ব্যয়িত করছি ; ক্ষণিক সুখ তাতে পাচ্ছি, কিন্তু স্থায়ী সুখ পাচ্ছি না। সহজ সরল পথ ছেড়ে আমরা পাকদণ্ডীর পথ ধরেছি ; ফলে কেবল এগুতেই হচ্ছে, তবু লক্ষ্যের দেখা মিলছে না। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী অনুভবের ভঙ্গী সবই আজ 'নীড়হারা নিশার পক্ষীর' মতো দিগ্‌বিদিকে উড়ে' বেড়াচ্ছে। কবে যে এই গোলকধাঁধাঁর জটিলতা থেকে পথ চিনে চলতে পারবো বলতে পারিনে। কিন্তু, এ নিশ্চয় করে' বলতে পারি যে, এখনো যদি আমরা স্ব স্ব চিত্তের বোধকে জাগতিক অকিঞ্চিৎকর বস্তুসমূহের আকর্ষণ থেকে খালাস করে' নিয়ে যথার্থ ফলাহ বস্তুর চিন্তায় নিয়োগ করতে পারি, তবে শান্তি ফিরে আসবে। এতে আমরা বিশ্বের চোখে খাটো হ'য়ে যাবো না, বরং এতে আমাদের সাধনাই হ'বে অধিকতর জয়যুক্ত। আমাদের পূর্ব্বপুরুষের সেই মানবোচিত বলিষ্ঠ প্রবৃত্তিগুলি আমাদের অন্তরকে দ্বিধাহীন সবল ও একনিষ্ঠ করে' তুলুক্।

মৃতদেহের সহিত একরাত্রি

শ্রীঅজিতকুমার বসু বি-এস্‌-সি

অস্তোন্মুখ সূর্য্যের আলো পশ্চিমের আকাশখানায় যেন সিঁদুর লেপিয়া দিয়াছে। বালুতটে বসিয়া কতো লোক—নর-নারী, শিশু-বৃদ্ধ, যুবক-যুবতী—হাসি-গল্প-তামাসা প্রভৃতি করিতেছে। শিশুরা বালির প্রাসাদ-নির্ম্মাণে ব্যস্ত—কিন্তু তাহাদের উদ্যম, তাহাদের পরিশ্রমের জিনিষ ক্ষণিকের মধ্যেই উন্মত্ত তরঙ্গ আসিয়া ভাঙ্গিয়া দিতেছে।

বেড়াইতে বেড়াইতে স্বর্গদ্বার ছাড়াইয়া আসিয়াছি। বড় একা একা মনে হইতেছে—এমন মধুর বাতাস, চঞ্চল ঢেউয়ের উপর এমন আলোর বিকীরণ—মানুষের, বিশেষ করে এই বয়সের মানুষের মনকে চঞ্চল করিয়া তোলে। চলিতে চলিতে আসিয়া পড়িয়াছি এমন এক যায়গায় যেখানে আর বাড়ী-ঘর নাই—বামপার্শ্বে অসীম সাগর, আর ডানদিকে ধূধূ করিতেছে বালির চর। সহসা চোখে পড়িল সেই জনবিরল স্থানে বসিয়া রহিয়াছে একজন লোক—কি একখানা বই অত্যন্ত মনোযোগের সহিত পড়িতেছে। লোকটার পরিধানে সাহেবি পোষাক—শরীর অত্যন্ত শীর্ণ। মনে হয়, কোন অসুখে ভুগিতেছে—হয়ত বা বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য এখানে আসিয়াছে। অসুখের কথা মনে হইলেই ভয় হয়—কি জানি কি অসুখ! পাছে ছোঁয়াচ লাগে সেই ভয়ে পিছন ফিরিবার চেষ্টা করিতেছি—কিন্তু পরিত্রাণ পাইবার উপায় আছে কি? লোকটা ডাকিল।

ভদ্রতার খাতিরে পিছন ফিরিলাম। দেখিলাম, লোকটা বই হইতে মুখ তুলিয়া আমার দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে। চোখাচোখি হইতেই সে হাতছানি দিয়া ডাকিল। একবার মনে হইল দৌড়াইয়া পালাই, কিন্তু কি ভাবিয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইলাম।

লোকটা জাতে যে ইংরাজ সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ রহিল না। আমাকে তাহার পাশে বসিতে বলিয়া সে তাহার ছড়ানো পা দুইটা গুটাইয়া লইল—দেখিলাম পা দুইটা এতো শীর্ণ যে তাহাতে অস্থি ছাড়া আর কিছু আছে কিনা উপলব্ধি করা যায় না। যাহা হউক, কতকটা বিরক্ত মনে তাহার পাশে গিয়া বসিলাম।

লোকটা ক্ষীণস্বরে বলিতে লাগিল, আপনাকে প্রায়ই দেখি সমুদ্রের তীরে বেড়াতে—কতো দিন ইচ্ছে হয়েচে ডেকে দুটো কথা কইতে, কিন্তু সাহস হয় নি। আজ আর লোভ সংবরণ করতে পারলাম না—

আমি কহিলাম, তা' বেশ করেছেন। আর আমিও বড় একা—সাথীহারা অবস্থায় দিন কাটাচ্ছি।

সাহেব মৃদু হাসিয়া কহিল, তা' হ'লে আমাদের দু'জনেরই এক অবস্থা।

আমি সে কথায় বিশেষ কান না দিয়া কহিলাম, কি বই ওখানা? অমন মনোযোগ দিয়ে পড়ছিলেন?

বইখানা আমার দিকে আগাইয়া দিয়া কহিলেন, আপনি ফরাসী ভাষা জানেন?

বইখানি ফরাসী ভাষায় লেখা। পাতাগুলি নাড়াচাড়া করিতে করিতে কহিলাম, আজ্ঞে না—আমি ফরাসী ভাষা জানি না।

বইখানি যে অতি যত্নের সহিত পড়া হইয়াছে, তাহা প্রত্যেক পৃষ্ঠাতে শব্দার্থ লেখা এবং লাইনের নীচে দাগের চিহ্ন হইতেই বেশ স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। কহিলাম, বইখানার অবস্থা দেখে ত মনে হয় এটাকে অসংখ্যবার পড়েছেন—তবুও এর মধ্যে এমন কি আছে…

বাধা দিয়া সাহেব বলিল, আপনি ভুল বুঝছেন—ও দাগগুলো আমার দেওয়া নয়।

জিজ্ঞাসা করিলাম, তবে?

—লেখক নিজেই শব্দার্থগুলো লিখে দিয়েছেন—আমার যাতে বেশী অসুবিধে না হয়।

লেখকের সঙ্গে আপনার পরিচয় ছিল না কি ? প্রশ্ন করিলাম।

সাহেব হাসিল—ম্লান হাসি। কহিল, তাঁর মৃত্যু অবধি তাঁকে বেশ ভাল করেই জানতাম। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর কতকটা যেন নিজমনেই বলিতে লাগিল, আজও স্পষ্ট মনে পড়ে সেই হাসি—সেই চোখ, সেই মুখ; আজও ভুলি নি মৃত্যুর পরে তাঁর মুখে যে হাসি ফুটে উঠেছিল···

আমি বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, মৃত্যুর পরে হাসি ফুটেছিল !

সাহেব কাশিতে লাগিল। কাশি থামিলে পর বিজ্ঞভাবে একটু ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে কহিল, তবে আর বলচি কি ! আশ্চর্য্য হচ্ছেন ? হ'বারই কথা ! মড়া মানুষের মুখে হাসি ! পকেট হইতে একখানি রুমাল বাহির করিয়া মুখটা মুছিয়া লইয়া বলিল, তা' হ'লে আপনাকে সবটা খুলেই বলি। সে হাসির কথা মনে হ'লে আজও আমার গা শিউরে ওঠে।

সন্ধ্যার একটু আগেই লেখক মারা গেলেন। সেদিন তাঁকে আর কবর দেওয়া হোল না। ঠিক করা হোল পরের দিন সকালে তাঁকে কবর দেওয়া হবে, আর সেদিন রাত্তিরে দু'জন দু'জন করে পাহারা দেওয়া হবে।

শীতকালের রাত্তির। আমরা কয়েকজন ধররাধরি করে' তাঁর দেহটাকে একটা বড় ঘরে নিয়ে এলাম। বিছানার দু'পাশে দুটো মোমবাতি জ্বেলে দেওয়া হোল। ঘরটাতে বিশেষ কোন আসবাব ছিল না—কোণে কোণে অন্ধকার জমে উঠে ঘরটাকে বড় বিষণ্ণ করে তুলেছিল।

আমার ওপর পাহারা দেবার ভার পড়লো মাঝ রাত্তিরে। আর একজন সঙ্গীকে নিয়ে মৃতদেহের পাশে বসলাম। যাঁ'রা এতক্ষণ পর্য্যন্ত বসেছিল, তা'রা ঘর ছেড়ে চলে গেল।

লেখকের মুখ দেখে বোঝা শক্ত তিনি মৃত কি জীবিত। সহসা দেখলে মনে হয় তিনি নিদ্রিত। ঠোঁটের ফাঁকে একটু যেন হাসির আভাস দেখা যাচ্ছিল—মৃত্যুর সময়ে তিনি হাসিমুখেই মরেছিলেন, সে হাসি তখনও মিলায়নি। সেই গাম্ভীর্য্যভরা মুখে একটু হাসির রেখা থেকে মনে হচ্ছিল পৃথিবীর সমস্ত সুখ-দুঃখকে যেন অতি সহজেই দূরে রেখে তিনি চলেছেন অজানা পথে। তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বেশ বিভোর হয়ে গিয়েছিলাম। হঠাৎ মনে হোল, যেন তিনি চোখ খোলবার, নড়েচড়ে ওঠবার বা কথা বলবার চেষ্টা করেচেন। হয়ত বা এটা আমাদের মনের ভুল বা চোখের ভুল হবে। যা' হোক, আমাদের কেমন যেন মনে হ'তে লাগলো তাঁর চিন্তাধারা, তাঁর ভাবধারা, তাঁর উপদেশ ক্রমেই আমাদের আবিষ্ট করে ফেলছে।

নির্জ্জনতা দূর করবার জন্যে আমরা নানারকম গল্পের ভিতর দিয়ে সময় কাটাবার চেষ্টা করলাম। কিছুক্ষণ পরে আমার সঙ্গী বললে, 'আমার মনে হচ্ছে উনি যেন কথা বলবার চেষ্টা করছেন।' বলব কি মশায়, আমাদের ভয়ানক অস্বস্তি বোধ হতে লাগলো—আমার ত মনে হোলো হয়ত বা অজ্ঞান হয়ে পড়ব। আমি কাঁপতে কাঁপতে আমার সঙ্গীকে বললাম, 'ঠিক বুঝতে পারছি না আমার কি হয়েছে—তবে বড় অসুস্থ বোধ করছি।'

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে মৃতদেহ থেকে পচা মতন একটা বিশ্রী গন্ধ বেরুল। আমার বন্ধুটী প্রস্তাব করলে মাঝখানের দরজাটা খুলে রেখে পাশের ঘরে থেকে আমরা পাহারা দেই। তার প্রস্তাবটাই বেশ যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হোল।

একটা মোমবাতি আমরা উঠিয়ে নিলাম—দ্বিতীয়টা সেখানেই জ্বলতে লাগলো। পাশের ঘরে গিয়ে পেছন দিকে দেয়ালের কাছে বসালাম—সেখান থেকে মৃতদেহটি বেশ ভালভাবেই দেখা যাচ্ছিল।

কিন্তু এতেও আমরা শান্তি পেলাম না—মনে হোল আমাদের ছেড়ে যেতে একেবারেই তিনি নারাজ। জীবিতকালে তিনি আমাকে খুব স্নেহ করতেন, তাই মরণেও বোধহয় সঙ্গে নিতে চান। বুকটা আমার ভীষণভাবে ঢিপ্ ঢিপ্ করতে লাগলো—মনে হোল, তাঁর আত্মা যেন আমার চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার ওপরে পচনোন্মুখ শরীরের বিশ্রী গন্ধে প্রাণ যেন 'যাই যাই' করতে লাগলো।

সহসা আমাদের হাড়ের ভেতর অবধি যেন ভীষণভাবে কেঁপে উঠলো। সামনের ঘর থেকে যেন একটা শব্দ—খুব ক্ষীণ অথচ খুব স্পষ্ট—আমাদের কানে এসে আমাদের প্রাণ কাঁপিয়ে তুললো। তখুনি আমরা মৃতদেহের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম। কি দেখলাম জানেন ? হয়ত বিশ্বাস করবেন না—কিন্তু আমরা দুজনেই স্পষ্ট দেখলাম, সাদা মতন কি যেন একটা বিছানার ওপর লাফিয়ে উঠলো, তারপর কার্পেটের ওপর পড়েই সেটা ইজিচেয়ারের নীচে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কিছু চিন্তা করবার আগেই আমরা দাঁড়িয়ে উঠেছিলাম পালিয়ে যাবার জন্যে। দু'জনেই প্রত্যেকের দিকে তাকালাম—কথা বলবার আর শক্তি কারও ছিল না। আমাদের অবস্থা তখন যে কি রকম হয়েছিল সে ব্যাখ্যা করবার মত ভাষা আমার নেই—সোজা কথায় আমরা ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিলাম। আমিই প্রথমে কথা বললাম।

'দেখলে ?'

'হাঁ।'

'তা' হ'লে উনি কি মরেন নি ?'

'কেন নয় ?—শরীরটা পচতে আরম্ভ করেচে।'

'কিন্তু ওটা ?—' আমার মুখ দিয়ে আর কথা বেরুচ্ছিল না—মাথা ঝিম্ ঝিম্ করতে লাগলো। তবুও বললাম, 'আমাদের এখন কি করা উচিত ?'

আমার বন্ধুটি একটু দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে উত্তর দিলে, 'চলো—ওঘরে গিয়ে ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করি।'

আমিই বাতিটা নিয়ে প্রথমে প্রবেশ করলাম—ঘরের অন্ধকার কোণগুলো ভাল করে দেখলাম, কিন্তু কিছুই পেলাম না। এখন আর কোন রকম স্পন্দন নেই, নড়াচড়া নেই, কোন শব্দ নেই—' সব স্থির। বিছানার কাছে এগিয়ে গেলাম—যা' দেখলাম তা'তে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। লেখক আর হাসচেন না। ক্রোধে ঠোঁটদুটো ভীষণভাবে যেন চেপে রয়েছেন—গালদু'টো দু'পাশ থেকে চেপে বসে গেছে। আমি কম্পিত স্বরে বললাম, 'ইনি মরেন নি।'

কিন্তু সেই পচা গন্ধ আবার নাকের ভেতর এসে গা বমি-বমি করতে লাগলো। আমি স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম।

ইতিমধ্যে আমার সঙ্গীটি অপর বাতিটা নিয়ে নীচু হয়ে কি যেন অনুসন্ধান করছে। তারপরে কোন কথা না বলে আমার হাতে মৃদুভাবে সে ধাক্কা দিলে। তা'র দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখলাম, ইজিচেয়ারের নীচে কালো কার্পেটের ওপর সাদা মতন কি যেন একটা হাঁ করে পড়ে রয়েছে—মনে হয় এখুনি বুঝি কামড়ে দেবে।...লেখকের বাঁধানো দাঁত!

পচন আরম্ভ হ'তে মাড়ি আলগা হয়ে, বাঁধানো দাঁতের পাটিটা মুখের ভেতর থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এসেছে।

সত্যি কথা বলতে কি ম'শায়, সেদিন যে রকম ভয় পেয়েছিলাম—জীবনে তেমন বোধহয় আর কখনও পাই নি।

গল্প যখন শেষ হইল, দেখিলাম ধরণীকে রজনী তাহার বুকের মাঝে লুকাইয়া ফেলিয়াছে। গল্প শুনিতে শুনিতে এমন তন্ময় হইয়া গিয়াছিলাম যে, কখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া রাত্রি নামিয়াছে বুঝিতে পারি নাই। সমুদ্রের ঢেউ অবিশ্রান্তভাবে পাড়ের উপর আছড়াইয়া পড়িতেছে...আর উন্মত্ত পবন শব্দ করিতেছে সোঁ—সোঁ...সোঁ...।*

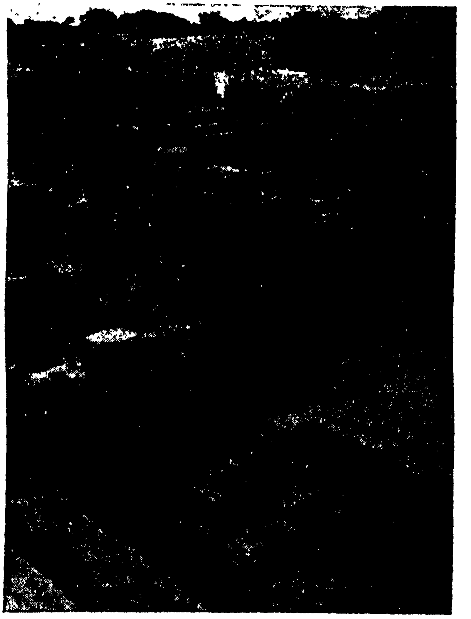
* মোঁপাসার অনুকরণে।

হারাপ্পার পথে

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

১৯৪২ সালের এপ্রিল মাসে মহেঞ্জোদারোর ধ্বংসাবশেষ ও মিউজিয়াম দেখিবার সুযোগ ঘটেছিল। বাংলায় থাকিতে শ্রীকুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী এম. এ. লিখিত এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত "মহেঞ্জোদারো" নামক বাংলা গ্রন্থখানি পড়িয়াছিলাম। তখন হইতে মহেঞ্জোদারো দেখিবার অতিশয় ইচ্ছা হইয়াছিল। করাচী ভিক্টোরিয়া মিউজিয়ামের কিউরেটার শ্রীচিত্তরঞ্জন রায় মহাশয়ের পরিচয়-পত্র সঙ্গে নিয়েছিলাম। সেইজন্য মহেঞ্জোদারোস্থিত আর্কিয়োলজিক্যাল মিউজিয়ামের কাস্টোডিয়ান (custodian) (জনৈক পাঞ্জাবী মুসলমান) মিঃ চৌধুরী অতি যত্নসহকারে আমাদিগকে মহেঞ্জোদারোর আবিষ্কৃত সকল স্থান এবং মিউজিয়ামের সকলবস্তু দেখাইয়া উহাদের ইতিবৃত্ত বলিলেন। পরে যখন তিনি স্যার জন মার্শ্যাল সাহেবের "Mohenjodaro and Indus Valley Civilisation" গ্রন্থখানির তিনটী খণ্ড খুলিয়া মহেঞ্জোদারোর সঙ্গে সঙ্গে হারাপ্পার পুরাতত্ত্ব বলিতে লাগিলেন তখন হইতেই হারাপ্পা দর্শনের ইচ্ছা হৃদয়ে বলবতী হয়। সেই ইচ্ছা পূর্ণ হইল ১৯৪৩ সালের জুনমাসে। ১৪ই জুন সোমবার তারিখের সমগ্র দিনটী হারাপ্পায় কাটাইয়াছিলাম হারাপ্পার ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া এবং উহার প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার কথা চিন্তা করিয়া। নিউদিল্লীস্থিত Central Archeological Library এর—লাইব্রেরিয়ানের নিকট হইতে হারাপ্পার Archeological museum এর Custodian পণ্ডিত কেদারনাথ শাস্ত্রী, এম. এ. এম. ও. এল মহাশয়ের নিকট পরিচয়-পত্র আনিয়াছিলাম। শাস্ত্রীজি কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ এবং জাম্মু সহরের লোক। তিনি অতিশয় অমায়িক ভদ্রলোক এবং সাধুভক্ত। তাঁহার বাড়ীতেই আমাদের দুইজনকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইলেন। হারাপ্পার মিউজিয়ামটী ছোট। উহার মাত্র দুইটী কাম্‌রা। কাম্‌রা দুইটীতে রক্ষিত হারাপ্পার প্রাচীন বস্তুগুলি আমরা তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলাম। মিউজিয়ামের সম্মুখে একটী সুন্দর লন (Lawn), অফিস প্রভৃতি আছে। তখন গ্রীষ্মকাল, স্থানটী অত্যন্ত গরম। আমার সঙ্গে ছিলেন শ্রীগেলারাম চেতনদাস আসনানি নামক একটী গ্রাজুয়েট সিন্ধী যুবক। মহেঞ্জোদারো ভ্রমণকালেও এই যুবকটী আমার সঙ্গী ছিল। পণ্ডিত কেদারনাথ প্রাচীন আমেরিকায় ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন এবং চামনলাল লিখিত "Hindu America" এবং ডক্টর ওয়াডেল (Waddell) সাহেব লিখিত ভারত তত্ত্ব সম্বন্ধে ২।১খানি গ্রন্থ পড়িতে আমাদিগকে পরামর্শ দিলেন। শাস্ত্রীজি A Guide to Harappa নামক একখানি ছোটবই ইংরাজি ও হিন্দিতে লিখিয়াছেন। বইখানি দুইভাষায় শীঘ্র প্রকাশিত হইবে। লাহোর হইতে হারাপ্পা আমরা একটী প্যাসেঞ্জার ট্রেনে পাঁচ ঘণ্টায় পৌঁছিলাম। ষ্টেশনে গাড়ী পৌঁছিল রাত্রি দুইটায়। আমরা সকাল অবধি ষ্টেশনেই বিশ্রাম করিলাম এবং প্রাতে পদব্রজে প্রায় দেড় ঘণ্টার মধ্যে হারাপ্পা শহরে উপস্থিত হইলাম।

পাঞ্জাব প্রদেশের মণ্টোগোমারী জেলায় হারাপ্পা অবস্থিত। লাহোর হইতে করাচী যাইবার পথে নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে লাইনে হারাপ্পা



ধ্বংসস্তূপের আটটী স্তর—হারাপ্পা

রোড ষ্টেশন আছে। লাহোর জংশন হইতে হারাপ্পা রোড মাত্র ১১৬ মাইল এবং তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া এখন মাত্র দুই টাকা এক আনা। হারাপ্পা রোড ষ্টেশন হইতে হারাপ্পা মাত্র ৪ মাইল; যাইবার কাঁচা রাস্তা

আছে। ঘোড়ার বা গরুর গাড়ী পাওয়া যায়। আমরা পদব্রজেই যাতায়াত করিলাম। মণ্টোগোমারী সহর হইতে মোটর বাসেও হারাপ্পা যাওয়া যায়। তবে বর্ষাকালে বাস যাতায়াত বন্ধ থাকে। মণ্টোগোমারী জেলা সহর হইতে হারাপ্পা মাত্র ১৫ মাইল। খ্রীষ্টপূর্ব প্রায় তিন হাজার বৎসর পূর্বে মহেঞ্জোদারোর ন্যায় হারাপ্পা তাৎকালিক জগতের একটী শ্রেষ্ঠ ও সমৃদ্ধ সহর ছিল। উহা বর্তমান যুগে একপ্রকার বিলুপ্ত ও বিস্মৃত। সহরের ধ্বংসস্তূপ আড়াই মাইল বা ১২৫০০ ফুট বিস্তৃত। ভারতের ভূতপূর্ব ডেপুটী ডাইরেক্টার জেনারেল অব্ আর্কিওলজি শ্রীমাধোস্বরূপ বৎস এম, এ তাঁহার "Excavations at Harappa" নামক দুইখণ্ড বৃহৎ সচিত্র গ্রন্থে হারাপ্পার বিশদ বিবরণ দিয়াছেন। তিনি বলেন, ধ্বংসস্তূপের পরিধি সাড়ে তিন মাইলের অধিক। খননকার্য সমাপ্ত না হইলে সহরের আয়তন নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। বর্তমানে খননকার্য্য বন্ধ আছে।

১৮২৬ খ্রীঃ ম্যাশন (Masson) সাহেব সর্বপ্রথম হারাপ্পা পরিদর্শন করেন। তাঁহার পর ১৮৩১ খ্রীঃ বার্ণেশ (Burnes) সাহেব একবার এবং তৎপর জেনারেল কানিংহাম ১৮৫৩ এবং ১৮৫৬ খ্রীঃ দুইবার এই ধ্বংসস্তূপ পরিদর্শন করেন। নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ের কণ্ট্র্যাক্টারগণ এবং হারাপ্পা ও চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামের ৫।৬ হাজার ব্যক্তি এই ধ্বংসস্তূপ হইতে পোড়ান ইঁট লইয়া গৃহনির্মাণ করিয়াছেন। নবনির্মিত হারাপ্পা সহরটীতে, বাজার, ডাকঘর, স্কুল ও মন্দিরাদি আছে। হারাপ্পা পরিদর্শন কালে স্যার আলেকজাণ্ডার কানিংহাম্ কয়েকটা প্রাচীন মুদ্রা



মহাধান্যকোষ্ঠ—হারাপ্পা

সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি ১৮৭৫ খ্রীঃ ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগের বাৎসরিক বিবরণে হারাপ্পা ধ্বংসস্তূপের স্থান, তথায় প্রাপ্তমুদ্রার বর্ণনা এবং প্রাচীনতা সম্বন্ধে গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেন। ব্রিটিশ মিউজিয়াম হারাপ্পা হইতে যে মুদ্রাসংগ্রহ করেন সেই সকলের বিবরণ ১৯১২ খ্রীঃ রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটীর জার্ণ্যালে প্রকাশিত হয়। স্যার জন মার্শ্যাল স্বদেশে (ইংলণ্ডে) থাকিবার সময়েই হারাপ্পায় প্রাপ্ত মুদ্রাগুলির প্রতি আকৃষ্ট হন এবং ভারতে প্রত্নতত্ত্ববিভাগের ডাইরেক্টার জেনারেল হইয়া আসিলে তাঁহারই আগ্রহে ধ্বংসস্তূপের খননকার্য আরম্ভ হয়। তাঁহারই নেতৃত্বে ও আদেশে রায় বাহাদুর দয়ারাম সাহানী দ্বারা ১৯২১ খ্রীঃ জানুয়ারী হইতে ১৯২৫ খ্রীঃ পর্যন্ত এই স্থানের খননকার্য পরিচালিত হইয়াছিল। গ্রীষ্মকালে খননকার্য বন্ধ থাকিত এবং শীতকালেই চলিত। তাঁহার পর শ্রীমাধোস্বরূপ বৎস মহাশয় ১৯২৬ হইতে ১৯৩৪ খ্রীঃ পর্যন্ত প্রায় আট বৎসর খননকার্য পরিচালন করেন। সময় এবং অর্থাভাবে রায় বাহাদুর খননকার্যে অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই, কিন্তু তিনি যে সকল দ্রব্য আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, হারাপ্পা মহেঞ্জোদারোর সমসাময়িক। স্যার জন মার্শ্যাল তাঁহার "Mohenjodaro and Indus Valley Civilisation" নামক সুবৃহৎ এবং সুবিখ্যাত গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, হারাপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর সংস্কৃতি একইপ্রকার। উভয়স্থানে আবিষ্কৃত গৃহ, পয়ঃপ্রণালী, ইঁট, মৃৎপাত্র, অস্ত্রশস্ত্র, গৃহে ব্যবহৃত বাসনাদি, অলঙ্কার, মুদ্রাদির মধ্যে এত সাদৃশ্য আছে যে উভয় সহরের মধ্যে নিশ্চয়ই যোগাযোগ ছিল। মার্শ্যাল সাহেবের মতে হারাপ্পা মহেঞ্জোদারো অপেক্ষা কিঞ্চিৎ প্রাচীনতর এবং সম্ভবতঃ খ্রীঃ পূর্ব ৪০০০ শতাব্দীর অর্থাৎ এখন হইতে প্রায় ছয় হাজার বৎসরের অধিক প্রাচীন। মাটীর দেওয়াল এবং মাটীর তৈরী কাঁচা ইঁটের দেওয়ালের গৃহ, সিঁড়ি, সুন্দর ইঁটের বা মাটীর মেজে, উন্নত ও দীর্ঘ পয়ঃপ্রণালী, ব্যবহৃত জলসঙ্করের গর্ত, কূপ, জলসত্র, ইঁট, গোলবেদী বা আঙ্গিনা, বৃহৎ ধান্যকোষ্ঠ (great granery) কবরস্থান, প্রভৃতি হারাপ্পাতে আবিষ্কৃত হয়েছে।

ডক্টর ই, জে, এইচ্ ম্যাকে (mackay) সাহেব তাঁহার "Further Excavatio s at mohenjodaro" গ্রন্থে লিখিয়াছেন, মহেঞ্জোদারোতে প্রাপ্ত সকলপ্রকার মৃৎপাত্র হারাপ্পাতে পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু হারাপ্পাতে এমন কয়েক প্রকারের মৃৎপাত্র পাওয়া গিয়াছে যাহা মহেঞ্জোদারোয় দৃষ্ট হয় নাই। হারাপ্পার ভূমি পূর্বকালে বিশেষ উর্বর ছিল। সিন্ধু শাখা ইরাবতী নদীর স্রোতদ্বয়ের সঙ্গমস্থলে ধারা উপত্যকার উপরে হারাপ্পা অবস্থিত ছিল। নদীর স্রোত বর্তমানে ৫।৬ মাইল দূরে সরিয়া গিয়াছে। নদীর স্রোত মাঝে মাঝে গতি পরিবর্তন করিত।

একবার প্রবল বন্যায় হারাপ্পা সহর, মহেঞ্জোদারো সহরের ন্যায় বিধ্বস্ত ও বিনষ্ট হয়। আবিষ্কৃত স্থান এত নিশ্চিহ্নভাবে ধ্বংস হইয়াছে যে, সহরের বা সহরস্থিত গৃহগুলির কোন পূর্ণ বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। তবে ইহা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, আদিম কালে হারাপ্পা সহরের অধিবাসিগণ পোড়ান ইঁটের তৈরী গৃহে বাস করিতেন। আবিষ্কৃত গৃহগুলিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; বাসের জন্য এবং সাধারণ প্রতিষ্ঠানের জন্য। সাধারণ গৃহগুলির মধ্যে বৃহৎ শস্যাগার (granery) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

হারাপ্পাতে প্রাগৈতিহাসিক যুগের একটী বৃহৎ কবরস্থান পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে উক্ত স্থানের মৃত-সৎকার-প্রথা জানিতে পারা যায়।* হারাপ্পাতে পুরাকালে দুই প্রকারে মৃতদেহের সৎকার করা হইত। অতীত যুগের প্রথমার্ধে মৃতদেহগুলিকে গভীর ও বৃহৎ গর্ত করিয়া তাহার মধ্যে প্রোথিত করা হইত। কিন্তু পরে মৃতদেহগুলিকে জঙ্গলে ফেলিয়া দেওয়া হইত এবং পশুপক্ষীসমূহ উহার মাংসাদি ভক্ষণ করিয়া ফেলিলে তাহার অবশিষ্ট অস্থি ও কঙ্কালাদি একটী বৃহৎ মৃৎপাত্রে পুরিয়া মাটির তলে পুঁতিয়া রাখা হইত। আংশিকভাবে এই প্রথা এখনও পার্শী সমাজে প্রচলিত। এ, বি, কীথ (Keith) সাহেব

* সর্বপ্রথমতঃ মৃতদেহ পোড়ান হইত—এই মত কেহ কেহ পোষণ করেন। এই প্রথা আমেরিকা, ভারত ও অন্যান্য দেশে এখনও প্রচলিত। ইহাই প্রাচীনতম প্রথা বলিয়া অনুমিত হয়।

তাঁহার "Religion and Philosophy of the Veda" পুস্তকের ৪১৭-১৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে বৈদিক যুগেও দুই প্রকারে মৃতসৎকার হইত : প্রথম প্রকারের নাম 'পরোপ্তাঃ' এবং দ্বিতীয় প্রকারের তার 'উদ্ধিতাঃ'। প্রথম প্রণালীতে শবকে জঙ্গলে বা নদীতীরে নিক্ষেপ করা হইত এবং দ্বিতীয় প্রণালীতে শবদেহকে বৃক্ষের উপরে বা কোন উচ্চস্থানে রাখিয়া দেওয়া হইত। হারাপ্পার অনার্যগণ সম্ভবতঃ বৈদিক প্রথার অনুসরণ করিয়াছিল। হারাপ্পাতে প্রাপ্ত কবর-পাত্রগুলির উপরে নানাপ্রকার চিত্র অঙ্কিত থাকিত। পাত্রমধ্যে তলায় শবের অস্থি এবং তদুপরি মাটি দিয়া পূর্ণ করা হইত। সকল পাত্রের উপরে ময়ূরের চিত্র অঙ্কিত আছে এবং ময়ূরের গাত্রে মৃত ব্যক্তির সূক্ষ্ম শরীরের একটী ক্ষুদ্র ছবি আছে। ইহা হইতে প্রতীত হয় যে, সেই যুগে হারাপ্পার লোকে ময়ূরকে অতি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত এবং মনে করিত ময়ূরের সাহায্যে মৃতব্যক্তির সূক্ষ্ম শরীর বা আত্মা স্বর্গে বা ঊর্দ্ধলোকে গমন করিবে। মৃতব্যক্তির দুই পার্শ্বে বৈতরণী ও অনুস্তরণী নদীর চিহ্নস্বরূপ দুইটী গাভী —এই প্রকার চিত্রও প্রচুর। কোন কোন পাত্রের উপর ছাগল, গাভী, ষাঁড় এবং কুকুরের চিত্রও দেখা যায়। মৃত্যুর পরে স্থুল-শরীর-হীন আত্মার যে যে অবস্থা হয় তাহার আভাস চিত্রগুলি হইতে জানিতে পারা যায়। শিকারী কুকুরগুলি নরকের বা যমের দূত, সজ্জিত গাভীগুলি স্বর্গের বা কোন সুখলোকের চিহ্ন (symbol) এবং ছাগলগুলি নরক হইতে স্বর্গে মৃতাত্মাকে বহন করিত। পাত্রগুলির গাত্রে পূর্ব-বর্ণিত চিত্র ব্যতীত অন্যান্য চিত্রও দেখা যায়। কোন কোন পাত্রে তারকা, রশ্মিযুক্ত গোল বস্তু, তরঙ্গায়িত রেখা, ত্রিভুজ, পত্র, চারা গাছ, বৃক্ষ, উড্ডীয়মান পাখী মৎস্যাদি চিত্রিত আছে। তারকা স্বর্গের, জ্যোতির্ময় গোলাকার বস্তু সূর্যের, রেখা ও ত্রিভুজও মৎস্য জলরাশির এবং পাতা চারাগাছ ও বৃক্ষ উদ্ভিদাদির প্রতীক। মৃতাত্মাগণ যে সকল বায়ুলোকের মধ্য দিয়া ঊর্দ্ধে গমন করে উড্ডীয়মান পক্ষীগুলি তাহার প্রতীক। প্রৌঢ় বা বালকের মৃতদেহগুলি সাধারণত বন্যপশুপক্ষীর সম্মুখে ফেলিয়া দেওয়া হইত এবং পরে তাহাদের অস্থি সংগ্রহ করিয়া মৃৎপাত্রে রাখিয়া ভূগর্ভে প্রোথিত করা হইত। হারাপ্পার প্রাচীন অধিবাসিগণ মৃত শিশুদিগকে একখানি কাপড়ে জড়াইয়া মৃৎপাত্রে রাখিয়া কবর দিত। এইগুলিকে ফেলিয়া দিলে পাছে পশুপক্ষীগণ ক্ষুদ্র দেহটাকে একেবারে বহন করিয়া লইয়া যায় এবং তাহা হইলে তাহাদের কোন অস্থি পাওয়া যাইবে না সেইজন্য মৃত শিশুদেহগুলিকে মৃৎপাত্রস্থ করিয়া প্রোথিত করা হইত।

যে সকল মৃতদেহকে ভূগর্ভে প্রোথিত করা হইত তাহাদের নিকটে কয়েকটী পাত্রে মৃতব্যক্তির ব্যবহারের জন্য আহার্য্য ও পানীয় রাখা হইত। কোন কোন মৃতদেহের সমগ্র এবং কোন কোন দেহ অংশমাত্র এইভাবে কবর দেওয়া হইত। কোন কোন কবরে আহার্য বা পানীয়ের জন্য কোন পাত্র নাই। আবার বিভিন্ন কবরে বিভিন্ন পাত্র দেখা যায়। শ্রীমাধোস্বরূপ বৎস তাঁহার উল্লিখিত গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, বিভিন্ন প্রকার কবর দেওয়ার প্রণালী হইতে ভিন্ন ভিন্ন যুগের ইতিহাস অধ্যয়ন করা যায়। তাঁহার মতে সমগ্র মৃতদেহের ভূগর্ভে কবর দেওয়া হইত আদিযুগে, আংশিক কবর পরবর্তী যুগে এবং মৃৎপাত্রে অস্থি রাখিয়া কবর দেওয়ার প্রথা অন্তিম যুগে প্রচলিত ছিল।

ভারত সরকারের নৃতত্ত্ববিৎ ডাঃ বি, এস, গুহ মহাশয় হারাপ্পার কবরস্থানে প্রাপ্ত মাথার খুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। তিনি বলেন—হারাপ্পার লোকের বৃহৎ মস্তক, প্রশস্ত বক্ষ, দীর্ঘ মুখ এবং লম্বা নাসিকা ছিল। প্রাচীন মিশর এবং মহেঞ্জোদারোর লোকের চেহারাও তাঁহার মতে এইরূপ ছিল। আদি যুগে সিন্ধুনদীর উপত্যকার সহরগুলিতে একই জাতি বাস করিত এবং পরে যখন এই সকল সহরে অন্যান্য দেশের লোকের যাতায়াত আরম্ভ হইল তখন জাতির সংমিশ্রণ হইতে লাগিল এবং তৎসঙ্গে স্থানীয় লোকের আকৃতির পরিবর্তন ঘটিল। বর্ণসঙ্কর হয়ত সেই যুগে ছিল না কিন্তু জাতি-সঙ্কর যে ছিল তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

মহেঞ্জোদারোর ন্যায় হারাপ্পাতে অশ্ব পাওয়া যায় নাই। যে সকল পশু প্রচলিত তাহাদের সংখ্যাধিক্যানুযায়ী যথাক্রমে নাম দেওয়া হইল : ষাঁড়, ছাগল, ব্যাঘ্র, সিংহ, হস্তী, শূকর, কুকুর ও বানর। মহেঞ্জোদারোতে বিড়াল ছিল না—কিন্তু হারাপ্পাতে বিড়াল ছিল। হারাপ্পাতে কাঠ-বেড়ালী, সাপ ও বেজী, কুম্ভীর, কচ্ছপ, মাছ, হাঁস, ময়ূর, মুরগী, চিল, পায়রা, ঘুঘু, তোতাপাখী ইত্যাদি ছিল। খেল্‌নার বাঁশীতে (toy-whistle) ঘুঘুর চিত্র আছে।

হারাপ্পাতে অসংখ্য লিঙ্গম্ ও যোনী পাওয়া গিয়াছে। কতকগুলি এক ধাতুর, অন্যগুলি ভিন্ন ধাতুর। প্রস্তর ও ধাতুনির্মিত লিঙ্গম্‌গুলির আকারও বহু প্রকার। তাহাদের উচ্চতা সাধারণত অর্ধ ইঞ্চি হইতে কিঞ্চিদধিক পাঁচ ইঞ্চি পর্যন্ত। হারাপ্পাতে প্রাপ্ত বৃহত্তম লিঙ্গমটী পাংশুবর্ণ বালিমিশ্রিত পাথরের তৈরী, ১৭॥০ ইঞ্চি উচ্চ, তলায় ৯ ইঞ্চি ব্যাস। একটী বৃহৎ মাটীর জারে অন্যান্য দ্রব্যের সহিত ছয়টী লিঙ্গম্



কচ্ছপ ও ক্ষুদ্রপাত্রাদিপূর্ণ মৃৎপাত্র—হারাপ্পা

পাওয়া গিয়াছে ; তন্মধ্যে বৃহত্তমটী প্রায় ১০ ইঞ্চি উচ্চ এবং মূলে প্রায় ৫॥০ ইঞ্চি ব্যাস। হারাপ্পাতে পোড়ান মাটীর লিঙ্গমও সাধারণে ব্যবহার করিত। স্যার জন মার্শ্যাল এবং ডক্টর ম্যাকে তাঁহাদের উপরোল্লিখিত গ্রন্থদ্বয়ে মহেঞ্জোদারো এবং হারাপ্পাতে প্রাপ্ত লিঙ্গম্‌গুলির সাদৃশ্যও দেখাইয়াছেন।

মহা শস্যভাণ্ডারই (Great Granery) হারাপ্পার সর্বাপেক্ষা দ্রষ্টব্য এবং বিশাল গৃহ। যখন টাকা পয়সা সৃষ্ট হয় নাই এবং শস্যাদির দ্বারা কর প্রদান ও মূল্য প্রদান হইত তখন সরকারী ধনাগার (treasury) শস্যভাণ্ডাররূপেই ছিল। প্রাচীন ক্নোসাস্ (cnossus) এবং ক্রীটে (crete)ও হারাপ্পার ন্যায় সরকারী শস্যভাণ্ডার ছিল। ক্নোসাসের মিনোয়ান (minoan) রাজপ্রাসাদে এবং ক্রীট দ্বীপের ফীষ্টাস্ (phaestus) রাজপ্রাসাদের সঙ্গে এইরূপ ধনাগার সংযুক্ত ছিল। স্যার জন মার্শ্যাল এক পত্রে শ্রীমাধোস্বরূপ বৎসকে লিখিয়াছিলেন যে, ইংলণ্ড এবং জার্মেনির রোমান দুর্গগুলির গৃহাদি হারাপ্পার শস্যভাণ্ডারের

সদৃশ এবং বিশেষতঃ রোমান দুর্গস্থিত একটী শস্যাগারের সহিত হারাপ্পার শস্যাগারের সাদৃশ্য বিস্ময়কর। হারাপ্পার শস্যাগারটী পূর্ব-পশ্চিমে ১০৬ ফুট এবং উত্তর-দক্ষিণে ১২০ ফুট। এই গৃহটীর মধ্যে ৫১ ফুট ৯ ইঞ্চি দীর্ঘ ১৪টী সমান্তরাল প্রাচীর আছে। এই সকল প্রাচীর বা দেওয়াল পশ্চিম দিকে যাতায়াতের বিস্তৃত ২৪ ফুট চওড়া রাস্তায় শেষ হইয়াছে। এই রাস্তার পরেই আবার এক সারি দেওয়াল। দেওয়ালগুলির অধিকাংশই আগুনে পোড়ান এবং রৌদ্রে শুষ্ক—এই দুই প্রকার ইঁটের দ্বারা নির্ম্মিত। শস্যাগারের মেজে ছিল কাঠের। সমগ্র মহাশস্যাগারটী ছয়টী হলে (Hall) বিভক্ত। ছয়টী হলের মধ্যবর্ত্তী ৫টী যাতায়াতের রাস্তা আছে। প্রত্যেক হল ৫১ ফুট ৯ ইঞ্চি দীর্ঘ, ১৭ ফুট ৬ ইঞ্চি প্রস্থ। প্রত্যেক হল এক একটী শস্যভাণ্ডার। প্রত্যেক হল সমদীর্ঘ তিনটী দেওয়াল দ্বারা ৪টী গৃহে বিভক্ত। এই দেওয়ালগুলি কাষ্ঠনির্ম্মিত মেজের সহিত এইরূপে সংযুক্ত যে, তাহাদের মধ্য দিয়া বায়ু প্রবেশের পথ আছে। শস্যগুলি গরমে পাছে নষ্ট হইয়া যায় সেইজন্য বায়ু গমনাগমনের নিমিত্ত এই প্রকার পথ ছিল। ভাণ্ডারে শস্য সঞ্চয় করিবার পথও নির্দিষ্ট



অদ্ভুত মাটীর কবর—হারাপ্পা

ছিল। রোমান শস্যাগারগুলিতেও এই বায়ু-দ্বার ছিল। স্যার জন মার্শ্যাল রোমান শস্যাগারগুলি স্বচক্ষে পরিদর্শন করিয়া হারাপ্পার এই সুবৃহৎ গৃহকে শস্যাগার বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। মহাশস্যভাণ্ডারের এক-তৃতীয়াংশ একটী বহিঃপ্রাকার দ্বারা পরিবেষ্টিত, কিন্তু দুই-তৃতীয়াংশ অনাবৃত। ভাণ্ডারের যে অংশ প্রাকার-বেষ্টিত সেই দিকে বোধহয় মেজে নষ্ট হইবার বিপদাশঙ্কা ছিল। সেই জন্যই এই বহিঃপ্রাকার দেওয়া। বহিঃপ্রাকারটী অল্প উচ্চ এবং ভূগর্ভে প্রোথিত এবং শস্যাগারের ভিত্তির সমান উচ্চ ছিল।

হারাপ্পাতে যে সকল প্রাচীন দ্রব্য আবিষ্কৃত হইয়াছে তন্মধ্যে শীল (seal) গুলিই সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান। সর্ব্বশুদ্ধ ছোট বড় ৯৭৪টী শীল পাওয়া গিয়াছে। শীল সমূহের কতকগুলি চতুষ্কোণ এবং কতকগুলি অন্য প্রকারের। চতুষ্কোণ শীলগুলি প্রায় এক ইঞ্চি। কতকগুলি শীল ছাপ দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হইত এবং পোড়ান মাটীর নির্ম্মিত। সকল শীলের উপরে দুইটী শিং বিশিষ্ট পশুর চিত্র আছে এবং পশুর মাথার নীচে একটী ধূপদানী। পশুর পৃষ্ঠে জিন, গলায় কয়েকটী বালা, এবং একটী গলহার। ধূপদানীর আকার এইরূপ: উপরে ও নীচে দুইটী পাত্র একটী কেন্দ্রীয় দণ্ড দ্বারা বিধৃত। নিম্নের পাত্রটীতে আগুন এবং ঊর্দ্ধের পাত্রে ধূপ, সুগন্ধি কাষ্ঠাদি দেওয়া হইত। নিম্ন পাত্রের আগুন উপরের পাত্রটীকে উত্তপ্ত করিত এবং সেই উত্তাপে ধূপ ধীরে ধীরে পুড়িয়া যাইত। ধূপকে একেবারে আগুনে না ফেলিয়া এইরূপে পোড়াইলে অধিক পরিমাণে এবং অধিক সময় সুগন্ধ পাওয়া যায়। স্যর জন মার্শ্যাল সাহেবের মতে ধূপদানীটা হারাপ্পাতে পূজ্যবস্তুরূপে প্রচলিত ছিল। শ্রীমাধোস্বরূপ বৎস আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া বলেন যে, পূর্ব্বে ধূপদানীকেই পূজা করা হইত এবং পরবর্ত্তী যুগে পশু-পূজার সঙ্গে ইহা সংযুক্ত করা হইয়াছে।

কতকগুলি শীলের উপরে আফ্রিকান হস্তী, ব্রাহ্মণী বৃষ, ব্যাঘ্র, মহিষ, ঈগল পাখী ও খরগোস প্রভৃতি মূর্ত্তি ক্ষোদিত আছে। একটী শীলের উপরে ইংরাজি অক্ষর 'T' টির সহিত স্বস্তিক এর চিত্র দেখা গিয়াছে। আর একটী শীলে একটী অদ্ভুত জন্তুর চিত্র আছে। জন্তুটী পৌরাণিক এবং বিভিন্ন জন্তুর সংমিশ্রণে উৎপন্ন (hybrid) বলিয়া মনে হয়। জন্তুটীর মুখ মানুষের, পশ্চাদ্ভাগ হস্তীর, শিং বৃষের, অগ্রভাগ ভেড়ার, মধ্যভাগ বাঘের মত এবং পুচ্ছ পাড়া। ছোট ছোট শীলের উপরে পশ্বাদির চিত্র নাই—অন্যপ্রকার রহস্যময় রেখাদির অঙ্কন আছে। সম্ভবতঃ এইগুলি কবচ (Amulet) রূপে ব্যবহৃত হইত। শীলগুলি আকৃতি ত্রিভুজ, বৃক্ষ-পত্র, মৎস্য, কচ্ছপ, খরগোস, অর্দ্ধচন্দ্র ইত্যাদি।

হারাপ্পার গৃহ-ব্যবহৃত দ্রব্যগুলিও বহু প্রকারের। অধিকাংশ দ্রব্যই মৃত্তিকা ও প্রস্তরনির্ম্মিত। প্রস্তরের নানাপ্রকার ওজন (weights) ছিল। ডক্টর ম্যাকে প্রমাণ করিয়াছেন যে, এইপ্রকার ওজন মেসোপোটেমিয়া, মহেঞ্জোদারো, মিশর ও ইলামে ব্যবহৃত হইত। এক রকমের স্কেল পাওয়া গিয়াছে যাহার দ্বারা দশমিক রীতিতে (Decimal) দীর্ঘ, প্রস্থ বা উচ্চতা সরল রেখায় মাপা যাইত। নানা প্রকারের প্রদীপ, চেরাক, টাইল (tile), রুটী বেলিবার চকোলা ও মাটীর পাত্রাদি গৃহ-দ্রব্য ছিল। টাইলগুলির দৈর্ঘ্য ১০ ইঞ্চি, প্রস্থ ৮½ ইঞ্চি এবং পুরু ১½ ইঞ্চি। টিনের অভাব ছিল কিন্তু পিতল ও তাম্রের ব্যবহার অধিক ছিল। ছুঁচ (neddle), ছোরা (dagger), lance. spear, Chisel প্রভৃতি প্রধানতঃ তাম্র-নির্ম্মিত ছিল। তাম্রের সঙ্গে টিন, আরসেনিক, সীসা, নিকেল, লোহা ও জিঙ্ক প্রভৃতির ভেজাল মিশ্রিত হইত। সুন্দর রৌপ্য পাত্র পাওয়া গিয়াছে। পাত্রগুলিতে কারুকার্য আছে। মালার দানা (beads) পাথরের ও ষ্টীটাইটেরও পোড়া (Steatite) হইত। দানার উপর সূক্ষ্ম চিত্রাদি করা হইত। মালার ব্যবহার সকলেই করিত। মাটীর দানাগুলি নানা আকৃতির যথা লম্বা, গোল, চারকোনা, দাঁতের মত ইত্যাদি। মালার দানা হাতী দাঁতের, সোনার এবং রৌপ্য দ্বারা তৈয়ারী হইত। এই সকল দুর্মূল্য মালা ধনী লোকেরাই ব্যবহার করিত। মিঃ এইচ, সি, বেক (Beck) সাহেব মেসোপোটেমিয়া এবং হারাপ্পার মালার দানা তুলনা করিয়া বলিয়াছেন যে, এই দুই প্রাচীন সভ্যতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। বেক সাহেবের মতে এই দুই সভ্যতা কোন অধুনা-লুপ্ত তৃতীয় সভ্যতার সমন্বিত হয়েছিল।

হারাপ্পার নরনারীগণ নানাপ্রকার অলঙ্কার ব্যবহার করিত। সোনা বা রূপার অলঙ্কার অধিক ছিল না—অধিকাংশই ছিল পোড়া মাটীর। পোড়া মাটীর অলঙ্কার এখনও কোন কোন প্রদেশে দরিদ্র রমণীগণ অঙ্গে ধারণ করে। হারাপ্পার রমণীগণ নাকে, মাথায়, কপালে, কানে এবং হস্তাঙ্গুলিতে অলঙ্কার ব্যবহার করিত। আংটীগুলি সাধারণতঃ তাম্র ও সোনার ছিল। হারাপ্পায় নানাপ্রকার খেলনা (playthings) এবং

খেলা (games) ছিল। খেলনাগুলি সাধারণতঃ মাটীর তৈরী। মাটীর গাড়ী, রথ, বাস্কেট, চাকা, পাখী, পাখীর খাঁচা, পশু প্রভৃতি মাটীর খেল্‌না এবং তাম্রনির্ম্মিত খেলনা রথও ছিল। খেলনা-বৃষগুলির মাথা নড়িত। পাখীর মত বাঁশী ছেলেরা বাজাইত। হারাপ্পাতে বল, মার্বেল, পাশা প্রভৃতি খেলা (games) প্রচলিত ছিল। মহেঞ্জোদারো ও হারাপ্পার লোকে পাশাখেলা (অক্ষ-ক্রীড়া) উত্তমরূপে জানিত। পাশা মাটীর ও পাথরের উভয় প্রকারের তৈয়ারী হইত। মিশরের পাশার সঙ্গে এই সকল পাশার খুব সাদৃশ্য আছে। চিরুণী, বেড়ান ছড়ি (walking stick), চুলের কাঁটা (hair-pins), সূঁচ, সূতার দ্রব্য, গম, বার্লি, মটর, তিল, খেজুর, তরমুজ, নেবু, নারিকেল, পদ্ম-ফল (lotus-fruit), বাঁশ, দেবদারু, ধাতু প্রভৃতি হারাপ্পাতে ছিল ও ব্যবহৃত হইত। পাকা ইঁটের ঘর ব্যতীত কাঁচা ইঁটের ঘরও ছিল। কাঁচা ইঁটের এখনও নানাস্থানে দেখা যায়। মহেঞ্জোদারোর এবং হারাপ্পার শিল্প একই প্রকার।

হারাপ্পায় আর যে সকল বস্তু পাওয়া গিয়াছে তাহাদের কয়েকটীর নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল: একপ্রকার কৃত্রিম মৃত্তিকা নির্ম্মিত কানফুল (ear-button), নাকফুল, ও হাতের বালা; তামা ও পিতল মিশ্রিত ধাতুর আয়না বা আর্শি (প্রত্যেক কবরে মৃতদেহের পার্শ্বে ইহা রাখা হইত); তামার সুর্ম্মাচি (চোখে সুরমা লাগানর কাঠি, তাম্রনির্ম্মিত ক্ষুর, সূঁচ (needle) কজ্জা, কাঠ কাটিবার কুড়ুল; ভাত খাইবার জন্য মাটীর থালা; মাটীর তৈলপাত্র ও লবণপাত্র ও জলপাত্র ও ফলপাত্র; তামার ছোট বড় নানারকমের পাত্র; শ্বেত পাথরের ও কাল পাথরের নানাপ্রকার শিবলিঙ্গ; চাউল ডাল প্রভৃতি সঞ্চিত রাখিবার জন্য বড় বড় মাটীর পাত্র; মশলা বাটিবার জন্য পাথরের শিল-নোড়া, পাকা ইঁটের উপর পদচিহ্ন, পাথরের বড় হস্তীমস্তক ও যোনি; মাটীর ধূপদানি, চামচে, দীপদানি খেল্‌না-পিঞ্জরা (toy cage for birds); শঙ্খ ও শঙ্খ নির্ম্মিত চামচে; হাতী দাঁতের চিরুণী ও পেয়ালা (cup) ও পাশা (dice); শতকরা একশত ভাগ সোনার চূড়ী ও হার এবং অন্যান্য অলঙ্কার; বাঘ, বানর, গণ্ডার, হস্তী, কচ্ছপ, ময়ূর ও দুর্গামূর্ত্তি এবং নানাপ্রকারের যোগাসন প্রভৃতি মাটীর খেল্‌না; ৩।৪টী গভীর কূপ; ৬।৭টী আগুন জ্বালিবার furnace, piotograph বা চিত্রলিপিযুক্ত মাটীর পাত্র এবং কয়েকটী বড় বড় যজ্ঞ-বেদী ইত্যাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

গুপ্তযুগের নানারকমের বস্তু ও মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। এইস্থানের মাটী এত হাড় মিশ্রিত যে, হারাপ্পার আদিম অধিবাসীগণ মাছমাংস খাইতেন বলিয়া মনে হয়। যে সকল গৃহ আবিষ্কৃত হইয়াছে সেগুলি উপর্য্যুপরি আটটী স্তরের। প্রথম স্তরের গৃহগুলি কোন দৈবদুর্বিপাকে নষ্ট হওয়ায়



মৃৎপাত্রে শিশুদের কবর— হারাপ্পা

স্থানটী জনশূন্য ও পরিত্যক্ত হয় এবং ২।৩ শতাব্দী পরে আবার মানুষ আসিয়া তথায় বসবাস ও গৃহনির্ম্মাণ করে। এইরূপে সহরটী আট বার নষ্ট ও পুনর্নির্মিত হয়। নূতন আধুনিক হারাপ্পা সহরের অধিকাংশ গৃহই প্রাচীন গৃহের ইঁট দ্বারা তৈয়ারী। পূর্বকালে ইরাবতী নদীর তীরেই সহর অবস্থিত ছিল। কূলপ্লাবী বন্যার ফলেই সম্ভবতঃ সহরটী আটবার ধ্বংস হইয়াছিল। এখন সহর হইতে ছয় মাইল দূরে ইরাবতী নদী চলিয়া গিয়াছে।

মিস্ অ্যাকসিডেণ্ট

শ্রীযামিনীমোহন কর

গোবর্দ্ধন প্রেমে পড়েছে। পাত্রীটির মুখচেনা কিন্তু তার নাম জানে না। রোজই ট্রামে দেখা হয়। হঠাৎ নয়, একটু চেষ্টা করে। গোবর্দ্ধনের প্রেম পাত্রী মেডিক্যাল কলেজের নার্স এবং অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান। তাতে কি। গোবর্দ্ধনও স্যুট পরে, পাইপ টানে। পৈত্রিক নাম গোবর্দ্ধন বন্দ্যোপাধ্যায়; হয়ে গেছে গ্যাবারডীন ব্যাণ্ডো।

আলাপ কি করে করা যায়। ভেবে ভেবে উপায় বার করলে। অ্যাকসিডেণ্ট। হাসপাতাল। তারপর সেই সুন্দরী নার্সের সুকোমল হস্তের সেবা। পরিচয়। প্রেম। যেন ফিল্মের ছবি, একের পর এক।

গোবর্দ্ধন ঠিক করলে মেডিক্যাল কলেজের সামনে আহত হতে হবে। অবশ্য একটু সামলে। হত হলেই সব ফেঁসে যাবে। দু'দিন নার্সটী ট্রাম থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে সে আহত হবার চেষ্টা করলে। কিন্তু ফসকে গেল। ফলে কেবল গালমন্দ জুটল। নতুন শুভ্র পাতলুনে কাদার ছিটে।

তৃতীয় দিনে সফল হল। ট্রাম থেকে নামতেই মিলিটারী লরীর ধাক্কা। অবশ্য সামান্য। কিন্তু তাতেই সে পড়ল ছিটকে। সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান। জ্ঞান হতে চোখ মলে চেয়ে প্রশ্ন করলে— "আমি কোথায়?" উত্তর এল—"হাসপাতালে। হাত ভেঙ্গে গেছে। নড়বেন না।"

তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে গোবর্দ্ধন জিজ্ঞেস করলে— "মেডিক্যাল।"

"না। কারমাইকেল।"

"দুত্তোর" বলে গোবর্দ্ধন আবার অজ্ঞান হয়ে পড়ল।

শতাব্দীর শিল্প—ভাস্কর্য্য

শ্রীঅজিত মুখোপাধ্যায় এম-এ (লণ্ডন) এফ-আর-এ-আই (লণ্ডন)

ক্রমশই ভাস্কর-শিল্প জনসাধারণকে আকৃষ্ট করে তুলছে এবং ফলে একদিকে যেমন হয়েছে বহুমূর্ত্তির গঠন, তেমনি হয়েছে একদল বলিষ্ঠ ভাস্কর-শিল্পীর উদ্ভব। এই বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পজগতে ভাস্কর্য্যের নানাভাবে আলোচনাও সুরু হয়েছে। সাধারণে ভাস্কর-শিল্পের রসগ্রহিতা শিল্পজগতে স্বাস্থ্যের লক্ষণ সূচনা করে—কেননা বর্ত্তমান শতাব্দীর নাগরিক সভ্যতার সঙ্গে এর মূল্য স্থিরীকৃত হবে। সুতরাং ভাস্কর্য্যের আলোচনায় গোড়াতেই কি আদর্শে মূর্ত্তিগুলি অনুপ্রাণিত হয় তা দেখা দরকার।

বিস্তৃতভাবে আলোচনার পূর্ব্বে একজন বিখ্যাত সমালোচক এ সম্বন্ধে কি বলেছেন তা উদ্ধৃত করা একান্ত প্রয়োজন। তাঁর মতে, "The very fact that the sculptor of to-day is a man whose emotional unrest and nervous energy force him to the task causes his work to show a tendency to strain and tumult. It is created rapidly as the gosts of mighty forces move him : there is the vision, the struggle—the moment is past—the work as far as he is concerned is ended. He has no responsibility to a waiting public. His statue may leave the studio wanting a head or a limb...if the essential message is there, if it bears witness to the emotions in himself which it called forth, his end is achieved and his exhausted spirit stirs faintly towards the next effort instead of fondly perfecting the fruits of the last. Does the modern method result in a series of masterpieces or only in the presentation of a series of masterly ideas?"



সাইরেন্ —কার্ল মাইলস্



কিন্নর ও কিন্নরী —পল্ ম্যান্সিপ্

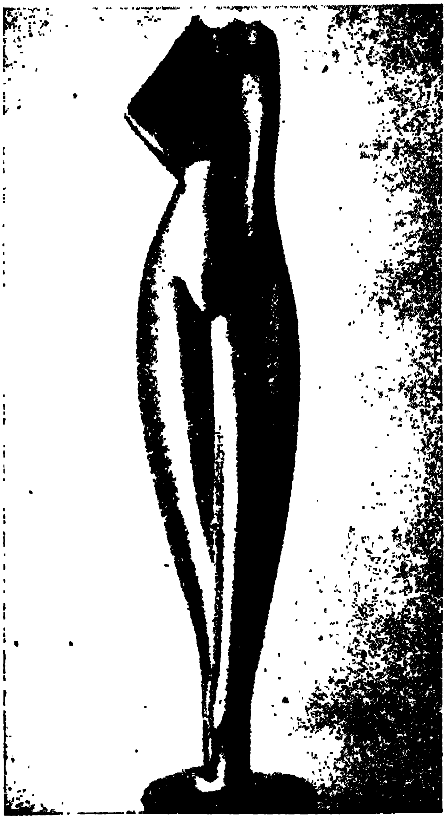
এই উক্তির সংক্ষেপ বিশ্লেষণে আমাদের মনে এই প্রশ্ন জাগে—যে কোন শিল্পী ভাস্কর্য্যে কি তার নিজস্ব ভাব ও আবেগ প্রকাশ করবার চেষ্টা করে, কিংবা তার আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক মনের ছাপ রেখে যায় অথবা মূর্ত্তিগুলির গঠনে শিল্পীর ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠা একান্ত নিষ্প্রয়োজন।

ভাস্কর্য্যে এই প্রশ্ন পৃথিবীর মতই আদিম। কোন সমালোচকের ইহা আবিষ্কার নয়। গল্প আছে যে গ্রীক-শিল্পী এপিলিস্ তাঁর ছবির প্রদর্শনী করে নিজেকে লুকিয়ে রাখতেন জনসাধারণের সমালোচনা শোনার জন্তে। যখন কেউ এসে বলত, "এ ছবি ভুল করে আঁকা হয়েছে," "ও ছবির রং ঠিকভাবে দেওয়া হয়নি" তখনই এপিলিস্ নোটবুকে তাঁর ছবির সমালোচনা-গুলি লিখে রাখতেন এবং বাড়ীতে এসে ঠিক সমালোচকদের মতানুযায়ী ছবি এঁকে প্রদর্শনীতে পাঠিয়ে দিতেন। শেষে দেখা যেত সেই জনসাধারণই সংশোধিত ছবিখানির চেয়ে এপিলিসের আঁকা নিজস্ব ছবির বেশী তারিফ করেছে।

স্থতরাং দেখা যায় শিল্পে শিল্পীর ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠা আধুনিক আবিষ্কার মোটেই নয়। কথাটিতে এও বোঝায় না যে শিল্পীর ভাব বা আবেগ যা তার একান্ত নিজস্ব তা শিল্পে ফুটিয়ে তোলাই একমাত্র উদ্দেশ্য। এপিলিসের দৃষ্টান্তে এই বোঝায় যে জনসাধারণের বাঁধা-ধরা নিয়মের মধ্যে শিল্পী যেন নিজেকে আবদ্ধ না করে। সে যে বিষয়বস্তু যে দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখেছে ঠিক সে ভাবে সেই বিষয়-বস্তুকে ফুটিয়ে তোলাই তার একান্ত কর্ত্তব্য—এখানে শিল্পীর ব্যক্তিগত ভাব ও অভাবের কোন প্রশ্নই ওঠে না।

ভাস্কর শিল্পেও ঐ একই ব্যবধান। আমাদের পছন্দ ও অপছন্দের মধ্যে রয়েছে 'a series of masterpieces' এবং 'a series of masterly ideas'. পৃথিবীর অন্তর্নিহিত ভাব ও শক্তি থেকে উৎপন্ন যে শিল্প আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে অনুপ্রাণিত করে সে শিল্প উঁচুদরের এবং যে করতে পারে না তা নিম্নস্তরের।

মাইকেল এঞ্জেলো, বত্তিচেলী, রেঁণো, ডেগাস্ এবং রোঁদা প্রভৃতি সব শিল্পীই জানতেন যে উঁচুদরের শিল্প সৃষ্টি করতে হলে নিজেদের ব্যক্তিগত উচ্ছ্বাসকে জলাঞ্জলী দিতে হয়। আবার এও বুঝতেন যে ভাবোচ্ছ্বাস এবং গভীর আধ্যাত্মিক প্রেরণার অভাবে কোন উঁচুদরের শিল্প সৃষ্টি অসম্ভব। সুতরাং সত্যিকারের শিল্প কোন ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়। বিশেষভাবে ভাস্কর্য্যে ত' মোটেই



দেহ (প্রশস্ত) —আলেকজাণ্ডার



দেহ (শ্বেত) —আর্কিপেঙ্কো

নয়। কেননা মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে এর সম্বন্ধ ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। আমাদের ঘর বাড়ী নগর-নগরীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রসাধন হচ্ছে—ভাস্কর্য্য। গত দু'শ বছরের মধ্যে স্থাপত্যে ভাস্কর্য্যের যে চাহিদা বেড়েছে তা' বিস্ময়কর এবং সঙ্গে সঙ্গে ভাস্কর শিল্পেও নানারকম পরীক্ষামূলক কাজ সুরু হয়েছে।

এই হিসাবে ১৯৩০ সনের পূর্ব্বেকার জার্ম্মানীর শিল্পীগণ বিংশশতাব্দীর ভাস্কর্য্যে বিশেষভাবে অগ্রণী। তাঁরা ভাস্কর শিল্পে যে নূতন আন্দোলন এনেছিলেন তার সুস্পষ্ট পরিণতি অনেক সময়

আবার অন্যদেশে দেখা গিয়েছে। এখানকার ভাস্কর শিল্পীদের একটা ছোট দল এক নূতন দৃষ্টি-ভঙ্গী দিয়ে গভীরভাবে ভাস্কর্য্য সাধনায় ব্রতী হন। এই শিল্পীদের মধ্যে হেরম্যান ওব্রিষ্ট, কাল হেরম্যান, রুডল্‌ফ বেলিং এবং ওসোয়াল হেরজগই শ্রেষ্ঠ কারিগর।



মডেল (নারী)

এবং দৃষ্টিভঙ্গীও এদের প্রায় এক। তাদের প্রত্যেকেরই প্রধান উদ্দেশ্য স্থাপত্যের সঙ্গে ভাস্কর্য্যের যোগাযোগ স্থাপন করা।

প্রাচীন ভারতীয় মন্দির, ডোরিক কিংবা আইওনিক্‌ মন্দির-গুলি দেখলেই স্পষ্ট বোঝা যায় স্থাপত্য শিল্পজগতে কিভাবে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করতে সক্ষম। জার্ম্মাণ-শিল্পীগণও এই সত্য উপলব্ধি করেছিলেন যে স্থাপত্য হচ্ছে স্তব্ধ সঙ্গীত এবং ভাস্কর্য্যের মতই ভাব প্রধান। আধুনিক নাগরিক সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে ভাস্কর্য্য স্থাপত্যে স্থান পেয়েছে সত্য কিন্তু তা' মোটেই—বিজ্ঞান-সম্মত নয়; সৌধপ্রাসাদে মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা হয়েছে কিন্তু স্থপতি শিল্পের নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি ও ভঙ্গীর সঙ্গে তার কোন যোগাযোগ নেই। সাধারণতঃ বাইরে থেকে মূর্ত্তিগুলি তৈরী করা হয় এবং পরে ঘরের যে অংশ খালি রাখা হয়েছিল সেখানে বসিয়ে দেওয়ার প্রথা এতদিন চলে এসেছে। এর ফলে মূর্ত্তিগুলির সঙ্গে পারিপার্শ্বিক অবস্থার কোন আত্মীয়তা নেই, কোন যোগাযোগ নেই, ঠিক যেন পরগাছা। শিল্পজগতে এই বেশ্যাবৃত্তি বর্ব্বরতার চরম নিদর্শন।

কিন্তু জার্ম্মাণ শিল্পীগণ দেখলেন যে স্থাপত্যে যে অতীন্দ্রিয় গুণটি আছে সেই গুণ ভাস্কর্য্যে আনা সম্ভবপর কিনা এবং তবেই



মডেল (পুরুষ)

সার্থক হবে ভাস্করদের শিল্প-সাধনা। তাদের মতে ভাস্কর শিল্পী যে কোন বস্তু থেকে তার শিল্পের প্রেরণা খুঁজতে পারে যদি সেই তৈরী মূর্ত্তি ভাবপ্রধান ও সুন্দর হয়। এই পরীক্ষা-মূলক কাজে শিল্পী হেরজগ সম্বন্ধে একজন সমালোচক বলেছিলেন, "he employs the human form only incidentally and recognizes a great cosmic principle in impersonal rhythm." ভাস্কর শিল্প সাধনায় এই মত যে খুবই গভীর ও বিদ্রোহাত্মক সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

ভবিষ্যৎ-এর ভাস্কর্য্য সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করবে যদি এই উক্তির সত্যতা নিরূপিত হয় যে স্থাপত্যের সঙ্গে পার্থক্য বজায় রেখেও মূর্ত্তিতে অতীন্দ্রিয় ভাব ও গুণ আনা সম্ভব।

এই হিসাবে হেরজগই একমাত্র শিল্পী যিনি সম্পূর্ণভাবে সাফল্যমণ্ডিত হতে পেরেছেন। তাঁর "দুঃখ" মূর্ত্তিটি মানুষের অবয়ব প্রকাশ করে বটে কিন্তু গঠনভঙ্গীতে এমন কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নেই যা ইন্দ্রিয়জ। যদিও মূর্ত্তিটি সম্পূর্ণভাবে অতীন্দ্রিয় কিন্তু রেখা বৈচিত্র্যে এমন একটা বিষাদ ও দুঃখের ভাব ফুটে উঠেছে যাতে মূর্ত্তিটি জীবন্ত বলে মনে হয় এবং এই মূর্ত্তি গঠনে স্থাপত্যের নিয়ম ধারার সঙ্গে কোন বিচ্যুতি ঘটে নি।

হেরজগের প্রায় অধিকাংশ মূর্ত্তিগুলিতে সঙ্গীতের রেশ সহজেই প্রশমিত হয়েছে কেননা সঙ্গীতের সঙ্গে স্থাপত্যের যে যোগাযোগ সেই সম্বন্ধ মূর্ত্তিগঠনে যে আনা সম্ভব তা হেরজগ্ শুধু তাঁর মতদ্বারা বিশ্লেষণ করেন নি, কার্য্যতঃ দেখাতেও সক্ষম হয়েছেন। হেরজগের মূর্ত্তিগুলির পশ্চাতে একদিকে যেমন তরুণ শিল্পীদের তথাকথিত আধুনিকতা নেই তেমনি অক্ষম শিল্পীদের অস্পষ্টতাও নেই। হেরজগের প্রধান উদ্দেশ্য ভাস্কর্য্যে মানুষের অবয়ব সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য না করেও কাল্পনিক রূপ দেওয়া যার প্রকাশ-ভঙ্গীতে সঙ্গীত ও স্থাপত্যের যোগাযোগ রয়েছে। সঙ্গীতের সুরের রেশে স্থাপত্যের গুণ পরিলক্ষিত হলেও মানুষের ভাব ও আবেগের সঙ্গে সঙ্গীত সম্পূর্ণভাবে বিচ্যুত নয় এবং যদিও সঙ্গীত মানুষের মনের ভাষাকে রূপ দেয় কিন্তু তাই বলে সঙ্গীতে শিল্পের বাস্তবতাও নেই। ইহা সম্পূর্ণভাবে কাল্পনিক। স্থপতি-শিল্প মানুষের আবেগ থেকে দূরে থাকলেও ইহা অপ্রত্যক্ষভাবে ভাব ও গতিকে প্রকাশ করে। কিন্তু ভাস্কর্য্যের সঙ্গে সব সময়ই জীবন্ত মূর্ত্তির যোগাযোগ রয়েছে এবং যেখানে ভাস্কর শিল্প বাস্তব থেকে দূরে সরে এসেছে সেখানেই ভাস্কর্য্যের সঙ্গে স্থাপত্যের ঘনিষ্ঠতা। হেরজগের মতেও, "If the human emotions latent in certain architectural forms are isolated and then combined in sculpture with musical qualities inherent in certain attitude of the human figure then, as a result, sculpture will be acting as a link between human beauty and the beauty of musical concepts on the one hand and between the human element of music and the emotional value of architecture on the other."



মর্ম্মর মূর্ত্তি —ফ্র্যাঙ্ক্ ডব্‌সন্



তীরন্দাজ —পল্ ম্যান্‌সিপ্

অনেক শিল্পীর কাছে আজ এই উক্তি নূতন বলে মনে হবে কিন্তু আধুনিক শিল্পী কার্ল মাইলস্, আলেকজাণ্ডার আর্কিপেঙ্কো, পল ম্যানসিপ্, ফ্র্যাঙ্ক্ ডব্‌সন্ প্রভৃতি ভাস্করেরা এই মতানুযায়ী মূর্ত্তিগঠন প্রচেষ্টায় ভাস্কর্য্য জগতে এক বিদ্রোহ আনা সম্ভব করে তুলেছেন।

ভাস্কর শিল্প আলোচনায় একটি কথার উল্লেখ একান্ত প্রয়োজন বলে মনে হয়। যে নরনারীদের মডেল হিসাবে ব্যবহার করে বহু শিল্পী আজ পৃথিবী বিখ্যাত হয়েছেন সেই সব মডেল প্রায়ই অজ্ঞাত এবং অখ্যাত। কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিত যে সব তরুণ তরুণী জীবনব্যাপী সৌন্দর্য্য সাধনায় শত শত শিল্পীর প্রাণে অনুপ্রেরণা দিতে সক্ষম হয়েছেন ভাস্কর্য্যে তার মূল্য যথেষ্ট।

জঙ্গম

বনফুল

২১

'তুমি' অঘোরে ঘুমাইতেছে। বিনিদ্র-নয়নে হাসি একা জাগিয়া আছে। ভাবিতেছে। রোজই ভাবে। ভাবে কোথায় সে ভাসিয়া চলিয়াছে, কি তাহার জীবনের পরিণাম। বিহার-পল্লীর একটা তুচ্ছ স্কুলের নগণ্য শিক্ষয়িত্রীরূপেই কি তাহার জীবনের অবসান হইবে? শঙ্করবাবুর আগ্রহাতিশয্যে সে আসিয়াছে, দেখিতে দেখিতে এতদিন কাটিয়াও গেল, ফল কি হইল? কিছুই না। শিক্ষার যে আদর্শ লইয়া সে আসিয়াছিল সে আদর্শে মনের মতো করিয়া একটা মেয়েকেও সে লেখাপড়া শিখাইতে পারিল না, শিখাইবার উপায় নাই। একপাল মেয়ে সাজিয়া গুজিয়া স্কুলে আসে যেন তাহারই মাথা কিনিবার জন্য। পড়াশোনায় কাহারও মন নাই। মেয়েদের অভিভাবকরাও এ বিষয়ে খুব সচেতন নন। দুদিন পরে তো বিবাহ হইয়া যাইবে লেখাপড়া কত আর শিখিবে। শঙ্করবাবুর খাতিরে, অনেকটা চক্ষুলজ্জা-বশত, যেন তাঁহারা মেয়েদের স্কুলে পাঠান। খানিকটা ফ্যাসানের খাতিরেও বটে। আজকাল সভ্য সমাজে টর্চ, হাতকাটা কামিজ, বাটারফ্লাই গোঁফের মতো মেয়েদের 'লিখাপড়ি' শেখানোটাও একটা ফ্যাসান হইয়াছে। 'বাংগালি' বাবুরা তাহাদের 'লেড়কি'দের লেখাপড়া শিখাইতেছেন—তাহাদের লেড়কিরাও শিখুক যতটা পারে—ক্ষতি কি। ইহাই অধিকাংশ লোকের মনোভাব। "আমরাই বা কম কিসে"—এ মনোভাবও কয়েকজন শিক্ষিত 'ফিলিং-ওলা' বিহারীর আছে। কিন্তু ওই 'ফিলিং'-দুষ্ট মনোভাবটুকুই আছে—যোগ্যতা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিতে হইলে যে আগ্রহ ও নিষ্ঠার প্রয়োজন তাহা নাই। স্কুলের ছাত্রীসংখ্যা বাড়াইয়া ইনস্পেকটারের কাছে বাহাদুরি লইবার জন্যই তাঁহারা ব্যগ্র। স্কুল কমিটির কে মেম্বার হইবে এবং মেম্বারদের মধ্যে কে সেক্রেটারি হইবে তাহা লইয়াই সকলে ঝগড়া করিয়া মরিতেছে, আর 'এস-ডি-ও'র খোসামোদ করিতেছে। তাহারা যে স্কুল এবং স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে সচেতন তাহা প্রমাণ করিবার একটিমাত্র উপায় তাহারা আবিষ্কার করিয়াছে—স্কুলের নানা খুঁত ধরিয়া গোপনে ইন্‌স্পেকটারের নিকট দরখাস্ত করা। খুঁতও সব অদ্ভুত ধরণের। সেদিন কে একজন লিখিয়াছে বিদ্যালয়ের হাতায় ঘাস গজাইয়াছে পরিষ্কার করানো হয় নাই—শিক্ষয়িত্রীর গাভীটিকে চরিবার সুবিধাদান করিবার জন্য কি স্কুলের হাতাটিকে জঙ্গলে পরিণত করা উচিত? মাসিক পনেরো টাকা কনটিনজেন্সির হিসাব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিবার জন্য একজন মোক্তার মেম্বার বদ্ধপরিকর। খড়ি, কাগজ, কলম, দোয়াত, নিব প্রত্যেকটি কবে কেনা হইয়াছে, কেন কেনা হইয়াছে, নির্ভরযোগ্য রসিদ আছে কি না, থাকিলেও এত ঘন ঘন কেনা হইয়াছে কেন—এই সব লইয়া তিনি তাঁহার শানিত আইনজ্ঞানের এমন সুতীব্র পরিচয় দিতেছেন যে হাসি উত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। লাইব্রেরিতে ভাল বই আনাইবার উপায় নাই। বিহারী লেখকের লেখা বিহারী প্রকাশকের প্রকাশিত বই সর্ব্বাগ্রে আনাইতে হইবে। তাহা কিনিতেই টাকা ফুরাইয়া যায়, ভাল বই কেনা হয় না। হাসি বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা বিরক্ত হইয়াছে—শুধু বিরক্ত নয়, অপমানিতও বোধ করিয়াছে তাহার প্রতি সকলের অনুকম্পা প্রদর্শনে। সকলের ভাবটা যেন—আহা স্কুলটা চলুক—আর কিছু না হোক একজন গরীব বিধবার অন্নসংস্থান হইতেছে তো, বেচারীর একটা ছেলেও আছে। স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের জন্য নয়, তাহাদের নিজেদের প্রয়োজনেও নয়—তাহার প্রতি দয়া-পরবশ হইয়া সকলে স্কুলটাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন! শিক্ষিত বিহারী মেম্বারগণ আবার আইনের কষ্টিপাথরে বারম্বার যাচাইয়া দেখিতেছেন মহিলাটি প্রকৃতই তাঁহাদের—অর্থাৎ বিহারীদের—দয়া পাইবার উপযুক্ত কি না। 'পাবলিক মানি' লইয়া ছিনিমিনি খেলা তো উচিত নয়! খুঁত ধরা পড়িয়াছে—সে 'হিন্দি নোইং' নয়। শঙ্করবাবু তাহাকে হিন্দি-পরীক্ষা পাশ করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছেন—পরীক্ষা পাশ করা অসম্ভব নয়—কিন্তু সে পরীক্ষা দিবে না। এই তুচ্ছ কাজের জন্য সে আর একবিন্দু শক্তি-ক্ষয় করিবে না। মৃন্ময়ের সহধর্ম্মিণীর এই কি উপযুক্ত কাজ? তাহার সঙ্কল্প মৃন্ময়ের সহধর্ম্মিণী হইবে সে—মৃন্ময়ের আদর্শকেই জীবনে সফল করিয়া তুলিয়া ধরিবে। কি সে আদর্শ? ত্যাগ। ন্যায়ের সমর্থন করিয়া অন্যায়ের প্রতিবাদ করা। প্রয়োজন হইলে তাহার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে হইবে, এমন কি জীবনও। এই ত্যাগের স্বপ্ন দেখিয়াই সে এই অপরিচিত পল্লীগ্রামে শিক্ষয়িত্রী হইয়া আসিয়াছিল। শঙ্কর তাহাকে বুঝাইয়াছিল নারীত্বের যে লাঞ্ছনার প্রতিকার করিতে গিয়া মৃন্ময় আত্মোৎসর্গ করিয়াছে সে লাঞ্ছনার সত্যকার প্রতিকার স্ত্রী-শিক্ষায়। এই স্ত্রী-শিক্ষা-বিস্তারে হাসি যদি সাহায্য করে, ইহার জন্য সে যদি সুখ সুবিধা স্বার্থ ত্যাগ করিতে পারে তাহা হইলেই মৃন্ময়ের আত্মা তৃপ্ত হইবে। স্বার্থত্যাগ করিতেই হাসি আসিয়াছিল। কিন্তু এখানে এতদিন কাটাইয়া সে অনুভব করিতেছে যে দেশের সমস্ত জনসাধারণকে মনুষ্যত্ব মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে বিচ্ছিন্নভাবে অবমানিত নারীত্বকে উন্নত করা যায় না। শঙ্করবাবু একা কি করিবে? গদাই দত্ত, নেকি মাড়োয়ারি, গুলাব সিং, প্রমথ ডাক্তার, সুখদেও মোক্তার যে স্কুলের পরিচালকবর্গ সে স্কুলের হাজার স্বার্থত্যাগ করিয়াও কিছু করা যাইবে না। পাষাণ প্রাচীরে মাথা কুটিলে প্রাচীরটা যদি ভাঙিয়া পড়িত মাথা কুটিতে আপত্তি ছিল না। কিন্তু হাসি বুঝিয়াছে মাথা কুটিয়া মাথা রক্তাক্ত করিয়া ফেলিলেও এ অনড় প্রাচীর নড়িবে না, তাহার কাণ্ড দেখিয়া লোকে শুধু হাসিবে। শুধু স্কুল কমিটির দোষ নয়—গভর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিভাগের আইনও প্রকৃত শিক্ষার অনুকূল নয়। ভিতরে 'পলিসি' আছে। হাসির স্বপ্ন ভাঙিয়া গিয়াছে। স্ত্রী-শিক্ষার নামে কতকগুলা বর্ব্বরের খোসামোদ করা কি ত্যাগ? ইহাতে কি মহত্ব আছে। ইহা

তো ভণ্ডামির নামান্তর—ত্যাগের ওজুহাতে নিজেকে খর্ব্ব করিয়াও নিশ্চিন্ত নিরাপত্তার মধ্যে কোন-ক্রমে বাঁচিয়া থাকা। ত্যাগ করিলে যে আনন্দ পাওয়া যায় সে আনন্দ সে একদিনের জন্যও পায় নাই। সমস্ত অন্তর ভরিয়া কেবল গ্লানি, ক্ষোভ আর হতাশাই তো হাহাকার করিয়া ফিরিতেছে। সে কি করিবে, কোথায় যাইবে, কোথায় গেলে শান্তি পাইবে! স্বার্থত্যাগ করিয়া আত্মত্যাগ করিয়া বৃহৎ একটা কিছু করিয়া স্বামীর আদর্শ অনুসরণ করিবার জন্য তাহার সমস্ত হৃদয় উন্মুক্ত হইয়া আছে—প্রয়োজন হইলে সে ছেলের দিকেও ফিরিয়া চাহিবে না। প্রতিদিন রাত্রে মৃত মৃন্ময়ের উদ্দেশ্যে এই একই কথা সে রোজ লেখে—আজও লিখিয়াছে—আজও সে তাহাকে আশ্বাস দিয়াছে—"তুমি অপেক্ষা কর, আমি প্রমাণ করিয়া দিব যে আমিও তোমার অনুপযুক্ত ছিলাম না—যে সিংহাসনে স্বর্ণলতাকে বসাইয়াছিলে সেখানে আমারও কিছু অধিকার আমি দাবী করিতে পারিতাম"—কিন্তু কি করিয়া প্রমাণ করিবে? কে তাহাকে পথ দেখাইয়া দিবে—কে তাহাকে সেই মহাদেবীর মন্দিরে লইয়া যাইবে যে মহাদেবীর পূজাবেদীমূলে আত্মোৎসর্গ করিলে অশান্ত হৃদয় শান্তিলাভ করে, অধন্য ধন্য হয়, অপূর্ণ-পূর্ণতা-লাভ করে? ধাত্রী পান্না, জোয়ান অব আর্ক যে পথে চলিয়াছিল কোথায় সে পথ?

বিনিদ্র-নয়নে হাসি ভাবিতেছিল। রোজই ভাবে।

২৮

"এই, নাও লে আও—"

খেয়াঘাটের নৌকাটা ঘাট ছাড়িয়া প্রায় নদীর মাঝামাঝি চলিয়া গিয়াছে এমন সময় অশ্বপৃষ্ঠে নটবর ডাক্তার নদীতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অন্য সময় হইলে জানকী মাঝি অবিলম্বে নৌকা তীরে ভিড়াইয়া নটবর ডাক্তারকে তুলিয়া লইত আজ কিন্তু সে একটু দ্বিধায় পড়িয়া গেল। প্রথমত নৌকায় নেকি মাড়োয়ারির একটা 'বরিয়াত' রহিয়াছে, দ্বিতীয়ত রহিয়াছেন স্বয়ং দারোগা সাহেব। ইহাদের মধ্যে কাহাকেও চটানো গরীব জানকীর পক্ষে শক্ত। নেকি মাড়োয়ারির কাছে আপদে বিপদে হাত পাতিতে হয়, তাছাড়া সুশৃঙ্খলায় 'বরিয়াত'টা পার করিয়া দিলে হয়তো কিছু বক্শিসও আজ মিলিতে পারে, আর দারোগা সাহেব তো স্বয়ং সম্রাটেরই প্রতিনিধি, তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করা রাজদ্রোহেরই সামিল। অথচ নটটু বাবুকে ফেলিয়া যাওয়াও যে অসম্ভব। গরীবের 'মাই-বাপ' তিনি। জানকী বেচারা একটু বিপদে পড়িয়া গেল। অনুমতির প্রত্যাশায় সে একবার নেকি মাড়োয়ারির দিকে একবার দারোগা সাহেবের দিকে চাহিল। নেকি মাড়োয়ারি চতুর লোক, সহসা 'হাঁ' 'না' কিছুই বলিল না। দারোগাজির সহিত নটবর ডাক্তারের ঠিক কি সম্পর্ক আছে জানা তো নাই, চট্ করিয়া কিছু একটা বলিয়া শেষে ফ্যাসাদে পড়িয়া যাইবার মতো বোকা লোক সে নয়। তাহার স্থূলকায় পুত্র 'কানাহাইয়া' চোখ পাকাইয়া জানকীকে নৌকা ভিড়াইতে মানা করিতে যাইতেছিল নেকি গোপনে পুত্রের গা টিপিয়া ইঙ্গিতে তাহাকে নিষেধ করিল। নেকি মাড়োয়ারির মনের ইচ্ছাটা অবশ্য নটবর ডাক্তারকে না লওয়া—লোকটা ঘোড়াসুদ্ধ লাফাইয়া নৌকাতে উঠিবে, বরিয়াত জিনিসপত্র সব লণ্ডভণ্ড হইয়া যাইবে। কিন্তু স্বমুখে অনিচ্ছা প্রকাশ করিবার মতো সাহস সে সংগ্রহ করিতে পারিল না। দারোগা সাহেব কি বলেন তাহা শুনিবার জন্য সোৎসুক বিপন্ন দৃষ্টি তুলিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। দারোগা সাহেব ন্যায়সঙ্গত কথাই বলিলেন।

"চলো তুম। ডাক্টর বাবু দেরি করকে আয়ে হেঁ পিছে যায়েঙ্গে—"

"এই, নাও ঘুরাও—"

বজ্রনির্ঘোষে নটবর আবার হাঁক দিলেন।

জানকী লগি ঠেলিতে ঠেলিতে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল ডাক্তারবাবুর পাহাড়ী ঘোড়াটা ঘাটে অধীরভাবে পরিক্রমণ করিতেছে। ঘোড়াটা দেখিয়া সহসা জানকীর মনে দুই বৎসর আগেকার একটা ছবি ফুটিয়া উঠিল। অন্ধকার গভীর রাত্রি, আকাশে ঘন-ঘটা, মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ স্ফুরিত হইতেছে, ঝড় উঠিয়াছে, বৃষ্টি পড়িতেছে। দুর্য্যোগ মাথায় করিয়া দুর্গম পথে এই পাহাড়ী ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া নটবর ডাক্তার ছুটিয়া চলিয়াছেন। তাহারই বাড়ির উদ্দেশে চলিয়াছেন। তাহার একমাত্র পুত্র জ্বরে অচৈতন্য। গরীব শুনিয়া হাঁসপাতালের ডাক্তারবাবু আসিতে রাজী হন নাই, কবিরাজ-জিও আসিলেন না, নটটুবাবু কিন্তু শুনিবামাত্র ঘোড়ার সওয়ার হইলেন, 'ঝড় ঝপটি' কিছু মানিলেন না, আসিয়া বিনা পয়সায় 'জক্সন' দিলেন, ঔষধ খাওয়াইলেন—ছেলে তাহার বাঁচিয়া গেল।

"আরে নাও ঘুরাতা হ্যায় কাহে ফের—"

জানকী আইনসঙ্গত ওজুহাত একটা খাড়া করিয়া ফেলিয়াছিল। বলিল নৌকায় জল জমিয়া গিয়াছে, জল তুলিয়া ফেলিবার পাত্রটা সে ঘাটে ফেলিয়া আসিয়াছে, সেটা না লইলে যদি জল বেশী জমিয়া যায়, মাঝ দরিয়ায় তাহা হইলে—কথাটা সে সম্পূর্ণ করিল না। নেকি শশব্যস্ত হইয়া বলিল, "নেই নেই লে লেও ভাই, দো পাঁচ মিনিট মে কেয়া হরজা হোয়ে গা—"

দারোগা সাহেব কিছু বলিলেন না। স্বল্পভাষী লোক তিনি। নৌকা আসিয়া ঘাটে ভিড়িল। নটবর ডাক্তার ঘোড়া হইতে না নামিয়া ঘোড়াসুদ্ধ লাফাইয়া নৌকায় উঠিলেন এবং জানকীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—"ক্যারে কানমে আজকাল কম শুনতা হ্যায়?" জানকী একটু কুণ্ঠিত হাসি হাসিল। নৌকায় চড়িয়াও ঘোড়ার পিঠ হইতে নটবর নামিলেন না। জানকী জল তুলিবার পাত্রটা লইয়া আসিল।

"রাম রাম ডাক্টার বাবু"

দন্ত বিকশিত করিয়া নেকি মাড়োয়ারি অভিবাদন করিল।

"রাম রাম—শেঠজির খবর কি, ছেলের বিয়ে না কি—"

"আপলোকা কিরপা"

দারোগা সাহেবও নটবরকে হাত তুলিয়া নমস্কার করিলেন।

প্রতি-নমস্কারান্তে নটবর বলিলেন, "আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ভালই হ'ল। আপনার কাছে যাব ভাবছিলাম "হরিয়াটার নামে কি আপনি বি-এল কেস করেছেন?"

"হ্যাঁ। ও ব্যাটা তো একের নম্বর লুচ্চা গুণ্ডা। শঙ্করবাবু জামিন হয়ে ছাড়িয়ে দিলেন, তা'না হলে ওই থেক্‌ট চার্জেই ফাঁসাতাম ওকে—"

নটবর ডাক্তারের ভ্রূ কুঞ্চিত হইল এবং অনেকক্ষণ কুঞ্চিত হইয়াই রহিল।

"বি-এল কেস প্রমাণ করতে পারবেন ওর বিরুদ্ধে ?"

"নিশ্চয়"

দারোগাবাবুর আত্মপ্রত্যয় দেখিয়া নটবর মনে মনে হাসিলেন, চক্ষুর্দ্বয় ঈষৎ বিস্ফারিত করিয়া তাঁহার দিকে চাহিলেন। চোখের দৃষ্টি যেন দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল—ও বাবা! হরিয়াটা কাল গিয়া তাঁহার কাছে কাঁদিয়া পড়িয়াছিল। তিনি তাঁহাকে আশ্বাস দিয়াছেন। যদিও নবাগত দারোগা সাহেবের সঙ্গে তেমন আলাপ নাই—তবু ভাবিয়াছিলেন তাঁহাকে একবার বলিলেই ব্যাপারটা মিটিয়া যাইবে বোধ হয়। এখন দেখিতেছেন লোকটির কর্ত্তব্যজ্ঞান বেশ টনটনে। এ ধরণের জীবরা ভদ্রলোকের মর্য্যাদা বোঝে না। ইহাদের কাছে কোন অনুরোধ করা বৃথা। আর কিছু বলিলেন না, ঘাড় ফিরাইয়া নদীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। চক্ষু দুইটি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। একটু হাসিও পাইল। হরিয়া লুচ্চা এবং গুণ্ডা! ছুঁচ এবং চালুনির গল্পটা মনে পড়িল।

২৯

উত্তেজিতভাবে নিপুদা আসিয়া প্রবেশ করিল।

"আমাকে তুমি মিছিমিছি আটকে রাখলে শঙ্কর, এখানে কোন কাজ করা অসম্ভব"

"আবার কি হল"

"রামলাল পড়বে না"

"কেন"

"বহু মাইজি মানা করেছে"

নিপুদা ঠোঁট বাঁকাইয়া হাসিল।

"বহু মাইজি মানে কুন্তলা ?"

"হাঁ হাঁ আবার কে। এম-এ পাশ করলে কি হবে, সেকেলে বুর্জোয়া সংস্কার কাটিয়ে উঠতে পারেননি এখনও। হাজার হোক বামুনের মেয়ে তো, কামারের ছেলে লেখাপড়া শিখছে বরদাস্ত করতে পারছেন না সেটা—"

নিপুদা কায়স্থ সন্তান, ব্রাহ্মণদের উপর ভীষণ রাগ, সুযোগ পাইলে ছোবল দিতে ছাড়েন না। নিপুদার কথায় ব্রাহ্মণ সন্তান শঙ্করের কান ঈষৎ গরম হইয়া উঠিল। কিন্তু কিছু বলিল না সে। নিপুদার চালচলন কথাবার্ত্তা কিছুই তাহার ভাল লাগে না, তবু তাহাকে সে যাইতে দেয় নাই। তাহার সমস্ত ঋণ শোধ করিয়া দিয়া তাহার বেতন বৃদ্ধি করিয়া অর্থাৎ একরূপ খোশামোদ করিয়াই আবার তাহাকে রাখিয়াছে। মনকে বুঝাইয়াছে নিপুদা না থাকিলে অনুন্নতদের উন্নত করিবার ভার কে লইবে। পল্লী-উন্নয়নের উহাই যে একটা প্রধান অঙ্গ। নিপুদার মতো উপযুক্ত লোক পাওয়া যাইবে না। এ পল্লীগ্রামে কেহ আসিতেই চাহিবে না। আসলে অসহায় নিপুদার প্রতি অনুকম্পা বশতই যে তাহাকে সে যাইতে দেয় নাই এ কথা নিজের কাছেও শঙ্কর স্বীকার করিতে চায় না। নিপুদা সত্যই উপযুক্ত লোক—অভাবের চাপেই মনটা বাঁকিয়া চুরিয়া গিয়াছে। শিক্ষিত লোক যে তাহা তো অস্বীকার করিবার উপায় নাই। নানা যুক্তি দিয়া নিজের মনকে বুঝাইয়াছে যে এ দেশের স্বার্থের জন্যই নিপুদার থাকা প্রয়োজন। যদি মন দিয়া কাজ করেন সত্যই অনুন্নত শ্রেণীর অনেক উপকার হইবে। ডোমপাড়ার নিরক্ষর ছেলে-মেয়েদের জন্য একটা পাঠশালা খাড়া তো করিয়াছেন। অনুন্নতদের উন্নত করিতে না পারিলে যে দেশের উন্নতি অসম্ভব তাহা শঙ্করের অনেক দিনের বদ্ধমূল ধারণা। তাহাদের জন্যই সে গ্রামে গ্রামে পাঠশালা করিয়াছে। স্বাস্থ্য যাহাতে ভাল থাকে তাহার যথোচিত ব্যবস্থা করিয়াছে। তাহাদের বাসস্থানের চতুর্দ্দিক পরিষ্কার করাইয়াছে, ভ্যাকসিন দেওয়াইবার জন্য কুইনিন বিতরণ করিবার জন্য চৌধুরীকে নিযুক্ত করিয়াছে। নিম্নশ্রেণীর একটি বালকের উচ্চশিক্ষার জন্য বৃত্তিস্থাপনও করিয়াছে। কামার কুমোর তেলি অথবা নিম্নতর কোন বর্ণের বালক যদি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় তাহা হইলে তাহাকে এম-এ পর্য্যন্ত পড়িবার খরচ উৎপলের ষ্টেট হইতে দেওয়া হইবে। বালকটির সহিত একটি সর্ত্ত থাকিবে কেবল—উপার্জ্জনক্ষম হইলে টাকাটা তাহাকে পরিশোধ করিয়া দিতে হইবে, সেই টাকায় ভবিষ্যতে যাহাতে আর একটি ছেলের পড়া হয়। নিম্নশ্রেণীর কোন বালক এতদিন ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষাই দেয় নাই। এই বৎসর ঝকসু কামারের পুত্র রামলাল ম্যাট্রিকুলেশন দিবে, পাশ করিতে পারিবে কি না তাহা অনিশ্চিত, কিন্তু তবু সে নিপুদা কর্ত্তৃক প্রবুদ্ধ হইয়া 'যদি'র উপর নির্ভর করিয়া বৃত্তিটি দাবী করিয়াছে। নিপুদার উদ্দেশ্য ক্যাপিটালিষ্ট উৎপল সত্য সত্যই টাকাটা দেয় কি না তাহা যাচাই করিয়া দেখা এবং উৎপল সত্যই যদি টাকাটা দিয়া ফেলে (সে বিষয়ে নিপুদার যথেষ্ট সন্দেহ ছিল) তাহা হইলে তাহা লইয়া ছোটলোক মহলে নিজের বেশ একটা প্রতিপত্তি বিস্তার করা। উৎপল বিনা দ্বিধায় রামলালের দাবী মঞ্জুর করিয়াছে। সমস্তই ঠিক ঠাক এমন সময় এক অপ্রত্যাশিত বাধা আসিয়া উপস্থিত। রামলালের পিতা ঝকসু হঠাৎ বাঁকিয়া বসিয়াছে। পুত্রকে সে আর 'আংরেজি' পড়াইবে না—বহু মাইজি বারণ করিয়াছেন! বহু মাইজির কথা তাহার নিকট বেদ-বাক্য।

কুন্তলার এই বিরুদ্ধতায় শঙ্কর বিস্ময় বোধ করিল। শিক্ষিতা মহিলার নিকট এ আচরণ সে প্রত্যাশা করে নাই।

"কুন্তলা মানা করলে ? কেন বুঝতে পারছি না তো"

"আমিও প্রথমটা পারি নি, তাই জিগ্যেস করতে গিসলাম"

"কি বললে"

"দেখা পর্য্যন্ত করলে না আমার সঙ্গে হে"

নিপুদার ঠোঁট কাঁপিয়া উঠিল, চোখের দৃষ্টি অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিল।

"ভাবলে বোধ হয় যেহেতু আমি এম-এ পাশ নই, সেই হেতু ওঁর সঙ্গে কোন বিষয়ে আলোচনা করবারও যোগ্য নই বোধহয়! দি ইন্সোলেণ্ট স্লাট্—"

ইংরেজি গালাগালিটা অর্দ্ধ-স্বগত উচ্চারণ করিয়া নিপুদা চুপ করিল এবং যেমন তাহার স্বভাব মুখে ঈষৎ হাসি ফুটাইয়া অন্যদিকে চাহিয়া রহিল। কুন্তলার সম্বন্ধে নিপুদার অপমান-সূচক ভাবাটা শঙ্করের নিজের আত্মসম্মানকেই যেন আঘাত করিল। কিন্তু তবু সে কিছু বলিতে পারিল না। কুন্তলার স্বপক্ষে কোন যুক্তিই সে খুঁজিয়া পাইল না। নিপুদার সহিত

সে কলহ করিতে চায় না, পল্লী-উন্নয়নের বিঘ্ন হিসাবে কুন্তলার এই আচরণ তাহার নিকট বিরক্তিকর তবু তাহার ভদ্র মন তাহার অজ্ঞাতসারেই কুন্তলার স্বপক্ষে একটা যুক্তি আহরণ করিতে ব্যস্ত হইল। নিপুদাকে মুখের মতো একটা জবাব দিতে পারিলে সে যেন আরাম বোধ করিত। লোকটা ভারী অভদ্র! কিন্তু কুন্তলা…

"কি ভাবছ। ওঠ, চল যাওয়া যাক—"

"কোথা"

"ঝকসুর কাছে। তাকে রাজি করাতে হবে। যদি নেহাত রাজি না হয় তাহলে রামলালকে তার বাপের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করব। ও যদি পাশ করতে পারে ওকে কলেজে ভর্তি করবই আমরা, দেখি কে আটকায়"

"সেটা কি ঠিক হবে—মানে, বাপের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করাটা—"

"তুমি তোমার প্রিন্সিপ্‌লের খাতিরে বাপের বিরুদ্ধে যাও নি? রাশিয়াতে অ্যান্টি-রিভলিউশনারি বাপ মাকে হরদম বর্জ্জন করছে সেখানকার ছেলে মেয়েরা এবং—বায়োলজিকালি—আত্মরক্ষার জন্য—তা করা ছাড়া উপায় নেই"

সুনিশ্চিত প্রত্যয়ের সহিত কথাগুলি বলিয়া নিপুদা হাসিল।

শঙ্কর আর থাকিতে পারিল না।

"আত্মরক্ষা মানে?"

"আত্মরক্ষা মানে আত্মরক্ষা, আবার কি"

"কার আত্মরক্ষা? আমাদের, না রামলালদের?"

"আমাদের সকলের"

"বলশেভিক রাশিয়ায় কিন্তু সকলে রক্ষা পায় নি। 'কুলাক' এবং 'নেপ্‌ম্যান'দের দুর্গতির অন্ত ছিল না সেখানে। এখানেও যদি সবাই বলশেভিক হয়ে ওঠে আপনি আমি বাঁচব না। বলশেভিক শাস্ত্রমতে আমরা শোষকের দলে। বায়োলজিকালি আত্মরক্ষা করতে হলে রামলালদের বাড়তে না দেওয়াই উচিত। সে হিসেবে কুন্তলা দেবীর যুক্তি ঠিক—"

"কুন্তলা দেবীর যুক্তি স্বার্থপর পশুর যুক্তি"

"বায়োলজিতে পরার্থ বলে' কিছু নেই—স্বার্থই সেখানে মূলমন্ত্র"

"মানলাম। কিন্তু বৃহত্তর স্বার্থের জন্য ক্ষুদ্র স্বার্থ বলিদান দিতে হবে"

"মানে, সোজা ভাষায় আমার স্বার্থ, আপনার স্বার্থ, আমাদের বংশধরদের স্বার্থ সব বলিদান দিতে হবে। শ্রমিকদের বড় করে' নিজেদের অবলুপ্ত করে' ফেলতে হবে"

বাঁকা হাসি হাসিয়া নিপুদা' বলিল, "একদিন তা হবেই। শ্রমিকদের প্রাধান্যকে স্বীকার করে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই"

"গত্যন্তর থাকবে না যখন তখন নেব। আগে থাকতে যেচে নিজেদের সর্ব্বনাশ ডেকে নিয়ে আসি কেন"

যুক্তির পথে না গিয়া নিপুদা চটিয়া উঠিল।

"তাহলে কি বুঝতে হবে তুমিও কুন্তলার দলে? তোমার এই পল্লী-উন্নয়ন টুন্নয়ন একটা 'শো' মাত্র। আমাকে তাহলে মিছিমিছি কেন—"

শঙ্কর হাসিয়া বলিল, "আহা, চটছেন কেন। ব্যাপারটা বায়োলজির দিক থেকে ভেবে দেখছি একটু, সেদিন যেমন দেখছিলাম"

"এ বায়োলজি নয়, এ তোমার কবিত্ব"

আর একটু হাসিয়া শঙ্কর বলিল, "কবিত্বই তো সত্য নিপুদা। ডারবিনও কবিই ছিলেন, struggle for existence, survival of the fittest আসলে বোধ হয় কাব্য কথাই। আমরা কি নিজেদের existenceএর জন্যে struggle করছি? যদি নিছক পশু-প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত হতাম, তাহলে নিজেদের সর্ব্বনাশ ডেকে আনবার জন্যে এমন করে' উঠে পড়ে লাগতাম না। এটা ঠিক জানবেন যাদের জাগাবার আমরা চেষ্টা করছি তারা জাগলে আমরা কেউ বাঁচব না—বৃহত্তর মানবসমাজ হয় তো রক্ষা পাবে—"

"তুমি ঝকসুর ওখানে যাবে, না বাজে তর্ক করবে বসে বসে"

"চলুন"

উভয়ে বাহির হইয়া পড়িল। পরিহাস ছলে তর্ক করিতে গিয়া শঙ্কর যেন একটা সত্য আবিষ্কার করিল এবং মনে মনে চমৎকৃত হইয়া গেল। বায়োলজির দিক দিয়া ভাবিয়া দেখিলে পতিতোদ্ধারের চেষ্টা করা মানে সত্যই তো আত্মবিলোপের আয়োজন করা। কোন জীব কি সজ্ঞানে আত্মবিলোপের আয়োজন করে? বায়োলজিকালি রামলালদের হয় তো উপকার হইবে, কিন্তু আমরা উদ্বুদ্ধ হইয়াছি কিসের প্রেরণায়? আমরাই তো উহাদের চোখ ফুটাইতেছি। নিজেদের সর্ব্বনাশ সুনিশ্চিত জানিয়াও কিসের প্রেরণায় আমরা নিজেদের মারণাস্ত্র উহাদের হাতে তুলিয়া দিতেছি! ইহা জৈবিক নয়, ইহা জীবোত্তর প্রেরণা, ইহাই মনুষ্যত্ব, ইহাই মহত্ত্ব—এই প্রেরণাবশেই দধীচি বজ্র নির্ম্মাণের জন্য নিজের অস্থিদান করিয়াছিলেন, বশিষ্ঠ আত্মনিধন যজ্ঞে পৌরহিত্য স্বীকার করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। নিজের কল্পনায় মশগুল হইয়া শঙ্কর পথ চলিতে লাগিল।

"হুঁ:—ক্যাপিটালিষ্টদের লেখা কতকগুলো বাজে প্রোপ্যাগাণ্ডা পড়ে' মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোমার—" নিপুদা খানিকক্ষণ পরে হঠাৎ বলিয়া উঠিল এবং আড়চোখে শঙ্করের দিকে চাহিল। শঙ্কর কোন উত্তর দিল না। তাহার মন তখন আকাশে আকাশে উড়িয়া বেড়াইতেছে।

মুখময়-বসন্তের-দাগ, কাঁচা-পাকা-ঝাঁকড়া-গোঁফ, কালো-রং, একমাথা-অবিন্যস্ত-চুল বিরাটকায় ঝকসু বিশাল হাতুড়িটা তুলিয়া চতুর্দ্দিকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত করিতে করিতে তপ্ত লোহা পিটিতেছিল। শঙ্করের শিক্ষার উপযোগিতা বিষয়ক বক্তৃতা অথবা নিপুদার কমিউনিষ্টিক্‌ বচন সে শুনিতেছিল কি না তাহা তাহার মুখ দেখিয়া অনুমান করা শক্ত। রামলালও একটু দূরে দাঁড়াইয়া রোদ পোহাইতেছিল এবং সব শুনিতেছিল। শঙ্করের এবং নিপুদার বক্তব্য যখন শেষ হইয়া গেল তখনও ঝকসু কিছু বলিল না, লোহাই পিটিতে লাগিল।

"কি রে, কিছু বলছিস না যে। তোর এক পয়সা খরচ লাগবে না, খরচ যা লাগে আমরাই দেব সব—"

হাতুড়ি পেটা বন্ধ করিয়া বাম হাত দিয়া ঝকসু মাথায় ঘাম

মুছিয়া ফেলিল। ঠাকুর-বাবার শিষ্যকে ইঁহারা পয়সার লোভ দেখাইতে আসিয়াছেন! এ সম্বন্ধে সে অবশ্য মুখে কিছু বলিল না। গলা খাঁকারি দিয়া বাগ্‌-যন্ত্রটা একটু পরিষ্কার করিয়া লইয়া সংক্ষেপে কেবল বলিল—"বহু মাইজিকা বাতো সে হাম্‌ বাহার নেই হোবে পারব—অংরেজি উ আর নেহি পঢ়তে"

"ওই এক বুলি ধরেছে—"

নিপুদা হতাশভাবে হাত উল্টাইল।

"অংরেজি পড়তে দোষটা কি?" শঙ্কর প্রশ্ন করিল।

ঝকসু হাতুড়ি তুলিয়া কাজ সুরু করিতে যাইতেছিল এই কথায় হাতুড়ি নামাইয়া রামলালের দিকে নিজের বলিষ্ঠ দক্ষিণ বাহুটা প্রসারিত করিয়া সক্ষোভে বলিল—"অংরেজি পঢ়ি কর্‌ শালায়ো হালত্‌ কি ভেলো ছে দেখো, তোঁ আপ্‌নে আঁখি সে দেখো—"

পুত্রকে শালা সম্বোধন করাতে নিপুদা শঙ্করের দিকে চাহিয়া মুচকি হাসিল। শঙ্কর হাসিতে সায় দিল না, রামলালের দিকে চাহিয়া সে অবাক হইয়া গেল। রামলালকে সে ইতিপূর্ব্বে বহুবার দেখিয়াছে, কিন্তু এই পারিপার্শ্বিকে সে যেন রামলালকে নবরূপে আবিষ্কার করিল। এই ঝকসুর পুত্র এই রামলাল! লিক্‌লিকে চেহারা, দশ-আনা-ছ-আনা চুল ছাঁটা, গায়ে সৌখীন কামিজ, গলায় রেশমের গলাবন্ধ, পায়ে গ্রীসিয়ান স্লিপার, গোঁফ-কামানো! তাহাদের দিকে অপাঙ্গে চাহিয়া মুচকি মুচকি হাসিতেছে! পুরুষ নয় যেন মেয়েমানুষ! একটা বটের চারা অস্বাভাবিক আওতায় পড়িয়া কেমন যেন লতানে-গোছের হইয়া গিয়াছে।

"হোপ্‌লেস্‌! চল, হরিহরবাবুর কাছে যাওয়া যাক—এর কাছে বকবক করে' কোন লাভ নেই। কি হে গুম মেরে গেলে যে—"

শঙ্কর কোন উত্তর দিল না। ঝকসু আবার লোহা পিটিতে সুরু করিয়াছিল। বিচ্ছুরিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গগুলির দিকে চাহিয়া শঙ্কর চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মনে হইতেছিল আমরা ভুল পথে চলিতেছি না তো? (ক্রমশঃ)

ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৭ ধারা

শ্রীনারায়ণ রায় এম-এ, বি-এল্‌

ইংরাজী "এ্যাডালটারী" (adultery) শব্দের আভিধানিক অর্থ-ব্যভিচার। তর্ক না করিয়া বা খুঁটিনাটী না ধরিয়া সাধারণভাবে বলা যাইতে পারে যে পরস্ত্রী-গমন, পরপুরুষ সহবাস ও অনুচালজন ইত্যাদি করিলে ব্যভিচার-দোষে-দোষী হয়।

সতীত্ব সম্বন্ধে যাহার যে ধারণাই থাকুক না কেন, মনুষ্য সমাজে সর্ব্বত্র সর্ব্বসময়ে সতীত্বের মূল্য স্বীকৃত হইয়াছে। বস্তুতঃ অসতী স্ত্রীলোক সকল সমাজেই (ব্যতিক্রম যদি কোথাও থাকে ত' তাহাদের কথা বলিতেছি না) ঘৃণ্য। বিশেষ করিয়া কোন পুরুষই—তাহার স্ত্রী অসতী, ইহা সহ্য করিতে পারে না। নারীও বিশেষ করিয়া ভারতীয় নারী তাহার সতীত্বকেই তাহার শ্রেষ্ঠ রত্ন বলিয়া মনে করে। পৃথিবীর ইতিহাসে ইহার দৃষ্টান্ত সর্ব্বত্র ও সর্ব্বসময়েই পাওয়া যায়।

ব্যভিচার চরিত্র সম্বন্ধীয় অপরাধ, সুতরাং এই অপরাধের জন্য শাস্তি-বিধান প্রত্যেক দেশের দণ্ডবিধির অন্তর্ভুক্ত হওয়া অবশ্য বাঞ্ছনীয়। ভারতীয় দণ্ডবিধির দশম পরিচ্ছেদে ৪৯৭ ধারায় ব্যভিচারের শাস্তি-বিধানের ব্যবস্থা হইয়াছে। উক্ত ধারায় বলা হইয়াছে যে, কোন ব্যক্তি পরস্ত্রী বা পরস্ত্রী বলিয়া বিশ্বাস করিবার পর্য্যাপ্ত কারণ আছে এমন কোন স্ত্রীলোকের সহিত তাহার স্বামীর বিনানুমতিতে যৌন সংসর্গ করিলে ও সেই যৌন সংসর্গ বলপূর্ব্বক ধর্ষণ না হইলে সেই ব্যক্তি "এ্যাডালটারী" অপরাধে অপরাধী হইবে এবং তাহার পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড বা জরিমানা বা উভয়ই হইবে। এই ক্ষেত্রে ঐ স্ত্রীলোককে প্ররোচক হিসাবে শাস্তি দেওয়া হইবে না। (whoever has sexual interoourse with a person who is and whom he knows or has reason to believe to be the wife of another man, without the consent or connivance of that man, such sexual intercourse not amounting to the offence of rape, is guilty of the offence of adultery, and shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to five years, or with fine or with both. In such case wife shall not be punishable as an abetter.)

ব্যভিচার বলিতে কি বুঝায় তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি। এক্ষণে প্রশ্ন ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৭ ধারা সকল প্রকার ব্যভিচারের দণ্ডদানের ব্যবস্থা করিয়াছে কি? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে প্রথমেই দেখিতে হইবে ৪৯৭ ধারা কি বলিতেছে। ৪৯৭ ধারায় এ্যাডালটারী অপরাধে অপরাধী কাহারা? উক্ত ধারায় প্রথমেই বলা হইয়াছে বলপূর্ব্বক ধর্ষণ এই ধারার আমলে আসে না (such sexual intercourse not amounting to the offence of rape) এ বিষয়ে আমাদের বলিবার কিছু নাই, কেননা ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬ ধারায় বলপূর্ব্বক ধর্ষণের জন্য দশ বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড ও জরিমানার ব্যবস্থা আছে। তাহা হইলে আমরা দেখিতেছি যে ৪৯৭ ধারা অনুসারে স্ত্রীলোকের ইচ্ছানুক্রমে যে ব্যভিচার তাহাকেই এ্যাডালটারী বলা হইয়াছে। কিন্তু ইহাও হইল না, কেননা উক্ত ধারায় বলা হইতেছে যে, কোন ব্যক্তি পরস্ত্রী বা পরস্ত্রী বলিয়া বিশ্বাস করিবার পর্য্যাপ্ত কারণ আছে এমন কোন স্ত্রীলোকের সহিত তাহার স্বামীর বিনানুমতিতে যৌন সংসর্গ করিলে…ইত্যাদি ইত্যাদি। তাহা হইলে দেখিতেছি ৪৯৭ ধারা অনুসারে এ্যাডালটারী অপরাধের জন্য প্রয়োজন—

(১) একজন পুরুষ।

(২) একজন বিবাহিতা স্ত্রীলোক এবং শুধু বিবাহিতা নয় স্বামী জীবিত আছে এমন স্ত্রীলোক—কেননা তাহা না হইলে স্বামীর অনুমতির প্রশ্নই উঠে না।

(৩) স্বামীর বিনানুমতি।

(৪) যৌন সংসর্গ।

(৫) বলপূর্ব্বক ধর্ষণ নহে।

অতএব দেখিতেছি কোন কুমারী বা বিধবার সহিত তাহার সম্মতি-ক্রমে যদি কোন পুরুষ যৌন-সংসর্গ করে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৭ ধারা অনুসারে সে ব্যভিচার-দোষে-দোষী হইবে না বা সেই অপরাধে দণ্ডনীয়ও হইবে না; অথবা যদি কোন পুরুষ কোন বিবাহিত স্ত্রীলোকের সহিত সেই স্ত্রীলোকের ও তাহার স্বামীর সম্মতিক্রমে যৌন-সংসর্গ করে তাহা হইলেও ৪৯৭ ধারা অনুসারে তাহা ব্যভিচার হইল না।

৪৯৭ ধারার শেষাংশে যাহা আছে তাহাও বিশেষ প্রণিধান করিবার বিষয়। উক্ত ধারার শেষ বাক্যটীতে বলা হইয়াছে যে—এই ক্ষেত্রে (অর্থাৎ এ্যাডালটারী বা ব্যভিচার অপরাধে) ঐ স্ত্রীলোককে প্ররোচক বা সহায়ক (abetter) হিসাবে শাস্তি দেওয়া হইবে না (In such case the wife shall not be punishable as an abetter)

তাহা হইলে কি বুঝিতে হইবে যে এই আইনের উদ্দেশ্য একমাত্র পুরুষকেই ব্যভিচার দোষে দোষী করা ও দণ্ড দেওয়া ? সত্যই তাই। আইন রচনাকারীগণ বলিয়াছেন "To make laws for punishing the inconsistancy of the wife, while the law admits the privilege of the husband to fill his Zenana with women, is a course which we are most reluctant to adopt" .অর্থাৎ যে স্থলে পুরুষের পক্ষে অগণিত স্ত্রীলোককে তাহার অন্তঃপুরে আনিবার অধিকার আইন স্বীকার করিতেছে সেই স্থলে স্ত্রীলোকের চঞ্চলতা বা অব্যবস্থিতচিত্ততার জন্য দণ্ডবিধান করিতে আমরা অনিচ্ছুক।

আইন রচনাকারী তাঁহার স্বপক্ষে আরও যে সকল যুক্তি দিয়াছেন তাহা অত্যন্ত অসার ও হাস্যকর। এদেশের সমাজে নারীর স্থান সম্বন্ধে এক লম্বা বক্তৃতা করিয়াছেন ও বলিয়াছেন নারী প্রায় সর্ব্বত্রই নিগৃহীতা—উপযুক্ত বয়সের পূর্ব্বেই তাহার বিবাহ হয় ও সপত্নীর ঈর্ষার মধ্যে তাহাকে বড় হইতে হয়, স্বামীর আদরও পরিপূর্ণভাবে পায় না ইত্যাদি। আইন রচনাকারী যেন বলিতে চাহেন যে এই সমাজে নারী যে পরপুরুষের সহিত ব্যভিচার করিবে ইহা আর বড় কথা কি ? ও ইহার জন্য নারীকে দণ্ডদান করা যুক্তিযুক্ত নহে—তিনি যেন করুণার অবতার হইয়াছেন।

জিজ্ঞাস্য এই যে, যে লোক খাইতে না পায় সে যদি প্রাণ বাঁচাইবার জন্য কিছু খাদ্য দ্রব্য চুরি করিয়াই খায় তাহার জন্য কি কোড্ রচনাকারী তাহাকে চুরীর দায় হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন ? কই তাহা ত দেন নাই, অথচ জীবনধারণ করিবার অধিকার নিশ্চয়ই সকলেরই আছে। খাইতে না পাইয়া যে চুরী করিল, সে ত' বিচারালয়ে কমলাকান্তের বিড়ালের মত অনায়াসে বলিতে পারে—"খাইতে দাও নহিলে চুরি করিব। আমাদের কৃষ্ণ চর্ম্ম, শুষ্ক মুখ, ক্ষীণ সকরুণ মেও মেও শুনিয়া তোমাদের কি দুঃখ হয় না ? চোরের দণ্ড আছে, নির্দ্দয়তার কি দণ্ড নাই ? দরিদ্রের আহার-সংগ্রহের দণ্ড আছে, ধনীর কার্পণ্যের দণ্ড নাই কেন ? পাঁচশত দরিদ্রকে বঞ্চিত করিয়া একজনে পাঁচশত লোকের আহার্য্য সংগ্রহ করিবে কেন ? যদি করিল, তবে সে তাহার খাইয়া যাহা বাহিরে পড়ে, তাহা দরিদ্রকে দিবে না কেন ? যদি না দেয়, তবে অবশ্য দরিদ্র তাহার নিকট হইতে চুরি করিবে ; কেননা অনাহারে মরিয়া যাইবার জন্য এ পৃথিবীতে কেহ আইসে নাই"—বিড়ালের কথার মধ্যে যে যুক্তি আছে তাহা কি কোড্ রচনাকারী অস্বীকার করিতে পারেন ? কিন্তু তবুও সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার্থ তিনি চোর মাত্রকেই চুরি অপরাধে অপরাধী ও দণ্ডনীয় করিয়াছেন।

ব্যভিচারও অপরাধ—তা সে যাহার দ্বারাই অনুষ্ঠিত হউক না কেন, যে দেশে যে সমাজে স্ত্রীলোক তাহার সতীত্বের জন্য হাসিতে হাসিতে প্রাণ বিসর্জ্জন দেয় সেই দেশের দণ্ডবিধিতে স্ত্রীলোক ব্যভিচার অপরাধে অপরাধী বা দণ্ডনীয় হইবে না ইহা কি বিস্ময়কর নহে ?

পুরুষের প্ররোচনায় স্ত্রীলোক বিপথগামী হয় ইহা যেরূপ সত্য, স্ত্রীলোকের প্ররোচনাতে পুরুষ বিপথগামী হয় ইহা ততোধিক না হইলেও তদ্রূপ সত্য। আইনকারী যদি মনে করিয়াই থাকেন যে স্ত্রীলোক অত্যন্ত দুর্ব্বল, তাহারা নিজেদের ভালমন্দ কিছুই বুঝে না, যা করে সবই পুরুষের প্ররোচনায়, তাহা হইলে বলিব তিনি ভুলই করিয়াছেন, তাছাড়া আইন রচনাকালে সমাজে স্ত্রীশিক্ষা যে পরিমাণে ছিল এক্ষণে উহা তদপেক্ষা বহু পরিমাণে বেশী। সুতরাং বুঝিতে হইবে—স্ত্রীলোক নিজ ভালমন্দ বুঝিতে পারে (আমরা অবশ্য আমাদের সমাজের এমন কোন সময়ের কথাই ভাবিতে পারি না যখন আমাদের সমাজে নারী তাহার সতীত্বের মূল্য বুঝিত না) সুতরাং বর্ত্তমানে এই সমানাধিকারবাদের যুগে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৭ ধারার পরিবর্ত্তন একান্ত কর্ত্তব্য।

শ্রীযুক্ত দেশমুখ এ বিষয়ে যে "বিল" কেন্দ্রীয় আইন সভায় আনিয়াছেন ভারতীয় নারী সমাজের স্বার্থরক্ষক প্রতিনিধি তাহার সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহাকে ধন্যবাদ।

কবির দৃষ্টি

শ্রীরামেন্দু দত্ত

কবির আঁখির দৃষ্টি কেমনে
গভীর মমতা হানে !
সুদূরে নিকট করিয়া পাষাণে
মাধুরী ভরিয়া আনে !
সম্মোহনের মোহনীয়া যাদু
এই নয়নের তলে
স্নেহপ্রেম মাখা পল্লব ছায়
স্নিগ্ধ হইয়া জ্বলে !
সে আলো বারেক ও মুখে পড়িলে
দেখিব কেমন থাকো
নিজেকে সরায়ে আঁখির আড়ালে
কেমনে লুকায়ে রাখো !

কবির চোখের চাহনীকে জানি
তাই তুমি ভয় করো !
মুখটি তুলিয়া ভুবন ভুলিয়া
নয়নে নয়ন ধরো !
দেখিবে, তোমার ধুলার ধরণী
কনক-বরণী লাগে !
জীবনের মরু-সরণী হয়েছে
কুসুমিত অনুরাগে !
সব গ্লানিভয় দুখ-সংশয়
দূরে গেছে দূর হয়ে—
কবির আঁখির গভীর মমতা
এসেছে অমৃত লয়ে !

রিয়ালিষ্ট

শ্রীনীরেন্দ্র গুপ্ত

জ্যোতিধর তরুণ শিল্পী। অসামান্য ছিল তার শিল্প-প্রতিভা, আর তারই বলে যৌবনের প্রথম অধ্যায়েই জীবনে তার ঘটেছিল অর্থ, খ্যাতি আর সম্মানের ত্রিবেণীসঙ্গম। আনন্দময় জগৎ এসে তার কণ্ঠে পরিয়ে দিয়েছিল গৌরবের বিজয়-মাল্য।

সেদিন অপরাহ্নে চিত্রগৃহের সুসজ্জিত কক্ষে বসে সে তার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত বিরাট ছবিখানিকে এঁকে শেষ করছিল, ছবিখানা দু'টি শিশুর।—মহিমময় সুকুমার শিশু দু'টি। প্রকৃতির পটভূমিকায় বিভোর হয়েই তারা ক্রীড়ারত। আননে তাদের ফুটে উঠেছে স্বর্গীয় দীপ্তি, উচ্ছ্বসিত আনন্দ আর সীমাহীন সরলতা। প্রায় শেষ হয়ে এসেছে চিত্রখানি—তার বহুদিনের অক্লান্ত সাধনার ফল! এ চিত্রটী যে পৃথিবীতে তাকে এক উচ্চতম গৌরবের আসন দান করবে সে বিষয়ে তার নিজের সন্দেহ ছিল না বিন্দুমাত্র। মনের সমগ্র একাগ্রতা আর দীর্ঘ অভিজ্ঞতার সকল নৈপুণ্য একীভূত করে জ্যোতিধর তার চিত্রখানিকে পরিপূর্ণ ও ত্রুটিহীন করে তুলছিল।

সবেমাত্র ছবিতে সে সম্পূর্ণতার রেখা টেনেছে, এমনি সময় দ্বারোয়ান্ এসে সংবাদ দিলে যে একটী বাবু সাহেবকে সেলাম জানিয়েছে। সফলতার আনন্দে জ্যোতিধরের অন্তর তখন পরিপূর্ণ, সে দ্বারোয়ান্‌কে হুকুম করলে, "বাবুকে এখানেই নিয়ে এসো।"

একটু পরেই যে-বাবুটি এসে ঘরে প্রবেশ করলে সর্ব্বাঙ্গে তার দারিদ্র্যের ছাপ সুস্পষ্ট। বন্ধু শুভেন্দুকে চিনতে জ্যোতিধরের বিলম্ব না হলেও, তার সাজ-সজ্জার অভাবিত দীনতার পানে অপরিচয়ের বিস্মিত দৃষ্টি নিয়েই সে তাকিয়ে রইল। সেই বিলাস-প্রিয়, হাস্যোৎফুল্ল শুভেন্দু আজ এমন নৈরাশ্য আর মলিনতায় চাপা পড়ে গেল কি করে!

জ্যোতিধরের শিল্পজগৎ চিররঙ্গীণ। সেই রঙ্গীণ কল্পনারই মায়াপরশ নয়নে মেখে এতদিন সে দেখে এসেছে বাইরের বিশাল জগৎটাকে—বাস্তবের বুকে রং ফলিয়েছে তারই পলায়ন-পন্থী মনের তুলিকা। আজ শুভেন্দুকে দেখে মনে হল, সে যেন জ্যোতিধরের মানস-জগতের চিত্রপটে একটা অনাবশ্যক গাঢ় কাল রংয়ের বিন্দু! বেদনা ও আনন্দমিশ্রিত কণ্ঠস্বরে জ্যোতিধর বললে, "বহুদিন পরে তোমার সাথে দেখা হল শুভেন্দু। কেমন আছ? এ অবস্থা কেন তোমার?"

সম্মুখের অনাবৃত ছবিখানার দিকে শুভেন্দু একবার তাকালে, তারপর বন্ধুর পানে দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে বললে, "এ অবস্থা কেন, তার উত্তর দেবার শক্তি নেই ভাই। তোমার কাছে সাহায্য চাইতে এসেছিলুম, কিন্তু সেকথা এখন থাক্। তুমি এ কী চিত্র এঁকেছ জ্যোতি?"

উচ্ছ্বসিত হয়ে জ্যোতিধর বললে, "এ ছবির নাম হবে 'স্বর্গদূত'। এ আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্র। শিশুর নিষ্পাপ, চিন্তাহীন, সরল, সুন্দর, আনন্দময় মুখের অভিব্যক্তি স্বাভাবিকভাবে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছি—বিফলও হইনি হয়তো।"

শুভেন্দুর ওষ্ঠের কোণে জেগে উঠল একটা মর্ম্মভেদী হাসির আভাস, সে বললে, "ভুল করেছ জ্যোতি।"

পরম বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে উঠল জ্যোতিধর, প্রশ্ন করল, "ভুল? কোথায়?"

শুভেন্দু কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইল, তারপর বলল, "চল আমার সঙ্গে, তোমার ভুল দেখিয়ে দিচ্ছি।"

আচ্ছন্নের মত জ্যোতিধর শুভেন্দুকে অনুসরণ করলে।

অন্ধকারাচ্ছন্ন গলির মাঝে একখানা ভগ্ন-গৃহের সামনে গিয়ে শুভেন্দু থামলে। জ্যোতিধর বললে, "এ কোথায় নিয়ে এলে আমায়?"

—"আমার বাড়ীতে।" বলে শুভেন্দু দরজায় আঘাত করলে। একটী রমণী এসে দরজা খুলে দিল এবং জ্যোতিধরকে দেখেই একদিকে সরে দাঁড়াল।

তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। অন্ধকার ঘরের মাঝে প্রদীপের একটি ক্ষীণ শিখা সভয়ে কেঁপে মরছে। জ্যোতিধর তাকিয়ে দেখলে মূর্ত্তিমান দারিদ্র্য ঘরের মাঝে শতরূপে আত্মপ্রকাশ করছে, ঘরের চূণ বালি গিয়েছে খসে। একধারে বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে ছিন্ন মলিন শয্যা, অন্যধারে পড়ে আছে শূন্য দু'একটা হাঁড়ি কলসী। দেয়ালে ঝুলছে একখানা শতছিন্ন সিক্তবসন—লজ্জা নিবারণের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত।

কক্ষের মাঝখানে জঞ্জালের মাঝে বসে আছে দু'টি উলঙ্গ শিশু। তাদের পানে তাকিয়ে চম্‌কে উঠল তরুণ শিল্পী। এরা কি শিশু?—না শিশুর কঙ্কাল? একটি পাত্র নিয়ে উভয়ে টানাটানি করছে। পাত্রের মধ্যে বুঝিবা একটু খাদ্যের ভুক্তাবশেষ লেগে আছে—তাই লাভ করবার জন্যে উভয়ের কি ব্যাকুল চেষ্টা! মুখের পরে ফুটে উঠেছে তাদের লালসা, হিংসা আর ক্রোধের মিলিত-আভাস। অতি কুৎসিত সে দৃশ্য—অতি করুণ আর ভয়াবহ!

শুভেন্দু তাদের আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে, "আমার ছেলে। এদের পানে তাকিয়ে তোমার ভুল বোধ হয় অনায়াসেই বুঝতে পারবে জ্যোতি।" পাগলের মত হেসে উঠল শুভেন্দু: জ্যোতিধর দু'হাতে চোখ ঢাকল।

চিত্রগৃহে ফিরে এসে চিত্রপটে আঁকা মূর্ত্তির মতই নীরব, নিশ্চল হয়ে বসে রইল এই তরুণ চিত্রকর। শতবর্ণোজ্জ্বল তার পৃথিবীর বিস্তৃতপটে কোন্ নিষ্ঠুর শিল্পী বুলিয়ে দিয়েছে কৃষ্ণবর্ণের তুলিকা। সেখানে কোথায় হাসি?—কোথায় ওই 'স্বর্গদূতে'র আননের আনন্দ-দীপ্তি? বুকফাটা ক্রন্দনে শুধু হাহাকার করছে ক্ষুধার্ত্ত শিশুরা—মাটির মানুষের সন্তানেরা!

...ধারাল ছুরি দিয়ে তার চিত্রখানিকে টুকরো টুকরো করে ফেললে জ্যোতিধর। তাকে আবার নূতন করে সাধনা করতে হবে।

কাব্য ও আধুনিক কাব্য

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

(৩)

কাব্যে যৌন-ভাববিলাস

যেখানে ইঙ্গিতে, ব্যঞ্জনায় বা ভাব-বিন্যাসের কুশলতায় অনেক গুহ্য কথা অনায়াসে বা স্বল্পায়াসে ব্যক্ত হতে পারে—গোপনতার পর্দ্দার উপর বিচিত্র আলোক সম্পাতে গহন মনের রহস্য যেখানে রূপায়িত হতে পারে, এমন কি নিছক রতিবিলাসও অপূর্ব্ব কাব্যরসে সঞ্জীবিত হয়ে আনন্দ দিতে পারে—সেখানে কাব্যের সে দুরূহ অথচ স্বাভাবিক পথ পরিহার করে সাম্প্রতিক কবিরা সহজ পথে কেন চলতে চান জানি না। সে পথ ক্লেদপঙ্কে কদর্য্য হলেও সহজ বলে, অনায়াস-গম্য বলে সেই পথকেই তাঁরা বেছে নিলেন দেখে দুঃখ হয়।—সমস্ত মনোভাবকে সর্ব্বাঙ্গীন ভাবে প্রকট করবার উৎকট বাসনাই তাঁদের সম্বল হয়েছে।—যাঁদের সত্যকার কবি বলে আমরা জানি, তাঁরাও আজ নূতনত্বের মোহে মশগুল;—তাতে বাহাদুরী লাভের আশু সম্ভাবনা হয়ত আছে কিন্তু কাব্যে রস জমে না—কাব্য সেখানে কবির কাছে বিলাসের সামগ্রী হয়ে পড়ে, আধুনিক সময়ের অনুরূপ মননশীলতারও কোনো লক্ষণ তাতে পাওয়া যায় না। যে রতি-বাসনা মানব-মনের চিরন্তন বস্তু, যাকে সুন্দর করে' মধুর করে' কত কাব্য মহাকাব্যের সৃষ্টি হ'ল—সেটা আজ সাম্প্রতিক কবিদের হাতে ছেলেখেলার সামগ্রী হয়ে দাঁড়াল; কোনো সৃষ্টিই তাঁরা করলেন না—বাংলা সাহিত্যের পক্ষে এটা নৈরাশ্যের কথাই বলতে হবে।—কবিতার জন্ম হয় অন্তরের প্রেরণায়, কবির সহজাত নিষ্ঠায় ও শ্রদ্ধায়; ভাবাবেগে কবিতার জন্ম হয় এই ত আমরা জানি, কিন্তু আধুনিক কবি শুভো ঠাকুর বলছেন—উঁহু তা নয়—

অন্তরের আত্মা আমি আলিঙ্গনে ধরি'
রতিক্রিড়া করি।......
তার পর......
আমার শরীর হতে নামে স্বাতি নক্ষত্রের জল,
অন্তরের জরায়ুতে প্রসব আবেগ ওঠে জেগে
জন্ম লয় আমার কবিতা"—

কবিরা তা হলে এতদিন আমাদের কাছ থেকে এই নব ইউজিনিকস্‌এর গূঢ় রহস্যটি গোপন করে এসেছেন! কবিগুরু কবিতার নব নব যাত্রার পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু সাহিত্যে বে-আব্রুতাকে তিনি নিন্দা করেছেন—বলেছেন—"সম্প্রতি আমাদের সাহিত্যে বিদেশের আমদানি যে-একটা বে-আব্রুতা এসেছে সেটাকেও কেউ কেউ মনে করেছেন নিত্যপদার্থ; ভুলে যান, যা নিত্য তা অতীতকে সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করে না। মানুষের রসবোধে যে আব্রু আছে সেইটেই নিত্য, যে আভিজাত্য আছে রসের ক্ষেত্রে সেইটেই নিত্য। এখনকার বিজ্ঞান-মদমত্ত ডিমোক্রাসি তাল ঠুকে বলছে, এই আব্রুটাই দৌর্ব্বল্য, নির্ব্বিচার অলজ্জতাই আর্টের পৌরুষ।"—কিন্তু অপরের ক্ষেত্রে সে যাত্রাপথের যে কি ভয়াবহ রূপ হবে, তা কল্পনাও করতে পারেন নি। নিজে তিনি যাতে হাত দিয়েছেন তাতেই সোনা ফলেছে। তাঁরই পক্ষে বলা সহজ ছিল;—

মানবের জীর্ণ বাক্যে মোর ছন্দ দিবে নব সুর
অর্থের বন্ধন হ'তে নিয়ে তারে যাবে বহু দূর
ভাবের স্বাধীন লোকে, পক্ষবান অশ্বরাজ সম
উদ্দাম সুন্দর গতি—সে আশ্বাসে ভাসে চিত্ত মম—

কবির এ আশ্বাস তাঁর নিজের জীবনে সম্পূর্ণ সফল হ'য়েছে কিন্তু আর সকলের পক্ষে নূতন বলেই যাত্রাপথ সহজ হবে, সুগম হবে এমন কোনো কথা নাই।

নারী জাতি ও বিবাহিত জীবন সম্পর্কে সাম্প্রতিক কবিদের মধ্যে কারো কারো সম্ভ্রম ও মর্য্যাদাবোধ যে কি মাত্রায় উদগ্র হয়ে উঠেছে এবং প্রেমরসাত্মক বস্তুতান্ত্রিক কবিতার মানোহারিত্ব যে কি পরিমাণ বেড়ে চলেছে সেটা কয়েকটি উদাহরণেই স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌বে—লেখকদের নাম আমি সৌজন্য বোধে গোপন রাখলাম—

বাতায়ন মুক্ত বাতায়ন
বধূ তার বাহিরের পৃথিবীকে
চিনতে পারে। বিশ্বের রূপ
রস-গন্ধের ছোঁয়াচ পেয়ে
ঘোম্‌টা খসে।
অচেনা পথিক পথে চলতে চলতে
তার পানে চেয়ে চোখ্‌ মারে।"

(অথবা)

অন্ধকারের স্তব্ধতা ভেঙ্গে কে যেন বল্‌ল
"জানো কাল রাত্রে মিলির বিয়ে হয়ে গেছে।"
—অন্ধকার দীঘিতে সে শব্দ পাথরের মতো।
"ও কিছুই নয়; ক'দিনই বা মনে থাক্‌বে;
তবে হয়ত কোনো রাত্রে রতিবিহারের সময়
হঠাৎ তোমাকে মনে পড়্‌বে,
আর সে দিন সমস্ত রাত
চোখে আর ঘুম আস্‌বে না।

(অথবা)

তবু কিছু মানিনাক ক্ষতি
তুমি আছ, আমি আছি, আর আছে দেহ ভোগবতী
সুন্দরী অসতি।

(অথবা)

নারী তুমি চির বিবসনা
পেয়ালার মত তাজা চুলগুলি (?) গ্রীবাতটে
ঢলে পড়া বেণীপ্রান্ত শিহরিছে
স্তনচূড়া সম
চুলের কাঁটারা সব ছাগপাল সম কামাতুর।

(অথবা)

মৃদু নীড় নাই কোনো বালিকার মুখে
বলাৎকারের পরুষ আরাবে নাই মানা;

শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু কবি অন্যমনস্কভাবে নিজের দুর্ব্বলতা স্বীকার করে ফেলেছেন—তিনি "বেপথু এবং গোলক ধাঁধায় ভ্রান্ত"—তবু মন্দের ভালো। Resurreotion এর আশা রইল।

শ্লীলতাহীন যৌন বোধ

আর একজন কবি তাঁর চারিদিকে শুধু দেখ্‌ছেন—

তৃপ্তিহীন প্রমত্ত লীলায় মগ্ন শত মুগ্ধ নারী,
অসহ শিহর সুখে এলায়িত তনু।
প্রিয় পাশে নাই—

কাজেই—

যৌবন জর্জ্জর তনু আকুল আবেগে
শুধু ওঠে বিমথিয়া।

আমার মতটা নেহাৎ ব্যক্তিগত—অতএব বিচার-সহ নয় এ কথা পাছে কেও বলেন, সেইজন্য আমাকে এখানে কতকগুলি কবিতার অংশবিশেষ উদাহরণ স্বরূপ উদ্ধৃত করতে হ'ল; উদ্ধৃতাংশের স্থানে

স্থানে এমন ভাব ও ভাষা আছে, যা আমার এবং অনেকের রুচি সংস্কৃতি ও সংস্কারে বাধে—কিন্তু উপায় কি ?

শিক্ষিত এবং শিক্ষিত বলেই রুচি ও সংস্কার-নিরপেক্ষ মন নিয়ে আমার বক্তব্য বিষয়ের বিচার হবে, এ আশা আমি নির্ভয়ে করতে পারি। কোনো কোনো মহিলা কবির মনেও (অবশ্য যদি না ছদ্মনামে তাঁদের কবিতা প্রকাশিত হয়ে থাকে) এই 'আঙ্গিকের' ছোঁয়াচ কি ভাবে লেগেছে তার প্রমাণ একটি মাত্র কবিতার অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করলেই বুঝা যাবে।

প্লাটিনাম আঙটিটা খোয়ালে ত ওখানেই !
বল্ছিল অঞ্জলি
ওরি বোন, তাই বলি,
আঙ্‌লে না উঠ্‌তেই লোপাট সে নিয়েছেই ?
কী যে হাসো, বে-সরম ইডিয়ট হাসি ওই !
লজ্জা কি নেই মোটে ?
কপালে আমারি জোটে
'ইম্যরাল' 'ভালগার' যত সব উড়ো খই।
দুষ্টু‌মি সুরু হল ?
খোপাতে যে লাগে টান !—

কবিতার এই প্রকারের মূল উৎস মনে হয় এই ধরণের কবিতা লেখার প্রতিযোগিতায়। কোনো মহিলা কবির কবিতাগুলির রচনা অতি সুন্দর, কিন্তু অতি-বাস্তবতার আচ্ছন্ন ভাবটা খানিক পরে কেটে গেলে মনে হয়—কাব্যপাঠের আনন্দ সেখানে একেবারেই সাময়িক ও সুলভ।

মহিলা কবিদের এই ধরণের লেখা নিয়ে আমি বেশী আলোচনা করব না—কারণ বেশী তাঁরা লেখেনও নি এবং এমন কিছুও লেখেন নি যে আমোল না দিলে এ আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকবে।

আমার ইঙ্গিতকে স্পষ্ট করবার জন্য আরো কয়েকটি উদাহরণ দিতে চাই—পুরুষ কবিদের পৌরুষ অঙ্কে।

একজন হতাশ কবি আক্ষেপ করছেন—

"আজ মোর প্রেম নাই, তাই যত হেরি হায় যুবতী কুমারী
নিতম্ব সুচারু কারো, কারো শুভ্র যুগ্মস্তন—বহুভোগ্যা নারী—
কেহ নাহি পারে মোরে সঙ্গ-সুখ বিতরিয়া করিতে চঞ্চল
নাহি নাচে স্নায়ুরজ্জু মিলন-উল্লাসে—শুধু ঝরে অশ্রুজল।

কবির এই আক্ষেপযুক্ত অশ্রুজলের প্রতি সমবেদনা জানান ছাড়া আমাদের আর কি উপায় আছে ?

আর একজন বিখ্যাত কবির কবিতায় বিলিতি মদের বিজ্ঞাপন দেখে মনে হয় সাম্প্রতিক কবিতায় বিজ্ঞাপন-সাহিত্যও গড়ে উঠ্‌ছে,—

তোমার বুকের প্রচুরতার মাঝখানে আমার মুখখানাকে
রাখতে দাও অনেকক্ষণ……
… · তোমার চুলের গন্ধ
দিক আমার চোখটায় শ্যাম্পেনের নেশা লাগিয়ে।
তোমার পাৎলা কাচের মত
গোলাপী ঠোঁটের পাত্র থেকে
আমার শুক্‌নো বিবর্ণ ঠোঁটে
ঢেলে দাও খানিকটা ইটালিয়ন ভারমুথ।

সাম্প্রতিক কবি সমর সেন উর্বশীকে সম্বোধন করে বলছেন—

"তুমি কি আসবে আমাদের মধ্যবিত্ত রক্তে
দিগন্তে দুরন্ত মেঘের মতো !……
চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে যেমন বিষণ্ণ মুখে
উর্ব্বর মেয়েরা আসে !"

এই কবিতা পড়েও রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যগ্রন্থে 'উর্ব্বশী'কে কোন সাহসে রেখে গেলেন, বাদ দিলেন না জানি না।

কোথাও বা এই কবি আধুনিকতার নেশায় সম্বিৎ হারিয়ে বল্‌ছেন :—

"আর কতো লাল সাড়ী আর নরম বুক,
আর টেরীকাটা মসৃণ মানুষ
আর হাওয়ার মত গোল্ডফ্লেকের গন্ধ,
হে মহানগরী !
দিগন্তে জ্বলন্ত চাঁদ, চীৎপুরে ভীড়,
কাল সকালে কখন সূর্য্য উঠ্‌বে।
কলেরা আর কলের বাঁশী আর গণোরিয়া আর বসন্ত
বন্যা আর দুর্ভিক্ষ
শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ"

উপনিষদের এমন বিশদ ব্যাখ্যা পড়েও পোড়া বাঙলা দেশের ধর্ম্মজ্ঞান হ'ল না। কিন্তু যেখানে তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে অনুভব করেছেন, কবিতার বিলাস যেখানে তাঁকে পেয়ে বসে নি, সেখানে তাঁর কলমেও সত্যকার কবিতার সৃষ্টি হয়েছে—

"মাথার উপর আসন্ন পৃথিবীর
অন্ধকার-বিরহিত সূর্য্য-সংস্কৃত আকাশ,
তবু সত্য শুধু পতন-বন্ধুর পথ
বন্ধ্যা ভূমি আর নিষ্ঠুর দিগন্ত।"

কবি কিন্তু সম্প্রতিকে নিয়েই তাঁর Moodএর কবিতা শেষ করেন নি—কবিজনোজিত ভবিষ্যতের আশা তাঁর আছে, তিনি বল্‌ছেন—

"তবু জানি
জটিল অন্ধকার একদিন জীর্ণ হবে, চূর্ণ হবে, ভস্ম হবে
আকাশ-গঙ্গা আবার পৃথিবীতে নাম্‌বে।"

—আমরা কিন্তু এই দুর্গতির মধ্যে সেই আশাতেই দিন গুণব।

কবি-প্রতিভা সকলের থাকে না, কিন্তু ভাল কবিতা, সুখপাঠ্য কবিতা লিখে আনন্দ দান করবার শক্তি নিয়ে যাঁরা জন্মেছেন তাঁদের জীবনের আসল সম্পদ হারিয়ে গেলে সেটা বাঙলা সাহিত্যেরই দুর্দ্দিন বলে বিবেচনা করব এবং আশা রাখব যে আকাশ-গঙ্গার অনাবিল স্রোত তাঁদের এই অহঙ্কৃত অভিযানকে একদিন ভাসিয়ে নিয়ে যাবে ; বর্ত্তমানের স্রোতাবর্ত্তের সঙ্গে আকাশ গঙ্গার স্নিগ্ধ ও পবিত্র বারি-সঙ্গম আমরা যে একদিন দেখতে পাব তার আভাস আমরা এখন থেকেই পাচ্ছি—কোনো কোনো সাম্প্রতিক কবির স্বরূপে ক্রমপ্রত্যাবর্ত্তন দেখে মনে হচ্ছে আশা আমাদের অমূলক নয়।

আজকের দিনে সাম্প্রতিক কবিতা নিয়ে আলোচনা করতে বসেছি বলে, আমি একথা মনে করি না যে এই শ্রেণীর কবিতার সার্থকতা নেই—সার্থকতা নিশ্চয়ই আছে এবং তার পরিমাণও নেহাৎ কম নয়। কারণ বিপ্লবের আপাত-নিষ্ঠুর রূপটাই ত তার সবখানি নয় ! ধাক্কা লাগে, ওলোটপালট হয়, ক্ষয়-ক্ষতিও হয়, কিন্তু ভবিষ্যৎ সৃষ্টির পথে তার অবদানকে কোনো বুদ্ধিমানই তুচ্ছ বলে মনে করবে না। কিছুদিনের জন্য পরিচিত পথ ছেড়ে যারা নূতন পথের সন্ধানে বের হ'ল—তাদের মধ্যে পাথেয় কারো যথেষ্ট ছিল, কারো বা একেবারেই ছিল না—তবুও তারা পথ অতিবাহন করে এল—পায়ে চলার পথে 'পাওটা' পড়েছে—একদিন হয়ত নবশ্যাম তৃণদলে সে পথচিহ্ন ও অস্পষ্ট হয়ে যাবে, বনবাসী বিহঙ্গেরা আর সে পথের ধারে তাদের পায়ের শব্দের দিকে উৎকর্ণ হয়ে থাক্‌বে না ; কিন্তু তারা যে যাত্রা সুরু করেছিল—তার প্রয়োজন ও সার্থকতার উচিত মূল্য দিতে আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত।

(ক্রমশঃ)

'আর্ট-ইন-ইনডাসট্রি' প্রদর্শনী

শ্রীঅমিয়জীবন মুখোপাধ্যায়

'আর্ট-ইন-ইনডাসট্রি' প্রদর্শনীর পশ্চাতে রয়েছে প্রধানতঃ দুটি উদ্দেশ্য : প্রথমতঃ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে শিল্পীর প্রতিভার পরিচয় করিয়ে দিয়ে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শিল্পীর প্রয়োজন কতটুকু শিল্পীকে সে সম্বন্ধে সচেতন ক'রে শিল্পীর সঙ্গে ব্যবসা-



বাণিজ্য-জগতের একটা সম্পর্ক স্থাপন করা এবং দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন সম্ভবপর উপায়ে সমস্ত দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে বিশিষ্ট অঙ্কন-পদ্ধতির স্তরকে সর্বপ্রকারে উন্নীত করা। ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম 'আর্ট-ইন-ইনডাসট্রি' প্রদর্শনী কলিকাতাতেই হয়—১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে। আরও বড় ক'রে এবং আরও সংশোধিতভাবে দ্বিতীয় প্রদর্শনীও ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতাতেই হয়। তৃতীয় প্রদর্শনী হয় বম্বেতে ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে। এবারে—অর্থাৎ ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট স্কুল অব আর্টস্-এ কলিকাতায় 'আর্ট-ইন-ইনডাসট্রি'র যে চতুর্থ প্রদর্শনী হ'ল এটা প্রতিযোগিতা, আর্থিক পারিতোষিক বিতরণ এবং অন্যান্য নানা দিক থেকে হয়েছে সর্ববৃহৎ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ। বস্তুতঃ শিল্পের এক বিশিষ্ট দিক নিয়ে এরূপ উচ্চাঙ্গের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা ক'রে বার্মা শেল কোম্পানি—এবং বিশেষ ক'রে প্রদর্শনীর জেনেরাল সেক্রেটারি মিঃ হেন্‌রি বর্ণ—জনসাধারণের, শিল্পরসিকগণের এবং সর্বপ্রকার ব্যবসায় কর্তৃপক্ষের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। চারিদিককার একটা খাপ-ছাড়া অবস্থার ভিতর অতুলনীয় সফলতার সঙ্গে এই প্রদর্শনী এবারে শেষ হ'ল।

এবারে সংক্ষেপে এবারকার এই প্রদর্শনীর পরিচয় দিই। প্রবেশ-দ্বারকে সজ্জিত করবার ব্যাপারে চৌধুরী ষ্টুডিয়ো একটি চক্রের ভিতর বিশেষ ভঙ্গীতে একটি নারীমূর্তি স্থাপন ক'রে 'আর্ট-ইন-ইনডাসট্রি' এই পরিকল্পনাকে রূপ দেবার চেষ্টায় যে অনাড়ম্বর, স্নিগ্ধ রুচির পরিচয় দিয়েছেন তা প্রথমেই মনকে আকর্ষণ করে। তারপরে ১নং কক্ষে সজ্জিত রয়েছে—রেক্রুটমেণ্ট পোষ্টার, অধিক-খাদ্য-উৎপাদন পোস্‌টার, অধিকতর-পরিষ্কৃত কলিকাতা পোস্‌টার, সিভিক-গার্ড পোস্‌টার, ডিফেন্স্‌ সেভিং পোস্‌টার, টায়ার-সংরক্ষণ, ইন্‌ডিয়ান রেড্‌ ক্রশ্‌ ও সেণ্ট্‌ জন অ্যাম্বুলেন্স, "ওয়েট্ পেণ্ট্"—ইত্যাদির চিত্র। মানবতার দিক থেকে "গ্রো মোর রাইস্"—চিত্রগুলির আবেদন একেবারে অতুলনীয়।

তারপরে ২নং কক্ষ। এই কক্ষ সুরু হ'ল "কমার্সিয়াল ফটোগ্রাফী" দিয়ে এবং এর বিষয়বস্তু হচ্ছে—"একটি শিশু।" তারপরে চলল—টিনের লেবেল, বই-এর মলাট, সুগন্ধি দ্রব্যের শিশির ডিজাইন, ছোট-হাজরির সেট্, ইস্পাতের ছোরা, কংক্রীটের উদ্যান-বীথিকা অথবা পাখীর স্নানাগার, চটিজুতো, প্রেস-রেক্রুটমেণ্ট, মোটরযান, ডিফেন্স্‌ সেভিংস্‌, ফোল্‌ডার, খবরের



কাগজের ডিজাইন, অসতর্ক কথাবার্তা এবং গুজোববিরোধী আপিস শো-কার্ড, বিভিন্ন বিষয়ের সিনেমা স্লাইড্, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক আপিস শো-কার্ড, জুয়েলারি (ফটোগ্রাফী), লেটার হেডের নমুনা—ইত্যাদি। তারপরে ৩নং কক্ষে রয়েছে—

ক্যালেণ্ডার, তোয়ালের ডিজাইন, সার্টের কাপড়ের ডিজাইন, ছাপানো কাপড়, শাড়ীর পাড়ের নমুনা, অভিনন্দন কার্ড,



"অধিকতর-খাদ্য জন্মাও"—এই চিত্র বা কথা নিয়ে দেশালাইবাক্সের লেবেল, ট্রামওয়ে বিজ্ঞাপন ইত্যাদি। Greeting Card-এর চিত্রণ অতি চমৎকার। সাধারণতঃ কলেজ ষ্ট্রীট বা শ্যামবাজার পাড়ায় বড়দিন, বিজয়া, নববর্ষ—ইত্যাদি উপলক্ষে যে সব শুভেচ্ছা-জ্ঞাপক কার্ড আমাদের অধিকাংশ সময়ে কিনতে হয় তার চাইতে এই কার্ডগুলির নমুনা অনেক গুণে উচ্চশ্রেণীর এবং অনেক অধিক প্রীতিকর। বিশেষতঃ ভারতীয় শিল্পের বৈশিষ্ট্য বা নিজস্ব ভঙ্গীটিকে রক্ষার দিকে শিল্পীরা এই কার্ডগুলিতে অনেকখানি যত্নশীল হয়েছেন।

৩নং কক্ষ অতিক্রম ক'রে এসে পড়া গেল একটি বারাণ্ডায়। এখানে দেখতে পাই রেলওয়ে, যুদ্ধসংক্রান্ত প্রচার, ইস্পাত, পেট্রল—ইত্যাদি বিষয়ে এবং অপর কয়েক প্রকার শিক্ষামূলক প্রাচীর-চিত্র।

সর্বশেষে হচ্ছে চতুর্থ কক্ষ। চতুর্থ কক্ষের নাম দেওয়া হয়েছে—"Outstanding Production"। এই কক্ষে নানা চিত্তাকর্ষক উপায়ে সজ্জিত রয়েছে বহু সিনেমা-পোষ্টার এবং শ্লাইড্, লেবেল, ফোল্ডার, প্রেসের বিজ্ঞাপন, শো-কার্ড, বুকলেট, ক্যালেণ্ডার, বইএর মলাট—ইত্যাদি ইত্যাদি। এ ছাড়া মেটাল-বক্স কোংএর টিন-কনটেনার, লাজারস্ কোম্পানির সাইড্-বোর্ড ও চেয়ার, কলিকাতা গভর্ণমেণ্ট স্কুল অব আর্ট, গোয়ালিয়র পটারী, কাশ্মির ওয়ার্কস্-এর মৃৎপাত্র, করাচীর গভর্ণমেণ্ট এম্পোরিয়ামের ছাই-দানীর ষ্ট্যাণ্ড, বেঙ্গল পটারি এবং শান্তিনিকেতনের ছোট-হাজরি ও চায়ের সেট, শান্তিনিকেতনের চামড়ার কাজ, কলিকাতা গভর্ণমেণ্ট স্কুল অব আর্টের রিলিফ্ ওয়ার্ক ও ভাস্কর্য—ইত্যাদি এবং বিভিন্ন শিল্পী ও শিল্পব্যবসায়ীর বিভিন্ন মৃৎপাত্র, ধূমপানের সেট, বেনারসী জরি ও মখমলের কাজ—ইত্যাদি।

প্রথম নম্বর কামরায় পোর্ট-কমিশনার প্রদত্ত নূতন হাওড়ার পুলের মডেল (নতুন হাওড়ার পুল তৈরির খরচ আপনারা সবাই জানেন কি? মোটামুটি—সাড়ে তিন কোটি টাকার মতন), দ্বিতীয় নম্বর কামরায় বার্মা শেল কোম্পানি প্রদত্ত অয়েল-রিফাইনারির মডেল এবং তৃতীয় নম্বর কামরায় করাচীর গভর্ণমেণ্ট এম্পোরিয়াম, কলিকাতার ইন্ডিয়ান সিল্ক হাউস, কলিকাতার ইন্ডিয়ান টেক্সটাইল কোম্পানি, কলিকাতার বেঙ্গল হোম-ইন্ডাস্ট্রিজ্ এ্যাসোসিয়েশান প্রভৃতি প্রদত্ত নানাবিধ জরির কাপড়, শাড়ী, শয্যাবরণ, টেবল ক্লথ, ছাপানো সিল্ক, ফার্ণিশিং ফ্যাব্রিক—ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

যুদ্ধ-সংক্রান্ত প্রয়োজনে চিত্রশিল্প যে আজ কতো রকমে লিপ্ত রয়েছে এবং সে দিক থেকে শিল্পজগতে, বিশেষ ক'রে প্রাচীর চিত্রে যে কতো রকম অভিনবত্ব দেখা দিয়েছে এবং শিল্পীও যে তাঁর কৃতিত্ব প্রদর্শনের কত নতুন পথের সন্ধান পাচ্ছেন, বর্তমান বছরের 'আর্ট-ইন-ইনডাস্ট্রি' প্রদর্শনী থেকে সেটা নানাভাবে উপলব্ধি করা যায়।

কিন্তু যে দু' একটি বিষয়ে এই প্রদর্শনী-কর্তৃপক্ষ তাঁদের আক্ষেপ জানিয়েছেন তার একটু উল্লেখ এখানে না ক'রে পারছি না। তাঁরা বলছেন: '**Unfortunately artists are in many ways not taking full advantage of the encouragement and considerable prize-money offered to them through this movement. Hundreds of entries sent to our exhibitions are useless, as artists do not read the prospectus with

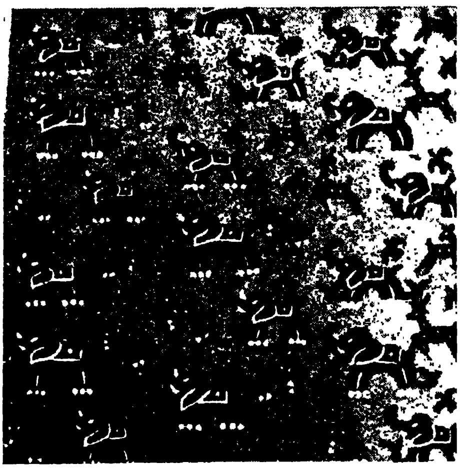


sufficient care to see that their entries are the correct size and conform to the specifications

which are plainly indicated. Also many posters are so complicated that they cannot be under-



stood even after much thought, while others are so badly lettered that they can only be read with difficulty. Most of the textile designs submitted are in drab colours or in most unpleasing colour combinations and few show originality. It is hoped that artists will study the prize winning



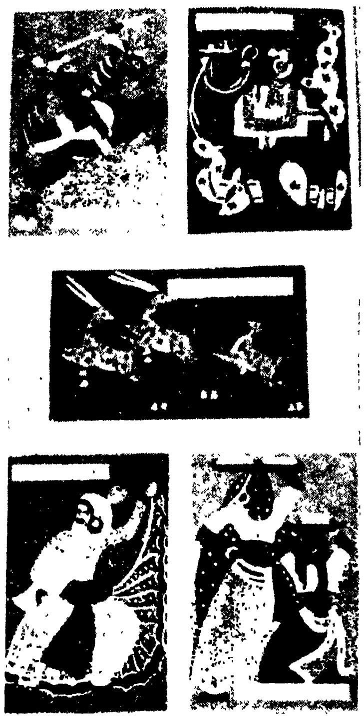
ছিটের ডিজাইন

entries and derive benefit from seeing good examples of commercial art and design. * * *"

প্রদর্শনী কর্তৃপক্ষের উপরি-উদ্ধৃত কথাগুলি দ্বারা আমাদের দেশের শিল্পীরা উপকৃত হবেন বলেই বিবেচনা করি।

এই প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষ আরও জানিয়েছেন যে এই প্রদর্শনী শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে 'আর্ট-ইন-ইনডাসট্রি' আন্দোলনের প্রাথমিক অবস্থা শেষ হ'ল। তাঁদের ইচ্ছা যে ভবিষ্যতে এই প্রদর্শনীকে সম্পূর্ণ স্থায়ীভাবে স্থাপন করতে হবে এবং প্রদর্শনীর ব্যবস্থা আরও ব্যাপকভাবে করতে হবে। তাঁদের এই শুভ-সংকল্প সিদ্ধ হোক—এটা সবারই কাম্য। বর্তমানের উদ্বেগজনক পরিস্থিতির মধ্যে এই প্রদর্শনীর ভিতর দিয়ে আমাদের সংস্কৃতি-মূলক কার্যাবলীর অন্যতম ধারাকে সুন্দররূপে বাঁচিয়ে রাখবার যে প্রয়াস আমরা দেখতে পেয়েছি তাতে এর সংগঠনকারীগণ আমাদের ধন্যবাদের পাত্র না হয়ে পারেন না।

পরিশেষে একটিমাত্র বিষয়ের উল্লেখ আমি এখানে করতে চাই। এই প্রদর্শনী একেবারে নিখুঁত এবং সর্বাঙ্গসুন্দর হ'ত



প্রীতি-উপহারের কার্ডের নক্সা

যদি সম্পূর্ণ পৃথকভাবে বাংলার পল্লীশিল্পের একটি বিশিষ্ট বিভাগের ব্যবস্থা প্রদর্শনী-কর্তৃপক্ষ করতেন। আমাদের পল্লী-শিল্প আমাদের traditional art ; কিন্তু একথা ভুললে চলবে না আমাদের traditional art-এর বিশেষ একটি অংশ পরিপূর্ণরূপেই Commercial art এবং এই আর্টের চর্চা বাংলার বহু পল্লী-গৃহস্থ-পরিবার, বহু কারিগর এবং আরও নানা শ্রেণীর লোক তাঁদের হাতের তৈরি নানান্ দ্রব্যের ভিতর দিয়ে বহুকাল ধ'রে ক'রে আসছেন। আমরা জানি এই চর্চার মধ্যে শুধু তাঁদের সৌখীন ভাববিলাস ছিল না, এর সঙ্গে তাঁদের নানারকম প্রচার, প্রতিযোগিতা ও উপার্জনের ঘনিষ্ঠ সংস্রব ছিল। যাই হোক, বিস্তারিতভাবে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবার স্থান এ নয়।

বাজার দরের রহস্য

শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়

(১)

"কব্‌রেজ মশাই! বাজার থেকে আস্‌ছেন?"

"হ্যাঁ"·· ··

"দুধের দর কত দেখ্‌লেন?"

"এখনো 'চার পয়সা' বিকোচ্ছে বটে—শীগ্‌গীরই বোধ হয় 'চার আনায়' উঠ্‌বে।"

"কেন বলুন তো?"

"কালিবাবুর মার অবস্থা ভাল নয়"···বলেই তিনি হন্‌ হন্‌ ক'রে ছুটলেন।

ফাগুন-চোত মাসে, যশোহরের পল্লী অঞ্চলে দুধের সের চার-পয়সার বেশী কখনো দেখিনি। দু'পয়সাও দেখিছি। এই দর যদি কখনো চার পয়সা থেকে চার আনায় লাফিয়ে উঠ্‌তো, তা'হলে বুঝ্‌তে হ'তো, নিশ্চয়ই নিকটবর্ত্তী গাঁয়ের কোনো বড়লোকের মা-বাপ মরেছে। ভূরি-ভোজনের আয়োজন চলছে। হালুইকর ঠাকুররা কোমর বেঁধে লেগে গেছে। যণ্ডা-ভোক্তাদের রসনা পরিতৃপ্তিকর নানাবিধ মিষ্টান্ন তৈরি হচ্ছে। গরীবের দুগ্ধ-পোষ্য শিশুরা দু'তিন দিনের জন্যে দুগ্ধপানে বঞ্চিত থাকবে, এ কথা নিশ্চয়।

অন্য রহস্য—"বড়লোকের ধনাভিমান-প্রকাশক যে-কোনো আয়োজনের জন্যে বাজারদর চড়ে।"

(২)

কলকাতার বাজারে। "মাষ্টার মশাই! পটল কিন্‌ছেন?"

"হ্যাঁ"······

"একটাকা সেরের পটল তো বড়লোকে খায়। আমরা খাই যখন দরটা চার আনায় নাবে। আপনি তা'হলে বড়লোক হয়েছেন—বলুন?"

"হ্যাঁ, তা' একটু হয়েছি বৈ কি। ছেলেটা কিছুতেই শুন্‌লো না, এরোপ্লেনের 'পাইলট' শিখে যুদ্ধের চাকরী নিয়েছে। এখন সে মাসে মাসে যত টাকা পাঠাচ্ছে, তা' আমি বছরে কামাতে পারিনি। তাই তো কর্ত্তা গিন্নি দুজনে ঠিক করেছি—অকালের পটল এক টাকা কেন, দশ টাকা সের হলেও, খাবো।"

বল্‌তে বল্‌তে মাষ্টার মহাশয়ের গলা ধরে গেল, পকেট থেকে একটা রুমাল বের করে চোখ মুছলেন। মাথার উপর দিয়ে একটা এরোপ্লেন উড়ে গেল—পটলগুলো মাটিতে পড়ে গেল।

অন্য রহস্য—"টাকা সস্তা হলেও বাজারদর চড়ে।"

(৩)

"ডাক্তারবাবু! 'ইন্‌জেকশান্‌'টার দাম কত?"

"একশো—দশ—টাকা।"

"আমার সঙ্গে মাত্র একশো টাকা আছে। এতেই দিন, দয়া করে। এই ইন্‌জেকশান্‌ না হলে আমার ছেলেটা নাকি বাঁচবে না।"

"তা' কি করবো বলুন? এই মাত্তর একজন একশো টাকা বলে গেল—তাকে দিইনি। বিলিতি ওষুধ কিনা, তাই একেবারেই অমিল! বাজারে বোধ হয়—আমার কাছেই আছে মাত্র একটি।"

"আচ্ছা, দিন্‌। এই নিন্‌ একশো—বাকি দশ টাকা এখুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

ডাক্তার হেসে বল্‌লেন—"মাপ করবেন। আপনি একজন দোকানদার—'কণ্ট্রোল প্রাইস্‌' এড়াবার জন্যে নিজের দোকানটি বন্ধ রেখেছেন—আপনাকে আমি চিনি। নগদ চাই।"

"কিন্তু আমার পেছন-দরজা তো খোলা আছে?"

ডাক্তার আবার হাস্‌লেন।

"বলি, চা'ল বেচছেন কি দরে?"

"ষাট টাকা! পাঠিয়ে দেব একমন?

এমন সময় দোকানদারের ছোট ভাই এসে খবর দিল "দাদা! আর ইন্‌জেকসান কিন্‌তে হবে না, খোকা মারা গেছে।"

দোকানদার চিৎকার ক'রে কেঁদে উঠ্‌লো—"ডাক্তারবাবু! আমার ছেলের মৃত্যুর কারণ আপনি।"

ডাক্তারবাবু তেম্‌নি হেসে উত্তর দিলেন—"আমার সাতটা ছেলে সারাদিন উপবাসী আছে। তার কারণ তো আপনি? টাকা নেই, তাই ষাট টাকা মনের চাল কিন্‌তে পারছিনে। আপনার একটি ছেলে মরেছে, আমার সাতটি ছেলে মরবে। তবু আমাদের 'অন্ধকার বাজারের' ব্যবসা ঠিক থাক্‌বে। কি বলেন?"······

অন্য রহস্য—"অতিলোভী ব্যবসাদারদের নির্ব্বুদ্ধিতার জন্যে বাজারদর চড়ে।"

(৪)

আর যে যে কারণে বাজারদর চড়ে—তা' আলোচনা করার অধিকার পরাধীন জাতির নেই। সুতরাং গল্পরচনাও সম্ভব নয়।

কাশীধামে শরৎচন্দ্র

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

সে প্রায় ২৪ বছর আগেকার কথা—সালটা ১৩২৬এর শেষাশেষি। আমরা তখন বীণাপাণি প্রতিষ্ঠানটির সংশ্রবে কাশীবাস করছি। কাশীর অনেকগুলি গুণী বাঙালী সে সময় এই প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে যোগসূত্র রচনা করেছিলেন। যদিও সেটি শিল্প প্রতিষ্ঠান, কিন্তু ঘটনাচক্রে সাহিত্যও তার একাংশ দখল করে ছোটোখাটো একটা আসর গড়ে তোলে, আর সেই আসরটি জমকে ওঠে শরৎচন্দ্রের আকস্মিক আবির্ভাব হওয়াতে।

যে সময়ের কথা বলছি, কাশীতে তখন বাঙালী বাসিন্দার সংখ্যা প্রায় বিশ হাজার। কিন্তু এতগুলি বাঙালীর সাধারণ কোন সংস্থা বা মিলন-ক্ষেত্র বলতে—বান্ধব, মিত্র ও হরিহর—এই তিনটি নাট্য-সমিতিকেই বুঝাত। শিবের ত্রিশূলের মতই এই তিন সমিতি শিবপুরীতে বাঙালীর শিবত্ব ও বৈশিষ্ট্যগুলির ওপর নজর রাখতেন। সাহিত্য-পরিষদের শাখাটি ক্রমশই শুখাচ্ছিল। অতিমাত্রায় রক্ষণশীল কতিপয় পুরাতনপন্থী এমন-ভাবে তার জীর্ণ দরজাটি আগলে বসে থাকতেন যে নব্যপন্থীদের সেখানে ঢোকবার জো-ই ছিলনা। না আসত নূতন যুগের কোন ভালো বই, না হোত সাধারণ দশজনকে নিয়ে কোন সভা বা আলোচনা।

মুক্তিতীর্থে বাস করলেও নব্যদল কিন্তু বাসনামুক্ত হয়ে বর্ত্তমানকে ভুলতে পারেনি। তাদের বুভুক্ষু মন বুঝি তখন নূতন খোরাকের সন্ধানে অতিষ্ঠ হয়ে উঠছিল। এখনকার কর্ম্মী সাহিত্যিক—'উত্তরা'-সম্পাদক শ্রীমান সুরেশ চক্রবর্ত্তী তখন এই দলে। হাতে লেখা এক মাসিকপত্র অবলম্বন করে সে লেখক সন্ধানে কাশী তোলপাড় করছিল। শুধু তাই নয়—একটা আদর্শ পাঠাগার খুলে কাশীবাসীর মনের উপর আলোকপাত করতে কি উৎসাহ তার! এখন ভাবি, উদ্যমের সঙ্গে যদি মহতী প্রেরণার যোজনা থাকে তা কখন ব্যর্থ হয় না, সুরেশেরও হয়নি। তাই বুঝি তারই ঐকান্তিক সাধনায় দুটি সঙ্কল্পই তার সিদ্ধ হয়েছিল। তারই হাতে-লেখা কাগজ কালক্রমে ছাপার অক্ষরে মুদ্রিত হয়ে বাঙলার বাহিরে বাঙালীর প্রথম মাসিক পত্রিকার গৌরব অর্জ্জন করে—আর সাহিত্য পরিষদ-শাখার দরজা বন্ধের ক্ষোভ মিটিয়েছিল—বিশ্বনাথ পাঠাগারের দরজা খুলে দিয়ে। উপযুক্ত ক্ষণেই যেন সাহিত্য-সাধক শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব ঘটে অনুষ্ঠানদুটিকে সার্থক করতে।

জঙ্গমবাড়ীর বড় রাস্তায়—বাঙালীটোলা ডাকঘরের সামনে সে জনপ্রিয় পাঠাগারটি অনেকেই দেখেছেন। তার বাসন্তী উৎসবে বহু সাহিত্য-রথীর পদধূলিও সেখানে পড়েছে। শরৎচন্দ্রও এমনি এক উৎসবে পৌরহিত্য করে তাঁর তরুণ জীবনের সঙ্গে সাহিত্য-জীবনের বহু কথাই কাশীবাসীকে শুনিয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্রকে আমাদের মধ্যে পাবার আগেই আমরা আর এক সাহিত্য-সাধককে পেয়েছিলাম। তিনি-রস-সাহিত্যিক শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। হাতের লেখা কাগজের লেখা খুঁজতে বেরিয়ে সুরেশ এঁকে আবিষ্কার করে ফেলে। ফলে আমাদের আসরটিও সরস হোয়ে ওঠে। শরৎচন্দ্রের প্রতিভার আলোকে তখন বাঙলার সাহিত্যক্ষেত্র উদ্ভাসিত, বাঙলার বাইরে প্রবাসী বাঙালী সমাজেও তার আভা ঠিকরে এসে পড়েছে। আসরে তাঁরই সৃষ্টির কথা প্রধান আলোচ্য, কেদারবাবুর মুখে রচনার প্রশংসা আর ধরে না। আলাপ-আলোচনায় সাহিত্যের আসরে শ্রীকান্তই যেন মূর্ত্তি ধরে দেখা দেয়, শ্রীকান্ত তখন বাঙলা সাহিত্যের বিস্ময়।



১৯২৭ বঙ্গাব্দে কাশীধামে বিশ্বনাথ পাঠাগারের বাসন্তী-উৎসবে শরৎচন্দ্র
বামদিক থেকে উপবিষ্ট : (১ম সারি) কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
(২য় সারি) সুরেশ চক্রবর্ত্তী, প্রবন্ধ লেখক—মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।
(উত্তরা-সম্পাদক সুরেশ চক্রবর্ত্তীর সৌজন্যে এই অপূর্ব্ব প্রকাশিত আলেখ্যটি প্রাপ্ত)

বেশ মনে আছে, নিবিষ্ট মনে আফিসের কাজ করছি, এমন সময় ঝড়ের মতন এসে সুরেশ বললে—হাতের কাজ ফেলে চেয়ে দেখুন দাদা, কাকে ধরে এনেছি।

চেয়ে দেখি, সুরেশের পিছনে এক শীর্ণকায় ব্যক্তি, পরিচ্ছদে কোন বৈচিত্র্য নাই, কিন্তু মুখের প্রচ্ছন্ন হাসি এবং দুটি চোখের দৃষ্টি কি মর্ম্মস্পর্শী!

সুরেশ তাড়াতাড়ি পরিচয় দিল—ইনিই শ্রীকান্তর শরৎবাবু, আমাদের টানেই কাশীতে এসেছেন।

সাহিত্যের আসরে অতি-আলোচ্য বহুবিখ্যাত ও বহুবাঞ্ছিত মানুষটিকে অপ্রত্যাশিতভাবেই এত কাছে পেয়ে চমৎকৃত হলাম বৈকি। যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করবার আগেই তিনি সামনের চেয়ারখানা টেনে নিয়ে বললেন—আপনিই নাট্যকার মণিলালবাবু, কাশীতে আসবার সময় ভারতবর্ষ আফিসে হরিদাসবাবু আমাকে বিশেষ করে আপনার কথাই বলে দিয়েছিলেন, কোন অসুবিধায় পড়লে যেন আপনার খোঁজ করি। কিন্তু আমি ভেবে ঠিক করতে পারছিনে, আপনার নাটুকে মনকে কি করে বেনারসীর ব্যাপারে টেঁকিয়ে রেখেছেন!

হেসেই জবাব দিলাম—মাস কয়েক যদি বেনারসে থাকতে পারেন, তাহলেই কথাটার জবাব নিজের মন থেকেই পাবেন।

সুরেশ অমনি রসান দিল—ওঁর মনকে শুকোতে দিইনি। দাদামশাই (কেদারবাবু) ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, ওঁকে আবার সাহিত্যের আখড়ায় ফিরে যেতে হবেই।

জিজ্ঞাসা করলাম—অসুবিধা কিছু হচ্ছে কি?

বললেন—কিচ্ছু না, বেশ আছি।

পুনরায় প্রশ্ন করলাম—বাসাটা ভালো পেয়েছেন ত?

উত্তর করলেন—ভালোবাসাই পেয়েছি, এখন আপনাদের ভালোবাসাটুকু পাবার আশাতেই এসেছি। চাই এখন সঙ্গী, আর আড্ডা।

এমন ভঙ্গি আর কৌতুকের সঙ্গে কথাগুলি বললেন, শুনে সবাই না হেসে পারলেন না। কাশীর বিখ্যাত খেয়ালী গাইয়ে নেপাল রায় এবং নাট্যবিদ্ মাষ্টার নলিনী ভট্টাচার্য্য এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। শরৎচন্দ্র এসেছেন শুনে তাঁরাও কাজ ফেলে আমাদের ঘরে উপস্থিত। অফিসের কাছেই রামাপুরায় কেদারবাবুর বাসা, তাঁকেও খবর দিয়ে আনা হোয়েছে, দেখতে দেখতে ঘরখানা ও বাইরে দালানটি কৌতূহলীদের সমাগমে ভরে গেছে তখন।

নেপাল রায় হাসতে হাসতে বললেন—আপনার নাম আর লেখা কিন্তু চেহারার সঙ্গে খাপ খাচ্ছে না।

হাসিমুখে শরৎবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—কেন বলুন ত?

নেপালবাবু বললেন—নাম ত দেশজোড়া, লেখার ধারাও সেই রকম, কারো সাধ্য নেই যে পাল্লা দেবে। কিন্তু চেহারা দেখে মনে করতে পারিনে যে আপনিই দুর্জ্জয় লিখিয়ে শরৎ চাটুয্যে।

নেপাল রায়ের চেহারাখানা ছিল রাশিয়ার জার নিকোলাস কিম্বা আমাদের স্বর্গত সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের ধাঁজের। তেমনি লম্বা, সেই রকম গোঁফ আর কেয়ারী-করা সুশ্রী দাড়ী। গায়ের জোরও তাঁর ছিল অসাধারণ। সুতরাং তখনকার শরৎবাবুর শীর্ণ চেহারা দেখে এরকম কটাক্ষ করা তাঁর পক্ষেই সম্ভব ছিল। কিন্তু শরৎবাবু প্রসন্ন মুখেই বললেন—আমার রোগা চেহারা দেখে এটা যেন ভাববেন না যে জোর আমার গায়ে মোটেই নেই। এই চেহারা নিয়েই একটা গোরার সঙ্গে ঘুসোঘুসি করেছি বর্ম্মায়।—এই সূত্রে বর্ম্মার আফিসে সাহেবের সঙ্গে ঝগড়া ও মারামারি করে কি ভাবে এক কথায় কাজ ছেড়েছিলেন—সে গল্প আমাদের সকলকে শুনিয়ে দিলেন।

কেদারবাবু এই চেহারার প্রসঙ্গে বললেন—চেহারা দেখেই যদি মানুষের যোগ্যতা বাচাই করা যায়, তাহলে সার গুরুদাস বাঁড়ুয্যে বা চন্দ্রমাধব ঘোষের সম্বন্ধে বলতে হয়—হাইকোর্টের জজ হোয়ে বসাটা তাঁদের ঠিক হয়নি।

প্রথম দিনের আলাপেই শরৎবাবুর সঙ্গে এমন একটা ঘনিষ্ঠতা আমাদের হোয়ে গেল যে, তিনি যেন আমাদের প্রত্যেকেরই কত পরিচিত! পরদিনই আমরা দল বেঁধে তাঁর বাসায় গিয়ে হাজির। শিবালয়ে একখানা ভালো বাড়ীই ভাড়া করে তিনি বাসা পেতেছিলেন। বাইরের ঘরখানিতে প্রকাণ্ড এক সতরঞ্চি পাতা, তার ওপর সাদা ধবধবে চাদর বিছানো। মাঝখানে একটা তাকিয়া ঠেস দিয়ে তিনি বসে আছেন। কাছে একটা কুকুর ছাড়া আর কেউ নেই। গৃহস্বামীর আগেই কুকুর সরবে আমাদের অভ্যর্থনা করল। শরৎবাবু তাড়াতাড়ি উঠে তাকে সামলে আমাদের পানে চেয়ে হাসতে হাসতে বললেন—একে দেখে ভয় পাবেন না, বেচারার সবই ভাল, দোষের মধ্যে খালি একটু কামড়ায়। প্রভুর স্বর শুনে প্রভুভক্ত প্রাণীটি শান্ত ও ভদ্রভাবে একটা লম্বা হাই তুলেই নিরস্ত হল, দোষটুকু তার চাক্ষুস না দেখতে পেয়ে আমরাও আশ্বস্ত হলাম। সাদর অভ্যর্থনা করে বসিয়ে প্রথমেই তাঁর সেই অমানুষ সাথীটির বিস্তৃত পরিচয় দিলেন। সে কি খায়, কি ভালবাসে, কিসে রেগে যায়, তাঁর কোন্ কোন্ লেখা আঁচড়ে কামড়ে ছিঁড়ে খুঁড়ে নষ্ট করে দিয়েছে—একটি একটি করে তাদের ফিরিস্তি প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে আমাদের শুনিয়ে দিলেন।

এর পরেই উঠল তাঁর সাহিত্য-সাধনা আর রচনা-রীতির কথা। বললেন—গোড়াতে ভাবতেই পারিনি যে মা-সরস্বতীর সেবা করে স্বচ্ছন্দভাবে দিন কাটাতে পারবো—চাকরীর পানে ঝুঁকতে হবে না! কিন্তু এটা বোধ হয় সম্ভব হোয়েছে ভারতবর্ষের ছোঁয়াচে। ভাগ্যবান হরিদাসবাবুদের সংস্পর্শে আসাতেই যেন মা-লক্ষ্মীরও ছোঁয়াচ পেয়েছি।

কথা প্রসঙ্গে মুক্তকণ্ঠেই তিনি অতীতের আর্থিক অভাবগুলোর কথা বিশদভাবেই ব্যক্ত করে তার পর উন্নতির ব্যাপারটিও খোলাখুলি ভাবে শুনিয়ে দিলেন—ভারতবর্ষের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হোয়ে কেমন করে তিনি সুপেয়-মুখ দেখেছেন। সুখের কথা বলতে বলতে হঠাৎ তিনি উত্তেজিত কণ্ঠে একথাও জানিয়ে দিলেন—এই যে এত মাখামাখি, ওঁদের এত সাহায্য পেয়েছি—এতে জীবনে ছাড়াছাড়ি না হবারই কথা। কিন্তু আমার পক্ষে সম্মানহানিকর বা আমি বরদাস্ত করতে অক্ষম—এমন কোন ঘটনা যদি কখন ঘটে, সেই মুহূর্ত্তেই মুখদেখাদেখি পর্য্যন্ত বন্ধ হোয়ে যেতে পারে। আমার স্বভাবের এইটিই হচ্ছে বিশেষত্ব।

অবশ্য, খুবই সুখের কথা—সে দুর্ভোগের ছায়াও-যে কোনদিন শরৎচন্দ্রের পরবর্ত্তী অধিকতর গৌরবোজ্জ্বল জীবনের উপর পড়বার অবকাশ পায় নি—এঁদের সম্প্রীতি ও সদ্ভাব-যে শেষ পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল সে কথা সবাই জানেন, আর তাঁর লেখা পত্রগুলি থেকেই সে পরিচয় আরো সুস্পষ্টভাবেই পাওয়া যায়।

রচনা-রীতি সম্বন্ধে শরৎবাবু বলেন—প্রথমে প্লটটি ঠিক করেই আমি পরিচ্ছেদগুলো সাজিয়ে ফেলি। কোন্ পরিচ্ছেদে কি কি থাকবে, খুব সংক্ষেপে টুকে রাখি। তার পর লেখা সুরু করি। কিন্তু পরিচ্ছেদ ধরে পর পর যে লিখে যাব—তার কোন ঠিক নেই। যে পরিচ্ছেদটা শেষ করতে মন থেকে তাগিদ পাই—সেইটিই আগে ধরি। এমন অনেক বইয়েই হোয়েছে যে, হয়ত প্রথম পরিচ্ছেদটা লিখেই, পাঁচ সাতটা পরিচ্ছেদ বাদ দিয়ে তার পর থেকে লেখা চালিয়েছি। এর পর খানিক দূর এগিয়ে আবার হয়ত পিছিয়ে আসতে হোল—যেগুলো ছেড়ে গেছি শেষ করতে। এই জন্যেই আমার কাপি পেতে প্রায় সকলকেই বেগ পেতে হয়।

একদিন কথাপ্রসঙ্গে শ্রীকান্তের কথা উঠল। সকলেই ধরে বসলেন—শ্রীকান্তের রহস্য আপনাকে ভাঙতেই হবে।

একটু গম্ভীর হোয়ে বল্লেন—শ্রীকান্ত সম্বন্ধে আপনাদের কি মনে হয় আগে বলুন ত শুনি?

বলা হোল—আপনার ভবঘুরে জীবনযাত্রার কথা যতটুকু শুনিছি তাতে মনে হয় যে নিজের জীবনের ঘটনাগুলির সব না হোক কিছু কিছু ওর মালমসলা হোয়ে আছে। অনেকেরই ধারণা—বেশীর ভাগ চরিত্রগুলিই সত্যি।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে শরৎচন্দ্র বললেন—আমার কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বন্ধু যিনি আমার অনেক খবর রাখতেন, শ্রীকান্ত পড়ে আমাকে কি লিখেছিলেন জানেন?

জানবার জন্যে আমরা জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম তাঁর মুখের পানে। মুখভঙ্গির কোন পরিবর্ত্তন না করেই বললেন—তিনি লিখেছিলেন: 'বইটার লিখনভঙ্গি থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে শ্রীকান্ত তুমি ছাড়া আর কেউ নয়। কিন্তু আমি হলপ নিয়ে বলতে পারি যে, শ্রীকান্ত তুমি একেবারেই নও।'—এর ওপর আর কথা আছে?

জিজ্ঞাসা করা হোল—আপনি এর কি উত্তর দিলেন?

সহজকণ্ঠেই বললেন—কিছু না।

অনুরোধ উঠল—বেশ ত, উত্তরটা এখানেই বলুন। একটা মস্ত সমস্যার সমাধান হোয়ে যায়।

বললেন—এ সমস্যার সমাধান নেই। এ ব্যাপারে যাঁরা খুব বেশী কৌতূহলী, তাঁদের মনে রাখা উচিত—বাস্তবের চেয়ে বেশী সত্য হোচ্ছে কবির মন। এই নিয়ে বেশী পীড়াপীড়ি করলে রবীন্দ্রনাথ রামায়ণ-সম্পর্কে নারদের মুখ দিয়ে যে কথা বলেছেন, সেইটিই বলতে হয়:

নারদ কহিলা হাসি' সেই সত্য, যা রচিবে তুমি।
ঘটে যা' তা' সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি
রামের জনমস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।

এর পর আর প্রশ্ন করা চলে না। প্রসঙ্গটা ত্যাগ করতে হোল।

বীণাপাণি প্রতিষ্ঠানে একটু ঘটা করেই পয়লা বোশেখের উৎসব হোত। এ সময় (১৩২৭ বঃ অঃ) শরৎবাবু কাশীতে, কাজেই উৎসবে তাঁকে পাবার আনন্দটাই বড় হোয়ে উঠল। শরৎবাবুর শিবালার বাসায় গিয়ে নিমন্ত্রণ করতেই হেসে বললেন: যাব বৈকি, নিশ্চয়ই যাব।

সন্ধ্যার আগেই শরৎবাবু এলেন। মজলিসের মাঝখানেই তাঁকে বসবার জন্যে অনুরোধ করা হোল, কিন্তু তিনি ফরাসে না বসে কিনারার দিকে রাখা একখানা চেয়ারের হাতলটি ধরে বললেন: এই জায়গাটিই ভালো।

শরৎবাবু আসবেন শুনে কাশীর বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অনেকেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। চেয়ারে বসেই শরৎবাবু বললেন: এটা খুব ভালো, বাঙলা ছেড়ে এসেও আপনারা বাঙালীর এই উৎসবটাকে ছেড়ে দেন নি, ধরে রেখেছেন।

কেদারবাবু বললেন: ছাড়বার জো কি, যতক্ষণ মা-লক্ষ্মীরা আছেন।

হঠাৎ শরৎবাবু জিজ্ঞাসা করলেন: আপনাদের চিঠিতে খাতা-মহরতের কথাটা নেই কেন বলুন ত?

কথার জবাব সুরেশই দিল খপ্ করে: দাদা ওটাকে বাদ দিয়েই সুরু থেকে উৎসবটা চালিয়ে আসছেন। উনি বলেন—উৎসব সেখানে সার্থক হয় না, দেনা-পাওনার ঝঞ্ঝাট যেখানে থাকে।

সোজা হয়ে বসে শরৎবাবু বললেন: ঠিক এই কথা নিয়েই কলকাতায় আমার এক ব্যবসাদার বন্ধুর সঙ্গে লাঠালাঠির জো হোয়েছিল।

কথাটা শোনবার জন্যে সকলকেই কৌতূহলী দেখে শরৎবাবু বললেন: আমার সে বন্ধুটি জামা-কাপড়ের কারবার কোরে লক্ষপতি হয়েছিলেন। আর সব কাজই সংক্ষেপে সেরে এদিনের উৎসবটাই শুধু জাঁকিয়ে কোরতেন তিনি। যাকে বলে—'জন্মের মধ্যে কর্ম্ম নিমুর চৈত্র মাসে রাস!' কিন্তু চিঠির নিচে পাওনার অঙ্কটা কিছুতেই বাদ দিতেন না। আমি একবার তাঁকে ঠাট্টা করে বলি—এ যে তোমার এক হাতে ভোজের পাতা দেখানো, আর একখানা হাত ভদ্রলোকদের পকেটে চালানো হোচ্ছে হে! কথাটা শুনে তিনি চটে উঠে বললেন—এটা হচ্ছে নেম কর্ম্ম, কেন এ প্রথাটা আছে জানো—লোকে সম্বৎসর ধরে পাওনাদারদের পাওনা দেবে, দেনা বাড়বে না; দুপক্ষেরই এতে লাভ—বুঝলে?

কথাগুলি হয়ত তাঁর যাদুকরী ভাষায় আরো চমৎকার করেই তিনি বলেছিলেন। তাঁর সংস্পর্শে নানা সূত্রেই দেখিছি—সভায় দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেওয়ার চেয়ে মজলিসে বসে গল্প বলবার ভঙ্গিতে বক্তব্য বিষয়টা বলা তিনি বেশী পছন্দ করতেন, আর সেইটিই শ্রোতাদেরও মর্ম্মস্পর্শী হোত।

কথায় কথায় প্রশ্ন উঠল—কাশী কেমন লাগছে?

বললেন: খুব ভাল। এখানে যেন একটা প্রচণ্ড আকর্ষণ রয়েছে, ছেড়ে যেতে ইচ্ছে হোচ্ছে না। এই দেখুন না, যাই যাই কোরেও যেতে পারছি নে। এক একবার ভাবি, বাড়ীটা এখানে করলেই হয় ত ভালো হোত।

কেদারবাবু বললেন: ওটা প্রায় সবারই মনে হয়, নিশ্চয়ই স্থান-মাহাত্ম্য। কাশীতে দিন কতক থাকলেই মনে ওঠে—আস্তানা একটা ফেঁদে ফেলি। জমি দেখা, দালালের আনাগোনা দিনকতক খুবই চলে। কিন্তু তার পর অকল্যাণ ব্রিজ পার হোলেই কালভৈরব সব ভুলিয়ে দেন।

এই সময় সামতাবেড়ে শরৎবাবুর পল্লীভবন তৈরী হচ্ছিল, তাঁর মুখেই সে কথা শুনেছিলাম। সুতরাং বলতে হোল: যেটা ফেঁদেছেন, সেইটিই আগে শেষ হোক। কাশীতে নিজের বাড়ী না থাকলেও থাকবার অসুবিধা নেই। তবে যদি স্থায়ী হতে চান, সে কথা আলাদা।

বললেন—সত্যিই থাকতে ইচ্ছে হোচ্ছে। আমার খুব ভালো লেগেছে জায়গাটি।

কেদারবাবু বললেন—যদি জষ্টিটা পর্য্যন্ত ভালো লাগে, তাহলেই বুঝবো উতরে গেলেন।

হেসে বললেন—গরমের ভয় দেখাচ্ছেন ত? তাহলে এর উত্তরে বলতে হয়—

রাবণ শ্বশুর মোর, মেঘনাদ স্বামী,
আমি কি ডরাই সখি, ভিখারী রাঘবে?

সকলেই হেসে উঠলেন। বললাম—আপনার শ্রীকান্তের নজিরে কথাটা আমরা মেনে নিতে বাধ্য।

বৈঠকে গান বাজনারও আয়োজন ছিল। তাতেই বুঝতে পারি, গানেও ছিলেন তিনি পাকা ওস্তাদ এবং সমঝদার।

এর পর এল ভোজের পর্ব্ব। কিন্তু এ ব্যাপারে তাঁর খেয়ালী স্বভাবটির সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া গেল। শরৎবাবুকে ব্রাহ্মণদের জন্যে নির্দিষ্ট পংক্তিতে বসবার অনুরোধ করতেই তিনি বললেন—আমি ওখানে গিয়ে বসতে পারি, কিন্তু ওঁদের হয় ত আপত্তি হবে।

জিজ্ঞাসা করা হোল—একথা বলছেন কেন?

বললেন—আমি ত জুতো খুলবো না। যে ভয়ে ফরাসের বিছানায় বসিনি, ওঁদের দলে বসতেও সেই ভয়! অর্থাৎ জুতো খুলছিনে, তাতে খাওয়ান, বা নাই খাওয়ান।

সেই যে জেদ ধরলেন, তা থেকে কিছুতেই নিরস্ত করতে পারা গেল না। আমাদের অগ্রজকল্প সুহৃদ কলকাতা পুলিসের হেমচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয়ও সে সময় কাশীতে বায়ু পরিবর্ত্তনে যান, তিনিও নিমন্ত্রিত হোয়ে উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি একটা আলাদা ঘরে খাবার ব্যবস্থার কথা বলতেই শরৎবাবু আবার গেলেন বিগড়ে। অপ্রসন্নভাবে বললেন—নিতান্তই তাহলে আমাকে 'এক ঘরে' করতে চান। কিন্তু বলুন ত, জুতো পায়ে দিয়ে খেতে বসলে কি দোষ হয়?

তর্ক আর বাড়াবার প্রয়োজন হোল না, কেদারবাবু আর শ্রীমান

সুরেশ উদ্যোগী হোয়ে তরুণ ভক্তদের সঙ্গে শরৎবাবুকে ঘিরে একটা ঘরে বসলেন। হাঙ্গামা গেল মিটে।

কাশী থেকে মাসিক পত্র বার করবার উৎসাহ শরৎবাবুকে পেয়ে যে তীব্রতর হোয়ে ওঠে সে কথা বলাই বাহুল্য। তাঁকে ধরা গেল—কাশী থেকে যখন কাগজ বেরুচ্ছে, আপনিও ঘটনাচক্রে কাশীতে এসে পড়েছেন, আপনাকে কিছু লিখতেই হবে। অবশ্য তার জন্যে দক্ষিণাও আমরা দেব।

হেসে বললেন—পয়সার কথা বলছেন; দেখুন, কাশীতে কিছু লিখব না এই সঙ্কল্প করেই এসেছি। আর আগেই ত বলেছি, এখানে চাই শুধু আপনাদের ভালোবাসা—পয়সা নয়। হ্যাঁ, লেখা একটা দেব আমি, একটা উপন্যাসই সুরু করব। কিন্তু তাঁর জন্যে কিছু নেব না।

কথা শুনে আমরা ত অবাক! এমন প্রতিশ্রুতি তিনি দেবেন, কল্পনাও করিনি। শরৎবাবু তাঁর কথা রেখেছিলেন। তাঁর সেই উপন্যাস 'বাড়ীর কর্ত্তা' নামে 'প্রবাস জ্যোতি' পত্রিকায় ছাপাও হয়েছিল। অবশ্য উপন্যাসটি তিনি শেষ করতে পারেন নি, পরে প্রবাস জ্যোতিতে যে কয় দফা ছাপা হোয়েছিল, তাকেই অবলম্বন করে 'রসচক্র' নামে বারোয়ারী উপন্যাসটি 'উত্তরা' কাগজে ধারাবাহিক-রূপে ছাপা হয়।

প্রায় দুটি মাস তিনি কাশীতে ছিলেন এবং এর পরেও দুবার কাশীর সঙ্গে যোগসূত্র রচনা করেছিলেন। দ্বিতীয়বার যখন আসেন, সেটা শীতকাল—মাঘ মাসের শেষাশেষি। কাশীতে সারস্বত উৎসবের মরশুম চলেছে। শরৎবাবুকে পেয়ে আমরা ত বর্ত্তে গেলাম। সেবারের উৎসবে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করে তাঁর সাহিত্য-সাধনার আনুপূর্ব্বিক কাহিনী কাশীবাসীকেই সর্ব্বাগ্রে শুনিয়ে প্রচুর আনন্দ দিলেন তিনি। শুধু তাই নয়, যখন প্রকাশ করলেন যে, এর আগে আর কোন সভায় কেউ তাঁকে সভাপতির আসনে বসাতে পারেনি—কাশীতেই আমরা তাঁর নিয়মভঙ্গ করেছি!—তখন আমরাও গর্ব্ববোধ করেছিলাম বৈকি! তাঁর সঙ্গ ও সাহচর্য্যের সেই মধুর স্মৃতি আজও আমাদের অন্তরকে যেন আচ্ছন্ন করে রেখেছে। আজও কাশীর কর্ম্মীদল জীবন-মধ্যাহ্নের প্রান্তে এসে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে থাকেন—আমরা একদিন আমাদের মধ্যেই তাঁকে পেয়েছিলাম, যিনি ছিলেন আমাদের সত্যকার মরমী ও দরদী কথাশিল্পী।

দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীঅনিলকুমার বিশ্বাস

যে সকল মনীষীর ভাবধারা ও কর্মপ্রচেষ্টা উনবিংশ শতকে বাংলায় সংস্কৃতির আশ্চর্য রূপান্তর ঘটাইয়াছিল, তাঁহাদের অনেকের নির্লোভ যশোবিমুখতা ও আত্মপ্রচারে নিশ্চেষ্টতার জন্য অত্যন্ত অল্পদিনেই বাংলা দেশ তাঁহাদের ভুলিতে বসিয়াছে।

রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজনারায়ণ বসু, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, নবগোপাল মিত্র, মনোমোহন ঘোষ প্রভৃতির বহুমুখী কর্ম প্রতিভার পরিচয় আমরা কতটুকুই বা রাখি? প্রাতঃ-স্মরণীয় এই সব চিন্তানায়কদের এইভাবে বিস্মরণে তাঁহাদের কোনই ক্ষতি হয় না, ক্ষতি হয় জাতির।

এই কর্মীদলের অন্যতম—অবলাবান্ধব দ্বারকানাথের জন্ম শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইবে আগামী ৯ই বৈশাখ। ১২৫১ বংগাব্দের ৯ই বৈশাখ বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত মাগুরখণ্ড গ্রামে কুলীন ব্রাহ্মণ বংশে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। যৌবনেই কুলীন কন্যাদের দুঃখে বিচলিত হইয়া তিনি ফরিদপুরের এক সুদূর পল্লীগ্রাম হইতে 'অ ব লা বা ন্ধ ব' নামে এক পাক্ষিক পত্রিকা বাহির করিয়া যে সমস্ত অগ্নিগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত করিতে থাকেন তাহাতে সারা বাংলা দেশে সাড়া পড়িয়া যায়। ব্রাহ্মসমাজের আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁহার আত্মচরিতে 'অবলা বান্ধব' সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:

> "এই রঙ্গভূমিতে অবলা বান্ধব দেখা দিল। আমরা ভাবিলাম, এ কে বঙ্গদেশের এক কোণ হইতে নারীকূলের হিতৈষী দেখা দিল?"

শিবনাথ প্রভৃতি কলিকাতার অগ্রণী ছাত্রদলের আগ্রহাতিশয্যে দ্বারকানাথ 'অবলা বান্ধব' লইয়া কলিকাতায় আসিলেন এবং পূর্ববংগীয় যুবকদলের নেতা স্বরূপ হইয়া স্ত্রী-স্বাধীনতার পতাকা উড়াইলেন।

ফরিদপুরে থাকার সময়ে ঢাকার নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় ও তাঁহার ভ্রাতা শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি উদ্যমশীল কুলীন ব্রাহ্মণ যুবকদিগের সহিত দ্বারকানাথের সংযোগ ঘটে। এই যোগাযোগের ফলে, এই যুবকগণ বিক্রমপুরের বহু কুলীন কুলললনাকে মৃত্যুপথ যাত্রী অতি বৃদ্ধ অথবা বহুদারসমন্বিত পাত্রের সহিত বিবাহ বন্ধ করিবার জন্য, ঐ কন্যাদের যুবক আত্মীয়দের সহায়তায় হরণ করিয়া আনিয়া কলিকাতায় সৎপাত্রে অর্পণ করিতে থাকেন।

এই সকল কাযে তাঁহাদিগকে বহুবার বিপন্ন ও আদালতে অভিযুক্ত পর্যন্ত হইতে হয়। বিধুমুখী মুখোপাধ্যায় নামে এক কুলীন কন্যাকে এইভাবে উদ্ধার করিতে গিয়া, বিধুমুখীর নিকট-আত্মীয় সারদানাথ হালদার ও তাঁহার ভ্রাতা বরদানাথ হালদার * আদালতে অভিযুক্ত হন। দ্বারকানাথ ও মনোমোহন ঘোষের চেষ্টায় তাঁহারা সেবার হাইকোর্টের বিচারে মুক্তিলাভ করেন।

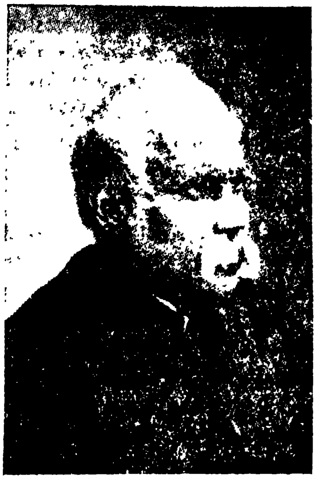
মুক্তি প্রদানকালে বিচারক এই সমস্ত যুবকদিগের সৎকীর্তির প্রশংসা করায়, এইরূপ কাযের জন্য ভবিষ্যতে আর এই যুবকদলকে আদালতে অভিযুক্ত হইতে হয় নাই।

বহু কুলকন্যা এইভাবে আনীত হইয়া সৎপাত্রে অর্পিত হইবার পূর্বে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের জ্যেষ্ঠতাত দুর্গামোহন দাশের আলয়ে আশ্রয় প্রাপ্ত হন। ইঁহাদের সৎশিক্ষা দানের ব্যবস্থা করিবার চিন্তা দ্বারকানাথকে ব্যস্ত করিয়া তুলিল। মনোমোহন ঘোষের বাটীতে তখন মিস্ অ্যাকরয়েড নাম্নী এক সুশিক্ষিতা ইংরেজ মহিলা অবস্থান করিতে-ছিলেন। দ্বারকানাথ তাঁহার সহায়তায় ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে 'হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়' নামে একটি স্কুল স্থাপন করিয়া, এই সকল উদ্ধারপ্রাপ্তা কুলকন্যা ও যে সকল প্রগতি-বাদী পরিবার আপন পরিবারস্থ বালিকাদিগকে উচ্চশিক্ষা দানে ইচ্ছুক ছিলেন, তাঁহাদের কন্যাদের উচ্চ শিক্ষালাভের ব্যবস্থা করেন। তখন পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতের ব্যবস্থা অন্য কোনও বালিকা বিদ্যালয়ে ছিল না। দ্বারকানাথ মহিলাদের উচ্চশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া, এই স্কুলের ছাত্রীদিগকে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের এণ্ট্রান্স পরীক্ষার উপযুক্ত করিয়া তুলিতে লাগিলেন। তাঁহার শিক্ষকতার গুণে এই স্কুল অতি অল্পদিনের মধ্যেই বাংলার শ্রেষ্ঠতম বালিকা বিদ্যালয়ে পরিণত হইল।

---

* উত্তরকালে এই বরদানাথের কন্যা বাসন্তী দেবীর সহিত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের বিবাহ হয়।

সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক হেনরী বেভারিজের সহিত কুমারী অ্যাক্রয়েডের বিবাহ হইয়া যাওয়ায় ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় উঠিয়া যায়। দ্বারকানাথ কিন্তু উহাতে দমিলেন না। ঐ



দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়

বৎসরই তিনি আনন্দমোহন বসু ও দুর্গামোহন দাশের অর্থানুকূল্যে 'বংগ মহিলা বিদ্যালয়' স্থাপন করিয়া বালিকাদের উচ্চ শিক্ষালাভের পথ অব্যাহত রাখিলেন। এই স্কুলের শিক্ষাদান পদ্ধতি এত উৎকৃষ্ট ছিল যে, ১৮৭৬-৭৭ খৃষ্টাব্দের ডাইরেক্টার অফ পাবলিক ইনষ্ট্রাকশনের রিপোর্টে এই স্কুল সম্বন্ধে বলা হয়:

> "The latter [Bungo Mohila Vidyalaya] is, in every sense, the most advanced school in Bengal,"

বংগ মহিলা বিদ্যালয়ের ছাত্রী কাদম্বিনী বসু ও সরলা দাসের কৃতিত্ব দর্শনে বাংলার তৎকালীন প্রধান বিচারপতি ও বেথুন স্কুলের সভাপতি স্যার রিচার্ড গার্থ ঐ স্কুলের সহিত বেথুন স্কুলের মিলন ঘটাইতে প্রয়াসী হন। স্কুল দুইটি মিলিয়া গেলে, বেথুন স্কুলের ছাত্রী কাদম্বিনী কৃতিত্বের সহিত এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কাদম্বিনীর উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য বাংলা সরকারকে বেথুন কলেজ স্থাপন করিতে হয়।

দ্বারকানাথ কাদম্বিনীকে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের জন্য উৎসাহিত করিতে থাকেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কাদম্বিনী বসু ও ডেরাডুন নিবাসী চন্দ্রমুখী বসু বেথুন কলেজ হইতে বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে প্রথম মহিলা গ্র্যাজুয়েট হইবার সম্মান অর্জন করেন। বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে, তখন পর্যন্তও কোন স্থানে মহিলাদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার উন্মুক্ত হয় নাই; সেজন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার খুলিতে বহু বাধা বিপত্তি দেখা গিয়াছিল, প্রধানত: দ্বারকানাথের চেষ্টায়ই ঐ বিপত্তি সকল দূর হয়। শিক্ষিতা নারী মাত্রেরই সেজন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

যে দেশে অবরোধ প্রথা এত ব্যাপকভাবে প্রচলিত, সেদেশে অন্ত:পুরে থাকিয়াই যাহাতে মহিলাগণ শিক্ষালাভ করিতে পারেন, সেইরূপ শিক্ষাদান প্রণালী উদ্ভাবিত না হইলে স্ত্রীশিক্ষা ব্যাপকতা লাভ করিতে পারে না বুঝিতে পারিয়া, দ্বারকানাথ ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে 'বিক্রমপুর সম্মিলনী' স্থাপন করিয়া—অন্ত:পুরে স্ত্রী-শিক্ষা প্রচারে ব্রতী হইলেন। নারী জাতিকে জাতীয়ভাবে উদ্বুদ্ধ করাই এই শিক্ষা আন্দোলনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল। বিক্রমপুর সম্মিলনীর প্রথম বার্ষিক রিপোর্টে দ্বারকানাথ লেখেন:

> "যে প্রণালীতে ইতিহাস লিখিত হইয়া থাকে, তাহা পাঠ করিয়া কুলকন্যাদিগের কোনও উপকার আছে, এমত বোধ হয় না। তবে, যদি প্রকৃত রাজনৈতিক ও জাতীয় উন্নতির ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়, প্রাপ্তবয়স্কা শিক্ষিতা কুলকন্যাগণ তাহা পাঠ করিতে পারেন। ভূগোলের স্থূল জ্ঞান থাকা উচিত বটে, কিন্তু যাঁহারা নিজেদের রক্তবাহী শিরা-সকলের নির্দিষ্ট স্থান অবগত নহেন, তাঁহাকে সাইবেরিয়ার বিজন প্রান্তরবাহী নদীসমূহের নামমাত্র কণ্ঠস্থ করাইয়া কি ফল, বুঝা যায় না। তথাচ ইহা বলা আবশ্যক যে, ভৌগলিক বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয় ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক বিষয় সকলের সহিত যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়া মুদ্রিত হইলে তাহা অবশ্য পাঠ্য করা যাইতে পারে।"

নারীজাতির উপযোগী পাঠ্যপুস্তকের অভাব মোচনের জন্য দ্বারকানাথ বিবিধ পাঠ্য পুস্তক রচনা ও সংকলনে প্রবৃত্ত হন। তিনি 'সরল পাটিগণিত', 'ভূগোল', 'স্বাস্থ্য তত্ত্ব', 'কবিগাথা', 'কবিতা মালা' প্রভৃতি বহু পাঠ্য-পুস্তক প্রকাশ করেন। বালিকাদিগের মনে জাতীয়তার ভাব জাগ্রত করিবার মানসে, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে দ্বারকানাথ 'জাতীয় সঙ্গীত' নামে একটি জাতীয়তা বোধ উদ্দীপক সংগীত সংগ্রহ প্রকাশ করেন। বাংলা ভাষায় ইহাই সর্বপ্রথম জাতীয় সংগীত সংগ্রহ।

এই সংগ্রহে দ্বারকানাথের স্বরচিত অনেকগুলি সংগীত আছে, তন্মধ্যে—

> "না জাগিলে ভারত ললনা
> এ ভারত আর জাগে না জাগে না।"
> "কাঁপিবে বিমান পৃথি পুন: বিক্রমে নবীন,
> রহিবে না পুণ্যভূমি চির পরাধীন।"

গান দুটি জনসমাজে অত্যন্ত আদৃত হইয়াছিল।

কেবলমাত্র নারী প্রগতির আন্দোলনেই দ্বারকানাথের শক্তি সীমাবদ্ধ ছিল না, তিনি ছিলেন কাজের মানুষ, কর্মই ছিল তাঁর জীবন। ধর্ম,



ডাক্তার কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়

সমাজ ও রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের সকল কর্মক্ষেত্রে ও সকল প্রগতিমূলক কার্যেই তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, ভারত সভা,

কংগ্রেস প্রভৃতি স্থাপনে যাঁহারা অগ্রণী ছিলেন, দ্বারকানাথ তাঁহাদের মধ্যে একজন প্রধান নায়ক।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার আত্মজীবনী 'A Nation in the Making' গ্রন্থে দ্বারকানাথ সম্বন্ধে বলিয়াছেন :

"Associated with us in our efforts to organise a new association upon popular lines was a devoted worker, comparatively unknown then, and I fear, even now, whose memory deserved to be rescued from oblivion."

ভারত সভাকে প্রকৃত গণতান্ত্রিক সভারূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য দ্বারকানাথ বাংলার গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া কৃষক ও রায়ত সভা স্থাপন করিয়াছিলেন। এ সম্পর্কে কৃষ্ণকুমার মিত্র তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন :

"বাবু দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী ভারত সভার সহকারী সম্পাদক ছিলেন। তিনি কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য, কালীপ্রসন্ন দত্ত, কালীশঙ্কর রায়চৌধুরী ও আমাকে সঙ্গে লইয়া নদীয়া, হুগলী ও হাওড়া জেলার নানাস্থানে গমন করিয়া রাজসভার আয়োজন করিতেন। ......নদীয়া জেলার কৃষ্ণগঞ্জের সভায় প্রায় বিশ হাজার প্রজা সমবেত হইয়াছিল।"

এইভাবে পোড়াদহে, কুষ্টিয়ায় ও তারকেশ্বরেও হাজার হাজার প্রজা সমবেত হইয়া, জমিদারের অত্যাচারের প্রতিবিধান করিতে দৃঢ়সংকল্প হইয়া, আন্দোলনে যোগদান করে। এই আন্দোলনের ফলে প্রজাদের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া প্রজাসত্ব আইন পরিবর্তিত করিতে বাংলা সরকার বাধ্য হন।

কংগ্রেসে নারী জাতির যোগদানের অধিকারও দ্বারকানাথের প্রচেষ্টাতেই স্বীকৃত হয় ও কংগ্রেসের ষষ্ঠ অধিবেশনে যে ছয়জন নারী প্রতিনিধি সর্বপ্রথম কংগ্রেসের ডেলিগেট রূপে যোগদান করেন, তন্মধ্যে দ্বারকানাথের পত্নী কাদম্বিনী দেবী অন্যতম। কংগ্রেসের সপ্তম অধিবেশনে কলিকাতায় কাদম্বিনী দেবীই বক্তৃতা প্রদান করিয়া, আলোচনায় নারীর যোগদানের ও ভোটদানের অধিকার সর্বপ্রথম গ্রহণ করেন।

অল্প পরিসরের মধ্যে দ্বারকানাথের কর্মবহুল জীবনের সম্যক পরিচয় দেওয়া অসম্ভব। 'অবলা বান্ধব' ব্যতীত তিনি 'সমালোচক' ও 'সঞ্জীবনী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। কবি, গীতিকার, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, সাংবাদিক, সমাজ সংস্কারক, শিক্ষা সংস্কারক ও রাষ্ট্রবীর দ্বারকানাথের বহুমুখী কর্মপ্রতিভার সম্যক পরিচয় দানের প্রচেষ্টা এত ক্ষুদ্র স্থানের মধ্যে না করাই ভাল ; তবে কংগ্রেস বিষয় নির্বাচনী সভা যে তাঁরই চেষ্টাতে সম্ভব হইয়াছিল ও আসামে চা বাগানে কুলি নামে যে দাস শ্রেণী কৃতদাসের জীবনযাপন করিতেছিল, তাহাদের দাসত্ব বিমোচনে দ্বারকানাথের প্রচেষ্টার উল্লেখ না করিলে এই অকুতোভয় কর্মীর জীবন কথা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

ব্রাহ্মসমাজের ধর্মপ্রচারক রামকুমার বিদ্যারত্ন প্রচার ব্যাপদেশে আসাম পরিভ্রমণ করিতে গিয়া, কুলিদের দাসত্ব কতদূর ভয়াবহ তাহার পরিচয় লাভ করেন। তাঁহার নিকট হইতে কুলী কাহিনী শ্রবণ করিয়া নিপীড়িতের অকৃত্রিম সুহৃদ দ্বারকানাথের হৃদয় বিচলিত হইল। তিনি কুলিদের অবস্থা সম্যক অবগত হইবার জন্য ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে স্বয়ং কুলির ছদ্মবেশে আসামে গমন করেন। তথ্য সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলে চা'করগণ দ্বারকানাথের উপস্থিতি ও উপস্থিতির কারণ অবগত হইয়া তাঁহার প্রাণনাশের চেষ্টা করিতে থাকেন। দ্বারকানাথ বিপদে ভীত না হইয়া, জীবন বিপন্ন করিয়াও কুলি জীবনের দুর্দশার প্রত্যক্ষ জ্ঞান আহরণ করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিয়া 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় ও 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিয়া এক মহা আন্দোলনের সৃষ্টি করেন। তাঁহাকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া কুলিদের পক্ষ হইয়া, আড়কাটিদের বিরুদ্ধে বহু মামলা পরিচালন করিতে হয়। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে তিনি কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে আসামের কুলিদের দাসত্ব প্রথার বিরুদ্ধে প্রস্তাব উত্থাপন করিতে চাহিলে—উহা প্রাদেশিক সমস্যা বলিয়া প্রস্তাব তুলিতে দেওয়া হয় নাই। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে প্রাদেশিক সমস্যাগুলির আলোচনার জন্য প্রাদেশিক সম্মিলনীর ব্যবস্থা হইলে, কলিকাতা শহরে উক্ত বৎসর ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের সভাপতিত্বে বংগীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রিয় সম্মিলনীর প্রথম অধিবেশন হয়। তাহাতে কুলিসমস্যা আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বিপিন চন্দ্র পাল আসামের প্রতিনিধি বলিয়া তিনি ঐ প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন। বাংলার সর্বপ্রধান সমস্যা এই কুলি সমস্যা, ইহা অনুভব করিয়া এই প্রস্তাবটি সর্বপ্রথম উত্থাপন করিতে দেওয়া হয়। দ্বারকানাথের উপর প্রস্তাবটি সমর্থনের ভার পড়ে। তিনি তীব্র জ্বালাময়ী ভাষায় কুলিদের দুঃখ কাহিনী বর্ণনা করেন ও আড়কাটিদের হাত হইতে তাহাদের উদ্ধারের জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করা হইতেছে তাহাও বলেন।

বহু আন্দোলনের পর ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস কুলি আন্দোলনের যৌক্তিকতা স্বীকৃত হয় এবং কংগ্রেস হইতে কুলি আইনের পরিবর্তন দাবী করা হয়। ইহার ফলেই 'ইণ্ডেঞ্চার সিস্টেম' উঠিয়া যায় ও দাসত্ব প্রথা তিরোহিত হয়। দ্বারকানাথের ন্যায় শ্রমিক নেতা আজও দুর্লভ।

বেথুন স্কুলের ধর্মনীতিবিবর্জিত শিক্ষাপদ্ধতি দ্বারকানাথের চিত্তে ক্লেশ দিতে থাকে, সেজন্য তিনি গার্হস্থ্য বিদ্যা—স্বাস্থ্যতত্ব, সীবনবিদ্যা, রন্ধন বিদ্যা প্রভৃতি ও নীতিশিক্ষাকে কেন্দ্র করিয়া নারীর উচ্চ শিক্ষাদানের নিমিত্ত একটি স্কুল স্থাপন করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়েন। ইহার ফলেই ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ের প্রতিষ্ঠা হয় ও স্কুলটির উন্নতির জন্য স্কুলের কর্ম সম্পাদকরূপে দ্বারকানাথ অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে থাকেন। তাঁহার চেষ্টায় উহা এত উন্নতিলাভ করে যে শিক্ষা বিভাগের রিপোর্টে উক্ত স্কুল বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ স্কুল বলিয়া স্বীকৃত হয়।

দ্বারকানাথ বিবাহের পর পত্নীর উচ্চশিক্ষার পথ রোধ করেন নাই। নারী জাতির রোগ চিকিৎসার জন্য নারী চিকিৎসকের প্রয়োজন অনুভব করিয়া তিনি স্বীয় পত্নী কাদম্বিনী দেবীকে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করাইয়া দেন। সে স্থানে শিক্ষা সমাপ্ত হইলে পর বিলাতে এডিনবরা শহরের রয়েল কলেজে শিক্ষালাভের জন্য প্রেরণ করেন। কয়েকটি শিশু সন্তানকে দেশে রাখিয়া তরুণী জননীর দূর দেশে গমন অসম্ভব বলিয়া সেকালে লোকে মনে করিত। দৃঢ়চেতা দ্বারকানাথের নিকট কর্তব্যবোধে সে অসম্ভবও সম্ভব হইল।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জুন মাত্র ৫৪ বৎসর বয়সে দ্বারকানাথের দেহাবসান ঘটে। কর্মের চাপে কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াও দ্বারকানাথ শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কর্মের চিন্তা ত্যাগ করেন নাই। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে তিনি গাহিয়াছিলেন :

"তুমি কাল ভাঙ্গ বটে, দেহ মৃত্তিকার ঘটে,
নাশিবে সে অমর আত্মা, শকতি কি আছে এত ?"

কালের নিষ্ঠুর আঘাতে দ্বারকানাথের দেহ মৃত্তিকার ঘট ভাংগিয়া গিয়াছে, কিন্তু তিনি যে সকল কর্মযজ্ঞের আয়োজন করিয়া গিয়াছেন সেগুলি সার্থক হইয়া উঠিয়া তাঁহার কীর্তিকে জীবিত রাখিয়াছে।

এরূপ একজন নিরলস কর্মতপস্বীর জন্য বার্ষিকী শ্রদ্ধায় স্মরণীয়। ভারত সভা, সাংবাদিক সংঘ, শ্রমিক সংঘ ও নারী শিক্ষা পরিষদগুলির সেজন্য অবহিত হওয়া উচিত।

দিল্লীতে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন

(জনৈক প্রতিনিধির বিবরণ)

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের দিল্লী অধিবেশনে বহু সুধীজনকে বলিতে শুনিয়াছি এবং একাধিক সংবাদপত্রে লিখিতে দেখিয়াছি যে বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে এই অধিবেশন স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। সে সম্বন্ধে আমার নিজেরও কোনও সন্দেহ নাই।

এই অধিবেশনের বৈশিষ্ট্যগুলি ও বাঙ্গালা সাহিত্যের পক্ষে কল্যাণকর বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন। সম্মেলনের দ্বিতীয় দিবসে প্রবাসী



শ্রীমতী কমলা দাশ

বাঙ্গালী শাখার সভায় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ রক্ষিত প্রবাসী বাঙ্গালীর অবস্থা ও বর্ত্তমান দুর্ব্বলতাগুলির আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, এবৎসর ভারতবর্ষের বহু সহরেই সম্মেলনকে নিমন্ত্রণ করাইতে তাঁহারা ব্যর্থকাম হইয়াছিলেন এবং দিল্লীতেও বহু বিশিষ্ট বাঙ্গালী অধিবেশন আমন্ত্রণ করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন ; তাহা সত্ত্বেও সম্মেলনের কর্ত্তৃপক্ষ এমন একজন শক্তিশালী বাঙ্গালী যুবকের সাহায্য পাইয়াছেন যাঁহার চেষ্টা ও উৎসাহে ভারতের রাজধানীতে এই সম্মেলন আহ্বান করা সম্ভব হইয়াছে। সংবাদপত্রের মারফত বাঙ্গালী সাহিত্যরসপিপাসু সকলেই জানিয়াছেন যে বিভিন্ন দেশের সুধীমণ্ডলী তাহাদিগের দেশের পক্ষ হইতে বাংলা-সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আমরা শুধু নিজের ঘরে বসিয়া নিজেদের শ্রেষ্ঠ বলিয়া ঘোষণা করিলেই নিখিল বিশ্ব আমাদিগকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিবে না। বাহিরের সকলে যখন আমাদিগকে স্বীকার করে তখনই আমরা সম্মানের আসন পাই। এই বৎসরের নয়া-দিল্লী অধিবেশনে সেই সম্মান ও স্বীকৃতির আসন এই সর্ব্বপ্রথম প্রতিষ্ঠা করা হইল। সম্মেলনের প্রধান কর্মসচিব শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ আই-সি-এস্ মহাশয়ের অক্লান্ত চেষ্টার ফলেই ইহা সম্ভব হইয়াছিল। বর্ত্তমান চীনের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ও বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে বিশিষ্ট আসন-প্রাপ্ত ডক্টর লিন ইয়ুটাং-এর সহিত শ্রীযুক্ত দাশ বহুপূর্ব্ব হইতেই সম্মেলনে যোগদান ও বাঙ্গালা-সাহিত্য সম্বন্ধে বক্তৃতার জন্য পত্র ব্যবহার করিয়াছিলেন। লিন ইয়ুটাং বিমান যোগে কলিকাতা পর্য্যন্ত আসিয়া অসুস্থ হইয়া পড়ায় সম্মেলনে যোগ দিতে পারেন নাই, কিন্তু একজন চৈনিক প্রতিনিধি তাঁহার একটা টেলিগ্রাম পাঠ করেন। পারসীক কৃষ্টি সংঘ ভারতবর্ষে পৌঁছিবার পূর্ব্বে হইতেই শ্রীযুক্ত দাশ তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন ও তাহাদের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত দাউদ একটা বাণী প্রেরণ করেন। তিনি শান্তিনিকেতনে বহুদিন ছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথকে তেহেরাণে পারস্য সরকারের পক্ষ হইতে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্ব স্মৃতি উল্লেখ করিয়া বাঙ্গালা-সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথের নিকট তাঁহার ঋণ আনন্দের সহিত স্বীকার করিয়া প্রশস্তি জ্ঞাপন করেন ও বলেন যে রবীন্দ্রনাথ শুধু ভারতের নহে বিশ্বজগতের কবি। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সমর সংবাদ বিভাগের মিষ্টার উইলিয়াম কার্টার বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, কবি, শিল্পী ও দার্শনিক হিসাবে রবীন্দ্রনাথকেই আমেরিকানগণ শুধু ভারতের নহে, নিখিল প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠ প্রতীক ও প্রতিনিধি বলিয়া মানে, তাঁহার শিক্ষার গুরুত্ব ও গভীরতা তাঁহারা সসম্মানে স্বীকার করে। ভারতীয় সংস্কৃতির এই প্রচারক যে ভাষায় তাঁহার মূল রচনাগুলি লিখিয়াছেন তাঁহাকে তিনি অভিনন্দিত করিতেছেন। রবীন্দ্রনাথকে ভারতের কতবড় সম্পদ্ বলিয়া আমেরিকা মনে করে তাহা বোধ হয় ভারতবর্ষও জানে না। রাজনীতি ক্ষেত্রের বাহিরে আমেরিকা ভারতকে জানে শুধু রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ ও জগদীশচন্দ্রের মধ্য দিয়াই। ভারত সরকারের শিক্ষা বিভাগের উপদেষ্টা মিষ্টার সার্জেণ্ট বাঙ্গালা দেশের প্রতি শ্রদ্ধা জানাইয়া বলেন যে রবীন্দ্রনাথ ও বাঙ্গালা সাহিত্যের নিকট হইতে তিনি বহু উদ্দীপনা ও আধ্যাত্মিক সহায়তা পাইয়াছেন। শান্তিনিকেতনের স্মৃতি তাঁহার মনে অমর হইয়া থাকিবে। বাঙ্গালীর সাহিত্য-প্রীতি ও সাহিত্যের জন্য উৎসাহের যে বিপুল প্রকাশ তিনি দেখিয়াছেন তাহা সত্যই বিস্ময়কর। তিনি বলেন যে বাঙ্গালা-সাহিত্য শুধু যে সমৃদ্ধ তাহা নহে, তাহা গতিশীল ও মানবকে বহু সম্পদ্ দিয়াছে। সিংহলের প্রতিনিধি স্যার ব্যারণ জয়তিলক বলেন যে বাঙ্গালা-সাহিত্য ও বাঙ্গালীকে সিংহলীয়গণ বৈদেশিক মনে করেন। ঐতিহ্য, সাহিত্য ও সংস্কৃতির দিক দিয়া বাঙ্গালার সহিত সিংহলের যোগসূত্র এখনও রহিয়াছে। বাঙ্গালী পূর্ব্বপুরুষগণ সিংহলে রাজত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া সিংহল এখনও এদেশকে মাতৃ-ভূমি মনে করে এবং সাহিত্যের প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা অসীম। ব্রহ্মদেশের প্রধান মন্ত্রী সার প-টুন বাঙ্গালী সাহিত্যিক ও ধর্ম্মগুরুদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। বিখ্যাত হিন্দী লেখক জৈনেন্দ্র কুমারও হিন্দী ভাষাভাষিগণের পক্ষ হইতে বাংলা সাহিত্যের প্রশস্তি করেন। বাস্তবিক এবার মূল অধিবেশনে যখন একটীর পর একটী দেশের প্রতিনিধি সভামঞ্চে উঠিয়া



সম্মেলনের সেচ্ছাসেবক ও সেবিকাবৃন্দ

বাঙ্গালা সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে লাগিলেন, তখন হৃদয় আনন্দে ও গর্বে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।

মহাসমারোহের মধ্যে পঁচিশে ফাল্গুন সভার উদ্বোধন হয়। এবার এরূপ অসম্ভব জনসমাগম হইয়াছিল যে শত শত লোক স্থানাভাব বশতঃ ফিরিয়া গিয়াছিলেন ; প্রধান কর্মসচিবের সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা কমলা দাশ বিশিষ্ট বৈদেশিক ও দেশীয় অতিথিগণকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কার্য্যসূচী প্রস্তুত ও পরিচালনা করিয়াছিলেন। তাঁহারই পরিকল্পনা অনুসারে একটী সুললিত নৃত্যের দ্বারা সাহিত্যের বন্দনা করিয়া সম্মেলনের উদ্বোধন করা হয়। তাহার পর প্রধান কর্মসচিব তাঁহার নিকট প্রেরিত শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথের আশীর্ব্বাণী ও আন্তর্জাতিক লেখক সংঘ "পি-ই-এন"এর নিখিল ভারতীয় শাখার প্রশস্তি বাণী পাঠ করেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি সার আজিজুল হক সুললিত ভাষায় অতিথি ও প্রতিনিধিদের সাদর অভ্যর্থনা করেন এবং অনাগত বাঙ্গালা সাহিত্যের রূপ ও ভবিষ্যৎ বর্ণনা করেন। বাঙ্গালীর বর্ত্তমান দুর্দ্দিন ও দুর্ভিক্ষের উল্লেখ করিয়া বলেন যে এই দুঃখ নিশ্চয়ই বিফল হইবে না। যদিও পারিপার্শিক অবস্থা এখনও অনুকূল নয়, তথাপি নব যুগের বার্ণার রেশ বাঙ্গালা সাহিত্যেও পৌঁছিতেছে। তাঁহার অভিভাষণ বাঙ্গালা ভাষার সেবাতে বাঙ্গালী মুসলমানের যে কতখানি দান আছে ও ভবিষ্যতে থাকিবে তাহার প্রমাণ দেয়। ইহার পর বৈদেশিক সুধীগণের প্রশস্তিবাচন আরম্ভ হয়। মূল সভাপতি শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার তাঁহার



সম্মেলনের অধিবেশন ভবন

সুলিখিত অভিভাষণে শিল্প বাণিজ্যে বাঙ্গালীর নিম্নস্থানের কথা ও তাহার প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করেন। প্রবাসে বাঙ্গালীরা যেরূপভাবে হটিয়া আসিতেছে তাহার কারণ ও প্রতিকার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বলেন যে, মাত্র কয়েকজনের ব্যক্তিগত উন্নতির ফলে একটী জাতি উন্নত হইতে পারে না, তাহার অগ্রগতি ও উন্নতিকে সমষ্টির কৃতিত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। বাঙ্গালীর জীবন ও সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে জীবনের প্রতিটী বিকাশ সাহিত্যের মধ্য দিয়াই সম্যকরূপে প্রতিফলিত হইয়াছে এবং সাহিত্যপ্রীতিই বাঙ্গালীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়। সাহিত্যই ভাবের আদান প্রদানের মধ্য দিয়া প্রাদেশিক গণ্ডী লঙ্ঘন করিয়া ভারতকে কৃষ্টিগত একতায় মিলিত করিবে।

দোল-পূর্ণিমার সন্ধ্যায় সাহিত্য-শাখার অধিবেশন আরম্ভ হয়। সভাপতি শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসুর অসুস্থতাজনিত অনুপস্থিতিতে প্রধান কর্ম্মসচিব সভাপতির অভিভাষণটী পাঠ করেন। "সংকেতময় সাহিত্যে"র আলোচনা-প্রসঙ্গে সভাপতি বলেন যে, আধুনিকতম সাংকেতিক বাঙ্গালী লেখকগণের বিচারের সময় এখনও আসে নাই। নূতন পদ্ধতির লেখকেরা বলেন—এককালে রবীন্দ্রকাব্য সাধারণের অবোধ্য ছিল, অবনীন্দ্র-প্রবর্তিত চিত্রকলাও উপহাস্য ছিল ; ভাবী গুণগ্রাহীদের জন্য সবুর করতে আমরা রাজী আছি ; অপর পক্ষ বলে সে সংকেতেরও সীমা আছে। এ সম্বন্ধে বিতর্ক ভাল, তার ফলে সদ্‌বস্তুর প্রতিষ্ঠা অথবা অসদ্‌বস্তুর উচ্ছেদ্ হতে পারে। যারা বিতর্কে যোগ দিতে চান না—তাদের পক্ষে এখন সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখাই উত্তম পন্থা। অধ্যাপক ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির কার্য্য পরিচালনা করেন এবং বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, প্রতি সাহিত্যেই একটা সৃজনশীল যুগের পরে বিরতি আসে। সে সময়ে যদি কোন নূতন উৎকৃষ্ট সৃষ্টি না হয় তবুও পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য আলোচনা করাতেও সার্থকতা আছে। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রোত্তর যুগে যদি গতিশীলতাহীন সময় আসিয়া থাকে তাহা অভূতপূর্ব্ব নহে এবং সেজন্য আমরা সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টা হইতে বিরত হইব না। অতঃপর সুপ্রসিদ্ধ কথা-সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত বিভূতি মুখোপাধ্যায় একটী চমৎকার ছোট গল্পে সভাকে হাস্যমুখর করিয়া তোলেন। সদ্য বিবাহের পর আধুনিক হইতে ইচ্ছুক বর ও বধূর সহিত ট্রেনের এক কামরায় ভ্রমণের সরস ও মধুর কাহিনীটির বর্ণনা—বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল। ইহার পর শিশুসাহিত্যিক 'মৌমাছি' সাহিত্যরচনা ক্ষেত্রে শিশুদের স্থান সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। বঙ্গ সাহিত্যে গল্পের উদ্‌ভবের ইতিহাস আলোচনা করিয়া ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আর একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। বহু রাত্রি হইয়া যাওয়ায় অনেক সুলিখিত প্রবন্ধ পঠিত বলিয়া গৃহীত হয়।

পরদিন সকালে উদ্বোধন সঙ্গীতের পর ইতিহাস-শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত বিজনরাজ চট্টোপাধ্যায় ইউরোপে ইতিহাস ও ভূগোলের সংমিশ্রণের ফলে যে নূতন রাজনীতির উদ্‌ভব হইয়াছে তাহার আলোচনা করিয়া ঐতিহাসিক তথ্যের একটী নূতন ও মননশীল অভিভাষণ প্রদান করেন। তিনি বলেন যে এই নব রাজনীতিকে অবলম্বন করিয়া ইউরোপের রাষ্ট্রগুলি ভিন্ন ভিন্ন গণ্ডীতে একীভূত হইতেছে। ডক্টর রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া ও বেদ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থের স্থানবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করেন যে ভারতবর্ষ গণতন্ত্রের অনুপযুক্ত বলিয়া যে রব মাঝে মাঝে উঠে তাহা সত্য নহে। ইহার পর ভারতীয় গণিতের ইতিহাস সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ পাঠ করা হইলে ইতিহাস শাখার অধিবেশন শেষ হয়।

বিজ্ঞানশাখার সভাপতি ডক্টর নীলরতন ধর মহাশয় যন্ত্র সহযোগে খাদ্য-প্রাণ ও বাঙ্গালীর খাদ্যসমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। বর্ত্তমানে বাঙ্গালীর খাদ্যের যেরূপ অভাব হইয়াছে তাহার পরিপূরক হিসাবে আর কি খাদ্য ব্যবহার করা যাইতে পারে তাহার আলোচনা করেন। অতঃপর অধ্যাপক ডক্টর সুকুমাররঞ্জন দাশগুপ্ত ও শিলংএর শ্রীযুক্ত দাশ দুইটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। সময়াভাবে বহু সুলিখিত প্রবন্ধ পঠিত বলিয়া গৃহীত হয়।

মধ্যাহ্নে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন দর্শনশাখায় পৌরহিত্য করেন। সভায় বিপুল জনতা মুগ্ধ ও অবহিত হইয়া তাঁহার সুললিত ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ অভিভাষণ শ্রবণ করেন। তিনি বলেন যে পৃথিবীব্যাপী এই দুর্দ্দিনে জ্ঞান ও দর্শনকে আরও ভাল করিয়া যাচাই করিয়া লইতে হইবে, বিশেষতঃ যেহেতু ভারতে দর্শন ছিল জীবনের সঙ্গে যুক্ত। জ্ঞানে ও ভক্তিতে, দর্শনে ও ধর্ম্মে বিরোধ ছিল না। কাব্যে ও সঙ্গীতে এ দেশে দর্শন প্রচারিত হইত। বাঙ্গালা দেশের দার্শনিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করিয়া তিনি বলেন যে ভারতীয় ষড়্‌দর্শনের ক্ষেত্রে বাঙ্গালার দান কম নয়। নব্য-ন্যায় তাহার আপন জিনিষ। শৈব ও শাক্ত দর্শনে বাঙ্গালা ভারতের অন্যান্য প্রদেশকে পথ দেখাইয়াছে। বৈষ্ণব দর্শনের প্রেমলীলার দৃষ্টি-ভঙ্গিটুকুও প্রেম সাধনায় একটী অপূর্ব্ব জিনিষ। শুধু শ্রীচৈতন্য নহে, বাঙ্গালার দীনহীন অশিক্ষিত সাধকদের মধ্যেও জ্ঞান ও প্রেমের বিস্ময়কর গভীরতা দেখা যায়।

আসামের শিক্ষাবিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ (ডি, পি, আই) শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় প্রবাসী বাঙ্গালী শাখার সভাপতিত্ব করেন। তিনি প্রবাসী বাঙ্গালী জীবনধারা ও সমস্যার সমালোচনা করিয়া বলেন যে

বাঙ্গালীকে তাহার সংস্কৃতি রক্ষা করিয়া অবাঙ্গালীর সহিত সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতা করিয়া বাঁচিতে হইবে।

চন্দ্রালোকিত ফাল্গুন সন্ধ্যায় সঙ্গীত শাখার অধিবেশন হয়। প্রারম্ভেই শাখা সভাপতি শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী বাঙ্গালা-সঙ্গীতের ইতিহাস ও পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে অভিভাষণ পাঠ করেন। তাহার পর প্রতিনিধিদিগের পক্ষ হইতে অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ বাঙ্গালী ও প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের পক্ষ হইতে সম্মেলনের উদ্যোক্তাগণকে ধন্যবাদ দিয়া অভূতপূর্ব্ব সাফল্যের জন্য আনন্দ প্রকাশ করেন। গীতিবিতানের শ্রীযুক্ত নিহারবিন্দু সেনের রবীন্দ্র-সঙ্গীতের গীতসহযোগে ব্যাখ্যা বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল। কুমারী প্রতিমা সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষ ও শ্রীযুক্ত সুজিত রায় ব্যাখ্যাটিকে সঙ্গীতে রূপায়িত করেন। এতদ্ব্যতীত নৃত্য, গীত ও মূকাভিনয়ে এই শাখাটিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করা হইয়াছিল। কুমারী মালশ্রী সেন, মণিমালা সরকার, দীপা চট্টোপাধ্যায়, রেবা চট্টোপাধ্যায়, শোভনা সেন, প্রতিমা সেন, সংযুক্তা সেন, তরুণ চক্রবর্ত্তী ও বিনয় ঘোষ প্রভৃতি সঙ্গীতানুষ্ঠানের বিভিন্ন অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র সান্ন্যাল সঙ্গীত সহযোগে একটি বক্তৃতা দেন। রাত্রি বারটার পর সম্মেলন শেষ হয়।

ভারতবর্ষের রাজধানীতে বাঙ্গালীর এই সম্মেলনের অভিনব গৌরবময় অনুষ্ঠানে বহুবিশিষ্ট অবাঙ্গালী ও রাজপুরুষ যোগদান করিয়াছিলেন। সংবাদ বিভাগের সদস্য স্যার সুলতান আহমদ, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চ্যান্সেলর ও ভারতীয় ফেডারেল কোর্টের ভূতপূর্ব্ব প্রবীণ বিচারপতি স্যার মরিস গয়ার, শ্রীমতী কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকে সম্মেলনের অধিবেশনগুলিতে যোগদান করেন। দিল্লীর স্থানীয় বেতার কেন্দ্র হইতে পর পর তিনদিন ও নিখিল ভারতীয় বেতার কেন্দ্র হইতে পর পর দুইদিন ইংরাজী ও বাঙ্গালাতে সম্মেলনের সংবাদ ঘোষিত হয়। ইহা ছাড়াও ভারত সরকারের সংবাদ বিভাগ হইতে উদ্বোধন অধিবেশনের চলচ্চিত্র লওয়া হইয়াছে এবং তাহা সমগ্র ভারতে "ইনফরমেশন অব ইণ্ডিয়া" চিত্রমালার অংশরূপে চলচ্চিত্র গৃহগুলিতে প্রদর্শিত হইয়া বাঙ্গালীর সাহিত্য-প্রীতির পরিচয় প্রদান করিবে।

আর্ট ও জীবন

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

আর্টের মধ্যে জীবনের বসন্তোৎসব। প্রাণের প্রাচুর্য্যের মধ্যেই আর্টের উৎস। প্রাণ যেখানে শুকিয়ে গেছে, মৃত্যুর যেখানে কালো ছায়া, জীবনের কলধ্বনি যেখানে ঘুমিয়ে আছে—সেখানে আর্ট নেই। আর্ট জীবনের রাজা। রোঁলার (Romain Rolland) জাঁ ক্রিস্তফ্ বলছে : 'Where death is, there art is not. Art is the spring of life'. রবীন্দ্রনাথের ফাল্গুনীতে কবিশেখর বলছে : 'যদি বাঁচবই, তবে বাঁচার মতো করেই বাঁচতে হবে।' দেহের ক্ষেত্রে, মনের ক্ষেত্রে, আত্মার ক্ষেত্রে সমস্ত সত্তা দিয়ে যেখানে আমরা বাঁচি সেখানেই আমাদের জীবনের পরিপূর্ণতা। জীবনের যেখানে পরিপূর্ণতা সেখানে আনন্দের প্রাচুর্য্য এবং আনন্দের প্রাচুর্য্য যেখানে সেখানেই আর্টের জন্ম। রোঁলা পুনরায় তাঁর জাঁ ক্রিস্তফে লিখছেন : 'To live, to live too much ! A man who does not feel within himself this intoxication of strength, this jubilation in living—even in the depths of misery,—is not an artist. That is the touchstone'. রবীন্দ্রনাথের ফাল্গুনীতে কবিশেখরের উক্তিতে ঠিক এই ধরণের কথাই আছে : "যারা অপর্য্যাপ্ত প্রাণকে বুকের মধ্যে পেয়েছে ব'লেই জগতের কিছুতে যাদের উপেক্ষা নেই—সৃষ্টি করে তারাই, কেননা তাদের মন্ত্র আনন্দের মন্ত্র—সব চেয়ে বড়ো বৈরাগ্যের মন্ত্র।" আনন্দের উচ্ছ্বসিত আবেগ নেই যেখানে, সমস্ত সত্তা দিয়ে যেখানে আমরা অনুভব করিনে—সেখানে আর্ট আসিতে পারে না। সত্যকে জানার আনন্দ, সুন্দরকে মজ্জায় অনুভব করবার আনন্দ, প্রেমাস্পদকে রক্তের প্রতি অনুপরমাণু দিয়ে ভালবাসার আনন্দ—অনুভূতির এই তীব্রতা এবং প্রসারতা যেখানে যত বেশী সেখানে তত আনন্দ। প্রাণের সজীবতার লক্ষণ হচ্ছে সুখ এবং দুঃখ উভয়েরই মধ্যে আনন্দকে আস্বাদন করবার ক্ষমতা। জীবনের দুঃখের দিকটাও তো কম সত্য নয়। আনন্দের অভিজ্ঞতা জীবনে যতখানি সত্য—বিষাদের অনুভূতিও ঠিক ততখানিই সত্য। Each is a primary Fact of experience. সমস্ত সত্তা দিয়ে দুঃখকে অনুভব করবার ক্ষমতা যেখানে নষ্ট হ'য়ে গিয়েছে, সেখানে হারিয়ে-যাওয়া আনন্দের দিকে সতৃষ্ণনয়নে আমরা বারবার চাই এবং চুরি ক'রে নতুন আনন্দ পাওয়ার জন্য সর্ব্বদা লালায়িত থাকি, সেখানে কৃপণের মতো আমরা দুঃখ পাই আর দুঃখভোগের মধ্যে যেখানে কার্পণ্য সেখানে প্রাণ শুকিয়ে গেছে। সমস্ত সত্তা দিয়ে আনন্দকে অনুভব করবার ক্ষমতাও যেখানে লোপ পেয়েছে—সেখানেও প্রাণের দারিদ্র্যের পরিচয়। বাঁচার মতো ক'রে যেখানে আমরা বাঁচি আমাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে সেখানে আমরা জোরের সঙ্গে সুখও পাই, জোরের সঙ্গে দুঃখও পাই। জোরের সঙ্গে দুঃখ পাওয়ার মধ্যে একটা গরিমা আছে, আনন্দ আছে। দুঃখ আমাদের নয়নে নতুন দৃষ্টি আনে। দুঃখের সুতীক্ষ্ণ হলমুখে হৃদয় আমাদের বিদীর্ণ হ'য়ে যায়। বিদীর্ণহৃদয়ের ফাঁকে ফাঁকে দেখা দেয় নবজীবনের অঙ্কুর। অনুর্ব্বর পতিত জমি ফুলে ফুলে ছেয়ে যায়। আদিকবির হৃদয় থেকে কাব্যের রসধারা বেরিয়ে এসেছিল শোকের সুতীব্র অনুভূতি থেকে। ক্রৌঞ্চের মৃত্যুতে যে ব্যথা তিনি অন্তরে অনুভব করেছিলেন তার গভীরতা থেকেই কাব্যের জন্ম হোলো। শোকের দুরন্ত আবেগ থেকে গান জেগে উঠ্‌লো। বাল্মীকি অত গভীর ক'রে দুঃখকে যদি অনুভব করতে না পারতেন—তাঁর অনুভূতি অনুপম কবিতায় উৎসারিত হতে পারতো না। দুঃখের বেলাতে যে কথা সত্য, আনন্দের বেলাতেও সেই কথা সত্য। আনন্দের অনুভূতি যেখানে আমাদের রক্তে ঢেউ তোলে না, উল্লাসের আতিশয্যে আমাদের সমস্ত অস্তিত্ব যেখানে বাঁশির মতো বেজে ওঠেনা সেখানে আমরা টিঁকে আছি, বেঁচে নেই, আমাদের আত্মা সেখানে আড়ষ্ট হ'য়ে আছে শীতকালের সাপের মতো। প্রাণ যেখানে বাহিরের বিপুল জগতের সংস্পর্শে এসে আনন্দের আবেগে তরঙ্গচঞ্চল সাগরের মতো দুলে উঠেছে—সেখানে এসেছে নব-সৃষ্টির প্রেরণা আর সেই প্রেরণা রূপ নিয়েছে আর্টের মধ্যে। পৃথিবীর রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ সব মানুষের মনেই রেখাপাত করে। কোন কোন মানুষের মনে তারা আনন্দের তরঙ্গ তোলে। সুন্দরের প্রতি এই যে অনুরাগ—এই অনুরাগই তো রুচিজ্ঞান, যাকে ইংরেজীতে বলে Taste. যারা রূপশিল্পী তাদের অনুভূতিপ্রবণ চিত্তকে জগতের রূপ এত জোরে নাড়া দেয় যে তারা সেই রূপের কেবল প্রশংসা ক'রে তৃপ্ত থাকতে পারেনা। রূপ দেখে, সৌন্দর্য্য দেখে তাদের অন্তরে আনন্দসিন্ধু উদ্বেলিত হয়ে ওঠে, আর সেই উদ্বেলিত আনন্দকে রসঘন মূর্ত্তি দিয়ে

মাটির কোলে তারা আর্টের অপরূপ ইন্দ্রলোক রচনা করে। সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিই তো আর্ট। ইমার্সনের ভাষায় The creation of beauty is art. আমাদের আত্মার কাছে জগতের যে অস্তিত্ব—সে কেবল প্রাণের মধ্যে সৌন্দর্য্যের জন্য যে পিপাসা রয়েছে তাকে তৃপ্ত করবার জন্য। আমি জগৎকে ভালোবাসি, কারণ জগৎ আমার আত্মার সৌন্দর্য্যপিপাসাকে তৃপ্তি দিচ্ছে। সুন্দরের জন্যই সুন্দরকে চাইছি—সৌন্দর্য্য আত্মার চরমকাম্য। এমার্সনের ভাষা পুনরায় উদ্ধৃত ক'রে বলি: This element I call an ultimate end. No reason can be asked or given why the soul seeks beauty. ঠিক এই কথারই প্রতিধ্বনি শুনি যখন মেটারলিঙ্কের (Maeterlinck) লেখায় পড়ি: For beauty is the only language of our soul, none other is known to it. It has no other life, it can produce nothing else, in nothing else can it take interest. সৌন্দর্য্যই হোলো একমাত্র উপাদান যার সঙ্গে আমাদের আত্মার সম্পর্ককে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক বলা যেতে পারে। সৌন্দর্য্যের মাপকাঠি দিয়েই আমাদের আত্মা সমস্ত কিছুর বিচার করে। সত্যের মধ্যে এমন একটা নির্ম্মল উলঙ্গ কঠিনতা আছে যা আমরা সহ্য করতে পারিনে। মঙ্গলের মধ্যেও কেমন একটা ম্যাদাটেভাব আছে যা আমাদের চিত্তকে আকর্ষণ করে না। সুন্দরের মধ্যে সত্যের এবং মঙ্গলের সমাবেশ আছে। সুন্দর সত্যকেও অস্বীকার করে না। এই জন্যই সুন্দরকে আমরা এত বেশী মূল্য দিই। এমার্সনের (Emerson) দৃষ্টি অত্যন্ত স্বচ্ছ। তাই তিনি লিখতে পারলেন: We call the beautiful the highest, because it appears to us the golden mean, escaping the dowdiness of the good, and the heartlessness of the true.

আসল বিষয় থেকে আমরা একটু সরে গিয়েছি। আমাদের বক্তব্য ছিল Art is the Emperor of life. কথাটা অবশ্য রোম্যা রল্যাঁর। জীবনের প্রকাশ আর্টে। জীবনের দীনতা যেখানে সেখানে আর্টের মধ্যেও দীনতা আসতে বাধ্য। Life! All life! To see everything. Romain Rollandএর John Christopherএর মধ্যে জীবনের এই জয়গান শুনতে পেলাম। শিল্পী ক্রিস্তফ্ জীবন-পূজারী; তার মর্ম্মবাণী হলো: It is not peace that I seek, but life. আমি জীবনকে কামনা করি, শান্তিকে নয়। যুগে যুগে যতো বড়ো বড়ো শিল্পী জন্মগ্রহণ ক'রে আর্টের জগতকে ঐশ্বর্য্য দান করেছেন তাঁদের সকলের কথাই ক্রিস্তফের কথা। জীবনের বন্দনাগান তাঁদের সকলের কণ্ঠে। জীবন তো সেখানেই যেখানে রৌদ্র এবং ঝড়বৃষ্টি, যেখানে আত্মপ্রকাশের পথে যা-কিছু বাধা তার বিরুদ্ধে চলেছে দুরন্ত সংগ্রাম, যেখানে নূতনতর জগতকে সৃষ্টি করবার জন্য মানুষ নিরাপদ বন্দরের আশ্রয় ত্যাগ ক'রে যাত্রী হয়েছে ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ তরঙ্গসঙ্কুল সাগরের বুকে।

সাহিত্যের বিষয়বস্তু যেখানে কেবল প্রবৃত্তির চরিতার্থতা, উপন্যাসের নায়ক-নায়িকারা যেখানে তাদের বিচরণ ক্ষেত্রকে সীমাবদ্ধ রেখেছে দেহের জীবনে—সেখানে সাহিত্য হয়েছে রুগ্ন, কারণ জীবনের বিপুলতাকে সে করেছে অস্বীকার। মানুষের মনের সামনে যেখানে দিগন্তের নিমন্ত্রণ নেই, যেখানে মুক্তপথ তাকে দূর থেকে সুদূরের পানে টেনে নিয়ে যায় না, যেখানে তার জীবন দেহের প্রবৃত্তিকে ঘিরে ঘিরে দুর্ভেদ্য জাল রচনা করেছে এবং সেই জালের মধ্যে পড়েছে বাঁধা, সেখানে বাঁচার মধ্যে রয়েছে প্রকাণ্ড অপূর্ণতা। জীবনে সেখানে দৈন্যের হাহাকার। জীবনের এই অপূর্ণতা যেখানে, সেখানে আর্ট কখনো সুস্থ এবং সবল হ'তে পারে না। আধ্যাত্মিক দিকটার উপরে সমস্ত জোর দিতে গিয়ে দেহের জীবনকে যেখানে উপেক্ষা করা হয়েছে সেখানেও বাঁচার মধ্যে মধ্যে কার্পণ্য প্রশ্রয় পেয়েছে। সত্যকে সমগ্রভাবে যেখানে আমরা গ্রহণ করতে পেরেছি সেখানেই জীবনের পূর্ণ প্রকাশ, আর জীবনের যেখানে পূর্ণ অভিব্যক্তি সেখানে সাহিত্যের মধ্যে ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ।

একটা জাতি যখন তার জীবনের প্রচণ্ড গতিবেগ হারিয়ে ফেলে তখন তার মধ্যে নানারকমের প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। তার সমস্ত শক্তি তখন একটা দিকে কেন্দ্রীভূত হয়। আধ্যাত্মিকতার মোহে কর্ম্মোদ্যমের দিককে অবহেলা ক'রে ধ্যানধারণার মধ্যে সে ডুবে থাকে। নয়তো চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় ব'সে তৈলধার পাত্র অথবা পাত্রাধার তৈল নিয়ে ক্রমাগত মাথা ঘামায়, অথবা দেহের প্রবৃত্তির চরিতার্থতাকে পরম পুরুষার্থ ক'রে তোলে। এর যে কোন একটাকে নিয়ে মেতে থাকা জীবনের অসম্মান। আমাদের জাতীয় জীবনের মধ্যে একটা অবসাদের ভাব অনেক দিন থেকে দেখা দিয়েছে। আমাদের সাহিত্যে সেজন্য মানসিক ব্যাধির যদি পরিচয় ফুটে ওঠে বিস্মিত হবার কিছু নেই। জীবনের দিগন্ত সঙ্কুচিত হ'য়ে আসার ফলেই আমাদের মন প্রবৃত্তির দিকে ঝুঁকে পড়েছে আর সাহিত্যেও তাই মৃত্যুর ছায়া। কিন্তু সাহিত্যের কাজ তো শুধু দেহের জয় গান করা নয়। সাহিত্যের কাজ আফিমের ধোঁয়া দিয়ে ইচ্ছাশক্তিকে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করাও নয়। সাহিত্য জীবনের বিশাল দিগন্তকে আমাদের দৃষ্টির সামনে জাগিয়ে দেবে, আমাদের চরিত্রকে পৌরুষের গরিমায় গরিমাময় ক'রে তুলবে, আমাদের চিত্তে কর্ম্মের প্রেরণা আনবে। সাহিত্য মৃত্যুর জাল থেকে অস্তিত্বকে মুক্তি দিয়ে জীবনকে দিক্‌চক্রবালের পানে চলবার উৎসাহ দেবে। সাহিত্যিক যারা—জীবনের বন্দনা গান তাদের কণ্ঠে বেজে উঠুক। কুসুমসুলভ পেলবতায় জাতির পৌরুষ আচ্ছন্ন হয়ে আছে, তার কর্ম্মশক্তিতে পঙ্গুতা এসেছে, তার চিত্ত অবসাদে ম্রিয়মান। এই অবসাদের দিগন্তব্যাপী অন্ধকারকে অপসারিত করবার জন্য আজ প্রয়োজন সেই সাহিত্যের, যার সৃষ্টি চিত্তের সবলতা থেকে, দৃষ্টির সমগ্রতা থেকে, জীবনের প্রাচুর্য্য থেকে

রবীন্দ্রনাথ

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

তোমার আমার উদয়-বিলয় বিশ্বকবির নয়,
মহাকালের পাথেয় তার শাশ্বত সঞ্চয়।
তাদের যাহা উদয়-বিলয়—ক্ষণিক দূরে যাওয়া,
এক নিমেষে হারিয়ে আবার ফিরিয়ে তারে পাওয়া!
তৃষ্ণামুখে বারিপানের যেমন আনন্দ
গতি-যতির মিলেই যেমন কবিতা-ছন্দ।

আজ যে রবির বিলয় দেখি অস্তাচলের পারে,
চিরটি দিন তারই দেখা মিলবে বারেবারে।
সূর্য্য—সে তো দূরেই থাকে, আলোই মোরা চাই,
চোখটি মেলেই সেই আলো যে নিত্য নূতন পাই।
জগৎ-পাতায় ছড়ানো তার দৃষ্টি-পরকাশ,
চোখের আগেই জ্বলছে যে তার সৃষ্টি বারোমাস।

কবির কভু মৃত্যু আছে—কবিরা কি মরে?
লোকে-লোকে চোখে-চোখে নিত্য বিরাজ করে!

সাময়িকী

নূতন ভাইস-চ্যান্সেলার—

কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি, খ্যাতনামা আইনজীবী ডক্টর শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ পাল ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিধানচন্দ্র রায় মহাশয়ের স্থানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চান্সেলার নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। পাল মহাশয় সারাজীবন শিক্ষার সহিত সংযোগ রক্ষা করিয়াছেন। ১৯২০ সালে এম-এল পাশ করিয়া ১৯২৩ হইতে ১৯৩৬ পর্য্যন্ত তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। ১৯২৪ সালে ডি-এল্ পাশ করিয়া তিনি ১৯২৫, ১৯৩০ ও ১৯৩৮ সালে তিনবার ঠাকুর আইন অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। গত বৎসর তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ও বঙ্গীয় সংস্কৃত এসোসিয়েসনের সদস্য মনোনীত হন। পাল মহাশয় নিজ কর্ম্মকুশলতা ও অসাধারণ শক্তির দ্বারা অতি সামান্য অবস্থা হইতে প্রচুর অর্থ ও সম্মান লাভ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার এই সম্মানপ্রাপ্তিতে তাঁহাকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—

গত ৫ই চৈত্র শনিবারের বৈঠকের সভাগণ খ্যাতনামা ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটী সভায় সম্বর্দ্ধিত করেন। শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র মহাশয় সভার পরিচালনা করেন। বহু খ্যাতনামা সাহিত্যিক সম্বর্দ্ধনা সভায় উপস্থিত হইয়া ব্রজেন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভা সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। অনুষ্ঠানকারীদের পক্ষ হইতে ব্রজেন্দ্রবাবুকে একটী অভিনন্দন প্রদান করা হয়। ব্রজেন্দ্রবাবু তাহার যথাযোগ্য উত্তর প্রদান করেন। দীর্ঘজীবী হইয়া ব্রজেন্দ্রবাবু সাহিত্যসেবা করিতে থাকুন —সম্বর্দ্ধনার শুভমুহূর্ত্তে আমরাও এই প্রার্থনা করি।

নূতন কলেজ স্থাপনের প্রচেষ্টা—

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে আসানসোলবাসীগণ তথায় একটী ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ স্থাপনের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। এই পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করিবার জন্য ইতিমধ্যে আসানসোল-বাসীগণ (প্রদত্ত ও প্রতিশ্রুত) এক লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহাদের এই শুভপ্রচেষ্টা জয়যুক্ত হউক।

রেনবো ক্লাব—

গত ৮ই মার্চ্চ রেনবো ক্লাবের রজত-জয়ন্তী উৎসব মহা-সমারোহে সম্পাদিত হইয়াছে। ঐদিন প্রাতে ক্লাব গৃহের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক 'রামধনু' পতাকা উত্তোলিত হয় ও সন্ধ্যায় মহাবোধী সোসাইটী হলে ডক্টর শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগের সভাপতিত্বে রজত-জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীযুক্ত অশোকনাথ শাস্ত্রী সভার প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণ করেন এবং রেনবো ক্লাবের সম্পাদক রামনাথ সেন সমিতির বিগত ২৫ বৎসরের একটী সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পাঠ করেন।

বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষের খতিয়ান—

গত ২৩শে মার্চ্চ কমন্স সভায় একটী প্রশ্নের উত্তরে মিঃ আমেরি জানান যে, নানারূপ কারণে ১৯৪৩ সালে বাংলায় ১৮,৭৩,৭৪৯জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে। বিগত পাঁচ বৎসরের তুলনায় গড়পড়তা ৬,৮৮,৮৪৬জন লোক বেশী মারা গিয়াছে। কোন কোন মহল হইতে এই মৃত্যুর সংখ্যা আরও অধিক বলা হইলেও তাহা মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে। এই বাড়তি মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে মিঃ আমেরি বলিয়াছেন—পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব, অনশন ও মহামারী। বিগত পাঁচ বৎসরের তুলনায় যে মৃত্যু সংখ্যা বাড়িয়াছে, তাহা অল্প নহে। যাঁহারা এই মৃত্যুর সংখ্যা আরও বেশী বলিয়াছেন তাঁহারা না হয় আমেরির মতে মিথ্যা কথাই বলিয়াছেন স্বীকার করিলাম। কিন্তু যে তিনটী কারণে এত অধিক সংখ্যক লোকের মৃত্যু হইয়াছে তাহার জন্য দায়ী কে? সরকার না ভারতবাসী? যত লোক মরিয়াছে সেই অনুপাতে সরকারী তরফ হইতে তাহাদের বাঁচাইবার জন্য কতটুকু চেষ্টা করা হইয়াছে?

গো-সমস্যা—

সম্প্রতি বাংলা সরকার হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে কলিকাতা ও কয়েকটি বড় মিউনিসিপ্যালিটীর জবাইখানায় গো হত্যা প্রয়োজনানুসারে ৫০ভাগ বাড়িয়া গিয়াছে। যদি এইভাবে বাংলায় গো হত্যা চলিতে থাকে তাহা হইলে অচিরেই গরুর অভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইবে। এই আশঙ্কায় প্রয়োজন মিটাইবার জন্য বাংলা সরকার বিহার ও মধ্যপ্রদেশের গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছেন যে তথায় গরু চালান দেওয়া সম্পর্কে যে নিষেধাজ্ঞা আছে তাহা তুলিয়া লইয়া তথা হইতে বাংলায় যাহাতে গরু চালান আসিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে। কিন্তু বর্ত্তমান প্রয়োজন মিটাইবার জন্য সরকারের এই সাময়িক ব্যবস্থাই কি যথোপযুক্ত? আমাদের মনে হয় এই সমস্যার সমাধান করিতে হইলে পল্লী অঞ্চলে বড় বড় ডেয়ারী স্থাপনের প্রয়োজন এবং যে সকল অঞ্চলে ইতিমধ্যে গরুর সংখ্যা হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে সে সকল অঞ্চল হইতে গরু চালান যাহাতে একেবারে বন্ধ হয় তাহার ব্যবস্থা করাও একান্ত কর্ত্তব্য।

বিজ্ঞান শিক্ষার অন্তরায়—

সম্প্রতি জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সমাবর্ত্তন উৎসবে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু দেশে বিজ্ঞান শিক্ষার চাহিদা বৃদ্ধির

বিষয় উল্লেখ করিয়া বলেন—'দেশে যে সকল উপকরণ আছে, তাহার পরিপূর্ণ ব্যবহার করিতে হইলে আদর্শ সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন। সমাজের পরিবর্ত্তন সাধন করিতে হইলে তাহা বিজ্ঞানের মধ্য দিয়াই করিতে হইবে। জীবন-যাত্রার মান বৃদ্ধি অথবা ব্যাধির সঙ্গে সংগ্রাম করা বিজ্ঞান শক্তিতেই সম্ভব। পৃথিবীর অভ্যন্তরে ও উপরিভাগে যে সকল উপাদান ও প্রাকৃতিক শক্তি রহিয়াছে তাহার ব্যবহারে দেশবাসীকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে আমাদের দেশের শিক্ষা প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হইতেছে। বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান শিক্ষাকে সমাজ সেবায়, সমাজের উন্নতির জন্য নিয়োগ করিতে হইলে রাষ্ট্রের যে অকুণ্ঠ সাহায্য ও আদর্শনিষ্ঠা আবশ্যক, আমাদের শিক্ষিত যুবকগণ পদে পদেই তাহার অভাব বোধ করিয়া থাকে। তাই তাহাদের শিক্ষা ও শক্তি যতটা সমাজের কাজে লাগিতে পারিত তাহাও পারিতেছে না।'

ভোজে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা—

ইতিপূর্ব্বে এক সরকারী ঘোষণায় কলিকাতা সহরে ও উপকণ্ঠস্থিত শিল্পাঞ্চলসমূহে বিশেষ কৃত্য উপলক্ষে ৫০ জনের অধিক অতিথি নিমন্ত্রণ করিতে হইলে পূর্ব্বাহ্নে অনুমতি গ্রহণের আদেশ হইয়াছিল। সম্প্রতি আবার জানানো হইয়াছে যে কোন ক্ষেত্রেই ৫০এর বেশীসংখ্যক লোককে নিমন্ত্রণ করিবার অনুমতি গভর্ণমেণ্ট দিবেন না এবং এই ব্যবস্থা লঙ্ঘন দণ্ডনীয় বলিয়া গণ্য হইবে। প্রয়োজন হইয়াছে বলিয়াই সরকার এইরূপ ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইয়াছেন সত্য, কিন্তু সামাজিকতার দিক দিয়া ইহা কি লোকের পক্ষে কষ্টের কারণ হইবে না?

কয়লার অভাব—

কলিকাতা ও সহরতলী অঞ্চলে কয়লার অভাব ও মূল্য দিন দিন যেরূপ বাড়িয়া যাইতেছে, তাহাতে সকল গৃহস্থই শঙ্কিত হইতেছেন। কয়লা অধিকাংশ স্থানেই পাওয়া যায় না, যেখানে পাওয়া যায়, তাহার মণ সাড়ে ৩ টাকা বা ৪ টাকা। কাঠের মূল্যও সেই অনুপাতে বাড়িয়া গিয়াছে। এ অবস্থায় লোক কি করিবে, কিছুই ভাবিয়া পায় না। চাল, ডাল, আটা ও চিনির মত কয়লা কি রেশনের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না? রেশন কার্ডের যখন ব্যবস্থা হইয়াছে, তখন তাহা দ্বারা গৃহস্থ যাহাতে সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্য পাইতে পারেন, গভর্ণমেণ্ট এখনও তাহার ব্যবস্থা করুন না?

চিনি ও গুড়—

যে সকল স্থানে রেশন কার্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে, সে সকল স্থানে প্রতি লোকের জন্য সপ্তাহে এক পোয়া চিনি দেওয়া হইতেছে—কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায় যে মাত্র এক পোয়া চিনি একজনের এক সপ্তাহের ব্যবহারের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। চিনির পরিমাণ যাহাতে বৃদ্ধি পায়, সে জন্য নানা স্থানে আন্দোলনও সুরু হইয়াছে, কিন্তু এখনও কোন ফল দেখা যায় নাই। বাঙ্গালা দেশের লোক প্রচুর পরিমাণে গুড় ও চিনি ব্যবহার করে—কিন্তু এ বৎসর চৈত্র মাসেই আখের গুড় এক টাকা সের হইয়াছে—কাজেই লোক পরে গুড় পাইবে কি না সন্দেহ। এ অবস্থায় রেশনে বরাদ্দ চিনির পরিমাণ বৃদ্ধি করা না হইলে লোককে দারুণ অসুবিধা ও কষ্ট ভোগ করিতে হইবে।

ম্যাট্রিকুলেশনে পরীক্ষার্থী—

এবার ম্যাট্রিকুলেশনের মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৩১ হাজার, তাহার মধ্যে ১৩ হাজার বালিকা। গত বৎসরের দারুণ দুর্ভিক্ষের পরও পরীক্ষার্থীর এই সংখ্যা আশাপ্রদ। দুর্ভিক্ষ না হইলে হয়ত এই সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইত। শুধু মুন্সীগঞ্জ মহকুমায় দুর্ভিক্ষের জন্য পরীক্ষার্থীর সংখ্যা শতকরা ৫০এর অধিক কমিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালার এই দুর্দ্দিনে এই সকল পরীক্ষার্থীর কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য দেশের নেতৃবৃন্দের বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত।

বাঙ্গালী সম্মানিত—

ডাক্তার বিমানবিহারী দে খ্যাতনামা অধ্যাপক ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রিন্সিপাল। তাঁহাকে সম্প্রতি কয় মাসের জন্য মাদ্রাজের শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে কোন ভারতীয় মাদ্রাজে ঐ পদে নিযুক্ত হন নাই। আমরা ডাক্তার দে'কে তাঁহার এই সম্মান লাভে অভিনন্দিত করি।

চিঠি পত্র সম্বন্ধে আদেশ—

কিছুদিন হইতে পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম হইতে প্রেরিত সমস্ত চিঠিপত্র গভর্ণমেণ্ট হইতে সেন্সার করা হইতেছিল। এখন আদেশ জারি হইয়াছে, সমগ্র বঙ্গদেশের সকল স্থান হইতে প্রেরিত সকল চিঠিপত্রই সেন্সার করা হইবে। যাহাতে কেহ পত্রের মধ্যে সৈন্য চলাচল বা ঐরূপ কোন সামরিক সংবাদ প্রেরণ না করেন, সে জন্যই সেন্সারের ব্যবস্থা। কিন্তু এই ব্যবস্থার ফলে শ্যামবাজার হইতে বালীগঞ্জে পত্র যাইতে যাহাতে ৩।৪ দিন সময় না লাগে, সে বিষয়ে ডাক কর্ত্তৃপক্ষের উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। জলপাইগুড়ী হইতে কলিকাতায় পত্র আসিতে ৬।৭ দিন সময় লাগিতেছে। এইরূপ বিলম্বের কারণ কি?

ট্রামে ভিড়ের কারণ—

কলিকাতার ট্রামগাড়ীগুলিতে এত ভিড় বাড়িয়াছে যে তাহাতে উঠা-নামা করা ক্রমে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইতেছে। এ বিষয়ে আলোচনার ফলে ট্রাম কর্ত্তৃপক্ষ প্রকাশ করিয়াছেন যে এক মাসের মধ্যে ২১৭খানি ট্রামগাড়ী মিলিটারী লরীর আঘাত-প্রাপ্ত হওয়ায় গাড়ীর সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে। ট্রামগাড়ীগুলি বিলাত হইতে প্রস্তুত হইয়া আসিত—তাহা এখন আনা কষ্টকর হইয়াছে। কাজেই ট্রামের গাড়ী বাড়িবে না ও লোকের কষ্ট দিন দিন বাড়িয়া যাইবে।

যাতায়াতের অসুবিধা—

গত সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসে এ দেশে যখন দারুণ খাদ্যাভাব ছিল সে সময়ে কানাডার গভর্ণমেণ্ট ভারতের লোকদিগের জন্য সুলভে গম দিতে সম্মত হইলেও বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট গম আনি-বার জন্য জাহাজ জোগাড় করিতে না পারায় আমরা তখন বিস্মিত হইয়াছিলাম। সম্প্রতি খবর আসিয়াছে, ভারতে যে

সুলভে গম দিতে সম্মত হইলেও বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট গম আনিবার জন্য জাহাজ যোগাড় করিতে না পারায় আমরা তখন বিস্মিত হইয়াছিলাম। সম্প্রতি খবর আসিয়াছে, ভারতে যে সকল সিভিলিয়ান (ইংরাজ) চাকরী করেন, তাঁহাদের দুই শত জনের স্ত্রী ইংলণ্ডে যাইয়া জাহাজের অভাবে আর ফিরিয়া আসিতে পারিতেছেন না। ইহা সত্যই দুর্দ্দৈবের কথা বটে! স্বামীরা ভারতে থাকিলেন, আর তাঁহাদের পত্নীরা বিলাতে আটক হইয়া রহিলেন—এ অবস্থায় স্বামীদের পক্ষে কার্য্য সুপরিচালনা করা কি সম্ভব হইবে? এই সামান্য বিষয়েও কি বৃটীশ সচিবরা অবহিত হন না?

লবণের অভাব—

বাংলা দেশে লবণের অভাব দিন দিন এত তীব্র ভাবে দেখা দিতেছে যে বাঙ্গালীর পক্ষে আর 'নুন-ভাত' জোগাড় করাও সম্ভব হইবে কি না সন্দেহ। এ সময়ে গভর্ণমেণ্ট যে কেন ব্যাপকভাবে লবণ প্রস্তুতের আদেশ দেন না, তাহা বুঝা কঠিন। বহু স্থানে গত কয় মাস ধরিয়া এক টাকা সের দরে লবণ বিক্রীত হইতেছে। এই দরিদ্রের দেশে লোককে এইভাবে সর্ব্বপ্রকারে কষ্ট দেওয়ার মূলে কি কোন নীতি থাকিতে পারে?

বাঙ্গালার বর্ত্তমান গভর্ণরকে লোক বিবেচক বলিয়াই মনে করে এবং আশা আছে, সত্বরই তিনি এই মন্ত্রী সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হইবেন।

কস্তুরীবাঈ গান্ধী স্মৃতি-রক্ষা ভাণ্ডার—

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের নেতৃত্বে স্বর্গত কস্তুরীবাঈ গান্ধীর স্মৃতি-রক্ষাকল্পে ৭৫ লক্ষ টাকা সংগ্রহের জন্য দেশের বিশিষ্ট চল্লিশজন নেতার স্বাক্ষরিত এক আবেদন পত্র সম্প্রতি প্রচারিত হইয়াছে। মাতা কস্তুরীবাঈ-এর স্থায়ী স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থায় নেতৃবৃন্দ উদ্যোগী হওয়ায় দেশবাসী সকলেই আনন্দিত হইয়াছেন। আমরা আশকরি, মাতাজীর স্মৃতি-রক্ষা ভাণ্ডারে দেশবাসী সকলেই সাধ্যানুযায়ী সাহায্য দান করিবেন।

মন্ত্রী-দলের অবস্থা—

খাজা নাজিমুদ্দীন সাহেব বাংলা দেশে মন্ত্রিসভা গঠন করিয়া মোট ১৩ জন মন্ত্রী ও ১৭ জন পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী নিয়োগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। অথচ শুনা যায়, পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারীদের কাগজপত্র দেখিতে দেওয়া হয় না—কাজেই তাঁহাদের কোন বিশেষ কাজ নাই। সে জন্য মন্ত্রীপক্ষের সদস্যগণ ক্রমে ক্রমে ঐ দল ত্যাগ করিতেছেন।



কলিকাতা বৌদ্ধ বিহার হলে মহিলা কবি শ্রীমতী হেমলতা দেবীর বয়স ৭০ বৎসর হওয়ায় তাঁহার সম্বর্দ্ধনা সভা

ব্যবস্থা পরিষদে হাতাহাতি—

গত ১৭ই মার্চ্চ শুক্রবার বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে যে হাতাহাতির দৃশ্য দেখা গিয়াছে, তাহা কোন সভ্য দেশ বা সভ্যজাতির পক্ষেই শোভন নহে। গভর্ণমেণ্ট পক্ষ যে দিন দিন দুর্ব্বল হইয়া যাইতেছে; তাহা ভোট গণনার হিসাব হইতেই বুঝা যায়। এ অবস্থায় গভর্ণরের কি কর্ত্তব্য, তাহা বলিয়া দিবার প্রয়োজন নাই।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—

এইবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৯৪৩ সালে মোট ২৩৬৮জন বিভিন্ন ডিগ্রী লাভ করিয়াছেন। তন্মধ্যে ২৪২জন মহিলা। মহিলাদের মধ্যে ১২জন বিভিন্ন কারণে পদক লাভ করিয়াছেন। গ্র্যাজুয়েটগণের মধ্যে এম-এ হইতেছেন ১৮৩জন, তন্মধ্যে ১৭জন মহিলা। এম্-এস্-সি ৬৯জন, তন্মধ্যে ১জন

মহিলা। বি-টি ২৫জন; তন্মধ্যে ১২জন মহিলা। বি-এ ১০৯১জন, তন্মধ্যে ১৮৮জন মহিলা। বি-এস্‌-সি ৫৬০জন, তন্মধ্যে ১৪জন মহিলা। বি-কম্‌ ২৫২জন; বি-এল্‌ ৫৫জন। এম্‌-বি ৯৬জন, বি-মেট (ধাতু বিদ্যা) ৪জন এবং ডি-পি-এইচ্‌ ৮জন। এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত শ্রীচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল এবং শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রমোহন সেন পি-এইচ-ডি ডিগ্রী এবং শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ চ্যাটার্জ্জি ও শ্রীযুক্ত তড়িৎকুমার ঘোষ এম-ডি ডিগ্রী লাভ করেন।



কাশীধামে সন্তোষের মহারাজকুমার শিল্পী শ্রীযুক্ত রবীন রায় তাঁহার গালার চিত্র প্রস্তুত প্রণালী সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ থিয়সফিষ্ট ডাক্তার ভগবান দাস, শিল্পী রণদা উকীল ও ডাঃ পি-এন রায় মহাশয়দিগকে বুঝাইয়া দিতেছেন

অচল অবস্থা অবসানে সাংবাদিকদের চেষ্টা—

ভারতে বিভিন্ন স্থানের ১১২টী সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ গত ২৪শে জানুয়ারী বড়লাট বাহাদুরের নিকট একটী আবেদন পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। উক্ত আবেদনপত্রে ভারতের রাজনৈতিক অচল অবস্থা অবসানের নিমিত্ত মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে মুক্তি দিবার এবং একটী প্রতিনিধিমূলক লোকায়ত্ত গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করার জন্য অনুরোধ জানান হইয়াছে। এতদ্‌সম্পর্কে নিখিল ভারত সংবাদপত্রসম্পাদক সম্মেলনের সভাপতি মিঃ ব্রেলভির সহিত বড়লাটের প্রাইভেট সেক্রেটারীর কয়েকখানি পত্র বিনিময় হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

আসিবে, আশা ও আশ্বস্ত—

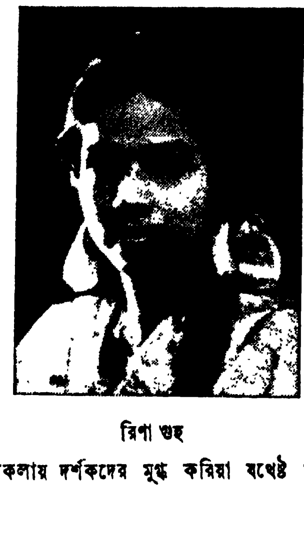
'নূন আনিতে পান্তা ফুরাণ'র অবস্থা বাঙ্গালাদেশের বহুদিনই হইয়াছে এবং তাহার ফলে জনসাধারণের অসুবিধার অন্ত নাই। আজ কয়লা নাই, কাল তেল নাই, পরশু নূন নাই—এইরূপ 'নাই নাই, শব্দে বাংলার আকাশ বাতাস মুখরিত। তথাপি মেঘের মাঝে বিদ্যুতের ন্যায় মাঝে মাঝে সরকারী আশ্বাস আমাদিগকে আশান্বিত করে। সম্প্রতি অসামরিক সরবরাহ সচিব মিঃ সুরাবর্দ্দি বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে ভারত সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত এক টেলিগ্রামের সংবাদযোগে জানাইয়াছেন যে বাংলায় যে চিনির বরাদ্দ আছে তাহা আরো বাড়াইয়া দেওয়া হইবে; গুড়, সরিষার তৈল ও সরিষার বরাদ্দ বা 'কোটা' কেন্দ্রীয় সরকার বাড়াইয়া দিবেন। ইহা ছাড়া বাংলার জন্য যত ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথের প্রয়োজন হইবে তাঁহারা তত ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ সরবরাহ করিবেন। বরাদ্দ ব্যবস্থা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে ইহা আনন্দের কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু কিছুদিন পূর্ব্বে সরবরাহ মন্ত্রীই আশ্বাস দিয়াছিলেন কয়লা আসিবে, কিন্তু পরে জানা যায় যে যত কয়লা আসিবার কথা ছিল তত কয়লা আসিয়া পৌছায় নাই। ব্যবস্থাপক সভার জনৈক সদস্যের কয়লার এই অভাব-জনিত এক মুলতুবী প্রস্তাবের উত্তরে সুরাবর্দ্দি সাহেব বলিয়াছিলেন—এই প্রদেশে কয়লা আসিয়া পৌছানর পর কেবলমাত্র বণ্টন ব্যবস্থা সম্পর্কেই তাঁহাদের দায়িত্ব, কয়লার পরিমাণ অথবা আনয়ন সম্পর্কে নহে। সুতরাং আসার আশায় আস্ফালনের কারণ নাই। আসিলে আশ্বস্ত হইতে পারা যাইবে।

সরকারী পরাজয়—

ভারত সরকারের ব্যয় বাবদ অর্থের সংস্থানের প্রস্তাবটী কেন্দ্রীয় পরিষদে গৃহীত হয় নাই। সরকার পক্ষের এই পরাজয়ের পর বড়লাট বাহাদুর উক্ত প্রস্তাবটী পুনর্বিবেচনার জন্য পরিষদকে অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। কিন্তু বড়লাট বাহাদুরের উক্ত অনুরোধও পরিষদ রক্ষা করেন নাই। ৫৬-৪৫ ভোটে প্রস্তাবটী অগ্রাহ্য হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই এতদ্‌সম্পর্কে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, 'গ্রেট বৃটেন যুদ্ধের জন্য যেখানে দৈনিক ১৪ কোটী টাকা ব্যয় করিতেছে—সেখানে সমগ্র বৎসরের জন্য ভারতবর্ষে মাত্র দুই কোটী টাকা মঞ্জুরের প্রস্তাবের কোন অর্থই হয় না।'

রিণা গুহ বি-এ—

কলিকাতার আর্ট সেণ্টার অফ দি ওরিয়েণ্টের শিল্পী রিণা গুহ বি-এ স্থানীয় বিভিন্ন সাহায্য অনুষ্ঠানে মণিপুরী ও



রিণা গুহ

অন্যান্য নৃত্যকলায় দর্শকদের মুগ্ধ করিয়া যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন।

পরলোকে অনাথনাথ মুখোপাধ্যায়—

গত ২৬শে মার্চ্চ রবিবার সকাল ৯।• ঘটিকায় স্বনামখ্যাত প্রচারশিল্পী ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ক্যালকাটা এ্যাডভারটাইজিং এজেন্সীর প্রবর্ত্তক ও স্বত্বাধিকারী অনাথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রায় ৭• বৎসর বয়সে তাঁহার কলিকাতা বাগবাজারস্থিত বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। সহজাত প্রতিভা ও



৺অনাথনাথ মুখোপাধ্যায়

অনন্যসাধারণ কর্ম্মশক্তির প্রভাবে অনাথবাবু এদেশে প্রচার শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি করিয়া গিয়াছেন। প্রায় ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে ১৯০৯ সালে তিনিই সর্ব্বপ্রথম এই ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেন। বিশিষ্ট সংবাদপত্র ও বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান নানাভাবে অনাথবাবুর নিকট উপকৃত। তিনিই সর্ব্বপ্রথম 'হোর্ডিং' এবং 'পিক্টোটাইন' বিজ্ঞাপনের প্রবর্ত্তন করেন। তিনি বহু সাহিত্যিক, শিল্পী ও কর্ম্মীর গুণমুগ্ধ সহায়ক ছিলেন। তিনি রামকৃষ্ণমিশন ও বিবেকানন্দ সোসাইটীর সহিত বিশেষভাবে-সংশ্লিষ্ট ছিলেন। যে কেহ তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন তিনিই তাঁহার প্রীতিপূর্ণ অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছেন। অনাথবাবুর বিয়োগে একজন সত্যদ্রষ্টা হৃদয়বান ভদ্র বাঙ্গালীর তিরোধান ঘটিল।

এ-বি-রেলের সংশয় মোচন—

কেন্দ্রীয় পরিষদে ফাইনান্স বিলের আলোচনার সময় আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে আমেরিকার হাতে দেওয়া এবং আমেরিকা যে সব বিমান ঘাঁটী নির্ম্মাণ করিতেছে যুদ্ধের পরেও সেগুলির উপর তাহাদের অধিকার থাকা না থাকা সম্পর্কে অনেক সদস্যের মনে উদ্বেগ দেখা গিয়াছিল। স্যার গুরুনাথ এতদ্‌সম্পর্কে জানান যে, আমেরিকা এইরূপ অধিকার দাবী করে না অথবা তাহাদিগকে ঐরূপ অধিকারও দেওয়া হয় নাই। এই সম্পর্কে জনসাধারণের মনও সংশয় দোলায় দুলিতেছিল। স্যার গুরুনাথ যথাযোগ্য উত্তর প্রদান করিয়া সকল সংশয় দূর করিয়াছেন তজ্জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ।

টিকা গ্রহণে সাম্প্রদায়িকতা—

এতদিন পর্য্যন্ত স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানের সদস্য নির্ব্বাচনে বা চাকরীতে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার কথা শুনা যাইত। সম্প্রতি শুনা যাইতেছে, বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের স্বাস্থ্য বিভাগ হইতে অনুরোধ করা হইয়াছে, হাসপাতাল সমূহে যে টিকা গ্রহণ করা হয়, তাহা যেন সাম্প্রদায়িক হারে গ্রহণের ব্যবস্থা হয়। এইরূপ নূতন ব্যবস্থার কথা আমরা হাসিব কি কাঁদিব, বুঝিতে পারি না। শুনা যায়, নূতন গভর্ণর মিষ্টার কেসি সুবিবেচক লোক—তিনি কি এইরূপ অদ্ভুত প্রস্তাবের মূল কোথায়, সে বিষয়ে খোঁজ-খবর লইবেন ?

পরলোকে সুরমা সুন্দরী ঘোষ—

বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রবীণা সেবিকা কবি সুরমাসুন্দরী ঘোষ সম্প্রতি ৭• বৎসর বয়সে কলিকাতায় পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি মৈমনসিংহের উকীল রায় বাহাদুর নিশিকান্ত ঘোষের পত্নী ছিলেন। তিনি কয়েকখানি কবিতা পুস্তক ও পাঠ্য পুস্তক লিখিয়া যশ অর্জ্জন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার কন্যা ও জামাতা (প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এইচ-কে-দে) তাঁহার নিকট উপস্থিত ছিলেন।

বেতার কেন্দ্রে বাঙ্গালা—

দিল্লী ও লক্ষ্ণৌ সহরে বহু সংখ্যক বাঙ্গালী বাস করেন, কিন্তু ঐ সকল স্থানের বেতার কেন্দ্র হইতে বাঙ্গালা ভাষায় কিছু বলা হয় না। এ বিষয়ে বহু দিন হইতে আন্দোলন করার পর গত ১৩ই মার্চ্চ নিখিল ভারত বঙ্গভাষা প্রচার সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ দিল্লীতে ঐ বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত সদস্য সার সুলতান আমেদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। ফলে স্থির হইয়াছে যে ঐ সকল সহরের বেতার শ্রোতাদের অভিমত জানিয়া লইয়া গভর্ণমেণ্ট ঐ বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবেন। তাহাতে শুধু বাঙ্গালী শ্রোতাদেরই সুবিধা হইবে না—অবাঙ্গালী শ্রোতারাও রবীন্দ্রনাথের বাংলা গান শুনিবার সুযোগ লাভ করিবেন।

পরলোকে ষোড়শীবালা দেবী—

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্নী ষোড়শীবালা দেবী ৪৪ বৎসর বয়সে গত



৺ষোড়শীবালা দেবী

৬ই চৈত্র ৩ পুত্র রাখিয়া সাবিত্রী ধামে প্রয়াণ করিয়াছেন। তিনি ধর্ম্মপরায়ণা ও করুণাময়ী ছিলেন এবং তাঁহার ব্যবহারে সকলেই প্রীত হইতেন।

জলধর স্মৃতি তর্পণ—

গত ৮ই এপ্রিল শনিবার সন্ধ্যায় হাওড়া সালিখা গোবর্দ্ধন সঙ্গীত ও সাহিত্য সমাজে ভারতবর্ষ-সম্পাদক স্বর্গত রায় বাহাদুর জলধর সেন মহাশয়ের এক স্মৃতি সভার আয়োজন হইয়াছিল। জলধরবাবু প্রতিষ্ঠাবধি ২৫ বৎসর কাল উক্ত সমাজের সভাপতি ছিলেন। শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় স্মৃতি সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ বসু, অখিল নিয়োগী, কবিরাজ ইন্দুভূষণ সেন, অধ্যাপক শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়, কানাই বসু, দেবনারায়ণ গুপ্ত, কিরণচন্দ্র দে চৌধুরী, সুধাংশুকুমার রায়চৌধুরী প্রভৃতি সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। সমাজের বর্ত্তমান সভাপতি কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিমলানন্দ তর্কতীর্থ ও স্থানীয় কর্ম্মীদের চেষ্টায় অনুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল।

সঙ্গীতের আসর—

গত ১৩ই মার্চ্চ সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস ও কবি জসীমুদ্দীনের উদ্যোগে কলিকাতা ২৫৭বি বৌবাজার ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক সঙ্গীত-আসরের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। তাহাতে কয়েক ঘণ্টাব্যাপী নৃত্য, গীত, বাদ্য, হাস্য-কৌতুক, নাটিকা-অভিনয় প্রভৃতির ব্যবস্থা ছিল। হাস্যরসিক রমণী ঘোষাল, শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন রায়, মিঃ আব্বাস উদ্দীন, মিঃ এম-হোসেন (খসরু), শেফালি সেনগুপ্ত, শান্তি সান্যাল, দুর্গারাণী মিত্র প্রভৃতি আসরে যোগদান করিয়াছিলেন।

কেদার বন্দ্যোপাধ্যায় জয়ন্তী—

খ্যাতনামা হাস্যরসিক সাহিত্য সেবী শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বিরাশীতম জন্মদিবস উপলক্ষে গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী রবিবার অপরাহ্নে ২৪পরগণা দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার পৈতৃক বাসভবনে প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের সভাপতিত্বে 'কেদার জয়ন্তী' উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। দক্ষিণেশ্বরস্থ রামকৃষ্ণ পাঠাগার এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা ছিলেন এবং পূর্ণিয়া হইতে কেদারনাথ এই উপলক্ষে এক বাণী প্রেরণ করিয়াছিলেন। সভাপতি মহাশয় কেদারবাবুর সাহিত্যিক প্রতিভার বিশ্লেষণ করিয়া এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন এবং শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধকুমার রায় প্রভৃতি কেদারবাবুর কথা বিবৃত করিয়াছিলেন। সভায় তাঁহার সুদীর্ঘ কর্ম্মময় জীবন কামনা করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। স্থানীয় ও বাহিরের বহু লোক এই উৎসবে যোগদান করিয়া অনুষ্ঠানটি সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছিলেন।

কলিকাতা কবি-সম্মিলন—

গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী সাহিত্য বাসরের উদ্যোগে কলিকাতা বালিগঞ্জ ৩৫।১০ পদ্মপুকুর রোড়ে শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের গৃহে প্রবীণ কবি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী মহাশয়ের সভাপতিত্বে কলিকাতা কবি সম্মিলন হইয়াছিল। সভাপতি মহাশয় ছাড়া সভায় নিম্নলিখিত ১৬ জন কবি স্বরচিত কবিতা পাঠ করিয়াছিলেন—শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী, গিরিজাকুমার বসু, প্যারীমোহন সেনগুপ্ত, কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, প্রভাতকিরণ বসু, শ্রীমতী মমতা ঘোষ, অপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, অনিলকুমার ভট্টাচার্য্য, অখিল নিয়োগী, শ্রীমতী কমলরাণী মিত্র, শ্রীমতী ক্ষণপ্রভা ভাদুড়ী, আশুতোষ সান্যাল, সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস, দক্ষিণারঞ্জন বসু, হেমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়। তাহা ছাড়া কলিকাতার বহু কবি ও সাহিত্যিক এই সম্মিলনে যোগদান করিয়াছিলেন।

হিন্দু সংস্কৃতি সম্মেলন—

গত ২৬শে মার্চ্চ রবিবার অপরাহ্নে ২৪ পরগণা জেলার নৈহাটী সরকারবাটীতে এক হিন্দু সংস্কৃতি সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত সম্মেলনে সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়া হিন্দুর প্রাচীন সংস্কৃতির ইতিহাস বিবৃত করিয়া তথায় এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ শেঠ, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং ভাটপাড়া হইতে পণ্ডিত শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ ও শ্রীযুক্ত ভবতোষ ভট্টাচার্য্য সভায় যোগদান করিয়া বক্তৃতা করেন। স্থানীয় হিন্দু আন্দোলনের নেতা শ্রীযুক্ত অতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ন সকলকে সাদর অভ্যর্থনা করেন। সভায় বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের মাধ্যমিক শিক্ষা বিল ও ভারত গভর্ণমেণ্টের হিন্দু উত্তরাধিকার বিলের নিন্দা করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ে কনভোকেসন—

গত ৪ঠা মার্চ্চ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে এবার কনভোকেসন উৎসব হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালার গভর্ণর মিষ্টার কেসি চ্যান্সেলার হিসাবে উৎসবে সভাপতিত্ব করেন এবং কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার সার সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান বক্তৃতা করেন। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় মহাশয় ভাইস-চ্যান্সেলার রূপে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বহুমুখী কর্ম্মপ্রচেষ্টার সম্পূর্ণ পরিচয় ছিল। তাহাতে জানা যায়, বর্ত্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মোট ৯১টি কলেজ আছে। তন্মধ্যে ১২টিতে শুধু বালিকাদের শিক্ষা দেওয়া হয়, একটির স্বতন্ত্র বালিকা বিভাগ আছে এবং ১৯টিতে বালক ও বালিকাদিগকে একত্র শিক্ষাদান করা হয়। ৯১টি কলেজের মধ্যে ২৭টি কলিকাতায়, ৪৯টি বাঙ্গালার মফঃস্বল সহরে এবং ১৫টি আসামে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১৯৪৩ সালে মোট ১৮৫৬টি স্কুল ছিল। তন্মধ্যে বাঙ্গালার ১০২টি ও আসামের ২৩টিতে শুধু বালিকাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়।



চলতি ভাষা ও কালীপ্রসন্ন সিংহ

শ্রীঅমলকুমার চট্টোপাধ্যায় বি-এল্

সর্ব্বগ্রাহ্য হউক আর না হউক, বাংলা গদ্যসাহিত্যে চলতি ভাষা দৃঢ় আসন পাতিয়া বসিয়াছে। একথা আজ অস্বীকার করা চলে না যে, গদ্য সাহিত্যের এই বিশেষ ভঙ্গিমা আমাদের সাহিত্যের একটী বিশেষ রূপ-সজ্জার সৃষ্টি করিয়াছে। প্রাচীনেরা হয়ত ইহাকে গ্রহণ করেন নাই—বিদ্রূপ-বাধায় ইহার গতিপথ ব্যাহত করিতেছেন, তথাপি বহুলোকের ইচ্ছা ও সম্মতির ফলে ধীরে ধীরে ইহার পুষ্টিলাভ হইতেছে।

প্রাচীনেরা সর্ব্ববিধ অগ্রগতিকে চিরকাল বাধা দেন ও দিবেন। বিদ্যাসাগরকেও একদিন তাঁহারা আক্রমণ করিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার প্রতিও কটূক্তি করিতে ছাড়েন নাই, রবীন্দ্রনাথকে ত অপাংক্তেয় করিয়া রাখিয়াছেন—তথাপি অগ্রগতির বিরাম হয় নাই ; যাহা বহুলোক চাহিয়াছে, তাহা আপন অধিকার লাভ করিয়াছে। বাংলা গদ্যসাহিত্যের সামান্য দেড়শত বৎসরের ইতিহাসে ইহার বিচার চলে না, অনাদি কালের যবনিকা-পটে এই সামান্য কয়েকটী মুহূর্ত্ত ভালো কি মন্দ ইহা লইয়া তর্ক করিতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র। ভাষার পরিণতি কি দাঁড়াইবে, তাহা আজও নির্দ্ধারণ করিবার সময় আসে নাই। এখনও বিভাগে বিভাগে, জেলায় জেলায়, পরগণায় পরগণায়, উচ্চারণ ভঙ্গিমার যে পার্থক্য বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা ভবিষ্যতে একদিন দূরীভূত হইবেই। শিক্ষার সম্প্রসারণে, যাতায়াতের অবাধ প্রচলনে, সামাজিক মিলনের প্রসারতায় অদূর ভবিষ্যতে সমগ্র বাংলার ভাষার এক অখণ্ডরূপ গড়িয়া উঠিবে, সুতরাং আজ হয়ত কোনো মানদণ্ড নির্দ্দেশ করা চলে না। কিন্তু মানদণ্ড নির্দ্দেশ করা চলে না বলিয়াই, তাহা একেবারে বাতিল করিয়া দেওয়াও বাতুলের কার্য্য। ক্রম পরিণতির দিকে চাহিয়া উদার দৃষ্টি মেলিয়া আমরা শুধু ইহাকে লক্ষ্য করিতে থাকিব। একদা যখন আপন গতি ভঙ্গিমায় এই প্রগতি স্বীয় পথ সৃষ্টি করিয়া লইবে, তখন ইহাকে কেহই অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না।

গদ্য ভাষায় চলতি ক্রিয়া পদ প্রয়োগ করা উচিত কি অনুচিত তাহা লইয়া বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ সারগর্ভ আলোচনা করিয়াছেন। এই দুই মণীষীর চিন্তাধারা ভিন্নমুখী। একজন ইহা স্বীকার করিয়াছেন, অপরজন ইহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র যে যুগে সাহিত্য আলোচনা করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য রবি সে যুগে উদিত হইলেও পরশতাব্দীতে তাহা মধ্যাহ্ন গগনে ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের তৎকালীন আবহাওয়া ও পট-ভূমিকা হইতে রবীন্দ্রনাথের পারিপার্শ্বিকতা পৃথক। সুতরাং এই দুই মণীষীর কথা বিচার করিবার সময় তৎকালীন যুগধর্ম্মকে ভুলিয়া বিচার করিলে ন্যায় বিচার করা যায় না।

ঔচিত্যের কথা ছাড়িয়া দিয়া আমরা শুধু ইহার গতিপথের উৎস ও ধারা দেখিবার চেষ্টা করিতেছি। বঙ্কিমচন্দ্র যদিও গদ্যসাহিত্যে চলতি ক্রিয়ার প্রচলন স্বীকার করেন নাই, তথাপি তিনি নিজেও তৎকালীন প্রগতিকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারেন নাই। তাঁহার উপন্যাসের চরিত্র-গুলির কথোপকথনে চলতি ভাষার প্রয়োগ-চেষ্টা করিয়াছেন। যদিও কথোপকথনে আধুনিক সাহিত্যিকগণের ন্যায় সুসংবদ্ধভাবে চলতিভাষা প্রয়োগে তিনি সমর্থ হন নাই, তথাপি ভবিষ্যৎ ধারার পরিচয় তাহাতে ব্যাপ্ত রহিয়াছে। মধুসূদন, দীনবন্ধু ও গিরিশচন্দ্রের উল্লেখ করিব না, কারণ তাঁহারা নাটক লিখিয়াছেন এবং নাটকের কথোপকথন চলতি ভাষায় লেখা ভিন্ন উপায় নাই। তবে দীনবন্ধু যেমন চলতি ভাষার মধ্যে প্রাদেশিক ভঙ্গিমা আনিয়াছিলেন, তেমন অন্যত্র দৃষ্ট হয় না।

কিন্তু ইহা নাটকের অথবা উপন্যাসের কেবলমাত্র কথোপকথনের ভাষা। সম্পূর্ণ উপন্যাস চলতি ভাষায় লেখা বঙ্কিম-যুগে স্বপ্নাতীত ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সম্পূর্ণ উপন্যাস বা গল্প আগাগোড়া চলতি-ভাষায় সুসংবদ্ধভাবে লেখা প্রবর্ত্তন করেন—রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে। অনেকেই ইহা বাংলা গদ্যসাহিত্যের চলতি ভাষার প্রথম রূপ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু বঙ্কিমযুগে, বঙ্কিমী আবহাওয়ায়, বিদ্যাসাগরের প্রভাবযুক্ত পারিপার্শ্বিকতায় কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় আগাগোড়া চলতি ভাষায় উপন্যাস লিখিয়া যে অসমসাহসিকতা ও সংস্কারবর্জ্জিত মনের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা আজ এই বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আমরা বিস্ময়ে স্মরণ করিয়া থাকি। এত ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি, এত উদার মনোবৃত্তি, এত সাহস তরুণ কালীপ্রসন্ন কোথা হইতে পাইলেন, তাহা অনুসন্ধানের বিষয়। কিন্তু যুগে যুগে যেমন নবপথের পরিদর্শকরূপে নব নব স্রষ্টার আবির্ভাব হয়, তেমনই কালীপ্রসন্ন বাংলা সাহিত্যের ভাবী স্থপতিরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

বিংশ শতাব্দীর তথাকথিত আধুনিক সাহিত্যধারাকে স্থূলতঃ তিন অংশে ভাগ করা যাইতে পারে। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বপর্য্যন্ত এক অধ্যায়—যেকালে 'নৌকাডুবি' 'চোখের বালি' রচিত হইয়াছিল। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে 'ঘরে বাইরে' রচনা করিয়া রবীন্দ্রনাথ আধুনিক ধারার প্রবর্ত্তন করিলেন। ভালোই হউক আর মন্দই হউক, এই নূতন যুগ কালধর্ম্মে টিকিয়া গেল। শুধুই টিকিল না—আপন মাধুর্য্যে সাহিত্যের দরবারে স্থায়ী আসন পাতিয়া বসিল, চারিপার্শে নব নব জ্যোতিষ্কের সমাবেশ করিয়া উজ্জ্বল হইয়াই রহিল। এই দ্বিতীয় যুগের শেষ অংশেই তরুণ সাহিত্যিকবৃন্দ বাংলা সাহিত্যের প্রাঙ্গণে বিচিত্র পীঠ নব নব আলিঙ্গনে সমৃদ্ধ করিলেন। তার পর তৃতীয় যুগ আরম্ভ হইল ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে—'শেষের কবিতা'র পরে। এই যুগ অতি-আধুনিক যুগ—এখনও ইহার প্রগতি বর্দ্ধমান, সুতরাং ইহার সমালোচনার অন্ত নাই।

একা রবীন্দ্রনাথের জীবনেই সাহিত্য-ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায় রচিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র হইতে যাহারই নাম করি না কেন, একক রবীন্দ্রনাথ আপন সার্ব্বভৌম বক্ষপুটে সকলকেই আচ্ছন্ন করিয়া আছেন। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দাঁড়াইয়া একবার অবাধ দৃষ্টি মেলিয়া অতীতের দেড়শত বৎসর দেখিয়া লইয়া আজ শুধু এই কথাই মনে পড়ে—রক্ষণশীলতার পক্ষে ওকালতি করিবার জন্য অনেকেই দাঁড়াইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাদের বক্তৃতা, সূক্ষ্ম সমালোচনার খুঁটিনাটিতে শুধু ওকালতিই রহিয়া গেল, মামলার রায়ে দেখা গেল যে তাঁহাদের মোকর্দ্দমা সখরচা খারিজ হইয়াছে। তথাপি এই রক্ষণশীলতার দুর্ভেদ্য রক্ষাকবচ বাঁধিয়াও যাঁহারা সময়ে সময়ে আপন হৃদয়ের মর্ম্মকথা বলিতে দ্বিধা করিতেন না, যাঁহারা সত্যকে গোপন করিয়া শুধু নীতিশাস্ত্রের অনুশাসন প্রচার করেন নাই এবং তর্কের মোহে আপনাকে বঞ্চিত করেন নাই—তাঁহাদের কথা ভাবিলেই মনে পড়ে প্যারীচরণ, ভবানী বন্দ্যোপাধ্যায় ও ইন্দ্রনাথকে। বাংলা ভাষাকে বাঙ্গালীর ভাষা করিবার জন্য তাঁহারা সে যুগে যে দুর্জ্জয় সাহস দেখাইয়াছেন, তাহা স্মরণ করিলে বিস্ময়ে মুগ্ধ হইতে হয়। শুধু পূর্ব্ব দিকের জানালা খুলিয়া শতাব্দীর পর শতাব্দী আমরা কাটাইয়াছি। অকস্মাৎ পশ্চিমের গবাক্ষ উন্মুক্ত হইয়া অবাধ বায়ু চলাচলের পথ প্রশস্ত হইয়া গেল। কেবল উদয়াচলের শোভা দেখিয়া যখন মন ক্লান্ত, তখন হঠাৎ পশ্চিমাকাশের আলোকচ্ছটা মন প্রাণ পুলকিত করিয়া তুলিল।

কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিমান কালীপ্রসন্ন সিংহ। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া মাত্র ৩১ বৎসরের মেয়াদ লইয়া তিনি আসিয়াছিলেন এবং তাহার মধ্যেই বাংলা ভাষার সংগঠনে যে সাহস, যে তেজ, যে প্রতিভা দেখাইয়াছেন তাহা ইতিহাসের মাপকাটিতে বিরাট ও বিস্ময়কর।

বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ কালীপ্রসন্নের দুই বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম রচনা 'ললিতা ও মানস' নামক কাব্যগ্রন্থ রচিত হয় ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে—১৫ বৎসর বয়সে। কিন্তু এই সনেই ১৩ বৎসর বয়সে কালীপ্রসন্ন রচনা করেন 'বাবু নাটক'। কিন্তু ১৫ বৎসর বয়স্ক বালকের রচিত 'ললিতা ও মানস' গ্রন্থ দ্বারা যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের পরিচয় প্রদান করা চলে না, তেমনই ১৩ বৎসর বয়সের রচনা দ্বারা কালীপ্রসন্নের কথা ও আলোচনা করা উচিত হইবে না।

বঙ্কিমচন্দ্রের সুসংবদ্ধ রচনা 'দুর্গেশনন্দিনী' তাঁহার প্রথম উপন্যাস; ইহা প্রকাশিত হয় ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে। ইহার রচনা কাল ইহার দুই এক বৎসর পূর্ব্বে অনুমান করিলে বোধ করি অন্যায় হইবে না। কিন্তু কালীপ্রসন্ন ইহার সাত বৎসর পূর্ব্বে মহাভারতের অনুবাদ কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন—মাত্র ১৮ বৎসর বয়সে। তৎকালীন গদ্য-ভাষার মান বিবেচনা করিলে মহাভারতের ভাষা বিশেষ সমৃদ্ধ ও সুগঠিত ইহাতে সন্দেহ নাই এবং কালীপ্রসন্ন যে বঙ্কিমচন্দ্রের অনুরূপ সংস্কৃত ও তদ্ভব শব্দে সালঙ্কার বর্ণনাবহুল মার্জ্জিত গদ্যভাষা বঙ্কিমচন্দ্রের বহু পূর্ব্বেই রচনা করিতে পারিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তৎসত্ত্বেও অক্ষয়-ভূদেব প্রচলিত ও বঙ্কিম-প্রভাবিত গদ্য সাহিত্যের ধারা-পথে চলিতে অকস্মাৎ 'হুতোম-প্যাঁচার নক্সা' লিখিবার অনুপ্রেরণা কোথা হইতে তিনি পাইলেন তাহা ভাবিবার বিষয়। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ২১ বৎসর বয়সে কালীপ্রসন্নের দৃষ্টিভঙ্গিমা ভবিষ্যতের পানে চাহিয়া জাগ্রত হইয়া উঠিল—কথ্যভাষাকে কৌলীন্য-মর্য্যাদা দিয়া সাহিত্যের বরাসনে বসাইয়া বরণ করিয়া লইলেন। সে যুগে এইরূপ দুঃসাহসকে সাহিত্যরথীরা ক্ষমা করিতে পারিলেন না, সমালোচনার তীক্ষ্ণ কশাঘাতে আহত করিতে লাগিলেন। তথাপি দ্রষ্টা ও স্রষ্টা যুবক সত্যকারের ভাষা জননীর রূপটীকে অস্বীকার করিতে পারেন নাই। আজ ৮২ বৎসর পরে সেই অসম সাহসিকতার কথা ভাবিয়া দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। অথচ সেই সনেই তিনি হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতির উদ্দেশে যে আবেদন প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা হইতে অভিন্ন নহে।

বস্তুতঃ 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'ই বাংলা সাহিত্যে প্রথম আগাগোড়া চলতি ভাষায় লেখা রচনা। ইহাতে কোনোস্থানে ভাষার তারতম্য ঘটে নাই, কোথাও ক্রিয়াপদ ভ্রমক্রমেও মাতৃভাষায় লিখিত হয় নাই। এই দীর্ঘ রচনার মধ্যে শুধু ক্রিয়াপদই চলতি ভাষায় লিখিত হয় নাই—অন্য সংস্কৃতজ শব্দও বাংলা কথ্য ভঙ্গিমায় লিখিত হইয়াছে।

কালীপ্রসন্নের মহাভারতের অনুবাদের পূর্ব্বে বর্দ্ধমান রাজবাটী হইতে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীকৃত মহাভারতের অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহা অনুবাদ হইলেও তাহার ভাষা সংস্কৃতবহুল, এজন্য সাধারণ লোক তাহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত না। এই সম্পর্কে কালীপ্রসন্ন রসিকতা করিয়া লিখিয়াছিলেন যে কলিকাতায় যে মাটীর পুতুলের সং হয়, তাহার নীচে লেখা দেখিয়া বুঝিতে হয়, তাহা কিসের সং এবং 'সংগুলি বর্দ্ধমানের রাজার বাংলা মহাভারতের মত—বুঝিয়ে না দিলে মর্ম্ম গ্রহণ করা ভার'। একস্থানে এই সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—'সঙেদের মুখের ছাঁচ ও পোষাক সকলেরই এক রকম, কেবল ভীষ্ম দুধের মত সাদা, অর্জ্জুন ডে-মার্টিনের মত কালো ও দুর্য্যোধন গ্রীণ। নবরত্নের সভা, বিক্রমাদিত্য আফিসের দালালের মত পোষাক পরে বসে আছেন। রত্নদের সকলেরই এক রকম ধুতি, চাদর ও টিকি হঠাৎ দেখ্‌লে বোধহয় যেন একদল অগ্রদানী ক্রিয়াবাড়ী ঢোকবার জন্য দরওয়ানের উপাসনা কচ্চে। শ্রীমন্ত মশানে, কোটালেরা ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েচে, শ্রীমন্তের মাথায় শালের শামলা, হাফ-ইংরিজি গোছের চাপকান ও পায়জামা পরা, ঠিক যেন একজন হাইকোর্টের প্লীডার প্লীড কচ্ছেন।'

উপরে উদ্ধৃত ভাষার নমুনা হইতে দেখা যায় যে 'সঙেদের' 'ঢোকবার' 'রয়েচে' 'গোছের', 'কালো' প্রভৃতি বাংলার খাঁটী প্রাদেশিক কথাগুলির প্রয়োগ দ্বারা ভাষার কিরূপ মিষ্টতা বাড়িয়াছে। ইহা ভিন্ন বাংলা ভাষার কথ্যরূপের কতকগুলি প্রাদেশিক ভঙ্গিমাও অন্যত্র আছে যথা, কাপড় চোপড়, ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে, পুঁস্যি-পুত্তুর, নেমন্তন্ন, চ্যাটালো, খদ্দের, উচ্ছুগগু, রাজা বদ্দিনাথ প্রভৃতি। বাহুল্যভয়ে বেশী উদ্ধৃত করা চলে না।

আজকাল বাংলা শব্দের বানান আধুনিক লেখকগণের বিতর্কের বিষয়। 'বাঙ্গালা' শব্দ বহুদিন অন্তর্হিত হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্‌লা, বাংলা, বাঙলা—ইহার মধ্যে কোনটী হইবে, তাহা এখনও ঠিক হয় নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় ৮২ বৎসর পূর্ব্বে কালীপ্রসন্ন 'বাঙ্‌লা' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। ইহাই কি তাঁহার দুঃসাহসিক আধুনিকতার পরিচয় নহে?

সে যুগে কালীপ্রসন্ন তাঁহার স্বল্পায়ু জীবনে বাংলা সাহিত্য ও ভাষার জন্য যাহা করিয়া গিয়াছেন, আজ হয়ত শতাব্দী পরে আমরা তাহা স্মরণ করিবার প্রয়াস পাই না, তথাপি এই আধুনিক সাহিত্যভঙ্গিমার রূপ যে শতাব্দীপূর্ব্বে তাঁহার স্বপ্নদৃষ্টিতে প্রতিভাত হইয়া উঠিয়াছিল তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। দীর্ঘদিন বাঁচিয়া থাকিলে সাহিত্যের ভাণ্ডারে তাঁহার দান অগণিত বিচিত্র উপাদান সঞ্চিত করিয়া যাইত, কিন্তু এই রূপদ্রষ্টা শিল্পী একত্রিশটী বসন্ত মাত্র উপভোগ করিয়া নিজ অলৌকিক প্রতিভা অনাগত কালের হর্ম্ম্য-সৌধ নির্ম্মাণের ভিত্তি-প্রস্তর রচনা করিবার জন্য রাখিয়া গিয়াছেন।

ত্রাণকর্ত্তা পৃথিবীর নবজন্ম আঁকে

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

সিঁদূরে রঙের মেঘ দিগন্ত ছাপিয়ে এলো,
গেল বেলা।
ঠাণ্ডা হাওয়া থরতোয়া নদীটিরে করে এলোমেলো,
দীর্ঘবাসে চঞ্চলতা পল্লব-প্রচ্ছন্ন চোখে করে খেলা।
সৈনিকের ক্লান্ত পদক্ষেপে
বাদুড়ের কাঁপে ডানা।
মৃত্যু দেবে
ঈগল পাখীর মত হানা।
যাবে চলে যাযাবর সভ্যতার অট্টহাসি আর পরিহাস।
রাত্রির তিমির প্রান্তে পাওয়া যাবে শান্তির আশ্বাস।
কুটীরে কান্নারধ্বনি যাবে থেমে,
দুঃখ কেন মাগো! সেদিন আগতপ্রায়।
স্বর্গের দূতীরা সব কুঁড়ে ঘরে আসিবে যে নেমে,
মাগো! ওই দেখ এ হিংস্র শতাব্দীর সূর্য্য অস্ত যায়।
হে দুঃখিনী সীতা!
নিবিতেছে দিবসের চিতা।
অবসন্ন মানুষেরা ভবিষ্যেরে ডাকে,
ব'সে রথে
অস্পষ্ট তারার পথে।
ত্রাণকর্ত্তা পৃথিবীর নবজন্ম আঁকে।

ছাপাখানার কালি ও সভ্যতা

শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত বি-এস্‌সি

আই-এস্‌সি ক্লাসে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের লিখিত রসায়নের পাঠ্যপুস্তকে গন্ধক-দ্রাবক যন্ত্রের ছবি দেখাইয়া আমাদের অধ্যাপক বলিলেন, "বর্ত্তমান মাপকাটিতে যে দেশে যত গন্ধক-দ্রাবক ব্যবহৃত হয় সে দেশ তত সভ্য।" প্রায় ২০ বৎসর পরে চলতি সাহিত্যে এমন কথা পড়িয়াছি যে, "যে দেশে যত বেশী সাবান ব্যবহার হয় সে দেশ তত সভ্য।" যে দৃষ্টি দিয়া এই প্রশ্নকে বিচার করা হয় তাহা অনুসরণ করিলে বলা চলে, "যে দেশে যত ছাপার কালি প্রস্তুত হয় সে দেশ তত সভ্য।"

বর্ত্তমান কালে এই সভ্য-অসভ্যের বিচার না করিলেও চলিবে, কিন্তু ছাপার কালির প্রয়োজন এই দেশে কতখানি তাহার আলোচনা আবশ্যক। সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র, স্কুলকলেজের ও অন্যপুস্তক, আপিসের কাগজপত্র ও ছবি এবং সকল রকম পণ্যদ্রব্যের লেবেল ও প্রচার পত্রাদি ছাপার জন্য বুঝিবা বহু লক্ষ টাকার কালি এদেশে ব্যয় হয়।

ছাপার কালি নানা রকম। কালো এবং বিবিধ রঙীণ। তাহাও আবার এক এক প্রয়োজনে এক এক রকম। বড় অক্ষর বলিবা সস্তা অপেক্ষাকৃত অমসৃণ কালিতে ছাপা যায়, ছোট ও সূক্ষ্ম কারিকুরীর অক্ষর বা ছবিতে চাই খুব মসৃণ দামী কালি।

কাগজ পরিবর্ত্তন করিলেও দেখা যায়, একই কালিতে ছাপিয়া ভিন্ন ভিন্ন ফল হইতেছে। ইহার ফলে বিভিন্ন কাগজের জন্য বিভিন্ন কালি তৈরীরও আবশ্যক হয়।

ছাপার যন্ত্র ও নানা প্রকার। ফ্ল্যাট, লিথো, অফসেট, রোটারী নানা নাম—এক একরূপ যন্ত্রে এক একরূপ কালি প্রয়োজন। ঘন বা তরল, বেশী বা কম চট্‌চটে, বেশী রঙীণ বা কম রঙীণ—এক একরূপ যন্ত্রে এক একরূপ ছাপার কালি প্রয়োজন।

এই কম রঙীণ ও বেশী রঙীণ কথাটির তাৎপর্য একটু পরিষ্কার করিয়া লওয়া আবশ্যক। কালো ভুষা বা তৈল ও জলে অদ্রাব্য কোন রঙের সঙ্গে তৈলজাতীয় দ্রব্য মিলাইয়া ছাপার কালি তৈরী হয়। সুতরাং এই ভুষা বা রং বেশী বা কম ভাগে মিলাইয়া বেশী বা কমজোরী ছাপার কালি তৈরী করা যায়। যত গুড় তত মিঠা—অর্থাৎ যত বেশী রং ছাপার কালিতে থাকিবে তত তাহার জোর বৃদ্ধি পাইবে এবং দাম সেই অনুপাতে বাড়িবে।

তাই একই রঙের কালির দাম কেহ ভিন্ন ভিন্ন চাহিলে বুঝিতে হইবে যে ঐ কালিগুলির মোটামুটি রঙের শক্তি ভিন্ন ভিন্ন এবং ঐরূপ ভিন্ন ভিন্নরূপ কালি তৈরী করার কারণ বিচিত্র মুদ্রণ যন্ত্র, ছাপার কাগজ ও বিষয়বস্তু।

মোটামুটি ছাপার কালির গঠন ও বিভিন্ন প্রকৃতি সম্বন্ধে আমরা যাহা বলিলাম তাহাতে বোধ হইতে পারে যে বিদেশীর নিকট হইতে যখন ছাপার যন্ত্র ক্রয় করা হয়, তখন ছাপার কাজে বিশেষজ্ঞ ঐ বিদেশীদের নিকট হইতেই ছাপার কালি সংগ্রহ করা ভাল।

কিন্তু ছাপাখানার মালিকদের সকলের এখন আর এই ধারণা নাই। অনেকে দেখিয়াছেন, এদেশে বসিয়াই বিদেশীরা কালি প্রস্তুত করিতেছেন এবং তাহারা সেই কাজে এদেশীয় অনেক কাঁচামাল ব্যবহার করিতেছেন। এবং আরও আশার কথা এই যে, বিদেশী কোন কোন রঙ, যাহা যুদ্ধের পূর্বে বিদেশ হইতে আসিত, তাহা এখন এদেশেই বেশ সুন্দর তৈরী হইতেছে।

ছাপার কালি কেমন করিয়া তৈরী করিতে হয় সে বিষয় এই প্রবন্ধের প্রারম্ভে কিছু বলিয়াছি। তাহাতে আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে ইহা প্রস্তুত করা অতি সহজ—কারণ, তৈলের সহিত রঙ মাড়িয়া লইলেই কালি তৈরী হইল। বস্তুত এই কার্যে গুরুতর অভিজ্ঞতা ও রাসায়নিক জ্ঞান আবশ্যক। ছাপার কালি হইবে মাখনের মত মসৃণ এবং রোটারীর জন্য অপেক্ষাকৃত পাতলা কালি ছাড়া অন্য প্রায় সকল রকম কালিই হইবে কমবেশী মাখনের মতই ঘন। তৈলের সঙ্গে গুঁড়া রঙ মাড়িয়া ঐরূপ মসৃণ ও ঘন কি সাধারণ ভাবে হয়? হয় না। ইহা তৈরী করিতে যে ভুষা বা রঙ লাগে তাহা তৈরী করিতে বিশিষ্ট রাসায়নিক জ্ঞান প্রয়োজন—সাধারণ ভুষা বা রঙ এই কাজের অযোগ্য। এই দেশজ তিসির তৈল বহু পরিমাণে কালির বাহকরূপে (Vehicle) ব্যবহৃত হইতেছে সত্য, কিন্তু রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা ইহার পূর্বরূপের সবিশেষ পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে হয়। সর্বোপরি রঙ ও বাহকের মিশ্রণ সূক্ষ্মযন্ত্রের সাহায্যে অতি দক্ষতার সহিত করিতে হয়। ফলতঃ ছাপার কালির ভালমন্দের বিচার হইবে যোগ্য ছাপাখানায়।

সংবাদপত্রের কাগজের সমস্যা যুদ্ধহেতু গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। এই কাগজ এদেশেই যে তৈরী করা সঙ্গত তদ্বিষয়ে একটি আন্দোলন এদেশে গত প্রায় পাঁচবৎসর চলিতেছে। সেই সঙ্গে আমরা বলিতে চাই যে ছাপার কালির প্রয়োজনও যেন এদেশের শিল্প প্রতিষ্ঠান-গুলিই মিটাইতে পারে, তদ্বিষয়ে আন্দোলনও আবশ্যক।

যুদ্ধহেতু আমদানী ব্যাহত হইয়াছে। ইহাতে আমাদের এই শেষোক্ত বাক্যের জন্য আর যুক্তি-সমাবেশের আবশ্যক নাই। কিন্তু যুদ্ধ চিরদিন থাকিবেনা, তখন ঐ সকল অনুচ্চারিত যুক্তি স্মরণ রাখাই দেশবাসীর পক্ষে কর্ত্তব্য হইবে।

কিন্তু আশার কথাও আছে। এদেশে কয়েকটি দেশীয় প্রতিষ্ঠানে ছাপার কালি প্রস্তুত হইতেছে। লাহোরে ক্রিসেণ্ট, মিরাটে ভুরেলা, কলিকাতায় বেঙ্গল কেমিক্যাল ও হুগলী প্রভৃতি দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলি প্রায় সবরকম ছাপার কালিই তৈরী করেন। আমরা জানিয়া আনন্দিত হইলাম যে দিল্লীর 'হিন্দুস্থান টাইমস্,' কলিকাতার 'আনন্দবাজার পত্রিকা,' 'প্রবাসী,' 'ভারতবর্ষ' প্রভৃতি দেশী কালিতে ছাপা হইতেছে। ভারত সরকার, বঙ্গ ও যুক্তপ্রদেশ এবং আসামের সরকার প্রভৃতিও দেশীয় প্রতিষ্ঠান হইতে ছাপার কালি কিনিতেছেন। তাহারা নানারূপ রঙীণ কালিও দেশীয় প্রতিষ্ঠান হইতেই লইতেছেন, কিন্তু নোট ছাপার কালি লইতেছেন অন্যত্র হইতে।

ছাপার কালির যে পরিচয় এবং এদেশে এই শিল্পের প্রসারের যে বর্ণনা আমরা প্রদান করিলাম তাহাতে আশা হয় যে, যুদ্ধোত্তর ভারতীয় শিল্প পরিচালনার নায়কগণ যদি কাগজ ও ছাপার কালির শিল্পকে একটি বিশিষ্ট স্থান প্রদান করেন তবে ভারতের শিক্ষিতগণও তাহা অতি সঙ্গত বলিয়া মনে করিবেন।

এই রেল, জাহাজ, এরোপ্লেনের যুগে কোন দেশই নিজের চিন্তা, বস্ত্র, কৃষ্টি স্বদেশের সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে পারে না। সুতরাং সামাজিক আদানপ্রদান ও বাণিজ্যিক বিনিময় অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু বর্ত্তমান বা ভবিষ্যতের যুদ্ধ আশঙ্কায় না হউক, অন্য স্বাভাবিক স্বার্থ প্রণোদিত হইয়াও প্রত্যেক দেশের যতখানি সম্ভব স্বাবলম্বী হওয়া অতীব প্রয়োজন।

এই বিষয়ের অন্য দিকও আছে। ভারতগবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া আমাদের দেশে বিদেশ হইতে কালচারাল মিশন আসে—আসিয়া দেখে ১৫০ বৎসর ইংরাজের অধীন থাকিয়াও ভারতবাসীদের মধ্যে শতকরা ১০।১২ জন লোকের মাত্র অক্ষর পরিচয় আছে। শিক্ষাবিস্তারে যদি আমরা প্রবৃত্ত হই তবে আরও কাগজ ও ছাপার কালি চাই। শতকরা মাত্র ১০ জনকে মুদ্রিত পুস্তকাদি দিতে যাইয়াই এই যুদ্ধকালে কাগজ কম খরচের জন্য গভর্ণমেণ্টের নানা অনুশাসন প্রচারিত হইতেছে অর্থাৎ এই দেশের শিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইলে তজ্জন্য প্রয়োজনীয় কাগজ ও ছাপার কালির আরও অধিকতর অভাব হইবে। এমনি এখন বিদেশ হইতে কাগজ ও ছাপারকালি না আসিলে অনেক কিছু অচল হয়।

সুতরাং দেশে শিক্ষার প্রচার করিতে হইলে এদেশেই প্রচুর পরিমাণে কাগজ ও কালি প্রস্তুত করা আবশ্যক। অন্যথা বিদেশী হাত গুটাইলে সকলের পঠনপাঠনের পুস্তকেরই অভাব হইবে। যদি বিদেশী আমাদের শাসক না হইত, তবে এই প্রশ্ন আমাদের জাতীয় গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি অচিরাৎ আকর্ষণ করিত এবং দেশ শাসন, পালন ও গঠন ব্যাপারে যে অত্যাবশ্যকীয় শিল্পাদির পরিকল্পনা এই জাতীয় গভর্ণমেণ্ট অনুসরণ করিতেন তাহাতে তাঁহারা কাগজ ও ছাপারকালির শিল্পকে পুরোভাগে স্থান প্রদান করিতেন। কারণ সকলেই জানেন যে শিক্ষাবিস্তার ব্যতিরেকে জাতীয়তাবোধ কোন দেশেই বিস্তার লাভ করে নাই।

কিন্তু বহুদিনের পরাধীনতায় আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে যে প্রাচীর উত্থিত হইয়াছিল, বর্ত্তমান যুদ্ধ নানা দিক দিয়া তাহাতে রন্ধ্র সৃষ্টি করিয়াছে—বহুযুক্তি যাহা অনুধাবন করাইতে পারিতনা, এখন তাহা দিব্যদৃষ্টিতে প্রতিভাত হইয়াছে। সভ্যতার এই নবতর পটভূমিকায় যেন প্রত্যেক শিল্প ও কৃষি সঙ্গত শ্রদ্ধা ও স্নেহ আকর্ষণ করে।

এসো নব বৈশাখ

শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায় এম্-এ

এসো নব বৈশাখ,
সারাটী পৃথিবী তোমার কোলেতে
অতলে ডুবিয়া যাক্,
এসো এসো বৈশাখ।
এসো বজ্রের ভেরী বাজায়ে,
এসো, রুদ্রের হাসি ছড়ায়ে,
এসো, প্রলয়-চরণ বাড়ায়ে,
ধরণীতে সঞ্চরি;
প্রথম প্রভাতে, বৈশাখ আজি তোমারে প্রণাম করি।

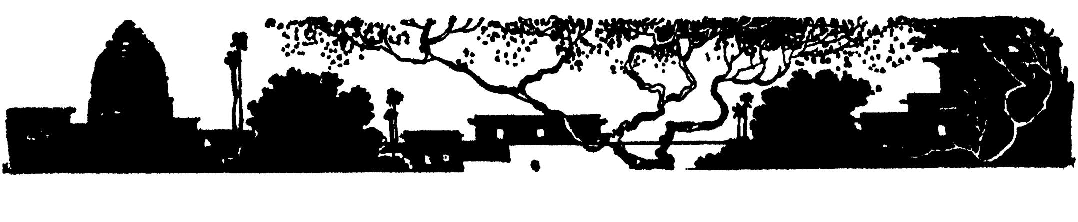
বৈশাখ তুমি এসো,
মরণ-চুমায় বসুন্ধরায় তুমি শুধু ভালোবাসো,
বৈশাখ তুমি এসো।
আকাশেতে তোল অগ্নি-নিশান,
বাতাসে বাজুক রুদ্র-বিষাণ,
প্রলয়ী আমার পাগল ঈশান,
যাক্ সব মুছে যাক্
নিঠুর তোমার পাষাণ-পীড়নে, হে আমার বৈশাখ।

দিক হ'তে দিকে ছুটিয়া চলুক
এই তব অভিযান
লভুক সমাধি তোমার দাপটে
যত হাসি, যত গান।

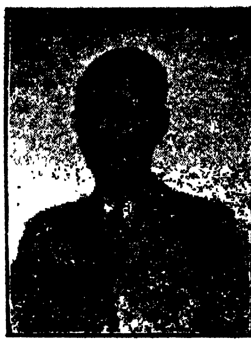
নরকঙ্কালে ভরুক ধরণী
রক্তাপ্লুত হউক সরণি
মৃত্যু-বাঁশরী ধ্বনিয়া উঠুক মানবের প্রাণে প্রাণে
প্রাচীন পৃথিবী লোপ পেয়ে যাক্ ধ্বংসের অভিযানে।

বিরাট তোমার বজ্র-মুঠির তলে,
ছিঁড়ে যাক যত পৃথিবীর মোহ মায়া,
শোষক-শোষিত আহবের মাঝখানে
আসিয়া নামুক নিকষ-আঁধার-ছায়া।

শুধু তব বৈশাখ
থাকুক চরণ-চিহ্ন্
মহাশ্মশানের-নিথর বুকেতে
বাজুক তোমার বীণ্।







ফটো: গুণেশ্বর চট্টোপাধ্যায়

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

ফুটবল খেলা ঃ

আত্মরক্ষায় সেণ্টার হাফ ঃ

সেণ্টার হাফের সর্ব্বপ্রধান কাজ তার গোলের সোজা পথ রক্ষা করা। সুতরাং সকল সময়ই সেণ্টারহাফ বিপক্ষ দলের সেণ্টার ফরওয়ার্ডের গতিবিধি লক্ষ্য রাখবে এবং ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তার কাছ থেকে বল সংগ্রহ করবে যাতে ক'রে সে দলের ইনসাইড খেলোয়াড়দের সঙ্গে বল আদান-প্রদানে আক্রমণের ধারা সম্মিলিত করতে না পারে। সেণ্টার-হাফ বিপক্ষ দলের সেণ্টার-ফরওয়ার্ডকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখবে যখনই সে 'shooting range'এর মধ্যে আসবে, বল তার পায়ে থাকুক বা না থাকুক। তাছাড়া বিপক্ষের 'throw in' করার সময় সেণ্টার-হাফ লক্ষ্য রাখবে সেণ্টার-ফরওয়ার্ডকে। অন্য সকল সময়েই সেণ্টার-ফরওয়ার্ডের উদ্দেশ্যে প্রেরিত সমস্ত পাসগুলি প্রতিরোধ করতে তার পশ্চাদ অনুধাবন করার বিশেষ প্রয়োজন সেণ্টারহাফের নেই।

সেণ্টারহাফ তার সহযোগী দু'জন হাফের সঙ্গে সর্ব্বদাই সহযোগিতা রেখে খেলবে। যেমন উইং হাফ বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়কে প্রতিরোধ করতে অগ্রসর হয়েছে—এ অবস্থায় সেণ্টারহাফ দলের সেই উইংহাফের স্থান পূরণ করবে এবং বিপক্ষের আউটসাইড তার সহযোগী ইনসাইডকে বল দিতে উদ্যত হলেই তার গতিরোধের জন্ম অগ্রসর হবে। প্রয়োজন হলে এমন কি বলটি সংগ্রহের জন্ম তার সঙ্গে tackle করতে হবে। বিপক্ষের দ্রুতগামী আউটসাইড ফরওয়ার্ডের কাছে দলের উইংহাফ পরাস্ত হ'লেই তাকে বাধা দিতে সেণ্টার হাফকেই যেতে হবে। কিন্তু প্রথম সুযোগেই তার সীমানায় সে ফিরে আসবে। এই অবস্থায় ব্যাকের পক্ষে অগ্রসর হওয়া যথেষ্ট নিরাপদ নয়। সময়ে সময়ে ব্যাক দু'জনের সাহায্যের জন্যও সেণ্টারহাফকে নিজের গোলের মুখে পিছিয়ে আসতে হবে। কোন ব্যাক গোলের কাছ থেকে দূরে এগিয়ে পড়লে কিম্বা টাচ লাইনের কাছে এগিয়ে গিয়ে বলটি নিজের আয়ত্বে না আনতে পারলে ব্যাকের শূন্য স্থানে সেণ্টারহাফই পিছিয়ে আসবে, যদি তার সীমানায় বল পৌছবার কোন সম্ভাবনা না থাকে।

উইং হাফ ঃ

যাঁরা উইংহাফে খেলেন তাঁদের সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞেরা কি নির্দ্দেশ দিয়েছেন বলি। বিপক্ষ দলের ফরওয়ার্ড খেলোয়াড়দের বাধা দেবার দক্ষতা পূর্ণমাত্রায় তাদের থাকা উচিত। সেণ্টার হাফের তুলনায় উইংহাফকে বেশী দ্রুতগামী হ'তে হবে। বিপক্ষকে আক্রমণ করতে নিজ দলের ফরওয়ার্ডদের সহযোগিতা এবং দলের আত্মরক্ষা করা ছাড়া উইংহাফদের আর একটি যে অতিরিক্ত কাজ করতে হয় তা 'Throwing in'. সকল রকম অসাফল্যের মধ্যেও উইংহাফের তৎপর হয়ে পরিশ্রম করতে হবে এবং কখনও হতাশ হয়ে ক্ষান্ত হবে না।

আক্রমণ ঃ

আক্রমণের উদ্দেশ্যে হাফব্যাক প্রধানতঃ আউটসাইড এবং ইনসাইড খেলোয়াড়ের সঙ্গে সম্মেলিত হয়ে অগ্রসর হবে। উপর্যুপরি প্রচণ্ড আক্রমণের জন্ম যে কোন পায়ে বল পাশ দেবার দক্ষতা হাফব্যাকের থাকা উচিত। আউটসাইড এবং ইনসাইড খেলোয়াড়দের সঙ্গে হাফব্যাকের ভাল রকম বোঝাপড়া একান্ত আবশ্যক। 'Throwing in' সময়েও এই বোঝাপড়াই আক্রমণে যথেষ্ট সহযোগিতা করবে।

আত্মরক্ষা ঃ

রক্ষণভাগে উইংহাফ দুজনের প্রধান কাজ 'টাচ লাইনে'র প্রান্ত দেশ পাহারা দেওয়া—যাতে বিপক্ষদলের আউটসাইড খেলোয়াড়রা বল নিয়ে অগ্রসর হতে কিম্বা পরস্পর বল আদান প্রদানে সম্মিলিত আক্রমণশক্তি বৃদ্ধি করতে না পারে। উইং-হাফ তাদের নিজ নিজ সীমানায় বিপক্ষ দলের আউটসাইডদের উদ্দেশ্যে প্রেরিত পাশগুলি প্রতিরোধ করতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকবে। পূর্ব্বেই বলেছি আত্মরক্ষা ব্যাপারে সেণ্টারহাফের কাজ বিপক্ষের সেণ্টার-ফরওয়ার্ড ও তার সহযোগী ইনসাইড খেলোয়াড়দের সম্মিলিত আক্রমণকে বাধা দেওয়া। উইংহাফ দু'জনের কাজ ইনসাইড এবং আউটসাইড খেলোয়াড়দের বল আদানে বাধা দেওয়া এবং সম্মিলিত আক্রমণ ছত্রভঙ্গ করা।

আত্মরক্ষায় এবং আক্রমণে ঃ

আত্মরক্ষায় এবং আক্রমণে উইংহাফের অবস্থান সম্বন্ধে ধারণা থাকা প্রয়োজন। বিপক্ষের আউটসাইড খেলোয়াড়কে প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে হাফব্যাক নিজের গোলের কাছাকাছি থাকবে। ব্যাক থাকবে মাঝামাঝি জায়গায় গোলকিপারকে সহযোগিতা করতে। এই স্থান থেকেই ব্যাক ইনসাইডম্যানকে লক্ষ্য রাখবে।

অনেক সময় হাফব্যাক নিজের Position ছেড়ে দলের আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়দের সঙ্গে বল আদান-প্রদান ক'রে বিপক্ষের গোলের দিকে অগ্রসর হয়। এ অবস্থায় বিপক্ষের আউটসাইড খেলোয়াড় unmarked অবস্থায় থেকে যায় এবং রক্ষণভাগের সাহায্যের জন্ম বিপক্ষের যে ইনসাইড খেলোয়াড় পিছিয়ে আসে তার সম্মুখীন হওয়া খুবই স্বাভাবিক। বিপক্ষের খেলোয়াড় যদি বলটি ছিনিয়ে নিয়ে তার দলের এই উল্লিখিত ইনসাইডকে পাশ দেয় তাহলে কিন্তু হাফব্যাক কালবিলম্ব না ক'রে তার সঙ্গে tackle করবে। ইনসাইডকে বাধা দেবার দায়িত্ব অপর খেলোয়াড়ের এই ধারণায় থেকে যদি হাফব্যাক ক্ষান্ত হয় তাহলে বিপক্ষের ইনসাইড খেলোয়াড় দলের unmarked আউটসাইডকে বলটি বিনা বাধায় নিরাপদে পৌঁছে দিতে পারবে। ফলে বিপক্ষের আক্রমণের ব্যূহ সুদৃঢ় হবে। সাফল্য কিম্বা অসাফল্যের বিচার না ক'রে হাফব্যাক বিপক্ষের কাছ থেকে বল সংগ্রহের জন্ম শেষ পর্য্যন্ত চেষ্টা করবে। অনেক সময় বিফল হ'লেও এর একটা সুবিধা সে পাবে যে, বিপক্ষ দলের লোককে যে পাশ দিবে তা সহজ এবং নির্ভুল হবে না।

অনেক সময় নিজের সীমানা ছেড়ে অন্যত্র বল ড্রিবলিং করতে হাফব্যাকদের দেখা যায় এবং সাফল্যলাভের জন্ম দর্শকদের কাছ থেকে সহানুভূতি পেলে তাদের উৎসাহ চতুর্গুণ বৃদ্ধি পায়। এ উৎসাহ কিন্তু দলের পক্ষে ক্ষতিকর। কয়েকক্ষেত্র ছাড়া বেশী সময় হাফব্যাক বলটি ধরে রাখলে তার দলের ফরওয়ার্ডদের পাহারা দেবার সময় এবং সুবিধা বিপক্ষদল পেয়ে যাবে। দলের লোককে বলটি পাশ দেবার প্রথম সুযোগ পেয়েও বিপক্ষের গোলের দিকে হাফব্যাকের এগিয়ে যাওয়ার আর এক বিপদ আছে। যদি কোন সময়ে বলটি তার আয়ত্তের বাইরে গিয়ে তার পিছনে বিপক্ষের আউটসাইড খেলোয়াড়ের পায়ে পৌঁছায় তাহলে পিছিয়ে এসে তাকে বাধা দেবার আর সময় থাকে না। এদিকে ব্যাকের পক্ষে একলা ইনসাইড এবং আউটসাইডের সম্মিলিত আক্রমণ প্রতিরোধ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এ ক্ষেত্রে বিপক্ষের গোল দেওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। এই গোলের জন্ম হাফব্যাকই দায়ী।

হাফব্যাক position নিয়ে না খেললে বিপক্ষের আক্রমণ প্রতিরোধ করা তার পক্ষে সম্ভব হবে না। বিপক্ষদলের খেলোয়াড় মধ্যিখান দিয়ে অথবা তার দলের বিপরীত দিকের হাফব্যাকের সীমানা দিয়ে গোলের দিকে অগ্রসর হ'লে উইংহাফ কালবিলম্ব না ক'রে দ্রুতগতিতে পিছিয়ে পড়বে। খেলার এই অবস্থায় হাফব্যাক বিপক্ষের দুজন ফরওয়ার্ড এবং নিজ গোলের মধ্যিখানে অবস্থান করবে। দলের বিপরীত উইং থেকে বিপক্ষের খেলোয়াড় বলটি সেণ্টার করলে এই দিকের উইংহাফ এই position থেকেই বলটি বাধা দিতে পারবে। অনেক সময় হাফব্যাক নিজের position ছেড়ে নিজের গোলের মুখে উপস্থিত হ'তে বাধ্য হয়। যে সময় বিপক্ষের ফরওয়ার্ড দলের একজন ব্যাককে অতিক্রম ক'রে গোলের মুখে অগ্রসর হচ্ছে ঠিক এই সময়েই হাফব্যাকের অকস্মাৎ আবির্ভাব একান্ত বাঞ্ছনীয়। গোলের মুখে হাফব্যাকের অকস্মাৎ আবির্ভাব এবং বিপক্ষের কাছ থেকে চোখের পলকের মধ্যে বল সংগ্রহ যেন নাটকীয় ঘটনার মতই সংঘটিত হয়। অত্যাশ্চর্য্যভাবে হাফব্যাক অনেক অব্যর্থ গোল রক্ষা ক'রে দলকে সহযোগিতা করে। অনেক সময়েই নিজের স্থান (position) ছেড়ে এসে হাফব্যাক ঘটনাক্ষেত্রে নিজেকে কোন প্রয়োজনে লাগাতে পারে না। হয়ত ঘটনাক্ষেত্রে পৌঁছবার পূর্ব্বেই খেলা অনুকূল অবস্থায় ফিরে এসেছে। এক্ষেত্রে তার অযথা পরিশ্রমের মূল্য নিরূপণ ক'রে হাফব্যাক যদি ভবিষ্যতে অপর খেলোয়াড়ের উপর গুরুত্ব ছেড়ে দিয়ে কিম্বা তার সহযোগিতা ছাড়াই ঘটনা অনুকূল অবস্থায় আসতে পারে মনে ক'রে ঘটনাক্ষেত্রে উপস্থিত না হয়, তাহলে কিন্তু সে খুবই ভুল করবে; খেলার এ অবস্থায় সকল সময়েই তার উপস্থিতি একান্ত আবশ্যক।

ব্যাকের সঙ্গে উইংহাফের একটা ঘনিষ্ঠ বোঝাপড়া থাকা উচিত। এই বোঝাপড়ার অভাব দেখা দিলে রক্ষণভাগ যথেষ্ট দুর্ব্বল হয়ে পড়বে। প্রথমত ধরা যাক বিপক্ষের ফরওয়ার্ড বল নিয়ে তার গোলের দিকে অগ্রসর হলেই তাকে বাধা দেওয়া। এই বাধা দেবার প্রাথমিক দায়িত্ব উইংহাফের। এখন উইংহাফ তাকে বাধা দিতে নিকটবর্ত্তী হলেই বলটি অন্য খেলোয়াড়কে পাশ দেওয়া স্বাভাবিক। সুতরাং উইংহাফ অগ্রসর হ'লে ব্যাক এমন position নিয়ে দাঁড়াবে যেখান থেকে সে বিপক্ষদলের পাশ প্রতিরোধ করতে পারবে।

ব্যাক এবং উইংহাফদের মধ্যে বোঝাপড়ার যেন এতটুকু অভাব না থাকে। দুজনের মধ্যে কার অগ্রসর হওয়া উচিত এই বিচার করতে যেন এমন সময়ের প্রয়োজন না হয় যে সময়ে বিপক্ষদল আক্রমণ ধারা সম্মিলিত করে নেয়। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে কিম্বা বোঝাপড়ার অভাবে উভয়েই অগ্রসর হ'লে বিপক্ষদলই লাভবান হবে। দুজন অগ্রসর হলে বিপক্ষ বলটি দলের unmarked খেলোয়াড়কে পাশ দিতে পারবে এবং কেউ অগ্রসর না হলে বিপক্ষের খেলোয়াড় বিনাবাধায় বলটি নিয়ে অগ্রসর হবে—দলের লোককে পাশ করতে অথবা গোলে সর্ট করতে। ব্যাক এবং গোলকিপারের একটা সুবিধা তারা দলের অন্য সকলের থেকে বিপক্ষের অগ্রগতি দ্রুত লক্ষ্য করতে এবং আক্রমণের সম্ভাবনাও অনুমান করতে পারে। সুতরাং ব্যাকই কিরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে তার নির্দ্দেশ দিবে দলের হাফব্যাকদের।

সব দিক বিচার ক'রে ব্যাক যদি বুঝতে পারে বিপক্ষের খেলোয়াড়ের সম্মুখীন হওয়া তার পক্ষেই সুবিধাজনক তাহলে উইংহাফকে সঙ্কেতে তার মনোভাব জানিয়ে দিতে ভুল করবে না। অন্যথা অন্য সকল ক্ষেত্রেই উইংহাফের প্রথম দায়িত্ব বিপক্ষের খেলোয়াড়কে বাধা দেবার জন্যে অগ্রসর হওয়া।

সেণ্টারহাফ এবং উইংহাফ সম্বন্ধে পৃথকভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এবার আলোচনা করবো হাফলাইনের অর্থাৎ সেণ্টারহাফ এবং দু'জন উইংহাফের সম্মিলিত খেলা সম্বন্ধে। এই সমস্ত হাফ লাইনটি দলের আক্রমণে এবং আত্মরক্ষায় কিভাবে অগ্রসর হলে তারা সাফল্যলাভ করতে পারবে তারই অভিজ্ঞতার বিবরণ এখানে সঙ্কলন করলাম।

হাফ লাইনের খেলার উপরই দলের জয়পরাজয় প্রধানত নির্ভর করছে। আক্রমণ এবং রক্ষণভাগের খেলোয়াড়দের

কর্ম্মপন্থা নির্ভর করছে হাফলাইনের খেলোয়াড়দের অবলম্বিত পন্থার উপর। হাফলাইন দুর্ব্বল হলে যতখানি দলের ক্ষতি হয় ততখানি ক্ষতির কারণ হয় না—যদি দলের অন্ত কোন ভাগের দু' একজন খেলোয়াড় খেলায় সাফল্যলাভ করতে না পেরে সহযোগীদের খেলা নষ্ট করে। এক কথায় হাফব্যাক তিনজনই আক্রমণ এবং রক্ষণভাগের প্রধান অবলম্বন। হাফব্যাক নামকরণ কিন্তু ঠিক প্রযোজ্য হয়নি। কারণ এরাই দলের মেরুদণ্ড—একদিকে ব্যাক এবং ফরওয়ার্ড খেলোয়াড়ের খেলা খেলছে। ফরওয়ার্ড খেলার জন্তে হাফ-ফরওয়ার্ড নামটাও প্রযোজ্য নয়। খেলার দায়িত্বও অন্ত সব খেলোয়াড়দের থেকে এদের অনেক বেশী। সুতরাং এদের সম্মানের যথার্থ নামকরণ হওয়া উচিত ছিল 'ফরওয়ার্ড-ব্যাক'।

প্রথম শ্রেণীর হাফব্যাক বিপক্ষের খেলোয়াড়ের সম্মুখীন হয়ে তাদের গতিরোধ করতে, দু'পায়ে সমানভাবে বল কিক করতে এবং বল হেড দিতে ব্যাকের সমকক্ষ। অপর দিকে ফরওয়ার্ড খেলোয়াড়ের সমান বল 'ড্রিবল' এবং বল সর্ট করবার দক্ষতা তাদের থাকবে।

আক্রমণে হাফব্যাক্ লাইন : হাফব্যাক বল নিয়ে অগ্রসর হ'তে গিয়ে খুব বেশী ড্রিবলিং কিম্বা মাথার খুব উপরে বল কিক্ কখনও করবে না, এতে সময়ের অপব্যয় হয়। বলটি দলের লোককে পাশ দেওয়াই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হবে। সাধারণতঃ হাফব্যাকদের এ বিষয়ে এক ভ্রান্ত ধারণা থাকে—খুব উপরে বল কিক করতে কিম্বা এক লম্বা কিকে বিপক্ষের গোল লাইন পার করতে তারা আনন্দ পায় এবং গর্ব্ব অনুভব করে। মাত্র বিশেষ ক্ষেত্রে হাফব্যাক বল কিক করতে পারে সোজাসুজি গোলের মুখ লক্ষ্য ক'রে। জোর বাতাসে অথবা ভিজে মাঠে বল ভিজে কর্দ্দমাক্ত হ'লে হাফব্যাক লম্বা কিক মেরে গোল লক্ষ্য করবে দলের সুবিধার জন্তই। কারণ এই অবস্থায় দূর-পাল্লার কর্দ্দমাক্ত ভিজে বল গোলরক্ষককে হতাশ ক'রে গোলের মধ্যে কিভাবে প্রবেশ করে তার অভিজ্ঞতা সকলেরই আছে। জোর বাতাসেও লম্বা কিক বিশেষ ফলপ্রদ। গোলরক্ষক বলের সঠিক গতিপথ অনুমান করতে না পেরে শূন্ত হস্তে অকৃতকার্য্য হয়। কিন্তু সকল সময়েই এ নীতি প্রযোজ্য নয়। কারণ সরাসরি হাফলাইন থেকে গোলের মুখে বল ফেললে বিপক্ষের পায়েই বলটি পড়বে—তাদের একটা সুবিধা যে এগিয়ে এসে কিম্বা বলের আগে অগ্রসর হয়ে বলটি আয়ত্বে আনতে পারে ; কিন্তু আক্রমণ দলের খেলোয়াড়রা দ্রুত অগ্রসর হয়ে বলের আগে যেতে পারে না—অফসাইড হবার সম্ভাবনায়।

হাফব্যাকের ড্রিবলিং করবার দক্ষতা প্রশংসনীয় কিন্তু অতিরিক্ত "ড্রিবলিং"য়ের লোভ দলের পক্ষে ক্ষতিকর। হাফব্যাক দক্ষতার সঙ্গে কিছুদূর 'ড্রিবল' করে বলটি নিয়ে যাবে সুবিধাজনক স্থানে বলটি পাস দিতে। কিন্তু গোল দিয়ে প্রশংসা লাভের আকাঙ্ক্ষায় হাফব্যাকের ড্রিবল করার অভ্যাস ক্ষমা করা যায় না।

আক্রমণের অনেকগুলি পদ্ধতি আছে। পূর্ব্বেই ফরওয়ার্ড খেলোয়াড়দের আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি। কিন্তু বিভিন্ন পদ্ধতির প্রয়োগের কার্য্যকারিতা নির্ভর করছে ফুটবল খেলায় অভিজ্ঞতার উপর। খেলায় দূরদর্শিতা এবং ক্ষিপ্রগতিতে খেলায় অবস্থা উপলব্ধির অভ্যাস না থাকলে অবলম্বিত কোন আক্রমণ-কৌশলে বিপক্ষকে বিপর্য্যস্ত করা যায় না।

হাফব্যাক বলটি পেয়ে একনিমেষের মধ্যে নিজ দলের খেলোয়াড়দের অবস্থান (position) এবং সেই সঙ্গে তার কাছে বল যাওয়ায় বিপক্ষদলের খেলোয়াড়রা তাকে প্রতিরোধ করতে কি ভাবে অগ্রসর হয়েছে তা অবলোকন ক'রে নেবে।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধরা যাক—একদলের রাইটহাফের পায়ে বল এসেছে। খেলার মাঠের দৃশ্য কল্পনা করলে দেখতে পাব এর ফলে বিপক্ষদলের খেলোয়াড়রা তাদের লেফট সাইড দিয়ে আক্রমণের গতি অনুমান ক'রে ঐ দিকেই বেশী প্রস্তুত হবে। এ ক্ষেত্রে আক্রমণ দলের উক্ত রাইটহাফ প্রথম সুযোগেই যদি বলটি দলের রাইটআউটকে পাশ দিতে না পারে এবং বলটি পাশ দিলে কার্য্যকরী হবে না মনে করে, তাহলে দলের লেফ্ট সাইড দিয়ে অকস্মাৎ আক্রমণে বিপক্ষকে সঙ্কটাপন্ন করতে পারে। কিন্তু তাড়াতাড়ির প্রয়োজন নেই। রাইটহাফ দলের রাইট-আউটকে বল পাশ করা প্রতিকূল জেনেও কিছুদূর বলটি ড্রিবল ক'রে এমনভাবে অগ্রসর হবে যাতে বিপক্ষদল তার প্রকৃত উদ্দেশ্য না বুঝতে পেরে এই ধারণায় বদ্ধমূল হয় যে, সে ঐ দিকেই অর্থাৎ তার ডানদিকেই বলটি পাশ দিবে। বিপক্ষের রাইট-সাইডের খেলোয়াড়রা এইভাবে যখন তার ডানদিকে ঝুঁকে পড়বে ঠিক সেই সুযোগে সে বলটি পাশ দিবে বিপরীত দিকে নিজ দলের লেফট-সাইডের খেলোয়াড়দের উদ্দেশ্যে। লেফট-আউটকে ততক্ষণে unmarked অবস্থায় পাওয়া যাবে। লেফটআউট এবং ইনসাইড ফরওয়ার্ড উভয়ে পরস্পর বলটি আদান প্রদান ক'রে বিপক্ষের গোলে অগ্রসর হবে। খেলার এই অকস্মাৎ গতি পরিবর্ত্তনের ফলে বিপক্ষদল তাদের বাঁ দিকের আত্মরক্ষার ব্যূহ (Defensive line) তাড়াতাড়ি ডানদিকে আনতে পারবে না। কিন্তু হাফব্যাক নিজ দলের আউটসাইড কিম্বা ইনসাইডকে unmarked অবস্থায় পেলে বলটি ড্রিবল ক'রে উল্লিখিত আক্রমণ পদ্ধতি আর অবলম্বন করবে না।

আউটসাইডের উদ্দেশ্যে প্রেরিত 'পাশ'গুলি গ্রাউণ্ড পাশ হলেই ভাল। অথবা বলটি সামনে এগিয়ে দেওয়া যেতে পারে। গ্রাউণ্ড প্যাশের একটা সুবিধা যে, যার উদ্দেশ্যে বল পাঠান হয় সে অতি সহজেই আয়ত্তে আনতে পারে এবং ঐগুলি প্রতিরোধ করা বিপক্ষের পক্ষে সকল সময় সম্ভব হয় না।

বিপক্ষের খেলোয়াড়দের বেশী সমাবেশ হ'লে Ground pass বিশেষ কার্য্যকরী হবে না। এক্ষেত্রে বলটি মাথার উপর তুলে পাশ দিতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে বলটি যেন খুব বেশী উপরে না উঠে। বেশী উঁচু দিয়ে কিম্বা জোরে বলটি পাশ দিলে বিপক্ষের ব্যাকের সুবিধা হবে বলটি ধরতে, কারণ আক্রমণ দলের ফরওয়ার্ডরা বলের আগে অগ্রসর হতে পারবে না অফসাইড আইন উপেক্ষা করে। সুতরাং বলটি এমন দক্ষতার সঙ্গে পাঠাতে হবে যাতে বিপক্ষের নাগাল পাবার পূর্ব্বেই দলের লোক আয়ত্তে আনতে পারে। বলের গতি এবং উচ্চতার দিকে হাফব্যাকদের লক্ষ্য রাখতে হবে নিজ দলের খেলোয়াড়দের অবস্থান (position) বুঝে। বল পাশ দিয়েই হাফব্যাক নিজের স্থানে ফিরে যাবে। খেলায়

পরবর্ত্তী পরিস্থিতির অপেক্ষায়। এরপর বিপক্ষদলের ব্যাক আক্রমণ ব্যর্থ ক'রে বলটি আক্রমণ দলের ফরওয়ার্ডদের আয়ত্তের বাইরে পাঠালে হাফব্যাকই বলের সম্মুখীন হবে দলের লোককে পুনরায় বলটি পাশ দিয়ে আক্রমণ সম্মিলিত করতে। এই জন্যই আক্রমণভাগের খেলোয়াড়দের পিছনেই এমনভাবে হাফব্যাকরা অবস্থান করবে যেন প্রথম আক্রমণ ব্যর্থ হ'লে তারা দলের খেলোয়াড়দের পুনরায় পাশ দিতে পারে অল্প সময়ের মধ্যে।

আক্রমণভাগের খেলোয়াড়দের সঙ্গে হাফলাইন বল নিয়ে অগ্রসর হ'লে মাঠের মধ্যিখানে খানিকটা ব্যবধান থেকে যাবে। এ ব্যবধান খুবই বিপদজনক হবে, যদি বিপক্ষদল আক্রমণদলের আক্রমণ ব্যর্থ ক'রে প্রচণ্ড সটে এই ব্যবধানে বলটি ফেলতে পারে। বিপক্ষের হাফব্যাকেরা এই অরক্ষিত শূন্যস্থান দিয়ে বলটি নিয়ে এসে তাদের আক্রমণভাগের খেলোয়াড়দের বিনা বাধায় পাশ দিতে পারবে। এ আক্রমণ ব্যাক এবং গোলরক্ষকের পক্ষে প্রতিরোধ করা খুব সহজ হবে না। বিপক্ষকে এরকম সুবিধা দেওয়ার অনেক ঝুঁকি। সুতরাং হাফব্যাক আক্রমণের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হ'লেই ব্যাক দুজন এগিয়ে দূরত্বের ব্যবধান সঙ্কীর্ণ করবে এবং হাফব্যাক বলটি পাশ দিয়ে নিজেদের স্থানে পৌঁছে গেলেই ব্যাক পুনরায় স্বস্থানে ফিরে আসবে। এতক্ষণ হাফব্যাকদের যে আক্রমণাত্মক খেলার কথা উল্লেখ করলাম তা পরোক্ষ, প্রত্যক্ষ নয় অর্থাৎ এতক্ষণ হাফব্যাকরা আক্রমণের উদ্দেশ্যে তাদের দলের আক্রমণভাগকেই বল সরবরাহ করে এসেছে। কিন্তু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে হাফব্যাকেরা পরোক্ষ নীতি ত্যাগ করে প্রত্যক্ষভাবে আক্রমণ চালিয়ে গোলের সন্ধান করলে তাদের স্বার্থান্বেষী বলবো না। এবার তার কথাই উল্লেখ করছি। বিপক্ষের গোলের মুখে উভয় পক্ষের অনেকগুলি খেলোয়াড় উপস্থিত হয়েছে এবং বিপক্ষের রক্ষণভাগ বলটি বাধা দিলে সৌভাগ্যক্রমে আক্রমণ দলের হাফব্যাকের পায়েই উপস্থিত হয়েছে। এ অবস্থায় হাফব্যাকের কি করা উচিত অনেকের মনেই এ প্রশ্ন উঠবে। এক্ষেত্রে দলের আউটসাইড খেলোয়াড়কে পাশ দিয়ে বিশেষ ফল নেই, আর আক্রমণভাগের খেলোয়াড়রা ত বিপক্ষের দ্বারা পরিবেষ্টিত। সেখানে বল পাশ দিয়ে গোলের আশা সুদূরপরাহত। তবু গোলের জন্যই তাকে চেষ্টা করতে হবে। এ সঙ্কটের একমাত্র সমাধান নিজেই গোলে বল সট করা। বিপক্ষের রক্ষণভাগ স্বভাবতঃ এ ধারণায় থাকবে যে, বলটি অপরকে পাশ করা হবে। তারা হাফব্যাককে বাধা দিতে সহজে অগ্রসর হ'তে পারবে না আক্রমণদলের খেলোয়াড়দের ছেড়ে দিয়ে। এই সুযোগে হাফব্যাক নিজেই বলটি কিছুদূর ড্রিবল ক'রে নিয়ে যাবে গোলপথের সন্ধানে এবং হঠাৎ সম্মুখের খেলোয়াড়দের মাথার উপর দিয়ে বলটি গোলে লক্ষ্য করবে। এতগুলি লোকের মধ্য দিয়ে বলটির গতি লক্ষ্য রাখা গোলরক্ষকের পক্ষে সম্ভব হয় না।

হাফব্যাকদের আক্রমণাত্মক (attacking) খেলার কথা এইখানেই শেষ বললে ভুল হবে। খেলায় প্রাধান্য লাভের প্রাথমিক পদ্ধতির উল্লেখ করলাম। খেলায় অভিজ্ঞতা এবং পরস্পরের বোঝাপড়ার ফলে খেলোয়াড়রা নতুন নতুন পদ্ধতিতে বিপক্ষের সম্মুখীন হতে পারে। পদ্ধতির প্রাথমিক জ্ঞানের অভাব হ'লে কিন্তু নতুন পদ্ধতির আবিষ্কার সম্ভব নয়। আত্মরক্ষামূলক খেলা (Defensive Play) আক্রমণাত্মক খেলার মতই সমান গুরুত্বপূর্ণ। বরং বেশী বলা চলে। আক্রমণভাগের কোন একজন খেলোয়াড় ব্যক্তিগত ক্রীড়াচাতুর্য্যে সহযোগীদের বিনা সহযোগিতায় গোল দিতে পারে কিন্তু রক্ষণভাগে একজনের পক্ষে গোলরক্ষা অসম্ভব। সম্মিলিত (combined play) খেলার গুরুত্ব আক্রমণভাগের থেকে রক্ষণভাগে বেশী প্রয়োজন। কিন্তু যতখানি সম্মিলিত খেলায় গুরুত্ব আমরা আক্রমণভাগের খেলায় উল্লেখ করি ততখানি রক্ষণভাগের খেলা প্রসঙ্গে করি না। আমরা সংবাদপত্রস্তম্ভে দেখতে পাব—'The first goal was the outcome of the combination on the right wing কিন্তু 'a dangerous attack was frustrated by fine combination on the part of the right wing' এ সংবাদের উল্লেখ কদাচিৎ মিলবে।

বিপক্ষের আক্রমণ থেকে দলকে রক্ষা করতে গিয়ে ব্যাক, হাফব্যাক এবং গোলরক্ষকের প্রধান লক্ষ্য থাকবে পরস্পরের সহযোগিতা থেকে যেন কখনও কেউ বঞ্চিত না হয়। বিপক্ষের আক্রমণ পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে আত্মরক্ষামূলক নীতি অবলম্বন করতে হবে। বিপক্ষ গোলের সোজা পথে আক্রমণ চালাতে গিয়ে যদি unmarked খেলোয়াড়কে বল পাশ করতে দেরী করে, তাহলে বিপক্ষের খেলোয়াড়দের লক্ষ্য রাখা কঠিন হবে না। রক্ষণভাগের প্রত্যেকে বিপক্ষের একজনকে স্থায়ী ভাবে অনুসরণ করবে। কিন্তু বিপক্ষ একই ভাবে আক্রমণ না চালাতে পারে। আক্রমণ-দল বিভিন্ন পদ্ধতি এবং কৌশল অবলম্বনে অগ্রসর হলে কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়মে খেলোয়াড়কে লক্ষ্য রাখা চলবে না।

বিপক্ষের অগ্রগামী খেলোয়াড়ের কাছ থেকে বলটি সংগ্রহ করতে হ'লে রক্ষণভাগের একজন তার সম্মুখীন হবে এবং অপর খেলোয়াড়রা এমন ভাবে position নেবে যেখান থেকে বিপক্ষের পাশ বাধা দিতে পারবে। রক্ষণভাগের সর্ব্বদাই লক্ষ্য থাকবে বিপক্ষের খেলোয়াড়কে unmarked অবস্থায় ছেড়ে না রাখা। তাই বলে যেখানে বলের উপস্থিতির কোন আশু সম্ভাবনা নেই সেখানে বিপক্ষের খেলোয়াড়কে ছেড়ে না দিয়ে দলের অপর দিকের সঙ্কট অবস্থায় সহযোগিতা না করার কোন যুক্তি নেই। বিপক্ষের কাছ থেকে সহজে বল আদায় করা অনেক সময়েই সুবিধা না হ'তে পারে। কিছুক্ষণ চেষ্টার পর হতাশ হয়ে ক্ষান্ত হলে চলবে না। রক্ষণভাগের খেলোয়াড় তার পিছন নিয়ে থাকবে এবং বিপক্ষকে বাধ্য করবে বলটি পাশ দিতে। এই অবস্থায় বিপক্ষের পক্ষে বলটি যথাস্থানে নির্ভুলভাবে পাশ দেওয়া কিম্বা নেওয়া সম্ভব হয় না। রক্ষণভাগ বিপক্ষের আক্রমণভাগের মত অতখানি ক্রীড়াশীল নয়, বরং বেশী স্থির; ফলে এই অবস্থায় তারা বলের গতিপথ নির্ণয় করতে এবং বলটির সম্মুখীন হ'তে বেশী সুবিধা পায়। আক্রমণের খেলোয়াড়রা দৌড়ান অবস্থায় গতি পরিবর্ত্তন কিম্বা ঘুরে গিয়ে বল ধরতে অনেক অসুবিধা বোধ করে। সেই কারণে তারা পাশগুলি নির্ভুলভাবে না পেলে বিপক্ষের রক্ষণভাগের প্রতিরোধ করা সুবিধা হয়। বিপক্ষের ভুল পাশগুলি প্রতিরোধ করা রক্ষণভাগের হাফের পক্ষে যেমন সহজ,তেমন ভাল পাশ প্রতিরোধ

করা সহজ না হতে পারে। কিন্তু উৎসাহী এবং পরিশ্রমী হাফব্যাকেরা ভাল পাশও প্রতিরোধ করতে পারে। কি ভাবে তা সম্ভব বলি। বিপক্ষের খেলোয়াড় সুরক্ষিত স্থান দিয়ে কখনই বলটি পাশ করবে না। সে চেষ্টায় থাকবে ফাঁকা স্থান দিয়ে বল দিতে রক্ষণভাগের খেলোয়াড়ের অনুমানের বাইরে। প্রথম শ্রেণীর হাফব্যাক এই সুযোগই চায়। সে স্বেচ্ছায় একটা দিক ছেড়ে দিয়ে বিপক্ষকে দেখাবে—সে অন্যদিকে বলটির গতি অনুমান ক'রে বলটি প্রতিরোধ করতে বেছে নিয়েছে। এ মনোভাবটা তার কৌশল মাত্র। তার প্রকৃত উদ্দেশ্য ঐ ফাঁকা স্থান দিয়ে বলটি পাশ করতে বিপক্ষকে প্রলুব্ধ করা। হাফব্যাক প্রস্তুত হয়েই থাকবে এবং বিপক্ষ এই প্রলোভনে পড়ে বলটি পাশ দিলেই অগ্রসর হয়ে বাধা দিতে তার পক্ষে মোটেই শক্ত হবে না।

Ground pass ছাড়া অনেক সময় হেড দিয়ে বিপক্ষদল বলটি তার দলের লোকের কাছে পাঠাতে পারে। হাফব্যাক তৎপরতার সঙ্গেই এই পাশ প্রতিরোধ করবে। কিন্তু সামনেই যদি বিপক্ষ উপস্থিত থাকে তাহলে বলটি trap করার ঝুঁকি না দিয়ে বলটি মাথা দিয়ে পাশ দিবে সাধারণত দলের নিকটবর্ত্তী ইনসাইডকে। আশপাশে কোন ফরওয়ার্ড না থাকলে সহযোগী কোন হাফব্যাককে দিবে। কালবিলম্ব না করে সে দলের ফরওয়ার্ডদের বলটি পাশ দিবে বিপক্ষদলকে আক্রমণ করতে।

কেবলমাত্র ফুটবল খেলার মৌলিক জ্ঞান (fundamental knowledge) নিয়ে খেলায় যোগ দিলে চলবে না। অনেক দিনের খেলার অভ্যাসের ফলে খেলোয়াড়রা কতকগুলি নিজস্ব পদ্ধতি অবলম্বনে নিজেদের ক্রীড়াচাতুর্য্যের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে। বিপক্ষের এই কৌশলগুলি আয়ত্তে আনতে না পারলে সহজেই পরাজয় স্বীকার করতে হবে। সুতরাং ফুটবল খেলার প্রথম দিকেই বিপক্ষদলের খেলার স্বকীয়ত্ব লক্ষ্য ক'রে সেগুলির বিপরীত নীতি অবলম্বন করা চাই। অনেক সময় দেখা গেছে কয়েকটি বিশেষ 'পাশ' দেবার কৌশল ছাড়া বিপক্ষদলের খেলোয়াড় সাধারণ খেলোয়াড়েরই পর্য্যায়ভুক্ত। হাফব্যাক যদি তার এই প্রয়োগ কৌশলকে খণ্ডন করতে না পারে তাহলে সর্ব্বদাই সে দলের পক্ষে মারাত্মক হয়ে উঠবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ মনে করা যাক বিপক্ষের আউটসাইড একজন প্রথম শ্রেণীর দ্রুতগামী খেলোয়াড়। এই দ্রুতগতি দিয়েই সে রক্ষণভাগকে পরাস্ত করতে সর্ব্বদাই চাইবে। এখন হাফব্যাক যদি সম্পূর্ণভাবে তার আক্রমণ পথে বাধা সৃষ্টি করে তাহলে সে বলটি দিবে তার সহযোগী ইনসাইডকে। ইনসাইড কিছুদূর বল নিয়ে এগিয়ে পূর্ব্ব-উল্লিখিত আউটসাইডকে পাশ দেবে। আউটসাইডের পক্ষে দ্রুতগতিতে বিপক্ষের গোলের দিকে এগিয়ে যাওয়া মোটেই কষ্টকর হবে না। এই শ্রেণীর দ্রুতগামী আউটসাইড খেলোয়াড়কে আয়ত্তে আনার উপায়, হাফব্যাক সম্পূর্ণ টাচ লাইনের পথ অবরোধ ক'রে না দাঁড়িয়ে মাঝামাঝি জায়গায় থাকবে—তার ভাবটা আউটকে উপেক্ষা ক'রে সে বিপক্ষের ইনসাইডের কাছে বলটা অনুমান করছে; উদ্দেশ্যটা কিন্তু আউটকে প্রলুব্ধ করা তাঁর অভ্যস্ত পন্থা অবলম্বন করতে। আউট এই ছলনায় পড়ে বলটি সামনে মেরে ছুটে আসবার পূর্ব্বেই হাফব্যাক তাকে আটকে দিতে পারবে। হাফব্যাককে প্রতারণার জন্ত বিপক্ষদল সর্ব্বদাই চেষ্টা করবে। মনে করুন বিপক্ষের আক্রমণভাগের খেলোয়াড় বলটি নিয়ে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হচ্ছে। বলটি সংগ্রহ করার যদি যথেষ্ট সুযোগ না থাকে তাহলে হাফব্যাক কখনও দ্রুতগতিতে বিপক্ষের সম্মুখীন হবে না। তা না হলে বিপক্ষ একপাশে বলটি tap করে তাকে অতি সহজেই অতিক্রম করবে। দ্রুতগতিতে অগ্রসর হওয়ার দরুণ হাফব্যাক বেশ খানিকটা বলের থেকে এগিয়ে পড়বে এবং গতি পরিবর্ত্তনে পুনরায় বিপক্ষের নাগাল পেতে যে সময় নেবে সে সময়ে বিপক্ষদল খেলার মোড় অনেকখানি তাদের প্রতিকূল অবস্থায় আনতে পারবে।

হাফব্যাকরা গোলের মুখ থেকে বলগুলি নিজেদের দলের নিকটবর্ত্তী উইংম্যানকে পাশ দিয়ে সেই সময়ের মত খেলার মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে। এ অবস্থায় বলটি সেণ্টারে পাঠানো কখনই নিরাপদ নয়, যত প্রচণ্ড সটই করা হউক না কেন। কারণ বিপক্ষ-দলের ফরওয়ার্ড লাইন আক্রমণের উদ্দেশ্যে গোলের মুখে অগ্রসর হলেই তাদের সেণ্টারহাফ এই ধরণের বলের অপেক্ষায় মধ্যিমাঠে থাকবে দলকে পুনরায় বল পাশ করতে।

উইংহাফ যে বলটি সেণ্টারে পাঠাবার ঝুঁকি না নিয়ে উইংয়ে পাঠাবে একথা বিপক্ষের ফরওয়ার্ড জানে বলেই অনেক সময় বলের গতিরোধ করতে এগিয়ে যায়। যেমন ধরা যাক, একজন উইংহাফ নিজের গোলের দিকে ছুটে গেছে উইংয়ে বলটির 'পাশ' গতিরোধ করতে। বলের দিকে হাফব্যাককে অগ্রসর হ'তে দেখে বিপক্ষের ফরওয়ার্ডও তাকে অনুসরণ করেছে। এক্ষেত্রে হাফব্যাক বলটি পাশ দিতে দলের কোন লোক না পেতে পারে। সুতরাং তার কাজ হচ্ছে 'to try a clearance across the field' গোলের মুখে বলটি ড্রিবল করবার দুঃসাহস না ক'রে। সাধারণত এসব ক্ষেত্রে হাফব্যাকরা cross kick করে বলটি পাঠাবার চেষ্টা করলেও প্রথম শ্রেণীর হাফব্যাক কদাচিৎ এ পন্থা অবলম্বন করে।

প্রথম শ্রেণীর হাফব্যাক এমন ভাব দেখাবে যেন সে বলটি সেণ্টারের দিকেই পাঠাতে চাইছে। এই ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে বিপক্ষের ফরওয়ার্ড টাচলাইন ছেড়ে তার সঙ্গে tackle করতে অগ্রসর হলেই হাফব্যাক কালবিলম্ব না করে দ্রুতগতিতে ঘুরে গিয়ে বলটি ফাঁকা রাস্তায় উইংম্যানকে পাঠিয়ে বিপদের হাত থেকে দলকে বাঁচাবে এবং অন্যদিকে আক্রমণের সূচনা করবে।

অনেক সময় হাফব্যাক দলের কোন ফরওয়ার্ড এবং ব্যাককে বল পাশ দেবার সুবিধা না পেলে দলের অপর হাফয়ের কাছে বল পাঠাতে পারে। এই ধরণের পাশের প্রয়োজন হবে যখন বিপক্ষদলের ফরওয়ার্ড লাইন সম্মিলিতভাবে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়ে রক্ষণভাগের হাফের কাছে বাধা পেয়ে বলটি হারায়। হাফব্যাক বলটি পেয়ে দেখতে হয়ত পাবে, দলের আক্রমণ ভাগ দূরে অবস্থান করছে। খুব লম্বা পাশ দিলেও বিপক্ষের হাফ-লাইনে বল পড়বে—কারণ তাদের আক্রমণ ভাগের দ্রুত অগ্রগতির সঙ্গে তারাও এগিয়ে এসেছে। এক্ষেত্রে হাফব্যাক নিজেদের মধ্যে বলটি আদান করে অগ্রসর হবে—যে পর্য্যন্ত না দলের ফরওয়ার্ডদের বল পাশ দেবার প্রথম সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে।

অনেক সময় গোলের মুখে হাফব্যাক বিপক্ষের খেলোয়াড়দের সামনে পড়ে একমাত্র ব্যাক ভিন্ন অন্য কোন খেলোয়াড়কে বলটি

পাশ দেবার সুবিধা পায় না। এক্ষেত্রে জোর করে সামনের দিকে বল পাশ না দিয়ে ব্যাককে পাশ করাই উচিত হয়। ব্যাক দলের খেলোয়াড়দের অবস্থান লক্ষ্য করে লম্বা সর্ট করবে। এ ধরণের পাশের জন্ত হাফব্যাক দলের ব্যাককে ইঙ্গিতে জানিয়ে দিবে—নচেৎ ব্যাক এর জন্ত তৈরী না থাকলে বিপক্ষের খেলোয়াড়রা ঝাঁপিয়ে পড়ে বলটি আয়ত্তে এনে সুবিধা ক'রে নেবে।

হাফলাইনের খেলোয়াড়দের একটা কথা সর্ব্বদা মনে রাখতে হবে যে, তারা নিজেদের আত্মরক্ষায় ব্যাপৃত রাখতে গিয়ে যেন আত্মরক্ষামূলকনীতি সর্ব্বদাই অবলম্বন না করে। তাদের প্রধান কাজ যথাযথসময়ে বল সরবরাহ করে দলের ফরওয়ার্ডদের সর্ব্বদা ব্যাপৃত রাখা। আক্রমণনীতিই মুখ্য হবে, আত্মরক্ষা গৌণ। আত্মরক্ষার সর্ব্বোৎকৃষ্ট পন্থা বিপক্ষকে আক্রমণ, আর সে আক্রমণ যত আকস্মিক হবে তত হবে কার্য্যকরী।

রঞ্জি ক্রিকেট ঃ

উত্তর ভারত ঃ ৩২৯ ও ১২৭

দক্ষিণ পাঞ্জাব ঃ ৩২৬ ও ১০৪ (৮ উইঃ)

রঞ্জি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার উত্তরাঞ্চলের ফাইনালে উত্তর ভারত দল প্রথম ইনিংসের ফলাফলে প্রতিদ্বন্দ্বী দক্ষিণ পাঞ্জাবকে পরাজিত করেছে। প্রথম ইনিংসে দক্ষিণ পাঞ্জাব মাত্র ৩ রান পিছনে পড়েছিল।

উত্তর ভারতের প্রথম ইনিংসে উল্লেখযোগ্য রান ছিল, আবদুল হাফিজের ৯৪, আসগর আলীর ৩৪, গুলমহম্মদের ৩৫ এবং আমীর ইলাহির ৩১ রান। অমরনাথ ৩৯ রানে ৩টির উইকেট পান। দ্বিতীয় ইনিংসে গুলমহম্মদের ২৮ রানই একমাত্র উল্লেখযোগ্য। অমরনাথ ২৯ রানে ৬টি উইকেট পান। দক্ষিণ পাঞ্জাবের প্রথম ইনিংসে উল্লেখযোগ্য রান রাজা ভালিন্দর সিংহের ১০৯, রায় সিংহের ৬৯। জাহাঙ্গীর খাঁ ৫৭ রানে ৪টি, এবং আসগর ২৫ রানে ৩টি উইকেট পান।

উত্তর ভারত রাজ্য ঃ ১৪৫ ও ২৮৩

পশ্চিম ভারত রাজ্য ঃ ২৫৪ ও ১৭৫ (৩ উইঃ)

রঞ্জি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে উত্তরভারত রাজ্য ৭ উইকেটে পশ্চিমভারত রাজ্যের কাছে পরাজিত হয়েছে।

উত্তরভারত দলের প্রথম ইনিংসে উল্লেখযোগ্য রান: ইনায়েৎ খাঁর ২৫। শান্তিলাল ৪৭ রানে ৬টি উইকেট পান। দ্বিতীয় ইনিংসের রান: আবদুল হাফিজ ১৪৩, জাফর আমেদ ৬৬ নট আউট। সৈয়দ আমেদ ৬২ রানে ৭টি উইকেট পান।

পশ্চিমভারত রাজ্যের ১ম ইনিংসের উল্লেখযোগ্য রান সুখবন্ত রায় ৪৫, পৃথিরাজ ৩৭। ফজল মহম্মদ ৬৫ রানে ৬টি উইকেট পান। দ্বিতীয় ইনিংসে ওমর ৬৬ নট আউট, পৃথিরাজ ৪৩, সৈয়দ আমেদ ২৩ নট আউট। রঞ্জি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলায় বাঙ্গলা দল পশ্চিমভারত রাজ্য ক্রিকেট দলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।

স্পোর্টস এসোসিয়েশন ঃ

স্পোর্টস এসোসিয়েশনের উদ্যোগে তাঁদের প্রথম বার্ষিক স্পোর্টস অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করতে গিয়ে লক্ষ্য করলাম আমাদের দেশের ছেলেদের মধ্যে খেলাধূলার উৎসাহ আবার কি ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। স্পোর্টস এসোসিয়েশনের পরিচালকমণ্ডলীর উদ্দেশ্য মহৎ, সেখানে অভিভাবক এবং তরুণ দলের সমন্বয় হয়েছে।

ভারতবর্ষে প্রকাশিত ফুটবল খেলা সম্বন্ধে ধারাবাহিক লেখাগুলি ক্রীড়ামোদী এবং খেলোয়াড়দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আগামী সংখ্যা থেকে মোহনবাগান ক্লাবের অধিনায়ক খ্যাতনামা খেলোয়াড় শ্রীযুক্ত অনিল দে এবং তাঁর সহযোগী বীরেন ভট্টাচার্য্য ফুটবল খেলা সম্পর্কে কতকগুলি মূল্যবান ছবি দিয়ে প্রবন্ধের গুরুত্ব বৃদ্ধি করবেন।

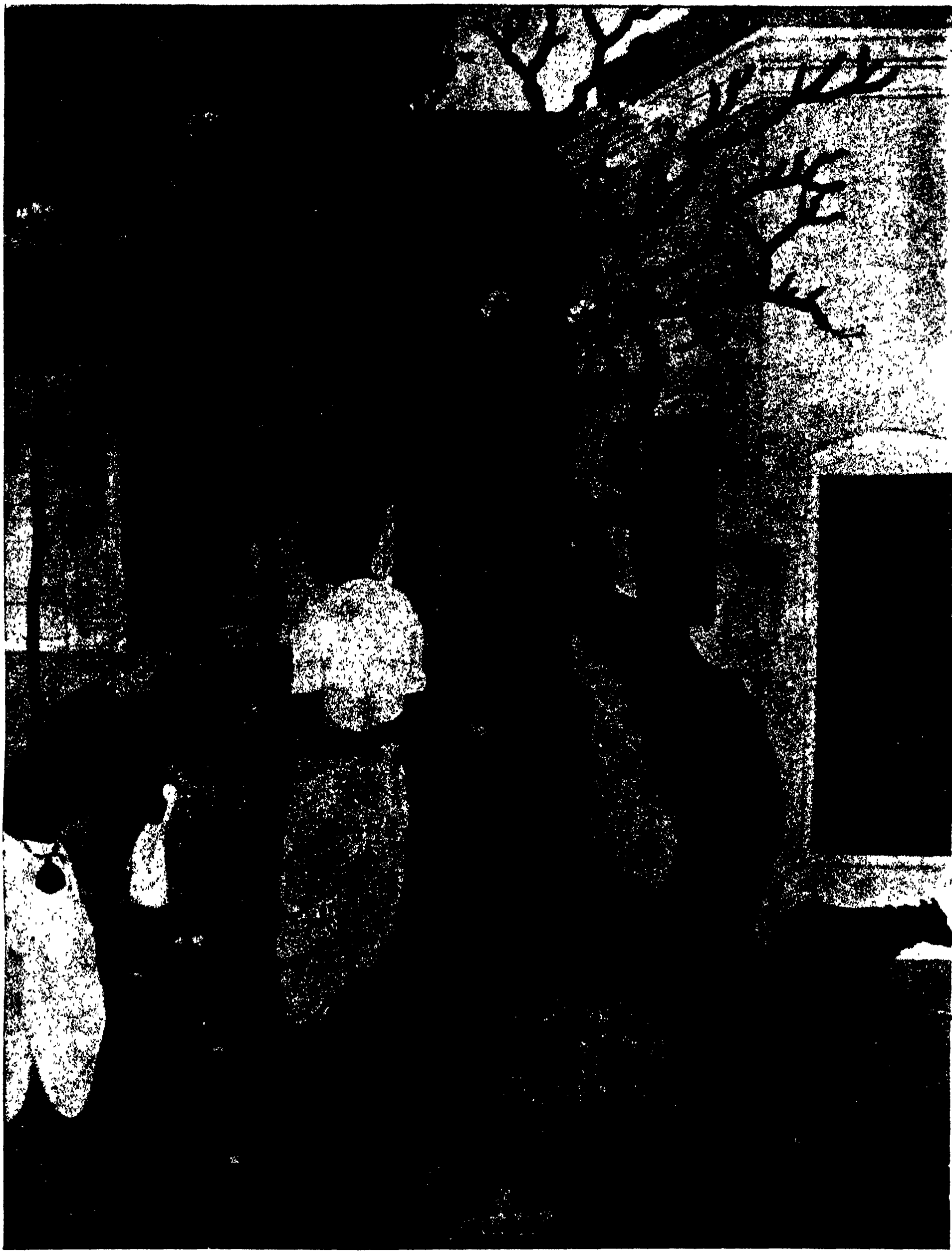
সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "একালের মেয়ে"—২৷০
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রণীত জীবনীগ্রন্থ "ষ্ট্যালিন"—২৲
শ্রীশশধর দত্ত প্রণীত উপন্যাস "মোহনের প্রতিদ্বন্দ্বী"—২৲,
"বার্লিনে মোহন"—২৲, "স্বপন ও দস্যু"—২৲
শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত
"ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের খসড়া"—১৷০
শ্রীদেবেশচন্দ্র দাস আই-সি-এস প্রণীত "ইয়োরোপা"—১৷০
শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য্য প্রণীত উপন্যাস "মাটীর পৃথিবী"—১৸০
শ্রীনরেন্দ্র দেব প্রণীত উপন্যাস "পরাগ ও রেণু"—২৲
বুদ্ধদেব বসু প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "খাতার শেষ পাতা"—২৷০
শ্রীউমানাথ সিংহ প্রণীত কাব্যগ্রন্থ "প্রথম আলোর চরণধ্বনি"—১৷০
স্বামী সোমেশ্বরানন্দ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত "কথাপ্রসঙ্গে
স্বামী অভেদানন্দ"—১৲
শ্রীনির্ম্মলপ্রাণ প্রণীত কাব্য-গ্রন্থ "মৃত্যু-মাদল"—১৲
শ্রীহেরম্বনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত কবিতা পুস্তক "ছন্দশ্রী"—১৷০
শ্রীসুরেশচন্দ্র বিশ্বাস প্রণীত জীবনী গ্রন্থ "শ্রীহরিঠাকুর"—।৵০

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ; ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত



শিল্পী—শ্রীযুক্ত বীরেশচন্দ্র গাঙ্গুলী

বস্তীর কল

ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্



জ্যৈষ্ঠ—১৩৫১

দ্বিতীয় খণ্ড | একত্রিংশ বর্ষ | ষষ্ঠ সংখ্যা

বাংলার জমীদারদের কথা

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

আজ-কাল বাংলার ভূমি রাজস্ব বিষয়ক আলোচনা কালে প্রায়ই বাংলার জমীদারদের কথা শুনা যায়। তাঁহারা প্রায়শই অকর্ম্মণ্য ও অযোগ্য—সমাজের কোনও কাজে আসেন না এই অভিযোগ শুনা যায়। আবার কেহ কেহ—তাঁহারা দীর্ঘিকা খনন, রাস্তা নির্ম্মাণ ও স্কুল স্থাপন প্রভৃতি বহুবিধ সৎকার্য্য করিয়াছেন বলিয়া বলেন। আমরা জমীদার সম্প্রদায়ের ইংরাজ রাজত্ব সুদৃঢ় হইবার পর হইতে অর্থাৎ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর হইতে অভ্যুদয় ও অবনতির কিছু আলোচনা করিব।

প্রথমেই আমরা 'জমীদার' কথাটী কি ভাবে ব্যবহার করিতেছি তাহা বুঝাইয়া বলিব। যাঁহারা সরাসরি গবর্ণমেণ্টের অধীনে জমীদারী রাখেন ও গবর্ণমেণ্টকে সদর মালগুজারী আদায় দেন তাঁহারাই আইনের কথায় জমীদার। কিন্তু এইরূপ জমীদার ছাড়া বড় বড় পত্তনীদার, দর-পত্তনীদার, তালুকদার প্রভৃতি যাঁহারা নিজে চাষ আবাদাদি করেন না, কেবলমাত্র প্রজার নিকট হইতে প্রাপ্য খাজানা সরকার, গোমস্তা, নায়েব দ্বারা আদায় করেন তাঁহাদের সহিত রাজস্ব-দেয়ী জমীদারদের বড় একটা প্রভেদ নাই। আমরা তাঁহাদেরও জমীদার সম্প্রদায়ভুক্ত ধরিয়া লইয়া আলোচনা করিব।

'জমীদার' সম্বন্ধে আলোচনা কালীন আরও একটী কথা বিশেষ ভাবে মনে রাখিতে হইবে যে জমীদাররা প্রায় অনেকেই হিন্দু। আকবর বাদশাহের সময় রাজা টোডরমল্ল সমগ্র বঙ্গদেশকে ৫৮২ পরগণায় বিভক্ত করেন—তখন বড় জোর ২০।২৫টী পরগণা বাদে বাকী সমস্ত পরগণার জমীদারই হিন্দু। হিন্দুর মধ্যে বেশীর ভাগ জমীদারই কায়স্থ। আবুল ফজল প্রণীত আইন-ই-আকবরীতে লিখিত আছে যে সুবে বাঙ্গালার জমীদাররা প্রায়ই কায়স্থ। (see Jarret's Ain-i-Akbari, Vol. II p 129). কায়স্থ জমীদারদের পরই ব্রাহ্মণ, দুই এক ঘর ক্ষত্রিয় বা রাজপুত। মোগল রাজত্বকালে এই অনুপাতের বিশেষ তারতম্য হয় নাই। মুসলমান জমীদাররা সংখ্যায় নগণ্য। হিন্দু জমীদারদের মধ্যে নবাবী আমলে নবাবী বিচারে বা নবাবী অত্যাচারে সীতারাম রায়ের ভূষণা পরগণা নাটোর রাজবংশ পাইলেন, অমুক হিন্দুর জমীদারী কাড়িয়া লইয়া আর একজন হিন্দুকে দেওয়া হইল। ফলে জমীদার হিন্দুই রহিল। ইংরাজ যখন দেওয়ানী লইলেন তখনও এই ব্যবস্থা ছিল।

ইংরাজের হাতে বাংলা আসিবার পর জমীদারদের বিচার করিবার, শান্তি-রক্ষার ইত্যাদি প্রকার যত কিছু রাজকীয় ক্ষমতা ছিল ক্রমশই কাড়িয়া লওয়া হইল। চিরস্থায়ী রাজস্ব বন্দোবস্তের সময় রাজস্বের পরিমাণ অত্যন্ত চড়াহারে ধরা হইয়াছিল। সমগ্র প্রজাই হস্তবুদের (মোট আদায়) ১০।১১ ভাগ ভূমি-রাজস্ব বলিয়া ধার্য্য হইয়াছিল। অনেকস্থলে না জানিয়া সন্দেহক্রমে প্রজাই হস্তবুদের পরিমাণ বেশী করিয়া ধরা হইয়াছিল। প্রবাদ আছে যে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের মাতৃশ্রাদ্ধে তৎকালীন বর্দ্ধমানাধিপতি যায়েন নাই বলিয়া দেওয়ানজী বর্দ্ধমানধিপতির দেয় রাজস্বের পরিমাণ তাঁহার তাৎকালীন প্রজাই

হস্তবুদের সমান সমান করিয়া ধার্য্য করিয়াছিলেন। বর্দ্ধমানাধিপতিকে ৫২,৫৩,০০০৲ টাকা রাজস্ব দিতে হইত। ইহাতে তাঁহাদের লাভের মণ্ডলঘাট পরগণা হস্তচ্যুত হয়। প্রবাদের মূল্য কি তাহা জানিনা, তবে প্রবাদটী বহুদিন হইতে শিষ্টমহলে চলিয়া আসিতেছে। আর দেখা যায় বর্দ্ধমান জেলায় প্রতি একরে রাজস্বের হার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। আর বর্দ্ধমান-রাজের জমীদারী তৎকালে (ইং ১৭৯৩) যে যে জেলায় ছিল তথাকার রাজস্বের হারও বেশী। নিম্নের হিসাবটী কিয়দপরিমাণে অ-প্রাসঙ্গিক হইলেও উহা দিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

চিরস্থায়ী রাজস্ব বন্দোবস্তে প্রতি একর জমীর উপর ধার্য্য রাজস্বের হার।—

জেলা	সমগ্র জেলার সমস্ত জমী ধরিয়া		কেবলমাত্র কর্ষিত জমী ধরিয়া	
বর্দ্ধমান	১৸	আনা	৪৸৶	আনা
হুগলী	১।/২	পাই	১॥৶	„
হাওড়া	১।৶৭	„	৪॥৶	„
বীরভূম	৸৶	„	১৸৩	পাই
ঢাকা	।২	„	।/১	„
মৈমনসিংহ	৶৪	„	।/১০	„
ফরিদপুর	।৶	আনা	।৶৩	„
বাকরগঞ্জ	৸৶	„	৸৶৪	„

এইরূপ উচ্চহারে ধার্য্য রাজস্বের ফলে বহু জমীদার নিয়মিতভাবে রাজস্ব আদায় দিতে পারিতেন না। ফলে তাঁহাদের জমীদারী টুকরা টুকরা করিয়া নীলাম হইয়া গেল। প্রায় তাবৎ পুরাতন জমীদার-বংশ ধ্বংস হইতে বসিল। **Fifth Report of the Select committee** (1812) পাঠে আমরা জানিতে পারি যে—

"Among the defaulters were some of the oldest and most respectable families in the country. Such were the Rajas of Nadia, Rajsahi, Bishnupore, Kasijora and others, the dismemberment of whose estates, at the end of each succeeding year, threatened them with poverty and ruin, and in some instances presented difficulties to the revenue officers in their endeavour to preserve undeminished the amount of public assessment"

(**Madra reprint** ৭১ পৃঃ)

৮৪ পরগণার অধীশ্বর নদীয়া-রাজ মাত্র ৬টী পরগণার জমীদারে পরিণত হইলেন। ইং ১৭৯০-৯১ সালে নদীয়া জেলায় ২৬১টী জমীদারী ছিল। ইহার ৯ বৎসর পরে জমীদারীর সংখ্যা বাড়িয়া ৭৩৭এ দাঁড়াইল। অর্দ্ধ-বঙ্গের অধীশ্বরী পুণ্য-শ্লোকা রাণী ভবানীর বংশধর নাটোর-রাজের অবস্থাও তদ্রূপ। বর্দ্ধমান-রাজ তাঁহার জমীদারীতে পত্তনী-প্রথার সৃষ্টি করিয়া কোনও মতে জমীদারী রক্ষা করিলেন। ইহাঁরা ত তবু রক্ষা পাইলেন—অনেক জমীদার-বংশ লোপ পাইল। বিষ্ণুপুর-রাজস্ব রাজস্বের দায়ে নীলাম হইয়া গেল। দশশালার বন্দোবস্তের সময় যে জমীদারী এক মালেকের হাতে ছিল দশ বৎসর পরে তাহা ২২০টি তৌজীতে ২৩০ জন মালেকের সম্পত্তি হইল। যশোহরের রাজা শ্রীকণ্ঠ রায়ের জমীদারী নীলাম হইয়া ১০০টী বৃহৎ ও ৩৯টী ক্ষুদ্র খণ্ডে পরিণত হইল। মামুদ সাহী পরগণা ১১৫টী খণ্ডে ও ভূষণা পরগণা ৬৬টী খণ্ডে পরিণত হইল। খুলনা জেলার সমস্ত বড় জমীদারী, দুইটী বাদে, চিরস্থায়ী রাজস্ব বন্দোবস্তের দশ বৎসরের মধ্যে নীলাম হইয়া গেল। ঢাকা জিলার পুরাতন জমীদারদের মধ্যে শতকরা ৪জন মাত্র নীলাম বাঁচাইয়া চলিতে পারিয়াছিলেন।

কিন্তু এই সব খণ্ডে খণ্ডে বিক্রীত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমীদারী কিনিল কে? নীলাম হইত জেলার সদরে বা কলিকাতায়—যাঁহারা তৎকালে কার্য্যব্যপদেশে জেলার সদরে বা কলিকাতায় বাস করিতেন, বা তথায় ঘন ঘন যাতায়াত করিতেন, অর্থাৎ এক কথায় যাঁহারা 'ইংরাজ-ঘেঁসা' ছিলেন তাঁহারাই কিনিলেন। এই নূতন জমীদারের প্রায় সকলেই হিন্দু 'ভদ্রলোক'। জাতি হিসাবে, ধর্ম্ম হিসাবে জমীদার সম্প্রদায়ের বিশেষ পরিবর্ত্তন হইল না বলিয়া মনে হয়—কিন্তু পরিবর্ত্তন হইল অনেক। স্যার জেমস্ ওয়েষ্টল্যাণ্ড বলেন যে -

"As a consequence of the Permanent Settlement small Zamindaries and small Zamindars came to be substituted for great Zamindaries and great Zamindars. Zamindari in fact has become more of a profession and less of a position."

অন্যত্র তিনি বলেন :—

"The new purchasers of the large Zamindaries were for the most part men of business from Calcutta, They had often, like Radhamohen Banerjee, who purchased Mahmudsahi, got their first footing through having lent large sums to the Zamindars, and at all events they were men who had by their own exertions amassed some degree of wealth. They had cousequently, as early as 1801, acquired the reputation of being good managers of their estates; they began looking into the old sub-tenures, they extended the cultivation and ceased to oppress the ryots, through whose co-operation alone improvement can be expected."

এই সকল নূতন জমীদারেরা অনেকটা সহর-ঘেঁসা। সহরে বাস না করিলেও সহরের সহিত সংস্রব-শূন্য নহেন। তাঁহাদের আত্মীয় স্বজন কেহ না কেহ সহরে থাকিতেন। তাঁহারা জমীদারী অর্জ্জন করিবার পর জমীদারী সু-শাসনের জন্য বা প্রতিপত্তি লাভের আশায় অনেক সময় জমীদারীর মধ্যে যাইয়া বাস করিতেন। না হয় নিজ গ্রামে বাস করিয়া নূতন অর্জ্জিত জমীদারীর আয়ে দোল দুর্গোৎসব ক্রিয়া কলাপ করিয়া সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভের চেষ্টা করিতেন। এই সব নূতন জমীদারের অনেকে নিজ নিজ জমীদারীতে বাস করিলেও এইখান হইতেই **absentee landordism**এর সূত্রপাত হইল। কিন্তু **absentee landordism**এর কু-ফল তখন দেখা দেয় নাই। কারণ যাঁহারা নিজ নিজ গ্রামে বাস করিতেন, তাঁহারা গ্রামের ২।৪ ক্রোশের মধ্যেই জমীদারী খরিদ করিতেন। যদি বহু দূরে জমীদারী থাকিত বৎসরের মধ্যে সময়ে সময়ে তাহা পরিদর্শন করিতে যাইতেন। তাঁহারা সকলেই বুদ্ধিমান, নিজ বুদ্ধিগুণে জমীদারী অর্জ্জন করিয়া কিরূপে তাহা রক্ষা পায় তাহার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টিত থাকিতেন এবং বৃথা অভিমান তাঁহাদের বড় একটা ছিল না। আরও একটী কারণ বর্ত্তমান ছিল—ধনী ও নির্ধনের মধ্যে বর্ত্তমানের ন্যায় সামাজিক ও ব্যবহারিক বৈষম্য তখন ছিল না। আজকাল আমরা মুখে গণতান্ত্রিক যুগ বলিয়া যতই চেঁচাই না কেন, ভোটের সময় সদা মুচির যতই দ্বারস্থ হই না কেন, মনে মনে ধন-গর্ব্ব বিশেষ প্রবল। কদাচিৎ দুই চারি জন নূতন জমীদার কলিকাতায় বাস করিতেন।

এইরূপে একটী নূতন শ্রেণীর জমীদার সম্প্রদায় গঠিত হইয়া ওঠে। তাঁহাদের লৌকিক প্রতিপত্তি কতকটা জমীদারীর মধ্যে বা জমীদারীর নিকটে থাকায়, কতকটা তাঁহাদের সামাজিক প্রতিপত্তি লাভের আকাঙ্ক্ষায় ক্রিয়া-কলাপ পূজা পার্ব্বণে অত্যধিক ব্যয় করায়, কতকটা তাঁহাদের কর্ম্ম-চতুরতার দরুণ পুরাতন বনিয়াদী জমীদারদের অপেক্ষা আদৌ কম হয় নাই।

এইবার আমরা জমীদার সম্প্রদায়ের আয় বৃদ্ধির কিছু আলোচনা করিব। ইংরাজী ১৭৮৪ সালের Regulating Actএর ৩৯ ধারা অনুসারে জমীদারদের সহিত কি হারে বা কি ভাবে রাজস্ব বন্দোবস্ত করা হইবে তজ্জন্য তদন্ত আরম্ভ হয়। তদন্তের বিবর সব কথা বলিবার আবশ্যক নাই—ইহার ফলাফল বৎসামান্য লিপিবদ্ধ করিব। তদন্তের ফলে দেখা যায় যে সুবা বাংলায় সর্ব্বশুদ্ধ ৫৭৬ লক্ষ একর জমী আছে—আর ইহার মধ্যে ৫৩০ লক্ষ একর জমী খেরাজের যোগ্য; বাকী জমী হয় লাখেরাজ, না হয় চাকরান। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ৫৩০ লক্ষ একর জমীর মধ্যে তৎকালে মাত্র ১১৫ লক্ষ একর জমীতে চাষ আবাদ হইত। বাকী জমী জঙ্গল বা পতিত। এক এক একর জমীতে উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ ১৩ মণ ধান ধরিয়া, এবং ধানের মূল্য মণকরা ৷৷০ আট আনা করিয়া হিসাব ধরিয়া, প্রত্যেক একরের উৎপন্নের মূল্য সে সময়ে গড়ে ৬৷০ টাকা ধরা হয়। এই হিসাবে সমগ্র সুবার উৎপন্নের মূল্য ৭ কোটী ৪৮ লক্ষ টাকা হয়। রায়তেরা জমীদারকে দিত উৎপন্ন শস্যের ১।৩ এক-তৃতীয়াংশ; অর্থাৎ জমীদার সম্প্রদায়ের প্রাপ্যের মূল্য ছিল ২ কোটী ৪৯ লক্ষ টাকা। এই প্রজাই হস্তবুদের ১০।১১ দশ-এগারো অংশ সরকারী রাজস্ব ধরা হয়। সুবা বাংলার রাজস্বের পরিমাণ ২২৬ লক্ষ টাকা। তখনকার সুবে বাংলার সহিত বর্ত্তমান Presidency of Bengalএর কিছু প্রভেদ আছে। তখন শ্রীহট্ট সুবে বাংলার অন্তর্গত ছিল—এখন শ্রীহট্ট আসামে।

ইংরাজী ১৭৮৯ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিস জমীদারদের সহিত প্রথমে দশ-শালার বন্দোবস্ত করেন। পরে বিলাত হইতে কোর্ট অব ডাইরেক্টরদের মঞ্জুরী আসিলে ঐ বন্দোবস্তই ইংরাজী ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত হয়। তৎকালে বর্ত্তমান Presidency of Bengalএর রাজস্ব ২১৫'৬ লক্ষ টাকা ধার্য্য হয়। প্রজাই হস্তবুদের ১০।১১ অংশ রাজস্ব—এই হিসাবে বর্ত্তমান Presidency of Bengal-এর তৎকালীন প্রজাই হস্তবুদের পরিমাণ ২৩৯ লক্ষ টাকা। ইংরাজী ১৮৭১ সালের সেস্ আইন অনুসারে যখন প্রথম সেস্ ধার্য্য হয়, তখন প্রজাই হস্তবুদ ৭৭৭ লক্ষ টাকা ধরা হয়, আর ইংরাজী ১৯৩১ সালে ঐরূপ প্রজাই হস্তবুদ (gross rental for the purpose of cesses) দাঁড়ায় ১৬৩৪ লক্ষ টাকায়। ঐ সব হিসাব হইতে বাংলার জমীদার সম্প্রদায়ের কোন বৎসরে কত মুনাফা ছিল তাহার একটা মোটামুটী খসড়া হিসাবে দাঁড় করাইতে পারি। নিম্নে আমরা সেই হিসাবটী দিলাম। যথা:—

	ইং ১৭৯৩	ইং ১৮৭১	ইং ১৯৩১
প্রজাই হস্তবুদ	২৩৯ লক্ষ	৭৭৭ লক্ষ	১,৬৩৪ লক্ষ
বাদ রাজস্ব	২১৬ লক্ষ	২১৬ লক্ষ	৩০৩ "
বাদ সেস্	... "	২৪ "	৫১ "
মুনাফা	২৩ লক্ষ	৫৩৭ লক্ষ	১,২৮০ লক্ষ

১৯৩১ সালে রাজস্ব ৩০৩ লক্ষ টাকা হওয়ার হেতু নদী সিকস্তি পয়স্তি হওয়ায় সরকার কর্ত্তৃক বহুস্থানে লগুচরের নূতন করিয়া রাজস্ব ধার্য্য করা হইয়াছে। আর অনেক জমী যাহা ভুলক্রমে ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তী মহালের অন্তর্গত বলিয়া ধরা হইয়াছিল, তাহা প্রকৃতপক্ষে সুন্দরবনের অন্তর্ভুক্ত।

মোটামুটী হিসাবে প্রথম ৮০ বৎসরে (সুক্ষ্মভাবে ধরিলে প্রথম ৭৯ বৎসরে) জমীদারদের আয় ২৩ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। আমাদের হিসাবে যত ভুলই থাকুক না কেন, জমীদারদের আয় যে খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বহু বহু গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তর্কের খাতিরে আয় বৃদ্ধি ইহার অর্দ্ধেক হইয়াছে ধরিলেও জমীদারদের আয় ১২ গুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু পরবর্ত্তী ৬০ বৎসরে (সূক্ষ্ম হিসাবে ৫৯ বৎসরে) জমীদারদের আয় ২০৪ গুণ মাত্র বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। এই যে বৃদ্ধির কথা বলিলাম ইহা টাকার বৃদ্ধি—কিন্তু টাকার মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধি হেতু এই আপাতদৃষ্টিতে দেখিতে বৃদ্ধি বা বৃদ্ধির হার প্রকৃত বৃদ্ধি নাও হইতে পারে। এইজন্য আমরা ঐ সময়ের মধ্যে টাকার মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধির কথা কিছু আলোচনা করিব।

Ramsbotham সাহেব তাঁহার প্রণীত Land Revenue History of Bengal 1769 1787 নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে "the purchasing power of the rupee to-day (অর্থাৎ তাঁহার পুস্তক লিখিবার সময় ইং ১৯২৬ সালে) is certainly less than one-fourth of the purchasing power of the rupee in 1773" (২৫ পৃঃ দেখুন)। আমরা যদি ইং ১৭৭৩ সালের ও ইং ১৭৯৩ সালের দ্রব্য মূল্যের পার্থক্য যৎসামান্য ছিল ধরিয়া লই তাহা হইলে সত্যের বিশেষ অপলাপ হইবে না। তদ্রূপ ইং ১৯২৬ সালের ও ইং ১৯৩১ সালের দ্রব্যমূল্যের পার্থক্য নগণ্য ধরিয়া লই ত বিশেষ অন্যায় হইবে না। মোটামুটী হিসাবে এ কথা বেশ জোর করিয়া বলা চলে যে দশ-শালা বা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় দ্রব্যাদির যে মূল্য ছিল বর্ত্তমানে তাহার চারি গুণ হইয়াছে। এক্ষণে ১৮৭২ সালের দ্রব্য-মূল্যের সহিত ইং ১৯৩১ সালের দ্রব্য-মূল্যের তুলনা করা যাউক। ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত Index Number of Indian Prices হইতে আমরা weighted index number (100 articles) পাই। তাহাতে আমরা নিম্নলিখিত মত পাঁচ পাঁচ বৎসরের index পাই—এবং সেইগুলি হইতে গড় কষিয়া ইং ১৮৭২ সালের দ্রব্য-মূল্যের সহিত ইং ১৯৩১ সালের দ্রব্য-মূল্যের তুলনা করিতে পারি। হিসাবটী নিম্নে দেওয়া গেল। যথা:—

সাল	index number	সাল	index number
১৮৬৭	১১৮	১৯২৬	২৬০
১৮৬৮	১০৭	১৯২৭	২৫৮
১৮৬৯	১১৮	১৯২৮	২৬১
১৮৭০	১০৭	১৯২৯	২৫৪
১৮৭১	৯৩	১৯৩০	২১৩
গড়	১০৮	গড়	২৪৯

অর্থাৎ ১৮৭২ সালের গড়ের তুলনায় ১৯৩১ সালের গড়ে দ্রব্য-মূল্যের ২·৩ গুণ হইয়াছে। এইবার আমরা বর্ত্তমান সময়ের দ্রব্য-মূল্যকে standard বা মাপকাঠি ধরিয়া পূর্ব্বে দ্রব্য-মূল্য কিরূপ সস্তা ছিল তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিব। ইং ১৯৩১ সালে যে দ্রব্যের মূল্য ১৲ টাকা ছিল, ইং ১৮৭২ সালে সেই দ্রব্যের মূল্য ছিল (১৲ + ২·৩) অর্থাৎ ।৵০ সাত আনা; আর দশ-শালা বন্দোবস্তের সময় উহার মূল্য ছিল ।০ চারি আনা। দ্রব্য-মূল্যের তুলনায় জমীদারদের আয় বাড়িয়েছিল নিম্নের হিসাব মত।

		১৭৯৩	১৮৭২	১৯৩১
১।	জমীদারদের মুনাফা	২৩ লক্ষ	৫৩৭ লক্ষ	১,২৮০ লক্ষ
২।	দ্রব্য-মূল্যের আপেক্ষিক হার	৪ আনা	৭ আনা	১৬ আনা
৩।	আপেক্ষিক আয় = (১) + (২)	৬	৭৭	৮০

অর্থাৎ প্রথম আশী বৎসরে জমীদারদের আয় প্রায় ১৩ গুণ (সূক্ষ্ম হিসাবে ১২·৮ গুণ) বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। শেষের ষাট বৎসরে আয় প্রায় সমান বা বৎসামান্য (শতকরা ৪ ভাগ) বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। আমাদের দেশে সাধারণতঃ লোকে জমীদারী-সম্পত্তি কেন এত পছন্দ করে তাহার কিছু কারণ বুঝা গেল।

এইবার আমরা জমীদারদের বংশ-বৃদ্ধির সহিত তাঁহাদের আয়-বৃদ্ধির তুলনা করিব। এক এক পুরুষে জমীদারদের আয় কিরূপ

বাড়িয়াছে তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিব। আমাদের এই আলোচনায় ৩০ বৎসরে এক পুরুষ হয় ধরিয়া লইলাম। কেন ৩০ বৎসরে এক পুরুষ ধরিলাম তাহার সমস্ত যুক্তিতর্ক এই প্রবন্ধে দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হইবে ও প্রবন্ধ কলেবর অত্যন্ত স্ফীত হইবে—সেজন্য উহা দিলাম না। ৩০ বৎসরে এক পুরুষ ধরিলে জমীদারদের আয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এক এক পুরুষে $\frac{৩০ \times ১২৬}{৭৯}$ = ৪·৯ গুণ করিয়া বাড়িয়াছে। আর শেষের দিকে আয় এক এক পুরুষে বাড়িয়াছে মাত্র $\frac{৩০ \times ০·০৪}{৫৯}$ = ·০২ গুণ।

যেমন এক এক পুরুষে আয় বাড়িয়াছে তেমনিই প্রত্যেক পুরুষে বিষয়-ভাগের জন্য ব্যক্তিগতভাবে জমীদারদের আয় কমিয়াছে। বাংলার জমীদারদের মধ্যে প্রায় সকলেই হিন্দু; অন্ততঃ পক্ষে শতকরা ৯০ জন হিন্দু—পূর্ব্বে এই অনুপাত আরও বেশী ছিল বলিয়া মনে হয়। হিন্দুদের মধ্যে কন্যায় বিষয় পায় না, কেবলমাত্র পুত্র-সন্তানেই বিষয় পায়। বাঙ্গালী 'ভদ্রলোকেদের' মধ্যে গড়ে ৪·৮টী করিয়া সন্তান বাঁচে। ইহার মধ্যে গড়ে অর্দ্ধেক পুত্র ও অর্দ্ধেক কন্যা। গড়ে আমরা প্রত্যেক পুরুষে ২·৪টী করিয়া পুত্র জন্মিয়াছে বা বড় হইয়াছে, আর তাহাদের মধ্যেই জমীদারী ভাগ হইয়াছে ধরিয়া লইতে পারি। এই পুত্রদের মধ্যে জমীদারী ভাগ হইলে প্রত্যেক পুরুষে এক এক জনের ভাগে আয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে দাঁড়ায় ৪·৯/২·৪ = ২·০৪ বা মোটামুটি হিসাবে ২ গুণ করিয়া। বংশ-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধন-বৃদ্ধি বা আয়-বৃদ্ধি চলিতে থাকে। ইহাকেই বলে "ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ"। আর এই "ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ" জমীদার সম্প্রদায়ের মধ্যে চলিয়াছিল তিন পুরুষ ধরিয়া। ইহা হইতেই জমীদারী সম্পত্তির এত আদর, এত কদর কেন তাহাও বুঝা যায়। কিন্তু পরবর্ত্তী ষাট বৎসরে এইরূপ জমীদারী ভাগের ফলে প্রত্যেকের আয় প্রথমে কমিয়া পিতার আয়ের সমান সমান দাঁড়াইল, পরে আরও বেশী কমিয়া গেল। শেষের কমীটা বড়ই দ্রুত। গড় হিসাবে শেষের ষাট বৎসরে জমীদারদের আয় পুত্রদের মধ্যে সম্পত্তি বিভাগের ফলে কমিয়া দাঁড়াইয়াছে ০·৪৩ করিয়া, অর্থাৎ পিতার যাহা আয় ছিল পুত্রের আয় তাহার শতকরা ৪৩ ভাগ মাত্র।

পূর্ব্বে যখন জমীদারদের "ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ" হইতেছিল তখন তাঁহারা খরচ বাড়াইয়া ফেলিয়াছিলেন। নানাপ্রকার ক্রিয়াকলাপ, দোল-দুর্গোৎসব, সদাব্রত, অতিথিশালা প্রভৃতি ত ছিলই, অধিকন্তু তাঁহারা জাঁক-জমকপ্রিয় হইয়া উঠেন।—গ্রামের আনন্দ মুখোপাধ্যায়ের মাতা বৃদ্ধাবস্থায় ভাল শুনিতে পাইতেন না। একদিন তিনি পুত্রকে ডাকাইয়া বলিলেন যে বাড়ীতে দুর্গোৎসব হইতেছে, ঢাকীরা ত সেরূপ জোরে ঢাক বাজাইতেছে না। আনন্দবাবু ৺পূজায় ১০৮ ঢাক বাজাইবার ব্যবস্থা করিলেন। তাঁহার মাতার স্বর্গারোহণের পরও ১০৮ ঢাকের ব্যবস্থা রহিল। তিনি গত হইলেও এই ১০৮ ঢাকের ব্যবস্থা চলিল। ক্রমশঃ তাঁহাদের অবস্থা খারাপ হইতে লাগিল। অনেক অন্যায় অপব্যয়ও তাঁহারা আরম্ভ করেন।

ক্রমশঃ যখন বংশ-বৃদ্ধির ফলে ও তদনুসঙ্গিক বিষয় বিভাগের ফলে তাঁহাদের ব্যক্তিগত আয় না বাড়িয়া কমিতে আরম্ভ করিল, এবং তাঁহারা পূর্ব্বের অভ্যস্ত চালচলন ও তদনুযায়ী ব্যয় কমাইতে পারিলেন না, তখন হইতেই "পিতামহের বিগ্রহ নাতির নিগ্রহ" কথাটার সৃষ্টি ও বহুল প্রচলন আরম্ভ হইল। জমীদারদের আয় বাড়া বন্ধের সময় হইতেই তাঁহারা অন্যায় ও অত্যাচার করিয়া আয় বাড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নূতন নূতন আইনে তাঁহাদের সে চেষ্টা বন্ধ হইল বা বাধা প্রাপ্ত হইল। অনেকে পৈত্রিক ক্রিয়াকলাপের খরচ পত্র কমাইতে লাগিলেন। সদাব্রত বন্ধ করিয়া দিলেন। মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে পুষ্করিণী খনন, পিসিমার ব্রত-উদ্যাপনে বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ক্রিয়াদি লোপ পাইল। অনেকে লজ্জায় বা অতিরিক্ত খরচ এড়াইবার জন্য পূজার সময় 'পশ্চিমে' যাইতে আরম্ভ করিলেন। অনেকে আবার কলিকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করিলেন। কলিকাতাবাসের ফলে কলিকাতার বাবুয়ানা, বিলাসিতা ও সাহেবীয়ানা তাঁহাদের মধ্যে প্রবেশ করিল।

জমীদার সম্প্রদায়ের মধ্যে বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের ন্যায়—যিনি এখনও ৩০।৪০ লক্ষ টাকা রাজস্ব দেন—জমীদার আছেন, আবার ফরিদপুর জেলার 'খণ্ডখরিদা' তালুকদার—যিনি ১৲ টাকা রাজস্ব দেন তিনিও আছেন। আমাদের দেশে ধনী লক্ষপতি জমীদারের সংখ্যা খুব কম। লক্ষপতি জমীদার যাঁহার নীট আয় বার্ষিক ১,০০,০০০৲ টাকা তাঁহাদের সংখ্যা বাংলা দেশে কত কম তাহার একটা খসড়া হিসাব দিবার চেষ্টা করিব। নির্দ্ধারিত সংখ্যার উপর বিশেষ জোর দিই না—কিন্তু যে সংখ্যা আমরা পাই তাহা হইতে তাঁহাদের সংখ্যাল্পতার একটা পূর্ণ আভাষ পাওয়া যাইবে।

ইং ১৯২৯ সালের বাংলার লাট-কাউন্সিলে সব কয়টী জমীদার নির্ব্বাচন কেন্দ্রের জমীদার-ভোটারের সংখ্যা পশ্চিম বঙ্গে (অর্থাৎ বর্দ্ধমান ও প্রেসিডেন্সী বিভাগদ্বয়ে) ২৬৪ জন এবং পূর্ব্ববঙ্গে (অর্থাৎ ঢাকা, রাজসাহী ও চট্টগ্রাম বিভাগত্রয়ে) ৬৬১ জন, মোট ৯২৫ জন। পশ্চিমবঙ্গে জমীদার-ভোটার হইতে হইলে তাঁহাকে হয় ৪,৫০০৲ টাকা রাজস্ব কালেক্টরীতে আদায় দিতে হইবে, না হয় ১,১২৫৲ টাকা সেস্ দিতে হইবে। আর পূর্ব্ববঙ্গে ৩,০০০৲ টাকা রাজস্ব বা ৭৫০৲ টাকা বার্ষিক সেস্ দিলেই হইবে। পূর্ব্ববঙ্গের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুসলমান জমীদারদের সুবিধার জন্য গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিয়া এই কম টাকার যোগ্যতা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। ইহার ফলে পূর্ব্ববঙ্গের নির্ব্বাচন-কেন্দ্রে জমীদার ভোটারের সংখ্যা বেশী হইয়াছে।

যাঁহারা ১,১২৫৲ টাকা সেস্ দেন তাঁহাদের প্রজাই হস্তবুদ ১১২৫ × ১৬৲ টাকা বা ১৮,০০০৲ টাকা। আর যাঁহারা ৭৫০৲ টাকা সেস্ দেন তাঁহাদের হস্তবুদ ১২,০০০৲ টাকা। তাঁহাদের আয় ইহাপেক্ষা যথেষ্ট কম—কত কম পরে দেখাইতেছি। আর যাঁহারা ৪,৫০০৲ টাকা রাজস্ব দেন তাঁহাদের আয় যাঁহারা ১,১২৫৲ টাকা সেস্ দেন তাঁহাদের সমান; এবং যাঁহারা ৩,০০০৲ টাকা রাজস্ব দেন তাঁহাদের আয় যাঁহারা ৭৫০৲ টাকা সেস্ দেন তাঁহাদের সমান—ইহাই আমরা ধরিয়া লইব। কারণ গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব-দেয়ী ও সেস্-দেয়ী জমীদারদের মধ্যে কোনও প্রভেদ করিবার ইচ্ছা ছিল না, বরং যাহাতে সমান সমান আয়ের হয় তজ্জন্য কিছু তদন্ত ও তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

Floud কমিশনের রিপোর্টে আছে যে যেখানে প্রজাই হস্তবুদ ১৩ কোটী টাকা সেখানে জমীদারদের রাজস্ব, সেস্, আদায়ী খরচা ইত্যাদি বাদে নিটলভ্য হয়, ৭ কোটী ৭৯ লক্ষ টাকা (১২৮ প্যারা দ্রষ্টব্য)। অর্থাৎ হস্তবুদের শতকরা ৬০৲ টাকা জমীদারদের মুনাফা। এই হিসাবে যাঁহাদের প্রজাই হস্তবুদ ১৮,০০০৲ টাকা তাঁহাদের নিট মুনাফা ১০,৮০০৲ টাকা; আর যাঁহাদের হস্তবুদ ১২,০০০৲ টাকা তাঁহাদের নিট মুনাফা ৭,২০০৲ টাকা। এইটী উর্দ্ধ সংখ্যার হিসাব। জমীদারদের আয় হস্তবুদের কত কম তাহা কুমার বিমলচন্দ্র সিংহ **Landholder's Journal**এ স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন।

আমরা আয় যত বাড়ে সংখ্যা তত কমে এই সরল অনুপাতে (যদিও ধন-বিজ্ঞানের ধন-বিস্তারের নিয়ম অনুসারে ইহাঁদের সংখ্যা আরও দ্রুত কম হইবে) বর্ত্তমানে বাংলার 'লক্ষপতি' জমীদারদের একটা সংখ্যা আন্দাজ করিতে পারি। পশ্চিম বঙ্গে ২৬৪ জনের আয় বার্ষিক ১০,৮০০৲ টাকা, সেই হিসাবে লক্ষপতির সংখ্যা ২৬৪ × ১০,৮০০/১০০,০০০ = ২৯ জন। তদ্রূপ পূর্ব্ব-বঙ্গে লক্ষপতির সংখ্যা ৬৬১ × ৭,২০০/

১০০,০০০=৪৮ জন। সারা বাংলায় 'লক্ষপতি' জমীদারের সংখ্যা মাত্র ২৯+৪৮=৭৭ জন।

যাঁহাদের আয় বর্ত্তমানে ১০,৮০০৲ টাকা দুই পুরুষ পূর্ব্বে তাঁহাদের পিতামহদের আয় হইতে ১০,৮০০৲×২·৪×২·৪=৬২,২০০৲ টাকা। আর তাঁহাদের সংখ্যা ছিল ২৬৪/২·৪×২·৪=২৬৪/৫·৭৬=৪৬ জন। ঐরূপ পূর্ব্ব-বঙ্গে যাঁহাদের আয় ৭,২০০৲ টাকা দুই পুরুষ পূর্ব্বে আন্দাজ ইং ১৮৭১ সালে তাঁহাদের আয় ৭,২০০×২·৪×২·৪=৪১,৫০০৲ টাকা; আর তাঁহাদের সংখ্যা হইবে ১১৫ জন। পূর্ব্বোক্ত আয় যত বাড়ে সংখ্যা তত কমে এই সরল অনুপাতে 'লক্ষপতি' জমীদারের সংখ্যা পশ্চিম বঙ্গে দুই পুরুষ আগে ছিল ২৮ জন। আর পূর্ব্ব-বঙ্গে ছিল ৪৮ জন। সারা বঙ্গে দুই পুরুষ আগে 'লক্ষপতি' জমীদারের সংখ্যা ছিল ৭৬ জন।

একটী বিষয় বিশেষ লক্ষ্য করিবার যে সমগ্র বঙ্গে 'লক্ষপতি' জমীদারের সংখ্যার গত দুই পুরুষে বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় জমীদারদের মুনাফা ২৩ লক্ষ টাকা। সুতরাং ২৩ জনের অধিক 'লক্ষপতি' জমীদার হইতেই পারে না। প্রকৃত সংখ্যা ইহার যথেষ্ট কম। আমরা যদি ইহার অর্দ্ধেক লক্ষপতিদের সংখ্যা বলিয়া ধরিয়া লই ত বিশেষ অন্যায় হইবে না। সে মতে তখন মাত্র ১০।১২ জন জমীদার লক্ষপতি ছিলেন।

বাংলা ভাষায় অত্যধিক ধনী বুঝাইতে লক্ষপতি শব্দ ব্যবহার হয়। 'ক্রোড়পতি' শব্দের ব্যবহার বাংলার বাক্য ধারা নহে। লক্ষপতির সংখ্যা কম থাকায়—পূর্ব্বে অত্যন্ত কম থাকায় 'লক্ষপতি' শব্দই অগাধ ধনের মালিককে বুঝাইত।

ভিখারিণী

শ্রীসুধীরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বহু প্রয়োজনীয় চিঠিপত্রের আশায় বসেছিলাম। পিয়ন এসে দিলে একখানি মাত্র চিঠি, তাও পোষ্ট আপিসের ছোট খামে। বিরক্ত ভাবে চিঠিখানা খুলে ফেললাম। খামের সঙ্গে চিঠিরও খানিকটা ছিঁড়ে এল।

নিমন্ত্রণ পত্র, পুরাতন বন্ধুর কাছ থেকে এসেছে। প্রায় পনের বছর দেখাশোনা নেই। শেষ দেখা পশ্চিমের কোন এক ষ্টেশন কোয়াটারে, তার ছেলের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে। আজকের চিঠি এসেছে ঝাঝা থেকে। তার মেয়ের ছেলের অন্নপ্রাশন। মাঝখানে পনের বছর কোথা দিয়ে চলে গেছে।

কাজের লোক, পনের বছর কলকাতা ছেড়ে যাই নি। বাজে নিমন্ত্রণ পত্র পেয়ে বিরক্তিই এল। চিঠিটা টেবিলে রেখে চাপরাসীকে ডাকবার ঘণ্টাটা বাজাতে গিয়ে চোখে পড়ল চিঠিখানার শেষের দিকে আসল চিঠি থেকে অনেকটা দূরে ভাঙ্গা ভাঙ্গা অক্ষরে দুছত্র লেখা—"কাকাবাবু, আমার ছেলের ভাতে আসতেই হবে।"

আপিস ঘরে বসে সহস্র কাজের সহস্র উদ্বেগের মধ্যে পনের বছর পূর্ব্বের একটা পুরাতন ছবি চোখের সামনে সজীব হয়ে ফুটে উঠল! পাঁচ বছরের একটি ছোট বালিকা তার ভায়ের অন্নপ্রাশন দেখে তার নিজের একটি কাঠের ছেলের ভাত দিয়েছিল, আর তাতে আমাকে নিমন্ত্রণ করে খাইয়েছিল—

টেলিফোনের ঘণ্টা বেজে উঠল। ট্রাঙ্ক কল—পাটনার আপিসে নানা গোলোযোগ—জটিল কাজের নেশায় মনটা সচল হয়ে উঠল। কাগজপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে চোখের সামনে ভেসে উঠে দুছত্র লেখা—

শেষ পর্য্যন্ত পাটনায় নিজেই যাওয়া স্থির হল। মাঝখানে ঝাঝায় একদিন নেমে গেলেই হবে।

বেহারের শুকনো খটখটে মাঠের মধ্যে দিয়ে ট্রেনখানা ছুটছিল। ট্রেনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আকাশের চাঁদটাও ছুটল পশ্চিমমুখে। গাছপালাগুলো ছুটেছে সমান বেগে পূর্ব্বমুখে। মাঝখানে শুধু আমি বসে আছি, স্থির, অচল।

ট্রেনখানা এসে থামল মধুপুরে। কামরা থেকে নামতেই সামনে পড়ল এক ভিখারিণী, কোলে একটি ছেলে। ভিক্ষা চাই।

বিরক্তিতে মন ভরে উঠল। ট্রেনে বাসে ট্রামে শুধু ভিক্ষুক। নিজেদের অলস অকর্ম্মণ্য জীবনের কথা ভাবে না, অপরের কষ্টার্জ্জিত অর্থের প্রতি শ্যেনদৃষ্টি। দিবারাত্র দেহ, মন, মস্তিষ্ক পেষণ করে যে অর্থের সৃষ্টি হয়, তা যেন ঐ বুভুক্ষুদের জন্য। এরা যে ঠিক ভিক্ষা করে তা নয়, এ যেন তাদের দাবী, ভিক্ষা চাই। "হবে না।" বলে মুখ ফেরালাম।

"তোমার ছেলের কি অসুখ না কি?"

মুখ ফিরিয়ে দেখি মধ্যবয়স্ক একটি ভদ্রলোক।

"বাবুজি!" বলে ভিখারিণী তার ছেলের হাতখানা তার দিকে বাড়িয়ে দিলে।

"পয়সার অভাবে ডাক্তার দেখাতে পাচ্ছ না বুঝি?"

হাতের সুটকেশটা মাটিতে নামিয়ে রেখে ভদ্রলোক বুক-পকেট থেকে একটা মনিব্যাগ বের করে তার ভেতর থেকে একটি টাকা বের করলেন।

ভিখারিণীর চোখ দুটো জ্বলে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, "হ্যাঁ, বাবুজি!"

ভদ্রলোক টাকাটি তার হাতে দিয়ে বললেন, "যাও, ভাল দেখে একজন হোমিওপ্যাথি ডাক্তার দেখিও।"

টাকাটা নিয়ে ভিখারিণী তাড়াতাড়ি সরে পড়ল। ভদ্রলোক আস্তে আস্তে কামরার মধ্যে ঢুকলেন।

গার্ডের হুইসিল বেজে উঠতে তাড়াতাড়ি কামরায় ঢুকে দেখি কামরার সকলেই ভদ্রলোকটির সম্বন্ধে বেশ গবেষণা আরম্ভ করে দিয়েছে।

লোকটা পাগল না কি?

ভিক্ষা না দিলে হয় নিষ্ঠুরতা। তাতে অন্তর থেকে আসে লজ্জা, আর ভিক্ষা দেওয়াটা দুর্ব্বলতা। লজ্জাটা তখন আসে বাইরে থেকে। অন্তর বাহিরের এই বিপরীতমুখী দ্বন্দ্বের মধ্যে বাইরের লজ্জাই চোখের সামনে পড়ে আর সেইটাই বড় দেখায়। ভিতরের লজ্জা ধীরে ধীরে ভিতরে চলে যায়। তাকে টেনে বাইরে আনার মতন সাহস তখন কোথায়? দুর্ব্বলতা বাস্তবিক কার? যে ভিক্ষা দেয়, না যে তাকে প্রত্যাখ্যান করে!

মনের মধ্যে লজ্জা পেলেও বাইরে ভদ্রলোকের অবস্থা দেখে বেশ আত্মপ্রসাদ অনুভব করলাম। উপস্থিত লজ্জা থেকে তাঁকে বাঁচাবার মত উদারতা দেখাবার লোভ ছাড়তে পারলাম না। সিগারেটটা ঠোঁটে চেপে দেশলায়ের কাঠিটা বের করতে করতে জিজ্ঞাসা করলাম, "কত দূর যাবেন ?"

"ঝাঝা !"

সিগারেট ধরান হল না। ঠোঁট থেকে সেটা নামিয়ে নিলাম। এই ঝাঝা ষ্টেশনের কথাই আজ সমস্ত দিন ভাবছি। ভদ্রলোকের উপর মনটা বেশ খুসী হয়ে উঠল। একটু আবেগের সঙ্গেই বলে ফেললাম, "ঝাঝায় যাবেন ? সেখানে কি কোন কাজকর্ম—"

কথাটা শেষ করতে পারলাম না। প্রশ্নটা অভদ্রের মত ঠেকল।

ভদ্রলোক কিন্তু বেশ সহজ ভাবেই উত্তর দিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, ওখানে আমার একটা ডিসপেন্সারী আছে।"

সঙ্কোচটা একেবারেই কেটে গেল। যেন কোন পরিচিত বন্ধুর সঙ্গে বহুদিন পরে দেখা। জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি তাহলে ঝাঝাতেই প্রাকটিস্ করেন।"

"না, নিজে ওষুধ দিই না। ডিসপেন্সারীতে দুজন বেশ ভাল ডাক্তার আছেন।"

"নিজে প্র্যাকটিস করেন না !"

"আগে করতাম, এখন ছেড়ে দিয়েছি।"

সকলেই উৎসুক দৃষ্টিতে ভদ্রলোকটির দিকে চাইলেন। মৃদু একটু হেসে তিনি বললেন, "ছিলাম আগে ডাক্তার, তারপর হলাম কম্পাউণ্ডার। তাও আর পারি না। এখন শুধু ওষুধ কিনে ডিস্পেন্সারীতে দিয়ে যাই। অর্থাৎ কিনা ওষুধের বাক্স বওয়া মুটে—"

ভদ্রলোক চুপ করলেন। কামরার সকলেই চুপচাপ্।

কামরার ওধার থেকে একজন বৃদ্ধ হঠাৎ বলে উঠলেন, "উন্নতি ত খুব করেছেন দেখছি।

কথাটা অত্যন্ত রূঢ় শোনাল।

কি জানি কেন ভদ্রলোকের উপর প্রথম থেকেই কেমন যেন শ্রদ্ধা এসেছিল। বৃদ্ধকে বললাম, "দেখুন, উনি ডাক্তার। ছেলেটির অসুখ দেখে—"

"রেখে দিন মশাই অসুখ। সারাদিন খেটে একটা টাকা উপায় হয় না আর উনি না চাইতেই—" কথাটা শেষ না করেই তিনি জানলা দিয়ে বাইরের দিকে মুখ ফেরালেন।

বুঝলাম বৃদ্ধের ব্যথা কোথায় !

"দানের পাত্রটিও বেশ—" একজন শিখা-তিলকধারী প্রৌঢ় বলে উঠলেন।

পাশের বেঞ্চি থেকে একজন সুবেশ যুবক অভিনয়ের ভঙ্গিতে মুচকি হেসে বলে উঠলেন, "Romantic something কিছু একটা আছে। নইলে—" কথাটা টেনে রেখে তিনি তাঁর ভ্রূ দু'টি কুঁচকে চশমার উপরের ফাঁক দিয়ে সম্ভবতঃ তাঁরই এক সহযাত্রীর দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাইলেন।

চোখের সামনে ভিখারিণীর চেহারাটা ভেসে উঠল। পরণের কাপড় আধ ময়লা হলেও তার চেহারা বেশ সুশ্রী, বয়স বাইশ তেইশের বেশী বলে মনে হল না।

আলোচনা জমে উঠার মতন হয়ে উঠল। কিন্তু হঠাৎ থেমে গেল। ভদ্রলোক বেশ সহজভাবে যুবকের দিকে চাইলেন। কয়েক সেকেণ্ড তার দিকে নীরবে চেয়ে থেকে ধীরে ধীরে বললেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, আছে বই কি ! ভিতরে একটা রহস্যজনক ঘটনা আছে।"

অবাক হয়ে গেলাম। এর মধ্যেও রহস্য আছে ! যতদূর মনে হয় ভদ্রলোক মেয়েটির দিকে চেয়েও দেখেন নি। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই টাকা-দানের ব্যাপার শেষ করে তিনি গাড়ীতে উঠেছিলেন।

গাড়ীশুদ্ধ সকলেই তাঁর রহস্যের কথা শুনিতে উদ্‌গ্রীব। কেবল বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি তখনও জানলার বাইরে মুখ ফিরিয়ে বসেছিলেন।

অনুনয়ের সুরে বললাম, "দেখুন, বিশেষ কোন বাধা যদি না থাকে—"

"না না, বাধা আর কি ? শুনতে চান, বলছি।"

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি কামরার ভিতরের দিকে ফিরে বসলেন। মুখে তাঁর তখনও বিরক্তি ভাব।

ভদ্রলোক তাঁর সুটকেশটা খুলে তার ভিতরটা বেশ করে দেখে নিয়ে সেটা বন্ধ করে পাশে রেখে দিলেন। তার পর গাড়ীর জানালা দিয়ে বাইরেটা একবার দেখে নিয়ে তাঁর গল্প সুরু করলেন—

ডাক্তারি সুরু করার অল্পদিনের মধ্যেই পশার বেশ জমে উঠল। রোগীর রোগ সারানোর মধ্যে যে আনন্দ আসে প্রথম প্রথম তা খুবই অনুভব করতাম। কিন্তু বছর দুয়েকের মধ্যে সে আনন্দকে ছাপিয়ে টাকা পাওয়ার আনন্দেই মন মেতে উঠল। সহরের লোক, খেতে পাক্ বা না পাক্ ডাক্তারকে টাকা দিতে দ্বিধা করে না। যেখানেই যাই কোথাও দারিদ্র্য আছে বলে মনে হয় না। এমনি ভাবে কয়েক বছর কেটে গেল। টাকাও জমে, পশারও বেড়ে উঠে।

একদিন ডাক এল, পশ্চিমের কোন এক সহর থেকে। কল্‌কাতার বাইরে গেলে সম্ভ্রম বাড়ে, কিন্তু পয়সার দিক দিয়ে আর কমে। দোটানার মধ্যে চিকিৎসার যশের দিকে মন ঢলে পড়ল।

পরের পয়সায় যাওয়া, সেকেণ্ড ক্লাসের রিসার্ভ বার্থে বেশ আরামে শুয়ে পড়লাম। সঙ্গে একটা হাতব্যাগ, তার ভিতর ছোট একটা হোমিওপ্যাথি ওষুধের বাক্স, তাতে কুড়ি পঁচিশটা হোমিওপ্যাথি ওষুধের শিশি।

ট্রেণ ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমে চোখ্ জড়িয়ে এল। ডাক্তারি জীবনে প্রথম সেদিন মনে হল টাকার জন্য কি কঠোর পরিশ্রমই না করি।

ঘুম যখন ভাঙ্গল, ট্রেণটা এসে ঝাঝায় থেমেছে। জানালা খুলে চায়ের সন্ধানে ষ্টেশনের দিকে মুখ বাড়ালাম।

ঘুরঘুটে অন্ধকার, আকাশে একটাও তারা নেই। ঘন কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে গেছে। খুব শীঘ্রই ঝড় কিম্বা বৃষ্টি হবে।

"বাবুজি !"

চেয়ে দেখি একজন ভিখারিণী। এই দুর্য্যোগের মধ্যে ভিক্ষায় বেরিয়েছে।

ঘোমটার ভিতর থেকে মুখ দেখা যাচ্ছিল না। কালো কাপড়ের ভিতর থেকে যে হাতখানা বেরিয়ে এল তা অস্বাভাবিক ফর্সা, কিন্তু কঙ্কালসার। একটুও মাংস নেই।

"এই রোগা শরীরে এত রাত্রে বেরিয়েছ?"

ভিখারিণী মুখ তুলে চাইলে। চেহারায় কোথাও এতটুকু লালিত্য নেই। বয়স কুড়িও হতে পারে, চল্লিশও হতে পারে। মুখ দেখে দয়া আসে না, ঘৃণাও হয় না—আসে ভয়।

বাঙ্গালা ভাল বুঝতে পারে নি। ভাঙ্গা হিন্দিতে প্রশ্ন করে বুঝলাম অনেক দিন থেকেই সে ভুগছে। ভিক্ষা সে আগে কখনও করে নি। কিন্তু ছেলের অসুখ, উপায় নেই, ওষুধের জন্ম ভিক্ষায় বেরিয়েছে।

আমার অন্তরের চিকিৎসকটি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসল, "কি অসুখ তোমার ছেলের?"

"ভেদবমি।"

প্রশ্রয় পেলে পরোপকার প্রবৃত্তিও বেড়ে উঠে। কিছু না ভেবেই বলে ফেললাম, "কি রকম অসুখ বল ত, আমি ওষুধ দিচ্ছি।"

ভিখারিণী আমার ভাঙ্গা হিন্দির প্রশ্নে যা জবাব দিয়ে যেতে লাগল তাতে কোন ওষুধই ঠিক হয় না। গার্ড হুইসেল দিলে—

কোটটা গায়ে দিয়ে, ব্যাগটা কাঁধে ফেলে হাতব্যাগটা তুলে নিয়ে গাড়ী থেকে নেমে পড়লাম। গাড়ী ছেড়ে দিলে।

পাটনা ষ্টেশনে একটা তার করে প্লাটফরমে এসে ভিখারিণীকে বললাম, "চল, তোমার ছেলেকে ভাল করে দেখে তার পর ওষুধ দেব।"

ষ্টেশনের বাইরে পাঁচটা কি ছটা একা। একপাশে একটা টঙ্গা। একাওয়ালাদের বিকট চীৎকার আর অশ্রাব্য গালাগালি কাটিয়ে টঙ্গাওয়ালা এগিয়ে এল।

ভিখারিণী গাড়ীতে উঠতে রাজি নয়। কাঁধের ব্যাগটা আর হাতব্যাগটা পিছনের সিটে রেখে সামনে এসে টঙ্গাওয়ালার পাশে গিয়ে বসলাম। ধীরে ধীরে সে টঙ্গায় উঠে বসে টঙ্গাওয়ালাকে তার গন্তব্যস্থান বলে দিলে। টঙ্গা চলতে লাগল।

সহরের রাস্তা ছেড়ে প্রায় মাইলখানেক মেঠো রাস্তায় চলে গাড়ীখানা একটা মেটে বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল। ভিখারিণী গাড়ী থেকে নেমে পড়ল।

গাড়ী থেকে নেমে টঙ্গাওয়ালাকে কিছুক্ষণ সেখানে থাকবার জন্যে ডবল ভাড়া বক্‌সিস্ দিতে চাইলাম। সে রাজী হল না। আকাশের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে সে জানালে যে, তার ঘোড়ার জানের দাম আছে। অগত্যা তার ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে তাকে খুব ভোরে আসতে বলে ভিখারিণীর পিছনে পিছনে তার বাড়ী ঢুকলাম। ছিপ্ ছিপ্ করে বৃষ্টি এল।

ঘরের মধ্যে বিছানায় একটি বছর পাঁচেকের ছেলে, পাশে মাথার দিকে আধা বয়সী একটি স্ত্রীলোক, ভিক্ষুক জাতীয়ই হবে। ছেলেটি পেটের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করছিল।

সরল সুশ্রী বালক। কে বলবে এর ছেলে? অবস্থাপন্ন ভদ্রঘরেও তেমন সুন্দর ছেলে বড় একটা দেখা যায় না।

বেশ করে দেখলাম। প্রায় পনের মিনিট ধরে। ওষুধ ঠিক করতে একটু বেগ পেলাম।

প্রাণে ভারি আনন্দ এল। রোগীর জন্ত ঔষধ নির্ব্বাচন, টাকার জন্ত নয়।

তার মায়ের দিকে চেয়ে বল্লাম, "ভয় নেই। রাতের মধ্যেই সেরে যাবে।"

দ্বিতীয় স্ত্রীলোকটি উঠে চলে গেল। বুঝলাম আপনার কেউ নয়। এদের মধ্যেও তাহলে পরস্পরের প্রতি সৌহার্দ্দ্য আছে।

ভিখারিণী একেবারে ছেলের মাথার কাছে এসে বসল। মাতাপুত্রে কোথাও এতটুকু সাদৃশ্য নেই। এমন সুন্দর ছেলেটির মা এই!

অন্তমনস্কভাবে হয়ত একটু অভদ্রভাবে চেয়েছিলাম। মুখটা একটু নামিয়ে সে মাথার কাপড়টা একটু টেনে দিলে। অপ্রস্তুত হয়ে একটু সরে গিয়ে প্রদীপের সামনে বসে হাতব্যাগটা খুলে ঔষধের বাক্সটা বের করে নিলাম।

বাক্সে নির্ব্বাচিত ঔষধ নাই।

সামনে রোগী, সুন্দর সরল শিশু, শিয়রে তার মা, ঔষধ নির্ব্বাচিত হয়েছে, এক ফোঁটা খাইয়ে দিলে আধ ঘণ্টার মধ্যে তার যন্ত্রণা সেরে যাবে। বাক্সে ঠিক সেই ঔষধটিই নেই।

যন্ত্রণায় পাশ ফিরে ছেলেটি তার মায়ের কোলের উপর হাত রাখলে। মা আমার দিকে চাইলে। চোখে তার মনে হল এক ফোঁটা জল। ছেলের কষ্ট দেখে না, ওষুধ খেলে কষ্ট সেরে যাবে বলে? বাইরে প্রবল বৃষ্টি পড়ছে।

কোন উপায় নাই!

রোগী সব সময়ে বাঁচান যায় না। চিকিৎসকের এ বিষয়ে দুর্ব্বলতা খুবই কম। কাজ করি টাকা নিই। রোগীর আসন্ন-কাল দেখে দর্শনীর টাকা পকেটে ফেলে নির্ম্মমভাবে বেরিয়ে যাই। এখানে টাকার ত কথাই নেই, বেরিয়ে যাবারও উপায় নেই।

হাতের সামনেই যে শিশিটা এল তাই তুলে নিয়ে এক ফোঁটা ওষুধ ছেলেটিকে খাইয়ে দিলাম। কলেরার যন্ত্রণার মধ্যেও ছেলেটি বেশ শান্তভাবে আমার মুখের দিকে চাইলে। বুকটা একটু কেঁপে উঠল।

একটু পরেই ছেলেটি বেশ প্রফুল্ল হয়ে উঠল। তার মাও যেন একটু নিশ্চিন্ত হল।

ঔষধের ফাঁকি সেরে নিলাম সেবার। ব্যাগটা রোগীর গায়ে ফেলে দিয়ে তার মাথার কাছটায় বসলাম। ধীরে ধীরে রোগী ঘুমিয়ে পড়ল।

"আপকা খানা—?"

ভিখারিণী হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে! কথাটা সে মনে মনে অনেকবার বলেছিল বলে বোধ হল।

আহারাদির ব্যাপার ট্রেণে উঠবার আগেই পরিপাটিরূপে সেরে নিয়েছিলাম। এ বিষয়ে ডাক্তারের কখন ভুল হয় না। তবু জিজ্ঞাসা করলাম—ঘরে কিছু আছে কিনা।

ভিখারিণী ঘরের এক কোণ থেকে এক বাটী দুধ নিয়ে এল।

ঘরে যে খাবারের একটা দানাও থাকতে পারে তা বোঝা যায় না। অথচ এমন সুন্দর কাঁসার বাটী, আর তার মধ্যে প্রায় আধ সের দুধ।

খাওয়া আমার হয়েছে জানিয়ে দুধটা তাকেই খেতে বললাম।

রাতে সে খায় না। শরীর ভাল নয়, অল্প অল্প জ্বর প্রায়ই হয়।

তার সে কথায় অবিশ্বাসের কিছুই ছিল না। মুখে চোখে তার তখনও জ্বরের চিহ্ন বেশ বোঝা যাচ্ছিল।

ছেলের সেবার ভার নিয়ে তাকে ঘুমুতে বললাম। কোন কথা না বলে সে দুধটা যথাস্থানে রেখে এসে ছেলের পাশে বসল।

ঘুমটা যে তার তখন কতখানি দরকার তা বেশ বুঝতে পাচ্ছিলাম কিন্তু কথা বলতে সাহস হয় না, বলাও যায় না।

একটু পরেই কিন্তু সে ছেলের পাশে কেমন করে শুয়ে কখন যে ঘুমিয়ে পড়ল তা সে নিজেই টের পায় নি।

নিস্তব্ধ রাত্রি, অপরিচিত দেশ, সামনে দুই রোগী, অঘোরে ঘুমোচ্ছে। ভয় একটু হল, হাসিও পেল। আমার জীবনের দাম কি? ব্যাঙ্কে যে ক'হাজার টাকা আছে বোধ হয় তার বেশী আর কিছু নয়। কিন্তু পরস্পরের কাছে এদের জীবনের মূল্য কত!

হঠাৎ মনে হল এরাই আমার আপনার। বিশেষ ছেলেটি।

আট বছর ডাক্তারি কচ্ছি। ছেলেটি তখন হয়ত এ পৃথিবীতে আসে নি।

ছেলে আর তার মায়ে কত তফাৎ। কিন্তু আট বছর আগে ছেলেটি যখন হয় নি···তখন এই ভিখারিণী···কেমন ছিল কে জানে?

তখন সে হয়ত ভিক্ষা করত না। তার ঘর ছিল, স্বামী ছিল।···হয়ত সে খুব সুন্দরী ছিল।···তার ছেলের মত সুন্দর বালক যেমন বড় একটা দেখা যায় না···হয়ত তার মত সুন্দরী নারীও তখন খুব কম ছিল।···

ঝড়ের একটা-ঝাপটায় হঠাৎ দরজাটা খুলে গেল। প্রদীপটাও গেল নিবে।

তাড়াতাড়ি উঠে দরজা বন্ধ করে প্রদীপ জ্বালতে গেলাম। পকেট থেকে দেশলাই বের করে জ্বেলে দেখি প্রদীপে তেল নেই। কাছেই হাতব্যাগটা খোলা পড়েছিল। ভেতরে দেখি একটা মোমবাতি। বাতিটা জ্বেলে ফেললাম। সাদা আলোয় ঘরের ভিতরটা বেশ পরিষ্কার হয়ে উঠল।

দরিদ্রের কুটীর। কিন্তু বেশ পরিষ্কার, ঝকঝকে। জিনিষপত্র পরিষ্কার ভাবে সাজান। একপাশে একটা ছোট চৌকি, তার উপর হাঁড়ি, কলসী, ভাঁড়ারের জিনিষপত্র। ওপাশটায় একটা ছোট আলনা—তাতে পরিষ্কার কখানা কাপড়, দু'একখানা আধময়লাও আছে। আলনার কাছেই বিছানা, পরিষ্কার ধব্‌ধবে। তার উপর শুয়ে অঘোরে নিদ্রা যাচ্ছে···এক সুন্দরী তরুণী। তার সুন্দর নিটোল হাতখানা বিছানার বাইরে এসে পড়েছে।

মাথাটা ঘুরে উঠল।

পাশেই আমার র‍্যাগটা পড়েছিল। তাড়াতাড়ি সেটা তুলে নিয়ে তার গায়ের উপর ফেলে দিলাম।

ভিখারিণী ঘুমের ঘোরেই একবার পাশ ফিরে তার শীর্ণ হাতখানা দিয়ে ছেলেকে জড়িয়ে ধরলে।

ছেলের গা একেবারে খালি। বুকের ওপর তার মায়ের হাত। কলেরা রোগী, ঘুম ভেঙ্গে যেতে পারে। অতি সন্তর্পণে রোগীর গায়ের উপর থেকে হাতখানা সরিয়ে মাতাপুত্রকে র‍্যাগটা দিয়ে বেশ করে ঢেকে দিলাম। তারপর পিছন দিকে আর না চেয়ে পকেট থেকে একটা সিগার বের করে ঘরের বাইরে চলে এলাম।

বাইরে দাওয়ায় পুরাণ একটা দড়ির চারপাই ছিল। তার উপরে বসে সিগারেটা ধরিয়ে ধীরে ধীরে টানতে লাগলাম।

বৃষ্টির তেজ কমে গিয়েছে। কিন্তু মেঘ কাটে নি; চারিদিক তখনও বেশ অন্ধকার। গা ছম্‌ছম্ করতে লাগল। কিন্তু ঘরে যেতেও সাহস হোল না।

সিগারটা শেষ হয়ে এল। বৃষ্টি থেমে গেছে। কিন্তু জোলো হাওয়া—বেশ শীত করতে লাগল। গায়ে গেঞ্জি আর পাতলা একটা সার্ট। ঠাণ্ডা হাওয়া জামার উপরে এসে জমে যায়, তার পরে গলে গলে যেন বুকের ভিতরে গিয়ে ঢোকে। কোটটা পেলে হোত কিন্তু সেটাও ঘরের মধ্যে পড়ে আছে।

শেষ পর্য্যন্ত ঘরে ঢুকতে হল।

কোটটা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে আসবার সময় অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভিখারিণীর দিকে চোখ পড়ল। জোলো হাওয়ার শীতের মধ্যে গরম র‍্যাগটা গায়ে পড়াতে সে তখন বেশ আরামেই ঘুমুচ্ছে।

তাড়াতাড়ি বাইরে এসে চারপাইটার উপর শুয়ে পড়লাম।

ঘুম ভাঙ্গতে দেখি সূর্য্য উঠেছে। রাতে শুধু বৃষ্টিই হয় নি। বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে প্রবল ঝড় হয়ে গেছে। রাস্তার ধারের মহুয়া গাছগুলোর ডালপালা ভেঙ্গে পড়েছে। ঠিক সামনে একটা গাছ একেবারে উপড়ে গেছে। রাস্তায়, উঠোনে কাদামাখা পাতা ছড়িয়ে পড়েছে। ভিখারিণীর উঠোনের একপাশে কটা টগর আর জবা গাছ ছিল। সেগুলো ভেঙ্গে তচ্‌নচ্ করে দিয়েছে।

এত দুর্য্যোগের পরও সুন্দর প্রভাত দেখা দিয়েছে। আকাশ গাঢ় নীল, তার উপর সূর্য্যের সোনালী কিরণগুলো ছুটোছুটি করছে। উঠোনের এক কোণে টকটকে লাল জবা ফুল ফুটে রয়েছে।

টঙ্গাওয়ালা এসে সেলাম ঠুকলে। উঠে বসতে ধীরে ধীরে সামনে এসে দাঁড়াল রাতের ভিখারিণী।

জিজ্ঞাসা করলাম, "লেড়কা ক্যায়সা হায়?"

"হাসতা হায়, বাবুজি!"

ছেলের হাসির কথা মনে করে সে নিজেও হেসে ফেললে। চোখে তার জল টল্‌মল্ কচ্ছিল।

ঘরের ভিতরে গিয়ে দেখি দুরন্ত ছেলে উঠে বসে র‍্যাগটা নিয়ে খেলা কচ্ছে।

রোগের কোন চিহ্নই নেই।

পকেট থেকে কটা টাকা বের করে ছেলের হাতে দিয়ে টঙ্গার কাছে এলাম।

ভিখারিণী বাইরে উঠোনে তার প্রতিবেশিনীর সঙ্গে ছেলের কথা বলছিল, তাড়াতাড়ি টঙ্গার কাছে এল।

ছেলের পথ্য সম্বন্ধে সামান্য কিছু উপদেশ দিয়ে তাকে আর কোন ওষুধ খাওয়াতে নিষেধ করে হাতব্যাগ আর কোটটা টঙ্গার উপর রাখলাম।

ভিখারিণী যেন কি বলতে চায়, পথ্যের খরচ?

মনিব্যাগ খুলে একটা দশ টাকার নোট বের করলাম।

ভিখারিণীর চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ করে দুফোঁটা জল পড়ল।

এত টাকা সে নেবে না—কিছুতেই না।

পকেট থেকে কটা খুচরো টাকা বের করলাম। একটা টাকা নিয়ে বাকী কটা টাকা সে ফিরিয়ে দিলে। টাকা কটা পকেটে পুরে টঙ্গায় উঠে বসলাম। টঙ্গা চলতে লাগল। যতক্ষণ দেখা গেল দেখি সে চুপ করে হাতের টাকাটার দিকে চেয়ে রয়েছে। মোড়টা ফেরবার মুখে সে হঠাৎ একবার টঙ্গার দিকে চাইলে।

ভদ্রলোক চুপ করলেন। ট্রেনটা তখন একটা ষ্টেশনে এসে থেমেছে। ভদ্রলোক তাঁর সুটকেশটা নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

সকলেই প্রায় সমস্বরে বলে উঠলেন, "তার পর—"

"তার পর আর কোন রোগী সারাতে পারি নি।"

ভদ্রলোক গাড়ী থেকে নেমে পড়লেন।

"আর সেই ভিখারিণী ?" প্রায় পাঁচ ছয়জন লোক জানালা দিয়ে মুখ বাড়ালেন।

একটু ঘুরে তিনি দরজার হাতলটা ধরে বললেন, "মাসখানেক পরে ফেরবার পথে খবর নিয়েছিলাম সে তখন মারা গেছে।"

"মারা গেল।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, যক্ষ্মায় ভুগছিল।"

"ছেলেটি—?"

একজন বিহারি ভদ্রলোক দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন। ভদ্রলোক হাতলটা ছেড়ে দিয়ে একটু সরে গিয়ে বললেন, "ছেলেটিকে তার কোন এক দূরসম্পর্কের মামা এসে নিয়ে গেছল। তাঁদের অবস্থা না কি খুব স্বচ্ছল।"

ভদ্রলোক চলে গেলেন।

আবার গবেষণা।

"লোকটা একটা বানানো গল্প বলে সময়টা মন্দ কাটিয়ে দিলে না।"

তিলকধারী বললেন, "নিছক পাগল।"

চশমাধারী যুবকটি বললেন, "নাঃ, লোকটা একজন সাহিত্যিক। তবে গল্পটা ওঁর নিজের বানান নয়। কোন ফরাসী লেখকের অনুবাদ। বৈদেশিক সাহিত্যের খবর কে রাখে ?"

যুবকটি যে বিদেশী সাহিত্যের অনেক খবর রাখেন তার প্রমাণস্বরূপ তিনি জানালেন যে, ফরাসী থেকে গল্পটার ইংরাজি অনুবাদ সাত আট বছর আগে বের হয়, আর তিনি তা তখন পড়েছিলেন। মূল লেখক একজন সুবিখ্যাত লোক, নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন। তবে তাঁর নামটা তিনি ভুলে গেছেন।

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে গম্ভীরভাবে বললেন, "যা ভেবেছিলাম, তা নয়। পাকা ব্যবসাদার। একটা টাকা দান করে অনেক টাকার কাজ গুছিয়ে নিয়ে গেল।"

যুবকটি একটু তর্কের সুরে বললেন, "কি রকম ?"

"লোকটা ডাক্তার, ঝাঝাতেই প্র্যাকটিশ করে। নিজের advertisement করে গেল।"

গাড়ী চলতে সুরু করেছে। প্লাটফরম ছাড়িয়ে যেতে হঠাৎ চোখে পড়ল ষ্টেশনটা—ঝাঝা।

ঝাঝায় আর নামা হোল না। ভালই হোল। পাটনার কারবারে যা গোলযোগ, কত টাকার যে ক্ষতি হবে, কে জানে ? র‍্যাগটা গায়ে দিয়ে অলসভাবে শুয়ে পড়লাম।

হঠাৎ কে যেন কানের কাছে স্পষ্ট বলে উঠল, "কাকাবাবু! আমার ছেলের ভাতে তুমি এলে না ?"

জানলার ফাঁক দিয়ে আকাশের দিকে চাইলাম। চাঁদটা তখন কালো একটা মেঘের ভিতর থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এসে দুষ্ট ছেলের মত হেসে উঠল!

শ্রীচৈতন্যদেবের জাতিগঠন আন্দোলনের শিক্ষা

স্বামী বেদানন্দ

বৈষ্ণব ভক্তগণের ভক্তির আতিশয্যে ধর্ম্ম-সংস্থাপক, সমাজ-সংস্কারক ও জাতি-সংগঠক শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেবকে আমরা ভাব-ভক্তি-প্রেমের কমনীয় বিগ্রহ, ভক্তের আরাধ্য অবতার বা মহাপ্রভুরূপেই দেখিতে ও বুঝিতে অভ্যস্ত হইয়াছি। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্য মঙ্গল, মুরারি গুপ্তের করচা প্রভৃতি সম-সাময়িক ব্যক্তিগণের লিখিত গ্রন্থপাঠে উপরোক্ত ধারণাই পরিপুষ্ট হয়। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে যখন মহাপ্রভুর প্রভাব দেশের সর্ব্বত্র সমাজের স্তরে স্তরে বিস্তৃত হইয়া বাঙ্গলা ও উড়িষ্যার তথা সমগ্র ভারতের হিন্দুজাতি ও সমাজকে ধ্বংসের কবল হইতে রক্ষা করিল, তখনও যে সকল গ্রন্থ লিখিত ও প্রচারিত হইল, তাহার মধ্যেও মহাপ্রভুকে ভাবভক্তি প্রেমের বিগ্রহরূপেই দেখি। ফলে যিনি আসিয়াছিলেন জাতি-সংগঠক ও সমাজ-সংস্কারকরূপে—তাহাকে আমরা পাইলাম—এক সম্প্রদায় সংগঠক ও এক মতবাদের প্রবর্ত্তকরূপে; ফলে মহাপ্রভুর পদাঙ্কানুবর্ত্তী বৈষ্ণব-সমাজের মধ্যে আসিল সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা, গোঁড়ামি ও বাহ্যাচারপ্রবণতা; জাতি-গঠনের ও সমাজ-সমন্বয়ের উদার সর্ব্বগ্রাসী ভাব ও আদর্শ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ হইতে চলিয়া গেল। স্বতন্ত্র বৈষ্ণব স্মৃতিশাস্ত্র লইয়া স্মার্ত্ত সমাজ হইতে পৃথক সমাজ গড়িয়া উঠিল। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা মহাপ্রভুকে জাতি-সংগঠক ও সমাজ-সংস্কারক—তথা ধর্ম্ম-সংস্থাপকরূপে দেখিবার চেষ্টা করিব এবং তাঁহার শিক্ষা হইতে বর্ত্তমান যুগে হিন্দু জাতির পুনর্গঠন ও হিন্দু সমাজের সমন্বয় সাধন এবং হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের ইঙ্গিত লাভের প্রয়াস করিব।

প্রারম্ভে মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী দেশ ও সমাজের অবস্থার কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক। বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতি ও বিকৃতির যুগে ভট্ট কুমারিল ও আচার্য্য শঙ্কর প্রচণ্ড তেজে বিকৃত বৌদ্ধধর্ম্মকে উৎখাত পূর্ব্বক বৈদিক আর্য্য আদর্শ ও সাধনার পুনঃপ্রবর্ত্তনের জন্য সমগ্র ভারতব্যাপী যে বিরাট আন্দোলন আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহাতে ভারত হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম সাধনার নির্ব্বাসন ঘটিল বটে, কিন্তু বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যায় তখনও বৌদ্ধপ্রভাব প্রবল রহিল—পাল রাজগণের আধিপত্যের আশ্রয়ে। সেনবংশের আদি পুরুষ আদিশূর বৈদিক আদর্শ ও অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তনের জন্য পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থ বঙ্গদেশে আনয়ন করিলেন। সেনবংশীয় হিন্দু রাজগণের প্রবল প্রতাপে, বিশেষ ভাবে সমাজ-সংস্কারক বল্লাল সেনের প্রচেষ্টায় বাঙ্গালা দেশে বৈদিক

আদর্শ ভাব অনুষ্ঠানের বহু বিস্তার ঘটিল। কিন্তু তথাপি তদানীন্তন বাংলায় অসংখ্য অশিক্ষিত, অর্দ্ধসভ্য জনগণের মধ্য হইতে বৌদ্ধ প্রভাব অন্তর্হিত হয় নাই। মর্য্যাদাভিমানী বৈদিক সমাজের প্রতাপে উক্ত বৌদ্ধ প্রভাবান্বিত জনগণ হিন্দুরাজগণের দ্বারা নিপীড়িত, উপেক্ষিত, ঘৃণিত ও শিক্ষায় বঞ্চিত হইয়া রহিল। বৈদিক সমাজের ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্যাদি উক্ত বৌদ্ধ-প্রভাবান্বিত জনগণকে "নেড়ে" আখ্যায় ঘৃণা, অবজ্ঞা ও উপহাস করিত। পাঠান আক্রমণের প্রাক্‌কালে বৈদিক বর্ণাশ্রমাভিমানী হিন্দু সমাজের এই সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামী অতিমাত্র উদগ্র হওয়ায় তদানীন্তন সমাজপতিগণ উদার আদর্শ ও আচার-ব্যবহারের দ্বারা বৌদ্ধ প্রভাবান্বিত জনগণের মধ্যে বৈদিক আদর্শ ও অনুষ্ঠানের প্রচার প্রতিষ্ঠার পরিবর্ত্তে, তাহাদিগকে নানা প্রকারে ঘৃণিত ও নির্য্যাতিত করিতেন। নিরুপায় বৌদ্ধ প্রভাবান্বিত জনগণ এই ঘৃণা ও নির্য্যাতন নীরবে সহিয়া যাইত।

মুসলমান আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে এমন উপযুক্ত ক্ষেত্র পাইয়া মুসলমান গাজীগণ এক হাতে কোরাণ ও অপর হাতে তরবারি লইয়া হিন্দুর মন্দির-বিগ্রহ ধ্বংস ও মুসলমান ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিল। বৈদিক হিন্দু সমাজের দ্বারা নির্য্যাতিত উক্ত অসংখ্য বৌদ্ধপ্রভাবান্বিত অধিবাসিগণ সহজে রাজধর্ম্ম ইসলামের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক মর্য্যাদা ও রাজ-অনুগ্রহ লাভের সুযোগ নিতে সচেষ্ট হইল। ফলে বাঙ্গালায় লক্ষ লক্ষ নর-নারীকে আত্মসাৎ করিয়া অতি দ্রুত বাঙ্গালায় বিরাট মুসলমান সমাজ গড়িয়া উঠিল। সমাজের এই মহা বিপদ সম্মুখে দেখিয়াও সমাজপতিগণ প্রথমে গ্রাহ্য করেন নাই, পরে যখন ব্যাপার গুরুতর হইয়া উঠিতে লাগিল, তখন আত্মরক্ষার প্রচেষ্টায় সমাজপতিগণ কঠোর শাসন সমাজে প্রবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ফলে যাহারা যবনের সংশ্রবে আসিল, যবনের অধীনে কার্য্যগ্রহণ করিল, যবনের স্পৃষ্ট-অন্ন স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় গ্রহণ করিল, অত্যাচারী যবনগণ যাহাদের স্ত্রী-কন্যাকে অপহরণ করিল, সমাজপতিগণ তাহাদিগকে সমাজ হইতে বহিষ্কার করিতে লাগিলেন। এইরূপে তদানীন্তন হিন্দু-সমাজ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া আত্মসংকোচন ও অঙ্গচ্ছেদ দ্বারা সমাজের আত্মরক্ষার বিধান অবলম্বন করিয়া চলিতে লাগিলেন। এরূপ সময়ে যদি মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য আবির্ভূত হইয়া এই সামাজিক আত্মহত্যার পন্থা রুধিয়া না দাঁড়াইতেন, তবে আজ বাঙ্গালা ও উড়িষ্যায় হিন্দু নামের পরিচয় পাওয়া যাইত কিনা সন্দেহ। বৈষ্ণব-ভক্ত-সাধক কবিগণ ভাব-কল্পনায় মসগুল্ হইয়া শ্রীরাধার দেহের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে প্রবেশ করাইয়া গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে "রাধা প্রেমে গড়া তনু" দেখিয়া যতই বিহ্বল হইয়া পড়ুক না কেন, ঐতিহাসিক, ধার্ম্মিক, সামাজিক, জাতীয় দৃষ্টি সম্পন্ন চিন্তাশীল ব্যক্তির চক্ষে মহাপ্রভু হিন্দু-ধর্ম্ম সাধনা-সংস্কৃতির তথা সমগ্র হিন্দুজাতি ও সমাজের রক্ষকরূপে আবির্ভূত হইয়া ইসলাম ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির প্লাবন নিবারণ করিয়াছিলেন। মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ তদীয় 'অমিয় নিমাই চরিতের' মধ্যে মহাপ্রভুকে ভগবানের আবেশ অবতাররূপে তাঁহার সাধু-ভক্ত ধার্ম্মিকগণের রক্ষা, অত্যাচারী দুর্ব্বৃত্তের দণ্ডবিধান ও উদ্ধার এবং ধর্ম্মসংস্থাপন কার্য্যাদি বর্ণনা করিয়াছেন এবং প্রসঙ্গক্রমে সমাজের উপর মহাপ্রভুর প্রভাবও কথঞ্চিৎ বর্ণনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু বর্ত্তমান গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত শিক্ষা সাধনাকে বিসর্জ্জন দিয়া কত দূরে সরিয়া পড়িয়াছে ও পড়িতেছে সেদিকের আলোচনা তিনি করেন নাই।

ভট্টপাদ কুমারিলের বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড প্রচার এবং আচার্য্য শঙ্করের অদ্বৈতজ্ঞানের ভিত্তিতে পঞ্চ দেবতার উপাসনা ও বৈদিক বর্ণাশ্রমাচার প্রবর্ত্তনরূপ ধর্ম্ম-সংস্থাপন ও সমাজ-সংগঠনের পন্থা পরিহার পূর্ব্বক মহাপ্রভু ভক্তিমার্গ অবলম্বনে জাতিগঠন ও সমাজ-সংস্কারে কেন অগ্রসর হইলেন—ইহা বুঝিতে হইলে মহাপ্রভুর সম-সাময়িক বঙ্গ-সমাজের অবস্থার ইঙ্গিত একটু প্রয়োজন। এই সময়ে বঙ্গ-সমাজের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে কয়েকটা বিষয় লক্ষ্য করা যায় :—

(১) আত্মরক্ষার প্রচেষ্টায় কূর্ম্মবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক স্মার্ত্ত-সমাজ যবন-সংশ্লিষ্ট, যবন-স্পৃষ্ট জনগণকে ক্রমাগত বহিষ্কার করিতেছিল।

(২) সমাজস্থ উচ্চশ্রেণীর অবজ্ঞা ও নির্য্যাতনে নিম্নশ্রেণীর জনগণ ইসলামের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছিল।

(৩) বৌদ্ধ প্রভাবিত জনগণ বহুল পরিমাণে ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল এবং করিতেছিল।

(৪) সমাজের ব্রাহ্মণাদি উচ্চশ্রেণীর বহু লোক রাজকার্য্যাদির সংশ্রবে যবন সংসর্গ-প্রভাবে স্বতঃপরতঃ ইসলাম গ্রহণ করিতেছিল। ফলে ক্রমশঃ হিন্দু-সাধনা-সংস্কৃতির প্রভাব মলিন হইয়া আসিতেছিল।

(৫) ধর্ম্মের আদর্শ ও সাধনা বিস্মৃত হইয়া শুধু বাহ্য আচারানুষ্ঠান ও শুচিতা লইয়া সমাজ বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল।

(৬) পণ্ডিত ও সমাজপতিগণের শুষ্ক ন্যায় ও শাস্ত্র বিচারেই সময় ও শক্তি ব্যয়িত হইতেছিল।

(৭) ধর্ম্মের নামে বহু বিকৃত আচারানুষ্ঠান—অনাচার-কদাচার ব্যভিচার সমাজের দেহে বিষ ছড়াইতেছিল।

এই সময়ে মহাপ্রভু হরিনাম কীর্ত্তনরূপ সার্ব্বজনীন ধর্ম্মসাধনা প্রবর্ত্তন পূর্ব্বক ভাব ও ভক্তির প্রবল প্লাবন আনয়ন করিলেন—"মুচি হয়ে শুচি হয় যদি কৃষ্ণ ভজে।" হরিনাম কীর্ত্তন ও হরিভক্তির প্লাবন-বেগ চতুর্দ্দিকে উত্তাল তরঙ্গে প্রবাহিত হইল। ক্রমে যবন হরিদাসের ন্যায় বহু যবন ও যবনাচারসমন্বিত হিন্দু হরিনাম কীর্ত্তনরূপ উদার ধর্ম্মানুষ্ঠান অবলম্বনে হিন্দু-সমাজের আশ্রয় লাভ করিলেন। যবন-সংশ্লিষ্ট, জাতিভ্রষ্ট, সমাজদণ্ডিত সুবুদ্ধিরায়ের ন্যায় শত শত ব্যক্তি হরিনাম কীর্ত্তনরূপ সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া হিন্দু সমাজের আশ্রয়ে রক্ষিত হইলেন। উচ্চ আদর্শ ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে অনভ্যস্ত ও অক্ষম নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণ হরিনাম কীর্ত্তনরূপ সহজ ধর্ম্ম-সাধনার সন্ধান পাইয়া স্মার্ত্ত সমাজের কঠিন বিধানে অশক্ত হইয়াও হিন্দু সমাজে রহিয়া গেল; ইসলাম গ্রহণের প্রলোভন সম্বরণ করিল। বৌদ্ধ-প্রভাবান্বিত অবশিষ্ট নরনারী হরিনাম কীর্ত্তনরূপ সার্ব্বজনীন সহজ সাধনার আগ্রহে হিন্দু-সমাজে প্রবেশ পূর্ব্বক সামাজিক যথাযোগ্য মর্য্যাদালাভ করিল। জ্ঞান ও কর্ম্মকাণ্ডপ্রধান বৈদিক ধর্ম্মানুষ্ঠান ও সদাচারে অশক্ত সমাজের অধিকাংশ জনগণ ধর্ম্মহীন হইয়া পড়িতেছিল; মহাপ্রভুর হরিনাম কীর্ত্তনরূপ ভাবাবেগ প্রধান (emotional) ধর্ম্মানুষ্ঠান সকলেরই পক্ষে সহজবোধ্য ও সহজানুষ্ঠেয় হইয়া উঠিল। শুষ্ক ন্যায়ের তর্কযুক্তি বিচারের বন্ধুর দুর্গম পথের পরিবর্ত্তে সহজ, সরল, ভাবাবেগের ধর্ম্মানুষ্ঠান পাইয়া জন-সাধারণ শান্তি ও স্বস্তি অনুভব করিল। ফলে সমাজে একদিকে আসিল সংগঠন, আর একদিকে আসিল সংস্কার :—

(১) গ্রামে গ্রামে আখ্ড়া, হরি-সভা, মহোৎসব সম্মেলনাদিতে সহস্র সহস্র লোকের সমাগম ও মিলনে হিন্দুর জনশক্তি ও সঙ্ঘশক্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। ফলে অহিন্দুগণের হিন্দু সমাজের উপর জুলুম করিবার ক্ষমতা অন্তর্হিত হইল।

(২) হরিনাম কীর্ত্তন ক্রমশঃ বৈদিক-সমাজের ব্রাহ্মণাদি সকল শ্রেণী এবং অবৈদিক জনগণ সকলে সমভাবে বরণ করায় সামাজিক সমতা ও সমগ্রতা গড়িয়া উঠিল। অস্পৃশ্যতা ও অনাচরণীয়তার তীব্রতা বহুল পরিমাণে কমিতে লাগিল।

(৩) বিধর্ম্মীগণের ছলে-বলে-কৌশলে ধর্ম্মভ্রষ্ট, জাতিচ্যুত হিন্দুগণ পুনরায় হিন্দুসমাজে প্রবিষ্ট ও গৃহীত হইতে লাগিলেন।

এইরূপে বহু ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়া হিন্দু সমাজ আত্মবিস্তারের মধ্য দিয়া আত্মরক্ষার কৌশল পাইয়া পূর্ব্বের কূর্ম্মবৃত্তি ও অঙ্গচ্ছেদরূপ আত্মহত্যার পথ পরিত্যাগ করিল। ইহাতে যদি কেহ মনে করেন

যে মহাপ্রভু যে ধর্ম্ম-সাধনা বা সামাজিক আচারানুষ্ঠান প্রবর্ত্তন করিলেন তাহা বেদ-বিরোধী, সুতরাং সনাতন ধর্ম্মের পরিপন্থী—তাহা হইলে তিনি হইবেন ভ্রান্ত। মহাপ্রভু যে ধর্ম্ম-সাধনা ও আচারানুষ্ঠান প্রবর্ত্তন করিলেন তাঁহার মর্ম্মানুধাবন করিতে হইলে তাঁহার জীবন-লীলার প্রতি লক্ষ্য করিতে হইবে। তিনি "আপনি আচরি জীবেরে" কি শিখাইয়াছেন ? বৈদিক ধর্ম্মের মূল আদর্শ—ত্যাগ, সংযম, সত্য, ব্রহ্মচর্য্য। মহাপ্রভুর স্বীয় জীবনে এবং তাঁহার স্বহস্তে শিক্ষিত ছয়জন গোস্বামী আচার্য্যের জীবনে—উক্ত বৈদিক মূল আদর্শ চতুষ্টয় পরিপূর্ণ মাত্রায় প্রকটিত।

মহাপ্রভুর প্রচারিত ও আচরিত ধর্ম্মের ব্যাখ্যা তিনি নিজ জীবনে—সন্ন্যাস, ব্রহ্মচর্য্য ও কঠোর নিয়ম-নিষ্ঠার মধ্য দিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন। ছোট হরিদাস স্ত্রীলোকের নিকট হইতে চাউল আনিয়াছিল বলিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন, কিছুতেই ক্ষমা করেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন—দারুনির্ম্মিত স্ত্রী-মূর্ত্তির প্রতি দৃক্পাত করিলে উচ্চ সাধকের চিত্তেও বিকার আসে। তিনি ভাব-সাধন-প্রবণ বৈষ্ণব সমাজকে সাবধান করিয়া গেলেন—"বহিরঙ্গ সঙ্গে কর নাম-সংকীর্ত্তন"। লীলার অন্তরঙ্গ আস্বাদক মহাপ্রভুর সময়েও মাত্র সাড়ে তিন জন ছিলেন—রায় রামানন্দ, স্বরূপদামোদর, শিখি মাইতি, মাধবী দাসী। এমন কি অদ্বৈতপ্রভু এবং নিত্যানন্দপ্রভুও লীলা আস্বাদনের অধিকারী ছিলেন না। দুর্ভাগ্যের বিষয় পরবর্ত্তী কালেও বর্ত্তমানে বাঙ্গালা দেশে নামসংকীর্ত্তন অপেক্ষা লীলাস্বাদন করিতেই সকলে ব্যতিব্যস্ত।

ফলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের সর্ব্বাঙ্গে আজ আউল, বাউল, দরবেশ, সাঁই, সহজিয়া, কিশোরী ভজন, কর্ত্তাভজা ইত্যাদি কত অসংখ্য মতবাদ গজাইয়া উঠিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মকে ঘৃণাকারজনক, ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা ও ব্যভিচারের নরকে পরিণত করিয়াছে। আর বৈষ্ণব ও স্মার্ত্ত-সমাজ পূর্ব্বে যেরূপ পৃথকভাবে অবস্থিত ছিল আজ আর তেমন নাই। বঙ্গ সমাজের যাবতীয় নরনারীই আজ প্রকৃতপক্ষে অল্পাধিক পরিমাণে বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন। সুতরাং মহাপ্রভুর বৈষ্ণব ধর্ম্মের নামে জঘন্য ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্রতা অল্পাধিক পরিমাণে সমগ্র বঙ্গীয় হিন্দু সমাজকেই আক্রমণ করিয়াছে। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব স্বীয় জীবনে যে বিরাট ত্যাগ, কঠোর সংযম, অটুট ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিয়াছেন, তাহার শিষ্য ছয়জন গোস্বামী যে কঠোর তপশ্চর্য্যার আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, সেই ত্যাগ, সেই সংযম, সেই ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শ বিসর্জ্জন দিয়া অথচ সেই মহাপ্রভু ও ছয়জন গোস্বামীর দোহাই দিয়া গৌড়ীয় সমাজ তথাকথিত যে বৈষ্ণবী ভাব-সাধনা প্রদর্শন করিতেছেন তাহাতে ভাবময় নিত্য-দেহ অবস্থিত মহাপ্রভুর বদন ঘৃণা-লজ্জায় মলিন হইয়া যাইতেছে না কি ?

আবার ইহাও প্রচারিত যে মহাপ্রভুর ধর্ম্ম নাকি অহিংসা ! বৈষ্ণব ধর্ম্মের সার কথা নাকি অহিংসা পরম ধর্ম্ম ! "মেরেছিস কলসীর কাণা তা বলে কি প্রেম দিব না"—ইহাই নাকি মহাপ্রভুর ভাব। চাঁদ কাজী যখন নদীয়া নগরে হরিনাম কীর্ত্তন নিষিদ্ধ করিয়া ফতোয়া জারী করেন তখন নিমাই পণ্ডিত কাজীর বিরুদ্ধে যে বিরাট অভিযান করিয়া কাজীকে দমন করিয়া ফতোয়া উল্‌টাইয়া দিয়াছিলেন, অহিংসা বা ক্ষমাই পরমধর্ম্ম করিয়া 'কিল খেয়ে কিল চুরি' করিয়া যান নাই ;—এ ইতিহাস কি তবে মিথ্যা ? জগাই মাধাই নিত্যানন্দকে আঘাত করিয়া রক্তাক্ত করিয়াছেন এ সংবাদ যখন মহাপ্রভুর কর্ণে পৌঁছিল, তখন মহাপ্রভু কি করিয়া ছিলেন ? তিনি কি নিত্যানন্দকে ক্ষমার উপদেশ দিয়াছিলেন ? না, রুদ্র মূর্ত্তিতে "পাপিষ্ঠকে ধ্বংস কর" বলিতে বলিতে ছুটিয়া গিয়াছিলেন ? সত্য ইতিহাসকে অস্বীকার করিয়া যাহারা মহাপ্রভুকে প্রেমের অবতার সাজাইতে গিয়া তাঁহাকে অহিংসা ও ক্লীবতার অবতার বানাইয়া বসে, তাহাদের আত্মপ্রতারণাকে ধন্যবাদ !

মহাপ্রভুর চরিত্র ছিল—"বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি।" কৃষ্ণপ্রেমে তিনি আত্মহারা ছিলেন, জীবের মলিনদশা দেখিয়া তিনি গলিয়া গিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য সর্ব্বত্যাগী হইয়া আচণ্ডাল সকলকে স্নেহ-প্রেম করুণার সুরধুনীতে ডুবাইয়াছিলেন ; এখানে তিনি ছিলেন—কুসুমাদপি-কোমল। কিন্তু সত্যরক্ষায়, কর্ত্তব্যপালনে, আদর্শ প্রতিষ্ঠায় তিনি ছিলেন বজ্রের ন্যায় কঠোর, হিমালয়ের ন্যায় অটল, ভীষ্মের ন্যায় অবিচলিত, বুদ্ধের ন্যায় দৃঢ়সঙ্কল্প। সেখানে তিনি কোন ভয় বা বিপদকে গ্রাহ্য করেন নাই, কোন প্রকার ত্রুটী দুর্ব্বলতাকে ক্ষমার চক্ষে দেখেন নাই।

মহাপ্রভুর সমসাময়িক যুগ হইতে বর্ত্তমান যুগের পরিস্থিতি বহুল পরিমাণে পৃথক ; তখনকার সমস্যাসমূহ হইতে বর্ত্তমান সমস্যারাশি বহুক্ষেত্রে ভিন্ন প্রকার। সুতরাং তিনি জাতিগঠন, সমাজ-সংস্কার ও ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য যে সকল পন্থা দেখাইয়াছিলেন, এখন ঠিক সেই সকল পন্থা কার্য্যকরী হইবার নয়। কিন্তু মহাপ্রভু যে মূল আদর্শ ও পদ্ধতির ভিত্তিতে হিন্দুজাতি ও সমাজকে পুনর্জ্জাগরিত ও পুনর্গঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন, যে দৃষ্টিভঙ্গী তিনি গ্রহণ পূর্ব্বক বৈদিক আদর্শের ভিত্তিতে ধর্ম্মের যে সর্ব্বগ্রাসী আকার দিয়াছিলেন এবং সমাজে উদারতা ও মিলনের ভিত্তিতে যে সাম্য ও ঐক্য শক্তি আনয়ন করিয়াছিলেন তাহাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া চলিবার মত ধারণা কাহারও হইতে পারে না। বর্ত্তমান যুগেও—

(১) হিন্দু ধর্ম্মের মূল আদর্শ—ত্যাগ-সংযম, সত্য-ব্রহ্মচর্য্যের ভিত্তিতে সার্ব্বজনীন ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রচার প্রতিষ্ঠা চাই।

(২) সামাজিক ভেদ-বিবাদ-সংকীর্ণতার-মূলোচ্ছেদের জন্য সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দুর মিলনক্ষেত্র আবশ্যক।

(৩) সামাজিক লোকাচার-দেশাচার-স্ত্রীআচারগুলির যথা সম্ভব নিরসনপূর্ব্বক শাস্ত্রীয় সদাচারের প্রবর্ত্তন আবশ্যক।

(৪) সার্ব্বজনীন ধার্ম্মিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানের ভিত্তিতে সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দুকে সম্মিলিত করিয়া অস্পৃশ্য-অনাচরণীয়তার পাপকে উন্মূলিত করা আবশ্যক।

(৫) সার্ব্বজনীন মিলন ও সামাজিক সংগঠনের ভিত্তিতে সঙ্ঘশক্তি রচনা অত্যাবশ্যক।

মহাপ্রভুর যুগের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পরিস্থিতি হইতে বর্ত্তমান যুগের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতি পৃথক হওয়ায় উপরোক্ত কার্য্যগুলি সম্পাদনের জন্য অবলম্বনীয় উপায়গুলি অবশ্য পৃথক হইবে—সন্দেহ নাই। মহাপ্রভুর যুগে যদিচ পাঠানগণ দেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে প্রজাসাধারণ শক্তিশালী বা স্বাধীন-প্রায় ভূম্যধিকারীগণের দ্বারাই শাসিত ও রক্ষিত ছিলেন। মুসলমান রাজগণের মন্ত্রী, সেনাপতি ও কর্ম্মচারী-অধিকাংশ ছিলেন—হিন্দু। কিন্তু বর্ত্তমানে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের দ্বারা প্রজাসাধারণ সর্ব্বতোভাবে আইনের নাগপাশে আবদ্ধ, নিরস্ত্র, আত্মরক্ষায় অক্ষম। মহাপ্রভুর যুগে ইস্‌লামের ধর্ম্মমত ও আচারের সহিত হিন্দুর ধর্ম্ম ও আচারের সজ্ঘর্ষ কিয়ৎ পরিমাণে আসিয়াছিল। সার্ব্বজনীনভাবে আক্রমণ করিবার সুযোগ পায় নাই। কারণ তখন সমাজে ব্যবস্থাদানকারী-সমাজপতিগণ ছিলেন, সমাজের রক্ষক স্বাধীন বা স্বাধীনপ্রায় হিন্দু ভূস্বামীগণ ছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে বিলাতী—সাম্যবাদ ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য—বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মধ্য দিয়া এবং রাষ্ট্রীয় আন্দোলন ও মতবাদের প্রণালী বহিয়া সমাজ ও জাতির অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিতেছে। সমাজের অভিভাবক নাই, রক্ষক নাই ; সর্ব্বত্র স্বেচ্ছাচার, কদাচার, ব্যভিচার উলঙ্গভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে ও করিতেছে। অথচ জাতির বলবীর্য্য ও কর্ম্মশক্তি ক্ষীণতর হইয়া পড়িয়াছে ; স্বার্থের প্রতি নিবদ্ধ দৃষ্টি হওয়ায় যাবতীয় সামাজিক গুণ ও বন্ধন শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। দেহ সর্ব্বস্ব ও ভোগপরতন্ত্র হওয়ায় জনগণ আত্মমর্য্যাদা

বিসর্জ্জন দিয়া ক্লীব ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যাবতীয় অপমান, অত্যাচার, লাঞ্ছনা নীরবে হজম করিয়া যাইতেছে। সমাজে মিলন ও সঙ্ঘশক্তির একান্ত অভাব।

এরূপ পরিস্থিতিতে একদিকে মিলনের ক্ষেত্র ও সার্ব্বজনীন মিলনের অনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তন চাই। সমাজে অভিভাবক শক্তির প্রতিষ্ঠা চাই। অপরদিকে জনগণের মধ্যে আত্মরক্ষার—স্বধর্ম্ম, স্বসমাজ রক্ষার সঙ্কল্প ও প্রচেষ্টা জাগাইবার ব্যাবস্থা চাই। আত্মরক্ষার উপযোগী সংগঠন ও হাতিয়ার গ্রহণ পূর্ব্বক যথাযোগ্য শিক্ষা-দীক্ষা চাই।

মহাপ্রভুর যুগে হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন ও হরিবাসরের ভিত্তিতে সার্ব্বজনীন মিলন সম্ভব হইয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে ভিন্ন উপায়ে আবশ্যক। আত্মরক্ষার—স্বজাতি, স্ব-সমাজ, স্ব-ধর্ম্ম-রক্ষার সঙ্কল্পকে অবলম্বন পূর্ব্বক সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দুর মিলন এবং উক্ত আত্মরক্ষার সঙ্কল্পে রক্ষীদল সংগঠন-পূর্ব্বক সমাজে ক্ষাত্রতেজ সঞ্চার সম্ভব। এইরূপে মিলন কেন্দ্র ও রক্ষকদল গঠনের সঙ্গে সঙ্গে ধার্ম্মিক ও সামাজিক সার্ব্বজনীন অনুষ্ঠানাদির সূত্র ধরিয়া ধর্ম্মের যথার্থ আদর্শ ও সাধনার প্রচার-সামাজিক অনাচার বিদূরণ পূর্ব্বক সদাচার ও সাম্য প্রতিষ্ঠা, হিন্দুত্বের মর্য্যাদাবোধ জাগাইয়া স্বধর্ম্ম স্বসমাজ রক্ষার জন্য হিন্দু জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ ও সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া তোলা সম্ভব হইয়া উঠিবে।

কোনারকের প্রধান বিগ্রহ কি জগন্নাথ মন্দিরের প্রাঙ্গনে আছেন?

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

সম্প্রতি কোনারক যাবার সুযোগ ঘটেছিল। পুরী গিয়ে মনে হল ভারতীয় শিল্পের এই অপূর্ব্ব নিদর্শনটী দেখে না গেলে পুরী আসাই বৃথা হবে। সুতরাং কোনারক যাবার উদ্‌যোগ করা হল। কোনারক যাবার কয়েকটী রাস্তা আছে। যাঁরা হেঁটে যান তাঁদের পক্ষে সমুদ্রের ধার দিয়ে যাওয়া সুবিধা। তা না হলে পুরী-বালিঘাই-সুতন-কোনারক, পুরী-বালিঘাই-লিয়াখিয়া-কোণারক বা পুরী-লিয়াখিয়া-কোনারক এই তিনটী পথের কোনও একটীতে যাওয়া যায়। সব কটী রাস্তাই পঁচিশ হতে কুড়ি মাইলের মধ্যে। গরুর গাড়ীর রাস্তাও এইগুলি। খুব ভাল ভাঁটা পেলে সমুদ্রের ধার দিয়েও গরুর গাড়ী যায়, শুনেছি সে পথে আরাম খুব বেশী। গাড়ী একটুও দোলে না। মোটরের রাস্তা অন্য। সচরাচর পুরী-পিপলি-নিমাপাড়া-গোপের রাস্তায় মোটর চলে। পুরী হতে কটকের রাস্তা ধরে পিপলি পর্য্যন্ত ২৩ মাইল। এ রাস্তা অতি চমৎকার। তারপর ডানদিকে বেঁকতে হয়, সাত মাইল পর্য্যন্ত রাস্তা ভাল। তারপর ২০।২১ মাইল কাঁচা রাস্তা, রাস্তার অবস্থা শীতকালেও অত্যন্ত খারাপ। এ পথে মোট রাস্তা ৫৩ মাইল। প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা সময় লাগে। কয়েকটী নদীও আছে, শীতকালের পর নদীগর্ভ দিয়ে মোটর চলাচলের রাস্তা হয়। একটী নদী পার হতে কিছু Tole দিতে হয়। আমরা এই পথেই গিয়েছিলাম। কিন্তু চেষ্টা করলে আরও একটী রাস্তায় যাওয়া বোধ হয় অসম্ভব নয়। পুরীর গুণ্ডিচা বাড়ীর পাশ দিয়ে বালিঘাই পর্য্যন্ত রাস্তা আছে। এ রাস্তায় বালিঘাই-এর আগে সময় সময় প্রচুর বালি পড়ে, সেকারণে রাস্তায় মোটর চলা কষ্টকর হয়ে ওঠে। কিন্তু সে জায়গাগুলিতে রাস্তা হতে নেমে বাঁদিকে সরহ্রদের শুকনো গর্ভ দিয়ে রাস্তার পাশাপাশি চলা কঠিন নয়। এ ভাবে সহজেই যাওয়া যেতে পারে আমি পরীক্ষা করে দেখেছি। এই পথে পুরী হতে গোপ কুড়ি মাইল পড়ে, কোনারক ২৮।২৯ মাইল। কিন্তু শীত ছাড়া অন্য সময় এ পথেও চলা একবারে অসম্ভব। কিছুদিন হল সরহ্রদ হতে সমুদ্র পর্য্যন্ত একটী খাল কাটা হয়েছে, এই পথে এই খাল বা New Cutটী পার হতে হয়। বর্ষা হলে বা অন্যকারণে জল থাকলে নিউ কাট পার হওয়া সম্ভব নয়। বাস্তবিক পক্ষে শীতকাল ছাড়া অন্য সময় কোনও রাস্তাতেই কোনারক যাওয়া সম্ভব বা সহজ নয়। এ ছাড়া যাঁরা উৎসাহী তাঁরা খুব ভাঁটার সময় সমুদ্রের একেবারে ধার দিয়ে মোটর চালাবার পরীক্ষা করে দেখতে পারেন, কিন্তু ওপথে নিউ-কাট এবং কুশভদ্রা নদী পার হতে হবে, সমুদ্রের ধার হতে কোনারকের মন্দিরের কাছে আসতেও বালি পার হতে হবে। কোনারক মন্দির আর এখন সমুদ্রের ঠিক তীরে নেই, প্রায় মাইল দেড়েক তফাত হয়ে পড়েছে। মনে হয় এককালে মন্দিরটী সমুদ্রের আরও কাছে ছিল।

আমরা ভোরবেলা রওনা হয়ে সাড়ে ন'টায় পৌঁছলাম। সবচেয়ে সুন্দর হচ্ছে পথের শেষপ্রান্তে ঝাউগাছের সারি। বহুদূর হতে একবার মন্দিরটী দেখা গেল, কিন্তু তারপরেই ঝাউ-এর সার শুরু হল। বালি-রাস্তায় ঝাউসারের মধ্য দিয়ে চলেছি, কিন্তু মন্দির কোথা? এগোতে এগোতে হঠাৎ ঝাউ-এর সারি শেষ হয়ে গেল, আর দেখি একটু নীচু এক বিরাট্ প্রাঙ্গনে অসংখ্য ভাঙা পাথর ও ভগ্নস্তূপের মধ্যে কোনারক মন্দিরের ভগ্নাবশেষ। চারপাশে উঁচু বালিয়াড়ি আর ঝাউ বন। পথে আসতে আসতে সেইজন্য মন্দিরটীকে হঠাৎ দেখা যায় না। পথের শেষে মন্দিরটীর হঠাৎ আবিষ্কার অত্যন্ত আনন্দ জাগায়। পৌঁছেই মন্দিরের চারপাশ ঘুরে দেখা গেল।

উড়িষ্যার মন্দিরগুলির সাধারণতঃ দুটী অংশ—একটী প্রধান দেউল বা রেখ দেউল, আর একটী মণ্ডপ বা ভদ্র দেউল। প্রধান মন্দিরটী গোলাকার, কিন্তু মণ্ডপটীর ছাদ অনেকটা প্যাগোডার মত থাকে থাকে তৈরী। কোনারক মন্দিরের এখন যে অংশ বর্ত্তমান, সেটী মণ্ডপ বা জগমোহন। প্রধান মন্দিরটীর অতি সামান্য অংশই আছে। এখন যে কয়টি সিঁড়ি করে দেওয়া হয়েছে সেই সিঁড়ি দিয়ে প্রধান মন্দিরের গর্ভে বা গম্ভীরায় যাওয়া যায়। মাথার ছাদ নেই, কিন্তু দেওয়ালগুলি কিছুদূর পর্য্যন্ত আছে। রত্নবেদী বা দেবতার সিংহাসনটীও আছে। বেদীটী দুই থাক। প্রথমটীর উপরে আবার আর একটী অপেক্ষাকৃত ছোট বেদী আছে; এই দ্বিতীয় বেদীর উপরে মূর্ত্তির দাগ আছে। এইখানে কি মূর্ত্তি ছিলেন, সে মূর্ত্তি এখন কোথায়, এটী একটী বিশেষ রহস্যের বস্তু। সে সম্বন্ধে পরে আলোচনা করছি।

এই গম্ভীরার মধ্যে দাঁড়ালে এক অদ্ভুত অনুভূতি হয়।

আশ্চর্য্যের কথা, বড় দেউলের যেটুকু অংশ অবশিষ্ট আছে তার বাইরের দেওয়ালে বহু কারুকার্য্য থাকলেও ভিতরের দেওয়ালে একটুও কারুকার্য্য নেই। একেবারে অতি সাধারণ দেওয়াল। গম্ভীরা হতে জগমোহন যাবার পথ ছিল, জগমোহনটি বালি



কোণারকের জগমোহন। জগমোহনের দরজা ইঁট দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে দেখা যাচ্ছে

ভর্ত্তি করে বন্ধ করে দেবার সময় এ পথটিও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। জগমোহনটি ঐ ভাবে সংরক্ষিত হওয়ায় এখন তার ভিতরে ঢোকা যায় না। সমস্ত দরজাগুলিও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। গত শতাব্দীর প্রথম ভাগে যে সব দর্শকেরা কোনারকে গিয়েছিলেন তাঁরা প্রধান মন্দিরটিকে অনেকটা অক্ষত অবস্থায় দেখেছিলেন। ১৮২৪ সালে ষ্টার্লিং সাহেব যখন কোনারকে যান সে সময় প্রধান মন্দিরটি প্রায় ১২০´ পর্য্যন্ত বজায় ছিল। ১৮৬৮ সালে রাজেন্দ্রলাল মিত্র দেখেন তার প্রায় সবটাই ভেঙে পড়েছে। এখন গম্ভীরার সামান্য কিছু অংশ ছাড়া প্রধান মন্দিরের কিছুই নেই। সুতরাং কোনারক মন্দির বলতে এখন মাত্র জগমোহনটিকেই বোঝায়। জগমোহনটি ছাড়া সামনে একটি অসম্পূর্ণ বা ভাঙা নাটমন্দির আছে। নাটমন্দিরটির ভিত ও তলার কাজ সম্পূর্ণ আছে, থামগুলিও প্রায় সম্পূর্ণ। এ ছাড়া উল্লেখযোগ্য মায়াদেবীর মন্দির। প্রাঙ্গনের মধ্যেই প্রধান মন্দিরের পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে এই মন্দিরের ভগ্নাবশেষ। জগমোহনের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে যথাক্রমে হস্তিদ্বার ও অশ্বদ্বার। প্রথমটিতে দুটি হাতীর মূর্ত্তি আছে, দ্বিতীয়টিতে দুটি ঘোড়ার। হস্তিদ্বারের কাছে আর একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে, কিসের মন্দির তা জানা যায় না। নাটমন্দিরের ঠিক দক্ষিণ পাশেও এরকম কয়েকটা ভাঙাচোরা মন্দিরের আভাস পাওয়া যায়, কিন্তু তাদের ইতিবৃত্তও জানা যায় না।

কোনারক ভারতীয় শিল্পকলার অপূর্ব্ব নিদর্শন। আসল মন্দিরটি না থাকায় এর সমগ্র রূপ কি ছিল তা অনুমান করা কঠিন। কিন্তু সবচেয়ে সুন্দর এর পরিকল্পনাটি। কোনারকের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার মন্দিরভিত্তিতে খোদিত চাকাগুলি। সমস্ত মন্দিরের চারপাশে মাটি হতে মন্দিরচাতাল পর্য্যন্ত বড় বড় চাকা খোদাই করা আছে। চাকার ধুরগুলি বেরিয়ে আছে—তাতে মনে হয় চাকাগুলি সত্যিই বুঝি চলতে পারে। এইরকম চাকা চব্বিশটি। শেষকালে পুব দিকের অর্থাৎ সমুদ্রের দিকের দরজার পাশে চাকাগুলির সামনে কটি করে ঘোড়া, পুব দিকের সিঁড়ির সামনেও দুটি ঘোড়ার প্রতিমূর্ত্তি আছে। কল্পনা করা হয়েছে সমস্ত মন্দিরটি যেন সূর্য্যদেবের রথ, ঘোড়াগুলি সেই রথ সমুদ্রের দিকে টেনে নিয়ে চলেছে। এখানে যখন সমুদ্র হতে সূর্য্যোদয় দেখা যায় তখন এই পরিকল্পনার সৌন্দর্য্য বোঝা যায়। মন্দিরের তিনপাশে তিনটি পার্শ্বদেবতার মূর্ত্তি এখনও বজায় আছে। মূর্ত্তিগুলি পুষা, সূর্য্য ও হরিদশ্বের। এই পার্শ্বদেবতা সঙ্গে নিয়ে সূর্য্যদেব উদয়ের পথে চলেছেন, সামনে অরুণ স্তম্ভের উপর অরুণ বসে স্তব করছেন (অরুণ স্তম্ভটি মারাঠাদের আমলে এখান হতে সরিয়ে পুরীতে জগন্নাথ মন্দিরের সিংহদ্বারে বসান হয়, এখনও সেখানেই আছে)। জগমোহন বা প্রধান মন্দিরটিও যেন প্রকাণ্ড একটি পদ্মের উপর বসান, সেই পদ্মটির তলায় চাকা। সমস্ত রথটিই যেন অশ্ববাহিত।

কিন্তু তবু কোনারকের মন্দির দেখে হতাশ হতে হয়। উঁচু পাতলা রেখদেউল না থাকায় এবং শুধু চতুষ্কোণ জগমোহনটি থাকায় এর গতিবেগের ইঙ্গিত স্থাপত্যের মধ্যে আর ফুটে ওঠে না। জগমোহনটি বিরাট, স্তরে স্তরে উঠেছে, তাতে কারুকাজের ছড়াছড়ি—কিন্তু তবুও তার মধ্যে গতির চেয়ে স্থিতির আভাসই স্পষ্টতর। এই পরিকল্পনাটিকে আরও ব্যাহত করেছে নাটমন্দিরটি। সমুদ্র আর আসল মন্দিরের মধ্যে এই নাটমন্দিরটি যেন একটি বাধা। কেউ কেউ বলেছেন নাটমন্দিরটি পরে তৈরী, সেটা আশ্চর্য্য নয়। অন্ততঃ প্রধান মন্দিরের স্থাপত্যের



জগমোহন ও পিছনে প্রধান মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। প্রধান মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের মাথার কাছে পার্শ্বদেবতার মূর্ত্তি দেখা যাচ্ছে

মূল পরিকল্পনার সঙ্গে নাটমন্দিরটিকে মেলানো কঠিন। নাটমন্দিরটিতে কোথাও চাকা নেই, 'বাড় বা plinthএর পর

প্রধান মন্দির (বড় দেউল ও জগমোহন ছুটিতেই) যেমন একটি বিরাট পদ্মের উপর বসান—এরকম ইঙ্গিত করা হয়েছে, নাটমন্দিরে সেটিও নেই। বাড়ের পরই সারি সারি থাম উঠেছে। জগমোহনের মাথার উপর হতে যখন সমুদ্র দেখা যায় তখন জগমোহনের বিরাট



পার্শ্বদেবতার মূর্ত্তি

আকার এবং সামনে ক্ষুদ্র নাটমন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখলে মনে হয় ওটি একটি সত্যিই বাধা—সূর্য্যের রথে নিষ্পিষ্ট ও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেই ওর সঙ্গত পরিণাম হবে। আরও হতাশ হতে হয় কোনারকের বন্ধকাম বা অশ্লীল মূর্ত্তিগুলিতে। অশ্লীলতার বিরুদ্ধে নীতিবাগীশের আপত্তি তুলছি নে, কিন্তু যে গ্র্যাণ্ড আইডিয়া হতে মূল মন্দির ও জগমোহন নির্ম্মিত তার সঙ্গে মূর্ত্তিগুলির কোনও অবিচ্ছেদ্য যোগ খুঁজে পাওয়া যায় না। ওগুলি যেন বাইরে হতে চাপানো, মৌলিক পরিকল্পনাকে ফুটিয়ে তোলার পরিবর্ত্তে যেন ব্যাহত করেছে! আর তা ছাড়া আক্ষেপ আসে শূন্য গম্ভীরায় দাঁড়ালে। শিল্পকলার এই পরম তীর্থের দেবতা কোথায়? এই রথে চড়ে কোন্ সূর্য্যমূর্ত্তি প্রত্যেক দিন উদয়ের দিকে অগ্রসর হতেন? এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে।

কোনারকের প্রধান বিগ্রহ এখন কোথায় এ নিয়ে অনেক জল্পনা কল্পনা হয়েছে। কোনারকে একটি যাদুঘর আছে। সেখানে একটি বড় সূর্য্যমূর্ত্তি রাখা আছে। কোনারকের প্রধান দেউলের তিন পাশে যেমন তিনটি সূর্য্যমূর্ত্তি পাওয়া যায় এ মূর্ত্তিটিও শিল্পকলায় এবং অন্য দিকে তারই অনুরূপ। নির্ম্মাণের পাথরও এক, সবুজ আভা সংযুক্ত পাথর (chlorite)। কিন্তু এটি যে কোনারকের উপাস্য দেবতা এমন কথা কেউই বলেন না। আর ছুই একটি সূর্য্যমূর্ত্তি এই যাদুঘরে আছে, কিন্তু সেগুলির কোনটিই যে কোনারকের পূজিত বিগ্রহ নয় সে সম্বন্ধে সকলেই একমত। সেগুলির কারুকার্য্য দেখলেও সে কথা মনে হয়, আর সেগুলি chlorite পাথরেরও নয়—অধিকাংশই laterite পাথরের। সুতরাং মন্দিরের মধ্যে বা মন্দিরের ভগ্নস্তূপের মধ্যে যদি প্রধান বিগ্রহ না পাওয়া যায় তাহলে সে বিগ্রহ কোথায়? প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে এখানকার পূজিত বিগ্রহ 'মইত্রাদিত্য বিরঞ্চিদেব' মুসলমানদের অত্যাচারের ভয়ে পুরী চলে যান এবং সেই হতেই নাকি কোনারকের পতন আরম্ভ। এই জনশ্রুতি অবশ্য জনশ্রুতিই হয়ে থাকতো, কিন্তু পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের প্রাঙ্গনে একটি ছোট মন্দিরে একটি অত্যন্ত রহস্যজনক মূর্ত্তি আছে যাতে এই জনশ্রুতিটিকে হেসে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। পুরীর এই মূর্ত্তিটিও কম কৌতূহলজনক নয় এবং সেইটিই কোনারকের প্রধান দেবতা কিনা এ কথাটা ভাল ভাবে আলোচনার অবকাশ এখনও আছে। বিষয়টি পণ্ডিতদের বিচার্য্য, আমরা একটা মোটামুটি বিবরণ দেবার চেষ্টা করব।

পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে একটী বিশেষ রহস্যজনক মূর্ত্তি আছে। জগন্নাথ মন্দির প্রাঙ্গনে একটী সূর্য্য (?) মন্দির আছে। সিংহদ্বার দিয়ে ঢুকে ডানদিকে গেলে এই মন্দিরটী পাওয়া যায়। মন্দিরটী আকারে খুব বড় নয়। উড়িষ্যার মন্দিরের রীতি অনুসারে একটী প্রধান মন্দির, সঙ্গে একটী মণ্ডপ। প্রথম বা আসল দেউলটী জগন্নাথের বড় দেউলের মত রেখ দেউল, অর্থাৎ থাক থাক ছাদ বিশিষ্ট। এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহটী অত্যন্ত কৌতূহলজনক। দর্শনার্থীরা সামনে দাঁড়ালে একটী সূর্য্যমূর্ত্তি দেখতে পাবেন। মূর্ত্তিটীর বিশেষ কোন গঠন সৌষ্ঠব নেই। কালো পাথরের মূর্ত্তি, অন্ততঃ প্রদীপের আলোয় কালো পাথরের মূর্ত্তি বলে মনে হয়। চোখ ছুটী পিতলের। মাথার উপরে একটী অল্প কারুকাজ করা Haloর মত। প্রত্নতত্ত্ব-বিশেষজ্ঞেরা এর নাম কি দেবেন জানিনা; পুরীর কাছাকাছি নানাজায়গায় এবং জগন্নাথদেবের দোলমঞ্চেও যেরকম তোরণ আছে এই সূর্য্যমূর্ত্তিটীর মাথার উপরের কাজটীও ঐ তোরণের মত। উপরের কাজগুলি কালো পাথরের



নাটমন্দির। এ পাশে জগমোহনের অংশ দেখা যাচ্ছে। চাকা ও ঘোড়া বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য

নয়, অধিকাংশই সাদাটে পাথরের তৈরী। মূর্ত্তিটীর পিছনের দেওয়ালটীও এই পাথরের তৈরী।

কিন্তু এই দেওয়ালের পিছনে গেলে দেখা যায়, আশ্চর্য্যের কথা, আর একটা মূর্ত্তি আছে। এই মূর্ত্তিটী যে পাথরের আসনের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেই পাথরটীর সঙ্গে গেঁথে ঐ দেওয়ালটী তোলা হয়েছে। তার ফলে প্রথম মূর্ত্তিটীর পশ্চাদ্‌পট এই দেওয়ালটীর আড়ালে এই যে দ্বিতীয় মূর্ত্তিটী আছে, সামনে হতে এটাকে আর দেখা যায় না। মধ্যে দেওয়ালটী আড়াল পড়ে। পিছনের



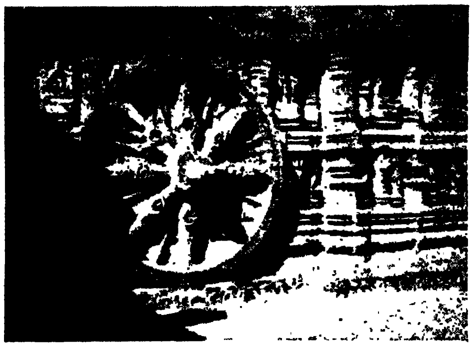
মায়াদেবীর মন্দির

মূর্ত্তিটী কিছু কিছু ভাঙ্গা। উপবিষ্ট মূর্ত্তি। পায়ের সামনে হতেই দেওয়ালটী উঠেছে।

পিছনের মূর্ত্তিটী কিসের মূর্ত্তি সে সম্বন্ধে কোনও নিশ্চিত সিদ্ধান্ত হয় নি। মূর্ত্তিটী কালো পাথরের। দুই হাত ও নাক ভাঙ্গা। মাথায় চুঁচালো মুকুট আছে। গলায় পৈতা আছে। কোনারকের সূর্য্যমূর্ত্তিগুলিতে যেরকম অলঙ্কার প্রভৃতি দেখা যায় এ মূর্ত্তিটীতেও সেরকম অলঙ্কার আছে। মূর্ত্তির পাশে গন্ধর্ব্ব ইত্যাদিও কোনারকের মূর্ত্তিগুলির মতই। এ মূর্ত্তিটী সামনের মূর্ত্তিটীর চেয়ে বড়। শ্রীযুক্ত নির্ম্মলকুমার বসু মেপে দেখেছেন (তাঁর 'কোনারকের বিবরণ' দ্রষ্টব্য), সামনের মূর্ত্তিটী চওড়ায় মাত্র ১′৫″ ও উচ্চতায় ২′২″। কিন্তু পিছনের মূর্ত্তিটী ৩′ চওড়া ও ৬′২″ উচ্চ। তবুও যে পিছনের মূর্ত্তিটী দেখা যায় না—তার কারণ মধ্যেকার দেওয়ালটী কিছু উঁচু।

এই রহস্যের কারণ কি? পাণ্ডাদের জিজ্ঞাসা করে কোনও সদুত্তর পাওয়া যায় না। তারা বলে সামনের মূর্ত্তিটী হচ্ছে কোনারকে উপাসিত বিগ্রহ, কোনারক মন্দির নষ্ট হবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ মন্দিরে এনে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। দ্বিতীয় মূর্ত্তিটাকে তারা বুদ্ধমূর্ত্তি বলে, ইন্দ্রমূর্ত্তিও বলে। তাদের মধ্যে জনশ্রুতি এই যে কালাপাহাড় পিছনের মূর্ত্তিটীকে ভাঙ্গার ফলে তার সামনে এই মূর্ত্তিটাকে বসিয়ে পূজা করা হচ্ছে, কেননা ভগ্নমূর্ত্তিতে পূজা নিষিদ্ধ। কিন্তু এই জনশ্রুতি নিতান্ত অর্থহীন। যদি পিছনের মূর্ত্তিটী বুদ্ধদেবেরই মূর্ত্তি হয় তাহলে সেটীর অঙ্গহানি হলে তার সামনে একটী বুদ্ধমূর্ত্তিই বসানো স্বাভাবিক, সূর্য্যমূর্ত্তি বসাবার কোনই সঙ্গত কারণ নেই। তাছাড়া পিছনের মূর্ত্তিটি জগন্নাথ মন্দির প্রাঙ্গনে আসবার পর ভাঙা হয়েছিল, সাধারণ বুদ্ধিতে এ কথাও মনে হয় না। অবশ্য কালাপাহাড়ের ভয়ে জগন্নাথদেবকেও সময়ে সময়ে মন্দির ছেড়ে অন্যত্র লুকিয়ে থাকতে হয়েছে এ প্রবাদ আছে। কিন্তু কালাপাহাড় যদি জগন্নাথ মন্দিরের প্রাঙ্গনে ঢুকে বিভিন্ন মূর্ত্তি ভেঙে থাকেন তাহলে শুধু এই মূর্ত্তিটিই ভাঙা থাকতো না, আরও দুচারটি মূর্ত্তি ভাঙা অবস্থায় পাওয়া যেত। কিন্তু তা নেই। যদি বলা যায় যে ভাঙা মূর্ত্তিগুলি মেরামত হয়েছে বা তার জায়গায় নতুন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাহলে এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হবার কোনও কারণ ছিল না। এই মূর্ত্তিটির স্থানে একটি নতুন মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করে পূজো করা চলতো—সেটিকে আড়ালে রেখে আর একটি মূর্ত্তি সামনে প্রতিষ্ঠা করার কোনও প্রয়োজন হত না। সুতরাং মনে হয়, পিছনের মূর্ত্তিটি বর্ত্তমান স্থানে আসবার পর ভাঙে নি, অন্য জায়গায় ভাঙলে তার পর সেটিকে বর্ত্তমান মন্দিরে আনা হয়। আর সেটিকে গোপনে বজায় রাখবার জন্যই সামনে আড়াল করে ঐ রকম আর একটি মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল।

যদি এই অনুমান সত্য হয়, তাহলে একথা স্বীকার করতেই হয় যে পিছনের মূর্ত্তিটী বিশেষ আদৃত ছিল এবং ভেঙে গেলেও সেটীকে ফেলে দিতে কারও মন ওঠে নি। কিন্তু এই মূর্ত্তিটী কি? সামনের মূর্ত্তিটী এতই ছোট ও কদাকার যে সেটী কোনারকের প্রধান বিগ্রহ নয় তা সহজেই বলা চলে। শ্রীযুক্ত নির্ম্মলকুমার বসুও লিখেছেন যে এই "কদাকার ক্ষুদ্র সূর্য্যমূর্ত্তিকে কোনার্কের সিংহাসনে বসাইয়া কল্পনা করিতে কষ্ট হয়।" ষ্টার্লিং সাহেবও অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন। বিহার উড়িষ্যার ভূতপূর্ব্ব চীফ ইঞ্জিনিয়ার রায় বাহাদুর বিষণস্বরূপ তাঁর বই Konarak—The Black Pagoda of Orissaতে লিখেছেন In its front, however, another statue has been set up which is that of the sun with seven horses, but they keep it covered so shabbily with clothes etc. that nobody can say what god it represents, and it was only by having the cloth removed that it was found to be the statue of the sun. (Mr.

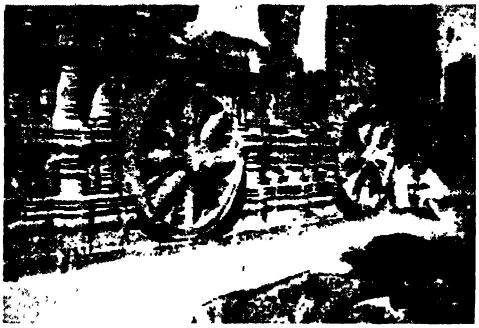


জগমোহনের একটী চাকা

O'malley was evidently informed of this statue when he says in his Gazetteer for the District of Puri that it is the statue of the sun on a chariot of seven horses. The workmanship of this statue is very inferior and it would never have been the

statue of Konaraka of the Black Pagoda). কিন্তু তাহলেই প্রশ্ন ওঠে, পিছনের মূর্ত্তিটাই কি কোনারকের মূর্ত্তি? এ প্রশ্নটা খুব অসঙ্গত নয়, কেননা পিছনের মূর্ত্তিটা কারুকার্য্যে বা চালচলনে কোনারক-মূর্ত্তি হওয়া বিচিত্র নয়।

এটাই কোনারকের মূর্ত্তি কিনা আলোচনা করার আগে তিনটা জিনিষ স্থির করা দরকার। প্রথম প্রশ্ন, কোনারকে পূজা হত

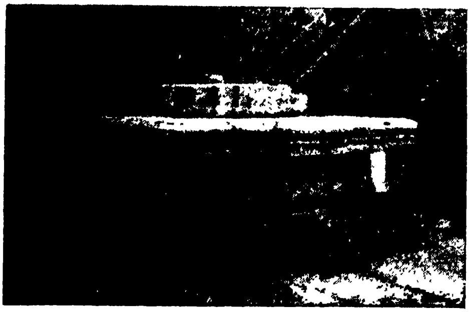


জগমোহনের চাকার অপর একটী দৃশ্য

কি না, হলে কি মূর্ত্তির পূজা হত। দ্বিতীয় প্রশ্ন, এই মূর্ত্তিটা কিসের মূর্ত্তি। তৃতীয় প্রশ্ন, এইটাই কোনারকের মূর্ত্তি কিনা। এ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞেরা বিশেষ আলোচনা করবেন। এখানে সাধারণ পাঠকদের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য মোটামুটি কিছু কিছু বিবরণ আলোচনা করাই সম্ভব।

কেউ কেউ বলেন, কোনারকে কোন সময়েই পূজা হয় নি। মন্দির গড়বার সময়ই কোন কারণে মন্দির ভেঙে পড়ায় তা পরিত্যক্ত হয়—মন্দিরে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠাই হয় নি। একথা সত্য বলে মনে হয় না। ইতিহাসের প্রমাণের কথা ছেড়ে দিলেও দেখা যায় সিংহাসনের উপরে স্থানে স্থানে কতকগুলি গোল দাগ আছে। বহুদিন ধরে কলসী বসানোতে যেরকম দাগ হওয়া সম্ভব এ দাগগুলি সেই ধরণের। জগন্নাথের রত্নবেদীতেও প্রণামীর টাকা সংগ্রহের কলসী এবং অন্যান্য কলসী দেখতে পাওয়া যায়। সুতরাং এই দাগগুলি হতে বোঝা যায় এখানে বহুদিন পূজা চলেছিল। তা ছাড়া আরও দেখা যায়, সিংহাসনের পূর্ব্বদিকে কিছু পদ্মলতার কারুকাজ ছিল, তাও কিছু কিছু মুছে গেছে। পুরীতে ভুষণ্ডী-কাক ও রত্নবেদীতেও দেখা যায় অবিরত স্পর্শের ফলে নক্‌সা এরকম ঘসে যাওয়া বা মুছে যাওয়া সম্ভব। শ্রীযুক্ত নির্ম্মলকুমার বসুর মতে "যাঁহারা বলেন মন্দিরে বিগ্রহ স্থাপনা বা পূজা হয় নাই, তাঁহাদের বিরুদ্ধে যাত্রীর হাতের স্পর্শে এই নক্‌সা উঠিয়া যাওয়া ও কলসীর দাগকে অকাট্য যুক্তি বলিয়া মনে হয়।"

কিন্তু কোনারকে কোন দেবতার অর্চ্চনা হত? এ নিয়েও তর্কের শেষ নেই। প্রচলিত মতে কোনারকের উপাস্য দেবতা সূর্য্য। কিন্তু কেউ কেউ মত প্রকাশ করেছেন, কোনারকের উপাস্য দেবতা ছিলেন বুদ্ধ। রায় বাহাদুর বিষণস্বরূপ প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন যে পুরীর পিছনের মূর্ত্তিটাই কোনারকের মূর্ত্তি। কিন্তু ও মূর্ত্তিটি বুদ্ধের, সুতরাং কোনারকের উপাস্য দেবতা বুদ্ধই :—What we are concerned with is the statue at the back, and this is the figure of Buddha in a sitting posture. The hands are broken and the lower portion of the statue built up in the pedestal of the sun statue in front. The workmanship is exactly what we have in chlorite statues at Konaraka. The pedestal of the statue will, it appears from what little measurements could be taken, fit on the upper Simhasana in the Black Pagoda. This statue finally settles in favour of the worship of Buddha at Konaraka, and any doubt remaining can be proved by the fact of there being within the enclosure of the Black Pagoda a temple of Mayadevi. Mayadevi, we know, was the mother of Gotama Buddha. I know of no Hindu Goddess that goes by that name. The question then presents itself, what was the name of the Buddhist divinity whom Shivites worshipped undert he name konarka? As the name konaraka occurs nowhere else in Hindu mythology, it appears probable that was the name of the Buddhist deity and was adopted by the Hindus when they took over the deity, taking the word to mean the 'corner sun' representing as has been explained above, Shiva in his form of the sun in the South-East corner. As the name of a Buddhist deity, the word konarka would stand for Gotama Buddha being the synonym of the word Arkabandhu (a relation of the sun) which is a name of the Great Reformer (Amarakosha, I. I. 10)...Here then we find an



প্রধান মন্দিরের গম্ভীরায় বিগ্রহের সিংহাসন। একটির উপর আর একটি বেদী লক্ষ্যণীয়। তলার বেদীটার এক জায়গায় নক্‌সা কাজের বদলে একখানি সাধারণ পাথর বসান হয়েছে

instance of the incorporation of Buddhism by the Hindus, in which the wholesale worship with the Buddhist deity has been taken over.

Even the name of the deity has been kept, only explained in a different way. This fact is the most important and interesting, as nowhere else in Orissa, and probably the whole of India has Buddhism obtained an unmixed entry into the Hindu ritual. In the Black Pagoda therefore we may expect better traces of Buddhism than in any other Hindu temple in Orissa. And such is the case. The big chlorite statues of the sun-god are all eminently of Buddhistic shape and cut, and except for the distinguishing marks, seven horses and lotus in both hands, can hardly be distinguished from standing statues of Buddhistic Gods. The numerous figures of Nagakanyas and Nagarajas which add so much grace to the ornamental detail of the temple are purely Buddhistic conceptions. The figure of Mahalakshmi on the chlorite linten of the door-ways of the Jagamohan is made exactly in the way the Buddhists made their goddess of fortune, as depicted on the gateway of Sanchi tope. প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু এতখানি স্পষ্টোক্তি না করলেও খানিকটা এই ধরণের ইঙ্গিত করেছেন। বৌদ্ধ উপাসনা যে কালক্রমে নানা স্থানে হিন্দু উপাসনায় নামান্তরিত হয়েছে এ বিষয়ে তাঁর অভিমত স্পষ্ট, আর পুরীর পিছনে ঐ মূর্ত্তিটী যে বুদ্ধ-মূর্ত্তি সে বিষয়েও তিনি নিঃসন্দেহ। তাঁর কথায়, Jagannatha generally passed for Buddha till the 41st anka (year) of the reign of Mukunda Deva of Utkala. And we have learnt from the pen of the Tibetan Lama Taranatha, a historian of Buddhism, that this Mukunda Deva was in reality a staunch and faithful worshipper of Buddha and was generally known by the name of "Dharma Raja." It was during his time that the notorious Kalapahara carried on his formidable crusade against Hinduism and Buddhism ; and it was with the close of his long reign that the Buddhists began to pass their lives in concealment and seclusion. Behind the temple which now generally passes as the Temple of Suryya Narayana, and situated within the very precincts of the famous temple of Jagannatha, is a gigantic statue in stone of Buddha sitting in the Bhumisparsca mudra. Strange to say, a massive wall has been built up just in front of the statue, completely obstructing the view of it from outside. This statue, which could have otherwise spoken volumes of past history, has all along remained a sealed book to the majority of observers and visitors. We have, however, come to know, as the result of a very sifting investigation, that this temple dedicated to Buddha is much older than the chief temple of Jagannatha itself. It is not at all improbable that upon the close of the career of Raja Mukunda Deva, the obstructing wall was built up to hide the statue from the public eye ; and it may also be the case that the tradition of the image of Jagannatha as Buddha being hidden from view, date its origin from this time. (Archeological Survey of Mayurbhanj, p ccxliii). কিন্তু এই ধরণের যুক্তি সহজে গ্রহণ করা যায় না। বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্ম্মের সংমিশ্রণ উড়িষ্যায় ঘটে থাকলেও কোনারকের উপাস্য দেবতা যে বুদ্ধই—একথা জোর করে বলা চলে না। পুরীর মূর্ত্তিটি যে বুদ্ধমূর্ত্তি সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। নির্ম্মলকুমার বসু বলেন "এই মূর্ত্তিটিকে নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি বলিয়া ঠিক করিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। মূর্ত্তিটির হাত আদৌ দেখা যায় না।···পুরীতে যেকালে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রভাবান্বিত ছিল, সেকালের তৈয়ারী কোনও মূর্ত্তি আছে বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই। তাহার উপর যাজপুর ও কটকের অলতি পাহাড়ের নিকটে বৌদ্ধযুগের যে সকল মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে তাহাদের গঠন এই মূর্ত্তির গঠন হইতে অনেক বিভিন্ন। যদি পুরীর মূর্ত্তির শৈলী দেখিয়া ইহার তারিখ নির্দ্ধারণ করিতে হয়, তবে ইহাকে কোনারকের যুগে আনিতে হইবে।" কিন্তু বিষণ স্বরূপের অপর যুক্তিতেও ত্রুটি আছে। কোনারকের বড় দেউলের গম্ভীরায় দ্বিতীয় সিংহাসনের উপর যে দাগ আছে পুরীর মূর্ত্তিটির আয়তন সে দাগের সঙ্গে মেলে কিনা সন্দেহ। তা ছাড়া কোনারকের মূর্ত্তিগুলি (সূর্য্যের বড় মূর্ত্তিগুলি) সবুজ পাথরের, কিন্তু প্রদীপের আলোয় যতদূর বোঝা যায় এ মূর্ত্তিটি কালো পাথরের। কাজেই নির্মাণ কৌশল ও গঠন শৈলী যদিবা এক হয়, পাথর এক নয় বলেই মনে হয়। তা ছাড়া এই মূর্ত্তির আসনটি দেওয়ালে আটকানো থাকায় সপ্তাশ্ব ও অরুণ আছে কিনা জানবার উপায় নেই। যদি তা থাকে তাহলে এটি 'বিষণ-স্বরূপ কথিত বুদ্ধমূর্ত্তি নয়। সেক্ষেত্রে এটি সূর্য্যমূর্ত্তিই প্রমাণিত হবে।

উড়িষ্যায় বুদ্ধপূজা বা বৌদ্ধপ্রভাব এককালে যতই থাক না কেন, কোনারকের উপাস্য দেবতা ছিলেন বুদ্ধ এবং পরে তিনি সূর্য্যে নামান্তরিত হন, এ কল্পনা বোধ হয় কষ্টকল্পনা। কোনারকের মন্দির কারও কারও মতে একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে তৈরী ; নির্ম্মলকুমার বসু সিদ্ধান্ত করেছেন যে "আমরা কোনার্কের বর্ত্তমান মন্দির ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি তৈয়ারী হইয়াছে জানিয়াই খুসী হইব।" ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনরুত্থান কল্পনা করাই স্বাভাবিক। তা ছাড়া কোনারক মন্দিরের গায়ের মূর্ত্তিগুলি সূর্য্যমূর্ত্তি-ই, বুদ্ধমূর্ত্তি নয়। এক্ষেত্রে উপাস্য দেবতাও যে সূর্য্যই একথা মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

তা ছাড়া ১৬২৭ সালে পুরীর রাজা নরসিংহদেব কোনারকের মন্দির দেখতে যান। তাঁর বিবরণেও জানতে পারা যায়, কোনারকের উপাস্য দেবতা ছিলেন 'মইত্রাদিত্য বীরঞ্চিদেব' কিন্তু এই মিত্রাদিত্য মুসলমানদের ভয়ে শ্রীপুরুষোত্তম দেউলে, নীলাদ্রিমহোৎসবের দেউলে চলে গিয়েছিলেন। সুতরাং কোনারকের পূজিত দেবতা সূর্য্যই, সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহের কারণ আছে মনে হয় না।

কিন্তু তাহলেও প্রশ্ন থেকে যায়, পুরীর মূর্ত্তিটিই কোনারকের মূর্ত্তি কি না। পূর্ব্বেই বলেছি এটি যে বুদ্ধমূর্ত্তি তা জোর করে বলা যায় না, বরং এটি যে সূর্য্যমূর্ত্তি সে কথা বিশ্বাস করারই বেশী কারণ আছে। সম্প্রতি একটি বইয়ে লেখা হয়েছে এটি ইন্দ্রমূর্ত্তি। (Puri by Rai Bahadur Chintamoni Acharyya) কিন্তু এ মত জনশ্রুতির উপর প্রতিষ্ঠিত, এর কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। বিশেষতঃ পুরোহিতরা এই মূর্ত্তিটিকে কখনও ইন্দ্র—কখনও বুদ্ধ—কখনও বর্হরাজ বলে থাকে—এর কোনও স্থিরতা নেই। সব দিক্ আলোচনা করলে মনে হয়, কয়েকটা বিষয়ে আমরা মোটামুটি সিদ্ধান্ত করতে পারি :—

(১) কোনারকের মন্দির হতে জিনিষপত্র জগন্নাথের মন্দিরে আনা বিরল নয়। সিংহদ্বারের অরুণ স্তম্ভটিও কোনারক হতে আনা। তা ছাড়া কোনারকের দেবতা পুরী চলে গিয়েছিলেন, ১৬২৭ সালেও এ কথা বলা হয়েছে। সে হিসেবে জগন্নাথ মন্দিরে কোনারকের বিগ্রহের সন্ধান পাওয়া আশ্চর্য্য নয়।

(২) পুরীর মূর্ত্তিটি যদি গঠন-শৈলীতে কোনারকের যুগের হয় এবং সূর্য্যমূর্ত্তি হয় তা হলে এইটিই কোনারকের বিগ্রহ হওয়া আশ্চর্য্য নয়। এ সম্বন্ধে নির্ম্মলকুমার বসুর সিদ্ধান্ত উল্লেখযোগ্য। তিনি এটিকেই কোনারকের বিগ্রহ বলার পক্ষপাতী, কিন্তু দুএকটি বাধাও আছে। তিনি বলেন যে মূর্ত্তিটির আয়তন কোনারকের রত্নবেদীর দাগের সঙ্গে ঠিক মেলে না, আবার মূর্ত্তিটির বেদীর আয়তনও কোনারকের রত্নবেদীর দাগের সঙ্গে মেলে না। তা ছাড়া কোনারকের মূর্ত্তিদের মত এই মূর্ত্তিটিতে কোনও সনাল পদ্ম নেই। এক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত বসুর মতে যদি মূর্ত্তির সামনের দেওয়ালটি ভেঙে ফেলা যায় ও পায়ের কাছে সপ্তাশ্ব ও অরুণ পাওয়া যায় তাহলে এইটিই কোনারকের প্রধান মূর্ত্তি এই সিদ্ধান্ত করা চলে। যদি সপ্তাশ্ব ও অরুণ না থাকে তা হলে এটি স্বতন্ত্র মূর্ত্তি, এমন কি অন্য দেবতার মূর্ত্তি হতে পারে। আমার নিজের মনে হয় এই প্রসঙ্গে আরও দু একটি কথা বিবেচনা করা যেতে পারে। প্রথমতঃ কোনারকের সূর্য্যমূর্ত্তিগুলি সাধারণতঃ সবুজ পাথরের, কিন্তু এটি কালো পাথরের। দ্বিতীয়তঃ, কোনারকের মূর্ত্তিগুলি সবই দাঁড়ানো মূর্ত্তি, একটি অশ্বারূঢ় মূর্ত্তি। কিন্তু পুরীর মূর্ত্তিটি উপবিষ্ট। গম্ভীরার রত্নবেদীর সামনে দাঁড়ালে কি ধরণের মূর্ত্তি কল্পনা করা সহজ হয়? রত্নবেদীটিই যথেষ্ট উঁচু, তার উপর আবার বেদী, তার উপর উপবিষ্ট মূর্ত্তিই বেশী মানায়, না শুধু দাঁড়ানো মূর্ত্তি বেশী মানায়—বিশেষতঃ গম্ভীরার উচ্চতার কথা মনে করলে। অবশ্য এ সবই অনুমান, এর কোনও প্রমাণ নেই। যতক্ষণ পর্য্যন্ত এ বিষয়ে কোনও স্থির সিদ্ধান্ত না হবে ততক্ষণ নানা অনুমান নানা জল্পনা কল্পনা চলবেই। কোনারক যেমন আজ অতল রহস্যে আবৃত হয়ে শুধু অপূর্ব্ব শিল্পকলার সাক্ষী হিসেবে পড়ে আছে, তেমনি জগন্নাথ মন্দির-প্রাঙ্গনের মূর্ত্তিটিও অতল রহস্যে আবৃত হয়ে লোকের কৌতূহল জাগাতে থাকবে।

স্বদেশপ্রেমিক নেপালচন্দ্র রায়

রায়বাহাদুর অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ

নেপালচন্দ্র রায় পরিণত বয়সেই পরলোকগমন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার বিস্তৃত কর্মক্ষেত্রে বহুদিন পর্যন্ত তাঁহার অভাব অনুভূত হইবে। তাঁহার কর্মশক্তি শেষ পর্যন্ত যুবকের ন্যায় ছিল। শারীরিক ব্যাধি ও বাধা তাঁহার অপরিমিত উদ্যমকে কখনও ম্লান করিতে পারে নাই।

আমরা তাঁহাকে যৌবনে দেখিয়াছি—অর্থাৎ তিনি যখন সিটি কলেজ স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন—তখন তাঁহার অদম্য উৎসাহ দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। আমরা এক 'মেসে' বাস করিতাম। আমরা ছাত্র, তিনি শিক্ষক। স্বভাবতঃই আমরা তাঁহাকে সমীহ করিয়া চলিতাম। কিন্তু আমাদের শ্রদ্ধা অকৃত্রিম ভালবাসায় পরিণত হইয়াছিল তাঁহার স্বভাব-গুণে। তিনি আমাদের সঙ্গে মিশিতেন মন খুলিয়া। তাঁহার হাসিতে ছিল শিশুর নিষ্কলুষ সরলতা, আর তাঁহার রুচি ছিল একান্ত উদার। কাজেই তিনি সকলেরই প্রিয়পাত্র হইতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার আদর্শ ছিল উচ্চ। আমরা ততদূর পৌঁছিতে না পারিলেও তাঁহাকে অনুসরণ করার মধ্যে আনন্দ উপলব্ধি করিতে পারিতাম। যে কোনও প্রশ্ন আমাদের মধ্যে উত্থিত হউক—মেসের ছেলেদের মধ্যে তর্ক বিতর্ক লাগিয়াই থাকে এবং হেন সমস্যা নাই যাহা তাহাদের গণ্ডীর বাহিরে—নেপালবাবুর দৃষ্টি ভঙ্গী আমাদের তর্কের মীমাংসায় সহায়তা করিত। অনেক ক্ষেত্রে দেখিয়াছি তাঁহার উচ্চ হাস্যে আমাদের সমস্ত আসন্ন মনোমালিন্য দূর হইয়া যাইত। নেপালবাবু ছিলেন ব্রাহ্ম মতের অনুকূল। অনেক সময় তাঁহাকে তাহা লইয়া বিদ্রূপ করিলে তিনি সে সকল হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারিতেন। তিনি সমাজ সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন। আমরা সব সময়ে তাঁহার আদর্শের নাগাল পাইতাম না। কিন্তু তাহা হইলেও একদিনের জন্য তাঁহার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ক্ষুণ্ণ হইতে পারে নাই। আমাদের 'মেসে'র কেহই বড় থিয়েটার প্রভৃতি তামাসায় যোগদান করিত না। নেপালবাবুর আদর্শই এ-বিষয়ে আমাদের অনুকরণীয় ছিল। আমাদের নৈতিক সংস্কৃতির যাহাতে প্রসার হয়, তাহার জন্য তিনি অত্যন্ত সচেষ্ট ছিলেন।

মনীষী শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে তিনি একদিন নিমন্ত্রণ করিয়া আমাদের 'মেসে' আনিয়াছিলেন এবং তাঁহার উপদেশ ও সারগর্ভ বক্তৃতা শুনিয়া আমরা—ছাত্রেরা অত্যন্ত তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলাম। সে সময়ে ব্রাহ্ম সমাজে মেয়েদের গান গাহিবার প্রথা প্রথম সুরু হইতেছিল। শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট এ সম্বন্ধে আমরা আমাদের আপত্তি জ্ঞাপন করি। আমরা বলিয়াছিলাম (যতদূর স্মরণ হয়) যে, ব্রাহ্মসমাজ-মন্দির প্রশস্ত জনাকীর্ণ রাজপথের ধারে অবস্থিত ; বহুলোক রমণী কণ্ঠের মোহে আকৃষ্ট হইয়া হয়ত মন্দিরে প্রবেশ করিবে যাহাদের মধ্যে কোনও আধ্যাত্মিক ভাবই হয়ত নাই। এই শ্রেণীর লোক যত ব্রাহ্মমন্দিরে না প্রবেশ করে, ততই ভাল নয়

কি? নেপালবাবু আমাদের এই সমস্তার সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন নাই। শাস্ত্রী মহাশয় আসিয়া আমাদের সঙ্গে তর্ক করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, রমণী-কণ্ঠের গানে আকৃষ্ট হইয়া দিন কতক হয়ত বাজে লোক ভীড় করিবে কিন্তু ক্রমে উহা সহিয়া যাইবে তখন আর ভীড় করিবে না। বাঙ্গালী সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েদের মধ্যে সঙ্গীত সম্বন্ধে যে প্রীতি ও উৎসাহ দেখা যাইতেছে, উহাকে অস্বীকার করা চলিবে না। অন্তঃপুরের চতুঃসীমার মধ্যে তাহাকে চিরদিন আবদ্ধ করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলেও তাহা সফল হইবে না, আর এরূপ চেষ্টা বাঞ্ছনীয়ও নহে। শাস্ত্রী মহাশয়ের কথা তখনই আমরা যে মানিয়া লইতে পারিয়াছিলাম, তাহা নহে। কিন্তু তাঁহার মত যে ঠিক ছিল তাহার প্রমাণ বর্ত্তমান কাল প্রচুর পরিমাণে দিতেছে।

নেপালবাবুর উদারতা যে অত্যন্ত আন্তরিক ছিল, তাহা আমরা সকলেই অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতাম। শুধু কথার জাল বুনিয়া মানুষের চিত্তকে বেশিদিন ভুলাইয়া রাখা যায় না। নেপালবাবু সর্বান্তঃকরণে বুঝিয়াছিলেন যে সত্যই শেষ পর্যন্ত জয় লাভ করে; ধর্ম কখনও চিরদিন অধর্মের দ্বারা লাঞ্ছিত হইতে পারে না। তাঁহার এই **optimism** বা ভরসাবাদ আমাদের মধ্যেও তিনি সংক্রামিত করিতে পারিয়াছিলেন। একটি বিষয়ে বিশেষভাবে তাঁহাকে আমরা শ্রদ্ধা করিতে পারিতাম—সে হইতেছে তাঁহার যুক্তিপ্রিয়তা—**Rationalism**, ইহার জন্য তিনি সমস্ত গোঁড়ামির হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি নিয়মিত ভাবে ব্রাহ্ম সমাজে যাইতেন, ব্রাহ্মদের উপাসনায় যোগদান করিতেন, তাঁহাদের সহিত সর্বতোভাবে সহানুভূতি-সম্পন্ন ছিলেন। কিন্তু সেজন্য তিনি অন্য সকলকে ঘৃণা করিতেন না বা ব্রাহ্মদের মধ্যে দোষ দেখিলে তাহারও সমর্থন করিতেন না। আমাদের এক বন্ধু অনাদিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন অত্যন্ত রহস্যপ্রিয়। তিনি পরে লক্ষ্মীপাশা স্কুলে হেড মাষ্টার হইয়াছিলেন। রহস্য বিষয়ে তাঁহার এমনই মৌলিক প্রতিভা ছিল যে সেরূপ সচরাচর দেখা যায় না। অনাদিনাথ দুই একদিন ব্রাহ্ম সমাজে গিয়া ব্রাহ্মদের উপাসনাপদ্ধতির হুবহু বিদ্রূপাত্মক অনুকরণ (**Parody**) করিতে আরম্ভ করিল। তাহার এই অভিনয় যিনি দেখিয়াছেন, তিনিই বিস্মিত না হইয়া পারেন নাই। শ্লেষ নাই, নিন্দা নাই, ধর্মের প্রতি কিঞ্চিন্মাত্রও কটাক্ষ নাই, অথচ বিশুদ্ধ আনন্দপ্রদ কৌতুক। মনে পড়ে রসরাজ অমৃতলাল বসু একবার 'বন্দে মাতরমে'র প্যারডি করিয়া লিখিয়াছিলেন 'দ্বন্দে মাতনম্'। নির্বাচন দ্বন্দ্ব লইয়াই তিনি এই নির্দোষ বিদ্রূপ করিয়াছিলেন। অনাদিনাথের বিদ্রূপ সেই ধরণের। নেপালবাবু আগ্রহ সহকারে ইহা শুনিতেন এবং উচ্চ হাস্যে অভিনেতাকে অভিনন্দন করিতেন। তাঁহার বন্ধুবান্ধবকেও শুনাইবার জন্য অনাদিনাথকে পীড়াপীড়ি করিতেন। আমাদের পাশের বাড়ীতে বিখ্যাত ব্রাহ্মগায়ক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী বাস করিতেন। তিনি এবং তাঁহার স্ত্রী, কন্যা প্রভৃতি অলক্ষে ছাদে দাঁড়াইয়া অনাদিনাথের এই প্যারডি শুনিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

নেপালবাবু সমস্ত সৎকর্মের সহায় ছিলেন এবং যথাসাধ্য সকল কার্যেই যোগ দিতেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার অভিমান ছিল না একটুও। বস্তুতঃ তাঁহার এই অভিমানবর্জিত স্বদেশ-সেবাব্রত তাঁহাকে সকলের নিকট প্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি কংগ্রেসের একজন বিশিষ্ট সমর্থক ছিলেন। পরে যখন হিন্দু মহাসভা বাংলা দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিল, তখন তিনি তাঁহার সমস্ত কর্মশক্তি ইহার সেবায় নিয়োজিত করিলেন। মাধ্যমিক শিক্ষা বিল সম্বন্ধে যে দেশময় আন্দোলন হইয়াছিল তাহাতে তিনি একটি প্রধান অংশ লইয়াছিলেন। প্রতিষ্ঠা বা প্রাধান্যের জন্য তাঁহার কোনও আকাঙ্ক্ষা দেখি নাই। এরূপ আত্মভোলা সেবাব্রত সকলের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ এইরূপ সেবার দ্বারাই দেশের প্রকৃত উন্নতি লভ্য হয়।

তিনি সকল বিষয়েই আত্মভোলা ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। নিজের বৈষয়িক ব্যাপারে এমন কি আহারের বিষয়ও তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। 'মেসে' তিনি রাত্রে প্রায়ই সকলের পরে ভোজন করিতেন। তখন হয়ত অনেক জিনিষ ফুরাইয়া যাইত। কিন্তু নেপালবাবু যাহা পাইতেন, তাহাতেই খুসী হইতেন। একদিনকার ঘটনা মনে পড়ে। তখন আমাদের বাসায় এক ব্রাহ্মণ বিধবা রন্ধন করিতেন। নেপালবাবু খাইতে বসিয়া দেখিলেন যে মাংসের অবশেষ কয়েকটি আলু মাত্র তাঁহার পাত্রে রহিয়াছে। নেপালবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "বামুন ঠাক্‌রুণ, মাংস কই? এ যে শুধু আলু!" বামুন ঠাক্‌রুণ উত্তর করিল "বাবু, তুমি যে আলু ভালবাস।" নেপালবাবু উচ্চ হাস্য করিয়া তাঁহার বাক্‌কৌশলের প্রশংসা করিলেন! (আমার 'মুদ্রাদোষে' বহুকাল পূর্বে এই ঘটনার উল্লেখ করিয়াছি।) এইরূপই তাঁহার স্বভাব ছিল। নিজের কোনও বিষয়েই তাঁহার খেয়াল ছিল না। অথচ সকল দেশহিতকর ব্যাপারের তিনি ছিলেন একজন একনিষ্ঠ কর্মী।

কিন্তু এই কোমল স্বভাবের মধ্যেও একটি বিষয়ে তাঁহার তেজ ছিল অসাধারণ। অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার তিনি কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেন না। অন্যায়ের প্রতিবাদকল্পে তিনি ক্ষতিকে ক্ষতি বলিয়া গণ্য করিতেন না। কোনও কারণেই তিনি অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার বা দুর্নীতির সহিত সন্ধি করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। আমার মনে হয়, তাঁহার চরিত্রের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল ইহাই। এমন অভিমানশূন্য, স্বার্থলেশবর্জিত নিষ্কলুষ চরিত্র আমি অধিক দেখি নাই। এই জন্যই সকলের অকুণ্ঠশ্রদ্ধা তিনি অর্জন করিতে পারিয়াছিলেন।

তিনি এবং তাঁহার ভ্রাতারা সকলেই কৃতী, সকলেই কৃতবিদ্য ছিলেন। কিন্তু নেপালবাবুকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া তাঁহারা যে সম্মান করিতেন, তাহার তুলনা বড় দেখিতে পাওয়া যায় না।

রবীন্দ্রনাথের সংসর্গে আসিয়া নেপালচন্দ্রের যে আধ্যাত্মিক প্রসার হইয়াছিল, তাহাও অত্যন্ত মূল্যবান। আমি শান্তিনিকেতনে গিয়া তাঁহার কার্যকলাপ দেখিয়াছি। তিনি সিটি কলেজ স্কুল হইতে বিশ্বভারতীর একজন সাধারণ শিক্ষকরূপে যোগদান করিয়াছিলেন। এখানে তিনি সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং কিছুদিন বিশ্বভারতীর অধ্যক্ষ মনোনীত হইয়া তাঁহার কর্মশক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মুখেও তাঁহার প্রশংসা শুনিয়াছি। কিন্তু এখানেও লক্ষ্য করিবার বস্তু এই যে তাঁহার মধ্যে কিছুমাত্র অভিমান দেখা যায় নাই। ইতিহাস ও ভূগোল সম্বন্ধে তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। এ বিষয়ে তিনি অনেক পাঠ্যপুস্তক রচনা করিয়া প্রভূত যশঃ লাভ করিয়াছিলেন।

তাঁহার বন্ধুবাৎসল্য সম্বন্ধে কিছু বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। বন্ধুমহলে নেপালবাবু ছিলেন প্রতিদ্বন্দ্বীরহিত। বন্ধুজনের সেবা তিনি যেমন অকাতরভাবে করিতেন, বন্ধুরাও তাঁহাকে নিতান্ত আপনার জন বলিয়া মনে করিত। বন্ধুদের আহ্বান তাঁহাকে কখনও উপেক্ষা করিতে দেখি নাই। তিনি তাহাদের উৎসাহবর্দ্ধনে কখনও কৃপণতা করিতেন না। আমি বর্দ্ধমান বিভাগের স্কুলপরিদর্শক হিসাবে চণ্ডীদাসের নান্নুরে একটি পাঠাগার-উদ্বোধনে গিয়াছিলাম। নেপালবাবু শান্তিনিকেতন হইতে আসিয়াছিলেন সেই অনুষ্ঠানে যোগদান করিবার জন্য। পণ্ডিত বিধুশেখর (পরে মহামহোপাধ্যায়), জগদানন্দ রায়, এবং (সম্ভবতঃ) অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেনও তাঁহার সহিত আসিয়াছিলেন। গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে বার মাইল পথ অতিক্রম করিয়া এই উৎসবে তাঁহার আগমন যে আমার প্রতি অনুগ্রহের ফল, ইহা আমি অনুভব করিয়াছিলাম, বন্ধুপ্রীতির এই নিদর্শনে আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম, তাই এখানে ইহার উল্লেখ করিলাম।

নেপালচন্দ্র অমর ধামে চলিয়া গিয়াছেন। সেখানে তাঁহার আত্মা সর্বতোভাবে সাধনোচিত তৃপ্তি ও শান্তিলাভ করুক, ইহাই প্রার্থনা করি।

উপনিবেশ

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

বর্মী মেয়েকে কদিন ধরিয়া আর দেখা যায় নাই। তার জন্ত দোষ অবশু বর্মী মেয়ের নয়। সেদিনকার সেই ব্যাপারের পর মণিমোহন আর গ্রামের দিকে পা বাড়ায় নাই।

সমস্ত মনটা তাহার দিন কয়েক কেমন আচ্ছন্ন হইয়াছিল, অত্যন্ত অশুচি বোধ হইয়াছিল নিজেকে। কিন্তু ধীরে ধীরে আত্মস্থ হইয়া উঠিতেছে মণিমোহন। গভীর রাত্রে ঘুম ভাঙিয়া গেলে বজরার জানালা দিয়া যখন হলদে চাঁদের আলো আসিয়া মুখে পড়ে, আর নদীর উপর দিয়া গাঙ্-শালিকের চীৎকার তীক্ষ্ণ আর করুণ হইয়া ভাসিয়া যায়, তখন মণিমোহনের যাহাকে মনে পড়ে, আশ্চর্য এই যে রাণী সে নয়। অধঃতন্দ্রার মধ্যে মণিমোহন যেন দেখিতে পায় কাহার ছুটি নীল গভীর চোখ আবেশে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছে, সাপের মতো বেণী-করা কাহার চুল তাহার চোখে মুখে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। একটা স্বেদাক্ত দেহের দৃঢ় কোমল বন্ধন তাহার সর্বাঙ্গ নিবিড় করিয়া ঘিরিয়া আছে যেন—তাহার চুলের গন্ধ, তাহার মুখের মিষ্টি গন্ধ, তাহার ঘামের গন্ধ তাহাকে ক্লোরোফর্মের মতো অচেতন করিয়া ফেলিতেছে।

তন্দ্রা টুটিয়া যায়। বজরার মধ্যে লঘু অন্ধকার। গোপীনাথের নাক ডাকিতেছে। চুলের গন্ধ নয়—জল ও ভিজা মাটির সোঁদা গন্ধ ছড়াইয়া যাইতেছে বাতাসে। দূরে তেঁতুলিয়ার বুকে পাড়ি ধরিয়া কোনো মাঝি ভাটিয়ালির সুর তুলিয়াছে:

"রজনী আন্ধার ঘোর মেঘ আসে ধাইয়া,
পার কর নাইয়া—"

গঞ্জালেস্ চাটগাঁয়ে ফিরিল বটে, কিন্তু কবির ভাষায়, গোটা মনটা লইয়া সে ফিরিতে পারিল না। আধখানা তাহাকে রাখিয়া আসিতে হইল চবুইস্‌মাইলে। গঞ্জালেস্‌কে শনিতে পাইল বলিলেই কথাটা ঠিক করিয়া বলা হয়।

এতদিন তো কাটিতেছিল বেশ। আর যাই হোক নারী-সম্পর্কিত অভাব বোধটা গঞ্জালেসের ছিল না। অর্থ শুদ্ধেই দৈহিক দাবীটা মিটিতেছিল, দেহের নিতান্ত স্থূল দিক ছাড়া মেয়েদের আর কোনো প্রয়োজন আছে এ কথা গঞ্জালেসের কখনো মনে হয় নাই। অন্তত উত্তরাধিকার-সূত্রে আর কিছু না পাইলেও পৈতৃক এই মনোভাবটা সে আয়ত্ত করিয়াছিল। বিবাহ করিয়া তাহার দায় টানিয়া চলা—এটাকে নির্বোধের বিড়ম্বনা বলিয়াই তাহার মনে হইয়াছিল এতকাল, কিন্তু অকস্মাৎ যেন গঞ্জালেসের ভ্রম ভাঙিল।

আর সেটাকে প্রথম আবিষ্কার করিল তাহার বন্ধু পেরিরা।

সহরের বাহিরে ছোট একটা বাড়ি করিয়া লইয়াছিল গঞ্জালেস্। নারিকেলের কুঞ্জে ঘেরা—নিরালা এবং নিভৃত। একটু দূরেই কর্ণফুলী। জাহাজ ঘাটের কালো কালো ধোঁয়াগুলি এখান হইতে দেখা গেলেও মোটের উপর জায়গাটি নিরিবিলি এবং নিভৃত।

ছুপুর বেলায় পেরিরা আসিয়া দেখিল, বাহিরের ঘর খোলা, কিন্তু গঞ্জালেস্ নাই। পেরিরা ভিতরে ঢুকিল, কিন্তু গঞ্জালেস্ সেখানেও নাই। এই ছুপুরবেলায় ঘর-ছুয়ার সব খোলা রাখিয়া লোকটা গেল কোথায়?

এমনি সময় মুসলমান বাবুর্চিটির সঙ্গে দেখা হইল। পেরিরা তাহাকে প্রশ্ন করিল, সাহেব কোথায়?

বাবুর্চি মৃদু হাসিয়া জবাব দিল, বাগানে।

—বাগানে? বাগানে কী করছে?

বাবুর্চির মৃদু হাসিটা আর একটু স্পষ্ট হইয়া উঠিল। দাড়ির ফাঁকে শাদা দাঁতগুলি ঝকঝক করিয়া উঠিল তাহার। বলিল, গাছে চড়ছে।

—গাছে চড়ছে! সে কী!

—যান্,—দেখুন না, বাবুর্চি প্রস্থান করিল।

গাছে চড়িতেছে এই ভর ছুপুরবেলায়। লোকটার কি মাথা খারাপ হইয়াছে নাকি! না অতিরিক্ত খানিকটা ব্র্যাণ্ডি গিলিয়া যা খুসি তাই করিতে সুরু করিয়াছে! পেরিরা ছুটিয়াই বাগানে গেল।

কোথাও কেহ নাই। পেরিরা চীৎকার করিয়া ডাকিল, স্তামুয়েল!

অন্তরীক্ষ হইতে সাড়া আসিল, এই যে!

—অ্যাঁ, তাই তো। পেরিরা নিজের চোখ ছুইটাকে বিশ্বাস করিতে পারিল না—বাবুর্চি তাহা হইলে বানাইয়া বলে নাই এক বিন্দুও! নারিকেল গাছের মাথায় বসিয়া আছে গঞ্জালেস্। মুখের ভাব অত্যন্ত গর্বিত এবং প্রসন্ন—যেন কেহ তাহাকে দিল্লীর তখ্‌ত-তাউসে বসাইয়া দিয়াছে। কিন্তু ব্যাপার দেখিয়া পেরিরার শূলে চড়ানোর মতোই বোধ হইল।

—আরে পাগল নাকি! এই ছুপুরবেলা নারকেল গাছে? নামো, নামো।

স্তামুয়েল সামান্ত অপ্রতিভ বোধ করিল। বহু কষ্টে টানা-হেঁচড়া করিয়া মাটিতে পদার্পণ করিল সে। অনভ্যাসের ফলে সার্টটা ছিঁড়িয়া গিয়াছে অনেকখানি। ছাল ছড়িয়া তিন চার জায়গা হইতে রক্ত পড়িতেছে। কিন্তু সেদিকে তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই, মুখে পরিতৃপ্ত প্রসন্নতার হাসিটি আঁঠার মতো লাগিয়া আছে।

পেরিরা হাঁ করিয়া তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল। তাহার পর খানিকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিল, ব্যাপার কি তোমার? হঠাৎ এই ভাবে গাছে চড়তে সুরু করেছ, গাঁজা খাচ্ছ নাকি আজকাল?

—না, গাঁজা খাচ্ছি না। স্তামুয়েলের কণ্ঠস্বর অপ্রসন্ন শুনাইল, অভ্যাস করছি।

—অভ্যাস করছ! এত অভ্যাস থাকতে গাছে চড়া?

—ওসব তুমি বুঝবে না—পেরিরার কাঁধে একটা থাবড়া দিয়া গঞ্জালেস্ তাহাকে বাড়ির মধ্যে লইয়া আসিল, কী বলে একটু

ব্যায়াম করে নিলাম আর কি। গাছে চড়া স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব ভালো জিনিস।

—কিন্তু এই দুপুর বেলা ?

—এসো এসো, চা খাওয়া যাক এক পেয়ালা।

নারিকেল গাছে ওঠা লইয়াই ব্যাপারটা আরম্ভ হইল, কিন্তু শেষ হইল না। দিনের পর দিন গঞ্জালেসের পরিবর্তন সুরু হইল। বাহির আর নয়—এবার ঘর। লিসির তামাটে আরাকানী মুখখানা যখন তখন আসিয়া স্বপ্ন-সঞ্চার করিয়া যায়। কাজকর্মে আলস্য আসিয়াছে। জাহাজের খোল বোঝাই করিয়া শুঁট্‌কি মাছ তুলিয়া দিতে গিয়া গঞ্জালেস্‌ লিসির কথা ভাবিতে সুরু করে, বস্তা গণিতে ভুল হইয়া যায়। পেরিরা আসিয়া সন্ধ্যার আড্ডায় যাওয়ার জন্ম টানাটানি করে কিন্তু তাহাকে নড়াইতে পারে না।

বলে, কী ব্যাপার ? যাবে না ?

গঞ্জালেস্‌ সংক্ষেপে বলে, উঁহু।

—কেন ? রাতারাতি সুবুদ্ধি চাড়া দিল নাকি ? সেণ্ট্‌ জন হওয়ার মতলবে আছ ? জেরুজালেমে রওনা হচ্ছ নাকি ?

পরিহাসে বর্মচর্ম ভেদ হয় না। ততোধিক সংক্ষেপে গঞ্জালেস্‌ জবাব দেয়—হুঁ।

পেরিরা নিরাশ হইয়া যায়। কী যেন হইয়াছে লোকটার আধি-ব্যাধি কিছু নয় তো ? কিন্তু ভাব দেখিয়া তা তো মনে হয় না। খাওয়ার সময় বরং ডবল পরিমাণে গিলিতে সুরু করিয়াছে আজকাল। তবে কি মাথা খারাপ হইয়া গেল ? ভাবিয়া অত্যন্ত মনঃকষ্ট বোধ করে পেরিরা।

নাঃ, আর দেরী করা ঠিক নয়। গঞ্জালেস্‌ অধীর হইয়া উঠিল। যেমন করিয়া হোক লিসিকে আনিতেই হইবে। কাজ-কর্ম সব গোল্লায় যাইতেছে—লোকজন যাহারা কাজ করে তাহারা চুরি-চামারি করিতেছে আপ্রাণ। সর্বোপরি তাহাকে পাগল ভাবিয়া পেরিরা যে সব কাণ্ড করিতে সুরু করিয়াছে, তাহাতে গঞ্জালেসের মাথায় খুন চাপিয়া যায় একরকম।

কথা নাই বার্তা নাই, পেরিরা আসিয়া গঞ্জালেসকে টানিয়া বাহির করিল। বলিল, আজ রবিবার, চলো গীর্জায় যাই।

—গীর্জা ? এবার হাঁ করিবার পালা গঞ্জালেসের! পেরিরা গীর্জায় যাইতে চায়—ইহাও এ জন্মে তাহাকে দেখিতে হইল। গঞ্জালেস্‌ বলিল, গীর্জায় !

—হাঁ, হাঁ, গীর্জায়। চল না।

খানিকটা বিস্ময় এবং কিছুটা কৌতুক বোধ করিয়া গঞ্জালেস্‌ গীর্জায় নামিল। প্রার্থনা ইত্যাদির ব্যাপার শেষ হইলে ফাদার আসিয়া গঞ্জালেস ও পেরিরাকে পাশের একটা ছোট ঘরে ডাকিয়া লইয়া গেলেন।

গঞ্জালেসের সবই কেমন রহস্যময় বোধ হইতেছিল। রহস্যটা আরো বেশি প্রগাঢ় হইয়া আসিল তখনই—যখন পাদ্রী সাহেব খানিকক্ষণ তাহার মুখের দিকে কট্‌মট্‌ করিয়া তাকাইয়া রহিলেন। তারপর বিড়্‌বিড়্‌ করিয়া কী খানিকটা প্রার্থনা করিয়া কহিলেন, শয়তান, বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও। মুক্তি দাও এর আত্মাকে।

গঞ্জালেস্‌ বোবার মতো চাহিয়াই রহিল! পাদ্রী সাহেব আবার কহিলেন, শয়তান, পৃথিবীতে অনেক পাপীর আত্মা আছে, যাদের তুমি ইচ্ছে করলেই নরকে টেনে নিয়ে যেতে পারো। কিন্তু এর পবিত্র আত্মা ভগবানের দাসত্বে নিয়োজিত, একে তুমি হরণ করতে পারো না।

মুহূর্তে গঞ্জালেসের অধিগম্য হইল ব্যাপারটা। পেরিরার দিকে তাকাইয়া দেখিল সে মিটিমিটি হাসিতেছে। গঞ্জালেসের মেজাজ সঙ্গে সঙ্গে বেঠিক হইয়া গেল। তাহাকে বেকুব বানাইয়া তাহার খরচায় খানিকটা হাসিয়া লইবার চেষ্টা! অশ্রাব্য ভাষায় সে পাদ্রী সাহেব এবং পেরিরাকে একটা গালি বর্ষণ করিয়া বেগে বাহির হইয়া গেল। পাদ্রী সাহেব চোখ দুটি বিস্ফারিত করিয়া সখেদে কহিলেন, হায়, শয়তান এর আত্মাকে একেবারে খেয়ে ফেলেছে!

শয়তান আত্মাকে খাক্‌ বা না খাক্‌, গঞ্জালেস্‌ বাহির হইয়া আসিয়া আর বিলম্ব করিলনা। নৌকা সাজাইয়া লইয়া সে চর ইস্‌মাইলের পথে পাড়ি জমাইল। এবারে লিসিকে লইয়া তবেই সে ফিরিবে।

সন্দীপ হইয়া আসিলে অনেকটা ঘুরিতে হয়, কাজেই সোজা-সুজি পাড়ি ধরিল সে। হাতিয়ার মোহানায় নদী আর সমুদ্র যেখানে একাকার হইয়া গিয়াছে—সেখান দিয়া নীল জলের উপর নৌকা চালাইয়া সে আসিল সাহাবাজপুরের নদীতে। এম্‌নি সময় ঝড় উঠিল রুদ্র-মূর্তি লইয়া। ভোলার দ্বীপের এক প্রান্তে আশ্রয় লইয়া গঞ্জালেসের নৌকা সে ঝড় হইতে আত্মরক্ষা করিল—তারপর ভোলার কূলে কূলে নৌকা বাহিয়া তেঁতুলিয়া পার হইয়া সে চর-ইস্‌মাইলে আসিয়া দেখা দিল।

সকালের আলোয় স্নান করিতেছে চর্‌-ইস্‌মাইল। কোথাও এতটুকু কোনো পরিবর্তন নাই। চৈত্রের স্পর্শে জলের নীল রঙ একটু একটু শাদা হইয়া উঠিতেছে, উপরের কোনো কোনো নদীতে ঢল্‌ নামিতেছে বোধ হয়। পর্তুগীজদের ভাঙা-গীর্জার ওখানে ঝির্‌ ঝির্‌ করিয়া তেমনই মাটি ভাঙিতেছে।

নৌকা হইতে নামিয়া কয়েক পা হাঁটিতেই ডি-সিল্‌ভার সঙ্গে দেখা হইল তাহার।

ডি-সিল্‌ভা খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আসিতেছিল। এক হাতে লাঠি। এক পায়ে বেশ করিয়া ন্যাকড়া জড়ানো। সুডোল ভুঁড়িটা কয়দিনের মধ্যেই কেমন চুপসাইয়া ছোট হইয়া গেছে।

গঞ্জালেসকে দেখিয়া ডি-সিল্‌ভা থামিল। তাহার চোখে মুখে এক ধরণের আত্ম-প্রসাদ প্রকাশ পাইল। সে নিজে বুড়ো এবং ভুঁড়ো—এই কার্তিকটিকে জামাই করিবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতেছিল ডি-সুজা। সকলের আশায় ছাই দিয়া লিসিকে কাকে লইয়া গেছে।

বলিল—আরে, এই যে স্যামুয়েল সাহেব। কী মনে করে ?

—বেড়াতে এলাম।

—বেড়াতে ? বেশ, বেশ। কিন্তু একটা ভারী দুঃসংবাদ আছে যে।

—দুঃসংবাদ ? গঞ্জালেস্‌ থমকিয়া থামিয়া দাঁড়াইল, কিসের দুঃসংবাদ ?

—আর বলো কেন! লিসিকে বর্মিরা চুরি ক'রে নিয়ে গেছে। আর তার শোকে বুড়ো ডি-সুজা পাগল। দিন রাত কাঁদছে আর—

বলিয়াই আড় চোখে চাহিয়া দেখিল, গঞ্জালেসের উপর আশাতীত ফল হইয়াছে। তাহার সমস্ত মুখ মুহূর্তে শাদা হইয়া গিয়াছে—পা দুইটা কাঁপিতেছে থর থর করিয়া, চোখের দৃষ্টি শূন্য আর অর্থহীন।

অত্যন্ত ভালো মানুষের মতো খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে ডি-সিল্‌ভা চলিয়া গেল।

ডি-সুজা সংক্রান্ত খবরটা যথা সময়ে আসিয়া পৌঁছিল নুরুল্ গাজীর কাণে।

ব্যাপারটা শুনিয়া গাজী সাহেব বিস্মিত হইলেন না। লিসিকে দেখিয়া তাঁহারই এক সময়ে কিছু চিত্ত-চাঞ্চল্য জাগিয়াছিল, কাজেই অন্যে যে তাহার উপর ছোঁ মারিয়াছে এটা এমন কিছু অসম্ভব বা অপ্রত্যাশিত ব্যাপার নয়। কিন্তু এই উপলক্ষে তাঁহাদের ব্যবসায়-গত ব্যাপারটা ফাঁস না হইয়া যায়, সেটা ভালো করিয়া দেখিবার জন্য তিনি চর্-ইস্‌মাইলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ডি-সুজা চুপ করিয়া বাড়ির রোয়াকে বসিয়াছিল। এই কয়দিনেই অদ্ভুত পরিবর্তন হইয়াছে তাহার চেহারায়। পাড়ার কে একটি মেয়ে আসিয়া তাহাকে খাওয়াইয়া দিয়া যায়, কিন্তু ওই পর্যন্তই। সমস্ত দিন সে নীরবে বাড়ির রোয়াকে বসিয়া থাকে, কাহারো সঙ্গে কথা বলেনা। তারপর যখন রাত্রি আসে —রাত্রি আসে নয়—রাত্রি যখন গভীর হয়, তখন সে অদ্ভুত অমানুষিক স্বরে চীৎকার করিয়া কাঁদে। সে কান্না শুনিলে সারা গা ছম্ ছম্ করিয়া ওঠে।

গাজী সাহেব ডাকিলেন—বুড়া সাহেব!

এই নামেই ডি-সুজা পরিচিত। কিন্তু বুড়া সাহেব জবাব দিলনা।

গাজী সাহেব আবার কহিলেন—বুড়া সাহেব।

ডি-সুজা কটমট্ করিয়া তাঁহার দিকে তাকাইল। তাহার চোখ দেখিয়া গাজী সাহেব শিহরিয়া পিছাইয়া আসিলেন। শরীরের সমস্ত রক্ত যেন চোখে আসিয়া জমা হইয়াছে তাহার। খুন করিবার আগে মানুষের চোখ এম্‌নি হইয়া ওঠে বোধ হয়।

—বিস্‌মিল্লা!

স্বগতোক্তি করিয়া গাজী সাহেব বাহির হইয়া আসিলেন। ডি-সুজার সম্পর্কে আর কোনো ভরসাই নাই। একেবারে গোল্লায় গিয়াছে—উন্মাদ পাগল!

রাস্তায় নামিয়া গাজী সাহেবের মনে হইল—একবার কবিরাজের সঙ্গে দেখা করিয়া গেলে নেহাৎ মন্দ হয়না ব্যাপারটা।

কবিরাজের সঙ্গে গাজী সাহেবের পরিচয় অনেকদিনের। মাঝে কিছুদিন উদরীতে পেটে জল হইয়া বিলক্ষণ কষ্ট পাইয়াছেন। সেই সময় পট্‌পটি খাওয়াইয়া কবিরাজ রোগমুক্ত করিয়াছিল তাঁহাকে। সেই জন্য কবিরাজের প্রতি গাজী সাহেব কৃতজ্ঞ হইয়া আছেন। গুটি গুটি পায়ে তিনি বলরাম ভিষক্‌রত্নের ডিস্পেন্‌সারীর দিকে অগ্রসর হইলেন।

বলরাম তখন কিছু পারিবারিক ব্যাপারে বিপন্ন ও বিব্রত হইয়াছিলেন।

মুক্তোকে লইয়া কী করা যায় এখন? আরো বিশেষ করিয়া এই সন্তানের দায়িত্ব। অবাঞ্ছিত এই পিতৃত্বের বোঝা মাথায় করিয়া চলা কোনো মতেই সম্ভব নয়—লোক লজ্জার কথা না হয় না-ই ধরিলাম।

বলরামের চিন্তার মধ্যে অনেকগুলি কবিরাজী ওষুধ ও শিকড়-বাকড় আসিয়া ঝিলিক দিয়া গেল। অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া তিনি দেখিলেন মুক্তো বসিয়া অত্যন্ত মনোযোগ দিয়া কাঁথা সেলাই করিতেছে।

বলরাম কহিলেন, ও কী করছ তুমি?

মুক্তোর চোখে ভয়ের ছায়া পড়িল। বলিল, কাঁথা।

—কেন?

মুক্তো জবাব দিলনা।

বলরাম বিছানাটার একপাশে বসিলেন। বলিলেন—ছাখো, অনেক ভেবে দেখলাম ওটাকে নষ্ট করে ফেলতে হবে। নইলে তোমারও কলঙ্ক—আমারও একটা বিশ্রী—সপ্রতিভভাবে বলরাম একটু হাসিবার চেষ্টা করিলেন।

মুক্তো ভয়ার্ত চোখ মেলিয়া কয়েক সেকেণ্ড তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার হাত হইতে সেলাইটা খসিয়া পড়িল। তারপর—সেদিনকার সেই রাত্রির মতো সে চীৎকার করিয়া উঠিল, না—না।

—না, না? বলরাম হতবাক হইয়া গেলেন: কেন, এতে তোমার আপত্তির কী থাকতে পারে? এ ছাড়া তো উপায় নেই আর। আমার কাছে ভালো ওষুধ আছে, যদি বলো তো আজকেই চেষ্টা করে দেখি। তোমার কোনো—

—না, কিছুতেই নয়। মুক্তো উঠিয়া দাঁড়াইল—যেন বলরামকে স্পষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করিতেছে। বলরাম খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া ব্যাপারটা বুঝিবার চেষ্টা করিলেন, তারপর টাক চুলকাইতে চুলকাইতে পুনর্মূষিক হইয়া বাহিরের ঘরে আসিয়া বসিলেন।

মুক্তো—নাঃ, মুক্তো দুঃসাধ্য। এমন জানিলে দু'দিনের সখের জন্য বলরাম এমন একটা কাণ্ড করিতেন নাকি। বেশ ছিলেন—কিন্তু এখন সামলাও ঠ্যালা! সুখে থাকিতে ভূতে কিলানো আর কাহাকে বলে!

রাধানাথ আসিয়া একখানা চিঠি দিল।

চিঠি? চিঠি আসিল কোথা হইতে? বলরাম চিঠিখানা তুলিয়া লইলেন। হাতের লেখাটা চেনা চেনা ঠেকিতেছে, হাঁ, হরিদাসের চিঠিই তো।

হরিদাস লিখিয়াছেন:

ভায়া হে, জানিয়া নিরাশ হইবে যে আমি মরি নাই। শত্রুর মুখে ছাই দিয়া এখনও বাহাল তবিয়তেই বাঁচিয়া আছি, এক হাঁপানির টান ছাড়া আর বিশেষ কোনো অসুবিধা হইতেছে না।

পথে নদী কিঞ্চিৎ ভারতীয় নৃত্য দেখাইয়াছে। ডুবাইয়া মারিবার মতলব করিয়াছিল, কিন্তু পারিয়া ওঠে নাই। আমার গৃহিণী বহু শিবপূজার ফলে আমার মতো ভূঙ্গীকে পতিরূপে লাভ করিয়াছেন, এত সহজেই তাঁহার বৈধব্য ঘটিবে কেন? তাই আর একবার শুকনা মাটিতে পা দিয়াছি।

ভাবিতেছি, আমি গৃহিণীর মুখ-চন্দ্রমা দর্শন করিয়া মধু-যামিনী

যাপন করিতেছি? সেটা ভাবিয়া থাকিলে মহা ভ্রম করিয়াছ। আমি অন্ধকারের জীব, প্যাঁচাই বলিতে পারো, তাই অতটা চন্দ্র-কন্দ্র আমার তেমন সহ্য হয় না। আমি এখন ঘরে নয়—পথে।

মণিপুর রোড দিয়া হাঁটিতেছি। দু পাশে ঘন জঙ্গলের মধ্যে অতীতের কঙ্কালগুলি ইট পাথরের রূপ লইয়া আমার দিকে তাকাইয়া আছে। বহু দূরে পাহাড়ের গায়ে একটা হাতীর পাল দেখিতেছি—কাছে নয় এইটাই রক্ষা। বুনো ফুলের গন্ধে ভরিয়া আছে বাতাস। ওদিকে কুকীদের কী একটা উৎসব চলিতেছে যেন—বাজনার আওয়াজ কাণে আসিতেছে।

পথ চলিয়াছি। কোথায় যাইব জানি না। হয়তো মণিপুর হইয়া বার্ম্মা, তার পরে চীন। তার পরে? তার পরে কোথায় গিয়া থামিব কে জানে? যদি চর-ইস্‌মাইলে কখনো ফিরিতে পারি, তাহা হইলে রোমাঞ্চকর অনেকগুলি গল্প শুনাইয়া দিতে পারিব।

তোমার দিন আশা করি ভালোই কাটিতেছে। সেই মেয়েটির কী সংবাদ? ইতি—

শ্রীহরিদাস

চিঠিটা পড়িয়া বলরামের মনটা কেমন উদাস আর আচ্ছন্ন হইয়া গেল। হরিদাস—বিধাতার অদ্ভুত সৃষ্টি এই যাযাবর লোকটা। ঘর নাই, আত্মীয়-স্বজন নাই—পৃথিবীকে একমাত্র চিনিয়াছে, আর পথকে। যে পথ দিয়া যায় সে পথে আর কখনো ফেরে না, কিন্তু এমনই দাগ রাখিয়া যায় যে কাহারো সাধ্য নাই তাহাকে ভুলিতে পারে।

এই সময়—এই সময় যদি এখানে হরিদাস থাকিতেন! বলরামের মনে হইল, কেন কে জানে তাঁহার মনে হইল, এই সময়ে হরিদাস এখানে থাকিলে তাঁহার সমস্ত সমস্যার সমাধান হইয়া যাইত। বলরাম হরিদাসকে সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করিতেন।

—কবিরাজ আছো হে?

বলরামের চমক ভাঙিল। চাহিয়া দেখিলেন, এক মুখ শাদা দাড়ি লইয়া প্রসন্ন মূর্ত্তি মুরুল্ গাজী দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া।

—আরে গাজী সাহেব যে! আসুন, আসুন, ভেতরে আসুন—বলরাম সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করিলেন; আজ আমার কী সৌভাগ্য যে এখানে গাজী সাহেবের পায়ের ধূলো পড়ল!

গাজী সাহেব সহাস্যে বলিলেন, দেখা করতে এলাম।

ঘরে ঢুকিয়া তিনি ফরাসের উপর বসিতেই বলরাম ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, রাধানাথ, ওরে রাধানাথ! গাজী সাহেবকে তামাক দে।

তামাক আসিল। গাজী সাহেব ফরসীতে টান দিয়া বলিলেন, তোমাদের বুড়ো সাহেব তাহলে পাগল হয়ে গেল।

বলরাম নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, তাই তো দেখছি। তবে লোকটা নেহাৎ খারাপ ছিল না।

—না, না, বেশ লোক। গাজী সাহেব সমর্থন করিলেন, একটু রগ-চটা ছিল তাই যা। ওর নাতনীটাকে বুঝি চুরি করে নিয়ে গেছে?

—সেই কথাই তো শুনেছি।

—হবে, যে পাজী ব্যাটারা। ওই জাতটাই বদ। যত ভালোই তুমি করো, ঘ্যাচাং ক'রে দা চালিয়ে দেবে গলায়। আমার এলাকায় যত মগ ছিল, সবগুলোকে আমি ভিটে মাটি ছাড়া ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছি।

বলরাম কহিলেন, তাই উচিত।

গাজী সাহেব হঠাৎ গলাটা নামাইয়া আনিলেন। বলিলেন, আচ্ছা কবিরাজ, আমাকে একটা ওষুধ দিতে পারো?

—ওষুধ? কী ওষুধ?

গাজী সাহেব দ্বিধা করিলেন, কাসিলেন একটু। কহিলেন, এই যাতে—মানে—জীবনী-শক্তিটা একটু—মানে—বাকীটা তিনি চাপা স্বরে বলরামের কানে কানে কহিলেন।

বলরাম হাসিলেন।

বলিলেন, সে তো তৈরী করতে সময় লাগবে। নানারকম তেজস্কর জিনিস দিয়ে পাক করতে হবে কিনা। তা তিন চারদিন বাদে আপনি লোক পাঠাবেন, তারই হাতে দিয়ে দেব না হয়।

গাজী সাহেব প্রসন্ন স্বরে বলিলেন, খরচ যা লাগে—

বাতাসে বলরামের অন্দরের দরজাটা হইতে পর্দা সরিয়া গেল, আর সেই সঙ্গে গাজী সাহেব দেখিলেন মুক্তোকে। চোখের দৃষ্টিটা তাঁহার তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল।

—আচ্ছা কবিরাজ, তোমার বাড়িতে মেয়েমানুষ দেখলাম না? এতদিন তো একাই থাকতে, তা—

গাজী সাহেবের চোখ বলরামের ভালো লাগিল না—বিশেষত মেয়েদের সম্বন্ধে সুখ্যাতি তাঁহার নাই। বলরাম দ্বিধা করিয়া কহিলেন, ও আমার এক দূর-সম্পর্কের—তিন কুলে কেউ নেই, তাই—

—ওঃ তাই।

আর একবার অন্দরের দিকে চোরা চাহনি ফেলিয়া গাজী সাহেব বলিলেন, আচ্ছা আসি তা হলে, আদাব।

—আদাব।

গাজী সাহেব বাহির হইয়া গেলেন। ভারী জুতা আর গলার কড়ির মালার খট্ খট্ শব্দ মিলাইয়া আসিল দূরে। আর গোটা গোটা অক্ষরে লেখা হরিদাসের পোষ্টকার্ডখানা বাতাসে বলরামের পায়ের কাছে উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল শুধু।

(ক্রমশঃ)



কবি যাদবিন্দ বা যাদবেন্দু বা যাদবেন্দ্র ভট্টাচার্য্য

শ্রীগৌরীহর মিত্র বি-এল্

সিউড়ী শহরের ছয় মাইল দক্ষিণে সিউড়ী রাণীগঞ্জ পাকা রাস্তার পার্শ্বেই কচুজোড় গ্রামের হরিশপুর পল্লীতে যাদবিন্দের নিবাস ছিল। হরিশপুর এখন ডাঙ্গা ও জঙ্গল ভূমিতে পরিণত হইয়াছে। ইনি তথাকার রাজা রুদ্রনারায়ণ রায়ের দীক্ষাগুরু ছিলেন। যাদবিন্দ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বর্ত্তমান ছিলেন।

সিউড়ীর তিন মাইল দক্ষিণে চন্দ্রভাগা নদীতীরবর্ত্তী মল্লিকপুর গ্রামের মহিলা কবি স্বর্ণলালীর সহিত ইনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। স্বর্ণলালীর মাত্র কতকগুলি পদ পাওয়া গিয়াছে। পূজনীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য-রত্ন মহাশয় কর্ত্তৃক ইঁহার কতকগুলি পদ উদ্ধার হইয়াছে। এখনও এই মহিলা কবির বহুপদ অনাবিষ্কৃত অবস্থায় পড়িয়া আছে।

কোন একখানি সনন্দ দৃষ্টে জানা যায় যে যাদবিন্দ বাঙলা ১১৬৬ সালের কিছু পূর্ব্বে ইহলোক ত্যাগ করেন।

যাদবিন্দ পরম বৈষ্ণব ছিলেন। কেহ কেহ ইঁহার শক্তি উপাসনার কথা বলিয়া থাকেন। ইঁহার বংশধরেরা কিন্তু আপনাদিগকে শাক্ত বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। ইহাঁর বংশধরেরা এখন কচুজোড়ের অনতিদূর পশ্চিমে সংগ্রামপুরে বাস করিতেছেন। সম্প্রতি অণ্ডাল সাঁইথিয়া লাইনের কচুজোড়ে একটী ছোট ষ্টেশন হইয়াছে।

যাদবিন্দ প্রকৃতই কবি ছিলেন। তাঁহার রচিত পদগুলি অতীব মনোহর। ইনি বাৎসল্য রসের কবিতা রচনা করিয়া খ্যাতি লাভ করেন। যাদবিন্দের গোষ্ঠ গানের প্রসিদ্ধি বহুজনবিদিত। তাঁহার মধুর রসাত্মক পদগুলিও অতি চমৎকার। আমাদের রতন-লাইব্রেরীর ২০৮৮ নং পুঁথিতে এই পদকর্ত্তার মাত্র ৪টি পদ প্রাপ্ত হইয়াছি। যাদবিন্দের গোষ্ঠলীলার পদগুলি এইস্থলে উদ্ধৃত হইল—

(১)

গহন-গমন কালে ভাসি নয়নের জলে
হরি মুখ করি নিরীক্ষণ ;
বলরামের করে ধরি সমর্পণ করি হরি
পুনঃ রাণী কহেন বচন ॥
আমার শপতি লাগে না ধাইহ কারু আগে
তুমি মোর প্রাণ নীলমণি।
নিকটে রাখিহ ধেনু বাজায়ে মোহন বেণু
ঘরে বসি যেন রব শুনি ॥
বলাই সবার আগে আর শিশু পার্শ্বভাগে
শ্রীদাম সুদাম যাবে পাছে।
তুমি সবার মাঝে যাবে কারু আগে না ধাইবে
বনে বড় রিপুভয় আছে ॥
ধীরে পদ বাড়াইও পথ পানে চেয়ে যেও
তৃণাঙ্কুর অতিশয় পথে।
কার বোলে বড় ধেনু ফিরাতে না যেও কানু
হাত তুলি দেহ মায়ের মাথে ॥
রোদ্দুর লাগিলে গায় বসিও তরুর ছায়
বসন ভিজায়ে দিও গায়।
যাদবিন্দ সঙ্গে লেহ বাধা পথে হাত দেহ
সময় বুঝে দিবে রাঙ্গা পায় ॥

[এই বাৎসল্য রসের কবিতাটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা বাঙলা সংগ্রহ পুস্তকে অন্যরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। এই দুই পাঠ মিলাইয়া দেখিয়া পরবর্ত্তী সংস্করণে কবিতাটির বিশুদ্ধ পাঠ ঠিক করিয়া দিলে ভাল হয়। লেখক]

(২)

দিছে রাণী রাম করে শ্যাম। দক্ষিণ করে বলরাম ॥
হের আয়রে বলরাম, হাত দে মোর মাথে।
প্রাণের অধিক শ্যাম সঁপে দি তোর হাতে ॥
রামের হাতে শ্যাম দিয়া বলে নন্দরাণী,
লঞা যেছো আমার গোপাল এনে দিও তুমি ॥
যমুনার তীরে যখন গোপাল ধেঞা যায়।
আড়ুড় বিষম বড় সামালিও তায় ॥
গোধনে গোধনে যখন লাগে হুলাহুলি
সেখানে সামালো আমার পরাণ পুতলি ॥
নব নব তৃণাঙ্কুর যেথানে দেখিবে।
সেইখানে গোপালে আমার কান্ধে করি লবে ॥
রবির কিরণে যখন ঘামিবেক গা।
নূতন পল্লব লঞা দিও মন্দ বা ॥
কাল যমুনার জল, কাল নীলমণি।
কাল জলে কালরূপ মিশায় পাছে জানি ॥
প্রাণধন তোরে দিঞা আমি ঘরে যাই।
যাদবিন্দু বলে রাণী কিছু ভয় নাই ॥

(৩)

রৈয় রৈয় রৈয় রৈয় রে
নেহারি বয়ান, জুড়াক পরাণ তবে মা'য়ে ছেড়ে যেও রে ॥
আগে ধেঞ রাণি যশোদা রোহিণী নেহারে চাঁদমুখ খানি।
অন্তরে কাতরে, আঁখে জল ঝরে, মুখে নাহি সরে বাণী ॥
শ্রীদাম সুদাম, শোন বলরাম, তোমা সভাদিকে কই।
মৃত তনু এই ঘরে লঞা যাই পরাণ পুতলি ঐ ॥
কল্যাণ কুশলে গোঁসাঞী রাখুক তোরে মায়ের সনে এই দেখা।
যাদবেন্দু সুখী তনে প্রাণ রাখি, নন্দ ঘুচায় ধেনু রাখা ॥

(৪)

গোঠ বিজই রাম কানু।
আগে পাছে শিশু ধায়, লাখে লাখে ধেনু ॥
নূপুরের ধ্বনি শুনি মুনির মন ভুলে।
ঢাকিল রবির রথ গোক্ষুরের ধূলে
সুরঙ্গ চাহনি বিনোদ পাগুড়ি।
কারু নীল কারু পীত, কারু রাঙ্গা ধড়ি।
কারু হাতে রাঙ্গা লাঠি গলে গুঞ্জহার ॥
কারু কারু কান্ধে শোভে ভোজনের ভার ॥
কেহ কেহ ধেঞা গিএ ধেনু বাহুড়ায়।
যাদবেন্দু একপাশে দাঁড়াইয়া চায় ॥

মিলন-গীতি

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম-এ, এফ্-এস্-এস্, এফ্-আর-ই-এস্

শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের চিরমধুর মিলনের গানের আলোচনা এই প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহে। সাধারণ নায়ক নায়িকার মিলন-গীতির রসাস্বাদন করাইবার জন্যও এই সন্দর্ভের অবতারণা নহে। যদি কাগজ খরচ সংক্ষেপ না করিবার জন্য এই দুর্দ্দিনে সম্পাদক মহাশয়কে ভারতরক্ষা বিধি অনুসারে না বিপদে পড়িতে হয় এবং বিশ্বকবির অপূর্ব্ব-সৃষ্টি বৈকুণ্ঠের ন্যায় বিস্তারিতভাবে প্রবন্ধের নামকরণ যদি পাঠকগণের মনে ভীতি উৎপাদন না করে তাহা হইলে এই প্রবন্ধটির বোধ হয় এইরূপ নামকরণ সঙ্গত হইবে:—"ভারতীয় হিন্দু ও মুসলমানগণের মধ্যে মিলন ও প্রীতিভাব সঞ্চারিত করিবার নিমিত্ত বিগত ও আধুনিক যুগের কতিপয় দেশপ্রসিদ্ধ বাঙ্গালী হিন্দু-কবির প্রচেষ্টার সংক্ষিপ্ত পরিচয়।"

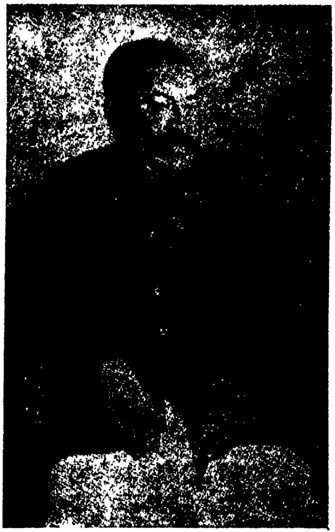
আমরা বাল্যকালে পূর্ব্ববঙ্গের যে বিদ্যালয়ে প্রথম শিক্ষালাভ করিয়াছিলাম তথায় হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্ম্মাবলম্বী শিক্ষকই অধ্যাপনা করিতেন এবং ছাত্রগণও উভয় সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। হিন্দু ছাত্রগণ মুসলমান শিক্ষককে হিন্দু শিক্ষকের ন্যায় সমান ভক্তি ও শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিত এবং মুসলমান ছাত্রগণও সকল শিক্ষককেই সমান শ্রদ্ধা করিত। ছাত্রগণের মধ্যেও গভীর প্রীতিভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। মহরম আদি মুসলমান পর্ব্বে হিন্দুর গৃহে মুসলমানগণ লাঠি খেলা দেখাইতে আসিতেন এবং হিন্দু গৃহস্বামীরা সাদরে তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিতেন, অর্থ সাহায্য করিতেন। আবার হিন্দুদের দুর্গোৎসব বা সরস্বতী পূজার সময় মুসলমানদেরও উৎসাহ ও সহানুভূতি আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। হিন্দুগৃহে রোগের সময় পীরের দরগায় সিন্নি মানিতে দেখিয়াছি, শিশুরা অসুস্থ হইলে শুক্রবারে মসজিদ হইতে উপাসনান্তে নির্গত ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমানগণের নিঃশ্বাস-পূত জল হিন্দু রমণীগণকে পান করাইতে দেখিয়াছি। জীবনের ঊষায় যে ভেদবুদ্ধিরহিত জাতিকে এক লক্ষ্যপথে অগ্রসর হইতে দেখিয়াছি, আজি জীবনের অপরাহ্নে সে জাতির মধ্যে কে ভেদবুদ্ধির বীজ বপন করিয়া বিষবৃক্ষের সৃষ্টি করিল? সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা কিরূপে আমাদের মধ্যে প্রবেশ করিল? যেরূপেই হউক, সাহিত্য জাতিকে উন্নতির পথে চালিত করিতে পারে, জাতীয় জীবন গঠিত করিতে পারে, ব্যক্তিগত স্বার্থ, সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা, রাজনীতিক বা কূটনীতিক প্রচার-পত্রের দ্বারা কেহ কখনও স্থায়ীভাবে জাতিকে অবনতির পথে লইয়া যাইতে পারে না, এ বিশ্বাস আমরা রাখি। সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী।

বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণার প্রয়োজন হইত না, যদি না আমরা দেখিতাম যে যুগাবতার বঙ্কিমচন্দ্র যে মাতৃমন্ত্রে অধিকাংশ ভারতবাসীকে একসূত্রে বাঁধিয়াছেন, সেই বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনা-প্রসূত কোনও কোনও চরিত্রের উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে মুসলমান-বিদ্বেষী বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা হইয়াছে, যে অপূর্ব্ব জাতীয় সঙ্গীত লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর প্রাণে নব জীবনের অনুভূতি আনিয়া দিয়াছে তাহা মুসলমানগণের পক্ষে আপত্তিকর বিবেচিত হইয়াছে। হিন্দু লেখকগণ যে সাহিত্য রচনা করিয়াছেন তাহাতে কোনও কোনও মুসলমান ভ্রাতা তাঁহাদের প্রতি বিদ্বেষের পরিচয় পাইয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে অল্প কয়েকজন হিন্দু কবির রচনার নিদর্শন প্রকাশ করিয়া আমরা ইহার বিনীত প্রতিবাদ করিতে চাহি।

প্রথমেই স্মরণ করা কর্ত্তব্য যে, বঙ্কিমচন্দ্র 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতটি 'আনন্দমঠ' রচনার বহুপূর্ব্বেই রচনা করিয়াছিলেন এবং যদিও হিন্দু সন্ন্যাসীদের বিদ্রোহ অবলম্বনে রচিত উক্ত উপন্যাসের অন্তর্গত হওয়ায় উল্লিখিত সঙ্গীতটিতে মুসলমানগণের বিশেষ উল্লেখ নাই, উহা যে সমগ্র জাতির জাতীয় সঙ্গীত হইতে পারে এইরূপ তিনি মনে করিয়াছিলেন তাহা আমরা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারি।

> সপ্ত কোটি কণ্ঠ কল-কল-নিনাদ করালে
> দ্বিসপ্তকোটি ভুজৈর্ধৃত খর করবালে, কে মা তুমি অবলে

প্রভৃতি পদে তিনি কেবল হিন্দু বাঙ্গালীর দেশমাতৃকার মূর্ত্তি ধ্যান করেন নাই। সেইজন্য বাঙ্গালার জাতীয় মহাকবি হেমচন্দ্র, যিনি সর্ব্বপ্রথম সকল ভারতবাসীকে এক দেশজননীর সন্তান বলিয়া ওজস্বী কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন, এই সঙ্গীতটিকে সমগ্র ভারতবাসীর জাতীয় সঙ্গীতের উপযুক্ত মনে করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় মহাসভার দ্বিতীয় অধিবেশন উপলক্ষে রচিত 'রাখীবন্ধন' শীর্ষক কবিতায় হেমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন:—



হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

> কি আনন্দ আজ ভারত ভুবনে—
> ভারত জননী জাগিল!
> * * *

পূরব বাঙ্গালা, মগধ, বিহার,
দেরা ইস্‌মাইল, হিমাদ্রির ধার,
করাচি, মান্দ্রাজ, সহর বোম্বাই—
সুরাটী, গুজরাটী, মহারাঠী ভাই,
চৌদিকে মায়েরে ঘেরিল ;
প্রেম-আলিঙ্গনে করে রাখি কর
খুলে দেছে হৃদি—হৃদি পরস্পর,
একপ্রাণ্ সবে, এক কণ্ঠস্বর
মুখে জয়ধ্বনি ধরিল।
প্রণয়-বিহ্বলে ধরে গলে গলে
গাহিল সকলে মধুর কাকলে
গাহিল—"বন্দে মাতরং ;
সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং
শস্য শ্যামলাং মাতরং
শুভ্র জ্যোৎস্না-পুলকিত যামিনীং
ফুল্ল কুসুমিত দ্রুমদল শোভিনীং
সুহাসিনীং সুমধুর ভাষিণীং,
সুখদাং বরদাং মাতরং
বহুবল ধারিণীং নমামি তারিণীং
রিপুদল বারিণীং মাতরং।"

পুনশ্চ, "রাখী-উৎসব বা ভারতের নিদ্রাভঙ্গ" কবিতায় হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন :—

ভাঙ্গিল কি তবে— এতদিন পরে—
ভাঙ্গিল কি ঘুম ভারত মাতা ?
জরা জীর্ণ শীর্ণ শরীরে তোমায়
ফিরে কি জীবন দিল বিধাতা ?
উঠ উঠ মাতঃ ডাকিছে তোমায়
তোমার সন্তান যে যেথা আজ
কিবা বৃদ্ধ শিশু কিবা যুবজন
কি দরিদ্র আর কিবা অধিরাজ॥
ডাকিছে তোমায় মহারাষ্ট্রবাসী,—
ডাকিছে পারসী—পঞ্জাবী-শিখ,
ডাকিছে তোমার বীর পুত্রগণ—
রাজোয়ারাময় যত নির্ভীক।
তোমার নন্দন মহম্মদীগণ—
বাহুবলে যার ধরণী টলে,
ডাকিছে-তোমায় সবে একস্বর
জাগো মা ভারত—জাগো মা বলে।
একা বঙ্গ নয় হিমালয় হতে
কুমারীর প্রান্ত যেথানে শেষ,
আজি একপ্রাণ হিন্দু মুসলমান—
জাগাতে তোমায় জেগেছে দেশ॥
'আর ঘুমাইও না' বলে কত দিন
কেঁদেছি—কেঁদেছে কত সে আর,
আজি জন্মভূমি জীবন সার্থক—
তোমার কণ্ঠে এ মিলন-হার॥
* * *
আজি আর কালি পাবো রে সকলি—
আর এ ভারত নিদ্রিত নয়,
সম তৃষ্ণাতুর সব পুত্র তাঁর—
একই পথপানে চাহিয়া রয়।
এক (ই) পথ পানে চাহে মহারাষ্ট্র
চাহে সে পারসী পঞ্জাবী শিখ ;
চাহে ভারতের বীর পুত্রগণ—
রাজোয়ারাময় যত নির্ভীক—
ভারত নন্দন মহম্মদীগণ
তাহারাও আজি—'মাগো মা' বলে ;
সেই পথ পানে একদৃষ্টে চাহে—
সাধনা সাধিতে সে পথে চলে।
উঠ উঠ মাতঃ ডাকিছে তোমায়
তোমার সন্তান যে যেথা আজ—
কিবা বৃদ্ধ শিশু কিবা যুবাদল
কি দরিদ্র আর কিবা অধিরাজ
একা বঙ্গ নয়— হিমালয় হতে
কুমারীর প্রান্ত যেথানে শেষ,
আজি একপ্রাণ হিন্দু মুসলমান
জাগাতে তোমারে জেগেছে দেশ।
উঠ উঠ মাতঃ ছাড়ো নিদ্রা ঘোর
পুরিয়া নিঃশ্বাস ফেল গো মাতঃ,
দেখি কি না হয়— অরুণ উদয়
তরুণ ছটাতে প্রভাত প্রাতঃ।

কবিবর নবীনচন্দ্র সেনও 'পলাশীর যুদ্ধে' হিন্দু মুসলমানের বহুকাল সহবাসহেতু প্রীতি-সম্বন্ধের কথা রাণী ভবানীর মুখ দিয়া এইরূপে বলিয়াছেন :



নবীনচন্দ্র সেন

জানি আমি যবনেরা ইংরাজের মত
ভিন্ন জাতি ; তবু ভেদ আকাশ পাতাল।
যবন ভারতবর্ষে আছে অবিরত
সার্দ্ধ পঞ্চশত বর্ষ। এই দীর্ঘকাল
একত্রে বসতি হেতু, হয়ে বিদূরিত
জেতাজিত বিষভাব, আর্য্যসুত সনে
হইয়াছে পরিণয় প্রণয় স্থাপিত ;
নাহি বৃথা দ্বন্দ্ব জাতি-ধর্ম্মের কারণে।
অশ্বথ-পাদপ-জাত উপবৃক্ষ মত,
হইয়াছে যবনেরা প্রায় পরিণত।
* * *

আমাদের করে রাজ্য শাসনের ভার।
কিবা সৈন্য, রাজকোষ, রাজমন্ত্রণায়,
কোথায় না হিন্দুদের আছে অধিকার ?
সমরে, শিবিরে হিন্দু প্রধান সহায়।

প্রথম বাঙ্গালী সিভিলিয়ান, রবীন্দ্রনাথের মধ্যমাগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত যে সঙ্গীত পাঠ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন—

"এই মহাগীত ভারতের সর্ব্বত্র গীত হউক! হিমালয়-কন্দরে প্রতিধ্বনিত হউক! গঙ্গা, যমুনা, সিন্ধু, নর্ম্মদা, গোদাবরীতটে বৃক্ষে



সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

বৃক্ষে মর্ম্মরিত হউক! এই বিংশতি কোটি ভারতবাসীর হৃদয়যন্ত্র ইহার সঙ্গে বাজিতে থাকুক!"—

সেই সর্ব্বজনপ্রশংসিত সঙ্গীতেও কবি সকল ভারত-সন্তানকে একতা অবলম্বন করত এবং তদ্দ্বারা বল সঞ্চয় করত ভারত-মাতার মুখ উজ্জ্বল করিতে উৎসাহ দিয়াছিলেন :—

মিলে সবে ভারত সন্তান, একতান মনঃপ্রাণ, গাও ভারতের যশোগান।

*　　　*　　　*　　　*

কেন ডর, ভীরু, কর সাহস আশ্রয়,
যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়,
ছিন্ন ভিন্ন হীনবল, ঐক্যেতে পাইবে বল
মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে কি ভয় ?

সত্যেন্দ্রনাথের প্রতিভাশালী ভ্রাতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথও তাঁহার জাতীয় সঙ্গীতে হিন্দু মুসলমানকে দলাদলি ভুলিয়া একপথে একসাথে একতা নিশান উড়াইয়া "যাহা শুভ, যাহা ধ্রুব, ন্যায়," তাহাতে জীবনদান করিতে প্রোৎসাহিত করিয়াছিলেন :

চল্‌রে চল সবে ভারত-সন্তান, মাতৃভূমি করে আহ্বান
বীর দর্পে, পৌরুষ গর্ব্বে, সাধ্‌রে সাধ সবে দেশেরি কল্যাণ।
পুত্র ভিন্ন মাতৃ দৈন্য কে করে মোচন ?
উঠ জাগো, সবে বল মা গো, তব পদে সঁপিনু পরাণ।

এক তন্ত্রে কর তপ, এক মন্ত্রে জপ ;
শিক্ষা, দীক্ষা, লক্ষ্য, মোক্ষ এক, এক সুরে গাও সবে গান।
দেশ দেশান্তে যাও রে আন্‌তে নব নব জ্ঞান,
নবভাবে নবোৎসাহে মাতো, উঠাও রে নবতর তান॥



জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

লোক রঞ্জন, লোক গঞ্জন, না করি দৃক্‌পাত,
যাহা শুভ, যাহা ধ্রুব, ন্যায়, তাহাতে জীবন কর দান।
দলাদলি সব ভুলি হিন্দু মুসলমান ;
এক পথে এক সাথে চল উড়াইয়ে একতা নিশান॥

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে ভারতবাসী সকল জাতিকে পবিত্র মনে হাতধরাধরি করিয়া আসিতে আহ্বান করিয়াছিলেন, কারণ, 'সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থ নীরে' মঙ্গলঘট পূর্ণ না করিলে মা'র অভিষেক সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব :—



রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এসো হে আর্য্য, এসো অনার্য্য, হিন্দু মুসলমান,
এসো এসো আজ, তুমি ইংরাজ, এসো এসো খৃষ্টান।
এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন ধরো হাত সবাকার,
এসো হে পতিত, হোক অপনীত সব অপমানভার।
মা'র অভিষেকে এসো এসো ত্বরা,
মঙ্গলঘট হয়নি যে ভরা,

সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থ-নীরে।
আজি ভারতের মহামানবের সাগর তীরে॥

ভগবান রামকৃষ্ণ পরমহংসের ভক্ত শিষ্য মহাকবি গিরিশচন্দ্র ধর্ম্মের গোঁড়ামী ত্যাগ করিয়া ভেদবুদ্ধি দূর করিবার জন্য নিয়ত উপদেশ দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন :—

এক বিভু বহু নামে ডাকে বহুজনে,
যথা জল, একওয়া, ওয়াটার, পানি,
বোঝায় সলিলে, সেই মত আল্লা, গড,
ঈশ্বর, যিহোবা, যীশু নামে নানাস্থানে
নানাজনে ডাকে সনাতনে। ভেদজ্ঞান
অজ্ঞান লক্ষণ, ভেদবুদ্ধি কর দূর,
বহু নাম—প্রতি নাম সর্ব্বশক্তিমান,—
যার যেই নামে প্রীতি-ভক্তির উদয়,
প্রফুল্ল-হৃদয়, যেই নামে মনস্কাম
পূর্ণ, সেই জন, সেই নাম উদ্গারণে।
মুসলমান, হিন্দু, কেরাস্থান, এক বিভু
সবে করে উপাসনা। সে বিনে উপাস্য
কেবা, কহ কার আর পূজা-অধিকার!
মূঢ় জনে ভেদ জ্ঞানে দ্বন্দ্বে পরস্পরে।

তাঁহার প্রসিদ্ধ গান "রাম রহিম না জুদা করো দিলকা সাচ্চা



গিরিশচন্দ্র ঘোষ

রাখো জী"—অনুকরণ করিয়া স্বদেশীযুগের এই জনপ্রিয় সঙ্গীতটী রচিত হইয়াছিল :—

রাম রহিম না জুদা কর ভাই মনটা খাঁটি রাখ জী!
দেশের কথা ভাব ভাইরে দেশ আমাদের মাতাজী॥
হিন্দু, মুসলমান, এক মা'র সন্তান, তফাৎ কেন কর জী।
দুই ভাইয়েতে, দু'ঘর বেঁধে' একই দেশে বসতি॥

গিরিশচন্দ্রের কোনও গ্রন্থে তিনি মুসলমান নায়কের মুখে বলাইয়াছেন :—

ওহে হিন্দু মুসলমান—
এস করি পরস্পর মার্জ্জনা এখন
হই বিস্মরণ পূর্ব্ব বিবরণ ;
করো সবে * * বিদ্বেষ বর্জ্জন।
* * *
বঙ্গের সন্তান হিন্দু-মুসলমান,
বাঙ্গালার সাধহ কল্যাণ।

কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তদ্বিরচিত 'দুর্গাদাস' 'মেবার পতন' প্রভৃতি জনপ্রিয় নাটকের স্থানে স্থানে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে প্রীতিসম্বন্ধের প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শিত করিয়াছেন। "শত্রু মিত্র জ্ঞান ভুলে গিয়ে, বিদ্বেষ বর্জ্জন করে, নিজের কালিমা, দেশের কালিমা ধৌত করে" দিতে তিনি উপদেশ দিয়াছেন :—



দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

ঘুচাতে চাস্ যদি রে এই হতাশাময় বর্ত্তমান,
বিশ্বময় জাগায়ে তোল্ ভায়ের প্রতি ভায়ের টান।
ভুলে যা রে আত্মপর, পরকে নিয়ে আপন কর,
বিশ্ব তোর নিজের ঘর—আবার তোরা মানুষ হ'।
শত্রু হয় হোক্ না, যদি সেথায় পাস মহৎ প্রাণ,
তাহারে ভালবাসিতে শেখ, তাহারে কর হৃদয় দান।
* * * *
জগৎ জুড়ে দুইটি সেনা পরস্পরে রাঙায় চোক,
পুণ্যসেনা নিজের কর, পাপের সেনা শত্রু হোক ;
ধর্ম্ম যথা সেদিকে থাক্ ঈশ্বরেরে মাথায় রাখ ;
স্বজন দেশ ডুবিয়া যাক্—আবার তোরা মানুষ হ'॥

আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রীও লিখিয়াছেন :—



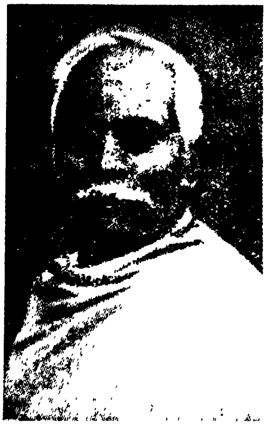
শিবনাথ শাস্ত্রী

আয় সবে মিলে করি জাগরণ,
মিলে পরস্পরে, দেশের উদ্ধারে, আয় দেখি সবে করি প্রাণপণ,
দেখি রে দুর্দ্দশা না যায় কেমন!

* * * *

শেষে ডেকে বলি ওরে যুন এই, প্রাচীন শত্রুতা প্রয়োজন নাই।
দেশের দুর্দ্দশা দেখ্ হলো ঢের, তোরা ত সন্তান প্রিয় ভারতের,
সে শত্রুতা ভুলে আয় প্রাণ খুলে, পুতে রাখ্ কথা মস্লেম কাফের—
বল্ শুধু "মোরা প্রিয় ভারতের।"
ভারতের তোরা তোদের আমরা, আয় পূর্ণ হলো আনন্দের ভরা!
সবে এক দশা তবে অহঙ্কার, তবে রে শত্রুতা শোভে না যে আর!
মিলি ভাই ভাই জয়ধ্বনি গাই, ঘুষিয়া বেড়াই শুভসমাচার,
"আমাদের মাতা বাঁচিল আবার।"

স্বদেশপ্রাণ অশ্বিনীকুমার দত্ত হিন্দুমুসলমানকে বিবাদ বিসম্বাদ ভুলিয়া দেশসেবায় ওজস্বিনীভাষায় আহ্বান করিয়াছিলেন :—



অশ্বিনীকুমার দত্ত



অতুলপ্রসাদ সেন

প্রণমি ভারত-মাতার চরণ-কমলে।
আয়রে মুসলমান ভাই আজি জাতিভেদ নাই,
এ কাজেতে ভাই ভাই আমরা সকলে।
ভারতের কাযে আজি, আয় রে সকলে সাজি,—
ঘরে ঘরে বিবাদ যত, সব যাই ভুলে।
আগে তোরা পর ছিলি, এখন তোরা আপন হলি,
হইরে তবে গলাগলি, ভাই ভাই বলে।
ভারতের যেমন মোরা, ওরে ভাই তেমনি তোরা,
ভেদাভেদ যত কিছু, কোথা গেছে চলে।
আয়রে ভাই সবে মিলি মাখি ভারতের ধুলি
এমন আর পবিত্র ধুলি, নাহি ভূমণ্ডলে।
এ ধূলি মস্তকে লয়ে, ভাবেতে প্রমত্ত হ'য়ে,
হিন্দু যবন কায করিব জাতিভেদ ভুলে।

পুনশ্চ,—

একসাথে হিন্দু মুসলমান,
ছাড়িয়া হিংসা দ্বেষ, ধরিয়া নবীন বেশ, (হও) নবীন ভারতে আগুয়ান।
দিব্যধাম হতে তোদেরে জাগাতে আসিয়াছে অপূর্ব্ব আহ্বান।
সে ধ্বনি শুনি কাঁপিছে অবনী, দেশে দেশে উঠিয়াছে তান।
এখনো বধির হ'য়ে স্বার্থের পুঁটুলি লয়ে এখনো কি রহিবে শয়ান?

সুকবি অতুলপ্রসাদ সেনের ওজস্বিনী বাণী কি কখনও নীরব হইবে?—

ভোলেনি ভারত, ভোলেনি সে কথা,
অহিংসার বাণী উঠেছিল হেথা,
নানক, নিমাই, করেছিল ভাই
সকল ভারত নন্দনে।
এস হে হিন্দু, এস মুসলমান,
এস হে পার্শি, জৈন, খৃষ্টিয়ান,
মিলহে মায়ের চরণে।
ভুলি ধর্ম্ম দ্বেষ জাতি অভিমান
ত্রিশ কোটী দেহ হবে একপ্রাণ;
এক জাতি প্রেম বন্ধনে।

পুনশ্চ,—

দেখ, মা, এবার দুয়ার খুলে;
গলে গলে এসু, মা, তোর হিন্দু মুসলমান দু' ছেলে।
এসেছি মা শপথ করে
ঘরের বিবাদ মিটবে ঘরে,
যাব না আর পরের কাছে,
ভাইয়ে ভাইয়ে বিরোধ হ'লে।
অনুগ্রহে নাই মুকতি
মিলন বিনা নাই শকতি
একথা বুঝেছি দোঁহে—
থাকব না আর স্বার্থে ভুলে।
থাকবে না আর রেষারেষি,
কাহার অল্প, কাহার বেশী;
দু'ভায়ের যা আছে জমা,
সঁপিব তোর চরণ-তলে!
দু'জনেই বুঝেছি এবার,
তোর মত কেউ নেই আপনার;
তোরই কোলে জন্ম মোদের,
মুদব আঁখি তোরই কোলে।

সুকবি শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরীর জাতীয় ঐক্যবিধায়িনী বাণীও ভুলিবার নহে :—



শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায়চৌধুরী

শুভদিনে শুভক্ষণে গাহ আজি জয়।
গাহ জয়, গাহ জয়, মাতৃভূমির জয় !
(একাধিক কণ্ঠে) জয়, জয় জয়, মাতৃভূমির জয় !
বহু কণ্ঠে) জন্মভূমির জয় স্বর্ণভূমির জয় !
পুণ্যভূমির জয়, মাতৃভূমির জয় !
লক্ষ মুখে ঐক্য গাথা রটাও জগতময় !
সুখ স্বস্তি স্বাস্থ্য দিলাম তোমার পায়,
যতদিন মা, তোমার বক্ষ জুড়ায়ে না যায়,
কে সুখে ঘুমায়, কে জেগে বৃথায় ?
মায়ের চোখে অশ্রুধারা, সে কি প্রাণে সয় !
নূতন উষায় গাহে পাখী নূতন জাগান সুর ;
উঠ, রাণী কাঙ্গালিনী, দুঃখ হল দূর ;
অলস আঁখি মেল, মলিন বসন ফেল,
উঠ মাগো, জাগো জাগো, ডাকে পুত্রচয়।

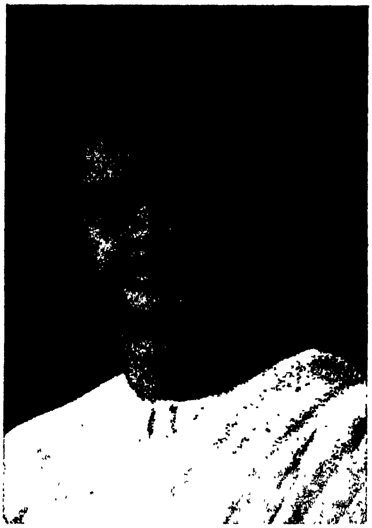
কান্ত কবি রজনীকান্তের নিম্নবিবৃত সঙ্গীতটীতে প্রাণ বিগলিত হয় :—



রজনীকান্ত সেন

আয় ছুটে ভাই, হিন্দু মুসলমান !
ঐ দেখ্ ঝ'রছে মায়ের দু'নয়ান
আজ, এক করে দে সন্ধ্যা নমাজ
মিশিয়ে দে আজ বেদ কোরাণ।
(জাতি ধর্ম্ম ভুলে গিয়ে রে) (হিংসা বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে রে)
থাকি একই মায়ের কোলে,
করি একই মায়ের স্তন্য পান।
(এক মায়ের কোল জুড়ে আছি রে) (এক মায়ের দুধ খেয়ে বাঁচি রে)
আমরা পাশাপাশি, প্রতিবাসী,
দুই গোলারি একই ধান।
(একই ক্ষেতে সে ধান ফলেরে) (একই ভাতে একই রক্ত ব'য়ে যায়)
এক ভাই না খেতে পেলে
কাঁদে না কোন ভায়ের প্রাণ ?
(এমন পাষাণ কোথা আছে রে) (এমন কঠিন কেবা আছে রে ?)

গুরুসদয় দত্ত গ্রামের গীতে লিখিয়াছেন :—



গুরুসদয় দত্ত

ভুলি, হিন্দু মুসলমান, করব ভ্রাতৃস্নেহ দান
একই মায়ের দেওয়া মোদের দুই ভাইয়েরই প্রাণ
(মোদের দুই ভাইয়েরই প্রাণ) (মোদের দুই ভাইয়েরই প্রাণ)
(মোরা) ভ্রাতৃবিবাদ বেঁধে দেশের করব না আর সর্ব্বনাশ)
করব মোরা চাষ—সবাই করব মাটির চাষ।

বাঙ্গালার হিন্দু মহিলা কবিগণও এ বিষয়ে নীরব নহেন। 'আলো ও ছায়া'র কবি স্বপ্নে "একতায় বলী জ্ঞানে গরী-



কামিনী রায়

য়ান" ভারত সন্তানের যে দিব্যমূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন 'সে স্বপ্ন সার্থক করিয়া কি সে দিব্যোজ্জ্বল মূর্ত্তি জাতিসমক্ষে প্রকাশিত হইবে না ?

"আমি শুনিনু জাহ্নবী যমুনার তীরে পুণ্য-দেব-স্তুতি উঠিতেছে ধীরে,
কৃষ্ণা, গোদাবরী, নর্ম্মদা, কাবেরী, পঞ্চনদ কূলে একই প্রথা
আর, দেখিনু যতেক ভারত সন্তান, একতায় বলী, জ্ঞানে গরীয়ান্,
আসিছে যেন গো তেজো মূর্ত্তিমান, অতীত সুদিনে আসিত যথা

ঘরে ভারত-রমণী সাজাইছে ডালি, বীর শিশুকুল দেয় করতালি,
মিলি যত বালা গাঁথি জয়মালা, গাহিছে উল্লাসে বিজয় গাথা।

কিন্তু দ্বন্দ্ব, দলাদলি, দ্বেষ ত্যাগ করিয়া, দেশকে সত্য করিয়া ভাল না বাসিলে, সত্যকে বরণ না করিলে সে স্বপ্ন সফল হইবার সম্ভাবনা কোথায়? তাই তিনি পুনশ্চ লিখিয়াছেন :—

ক্ষান্ত হও, ভ্রান্ত দল, দেশের কল্যাণ
হবে না এ পথে। যদি চাহ শিখাইতে
মনুষ্যত্ব, সর্বোপরি সত্যে দাও স্থান।

* * *

দেশের মানুষে যারা সত্য ভালবাসে
স্বদেশীর মনুষ্যত্বে তারা শ্রদ্ধা করে,
আপনারে বাড়াবার একান্ত প্রয়াসে
দ্বন্দ্ব দলাদলি দ্বেষে দেশ নাহি ভরে।
সে কি দেশ-প্রেম যাহা ক্ষিপ্ত মত-ভেদে,
হারাইলে নেতৃপদ মরে সন্ত খেদে?

সর্ব্বশেষে আমরা মাননীয়া শ্রীযুক্তা সরলা দেবীর সেই ভেদরিপুবিনাশিনী মহাজাতি সংগঠনী বাণী পুনরুচ্চারিত করি :—

ভেদ রিপু-বিনাশিনী মম বাণি! গাহ আজি ঐক্যতান!
মহাবল বিধায়িনী মম বাণি! গাহ আজি ঐক্যগান!
মিলাও দুঃখে, সৌখ্যে, সখ্যে, লক্ষ্যে, কায় মনঃপ্রাণ
বঙ্গ, বিহার, উৎকল, মান্দ্রাজ, মারাঠ, গুর্জ্জর, পঞ্জাব, রাজপুতান,
হিন্দু, পার্সি, জৈন, ইসাই, শিখ, মুসলমান!
গাও সকল কণ্ঠে, সকল ভাবে, 'নমো হিন্দুস্থান!'
সকল জন উৎসাহিনী মম বাণি! গাহ আজি নূতন তান!
উঠাও কর্ম্ম নিশান! ধর্ম্ম বিষাণ! বাজাও চেতায়ে প্রাণ!
বঙ্গ, বিহার, উৎকল, মান্দ্রাজ, মারাঠ, গুর্জ্জর, পঞ্জাব, রাজপুতান,—
হিন্দু, পার্সি, জৈন, ইসাই, শিখ, মুসলমান!
গাও সকল কণ্ঠে, সকল ভাবে, 'নমো হিন্দুস্থান!'

আমরা এই প্রবন্ধে কয়েকজন কবির কয়েকটি মাত্র কবিতার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াছি, বাঙ্গালা সাহিত্যে আরও অনেক এইরূপ নিদর্শন পাওয়া যাইবে। যখন স্বার্থ জাতীয় কল্যাণের পরিপন্থী হয়, সাম্প্রদায়িকতা সত্যকে তমসাচ্ছন্ন করিতে প্রয়াস পায়, তখন জাতিকে উন্নত, উদার, সাম্প্রদায়িকতামুক্ত করিবার ভার সাহিত্যের। সেইজন্য পরিশেষে এই নিবেদন যে, কবি,



শ্রীযুক্তা সরলা দেবী

কথাসাহিত্যিক, দার্শনিক, চিত্রশিল্পী, কলাবিদগণ সকলেরই অবহিত হইয়া তাঁহাদের প্রতিভা দেশের ও জাতির কল্যাণের জন্য বিনিয়োজিত করুন। ভারতবর্ষে বাঙ্গালীই সর্ব্ববিষয়ে অগ্রণীর কার্য্য করিয়াছে। সেইজন্য বাঙ্গালীকেই এই ভার গ্রহণ করিতে হইবে।

খানকয়' চিঠি

শ্রীঅলকা মুখোপাধ্যায়

(প্রথম চিঠি)

কল্যাণীয়াসু, অনুরাধা—

হঠাৎ তোমাদের না বলে চলে আসাটা আমার অত্যন্ত অন্যায় হ'য়েছে, সে কথা নিজের দেশ থেকে তিন হাজার মাইল দূরে এসে প্রথম মনে হল।

যে মানুষটা ছোট্ট একটা দুর্ঘটনা সহ্য করতে পারত' না, সে এমন ভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে এসে পড়বে এটা যেন আমার নিজেরই বিশ্বাস হচ্ছে না! ভাবছি কি করে সম্ভব হল! তোমরাও নিশ্চয় এ খবরটা পেয়ে জল্পনা কল্পনায় তোমাদের সান্ধ্য আসরটা ভরিয়ে ফেলবে! দেখেছ, তোমাদের কাছ থেকে দূরে চলে এসে তোমাদের কত আপন মনে করছি? আমি এমন একটা কিছু নই যে আমাকে উপলক্ষ করে তোমাদের আলোচনা চলতে পারে! বড় জোর বলবে 'বেচারি'! কিম্বা হয়ত' বলবে, কেন যে গেল!

সত্যি কেন এলাম? কেন এলাম এ প্রশ্নের উত্তরটা কিছুতেই ঠিক করতে পারছিনা। একবার মনে হয়েছে জীবনে উত্তেজনার অভাব হয়েছিল তাই, কিন্তু সত্যিই কি তাই? তোমরা হয়ত' ভাবছ' বাহাদুরী? আশ্চর্য্য, এটুকুও বোঝ'না যে বাহাদুরী দেখাতে মরণকে আলিঙ্গন করাটা নিতান্ত অস্বাভাবিক! আর বাহাদুরী দেখাব কাকে? তোমাকে? তুমি আমার কে? হঠাৎ পথের ধারে তোমার সঙ্গে আমার দেখা।

তারপর মাঝে মাঝে আমাদের অল্পবিস্তর কথা, হাসি, ছাড়া ছাড়া আলাপ আলোচনা। ভাগ্যিস দিদি আমায় স্নেহ করতেন তাই, তা না হ'লে তোমার দেখাও হয়ত' মিলত' না!

তুমি যে আমায় কোনদিনও দেখতে পারতে না, আমার ওপর তোমার যে ভয়ানক একটা রাগ আছে, সান্ধ্য আসরে কথায় কথায় আমাকে তুমি যে অপমান করতে, আজকের আমাদের মধ্যে দূরত্বের দোহাই দিয়ে আমি তা ভুলে গেছি। আমার কেবলই মনে হচ্ছে তুমি আমার কত আপনার! আমি চলে আসাতে নিশ্চয় খুব খুসী হ'য়েছ, তোমাদের সান্ধ্য আসরটার মধুরত্ব নষ্ট করবার জন্তে আমি আর নেই বলে? খুসী হয়েছ সন্দেহ নেই, কিন্তু আমার উপস্থিতির মধ্যে যে তিক্ততাটা ছিল তার অভাব তুমি নিশ্চয় অনুভব করবে, আমার মন বার বার এই কথাটাই ভাবছে!

তুমি হয়ত' ভাবছ, গোটা বাঙলা দেশে এত' লোক থাকতে তোমাকেই বা চিঠি লিখছি কেন? এ কেনর উত্তর কোনদিনও পাবে না।—তোমার উত্তরের আশাও আমি করিনা, বলাই বাহুল্য! ফ্রন্টে একটা রীতি আছে—রাত্রির অন্ধকারে কারো কথা ভাবা, তার বিষয় অত্যন্ত রঙচঙে আলোচনা করা! আমার মন তাই তোমাকে নিয়েই খেলা করে। সকলের কাছে তোমার গল্প করি, তুমি যা নও, ঠিক তাই বলে তোমাকে প্রচার করি। তুমি আমাকে যতখানি কর ঘৃণা, আমি ঠিক ততখানি স্নেহের গর্ব্ব করি! তুমি শুনলে তোমার অপমান মনে হত, কিন্তু এরা শুনে আমাকে হিংসে করে। আজ রাত হল, আলো নেভাবার হুকুম শুনছি, চিঠিখানাও তাই শেষ করতে হল! ইতি—

—অভিজিৎ

* * * *

(দ্বিতীয় চিঠি)

কল্যাণীয়াসু, অনুরাধা—

তিনমাস আগে তোমাকে চিঠি দিয়েছিলুম সাহারা মরুভূমির বুকের ওপর তাঁবুতে বসে, আজ দিচ্ছি অন্ত জায়গা থেকে। জায়গার নাম বল' বারণ অথচ জায়গাটা এতই সুন্দর যে কি বলব'।—বিশাল নদীর ধারে আমাদের ছোট্ট তাঁবু। নদীটা প্রকাণ্ড বড় এবং নাম করা, আদি অন্ত মেয়েদের মনের মতন সীমাহীন। নামটা বলতেই হল, কিন্তু কি করে বোঝাই তোমাকে! আচ্ছা, ধর যে রংয়ের সাড়ী পরলে তোমাকে সব চাইতে বেশী মানায়, নদীর আগে সেই রংটা বসিয়ে নাও! বুঝেছ'? সেই নদী, পাশ দিয়ে অনন্ত ব'য়ে চলেছে! মনটা আমার তারই সঙ্গে সঙ্গে ছুটে চলেছে! কোথায় এসে পড়লাম জান' দেশের নদীর ঘাটে। বেশ মনে আছে গঙ্গার ধারে শান বাঁধান' ঘাট, সেইখানে পা ঝুলিয়ে বসে থাকা। সন্ধ্যায় মন্দিরে মন্দিরে কাঁসর ঘণ্টা, বাড়ীতে বাড়ীতে শাঁখ! সত্যি, কি সুন্দর আমাদের জীবনটাই না ছিল। সন্ধ্যার অনুজ্জ্বল আলোয় বাড়ী ফিরে দেখতাম গলবস্ত্র হ'য়ে মা প্রণাম করছেন উঠানের কোণে তুলসীমঞ্চের তলায়। অন্ধকারে প্রদীপটা জ্বলতো, মার মুখের ওপর আলো পড়ত'—মনে হতযেন স্বর্গের একটা জ্যোতি। মা প্রণাম সেরে শাঁখ বাজিয়ে সন্ধ্যাকে বরণ করতেন, রাত্রি ছুটে আসত'। শাঁখের আওয়াজটা মনে হত যেন ভয় ভাবনাকে গর্জন করে তাড়াচ্ছে। প্রথম প্রথম ভয় করত' কিন্তু শাঁখের শব্দটায় কি যে যাদু ছিল, কিছুতেই আর ভয় করত' না! ফ্রন্টে ফ্রন্টে মরণের লীলা খেলা, ভয় নেই, শঙ্কা নেই, ভাবনা নেই। মরণ যেন দরজার পাশে দাঁড়িয়ে, মায়া মমতা সব গেছে, অভাব খালি সেই অলস সন্ধ্যায় শাঁখের শব্দের, অভাব শুধু মার সেই প্রণাম-রতা মূর্ত্তি! সেই যে প্রদীপের আলো, মার মুখের ওপর একটি রেখা হয়ে পড়ত' আর বাড়ীর দেওয়ালে সেই যে ছায়াটা সুন্দর একটা শ্রী রচনা ক'রে দুলে দুলে উঠত' তার জন্তে মনটা কাঁদে। নিজের ওপর অভিমান হয় আসবার আগে কেন ভাল' করে সেটা আর একবার দেখে এলাম না! এখনও ঠিক তেমনি সন্ধ্যা, মা হয়ত' সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বেলে ভগবানকে প্রণাম করছেন, আর মনে মনে বলছেন 'খোকাকে দেখ' ঠাকুর!—আমি ঠিক তাঁর পাশটিতে দাঁড়িয়ে তা কি তিনি দেখতে পাচ্ছেন! পেছন ফিরে চাইলেই আমায় দেখতে পাবেন, গেঞ্জি পরা, কোমরে কাপড় জড়িয়ে, খালি পায়ে উঠানের পাশে দাঁড়িয়ে নমস্কার করছি, ঠিক তেমনি, যেমনি আমি চিরকালের! আশ্চর্য্য, তোমাকে এসব কথা লিখছি কেন? তুমি চিরদিন চায়ের টেবিলে সন্ধ্যা কাটিয়েছ, মোটর গাড়ীর হর্ণ শুনেছ, ছায়াগৃহে নকল জীবনের নকল অভিনয় দেখেছ'—শাঁখ বাজানোর মধ্যে যে দেবতার আশীর্ব্বাদ আছে তা তুমি কি করে জানবে! তা হ'ক, হলেই না হয় তুমি পোষাকী সভ্যতার প্রতিমূর্ত্তি, তবু তোমার মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যা আমার মার সঙ্গে অনেক মেলে! তোমাকে বাপু চায়ের টেবিলের চাইতে রান্নাঘরেই মানায় বেশী! কেন তোমাকে এত কথা লিখছি জান'—তোমাকে যখনি আমি দেখি তখনই তোমাকে প্রণাম-রত অবস্থায় তুলসীমঞ্চের তলায় অথবা প্রদীপ হাতে দেখি। কল্পনায় দেখি দুহাতে প্রদীপটিকে সযত্নে ঢেকে তুমি নিয়ে যাচ্ছ বাতাস বাঁচিয়ে! পরণে তোমার চওড়া লাল পাড় সাড়ী, এলান তোমার চুল—, কপালের লাল সিঁদুর-টিপটিও অন্ধকারে উজ্জ্বল! মার মতন তোমাকেও দেখি গভীর নিশীথে হিসেবের খাতা হাতে, কিম্বা কালকের বাড়ন্ত চালের কি ব্যবস্থা হবে তারই আকাশ পাতাল ভাবনা করতে! তোমাকে দেখি রান্না ঘরে, কাপড়ে হলুদের দাগ, কোমরে কাপড় জড়ান', উনুনের গরমে আরক্তিম তোমার গাল দুখানি, ঘামের বড় বড় ফোঁটা মুক্তোর মতন! কিম্বা দেখি, দালানে বসে, এলান' চুল, কুটনো কুটছ', ঝি পাশে আলু ধুয়ে দিচ্ছে, চাকরকে বকছ' হিসেবের ভুল ধরে, কিম্বা কপিটা পোকায় খাওয়া বলে!…

তোমাকে দেখি স্বামীর সঙ্গে পরামর্শ করতে, মেয়ে তোমার বড় হয়েছে চার বছরের, তার জন্তে কি রংয়ের কাপড় মানাবে, কেমন ছাঁটের তারই বিষয়! তোমাকে দেখি সেই মানবীরূপে!

তোমার হয়ত' ভাল লাগছে না আমার গ্রাম্য দৃষ্টি: কি করবে বল' দেবতার আমি এমনি অদ্ভুত সৃষ্টি। তুমি আমাকে যতখানি ঘৃণা কর, তোমাদের সহুরে সভ্যতাকে আমি ঠিক ততখানি ঘৃণা করি! তোমাদের সভ্যতার সবটাই ঠুনকো, সবটাই কৃত্রিম, সবটাই বাঁকা। তোমাদের জীবন নেই, তোমাদের প্রাণ নেই, তোমাদের আছে খালি অভিনয়! তোমরা জীবনটাকে করেছ' খেলার পুতুল, প্রকৃতিকে তোমরা কর অবহেলা! ছয় ঋতুকে তোমরা রবিঠাকুরের কবিতায় ছাড়া অন্ত কোথাও দেখনি, ফুলকে তোমরা কাগজের রংয়ে এঁকে

বসবার ঘর সাজাও! শরৎকালের ভাসা ভাসা সাদা কালো মেঘ যখন আকাশের গায়ের ওপর দিয়ে দুরন্ত প্রজাপতির মতন ছুটে চলে যায়, কাশের বনে যখন দোলা লাগে, সাদা সাদা কাশ ফুল যখন দোল খায় ছোট্ট একরত্তি মেয়ের মতন—তখন তোমরা যাও সিনেমার নকল ছবি দেখতে—এই ত তোমরা সভ্য! প্রকৃতিকে তোমরা দুহাতে ঠেলে রেখেছ' দৃষ্টির বাইরে, অথচ জান'না, এই প্রকৃতিই তোমাদের মা! মানব মনের সহজ সরল প্রকাশকে তোমরা প্রকাশ্যে বল অসভ্যতা, অন্তরালে বল জীবন! জীবনের তোমরা কি জান'? তোমাদের সভ্যতায় জীবন' নেই, আছে মরণ!

রাগ করছ'? কি করব বল, তোমাদের পাশ্চাত্য বাতাসে দোল খাওয়া সভ্যতার ওপর আমার একটা ভয়ানক রাগ আছে; তার কারণ হল, এমনই নিষ্ঠুর এই সভ্যতা যে তোমার মতন জন্মগত মা যারা, সংসারের মানবী যারা, দেবতার আশীর্ব্বাদ মাথায় শান্তির দূত যারা, তাদের সংসার থেকে, সত্যিকার জাতির কাজ থেকে দূরে ঠেলে রেখেছে! এই অসভ্য ব্যঙ্গের আওতা থেকে তোমাদের মুক্ত করতে না পারলে আমার পোড়া জাতির মুক্তি নেই!

কিন্তু আশ্চর্য্য তোমাকে 'এত' কথা কেন লিখছি? দিদির স্নেহ, মায়া আমাকে ঘিরে রয়েছে—তাঁকে লিখলেই ত' পারতাম! তিনি আমাকে যত স্নেহ করেন আমি তাঁকে তত করি অবহেলা, আর তুমি আমাকে যত কর ঘৃণা, ততই কর আকর্ষণ! তোমাদের কাছ থেকে এত' দূরে বলেই বোধহয় তোমার ঘৃণাটাও আমার কাছে মধুর! কিন্তু শুধুই কি দূরত্ব, না আর কিছু! ইতি—

তোমাদের—অভিজিৎ

* * * *

(তৃতীয় চিঠি)

সুচরিতাসু অনুরাধা—

তোমার চিঠি একমাস হ'ল পেয়েছি। চিঠি লিখতে বারণ করবার ঘটা দেখে মনে হচ্ছে নিতান্তই তোমার কাছে আমি ঘৃণ্য। যাক গে ও কথা, মৃত্যুর দরজায় দাঁড়িয়ে মনের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হয়, ঘৃণাটাও মধুর মনে হয়। আমাদের এখানকার যদি কেউ আমাকে অপমানসূচক কোন কথা বলে, তাহ'লে হয়ত' তাকে একটা গুলিতেই শেষ করে দেব, ঠিক মশা মারার মতন, কিন্তু সুদূর বাঙলা দেশের রঙ মাখান তোমার মতন মানবীর অপমানসূচক কথাগুলো পর্য্যন্ত ভাল' লাগে। নিজের কথা কিছু লিখব' না, আমার মনের খোঁজে তোমার কোন উপকার হবেনা তা তুমি জানিয়েছ, কাজেই তোমার যাতে ঘোরতর আপত্তি, সেরকম কোন কাজ আমি করব' না।

হঠাৎ কানা ঘুঁষো শুনতে পেলাম অন্নের অভাবে বাঙলার ঘরে ঘরে কান্নার রোল উঠেছে, মৃত্যুর লীলা খেলা চলছে; পথের ধারে কুকুর বেড়ালের মতন নাকি আমার বাঙলার মা বাপ ভাই বোন মরছে। খবরটা সঠিক জানবার উপায় নেই, তাই তোমার কাছে বিনীত অনুরোধ—যদি পার' তোমার বন্ধু অমিতবাবুকে দিয়ে আমার গ্রামের বাড়ীর খোঁজ নিও, আশঙ্কা হচ্ছে আমার গরীব ছোট্ট সংসারটা হয়ত' অন্নহারাদের দলে প'ড়ে ভেসে গেছে। আমার সংসারে থাকবার মধ্যে আছে মা, আর আছে অতীত দিনের উজ্জ্বল স্মৃতি। গ্রামের নাম তুমি জান', সেখানে গিয়ে সর্ব্বমঙ্গলা ঠাকুরের পাড়ায় আমার নাম করলেই আমার ঠিকানা সহজেই মিলবে। আমাদের ঐ সর্ব্বমঙ্গলার পাড়ায় অমঙ্গলের তিলক পরে লক্ষ্মীছাড়া হ'য়ে আমি ছাড়া আর কেউ জন্মায়নি।

সামনের মাসে তিনমাসের ছুটি পাওয়া যাবে। অনেকেই দল বেঁধে বাড়ী ফিরবার জন্যে এখন থেকেই গোছ গাছ আরম্ভ করেছে, আনন্দের আতিশয্যে ভুলেই গেছে যে একদিনের একটি গোলায় সব ওলোট পালট হ'য়ে যেতে পারে। হতভাগার দল আমরা—বাঙলা দেশের কল্পনাতেই কেঁপে উঠি, হয়ত' বাড়ী ফিরতে পারি, এই আশাতেই আমাদের মনে নানান পাগলামীর রঙ লেগেছে। সকলেই বাড়ী যাবে দিনরাত ছেলে মেয়ে মা ভাই বোনেদের স্বপ্ন দেখছে, ওদের দিন তাই অনেক রকম দিবা স্বপ্নের একটি রূপ! আমরা এখানে বাইশজন বাঙালী, একুশজন বাড়ী যাবে। বাদ পড়েছি আমি। এখানে আছি তাই মনে হচ্ছে গোটা বাঙলা দেশটাই আমার আত্মীয়, কিন্তু বাঙলা দেশের মাটিতে পা পড়বার সঙ্গে সঙ্গে আমি যে সর্বহারা এই কথাটাই সব চেয়ে বড় হ'য়ে উঠবে। তোমার কাছে মার খবরটা না পাওয়া পর্য্যন্ত আমার বাড়ী যাওয়া হবে না। যদি অঘটন কিছু ঘটে থাকে তাহ'লে তোমার কাছে সে খবরটা পাওয়াই ভাল, কারণ সেই খবরের সঙ্গে সান্ত্বনাসূচক দু একটা কথা যা পার, আমার তাই লাভ! এটা ঠিক জানি, যদি কখনও জানতে পার' যে ত্রিভুবনে আমার আপন বলতে কেউ নেই, তাহ'লে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্বেও অন্ততঃ দু একটা ভাল' কথা তোমাকে বলতেই হবে। তুমি হয়ত' বলবে দায় পড়েছে আমার, কিন্তু আমি ভুলি কি করে—যে তুমি আমার মায়ের জাতের মানুষ। যেখানে সব চেয়ে বড় শূন্য, সেইখানেই তোমরা সব চেয়ে বড় অন্নপূর্ণা। যদি বা সান্ত্বনাসূচক, অথবা সহানুভূতি জানিয়ে কিছু লেখ' তাহ'লে আমার সর্বহারা জীবনে তার প্রভাব যা হবে তার চেয়ে বেশী লাভ হবে এই কথাটা জেনে যে আমার বাঙলা দেশের মাতৃজাতি, নকল সভ্যতায় নিজেকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দেয়নি, এখনও সর্বহারা যারা তাদের আপন করবার দরকার হ'লে সব কিছু ভুলে গিয়ে তারা আপনা থেকেই এগিয়ে আসে। তারা প্রাণহীন সভ্যতার মানুষ হলেও, এখনও তারা অন্নপূর্ণা হ'তে পারে! মার খবর দিও। ইতি—

তোমারই অভিজিৎ—

* * * *

(চতুর্থ চিঠি)

অনুরাধা,

তোমার চিঠি আজও পাইনি, তিনমাস হ'ল। বুঝতে পারছি তুমি চাওনা আমি তোমায় চিঠি লিখি। তাই এবার আর নিজের হাতে চিঠি লিখছিনা ক্যাম্প হস্‌পিটালের একটি নার্সকে দিয়ে চিঠি লেখাচ্ছি। আমার হাতের চিঠি তুমি শেষ পর্য্যন্ত পড়'না এইরকম একটা অভিমানভরা ধারণা আমার হয়েছে।

আজ নিজের কথা কিছু বলব' না। আমার এক বন্ধু চারদিন হল যুদ্ধক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে আহত হয়েছে, বাঁচবে কিনা সন্দেহ। গতকাল তার অপারেশন হল, কোন রকমে মিথ্যে কথা বলে তাকে শক্তি দিয়েছি, আর পারছিনা। তার কথাই তোমায় আজ বলব'। তোমায় তার একটা উপকার করতে হবে, উপকার পরে বলছি।

বন্ধুটির নাম জ্যোতি। বাড়ীতে তার কেউ নেই, আছে ছোট্ট একটা সংসার, তার স্ত্রীর নাম মানবী! ছ' মাস আগে সে আমায় কথায় কথায় একদিন বলেছিল যে আর মাস পাঁচেক পরে তার বাড়ীতে আসবে একটি নতুন মানুষ, নাম রাখবে তার 'শ্রীলেখা'। এই যে নতুন মানুষ আসবে, তার ছোট্ট সংসার ভরে উঠবে, এই কল্পনায় তার বিলাস, তার শূন্য সন্ধ্যা, তার নীরব, নির্জন পৃথিবীর রঙিন রূপ। কত গল্প, কত বিবরণ, কত কথা। বেশ মনে আছে এক একদিন মানবীর কথা বলতে বলতে তার মুখে চোখে গর্বের রঙ ফুটে উঠত' আনন্দের আতিশয্যে সে দুলে দুলে উঠত'। কি যে গর্বের জিনিষ তার মানবী—তা ওর কথা বলার ভঙ্গি দেখেই আমি বুঝতাম। মানবী ত' নয় যেন স্বর্গের শান্তি ধারা, ওর সংসারের দুকুল প্লাবিত করে এসেছে। একদিন ওর সংসারে সে ছোট্ট শিশু আনবে এই চিন্তাটাই ওর স্বর্গ। ওরা দুজনে মিলে ঠিক করেছে মেয়েটির নাম রাখবে শ্রীলেখা। শ্রীলেখা কবে আসবে, কিন্তু এখন থেকেই ও শ্রীলেখার এমন নিখুঁত ছবি মনে মনে এঁকে নিয়েছে যে মনে হয় ও যেন র‍্যাফেল আর মানবী যেন ম্যাডোনা। যুদ্ধের পর মানবী আর শ্রীলেখাকে নিয়ে ওর সংসার জমজম করবে, এই ওর মনের একান্ত গোপন আশা। ওরা তিনজনে রচনা করবে একটি স্বর্গ, যার সমস্ত সৌন্দর্য্য হবে মানবী। মানবীকে ও যে কত ভালবাসে তা বোঝাতে গিয়ে এক একদিন ও কেঁদে ফেলত'! কথা হারিয়ে যেত, ও থেমে যেত', তন্ময় হয়ে মানবীর কথা ভাবত'। সন্ধ্যার বিদায় রশ্মি ওর মুখের ওপর যে ছায়া আঁকত তা নিপুণতম শিল্পীও বোধহয় পারত'না। সে দৃশ্য না দেখলে তুমি বুঝবে না, আমিও বোঝাতে পারব' না।

চারদিন আগে ও যুদ্ধক্ষেত্রে আহত হয়, ওরই এক বন্ধু পিঠে করে ওকে নিয়ে আসে। প্রথম যেদিন ওর অপারেশন হয় সেদিন গোড়া থেকেই মানবীর জন্যে শ্রীলেখার জন্যে ও কাঁদতে থাকে, চিৎকার করে বলতে থাকে, এ জীবনে আর হয়ত' ওদের কাউকেই দেখতে পাব' না! ডাক্তারবাবু বললেন—অপারেশন করতে ভরসা পাচ্ছিনা, ওর শক্তি নেই। আমি একটা মতলব করলাম। আঁকা বাঁকা হাতের লেখায় লিখলাম "বাপী, তুমি কবে আসবে, আমি এসেছি। শ্রীলেখা।" মৃত্যুর সামনে ও যখন ঝিমিয়ে পড়েছে তখন ওকে চিঠিখানা দেখালাম। ও যেন নতুন প্রাণ পেল। ওর মনের স্পষ্ট ধারণা ওর শ্রীলেখা এসেছে, মানবী ওকে এই কথাটা জানিয়েছে। এই কথাটাই ওর মনে এতখানি প্রভাব বিস্তার করেছে যে প্রথম অপারেশনে ও টিকে গেছে। এবার তোমায় একটা কাজ করতে হবে।—নম্বর বেকার ষ্ট্রীটে ওদের বাড়ী। তুমি একবার তাদের বাড়ীতে যাবে, খবর নেবে মানবী কেমন আছে, শ্রীলেখা কেমন আছে। হয়ত' তারা আর ও বাড়ীতে নেই ওখান থেকে উঠে গেছে। যদি তা গিয়ে থাকে তাহ'লে তুমি নিজে একটা চিঠি লিখবে, এমন ভাবে এমন কথা লিখবে যা আমি বন্ধুটিকে দেখাতে পারি। মানবীর চিঠি আমি দেখেছি, ঠিক তোমার হাতের লেখার মতন, কাজেই কোন ভয় নেই! আমার ধ্রুব বিশ্বাস তোমার হাতের চিঠি পেলে বন্ধুটি এ যাত্রা টিঁকে যাবে। মৃত্যুর সঙ্গে আজ যে যুদ্ধ করছে, তাঁকে বাঁচাতে তুমিই একমাত্র পার'। আমাকে ত' তুমি ঘৃণা কর, বন্ধুর জীবনটা বাঁচাতে তুমি একবার না হয় অভিনয় করলে! একটা জীবন বাঁচাতে না হয় তুমি কয়েক মিনিটের জন্যে মানবী সাজলে, ক্ষতি কি! তবু ত' মনে থাকবে, আমায় ঘৃণা করলেও, আমার একটা অনুরোধ তুমি ফেলতে পার'নি! তোমার লেখা কয়েকটা লাইনের ওপর জীবন মরণ নির্ভর করছে। হোক তা মিথ্যা, হোক তা অভিনয় তবু তুমি লিখ', কেমন? ভুলে যাবে না ত'? ইতি—

তোমারই!

* * * *

(অনুরাধার চিঠি)

আমার জ্যোতি,

ভয় করছে চিঠি লিখতে শেষ পর্য্যন্ত তোমার কাছে চিঠি পৌঁছবে কিনা। না ব'লে চ'লে গিয়েছিলে, আমার ওপর অভিমান ক'রে, তাই আমারও অভিমান হ'য়েছিল তোমার ওপর। তোমার চিঠি সব কটাই পেয়েছি, নিতান্ত অভিমান ভরে তার জবাব দিইনি, একথা তুমি বোঝনি। এবার নিজের ওপর অভিমান হচ্ছে, চিঠি না দিয়ে ভুল করেছি, হয়ত' দেরী হয়ে গেল। তবু আমার মন বলছে তুমি চিঠি পাবে। ওগো আমার সর্বস্ব তুমি ফিরে এস', তোমার মানবী তোমার অপেক্ষায় আছে।

তোমার কল্পনার 'শ্রী' আমার বাস্তব জীবনে সবখানি ভরে আছে। তার কথা লিখতে লজ্জা করছে, তুমি এলে সব বলব'। শ্রীর কথা জিজ্ঞেস করে এমন ভাবে কি লজ্জা দিতে হয় দুষ্টু টি!

তোমারই আশাপথ চেয়ে,

মানবী।

* * * *



ইভা দেবীর ভ্যানিটি-ব্যাগ

(নাটিকা)

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

চতুর্থ অঙ্ক

দৃশ্য—প্রথম দৃশ্যের মতই।

ইভা। (সোফায় শায়িত অবস্থায়) কেমন ক'রে তাঁকে বলব? বলতে পারব না। বলতে গেলে আমি ম'রে যাব। সেই ভীষণ ঠাঁই থেকে পালিয়ে আসবার পর কী যে ঘটেছে, কে জানে! মিসেস্ রায় হয়তো সেখানে তাঁর উপস্থিতির আসল কারণ খুলে বলতে বাধ্য হয়েছেন, আর আমার সেই মারাত্মক 'ভ্যানিটি-ব্যাগ'ও যে কেন সেখানে প'ড়ে ছিল, তাও হয়তো না ব'লে পারেন নি। (করুণ স্বরে) মাগো! যদি তিনি সব জেনেই থাকেন, কেমন ক'রে আর তাঁকে মুখ দেখাব? তিনি কখনই আমাকে ক্ষমা করবেন না। ভ্রম, পাপ, প্রলোভন থেকে মুক্তি পেয়েছি ভেবে মানুষ কেমন নিশ্চিন্ত জীবন-যাপন করে। তারপর হঠাৎ যেন হয় বিনা মেঘে বজ্রপাত! ওঃ, জীবন হচ্ছে ভয়াবহ! জীবনই আমাদের শাসন করে, আমরা তাকে শাসন করতে পারি না।

নয়নতারার প্রবেশ

নয়ন। রাণীজি কি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন?

ইভা। হ্যাঁ। রাজা-বাহাদুর কাল কত রাতে বাড়ী ফিরেছেন, সে কথা কি তুমি জানো?

নয়ন। রাজা-বাহাদুর বাড়ী ফিরেছেন শেষ রাতে।

ইভা। শেষ রাতে? তিনি কি আমার দরজার সামনে এসে আমাকে ডেকেছিলেন?

নয়ন। আজ্ঞে হ্যাঁ রাণীজি! আমি তাঁকে বললুম, এখনো আপনার ঘুম ভাঙেনি।

ইভা। শুনে তিনি কি বললেন?

নয়ন। যেন আপনার ভ্যানিটি-ব্যাগের কথা কি বললেন। আমি ভালো ক'রে সব-কথা শুনতে পাইনি। হ্যাঁ রাণীজি, আপনার ভ্যানিটি-ব্যাগটি কি হারিয়ে গেছে? আমি সেটিকে খুঁজে পেলুম না, শ্রীধরও সব ঘর খুঁজে বললে, ব্যাগ কোথাও নেই।

ইভা। ও-নিয়ে তোমাদের কারুকে মাথা ঘামাতে হবে না। যাও।

নয়নতারার প্রস্থান

(উঠে বসলেন) মিসেস্ রায় নিশ্চয় সব বলেছেন। মানুষ স্বেচ্ছায় পরের উপকার, আত্মত্যাগ করতে চায়—কিন্তু তার পরে হয়তো আবিষ্কার করে সে আত্মত্যাগের মূল্য কি নিদারুণ, তখন নিজের ইচ্ছা দমন করা ছাড়া তার আর কোন উপায় থাকে না। আমাকে সর্ব্বনাশ থেকে বাঁচাতে গিয়ে মিসেস্ রায় কেন নিজের সর্ব্বনাশ করবেন?……কি আশ্চর্য্য! মিসেস্ রায়কে আমি নিজের বাড়ীতে ব'সে সকলের সামনে অপমান করতে চেয়েছিলুম! কিন্তু তিনি পরের বাড়ীতে গিয়ে আমাকে বাঁচাবার জন্যে নিজের অপমানও স্বীকার ক'রে নিলেন!……যে-ভাবে আমরা সতী আর অসতী মেয়েদের নিয়ে কথা কই, তার মধ্যে লুকিয়ে থাকে অদৃষ্টের তিক্ত পরিহাস……কি কঠোর শিক্ষা! কিন্তু দুঃখের কথা এই, যখন শিক্ষালাভ ক'রে আমাদের চোখ ফোটে, তখন সে-শিক্ষা আর আমাদের কাজে লাগে না। কারণ, মিসেস্ রায় যদি কিছু ব'লেও না থাকেন, আমাকে সব বলতে হবেই। কি লজ্জা, কি লজ্জা! সে কথা বলবার সময় আবার আমাকে কালকের রাতের সব যাতনাই নতুন ক'রে ভোগ করতে হবে। (হঠাৎ চমকে উঠে) ঐ, ঐ উনি আসছেন!

রাজা নরেন্দ্রনারায়ণের প্রবেশ

রাজা। (ইভার কাছে এসে তাঁর কণ্ঠে বাহুবেষ্টন ক'রে) ইভা, তোমার মুখ কি শুকনো দেখাচ্ছে!

ইভা। কাল আমার ভালো ক'রে ঘুম হয় নি।

রাজা তাঁর পাশে সোফার উপরে বসলেন

রাজা। আমার বড় অন্যায় হয়েছে। আমি শেষ-রাতে বাড়ী ফিরেছি। তোমার কষ্ট হবে ব'লে তোমাকে জাগাতে চাই নি। ইভা, তুমি কাঁদছ!

ইভা। হ্যাঁ রাজা, আমি কাঁদছি! তোমাকে আমি কিছু বলতে চাই।

রাজা। ইভা, তোমার শরীর ভালো নেই। আজকাল তুমি অতিরিক্ত পরিশ্রম করছ। চল, ছুটি নিয়ে দিন-কয়েক বাইরে বেড়িয়ে আসি। কোথায় যাবে? ওয়াল্টেয়ার, দার্জ্জিলিঙ না নৈনিতাল? ইচ্ছা কর তো আজকেই আমরা বেরিয়ে পড়তে পারি। আচ্ছা, সেই ব্যবস্থাই করছি।

উঠে দাঁড়ালেন

ইভা। হ্যাঁ রাজা, চল আমরা সহর ছেড়ে পালাই। না, না, আজতো আমার যাওয়া হবে না! সহর ছেড়ে যাবার আগে একজনের সঙ্গে আমাকে দেখা করতেই হবে। আমার প্রতি তাঁর অসীম দয়া।

রাজা। (সোফার উপরে হেঁট হয়ে) তোমার উপরে অসীম দয়া!

ইভা। তারও চেয়ে বেশী। (উঠে দাঁড়িয়ে) রাজা, রাজা, তোমাকে আমি সব-কথাই বলব, কিন্তু তারপরেও তুমি আমাকে ভালোবেসো রাজা—আগে যেমন বাসতে, ঠিক তেমনি ভালোবেসো।

রাজা। আগে যেমন ভালোবাসতুম? কাল যে নষ্ট স্ত্রীলোকটা এখানে এসেছিল, তুমি কি তাকে ভেবেই একথা বলছ? (দুই-হাত ধ'রে ইভাকে সোফায় বসিয়ে এবং নিজেও তাঁর পাশে ব'সে) তুমি কি এখনো ভাবছ—না, না, তুমি তা ভাবতে পার না, তোমার তা ভাবা উচিত নয়।

ইভা। না রাজা, আমি সে-কথা ভাবছি না। এখন আমি বুঝতে পারছি, কাল আমি অজ্ঞানের মতন অন্যায় কাজ করেছি।

রাজা। কাল যে তুমি সেই স্ত্রীলোকটাকে অভ্যর্থনা করেছিলে, এতে তোমার মহত্ত্বই প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু আর তার সঙ্গে কখনো তোমার দেখা হবে না।

ইভা। কেন তুমি ও-কথা বলছ?

ক্ষণিকের স্তব্ধতা

রাজা। (ইভার হাত ধ'রে) মিসেস্ রায় কেবল নষ্ট নয়, সে হচ্ছে দুষ্ট স্ত্রীলোক, অত্যন্ত দুষ্ট! আমি ভেবেছিলুম, মুহূর্ত্তের ভুলের জন্যে সমাজে সে নিজের যে স্থান হারিয়েছে, সু-পথে থেকে আবার সেইখানে ফিরে আসতে চায়, যাপন করতে চায় ভদ্র-জীবন। তার কথায় বিশ্বাস ক'রে আমি ভুল করেছিলুম। নারীর যতটা মন্দ হওয়া সম্ভব, সে তার চেয়ে কম-মন্দ নয়।

ইভা। রাজা, রাজা, কোন নারীকে নিয়ে অত তিক্ত কথা বোলো না। আজ আমার এ-কথা মনে হয় না যে, মানুষদের ভালো আর মন্দ নাম দিয়ে দুই-ভাগে ভাগ করা যায়—যেন ভালো আর মন্দ হচ্ছে দুটো আলাদা জীব বা আলাদা সৃষ্টি! যাদের আমরা ভালো মেয়ে ব'লে ডাকি, তাদের মধ্যে আসতে পারে পাগলের মত উদ্দামতা, পাপ, হিংসা! আবার মন্দ ব'লে কুখ্যাত নারীদের মধ্যেও থাকতে পারে দুঃখ, অনুতাপ, করুণা, আত্মত্যাগ! মিসেস্ রায়কে আমি মন্দ নারী ব'লে মনে করি না।

রাজা। ইভা, তুমি জান না, সে হচ্ছে অসম্ভব স্ত্রীলোক! ভবিষ্যতে সে আমাদের যত ক্ষতি করবার চেষ্টাই করুক, তুমি আর কখনো তার সঙ্গে দেখা কোরো না। সে কোথাও আশ্রয় পাবার যোগ্য নয়।

ইভা। কিন্তু আমি তাঁর সঙ্গেই দেখা করতে চাই। আমি চাই তিনি আবার আমাদের বাড়ীতে আসুন।

রাজা। কখনো না, কখনো না!

ইভা। একদিন তিনি এখানে এসেছিলেন তোমার অতিথি হয়ে। এখন তিনি আমার অতিথি হয়ে এখানে আসুন।

রাজা। তার এখানে আসাই উচিত হয়নি।

ইভা। (উঠে দাঁড়িয়ে) রাজা, আর ও-কথা বলা চলে না। তুমি যখন নিয়ম ভঙ্গ করেছ, তখন সেইটেই হোক্ আমার নিয়ম।

ধীরে ধীরে অগ্রসর হ'লেন

রাজা। (উঠে দাঁড়িয়ে) ইভা, যদি তুমি জানতে কাল রাতে আমাদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে মিসেস্ রায় কোথায় গিয়েছিলেন, তাহ'লে তুমি আর তার ছায়া মাড়াতেও চাইতে না। সে-এক অত্যন্ত নির্লজ্জ ব্যাপার!

ইভা। রাজা, আর আমি বুকের ভার সহ্য করতে পারছি না। তোমাকে সব কথাই খুলে বলব। আমি কাল রাতে—

শ্রীধরের প্রবেশ। তার হাতের একখানা ট্রের উপরে রয়েছে রাণী ইভার ভ্যানিটি-ব্যাগ

শ্রীধর। মিসেস্ অশোকা রায় রাণীজির এই ব্যাগটি কাল ভুলে নিয়ে গিয়েছিলেন, আজ তাই ফিরিয়ে দিতে এসেছেন। তিনি রাণীজির সঙ্গে একবার দেখা করতে চান।

ইভা। মিসেস্ রায়কে এখানে নিয়ে এস।

শ্রীধরের প্রস্থান

রাজা, মিসেস্ রায় আমার সঙ্গে দেখা করতে চান্।

রাজা। মিনতি ক'রে বলছি ইভা, তার সঙ্গে তুমি দেখা কোরো না। অন্তত আগে আমি গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করি। সে হচ্ছে সর্ব্বনেশে নারী! নারী যে এমন ভয়াবহ হ'তে পারে আগে তা জানতুম না। বুঝতে পারছ না, তুমি কার সঙ্গে দেখা করতে চাইছ!

ইভা। তাঁর সঙ্গে দেখা করা আমার কর্ত্তব্য।

রাজা। কি অবোধ তুমি! তোমার অদৃষ্টে হয়তো কোন বিশেষ দুর্ভাগ্য আছে। যেচে দুর্ভাগ্যকে ডেকে এনো না। তোমার আগে তার সঙ্গে আমার দেখা করা অত্যন্ত দরকার।

ইভা। অত্যন্ত দরকার কেন?

মিসেস অশোকা রায়ের প্রবেশ

মিসেস্ রায়। কেমন আছেন রাণীজি? (রাজার দিকে ফিরে) কেমন আছেন রাজা বাহাদুর? রাণীজি, আপনার ঐ ব্যাগটির জন্যে আমি বড়ই লজ্জিত। কেমন ক'রে যে এই অদ্ভুত ভুল করলুম, কিছুই বুঝতে পারছি না। এ আমার ভারি অন্যায়। তাই আজ ব্যাগ ফিরিয়ে দিতে আর সেই সঙ্গে আমার বিদায়-সম্ভাষণও ক'রে যেতে এসেছি।

ইভা। বিদায়-সম্ভাষণ? (উঠে মিসেস্ রায়ের সোফায় গিয়ে বসলেন) মিসেস্ রায়, আপনি কি সহর ছেড়ে চ'লে যাচ্ছেন?

মিসেস্ রায়। হ্যাঁ রাণীজি। এতদিন আমি বিদেশেই ছিলুম, আবার সেই বিদেশ-বাস করতেই চললুম। বাংলা দেশের জলহাওয়া আমার সহ্য হচ্ছে না। জানেন রাজা-বাহাদুর, এই কলকাতা সহরটা হচ্ছে কেবল ধুলোয়, ধোঁয়ায় আর সুগম্ভীর লোকের জনতায় পরিপূর্ণ। এই ধুলো আর ধোঁয়াই কলকাতার গম্ভীর লোকগুলিকে তৈরি করেছে, কিম্বা ঐ গম্ভীর লোকগুলিই সৃষ্টি করেছেন এই ধুলো আর ধোঁয়া, তা আমি ঠিক জানি না। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটাই আমাকে অধীর ক'রে তুলেছে। তাই কলকাতার পায়ে গড় ক'রে আজই স'রে পড়তে চাই।

ইভা। আজই? কিন্তু আমার যে আপনাকে ছাড়বার ইচ্ছে নেই।

মিসেস রায়। আপনার কথা শুনে খুসি হ'লুম। তবু উপায় নেই, আমাকে যেতেই হবে।

ইভা। মিসেস্ রায়, আমি কি আপনাকে আর কোনদিন দেখতে পাব না?

মিসেস্ রায়। বোধ হয়, না। আমাদের দু-জনের জীবনের ধারা বইছে দুইদিকে। কিন্তু আপনি ইচ্ছে করলে আমার একটি কথা রাখতে পারেন। রাণী ইভা, আমি আপনার একখানি ফোটোগ্রাফ্ চাই। দেবেন? যদি দেন, তাহ'লে আমি যে কত কৃতজ্ঞ হ'ব, বলতে পারি না।

ইভা। নিশ্চয়ই দেব মিসেস্ রায়! ঐ টেবিলের ওপরেই তো আমার একখানা ছবি আছে। বসুন, আমি নিয়ে আসছি।

গাত্রোত্থান ক'রে ঘরের অন্তদিকে গেলেন

রাজা। (মিসেস্ রায়ের কাছে এসে দাঁড়িয়ে নিম্নস্বরে) কাল রাতের সেই বীভৎস ব্যাপারের পরেও আবার আমার বাড়ীতে আসা হচ্ছে আপনার পক্ষে ভীষণ নির্লজ্জতা!

মিসেস্ রায়। (কৌতুকপূর্ণ হাসি হেসে) প্রিয় নরেন, সভ্য সমাজে গিয়ে নীতি-উপদেশ শোনবার আগে লোকে চায় ভদ্র ব্যবহার।

ইভা। (ফিরে এসে) মিসেস্ রায়, এ-ছবিখানার ভিতরে অত্যুক্তি যেন জলন্ত! আমি নিশ্চয়ই এত সুন্দর দেখতে নই।

ছবিখানা দেখালেন

মিসেস্ রায়। আপনি এর চেয়ে আরো-বেশী সুন্দর। কিন্তু আপনার খোকাকে নিয়ে আপনি কি কোন ছবি তোলেন নি?

ইভা। তুলেছি বই কি! আপনি কি সেই-রকম ছবি চান?

মিসেস্ রায়। হ্যাঁ। আমি আপনার সঙ্গে আপনার খোকাকেও চাই।

ইভা। তাহ'লে আমাকে উপরে যেতে হবে। আপনি দয়া ক'রে একটু অপেক্ষা করুন।

মিসেস্ রায়। রাণীজি, আপনাকে আবার কষ্ট দিচ্ছি ব'লে আমি বড় দুঃখিত।

ইভা। (যেতে যেতে) কষ্ট আবার কি, কিচ্ছু না।

প্রস্থান

মিসেস্ রায়। নরেন, দেখছি আজ সকালে তোমার মেজাজ বড় ভালো নেই। কি ক'রে ভালো থাকবে? ইভার সঙ্গে আমার এত ঘনিষ্ঠতা অসহনীয়, কি বল?

রাজা। হ্যাঁ, অসহনীয়! ইভার সঙ্গে আপনি! এ-দৃশ্য দেখা যায় না। বিশেষ, কাল আপনি সত্য কথা বলেন নি।

মিসেস্ রায়। তার মানে তুমি বলতে চাও, আমি কে, ইভার কাছে সেই সত্য প্রকাশ করিনি?

রাজা। মাঝে মাঝে মনে হয়, সে যেন ছিল ভালো। তাহ'লে আজ ছ'মাস ধ'রে আমি কত দুশ্চিন্তা, কত দুর্ভাগ্য, আর কত বিরক্তির কবল থেকে মুক্তিলাভ করতুম। এর চেয়ে আমার স্ত্রীর জানলে ক্ষতি ছিল না, আজও তার মায়ের মৃত্যু হয়নি। তার মা হচ্ছেন, স্বামীত্যাগিনী কুলটা। তিনি ছদ্মনামের আড়ালে বাস ক'রে সমাজের মধ্যে শিকার সন্ধানে ঘুরে বেড়ান! কেন আপনার হাতে আমি রাশি-রাশি অর্থ দিই, কেন আপনার বিলাসিতার সরঞ্জামের পর সরঞ্জাম সরবরাহ করি, এই-সব কথা ইভার জানা থাকলে আমার বাড়ীতে কাল সেই অশোভন দৃশ্যের অভিনয় হ'ত না। আর স্ত্রীর সঙ্গে হ'ত না আমার প্রথম বিবাদ! আমার পক্ষে এ-সব যে কতখানি কষ্টকর, আপনি সেটা আন্দাজ করতে পারবেন না। কেমন ক'রে পারবেন? আপনার জন্যেই আমার স্ত্রীর মুখে শুনেছি প্রথম তিক্ত কথা! তাই তার পাশে আপনাকে দেখলে আমার মনে জাগে দারুণ ঘৃণা! তার শুভ্র পবিত্রতাকে আপনি ময়লা ক'রে দেন। আগে ভাবতুম, আপনার যতই দোষ থাকুক, আপনি অকপট আর সরল। কিন্তু তাও আপনি নন্।

মিসেস্ রায়। এ কথা বলছ কেন?

রাজা। আপনি জোর ক'রে আমার স্ত্রীর 'পার্টি'তে আমার কাছ থেকে নিমন্ত্রণ আদায় করেছেন।

মিসেস্ রায়। বল, আমার নিজের মেয়ের 'পার্টি'র জন্যে তোমার কাছ থেকে আমি নিমন্ত্রণ পেয়েছি। হ্যাঁ, একথা সত্যি।

রাজা। আপনি এখানে এলেন। তারপর এখান থেকে আপনি বিদায় নেবার এক ঘণ্টার পরে আপনাকে আমি দেখতে পেলাম আর একটা পুরুষের ঘরে—সকলের সামনে হ'লেন আপনি অপমানিত!

মিসেস্ রায়। হ্যাঁ।

রাজা। (মিসেস্ রায়ের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে) কাজেই আপনাকে একটা নগণ্য আর জঘন্য স্ত্রীলোক ছাড়া আর কিছুই ব'লে আমি ভাবতে পারি না। আজ এ-কথা বলবার অধিকার আমার আছে যে, আপনি আর কখনো এ-বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করবেন না, আর কখনো চেষ্টা করবেন না আমার স্ত্রীর—

মিসেস্ রায়। (কঠিন স্বরে) আমার কন্যা, তাই নয় কি?

রাজা। ইভাকে নিজের কন্যা ব'লে দাবি করবার কোন অধিকারই আপনার নেই। ইভা যখন শিশু, দোলায় শুয়ে ঘুমোয়, তখন আপনি তাকে ত্যাগ ক'রে চ'লে গেছেন আপনার প্রেমাস্পদের সঙ্গে—যে প্রেমাস্পদও আবার আপনাকেই ত্যাগ ক'রে অদৃশ্য হয়েছে।

মিসেস্ রায়। (উঠে দাঁড়িয়ে) রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ, এটা তার গুণ, না আমার?

রাজা। তার—কারণ এখন আপনাকে চিনতে পেরেছি।

মিসেস্ রায়। রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ, তুমি একটু সাবধান হয়ে কথা কও!

রাজা। আপনার মুখ চেয়ে মিষ্ট কথা বলবার ইচ্ছা আমার নেই। আপনাকে খুব ভালো ক'রে চিনে ফেলেছি।

মিসেস্ রায়। (স্থির-দৃষ্টিতে রাজার মুখের দিকে তাকিয়ে) ও-বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে।

রাজা। হ্যাঁ, আপনাকে আমি চিনেছি—খুব চিনেছি! আজ বিশ বছর কন্যা ত্যাগ ক'রে আপনি অজ্ঞাতবাস করেছেন, একদিনও সে-বেচারির কথা ভাবেন নি। তারপর একদিন আপনি খবরের কাগজ প'ড়ে জানলেন যে এক খেতাবী ধনীর সঙ্গে তার বিবাহ হয়েছে। অমনি আপনি পেলেন এক মস্ত হীন সুযোগ। আপনি বুঝে নিলেন, আমার স্ত্রী যে আপনার কন্যা, তার কাছে এ-কথা প্রকাশ করবার শক্তি আমার হবে না। সমাজেও দশজনের সামনে আমি এই ভীষণ সত্য প্রকাশ করতে পারব না। এই কুৎসিত সত্যকে গোপন রাখবার জন্যে আমি যা-কিছু করতে রাজি হব। তারপরই আপনি ভয় দেখিয়ে আমার কাছ থেকে টাকা আদায় করতে সুরু করলেন।

মিসেস্ রায়। (ভ্রূ সঙ্কুচিত ক'রে) কুৎসিত কথা ব্যবহার

কোরো না নরেন। তা শ্লীলতার পরিচয় দেয় না। হ্যাঁ, আমি সুযোগ পেয়েছি, আর সে সুযোগ গ্রহণও করেছি—এইমাত্র।

রাজা। হ্যাঁ, আপনি সে সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু কাল রাত্রে নিজেই নিজের মুখোস খুলে আবার তা ব্যর্থও ক'রে দিয়েছেন।

মিসেস্ রায়। (বিচিত্র হাসি হেসে) ঠিক্ বলেছ, কাল আমি সব ব্যর্থ করেছি বটে!

রাজা। তারপর ভুলে আমার স্ত্রীর ভ্যানিটি-ব্যাগ নিয়ে গিয়ে স্যর বিনয়ের ঘরে ফেলে রাখা হচ্ছে অমার্জ্জনীয় অপরাধ। ও-ব্যাগটাকে এখন আমার চোখের বালি ব'লে মনে হচ্ছে। আমার স্ত্রীকে আর কখনো ওটা ব্যবহার করতে দেব না! ও-জিনিষটা এখন কলঙ্কিত! ওটা নিজের কাছে রেখে না দিয়ে, এখানে ফিরিয়ে এনেও আপনি অন্যায় করেছেন।

মিসেস্ রায়। আমি মনে করছি ওটা নিজের কাছেই রেখে দেব। (উঠে গিয়ে) এটি চমৎকার দেখতে! (ব্যাগটি তুলে নিলেন) ইভার কাছ থেকে আজ আমি এটা চেয়ে নেব।

রাজা। আশা করি আমার স্ত্রী ওটা আপনাকে দেবেন।

মিসেস্ রায়। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই ইভা কোন আপত্তি করবে না।

রাজা। আমার ইচ্ছা, সেই সঙ্গে ইভা আর একটা জিনিষও আপনার হাতে অর্পণ করবে।

মিসেস্ রায়। কি?

রাজা। একখানা ছোট ছবি। আমার স্ত্রী প্রতিদিন সেই ছবিখানাকে পূজো করে। সে হচ্ছে, ফুলের মতন পবিত্র-দেখতে সুন্দর একটি বালিকার ছবি।

মিসেস্ রায়। (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) হ্যাঁ, আমার স্মরণ হচ্ছে। কিন্তু সে কতকাল আগেকার কথা! (আবার সোফায় গিয়ে বসে পড়লেন) ছবিখানা যখন তুলেছিলুম তখনও আমার বিবাহ হয়নি।

ক্ষণিকের স্তব্ধতা

রাজা। আজ সকালে আবার এখানে কি করতে এসেছেন? আজ আবার আপনার অভিপ্রায় কি?

স'রে গিয়ে একখানা আসনের উপরে বসলেন

মিসেস্ রায়। (কণ্ঠস্বরে ব্যঙ্গের ভাব ফুটিয়ে) আমার আদরের মেয়ের কাছ থেকে বিদায় নিতে এসেছি, আবার কি! (রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ রুদ্ধ ক্রোধে ওষ্ঠ দংশন করলেন। মিসেস্ রায় তাঁর দিকে তাকালেন এবং তাঁর ভাব-ভঙ্গি ও কণ্ঠস্বর ক্রমেই গম্ভীর ও দুঃখময় হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। এক মুহূর্ত্তের জন্যে তিনি আত্মপ্রকাশ করলেন) না, না, ভেবো না আজ আমি এখানে করুণ অভিনয় করতে এসেছি, তাকে বুকে টেনে নিয়ে কাঁদো-কাঁদো মুখে বলতে এসেছি, আমি তার কে? জননীর ভূমিকায় অভিনয় করবার কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষাই আমার নেই। জীবনে মাত্র একদিন আমি অনুভব করতে পেরেছি, জননীর অনুভূতি। সে হচ্ছে কাল্‌কের রাতে। কিন্তু সে ভীষণ অনুভূতি! আমার সারা হৃদয়কে তা ব্যথিত ক'রে তুলেছে। ঠিক বলেছ, গেল বিশ বছর আমি মাতৃত্বের আস্বাদ পাইনি—আর আজও আমি সন্তানহীন জীবনই যাপন করতে চাই। (হঠাৎ লঘু হাসি হেসে নিজের আসল মনের ভাব ঢাকবার চেষ্টা ক'রে) কিন্তু প্রিয় নরেন, এত বড় একটি মেয়ের মা আমি সাজব কেমন ক'রে? ইভার বয়স একুশ বৎসর, আর নিজের বয়স কোনদিনই আমি উনত্রিশ-ত্রিশের বেশী ব'লে স্বীকার করি না। সুতরাং বুঝতেই পারছ, ইভাকে মেয়ে ব'লে মানলে আমি কি মুস্কিলেই পড়ব! না নরেন, আমার কথা যদি বল, তোমার স্ত্রী তার মৃত পবিত্র মাতার স্মৃতিকে পূজা করলেই আমি বেশী খুসি হ'ব। আমি তার দিবাস্বপ্নে কেন বাধা দিতে যাব? নিজের দিবা-স্বপ্নকেই আমি সফল করতে পারি না! এই দেখ না, কাল রাতেই আমার একটা স্বপ্ন ভেঙে গেল। ভেবেছিলুম, আমার মধ্যে হৃদয় ব'লে পদার্থ নেই। কাল কিন্তু আবিষ্কার করলুম, আমারও হৃদয় আছে। কিন্তু নরেন, সে-হৃদয় আমার উপযোগী নয়। ও হৃদয়-টৃদয় একেলে পোষাকের সঙ্গে খাপ্ খায় না। ও-যেন নারীকে বুড়ী ক'রে তোলে। (টেবিলের উপর থেকে একখানি হাত-আয়না তুলে নিয়ে তার ভিতরে নিজের মুখ দেখতে দেখতে) আর ঐ দুষ্ট হৃদয় সঙীন্ মুহূর্ত্তে জীবনের গতিকে দেয় বদ্‌লে।

রাজা। আপনি আমাকে ক্রমেই ভীত ক'রে তুলছেন।

মিসেস রায়। (উঠে দাঁড়িয়ে) নরেন, আমার বোধ হচ্ছে, আমি যদি আজ কোন মঠে গিয়ে সন্ন্যাসিনী হই, কিংবা ঐ-রকম একটা-কিছু হবার চেষ্টা করি, তাহলে তুমিও খুব খুসি হও। কিন্তু ও-সব হচ্ছে ডাহা নাটুকে ব্যাপার। বাস্তব-জীবনে আমরা তা কখনো করিনা—অন্তত যতদিন যৌবন থাকে। না—আধুনিক যুগে অনুতাপে সান্ত্বনা নেই, সান্ত্বনা মেলে খালি আমোদ-প্রমোদে। অনুতাপটা হচ্ছে একেবারেই সেকেলে ব্যাপার। বিশেষ অনুতপ্ত হ'লে ভালো সাজ-পোষাক ছাড়তে হবে, নইলে কেউ আমাকে বিশ্বাস করবে না। ও সাদাসিধে পোষাক পরতে জীবনে আমি পারব না। তার চেয়ে আমি চ'লে যেতে চাই, তোমাদের দু'জনের জীবনের বাইরে। কাল বুঝতে পেরেছি, আমি ভুল করেছি তোমাদের মাঝখানে এসে।

রাজা। মারাত্মক ভুল!

মিসেস্ রায়। (হাসিমুখে) হ্যাঁ, প্রায় মারাত্মক!

রাজা। গোড়াতেই ইভাকে সব কথা বলিনি ব'লে এখন আমার দুঃখ হচ্ছে।

মিসেস্ রায়। আমি দুঃখ করছি মন্দ কাজ করেছি ব'লে। তুমি দুঃখ করছ ভালো কাজ করনি ব'লে—এইখানে হচ্ছে তোমাতে আমাতে তফাৎ।

রাজা। আপনাকে আমি বিশ্বাস করি না। হ্যাঁ, ইভাকে আমি সব-কথাই বলব। আমার মুখ থেকেই তার পক্ষে সব-কথা শোনা ভালো। এতে তার যন্ত্রণারও সীমা থাকবে না, আর এজন্যে তাকে যথেষ্ট হীনতাও ভোগ করতে হবে বটে, কিন্তু তবু সব কথা শোনাই তার উচিত।

মিসেস্ রায়। ইভাকে তুমি সব-কথা বলতে চাও?

রাজা। হ্যাঁ, আমি এখনি বলতে যাচ্ছি।

মিসেস্ রায়। (উঠে রাজার কাছে গিয়ে) যদি তুমি বল, তাহ'লে আমি নিজের নামকে এমন কলঙ্কিত ক'রে তুলব যে, চিরদিন তার জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তটি হয়ে উঠবে বিষম বিষাক্ত!

ধ্বংস হয়ে যাবে তার সমস্ত জীবন। যদি তুমি তাকে বলতে সাহস কর, তাহ'লে আমি নেমে যাব নীচতার অতল পাতালে! লজ্জা আমার কাছ থেকে পালিয়ে যাবে গভীর লজ্জায়! তুমি তাকে বলতে পারবে না—আমি তোমাকে নিষেধ করছি।

রাজা। কেন?

মিসেস্ রায়। (একটু চুপ ক'রে থেকে) যদি বলি তাকে আমি এখনো ভালোবাসি—তাহ'লে নিশ্চয়ই তুমি আমাকে বিদ্রূপ করবে, কি বল?

রাজা। তাহ'লে আমার মনে হবে, আপনার কথা সত্য নয়। মাতৃপ্রেমের অর্থই হচ্ছে নিষ্ঠা, আত্মত্যাগ, স্বার্থহীনতা! আর এ-সব হচ্ছে আপনার কাছে অজানা কথা।

মিসেস্ রায়। ঠিক্ বলেছ। ও-সব কথা আমি কেমন ক'রে জানব? অতএব এ-প্রসঙ্গ ছেড়ে দাও। কেবল এইটুকু জেনো, ইভার কাছে আমার পরিচয় দেবার অধিকার আমি তোমাকে দেব না। এ-হচ্ছে আমার গুপ্তকথা, তোমার নয়। এ-কথা তাকে বলবার জন্যে যদি আমার মনকে শক্ত ক'রে তুলতে পারি, আর বোধ হচ্ছে আমি তা পারবও, তাহ'লে এ-বাড়ী ছাড়বার আগে আমিই তাকে সব-কথা ব'লে যাব! আর যদি না আমার সাহস হয়, তাহ'লে কোন দিনই তাকে কোন কথাই বলব না।

রাজা। (ক্রুদ্ধস্বরে) তাহ'লে আমি মিনতি ক'রে বলছি, আপনি এখনি আমার বাড়ী ছেড়ে বিদায় হ'য়ে যান।

ইভার প্রবেশ। তাঁর হাতে একখানি ফোটোগ্রাফ্। তিনি মিসেস রায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। রাজা সোফার পিছন দিকে হেলে প'ড়ে উদ্বিগ্নভাবে মিসেস্ রায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন

ইভা। মাপ্ করবেন মিসেস্ রায়, অনেকক্ষণ আপনাকে বসিয়ে রাখলুম। ছবিখানা আমি খুঁজে পাচ্ছিলুম না। তারপর এখানা পেলুম আমার স্বামীর পোষাক পরবার ঘরে—রাজা এখানা চুরি করেছিলেন!

মিসেস্ রায়। (ছবিখানা নিয়ে দেখতে দেখতে) যা ভেবেছিলুম, চমৎকার! (ইভার সঙ্গে এগিয়ে একখানা সোফায় পাশাপাশি ব'সে আবার ছবির দিকে তাকিয়ে) তাহ'লে এইটিই হচ্ছে তোমার ছোট খোকা? খোকনের নামটি কি?

ইভা। আমার বাবার নাম ছিল শ্যামলকুমার, তাই খোকনের নাম রেখেছি শ্যামলেন্দ্রনারায়ণ!

মিসেস্ রায়। (ছবিখানি টেবিলের উপর রেখে) তাই নাকি!

ইভা। হ্যাঁ। ছেলে না হয়ে ও-যদি মেয়ে হ'ত, তাহ'লে আমার মায়ের নামের সঙ্গে মিল রেখে আমি ওর নাম রাখতুম, রেণুকণা! আমার মায়ের নাম রেণুকা কিনা!

মিসেস্ রায়। জান না বুঝি, আমারও ডাক্-নাম রেণু!

ইভা। সত্যি?

মিসেস্ রায়। হ্যাঁ। (একটু থেমে) রাণীজি, আপনার স্বামীর মুখে শুনলুম, আপনি নাকি মায়ের স্মৃতি পূজা করেন?

ইভা। সব মানুষেরই জীবনে আদর্শ থাকে, অন্তত থাকা উচিত। আমার আদর্শ হচ্ছেন, আমার মা!

মিসেস্ রায়। আদর্শ হচ্ছে বিপজ্জনক। বাস্তব হচ্ছে তার চেয়ে ভালো। বাস্তবতা আঘাত দেয়, কিন্তু তবু তাকে ভালো বলি।

ইভা। (ঘাড় নেড়ে) আদর্শ হারালে আমি সব হারিয়ে ফেলব মিসেস্ রায়!

মিসেস্ রায়। সব?

ইভা। হ্যাঁ, সব। (ক্ষণিকের স্তব্ধতা)

মিসেস্ রায়। আপনার বাবা প্রায়ই কি আপনার মায়ের কথা বলতেন?

ইভা। না, সে-কথা বলতে গেলে তিনি বড় কষ্ট পেতেন। তাঁর মুখেই শুনেছি, আমার জন্মের মাস-কয়েক পরে আমার মা কেমন ক'রে মারা যান। বলতে বলতে তাঁর দুই চোখ জলে ভ'রে উঠত। তারপর তিনি মিনতি ক'রে বলতেন, তাঁর কাছে কখনো যেন আমার মায়ের নাম না করি। মায়ের নাম শুনলেও তাঁর কষ্ট হ'ত। মায়ের জন্যে ভেবে ভেবেই বাবা শেষে ভগ্ন-প্রাণ নিয়ে মারা পড়লেন। কি দুঃখের জীবন ছিল তাঁর!

মিসেস্ রায়। (দাঁড়িয়ে উঠ্‌তে উঠ্‌তে) রাণীজি, এইবার যে আমাকে যেতে হবে!

ইভা। (দাঁড়িয়ে উঠ্‌তে উঠ্‌তে) না না, এখনি নয়।

মিসেস্ রায়। না রাণীজি, আর দেরি করলে চলবে না। এতক্ষণে আমার গাড়ী নিশ্চয় এসে পড়েছে।

ইভা। রাজা, মিসেস্ রায়ের গাড়ী এসেছে কিনা একবার খোঁজ নিয়ে দেখবে?

মিসেস্ রায়। রাণীজি, রাজা-বাহাদুরকে আর কষ্ট দিয়ে কাজ নেই।

ইভা। হ্যাঁ রাজা, একবার খোঁজ নিয়ে এসো গে যাও। (রাজা নবেন্দ্রনারায়ণ একটু ইতস্তত ক'রে মিসেস্ রায়ের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। মিসেস্ রায় দাঁড়িয়ে রইলেন নির্ব্বিকার মূর্ত্তির মত। রাজার প্রস্থান) মিসেস্ রায়, মিসেস্ রায়! আপনাকে কী আর বলব? কাল আপনি আমাকে বাঁচিয়েছেন!

মিসেস্ রায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন

মিসেস্ রায়। চুপ্, ও-কথা আর তুলো না।

ইভা। আমি ঐ কথাই তুলব। আপনার এই মহৎ আত্মত্যাগের আড়ালে থেকে নিজের দুর্ব্বলতা লুকিয়ে রাখব, এমন কথা আপনি ভাববেন না। অসম্ভব! আজই স্বামীকে সব কথা বলব। এ হচ্ছে আমার কর্ত্তব্য।

মিসেস্ রায়। না, এ তোমার কর্ত্তব্য নয়! স্বামী ছাড়া অন্যের প্রতিও তোমার কর্ত্তব্য আছে। অন্তত আমার কাছে তোমার কৃতজ্ঞতার ঋণ স্বীকার কর তো?

ইভা। আমার সর্ব্বস্ব রক্ষা পেয়েছে আপনার জন্যে।

মিসেস্ রায়। তাহলে নীরব থেকে কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ কর। এ ছাড়া আর কোন উপায়েই তোমার ঋণ শোধ করতে পারবে না। জীবনে আমি একটিমাত্র ভালো কাজ করেছি, সকলের কাছে ব'লে দিয়ে তার গৌরব নষ্ট কোরো না। অঙ্গীকার কর, কাল রাত্রে যা ঘটেছে, তা জানব খালি আমরা দুজনেই। তোমার স্বামীর জীবনকে দুঃখময় ক'রে তুলো না। নষ্ট কোরো না তাঁর প্রেমকে। তুমি জানো না ইভা, প্রেমকে

হত্যা করা যায় কত সহজে। কথা দাও, বল—জীবনে কখনো স্বামীর কাছে কালকের কথা প্রকাশ করবে না?

ইভা। (মাথা নত ক'রে) এ হচ্ছে আপনার ইচ্ছা, আমার নয়।

মিসেস্ রায়। হ্যাঁ, এ-হচ্ছে আমার ইচ্ছা। কখনো ভুলো না খোকাকে। আমি তোমাকে আদর্শ মা ব'লে ভাবতে চাই। তুমিও নিজেকে তাই ব'লেই ভেবো।

ইভা। (মুখ তুলে) আজ থেকে আমি সর্ব্বদাই আপনার এই উপদেশ মনে ক'রে রাখব। জীবনে কেবল একবার আমি নিজের মাকে ভুলে গিয়েছিলুম—আর সে হচ্ছে কাল রাত্রে। মায়ের কথা যদি না ভুলতুম, তাহ'লে কাল এত নির্ব্বোধ, এত মন্দ হ'তে পারতুম না।

মিসেস্ রায়। (মুহূর্ত্তের জন্যে শিউরে উঠে) চুপ! কালকের রাত ফুরিয়ে গিয়েছে।

রাজা নরেন্দ্রনারায়ণের প্রবেশ

রাজা। মিসেস্ রায়, আপনার গাড়ী এখনো ফিরে আসে নি।

মিসেস্ রায়। না এলেও ক্ষতি নেই। আমার 'ট্যাক্সি' হ'লেও চলবে। রাণীজি, এইবারে সত্য-সত্যই বিদায় নিতে হ'ল। (রঙ্গমঞ্চের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে) ও, ভুলে গিয়েছিলুম! রাণীজি, আপনি হয়তো শুনে হাসবেন, কিন্তু একটা কথা বলব। আপনার ভ্যানিটি-ব্যাগটি নিয়ে কাল আমি পালিয়ে গিয়েছিলুম, ওটি আমাকে উপহার দিতে পারবেন? রাজা-বাহাদুর বললেন, আপনি দিলেও দিতে পারেন।

ইভা। নিশ্চয়ই দেব, এ আর বেশী কথা কি?

মিসেস্ রায়। (ব্যাগটি নিয়ে) ধন্যবাদ! এই ব্যাগটি সর্ব্বদাই আপনার কথা মনে করিয়ে দেবে। নমস্কার!

প্রস্থানোদ্যত

কুমার চন্দ্রনাথের প্রবেশ

কুমার। (সবিস্ময়ে) হরি, হরি, মিসেস্ রায়!

মিসেস্ রায়। ভালো তো কুমার-বাহাদুর? আজ সকালে বেশ খোস-মেজাজে আছেন তো?

কুমার। (অপ্রসন্নভাবে) হ্যাঁ, বহুৎ-আচ্ছা আছি।

মিসেস্ রায়। না কুমার-বাহাদুর, আপনাকে দেখে মোটেই ভালো মনে হচ্ছে না। আপনি বাইরে বাইরে বড্ড-বেশী রাত জাগেন—এটা আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে খারাপ। ভবিষ্যতে নিজের শরীরের দিকে একটু তাকাবেন। নমস্কার, রাজা-বাহাদুর! (দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে) কুমার-বাহাদুর, আপনি কি আমার গাড়ী পর্য্যন্ত সঙ্গে আসবেন না? এই ভ্যানিটি-ব্যাগটি আপনি নিয়ে চলুন।

রাজা। আমায় দিন!

মিসেস্ রায়। না, আমি চাই কুমার-বাহাদুরকে।—ওঁর দিদির—অর্থাৎ মহারাণীজির কাছে আমি একটা খবর পাঠাতে চাই। কুমার-বাহাদুর, ব্যাগটি নিয়ে কি আপনি আমার সঙ্গে আসতে পারবেন?

কুমার। মিসেস্ রায়, আপনার হুকুম পেলেই পারব।

মিসেস্ রায়। (হাসতে হাসতে) হ্যাঁ, আমিই তো হুকুম দিচ্ছি। আপনি কেমন সুন্দর ভঙ্গীতে ওটি বহন করতে পারবেন!

মিসেস্ রায় দরজার কাছে গিয়ে আর একবার ফিরে দাঁড়ালেন—ইভার সঙ্গে তাঁর চোখোচোখি হ'ল। তারপর তিনি প্রস্থান করলেন এবং তাঁর পিছনে পিছনে চললেন কুমার চন্দ্রনাথ।

ইভা। রাজা, আর কখনো তুমি মিসেস্ রায়ের বিরুদ্ধে কোন কথা বলবে?

রাজা। (গম্ভীর ভাবে) মিসেস্ রায়কে যা ভেবেছিলুম, দেখছি উনি তার চেয়ে ভালো।

ইভা। মিসেস্ রায় আমার চেয়েও ভালো।

রাজা। (হেসে ইভার চুল নিয়ে আদর করতে করতে) শিশু! তুমি আর মিসেস্ রায় ভিন্ন-জগতের জীব। তোমার জগতে মন্দ কোনদিন প্রবেশ করেনি।

ইভা। ও-কথা বোলো না রাজা। একই জগতে আমরা বাস করি—ভালো আর মন্দ, পাপ আর পুণ্য, সেখানে পরস্পরের হাত ধ'রে বিচরণ করে।

রাজা। ইভা, তুমি এ-কথা বলছ কেন?

ইভা। (সোফায় ব'সে) কারণ, ভালো থেকে মন্দকে আলাদা করতে গিয়ে আর একটু হ'লেই ডুবে গিয়েছিলুম আমি গভীর অন্ধকারে। তারপর, যার জন্যে আমাদের মিলনে বাধা ঘটেছিল—

রাজা। না ইভা, কোনদিনই আমাদের মিলনে বাধা ঘটেনি।

ইভা। না, আর কোনদিনই ঘটবে না। রাজা, কোনদিন তুমি আমাকে আজ্‌কের চেয়ে কম ভালোবেসো না, তাহ'লে আজ্‌কের চেয়ে আমিও তোমাকে ঢের-বেশী ভালোবাসব। তুমি হবে আমার চিরদিনের নির্ভর! চল, আজই আমরা দার্জ্জিলিঙের বাড়ীতে বেড়াতে যাই। সেখানে হিমালয়ের তুষার-স্বপ্নের ছায়ায় আমাদের সবুজ বাগানে ফুটে আছে সাদা গোলাপ আর রাঙা গোলাপ!

কুমার চন্দ্রনাথের পুনঃপ্রবেশ

কুমার। নরেন, কাল যা-যা ঘটেছিল, মিসেস্ রায় তার বহুৎ-আচ্ছা কৈফিয়ৎ দিয়েছেন।

ভয়ে ইভার মুখ সাদা হয়ে গেল। রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ চমকে উঠলেন। কুমার চন্দ্রনাথ এগিয়ে এসে রাজার হাত ধ'রে তাঁকে রঙ্গমঞ্চের সামনের দিকে টেনে আনলেন।

ওহে ভায়া, হরি হরি! মিসেস্ রায় খুব ভালো কৈফিয়ৎ দিয়েছেন। আমরা সবাই কাল তাঁর ওপরে অবিচার করেছিলুম। এখান থেকে বেরিয়ে মিসেস্ রায় আগে ক্লাবে আমাকে খুঁজতে যান। সেখানে আমাকে না পেয়ে কেবল আমার জন্যেই তিনি গিয়েছিলেন শুর বিনয়ের বাড়ীতে। তারপর, হঠাৎ একদল লোক গোলমাল করতে করতে আসছে শুনে ভয়ে তিনি পাশের

ঘরে গিয়ে লুকিয়েছিলেন। দেখ দেখি, কি মিষ্টি মেয়ে! আর আমরা কিনা তাঁরই সঙ্গে করেছিলুম জানোয়ারের মতন ব্যবহার! তিনিই হবেন ঠিক্ আমার মনের মতন স্ত্রী! তাঁর সঙ্গে আমি একেবারে খাপ খেয়ে গিয়েছি। কেবল তিনি একটি সর্ত্ত করেছেন যে, আমরা বাস করব বাংলা দেশের বাইরে গিয়ে। হরি, হরি! এ তো খুব ভালো কথাই! রাবিশ কলকাতা, রাবিশ ধূলো-ধোঁয়া, রাবিশ সমাজ, রাবিশ যা-কিছু! ভাবলেও গায়ে জ্বর আসে!

রাজা। চন্দ্রনাথ, তুমি বিয়ে করবে বেশ-একটি চতুরা নারীকে।

ইভা। (স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর হাত ধ'রে) না কুমার-বাহাদুর, আপনি বিয়ে করবেন, যথার্থ এক সৎ নারীকে!*

[যবনিকা]

* বিশ্ব-বিখ্যাত Oscar Wildএর Lady Windermere's Fan নাটিকার রূপান্তর।

দেউলিয়া মন

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

বিশ্ব-সমর রক্তের তৃষা ভরা,
ওলট পালট করিছে বসুন্ধরা।
রুদ্রতা তার বরং সহিতে পারি,
ক্ষুদ্রতা তার ঝরায় নয়ন বারি,
দেখি নাই হেন মানুষকে হীন করা।

২

বড় বড় মন দেউলিয়া হয়ে যায়,
কি ধন হারালো ভ্রূক্ষেপ নাহি তায়।
কোথা সেই দয়া-সেই মমত্ব বোধ,
শুদ্ধ বিবেক সব কেড়ে নিল ক্রোধ,
মহানুভবতা গ্রাসিলরে হিংসায়।

৩

ধনী নির্ধন, রাজা ও ভিখারী হয়,
জগতের রীতি এতে নাই বিস্ময়।
উদার হৃদয়—নির্ম্মল গভীরতা—
কোথা? সেথা কেন এত সংকীর্ণতা?
এত পঙ্কিল দেখিলেই লাগে ভয়।

৪

সৌহার্দ্য ও প্রীতির সিংহাসন,
দখল করিল জিঘাংসা পুরাতন।
সূক্ষ্ম বিচার, ন্যায়, মিত্রতা শুচি,
শ্রেয়, সত্য ও পবিত্রে অভিরুচি,
সব কেড়ে নিল, রিক্ত করিয়া মন।

৫

যখন জাতির বৃহৎ বৃহৎ প্রাণ
লাভ ও ক্ষতির বসে লয়ে খতিয়ান।
স্বার্থ যখন সব মহত্ত্ব ঢাকে,
প্রতিভা আসিলে আসন দেয় না তাকে,
তখনি তাহার গৌরব অবসান।

৬

ছলনা এবং মিথ্যার আশ্রয়,
আপাত-মধুর পরিণামে বিষময়।
সদাই ক্ষমতা লোপের ভয়েতে ভীত,
স্বতঃ হয় পাপ পঙ্কে নিমজ্জিত,
আলোক স্তম্ভ মগ্ন শৈল হয়।

৭

বিভব ফুরাক—জ্বলুক না লাল বাতি,
মন দেউলিয়া হইলে নষ্ট জাতি।
ধূলি-ধূসরিত হলে আকাঙ্ক্ষা তার,
এলো দুর্গতি উদ্ধার নাহি আর,
সে হ'ল অধঃপতিতগণের জ্ঞাতি।

৮

সাধুর বেদীতে যখনই বসিবে শঠ,
পচন ধরেছে—পতন সন্নিকট।
যাক বাণিজ্য, রাজ্য রত্ন মণি
জাতির পক্ষে সে সব তুচ্ছ গণি,
ভাবাঢ্য হৃদি—চির শান্তির মঠ।

৯

সেই ত শক্তি—জগৎ কান্তিমৎ,
হীরকের খনি—হিরণ্য পর্ব্বত।
শুধু তারি বল তাহারি যে নিষ্ঠা
করে রাজশ্রী পুনঃ প্রতিষ্ঠা,
জাতিরে সে করে বীর, বরেণ্য সৎ।

১০

চাই ধার্ম্মিক—ধর্ম্মের আবহাওয়া,
জনগণ মন ঊর্দ্ধে লইয়া যাওয়া।
চাই আত্মোৎসর্গ প্রবণ বুক;
পর শৃঙ্খল মোচনেতে উন্মুখ,
চাই প্রতি পদে ভগবান পানে চাওয়া।

আলোর পথে

শ্রীকিরণচন্দ্র দেচৌধুরী

নূতন কিছু বলিব বা করিব, এরূপ কল্পনা-অনভিজ্ঞের অহঙ্কার। শ্রুতি বলিয়াছেন, "সদেব সৌম্যেদমত্র অসীৎ" অর্থাৎ জগতে যাহা কিছু আছে, তাহা বরাবরই আছে। তাহাদের উৎপত্তিও নাই, নাশও নাই। কথাটী শুধু জীবজগৎ সম্বন্ধেই বলা হয় নাই ; ভাব বা জ্ঞান সম্বন্ধেও ইহা সম্পূর্ণ সত্য। তথাপি স্মরণাতীত কাল হইতেই মানুষের বিবক্ষার বিরতি নাই, কর্মেরও অবধি নাই। এর মূলে আছে পুনরাবৃত্তির প্রেরণা, পুনঃ পুনঃ অভ্যাস। একই কথা বার বার ভিন্নভাবে, ভিন্ন ভাষায়, ভিন্ন ভঙ্গীতে বলার মধ্যে আছে একটী সজীবতা,' একটী আনন্দ, একটী গতি—যাহা মানুষকে নিত্য নবজীবনদানে পুষ্ট করে।

আজিকার আলোচনায় হিন্দুদর্শন সম্বন্ধে যৎসামান্য নিবেদন করিবার একটী ক্ষীণ প্রয়াসই পরিলক্ষিত হইবে। যুগ যুগান্তর হইতে মহাত্মাগণের সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডারে কি অমূল্য রত্ন কি অপরিসীম যত্নেই না রক্ষিত হইয়াছে, স্মরণে হৃদয় পুলকে নৃত্য করে, মস্তক শ্রদ্ধাভরে আপনি নত হইয়া পড়ে।

'দর্শন' শব্দের মৌলিক অর্থ 'দৃষ্টি', angle of vision। "দৃশি জ্ঞানে" এই সূত্রানুসারে আমরা 'দর্শন' শব্দের 'জ্ঞানানুশীলন' অর্থও করিতে পারি। মহাপুরুষগণ বিভিন্ন দৃষ্টিতে ঈশ্বর সম্বন্ধে, জীব সম্বন্ধে, জগৎ সম্বন্ধে আত্মজিজ্ঞাসা দ্বারা যে জ্ঞানের অধিকারী হইয়াছেন, জগৎ-কল্যাণে সেই সুধারস সিঞ্চিত করিয়াছেন এই ধরণীর বুকে, তাঁহাদের অসীম দয়ায়, অপার করুণায় বোধহয় ভগবৎ ইচ্ছায়।

প্রধানতঃ এদেশের দর্শন ছয়টী। ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, পূর্ব্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা (বেদান্ত)। একটু আন্তরিক আলোচনা করিলেই দেখা যায়—যে সমস্ত দর্শনগুলিরই মূল উদ্দেশ্য এক, তাহাদের ভিত্তি এক। মূলতঃ প্রত্যেক দর্শনেরই উদ্ভব দুঃখবাদে, পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা যাহাকে নাম দিয়াছেন 'Pessimism'। দুঃখবাদ শব্দটার অর্থ এই যে জগৎ দুঃখময়। বিশ্বসংসারে চারিদিকে দুঃখের প্রাবল্য দেখিয়া দয়ার্দ্র হৃদয় দর্শনকারগণ দুঃখনির্বৃত্তির জন্য যে পন্থা বা উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহাই 'দর্শন' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে এবং যুগ যুগ হইতে বংশানুক্রমে নামিয়া আসিয়াছে এই দুঃখপীড়িত মানব-সমাজে। মহাত্মাগণ আপন আপন অন্তরে ধীশক্তি প্রজ্বলিত করিয়া মুক্তির আলোকের সন্ধান পাইয়াই ক্ষান্ত হন নাই ; অপরেও যাহাতে অনুরূপ ধীশক্তির অধিকারী হইতে পারে, অনুরূপ মুক্তির আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, সেদিকে তাঁহাদের চেষ্টায়, যত্ন ও আকাঙ্ক্ষার নিদর্শন দেখিতে পাই, তাঁহাদের তপোলব্ধ জ্ঞানের আন্তরিক পরিবেশনে। নিজের মুক্তিকেই তাঁহারা চরম বলিয়া মানেন নাই। বিশ্বের সাথে একযোগে মুক্তিকামনা করিয়াছিলেন বলিয়াই এই সমুদয় জ্ঞানসমুদ্রের উদ্ভব, দর্শনসমূহের সৃষ্টি। দর্শনগুলিকে আমরা দেখিতে পাই এই তাপদগ্ধ, বেদনাবিহ্বল সংসার মরুতে ওয়েশিশের মত, কারণ দুঃখনাশের উপায়ের কথাই দর্শনসমূহের শেষ কথা। ইহার মধ্যে ভাবালুতা নাই, মিথ্যা বাগাড়ম্বর নাই, আত্মপ্রতিষ্ঠার অহমিকা নাই ; আছে শুধু কৃপা, আছে শুধু করুণা, আছে শুধু আর্ত্তের বেদনা নিবারণে—অমৃত আকারে নিঃস্বার্থ উপদেশ, যে অমৃতপানে পীড়িত মানব মৃত্যুসাগর গোষ্পদসমান উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ। শুধু চাই জীবনে-শ্রদ্ধা, শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস এবং আত্মকৃপার বিকাশ।

প্রত্যেক 'দর্শন'ই দুঃখনিবৃত্তির একটী স্বকীয় পন্থা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। প্রথমেই 'ন্যায় দর্শনে'র আলোচনা অন্যায় হইবে না। এই দর্শনের প্রণেতা মহর্ষি গৌতম দেখাইলেন—জন্মই দুঃখের কারণ ; অতএব দুঃখবারণের উপায় নিহিত আছে জন্মবারণে। তর্ক চলিল—'জন্মের কারণ কি'? উত্তর আসিল 'প্রবৃত্তি'। প্রবৃত্তি কোথা হইতে? রাগ, দ্বেষ ও মোহ এই ত্রিদোষ হইতে। দোষ আসে কেন? মিথ্যা-জ্ঞান এই দোষত্রয়ের জনক। মিথ্যাজ্ঞান যায় কিসে? তত্ত্বজ্ঞানেই এই মিথ্যাজ্ঞানের নাশ সম্ভব। অতএব তত্ত্বজ্ঞান লাভ দুঃখের নিবৃত্তি। জিজ্ঞাসা চলিল 'কিসের তত্ত্বজ্ঞান?' উত্তরে বলা হইল ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান।

১। প্রমাণ ২। প্রমেয় ৩। সংশয় ৪। প্রয়োজন ৫। দৃষ্টান্ত ৬। সিদ্ধান্ত ৭। অবয়ব ৮। তর্ক ৯। নির্ণয় ১০। বাদ ১১। জল্প ১২। বিতণ্ডা ১৩। হেত্বাভাস ১৪। ছল ১৫। জাতি ১৬। নিগ্রহস্থান—এই ষোড়শ পদার্থের বিস্তৃত আলোচনায় মহর্ষি আমাদের শুনাইয়াছেন আত্মার কথা, যে আত্মা নিত্য এবং দেহাতিরিক্ত এক স্বতন্ত্র বস্তু। অনুসন্ধিৎসু শ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তি এই ন্যায়ের আলোচনাতেই নিঃশ্রেয়সলাভে অধিকারী হইবেন নিঃসন্দেহ।

'বৈশেষিক' দর্শনের প্রণেতা মহর্ষি কণাদের পরমাণুবাদ এক বিশিষ্ট চিন্তাধারার ফল। এই বাদের মূলকথা—এই যে পরমাণু নিত্য, সত্য এবং অকারণ। এই দর্শনও দেখাইয়াছেন যে দুঃখনাশেই শুভ, কল্যাণ এবং নিঃশ্রেয়স। দুঃখনাশের উপায়ও একমাত্র তত্ত্বজ্ঞান লাভ। ন্যায় দর্শনের সহিত ইহার প্রভেদ শুধু এই তত্ত্বজ্ঞানের প্রকার ভেদ লইয়া। বৈশেষিক বলেন, "ধর্ম্মবিশেষ প্রসূতাদ্ দ্রব্যগুণ কর্ম্মসামান্য বিশেষ সমবায়ানাং পদার্থানাং সাধর্ম্ম বৈধর্ম্ম্যাভ্যাং তত্ত্বজ্ঞানাৎ নৈঃশ্রেয়সম্", অর্থাৎ দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায়, এই ছয় পদার্থের সাধর্ম্ম ও বৈধর্মজ্ঞানজনিত তত্ত্বজ্ঞানই জীবের নিঃশ্রেয়স লাভের একমাত্র উপায়। বৈশেষিক আত্মাকে জীবাত্মা ও পরমাত্মা দুইভাগে ভাগ করিয়াছেন। পরমাত্মাকে অষ্টগুণ বিশিষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—"মহেশ্বরষ্টৌ"। এই মহেশ্বর সিসৃক্ষাপরবশ পরমাণু সংযোগে এই বিশ্বসৃষ্টি করিয়াছেন। বৈশেষিকের ইহাই সংক্ষিপ্ত আকার।

'সাংখ্য দর্শনের প্রণেতা মহর্ষি কপিল। ইহা সূত্রাকারে গ্রথিত। এই সূত্রের গোড়ার কথা—"অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্ত নিবৃত্তিরত্যন্ত পুরুষার্থ", অর্থাৎ ত্রিবিধ দুঃখের সমূলে নিবৃত্ত সাধনই পুরুষার্থ এবং এই দুঃখনিবৃত্তি একমাত্র জ্ঞানের সাধনাতেই সম্ভব। "জ্ঞানান্মুক্তিঃ" সাংখ্য সূত্রেরই কথা। এই জ্ঞানের আলোচনায় মহর্ষি বলেন যে প্রকৃতি ও পুরুষের পার্থক্য জানাকেই জ্ঞান বলে। এই পার্থক্য সবিশেষ বুঝাইতে তিনি পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন। প্রাচীন একটী প্রবচনে পাওয়া যায়—

> "পঞ্চবিংশতি তত্ত্বজ্ঞো যত্র তত্রাশ্রমে বসেৎ।
> জটী মুণ্ডী শিখী বাপি মুচ্যতে নাত্র সংশয়॥"

অর্থাৎ যিনি পঞ্চবিংশতি তত্ত্বে জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, তিনি যে আশ্রমেই বাস করুন না—তিনি বনবাসী, ব্রহ্মচারী বা গৃহস্থ যাহাই হউন না, তিনি যে মুক্তিলাভ করিবেন, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। এখন কথা হইতেছে, পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব কি? সাংখ্যসূত্রে দেখা যায়, "সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ প্রকৃতের্মহান্ মহতোঽহঙ্কার অহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রানি উভয়মিন্দ্রিয়ং তন্মাত্রেভ্যঃ স্থূলভূতানি পুরুষ ইতি পঞ্চবিংশতির্গণঃ" অর্থাৎ সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা হইল প্রকৃতি, তাহা হইতে মহৎ, মহৎ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র (সূক্ষ্মভূত),

একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চমহাভূত (স্থূলভূত) ও পুরুষ, এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব। এই পুরুষ ও প্রকৃতির বিচারই সাংখ্যের অমূল্য দান, অসীম জ্ঞান। পুরুষ নিত্য মুক্ত, শুদ্ধ, বুদ্ধ। অজ্ঞানে আবৃত হইয়া প্রকৃতি সংযোগে পুরুষ স্বরূপ হইতে বিকৃতি, বিচ্যুতি লাভ করিয়া আপনাকে দুঃখদৈন্যের অধীন মনে করে। অজ্ঞান দূর করিলেই পুরুষের স্বতঃপ্রকাশ রূপ ফুটিয়া উঠিবে। সেখানে মুক্তির আলোকে চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত। ইহাই সাংখ্যের কৈবল্য মুক্তি।

'পাতঞ্জলে' দর্শনের সাধক মহর্ষি পতঞ্জলি যোগসূত্রে এই মুক্তির (দুঃখনিবৃত্তির) কথাই নানাভাবে প্রকাশের চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি স্থির বলিলেন—পুরুষকে প্রকৃতি হইতে বিবিক্ত দেখিবার একমাত্র উপায় যোগ। যোগের বিশদ আলোচনায়—বলিলেন, "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ"। দুঃখদৈন্য চিত্তের বৃত্তি। যোগ দ্বারা চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিলেই দুঃখ-নিবৃত্তি। যোগের ক্রমপরিণতি দেখাইতে বলিলেন যোগ অষ্টাঙ্গ। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি। এই অষ্টবিধ প্রক্রিয়ায় যোগের পূর্ণতা। চিত্তবৃত্তির বর্ণনায় বলিলেন "বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয্যঃ—।" "প্রমাণ বিপর্য্যয়-বিকল্প-নিদ্রা-স্মৃতয়ঃ"। এই বৃত্তিগুলি নিরোধের সর্ব্বপ্রধান উপায় বলিয়াছেন "ঈশ্বর প্রণিধানাৎ বা"। প্রশ্ন উঠিল ঈশ্বর কি এবং কে? উত্তর আসিল,—ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈর-পরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ এক বিশেষ পুরুষ, যিনি দুঃখ, কর্ম্ম, কর্ম্মফল, অথবা বাসনা দ্বারা অস্পৃষ্ট, তিনিই ঈশ্বর। সমাধিযোগে ঈশ্বরের এইরূপে (স্বরূপে) অবস্থান হয়। ইহাই কৈবল্যসিদ্ধি।

"পূর্ব্বমীমাংসা"র ঋষি মহাত্মা জৈমিনি। যদিও সমস্ত জ্ঞানেরই জনক 'বেদ', তথাপি বিশেষ করিয়া এই দর্শনখানি এবং 'বেদান্ত' দর্শনের মূল বেদ হইতে। এইখানে বেদ সম্বন্ধে সামান্য একটু আলোচনা অবান্তর হইবে না, বরং বোধসৌকর্য্যার্থে ইহার প্রয়োজনীয়তাই অনুমিত হয়। বেদের দুইভাগ—কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। কর্ম্মকাণ্ডের দুই শাখা—'সংহিতা' ও 'ব্রাহ্মণ'। জ্ঞানকাণ্ডের দুই শাখা—'আরণ্যক' ও 'উপনিষদ্'। কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের বিবৃতিতে আশ্রমধর্ম্মের কথা আসিয়া পড়ে। হিন্দুধর্ম্ম যে সত্যধর্ম্ম, হিন্দুদর্শন যে সত্যজ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, হিন্দুধর্ম্ম যে নিত্য এবং অবিনাশী, ইহার মূলে আছে এই আশ্রমধর্ম্ম। এই আশ্রমধর্ম্মটী এত সুগভীর চিন্তার ফল, যে ইহাতে কোন দোষ স্পর্শ করে নাই, কখনও করিতে পারে না। পূর্ব্বাচার্য্যগণ যে পূর্ণ ধীশক্তিকে জাগ্রত করিতে পারিয়াছিলেন, জীবকল্যাণে এই আশ্রমধর্ম্মের প্রবর্ত্তনই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতে প্রথমে ব্রহ্মচর্য্য—ছাত্রজীবন। এই আশ্রমে বালকদিগকে অধ্যয়নে রত থাকিতে হইত। 'সংহিতা' এই আশ্রমের বাহন। পরে গার্হস্থ্য—বিবাহিত জীবন। এই আশ্রমে যুবক পত্নীসহ যাগযজ্ঞে ব্যাপৃত থাকিত। 'ব্রাহ্মণ'ভাগ এই আশ্রমের বাহন। পরে বাণপ্রস্থ—অরণ্যজীবন। এই আশ্রমে প্রৌঢ় সংসার ত্যাগ করিয়া অরণ্য আশ্রয় করিতেন এইখানেই জ্ঞানকাণ্ডের উৎপত্তি। এই আশ্রমের আলোচ্য গ্রন্থসমূহের নাম হইয়াছে "আরণ্যক"। শেষ জীবনে সন্ন্যাস = ভিক্ষু জীবন। এই আশ্রমে বৃদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান আয়ত্ত করিয়া মোক্ষযাত্রী রূপে দেহ ধারণ করিয়া ব্রহ্মের অপেক্ষায় মাত্র থাকিতেন। এই আশ্রমে আলোচ্য গ্রন্থসমূহের নাম "উপনিষৎ"।

সংক্ষেপে আমরা দেখিলাম, বেদের চারিটী বিভাগ চারিটী আশ্রমের জন্য।

১। সংহিতা—মন্ত্রসমষ্টি—ব্রহ্মচারীর জন্য।

২। ব্রাহ্মণ—যজ্ঞক্রিয়া—গৃহস্থের জন্য।

৩। আরণ্যক—যজ্ঞাঙ্গের রূপক ভাবনা—বাণপ্রস্থীর জন্য।

৪। উপনিষৎ—ব্রহ্মোপলব্ধি—সন্ন্যাসীর জন্য।

বেদের কর্ম্মকাণ্ড অর্থাৎ সংহিতা ও ব্রাহ্মণভাগের সার সঙ্কলনই "মীমাংসা দর্শন"। এই দর্শনের মতে কর্ম্মকাণ্ডই বেদের সার, জ্ঞানকাণ্ড অপ্রয়োজনীয়। মীমাংসা দর্শন নিরীশ্বরবাদ প্রচার করিতে দ্বিধা করেন নাই। জীব স্ব স্ব কর্ম্মানুযায়ী ফলভোগ করে। তাহাতে ঈশ্বরের সম্পর্ক আরোপ করা অজ্ঞানের কার্য্য। "স্বর্গকামঃ যজ্ঞে"। যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর, অমৃতময় সুখধাম লাভ করিবে। ইহাই মুক্তি, ইহাই অমরত্ব। "অপামসোমম্ অমৃতা বভূম" এই দর্শনের বাণী।

এইবার বেদান্ত দর্শনের কথা। এই দর্শনখানি সর্ব্বদর্শনশিরোমণি আখ্যা পাইয়াছেন। বেদের জ্ঞানকাণ্ড বা 'আরণ্যক' ও 'উপনিষৎ' হইতে এই দর্শনের উৎপত্তি। ইহা মহর্ষি বাদরায়ণ প্রণীত। বেদের ইহা অন্ত, চরম বা পরম ভাগ। ইহার অপর নাম 'ব্রহ্মসূত্র'। মূল প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম বলিয়াই বোধ হয় এই নাম। ব্রহ্ম সম্বন্ধে এই দর্শনে বলা হইয়াছে—"একমেবাদ্বিতীয়ম্," "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম", "অনোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্", "সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতং", "অপানি-পাদো জবনোগ্রহীতা" ইত্যাদি বিস্ময়কর কথা। জগতের সমস্ত পদার্থই ব্রহ্ম। "জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ"। জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নয়—অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যেমন অগ্নি হইতে ভিন্ন নয়। বেদ সেই কথাই বলিয়াছেন, "তত্ত্বমসি", "সোঽহং", "অহং ব্রহ্মাস্মি", "অয়মাত্মা ব্রহ্ম"। প্রশ্ন উঠিতে পারে—জীব যদি ব্রহ্মের সহিত অভেদ, তবে জীবের দুঃখের কারণ কি? উত্তরে বলিলেন, "অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ" অবিদ্যাপ্রভাবে আত্মবিস্মৃত হইয়া শোক মোহের অধীন হইয়া নিজের মহিমা ভুলিয়া দুঃখ দৈন্যের অধিকারে আগমন। অবিদ্যা বিদূরের উপায়ে বলিলেন, "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ, শ্রোতব্যঃ, মন্তব্যঃ, নিদিধ্যাসিতব্যঃ, অর্থাৎ শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা সেই পরমাত্মাকে নিজের আত্মারূপে জান। "তমেবৈকং জানথ আত্মানং"। তুচ্ছ বিষয়ের আলোচনা পরিত্যাগ কর। "অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ"। উপনিষৎ বলিলেন, "ব্রহ্ম সন্ ব্রহ্ম অপ্যেতি", ব্রহ্ম হইয়া ব্রহ্মকে জান। বেদান্ত ইহাকে বলিয়াছেন ব্রহ্মসাযুজ্য।

অন্যান্য দর্শনগুলি হইতে এই দর্শনের একটী বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় যে এই দর্শনখানি আদ্যন্ত আনন্দের কথায় পূর্ণ। "রসো বৈ সঃ" এই শ্রুতিবাক্যের সম্পূর্ণ রসটী যেন পরিপূর্ণ প্রবাহিত হইতেছে এই দর্শনটীর সমগ্র দেহে, সমগ্রভাবে। আনন্দ যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া এই দর্শনখানির সারা দেহে দর্শন দিয়াছে। এই দর্শনের সাধক "মোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধা", আনন্দময়কে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দস্বরূপ হইয়া যান। সেই আনন্দ যে জীবের অন্তরে সর্ব্বতোভাবে পরিব্যাপ্ত তাহাই বলিয়াছেন, "সর্ব্বব্যাপিনমাত্মানং ক্ষীরে সর্পিরিবার্পিতং" অর্থাৎ ক্ষীরের মধ্যে যেমন ঘৃত আছে, দেহের মধ্যে তেমনি আত্মা আছেন। সেই কথাই ভিন্ন ভাবে বলা হইয়াছে,

"কাষ্ঠমধ্যে যথা বহ্নিঃ, পুষ্পে গন্ধঃ, পয়ে ঘৃতং।
দেহমধ্যে তথা দেবঃ পাপপুণ্য বিবর্জ্জিতঃ॥"

আমরা দেখিলাম দর্শনগুলি মোটামুটি তিনটী তত্ত্বনির্ণয়ে যত্নবান। ঈশ্বর, জীব ও জগৎ। জগতে জীব নিরন্তর দুঃখের কবলে পতিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল, পন্থা কি? শ্রদ্ধাবিজড়িত আন্তরিক প্রচেষ্টা কখনও ব্যর্থ হয় না, ইহাই প্রমাণ করিতে বাণী আসিল শুক্লযজুর্ব্বেদ হইতে—

"তমেব বিদিত্বা অতি মৃত্যুম্ এতি।
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥"

তাঁহাকে জানিলেই জীব মৃত্যুসাগর পার হইয়া অমৃতলাভে অধিকারী হয়, ইহা ভিন্ন অন্য পন্থা নাই। মৃত্যু অর্থে দুঃখ, অমৃত অর্থে সুখ। ছান্দোগ্য উপনিষৎ বলিলেন, "ব্রহ্মসংস্থঃ অমৃতত্বম্ এতি", যিনি ব্রহ্মে

স্থিতি লাভ করিয়াছেন, তিনি অমৃতত্ব (মুক্তি) লাভ করিয়াছেন। এই মুক্তির নামই দুঃখনিবৃত্তি বা আনন্দ। আনন্দ ব্রহ্মের স্বরূপ। নিজের মধ্যে এই ব্রহ্ম, এই ভূমার আবিষ্কারই মানুষের সাধনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফল। তাঁহাকে ভাষায় প্রকাশ করিতে গিয়া বলিলেন, সৎ, চিৎ, আনন্দ। মানবদেহ ধারণের সর্ব্বোচ্চ সার্থকতা লুকাইয়া আছে বিরাটের কল্পনায়, বিরাটের সাধনায়, বিরাটের অনুভূতিতে। এই বিরাটের বাস চিত্তক্ষেত্রে। সেখানে অব্যাহত আনন্দস্রোত প্রবাহিত রাখাই মনুষ্যত্ব, বিচ্যুত হওয়াই পশুত্ব। পশুর জন্ম আছে, সুতরাং মৃত্যু আছে। মানবের মৃত্যু নাই, সুতরাং জন্মও নাই।

দর্শন ও উপনিষদের আশ্চর্য্য বাণীগুলির শুধু মাত্র পুনরাবৃত্তি করিলাম। আশা, যে পুনঃ পুনঃ আলোচনায় একদিন না একদিন, কোন না কোন শুভমুহূর্ত্তে এই রসধারা অন্তরে ব্যাপ্তি লাভ করিবে। সেদিন জীবনে আসিবে শান্তি, আসিবে মুক্তি, আসিবে আনন্দ। আর আসিবে যে কি তাহা আমি জানিনা, যিনি আসিবেন—জানেন শুধু তিনি।

হাজারিবাগের পথে

শ্রীসুধাংশুকুমার ঘোষ বি-এস্-সি

হাজারিবাগ রোড ষ্টেশন থেকে হাজারিবাগ ৪১ মাইল মোটর বাসে যেতে হয়। রাস্তা খুব ভাল। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে চওড়া পিচ্-ঢালা মেটাল রোড—পি, ডব্লিউ, ডি-র অতিশয় যত্নে রক্ষিত ব'লে মোটরে যাওয়া আসার দীর্ঘ পথক্লেশ একেবারে বোঝা যায়না। কিন্তু পথিমধ্যে 'রথ' খারাপ হ'লে কষ্টের সীমা থাকে না। আমার হ'য়ে ছিল তাই। বাসে চ'ড়ে পথের দু পাশের ছোট বড় ঘন জঙ্গল, লাল কাঁকুড়ে মাটির বুকে বর্ষার জল স্রোতের প্রশস্ত গভীর ক্ষতের মত দাগ, মাঝে মাঝে পার্ব্বত্য নদীর বালুকা শয্যার উপর পাথরে বাঁধা পুল—চাঁদের আলোয় স্নাত হ'য়ে অপূর্ব্ব শোভাময় হ'য়ে ছিল। তা দেখ্‌তে দেখ্‌তে বাসের দোলানিতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হ'য়ে ছিলাম। হঠাৎ টাটিঝরিয়ার ডাক্-বাংলোর (হাজারিবাগ থেকে ১৭ মাইল) সাম্‌নে এসে বাস্ নিজের ভাষায় ব'লে দিল—আর পাদমেকম্ ন গচ্ছামি। তখন শীতকাল, রাত প্রায় একটা। ড্রাইভারের মুখে বাসের মর্ম্মবাণী অবগত হ'লাম। সে ব'লে দিল—বাস্ ছাড়বে পরদিন বেলা দশটার আগে নয়। বিওন্‌গড় গ্রাম থেকে নাট্ ও স্ক্রু আনিয়ে তবে বাস্ মেরামত ক'রতে হবে। আধঘুম অবস্থায় এ কথা শুনে আঁৎকে উঠ্‌লাম। ড্রাইভার ব'লে দিলে, ডাক্-বাংলোয় শোবার জায়গা হবে। বাংলোয় গেলাম। ডাকাডাকি ক'রে মালীর সুখনিদ্রা ভাঙ্গিয়ে একটা ঘরে আশ্রয় নিলাম। নেয়ারের খাটে বিছানা পেতে শুলাম বটে কিন্তু নিদ্রা এল না। ছার-পোকার কামড় এবং ছুঁচো চ'লে বেড়াবার শব্দ সমস্ত রাত জাগিয়ে রেখেছিলো আমাকে। সঙ্গে ছিল—আমার পশ্চিমা ভৃত্য বুধুয়া। আসামের এক বড় চা বাগানের কর্ত্তৃপক্ষদের পক্ষ থেকে হাজারিবাগের জঙ্গল অঞ্চলে চা-এর চাষ কি রকম সফল হবে—সে সম্বন্ধে তথ্যসংগ্রহ করার জন্ত আমার এই অভিযান। যাই হোক ছুঁচোর কীর্ত্তন ও ছারপোকার কামড় সহ্য করে ভোরের দিকে ঘুমিয়ে প'ড়ে ছিলাম। ঘুম ভাঙ্গলো সকালে একটা চাপা কান্নার শব্দে। বারাণ্ডায় বেরিয়ে এসে দেখি ডাক্-বাংলার মালীর স্ত্রী কাঁদছে। তার সাম্‌নে ব'সে র'য়েছে আমার চাকর বুধুয়া এবং পাশে দাঁড়িয়ে আছে বাংলোর মালী। আমাকে দেখে মেয়েটি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো। তার পাশে দুটি পুরুষ মানুষ হতবম্বর মত উপস্থিত র'য়েছে—কারও মুখে কোনও কথা নেই। আমি বুধুয়াকে ডাকলাম। তাকে ব'ললাম বাস্ ক'টায় ছাড়বে জেনে আস্‌তে। সে ব'ললে সে এক মহা সমস্যায় প'ড়েছে। আমার সঙ্গে সে যেতে পারবে না। হয়ত' চা বাগানের চাকরী তাকে ছেড়ে দিতে হবে এবং তার জন্ম যা ক্ষতি হয়, তা তাকে নিরুপায় হ'য়ে সহ্য ক'রতে হবে। অত্যন্ত চিন্তায় প'ড়ে গেলাম—এ কথা শুনে। চা বাগানে একলা থাকি। বুধুয়াকে বেশ ট্রেন্‌ড্ ক'রে নিয়েছিলাম। ওকে ছেড়ে দিলে হাজারিবাগে থাকা কালীন বা চা বাগানে ফিরে গিয়ে আমাকে অত্যন্ত অসুবিধায় প'ড়তে হবে। নানারকম চিন্তারমধ্যে প্রাতরাশ শেষ ক'রলাম। তারপর বুধুয়াকে জিজ্ঞাসা ক'রলাম—তার মহা সমস্যার কথা। সে মুংলীর কাছে শুন্‌তে ব'ললে—এবং মুংলী অর্থাৎ মালীর স্ত্রীকে ডেকে নিয়ে এল। মালীও একটু পরে হাতে দু খানা কাগজ নিয়ে—কাছে এসে দাঁড়ালো।

মুংলী ফোঁপাতে ফোঁপাতে নিজের ভাষায় আমাকে যা ব'ললো—তার মর্ম্মার্থ এই :—

বুধুয়া, মুংলী ও সোম্‌রার (মালী)—তিনজনেরই হাজারিবাগ জেলার ইচাক্ গ্রামে বাড়ী। ওদের ছেলেমেয়ের নাম হয়—জন্মবারের নাম ধ'রে—'আ'কার ও 'ঈ'কারের সাহায্যে যথাক্রমে নামের পুং ও স্ত্রীলিঙ্গ সূচিত হয়। মুংলীর যখন বয়স আট বছর তখন একবার সে তালাওয়ে স্নান ক'রতে গিয়ে জলে ডুবে যায়। সোম্‌রা দৈবাৎ সেদিন জঙ্গল থেকে সগড় গাড়ী ক'রে কাঠ কেটে তালাওয়ের সাম্‌নে দিয়ে বাড়ী ফির্‌ছিলো। মুংলীর কান্নার শব্দ শুনে—সে সগড় থেকে লাফিয়ে নিজের জীবন বিপন্ন ক'রে মুংলীকে জল থেকে তুলে বাঁচায়। ওদেশের ছেলে মেয়েরা সাঁতার খুব কম শেখে। সোম্‌রা একটু একটু জলে ভাস্‌তে শিখেছিল—মাত্র। এ অবস্থায় তার সাহসিকতা দেখে গ্রামের লোকে তার খুব প্রশংসা ক'রেল। মুংলীর বন্ধুরা তাকে পরামর্শ দিল—সোম্‌রাকে বিয়ে ক'রতে। সোম্‌রাও সেই থেকে মুংলীর সঙ্গে নানা ছলে ভাব করবার চেষ্টা ক'রত। কাছাকাছি গাঁয়ের মেলা থেকে কাঠের লাল চিরুণী, গাছের পাতা পাকানো কাণের ফুল প্রভৃতি তার জন্ত এনে দিত। ফলসা, পানেরা, খেজুর প্রভৃতি জঙ্গল থেকে এনে মুংলীকে লুকিয়ে খাওয়াত। মুংলীর যেদিন তালাওয়ে স্নানের দিন হ'ত সেদিন সোম্‌রা তালাওয়ের কাছাকাছি 'চেলি' বা টুক্‌রা কাঠ সংগ্রহের কাজে নিজেকে নিযুক্ত রাখ্‌তো ; এইসব থেকে মুংলী যখন বুঝ্‌তে পারলে—সোম্‌রার তাকে ভাল লাগে, তখন সে সোম্‌রাকে ব'ললে, তার

বাপ যেন মুংলীর বাপের কাছে তার সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব করে। সোম্‌রার বাপ বিশুয়া ছিল—গ্রামের 'মাহাতো' অর্থাৎ প্রধান। পদ্‌মা রাজার দেওয়ান ৺রামেশ্বর ঘোষ মহাশয়ের স্বাক্ষরিত বিশুয়াকে 'মাহাতো' পদবী দানের হুকুমনামা—সোম্‌রা সঙ্গে ক'রে এনেছিল—আমাকে সে তা দেখালে। বিশুয়া মাহাতো মুংলীর সঙ্গে তার ছেলের বিবাহে কিছুতেই মত দিলেনা। কারণ মুংলীর বাপ সামান্ত 'ক্ষেতি' করে মাত্র। শেষ পর্য্যন্ত মুংলীর আমার বাহন বুধুয়ার সঙ্গে বিয়ে হয়। বুধুয়ার বাপ ছিল গ্রামের ছোট মাহাতো—বুধুয়ার সঙ্গে বিয়ের পর মুংলীর বছর খানেক বেশ সুখে কাটে। ওদের খুব ছোট বয়সে সাধারণতঃ বিয়ে হয়। পাত্র পাত্রী বয়স্থা হলে 'গহ্‌না' অর্থাৎ দ্বিরাগমন হয়। তার পূর্ব্বে কন্যা শ্বশুরালয়ে ঘর ক'রতে যায়না। কিন্তু মুংলীর বিয়ে নিয়ে প্রথমে একটা খট্‌কা প'ড়ে যাওয়ায়—তার বিয়ে হ'তে দেরী হয় এবং বিয়ের পরই তাহার 'গহ্‌না' হয়। এ পর্য্যন্ত ব'লে সে বুধুয়ার দিকে একবার চাইলে। বুধুয়া আমার কাছ থেকে স'রে গিয়ে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেল্‌লে।

মুংলী ব'লে চ'ল্‌লো—তারপর শীতকাল এল। জঙ্গলে কাঠ কাটার সময় প'ড়ল। গ্রামের 'জোয়ান' ও 'মরদ' সকলে রাত্রে দল বেঁধে সগড় নিয়ে কাঠ কাট্‌তে যেত। যে যেমন দূরে কাঠ কাট্‌তে যেতো—সে তেমন শীঘ্র বা দেরীতে কাঠ নিয়ে ফির্‌তো। সাধারণতঃ ফির্‌তে তিন চার দিনের বেশী কারোর দেরী হ'ত না। একবার বুধুয়া কাঠ কাট্‌তে গিয়ে আর ফির্‌লো না। তার সগড়ের সঙ্গে গ্রামের আর একজন লোক গিয়েছিলো—সেও ফির্‌লো না। দশ পনের দিন পরেও যখন তারা ফির্‌লো না—তখন সকলের ভাবনা হ'ল। আশ-পাশের জঙ্গলে বুধুয়া ও তার সঙ্গীকে অনেক খোঁজা হ'ল। কোনও সন্ধান মিল্‌লো না। কিছুদিন পরে বুধুয়ার সগড়, ছুটো বলদের মাথা এবং একটা মানুষের কঙ্কাল—একটা দূর জঙ্গলে একদল লোক দেখ্‌তে পেয়েছে—খবর এল। গ্রামে কান্নাকাটি প'ড়ে গেল। আজ সকালে বুধুয়াকে মুংলী দেখার আগে পর্য্যন্ত জান্‌তো—বুধুয়াকে জঙ্গলে বাঘে নিয়ে গেছে। সেই ধারণা অনুযায়ী বুধুয়ার 'মৃত্যুর' কিছুদিন পরে—সোম্‌রার সঙ্গে তার 'সাংগা' অর্থাৎ পুনর্ব্বিবাহ হয়। সোম্‌রার বাপকে অনেক কষ্টে গ্রামের লোকেরা বুঝিয়ে রাজি করায়—মুংলীও নিজেকে সোম্‌রার হাতে সমর্পণ ক'রে। এদের একটি ছেলে হ'য়েছে। দেশে অজন্মা হওয়ায় সোম্‌রা এই চাকরী নিয়েছে। এখন তার স্বামী বেঁচে থাক্‌তে তার 'সাংগা' হওয়ার সংবাদ লোকে জান্‌লে—তাকে 'জাত' থেকে বের ক'রে দেবে—এই ব'লে সে কাঁদ্‌তে আরম্ভ ক'রে দিলে।

বুধুয়ার 'মৃত্যু' সংবাদ সে চৌকিদারকে জানিয়েছিল এবং চৌকিদারকে এ বিষয় সন্ধান ক'রতে যথোচিতভাবে অনুরোধ ক'রেছিল—তার প্রমাণ স্বরূপ তদানীন্তন এলাকার সাব্‌ডেপুটি ও চৌকিদারী অফিসার ৺তুলালহরি ঘোষ মহাশয়ের যথারীতি বীট্‌-চৌকিদারের উপর উক্ত মর্ম্মে পরোয়ানা সোম্‌রা আমাকে বের ক'রে দেখালো।

বুধুয়াকে জিজ্ঞাসা ক'রলাম—সে 'ম'রে' আবার ফিরে এল কি ক'রে! সে ব'ললে সে এখন ম'রলে যদি মুংলীর সুবিধা হয় তবে সে তাতেও রাজী আছে। সোম্‌রা ব'ললে তার দরকার নেই—সে তার দাবী ত্যাগ ক'রে দেবে। আমি বললাম সে সব কথা পরে হবে। বুধুয়া উধাও হ'ল কি ক'রে শুনি।

বুধুয়া ব'লল—সে সেবার কাঠ কাট্‌তে বেরিয়েছিলো তাদের গাঁয়ের ছোট শুক্‌রার সঙ্গে। সিংহানি মিশনের হাতার সাম্‌নে পৌছে লোকের ভিড় দেখে খোঁজ নিয়ে জান্‌লো দু'জন লোক অনেক টাকা দিয়ে চা বাগানের জন্য কুলী 'কিন্‌ছিলো'। সে কুলী হ'তে চাইলে বাবুরা তাকে অনেক টাকা দিলে। ছোট শুক্‌রার মারফৎ এ টাকা ও এই খবর তার বাপকে ও মুংলীকে পাঠিয়ে সেই দিনই সে লরী ক'রে অনেক লোকের সঙ্গে সেখান থেকে চলে যায়। চুক্তির সময় পূরে গেলেই সে ফিরবে—তারা যেন না ভাবে—এবং মুংলী যেন তার বাপের বাড়ী গিয়ে থাকে—এসব ব্যবস্থা সে ছোট শুক্‌রার মারফৎ ক'রে গেছলো। এখন বোঝা যাচ্ছে—ছোট শুক্‌রা জঙ্গলে বাঘের হাতে প'ড়েছিলো।

আমি ব্যাপারটা যত সহজ মনে ক'রেছিলাম—তত সহজ দেখা গেল না। এদের জবানবন্দী শুন্‌তে শুন্‌তে বেলা হ'য়ে গেল। বাস্ মেরামত হ'য়ে যাওয়ার সংবাদ ড্রাইভার দিয়ে গেল। আমার সে অবস্থায় যাওয়া অসম্ভব হ'ল, বাস ছেড়ে দিল। আমি ডাক্ বাংলায় আহারাদি সেরে বৈকালে একটু বেড়াতে বেরুলাম। জঙ্গলের চারিদিকে উঁচু পাহাড়গুলিকে প্রহরীর মত বিরাজমান দেখে মনটা ক্লান্তিপূর্ণ বাস্তব থেকে একটু বিক্ষিপ্ত হ'ল। গ্রামের শিবমন্দিরের উচ্চ চূড়া দেখে অনেকক্ষণ হেঁটে সেখানে পৌছালাম। সেখানকার পুরোহিতের সঙ্গে কথা ক'য়ে জান্‌লাম—তাঁর নাম প্রেমসুখ শর্ম্মা—বাড়ী ইচাক্ গ্রামে। তাঁকে একবার বাংলোয় পায়ের ধূলো দিতে ব'লে—ফিরে এলাম। তিনি সেখানে থাকেন—সোম্‌রা ও মুংলী জান্‌তো। তিনি বাংলোয় পৌছালে বুধুয়া তাঁকে 'পাঁভাওলাগি মহারাজ' ব'লে অভ্যর্থনা ক'রতে—তিনি বুধুয়াকে দেখে চ'ম্‌কে উঠ্‌লেন। তাঁর ভাবান্তর সবাই বুঝ্‌লে। আমি সংক্ষেপে তাঁকে ঘটনাটা ব'লে দিলাম—এবং শীঘ্র এর একটা সমাধান ক'রে দিতে ব'ললাম। তিনি ব'ললেন—রাত্রে তিনি মহাদেওজির নিকট ধ্যানে সমাধান জিজ্ঞাসা ক'রে কাল ব'লবেন। কাল দিনে খাওয়া দাওয়া ক'রে বারটার বাসে আমি হাজারিবাগ চলে যেতে পারবো সে ভরসা আমাকে দিলেন। আমি সেদিনের বাকীটুকু সম্পূর্ণ 'রেষ্ট' নেবার মতন ব্যবস্থায় মন দিলাম।

পরদিন প্রাতে ঘুম ভাঙ্গলো আবার মুংলীর কান্নায়। সে কান্না ফুঁপিয়ে চাপা কান্না নয়—মর্ম্মভেদী হাহাকার জানিয়ে তারস্বরে কান্না। বুধুয়ার কাছে জানলাম, ভোর রাত্রে সোম্‌রা একবার উঠে বাইরে গিয়েছিলো—সে সময় তাকে 'সের' অর্থাৎ বাঘে নিয়ে গেছে। এ অঞ্চলের জঙ্গলটা একটু পাৎলা। বাঘের উপদ্রবের কথা কচিৎ শোনা যায়। দু' একটা গরু ছাগলও সে রাত্রে গ্রাম থেকে উধাও হয়েছে। ভোরের আলো হ'য়ে যাওয়ায় 'শের'টা সোম্‌রার অর্দ্ধভুক্ত দেহ জঙ্গলের প্রান্তে ফেলে পালিয়েছে। সমস্যার এ রকম সাংঘাতিক সমাধান কি কেউ চেয়েছিল? তার সঙ্গে এ ঘটনার কোনও যোগাযোগ আছে কি? মনস্তত্ত্বের এলাকায় পৌছে গেছি—এজন্য বিরত হ'তে হ'ল।

বিশ্ববিদ্যালয়ে স্ত্রী-শিক্ষার পত্তন

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

বিগত ১৩৫০ অগ্রহায়ণ সংখ্যা "ভারতবর্ষে" শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের 'বিশ্ববিদ্যালয়ে স্ত্রীশিক্ষার পত্তন' নামক সুলিখিত বহুতথ্যপূর্ণ প্রবন্ধে কয়েকটী তথ্য বাদ পড়াতে ভবিষ্যতে স্ত্রীশিক্ষার পত্তনের ইতিহাস লেখকগণের পক্ষে ক্ষতিকর হইতে পারেবোধে তাহা পূরণ করা প্রয়োজন মনে করিতেছি। তিনি লিখিয়াছেন যে "কাদম্বিনীর পরেই ১৮৮০ সালে কামিনী সেন (পরে রায়) প্রথম বিভাগে এন্‌ট্রেন্স পাশ করেন।" সে বৎসর যে আর একটী বঙ্গ মহিলাও এন্‌ট্রেন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহার কোনো উল্লেখ না থাকায় মনে হওয়া স্বাভাবিক যে তিনিই সে বৎসর একমাত্র মহিলা যিনি উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন ; কিন্তু ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের বেথুন স্কুলের বার্ষিক বিবরণী যাহা স্কুলের তদানীন্তন সম্পাদক মনোমোহন ঘোষ মহাশয় উক্ত স্কুলের পুরস্কার বিতরণ সভায় ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মার্চ্চ তারিখে পাঠ করেন এবং যাহা ৮ই মার্চ্চ তারিখের 'ইণ্ডিয়ান্ ডেলি-নিউজ্' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, তাহা হইতে জানা যায় যে উক্ত বৎসর ৺সুবর্ণপ্রভা বসুও এন্‌ট্রেন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'ন। রিপোর্টে আছে যে "In the first year College class there is one pupil, Kamini Sen, who intends to go up this year for the first Arts Examination, there was another young lady, Subarna Probha Bose, in the same class, who passed the Entrance Examination with Kamini Sen in 1880, but who left Cllege last year by reason of her marriage."

৺কামিনী সেন পরে কবিরূপে যশ লাভ করেন। ইনি সুবিখ্যাত সাহিত্যিক ও যশস্বী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট 'অযোধ্যার বেগম', 'ঝান্সীর রাণী' 'মহারাজ নন্দকুমার' প্রভৃতির প্রণেতা ৺চণ্ডীচরণ সেনের কন্যা ও সুবিখ্যাত সিবিলিয়ান্ ৺কেদারনাথ রায়ের ধর্ম্মপত্নী। ৺সুবর্ণপ্রভা ৺ভগবান্‌চন্দ্র বসুর কন্যা ও আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের ভগিনী। ৺আনন্দমোহন বসুর ভ্রাতা ডাক্তার ৺মোহিনীমোহন বসুর সহিত ইনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হওয়াতে ইঁহাকে বেথুন কলেজের পাঠ শেষ করিতে হয়। বসুবিজ্ঞান মন্দিরের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ ডাক্তার দেবেন্দ্রমোহন বসু ইঁহার পুত্রদের মধ্যে অন্যতম।

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে কাদম্বিনী ও চন্দ্রমুখী এফ্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরে, জ্যোতিষ বাবু ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে কামিনী সেনের উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সংবাদ দিয়াছেন। কিন্তু ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে যে বেথুন কলেজ হইতে এলেন ডি' আব্রু নাম্নী একটী অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান্ মহিলা এফ্-এ পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হ'ন, সে সংবাদটুকু প্রদান করেন নাই উক্ত বেথুন স্কুলের রিপোর্টে আছে যে, "from the College Department only one girl, Ellen D'Abren. went up for the first Arts examination of the Calcutta University which she passed with Credit to herself in the Second Division." যে দুই বঙ্গমহিলা সর্ব্বপ্রথম এফ্-এ পরীক্ষায় উর্ত্তীর্ণ হ'ন, তাঁহাদের মধ্যে কাদম্বিনী বেথুন কলেজের একমাত্র ছাত্রী ছিলেন, চন্দ্রমুখী ছিলেন "Free Church of Scotland এর কলেজের ছাত্রী।

জ্যোতিষ বাবু লিখিয়াছেন, "১৮৮১ সালে পাঁচটি বঙ্গনারী এন্‌ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করেন।" ঐ বৎসর কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ছয়জন বঙ্গমহিলা উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'ন ; জ্যোতিষবাবু বাঙ্গালী খ্রীষ্টান মহিলা কুমারী প্রিয়তমা দত্তের (পরে চট্টোপাধ্যায়) কথা উল্লেখ করেন নাই। তিনি আপার কৃশ্চিয়ান্ স্কুলের ছাত্রী ছিলেন।

Journal of National Indian Association পত্রিকার মার্চ্চ ১৮৮২ সংখ্যা (ক্রমিক সংখ্যা ১৩৫), সংবাদ বিভাগে (পৃঃ ১৮১) সংবাদ দৃষ্টে এই ভুল ধরা পড়ে। উক্ত সংবাদে আছে "In the recent Matriculation examination of the Calcutta University six Bengalee ladies were among the successful Candidates. Kumari Abala Bose and Kumudini Khastogir (Bethune School), Vriginia Mary Mittra (Cawnpure Girls' School). and Kumari Nirmalabala Mukhopadhya (Free Church Normal School) in the Second Division ; Kumari Priatama Dutt (Upper Christian School), Kumari Bidhumukhi Bose (Dehra mission Girls' School) in the third division. Two other ladies, Miss P. Johnstone (Allahabad Girls' Schooll) and Miss L. H. Smith (Miss Arakiels' School) passed in the Second Division."

জ্যোতিষবাবু মহিলাদের উচ্চ শিক্ষা প্রসারে হব্‌হাউস্ সাহেবের কথা লিখিয়াছেন, কিন্তু এ প্রসঙ্গে বাঙ্গালার ছোট লাট স্যার অ্যাশ্‌লি ইডেন এবং যাঁহার প্রযত্ন ভিন্ন বঙ্গীয় মহিলাদের নিকট বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার কখনও উন্মুক্ত হইত কিনা সন্দেহ সেই মদীয় পিতৃদেব, 'অবলা-বান্ধব' দ্বারকানাথের বিষয় কিছুই বলেন নাই। সে সময়ে, বেথুন স্কুলে নর্ম্ম্যাল অবধি শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল, অগ্রগামীদলের নেতা কেশবচন্দ্রও মহিলাগণের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা পছন্দ করিতেন না, তিনিও মহিলাদের জন্য নর্ম্ম্যাল পর্য্যন্ত পাঠের ব্যবস্থা তাঁহার স্কুলে করেন। দ্বারকানাথ, দুর্গামোহন দাস, অন্নদাচরণ খাস্তগির ও আনন্দমোহন বসুর সহযোগিতায় নারীদের উচ্চতর শিক্ষার আন্দোলন আরম্ভ করেন এবং এন্‌ট্রান্স পর্য্যন্ত শিক্ষা দিবার জন্য বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। এই স্কুলের শিক্ষা ব্যবস্থা বেথুন স্কুলের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর দেখিয়া এই দুইটি স্কুলকে এক করিবার বাঙ্গালার লাট স্যার অ্যাশ্‌লি ইডেন চেষ্টা করেন এবং তাঁহার চেষ্টাতেই উভয় স্কুল মিলিয়া শক্তিশালী হইয়া উঠে। এই ঘটনার উল্লেখও মনোমোহন ঘোষ কর্ত্তৃক পঠিত ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের বেথুন স্কুলের রিপোর্টে আংশিকভাবে স্বীকৃত আছে। রিপোর্টে প্রকাশ যে, "Nearly four years have now elapsed since this Committee thought fit to amalgamate with the Bethune School, the Banga Mahila Vidyalaya (a boarding School founded by some Bengali Gentlemen)." বঙ্গমহিলা বিদ্যালয় সম্পর্কে আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁহার 'আত্মচরিত'-এ লিখিয়াছেন যে, "দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীর দল ভারত আশ্রমের মহিলা বিদ্যালয়ে সন্তুষ্ট না হইয়া মহিলাদের শিক্ষার উদ্দেশ্যে আর একটি স্কুল স্থাপনে অগ্রসর হইলেন। বালীগঞ্জে একটি বাড়ী ভাড়া লইয়া স্কুল খোলা হইল। গাঙ্গুলী ভায়া নিজে শিক্ষক হইলেন ; শুধু শিক্ষা কেন, তিনি দিবারাত্র বিশ্রাম না জানিয়া ঐ স্কুলের উন্নতি সাধনের জন্য দেহ মন নিয়োগ করিলেন।" নানা বিষয়ে দ্বারকানাথের সহকর্মী, ঐ একই গ্রন্থকার তৎপ্রণীত ও অধুনা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থে দ্বারকানাথের ঐ বিদ্যালয়

সম্পর্কে তাঁহার অসাধারণ পরিশ্রমের কথা আরও খুলিয়া লিখিয়াছেন : "তাঁহার [ঐ বিস্তালয়ের] জন্ম অর্থসংগ্রহ করা, যানবাহনাদির বন্দোবস্ত করা, পাঠাদির ব্যবস্থা করা, ছাত্রীনিবাসে ছাত্রীগণের আহারাদির ব্যবস্থা করা, তাহাদের পীড়াদির সময়ে চিকিৎসাদির বন্দোবস্ত করা, প্রভৃতি সমুদায় কার্য্যের ভার একা গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের উপর পড়িয়া গেল। তিনি আহ্লাদিতচিত্তে সেই সকল শ্রম বহন করিতে লাগিলেন। আমরা দেখিয়া পরস্পর বলাবলি করিতাম যে মানুষ এতদূর শ্রম করিতে পারে ইহাই আশ্চর্য্য।" (দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯০৯, পৃঃ ৩৪৩)। মোট কথা, বিশ্ববিষ্ঠালয়ে উচ্চতর স্ত্রীশিক্ষার মূলে যে নবগঠিত বেথুন স্কুল সেই নূতন বেথুন স্কুলের মূলে ছিল তাহার অপেক্ষা উন্নততর ও পূর্বগামী বঙ্গনারীদের উচ্চ শিক্ষার সর্ব্বপ্রথম শিক্ষায়তন 'বঙ্গমহিলা বিস্তালয়' এবং ঐ বিস্তালয়ের সর্ব্বপ্রধান উদ্যোক্তা ও প্রাণস্বরূপ ছিলেন দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। বঙ্গনারীদের উচ্চ শিক্ষার ইতিহাস সম্পর্কে কেবলমাত্র বিদেশী হব্‌হাউস্, এমন কি বিদেশী লাট অ্যাশ্‌লি ইডেনের উল্লেখ করা, অথচ তাঁহাদের পূর্ব্বে, ভারতসভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, এদেশে শ্রমিক (চা-বাগানের কুলি) আন্দোলনের প্রবর্ত্তক, একজন প্রধানতম নেতা, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের উল্লেখমাত্র না করা—যিনি কোনো বৈদেশিক প্রেরণায় নয়, স্বাধীন ভাবে, জাতির ভিতর হইতে ঐ আন্দোলনে অগ্রণী হইয়া গভর্ণমেণ্টকে পথ দেখাইয়াছিলেন—তাহা শুধু ভুল নহে, অপরাধ।

মহিলাদের বিশ্ববিস্তালয়ে পরীক্ষা দিবার অনুমতি ১৭ই মার্চ্চ ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে সিণ্ডিকেট্ সভা ও ২৭শে এপ্রিল সিনেট্ সভা প্রদান করিলেন, কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই মহিলাদের পরীক্ষার যোগ্যতা হইয়াছে কিনা তজ্জন্য একটি প্রারম্ভিক পরীক্ষায়, পোপ সাহেব ইংরেজির, গ্যারেট্ অঙ্কের, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিহাস ও ভূগোলের এবং পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার বাঙ্গালার পরীক্ষা গ্রহণ করেন। সরলা দাস ও কাদম্বিনী বসু এই পরীক্ষায় যে উত্তর প্রদান করেন, তাহাতে তাঁহারা সকলেই স্বীকার করেন যে ইঁহারা পরীক্ষায় উপস্থিত হইবার যোগ্য। কাজে কাজেই বিশ্ববিদ্যালয় অনুমতি প্রদান করেন।

যখন বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয় ও বেথুন স্কুলের মিলন স্থির হয়, তখন হিন্দু সমাজের রক্ষণশীলদল এবং কেশববাবু ও 'ইণ্ডিয়ান্ মিরর্'-এর দল তাহাতে আপত্তি তুলেন। স্কুল মিশিয়া গেলেও বিরোধী দলের আন্দোলনের বেগ কমে নাই। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বর 'নববিভাকর' পত্রিকায় স্কুল ও বেথুন কলেজের ছাত্রীদের শাড়ী ও জ্যাকেট (যাহা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী বোম্বাই প্রদেশ হইতে একটু রকমফের করিয়া সৌন্দর্য্য ও শালীনতাপূর্ণ পরিচ্ছদ হিসাবে প্রচলন করেন) পরা দেখিয়া এই তথাকথিত অহিন্দু আচারকে তীব্র আক্রমণ করেন। তদুত্তরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের পিতা ভুবনমোহন দাস কর্ত্তৃক সম্পাদিত "ব্রাহ্ম পাব্‌লিক্ ওপিনিয়ন্ ২০শে ডিসেম্বর তারিখে লেখেন যে "We presume to know something about the Bethune School girls and we unhesitatingly tell our contemporary they do not dress in European style. This Boshan (dress) is not at all Bibiana (like European ladies). No doubt they do not remain barefooted, do not wear the saries without covering on their bodies but are decently clad. Is this Bibiana ?"

যখন দেশের এই প্রতিকূল মনোভাব, তখন দ্বারকানাথ অকুতোভয়ে নারীশিক্ষা আন্দোলন চালাইতে থাকেন। কাদম্বিনী বেথুন স্কুলের ছাত্রী হইয়া গেলেও দ্বারকানাথ তাঁহাকে গৃহে শিক্ষা দিতে লাগিলেন ও তাঁহার শিক্ষাদানের ফলেই কাদম্বিনী এণ্ট্রান্স পরীক্ষা যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ্চ তারিখের কন্‌ভোকেশন্ সভায় ভাইস্-চ্যান্সেলার স্যার অ্যালেক্‌জাণ্ডার আরবুথ্‌নট্ সাহেব কর্ত্তৃক প্রশংসিত হন।

কাদম্বিনীকে একমাত্র ছাত্রী লইয়া বেথুন কলেজ আরম্ভ হয়। নারী-জাতির জন্য এই প্রচেষ্টা অবলাবান্ধব দ্বারকানাথের একমাত্র নারীমঙ্গল কার্য্য নহে। যৌবনে কুলকন্যাদের দুর্দ্দশা মোচনের জন্য তিনি ফরিদ-পুরের লোনসিংহ গ্রাম হইতে 'অবলাবান্ধব' নামে পত্রিকা বাহির করিয়া প্রবলভাবে নারীমঙ্গল আন্দোলন আরম্ভ করিয়া দেন। 'অবলা বান্ধবে'র প্রবন্ধ সকল কলিকাতার ছাত্র সমাজে তুমুল আন্দোলন তুলে। এই ছাত্রদলে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও লেফ্‌টেনাণ্ট কর্ণেল উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছিলেন। তাঁহারা পত্রযোগে দ্বারকানাথকে কলিকাতায় আসিয়া ছাত্রদলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। দ্বারকানাথ সেই আহ্বানে কলিকাতায় আসিয়া তাঁহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। শিবনাথ 'আত্মচরিতে' লিখিয়াছেন, "আমি আমাদের 'হিরো'কে দেখিবার জন্য বাহির হইলাম......কিছুদিন পরেই তিনি 'অবলাবান্ধব' নিয়া কলিকাতায় আসিলেন এবং পূর্ব্ববঙ্গের যুবকদিগের নেতা স্বরূপ স্ত্রী-স্বাধীনতার পতাকা উড্‌ডীন করিলেন।"

মহিলা সমাজের এই অকৃত্রিম সুহৃদের ও সংগ্রাম বীরের স্মরণোৎসব সকল মহিলা সমিতি ও নারীশিক্ষা আয়তনের পক্ষ হইতে হওয়া উচিত। উচ্চশিক্ষায় বেথুন স্কুলের অগ্রদূত স্বরূপ 'বঙ্গ মহিলা বিস্তালয়ের' ছাত্রীবৃন্দের মধ্যে শ্রীমতী সরলা রায় ও লেডী অবলা বসু এখনও জীবিত আছেন, তাঁহারা কি এই বিষয়ে অগ্রণী হইবেন না ?

৺দ্বারকানাথ চা বাগানে কুলির বেশে গমন করিয়া নিজের জীবনকে বার বার বিপন্ন করিয়াও কুলি জীবন সম্পর্কে বহুতথ্য পরিজ্ঞাত হইয়া "বেঙ্গলী" ও "সঞ্জীবনী" পত্রিকার মারফৎ আন্দোলন তুলেন এবং তাঁহার ফলেই বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনী ও ভারতীয় রাষ্ট্রীয় মহাসভা হইতে কুলি আন্দোলন আরম্ভ হয়। ভারতবর্ষীয় সভা, কংগ্রেস, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠারও তিনি অন্যতম নায়ক। সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার *Nation in the Making* গ্রন্থে এই বিস্মৃতপ্রায় কর্ম্মবীরের কথা আলোচিত হওয়া প্রয়োজনীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এত বড় একজন কর্ম্মবীরকে এত শীঘ্র বিস্মৃত হওয়ার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। সেজন্য শ্রমিক সভা ও রাষ্ট্রনৈতিক সভাগুলির এই শত বার্ষিকী সম্বন্ধে অবহিত হওয়া উচিত।

স্মরণীয়

শ্রীগুণেন্দ্রকুমার বসু এম্-এ

জ্যোৎস্না পরী নাচবে যখন কাশের বনে এসে
ভুল করিব—'আমায় বুঝি ফেল্‌লে ভালোবেসে',
ভুল করিব—'হয়তো তুমি অস্তাচলের পারে
আলোর রেখায় পথ দেখাবে গভীর অন্ধকারে।'

মনে হবে 'তুমিই আমার সকল জনম সাথী
শেষ না হতে আসবে পুন—উজল মিলন রাতি'।
ঝড় উঠিলে মানস-লতা চলবে আমার পাশে
যুগল মোদের চরণ-চিহ্ন রইবে আঁকা ঘাসে।

শরৎচন্দ্র

শ্রীচিত্রিতা দেবী

রসসৃষ্টিই সাহিত্যের প্রধান উদ্দেশ্য। সাহিত্য পরিবেশন করে সেই রস, সেই আনন্দ, যা দৈহিক ভোগতৃপ্তিকে অতিক্রম করে মানবমনকে কোন সুদূর সুন্দরলোকের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছিয়ে দেয়। প্রাচীনকালে, মানুষের হাতে সময় ছিল অনেক। কল্পনাবিলাসের আতিশয্যে সম্ভব অসম্ভবের সীমারেখা বিলুপ্ত হয়েছিল। আধুনিক সাহিত্য আধুনিক যুগের মতই ক্ষিপ্রগতিতে চলে। জীবনের প্রত্যেকটী ছোট গলিতেও এর গতি রুদ্ধ হয় না। তখনকার সাহিত্যে ছিল রাজ রাজড়ার কাহিনী। আজকের সাহিত্যে আছে ধনী, দরিদ্র, উচ্চ নীচ, ভদ্র অভদ্র নির্ব্বিশেষে মানবমনের ভাব-বৈচিত্র্যের কাহিনী। সেকালের সাহিত্য রসসৃষ্টিতে আনন্দের যে স্বর্গ-লোক গড়ে তুলত, বাস্তবজীবনের কঠিন সত্যের উপর সে সাহিত্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল না। আধুনিক সাহিত্য বলে সত্যের মধ্যেই সুন্দরের বীজ নিহিত। দৃষ্টিভঙ্গীর বিশেষত্বে, সত্য তার কাঠিন্যের দ্বারাই আমাদের মনকে আকর্ষণ করে সুন্দরের লীলাভূমিতে। রূপকথার ঘুমন্ত রাজকন্যার মায়াকাঠিস্পর্শে জাগরণের কাহিনী যেমন সুন্দর তেমনি অলীক। কিন্তু প্রেমের স্পর্শে উদাসীন রমণীর চিত্ত সহসা জাগরিত হওয়ার কাহিনী, সত্যও বটে, সুন্দরও বটে। আধুনিক উপন্যাস অন্তরের গোপনতম প্রদেশের রহস্য উদ্ঘাটিত করতে চায়। মানবমনের অস্ফুট সুকুমার ভাবগুলি, ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে, কেমন করে ধীরে ধীরে সহস্রদলে বিকশিত হয়ে ওঠে, তাই দেখানোই আধুনিক উপন্যাসের কাজ। শরৎচন্দ্রের সাহিত্যও এই আধুনিক realistio সাহিত্যের অন্তর্গত, যে সাহিত্য জীবনের চিত্রকে তার যথার্থ রূপটাই দিতে চায়, মিথ্যা কল্পনার মায়ায় তাকে আচ্ছন্ন করে না, সত্যের মহিমায় তার প্রকাশকে সুন্দর করে তুলতে চায়। শরৎচন্দ্র এই মতবাদকে সম্পূর্ণ স্বীকার করেছেন। আমাদের সমাজের, আমাদের জীবনযাত্রার; আমাদের মানসিক বৃত্তিগুলির যেন তিনি photograph তুলে গেছেন—তাই তার বই পড়তে পড়তে যে ছবি দেখতে পাই তাই আমাদের অত্যন্ত পরিচিত মনে হয়। সে যে আমাদেরই হৃদয়ের ছবি। কিন্তু তাঁকে যদি photographer বলি তবে এটা স্বীকার করতে হবে যে তিনি অতি নিপুণ শিল্পী। তিনি জানেন কেমন করে photographকেও artএ পরিণত করা যায়। তিনি জানেন কোথা দিয়ে কোন আলোটি ফেল্লে কার ওপরে কেমন প্রভাব বিস্তার করে। কোন জিনিষটি কোন দিক দিয়ে দেখলে সুন্দর হয়ে ওঠে। উপন্যাসে ও গল্পে শরৎসাহিত্য যে রসের সৃষ্টি করেছে তা অনুপম। হৃদয়কে অত্যন্ত ব্যথার সঙ্গে স্পর্শ করে—তার স্পর্শে আমাদের মন বেদনায় করুণ ও প্রেমে গভীর হয়ে ওঠে। তাঁর নায়কনায়িকাদের কল্পনায় রোমান্সের আকাশস্পর্শী সুদূরতা নেই। তারা সবাই.এই ধূলির ধরণীর মানুষ, যে ধরণীতে, স্নেহ, মায়া, ঈর্ষা, ভালবাসা, একনিষ্ঠ প্রেম ও অসংযত প্রণয়াকাঙ্ক্ষা পাশাপাশি বাস করে। তাঁর সাহিত্য সমাজের প্রচলিত নীতির বিরুদ্ধে অভিযান করেছে, অন্ধ ধর্মবিশ্বাসের মূঢ়তাকে অস্বীকার করতে চেয়েছে সত্য, কিন্তু তাঁর সংস্কারমুক্ত লেখনী কখনো অসংযমকে প্রশ্রয় দেয় নি। নীতি বিচারের এস্থান নয়—আর সে বিচার করতে গেলে দার্শনিক জটিলতার হাত থেকে নিস্তার নেই, শুধু এইটুকু বলতে পারি, শরৎচন্দ্র দেখিয়েছেন সংযমের মধ্যেই সুন্দরের প্রকাশ, অসংযত প্রবৃত্তির উদ্দাম নৃত্য অত্যন্ত কুৎসিত। মুখে যে নীতিই প্রচার করুক, তাঁর নায়িকাদের জীবনযাত্রার সমস্ত দিকই অত্যন্ত সংযত নিয়মে আবদ্ধ—তাই তাদের হৃদয়ের সূক্ষ্ম ভাবগুলি আমাদের সহানুভূতি এমন করে আকর্ষণ করে যে চোখে জল ভরে আসে শ্রীকান্তের দ্বিতীয় পর্বে; বাঙ্গালী ভদ্রলোক বর্মী মেয়েটিকে যে অসংযত লোভের তাড়নায় অমন দারুণ প্রবঞ্চনার অপমানে ফেলেছিল তা যেমনি বীভৎস তেমনি কুৎসিত কিন্তু অন্যদিকে সেই মেয়েটিরই সংযত কর্ম্মময় প্রতারিত জীবনের ইতিহাস কী করুণ কী সুন্দর! শুধু মাত্র ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্যে যে লালসা তার লক্‌লকে জিবের লালায় সত্যসুন্দরকে পঙ্কিল করে তুলতে চায় তার ভয়াবহ প্রচণ্ড পরিণাম তিনি দেখিয়েছেন—কিরণময়ী, জীবানন্দ, সুরেশ, অচলা প্রভৃতির চরিত্রে। যে প্রেম অসংখ্য ত্যাগের মধ্যে দিয়ে প্রিয়তমকে সার্থক ও আপনাকে মহান করে তোলে, শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্যে সেই মঙ্গলময় নিঃস্বার্থ অগ্নির স্তব করেছেন—যে অগ্নি রাজলক্ষ্মীর মুখ দিয়ে বলেছিল—"বড় প্রেম মানুষকে কেবল কাছেই টানে না, তাকে দূরেও সরিয়ে দেয়।" তিনি দেখিয়েছেন যে এই অগ্নি ব্যক্তিবিশেষের একান্ত আপনার ধন। কাজেই কার মধ্যে যে এর দেখা পাওয়া যাবে, সে কথা নিশ্চয় করে বলা শক্ত। যাদের কাছে আমরা সাধারণত এ জিনিষের প্রত্যাশা করি না তাদের মধ্যেও কখনো কখনো দেখতে পাই, এই আগুন অনির্ব্বাণ দীপশিখার মত জ্বলচে। এই আগুনের প্রভাবেই, সাবিত্রী প্রেমাস্পদের মঙ্গলের জন্যে নিজের আকাঙ্ক্ষাকে সম্পূর্ণ বলি দিয়ে নিজেকে কতদূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে। কিন্তু কেন? সমাজে পাঁচজনের একজন হয়ে কোনমতে জীবনটাকে চালিয়ে যেতে পারাটাই কী খুব কল্যাণকর? আর শুধুমাত্র এইজন্যেই, প্রিয়তমের মঙ্গলকামনায় সতত উত্থিত পবিত্র প্রেমের হোমাগ্নিকে সম্পূর্ণ নির্ব্বাপিত করা খুবই প্রয়োজন? এ প্রশ্ন শরৎচন্দ্রের নায়িকার সকলের মনেই বহুবার জেগেছে কিন্তু একমাত্র অভয়া ছাড়া আর কেউই এর মীমাংসা করতে পারে নি। কারণ শরৎবাবুর নায়িকারা তেজস্বিনী ও অসীম বুদ্ধিশালিনী হলেও, তাদের ধমনীতে সেকালের সংস্কার প্রবাহিত, তাদের অস্থিমজ্জায় সেকালের শিক্ষা প্রোথিত। তারা অন্তর দিয়ে যা অনুভব করে, প্রাণ দিয়ে যা আকাঙ্ক্ষা করে, সংস্কারের বশে করে তার উল্টোটা। নারীচিত্তের চিরন্তন চাওয়াকে সংস্কারের দ্বারা প্রতিহত করায় যে বিষ জীবনে সঞ্চিত হয় তাতেই ট্র্যাজিডির উৎপত্তি। মধ্য-যুগের ইউরোপীয় ট্র্যাজিডির মত শরৎচন্দ্রের কোন ট্র্যাজিডিই মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে ঘটেনি। ডেসডিমনা, কর্ডেলিয়া, রোমিও জুলিয়েটের মত তাঁর নায়ক নায়িকারা মরে গিয়ে করুণরস জমায় নি। দেবদাস মরেছে বটে, কিন্তু তার বহু আগেই তার জীবনে ট্র্যাজিডি সুরু হয়েছে। মৃত্যু তো দুঃখের গ্লানি নয়, সে দুঃখের অমৃত। গ্লানিতেই আত্মার যথার্থ পরাজয় ঘটে। এ জীবনে বেঁচে থাকার মধ্যেই কত কারণে চরম ব্যর্থতার ইতিহাস ঘনিয়ে ওঠে, শরৎচন্দ্র তাই দেখিয়েছেন তাঁর সাহিত্যে। অনুভূতির সঙ্গে সংস্কারের দ্বন্দ্বে তাঁর নায়ক নায়িকার জীবনে যে ট্র্যাজিডি ঘটেছে রাজলক্ষ্মীর চরিত্রেই তা সবচেয়ে পরিস্ফুট। অভয়া তাঁর একমাত্র নায়িকা, যে এই দ্বন্দ্বকে পরাভূত করে, প্রচলিত নীতি পদ্ধতিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে দুজনের চিত্তের অমলিন আকাঙ্ক্ষাকেই শিরোধার্য্য করেছে। তার অকুণ্ঠ বিশ্বাসের কাছে দ্বিধা দ্বন্দ্ব মিটে গেছে। তার নিজের কথাতেই একটু বলি—"একটা রাত্রির বিবাহ অনুষ্ঠান যা স্বামী স্ত্রী উভয়ের কাছেই স্বপ্নের মত মিথ্যা হয়ে গেছে, তাকেই জোর করে সারা জীবন সত্য বলে খাড়া করে রাখবার জন্যে এতবড় ভালবাসাটাকে ব্যর্থ করে দেব? যে বিধাতা ভালবাসা দিয়েছেন তিনিই কি তাতে খুসী হবেন?"

শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে বিশেষ করে এই কথাই বলতে

চান যে সহানুভূতি ও অন্তর্দৃষ্টি ছাড়া মানুষ যেখানেই বিচার করতে বসেছে, সেখানেই তার বিচারে বহু ভুল হয়েছে। বাইরে থেকে আপাত দৃষ্টিতে যাকে হেয় ও কুৎসিত বলে মনে হয়, কাছে গেলে তারও চিত্তের সৌন্দর্যে কত সময় আমাদের বিস্মিত হতে হয়। অন্নদাদিদিকেও তাঁর সমাজের লোকেরা কুলটা বলে জানে, কিন্তু অন্তরের সাধনায় তিনি সতীশিরোমণি। শরৎচন্দ্রই প্রথমে দেখিয়েছেন যে যাদের আমরা ঘৃণা করি, অবহেলায় সরিয়ে দিই দূরে, তাঁদের মধ্যেও বসে আছে মহিমাময়ী নারীপ্রকৃতি ধ্যানরতা।

শরৎসাহিত্যে নারীচরিত্রের প্রাধান্যের কথা সকলেই জানেন। নারীর নারীত্বই তিনি ফুটাতে চেয়েছেন তাঁর সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতায়, শুধুমাত্র পতি-পরায়ণতাই নয়, প্রচলিত সংস্কারের প্রতি শ্রদ্ধা, ধর্মের প্রতি মোহ, লোকনিন্দা ভয়, শতসহস্র দুর্বলতা, সর্বোপরি এ সমস্তকে পরাভূত করে প্রেমের তপস্যায় নারীত্বের যে বিকাশ, শরৎচন্দ্র দেখিয়েছেন তা অতুলনীয়। তাঁর পুরুষচরিত্রগুলি যেন এদের পাশে নিতান্ত ম্লান হয়ে গেছে। তারা যেন অসীম ব্যক্তিত্বসম্পন্না স্ত্রীচরিত্রগুলিকে ভাল করে ফুটিয়ে তোলবার জন্যেই সৃষ্ট হয়েছে। তবু পুরুষচরিত্র সৃষ্টিতেও শরৎবাবু তাঁর বৈশিষ্ট্য হারান নি। তাতেও যেখানে দুঃখ, যেখানে ব্যথা, যেখানে অবজ্ঞা অবহেলা, সেখানেই তার দৃষ্টি সমধিক প্রসারিত। নীলাম্বর, প্রিয় ডাক্তার, গোকুল প্রভৃতি কারুর স্থানই সাংসারিক বুদ্ধির বিচারে উঁচুতে নয়, এরা নিজের ভাল বোঝে না, রাগ আছে অথচ দ্বেষ নেই। সংসার এদের মূল্য দিতে চায় না। কিন্তু এদের নির্বুদ্ধিতার আবরণের অন্তরালে যে মহাপ্রাণ, নিঃশব্দ স্বার্থত্যাগ ও সৎসাহসের মহিমায় চিরভাস্বরতার খবরটি দিয়েছেন শরৎবাবু। এ ছাড়াও তাঁর আরও এক শ্রেণীর নায়ক আছে যারা শুধু নির্বুদ্ধি ও অকর্ম্মণ্যই নয়, যাদের চরিত্র কলঙ্কলিপ্ত, বাল্যপ্রণয়ের অভিশাপে যারা নিপীড়িত, আপন দুর্ব্বল চিত্তকে যারা সংযত করতে পারেনি। এদের মধ্যে প্রথমেই নাম করা যায় দেবদাসের। শরৎবাবু তাকে কোথাও এতটুকু প্রশংসা করেন নি, কিন্তু তার কথা বলতে গিয়েও তাঁর চিত্ত করুণায় আর্দ্র হয়ে এসেছে। তিনি যেন কবির এই বাণীর উদাহরণ দিয়ে গেছেন—

"আমার প্রভুর পায়ের কাছে
সুবোধ ছেলে ক'জন আছে ?
অবোধজনে কোল দিয়েছেন
তাই আমি তাঁর চেলারে
বসন্তে কি শুধুই কেবল
ফোটা ফুলের মেলারে ॥"

শিশু চরিত্রের অভিব্যক্তিতেও তাই। রামকে সবাই বলে দুষ্টু। কেউ তাকে ভালবাসে না—কিন্তু তার পবিত্র শৈশবের দুরন্ত গতিবেগ শরৎবাবুর স্নেহবৃত্তিকে স্পর্শ করেছে। কী অসীম প্রতিভা ও কী সরল শৈশবের মহিমায় প্রদীপ্ত ইন্দ্রনাথ। অথচ বাইরের লোক তার কী পরিচয় জানে ?

শরৎচন্দ্রের ভাষা আধুনিক কালের ভাষার উপযোগী। যদিও তাঁর আগেকার উপন্যাস চলতি ভাষায় লেখেন নি, তবুও তাঁর লিখনভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যে তাকে প্রাত্যহিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন কোন কৃত্রিম ভাষা বলে মনে হয় না। তাঁর ভাষা, তাঁর চরিত্রগুলির ব্যবহারের মতই অত্যন্ত সংযত অথচ স্বচ্ছন্দ সরল। কোথাও বাধে না, আবার কাথাও এতটুকু ন্যাকামীর নামগন্ধ নেই। একটা উদাহরণ দিই—রমেশ ঘরের দিকে চাহিয়া কহিল—আর এক মুহূর্ত্তও থেকো না, খিড়কি দিয়ে বেরিয়ে যাও, পুলিস খানাতল্লাসী করতে ছাড়বে না। রমা নীলবর্ণ মুখে দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিল—তোমার তো কোন ভয় নেই ? রমেশ কহিল—বলতে পারিনে, কতদূর কী দাঁড়িয়েছে জানিনে। একবার রমার ওষ্ঠাধর কাঁপিয়া উঠিল, তাহার মনে পড়িল, পুলিশের কাছে তাহার নিজের অভিযোগ করার কথা। তার পরেই সে হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল—আমি যাব না। রমেশ বিস্ময়ে মুহূর্ত্তকাল অবাক থাকিয়া বলিল—"ছি এখানে থাকতেই নেই রমা, বেরিয়ে যাও।"

এই ছোট বর্ণনায় প্রেমের সুগভীর বেদনা কী সংযতভাবেই প্রকাশ পেয়েছে।

শরৎচন্দ্র আমাদের সমাজের মর্মের মধ্যে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন তাই তাঁর রচনায় সাধারণ গৃহস্থ ঘরের ছবি এত জীবন্ত হয়ে ফুটেছে। 'অরক্ষণীয়া' 'নিষ্কৃতি' প্রভৃতিতে যে সমাজের যে গৃহের চিত্র ফুটে উঠেছে তা বাংলার একান্ত নিজস্ব জিনিষ। কিন্তু তাই বলে একথাও বলা চলে না যে তাঁর সাহিত্যে বিশ্বজনীনতা নেই। 'অরক্ষণীয়া'র জ্ঞানদার প্রতি অতুলের স্নেহ, রূপের মোহে অতুলের তাকে ভুলে যাওয়া, ও অপমান করা এবং তার ফলে জ্ঞানদার মনোবেদনা, সমগ্র বিশ্বের অনুভূতিতে ধরা পড়ে। তবে আমাদের গ্রাম তাকে যে অত্যাচার করেছিল অন্য দেশের সমাজ সে মনোভাবকে হয়ত ঠিক বুঝতে পারবে না। কিন্তু একথা কি ঠিক নয় যে সব দেশের সব সাহিত্যেরই মূল তাদের বিশেষ বিশেষ সমাজের অন্তরে। গোর্কির 'মাদার' কী রাশিয়ান সমাজকে বাদ দিয়ে গড়ে উঠতে পেরেছে ? সাহিত্যের মধ্যে যেটুকু সমগ্র মানবাত্মার আপনার ধন, আর যেটুকু সমাজের দান তা মানুষ সহজেই ভাগ করতে পারে।

এককথায় বলতে গেলে, এই বলা যায় যে শরৎবাবু অত্যন্ত দরদী লেখক ছিলেন। তিনি মানুষের দুঃখবেদনার মর্মমূল উদঘাটিত করে দেখিয়েছেন সহানুভূতির আলোকে। মানবহৃদয়ের নিভৃতনিলয়ে অনুভূতি ও সংস্কারের নিরন্তর দ্বন্দ্বকে তিনি সাহিত্যে রূপ দিতে চেয়েছেন। প্রচলিত সমাজ নীতিতে তিনি আস্থা রাখেন নি, আমাদের চিরাগত সংস্কার ও ধর্মবিশ্বাসের নিন্দা করেছেন। তাঁর রচনায় বিদ্রোহের সুর ধ্বনিত হয়েছে। তবু একথা ঠিক যে তাঁর সাহিত্য কিছু মীমাংসা করে নি, কেবল প্রশ্ন করেছে। তাঁর সাহিত্যের মূলে আছে এই জিজ্ঞাসা যে, যে সমাজ ক্ষমা করতে জানে না, যে ধর্ম স্নেহ করতে জানে না, সত্য বিচার করতে জানে না, মানবহৃদয়ের সূক্ষ্ম অনুভূতির প্রতি-যার এতটুকু সকরুণ দৃষ্টিপাত নেই, ব্যক্তিবিশেষের চরম সুখ দুঃখের প্রতি যে ধর্ম, যে সমাজ এত নির্মম উদাসীন, সেই ধর্ম, সেই সমাজের অনুবর্ত্তিতায় মানবের মঙ্গল কোথায় ?



ধারাগিরি

শ্রীমতী রুচিরা বসু

চারিধারে পাহাড়ঘেরা ঘাটশিলা, তার একধারে ব'হে যাচ্ছে সোনার নদী সুবর্ণরেখা, আর একধারে যে পাহাড়ের পাঁচীল, সেখান থেকে নেমে এসেছে চঞ্চলা ছোট গিরিধারা।

বিস্তৃত শালবন, গভীর অরণ্যানী, ভারি ভালো লাগলো আমার ঘাটশিলাকে। শ্যামল উপত্যকা, ফুলডুংরি পাহাড়, হরিণ ধুবরি, তামুকপালের নির্জ্জন গিরিনদীর কিনারে বনের মধ্যে মন্দিরটি মনে আমার আঁকা হয়ে আছে। দেখেছি মৌভাণ্ডার, মুসাবনী রোড, ফুলডুংরির কোল ঘেঁসে রাস্তা গালুড়ির, যেন দিগন্তে গিয়ে মিশেছে। মৌভাণ্ডারের বিরাট কারখানার অভ্যন্তরে আধুনিক শিল্পের ক্রমবিকাশ দেখান বটে, তারি কোলে সুবর্ণরেখা-তীরে সূর্য্যাস্তের যে সমারোহ দেখলাম সেত' ভোলবার নয়! পাহাড়ের পর পাহাড়ের মালা চ'লে গেছে, নীচে তার শ্যামল শালবন, চওড়া বালী চিকচিকিয়ে সোনার নদী পাথরে পাথরে প্রতিহত হ'য়ে ঝরঝর শব্দে নেচে চলেছে। বুকে তার বাঁধ বেঁধে মুসাবনী রোড চ'লে গেছে বনের মধ্য দিয়ে কত দূরে। সূর্য্যের রাঙা আলো অস্ত'মত, আধো আলো আধো ছায়ায় নদীর পথ দিয়ে আমরা কারখানা ফেলে মিঃ খান্নার বাংলোয় ফিরে এলাম। সেখানে চা খেয়ে গরুর গাড়ী ক'রে উঁচু নীচু পথ দিয়ে বাড়ীতে ফিরলাম রাত নটায়।

ছিলাম আমরা কাশিদার শেষপ্রান্তে নানের বাংলায়, চারিধারে যার হরতকী আর শালবন। দেখা যায় ধারাগিরি পর্ব্বতশ্রেণী, হাটের দিন সকাল থেকে সামনের রাস্তায় লোক চলাচল বেড়ে যেত। কুড়ি বাইশ মাইল দূরের পাহাড় থেকে নেমে আসত স্বচ্ছন্দগতিতে পাহাড়ি মেয়ের দল, মাথায় বেসাতি নিয়ে। পরিপাটি ক'রে টেনে খোঁপা বাঁধা, খাটো কাপড় পরা কোমরে আঁচল গোঁজা। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, লঘুহাস্যে বিজন শালবীথি মুখরিত ক'রে তারা দ্রুত চ'লে যেত হাটের দিকে। কি সহজ সুন্দর জীবন তাদের! নিকষ পাথরের মত দেহ পরিপূর্ণতায় অপূর্ব্ব সুষমায় ভরা। যেন অরণ্যের সবুজ বনলতা, শ্যামলতায় ঢলঢল করছে। কালোদেহে স্বাস্থ্যের যে রূপ আছে, এই পাহাড়ি মেয়েগুলিকে দেখলে বোঝা যায়। ওদের গ্রামে পৌষসংক্রান্তিতে তুষুপূজোর উৎসব দেখে এসেছি, মাটির ঘরগুলি নিকানো ঝকঝক করছে, রঙীণ দেওয়ালে চিত্রবিচিত্র আল্পনা আঁকা। ঘরের কোলে কালো মাটির দেহলী, আমার সাধ যেত ওই রঙীণ মাটির কুটীরে কিছুদিন বাস করতে ওদের মাঝে অমনি সহজ স্বচ্ছন্দ হ'য়ে।

ঘাটশিলার মধ্যে সর্বচেয়ে ভালো লেগেছে আমার ধারাগিরি পাহাড়। একদিন সকালে পাঁচখানা গরুর গাড়ী ক'রে আমরা বেরিয়ে পড়লাম ধারাগিরির উদ্দেশে। অনেকে বললে, সেখানে সম্প্রতি বাঘ বেরিয়েছিল, এখন যাওয়া মোটেই নিরাপদ নয়। সকলে দ'মে গেলেও আমি দমিনি, ধারাগিরি দেখতেই হবে আমি মনে মনে ঠিক ক'রে রেখেছিলাম। কেউ কেউ আবার খুব উৎসাহও দিলেন। আমরা সকাল সাড়ে আটটায় যাত্রা করলাম পাঁচখানা গোযানে।

চ্যাংজোড়া পেরিয়ে যে বিস্তৃত শালবন চ'লে গেছে পাহাড়ের কোল পর্য্যন্ত, সেখান দিয়ে যেতে যেতে দেখলাম বনে বসন্তের আমেজ লেগেছে। গাছে গাছে কচি রাঙা পাতা আর মঞ্জরী ধরেছে, বন্য আমগাছ মুকুলে ভারাক্রান্ত। হরিতকী বয়ড়া আর কেঁদফল দুলছে, পাহাড়ে কুলের বন রাঙা রাঙা পাকা কুলে ভরা। আমাদের অনেকে হেঁটে চললেন, ছেলেরা পাকাকুল কুড়িয়ে এনে আমাদের দিতে লাগলো।

মন্থরগতিতে বনের মধ্যে দিয়ে গাড়ী চলেছে, কত যে বন্যলতায় স্তবকে স্তবকে ফুলের মঞ্জরী, নাম না জানা কত রকমের গাছ, কত গাছের ডাল নুয়ে প'ড়ে আমাদের গাড়ী স্পর্শ করছে, দু'হাত বাড়িয়ে আমি তাদের চেপে ধরছি, আবার ছেড়ে দিচ্ছি! ভারি ভালো লাগছে এই বনের মধ্যে দিয়ে গরুর গাড়ী ক'রে যেতে! চারধারে চেয়ে গুণ গুণ ক'রে গাইছিলাম:
ওরে ভাই, ফাগুন লেগেছে বনে বনে!

দু'টি পাহাড়ি নদী পেলাম, আমি যে গাড়ীখানায় ছিলাম তার একটি গরু বোধহয় কিছুতেই যেতে রাজী ছিল না, উঁচু নীচু পথে সে ক্রমাগত শুয়ে পড়ছিল, শেষে নদীর মাঝখানে জলের মধ্যে শয্যা নিলে! গাড়ী কাত হ'য়ে আমাদের তখন অদ্ভুত অবস্থা! না নামতে পারছি, না বসতে পারছি, সকলে খুব ভয় পেয়ে গেল। এখনো অনেক পথ বাকি, আসল পাহাড়ে রাস্তা বুরুডিপাশ আসেনি, সেখানে গরু কি করবে, আমরাত' ভেবেই পেলাম না। অন্য গাড়ীর গাড়োয়ানরা নেমে এসে ঠেলেঠুলে কোনো রকমে গরুকে দাঁড় করিয়ে দিলে সে তখন আবার চলতে লাগলো।

বন পেরিয়ে পেলাম বুরুডি গ্রাম, পাথরের বাসন এখানে তৈরী হয়। এখন সব কাজ বন্ধ হ'য়ে আছে। আবার নদী, আবার বন, নদীর ধারে হাতীর চিহ্ন দেখলাম, গাড়োয়ান বললে বুনো হাতী নিশ্চয় পাহাড় থেকে নেমেছিল। পাহাড়ের কোলে জঙ্গলের ধারে ছোট ছোট ফসলের ক্ষেত, দেখলাম গাছের ওপর পাতার ঘর। পাহাড়িরা ক্ষেতের ফসল পাহারা দেয়, বাঘের ভয়ে নীচে নামে না। আবার বুনো হাতীর দল পাহাড় থেকে এসে ক্ষেত নষ্ট করে।

বুরুডির পর জঙ্গল পেরিয়ে এল বুরুডিপাশ, এখানে আমি গাড়ী থেকে নেমে হেঁটে পাহাড়ে উঠতে লাগলাম। লাল রাস্তা ঘুরে ঘুরে পাহাড়ের গায়ে উঠে গেছে, একদিকে আকাশ-চুম্বী পাহাড়, আর একদিকে অতলস্পর্শী খাদ! যদি কোনো রকমে একবার ক্ষেপে গিয়ে গরু লাফায়, তা হ'লে কোথায় যে পড়বে জানি না!

পাহাড়ের গায়ে একরকম গাছে পাতা নেই, বেগুনি রঙের

ফুলের মঞ্জরীতে ভরে আছে। কত যে বন্যফল ঝুলছে কত গাছে, দুগ্ধধবল শিববৃক্ষ, বনশেফালীর ঝাড়, চীহড় আর কেঁদগাছ। কত বিচিত্র লতা, বিচিত্র ফুল, অপূর্ব্ব বনভূমি ভ'রে আছে, বসন্তের ছোঁয়ায় মঞ্জরিত বনতল দেখে মনে হচ্ছিল কবিগুরুর ক'টি লাইন—

মাঘের বুকে, সকৌতুকে কে এলো, আজি তাহা
বলিতে পারো তুমি ?
শোননি কানে, হঠাৎ গানে কহিল আহা আহা,
সকল বনভূমি !

গাছে গাছে পাতার পাতায় জড়াজড়ি, সেখানে একটা নরম অন্ধকার নেমে এসেছে। স্নিগ্ধ ছায়াশূন্য পথে পেলাম বনের সোঁদাগন্ধ, চারিধারে গম্ভীর অরণ্য, ভয়াকুল জানোয়ারে ভর্ত্তি, কিন্তু আমাদের মন দোলালো এই গভীর নির্জ্জনতা, পাহাড়ের আর বনানীর এই শ্যামল রূপশ্রী, অভিভূত হ'য়ে গেলাম।

উপভোগ করতে করতে আমরা এগিয়ে চললাম, বুরুডিপাশ পার হ'য়ে নীচে উপত্যকায় বাসাডেরা গ্রাম। তার চারিধারে পাহাড় আর পাহাড়, জঙ্গল আর জঙ্গল। পাহাড়ের ওপর থেকে আমাদের একজন দেখালেন, নীচে খাদে যেখানে বন্য-তটিনী নেচে চলেছে, তারি ধারে একটা বড় পাথরখণ্ডে কোঁদা আছে অদ্ভুত হরফের মত কতকগুলো চিহ্ন! কোন যুগের জানি না, কি লেখা আছে জানিনা, বোধহয় আজ পর্য্যন্ত কেউ জানে না। সেখানে নামা অসম্ভব মনে হ'ল।

বুরুডিপাশ পার হ'য়ে বাসাডেরা ফেলে রেখে গভীর বনের মধ্যে পাহাড়ের নীচে গিয়ে আমাদের গাড়ীগুলো দাঁড়ালো। আমরা হৈ হৈ ক'রে নেমে আগে চললাম ধারাগিরি ঝর্ণা দেখতে। বনের মধ্যে বড় বড় নুড়ির ওপর দিয়ে ক্ষীণ-স্রোতা নদী ব'হে চলেছে ঝিরঝির ক'রে, দু'পাশে গভীর অরণ্য, কেমন একটা নির্জ্জন থমথমে ভাব। মনে যে ভয় হচ্ছিল না তা নয়, কিন্তু ভালো লাগছিল তারো চেয়ে বেশী। অরণ্যের ভয়াবহ রূপ যে কতখানি আকর্ষণ করতে পারে, এখানে এলে বোঝা যায়। ধারা যেখানে গিরি থেকে নামছে, তার নীচে একটা গভীর দহের সৃষ্টি হয়েছে, আমাদের সঙ্গের লোকজন সেখান থেকে রান্নার জন্যে বালতি ক'রে জল নিয়ে এল। কনকনে ঠাণ্ডা জল আমরা মুখে চোখে দিলাম। তারপর ফিরে এসে রান্নার জোগাড়ে লেগে গেলাম।

গাড়োয়ানরা বড় বড় পাথর দিয়ে তিনটে উনুন বানিয়ে ফেললে, বন থেকে কাঠ কেটে এনে দিলে। প্রথমে হ'ল চা, সঙ্গে কড়াইশুঁটির কচুরি আর রসগোল্লা ছিল, আগে তাই খাওয়া হ'ল। তারপর আমরা সকলে মিলে মহা উৎসাহে কেউ কুটনো কুটতে, কেউ পাতা কাটতে, কেউ চাল ধুতে ব'সে গেলাম। ছেলেরা গাছের তলায় শতরঞ্চি বিছিয়ে তাস খেলতে আরম্ভ ক'রে দিলে। এখান থেকে ৫টার মধ্যে বেরোতে হবে, বুরুডি-পাশ পার না হওয়া পর্য্যন্ত পথ মোটেই নিরাপদ নয় শুনেছিলাম। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা রান্নায় মন দিলাম।

দু'হাঁড়ি খিচুড়ি নেমে আর এক হাঁড়ি চড়েছে, আমাদের খাওয়ার পরে গাড়োয়ানরা খাবে। সে খিচুড়ি আর নামে না! আমরা ঠাকুরকে তাড়া দিতে লাগলাম। যদবা অর্দ্ধসিদ্ধ খিচুড়ি নামানো হ'ল, গাড়োয়ানদের খাওয়া আর শেষ হয় না! এধারে ৪|০টে বেজে গেছে, আমরা বললাম, তোমরা বরং খিচুড়ির হাঁড়ি বেঁধে নিয়ে চলো, বাড়ী গিয়ে খাবে। এখন ভালোয় ভালোয় আমাদের এই পাহাড়ের জঙ্গলটা পার ক'রে দাও। তারা নির্ব্বি-কারে খিচুড়ির ওপর আরো বেশী ক'রে মনোনিবেশ ক'রে বললে, আপনারা একটু বেড়িয়ে আসুন না আমরা ততক্ষণে খেয়ে নোব।

তাদের উৎসাহ দমানো যাবে না দেখে অগত্যা আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম। ওরা খাওয়া শেষ ক'রে ধারাগিরি থেকে বাসন-পত্র মেজে এনে দিলে; জিনিষপত্রে একখানা গাড়ী বোঝাই ক'রে ঠাকুরের জিম্মায় দিয়ে আমরা সকলে গাড়ীতে উঠে বসলাম। এবার আমি গাড়ী বদল ক'রে নিলাম, কিন্তু তাতে একটা গরু আর একটা মোষ, কাজেই আমার গাড়ী সকলের শেষে চললো। বিজন উপত্যকায় বাসাডেরা গ্রাম, উলঙ্গ শিশুর দল ঘুরে বেড়াচ্ছে। নদী পেরিয়ে বুরুডিপাশে গাড়ী উঠলো, ভালো ক'রে পিছন ফিরে ধারাগিরিকে একবার দেখে নিলাম। সেই পাহাড় আর অরণ্য তার নিবিড় লতায় পাতায় শত বাহু দিয়ে আমাদের যেন বেঁধে রাখতে চাইছিল, মন তাই কেমন করতে লাগলো।

আবার সেই পাহাড় আর ভয়াবহ পথ, একধারে জঙ্গলপূর্ণ খাদ আর একধারে পাহাড়। পাহাড় থেকে পাহাড়ে ঘুরে ঘুরে রাস্তা চ'লে গেছে নেমে। আমরা যে পথে চলেছি ছায়াঘন অরণ্যে নেমেছে সন্ধ্যার অন্ধকার, কিন্তু সামনের পাহাড়ের গায়ে রৌদ্র ঝলমল করছিল। দেখলাম পাহাড়ি মেয়ে দু'টি, ঝরণার জল ঘড়া ক'রে মাথায় নিয়ে ক্ষিপ্রগতিতে নেমে গেল বাসাডেরা গ্রামের দিকে।

আমাদের গাড়ী এবার বেশ জোরেই চলছে, ঘরমুখো গরু কিনা। আসতে পুরো চার ঘণ্টা লেগেছিল, কিন্তু নেমে এলাম তিন ঘণ্টায়। জঙ্গল পেরিয়ে বুরুডি গ্রাম এল, বুরুডি পেরিয়ে সেই বিস্তৃত শালবন। সূর্য্য তখন অস্ত গেছে, শালবনের মাথায় চাঁদ হেসে উঠেছে, সামনে চ্যাংজোড়ার কালো জল দেখা যাচ্ছে। এবার আমাদের বাড়ীর সীমানায় এসে গেছি।

দেখেছি শিলংএর পাইন বন, পাহাড় থেকে পাহাড়ে রাস্তা ঘুরে ঘুরে উঠে গেছে, চেরাপুঞ্জির ফগের মেলা আর বিচিত্র মসমাই ফলস্, শিলংশিলেট রোডে ঝোলানো পুল থেকে ডাউকি নদীর অপরূপ দৃশ্য। উঠেছি আবু মাউণ্টে, সেও এক সৌন্দর্য্য, চ'লে গেছি হরিদ্বারে, হৃষিকেশে, লছমনঝোলায় বদরিকার পথে, কন্যাকুমারীতে দেখেছি তিনধারে সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস, সেখানে নীল পাহাড় নেমে এসেছে জলের বুকে। দক্ষিণে বালাজীর সপ্ত পাহাড় পার হয়ে দেখেছি ত্রিপতিনাথের অপূর্ব্ব মূর্ত্তি। দেখেছি বদরপুর হাফলংএর গভীর অরণ্য, আগরতলার শ্যামল উপত্যকা। চন্দ্রনাথে উচ্ছল জল-প্রপাত সহস্র ধারা, কত দেশে ঘুরেছি, কত সহর, কত নদী, কত না পাহাড়, অরণ্য, ঝর্ণা, নির্জ্জন বনপ্রান্তর দেখেছি, তবু ঘাটশিলায় এসে ভালো লাগলো এই শাল হরিতকীর বন, চ্যাংজোড়া, বুরুডি, বুরুডিপাশ, বাসাডেরা পেরিয়ে গভীর অরণ্যবেষ্টিত ধারাগিরিকে। মনে মনে স্বীকার করলাম এ পাহাড়, এ অরণ্যানী, এ উপল-প্রতিহত ক্ষীণ বন্য নদীকে না দেখলে আমার ঘাটশিলা দেখা অসম্পূর্ণ থেকে যেত।

কাব্য ও আধুনিক কাব্য

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

"তোমার যোগ্য গান বিরচিব ব'লে
বসেছি বিজনে, নব নীপবনে
পুষ্পিত-তৃণদলে।
শরতের সোনা গগনে গগনে ঝলকে
ফুকারে পবন, কাশের লহরী ঝলকে,
শ্যাম সন্ধ্যার পল্লবঘন অলকে
চন্দ্রকলার চন্দনটীকা জ্বলে।
মুগ্ধ নয়ান পেতে আছি কান,
গান বিরচিব বলে।"

কবি সুধীন দত্তের লেখা এমন সুন্দর আরম্ভ যে কবিতার, শুধু আধুনিক ঢংএর খাতিরে তার পরিণতিটা কিরূপ শোচনীয় হ'ল দেখুন—

"অশক্য পিতা ; বলীর কণ্ঠলগ্ন
মাতা বসুমতী ব্যাভিচারে আজ মগ্ন,
ক্ষাত্র শোণিতে অবগাহি জামদগ্ন্য
তবু পাতিবে না স্বর্গরাজ্য ভবে।
স্বীয় শক্তিতে হবে যোগ দিতে
শুদ্ধির তাণ্ডবে।"

—ঠিক এই রকম 'ঢং' বজায় রাখতে গিয়ে মোদ্দা কথাটা কথার 'জারগণের' (Jargon) মধ্যে কোথায় ডুবে যায়—পাঠকের মনে জাগে অতৃপ্তির অস্বস্তি—যেমন,—

"রক্ত হীন বিস্মৃতির প্রতন পাতালে
অতিক্রান্ত বিলাসের, অস্থাবর প্রমোদের শব
অপূর্বের সাম্প্রতেরে করিবারে চায় পরাভব
জোগায়ে জীয়ান রস অপুষ্পক বীজে"
(অথবা)
"জানি জানি এই অলাতচক্রে চক্রমণ
সোৎপ্রাস পাশে বলিনাকো তাই কথা।
ক্রেসিডা! আমার প্রচণ্ড আকুলতা
জীজিবিষু প্রজাপতির বিভ্রমণ।"
(অথবা)
"বুদ্ধি আমার অপাপবিদ্ধ মন্নাবির
জড়কবন্ধ অন্ধ কর্ম্মে ফুৎকার মোর নর্ম্মাচার
প্রাক্তন পাশ্চাত্য মাগিনা। মন তুষার।
ক্রেসিডা তোমার থমকালো চোখে বরাভয়।
আশ্লেষে তব অনন্ত স্মৃতি ক্রতু কৃতমের শেষ।
তোমাকেই করি মত্ত মরণে জয়।"

এই রকম বাক্যের কসরৎ করা আত্মবিস্মৃত কবি-জীবনের পক্ষে অভিশাপ বলেই মনে করব। কবি রসের সৃষ্টি করবেন এটা অতি পুরাতন সত্য—যেটা কাব্য বিচারের প্রধান সহায়ক। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"সাহিত্যে রসের হোলিখেলায় কাদা-মাখামাখির পক্ষ সমর্থন উপলক্ষে অনেকে প্রশ্ন করেন, সত্যের মধ্যে এর স্থান নেই কি? এ প্রশ্নটাই অবৈধ। উৎসবের দিনে ভোজপুরীর দল যখন মাৎলামির ভূতে-পাওয়া মাদল-করতালের খচোখচো-খচকার যোগে একঘেয়ে পদের পুনঃপুনঃ আবর্ত্তিত গর্জ্জনে পীড়িত সুরলোককে আক্রমণ করতে থাকে তখন আর্ত্ত ব্যক্তিকে এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাই অনাবশ্যক যে এটা সত্য কিনা, যথার্থ প্রশ্ন হচ্ছে এটা সঙ্গীত কিনা। মত্ততার আত্মবিস্মৃতিতে এক রকম উল্লাস হয়, কণ্ঠের অক্লান্ত উত্তেজনায় খুব একটা জোরও আছে। মাধুর্য্যহীন সেই রূঢ়তাকেই যদি শক্তির লক্ষণ বলে মানতে হয় তবে পালোয়ানির মাতামাতিকে বাহাদুরী দিতে হবে সে-কথা স্বীকার করি। কিন্তু ততঃ কিম্! এ পৌরুষ চিৎপুর রাস্তার, অমরাপুরীর সাহিত্য-কলার নয়।"

কিন্তু নীচের কবিতাটি সাম্প্রতিক কবি কামাক্ষী চট্টোপাধ্যায়ের লেখা—সত্যই অতি সুন্দর।

স্মৃতির দুয়ারে শঙ্কিত করাঘাত
বন্যার মাঝে ছোট ছোট দ্বীপ যেন,
কথা কও, তুমি, কথা কও তুমি প্রিয়
আলোতে ছায়াতে দুরন্ত সন্ধ্যায়।
*   *   *
ছোট ছোট ডাক শঙ্কিত ভীরুতায়
চঞ্চল হ'ল হরিণ শিশুর মত
কথা কও তুমি কথা কও তুমি প্রিয়
সময়ের ঢেউ কর তুমি রঞ্জিত।
টুকরো হাসিতে, হালকা মুখরতায়
টুকরো গানের স্তব্ধ নীরবতায়।
*   *   *
বন্যার মাঝে ছোট ছোট দ্বীপগুলি
অঙ্কিত কর পুষ্পিত সজ্জায় ;
কম্পন আজি ধ্বনিয়া উঠুক গানে
নীল-অঞ্চল ফেনায়িত আহ্বানে
কম্পনে গানে ছিঁড়ে ফেলো যত শঙ্কিত ভীরুতায়.
বেজে ওঠো আজ হাল্‌কা মুখরতায়।

কিন্তু আপ্‌শোষের কথা এই যে অতি সত্বরই সাম্প্রতিকের ছোঁয়াচ এমনি ভাবেই এই কবিকে আচ্ছন্ন করে ফেলল যে তিনি দুর্ব্বোধ্য ও "আঙ্গিক" সর্ব্বস্ব কবিতা লেখায় বিশেষ পারদর্শী হয়ে উঠ্ছেন।

কাব্যে স্বাভাবিক অভিব্যক্তি

'আধুনিক বা সাম্প্রতিক' কাব্য সম্বন্ধে আমার বক্তব্য অনেক স্থলে "সাম্প্রতিক"বাদীদের মনঃপূত হবে না একথা আমি জানি। কিন্তু নিরপেক্ষ ভাবেই আমি এতাবৎকাল আধুনিক সাহিত্যের বিচার করে এসেছি এবং একথা স্বীকার করতে আমি কুণ্ঠিত নই যে আমি কাব্যে আধুনিকতার স্বাভাবিক অভিব্যক্তির বিরোধী নই। আধুনিক কাব্যের 'রুটমার্চের' সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চল্‌তে না পারলেও, উক্ত ও-পথে আমার চলাফেরা আছে, হয়ত বা কখনো চল্‌তি হাওয়ায় আমি উন্মনাও হইব, মনের রঙ হয়ত আমার কাব্যেও রঙ কলায় কিন্তু তাই বলে 'সাম্প্রতিক'এর ভেক্ ধারণ করতে পারব না বলে যে আমি নোতুনত্বের বিরোধী একথা ভাবলে আমার উপর অবিচার করা হবে। —কারণ কাব্যের তথাকথিত প্রগতি উদ্ভাবন করতে না পারলেও ধাতস্থ করবার ক্ষমতা আমার আছে—কিন্তু অনুযোগ করব না কেন? বরং

নূতন কিছুর প্রত্যাশাই করব। বাঁকাকে জোর করে সোজা করবার মূঢ়তা আমার নেই।

' Dreamer of dreams, born out of
My due time
Why should I strive to set the
Crooked straight ?"
(EAIS)

এই কারণেই যাঁরা মনে করেন যে বাঙলার কাব্য রবীন্দ্র বা রবীন্দ্র-উত্তর যুগেই শেষ হয়ে গেছে—তাঁদের সঙ্গে যেমন আমি এক মত নই তেমনি যাঁরা মনে করেন—সাম্প্রতিক কবিদের হাতে কাব্যলক্ষ্মীর লাঞ্ছনা বাড়ছে—তাঁদের সঙ্গেও আমি সম্পূর্ণ এক মত নই। কারণ এঁদের অনেকের মধ্যে প্রতিভার স্ফুরণও দেখতে পাই—সুলভ হাততালি বা নগদ বিদায়ের লোভ অবশ্য সবারই নাই। তবে অনেকের সম্পর্কে অনেকের মত আমারও অনুযোগ আছে বলেই আমি আলোচনার প্রয়োজন বোধ করেছি। সমাজে দুর্নীতি বা স্বৈরাচার এনেছে একথা ঠিক, কিন্তু তার জন্য একাধিক ঘটনা দায়ী—শুধু আধুনিক কাব্য বা সাহিত্য নয়। আজ যে এক শ্রেণীর কবি সাম্প্রতিক সাহিত্য রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন—নোতুন ঢংএ, নোতুন আলোকপাতে তাঁরা যে বাস্তবকে দেখাতে চান তাতে আপত্তি করার কিছু নেই—আমি জানি প্রাথমিক চেষ্টা হিসাবে তাতে স্খলন পতন ও ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকবেই; তৎসত্ত্বেও চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গীতে, আদর্শে ও রীতিতে, প্রকাশে ও পরিকল্পনায় আধুনিক কবিরা একটা বৃহৎ কিছু সৃষ্টি করতে না পারলেও উপভোগ্য রচনার দ্বারা আমাদের আকৃষ্ট করেছেন। তাঁদের এই চেষ্টার মধ্যে আমি ভাবী কালের উর্দ্ধগামী সম্ভাবনা দেখতে পাই বলেই অধোগতির কথা নিয়ে এতখানি আলোচনা করলাম। বাস্তবের দুঃখ ব্যথা, গ্লানি ও অধঃপতনকে এড়িয়ে গেলে চলবেনা, তবে কাব্য-রসের সৃষ্টি হওয়া চাই, যেমন রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'কবিতা হওয়া চাই।' যে জীবন আমরা যাপন করছি, যে প্রশ্ন ও সমস্যা আমাদের সম্মুখে রয়েছে—তাকে এড়িয়ে যেতে বলিনা— তবে বলি এই যে সাহিত্য সম্পর্কে বাস্তবতা বা রস কোনটাই বর্জ্জনীয় নয়। রাশিয়ার গাছ বাঙলা দেশের উর্ব্বর মাটিতেও বাঁচবে না একথা মনে রাখা দরকার। বাস্তব-সাহিত্য যে বস্তী সাহিত্য নয়—একথাও অবাস্তর নয়। বাঙালীর মন আজ আর তার গৃহ-সীমানায় আবদ্ধ থাকতে চায় না, বৃহত্তর জগতের সঙ্গে তার পরিচয়ের সূত্রপাত হয়েছে—সে সেটাকে ঘনিষ্ঠ করে তুলতে চেষ্টা করছে। মাল মশলা সংগ্রহের সময়ে অবাঞ্ছিত পদার্থও কিছু কিছু এসে পড়বে—পরিবর্ত্তনের যুগে, এটা স্বাভাবিক। জগত বদ্‌লাচ্ছে মানুষের মনও বদ্‌লাচ্ছে—কিন্তু কবির দৃষ্টিভঙ্গী বদ্‌লাবে না একথা আমি বলিনা। তবে প্রকৃতির পরিশোধ যেন আমরা আমন্ত্রণ করে ঘরে না আনি; অতিকৃতি বা over doing থেকে নিজেদেরকে যেন আমরা বাঁচিয়ে চলি।

কাব্যসৃষ্টির নব উদ্যম

আমার এ কথার সমর্থনে মহাজনের বাণী উদ্ধৃত করা যেতে পারে। আধুনিক বাঙলা কাব্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"বাংলা সাহিত্যে কাব্যসৃষ্টির মধ্যে আজ একটা নব উদ্যম জেগেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই চেষ্টা প্রচলিত বিধানের বাঁধন ভাঙতে প্রবৃত্ত ব'লেই ক্ষণে ক্ষণে, স্থানে স্থানে অতিকৃতি অতি ভঙ্গীতে গিয়ে পৌঁছয়। আন্তরিক বেগের থেকেই যে তার উদ্ভব, আত্মপ্রচারের অতিশয় স্পর্দ্ধা থেকে, কোথাও বা ব্যর্থ বিদেশী অনুকরণ থেকে। অপেক্ষা করতে হ'বে। অতি সজাগ ঔদ্ধত্য ক্রমে ক্রমে শান্ত হয়ে আস্‌বে। তখন রূপসৃষ্টির স্বাভাবিক পরিণতি দেখা দেবে। অনেক কিছু লুপ্ত হবে, আলোড়িত সমুদ্রের জলবিম্বের মত। আবার অনেক কিছুই পূর্ণ বিকশিত হয়ে উঠ্‌বে নবযুগের বাণীকে নূতন ভাষায় বহন ক'রে। ক্রমশই এই কথাটা স্ফুটতর হয়ে উঠ্‌তে থাক্‌বে যে, গায়ে-পড়া, ধাক্কা দেওয়া নূতনত্ব—আত্মশক্তিতে গভীর অবিশ্বাসেরই প্রমাণ। যার সৃষ্টির ক্ষমতা আছে, সে পুরাতনকে জোর করে এড়িয়ে যায় না, পুরাতনের ভূমিকাতেই সে নূতনকে উদ্ভাবিত করতে পারে।"

"সব শেষে একথা আমি স্বীকার করব যে আধুনিক বাংলা সাহিত্য বারম্বার আমাকে বিস্মিত করে, আনন্দিত করে এবং আশান্বিত ক'রে তোলে। জানি এই ভিড়ের মধ্যে প্রতিভার সঙ্গে এসে জুটবে অনেক অভাজন, আসবে তারা আধুনিকতার উদগ্র ছাপ মারা ভেক্ ধারণ ক'রে—তারা মেঘের মতো জমা হয়ে জ্যোতিষ্কদের আচ্ছন্ন কর্‌তে থাক্‌বে। এরাই লোককে ভুলিয়ে দেয় দলবাঁধা সাম্প্রদায়িকতা সাহিত্যের ধর্ম্ম নয়, সাহিত্য বিশেষ কারখানার প্রাচীন বা অর্ব্বাচীন মার্কামারা বস্তাবন্দী মালের ভাণ্ডার নয়, সাহিত্যে প্রতিভার আত্মপরিচয়ের স্বাতন্ত্র্য আত্মসমাহিত। সাহিত্যিক পত্রিকায় যখন একত্রে জমাট-করা বহু কবিতার পিণ্ড দেখ্‌তে পাই তখন ভয় হয় শ্রেণীগত ভাবে আধুনিক মেল-বন্ধনের সংজ্ঞা গ্রহণ ক'রে পাঠকদের মনে পাছে তারা বিভ্রম জন্মাতে থাকে এবং সমষ্টির কলঙ্ক লাগায় বিশিষ্টদের উপরে।"

আমার কথায় হয়ত কেও কেও আপনারা বিরক্তি বোধ করছেন—আমার বক্তব্যের মোদ্দা কথাটা রবীন্দ্রনাথের আর কয়েকটি কথায় পরিস্ফুট হবে আশা করি। রবীন্দ্রনাথ বল্‌ছেন—

"পাড়ার মদের দোকান আছে সেটাকে ছন্দে বা অছন্দে কাব্যরচনায় ভুক্ত করলেই কোনো কোনো মহলে সস্তা হাততালি পাওয়ার আশা আছে, সেই মহলের বাসীন্দারা বলেন, বহুকাল ইন্দ্রলোকের সুধাপান নিয়েই কবিরা মাতামাতি করেছেন, ছন্দেবন্ধে শুঁড়ির দোকানের আমেজমাত্র দেন নি—অথচ শুঁড়ির দোকানে হয়ত তাঁদের আনাগোনা যথেষ্ট ছিল। এ নিয়ে অপক্ষপাতে আমি বিচার করতে পারি—কেননা আমার পক্ষে শুঁড়ির দোকানে মদের আড্ডা যত দূরে, ইন্দ্রলোকের সুধাপান সভা তার চেয়ে কাছে নয়, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ পরিচয়ের হিসাবে। আমার বল্‌বার কথা এই যে, লেখনীর যাদুতে, কল্পনার পরশমণির স্পর্শে, মদের আড্ডাও বাস্তব হয়ে উঠ্‌তে পারে—সুধাপান সভাও। কিন্তু সেটা হওয়া চাই। অথচ দিন ক্ষণ এমন হয়েছে যে ভাঙা ছন্দে মদের দোকানে মাতালের আড্‌ডার অবতারণা করলেই আধুনিকের মার্কা মিলিয়ে যাচনদার বল্‌বে, হ্যাঁ, কবি বটে, বলবে, একেই ত বলে realism, আমি বল্‌ছি বলে না। Realism এর দোহাই দিয়ে এ রকম সস্তা কবিত্ব অত্যন্ত বেশী চলিত হয়েছে। আর্ট এত সস্তা নয়। ধোপার বাড়ীর ময়লা কাপড়ের ফর্দ্দ নিয়ে কবিতা লেখা নিশ্চয়ই সম্ভব, বাস্তবের ভাষায় এর মধ্যে বস্তাভরা আদিরস, করুণরস এবং বীভৎস রসের অবতারণা করা চলে। যে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দুইবেলা বকাবকি চুলোচুলি, তাদের কাপড় দুটো এক ঘাটে—একসঙ্গে আচাড় খেয়ে খেয়ে নির্ম্মল হয়ে উঠ্‌ছে। অবশেষে সওয়ার হয়ে চলেছে একই গাধার পিঠে; এ বিবরটা নব্য চতুষ্পদীতে দিব্য মানান-সই হতে পারে। কিন্তু বিষয় বাছাই নিয়ে তা Realism নয়, realism ফুটবে রচনার যাদুতে। সেটাতেও বাছাইএর কাজ যথেষ্ট থাকা চাই। না যদি থাকে তবে অমনতর অকিঞ্চিৎকর আবর্জ্জনা আর কিছুই হতে পারে না। রিয়ালিষ্টিক কবিতা কবিতা বটে কিন্তু রিয়ালিষ্টিক বলে নয়, কবিতা বলেই। বলতে বলতে আর একটা কাব্য-বিষয় মনে পড়ল—একটুকু তলানিওয়ালা লেবেল উঠে যাওয়া চুলের তেলের নিস্ছিপি একটা শিশি চলেছে সে তার হারাজগতের অন্বেষণে—সঙ্গে সাথী আছে একটা দাঁত-ভাঙা চিরুণি আর শেষ ক্ষয় ক্ষয়ে যাওয়া সাবানের পাত্‌লা টুক্‌রো, কাব্যটার নাম দেওয়া যেতে পারে আধুনিক রূপকথা। তার ভাঙা

ছন্দে এই দীর্ঘশ্বাস জেগে উঠ্‌বে যে কোথাও পাওয়া গেল না সেই খোয়ান জগৎ।"

"এই সুযোগে সেদিনকার দেউলে অতীতের এই তিনটি উদ্বৃত্ত সামগ্রী বিশ্ববিধি ও বিধাতাকে বেশ একটু বিদ্রূপ করে নিতে পারে, বল্‌তে পারে, আমরা রইল, আমরা ঝাঁটানি মালের ঝুড়ি থেকে আধুনিকতার রসদ জোগাই। আমাদের কথা ফুরোয় যেই, দেখা যায় নটে গাছটি মুড়িয়েছে; কালের গোয়ালঘরের দরজা খোলা, তার গোরুতে দুধ দেয় না, কিন্তু নটে গাছটি মুড়িয়ে খায়। তাই আজ মানুষের আশা ভরসা ভালোবাসার মুড়ানো নটে গাছটার এত দাম বেড়ে গেছে কবিত্বের হাটে। গোরুটার হাড়-বের-করা, শিং-ভাঙা, কাকের ঠোকর খাওয়া ক্ষত পৃষ্ঠ, গাড়োয়ানের মোচড় খেয়ে খেয়ে গ্রন্থিশিথিল ল্যাজওয়ালা হওয়া চাই। লেখকের অনবধানে এ যদি সুস্থ সুন্দর হয় তা'হলে মিড্‌-ভিক্টোরীয় যুগবর্তী অপবাদে লাঞ্ছিত হয়ে আধুনিক সাহিত্য ক্ষেত্রে মরতে যাবে সমালোচকের কশাইখানায়।"

কাব্যের চিরন্তন আবেদন

উপসংহারে তাই এই কথা আজ বল্‌তে চাই যে শুধু নূতনত্বের মোহে অন্ধের মত এগিয়ে গেলে চল্‌বে না, অন্তরের মণিকোঠায় অনির্ব্বাণ দীপশিখাকে অবহেলা করে, আতসবাজীর আলোকে পথের সন্ধান মিলবে না। নিত্যকাল ধরে কবির চিত্তলোকে মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা, সুখদুঃখ বেদনা ও আনন্দ ধ্বনিত হয়ে চল্‌ছে। সংসার সংঘাতের মূক বেদনার মূর্ত্ত প্রতীকই ত কবি। আত্মসমাহিত উপলব্ধির দ্বারা, সহজ চৈতন্যের উজ্জ্বল বর্ণ-বিন্যাসে, প্রতিভার যাদুস্পর্শে কবি সেই বেদনা ও আনন্দকে রূপে রূপে রসে রসে প্রকাশ করে তুল্‌ছেন। তাব সমুদ্রের তরঙ্গ দোলায় কবি-মানস অনন্তকাল ধরে পারাপার করবে—সোনার তরী তার ইন্দ্রধনুর পাল তুলে নিরুদ্দেশ যাত্রা করবে, চির-কৌতুকময়ী লীলাসঙ্গিনীর কঙ্কন-নিক্বণে আবেশ-বিহ্বল চোখে সোনার স্বপ্ন তার জেগে উঠ্‌বে চিরদিন—রূপ সৃষ্টির সাধনা সেখানে নয়নাভিরাম, রসের অফুরন্ত মাধুর্য্যে সৃষ্টির আনন্দ সেখানে পরিপূর্ণ। সবুজপত্রের সুপ্রসিদ্ধ লেখক "সপ্তপর্ণ" রচয়িতা ইংরাজি ও বাঙলা কাব্য-সাহিত্যে সুপণ্ডিত ও সুরসিক শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় কোনো একটি সাহিত্যসম্মেলনের অভি-ভাষণে কবিদের উদ্দেশে একদিন যে আহ্বান বাণী শুনিয়েছিলেন আমি তারই প্রতিধ্বনি করে আজ বলি—"আমরা জানি অভাবের দিনে, ক্ষুধা-তৃষ্ণার দিনে কবিকে লোক উপেক্ষা করেই—কাড়াকাড়ি হানা-হানিতে যে নেতৃত্ব করে, মানুষ তখন তাকেই বড় বলে সম্মান করে; কিন্তু যখন কাড়াকাড়ি শেষ হয়ে যায়, দ্বেষ হিংসা শান্ত হয়ে আসে তখন মনে পড়ে কবিকে—বলে—বলো তোমার তেপান্তরের কথা, মেঘান্ধকার আকাশের নীচে পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়া রাজপুত্রের কথা, হাতির দাঁতের পালঙ্কে নিদ্রাবতী রাজকন্যার কথা—কারণ, শত বাধা বিপত্তি বিড়ম্বনার মধ্যে, গভীর দুঃখ ও বেদনার মধ্যে আসল খোঁজ ত তারই জন্য। বলে—বলো তুমি প্রথম সন্ধ্যায় আকাশে শুকতারা জ্বালিয়ে কে প্রতীক্ষা করে'। কার জন্য প্রতীক্ষা করে? শ্রাবণের গভীর রাত্রে আকাশ থেকে বৃষ্টিধারা ঝরে কার জন্য? অন্ধকার রাত্রে তারার আখরে আকাশে ও কার চিঠি লেখা? বাসন্তী পূর্ণিমায় চাঁদ ও পৃথিবী কেন মুখোমুখী স্তব্ধ হয়ে চেয়ে থাকে—বল তুমি কবি, তুমিই ত এ রহস্যের সন্ধান জান।"

কৃষক, কৃষি-আয়-কর ও জমিদার

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌-এ

অক্ষমতার প্রধান উপসর্গই হইল আত্মপ্রবঞ্চনা। এই যুদ্ধ যতই ভারতবর্ষের আর্থিক অবস্থা ও ব্যবস্থার উপর নানারূপ বিপর্য্যয় আনিয়া শত সহস্র লোককে দুর্দ্দশা ও মৃত্যুর আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিতে লাগিল, ওপার হইতে ভারতসচিব মিঃ আমেরী ও এপার হইতে অর্থসচিব স্যার জেরেমী ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য্যের সুখ চিন্তায় বিভোর হইয়া বিশ্বমঞ্চে ততই প্রচার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। মুদ্রাস্ফীতি বা ইনফ্লেশনের বিভীষিকা যেদিন দেশবাসীকে দুর্দ্দশার চরম সীমা সম্বন্ধে বিপদ ও আতঙ্কগ্রস্ত করিয়া তুলিল এবং আজিকার দিনের মৃত্যুর এই উলঙ্গ মূর্ত্তির প্রথম অঙ্কের উদ্‌ঘাটন যখন সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছিল, মিঃ লিও-পোল্ড এস্‌ আমেরী বিশ্বকক্ষে ঘোষণা করিলেন, ভারতবর্ষ সেদিন নাকি আর্থিক "উন্নতিতে" ভরপুর। তারপর যখন দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া এবং মৃত্যু ও নরকঙ্কালের বীভৎস দৃশ্য অতি বড় নির্দ্দয় ও সভ্যতাভিমানী মানুষকেও বিচলিত করিয়া তুলিল, ভারতসচিব সমুদ্রপারের সুখাসনে বসিয়া সেদিন আবিষ্কার করিলেন যে আজিকার এই সুদিন ও আর্থিক স্বচ্ছলতার জন্য ভারতবাসী অতিভোজনে ব্যস্ত, আর তাইতেই ত এত দুর্ভিক্ষ। চমৎকার! এত বড় একটি সত্য আবিষ্কারের জন্য অন্তত চিকিৎসা-শাস্ত্র মিঃ আমেরীর নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে। আমেরী সাহেবের রসিকতা সীমাহীন, সুতরাং পরাধীন জাতির ভাগ্য লইয়া পরিহাস করিতে বা ছিনিমিনি খেলিতে তিনি দ্বিধাবোধ করেন না। এদিকে ভারতবর্ষের চির-উপেক্ষিত বিরাট কৃষক সম্প্রদায়ের সৌভাগ্যও যেন ভারতের অর্থসচিব অকস্মাৎ দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইলেন, তাই তিনিও তালে তাল ঠুকিলেন। গত ফেব্রুয়ারী মাসে বাজেট বক্তৃতায় তিনি ঘোষণা করিলেন,

"Employment improved and higher earning compensated the rise of agricultural prices, which in its turn *improved the buying power of the ryot*, and the mounting demand was met by a fuller utilisation of the margin of productive power still available."

অর্থাৎ, যুদ্ধে রোজগারে অনেক সুবিধা হওয়ায় কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি লোকের কষ্ট আনয়ন করে নাই, উপরন্তু কৃষককুলের ক্রয়-ক্ষমতা এইভাবে বাড়িয়া যাওয়ায় তাহাদের অবস্থার উন্নতিই হইয়াছে এবং সর্ব্ববিধ দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায়, জিনিষের উৎপাদনও অনেক বাড়িয়া গিয়াছে।

এককথায়, স্যার জেরেমী রেস্‌ম্যান্‌ বলিতে চান যে যুদ্ধে ভারতবর্ষের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি বিধান হইয়াছে। হায়রে বরাত! এখানেও সেই একই কথার প্রতিধ্বনি।

বাংলার এই মনুষ্যকৃত দুর্ভিক্ষ অর্থসচিবের এই সংস্কার ও ধারণার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যায় যে দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত জনসংখ্যার অধিকাংশই আসিয়াছে কৃষক সম্প্রদায় হইতে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগ যে একটি প্রাথমিক অনুসন্ধান করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায়, এই দুর্গতদের মধ্যে শতকরা ৭২·৭ জনই ভূমিহীন ও ভূমিসম্পন্ন কৃষক শ্রেণীর। যুদ্ধের বাজারে কৃষকদের উন্নতি সম্বন্ধে যে গালভরা কথা সরকারী তরফ হইতে প্রায়ই শুনান হয়, তাহা যে শুধু অতিশয়োক্তি তাহাই নহে, নিছক কল্পনা মাত্র। ক্ষুধার যন্ত্রণায় মৃত্যু বরণের মাঝে উন্নতির স্বপ্ন দেখা বেদান্ত দর্শনে থাকিতে পারে, কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে এ এক অদৃষ্টের পরিহাস ছাড়া আর কি?

অথচ ইহারই উপর আস্থা স্থাপন করিয়া একটি নিছক প্রতারণায় মুদ্রাস্ফীতির প্রতিরোধকল্পে কৃষকের নিকট ডিফেন্স বণ্ড বিক্রী করা এবং নানাবিধ উপায়ে ক্রয়ের জন্য বাধ্য করাও হইতেছে। এমনি একটি দুর্দ্দিনে এবং এমনি একটি ভুলের বশবর্ত্তী হইয়া বাংলা সরকার এবারকার বাজেটে কৃষি আয়-কর বিল পেশ করিলেন। বিলটি এখন সিলেক্ট কমিটিতে গিয়াছে।

এখন এই কৃষি আয়-কর জিনিষটি কি? লোকের আয় হইতে যেমন গবর্ণমেণ্টকে আয়-কর (Income-Tax) দিতে হয়, তেমনি কৃষির আয় হইতে জমিদারকে খাজনা দিতে হয়। এখন এই খাজনাকে যদি ইন্‌কাম্‌-ট্যাক্স রূপে গণ্য করা যায়, তবে জমিদারের আয়ের উপর আর ইন্‌কাম্‌-ট্যাক্স বসান চলে না, কারণ তাহা হইলে তাহাদের উপর দুইবার ট্যাক্সের বোঝা চাপান হয়। আর যদি গবর্ণমেণ্টকে দেয়িত জমিদারের খাজনাকে ট্যাক্স বা কর বলিয়া না ধরা হয় তবে ন্যায়সঙ্গত তাহাদের আয়ের উপর আবার পৃথক ইন্‌কাম্‌-ট্যাক্স বসান চলে। খাজনা ট্যাক্স বলিয়া গণ্য হইবে কিনা, ভারতীয় অর্থশাস্ত্রে এ একটি পুরাতন তর্কের বিষয় এবং সে তর্ক আমাদের আজিকার বিষয় সূচীর বাহিরে। ১৯২৫ সনের টাক্সেসন্ ইন্‌কোয়ারী কমিটির (Taxation Enquiry committee) মতে, এমন কি যে সব প্রদেশে জমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, সেখানেও এ কর বসাইলে অন্যায় হইবে না। আমরা এ করের বিপক্ষে নহি। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, এ করের কি এই উপযুক্ত সময়? যখন সমগ্র দেশের কৃষি অবস্থা ও ব্যবস্থা উলট্‌ পালট্‌ করিয়া দিয়া এক প্রচণ্ড ঝড় বহিয়া চলিতেছে, নিস্তেজ ও বুভুক্ষু কৃষককুল যখন হা অন্ন হা অন্ন করিয়া একের পর এক মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িতেছে, দেশের এই চরম দুঃসময়ে বিধ্বস্ত কৃষকের উপর একটি কর ধার্য্য করা কি যুক্তিসঙ্গত? প্রশ্ন উঠিতে পারে যে এ কর ত আর কৃষকদের উপর ধার্য্য করা হইতেছে না, ইহা হইতেছে জমিদারদের আয়ের উপর। কিন্তু এ যুক্তি সম্পূর্ণ ভুল। কৃষকদের অবনতি ও উন্নতিতে জমিদারদের অবনতি ও উন্নতি এবং যেহেতু কৃষক সম্প্রদায়ের তুলনায় জমিদার বেশী শক্তিশালী, অতএব জমিদার শ্রেণীর কষ্ট সাধ্য হইলেই তাহারা এই করের বোঝা অধীনস্থ কৃষকমণ্ডলীর উপর চাপাইয়া দিবে। ফলে বিপদগ্রস্ত কৃষককুল আরোও বিপদগ্রস্ত হইবে। মোগল যুগের দুর্ভিক্ষের ইতিহাসেও আমরা খাজনা মাপের কথা শুনিতে পাই; কিন্তু বর্ত্তমানের এই অভূতপূর্ব্ব কৃষি সঙ্কটের মাঝে কৃষি করের ব্যবস্থা বোধ হয় ইতিহাসে এই প্রথম।

১৯৩৫ সালের প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসনে প্রদেশের আর্থিক উন্নতির নানাবিধ উপায়ের মধ্যে কৃষি আয়-করেরও উল্লেখ রহিয়াছে, কিন্তু গত ছয় সাত বৎসরের প্রাদেশিক উন্নতিতে স্বৈরশাসনের শুধু অক্ষমতার পরিচয়ই পাওয়া যায়। বাংলার জমিদারের এবং জমিদারী প্রথার বিরুদ্ধে প্রধান নালিশ যে সময়ের সাথে সাথে প্রজাদের খাজনা বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু জমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নিমিত্ত জমিদারগণ গবর্ণমেণ্টকে সেই মান্ধাতার আমল হইতে (লর্ড কর্ণওয়ালিসের যুগ হইতে) একই খাজনা দিয়া আসিয়াছে। সুতরাং একদিকে জমিদাররা যেমন লাভবান হইতেছে, অন্যদিকে গবর্ণমেণ্টকে প্রভূত আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিতে হইতেছে। এ অনুযোগ ভারতের যেখানে যেখানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কায়েম সে সব যায়গাই প্রযোজ্য। মাদ্রাজের এষ্টেট্ ল্যাণ্ডস্ ইন্‌কোয়ারী কমিটি (Estate Lands Enquiry Committee) হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে প্রজাদের নিকট হইতে জমিদারগণ যদিও এক সময় প্রায় ২॥০ কোটি টাকা আদায় করে, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের ভাগে সদর খাজনা বাবদ মোটে পড়ে ৫০ লক্ষ টাকা। এই সব নানা কারণে সেদিন ফ্লাউড্ কমিশন (Floud commission) বাংলা হইতে জমিদারী প্রথা সমূলে উচ্ছেদ করিয়া সমস্ত জমিকেই খাসমহলে পরিবর্ত্তিত করিবার জন্য রিপোর্ট দাখিল করেন। এই ল্যাণ্ড রেভিনিউ কমিশন (Land Revenue commission) তাহাদের রিপোর্টে কৃষি আয়-কর স্থাপনেরও উল্লেখ করিয়াছেন।

নিজ নিজ প্রদেশের আয় বাড়াইবার জন্য ইতিমধ্যেই বিহার ১৯৩৮ সনে ও আসাম ১৯৩৯ সনে কৃষি আয়-কর বসাইয়া ফেলিয়াছে। বিহারে কিন্তু এই করের বোঝা আসাম হইতে অনেক কম, যেহেতু সেখানে ৫,০০০৲ টাকা আয়ের কমে কাহাকেও ট্যাক্স দিতে হয় না, কিন্তু আসামে আয় মাত্র ১৫০০৲ টাকা হইলেই এই কর তাহার উপর ধার্য্য করা হয়। বাংলায় এই করের জন্য যে বিল পেশ করা হইয়াছে, তাহাতে নিম্নতম আয় আসামের মতই ১৫০০৲ টাকায় রাখা হইয়াছে। নিম্নে এই দুই প্রদেশের তুলনামূলক করের হার দেওয়া হইল :—

	বাংলা টা আ পা	আসাম টা আ পা
	(প্রতি টাকায়	
১। প্রথম ১৫০০৲ টাকা আয়েব উপর	০ ০ ০	০ ০ ০
২। ১৫০০৲ টাকা আয় হইতে ৫০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত	০ ০ ৯	০ ০ ৯
৩। ৫০০০ „ „ „ ১০,০০০৲ „ „	০ ১ ০	০ ১ ৩
৪। ১০,০০০ „ „ „ ১৫,০০০ „ „	০ ১ ৬	০ ২ ০
৫। ১৫,০০০ „ „ „ ২০,০০০ „ „	০ ২ ০	০ ২ ৬
৬। পরবর্ত্তী যে কোন আয়ের উপর	০ ২ ৬	০ ২ ৬

উপরের হার হইতে বুঝা যায় যে যদিও নিম্নতম করের আয় এই দুই প্রদেশেই সমান, তথাপি আসামে করের বোঝা বাংলা হইতে কিছু বেশী; কারণ আসামে আয় ১৫,০০০ টাকা হইলেই প্রতি টাকায় উচ্চতম হার দুই আনা হিসাবে কর দিতে হয়, কিন্তু বাংলায় সেই আয় ২০,০০০ টাকা হওয়া চাই। কিন্তু ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে যে কৃষি আয়-কর বসান হইয়াছে, সেই তুলনায় বাংলা, আসাম ও বিহার এই তিন প্রদেশেই করের হার অনেক বেশী। ত্রিবাঙ্কুরে ৫০০০ টাকা নিম্ন আয়ে কোন করই দিতে হয় না এবং এক লক্ষ টাকা আয়ের উপর মাত্র ২০১ পাই হিসাবে কর দিতে হয়।

বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, বাংলা তাহার প্রতিবেশী বিহার হইতেও করের হার বেশী রাখিয়াছে, বিশেষ করিয়া এই দুর্দ্দিনে যখন মুদ্রাস্ফীতির দৌলতে কৃষক শ্রেণীর ও অন্যান্য সকলেরই জীবন যাত্রার ব্যয় অত্যধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফলে হইবে এই যে, নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যাহাদের জমির আয়ের উপর নির্ভর করিতে হয়, তাহাদের অবস্থা আরোও সঙ্গীণ হইয়া উঠিবে এবং সমাজে যে আর্থিক ভাঙ্গন দেখা দিয়াছে, তাহা জোড়া লাগা দূরের কথা, নূতন উপসর্গ আসিয়া ফাটলটিকে আরো দীর্ঘ করিয়া দিবে। কয়েকটি প্রদেশ মুদ্রাস্ফীতির প্রতিকারে নিজেদের কৃতিত্ব দেখাইবার জন্য ইতিমধ্যে কতকগুলি নূতন করের প্রবর্ত্তন করিয়া মুদ্রা সঙ্কোচন নীতি (Deflationary Policy) গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু তাহারা ভুলিয়া যাইতেছে যে সিক্কা বা কারেন্সী কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যাপার এবং একটি সর্ব্বভারতীয় সমস্যা। সুতরাং অতিরিক্ত ট্যাক্স দ্বারা যদি কোন প্রদেশ দুই এক কোটি টাকা বাজার হইতে সরাইয়াও লয় তাহা হইলেও বাজারে যে পরিমাণ নোট আসিয়াছে তাহার তুলনায় সেটি সমুদ্রে একটি বিন্দুবৎ।* বাংলা সরকারও যদি সেই সঙ্কোচন নীতির কথা ভাবিয়া

* যাঁহারা মুদ্রাস্ফীতি ও তার প্রতিকার সম্বন্ধে বিশদভাবে জানিতে চাহেন, তাহাদের গত ১১ই জুলাইয়ের রবিবাসরীয় আনন্দবাজারে লেখকের "মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যস্ফীতি" নামক প্রবন্ধ অথবা ইংরাজীতে জুলাই মাসের *Calcutta Review*তে "**A study in inflation And its Remedy**" দ্রষ্টব্য।

থাকেন তবে বড় ভুল করিয়াছেন। বিহার ও আসামের দৃষ্টান্তে আমরা দেখিতে পাই যে এই কর হইতে সরকারের আয় খুব সামান্যই হইয়াছে। নীচে তাহাদের গত চারি বৎসরের আয়ের হিসাব দেওয়া হইল :—

বৎসর	বিহার	আসাম
১৯৩৯—৪০	৫·৮০ লক্ষ টাকা	৮৩·০০ হাজার টাকা
১৯৪০—৪১	১৪·৯০ " "	৩৯·০০ লক্ষ টাকা
১৯৪১—৪২	১৭·০৬ " "	২৫·১২ " "
১৯৪২—৪৩	১৭·৬৪ " "	২৭·০০ " "
১৯৪৩ ৪৪ (বাজেট)	১৭·৬৫ " "	২৭·০০ " "

সরকারী তরফ্ হইতে বাংলার নূতন কর হইতে মোটামুটি আয় সম্বন্ধে আমাদের এখনও কিছু আভাস দেওয়া হয় নাই; তবে উপরের দৃষ্টান্তে মনে হয় সরকারী তহবিলে ৬০ লক্ষ টাকার বেশী আসিবে না। যেখানে ভারতীয় গবর্ণমেন্টের ছাপাখানা হইতে ৬০০ কোটি টাকার উপর অতিরিক্ত নোট বাজারে আসিয়াছে, তাহার স্থলে ৬০ লক্ষ টাকার সঙ্কোচনে কি প্রতিকার হইবে?

বাংলা সরকার অবশ্য তাদের বাজেট ঘাট্‌তির জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এ বৎসরের বাজেট ঘাট্‌তির পরিমাণ বেশ একটি মোটা পৌঁছিয়াছে। শুধু ৭½ কোটি টাকাই যে কম পড়িবে তাহা নহে, এ ঘাট্‌তির পরিমাণ ১৪ কোটি টাকা অবধি উঠিতে পারে। কিন্তু ইহার জন্য তাহাদের ব্যস্ত হইবার বা ব্যয়সঙ্কোচ করিবার কি কারণ আছে? এটি বাংলার একটি অভূতপূর্ব্ব দুর্বৎসর, দুর্ভিক্ষ ও জাতির জীবন মরণ সমস্যা আজ দেশের সম্মুখে। সুতরাং গবর্ণমেন্টের এখন কার্পণ্য করিবার সময় নাই। জাতিকে বাঁচাইবার জন্য, সমাজকে বাঁধিবার জন্য ও কৃষকদের পুনরায় স্থাপিত করিবার জন্য সরকারকে আজ মুক্ত হস্তে ব্যয় করিতে হইবে। আর এই টাকা তাহারা কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে ঋণ লইয়া, নিজেদের প্রদেশে ঋণ গ্রহণ করিয়া এবং নিজেরাই ট্রেজারী বিল বাহির করিয়া যোগাড় করিতে পারেন। তাহা না করিয়া যদি বাংলা সরকার এই নূতন কৃষি আয়ের কথা ভাবিয়া থাকেন, তবে বাংলার এই দুর্দ্দিনের সমস্যাকে আরো জটিল ও ঘোরতর করা হইবে।

কৃষি আয়-করের প্রশ্ন তখনি উঠিতে পারে, যখন কৃষকের প্রকৃতই আর্থিক উন্নতি হয় এবং আমরা মোটামুটি দেখিয়াছি যে এই যুদ্ধে কৃষকজাতির উন্নতির ব্যাপারটি কতখানি ভূয়া ও কাল্পনিক। আজ বাংলার সম্মুখে সমস্যার পর সমস্যা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এই মনুষ্যকৃত দুর্ভিক্ষগ্রাসে লক্ষ লক্ষ লোকের জীবনাহুতির পরই যে সকল সমস্যার সমাধান হইয়া গেল, তাহা নহে। খাদ্য সমস্যা চিকিৎসা সমস্যা দ্বারা অনুসৃত হইতেছে। রোগ ও মহামারী ইতিমধ্যেই নির্জ্জীব ও অনাহারে নিস্তেজ দেশবাসীর উপর তাহাদের তাণ্ডব নৃত্য সুরু করিয়া দিয়াছে এবং বাংলার দ্বারে আজ সেই ইতিহাস বিখ্যাত "ব্ল্যাক্ ডেথের" (Black-Death) ভয়ঙ্কর দৃশ্য প্রকটমান। ইহা শুধু দরিদ্রের প্রাণ লইয়াই ছাড়িবে না, সম্পন্ন ব্যক্তিরও ইহা হইতে নিস্তার নাই। দুর্ভিক্ষের প্রাবল্য কিছু উপশম হইলেও উহার পুনরাবৃত্তি হইবার আশঙ্কা এখনও পদে পদে বর্ত্তমান। উপযুক্ত শাসনপ্রণালী, পর্য্যাপ্ত যানবাহন এবং দক্ষ রাজকর্ম্মচারীর অভাবে সরকারের বর্ত্তমান শস্যক্রয় নীতির সফলতা সম্বন্ধে আমরা আজও সন্দিহান। অতীতের যে সমস্ত ভুল ত্রুটির জন্য আজ পতঙ্গের মত এতগুলি অসহায় শিশু, নর ও নারী ক্ষুধার জ্বালায় ছটফট্ করিয়া শেষ নিশ্বাস ফেলিল, সেই সব ভুল ত্রুটী সংশোধন করা ত দূরে থাকুক, গবর্ণমেন্ট এখনও নিজেদের দোষ প্রক্ষালনেই ব্যস্ত। মিঃ চার্চ্চিল ভাবেন, ভারতবর্ষের জন্য ত ভারতসচিব মিঃ আমেরীই রহিয়াছেন; মিঃ লিওপোল্ড এস্ আমেরী বলেন যে ভারতবাসী নিজেরাই এই দুর্ভিক্ষের জন্য দায়ী, কারণ তাহারাই ত জনসংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া খাদ্যের অল্পতা আনিয়াছে; কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট দেখেন যে কৃষি এবং খাদ্য এ দুইটা ত প্রাদেশিক সরকারের আয়ত্বাধীন এবং প্রাদেশিক সরকার দেখেন যে স্বায়ত্বশাসন একটি মহান প্রহসন। সুতরাং সমস্ত চেষ্টাই বিফল হইয়া যায়, আর তাই লোকও মরিতে থাকে প্রচুর। যা হইবার তা ত হইয়াই গেল। এখন দলাদলি, হিংসা, দ্বেষ এই সব ভুলিয়া, অন্তত মানবতার খাতিরেও কি এই দেশব্যাপী সঙ্কটে একত্রিত হইয়া মানুষগুলির প্রাণ বাঁচান যায় না? ক্ষুধা ত সকলেরই সমান, তা সে গরীবই হউক অথবা প্রাসাদতুল্য দপ্তরখানার উচ্চ রাজ-কর্ম্মচারীই হউক। এই সময় মুমূর্ষু কৃষকদের ঘাড়ে আবার এই করের বোঝা না চাপাইয়া কি করিয়া তাহাদের এক মুঠা অন্ন দিয়া বাঁচাইয়া রাখা যায় সেই চিন্তাই অনেক মহৎ ও প্রয়োজনীয় নহে কি? সমগ্র জাতিটা ত' একটি ভিক্ষুকে পরিণত হইয়াছে। দেশবাসী ভিক্ষা চাহিয়া ফেরে সরকারের নিকট, আর বাংলা সরকার ভিক্ষা ও করুণা যাচিতেছে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের নিকট। এই ত অবস্থা হইয়াছে শস্য শ্যামলা বঙ্গভূমির। তারপর এইখানেই কি কর্ত্তব্য শেষ হইয়া গেল? দুর্ভিক্ষের প্রচণ্ড আলোড়নে দেশের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার ওলট পালট হইয়া গিয়াছে। কৃষকরা ঘর ছাড়িয়াছে, কৃষিমজুর মরিয়াছে আর নিম্ন মধ্যবিত্তরা উৎসন্নে যাইতেছে। ইহার ফল এইখানেই শেষ নয়, এর প্রায়শ্চিত্ত জাতিকে এক যুগ ধরিয়া করিতে হইবে। গবর্ণমেন্টর সম্মুখে আজ বিরাট কর্ত্তব্য। সমাজকে আবার বাধিতে হইবে, কৃষকদের পুনস্থাপিত করিতে হইবে এবং কৃষি মজুরের অভাব অচিরে দূর করিতে হইবে। এই দুর্ভিক্ষ মুদ্রাস্ফীতিপ্রসূত। গবর্ণমেণ্ট কিছু কমাইলেও এখনও অকাতরে নোট ছাপিয়া চলিয়াছেন। ভবিষ্যতে যে কোনদিন ভারতে দুর্ভিক্ষ আরো বিরাট আকার ধারণ করিতে পারে। সেইজন্য প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টকে সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে এবং মুদ্রাস্ফীতি নামক লক্ষ ফণাযুক্ত কুটিল সর্পের ধ্বংসসাধনে ক্রমাগত ও অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া যাইতে হইবে। শুধু "উচিত মূল্য" বাঁধিয়া দিলেই কর্ত্তব্য শেষ হয় না। গবর্ণমেণ্টের বিবেচনায় যেটি উচিত মূল্য, দেশের জনসাধারণের নিকট তাহা উচিত মূল্য নহে। কুড়ি টাকা মণে চাউল কিনিবার মত লোকই বা এ দরিদ্র দেশে কোথায়? আর তা ছাড়া এতদিন ধরিয়া চল্লিশ, ষাট ও একশত টাকা দরে চাল কিনিয়া দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত ও দরিদ্র লোক ত সর্ব্বস্বান্ত ও ফতুর হইয়া গিয়াছে, একখানি থালা, ঘটি বাটি পর্য্যন্ত আর তাহাদের নাই। সুতরাং বহুদিন পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টকেই ইহাদের ভরণ পোষণের দায়িত্ব লইতে হইবে। কৃষিকর বসাইতে হয়, সে পরে যথেষ্ট সুযোগ পাওয়া যাইবে। বর্ত্তমানই ইহার জন্য উপযুক্ত অবসর নহে।

বাংলার জমিদারদের বহু দোষ ও ত্রুটির কথা বহুভাবে আলোচিত হইয়াছে এবং তাহারা যে বিনা পরিশ্রমে বিপুল সম্পদের অধিকারী হইয়া বিলাস ব্যসনে জীবনযাপন করে ইহারও তীব্র প্রতিবাদ বহুবার হইয়াছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ভিতর দিয়া লর্ড কর্ণওয়ালিস যেরূপ একদল বিলাতের মত ধনী ও রাজভক্ত জমিদার বাংলায় সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিলেন, সে আশা তাঁর পূর্ণ হয় নাই। জমিদাররা রক্ষকের পরিবর্ত্তে ভক্ষক হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং প্রজাবাৎসল্যের পরিবর্ত্তে প্রজার উপর তাহারা অত্যাচারই করিয়া আসিয়াছে। জমীর স্থায়ী বন্দোবস্তের জন্য একদিকে যেমন সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জমিদারদের আয় বাড়িয়াছে, গবর্ণমেণ্টের জমিদারদের উপর খাজনা বাড়াইবার ক্ষমতা না থাকায়, তাহাদের তেমনি আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিতে হইতেছে। এই সবই হইল জমিদারদের বিরুদ্ধে মোটামুটি নালিশ, যার জন্য ফ্লাউড্ কমিশনের মতানুযায়ী গবর্ণমেণ্ট বাংলা হইতে জমিদারী প্রথা সমূলে উৎপাটিত করিতে মনস্থ করিয়াছেন। আমরাও জমিদারের শত

অপরাধের কথা স্বীকার করি, তবে সেই সঙ্গে যার যতটুকু প্রশংসা প্রাপ্য সেটুকু তাহাদের দিতে কার্পণ্য করা উচিত মনে করি না। আধুনিক বাংলা তার যে শিক্ষা, সাহিত্য, সভ্যতা ও কৃষ্টির জন্য আজ গর্ব্বিত, তার বহুলাংশই দেশের এই নিন্দিত শ্রেণীর নিকট ঋণী। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তই হইল উন্নত বাংলার অর্থনৈতিক কারণ। ইহাদের পুরাকালের ধন সম্পদের কথা আজ যদিও চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু গত ১৯২৯ সন হইতে যে আর্থিক দুর্য্যোগ আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে কৃষি-প্রধান দেশগুলি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আহত হওয়ায় বাংলার কৃষক ও সেই সঙ্গে জমিদার শ্রেণী একই সাথে দেউলিয়া হইয়াছে। মুষ্টিমেয় কয়েকজন অতিরিক্ত বৃহৎ জমিদার ছাড়া প্রায় সকলেরই অবস্থা অতি হীন। তাহার পর সরকারী তরফ হইতে নানারূপ অর্ডিন্যান্স বাহির হইয়া কৃষকদের গ্রাম্য ঋণ প্রথাকে একেবারে উচ্ছেদ করিয়াছে, অথচ ইহার পরিবর্ত্তে সমবায় ঋণ সমিতি এবং অল্প সুদের সরকারী ঋণও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে গড়িয়া উঠে নাই। ফলে কৃষকদের সুবিধা ও মঙ্গলের পরিবর্ত্তে তাহাদের অর্থনৈতিক সমস্যা আরোও জটিল ও উৎপাদক ক্ষমতা আরোও সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। বাংলার জমিদারী প্রথা উঠিয়া গেলে, গ্রাম্য বাংলার সামাজিক জীবন আরোও অধঃপাতে যাইবার সম্ভাবনা। কারণ, শুধু মাত্র কৃষক ব্যতীত গ্রামে অন্য শ্রেণীর লোকের বসবাস বিশেষ থাকিবে না। প্রজাদের সঙ্গে জমিদারদের বিমাতার সম্বন্ধের নিন্দা আমরা বহুবার শুনিয়াছি, কিন্তু বর্ত্তমান খাদ্যসঙ্কটে সরকারী কার্য্যপ্রণালী ও স্বৈরশাসনের অক্ষমতা কি নিরন্ন দেশবাসীর প্রতি কোন দয়া, মায়া বা পিতৃবাৎসল্যের পরিচয় দেয়? শত অবস্থাবিপর্য্যয়ের মধ্যে অনুপস্থিত জমিদার আজও গ্রামের সামাজিক জীবনে কেন্দ্রস্থল অধিকার করিয়া আছে। আজও সেই বার মাসে তের পার্ব্বণের জের কোন রকমে বহন করিয়া নিরানন্দ গ্রাম্য জীবনে একটু হাসির রেখা ফুটাইবার চেষ্টা করে। খরচের তার অনেক বালাই। এইখানেই জমিদারের সঙ্গে অন্য শ্রেণীর ধনী লোকের তফাৎ। ব্যবসায়ী ধনী বা চাকুরীয়াদের অন্যের জন্য খরচের কোন বাধ্যবাধকতা নাই; সুতরাং তাহারা আয়-কর দিলেই যে সমান আয়ের জমিদারদের আয়-কর দিতে হইবে, এ ধরণের যুক্তি এই কারণেই সমীচীন নহে। গত দুর্দ্দিন হইতেই জমিদার শ্রেণী মরিতে বসিয়াছে; যুদ্ধে দেখিলাম বেশীর ভাগ কৃষকের অবস্থার কোন উন্নতিই হয় নাই, সুতরাং জমিদারেরও নহে। তাহারা যে গত পনের বৎসর ধরিয়া খুব লাভবান হইতেছে, এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল; উপরন্তু তাহাদেরই অবস্থা অতিরিক্ত সঙ্গীণ হইয়া উঠিয়াছে। এই অবস্থায় একটি ভুল ও বহু পূর্ব্বেকার ধারণা লইয়া তাহাদের উপর এই দুর্দ্দিনে কৃষি আয়-কর ধার্য্য করা কর-বিজ্ঞানের দিক হইতেও ন্যায় হইবে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমরা এ করের অপক্ষপাতী নহি। কিন্তু তাহার জন্য আমাদের সুযোগ ও সুসময়ের অপেক্ষা করিতে হইবে। আর যদি বঙ্গীয় সরকার একান্তই এই কার্য্য হইতে বর্ত্তমানে ক্ষান্ত না হন, তবে আমাদের অনুরোধ, তাঁহারা যেন কর ধার্য্যের নিম্নতম আয়কে ১৫০০ টাকা হইতে উর্দ্ধে উঠাইয়া অন্তত ১০,০০০ টাকায় রাখেন। প্রকৃতপক্ষে আজ এই ১০,০০০ টাকার মূল্য ১৯৩৯ সনের ২৫০০ টাকারই সমান। এই করের প্রধান আশঙ্কা যে ইহার বোঝা কৃষকদেরই বহিতে হইবে। ইহাতে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দেওয়া হইবে না কি?

ঋণ-শোধ

শ্রীচাঁদমোহন চক্রবর্ত্তী বি-এল

আমগ্রামের বিহারী মোড়লের ছেলে রামনাথ আই-সি-এস্ পাশ দিয়ে যখন আলীপুরে জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হ'ল, তখন গ্রামে হৈ চৈ পড়ে গেল। বিহারী সেকেলে চাষা লোক, বিপত্নীক হ'য়ে দশ বছরের ছেলে রামনাথ আর পাঁচ বছরের মেয়ে মাধুরীকে মায়ের অভাব জানতে দেয় নি। গ্রামের নমঃশূদ্র সমাজের মোড়ল—গোলাভরা ধান—একজন নামজাদা গাঁতিদার। অর্থের অভাব নাই অথচ নিরহঙ্কার সাদাসিদে পরোপকারী সরল চাষী। ছেলেকে ইচ্ছামত স্কুল ও কলেজে পড়িয়েছিল—ছেলেও ছিল তেমনি মেধাবী ও পিতৃগতপ্রাণ। তাই আজ যখন ছেলের 'তার' পেল যে সে হাকিম হ'য়েছে, সরল শিশুর ন্যায় দুই চোখে তা'র অশ্রুধারা! যুক্তকরে উর্দ্ধদিকে তাকিয়ে ভগবানের চরণে জানালো তার কৃতজ্ঞতা। গ্রামের ভদ্র ও চাষী আজ এই শুভদিনে তা'র বাড়ীতে ভীড় জমিয়েছে। গাঁয়ের ছেলে 'সিভিলিয়ান' হাকিম হ'য়েছে, গৌরব তাতে গ্রামবাসীদেরও তো কম নয়। বিহারী হাস্য মুখে সাদরে সবাইকে আপ্যায়িত করলে।

দেখতে দেখতে বৎসর কেটে গেল। বিহারী মোড়লের ছেলে রামনাথ এখন মিঃ আর, রয় নামে পুরাদস্তুর সিভিলিয়ান—তিনি হাকিম হ'য়ে আর দেশে আসেন নি। মাঝে মাঝে পিতার নিকট চিঠি লিখে খবর নিয়ে থাকেন। স্নেহান্ধ পিতার মা-মরা পুত্রের মুখখানি দেখার জন্য বুকখানা তোলপাড় ক'রে উঠে, কিন্তু আজ তো সে মুখ ইচ্ছা করলেই দেখা যায় না—অনেক চিঠিতে মনোভাব ব্যক্ত করেছে কিন্তু প্রত্যুত্তরে এমন কোন আভাষ পায়নি যা'তে বুভুক্ষু পিতা স্নেহের পুত্তলীর কাছে গিয়ে তার ক্ষুধা মেটাতে পারে! তাই অভিমানী পিতার স্নেহার্দ্র চিত্ত বিক্ষুব্ধ হ'য়েছে। বিহারী তাই ইদানীং বড়ই চিন্তাকুল। গ্রামের লোকেরা বলে বিহারী ম্যাজিষ্ট্রেটের বাপ হ'য়ে গম্ভীর হ'য়েছে, সে সদানন্দ বিহারী আর নাই!

সেদিন বিহারীর নামে ডাকপিয়ন চিঠি দিয়ে গেল—সবুজ খামে উগ্র আতরের গন্ধ। বিহারী চিঠি খুলে ইংরেজী লেখা দেখে ছুটলো বাঁড়ুয্যে বাড়ী। বিনোদ বাঁড়ুয্যে "রিটায়ার্ড" পুলিশ ইনস্পেক্টর, তিনি চিঠি পড়ে হেসে বল্লেন, "আরে বিহারী, শুভ সংবাদ, তোমার ছেলের বিয়ের অনুমতির জন্য ব্যারিষ্টার নাগ তোমাকে অনুরোধ জানিয়েছেন, তোমার অনুমতি পেলেই শুভকার্য্য সুসম্পন্ন হ'বে।" বিহারী বিমর্ষভাবে প্রশ্ন করলে, "নাগ কি জাত, বাঁড়ুয্যে মশাই?" "যদি আমার অনুমান সত্য হয় তবে ইনি কায়স্থ ও আমাদের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের জমীদার বংশ"—এই বলে বাঁড়ুয্যে মশাই একটু চিন্তাকুল হ'লেন। "এ কি, সর্ব্বনাশ!"—অস্ফুট শব্দ ক'রে বিহারী মলিনমুখে স্থান ত্যাগ করলো।

কলিকাতা আজব সহর। বালীগঞ্জ আধুনিক "এ্যারিষ্টো-ক্র্যাসি"—আর আলীপুর প্রাচীন আভিজাত্যের ও "বুরোক্র্যাসির"

আবাসস্থান। আর আলীপুর রোডের এক আধুনিক রুচিসম্পন্ন সাহেবী ফ্যাসানের বাড়ীর এক প্রকোষ্ঠে রামনাথ অর্থাৎ মিঃ আর, রয় ও তাহার পিতৃবন্ধু দয়াল বিশ্বাস বসে ছিলেন। কিছুক্ষণ পরেই সাহেবী পোষাক পরিহিত একটী ভদ্রলোক ও একটী সুন্দরী যুবতী ভদ্রমহিলা হালফ্যাসান কায়দায় 'ভ্যানিটী' ব্যাগ হাতে সেই ঘরে প্রবেশ কর্লেন—মিঃ রয় সসম্ভ্রমে তাঁদের অভ্যর্থনা করে বসিয়ে বললেন, "ইনি মিঃ বিশ্বাস, আমার পিতার বন্ধু, আপনার চিঠি পেয়ে বাবা এঁকে পাঠিয়েছেন।" মিঃ নাগ অভ্যাসবশতঃ ডান হাত বাড়ালেন কিন্তু দয়াল জোড় ক'রে নমস্কার করলে, মিঃ নাগ হাত তুলে প্রতিনমস্কার জানালেন। দয়াল জিজ্ঞাসুনেত্রে তাঁর দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন, "আপনিই আরংদীর হরকুমার নাগ মহাশয়ের পুত্র সতীনাথ নাগ?" মিঃ নাগ, বিস্মিতভাবে উত্তর দিলেন, "আপনি দেখছি আমাদের পরিচয় সবই জানেন।" দয়াল একটু হেসে বললেন, "আপনাদের পাশের গাঁয়েই আমাদের দেশ।" "বটে, বটে, বেশ, বেশ"—বলে মিঃ নাগ এক ঝলক হাসলেন। দয়াল মৃদু হেসে দৃপ্তকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, "একটা কথা জিজ্ঞেস করছি, আপনারা বনেদী কায়েৎ জমিদার, আপনি নমঃশূদ্রের ছেলের সঙ্গে আপনার মেয়ের বিয়ে দিতে উৎসাহী কেন জান্তে পারি কি?" এমনি সহজ সরল অথচ স্পষ্ট প্রশ্নে একটু যেন থতমত খেয়ে আবার নিজেকে সামলে নিয়ে জবাব দিলেন মিঃ নাগ, "হ্যাঁ, এ প্রশ্ন আপনি করতে পারেন মিঃ বিশ্বাস—দেখুন, এই প্রগতির যুগে আমরা ক্রমশঃই সভ্য হচ্ছি; পঞ্চাশ বছর পূর্ব্বে যে সমাজ ও সংস্কার ছিল, এখন আর তা নেই। আর সত্যি কথা বলতে কি আমি জাতিভেদ প্রথা মানি না।" দয়াল একটু উত্তেজিত হ'য়ে বিদ্রূপ কণ্ঠে বললেন—"মিঃ নাগ, আমি আপনার উক্তি সমর্থন কর্ত্তে পারি না—আপনার কাছারী বাড়ীতে এখনও আমরা অস্পৃশ্য—আমাদের বস্‌বার স্থান ও তামাকের হুকা চিহ্নিত। প্রকৃত কথা হ'চ্ছে, আপনারা স্বকার্য্য উদ্ধারের জন্ম মুখে সব রকম বুলি আওড়াতে অভ্যস্ত অর্থাৎ সুবিধাবাদী। আমি বলবো আপনারাই আমাদের সমাজের উন্নতির অন্তরায়—আজ আমাদের সমাজের একটী সন্তান কৃতী হ'য়ে সমাজের একজন হ'য়ে সমাজের উন্নতি সাধন করবে তা'তেও আপনারাই অন্তরায় অর্থাৎ আমাদের সমাজের আপনারাই শত্রু! আপনি কি বলতে চান, মিঃ নাগ, যে আপনার বংশের মেয়ে পারবে আমাদের সমাজকে গ্রহণ করতে, পারবে তাদের ব্যথা বুঝতে—না, না, তা হয় না মিঃ নাগ। বরং তিনি দেখেছেন আমাদের ঘৃণার চোখেই—স্বামীকেও দিতে পারবেন না আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভালবাসা—তাঁর দেহের ও মনের আভিজাত্যের ছাপ তাঁকে প্রতিপদে বাধা দেবে এই চাষার ছেলের অঙ্কশায়িনী হ'তে। সে স্বামী-স্থানীয় মিঃ রায়ের উচ্চপদ-জাত অবস্থার সুখ সুবিধার মধ্যে তরুণ মনের সবুজ নেশায় কতকটা শান্তি পাবে সত্য কিন্তু তা'তে তার নারীত্বের ঠিক বিকাশ হবে কি? আপনারই পিতা একদিন এই রামনাথকে আপনাদের পূজার দালান হ'তে কুকুরের ন্যায় তাড়িয়ে দিয়েছিলেন—নিষ্পাপ শিশু জেনেও, আজ পারবেন কি আপনারই কন্যা তা'কে স্বামী বলে তার পায়ে নিষ্ঠার সঙ্গে পুষ্পাঞ্জলী দিতে!!" অবস্থা দেখে মিঃ রয় বড়ই অস্বস্তি বোধ করলেন—তিনি হেসে বল্‌লেন—"দেখুন, মিঃ নাগ, আমার কাকা অর্থাৎ মিঃ বিশ্বাস আমাদের সমাজের নেতা ও সমাজ সংস্কারক। আপনি তাঁর এই আলোচনায় দুঃখিত হবেন না। চলুন, পাশের ঘরে, আপনারা বিশ্রাম করবেন—আমি কাকার সঙ্গে কথা বলছি—সব বুঝিয়ে দিচ্ছি।"

তারপর তিন বৎসর কাটল। রামনাথ মিঃ নাগের মেয়ে রমলাকে বিবাহ করেছে। অবশ্য বিবাহে তার পিতা বা অন্য কোন আত্মীয়স্বজন যোগদান করেন নি, অথবা নিমন্ত্রণও পান নি। তারপর পিতাপুত্রের স্নেহবন্ধন বিচ্ছেদ না হোক প্রীতিকর ছিল না—শিথিল হয়েছিল, উভয়ের মধ্যে চিঠিপত্রের আদান প্রদান বন্ধ হয়েছিল। অভিমানী পিতা বন্ধু দয়ালের নিকট সব শুনে পুত্রের আশা ত্যাগ করেন—আর পুত্রও পিতার অসম্মতিতে আত্মসম্মানে আঘাত পেয়ে পিতার প্রতি বিরক্ত হন।

পৃথিবীব্যাপী ভীষণ যুদ্ধের জন্য খাদ্যদ্রব্যের মূল্য আগুন হ'লো, বাংলার ঘরে ঘরে হাহাকার উঠল। তারপর গোদের উপর বিস্ফোটক—দামোদরের সর্ব্বনাশা বন্যায় বাংলার একাংশ প্লাবিত ক'রে ছাগল গরু মানুষ গৃহ বাটী জিনিষপত্তর ভাসিয়ে নিয়ে গেল। হতভাগ্য চাষীদের মধ্যে যা'রা জীবিত রইল তারা নিরাশ্রয় হ'ল—যা'র ঘরে যা কিছু সঞ্চিত খাদ্যশস্য ছিল প্রকৃতির তাণ্ডব লীলায় ফুৎকারে কোথায় উড়ে গেল; সহস্র সহস্র নিরন্ন উলঙ্গ অর্দ্ধউলঙ্গ বৃদ্ধ যুবক যুবতী বালক বালিকা শিশু দুর্ভিক্ষের করাল প্রবাহে নদীর স্রোতে তৃণের ন্যায় ভেসে চলল। ভগবানের অভিশাপ মাথায় নিয়ে তারা এক মুষ্টি অন্নের কাঙ্গাল, শেয়াল কুকুরের সঙ্গে খাবার নিয়ে বাধায় লড়াই! ওদিকে পশ্চিম রণাঙ্গণে লড়াই। প্রকৃতির অট্ট হাস্য! অসংখ্য হতভাগ্য নরনারী মৃত্যুর শীতল স্পর্শে ভব যন্ত্রণা হ'তে নিষ্কৃতি পেলো; সংখ্যা শুনে সভ্য-জগতের বড় বড় ধুরন্ধরগণও হ'লো বিস্ময়াভিভূত। চাউলের জন্মস্থানেও চাউলের মূল্যের কোন হিসাব রইল না—চারদিকে হা অন্ন! হা অন্ন! অর্থেও চাউল অমিল হল—প্লাবন-পীড়িত চাষীর দল, বিভিন্ন সাহায্য কেন্দ্রের সৌজন্যে দুই এক মুষ্টি অন্ন পে'ল বটে, কিন্তু সে সমুদ্রে বারি বিন্দু মাত্র! তাই তারা দু মুঠা অন্নের সন্ধানে ছুটল দেশ দেশান্তরে। বিরাট কলিকাতা নগরী ভর্ত্তি হ'য়ে গেল সেই নরকঙ্কালের শোভাযাত্রায়!

কিছুদিন পরের কথা। নাগপুর প্যাসেঞ্জার 'আপ' ট্রেণ আটকুড়া ষ্টেশনে এসে থামতেই পিপীলিকা শ্রেণীর মত অর্দ্ধ উলঙ্গ অসংখ্য নরকঙ্কাল—স্ত্রীপুরুষ—বৃদ্ধ বৃদ্ধা যুবক যুবতী দলবদ্ধ হ'য়ে ট্রেণখানি ঘিরে ফেলল; যে যেখানে পারল স্থান করবার চেষ্টা করল—কেউ গাড়ীর নীচের 'রডে'র উপরে উঠে দাঁড়াল, কেউ হাতল ধরল, একদল গাড়ীর ছাদে উঠে বসল। আর যারা কোথাও স্থান করতে পার্‌লো না তারা দুঃখে কষ্টে ক্রন্দন বা চীৎকার করতে লাগলো। ট্রেণের যাত্রীরা অবাক হ'য়ে এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখতে লাগলো—প্রশ্ন করে জানা গেল—বাংলার চাষীর দল গ্রাম ছেড়ে চলেছে খাবার সন্ধানে। সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বঙ্গজননী আজ বিদেশে অন্নের ভিখারিণী—তাঁর সন্তানের দল আজ দল বেঁধে চলেছে খাবার সন্ধানে—অন্নপূর্ণা মা অন্নের কাঙ্গালিনী।

ষ্টেশনটা ছোট, তাতে অত লোকের ভীড় ;—কর্ত্তৃপক্ষ বিচলিত হোলেন। গাড়ীর প্রথম শ্রেণীর একটা দরজা খুলে দাঁড়ালেন সৌভাগ্যবান কে একজন—দেখেই কর্ত্তৃপক্ষ করলেন অভিবাদন। অমনি বুভুক্ষের দল তাঁকে লক্ষ্য করে তাদের বাঁচার দাবী জানিয়ে দিলে সমস্বরে চীৎকার করে—তাদের মধ্যে কোন কোন হতভাগা বুঝি ষ্টেশনের কোন নিষিদ্ধ স্থানে গিয়ে পড়েছিল অজ্ঞানিত ভাবে—ব্যস্, আর যায় কোথায়, কোম্পানীর কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ভৃত্যের দল ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। মড়ার মরণ ঘনিয়ে এলো তখনি পুলিশের লাঠির মুখে। বিহারী বৃদ্ধ হ'লেও এ সঙ্কটে হতভাগ্যগুলোকে বাঁচাবার জন্য অস্থির হয়ে উঠল। তারা যে বৃদ্ধেরই মুখ চেয়ে সব বিপদেই পাড়ি দেয়। তাই সে এগিয়ে গেল সবার আগে—যুক্তকরে ক্ষমা চাইতে। শান্তিরক্ষা কর্ত্তেই হ'বে, তা'তে সামনে বড়কর্ত্তা দণ্ডায়মান—দেখাতে হবে তা'কে কর্ত্তব্যনিষ্ঠা। এমন শিক্ষা দেওয়া চাই যে অত্যাচারী গুণ্ডার দল যেন আর না কখন শান্তিভঙ্গের চেষ্টাও করে। শান্তিরক্ষী দিলেন আদেশ, "চালাও।"—বৃদ্ধ নারী শিশু অর্দ্ধাহারী অনাহারী রুগ্ন—সবার উপর চললো এলোপাথাড়ি প্রহার। বৃদ্ধ বিহারী মাথা পেতে নিলে সেই নিষ্ঠুর আঘাত ;—অব্যক্ত যন্ত্রণায় ছিট্‌কে পড়লো সেই প্রথম শ্রেণীর কামরার সম্মুখে, ক্ষণিকের জন্য তাহার দৃষ্টি পড়ল সেই মূর্ত্তির দিকে ;—পরক্ষণেই সে জোড় করে আঁক্‌ড়ে ধরলো গাড়ীর হাতোল—চেষ্টা ক'রে দুই চোখ মেলে আবার দেখে নিলে সেই মূর্ত্তিকে—তার কণ্ঠ থেকে আর্ত্তস্বরে বেরিয়ে এল—"বাবা রমু!" সঙ্গে সঙ্গে—বিহারীর অনাহার-ক্লিষ্ট দেহটা কেঁপে উঠ্‌লো—কুয়াসার একটা ঢেউ যেন সব দৃষ্টিশক্তিকে মলিন ক'রে দিলে।

কম্পিত কণ্ঠে 'ষ্টপ' বলেই রামনাথ তড়িৎবেগে প্লাটফর্ম্মে নেমে গেল। স্ত্রী চীৎকার কর্লেন "কোথায় যাও—ঐ অসভ্য গুণ্ডাগুলোর মধ্যে।" অশ্রুনেত্রে আঘাতপ্রাপ্ত ভূলুণ্ঠিত মূর্ত্তির দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রামনাথ বলল, "আমার তীর্থে রমলা।" স্তব্ধবিস্ময়ে সকলে তাকিয়ে দেখল, জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ রয় ধীরে ধীরে আঘাতপ্রাপ্ত বৃদ্ধ বিহারীর মাথাটী কোলে তুলে নিয়ে বসেছেন!—দূরে আবার কোলাহল উঠল ; ভীড় ঠেলে দেখা গেল সেবিকা নারী আসছে—হাতে চিকিৎসার সরঞ্জাম—সঙ্গে চাকর, তার পেছনে আধপাগলা গোছের একটা লোক, পরণে মোটা কাপড়—হাতকাটা জামা গায়। মাধুরী আর্ত্তকণ্ঠে ডাকিল, "বাবা"। রামনাথ চমকে করুণ দৃষ্টিতে চাইলে, মাধুরী বিষণ্ণ দৃষ্টিতে একবার তার দিকে তাকিয়ে বললে, "দাদা এসেছ?" বিহারীর চোখে অশ্রু, ক্ষতমুখে রক্তধারা, কি যেন বল্‌তে চাইছে কিন্তু শক্তি নেই। সেই আধপাগলা ডাক্তার বিশ্বাস হাতটা তুলে নিয়ে আবার নামিয়ে দিলে, রামনাথ করুণস্বরে জিজ্ঞাসা কর্লে, "ভাই, কোনও উপায় নেই?" ডাক্তার ম্লানমুখে রামনাথের দিকে একবার তাকিয়ে মাথা নীচু কর্লে। রামনাথের মনের অবস্থা ও ম্লানমুখ দেখে মাধুরী ব্যথিত কণ্ঠে বললে, "দাদা, এমনি সময়ে তুমি এখানে কেন দেখা দিলে?" রামনাথ সজল-নয়নে কোমলস্বরে বললে, "বোন, এই তো আমার আসার সময় রে—ভাই, একটু জ্ঞান কি হ'তে পারে না?"—এই বলে ব্যাকুল-ভাবে ডাক্তারের হাত জড়িয়ে ধরলো। ডাক্তার গম্ভীরভাবে মাধুরীর হাত থেকে "ইনজেক্‌সনের" বাক্সটা নিয়ে একটা "ইনজেক্‌সন" কর্লেন। বৃদ্ধের জ্ঞান ক্রমে ফিরে এলো—'ফ্লাস্ক' থেকে মাধুরী গরম দুধ দিতে গেলে—বিহারী ডান হাত দিয়ে তার হাতটা ধরলে।

কামরার দরজায় দাঁড়িয়ে সামনে ঝুঁকে রমলা তিক্তকণ্ঠে চীৎকার করে বল্‌লে—"ও কি হ'চ্ছে মিঃ রায়? একটা চাষা আঘাত পেয়েছে, তাকে নিয়ে তুমি প্লাটফর্ম্মে একটা দৃশ্য সৃষ্টি করলে—উঠে এসো, ট্রেণ 'ডিটেইণ্ড্' হ'চ্ছে।" রামনাথ অশ্রু-প্লাবিতনেত্রে তার দিকে চেয়ে বল্‌লে, "রমলা, তুমি যাও—ট্রেণ যাক্—আমি আমার মুমূর্ষু বাপ্‌কে ফেলে কোথায় যাবো?" উত্তরে রমলা চমকিতা হ'য়ে বল্‌লে, "এই লোকটা তোমার বাবা?" রামনাথ শান্তকণ্ঠে উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ; রমলা—আমার বাবা, মা-মরা মাধু আর রামুর বাবা—তুমি আঘাত পেলে?—তোমার আভিজাত্যে ঘা লাগলো, কি করবো।—আমি হতভাগ্য—আমি এতবড় সম্বন্ধ ফেলে—সব ভুলে, কেমন করে, কি মায়া মরীচিকার পেছনে ছুটে ছিলাম!" বল্‌তে বল্‌তে রামনাথের গণ্ডে অশ্রুধারা নেমে এল। "বাবা", আর্ত্তস্বরে রামনাথ ডাকল, "বাবা, আমি রমু!" স্বরের প্রভাবে বুঝি মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধের স্থির দেহটি নড়ে উঠল, রমানাথ দেখল, বৃদ্ধের জ্ঞান ফিরেছে—দর-বিগলিত ধারায় গণ্ডদেশ বহে অশ্রু পড়ছে—শীর্ণ হাতখানি তুলে পুত্র ও কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করলো। রমলা বিস্মিতভাবে কিছুক্ষণ গাড়ীর হাতলটি ধরে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর গাড়ী থেকে নেমে এসে অনিমেষ নয়নে একবার মাধুরীর দিকে তাকাল। মাধুরীর দীপ্ত চাহনির কাছে তার শিক্ষার মিথ্যা আবরণ সরে গেল। সে দেখলো—পল্লীর ম্লান সন্ধ্যার ধুসর ছায়ার ভিতর মিলনের শান্ত দৃশ্য। স্বামী তার যেন কত দূর থেকে বলে উঠলো—"দেখেছ রমলা, মোহের ছলনা—কোথা দিয়ে কোন্ আঘাতে চূর্ণ হয়। কত বড় শক্তি আমার বাবার বলো,—নিজের হাতে গড়া 'সিভিলিয়ান' ছেলের ঐশ্বর্য্য ঠেলে ফেলে দিয়ে মরণকে বেছে নিলে দৈন্যের মধ্যে ; গ্রামের মোড়ল—গ্রামের মাটীতেই বিছিয়ে দিলেন তা'র মহাশয্যা—তবুও আমরা গর্ব্ব করি!"

রমলা স্তম্ভিত—তা'র সমস্ত শরীরের ভিতর যেন একটা বৈদ্যুতিক শিহরণ হ'লো—একটা যেন ভোজবাজি হ'য়ে গেল—আত্মবিস্মৃতা হ'য়ে বৃদ্ধের পদতলে লুটিয়ে পড়্‌ল—সব সৌন্দর্য্য সাজগোজ প্লাটফর্ম্মের ধূলায় ধুসরিত হ'লো। ডাক্তার নাড়ী দেখে দুই হাতে মুখ ঢাকলো, মাধুরী চীৎকার করে পিতার শীতল বক্ষে লুটিয়ে পড়লো—রামনাথ আর্ত্তকণ্ঠে বলে উঠ্‌লো "ঋণ-শোধ।"



জঙ্গম

বনফুল

৩০

সমস্ত রাত শঙ্করের ঘুম হয় নাই। নিপুদা, কুন্তলা, ঝকৃসু, রামলাল, সুরমা, উৎপল সকলের সম্মিলিত প্রভাব একটা পাথরের মতো তাহার বুকে চাপিয়া বসিয়াছিল। সে যেন স্বচ্ছন্দে নিশ্বাস প্রশ্বাসও লইতে পারিতেছিল না। কিছুক্ষণ এপাশ ওপাশ করিয়া অবশেষে সে বিছানায় উঠিয়া বসিল। কমানো বাতিটার স্বল্পালোকে চোখে পড়িল অমিয়া এবং খুকী অঘোরে ঘুমাইতেছে। খুকীর গায়ে লেপ নাই, অমিয়ার খোঁপাটা এলাইয়া পড়িয়াছে। খুকীর গায়ের লেপটা সন্তর্পণে ঠিক করিয়া দিয়া সে মশারি হইতে চুপি চুপি বাহির হইয়া আসিল। ধীরে ধীরে কপাট খুলিয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। বারান্দায় আসিয়া সে অভিভূত হইয়া পড়িল। এ কোথায় আসিল সে! এ যে রূপকথার রাজ্য! তাহারই ঘরের বারান্দায় এই অপরূপ স্বপ্ন কতক্ষণ হইতে মূর্ত্ত হইয়া রহিয়াছে! মেঘ-চাপা জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধতায় চতুর্দ্দিক স্বপ্নাকুল। কিছু দূরে রাস্তায় যে অস্ফুট কলরব উঠিতেছিল তাহা তাহার জ্যোৎস্না-অভিভূত মন প্রথমটা শুনিতেই পাইল না। একটু পরেই কিন্তু পাইল এবং উৎকর্ণ হইয়া উঠিল। কিসের কলরব? রাস্তায় এত ভীড় কিসের? বারান্দা হইতে নামিয়া দেখিল দলে দলে লোক চলিয়াছে। হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল আজ মাঘী পূর্ণিমা। গঙ্গাস্নান করিতে চলিয়াছে সব। গঙ্গার তীরে প্রকাণ্ড উৎসব আজ। মেলা বসিবে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, তীব্র হাওয়া উঠিয়াছে একটা, মাঘের কনকনে শীত। কিন্তু কিছুই ইহাদের নিরস্ত করিতে পারে নাই। দলে দলে চলিয়াছে সব। দূর দূরান্ত হইতে আসিয়াছে। মাঝে মাঝে 'টপ্‌পর'-দেওয়া গরুর গাড়ি, তাহাতেও লোক ঠাসা। কি উৎসাহ! মাঝে মাঝে নারীকণ্ঠের উচ্চ হাস্য শোনা যাইতেছে, মাঝে মাঝে শিশু কণ্ঠের ক্রন্দনও। 'জয় গঙ্গা মায়িকী জয়' বলিয়া এক একটা দল মাঝে মাঝে জয়ধ্বনি দিতেছে, কেহ ভজন গাহিতেছে, দেশী ঢোল খঞ্জনী বাজাইয়া কেহ কেহ কীর্ত্তন ধরিয়াছে। মেঘ-মেদুর জ্যোৎস্নায় শঙ্কর স্পষ্ট কিছু দেখিতে পাইতেছিল না, কিন্তু সে অনুভব করিতেছিল আবাল-বৃদ্ধবনিতা সকলেই চলিয়াছে আজ। অন্ধ-খঞ্জ, সুস্থ-অসুস্থ, ধনী-দরিদ্র, কৃপণ-দাতা, চোর-সাধু, পাপী-পুণ্যবান কেহ বাদ নাই। তাহার মনে হইল আমাদের মতো 'কালচার্ড' কুসংস্কার-মুক্ত ইংরেজি-পড়া মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া বাকী সকলেই আজ গঙ্গাস্নানে চলিয়াছে। কিসের টানে চলিয়াছে? কোন অদৃশ্য আইন ইহাদের এই শীতের ভোরে হাঁটিতে বাধ্য করিতেছে? পুণ্যের লোভ? পরলোকের সদ্গতি? সে কিন্তু লোভ দেখাইয়া ইহাদের সৎপথে আনিতে পারিতেছে না তো। পাশ করিলে চাকরি পাইবে হাকিম হইবে—এসব লোভ দেখানো সত্ত্বেও তাহার অবৈতনিক বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র কই জুটিল। আর একটা ঘটনাও মনে পড়িয়া গেল। রাজীব দত্ত একবার মাতৃশ্রাদ্ধে গরীব দুঃখীদের পোলাও খাওয়াইবেন বলিয়া ঢ্যাঁটরা দিয়াছিলেন। কয়েকজন অস্পৃশ্য ভিখারী ছাড়া তেমন বেশী লোক জোটে নাই! এই নিরন্ন বুভুক্ষু দেশে পোলাও খাইবার লোভে দলে দলে লোক ছুটিয়া গেল না তো। রাজীব দত্তের ঢ্যাঁটরা দিয়া পোলাও-খাওয়ানোর অশোভন অহমিকাকে এদেশের গরীব দুঃখীরাও প্রশ্রয় দিল না। না—না, ঠিক লোভ নয়। বিশ্বাস, তৃপ্তি, নিগূঢ় সংস্কার বা ওই জাতীয় একটা কিছু ইহাদের অন্তরে এখনও আছে যাহা আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি। ইহারা যাহা বিশ্বাস করে আমাদের তাহাতে বিশ্বাস নাই। এই বিশ্বাসের জোরে ইহারা বারো মাসে তের পার্ব্বণের উৎসবে মাতিয়া উঠিতে পারে আমরা পারি না, নিরুৎসব আমরা নাক সিঁটকাইয়া দূরে বসিয়া থাকি শুধু। মনে করি যদি এই অসভ্যগুলাকে ধরিয়া সাবান-পাউডার মাখাইয়া ফিট্‌ফাট কেতা-দুরস্ত করিয়া মুখে বিদেশী বুলি এবং মনে বিলাতি সভ্যতার রংটা ধরাইয়া দিতে পারি তাহা হইলেই বুঝি ইহারা শান্তি পাইবে। কিন্তু তাহাতে ইহারা বোধহয় শান্তি পায় না। আমরাই কি পাইয়াছি? শীতের ভোরে খালি পায়ে হাঁটিয়া ভজন গাহিতে গাহিতে গঙ্গা-স্নান করিয়াই বোধহয় ইহারা শান্তি পায়।……প্রত্যুষের অস্ফুট আলোকে তীর্থযাত্রী এই জনস্রোতের দিকে শঙ্কর সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। মনে হইল সে যেন বিদেশী, ইহাদের চেনে না, ইহাদের সহিত কোন সম্পর্ক যেন তাহার নাই।

এই বিদেশীর জন্যই কিন্তু যমুনিয়া লুকাইয়া মুকুন্দ পোদ্দারের দ্বারস্থ হইয়াছিল এবং কিছু টাকা কর্জ্জ করিয়া 'ঝান্‌ডা' উঠাইবার বন্দোবস্ত করিতেছিল। বাজু জোড়া বাঁধা দিতে হইল। কিন্তু উপায় কি—মানত শোধ করিতে হইবে তো। মানত শোধের জন্য এত খরচ অবশ্য না করিলেও চলিত—কম পূজা দিলেও 'দেওতা' অসন্তুষ্ট হইতেন না, কিন্তু শঙ্করবাবুকে ভাল মাংস খাওয়াইবার সাধ তাহার অনেক দিন হইতে। সেদিন এককথায় অমন একটা দামী পশমি দোশালা তাহাকে দিয়া দিলেন! সামান্য কিছু একটু প্রতিদান না দিলে কি ভাল দেখায়। সুতরাং মাঘী পূর্ণিমার দিন 'দেও' স্থানে 'ঝান্‌ডা' উঠাইবার অজুহাতে সে একটা পাঁঠা, একটা পাঁঠি এবং পাঁচটা 'কবুতর' 'চঢ়াইবার' বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। মেথর পাড়ার এই 'দেও' স্থানটি বড় জাগ্রত স্থান। ডাইনির 'আঁখ লাগিয়া' কেহ যদি অসুস্থ হয়, দুরারোগ্য ব্যাধি যদি কাহারও না সারে, কাহারও যদি বারবার ছেলে হইয়া মরিয়া যায়, বিদেশী পুত্রের সংবাদ না পাইয়া কেহ যদি ব্যাকুল হয় এই দেওস্থানে আসিয়া সে মানত করে এবং মাঘী পূর্ণিমার দিন পূজা চড়ায়। বিষুণের অনেক দিন কোন খবর নাই, কলিকাতায় সেই যে সে গিয়াছে আর আসে নাই। চিঠিও লেখে না। চিঠি লিখিলে উত্তরও আসে না। ছেলের জন্যই যমুনিয়া মানত করিয়াছিল। মুশাই আপত্তি করে নাই, বরং

খুশিই হইয়াছিল। অন্ত কোন কারণে নয়—ন্যায়সঙ্গত ভাবে মদ খাইতে পারা যাইবে বলিয়া। আজ যমুনিয়া আপত্তি করিবে না। একটা বিষয়ে সে কিন্তু যমুনিয়াকে সাবধান করিয়া দিয়াছিল, ধারের কথা বাবু যেন না জানিতে পারে। ইহা লইয়া বাবু যদি তাহাকে 'বক্‌ঝক্‌' করে তাহা হইলে কিন্তু সে মারিয়া ধুনিয়া দিবে। যমুনিয়াও ধারের ব্যাপারটা যথাসাধ্য গোপন রাখিবার প্রয়াস পাইতেছিল।

৩১

পরম শ্রদ্ধাবিষ্ট কণ্ঠে হরিহর জগদ্ধাত্রী প্রতিমার সম্মুখে মন্ত্রপাঠ করিয়া ধ্যান করিতেছিলেন—

সিংহস্কন্ধাধিসংরূঢ়াং নানালঙ্কার-ভূষিতাম্
চতুর্ভুজাং মহাদেবীং নাগযজ্ঞোপবীতিনীম্।
শঙ্খ-শার্ঙ্গ-সমাযুক্ত-বামপাণিদ্বয়ান্বিতাম্
চক্রঞ্চ পঞ্চবানাংশ্চ ধারয়ন্তী চ দক্ষিণে।
রক্তবস্ত্র-পরিধানাং বালার্কসদৃশী তনুম
নারদাদ্যৈর্মুনিগণৈঃ সেবিতাম্ ভবসুন্দরীম্
ত্রিবলীবলয়োপেত নাভিনাল মৃণালিনীম্
রত্ন-দ্বিপময়দ্বীপে সিংহাসনসমন্বিতে
প্রফুল্লকমলারূঢ়াং ধ্যায়েত্তাং ভব-গেহিনীম্।

ধ্যানান্তে ভক্তিভবে তিনি প্রণাম করিলেন। অনেকক্ষণ প্রণত হইয়াই রহিলেন এবং মনে মনে প্রার্থনা করিলেন—"ত্রিভুবন-পালিনী জগজ্জননী সকলের মঙ্গল কর মা, সকলকে শান্তি দাও।" সকলের জন্যই প্রার্থনা করিলেন তিনি, কেবল নিজের জন্য প্রার্থনা করিতে তাঁহার কেমন যেন সঙ্কোচ হইল। কিন্তু নিজের জন্যও প্রার্থনার প্রয়োজন ছিল তাঁহার। কিছুদিন হইতে তিনি কেমন যেন একটা অশান্তি অনুভব করিতেছিলেন। অশান্তিটা যে ঠিক কি এবং কেন তাহাও তাঁহার অগোচর ছিল। স্পষ্ট কোন কারণ তো চোখে পড়ে না। তবু কেমন যেন একটা অস্বস্তি, অস্পষ্ট কিসের যেন একটা ছায়া তাঁহার মনের স্বাচ্ছন্দ্য নষ্ট করিতেছিল। কিসের একটা অভাব যেন তিনি মনের মধ্যে অনুভব করিতেছিলেন। এই অভাব-বোধটা কি কুন্তলাকে কেন্দ্র করিয়াই? মাঝে মাঝে একথা তাঁহার মনে হয়, আবার তখনই ভাবেন—না, কুন্তলার আচরণ তো নিখুঁত। তাহার পতিভক্তি, গৃহকর্ম্মনিপুণতা, দেব-সেবা, কর্ম্ম-শৃঙ্খলা সমস্তই তো অনিন্দনীয়। কেবল সে বড় বেশী গম্ভীর এবং আন্তরিক। একবার যাহা ভাল বলিয়া মনে করিবে প্রাণপণে তাহা করিবেই। কলেজে-পড়া-মেয়ে একটু যদি বিলাসিতা করিতই, কি এমন ক্ষতি ছিল তাহাতে। তাঁহার জন্যই হয় তো সে নিজেকে বঞ্চিত করিতেছে এ সন্দেহ মাঝে মাঝে মনে জাগে এবং জাগিলেই তাঁহাকে বড় ব্যাকুল করিয়া তোলে। তাঁহার জন্য কেহ কষ্ট পাইতেছে এ চিন্তা অতিশয় পীড়াদায়ক। তাঁহার জন্যই কি কুন্তলা এই কৃচ্ছ্রসাধন করিতেছে? জিজ্ঞাসা করিতে কেমন যেন সঙ্কোচ হয়। তুমি বিলাসী হও—একথাও মুখ ফুটিয়া বলা যায় না। অথচ··· আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে এতটা সনাতন মনোবৃত্তি কি ভাল? কে জানে। রামলাল যদি ম্যাট্রিক পাশ করিয়া জমিদারদের খরচে আই-এ পড়িত কি এমন ক্ষতি ছিল তাহাতে। ইহা লইয়া অনর্থক একটা অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছে। নিপুবাবু সেদিন যা মুখে আসিল বলিয়া গেলেন। কি দরকার ছিল এ সবের। কুন্তলা কিন্তু কিছুতেই নিজের মত-পরিবর্ত্তন করিবে না। ঝমরুও কুন্তলার মতের বিরুদ্ধে কিছুতে যাইবে না। কুন্তলা যাহা বলিতেছে এক হিসাবে তাহা ঠিকই। সংস্কৃত-লজিক মুখস্থ করিয়া অবশেষে একটা অকর্ম্মণ্য জীবে পরিণত হওয়া অপেক্ষা কুলকর্ম্ম করাই রামলালের পক্ষে শ্রেয়ঃ···কিন্তু কি দরকার আমাদের এসব ঝঞ্ঝাটের মধ্যে যাওয়ার! জগদ্ধাত্রীর চরণাশ্রয়ে যে শান্ত শুদ্ধ আনন্দিত জীবন তিনি যাপন করিয়াছেন তাহার মধ্যে এ সবের কোন স্থান ছিল না এতদিন। সকলের মঙ্গল কামনা করিয়া সকলকেই স্বীয় নিয়তি-নির্দ্ধারিত পথে চলিতে দেওয়াই বিবেক-সম্মত মনে হইত। কিন্তু কুন্তলাও হয়তো নিজের বিবেককেই অনুসরণ করিতেছে। স্বামীত্বের জোরে তাহাতে বাধা দিতে যাওয়াটাও কি ঠিক? তাছাড়া কিছুদিন হইতে তাঁহার নিজেরও একটা খট্‌কা লাগিয়াছে। সকলেই স্বীয় নিয়তি-নির্দ্ধারিত পথে চলিতেছে এই বলিয়া নির্ব্বিকারভাবে বসিয়া থাকা কি ব্রাহ্মণোচিত? শস্যশ্যামলা দেশ আমাদের শ্মশান হইয়া উঠিল যে! সবই নিয়তি-নির্দ্ধারিত? অসংখ্য লোকের অসংখ্য দুর্দ্দশা এবং নিজেদের ক্লীবত্ব মনকে পীড়িত করিয়া তোলে। ভিখারীর সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। আমার কি করিবার আছে, আমি কি করিতে পারি বলিয়া বসিয়া থাকা কি উচিত? পুনরায় তিনি জগদ্ধাত্রী-চরণে প্রণত হইয়া প্রার্থনা করিলেন—জগদ্ধাত্রী জননী, সকলের মঙ্গল কর মা —সকলকে শান্তি দাও—।

প্রণামান্তে বাহিরে আসিয়াই দেখিতে পাইলেন কাঠের-পা-পরা সেই ভিখারীটা দাঁড়াইয়া আছে। সঙ্গে দুইটি শিশু। প্রাণপণে কি একটা জানোয়ারের ডাক ডাকিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু পারিতেছে না। গলা একেবারে বসিয়া গিয়াছে। বড় ছেলেটা মহিষের ডাক ডাকিবার চেষ্টা করিল। কিছুই হইল না। এখনও ভাল শিখিতে পারে নাই।

হরিহর ভিতরে ঢুকিয়া চাল-কলা ফল যাহা ছিল সব বাহির করিয়া তাহাকে দিলেন। ঝমরু চলিয়া গেল। হরিহর চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন

৩২

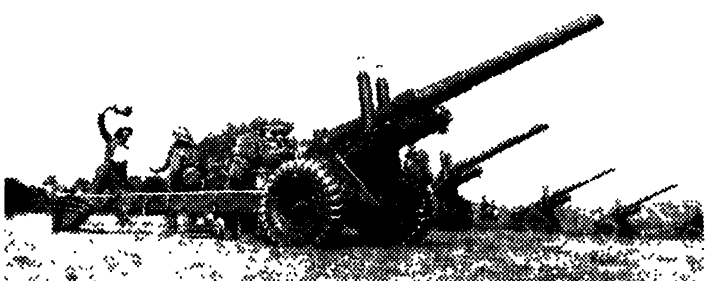
শঙ্করের পরিবর্ত্তিত মনোভাব সম্বন্ধে সুরমা অচেতন ছিল না। নিগূঢ় উপায়ে সে ঠিক বুঝিতে পারিয়াছিল। বুঝিতে পারিয়াও কিন্তু নিজের সহজ আচরণকে সে ক্ষুণ্ণ করে নাই, বিশেষ বিব্রত বা কুণ্ঠিতও সে হয় নাই। অন্তরের অন্তস্তলে সে বরং একটা সূক্ষ্ম গর্ব্বই অনুভব করিতেছিল। অজ্ঞাতসারে নয়, জ্ঞাতসারেই সে এই মুগ্ধ ভৃঙ্গটিকে মনে মনে যে অপাঙ্গ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতেছিল তাহা সতী-সুলভ নহে বিজয়িনী-সুলভ। কিন্তু তাই বলিয়া বিগলিত কিম্বা বিচলিত সে হয় নাই। বাক্যে বা আচরণে এমন কিছুই সে প্রকাশ করে নাই যাহা অশোভন। সে যে বুঝিতে পারিয়াছে তাহাও তাহাকে দেখিয়া বুঝিবার উপায় ছিল না। তাহার সুমার্জ্জিত ব্যবহারের স্বচ্ছন্দ সাবলীলতায় এতটুকু

ছন্দ-পতন হয় নাই, তাহা ঠিক আগের মতোই সংযত অথচ অনাড়ষ্ট ছিল। কিন্তু শঙ্করের স্পন্দিত হৃদয়ের উন্মুখ প্রণয়োৎকণ্ঠায় তাহার মনের নিভৃততম প্রদেশে যে সূক্ষ্ম আনন্দ অদৃশ্য পুষ্প-সুরভির মতো সঞ্চারিত হইতেছিল তাহাতে সে ঈষৎ আবিষ্ট হইয়াছিল বই কি। কিন্তু সে মনে মনে বর্ম্মাবৃতও হইতেছিল। ধরা দেওয়া হইবে না, লঘু ললিত-গতিতে স্থূলতাকে এড়াইতে হইবে, এমন আচরণ করিতে হইবে যাহাতে এই অকথিত প্রণয়-আকুতি কথ্য প্রেমালাপের ইতরতায় পরিণত হইবার সুযোগ না পায়। নেপথ্য মানস-বিলাসকে নেপথ্যেই নিবদ্ধ রাখিতে হইবে। কিন্তু স্থূলতা এড়াইবার এই চেষ্টাটাও আবার যেন স্থূলভাবে প্রকট হইয়া না পড়ে, সে দিকেও তাহার সতর্ক দৃষ্টি ছিল। নিজের কৃতিত্ব মনে মনে উপভোগ করিতে করিতে নিপুণা সার্কাস-অভিনেত্রী যেমন ছাতা-হাতে সরু তারের উপর দিয়া হাঁটিয়া যায় সুরমাও মনে মনে অনেকটা সেই জাতীয় ক্রীড়ায় লিপ্ত ছিল। একটু তফাত অবশ্য ছিল। মানসলোকের প্রত্যন্ত দেশে অতিশয় সঙ্গোপনে যে খেলা চলিতেছিল তাহাতে ক্রীড়ক এবং দর্শক উভয়েরই ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল সে নিজেই। বাহিরের কোন দর্শক সেখানে ছিল না। ক্রমশঃ

বাহির বিশ্ব

শ্রীঅতুল দত্ত

বিশ্ব-সংগ্রামের সাড়ে চারি বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে। এই ধ্বংসাগ্নির প্রবল তাপে ভারতভূমি ঝলসিয়া গেলেও এত দিন এই অগ্নিশিখা ভারতকে প্রত্যক্ষভাবে স্পর্শ করে নাই। কিন্তু গত এপ্রিল মাসে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। এই সময় বিশ্বব্যাপী বাড়বাগ্নির দুই চারিটি স্ফুলিঙ্গে ভারতের প্রান্তসীমা প্রজ্বলিত হইয়া উঠে; সে অগ্নি এখনও নির্ব্বাপিত হয় নাই।



রয়েল এ্যার্টিলারীর সৈন্যগণ ব্রিটেনের ৫.৫ গান্ হাউট্‌জার কামানে গোলা ছোঁড়ার মহড়া দিতেছে। এই কামানে একশত পাউণ্ড ওজনের গোলা ছোড়া যায়। টিউনিসিয়া ও সিসিলি যুদ্ধে এই কামান বিশেষ কার্য্যকরী হইয়াছে

মণিপুর অঞ্চলে

গত মার্চ্চ মাসের শেষভাগে জাপ-সৈন্য ছয়টি স্থানে চিন্দুইন নদী অতিক্রম করে। তাহার পর তিন দিক—টিড্ডিম-ইম্ফল ও প্যালেল্-টামু রাস্তা এবং সোমড়া পাহাড় ধরিয়া জাপ-সৈন্য পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। তাহাদের লক্ষ্য ইম্ফল ও বাঙ্গলা আসাম রেলপথ। এপ্রিল মাসের প্রথমেই ইম্ফল সমতল ভূমির নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতমালায় জাপ-সৈন্য প্রতিষ্ঠিত হয়, টিড্ডিম হইতে সম্মিলিত পক্ষের সপ্তদশ বাহিনী প্রত্যাবর্ত্তন করে, প্যালেল্-টামু রাস্তা ধরিয়াও জাপ-সেনা আগাইয়া আসে। এদিকে জাপ-সেনা স্থানে স্থানে মণিপুর রোডের পশ্চিম দিকে উপস্থিত হয়; কোহিমার সহিত উত্তর-পশ্চিমে ডিমাপুরের এবং দক্ষিণে ইম্ফলের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। সাময়িকভাবে কোহিমার একটি অংশও জাপ-সেনার হস্তগত হয়। অল্পকালের মধ্যে ইম্ফল-টিড্ডিম রাস্তায় বিষেণপুর সংযোগ কেন্দ্রের পশ্চিম দিকে জাপ-সৈন্য আবির্ভূত হয়; এই সংযোগ-কেন্দ্র হইতেই পশ্চিমে শিলচর যাইবার পথ। সংক্ষেপে, এই সময় ইম্ফল সমতলভূমির সহিত স্থলপথে বহির্জ্জগতের সংযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে।

বর্ত্তমানে ইম্ফলের নিকটবর্ত্তী বিভিন্ন পাহাড়, কোহিমা এবং বিষেণপুরের পশ্চিমাঞ্চল হইতে শত্রু-সৈন্যকে বিতাড়িত করিবার চেষ্টা চলিতেছে; সামরিক অবস্থা এখন ক্রমেই সম্মিলিত পক্ষের অনুকূল হইয়া উঠিতেছে।

মণিপুর অঞ্চলে জাপানের এই তৎপরতা তাহার ভারত অভিযানের প্রাথমিক পর্ব্ব নহে। ইহা তাহার প্রতিরোধমূলক তৎপরতারই অঙ্গ।

প্রথমতঃ এই অঞ্চলে তৎপর হইয়া জাপান উত্তর ব্রহ্মে যুদ্ধরত মার্কিণী ও চীনা সেনার সহিত ভারতবর্ষের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিতে চাহিয়াছিল; ডিমাপুর অধিকারে সমর্থ হইলে তাহার এই অভিসন্ধি সত্যই সিদ্ধ হইত। ইহার ফলে, বিমানযোগে সম্প্রতি যে ইঙ্গ-মার্কিণ বাহিনী উত্তর ব্রহ্মে প্রেরিত হইয়াছে, তাহারাও বিপন্ন হইয়া পড়িত। মণিপুর অঞ্চলে আক্রমণ প্রসারিত করিবার কল্পনা জাপান বহু পূর্ব্ব হইতেই স্থির করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। গত জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে আরাকান্ অঞ্চলে জাপানের প্রতি-আক্রমণ হয়ত বিভ্রান্তকারী তৎপরতা (diversionary move) মাত্র।

দ্বিতীয়তঃ, উত্তর ব্রহ্মে সম্মিলিতপক্ষের তৎপরতায় বাধা দানের আশু সামরিক উদ্দেশ্য ব্যতীত, জাপান তাহার প্রতিরোধমূলক যুদ্ধকে ব্রহ্ম সীমান্ত হইতে পূর্ব্ব ভারতে ঠেলিয়া আনিতে চাহিতেছে। ব্রহ্মদেশ রক্ষার কার্য্য সাফল্যের সহিত পরিচালনার জন্য ইহার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। জাপান জানে—বিমান-শক্তিতে সম্মিলিত পক্ষ প্রবল হইলেও জঙ্গলাকীর্ণ পার্ব্বত্য অঞ্চলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাপ সেনাদলের অগ্রগতিতে বাধা দান তাহাদের পক্ষে সম্ভব হইবে না। তাই, সে দুর্গম গিরিপথে সৈন্য প্রেরণ করিয়া সম্মিলিত পক্ষে অগ্রবর্ত্তী ঘাঁটী ও ঐ

অঞ্চলের সংযোগসূত্র বিপন্ন করিতে সাহসী হয়। জাপ সমরনায়করা বুঝেন—লক্ষ্যস্থলগুলি আয়ত্তে না আসিলেও এই তৎপরতার ফলে সম্মিলিত পক্ষের অভিযান-প্রচেষ্টায় বিঘ্ন অবশ্যম্ভাবী।

তৃতীয়তঃ, জাপ-কর্ত্তৃপক্ষ এই তৎপরতার দ্বারা ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার সুযোগ লইতে সচেষ্ট হইয়াছেন। রাজনৈতিক অবস্থার সুযোগ লইতে সচেষ্ট হইয়াছেন। তাঁহাদের ধারণা—ভারত ভূমিতে যুদ্ধ প্রসারিত হইলে সম্মিলিত পক্ষের পশ্চাদ্ভাগে (rear) বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি সম্ভব হইবে। পূর্ব্ব ভারতে দুই একটি ঘাঁটীতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলে তখন সম্মিলিত পক্ষের সামরিক শক্তিতে ভারতীয় জনসাধারণের সন্দেহ আসিবে। সেই সময় যদি প্রবল শ্বেতবিরোধী প্রচারকার্য্য চলে এবং জাপানের অনুগৃহীত ভারতীয় সৈন্য সম্মিলিত পক্ষে পশ্চাদ্ভাগে অন্তঃপ্রবেশ (infiltrate) করিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে সহজেই অভিযান-প্রচেষ্টায় বিঘ্ন সৃষ্টি সম্ভব হইবে। এই প্রসঙ্গের উল্লেখযোগ্য—কিছুকাল পূর্ব্বে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে স্বীকৃত হইয়াছিল যে, সুভাষচন্দ্রের সহায়তায় জাপান কতকগুলি ভারতীয় সৈন্যের আনুগত্য পরিবর্ত্তন করাইতে সমর্থ হইয়াছে। জাপ কর্ত্তৃপক্ষ হয়ত মনে করেন—রাজনৈতিক অচল অবস্থার জন্য ভারতে দারুণ অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছে; এই সময় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতির প্রচারকার্য্য এবং ভারতীয় সৈন্যের অন্তঃপ্রবেশ কেবল সম্মিলিত পক্ষের অভিযান-প্রচেষ্টায় বিঘ্নই সৃষ্টি করিবে না—হয়ত ভারতের পূর্ব্বাঞ্চলে রাজনৈতিক বিপ্লব সৃষ্টিও সম্ভব হইবে। সাম্প্রতিক দুর্ভিক্ষও জাপ-কর্ত্তৃপক্ষকে উৎসাহিত করিয়া থাকিবে; হয়ত তাঁহাদের ধারণা—এই দুর্ভিক্ষ সম্মিলিত পক্ষের সমর-প্রচেষ্টায় ভারতীয়দিগকে আরও সহানুভূতিহীন করিয়াছে, তাহাদের বৃটিশ-বিরোধী মনোভাব আরও বাড়িয়াছে।

জাপান বর্ষার পূর্ব্বে আক্রমণ করিয়া টিড্‌ডিম্ হইতে ইম্ফল এবং ইম্ফল হইতে ডিমাপুর পর্য্যন্ত রাস্তায় প্রতিষ্ঠিত হইতে সচেষ্ট হইয়াছিল। এই রাস্তাটি বর্ষার সময়েও ব্যবহারযোগ্য। জাপান যদি ইম্ফল ও ডিমাপুর অধিকার করিতে পারিত এবং এই রাস্তায় প্রতিষ্ঠিত হইতে সমর্থ হইত, তাহা হইলে বর্ষাকালে তাহাকে বিতাড়িত করা সম্ভব হইত না। টিড্‌ডিম-ইম্ফল-ডিমাপুর রাস্তা ধরিয়া সে নূতন সৈন্য ও রসদ আনিতে পারিত; সমগ্র পূর্ব্বআসাম বিপন্ন করিয়া তোলা তাহার পক্ষে সহজ হইত। অবশ্য, সেই অবস্থাতেও জাপানের ভারত অভিযান আরম্ভ হইয়াছে বলা সঙ্গত হইত না; কারণ পূর্ব্ব ভারতের দুর্গম স্থলপথে সমগ্র ভারতের উদ্দেশে অভিযান অসম্ভব। বস্তুতঃ জাপান নিজের অস্ত্রবলে ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তিকে ভারত হইতে বিতাড়িত করিতে প্রয়াসী নহে; সে আগাইয়া আসিয়া সম্মিলিত পক্ষের অভিযান-প্রচেষ্টায় বাধা দিতে চাহে, সামান্য সামরিক তৎপরতার সাহায্যে ভারতে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ঘটাইতে চাহে।

জাপান এই সময় সমুদ্রপথেও ভারতে আঘাত করিতে পারে বলিয়া আশঙ্কা করা হইয়াছিল। মধ্য প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানের বিশাল নৌঘাঁটী ত্রুকে জাপ-নৌবহরের সন্ধান না পাওয়ায় আমেরিকার নৌ-বিশেষজ্ঞগণ মনে করিতেছিলেন—সিঙ্গাপুরেই হয়ত জাপ-নৌবহর স্থানান্তরিত হইয়াছে; এখান হইতে জাপান সমুদ্রপথে ভারতের পূর্ব্ব উপকূলে ও সিংহলে আঘাত করিতে সচেষ্ট হইতে পারে। জাপানের এই সম্ভাবিত তৎপরতা নিবারণের উদ্দেশ্যে সম্মিলিত পক্ষ সম্প্রতি ভারত মহাসাগরে নৌবাহিনী সন্নিবেশ করিয়াছেন। এই নৌবাহিনী কয়েক দিন পূর্ব্বে সুমাত্রার সাবাং ঘাঁটীতে গোলা বর্ষণ করিয়া আসিয়াছে।

ভারত মহাসাগরে সম্মিলিত পক্ষের নৌবাহিনী সমাবেশে এবং দক্ষিণ এশিয়া কম্যাণ্ডের প্রধান কেন্দ্র দিল্লী হইতে সিংহলে অপসারণে জাপানের বিরুদ্ধে সম্মিলিত পক্ষের সেই বিঘোষিত উভচর (amphibious) তৎপরতা অতি সত্বর আরম্ভ হইবে বলিয়া মনে করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। বস্তুতঃ সম্মিলিত পক্ষের ধুরন্ধররা একাধিকবার বলিয়াছেন যে, ইয়ুরোপের যুদ্ধ শেষ হইবার পর জাপানের প্রতি অখণ্ড মনোযোগ দেওয়া হইবে। সেই নীতি এখনও অনুসৃত হইতেছে। এখনও অনির্দ্দিষ্টকাল পর্য্যন্ত—অর্থাৎ ইয়ুরোপের দ্বিতীয় রণাঙ্গন সম্মিলিত পক্ষের অনুকূলে বহুদূর অগ্রসর না হওয়া পর্য্যন্ত অভিযান-ঘাঁটী ভারতে ও সিংহলে তোড়জোড়ই চলিতে থাকিবে। সঙ্গে সঙ্গে ভারতের পূর্ব্ব সীমান্তে সামান্য সজ্ঘর্ষ চলিবে এবং সাবাং আক্রমণের ন্যায় মধ্যে মধ্যে অন্যান্য জাপ-ঘাঁটীতেও অতর্কিতে হানা দেওয়া হইবে।



দুইটী আমেরিকান সৈন্য ও একজন নাবিক মিত্রশক্তির পঞ্চমবাহিনীর সৈন্যগণের হইয়া জার্ম্মানীর বিপক্ষে যুদ্ধে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে। তাহাদের তুলিয়া লইবার জন্য জাহাজখানি তীরে ভিড়িতেছে

ইয়ুরোপীয় রণাঙ্গন

ইয়ুরোপীয় রণাঙ্গন স্থির নিস্তব্ধ; কেবল ইঙ্গ-মার্কিণ বিমানবাহিনীর নিক্ষিপ্ত বোমার বিস্ফোরণে এই নীরবতা মধ্যে মধ্যে ভঙ্গ হইতেছে। যে বিরাট সিংহের বিজয় গর্জ্জনে ইয়ুরোপের পূর্ব্ব গগন বিদীর্ণ হইতেছিল, সে যেন সাময়িকভাবে বিশ্রাম লইতেছে এবং শত্রুকে পরবর্ত্তী আঘাতের উপায় চিন্তা করিতেছে। ইটালীতে উভয়পক্ষ নিষ্ক্রিয় থাকিয়া প্রতিপক্ষকে আঘাতের সুযোগ খুঁজিতেছে। ওদিকে ইয়ুরোপের সামরিক গগনের বায়ু কোণে একখণ্ড কৃষ্ণ মেঘ যেন ক্রমেই ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে; ঝঞ্ঝা উত্থিত হইতে যেন আর বিলম্ব নাই।

রুশিয়া

রুশ রণাঙ্গনের উত্তরাঞ্চলে লেনিনগ্রাডের দক্ষিণ দিকে সমগ্র ক্ষেত্র শত্রুমুক্ত করিবার পর সোভিয়েট বাহিনী এখন এস্থোনিয়ার উত্তর-পূর্ব্ব কোণে নার্ভার এবং এস্থোনিয়া ও লাটভিয়ার সংযোগস্থলে স্কভের দ্বারদেশে উপস্থিত; এই অঞ্চলে গত কিছুকাল কোন তৎপরতা নাই। মধ্য অঞ্চলে মার্শাল ঝুকভের সেনাবাহিনী চেকোস্লোভাকিয়ার পূর্ব্ব সীমান্তে কার্পেথিয়ানসের পাদদেশে উপনীত হইয়াছে। এখানে কার্পেথিয়ানসের একটি শৃঙ্গে চেকোস্লাভদের জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হইয়াছে। মার্শাল ঝুকভের পরবর্ত্তী লক্ষ্য লাও। লাও-ক্রাকাও-ব্রেস্লা পথটি বার্লিনে পৌঁছিবার সংক্ষিপ্ততম পথ; এই পথে প্রাকৃতিক বিঘ্নও অল্প। দক্ষিণে মার্শাল কনিয়েভের সেনাবাহিনী রুমানিয়ায় প্রবেশ করিয়াছে; তাহারা বেসারেবিয়া প্রদেশ অতিক্রম করিবার পর ঐ প্রদেশের পশ্চিম সীমান্তবর্ত্তী প্রুথ্ নদীও যাসীর নীচে অতিক্রম করিয়াছে। ইহাদের লক্ষ্য রুমানিয়ার প্লোয়েস্তি তৈলকূপ। ইতিমধ্যে স্থলপথে বিচ্ছিন্ন-সংযোগ ক্রিমিয়ায় রুশ সেনার প্রবল আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছে। দুই দিক হইতে রুশ সেনা এখন সেবাস্তোপোলের উপকণ্ঠে পৌঁছিয়াছে।



আমেরিকান বোমারু জার্ম্মানীর উপর বোমা বর্ষণ করিতেছে

গত জুন মাসে কুরস্ক-ওরেল্ রণাঙ্গনে রুশ বাহিনীর প্রতি-আক্রমণ আরম্ভ হইবার পর এত দিন তাহারা অবিরাম শত্রুর প্রতি প্রচণ্ড আঘাত হানিয়াছে, কখনও উত্তর, কখনও মধ্য, কখনও দক্ষিণ অঞ্চলে তাহাদের আঘাত পতিত হইয়াছে। এতদিন পরে রুশ সেনা এখন যেন বিশ্রাম লইতেছে; একমাত্র সেবাস্তোপোল ব্যতীত অন্য সর্ব্বত্র তাহারা এখন একরূপ নিষ্ক্রিয়। ইতিমধ্যে ফন্ ম্যানষ্টাইন মধ্য রণাঙ্গনে—ষ্ট্যানিস্লাভের দক্ষিণপূর্ব্বে প্রতি আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছেন। মধ্য রণাঙ্গনে সোভিয়েট বাহিনী এখন যে স্থানে উপস্থিত হইয়াছে, উহাই সর্ব্বাপেক্ষা জার্ম্মানীর অদূরবর্ত্তী কাজেই, এই অঞ্চলে সোভিয়েট বাহিনীর প্রতি বিশেষভাবে অবহিত হওয়া সত্যই প্রয়োজন। এখানে ফন্ ম্যানষ্টাইনের সুবিধাও অনেক বেশী। তাঁহার সরবরাহ-সূত্র খুব সংক্ষেপ; পক্ষান্তরে সোভিয়েট বাহিনীর সরবরাহ সূত্র এখন অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। ফন্ ম্যানষ্টাইন্ চতুর্দ্দিক হইতে সংরক্ষিত সৈন্য আনয়ন করিয়া এই অঞ্চলে প্রবল প্রতিরোধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিয়েভ-স্মীতিতে যে প্রবল যুদ্ধ হইয়াছিল, এখন ষ্ট্যানিস্লাভকের দক্ষিণ-পূর্ব্বেও সেইরূপ যুদ্ধ আসন্ন। এই প্রতিরোধ যুদ্ধের উপরই বর্ত্তমান মহা সংগ্রামের এক বড় অধ্যায়ের ফলাফল নির্ভর করিতেছে।

ইটালী

ইটালীর রণাঙ্গন সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ। রোমের দক্ষিণে সম্মিলিত পক্ষ যে সৈন্যবাহিনী অবতরণ করাইয়াছিলেন, কোন প্রকারে তাহারা টিকিয়া আছে মাত্র; জার্ম্মানীর পুনঃপুনঃ প্রতি-আক্রমণে কোনরূপ সাফল্য লাভ তাহাদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। এই অঞ্চল হইতে ৫৭ মাইল দক্ষিণে ক্যাসিনো লক্ষ্য করিয়া ৫ম বাহিনী যুদ্ধ করিতেছিল। ক্যাসিনো এখন প্রায় ধূলিসাৎ হইয়াছে; কিন্তু উহা সম্পূর্ণরূপে ৫ম বাহিনীর অধিকারভুক্ত হয় নাই।

ইটালীর রণাঙ্গনে নিস্তব্ধতা বিরাজ করিলেও ইটালীর ঘাঁটীগুলি হইতে সম্মিলিত পক্ষের বিমানবাহিনী এখন জার্ম্মানী ও তাহার অধিকৃত অঞ্চলে আক্রমণ চালাইতেছে। এই বিমান আক্রমণের গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক। প্রথমতঃ আক্রমণরত রুশ সেনার পক্ষে এই তৎপরতা পরোক্ষে অত্যন্ত সহায়ক হইতেছে। দ্বিতীয়তঃ দক্ষিণ জার্ম্মানীতে, অষ্ট্রিয়ায় ও চেকোস্লাভাকায় জার্ম্মানীর গুরুত্বপূর্ণ সামরিক কারখানাগুলি এই সব আক্রমণে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে বিমান আক্রমণের আশঙ্কায় জার্ম্মানী ঐ অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ মধ্য ইয়োরোপে স্থানান্তরিত করিয়াছে। কাজেই, রূঢ় ও রাইনল্যাণ্ড বোমা বর্ষণের ফল সম্বন্ধে যে ধারণা করা হয়, তাহা হয়ত সময় সময় অতি-রঞ্জিত। সম্ভবতঃ ঐ অঞ্চলে বোমা বর্ষণ অপেক্ষা দক্ষিণ জার্ম্মানী, অষ্ট্রিয়া ও চেকোস্লোভাকিয়ায় বিমান আক্রমণের গুরুত্ব অধিক।

দ্বিতীয় রণাঙ্গন

এই বৎসর বসন্তকালে ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তি ইয়ুরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টি করিবেন বলিয়া বিশেষভাবে আশা করা হইতেছিল। এই দ্বিতীয় রণাঙ্গন সম্পর্কে সকল আয়োজন এখন শেষ হইয়াছে বলিয়া মনে করা হইতেছে; ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তির ব্যাপক সামরিক তৎপরতা নাকি আসন্ন। বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন, এই প্রত্যাশিত তৎপরতা কেবল পশ্চিম ইয়ুরোপেই নিবদ্ধ থাকিবে না—দক্ষিণ অঞ্চলেও উহা প্রসারিত হইবে। ইয়ুরোপের সকল দিকে এক সঙ্গে তৎপর হইবার উদ্দেশ্যেই এখন ইটালীতে সামরিক নিষ্ক্রিয়তা দেখা দিয়াছে, রুশ রণক্ষেত্রে সামরিক নিস্তব্ধতার পরোক্ষ কারণও হয়ত ইহাই।

ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তি যদি সত্বর দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টি করেন এবং তাঁহাদের এই তৎপরতা যদি সাফল্যের সহিত অগ্রসর হয়, তাহা হইলে এই বৎসরই ইয়ুরোপের যুদ্ধ শেষ হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তি যদি রাজনৈতিক কারণে এখনও দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টিতে ইতস্ততঃ করেন, তাহা হইলে উহার কুফল অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী হইবে। ফ্রান্সের ফ্যাসিস্ত-বিরোধী গণ শক্তি আজ তিন বৎসর মুক্তিকামনায় দিন গণিতেছে। ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তি ১৯৪২ সালে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টি করিবেন বলিয়া নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। ১৯৪২ গিয়াছে,

১৯৪৩ গিয়াছে, ১৯৪৪ সালেরও এক তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হইল। এইরূপ সুদীর্ঘ ও নিস্ফল প্রতীক্ষায় ফরাসী গণ-শক্তির দৃঢ়তা ক্রমে হ্রাস পাওয়া অসম্ভব নহে। ফ্যাসিস্ত-বিরোধী যুদ্ধে ফ্যাসিস্ত পদদলিত দেশগুলির গণ-শক্তির সহযোগিতা পরম সম্পদ। অবশ্য, এই জাগ্রত গণশক্তির স্কন্ধে পরে প্রাগযুদ্ধকালীন ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা চাপাইয়া দেওয়া দুষ্কর হইতে পারে; সর্ব্বপ্রকার শোষণ ও নিষ্পেষণের বিরোধিতা ফ্যাসিস্ত বিরোধী আন্দোলনের স্বাভাবিক পরিণতি। গণশক্তির অভ্যুত্থান এবং তাহার ফলে ভবিষ্যতে এই রাজনৈতিক জটিলতার আশঙ্কায় ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তি দ্বিতীয় রণাঙ্গণ সৃষ্টিতে এখনও বিলম্ব করিবেন কি না, কে জানে? ফরাসী মুক্তি পরিষদকে (French Liberation Committee) ফ্রান্সের ন্যায়-সঙ্গত গভর্ণমেণ্ট বলিয়া মানিয়া লইয়া ফরাসী গণশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিতে যে দ্বিধা ইঙ্গ-মার্কিণ শিবিরে লক্ষিত হয়, উহা ফ্যাসিজম্ তথা সর্ব্ব-প্রকার শোষণের বিরোধী গণশক্তির অভ্যুত্থানের আশঙ্কা হইতে উদ্ভূত কি না, তাহা বলা যায় না।

বাদোগ্লিও গভর্ণমেণ্ট ও রুশিয়া—

সম্প্রতি রুশিয়া বাদোগ্লিও গভর্ণমেণ্টের সহিত প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপন করে এবং সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ জানায় যে, ইটালীর ফ্যাসিস্ত বিরোধীদের সহযোগিতায় বাদোগ্লিও গভর্ণমেণ্টের প্রসার সাধনের ব্যবস্থা হউক। রুশিয়ার এই আচরণে সোভিয়েটের কোন কোন মিত্র বিস্মিত হইয়াছেন, আর তাহার শত্রুরা প্রবল অপপ্রচার করিয়াছে। প্রথমতঃ রুশিয়ার এই আচরণ ও প্রস্তাব মস্কো বা তেহরাণ সিদ্ধান্তের বিরোধী নহে। মস্কোর সিদ্ধান্তে বলা হইয়াছিল—"...the Italian Government should be made more democratic by the introduction of representatives of those section of the Italian people who have always opposed Fascism" তারপর ইটালীতে সম্মিলিত সামরিক শাসনব্যবস্থা (AMGOT—Allied Military Government of the Occupied Territories) তথাকার ফ্যাসিস্ত-বিরোধী শক্তিগুলির সংহতিতে বিশেষ বিঘ্ন ঘটাইতেছিল। এইরূপ অবস্থায় ইটালীতে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী দলগুলির সহযোগে একটি শক্তিশালী দেশীয় গভর্ণমেণ্ট গঠনই বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে। বাদোগ্লিওর অতীত ইতিহাস যতই কলঙ্ক-মলীন হউক না কেন, তাঁহাকে বাদ দিয়া জার্ম্মানীর কবলমুক্ত ইতালীতে সম্পূর্ণ নূতন শাসনব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবার সময় এখনও আসে নাই। তাই, সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট বৈদেশিক "আম্‌গটের" হাত হইতে ইটালীকে বাঁচাইয়া বাদোগ্লিও গভর্ণমেণ্টকে গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে প্রসারিত করিতে চাহেন। ফ্যাসিস্ত-বিরোধী যুদ্ধে ইটালীর গণশক্তির সহযোগিতা লাভের জন্য ইহা একটি সাময়িক মধ্যবর্ত্তী ব্যবস্থা। ইহা ফ্যাসিস্তদের সহিত আপোষ নহে।

সে যাহা হউক, সোভিয়েট রুশিয়ার বাসনা পূর্ণ হইয়াছে। সম্প্রতি বাদোগ্লিও গভর্ণমেণ্টের প্রসার সাধিত হইয়াছে। ইটালীর কম্যুনিষ্ট, উদারনৈতিক প্রভৃতি ফ্যাসিস্ত-বিরোধী দলগুলি হয় নূতন মন্ত্রিসভায় যোগ দিয়াছেন অথবা নূতন মন্ত্রিসভাকে সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। ১।৫।৪৪



আমেরিকান রেড-ক্রশ সোসাইটীর হেড্ কোয়াটার্সে প্রেসিডেণ্ট্ চার্লস্-ডি-গল্



ব্রিটেনের নূতন চীফ কমাণ্ডাণ্ট অপারেশান্ মেজর জেনারেল আর-ই-লে কক ডি-এস্-ও। এই যুদ্ধের বহু রণাঙ্গনের সম্মুখভাগে ইনি সৈন্য পরিচালনা করিয়াছেন

পরলোকে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের স্বত্বাধিকারী, মাসিক বসুমতী-সম্পাদক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় গত ২৬শে এপ্রিল বুধবার সকাল সাড়ে ৯টার সময় মাত্র ৫৩ বৎসর বয়সে সহসা পরলোকগমন করিয়াছেন। মাত্র দুই মাস পূর্ব্বে একমাত্র পুত্র রামচন্দ্রের অকাল বিয়োগে সতীশবাবু যে ব্যথা পাইয়াছিলেন,



পরলোকে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

সে শোক তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না। গত কয় বৎসর যাবৎ তাঁহার শরীর সুস্থ ছিল না বটে, কিন্তু সেই অসুস্থতা যে এত শীঘ্র তাঁহার দেহাবসানের কারণ ঘটিবে, তাহা কেহ কল্পনাও করিতে পারেন নাই। সতীশচন্দ্রের বৃদ্ধা মাতা, বিধবা পত্নী বিধবা পুত্রবধূ, একমাত্র শিশু পৌত্রী ও ৪ কন্যা বর্ত্তমান (একটি বিবাহিতা, তিনটি অবিবাহিতা), তাঁহাদের এই শোকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা নাই।

সতীশচন্দ্র অতি অল্প বয়সে পিতা ৺উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত 'বসুমতী'র কার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন এবং প্রায় চল্লিশ বৎসর কাল সেই বসুমতীর সেবা করিয়া তাহাকে সর্ব্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। ১৯১৪ সালে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাপ্তাহিক বসুমতীর সঙ্গে সঙ্গে দৈনিক বসুমতী প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়া সতীশবাবু তাঁহার ব্যবসায় ক্রমশঃ বিস্তৃত করার ব্যবস্থা করিলেন। পরে ক্রমে ক্রমে বসুমতী সাহিত্য মন্দির হইতে মাসিক বসুমতী, বার্ষিক বসুমতী, দৈনিক ইংরাজি বসুমতী প্রভৃতি প্রকাশেরও ব্যবস্থা হইয়াছিল। তিনি সুলভে ইংরাজি দৈনিক সংবাদপত্র বিক্রয়ের যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা ব্যবসায় হিসাবে সাফল্য মণ্ডিত না হওয়ায় তিনি ইংরাজি বসুমতীর প্রকাশ বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। এই সকল সাময়িক পত্র প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সতীশবাবু সুলভে বাঙ্গালা সাহিত্য প্রচারের যে বিরাট আয়োজন করেন, তাহা শুধু তাঁহাকে ও তাঁহার প্রতিষ্ঠানকে যশোমণ্ডিত করে নাই, তদ্বারা দেশে জ্ঞান-প্রচারের যে বিপুল ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহা গত ৩০ বৎসরের বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিলেই বুঝা যায়। তিনি শুধু মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, শরৎচন্দ্র প্রভৃতির গ্রন্থাবলী প্রকাশ করেন নাই, বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের শাস্ত্রপ্রচার বিভাগ খুলিয়া ধর্ম্মহীন দেশে ধর্ম্মালোচনার আন্দোলন প্রবাহিত করিয়াছিলেন। দেশের সকল অভাব অভিযোগের প্রতি সতীশচন্দ্রের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল; তাই তিনি দেশে ইংরাজি শিক্ষা প্রচারের জন্য রাজভাষা নামক যে পুস্তক প্রকাশ করেন, তাহা যে কত লক্ষ বিক্রীত হইয়াছে, তাহার স্থিরতা নাই। বাঙ্গালী জাতিকে শিল্প ও ব্যবসায়ের প্রতি আকৃষ্ট করিবার জন্য বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের 'হাজার জিনিষ' পুস্তক যে চেষ্টা করিয়াছে, তাহাও অসাধারণ বলিলে অত্যুক্তি

হয় না। এই পুস্তকও বাঙ্গালা দেশে বহু লক্ষ সংখ্যায় বিক্রীত হইয়াছিল।

১৯২০ সাল হইতে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে দেশে যে বিরাট রাজনীতিক আন্দোলন আরম্ভ হয় সতীশচন্দ্র তাঁহার দৈনিক বসুমতীকে সেই আন্দোলনের প্রচারে নিযুক্ত করেন এবং বাঙ্গালা দেশে অসহযোগ আন্দোলনের সাফল্যের মূল্যে দৈনিক বসুমতীর দান কিরূপ তাহার সাক্ষ্য ঐতিহাসিকগণই দিতে পারিবেন। বাঙ্গালা সংবাদপত্র যে আজ বাঙ্গালা দেশে ইংরাজি সংবাদপত্রের স্থান অধিকার করিয়া ইংরাজি শিক্ষিতের গৃহে ইংরাজি সংবাদপত্রের সহিত সমান আদর লাভ করিয়াছে, তাহার জন্য সতীশচন্দ্রের চেষ্টা প্রথম ও প্রধান। সতীশচন্দ্রই সর্ব্বপ্রথম লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে রোটারী মেশিন ক্রয় করিয়া তাহাতে দৈনিক বসুমতী মুদ্রণের ব্যবস্থা করেন এবং বাঙ্গালা দৈনিক সংবাদপত্রের মধ্যে বসুমতীই সর্ব্বপ্রথম ১৬ পৃষ্ঠা কাগজ মাত্র দুই পয়সা মূল্যে বিক্রীত হয়। বাঙ্গালা সংবাদপত্রের প্রভাতী সংস্করণ প্রকাশ করিয়া তাহাতে দেশী ও বিদেশী সংবাদ প্রকাশের ব্যবস্থা সতীশচন্দ্রই সর্ব্বপ্রথম প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন।

সতীশচন্দ্রের পিতা উপেন্দ্রনাথ পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের আশীর্ব্বাদ পাইয়া যে ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সতীশচন্দ্র তাঁহার অনন্যসাধারণ কর্ম্মশক্তি, অপূর্ব্ব প্রতিভা ও অদ্ভুত ব্যবসায়-বুদ্ধি দ্বারা সেই ব্যবসায়কে কিরূপ উন্নত করিয়াছিলেন, তাহা বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বসাধারণের নিকট সুপরিচিত। তিনি একদিকে যেমন নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন, তেমনই বর্ণাশ্রমী ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার গৃহে গৃহদেবতার নিত্য পূজার ব্যবস্থা ছিল এবং বার মাসে তের পার্ব্বণ করিয়া ব্রাহ্মণসজ্জনদিগকে ভোজনে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ দেখা যাইত। আহিরীটোলা পাড়ায় নূতন গৃহ নির্ম্মাণের সঙ্গে সঙ্গে তিনি তথায় দুর্গোৎসবের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং তাহা বৌবাজারের গৃহেও বহু বৎসর অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সে উৎসবে তিনি আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সকলকে নিমন্ত্রণ করিতেন। সরস্বতীর সেবা করিয়া তিনি ধনার্জ্জন করিতেন বলিয়া জাঁকজমকের সহিত তাঁহার গৃহে সরস্বতী পূজার ব্যবস্থা ছিল। গৃহস্থালীর লক্ষ্মীপূজা উৎসবেও তিনি বহু লোককে ভূরিভোজে তৃপ্ত করিতেন। তাহা ছাড়াও ইদানীং তিনি স্বগৃহে বহু উৎসবের আয়োজন করিয়া সকলকে আহ্বান করিতেন। বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীদিগকে মধ্যে মধ্যে তিনি স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করিতেন।

উপেন্দ্রনাথের সময় হইতে বেলুড় মঠের উৎসবে বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের দান সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন। তদ্দারা যেমন ব্যবসায়ের সুবিধা হইত, তেমনই লোক ও নানাভাবে উপকৃত হইত।

সতীশবাবু রাজনীতিক্ষেত্রের আন্দোলনে যোগদান না করিয়াও সেই আন্দোলনের প্রতি কিরূপ সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন এবং সেই আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য তাঁহার সংবাদপত্রসমূহের মারফতে সর্ব্বদা কিরূপ সচেষ্ট ছিলেন, তাহা তাঁহার সহকর্ম্মীদের ও দেশবাসীর অবিদিত ছিল না।

দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রচারে তাঁহার যে দান ছিল, তাহা শুধু ব্যবসায়-বুদ্ধি-প্রসূত ছিল না—এ বিষয়ে তাঁহার আন্তরিকতা লক্ষ্য করিলে মানুষ মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারিত না। তিনি শুধু অর্থার্জ্জনের জন্য বাঙ্গালা পুস্তকসমূহের সুলভ সংস্করণ প্রকাশ করিতেন না—দেশের জ্ঞান-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিয়া দেশকে উন্নতির পথে পরিচালিত করা তাঁহার একান্ত কাম্য ছিল। তাই তিনি শুধু গল্প বা উপন্যাস প্রচার না করিয়া সঙ্গে সঙ্গে বিবিধ প্রবন্ধ পুস্তকাদির সুলভ সংস্করণও প্রকাশ করিতেন। একদিকে যেমন তিনি রামকৃষ্ণ সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদিগের ত্যাগে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, অন্য দিকে তেমনই ব্রাহ্মণ্য ত্যাগের প্রতিও তাঁহার আকর্ষণ ও ভক্তি কম ছিল না। সেইজন্য সর্ব্বদা তাঁহার গৃহে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ পূজিত ও সমাদৃত হইতেন এবং শাস্ত্রপ্রচার ব্যাপারে শাস্ত্রব্যবসায়ীগণ তাঁহার দ্বারা সর্ব্বক্ষেত্রে উৎসাহ লাভ করিতেন। তাঁহার নিজের বাল্যজীবনে উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ হয় নাই বলিয়া তিনি নিজে যেমন অনেক সময়ই দুঃখ প্রকাশ করিতেন, তেমনই শিক্ষিতগণকে উপযুক্ত সম্মানদানে কখনও কার্পণ্য করিতেন না। তিনি নিজে আচারে ও ব্যবহারে সংস্কার বিরোধী থাকিয়াও পাশ্চাত্য শিক্ষার অনুরাগী ছিলেন এবং বিদেশে শিক্ষিতগণের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধার অভাব ছিল না। সদ্গুণ না থাকিলে মানুষ যে বড় হইতে পারে না এবং তাহার দ্বারা কোন প্রতিষ্ঠান উন্নত হইতে পারে না, তাহা সতীশচন্দ্রকে লক্ষ্য করিলেই বেশ বুঝা যাইত।

সতীশচন্দ্র সমগ্র বাঙ্গালা দেশে তাঁহার সাময়িক পত্রাদির ও প্রকাশিত গ্রন্থাদির মধ্য দিয়া সর্ব্বজনপরিচিত ছিলেন, তাই আজ তাঁহার এই অপ্রত্যাশিত মৃত্যুতে সমগ্র দেশবাসী দুঃখানুভব করিতেছেন। তাঁহার পরিচালিত এই বিরাট 'বসুমতী সাহিত্য মন্দির, যাহাতে সতীশচন্দ্র ও রামচন্দ্রের অভাবেও নিজ গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া দেশবাসীর সেবা দ্বারা সমৃদ্ধ থাকে, সকলেই ভগবৎচরণে আজ সেই প্রার্থনাই জানাইতেছে।

নামহারা শিল্পী

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

নমি সেই রসশিল্পিগণেরে
সৃষ্টির যারা চায় নি দাম,
মনের আবেগে সৃষ্টি করেছে
তাতে দেগে রেখে যায় নি নাম।
সৃষ্টি করার পরমানন্দে
জানিয়াছে তারা পুরস্কার,
সৃষ্টি করেছে রহি অজ্ঞাত
বহি অজ্ঞাতে দুঃখ ভার।

সর্ব্ব অঙ্গে নামাবলী ঘিরে
কত না সৃষ্টি লুপ্ত হায়,
নামহারা তবু তাদের সৃষ্টি
অমর হইয়া আছে ধরায়।
সৃষ্টি তাদের জীবন চরিত
সৃষ্টিরই মাঝে বিরাজে তারা,
নাম অনিত্য, যেই নামে ডাক,
দিবে তারা সেই নামেই সাড়া।

সাময়িকী

পরলোকে প্রফুল্লকুমার সরকার

গত ১৩ই এপ্রিল চৈত্র সংক্রান্তির দিন আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক, লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক প্রফুল্লকুমার সরকার মহাশয় ৬০ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা ব্যথিত হইলাম। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয় এবং ১৯০৫ সালে বি-এ পাশ করিয়া তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বঙ্কিম পদক' লাভ করিয়াছিলেন। নদীয়া জেলার কুষ্টিয়ার নিকট কুমারখালি গ্রামে তাঁহার পৈতৃক বাস ছিল। ১৯০৮ সালে বি-এল পাশ করিয়া তিনি কিছুদিন ফরিদপুরে ও কিছুদিন পালামৌ জেলার ডালটনগঞ্জে ওকালতি করিয়াছিলেন। কিন্তু সে ব্যবসা নিজ মনঃপূত না হওয়ায় ১৯১২ সাল হইতে তিনি উড়িষ্যায় ঢেনকানল রাজ্যে কার্য্য গ্রহণ করেন। শেষ কয়েক বৎসর তথায় দেওয়ানী



পরলোকে প্রফুল্লকুমার সরকার

করিয়া তিনি ১৯২১ সালে প্রিয়বন্ধু শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের আহ্বানে কলিকাতায় চলিয়া আসেন ও সংবাদ-সেত্র সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। কয়েক মাস মাত্র অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করার পর প্রফুল্লকুমার ১৯২২ সালের ১৩ই মার্চ্চ দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা প্রকাশ করেন।

বাল্যকাল হইতেই প্রফুল্লকুমার সাহিত্যানুরাগী ছিলেন, সংবাদপত্রের সংশ্রবে আসিয়া তাঁহার প্রতিভা স্ফুরণের স্থান পাইল। আনন্দবাজার পত্রিকা প্রকাশের পর কয়েক মাস প্রফুল্লকুমারের নাম সম্পাদক বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল; তাহার পর একটি রাজনীতিক মামলায় প্রফুল্লকুমার ধৃত হইলে তদবধি যদিও শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার সম্পাদক হইয়াছিলেন, প্রফুল্লকুমার চিরদিনই আনন্দ বাজারের প্রাণ-স্বরূপ ছিলেন। তাঁহাকে প্রত্যহ ১০।১২ ঘণ্টা কাল নিষ্ঠার সহিত নিরলসভাবে আনন্দবাজার পত্রিকা কার্য্যালয়ে কাজ করিতে দেখা যাইত। তৎপরে ১৯৪১ সালের জানুয়ারী মাসে সত্যেন্দ্রনাথ আনন্দবাজার পত্রিকার সংশ্রব ত্যাগ করায় তদবধি মৃত্যু দিন পর্য্যন্ত প্রফুল্লকুমার আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

সাংবাদিকের কাজ করিয়াই তিনি ক্ষান্ত থাকিতেন না। তিনি 'অনাগত', 'বালির বাঁধ' 'লোকারণ্য', 'ভ্রষ্টলগ্ন', 'বিদ্যুৎলেখা' প্রভৃতি অনেকগুলি উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন এবং 'শ্রীগৌরাঙ্গ' ও 'ক্ষয়িষ্ণু-হিন্দু' রচনা করিয়া বৈষ্ণব ও হিন্দু সমাজে আদৃত হইয়াছিলেন। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ইংরাজি আত্মজীবনী তিনি বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। 'রবীন্দ্রনাথ' সম্বন্ধেও তিনি একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

প্রফুল্লকুমার সরল, নিরহঙ্কার, সদাহাস্যময় ও বন্ধুবৎসল লোক ছিলেন। তিনি যে প্রকৃত বৈষ্ণব ছিলেন এবং মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের শিক্ষা তাঁহাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল, তাহা তাঁহার ব্যবহারে সর্ব্বদা প্রকাশ পাইত। তিনি সংবাদপত্রসেবী সংঘের একজন নিষ্ঠাবান কর্ম্মী ছিলেন এবং ১৯৪২ সালে সংঘের সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি কর্ম্মী ছিলেন এবং সংবাদপত্রসেবার সহিত দেশের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও রাজনীতির সকল আন্দোলনে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যোগদান করিতেন। অতি অল্পদিন রোগ ভোগের পর সহসা তাঁহার পরলোকগমনে দেশের ও সমাজের যে ক্ষতি হইল, তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নহে।

দক্ষিণেশ্বর জনসংঘ—

গত ২৩শে এপ্রিল রবিবার অপরাহ্নে দক্ষিণেশ্বর (২৪পরগণা) জনসংঘের বার্ষিক সাধারণ উৎসব ও পুরস্কার বিতরণ সভা হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয় এই উৎসবে পৌরহিত্য করেন এবং যুগান্তর সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় সভায় প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় কয়েকটি উৎসাহী তরুণের উদ্যোগে সংঘের অধীনে কয়েকটি নৈশ বিদ্যালয়ে বহু সংখ্যক বালকবালিকা বিনামূল্যে প্রাথমিক শিক্ষালাভ করিতেছে। তাহা ছাড়া সংঘের কর্ম্মীরা গত দুর্ভিক্ষের সময় বহু জিনিষ সংগ্রহ করিয়া তাহা স্থানীয় দুঃস্থগণের মধ্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। দক্ষিণেশ্বরের যুবকবৃন্দের এই চেষ্টা বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বত্র অনুকৃত হওয়া উচিত।

পরলোকে শশিশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়—

কলিকাতা হাইকোর্টের প্রবীণতম এটর্নী খ্যাতনামা শশিশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গত ১২ই এপ্রিল বুধবার ৭৭ বৎসর বয়সে তাঁহার কলিকাতা জেলিয়াটোলাস্থ ভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা ব্যথিত হইলাম। তাঁহার পিতা কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় হুগলী জেলার কোন্নগরের অধিবাসী ছিলেন এবং পূর্ত্ত বিভাগে প্রসিদ্ধ এঞ্জিনিয়ার ছিলেন। তিনি যখন পাঞ্জাব শিয়ালকোটে বাস করিতেছিলেন, তখন ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ৩রা মার্চ্চ তথায় শশিশেখর জন্মলাভ করেন। প্রবাসী বাঙ্গালীদের মধ্যে তৎকালে কেদারনাথের সুনাম ছিল। শিয়ালকোট হইতে হায়দ্রাবাদে বদলী হইয়া তথায় ছেলেদের শিক্ষার অসুবিধার জন্য কেদারনাথ নির্দ্দিষ্ট কাল চাকরী শেষ না করিয়াই অবসর গ্রহণ করেন এবং কলিকাতা সিমলায় আসিয়া বাস করেন। এখানে



পরলোকে শশিশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত মেট্রপলিটান ইনিষ্টিটিউসনে শশিশেখরের শিক্ষারম্ভ হয়। এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় তিনি বৃত্তিলাভ করেন এবং এফ-এ পরীক্ষায় একবিংশ স্থান অধিকার করেন। ইংরাজিতে অনার্স লইয়া শশিশেখর ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে বি-এ পাশ করেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে এটর্নী পরীক্ষা পাশ করিয়া তিনি কলিকাতায় ব্যবসা আরম্ভ করেন। সুদীর্ঘকাল এই ব্যবসায়ে থাকিয়া তিনি একদিকে প্রভূত অর্থ ও অপর দিকে যশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি নানাপ্রকার জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিতও চিরদিন সংযোগ রক্ষা করিয়া চলিতেন। কমলা হাইস্কুল, সিমলা সেবা সমিতি, অনঙ্গমোহন হরিসভা, রেনবো ক্লাব প্রভৃতির সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তিনি সাঁওতাল পরগণার জগদীশপুরে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তথায় অবসর যাপন করিতেন এবং কৃষি কার্য্যের প্রতি তাঁহার বিশেষ আকষণ ছিল।

শশিশেখর পরোপকারী, বন্ধুবৎসল ও সুরসিক লোক ছিলেন। তাঁহার মধুর ব্যবহারের জন্য সকল সমাজেই তিনি আদৃত হইতেন। তাঁহার ৪ পুত্র—(১) সুশীলকুমার, কর্পোরেশনের কর্ম্মচারী (২) সরলকুমার, কলিকাতা হাইকোর্টের এসিষ্ট্যান্ট রেজিষ্ট্রার (৩) শ্যামলকুমার ও (৪) সুনীলকুমার এবং ৬ কন্যা বর্ত্তমান। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

বোম্বাই ডকে বিস্ফোরণ—

বৎসরের প্রথম দিনে (১৪ই এপ্রিল) বোম্বাই ডক এলাকায় এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে। ইহার কারণ নির্ণয়ের জন্য সম্প্রতি একটী কমিটী গঠিত হইয়াছে। প্রকাশ, ডকে অবস্থিত একখানি জাহাজে আগুন লাগে, তাহাতে বিস্ফোরক বোঝাই ছিল; তাহাতে আগুন লাগায় পর পর দুইটী প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হয় এবং সমস্ত অঞ্চলে অগ্নি পরিব্যাপ্ত হয়। বোম্বাই ডক, তৎসন্নিহিত সমস্ত এলাকায় এমন কি দুই মাইল দূরে অবস্থিত অট্টালিকার কাচ প্রভৃতি ভাঙ্গিয়াছে; ঘটনার নিকটস্থ অট্টালিকা-সমূহ বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। প্রকাশ ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ডের ছাপ মারা আটাশ পাউণ্ড ওজনের এক স্বর্ণ "ইষ্টক" একটী অট্টালিকার চার তলার ছাদ ভেদ করিয়া তেতলার ঘরে পড়ে। সাড়ে তিন শতাধিক লোকের জীবনান্ত হইয়াছে, দুই সহস্রাধিক লোক আহত হয়। ক্ষতির পরিমাণ শতাধিক ক্রোড় মুদ্রা; কেহ কেহ মনে করেন তিন শতাধিক ক্রোড় হওয়াও অসম্ভব নয়। এরূপ দুর্ঘটনা অতীব বিরল। অথচ ইনসিওরেন্স কোম্পানীগুলি ক্ষতি পূরণ করিতে অস্বীকার করায় নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে। আর্থিক ক্ষতির হয়ত এক সময় পূরণ হইবে, কিন্তু যাহাদের জীবননাশ হইয়াছে বা যাহারা চিরতরে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের ক্ষতিপূরণ হওয়া সম্ভব নয়। আমরা তাহাদের প্রতি গভীর সহানুভূতি জানাইতেছি।

ব্যয় মঞ্জুর—

কেন্দ্রীয় পরিষদ কর্তৃক এবার ভাল ভাবেই বাজেট ছাঁটাই হইয়াছিল; বিশেষ করিয়া বড়লাট বাহাদুরের শাসন পরিষদের সমস্ত বরাদ্দ ছাঁটিয়া দিয়া মবলগে এক টাকা রাখিয়া দেওয়া হয়। বিশেষ ক্ষমতাবলে বড়লাট বাহাদুর প্রায় সমস্ত বাজেটই পুনর্ব্বহাল করিয়াছেন। এরূপ শক্তি যখন আছে, তখন বাজেট, রাষ্ট্রীয় পরিষদ, ব্যবস্থা পরিষদ প্রভৃতির প্রয়োজন নাই, কিন্তু ব্যয়-বাহুল্য আছে। কেন্দ্রীয় সরকার ৯৩ ধারা অনুসারে চলিলে ক্ষতি কি?

ট্রামে ধূমপান—

ট্রামে ধূমপান নিবারণের জন্য বহুদিন হইতে নানারূপ আন্দোলন চলিতেছে। সম্প্রতি দেখা গেল ট্রাম কোম্পানী প্রথম

শ্রেণীর যাত্রীদের সম্মুখভাগের পর পর চারিটী "সিটে" বসিয়া ধূমপান হইতে বিরত হইবার জন্ত বিশেষ অনুরোধ জানাইয়াছেন। কোন কোনও ভদ্রলোক হয়ত ইহা মানিয়া চলিতেছেন, কিন্তু এই অনুরোধের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন যে খুব অধিকসংখ্যক যাত্রী আছেন তাহা আমাদের মনে হয় না; প্রায় সমভাবেই ঐ সকল "সিট"-এ ধূমপান চলিতেছে। আমরাও অনুরোধ করি যেন যাত্রীরা ঐ নির্দ্দেশের মর্য্যাদা রক্ষা করেন; ইহা যাত্রীদের সুবিধার জন্ত, কোম্পানীর নহে। আমরা মনে করি ট্রামে ভ্রমণকালে ঐ সময়টুকু যাত্রীরা ধূমপান না করিলে সকলেরই সুবিধা হয়—এমন কি ধূমপায়ীর এক হইতে তিন বা ততোধিক (পান করার ক্ষেত্রে) সিগারেট অর্থাৎ তিন হইতে নয় বা ততোধিক পয়সা বাঁচিয়া যায়।

পরলোকে ধীরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—

প্রসিদ্ধ কংগ্রেসনেতা ধীরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় সম্প্রতি মাত্র ৪৯ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ছাত্রজীবনে রাজনীতিক আন্দোলনে যোগদান করেন ও বহুদিন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী ও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সদস্য ছিলেন। ১৯৩৫ সালে তিনি কংগ্রেস জাতীয় দলে যোগদান করিয়া বাঙ্গালায় উক্ত দলের সেক্রেটারী হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত চপলাকান্ত ভট্টাচার্য্যের সহযোগে তিনি কংগ্রেসের এক ইতিহাস প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি অবিবাহিত ছিলেন। গত দুর্ভিক্ষের সময় তিনি স্বগ্রাম ঢাকা ফুরসাইলে সাহায্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়া কাজ করিয়াছিলেন।


পরলোকে ধীরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

কর্পোরেশনে অল্ডারম্যান নির্ব্বাচন—

এবার কলিকাতা কর্পোরেশনের "অল্ডারম্যান" নির্ব্বাচনে কলিকাতার রাজনৈতিক দলগত অবস্থার যে লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা শুভ নহে। কাউন্সিলর নির্ব্বাচনে "কংগ্রেস" কোনও অংশ গ্রহণ করে নাই। কংগ্রেসের নামে যাঁহারা নির্ব্বাচন চালাইলেন তাঁহারা "হিন্দু মহাসভার" সহিত একযোগে কার্য্য করিলেন। অল্ডারম্যান নির্ব্বাচনে দেখা গেল, তাঁহারা মুশলিম লীগের সহিত মিতালী করিয়াছেন। আবার মেয়র ও তৎ-ডেপুটী মনোনয়নের সময় প্রকাশ পাইল ক্ষুদ্র হিন্দুমহাসভা ইউরোপীয়দের সহিত সজ্ঘবদ্ধ হইয়াছে। হিন্দু মহাসভাকে আশ্রয় করিয়া ইউরোপীয় দল এই প্রথম মেয়র বা ডেপুটী মেয়র নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইয়াছে। আরও প্রকাশ, কংগ্রেস নামধারী দলে আবার দুইদল হইয়া পড়িয়াছে, একদল মুশলিম লীগের মনোনীত প্রার্থী ও অপর দল ইউরোপীয় দল মনোনীত প্রার্থীকে মেয়র ও ডেপুটী মেয়র পদের জন্ত ভোট দিতে নির্দ্দেশ দিলেন। দেখা যাইতেছে দলগত প্রাধান্ত লাভের জন্ত কোনও বিশেষ মতবাদের মূল্য নাই।

দুর্ভিক্ষে মৃত্যুসংখ্যা—

গত দুর্ভিক্ষে মৃতের সংখ্যা লইয়া জল্পনা-কল্পনার অন্ত নাই। এ পক্ষে বাঙ্গালা সরকারের অবস্থা দেখিয়া দুঃখ হয়। যখন আমেরি সাহেব বলিয়াছিলেন যে এইরূপ মৃত্যুসংখ্যা হয়ত দশলক্ষ হইবে, তখন লোকে মনে করিয়াছিল চিরাচরিত প্রথামত আমেরি সাহেব ইহা সংশোধন করিয়া দিবেন। পরে বাঙ্গালা সরকার একেবারে সঠিক সংখ্যা দিলে সমস্ত হাওয়া ফিরিয়া গেল। তবে একটা কথা রহিল যে উহা চৌকিদারের গণনা। আমেরি সাহেব কমন্স সভায় ঐ সংখ্যাই উল্লেখ করিলেন। আবার বাঙ্গালা সরকার বলিলেন "কমন্স সভায় মিঃ আমেরি কর্ত্তৃক বা অন্তত্র সরকারীভাবে বাঙ্গালায় অনাহারে মৃতদের যে সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে, বাঙ্গালার গত দুর্ভিক্ষে অনাহারে মৃতদের তাহাই মোট সংখ্যা নহে।" তাহার পর আবার সুরাবর্দ্দি সাহেব বলিলেন, "বাঙ্গালা সরকার মনে করেন, যে সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে, তাহা সঠিক।" বাঙ্গালা সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে কি মনোমালিন্ত আছে?

মিঃ জিন্নার মনোভাব—

আমাদের পত্রিকায় সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্ব দোষদুষ্ট কোন আলোচনাই পছন্দ করা হয় না, সকল সম্প্রদায়ের স্বার্থ সমানভাবে যাহাতে রক্ষিত হয় সেজন্তই সাধারণতঃ আমরা চেষ্টা করিয়া থাকি। কিন্তু মিঃ জিন্না বর্ত্তমানে যে মনোভাব লইয়া সারা ভারতবর্ষে প্রচারকার্য্য চালাইতেছেন তাহার বিরুদ্ধে কিছু বলা আমরা সাংবাদিক কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেছি। মিঃ জিন্নার আধুনিক সমস্ত কার্য্যকলাপ হইতে এইটুকু অনায়াসে বলা চলে যে কংগ্রেস ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সহিত সংগ্রাম করিয়া স্বাধীনতা আদায় করিলে সেই স্বাধীনতা পাকিস্থানের নামে নিজহস্তগত করিবার নির্লজ্জ আকাঙ্ক্ষা মিঃ জিন্নার মধ্যে রহিয়াছে। বাঙ্গালার লীগ-মন্ত্রীমণ্ডলীর ইউরোপীয় স্বার্থ বজায় রাখিয়া আত্মরক্ষা করার দুর্নীতি মিঃ জিন্নার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিতেছে। মুসলমানপ্রধান পাঞ্জাবেও মিঃ জিন্না চাহিয়াছিলেন লীগ অনুগামী কোন নামকরণ করিয়া প্রাদেশিক শাসনাধিকার লীগের জন্ত স্থায়ীভাবে দখল করিতে। পাঞ্জাবে শাসন পরিষদের অমুসলমান সভ্যগণ ইহা অবশ্যই পছন্দ করিবেন না এমনি এক সন্দেহে প্রধান মন্ত্রী মালিক হায়াৎ খাঁ তিওয়ানা মিঃ জিন্নার এই ইচ্ছা পূর্ণ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। স্বর্গীয় সেকেন্দর হায়াৎ খানের পুত্র সর্দ্দার সৌকত হায়াৎ খাঁর পদচ্যুতিতে মিঃ জিন্নার জুলুমবাজী জনসাধারণের কাছে পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। একদা ভারত সরকার মিঃ জিন্নাকে হাতে রাখিবার বহু দুশ্চেষ্টা করিয়াছেন, ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লিনলিথগো বাংলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ ফজলুল হকের কাছে খাদ্য সমস্তার ব্যাপার জিন্নার উপর তাহার নির্ভরশীলতার কথা অকপটে স্বীকার করিয়াছিলেন; কিন্তু ভারতকে খণ্ড বিখণ্ড করিবার উন্মাদপ্রায় সংকল্প ভারত সরকারও শেষ পর্য্যন্ত সমর্থন করিতে পারেন নাই এবং পাঞ্জাবের মত সামরিক প্রয়োজনীয় দেশের অমুসলমান

অধিবাসীদের মনে ক্ষুব্ধতা সৃষ্টি করার দায়িত্বও তাঁহারা লইলেন না। মিঃ জিন্না একদিন বোম্বাই ইয়ুথ লীগে প্রভূত কর্ম-তৎপরতা দেখাইয়াছিলেন, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁহার দানও আমরা অস্বীকার করি না; বর্ত্তমানে শুধু সাম্প্রদায়িকতার ধূয়া ধরিয়া কর্ম্মহীন ভেদ সৃষ্টিতে তাঁহার প্রতিভার যে অপচয় তিনি করিতেছেন, তাহার জন্য শুধু তাঁহার নিজ সম্প্রদায় নয়, সমগ্র দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। ভারতের এই চরম দুঃখের দিনে মিঃ জিন্নার কর্ত্তব্য তাঁহার শক্তিশালী সমর্থনকারীদের সাহায্যে দেশের সত্যকার কল্যাণপ্রদ কিছু করা; গঠনমূলক কোন কাজ না করিয়া শুধু ভেদ সৃষ্টির নীতি তিনি এখন গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে কাহারও মঙ্গল হইবে না।

মিস্ মেয়োর ঘরের কথা—

ইংলণ্ডের সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে 'নিউ ইয়র্ক টাইমস্' পত্রিকায় প্রকাশ ১৯৪২ সালের ৯,০৪৬ জন ব্যক্তি সিফিলিস্ রোগে নূতন আক্রান্ত হইয়াছে। ইহারা কেহই সৈনিকের অন্তর্ভুক্ত নহে। ইহার সহিত উক্ত রোগে আক্রান্ত সৈনিকগণের সংখ্যা যদি সংযুক্ত করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে ১৯৪১ সালের তুলনায় শতকরা ২৯ জন এই রোগে বেশী আক্রান্ত হইয়াছে। অথচ ১৯৪১ সালে দেখা গিয়াছিল যে ১৯৪০ সালের অপেক্ষা শতকরা ৪০ জন অতিরিক্ত ব্যক্তি এই রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া ১৯৩৯ সালে হাজারে ৪২টী ও ১৯৪২ সালে হাজারে ৫৪টী জারজ সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এ সম্বন্ধে আমরা মিস্ মেয়োর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

বিলাতে বৈজ্ঞানিকগণ নিমন্ত্রিত—

বিলাতের গভর্ণমেণ্ট সম্প্রতি যে ৭জন বৈজ্ঞানিককে বিলাত ভ্রমণের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে তিনজন বাঙ্গালী—(১) ডক্টর শিশিরকুমার মিত্র (২) সার জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ও (৩) ডক্টর মেঘনাদ সাহা। তাঁহারা বিলাতে বাঙ্গালীর সম্মান বৃদ্ধি করুন, আমরা ইহাই প্রার্থনা করি।

পরলোকে ডাঃ বিজয় রাঘবাচারিয়া—

গত ১৯শে এপ্রিল সুপ্রসিদ্ধ কংগ্রেস নেতা ডক্টর সি-বিজয় রাঘবাচারিয়া ৯২ বৎসর বয়সে মাদ্রাজ সালেমে স্বগৃহে পরলোক-গমন করিয়াছেন। উকীল হইয়া তিনি সালেমের জেলা আদালতে আইন ব্যবসা করিতেন। ১৮৯৫ হইতে ১৯০১ সাল পর্য্যন্ত তিনি মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভার ও ১৯১৩ হইতে ১৯১৬ পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। ১৯২০ সালে নাগপুরে কংগ্রেসের তিনি সভাপতি হইয়াছিলেন ও পরে হিন্দু মহাসভা আন্দোলনে যোগদান করিয়া একবার হিন্দু মহাসভার বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। আজীবন তিনি দেশ-সেবা করিয়া গিয়াছেন।

মিউনিসিপাল কনফারেন্সে প্রস্তাব—

গত ১৩ই ও ১৪ই এপ্রিল গাইবান্ধায় নিখিল বঙ্গ মিউনিসি-পাল কনফারেন্সে কয়েকটি প্রয়োজনীয় প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। একটিতে বলা হইয়াছে, দেশের রাজনীতিক নেতৃবৃন্দকে মুক্তিদান করা না হইলে দেশের অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হইবে না। মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতির মত দেশমান্য নেতারা যতদিন কারারুদ্ধ থাকিবেন, ততদিন কেহই দেশের জনসাধারণকে সুপথে পরিচালিত করিতে পারিবেন না। আর একটি প্রস্তাবে—বর্ত্তমান মন্ত্রীগণ কর্ত্তৃক স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠানসমূহের বিশিষ্ট পদগুলি দখল করিয়া থাকার বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করা হইয়াছে। স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠানে যদি সরকারী সদস্যদের গুরুত্ব বাড়াইয়া দেওয়া হয়, তবে ঐ প্রতিষ্ঠান রাখার কোন যৌক্তিকতা দেখা যায় না।

বোম্বায়ের নূতন মেয়র—

বোম্বায়ের প্রসিদ্ধ কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত নগিন দাস মাষ্টার এবার অধিক ভোট পাইয়া ১৯৪৪-৪৫ সালের জন্য বোম্বাই মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের মেয়র নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ১৯৩১ সাল হইতে তিনি বোম্বাই কর্পোরেশনের সদস্য আছেন। ১৯৪২ সালের ৮ই আগষ্ট তিনি গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন—মেয়র নির্ব্বাচিত হওয়ার পর তাঁহাকে মুক্তি প্রদান করা হইয়াছে।

বাঙ্গালীর সম্মান লাভ—

ই-আই-রেলের চিফ অপারেটিং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘোষ ই-আই-রেলের জেনারেল ম্যানেজার



রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘোষ

পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। নিবারণবাবুর পূর্ব্বে আর কোন বাঙ্গালী এই পদলাভ করেন নাই। নিবারণবাবু জনপ্রিয় লোক, তাঁহার এই নিয়োগে বাঙ্গালী মাত্রই গৌরব বোধ করিবেন।

কংগ্রেস আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠান—

গত ১৭ই এপ্রিল হায়দ্রাবাদে জমিয়ৎ-উল-উলেমা সম্মেলনে মৌলানা ওবেদুল্লা সিন্ধি বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন—'যে সকল ভারতীয় মুসলমান ইংরাজী শিক্ষা করিয়া পরিষদে প্রবেশ করিয়াছেন তাঁহারা রাজনীতি বুঝেন না। এ বিষয়ে শিক্ষালাভের জন্য

তাঁহাদিগকে রাজনীতির পাঠশালায় প্রথম পংক্তিতে আসন গ্রহণ করিতে হইবে। আমি কংগ্রেসকে শুধু জাতীয় কংগ্রেস বলি না; আমি উহ'কে আন্তর্জ্জাতিক কংগ্রেস বলিয়া বিবেচনা করি। ভারতে দুইটী রাজনৈতিক দল আছে। একটী হইতেছে বৃহত্তম দল হিসাবে বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট ও অপরটী কংগ্রেস। ইহার পরে অন্য কোন দল নাই।' মৌলানা সাহেবের বক্তৃতায় লীগ-পন্থীরা সরাসরি বাদ পড়িয়াছেন। মৌলানা সাহেব সেই দলকেই জাতীয় দল বলিয়াছেন—যাঁহারা সম্প্রদায়গত স্বার্থের বহু উর্দ্ধে জাতিগত স্বার্থের জন্য প্রাণপণ করিতেছেন। এই বক্তৃতার বিপক্ষে জিন্নাসাহেবের দল কি যুক্তি দেখাইবেন তাহা যদিও আমরা সঠিক বলিতে পারি না, তথাপি সন্তুষ্ট যে হইতে পারিবেন না তাহা আমরা অনায়াসেই অনুমান করিতে পারি।

বৃটেনে 'ভারতকে স্বাধীন কর' আন্দোলন—

গত ১৬ই এপ্রিল লণ্ডনের ক্যাক্সটন্ হলে 'ভারতকে এখনই স্বাধীন কর' আন্দোলনের উদ্যোগে অধ্যাপক নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর সভাপতিত্বে এক জনসভা হয়। উক্ত সভায় মিঃ একবাল সিং, কমন্‌ওয়েলথ্ দলের নেতা স্যার রিচার্ড অক্‌ল্যাণ্ড, মিঃ ফেনার ব্রকওয়ে প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বক্তৃতা করেন। লাইফ পত্রিকার সুরেশ বৈদ্যের প্রতি ৯৮ দিন সশ্রম কারাদণ্ড ভোগের আদেশ দেওয়ায় তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান হয় এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী গৃহীত হয়।

"বর্ত্তমান সঙ্কটজনক পরিস্থিতি হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য এই সভায় সমবেত ভারতীয় এবং ভারতের প্রতি সহানুভূতিশীল বৃটনগণ ভারতে পূর্ণ স্বাধীনতার ভিত্তিতে লোকায়ত্ত গভর্ণমেণ্ট গঠনের জন্য বিনাসর্ত্তে সকল প্রকার রাজবন্দীদিগের অবিলম্বে মুক্তির দাবী জানাইতেছেন।"

মিঃ ব্রকওয়ে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন—'ভারত বৃটীশ রাজনীতি পরিচালনার একটী চরম পরাজয়ের উদাহরণ।' মিঃ ব্রকওয়ে উদাহরণ দেখাইলেও 'কালা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী' এ প্রবাদ-বাক্যের পরিবর্ত্তন সম্ভব হইবে কি?

চাউলের মূল্য—

বাঙ্গালা দেশে গত বৎসর প্রচুর ধান উৎপন্ন হইয়াছে। ঢাকা, ফরিদপুর প্রভৃতি কয়টি জেলায় যেমন প্রয়োজনমত ধান হয় নাই, তেমনই বর্দ্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, যশোহর, খুলনা, মৈমনসিংহ, বাখরগঞ্জ, রাজসাহী, দিনাজপুর, মালদহ, বগুড়া প্রভৃতি জেলাগুলিতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধান হইয়াছে। তাহা ছাড়া কলিকাতা ও সহরতলীতে যে রেশনিং ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য ভারত গভর্ণমেণ্ট বাহিরের প্রদেশগুলি হইতে আনিয়া দিতেছেন। বাঙ্গালার বাহির হইতে যে গম, আটা, ময়দা প্রভৃতি আসিতেছে, তাহা বাঙ্গালার মফঃস্বলের জেলাগুলিতে প্রচুর পরিমাণে পাঠান হইতেছে। এই সকল কারণে এবার চাউলের মূল্য আরও কমিয়া যাওয়া উচিত ছিল। সে জন্য সম্প্রতি বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট চাউলের মূল্য ১৪৸০ স্থির করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু কোথাও সে মূল্যে চাউল পাওয়া যায় না। অধিকন্তু অধিকাংশ স্থানে চাউলের মণ ২০৲ টাকার কম নহে। কেন এরূপ অব্যবস্থা চলিতেছে, সে সম্বন্ধে তদন্ত হওয়া উচিত ও যাহাতে বাঙ্গালার সর্ব্বত্র নিয়্নতম মূল্যে চাউল সরবরাহের ব্যবস্থা হয়, তাহা করা উচিত। চাউলের মূল্য বৃদ্ধির জন্য বাঙ্গালার লোকদিগকে কিরূপ অসুবিধা ও কষ্ট এখন পর্য্যন্ত ভোগ করিতে হইতেছে, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অপরে জানেন না। এই কষ্ট দীর্ঘস্থায়ী হইলে আরও বহু লোক মারা যাইতে পারে। এ বিষয়ে পূর্ব্ব হইতেই কর্তৃপক্ষের সাবধানতা অবলম্বন করিয়া চলা উচিত।

পরলোকে মিঃ উইলিয়ম পি ক্রোজিয়ার—

'ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান' পত্রিকার সম্পাদক মিঃ উইলিয়ম পি ক্রোজিয়ার গত ১৬ই এপ্রিল রবিবার পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ৬৪ বৎসর বয়স হইয়াছিল। মিঃ ক্রোজিয়ার ভারতবর্ষ সম্পর্কে ব্রিটীশনীতির একজন নিরপেক্ষ সমালোচক ছিলেন। বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভের প্রথমাবস্থায় কংগ্রেস যখন স্বায়ত্তশাসন দাবী করে সেই সময় হইতে ব্রিটীশের মনোভাবের তিনি তীব্র সমালোচনা করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহার সম্পাদিত পত্রে ভারত সম্পর্কে প্রায়ই সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত। তাঁহার মৃত্যুতে একজন নির্ভীক উদারচেতা ও নিরপেক্ষ সাংবাদিকের তিরোধান ঘটিল।

সিউড়ীতে সাংবাদিক সম্মানিত—

গত ১১ই এপ্রিল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সিউড়ীস্থ রামরঞ্জন টাউন-হলে 'বীরভূম বার্ত্তা'র সম্পাদক স্বর্গত দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের এক তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা উৎসব হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ঐ উৎসবে সভাপতিত্ব করেন এবং বীরভূমের বর্ত্তমান জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তৈলচিত্রের আবরণ উন্মোচন করেন। দেবেন্দ্রবাবু 'বীরভূম বার্ত্তা' প্রতিষ্ঠা করিয়া ৪০ বৎসরকাল উহার সম্পাদক ছিলেন। উৎসবে সহরের বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, বীরভূমবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন এই উৎসবের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন।

চাষের জন্য পশুর অভাব—

হাল দিবার গরু মহিষের অভাবে বাঙ্গালা দেশের বহু স্থানে চাষ আবাদ বন্ধ হইয়া যাইতেছে বলিয়া প্রত্যহ মফঃস্বল হইতে খবর আসিতেছে। গত দুর্ভিক্ষের সময় বহু পশু মারা গিয়াছে, যাহা অবশিষ্ট ছিল, বেশী দাম পাইয়া কৃষকগণ সেগুলিকেও বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছেন। অনেকগুলি ভারতস্থ সৈনিকগণের খাদ্য হিসাবে হয় ত ব্যবহৃত হইয়াছে। এখন বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট মফঃস্বলের কৃষকগণকে চাষের পশু কিনিবার জন্য ৫০ লক্ষ টাকা ধার দিবেন। ৩৭ লক্ষ টাকা ইতিমধ্যে মফঃস্বলে প্রেরিত হইয়াছে ও বাকী টাকা প্রয়োজন মত পাঠান হইবে। কিন্তু কৃষকরা পশু পাইবে কোথায়? বাঙ্গালা দেশে টাকা দিয়াও পশু পাওয়া যায় না।

মহাত্মাজির মুক্তিলাভ—

মহাত্মা গান্ধী জেলে কিছুদিন হইতে ম্যালেরিয়া রোগে ভুগিতে ছিলেন, এই অজুহাতে গত ৬ই মে শনিবার সকাল ৮টার সময় মহাত্মাজীকে মুক্তি দান করা হইয়াছে। মহাত্মাজী জেল হইতে মুক্তি লাভের পর হইতে ক্রমশঃ সুস্থ হইতেছেন। তাঁহার সহিত ১৫ দিন সকলকে সাক্ষাৎ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। বিলাতের সংবাদে প্রকাশ, ভারত সচিব এ বিষয়ে ভারতের বড়লাটকে সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করিয়াছিলেন এবং বড়লাট লর্ড ওয়াভেল জেলে গান্ধীজির পীড়াবৃদ্ধির সংবাদ পাইয়াই তাঁহার কারামুক্তির আদেশ দেন। আমরা আশাবাদী, এই দুর্দ্দিনেও সে জন্য আমরা আশা



মহাত্মা গান্ধী

করিতেছি যে এ সময়ে গভর্ণমেণ্টের মনোভাবের পরিবর্ত্তন হইবে এবং তাঁহারা দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে একে একে মুক্তি দান করিয়া তাঁহাদের সহিত ভারতবাসী জনগণের সহযোগের পথ প্রশস্ত করিয়া দিবেন। মহাত্মাজী মুক্ত অবস্থায় কিছুদিন বোম্বায়ে সমুদ্রতীরে বাস করিবেন—চিকিৎসকগণ সেইরূপ নির্দ্দেশ দিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস, তিনি শীঘ্রই হৃতস্বাস্থ্য পুনরায় লাভ করিয়া আমাদিগকে মুক্তির পথে পরিচালিত করিতে সমর্থ হইবে।

কলিকাতা সহরের আবর্জ্জনা দূর—

নানাকারণে গত কয় মাস হইতে কলিকাতার পথঘাট হইতে জঞ্জাল ও ময়লা পরিষ্কার করার ব্যবস্থার ত্রুটি দেখা যাইতেছে। শ্রমিকগণ কর্ত্তৃক অন্যত্র কার্য্য গ্রহণের ফলে সহরে যে শ্রমিক সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে, তাহাই ময়লা দূর না হওয়ার প্রথম ও প্রধান কারণ; সম্প্রতি এ বিষয়ে বাঙ্গালার গভর্ণর মিষ্টার কেসির মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে দেখিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি। গভর্ণর নিজে গত ৭ই মে রবিবার সকালে কলিকাতার নূতন মেয়র শ্রীযুক্ত আনন্দীলাল পোদ্দারকে সঙ্গে লইয়া সারা সহর ঘুরিয়া দেখিয়াছেন। যে সকল স্থানে আবর্জ্জনা স্তূপ দেখা গিয়াছে, সেই সকল স্থানে তাঁহারা ঐ বিষয়ে প্রয়োজনীয় তদন্তও করিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস, তাঁহাদের উভয়ের সমবেত চেষ্টার ফলে কলিকাতাবাসী 'অধিকতর পরিস্কৃত সহরে' বাস করিতে পারিবে ও তাহার ফলে সহর হইতে সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ কমিয়া যাইবে।

বঙ্কিমচন্দ্র স্মৃতিতর্পণ—

গত ৯ই এপ্রিল রবিবার অপরাহ্নে নৈহাটী সাহিত্য-পরিষদের উদ্যোগে বঙ্কিমভবনে (কাঁঠালপাড়া) খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিতর্পণ হয়। সুসাহিত্যিক ও নাট্যকার শ্রীযুক্ত মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সভার উদ্বোধন করেন। ডঃ নলিনাক্ষ সান্যাল এম-এস-এ, পণ্ডিত শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ, শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ পাল, শ্রীযুক্ত অতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ন, শ্রীযুক্ত সুধাংশুকুমার রায়চৌধুরী প্রভৃতি সাহিত্যিকগণ সভায় বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। নৈহাটী, কাঁচড়াপাড়া, হুগলী, চুঁচড়া, ভাটপাড়া, হালিসহর হইতে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন।

১৯৪৪-৪৫ সালের ব্রিটিশ বাজেট—

বাংলার ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর স্যার জন এণ্ডারসন চ্যান্সেলার অফ এক্সচেকার রূপে ব্রিটেনের ১৯৪৪-৪৫ সালের নূতন বাজেট প্রস্তুত করিয়াছেন। ব্রিটেনের মারাত্মক যুদ্ধব্যয় দেশের আর্থিক বনিয়াদকে যেভাবে আহত করিতেছে তাহাতে বাজেটে বিশৃঙ্খলা ঘটাই স্বাভাবিক ছিল; কিন্তু স্যার এণ্ডারসনের সুসংবদ্ধ কার্য্য-নীতির ফলে ব্রিটেনের এবৎসরের বাজেট সর্ব্বসাধারণের কাছে সমানভাবে আদরণীয় হইয়াছে। এবার ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলা হইবে, তাহার উপর আবার পূর্ব্ব এশিয়ায় জাপানের সহিত আক্রমণাত্মক সংগ্রাম তীব্র হইয়া উঠিতেছে, এ অবস্থায় যুদ্ধোপলক্ষে ব্যয়বাহুল্য বর্জ্জন করা চ্যান্সেলারের সাধ্যাতীত। তবু তিনি দেশের কৃষি, শিল্প প্রভৃতির উন্নতির জন্য সরকারের পক্ষ হইতে বাজেটে যথেষ্ট প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। এবারকার আনুমানিক ঘাটতি ২৮৩ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া পূরণ করা হইবে, ইহার জন্য ইংলণ্ডবাসীর উপর নূতন কোন ট্যাক্স বসাইবার প্রস্তাব বাজেটে করা হয় নাই। বরং অতিরিক্ত মুনাফা কর দিবার নিম্নতম আয়ের পরিমাণ পূর্ব্বাপেক্ষা ১০০০ পাউণ্ড বাড়াইয়া দেওয়ায় ৩০ হাজার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর যে উপকার হইল, দেশের দরিদ্র অধিবাসীবৃন্দের প্রতি গভর্ণমেণ্টের সহানুভূতির তাহা একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। নূতন শিল্প বাঁচাইবার এবং ঋণ প্রভৃতি নানাবিধ সাহায্য দ্বারা কৃষকদের যুদ্ধকালীন বর্দ্ধিত আয় যুদ্ধের পরেও রক্ষা করিবার যে সরকারী আগ্রহ বাজেটে প্রকাশ পাইয়াছে, ভারতসরকারের বাজেটে তাহার একাংশ খুঁজিয়া পাইলে আমরা ধন্য হইয়া যাইতাম। ভারতসরকারও প্রতি বৎসর বাজেট প্রস্তুত করেন, কিন্তু সর্ব্বসাধারণের স্বার্থের প্রতি নির্লজ্জ ঔদাসীন্য তাহাদের বাজেটে সর্ব্বদাই ফুটিয়া উঠে। এবারের ইংলণ্ডের বাজেটের অনুকরণে ভারতসরকার যাহাতে ভারতীয় কৃষি ও শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণের প্রতি একটু মনোযোগী হন এবং নিত্য নূতন করভার

হইতে ভারতবাসীদের রেহাই দেন, তাহার জন্য তাঁহাদিগকে আমরা একান্ত অনুরোধ জানাইতেছি।

শাসনতান্ত্রিক সঙ্কট—

১৯৩৪ সালের অক্টোবর মাসে ভারতের ৮টি প্রদেশের কংগ্রেস দলের মন্ত্রিসভার সদস্যগণ পদত্যাগ করায় গভর্ণরগণ নূতন মন্ত্রিসভা গঠনে অসমর্থ হইয়া নিজেদের হাতে শাসনভার গ্রহণ করেন। তাহার পর বহু চেষ্টা করিয়া তিনটি প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠন করা হইলেও বাকী ৫টি প্রদেশে ৫ বৎসর ধরিয়া স্বৈরশাসন চাপিয়া আসিতেছে। ভারত সচিব মধ্যে মধ্যে ভারতের শাসনতান্ত্রিক সঙ্কট দূর করার জন্য অনেক বড় বড় কথা বলিয়া থাকেন। কিন্তু এই অচল অবস্থা দূর করিবার জন্য কোন ব্যবস্থাই এ পর্য্যন্ত অবলম্বিত হয় নাই। যতদিন এই অবস্থা থাকিবে ততদিন শুধু বড় বড় কথায় কোন ফল হইবে বলিয়া মনে হয় না।



কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনিযুক্ত ভাইস্‌চ্যান্সেলর শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ পাল (ইঁহার নিয়োগ সংবাদ আমরা গত মাসে প্রকাশ করিয়াছি)

ব্যাঙ্ক অফ্‌ ইংলণ্ডের মুনাফাবৃত্তি—

দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রীয় পরিষদে জাতীয়তাবাদী দলের পক্ষ হইতে ব্যাঙ্ক অফ্‌ ইংলণ্ডের নামে যে অভিযোগ করা হইয়াছে, তাহাতে স্বার্থ সম্বন্ধ না থাকিলেও সমগ্র সভ্য জগতের মানবতা-সুলভ প্রতিবাদ ঘোষিত হওয়া স্বাভাবিক। পুরাতন চুক্তি অনুযায়ী ব্যাঙ্ক অফ্‌ ইংলণ্ড বীমা ও বহনী খরচ সমেত দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ১৭১ শিলিং দরে বিশুদ্ধ স্বর্ণ কিনিতেছে এবং সেই স্বর্ণ আমেরিকায় ১৭৪ শিলিং দরে ও ভারতবর্ষে ৩২০ শিলিং দরে বিক্রয় করিতেছে। প্রচার কার্য্যের সুবিধার জন্য ভারত সরকারের দিক হইতে বর্ত্তমানে ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের যত ছবিই আঁকিবার চেষ্টা হউক, ভারতীয় স্বার্থের প্রতি আপেক্ষিক সরকারী ঔদাসীন্য এই স্বর্ণ বিক্রয়ের ব্যাপারে পরিস্ফুট হইয়া গিয়াছে। ভারতবাসীর স্কন্ধ যখন নূতন নূতন করভারের চাপে অবনত, তখন এদেশের গভর্ণমেণ্ট কি বিবেচনায় বিদেশী প্রতিষ্ঠানকে বিনা প্রতিবাদে এমন মারাত্মকভাবে শোষণ করিতে দিতেছেন, তাহা অতীত ইতিহাস জানা না থাকিলে পরিষ্কার বুঝা যায় না। বাংলা সরকার ইউরোপীয় চা বাগানের মালিক-দিগকে কৃষি আয়কর হইতে রেহাই দিতেছেন, ভারত সরকার ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ডকে এক আউন্স সোনায় ৭ পাউণ্ড ৯ শিলিং লাভ করিবার অনুমতি দিতেছেন, ক্যানাডা হইতে গম আনিবার জাহাজ পাওয়া না গেলেও আমদানীর মধ্যে 'জনি-ওয়াকার' শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতেছে, ইহার পরও কি ভারতের যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন লইয়া মাথা ঘামাইয়া মাথা ব্যথা করায় আমাদের সত্যকার কোন লাভ হইবে ?

নূতন ঋণ-ইজারা চুক্তি—

নিউ ইয়র্ক টাইমস্ আমেরিকা ও ব্রিটেনের মধ্যে একটি নূতন ঋণ ও ইজারা চুক্তির কথা প্রকাশ করিয়াছেন। এই চুক্তি অনুসারে সামান্য ক্ষতিপূরণ দিয়া ব্রিটেন যুদ্ধের পরে আমেরিকাকে প্রাপ্ত জিনিষগুলিই ফিরাইয়া দিতে পারিবে। এদিকে ভারতবর্ষে আমেরিকা ঋণ ও ইজারা চুক্তি অনুসারে যে সব বস্তু পাঠাইতেছে, সেগুলি ভারতবর্ষে প্রস্তুত হয় না, কোন কালে হইবে বলিয়া আমরা আশাও দেখি না। অগ্নিমূল্যে এই সব জিনিষ ভারতকে কিনিতে হইতেছে, অথচ আমেরিকা এই দুঃসময়েও ভারত হইতে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে বহু কাঁচা মাল লইয়া যাইতেছে। যুদ্ধের পরে পণ্য-মূল্য যখন আরও নামিয়া যাইবে, তখন আমাদের পক্ষে এই সব যুদ্ধান্তের মূল্য পণ্য দিয়া শোধ করা কি উপায়ে সম্ভব, তাহা আমরা ভাবিয়াও পাই না। ইংলণ্ডের মত শিল্পপ্রধান দেশ শিল্পজাত পণ্যাদির বিনিময়ে হয় তো আমেরিকার দেনা শোধ করিয়া দিতে সমর্থ হইবে, কিন্তু সেদিন পরিকল্পনা অনুযায়ী যদিই বা কিছু শিল্পপ্রসারের ব্যবস্থা এদেশে হয়, আটলান্টিক চার্টারের অর্থনৈতিক ধারাগুলির চাপে এবং আমেরিকা ঋণ-ইজারা চুক্তির দরুণ পর্ব্বত প্রমাণ দেনা শোধ দিবার বাধ্য-বাধকতায় সেদিন আমাদের অবস্থা অবশ্যই শোচনীয় হইয়া উঠিবে। আসন্ন এই দুর্য্যোগ হইতে ভারতকে রক্ষা করিবার দায়িত্ব কাহার তাহাই আমরা আজ বিষণ্ণচিত্তে ভাবিতেছি।

নূতন মেয়র ও ডেপুটী মেয়র—

গত ২৮শে এপ্রিল কলিকাতা কর্পোরেশনের নব নির্ব্বাচিত কাউন্সিলার ও অলডারম্যানগণের প্রথম সভায় শ্রীযুক্ত আনন্দী-লাল পোদ্দার ও মিঃ মহম্মদ রফিক যথাক্রমে আগামী বৎসরের জন্য মেয়র ও ডেপুটী মেয়র নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত পোদ্দার গত বৎসর কর্পোরেশনের ডেপুটী মেয়র ছিলেন এবং মিঃ রফিক একজন খ্যাতনামা ব্যবসায়ী। আমরা তাঁহাদিগকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন সেন—

শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন সেন গত ১৭ই এপ্রিল হইতে দুই বৎসরের জন্য নাগপুর হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। বাঙ্গালার বাহিরে বাঙ্গালীর এই উচ্চপদপ্রাপ্তিতে বাঙ্গালী মাত্রই গৌরব বোধ করিবেন।

চিনি ও গুড়—

রেশনিং ব্যবস্থায় কলিকাতায় জন প্রতি সপ্তাহে যে এক পোয়া করিয়া চিনি দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহা পর্য্যাপ্ত নহে বলিয়া সকলেই মত প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ চিনির পরিমাণ বৃদ্ধির জন্যও চেষ্টা চলিতেছে। চিনির সঙ্গে গুড় দেওয়ার ব্যবস্থা হইবে বলিয়া শুনা গিয়াছিল। কলিকাতার কোন কোন দোকানে পশ্চিমা 'ভেলী গুড়' আসিয়া পৌঁছিলেও সর্ব্বত্র তাহা পাওয়া যাইতেছে না। বাঙ্গালীর সংসারে পর্য্যাপ্ত গুড় চিনি না হইলে তাহার চলে না। বাঙ্গালা দেশে উৎপন্ন গুড় যে এবার কোথায় উড়িয়া গেল, তাহা বুঝা গেল না। এই সকল বিষয়ে বেসামরিক সরবরাহ বিভাগ হইতে সংবাদ প্রকাশিত হওয়া উচিত।

প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য

অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যোদ্যানে কবিতার কুঞ্জবনে একজন কবি পথ-প্রদর্শক হইয়া আমাদের হাত ধরিয়া লইয়া যাইতেছেন, কবিদের রচনা বুঝাইয়া দিতেছেন, কি ভাবে কাব্যামৃত রস আস্বাদ করিতে হয় তাহা সেই অমৃত রসের পাত্র মুখের সামনে তুলিয়া ধরিয়া আমাদের দেখাইয়া দিতেছেন। কবিশেখর শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় প্রণীত 'প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য' বইখানি সম্পূর্ণ নূতন ধরণের, প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস নহে, কিন্তু শুষ্ক ইতিহাসের ঊর্দ্ধে যাহা অবস্থিত, সেই রসবস্তুর বিশ্লেষণ, ভাব সম্পুটের উন্মোচন ইহার উদ্দেশ্য। "প্রাচীন সাহিত্য" বলিলেই আমাদের মনে একটা সম্ভ্রম জাগে—প্রাচীনকালে আমাদের পিতৃপুরুষদের হাত হইতে যাহা বাহির হইয়াছিল তাহার সবটাই বুঝি সাহিত্য পদবাচ্য। কিন্তু বাস্তবিকই প্রাচীন রচনার অনেকখানিই সাহিত্য পদবাচ্য নহে; তবে যাহা সত্যকার 'সাহিত্য' নহে, রস যাহাতে নাই, তাহা আমরা শ্রদ্ধার সহিত দেখিয়া থাকি, তাহার নিজরূপে তাহাকে আবিষ্কার করিয়া তাহার সংরক্ষণ করিতে চাহি এই জন্য যে তাহার অন্যবিধ মূল্য আছে, তাহা ঐতিহাসিক ভাষাতাত্ত্বিক অথবা নৃতত্ত্ববিদের মতন বিশেষজ্ঞদেরই উপজীব্য হইয়া থাকে। কিন্তু সাধারণ পাঠক তাহা হইতে সাহিত্যরস পান না বলিয়াই তাহাকে এড়াইয়া থাকেন, তাহার সম্বন্ধে সম্ভ্রম থাকে কিন্তু তাহাকে ভালবাসা সম্ভব হয় না। লেখক সাধারণ শিক্ষিত বঙ্গ সাহিত্যানুরাগীর প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই উপাদেয় বইখানি লিখিয়াছেন; প্রাচীন বাঙ্গালা বাঙ্ময়ের মধ্যে যাহা সত্যকার সাহিত্য, যাহাতে উপভোগ্য রসবস্তু বিদ্যমান, তাহারই তিনি প্রকাশনে আত্মনিয়োজিত করিয়াছেন, তাঁহার এই সাধনা সার্থক হইয়াছে—বাঙ্গালা সাহিত্যের সৌন্দর্য্যের এবং তাহার অসম্পূর্ণতার, তাহার দোষগুণ উভয়েরই বিচার এমন মার্জ্জিত রুচি ও সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহাসিক বুদ্ধি ও সাহিত্যবোধ লইয়া ধারাবাহিকভাবে আর কেহ করিবার চেষ্টা করেন নাই।

বইখানির সূচীপত্র হইতে ইহার আলোচনার ক্ষেত্র বুঝা যাইবে। ইহাতে যাহা আছে তাহা আগে বলিতেছি, যাহা নাই (এবং যাহা আশা করি ইহার তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডে থাকিবে) তাহার কথাও বলিব। প্রথম খণ্ডে 'বিদ্যাপতি', 'কৃত্তিবাস', 'বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন', 'গোবিন্দদাস', 'জ্ঞানদাস' এবং 'বৈষ্ণব কবিতার স্বরূপ' এবং দ্বিতীয় খণ্ডে 'বৈষ্ণব কবিতার ভূমিকা', 'মঙ্গলকাব্য', 'চণ্ডীদাস' (১), গৌর পদাবলী', 'মাথুর', 'শ্রীচৈতন্যচরিত', 'চণ্ডীদাস (২)' এবং 'বৈষ্ণব পদাবলীর ছন্দ'—এই কয়টি অধ্যায় আছে। দেখা যাইতেছে, কৃত্তিবাস সম্বন্ধে একটি অধ্যায় ও মঙ্গল কাব্য সম্বন্ধে একটি অধ্যায় ব্যতীত প্রায় চারিশত পৃষ্ঠায় এই নাতিক্ষুদ্র বইখানির প্রায় সবটাই বৈষ্ণব সাহিত্য লইয়াই রচিত। ইহাতে লেখককে দোষ দিতে পারা যায় না, কারণ পুরাতন বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদই হইতেছে ইহার বৈষ্ণব গীতি-কাব্য এবং চরিত কথা। আশা করা যায়, কবি অদূর ভবিষ্যতে বাঙ্গালা সাহিত্যের অনালোচিত অন্য অংশের কথা আমাদের এইভাবে শুনাইবেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের পত্তন, চৈতন্যদেবের পূর্ব্বেকার ও তাঁহার সময়ের অন্য কবি ও কাব্য, রামায়ণের অন্য অনুবাদক, বাঙ্গালা সাহিত্যে মহাভারত, গোপীচাঁদের ও লাউসেনের, বেহুলা ও ফুল্লরার কথা লইয়া রচিত কাব্যসমূহ এবং অষ্টাদশ শতকের কবিদের কথা—ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ এবং অন্যান্য শাক্ত কবি—এই বিষয়গুলি অবলম্বন করিয়া তাঁহার প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য সমীক্ষা সম্পূর্ণ হইবে। ভূমিকায় লেখক পরবর্ত্তী খণ্ডে এই বিষয়গুলি লইয়া আলোচনা করিবেন বলিয়াছেন।

লেখক যে চক্ষে আলোচনা করিয়াছেন তাহা মুখ্যতায় বস্তুতন্ত্র। তিনি যে কবির বা কাব্যের অথবা কাব্যধারার বিচার বিশ্লেষণ হাতে লইয়াছেন, আগে তাঁহার আলোচ্য বিষয়টি কি, তাহাতে কি কি বস্তু বা উপাদান আছে, তাহা আনুসঙ্গিক টীকা সমেত দেখাইয়া দিয়াছেন। কৃত্তিবাসের সম্বন্ধে লিখিত প্রবন্ধ হইতে পাঠক বুঝিতে পারিবেন, বাঙ্গালী "অনুবাদক" কৃত্তিবাসের বইয়ে কি কি জিনিষ আছে, এবং বাল্মীকির সংস্কৃত রামায়ণ হইতে ইহার পার্থক্য কোথায়—উপাখ্যানভাগে এবং দৃষ্টিভঙ্গীতে, উভয়েই। সর্ব্বত্র ছন্দের বিশ্লেষণ আছে, অলঙ্কারের আলোচনা আছে, নানা সূক্তি সংগ্রহ আছে। লেখক স্বয়ং কবি, সমগ্র বাঙ্গালা সাহিত্যে বিশেষজ্ঞ কবি; ছন্দ বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টিকোণ কৃতবিদ্য ও কৃতকর্ম্মা ছান্দোবিদের দৃষ্টিকোণ, সুতরাং এ বিষয়ে তাঁহার আলোচনা বিশেষ মূল্যবান হইয়াছে।

সারা বইয়ের মধ্যে প্রচুরভাবে পরিলক্ষিত আর একটি বিষয়ে বইখানির নিজ বিশিষ্টতা ফুটিয়া উঠিয়াছে—প্রাচীন কবিদের মধ্যে সর্ব্বত্র যে ভাব ও ভাষার একটা ধারাবাহিক পারম্পর্য্য বা অনুকৃতি বিদ্যমান, লেখক বাক্য ও কবিতাংশের প্রভূত উদ্ধারের দ্বারা তাহা আমাদের দেখাইয়া দিয়াছেন। ইহা তাঁহার প্রাচীন সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের এক অতি সহজ উপায়ে প্রমাণিত হইয়াছে। সাধারণ পাঠক ও বাঙ্গালা সাহিত্যের অনুরাগী ইহা হইতে অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন, আমাদের পূর্ব্বজ-গণের মধ্যেও মাতৃভাষার সাহিত্যের সহিত কিরূপ পরিচয় ছিল, সুন্দর ভাষায় উক্ত একটি সুন্দর ভাব কেমন করিয়া পুরুষানুক্রমে আমাদের কবিদের চিত্তে স্থান করিয়া লইয়াছিল।

সহজ সাহিত্যদৃষ্টির দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া যাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যের বিচার করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের নাম সর্ব্বাগ্রে করিতে হয়। এই বইয়ে লেখক প্রচুর পরিমাণে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যগুলি উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন—রবীন্দ্রনাথের মতের দ্বারা লেখকের মতের মূল্য এই ভাবে অনেক স্থলে যাচাই করিতে পারা যাইবে।

ইহাতে সাহিত্যিকের দৃষ্টিতে বৈষ্ণবরসতত্ত্ব ও সাধনতত্ত্বের বিশ্লেষণ আছে। লেখক ভালরূপেই দেখাইয়াছেন, বৈষ্ণব-কবিতার mysticism বা রসানুভূতি intrinsic অর্থাৎ কবিতার অঙ্গীভূত নহে, উহা transferred অর্থাৎ আরোপিত। মোটের উপর সমগ্র পুস্তকে একটি সংযত, সত্যদর্শী অথচ শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী আছে তাহা বিশেষভাবে উপভোগ্য এবং তাহার দ্বারা বইখানির মূল্য যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়াছে। ইহাতে ব্যক্তিগত ভাবগদগদ উচ্ছ্বাসের স্থান নাই দেখিয়া সকলেই প্রথম হইতেই লেখকের যৌক্তিকতার প্রতি আকৃষ্ট হইবেন।

বইখানির আর একটি বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য—যদ্দ্বারা ইহা সমালোচনার বই হইয়াও উচ্চ সাহিত্যের পদে উন্নীত হইয়াছে—ইহাতে প্রকাশিত কবিশেখর কালিদাসের কতকগুলি কবিতাময় রচনা। এক একটি কবির আলোচনার পরে, লেখক উক্ত কবির বিশেষ গুণ ছন্দোবদ্ধভাবে কবিতাকারে প্রদর্শন করিয়াছেন। এক একটি কবিতায় সংক্ষিপ্ত ভাবে এক একজন কবির বিশিষ্টতার সুন্দর আলোচনা কবি-লেখক করিয়াছেন। এই সম্পর্কে, কৃষ্ণদাস কবিরাজের ব্যক্তিত্ব ও কবিপ্রতিভা অবলম্বন করিয়া কবি কালিদাস যে সুন্দর কবিতাটি দিয়াছেন, বিশেষ করিয়া তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে; ইহাতে লেখক অতি চমৎকার ভাবে কৃষ্ণদাসের "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" গ্রন্থের সারতত্ত্বটুকুর একটি উপভোগ্য নূতন রসরূপ দান করিয়াছেন।

আমি এই বই প্রভূত আনন্দের সহিত পড়িয়াছি। আমার পক্ষে অনেক নূতন কথা অথবা আবছা-আবছা ভাবে অনুভূত কথা নূতন ভাবে এবং মনোগ্রাহীভাবে লেখক আমাদের সামনে প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। বইটিতে ক্লান্তিকারক বা রোমাঞ্চপ্রদ মত বা তত্ত্বের অবকাশ নাই, sweetness and light রস এবং জ্ঞান উভয়ের মনোজ্ঞ সংমিশ্রণে এখানি সকলকেই খুসী করিবে।

মোটের উপর বইখানি আমার খুব ভাল লাগিলেও, সব জায়গায় যে লেখকের সঙ্গে আমি এক মত তাহা বলিতে পারি না। তবে বেশীর ভাগ ইতিহাস ও তথ্যঘটিত বিষয়ে তাঁহার সহিত মতানৈক্য—তত্ত্ববিচার বা রসবিচার লইয়া নহে। ব্রজবুলি ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ সম্বন্ধে যে বিস্তৃত আলোচনা ইতিপূর্ব্বে হইয়া গিয়াছে, কবি কালিদাস তাহার সহিত সম্যক্ পরিচিত নন বলিয়া মনে হয়—নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় ও তদনন্তর সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহাই সমীচীন বলিয়া মনে হয়। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের আলোচনায়, বাঙ্গালা দেশের বৈষ্ণব ভাবধারার ঐতিহাসিক বিকাশের কথা বিস্মৃত হইয়া লেখক বড়ু চণ্ডীদাসের কৃতির উপর একটু অবিচার করিয়াছেন বলিয়াই মনে হয়; তবে কেন তিনি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনকে পুরাপুরি পছন্দ করিতে পারেন নাই, তাহার কতকগুলি কারণও দিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমি খালি আমার একটি কথার পুনরুক্তি করিব—প্রাচীন কবিদের সবটুকুই তো আর রসসৃষ্টি নহে। তারপর, তিনি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে অপরিণতবয়স্কা রাধার প্রতি আসক্ত শ্রীকৃষ্ণকে যুবক অনুমান করিয়া উনবিংশ শতকের শেষ পাদের ও বিংশ শতকের প্রথম পাদে বাঙ্গালা দেশে দাম্পত্য জীবনে স্বামী ও স্ত্রীর বয়সের পার্থক্য হেতু যে কুৎসিত পরিস্থিতির উদ্ভব হইত, তাহা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের যুগে আরোপ করিয়াছেন। এইরূপ আরোপ কোন প্রামাণিক বা সঙ্গত কারণ নাই। "এদেশে বালিকার সহিত চিরদিন যুবকের বিবাহ হইয়া থাকে"—একথা কি ঠিক? বাল্যবিবাহে কন্যা যেমন শিশু বা বালিকা, বরও তেমনি বালক বা কিশোর, বা অষ্টাদশবর্ষদেশীয় তরুণ। মধ্যযুগের উত্তর ভারতের আদর্শ—"তিরিয়া তেরহ, পুরুখ অঠারহ"—ইহা বাঙ্গালা দেশেরও আদর্শ এবং রীতি ছিল। শ্রীকৃষ্ণও কিশোর রূপে কল্পিত। এ সব কথা ভুলিয়াছেন বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের সামাজিক আবহাওয়া সম্বন্ধে কতকগুলি অনুচিত মন্তব্য করিয়াছেন। মঙ্গলকাব্যের আলোচনায় লেখক মোটামুটি ভাবে রবীন্দ্রনাথের মতেরই অনুসরণ করিয়াছেন। মঙ্গলকাব্যগুলির বিষয় বস্তু এবং ভাবজগৎ উভয়েরই পিছনে প্রাচীন ইতিহাস ও নৃতত্ত্ব উঁকি দিতেছে—মনসা ও শীতলা, ধর্ম্মঠাকুর ও মঙ্গলচণ্ডী কোন বাতাবরণের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছিলেন তাহা বুঝিতে না পারিলে তাঁহাদের লীলা লইয়া রচিত কাব্য পুরাপুরি বুঝাও কঠিন হইবে—কেবল মধ্যযুগের বাঙ্গালার রাজনৈতিক আবহাওয়ার কারণেই পূজালোলুপ অত্যাচারী দেবতার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে তাহা বলিলে হয়তো সব কথা বলা হয় না।

সে যাহা হউক, বইখানি প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের সবচেয়ে বড় দিকটির অর্থাৎ ইহার বৈষ্ণব সাহিত্যের বিভাগটির—সাহিত্যিক রসাস্বাদনে সাহায্য করিবে, এবং এইজন্য, ইহার অভাব ও ত্রুটি যাহা কাহারও না কাহারও চোখে লাগিবে তাহা সত্ত্বেও, ইহাকে বাঙ্গালা ভাষায় সাহিত্যালোচনা বিষয়ক একখানি বিশেষ লক্ষণীয় পুস্তক বলিতে হইবে। আশা করি সাধারণ বাঙ্গালী পাঠক সমাজে ও ছাত্র-সমাজে ইহার উপযুক্ত সমাদর হইবে।

অভেদ নীতি

শ্রীনীহাররঞ্জন সিংহ

অন্তরে আমি যে গীতি শুনেছি
সেই গানই শুনি বাহিরে।
বাহিরে যে আলো, ভিতরে সে আলো
ভেদাভেদ কিছু নাহি রে!

অন্তর আর বাহিরের গানে;
মিশে গেলে সুর, শুনিনাক কানে—
আলোকের সাথে আলোক মিলিলে
অকারণে শুধু চাহি রে!

এ হৃদয় নদী কুল্ কুল্ সুরে
মিশিছে ভুবন-সাগরে!
উদারার সাথে তারার মিলন—
অতি ছোট মিশে ডাগরে।

তবু এ মিলনে একই সুর উঠে
সাত রঙা ঢেউ সাদা হয়ে ফুটে—
পরমানন্দে ভিতরে বাহিরে
নীরবের গীতি গাহি রে!



শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়



৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

খেলা ঃ

ব্যাক ঃ

হাফ লাইনের পরই গোলরক্ষার্থে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখব দু'জন ব্যাককে। দু'জন ব্যাকের মধ্যে বোঝাপড়ার প্রয়োজন প্রধান। একজনের ভুল অপরকে দিয়ে সংশোধন করতে হ'লে পরস্পরকে 'Cover' করবার অভ্যাস তাদের নিশ্চয় থাকবে। যে কোন পায়ে যে কোন দিকের বল প্রচণ্ডভাবে কিক করবার অভ্যাস, বিপক্ষের সঙ্গে প্রচণ্ডভাবে লড়াইয়ের ক্ষমতা এবং হেডিং ও ট্রাপিংয়ের দক্ষতা ব্যাক দুজনের থাকা উচিত। উপরন্তু খেলার গতিবিধির সঙ্গে নিজেদের অবস্থান পরিবর্ত্তন ক'রে ব্যাকরা দলকে সহযোগিতা করবে।

খেলার সূচনায় (kick off) একজন ব্যাক পেনাল্টি সীমানার দাগের উপর থাকবে অপর ব্যাক থাকবে এগিয়ে। তারা কখনও গোল লাইনের সঙ্গে সামন্তরলভাবে দাঁড়াবে না। তারা obligue position এ পিছিয়ে এবং এগিয়ে খেলবে যখন যেমন প্রয়োজন হবে।

ব্যাকরা সর্ব্বদাই পরস্পরকে 'cover' করে খেলবে। একজন বিপদের সম্মুখীন হ'তে অগ্রসর হলে অপর ব্যাক তার স্থান ছেড়ে আসবে তার জুটীকে সহযোগিতা করতে। একদিকের উইং থেকে বিপরীত উইংয়ে বলটির গতি পরিবর্ত্তন হ'লেই সেই দিকের ব্যাকই (supporting Back) বলের সম্মুখীন হবে এবং অপর ব্যাক অতিরিক্ত হিসাবে পিছিয়ে আসবে। প্রথম শ্রেণীর ব্যাক কখনও একস্থানে নিশ্চল হয়ে দাঁড়ায় না, খেলার গতিবিধির সঙ্গে সর্ব্বদাই সে নিজের অবস্থান (position) পরিবর্ত্তন করে জুটীকে সহযোগিতা করে।

আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে সামনে হাফব্যাক লাইনে এবং পিছনে গোলরক্ষকের সঙ্গে ব্যাককে যোগাযোগ রাখতে হবে। অধিকন্তু তার যোগাযোগ অক্ষুন্ন থাকবে সহযোগী অপর ব্যাকের



বিপক্ষের বল প্রতিরোধের জন্য খ্যাতনামা লেফট হাফ অনিল দে অগ্রসর হচ্ছেন

[ছবি—অনিল দের সৌজন্যে

সঙ্গে, যে খেলার গতির সঙ্গে কখনও পিছনে এবং সামনে অবস্থান করবে।

এই যোগাযোগ সুদৃঢ় করতে হ'লে নিম্নলিখিত মৌলিক নিয়ম পালন একান্ত আবশ্যক।

(১) নিকটবর্ত্তী রক্ষণভাগের খেলোয়াড়ই আক্রমণকারীকে বাধা দিতে প্রথম অগ্রসর হবে।

(২) অবশিষ্ট খেলোয়াড়রা position নিয়ে বলটি পাশ



খ্যাতনামা লেফট হাফ্ অনিল দে বল ট্যাপ করার কৌশল দেখাচ্ছেন

[ছবি—অনিল দের সৌজন্যে

দিলে তার গতিরোধ করতে কিম্বা প্রথম ব্যক্তি পরাস্ত হলে পুনরায় আক্রমণকারীকে tackle করতে।

(৩) সামনের লোকের পক্ষে বলটি আয়ত্তে আনা সম্ভব না হলে পিছনের খেলোয়াড়দের আবেদনে বলটি ছেড়ে দিতে হবে।

এক এক সময় খেলা এমন অবস্থায় পৌঁছে যে ব্যাক তার সহযোগীকে সাহায্যের জন্ত গোলের মুখ ছেড়ে অগ্রসর হ'তে পারে না। যেমন বলটি দ্রুতগতিতে নিকটবর্ত্তী উইংয়ে উপস্থিত হলে একজন ব্যাক শেষ রক্ষার জন্ত গোলের মুখে অবস্থান করতে বাধ্য হয়। গোলের মুখ ছেড়ে অগ্রসর হওয়ার বিপদ এই যে, বিপক্ষদলের খেলোয়াড় সেই সুযোগে বলটি তার দলের unmarked খেলোয়াড়ের কাছে বিপক্ষের গোলের মুখে সেণ্টার করলে গোলরক্ষকের পক্ষে একা তাদের বাধা দেওয়া সম্ভব হয় না।

তবে দুটী ক্ষেত্রে ব্যাকের নিজ সীমানা ছেড়ে আসার যুক্তিকে সমর্থন করা যায়। প্রথম, বিপক্ষের ফরওয়ার্ড রক্ষণভাগ অতিক্রম ক'রে গোলের দিকে বলটি ড্রিবল ক'রে অগ্রসর হলে বলটি সট করবার পূর্ব্বেই যে কোন সঙ্গত উপায়ে ব্যাক এগিয়ে গিয়ে তাকে বাধা দিবে। দ্বিতীয়, পাশ ধরবার জন্তে বিপক্ষের আউট সাইড টাচলাইন ধরে দ্রুতবেগে অগ্রসর হলে ব্যাক যদি বুঝতে পারে সেও বিপক্ষের সঙ্গে সঙ্গেই বলের কাছে পৌছতে পারবে তাহলে ইতস্তত না করে সেও দ্রুত গতিতে এগিয়ে গিয়ে বলটি তার অধিকারচ্যুত করবে। ব্যাক মাঠের মধ্যিখানে সেণ্টার হাফকে এবং উইংয়ের কাছে উপস্থিত থেকে উইংহাফদের সহযোগিতা করবে। ব্যাক সর্ব্বদাই লক্ষ্য রাখবে সামনের হাফব্যাকদের গতিবিধি এবং যে কোন দিকে অগ্রসর হ'তে প্রস্তুত থাকবে। সাধারণতঃ ব্যাককে এগিয়ে যেতে হবে হাফলাইনের সাহায্যের জন্তে। বলটি সংগ্রহ করতে গিয়ে দলের হাফব্যাককে আক্রমণকারীর কাছে পরাজিত হ'তে দেখলেই ব্যাক এগিয়ে বলটি আয়ত্বে আনতে পারবে। বিপক্ষের 'পাশ' প্রতিরোধ করতে ব্যাক কোনাকুনিভাবে (at angle) অগ্রসর হবে। কিন্তু ঘুরে গিয়ে বিপক্ষের through pass বাধা দিতে ব্যাক সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকবে। নিশ্চিত সাফল্যের সম্ভাবনা না থাকলে কখনও ব্যাক বেশী দূর অগ্রসর হবে না। কারণ যথাসময়ে ফিরে এসে বিপক্ষকে বাধা দেওয়া তার পক্ষে খুবই কঠিন।

অনেক সময় দেখা গেছে আত্মরক্ষার্থে ব্যাক বিপক্ষের পা থেকে বলটি সংগ্রহ করতে গিয়ে ক্রমশঃ নিজের গোলের দিকেই ঝুঁকে পড়ছে। এ অবস্থায় ব্যাকের পক্ষে উইংয়ের দিকে বলটি পাশ করা স্বাভাবিক জেনে বিপক্ষের ফরওয়ার্ডেরা বলের গতিরোধ করতে উইংয়ে এগিয়ে যাবে। মাঠের মাঝখানে এই অবস্থায় পড়লে ব্যাক বলটি পাঠাবে সহযোগী অপর ব্যাকের কাছে। খেলার সামনে দাঁড়িয়ে থাকার দরুণ বলটি অনায়াসে আয়ত্বে আনা তার

পক্ষে সম্ভব। বিপক্ষের খেলোয়াড়দের সামনে বলটি clear করতে অসুবিধা মনে করলে দলের নিকটবর্ত্তী যে কোন খেলোয়াড়কে পাশ করা উচিত। গোলের মুখের বলগুলি আটকাবার দায়িত্ব গোলরক্ষকের। অনর্থক ব্যাক সেখানে পদক্ষেপন ক'রে গোলরক্ষককে বিভ্রান্ত করবে না। তবে গোলরক্ষকের পক্ষে যে বল একা সামলানো সহজ হবে না সেখানে ব্যাকের সহযোগিতা একান্ত বাঞ্ছনীয়। গোলের মুখে গোলরক্ষককে বল পাশ করা ব্যাকের অক্ষমতার কারণ নয়। গোলরক্ষকের একটা সুবিধা, সে মাঠের শেষ প্রান্তে অবস্থান ক'রে চারিদিকে খেলার অবস্থা অবলোকন করছে এবং অভিজ্ঞতার ফলে খেলার পরিবর্ত্তনও অনুমান করতে পারে। সুতরাং গোলরক্ষক বলটি ছেড়ে দিতে সঙ্কেত করলে তার উপর আস্থা স্থাপন করতে ব্যাক কখনও দ্বিধাবোধ করবে না।

কিন্তু এমন বিপদও খেলায় একবার অন্তত আসতে পারে, যে অবস্থায় ব্যাক বলটি নিজেও আয়ত্বে আনতে কিম্বা দলের অপর কোন খেলোয়াড়ের কাছে পৌছে দিতে পারে না। এক্ষেত্রে ব্যাক হয়ত বলটি টাচলাইনে কিম্বা গোল লাইনের পিছনে পাঠিয়ে সেই সময়ের মত আক্রমণের প্রচণ্ডতা শিথিল করতে পারে। বিপক্ষের খেলোয়াড়দের হাতে ধরাশায়ী হওয়ার থেকে অব্যাহতি পেতে এই অখেলোয়াড়ী পন্থা অবলম্বন করা মোটেই অগৌরবের নয়।

গোলের মুখে ব্যাকের প্রধান কাজ হ'ল গোলরক্ষককে সাহায্য করা। নিকট দূরত্বের প্রচণ্ড সটগুলি প্রতিরোধ করা গোলরক্ষকের পক্ষে সকল সময় সম্ভব নয়। সুতরাং কয়েকটি বিষয়ে ব্যাক গোলরক্ষকের সঙ্গে সহযোগিতা রেখে খেললে বিপক্ষদলের আক্রমণ প্রতিরোধ করা সহজ হবে।

(১) বিপদজনক এলাকার বাইরে ব্যাক বিপক্ষদলের ফরওয়ার্ডদের প্রতিরোধ করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করবে।

(২) বিপদজনক এলাকার মধ্যে বিপক্ষদল উপস্থিত হলে গোলে সট করবার পূর্ব্বেই ব্যাক আইনসঙ্গতভাবে চার্জ করে বলটি প্রতিরোধ করবে।

(৩) বিপক্ষের সট বাধা দেবার নিশ্চিত সুযোগ না থাকলে ব্যাক নিজের অবস্থান সম্বন্ধে সচেতন হবে যাতে বলের উপর গোলরক্ষকের দৃষ্টি অবরুদ্ধ না হয়। গোল থেকে ৩০ গজ দূরের ফ্রি কিকের কথা এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ভলি এবং হাফভলি উভয় 'কিক'ই ব্যাক সমান কৃতিত্বের সঙ্গে ব্যবহার করবে।

ব্যাক সর্ব্বদাই চেষ্টা করবে তার বলের প্রত্যেক 'clearance' গুলি দলের খেলোয়াড়দের কাছে 'পাশ' হিসাবে পাঠাতে। তার প্রেরিত বলটি দলের খেলোয়াড়দের অতিক্রম করে গেলে বিপক্ষেরই সুবিধা হবে। আক্রমণের চাপে পা দিয়ে বল মারা অসুবিধা বোধ করলে ব্যাক মাথা দিয়ে বলটি বিপদ গণ্ডীর বাইরে পাঠাবে; গোলের মুখে ব্যাককে অনেক সময়ই এইভাবে মাথা নাড়া দিতে হবে। এর জন্য হেডিংয়ে তার দক্ষতা একান্ত প্রয়োজন।

প্রথম সুযোগেই ব্যাক বলটি clear করবে, কখনও ড্রিবল ক'রে বল নিয়ে অগ্রসর হবে না। ড্রিবল করতে গিয়ে বিপক্ষের কাছে পরাস্ত হ'লে বিপক্ষের unmarked খেলোয়াড়দের, যাদের ছেড়ে এসেছে তারাই সুবিধা লাভ করবে!

ফাষ্ট টাইম সট করার অভ্যাস ব্যাকের একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু কয়েক শ্রেণীর বিপদজনক বলে ফাষ্ট টাইম সট করার ঝুঁকি নিবে না। একমাত্র অনন্যোপায় না হ'লে অসুবিধাজনক স্থান থেকে বিপক্ষের ব্যাকের প্রচণ্ড সটে 'ফ্লাইং কিক' মারা খুবই বিপদজনক। সময় থাকলে এগুলির প্রথম ধাপেই বুক দিয়ে কিম্বা ট্যাপ ক'রে আয়ত্বে আনা নিরাপদ।

খেলায় অধিকাংশ সময়েই বলটি 'clear' করার পূর্ব্বে বিপক্ষের বাধাদান থেকে রক্ষার জন্য ব্যাক বলটি একদিকে 'ট্যাপ' ক'রে নিবে। ট্যাপ করেই কিন্তু ব্যাক তৎক্ষণাৎ বলটি দলের খেলোয়াড়ের উদ্দেশ্যে পাশ করবে। ব্যাকের কিক খুব উঁচু হলে বিপক্ষ বলটি মাথা দিয়ে ধরবার সময় পাবে। লম্বা এবং নিচু 'কিক'ই বিশেষ কার্য্যকরী।

বিপক্ষের খেলোয়াড় না থাকলে বল দিতে হবে নিচু দিয়ে। অনেক সময় বিপক্ষের রক্ষণভাগের ক্রীড়াচাতুর্য্য অতিক্রম ক'রে ব্যাক দলের খেলোয়াড়দের বারম্বার বল জুগিয়েও খেলায় প্রাধান্যলাভ করতে পারে না। এই অবস্থায় ব্যাক ফরওয়ার্ডদের বল পাঠিয়ে অযথা সময় নষ্ট করবে না। আক্রমণের ধারা পরিবর্ত্তন একান্ত প্রয়োজন। ব্যাক দলের হাফব্যাককে ground pass দিবে। হাফব্যাক বলটি ড্রিবল ক'রে এগিয়ে যাবে যে পর্য্যন্ত না বিপক্ষের একজন খেলোয়াড় অগ্রসর হবে তাকে বাধা দিতে। বিপক্ষের খেলোয়াড় এগিয়ে এলে হাফব্যাক দলের একজন unmarked খেলোয়াড়কে পেয়েই বলটি পাশ দিতে পারবে। কিন্তু সরাসরি ফরওয়ার্ডদের বল পাশ দেবার সুবিধা থাকলে ব্যাক আর হাফব্যাকদের পাশ করবে না। দলের হাফলাইন আক্রমণের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হ'লেই ব্যাক দু'জন এগিয়ে ব্যবধান সঙ্কীর্ণ করবে। আত্মরক্ষার্থে তারা সর্ব্বদাই চেষ্টা করবে "to avoid standing square to one another." খেলার গতি বাঁদিকে গেলে লেফট ব্যাক অগ্রসর হয়ে position নিবে; বিপক্ষের গোলের দিকে কর্ণার কিকের সময় একজন ব্যাক হাফলাইন পর্য্যন্ত অগ্রসর হবে এবং দ্বিতীয় জন থাকবে ঐ সীমানার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে। অন্য সকল সময়ে হাফলাইন পর্য্যন্ত ব্যাকের অগ্রসর হওয়া দুঃসাহস। যদি না বিপক্ষদল ভালভাবে বল clear করতে অক্ষম হয় কিম্বা বিপক্ষদলকে হাওয়ার প্রতিকূলে অবস্থায় খেলতে হয়।

কলিকাতা হকি লীগঃ

কলিকাতা হকি লীগের প্রথম বিভাগের খেলায় পোর্ট কমিশনার্স ২৯ পয়েণ্ট পেয়ে প্রথম হয়েছে। ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব ২৮ পয়েণ্টে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। হকি খেলায় কাষ্টমস ক্লাবের নাম সুপ্রতিষ্ঠিত কিন্তু দুঃখের বিষয় এবার তারা দ্বাদশ স্থানে নেমেছে।

হকি লীগের অন্যান্য বিভাগের ফলাফলঃ

দ্বিতীয় ডিভিসন "বি" লীগ—বিজয়ী পোর্ট কমিশনাস, রাণার্স আপ মোহনবাগান ক্লাব; লক্ষ্মীবিলাস কাপ—বিজয়ী

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব, রাণার্স আপ মোহনবাগান ক্লাব; কাইভান কাপ—বিজয়ী কলেজিয়াল্‌স, রাণার্স আপ গান এণ্ড সেল দল।

বেঙ্গল চ্যালেঞ্জ শীল্ড—বিজয়ী পোর্ট কমিশনার্স দল, রাণার্স আপ মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব।

স্যার আশুতোষ চৌধুরী কাপ—বিজয়ী মেডিক্যাল কলেজ, রাণার্স আপ বি ই কলেজ।

বেটন কাপ প্রতিযোগিতা ঃ

হকি খেলার প্রধান আকর্ষণ বেটন কাপ প্রতিযোগিতা। এবার বি এন আর দল গোয়ালিয়রের জিওয়াজী ক্লাবকে প্রতিযোগিতার ফাইনালে পরাজিত করে কাপ বিজয়ী হয়েছে। এই নিয়ে বি এন আর দল চারবার ফাইনাল বিজয়ী হ'ল। ১৯৩১ সালে রেল দল প্রথম কাপ বিজয়ী হয়। এর পর ১৯৩৯ এবং ১৯৪৩ সালে কাপ বিজয়ের সম্মান লাভ করে। ফাইনালে জিওয়াজী ক্লাব আশানুরূপ খেলতে পারে নি। সেমিফাইনালে জিওয়াজী ক্লাব যে ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখিয়েছিল ফাইনালে তার কিছুই প্রকাশ পায় নি। আত্মরক্ষামূলক নীতি অবলম্বনের ফলেই এই দলটি রেল দলের সঙ্গে পেরে উঠে নি।

ফুটবল খেলার ছবি ঃ

খ্যাতনামা ফুটবল খেলোয়াড়দের সহযোগিতায় ফুটবল খেলার technic সম্বন্ধে ধারাবাহিক ফটো ছাপার যে ব্যবস্থা হয়েছে তার উল্লেখ গত সংখ্যায় করেছি। আগামী বার খ্যাতনামা ফুটবল খেলোয়াড় মিঃ কে ভট্টাচার্য্য ফুটবল খেলার কয়েকটি পদ্ধতি সম্বন্ধে ছবি দিবেন। ফিল্ম কৃচ্ছ্রতার দিনে ক্যামেরা এক্সচেঞ্জ 'বার্ণেট' ফিল্ম সরবরাহ ক'রে এই কাজে যথেষ্ট সহযোগিতা করছেন।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী প্রণীত "বহ্ন্যুৎসব"—১॥০
শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "মুক্তি-মণ্ডপ"—২৲
শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল প্রণীত "মহাসমরের মুখে"—১৲
সব্যসাচী প্রণীত শিশু-উপন্যাস "মুখোশের অন্তরালে"—১৲
প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত "কস্তুরীবাঈ গান্ধী"—৸০
জগবন্ধু ভট্টাচার্য্য প্রণীত "নিস্তরঙ্গ নীল সমুদ্র"—১॥০
শ্রীদিলীপকুমার রায় প্রণীত নাটক "শাদা-কালো"—২৲
শ্রীনরেন্দ্রনাথ সিংহ প্রণীত "আধুনিক জাপান ও বর্ত্তমান যুদ্ধ"—৩৲
শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "যাদুকর মার্কনী"—১৲
শ্রীঅশোক সেন প্রণীত "অযাত্রা পথে যাত্রী যাহারা চলে"—২৲
শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রণীত কবিতার বই "জীবনমৃত্যু" ২।০

আগামী আষাঢ় মাসে ভারতবর্ষের দ্বাত্রিংশ বর্ষ আরম্ভ

গত একত্রিংশ বর্ষকাল 'ভারতবর্ষ' কি ভাবে বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবা করিয়া আসিতেছে, তাহা আমাদের পাঠকগণ অবগত আছেন। বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের জন্য নানা দিক দিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াও আমরা ভারতবর্ষের চাঁদার হার বৃদ্ধি করি নাই। আশা করি, সকলে আমাদের সহিত পূর্ব্বের মতই সহযোগিতা করিয়া আমাদের উৎসাহ বৃদ্ধি করিবেন।

ভারতবর্ষের মূল্য মণিঅর্ডারে বার্ষিক ৬॥০, ভি পি—৬৸৵০, ষাণ্মাষিক ৩।০, ভি-পিতে ৩।৵০। ভি-পিতে ভারতবর্ষ লওয়া অপেক্ষা **মণিঅর্ডারে মূল্য প্রেরণ করাই সুবিধাজনক।** ভি-পির টাকা অনেক সময় বিলম্বে পাওয়া যায়, ফলে পরবর্ত্তী সংখ্যা পাঠাইতেও বিলম্ব হয়। গ্রাহকগণের টাকা ২০শে জ্যৈষ্ঠের মধ্যে না পাওয়া গেলে আষাঢ় সংখ্যা আমরা ভি-পিতে পাঠাইব। পুরাতন ও নূতন সকল গ্রাহকগণই দয়া করিয়া মণিঅর্ডারের কুপনে পূর্ণ ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। পুরাতন গ্রাহকগণ কুপনে গ্রাহক নম্বর দিবেন। নূতন গ্রাহকগণ 'নূতন' কথাটি লিখিয়া দিবেন।

মণিঅর্ডার পাঠাইবার ঠিকানা—কার্য্যাধ্যক্ষ—ভারতবর্ষ

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা; ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত